"বই মনের খাদ্য।
বেশি বেশি বই পড়ুন,
মনকে সুস্থ রাখুন।।"

মোঃ কবিরুল ইসলাম
(DMC K-69)

www.facebook.com/kabiruldmc
kabirul.dmc@gmail.com

পুজোয় চাই নতুন জুতো

জীনস্ ৩৭

নোডা ২৪

সিনডারেলা ৭৮

Bata

Bata understands shoes

অমৃত
১৭ বর্ষ ২০ সংখ্যা
৬ আশ্বিন ১৩৮৪
23 SEPT. 1977

আগামী সংখ্যায়

এ সংখ্যার প্রচ্ছদ এঁকেছেন ধ্রুব রায়
ভেতরের অলংকরণ করেছেন
সুবোধ দাশগুপ্ত। ধ্রুব রায়

সংস্কৃতি অপসংস্কৃতি বিনিশ্চয়

বাঙালি সংস্কৃতি-প্রিয় জাত, একথা সকলেই স্বীকার করেন, আর এ নিয়ে আমরা গর্বও বোধ করে থাকি। সেজন্যে সংস্কৃতি নিয়ে কোনো আলোচনা শুরু হলে অনেকেই রীতিমত উৎসাহী হয়ে উঠি।

ইদানীং কলকাতা শহরে খারাপ নাটক ও ক্যাবারে ইত্যাদি নিয়ে আপত্তি শোনা যাচ্ছে। অপসংস্কৃতি কথাটা এখন অবিশ্যি অতিব্যবহারে জীর্ণ, কিন্তু অপসংস্কৃতি ব্যাপারটা আকাশ থেকে পড়ে না, দেশের জল মাটি আবহাওয়া থেকেই জন্মায়। একথা আমরা ক'জন ভেবে দেখি! ইংরেজ কবি ও সমালোচক এলিয়ট একবার বলেছিলেন, প্রত্যেকটি যুগ ঠিক সেই ধরনের সাহিত্যই পায়, যা পাবার যোগ্য সে। বলাই বাহুল্য এই সত্যটি শুধু সাহিত্যের বেলাতেই নয়, সংস্কৃতির অন্য সব শাখা-প্রশাখা, যেমন নাটক সিনেমা, গান ইত্যাদি সব কিছুর সম্বন্ধেই খাটে। সেজন্যে অপসংস্কৃতি, বিশেষ করে 'খারাপ' নাটক নিয়ে যদি আপত্তি তোলা হয় তাহলে বুঝতে হবে তার আসল শিকড় ছড়িয়ে রয়েছে সমাজের মধ্যেই। কাজেই সমস্যাটিকে বিচ্ছিন্নভাবে দেখে তার প্রতিকার করা দুঃসাধ্য।

দ্বিতীয়ত, সংস্কৃতি জিনিসটি অবিভাজ্য এবং তার একটি পূর্বাপরতা আছে। কোনো সমাজে যদি 'খারাপ' নাটক দেখা দেয় তাহলে অনুমান করা ভুল হবে না, সংস্কৃতির অন্য নানা বিভাগেও তার সমর্থন রয়েছে। এবং সে ব্যাপারটা হঠাৎ দেখা দেয় নি, অনেক দিন ধরে ধাপে ধাপে তার পরিণতি ঘটেছে।

এক্ষেত্রে, অর্থাৎ বাংলা নাটকের কোনো কোনো জায়গায় যদি অপসংস্কৃতির লক্ষণ দেখা দিয়ে থাকে তবে বুঝতে হবে, অনুরূপ ধরনের নাটক বহু দিন ধরেই চলছিল; এবং নাটক ছাড়াও, সিনেমা ও সাহিত্যের মধ্যেও তার জ্ঞাত ভাইরা আগে থেকেই আসর জাঁকিয়ে বসে ছিল। কাজেই কলকাতায় যদি 'খারাপ' নাটক দেখা দিয়ে থাকে তবে চোখ ফেরাতে হবে, সিনেমা ও সাহিত্যের দিকেও। বিশেষ করে সিনেমার দিকেই, কেননা সিনেমা জনরুচি সৃষ্টি কিম্বা তাকে কলুষিত করার ব্যাপারে নাটকের চেয়েও বেশি প্রভাবশালী।

কিন্তু সব কিছুর আগে স্থির হওয়া দরকার, 'খারাপ' নাটক বলতে কোন ধরনের নাটক বোঝানো হচ্ছে? এবং তার চেয়েও যা জরুরী, 'খারাপে'র সংজ্ঞা কী?

কেননা সকলেই জানেন, শ্লীলতা অশ্লীলতার প্রশ্নটি খুবই জটিল। সাহিত্য এবং সংস্কৃতির ইতিহাসে অনেক দেশেই দেখা গেছে, এক যুগের নীতিবোধের নিরিখে যা অপসংস্কৃতি কিম্বা অশ্লীল মনে করা হয়েছে, অন্য কালে সেটা ছাড়পত্র পেয়ে গেছে।

বিষয়টি নিয়ে তাই স্থির মস্তিষ্কের বিবেচনা করা দরকার। আবেগের হাত ধরে এগোলে বিপরীত আবেগ আবার পেণ্ডুলামের মতো উল্টো দিকেও ঠেলে নিয়ে যেতে পারে।

শারদীয় অমৃত ১৩৮৪

জীবন / বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়
চীনে সুনীতিকুমারের সঙ্গে / গোপাল হালদার
রাজার সঙ্গে দেখা / বিদ্যুৎ বন্দ্যোপাধ্যায়
মহাকবি ও মহাপ্রভু / অমিতাভ চৌধুরী
আমেরিকায় রবিশঙ্করের মুখোমুখি / প্রহরী সওদাগর
নিভে যাওয়া নক্ষত্র / মধুসূদন মজুমদার
সৈয়দ মুজতবা আলির ডায়েরি
সংসারী সুভাষচন্দ্র / শিবব্রত ঘোষ

বড়গল্প

এই রকম / জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী
ন'বাবু, সেজোবাবু / পরিতোষ সেন
দৃশ্যপটে আমিই নায়ক / মহাশ্বেতা দেবী
একদিন অমলা আসবে / কবিতা সিংহ

উপন্যাস

মানুষের ঘর বাড়ি / অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়
পথের শেষে / নিমাই ভট্টাচার্য
তুমি, মালিনী চৌধুরী / চাণক্য সেন
উমাপতির সাধআহ্লাদ / প্রফুল্ল রায়
অজ্ঞাতবাস / শৈবাল মিত্র
কক্ষপথ / তারাদাস বন্দ্যোপাধ্যায়

কবিতা

পবিত্র মুখোপাধ্যায়, শান্তনু দাস, সামসুল হক, তরুণ চৌধুরী, পরমানন্দ সরস্বতী, গৌরাঙ্গ ভৌমিক, রানা চট্টোপাধ্যায়, পার্থপ্রতিম কাঞ্জিলাল, সোমনাথ মুখোপাধ্যায়, সুরজিৎ ঘোষ।

কৃষ্ণ ধর, কালীকৃষ্ণ গুহ, সমীর চট্টোপাধ্যায়, কবিরুল ইসলাম, শম্ভু রক্ষিত, দেবারতি মিত্র, রত্নেশ্বর হাজরা, অজয় সেন, মৃগেন্দু সরকার, প্রভাত চৌধুরী, প্রতিমা রায়, তুষার চৌধুরী।

দেবীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়, ভাস্কর চক্রবর্তী, বুদ্ধদেব দাশগুপ্ত।

গল্প

ফন্টু / প্রেমেন্দ্র মিত্র
পার্বতী / গজেন্দ্রকুমার মিত্র
হিসেবের বাইরে / আশুতোষ মুখোপাধ্যায়
ফসল তোলার দিনে / আশাপূর্ণা দেবী
কলকাতা থেকে ফেরা / শচীন দাশ
ছোট মাপের মানুষ / সুধাংশু ঘোষ
চিকে / শিশির লাহিড়ী
অ্যানাটমি / নবকুমার বসু
চাই/হীরক রায়
শেষ বিকেল / বুদ্ধদেব গুহ
মহিষ ও জ্যোৎস্না / শিশির দাশ

অলংকরণ : সুবোধ দাশগুপ্ত, ধ্রুব রায়, গৌতম রায় এবং নিতাই ঘোষ

দাম দশ টাকা ॥ সডাক বারো টাকা

খানিকটা ধরে রেখে সব কথাকাব, ফোটোগল্পকে উপন্যাস বলে চালানো একসাথে জবাই করা মুর্গীকে নাম বদলে আর একবার চালানো। ছোট ব্যাপারকে বাগে ভরে লোভের হাত-ছানি দেখানো। শিরোনাম বাদ দিয়ে কতকগুলো ফিচারকে অধ্যায় বলে চালিয়ে, উপন্যাসোপম বইকরা—এসব তো চলছেই। এবং অবশ্য এই কীর্তিকলাপের সিঁড়ি বেয়ে কিছু ব্যক্তি এমন একটা স্তরে উন্নীত হচ্ছেন যে, যেখান থেকে আমেরিকা রাশিয়া চীন জাপান সমদূরবর্তী হয়ে পড়ছে। যে কোনো কাল্পনিক পুরস্কার দিলেই এঁরা অর্জন পারেন। কারণ এঁদের এই উচ্চস্তরে পৌঁছোলে টাকার আর কোন জাত থাকে না। সাহিত্য বিকিকিনির নগদ বিদায় তা হয়ে যায় নিরুপাধি। অথচ এই টাকাই আর একটু নিম্নস্তরের এবং ঐ উচ্চ উচ্চ ব্যক্তিবর্গের কোটারির বাইরে গিয়ে পড়লেই নতুন উপাধি নিয়ে বসে যায় 'সাম্রাজ্যবাদীর টাকা', 'আমেরিকার টাকা' 'রাশিয়ার টাকা', 'জার্মানীর টাকা' 'চীনের টাকা'।

আজ যখন ভারতীয় ও বহির্বিশ্ব সাহিত্যের পুরোনো সময়কে পর্দা সরিয়ে দেখি—দেখি অনেক মহান কবি ও লেখককে যাঁরা সমস্ত জীবন কেবল লেখার জন্যই লিখে গেছেন। দুঃখ দারিদ্র্য, বঞ্চনা ও অপমানে অত্যাচারিত হয়ে কেবল সরস্বতীর আরাধনাই করে গেছেন। এবং জীবিতকালে ত বটেই, মৃত্যুরও অনেক পরে এঁরা আবিষ্কৃত হয়েছেন। হয়েছেন সর্বোচ্চ সম্মানিত।

ভাবি তাঁরা কি সব অন্য গ্রহের মানুষ ছিলেন? কোন্ দেবতাকে উদ্দেশ্য করে তাঁরা লিখতেন? অকৃতার্থ তাঁরা রবীন্দ্রনাথ-সৃষ্ট সেই কবির মত, রাজার গলার মালাটি পর্যন্ত পাননি স্বীকৃতিস্বরূপ। তাঁদের চিতার ছাই মিলিয়ে গেছে পঞ্চভূতে, কবরের মাটিতে জন্মেছে তাচ্ছিল্যের ঘাস, কিন্তু ক্রমশ উজ্জ্বল আর দেদীপ্যমান হয়ে উঠেছে তাঁদের লেখা যত বেশি করে কালের পালিশ পড়ছে।

একবার একজন প্রখ্যাত লেখিকা আমাকে ভদ্রতাবশতঃ প্রশ্ন করেছিলেন—এখন কি লিখছো টিখছো?

বলেছিলাম—একটি উপন্যাস লিখছি।

—কোন্ কাগজের জন্যে?

—কোনো কাগজের জন্য না।

—এমনি?

—এমনি।

—ওমা, কি করে লেখো। আমি তো তাগাদা ছাড়া একটি শব্দও লিখতে পারি না।

বৈকুণ্ঠ পাঠক কি এই তাগাদাকেই সেই তালপাতার ইনজেকশন বলে অভিহিত করেছিলেন? কে জানে!—যাই হোক, আমি কেবল অন্তরে অন্তরে অনুভব করি, লেখার জন্য তাগিদ আর লেখকের ভিতরে নেই। তাগিদটা একেবারেই বাইরে চলে এসেছে। এবং লেখকের সবচেয়ে বড় সর্বনাশ করছে—এই নগদ বিদায়, মোটা দক্ষিণা এবং নানাবিধ সব মোটা অঙ্কের পুরস্কার।

বাংলা সাহিত্যের পুনরুজ্জীবনের জন্য তাই সভায় একটি প্রস্তাব রাখি। তা হলো সাহিত্য থেকে 'দেন-মোহর' তুলে দেওয়ার প্রস্তাব। সাহিত্যের বিনিময় মূল্যকে—অ-মূল্য করে দেওয়া হোক।

টাকা দিয়ে সাহিত্যের বেচাকেনা, অর্থমূল্যের পুরস্কার—এসব স্বীকৃতিদান বন্ধ হোক। গল্প উপন্যাস প্রবন্ধের ক্ষেত্রে যদিও বা এখনই তা পরীক্ষামূলকভাবে চালু করা সম্ভব না হয়—কবিতার ক্ষেত্রে হোক। কবিতাকে যেন টাকা দিয়ে বেচাকেনা না করা যায়।

বলাই বাহুল্য এমন ব্যবস্থা চালু হবার আগেই হাঁ হাঁ করে উঠবেন লেখকেরা। —সে কি, সে কি,—পত্রিকারা টাকা পাবে, মুদ্রক টাকা পাবে—বই বিক্রেতা টাকা পাবে আর আমরা লেখকেরা পাব না?

না পাবেন না। ওরা তো লেখক নয়, ওরা টাকা করতে চায়। ওরা টাকা পাক। আপনি লেখক। আপনি পাবেন না। আপনি কেবল অমূল্য লেখা লিখবেন। এবং যেমন লেখা অ-মূল্য হয়ে গেলে আপনাকে আর সম্পাদকের সামনে নাড়ুগোপালটি হয়ে গিয়ে বসে থাকতে হবে না। স্বয়ং সম্পাদকই যাবেন আপনার কাছে। এবং কলেজ স্ট্রীট পাড়ার প্রকাশকদের জুতোর সুখতলা ক্ষইবে আপনারই দরজায় ঘোরাঘুরি করে। আপনাকে আর আজকের মত হাফসোল লাগাতে হবে না পাবলিশারের ঘরে ঘরে গিয়ে। এবং সর্বোপরি যা দাঁড়াবে তা হলো লেখা অ-মূল্য হয়ে গেলে, বাংলা সাহিত্যের বড় বাজার—এক পলকেই জনশূন্য খাঁ খাঁ শ্মশানে পরিণত হবে।

[illegible] কোলাহল শোনা গেল না। রামনেহাল এসে লুটিয়ে পড়লো তার খাটে এবং তখনই শোনা গেল আবার সেই রক্তজমানো করুণ তীব্র আর্তনাদ। এবার অতি স্পষ্ট এবং নিঃসন্দেহে এ-টা মানুষেরই গলার শেষ প্রকম্পিত আর......

কেমন বুঝছেন? দাঁড়াবে তো?

আর অন্যপ্রকার উপন্যাসের মতো গোয়েন্দাকাহিনীও বিশেষ নিয়মশৃঙ্খলা মেনে গড়ে ওঠে। যেমন, আগেই বলেছি, হত ব্যক্তি কখনোই মধ্যবিত্ত শ্রেণীর লোক হবেন না। অর্থাৎ, আপনাতে আমাতে, খুনের বিষয় রহস্য নেই। কেননা আমরা অতিসাধারণ। আমার উপার্জন কতো বা আমি [illegible] মাইনে পাই—এটা পাড়ার সমস্ত লোক জানে। হঠাৎ ট্যাক্সি চড়ে বাড়ি ফিরলে পাড়ায় কানাকানি শুরু হয়।

ধনীদের কথা বাদ দিন। তাদের নিয়ে

আরেকটা কথা। আপনি মনে মনে যা লিখবেন—তা-ই সাহিত্য। এর জন্য আপনাকে আইন আদালতের পাতা দেখতে হবে না, না ঘাঁটতে হবে না পত্রিকা[illegible]। লক্ষ্য করেছি, সত্যঘটনা অবলম্বনে লিখিত গোয়েন্দাকাহিনীর কদর নেই।

এবার মূল প্রসঙ্গে আসি। কি স্টাইলে লিখবেন আপনি? আপনার নিজস্ব একটা রচনাভঙ্গি থাকলে, আপনি ভাগ্যবান। যদি তা না থাকে, আমাদের কারোরই বা সে-টা আছে, তবে আপনাকে খানিকটা হাত মকসো তো করতেই হবে। ধরা যাক, আপনাদের পাড়ার একটি বাড়িতে সম্প্রতি চুরি হয়েছে। আপনি তারই বর্ণনা লিখুন। বঙ্কিমচন্দ্রের স্টাইলে লিখতে পারেন। না হয় রবীন্দ্রিক ভঙ্গিতে। না হয় আধুনিক কালের [illegible] স্টাইলে। আত্মবিশ্বাস যদি আপনাকে নিজস্ব স্টাইলে লেখায়—তাহলেও আপত্তি নেই। দু' চারটে গল্প লেখা আপনার

ডাকে পাঠিয়ে দিন। প্রতিটি চিঠির উত্তর পাবেন। নির্বাচিত রচনাগুলি প্রকাশিত বা আলোচিত হবে। কিন্তু প্রতিশ্রুতিভঙ্গও ঘটতে পারে।

অর্থাৎ, জলে তো নেমে পড়ুন। তারপর দেখা যাবে আপনি কেমন সাঁতারু!

দেওয়া। চোখ তাঁর সেঁটে রইল ক্যামেরার ভিউ-ফাইণ্ডারে। এঁকেবেঁকে গণ্ডারটা ধান খাওয়া ছেড়ে এগুতে লাগল তাঁর দিকে। সাহেব ছবি নিতেই ব্যস্ত, খেয়াল নেই। হঠাৎ দেখলেন ভিউ-ফাইণ্ডার জুড়ে গণ্ডারের ছবি। গণ্ডারটা এসে পড়েছে ঘাড়ের কাছে। কিন্তু ছবিও আসছে দুর্দান্ত। ক্যামেরা ছাড়া যায় না। অনুচরকে হাতীতে উঠতে বলে তিনি ক্যামেরা চালাতেই রইলেন। শেষে জন্তুটা যখন প্রায় ঘাড়ের ওপর, তখন ক্যামেরা-টামেরা ফেলে সাহেব দে ছুট।

গণ্ডারটা ক্যামেরার কাছে এসে ধীরে-সুস্থে বস্তুটাকে নিরীক্ষণ করতে লাগল চার দিকে ঘুরে ঘুরে। আর লেজ ধরে ঝুলেই হাতীর পিঠে উঠতে উঠতে খাঁ সাহেব ভাবলেন, গণ্ডারটা যদি ক্যামেরাটা চালাতে জানত, তাহলে ভয় পেয়ে লেজ গুটিয়ে পালিয়ে যাওয়া একটা মানুষের কী চমৎকার ছবিই না সে তুলে নিতে পারত।

ভিক্টোর পাইন রসিক মন। যমের মুখে দাঁড়িয়েও সে রসিকতা ছাড়ে না।

আর একবার হাতী ছেড়ে দিয়ে সাহেব দুজন অনুচরের সঙ্গে ঢুকলেন জঙ্গলে। ১৫ ফুট উঁচু শরবনের (একেই ইংরাজীতে বলে এলিফ্যান্ট গ্রাস—হাতীর পালও এই বন ঘাসের জঙ্গলে অনায়াসে লুকিয়ে থাকতে পারে, তাই এই নাম) ভেতর দিয়ে চলেছেন এক চিলতে সরু পথ বেয়ে। এই রকম শুঁড়ি পথগুলো তৈরী হয় জানোয়ার যাতায়াতের ফলে ঘাস দু দিকে সরে গিয়ে। হঠাৎ সঙ্গের লোক দুটো দারুণ ভয়ে চেঁচিয়ে উঠল, সাহেব গাঁড় আসছে (আসামী ভাষায় গণ্ডারকে গাঁড় বলে)। বলেই ঊর্ধ্বশ্বাসে দৌড়। সাহেব জানেন, দৌড়ে অলিম্পিক জেতা লোকও গণ্ডারের সঙ্গে পেরে উঠবে না। তবুও সাহেব দৌড়তে লাগলেন, পালাবার পথ খুঁজতে লাগলেন। পথটাও আবার ভিজে ভিজে, পিছল। তার ওপর গণ্ডারের তিন-খুরের চাপে আর হাতীর পায়ের দাপানিতে ভীষণ এবড়ো-খেবড়ো। তার ওপর দিয়ে ছুটে যাওয়াও সহজ নয়। পা হড়কে মুখ থুবড়ে পড়লেন সাহেব কাদার ওপর। আর সেই সঙ্গে তাঁর মনে পড়ল ভারতের গণ্ডারেরা মাটিতে পড়ে যাওয়া লোককে আক্রমণ করে না, যেমন করে থাকে নিষ্ঠুর বুনো হাতীরা। তিনি সেই অবস্থাতেই সট করে কাত হয়ে গড়িয়ে পথ থেকে একটু পাশে সরে গেলেন। পর মুহূর্তেই গণ্ডারটা বাজের মত মাটি কাঁপিয়ে কানের পাশ দিয়ে ছুটে বার হয়ে গেল।

মিনিট কয়েক পর দুজন সঙ্গীর একজন এসে হাজির। —সাহেব ঠিক আছেন তো? তখন তাঁরা দুজনে তৃতীয় সঙ্গীর খোঁজ করতে লাগলেন। বহুক্ষণ খোঁজাখুঁজির পর দেখা গেল সে ঘাসের জঙ্গলের ভেতর থেকে বার হয়ে আসছে। লোকটার সারা শরীর তখনও ঠক-ঠক করে কাঁপছে। মুখ দিয়ে কথা বার হচ্ছে না নিদারুণ ভয়ে। খানিকটা সময় লাগল তার সামলে উঠতে। তখন সে জানাল, সে-ও ঘাসের ভেতর মড়ার মত পড়েছিল। আর গণ্ডারটা তার ওপর দাঁড়িয়ে ফোঁস ফোঁস করে গরম নিঃশ্বাস ছাড়ছিল অনেকক্ষণ ধরে। শেষে ওটা তাকে ছেড়ে দিয়েই চলে গেল।

গণ্ডার শিকার :

দুপুরের খাওয়া সেরে বাংলোর বারান্দায় বসে অর্কিডের শোভা দেখছিলাম। এরা ঝুলিয়েছে নানা রকমের অর্কিড, বাংলোর বড় বড় গাছগুলোতে। সবগুলোই জংলী। যেমন রূপের বাহার, তেমনি এক একটার মিষ্টি গন্ধ।

শ্রীদাস বেশ একটু উত্তেজনা নিয়েই বারান্দায় উঠে এলেন। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই বললেন, একটা গণ্ডার ধরা পড়েছে, দেখতে যাবেন?

—নিশ্চয়, নিশ্চয়।—উত্তেজনায় আমিও উঠে দাঁড়ালাম।

—কখন ধরা পড়ল? কোথায়?

—আজ সকাল আটটায় ধরা পড়েছে মিহিমুখের জঙ্গলে। ডি এফ ও কি রেঞ্জার সাহেব কেউই এখন এখানে নেই। আমাকেই গিয়ে ওটাকে তুলে আনার বন্দোবস্ত করতে হবে। —বললেন, শ্রীদাস।

—যাবেন কিভাবে?

—কেন, আমার মোটর বাইকে। আপনি যাবেন আমার পিছনে।

ঘণ্টা দুয়েকের মধ্যেই আমরা বাগুড়ি থেকে দশ কিলোমিটার দূরে কোহড়া (এখানেই কাজিরাঙার আসল টুরিস্ট সেন্টার) হয়ে ধরেছি উত্তর-মুখো জঙ্গলের পথ। রাস্তার দু পাশে কিছুটা ফাঁকা মাঠ ফেলে। একটু এগিয়েই পড়ল বড় গাছের জঙ্গল, রাস্তার ডান দিকটায়। আর ল্যাগারস্ট্রোমিয়ার (অর্জুন জাতের গাছ) সঙ্গে শিমুল আর শিরীষের ছড়াছড়ি। চিকন সবুজ পাতায় গাছগুলো ভরে গেছে। শুধু কাঁঠাল আর শিশু গাছগুলো এখনও ন্যাড়া—তাদের পাতা আসতে একটু দেরি।

মেঠো পথে মোটর বাইক, ঢেউ-এর মুখে মোচার নৌকো। তবু পথ বেশী মালুম হচ্ছে না। চোখের সঙ্গে মন চার দিকে ছড়িয়ে পড়ছে। চোখের এমন মিঠে ভোজ। মাইল দুই

গণ্ডারের খাল থেকে তৈরি কাপ

গেছেন সতেরো ফিট উঁচু বেলুচিথেরিয়ামরা (বেলুচিস্তানে এদের জীবাশ্ম পাওয়া গেছে, তাই এই নাম)। তাদের নাকের ডগায় কিন্তু খড়্গ ছিল না। তারা লম্বা গলা বাড়িয়ে চব্বিশ-পঁচিশ ফিট উঁচু গাছের পাতা অনায়াসে খেতে পারত।

খড়্গওয়ালা গণ্ডারেরা পাঁচ কোটি থেকে দশ লক্ষ বছর আগেও তামাম দুনিয়া—এমনকি উত্তর-দক্ষিণ মেরুও চষে বেড়িয়েছে। এখন এরা এসে ঠেকেছে শুধু আফ্রিকা আর এশিয়ায়। কাজেই বলা যায় একমাত্র এই এশিয়াতেই খড়্গী গণ্ডার-দের ইতিহাস, পাঁচ কোটি বছরের ইতিহাস।

এই পাঁচ কোটি বছরের মধ্যে এদের একুশটা প্রজাতি পৃথিবী থেকে ঝাড়ে-বংশে লোপাট হয়ে গেছে। বাকি পাঁচটি প্রজাতি তাদের সবচেয়ে বড় শত্রু মানুষের অনেক অত্যাচার সহ্য করে কোনরকমে টিঁকে আছে এশিয়ায় আর আফ্রিকায়।

গণ্ডার পুরাতত্ত্ব ঃ

মহেঞ্জোদাড়োর শীল ছাড়াও প্রাচীন গ্রীস-রোমের ইতিহাসে-পুরাণে গণ্ডারের উল্লেখ দেখতে পাওয়া যায়। বাইবেলের অনেক জায়গায় মিশর দেশের গণ্ডারের কথা লেখা আছে। গ্রীক দার্শনিক টিসিয়াস এক রকম বুনো গাধার বর্ণনা দিয়েছেন, যা গণ্ডার ছাড়া আর কিছুই নয়। তিনি লিখেছেন, এদের নাকের ডগায় খড়্গ আছে। ঐ খড়্গে যে পান-পাত্র তৈরি হয়, তাতে সুরাপান করলে বাত ও মৃগী রোগ আরোগ্য হয়।

এই গাধাদের গোড়ালির হাড়ের গঠন অতি চমৎকার। ষাঁড়ের মতো দড়। এদের খুর জোড়া। বুনো বা ঘরে পোষা গাধা কি অন্য কোন একখুরওয়ালা জন্তুর গোড়ালি এদের মতো নয়।

অ্যারিস্টটল তাঁর প্রকৃতি বিজ্ঞানের গ্রন্থে টিসিয়াসকে নস্যাৎ করে লেখেন, এক খড়্গ ও সেই সঙ্গে এক খুরওয়ালা কোন জন্তু, তিনি জীবনে দেখেননি। তিনি কেবল দেখেছেন গোড়ালির চওড়া হাড়ওয়ালা ও খড়্গওয়ালা ভারতীয় গাধা।

খৃঃ পূঃ ১৮০-তে এগাথার কাইডস একটা একশৃঙ্গ গণ্ডারকে একটা হাতির পেট ফাঁসিয়ে দেবার বর্ণনা লিখে রেখে গেছেন। তাঁর মতে হাতির পেট ফাঁসানোর জন্যেই এর নাম রাইনোসেরস। ভাষাতাত্ত্বিকেরা গবেষণা করে দেখতে পারেন, এ-কথা ঠিক কিনা।

ঠিক হোক বা না হোক, প্রাচীন রোম সাম্রাজ্যের অনেক মুদ্রায় যে গণ্ডারের প্রতিকৃতি ছাপা আছে, তা রোম মিউজিয়ামে গেলেই চোখে পড়বে।

এশিয়ার তৈমুরলং তাঁর বিধ্বংসী বিজয়-অভিযানের ফাঁকে ১৩৯৮ খ্রীষ্টাব্দে কাশ্মীরের জঙ্গলে গণ্ডার শিকার করে-ছিলেন—ইতিহাস একথা বলে। মোগল সাম্রাজ্যের স্রষ্টা যে বাবর-বাদশার হাতে, সেই হাতে ১৫১৯ খ্রীষ্টাব্দে সিন্ধু নদীর তীরে কোণেঝাড়ে কিভাবে গণ্ডার শিকার করেছিল, তার বিবরণ তিনি নিজেই লিখেছেন তাঁর আত্মজীবনীতে। ১৫১৩-তে কাম্বের রাজা পর্তুগাল-রাজ ইমান্যুয়েলকে এক গণ্ডার উপহার হিসেবে পাঠান। এই প্রথম ভারতীয় গণ্ডার জাহাজে ইউরোপ যাত্রা করে গোয়ার বন্দর থেকে।

প্রাচীন রোমের কথায় আবার ফিরে যাই। আগাস্টস সীজার কিং প্যান্টুকে জয় করে স্বর্গ জেতার গর্ব অনুভব করেছিলেন। সেই জয় জনসাধারণের কাছে ঘোষণা করবার সময় তিনি মল্ল-ভূমিতে বুনো গণ্ডার আর জলহস্তির লড়াই দেখিয়েছিলেন। সম্রাট এন্টোনিয়াস হেলিওগেবেলাস ও গার্ডিয়ান দুজনেই এইরকম গণ্ডারের খেলা দেখিয়ে লোককে আনন্দ দিতেন মাঝে মাঝে।

১৭৭১ খ্রীষ্টাব্দ, প্যারিসে হৈ-চৈ। কি, না এসেছে একটা গণ্ডারের বাচ্চা। জুটলেন বিজ্ঞানীর দল। লাভোয়াসিয়ের, ল্য মার্ক, কুভিয়ের, বোঁকো। প্রাণীবিজ্ঞানী কুভিয়ের আর অভিব্যক্তিবাদী বোঁকো খুটিনাটি বর্ণনা লিখে রাখলেন সেই গণ্ডারের বাচ্চার।

১৭৯০-এ যে গণ্ডারটাকে ইংলণ্ডে নিয়ে যাওয়া হয়, তার সম্বন্ধে বিশদ বর্ণনা লিখেছেন বিংলে সাহেব। দর্শকরা তার পা চাপড়ালেও সে কিছ্ছুটি বলে না। দিনে তার খাবার হল সের-দশেক ঘাস, সের-দশেক বিস্কুট, প্রচুর কাঁচা শাক-সব্জি। দিনে দু-তিনবার পাঁচ বালতি করে জল দেওয়া হয় তাকে। সে চোঁচোঁ করে এক নিশ্বাসে তা শুষে নেয়। গণ্ডারটা মিষ্টি মদ খেতে খুব ভালবাসে। ঘণ্টায় সে বোতল-চারেক অনায়াসে টানতে পারে।

ভারতীয় স্মৃতিতে গণ্ডারের স্থান ঃ

ভারতীয় স্মৃতিতে গণ্ডারের স্থান সুনির্দিষ্ট। আদি ভারতীয় সমাজবিধির স্রষ্টা মনু গণ্ডারকে পঞ্চনখ প্রাণীদের শ্রেণীভুক্ত করে, তাকে তাবৎ হিন্দু, বিশেষ করে ব্রাহ্মণদের ভক্ষ্য করে গেছেন।

মহাভারতে কুরু পিতামহ ভীষ্ম মহারাজ যুধিষ্ঠিরকে পিতৃ-পুরুষের শ্রাদ্ধানুষ্ঠানে বিধিনির্দেশ দিয়েছিলেন শর-শয্যায় শুয়ে। সেখানে কোন কোন আমিষ পদার্থে পিতৃলোকের কতদিন তৃপ্তি, তারই একটা লেখা চওড়া ফর্দ দেওয়া আছে। মাছে দু' মাস, ভেড়ার মাংসে তিন মাস। খরগোসের মাংসে চার মাস, ছাগলের মাংসে পাঁচ মাস। শুকর বা বরাহ মাংসে ছ' মাস, শোল মাছে সাত মাস। হরিণের মাংসে আট মাস, সম্বরের মাংসে ন' মাস। অন্য গবাদি পশুর মাংসে দশ মাস। কিন্তু বৃষ-মাংসে বারো বছর। আর গণ্ডারের মাংসে অনন্তকাল।

তাই কট্টর হিন্দু নেপালের রাজাদের শ্রাদ্ধে এখনও গণ্ডারের মাংস দেবার বিধি আছে। এবং নেপালের রাজকীয় অরণ্যে গণ্ডার জিইয়ে রাখার আসল উদ্দেশ্যটাই ছিল এই।

প্রাচীন আয়ুর্বেদ শাস্ত্রে গণ্ডার-মাংসের গুণ বর্ণনা করা আছে। সুশ্রুত তাঁর সংহিতায় বলেছেন, গণ্ডারের মাংস বলকর, বৃংহন (বৃদ্ধিকর) ও গুরু; কফ ও বায়ু নাশক। কষায়। পিতৃলোকের তৃপ্তিকর ও পবিত্র। আয়ুর হিতকর। মূত্রবন্ধকারক ও রুক্ষ।

প্রাচীন ভারতে গণ্ডারের একটা বিশেষ স্থান ছিল বলেই, নানা শাস্ত্রে—মহাকাব্যে—পুরাণে গণ্ডারকে নানা আখ্যা দেওয়া হয়েছে। খড়্গ থাকার জন্য সে খড়্গী তো বটেই। বনচর তাণ্ডবকারী বলে খড়্গমৃগ। কেন্ড়ি (এই নামটা সংস্কৃতে কিভাবে এসেছে সঠিক বোঝা গেল না)। মুখটা লম্বা আর ভারী বলেও বটে, খড়্গ থাকার জন্যও বটে—তুঙ্গমুখ। বাঘের মতো

বর্তমান শতাব্দীর
এক মহীরুহের আত্মজীবনী
বছরের শ্রেষ্ঠ রচনা

জীবন-কথা

আচার্য সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়

বড় উপন্যাস

অন্নদাশংকর রায়ের **'আই. সি. এস'**
অমিতাভ চৌধুরীর **'কবি ও সন্ন্যাসী'**

শারদীয় যুগান্তর ১৩৮৪

গল্পের মত সমারোহ

লীলা মজুমদারের 'মধ্যমণি' ॥ জহুরী সওদাগরের **'আলি আকবর, স্বদেশে এবং বিদেশে'** ॥ অমিতাভ দাশগুপ্তের **'নও শুধু ছবি'** ছবি বিশ্বাসকে নিয়ে।

কিশোরদের চারটি উপন্যাস

আশুতোষ মুখোপাধ্যায়
জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী
শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়, সুধাংশু ঘোষ

জীবনানন্দ দাশের অপ্রকাশিত প্রবন্ধ/কবিতা

পিণ্ডারী দেখে এলাম
বরেন গঙ্গোপাধ্যায়

ক্রিকেট নিয়ে অজয় বসুর 'বাঙালী হৃদয়ে সোনালী স্মৃতি'

অভিনেত্রীকে নিয়ে
মধুসূদন মজুমদারের 'ভরা থাক স্মৃতি সুধায়'

২টি বড় গল্প॥ অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়
কবিতা সিংহ

হাসির বড় গল্প লিখেছেন সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়

যুগান্তর পূজা সংখ্যা ✿ পূজা সংখ্যায় যুগান্তর ✿ যুগান্তর

মহালয়ার আগেই বেরুচ্ছে
দাম/১০ টাকা
সডাক/১২ টাকা

গল্প

বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়
আশাপূর্ণা দেবী/মহাশ্বেতা দেবী
গজেন্দ্রকুমার মিত্র/বাণী বসু মিত্র
সমরেশ মজুমদার/শেখর মিত্র
শচীন দাশ এবং অনেকে

কবিতাগুচ্ছ

প্রেমেন্দ্র মিত্র/অরুণ মিত্র
দিনেশ দাশ/মনীশ ঘটক
অশোকবিজয় রাহা
হরপ্রসাদ মিত্র/মণীন্দ্র রায়
কৃষ্ণ ধর/রাম বসু/পরমানন্দ সরস্বতী/বিমলচন্দ্র ঘোষ
সুনীলকুমার নন্দী/গৌরাঙ্গ ভৌমিক/আলোক সরকার/
পূর্ণেন্দু দাশগুপ্ত/পূর্ণেন্দু পত্রী/
সমরেন্দ্র সেনগুপ্ত/মানস রায়চৌধুরী/তারাপদ রায়
কবিরুল ইসলাম/সামসুল হক/আনন্দ বাগচী
দেবারতি মিত্র/পবিত্র মুখোপাধ্যায়/অমিতাভ চক্রবর্তী এবং কয়েকজন

স্কেচ

সুনীলমাধব সেন
প্রকাশ কর্মকার/গণেশ পাইন
রবীন মণ্ডল/বিকাশ
ভট্টাচার্য/ধীরাজ চৌধুরী
দিলীপ কুণ্ডু/মানু
রাউড়ে/শুভপ্রসন্ন/দিলীপ
মুখোপাধ্যায়

শ্রীদুর্গা ও শ্রীগৌরাঙ্গের
রঙীন আর্টপ্লেট

করে চষে তথ্য সংগ্রহ করেছেন। জঙ্গলে চরা পঞ্চাশ হাজার পোষা গরু-মোষকে টিকে দিয়েছেন রিন্ডারপেস্টের। এই ভয়ংকর ব্যাধি রিন্ডারপেস্ট গণ্ডারদের ধরে ধরে চটপট। এর পরই রোগের আক্রমণ থেমে গেল। গণ্ডার মৃত্যুর হারও গেল কমে। পোচিং বন্ধ করার জন্য স্ট্রাসি কাজিরঙার জঙ্গলের বাইরে সমস্তটা জঙ্গল বেড় দিয়ে খানিকটা ফাঁকা চৌহদ্দি রাখলেন 'বাফার জোন' হিসাবে। ঐ সমস্ত জায়গা জুড়ে তিনি বসালেন কঠোর পাহারা। বন্ধ করে দিলেন জঙ্গলে সব রকম শিকার। কিন্তু এতো করেও পোচিং বন্ধ করা গেল না। যাবে কি করে? চীফ কনজারভেটর তো আর সব সময়ে কাজিরঙাতে বসে থাকেন না। কাজিরঙা হল সরাসরি একজন রেঞ্জারের দায়িত্বে। সেই রেঞ্জারের সঙ্গে গী-সাহেবের ১৯৪৯এ যে কথাবার্তা হয়েছিল তা বড় মজার। একটু তুলে দিচ্ছি গী সাহেবের নিজের লেখা থেকে।

'আজকাল কি কাজিরঙায় কোন পোচিং হচ্ছে'—বেধড়ক গণ্ডার পোচিং-এর খবর পেয়ে গী-সাহেব এসে একদিন জিজ্ঞাসা করলেন রেঞ্জারকে।

'পোচিং? পোচিং কি করে হবে-? এটা একটা স্যাংচুয়ারী। আমার লোক চারদিকে পাহারা দিচ্ছে।'—বেশ ঝাঁঝের সঙ্গে জবাব দিলেন রেঞ্জার।

গী বলছেন, যখনই আমি এই রকম জবাব শুনি তখনই আমি বুঝতে পারি আসল ব্যাপারটা কি।

খবর মিস্টার গীর কাছে ঠিকই পৌঁছত, কারণ তিনি থাকতেন কাজিরঙার থেকে চল্লিশ মাইল দূরে একটা চা-বাগানে। সেখানকার ম্যানেজার ছিলেন তিনি। কাজিরঙার জঙ্গলে ১৯৩৮ থেকে দর্শক নিয়ে যাবার ব্যবস্থা হয়। মাথা পিছু হাতি ভাড়া এক্ষেত্রে ছিল পনেরো টাকা। সে শুধু দিনের বেলাতেই। রাতে সেই হাতি যখন পোচার নিয়ে জঙ্গলে ঢুকত তখন তার ভাড়া হত পঞ্চাশ। এ রোজগারের সমস্তটাই যেত কর্মচারীদের পকেটে। সর্ষের মধ্যে ভূত।

গণ্ডার বংশ বাঁচানর জন্য গীর অবদান কিছুমাত্র কম নয়। তিনি মিস্টার স্ট্রাসিকে সব জানালেন। সঙ্গে সঙ্গে সেই রেঞ্জারকে সরিয়ে জনৈক স্কুলমাস্টার আর. সি. দাসকে কাজিরঙার রেঞ্জার করে পাঠালেন স্ট্রাসি। দাস এসেই পোচারদের সঙ্গে হাত মেলান কর্মচারীদের তাড়ালেন। ঢেলে সাজালেন অনুশাসন। ডিভিশনাল অফিসার যিনি এলেন, তিনিও একজন উৎসাহী, দক্ষ যুবক। কাজিরঙার এখন যে রূপ তার কাঠামো শ্রীদাসেরই হাতে।

এখন কাজিরঙাতে পোচিং প্রায় বন্ধ বলা চলে। কালে-ভদ্রে দু'একটা হয় না যে তা নয়, তবে সেগুলো হয় বন বিভাগের কর্মচারীদের জবরদস্ত কড়া নজর এড়িয়ে। আসলে পোচিং হল কালোবাজারী, বেশ্যাবৃত্তি, চুরি-ডাকাতির মতো একটা সামাজিক ও অর্থনৈতিক সমস্যা। এর মূল শুধু উপড়ে ফেলতে হলে দেশের সমাজ ও অর্থনৈতিক কাঠামোটাকে অন্যভাবে গড়তে হতে পারে।

তবে এই সীমিত কাঠামোর মধ্যে কাজিরঙার বনবিভাগ যতটা করবার করেছেন। গত ৭৪ সাল থেকে তাঁরা জঙ্গলের মধ্যে বাইরের লোকেদের পোষা গরু-মোষ চরান একেবারে নিষিদ্ধ করে দিয়েছেন। এখন বন বিভাগের অনুমতি ছাড়া একটি লোকও জঙ্গলে ঢুকতে পায় না। এতে পোচিং-এর একটা মস্তবড় ফাঁক বন্ধ করা হয়েছে, নিঃসন্দেহে।

এই সব কড়া ব্যবস্থা ও কড়া পাহারার ফলে কাজিরঙার গণ্ডার গোষ্ঠি ১৯৬০ খ্রীষ্টাব্দে এসে দাঁড়িয়েছিল প্রায় তিনশোর কাছে। ১৯৬৬র গননায় তাদের সংখ্যা বেড়ে হয়েছিল চারশো।। ১৯৭২-এর গননায় পাওয়া গিয়েছে ছশো সত্তর। এবার মার্চের শেষে কাজিরঙায় গিয়ে এক শুঙ্গ গণ্ডারগোষ্ঠির বাড়বাড়ন্ত দেখে মনে ভরসা এল।

জঙ্গলে ঢুকে এক ফার্লং গেলেই দুটো একটা (সবচেয়ে কম) গণ্ডার নজরে পড়বেই। বীট-অফিসার শ্রীদাস বেছে ডেকে তাঁর অনুমান দিলেন আটশোর মতো। আমার মনে হল হাজারের কম কিছুতেই নয়।

বাঘ মারা পড়ে তার সুন্দর চামড়ার জন্যে। গজদন্তের জন্যে মারা পড়ে হাতি। লোমের জন্য চমরী হত হয়। আর খড়গের জন্যে গণ্ডার।

যদিও গণ্ডারের শরীরের প্রতি অংশই মূল্যবান তবু খড়গের দামের তুলনায় অন্যগুলি কিছুই নয়। গণ্ডারের মাংসের দাম বেশ চড়া। ভারতবর্ষের সর্বশ্রেণীর তা প্রিয় খাদ্য। তার চেয়েও চড়া দামে বিকোয় তার চামড়া। তাতে যুদ্ধের ঢাল থেকে শুরু করে বহু রকমের সৌখীন জিনিস তৈরী হয়। হাড় তো বিক্রী হয়ই, অস্ত্রশস্ত্রের বাঁট আর হরেক রকম ঘর সাজানোর জিনিস তৈরীর জন্যে। তাছাড়াও গণ্ডারের হাড়—মারণ-উচাটন-বশীকরণের মোক্ষম বাজুদণ্ড। গণ্ডারের কিছুই ফেলা যায় না। এমন কি তার প্রস্রাবে পর্যন্ত এন্টিসেপ্‌টিক গুণ আছে। ১৯৫৫তে ইন্টার ন্যাশনাল ইউনিয়ন ফর দ্য কনজারভেশন অব নেচার-এর পক্ষে আমেরিকান ন্যাচরালিস্ট লী-মার্টিন-টালবট এক রিপোর্ট দাখিল করেছেন। তাতে উল্লেখ করেছেন, কলকাতার আলিপুর চিড়িয়াখানার বাইরে ছোট ছোট কাচের টিউবে গণ্ডারের প্রস্রাব বিক্রী হতে তিনি স্বচক্ষে দেখেছেন।

গণ্ডারের খড়গের দাম সবকিছুকে ছাপিয়ে যায়। টালবট লিখছেন, সুমাত্রায় ভারতীয় গণ্ডারের একখানা বিরাট খড়গ চাই নিয়ে সিন্ডিকেট হাজার পাউণ্ড (প্রায় ষোল সতেরো হাজার টাকা) দিয়েও কিনতে রাজী ছিল।

এই বিশ শতকের শেষের দিকেও মিশর থেকে শুরু করে হংকং পর্যন্ত চালাও প্রাচ্য দেশে গণ্ডারের খড়গের চড়া বাজার। সে বাজারে একটা খড়গের দাম দেড়-দু হাজার টাকা অনায়াসে। তিরেশের দশকে একটা খড়গের দাম ছিল তার ওজনের অর্ধেক পরিমাণ সোনা। এখন তার দাম তার চেয়ে অনেক চড়া। ৬২-৬৩ সালে গৌহাটিতে এক লট গণ্ডারের খড়গ নিলাম হয়। তাতে বোম্বাই থেকে একদল ব্যবসায়ী প্লেন চার্টার করে গৌহাটিতে আসে। তারা প্রতি পাউণ্ড ২৫২৫ টাকায় সমস্ত লটটা কিনে নেয়। কাজেই এই খড়গের জন্য গণ্ডারদের জীবনের ওপর আজও যে পোচারদের হামলা চলবে তাতে আশ্চর্য কি?

অথচ যে জন্য খড়গের এই চড়া বাজার। তার পুরোটাই একটা প্রবাদভিত্তিক অন্ধবিশ্বাস।

আদিকাল থেকে তামাম প্রাচ্যের লোকের মনে বিশ্বাস, গণ্ডারের খড়্গচূর্ণ হল পুরুষত্ব-হীনতার অব্যর্থ দাওয়াই।

আর কি। এক-একটি থলেতে ৪-৫টী সাপ পুরে মুখগুলো সেলাই করা হতো অথবা বেঁধে ফেলা হতো। তারপর থলেগুলোকে প্লাইউডের বাক্সে টান-টান করে পেতে থলের দুপাশে পেরেক মারা হতো, যাতে বাক্স নাড়াচাড়া করা হলেও সাপগুলো এক অবস্থাতেই থাকতে পারে।

বাক্সগুলো তৈরি করা হতো নানা আকারে। কোনটা ২৪″×২০″×৮″, আবার কোনটা ২৪″×১৬″×১২″ আকারের। বাক্সে ½″ আকারের ৮-১০টা ফুটো করা হতো। ফলে সাপিতে বাক্সগুলো বন্ধ করার পর বিশেষ নিরাপত্তার খাতিরে তারের জাল দিয়ে মোড়া হতো বাক্সগুলোকে।

বাক্স আর থলের খরচ সাপের কারবারীর নিজস্ব। বিদেশে পাঠানোর বিমান খরচা সব সময় ক্রেতাই বহন করেছে। বিমান ছাড়া জাহাজে কখনো সাপ রপ্তানি হয়নি।

১৯৬৯-৭০ সাল নাগাদ এই ধরনের বাক্স করতে খরচা পড়তো ১২-১৩ টাকা। থলের দাম পড়তো টাকা দেড়েক।

নাজির আলি সে-সময় যে-দামে সাপ কিনতেন ও বিক্রি করে যে দাম পেতেন তার একটা পর্যায়ক্রমিক তালিকা দেওয়া হল :

বিষাক্ত সাপ : কেউটে ১০—১২ টাকা এবং ৩০—৫০ টাকা, গোখরো ১৫—২০ টাকা এবং ৩৫—৫৫ টাকা, চন্দ্রবোড়া ১০—১৫ টাকা এবং ৩০—৫০ টাকা, কালাজ ১৫—২০ টাকা এবং ৩৫—৫৫ টাকা, শাঁখামুটে ১৫—২০ টাকা এবং ৩৫—৫৫ টাকা, শংখচূড় ২০০—২২৫ এবং ৪০০—৪৫০ টাকা।

নির্বিষ সাপ : পাইথন ১৭৫—২৫০ টাকা এবং ৫০০—১০০০ টাকা, কাল-নাগিনী ১৫—২০ টাকা এবং ৩০—৫৫ টাকা, লেজ আঁচড়া, ঢোঁড়া, ঘরচিতি, লাউ ডগা, ধামিন, ডাংমেটে ১—২ টাকা এবং ৩—৬ টাকা।

বহু দেশে সাপ পাঠিয়েছেন নাজির আলি। জাপান, পশ্চিম জার্মানী আর হল্যান্ডই ছিল তাঁর প্রধান ক্রেতা, এছাড়াও সাপ যেত আমেরিকার ক্যালি-ফোর্নিয়ায়, নিউইয়র্কে, লন্ডনে, ইতালী, ফ্রান্স ও নিউজিল্যান্ড প্রভৃতি দেশে।

দীপক মিত্রের সাপ-রপ্তানীর খবরটা পেয়েছিলাম এক্সপোর্ট - ইমপোর্ট অফিসের উর্ধতম মহল থেকেই। প্রথমেই যাঁর স্মরণস্থ হয়েছিলাম, আমার পূর্বপরিচিত সেই কন্ট্রোলার অব এক্সপোর্ট - ইমপোর্ট বললেন, দীপক মিত্র প্রথম সাপ রপ্তানির লাইসেন্স পান ১৯৭৫-এর জুন নাগাদ। ১৯৭৭-এর শুরুতেই ওই লাইসেন্সের মেয়াদ শেষ হয়ে যাওয়ায় শ্রীমিত্র আবার একটি লাই-সেন্সের আবেদন করেন। এবং সেই সূত্রে বর্তমানেও আরো একটি লাইসেন্স পেয়েছেন। এটির কার্যকাল ১৯৭৭ থেকে ১৯৭৮-এর মার্চ পর্যন্ত।

সাপ রপ্তানি নিষিদ্ধ হওয়া সত্ত্বেও এই লাইসেন্স দেওয়া হলো কি কারণে, জিজ্ঞেস করায় কন্ট্রোলার জানালেন, এডিসনরা ইউনিভার্সিটি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়কে গবেষণার জন্য সাপ কেনার ইচ্ছা প্রকাশ করে। এই সূত্রে দীপক কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের রেক-মেনডেশনসহ কেন্দ্রীয় কৃষি দপ্তর, শিক্ষা দপ্তর ও বাণিজ্য দপ্তরে এডিসন-বরা ইউনিভার্সিটিতে সাপ রপ্তানির জন্য আবেদন করে। ওই তিন দপ্তরের স্পেশাল রেকমেনডেশনের পরিপ্রেক্ষিতে দিল্লির কেন্দ্রীয় রপ্তানী-আমদানি দপ্তর সাপ-রপ্তানীর অনুমতি দেয়। যতদূর মনে পড়ে ৬০-৬৫টি সাপ পাঠাবার অনুমতি ছিল। কিন্তু দীপক মাত্র ১৫-১৬টি সাপ পাঠাতে সক্ষম হন। দ্বিতীয় বার লাইসেন্স পাওয়ার পর শ্রীমিত্র কোনও সাপ বিদেশে পাঠাননি।

পঞ্চানন মিত্র ও দীপক মিত্র—পিতাপুত্রে সাপের চাষ করেন বাদুড়ে। শ্যামবাজার থেকে ৯৩ নম্বর বাসে কাঠের পোঁছাতে ঘন্টাখানেক লাগে। কাঠোরে নেমে মিনিট পাঁচ-সাত হাঁটলেই সর্পোদ্যান। ওখানে বসেই কথা হচ্ছিল পঞ্চানন মিত্রের সঙ্গে। বয়স, বছর পঞ্চাশ-বাহান্ন। ফর্সা, পাতলা গড়ন, মাঝারি লম্বা। কথাবার্তায় দারুণ চটপটে। জীবন শুরু করেছিলেন সেলসম্যান হিসেবে। একটা কসমেটিকের ছোটখাট ব্যবসাও শুরু করেছিলেন। একবার হঠাৎ কঠিন রোগে হলেন শয্যাশায়ী। অংশী-দারকে বিশ্বাস করার খেসারৎ দিয়ে নতুন লগ্নের সন্ধান পেলেন। সাপই হয়ে উঠল ধ্যান-জ্ঞান। দুই ছেলে—দীপক ও আশিস এগিয়ে এলো বাবাকে সাহায্য করতে। পরিশ্রম সার্থক হয়েছে, পেয়ে-ছেন যথেষ্ট প্রচারের সুযোগ, পেয়েছেন প্রতিষ্ঠা।

—প্রায় বছর দুয়েক পরে এলেন প্রবীরবাবু। খুব ভাল লাগছে। আপনি আসায়। মাটি-কোপান খুরপীটা রেখে হাত ধুতে ধুতে পঞ্চাননবাবু বললেন।

—আপনার ছেলে কই? একটা মোড়া টেনে নিয়ে বসতে বসতে বললাম।

—দীপক? ও তো সাধারণত থাকে না এখানে, জানেনই তো আমিই এখানে রাত্রিবাস করি। সপ্তায় এক-আধদিন হিন্দুস্থান পার্কের বাসায় যাওয়ার সুযোগ পাই।

—শুনলাম আপনারা সাপ রপ্তানী করছেন?

—হ্যাঁ। এডিসনবরা ইউনি-ভার্সিটিতে।

—কতদিন ধরে রপ্তানী করছেন?

—১৯৭৫ এর জুন থেকে।

এই প্রসঙ্গে পঞ্চাননবাবু জানালেন, এডিনবরা ইউনিভার্সিটির অনুরোধে কোলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বালিগঞ্জ সায়েন্স কলেজের রেকমেনডেশনে কেন্দ্রীয় সরকারের বাণিজ্য দপ্তরকে আবেদন করার পরিপ্রেক্ষিতে দিল্লী এক্সপোর্ট-ইমপোর্ট অফিস থেকে সরাসরি লাইসেন্স পেয়েছেন।

কি পরিমাণ সাপ পাঠাবার অনুমতি ছিল ও কি পরিমাণ পাঠিয়েছেন জিজ্ঞেস করায় জানালেন, ও তো মনে নেই, ভুলে গেছি। কাগজপত্র যে কোথায় আছে—। কাগজপত্র না দেখে সঠিক সংখ্যা বলতে পারবো না।

—তাও আনুমানিক কতো হবে? ঘুরিয়ে ফিরিয়ে বার বার এই প্রশ্নটা করলাম। বার বার একই উত্তর পেলাম—সঠিক পরিমাণ মনে নেই। কাগজপত্রে আছে কিন্তু আপনাকে বলতে পারি না।

—কি কি জাতের সাপ পাঠিয়েছেন?

গোখরো, কেউটে, শাঁখামুটে, চন্দ্রবোড়া, কালাজ, লাউডগা, লেজ আঁচড়া, কালনাগিনী প্রভৃতি।

পশ্চিম বাংলার সাপের ব্যবসায়ীদের মধ্যে যাদের বাজার এখন সবচেয়ে রমারমা সেই বারুইপুর বোষ্টমপাড়া রেল গেটের বাসিন্দা মামা ভাগ্নে জেরমত আলি ও জিয়াদ আলির সঙ্গেও কথা বলেছি সাপ রপ্তানী নিয়ে।

মামা জেরামৎ। বয়স বছর পঞ্চাশ। গায়ের রং ফর্সাই বলা চলে। মাঝারি উচ্চতার জেরামৎ কথা বলে যথেষ্ট দৃঢ়তার সঙ্গে। ভাগ্নে জিয়াদের বয়স বছর চল্লিশ হবে। গায়ের রঙ শ্যামলা, উচ্চতা মাঝারি। ওরা সাত-আট পুরুষের সাপুড়ে। এখনো পরিবারের মেয়ে-পুরুষ বাচ্চা-বুড়ো সকলেই সাপ ধরে, সাপ বেচে, সাপ খেলিয়ে নানারকম টোটকা ওষুধ বেচে রোজগারের ধান্দা করে। কলকাতার সায়েন্স কলেজ, বঙ্গবাসী, প্রেসিডেন্সি, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের জীবতত্ত্ব বিভাগে নগদ দামে বিষাক্ত ও নির্বিষ সাপ বিক্রি করে। বাড়িতেই বাক্সে বন্দী করে সাপ পোষে। বিভিন্ন জাতের সাপের জন্য রয়েছে আলাদা আলাদা বাক্স।

জেরামৎ কথা প্রসঙ্গে জানাল সাপ ওরা সরাসরি কোনদিন রপ্তানী করেনি, নাজির আলি যখন রপ্তানী করত তখন তাকে প্রয়োজন মাফিক সাপ জোগান দিয়েছে। সাপ রপ্তানী বন্ধ হওয়ায় বহু সাপুড়ে পরিবারই ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে।

প্রবীর ঘোষ

[illegible] আত্মীয়স্বজন [illegible] হন। মাস কয়েক নিরুদ্দিষ্ট থেকেই অবশেষে [illegible] একদিন মধ্যাহ্ন ভোজন সেরে তাঁর [illegible] কক্ষে, এমন সময় তিনি আমাকে [illegible] পাশে বসতে ইঙ্গিত করলেন। আমার [illegible] গম্ভীর মুখে নরম সুরে বললেন, '[illegible] কেবলই আমার মনে হয় যে, আমি [illegible] মধ্যে আর বেশী দিন নেই। তাই [illegible] দেখে যেতে [illegible] আমার শেষ ইচ্ছাটা পূর্ণ হয়।'

মায়ের এ কথাগুলি আমার মনে একটা তোলপাড় সৃষ্টি করল।

বিবাহের পক্ষে [illegible] উপস্থিত [illegible] সুদর্শন এবং সুযোগ্য [illegible] বিবেচিত হলেও, বিবাহ [illegible] আমার মনে বাসা বাঁধে নি। স্বভাবতঃ আমি

নির্বাচন

পরিতোষ সেন
লিখিত ও চিত্রিত

অত্যন্ত ভাবপ্রবণ এবং আবেগপূর্ণ। তাই, মার প্রস্তাবটির গুরুত্ব বিশেষ বিবেচনা না করেই তাঁর মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করতে [illegible] হলাম।

আমার ছুটি শেষ হতে আর মাত্র দশ দিন বাকি। যদি ভাগ্যদেবী প্রসন্ন হন, তাহলে আগামী কয়েক দিনের মধ্যেই বিবাহ করে সস্ত্রীক আমার কর্মস্থল [illegible] ফিরতে পারবো। এ বাসনা নিয়ে আমি বাড়ি থেকে তৎক্ষণাৎ বেরিয়ে পড়লাম। বন্ধু-বান্ধব এবং আত্মীয়স্বজনদের, জরুরী পরিস্থিতির কথা জানিয়ে অবিলম্বে সুযোগ্যা পাত্রীর খোঁজ দিতে বললাম। সঙ্গে সঙ্গে এও জানিয়ে দিলাম যে, আমার জাত-বিচার কিংবা দাবী-দাওয়ার বালাই নেই। এবং পাত্রী পছন্দ হলে একদিনের নোটিশেই বিবাহের আয়োজন করে ফেলতে হবে। আমি 'বে-পাগলা' হয়ে গেছি এ-কথাটি গ্রীষ্মের খড়কুটোর গাদায় আগুনের মতোই কলকাতা শহরের পাড়ায় পাড়ায় ছড়িয়ে পড়ল। তাই পাত্রীর খোঁজ আসতে কোনোই বিলম্ব হল না। মেয়ে দেখে বেড়ানোর এবং সাজানো বিয়েতে আমি বরাবরই ঘোরতর বিরোধী ছিলাম। কিন্তু বর্তমান পরিস্থিতিতে আর কোনো উপায় নেই দেখে অগত্যা তাতেই সায় দিতে বাধ্য হলাম।

প্রথমেই একটি আত্মীয়ের মারফৎ, উত্তর কলকাতার এক কবিরাজ মহাশয়ের 'সুশ্রী স্বাস্থ্যবতী, গৌরবর্ণা, গৃহকর্ম-নিপুণা এবং গ্র্যাজুয়েট' কন্যার খবর পেলাম। আমিও কবিরাজ পুত্র। সুতরাং মিল। শুভ লক্ষণ সন্দেহ নেই। 'হোয়াট্ বিগিনস্ ওয়েল, এন্ডস্ ওয়েল' এই মনে করে সেদিনই বিকেলে, শিল্পীবন্ধু প্রদোষ দাশগুপ্ত, রথীন মৈত্র এবং প্রাণকৃষ্ণ পাল সহ পাত্রীর বাড়িতে হাজির হলাম। সাদর অভ্যর্থনা জানিয়ে পাত্রীর পিতা মশাই আমাদের তেতালার ঘরে নিয়ে গেলেন। বেলা তখন সাড়ে পাঁচটা। ঘরের সামনে একটি বড় ছাদ। এক পাশে আরো দুটি ঘর এবং বারান্দা। ছাদে, দড়ির ওপর একটি গামছা, দু-তিনটি শাড়ি এবং দুটি ব্লাউজ শুকিয়ে গিয়ে তোলবার অপেক্ষায় আছে।

শিল্পী মাত্রেই তো কিঞ্চিৎ কল্পনা-বিলাসী হয়। এ ব্যাপারে বিধাতা আমার বেলায় কোনোই কার্পণ্য করেন নি। ব্লাউজ দুটির ওপর নজর যেতেই আমার কল্পনা [illegible] পাখির মতো মহাকাশের দিকে ছুটে দিল। ময়ূরকণ্ঠী-নীল রঙের ব্লাউজটির আয়তন এবং ছাঁট দেখে একটি [illegible] পরিধানকারিণীর ছবি আমার চোখের সামনে ভেসে উঠলো। এটির তুলনায় [illegible]-রঙের অন্য ব্লাউজটির পরিধানকারিণী যে বেশ স্বাস্থ্যবতী তা বুঝে নিতে বিশেষ মাথা ঘামাতে হল না। কাপড়ের সারির ওপর দিয়ে এক ফালি দক্ষিণের আকাশ উঁকি-ঝুঁকি দিচ্ছে। ছাদের কোণে একটি তুলসীমঞ্চ। ঘরের ভেতর আসবাবপত্রের বাহুল্য নেই। পশ্চিমের দেয়ালে কালো মার্বেল কাগজের ওপর তুলোর-সাঁটা একটি বাঁধানো হাঁসের ছবি। পূবের দেয়ালে, জলরঙে আঁকা, সূর্যাস্তের পটভূমিকায়, কয়েকটি পাল-তোলা জেলে ডিঙির আরেকটি ছবি। আশ্চর্যের বিষয় এই যে, দুটি ছবিরই কোণে যে সইটি আছে, তাঁরও নাম ছবি। [illegible] কলা আমার স্বভাব-বিরুদ্ধ হলেও [illegible] পয়সার মতো, কবির

বহু প্রচলিত গানের কলিটি, স্তুতির কি কেবল ছাঁদ, শুধু পটে লিখা, একটি অবাধ্য পতঙ্গের মতো আমার মনে ঘোঁ ঘোঁ করে ঘুরপাক খেতে থাকলো।

ছাদে শুকুনো কাপড়গুলোর তলায় হঠাৎ গৌরবর্ণা, আলতা-রাঙা, অতি সুশ্রী দুটি পা আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করল। তার আঙুলগুলো এমনই লম্বা এবং নিটোল যেন অবিকল চাঁপা ফুলের কুঁড়ি। মাটিতে পায়ের পাতা দুটি যেন্নার ভঙ্গীতে লজ্জার ইঙ্গিত। অনেকটা নন্দলাল বসু অঙ্কিত 'বীণাবাদিনী'র পায়ের মতো। দড়ির ওপর তাঁরই একটি হাত, শুধু ব্লাউজ দুটিকে টপাটপ তুলে নিয়ে কাপড়ের আড়ালে চলে গেল। তাঁর বাকি অঙ্গের রূপ ও সুষমা কল্পনা করছি, এমন সময় চাবুকের মতো ছিমছাম একটি তন্বী, মুহূর্তের জন্যে, একটি সাতরঙা প্রজাপতির চালে এঁকে বেঁকে আমাদের সামনে দিয়ে উড়ে গেল। আচমকা এক ঝলক আলো যেন আমাদের চোখ ধাঁধিয়ে অদৃশ্য হয়ে গেল। প্রত্যাশা এবং খুশির একটি বিরাট ঢেউ ফুলে ফুলে উঠে আমার প্রাণের একুল-ওকুল ভাসিয়ে দিল। বন্ধুবর প্রলোভনা চোখ টিপে বললেন, 'বাঃ, খাশা, খাশা! আর ভাবনা কিসের।'

আমিও তৎক্ষণাৎ মনোস্থির করে ফেললাম। আর দ্বিতীয় পাত্রী দেখা নয়। আজকেই, এই মুহূর্তেই পাকা কথা দিয়ে যাবো, সোজা বাড়ি ফিরে গিয়ে মাকে সুখবর জানাবো, সন্ধ্যাবেলায় বন্ধু-বান্ধবদের নিয়ে আমোদ-আহ্লাদ করব, কয়েক দিনের মধ্যেই অপরূপ স্ত্রীকে নিয়ে সগর্বে কর্মস্থলে ফিরে যাবো—এ-সব নানা জল্পনা-কল্পনার জাল বুনছি, এমন সময় গৃহ কর্তা মশাই, হাত ধরে একটি মেয়েকে নিয়ে প্রবেশ করলেন। 'এটি আমার জ্যেষ্ঠ কন্যা ছবি', এই বলে ভদ্রলোক তাঁকে আমাদের সামনে বসিয়ে দিলেন। ছাদে নস্যি রঙের ব্লাউজটি যে কার ছিল, চোখের নিমেষে সব কিছু তালগোল পাকিয়ে গেল। দিন যেন হঠাৎ রাত হয়ে গেল। আড় চোখে আমরা পরস্পরের দিকে তাকাচ্ছি। সবারই চক্ষু ছানাবড়া। ব্লাউজটি দেখে আমার কল্পলোকে যে ছবিটির উদয় হয়েছিল তার সঙ্গে বাস্তব 'ছবির' হুবহু মিল দেখে আমি এমনই আঁতকে উঠলাম যে আমি মূর্চ্ছা যাই আর কি। চেহারায় তিনি যেমনই হোন না কেন, পাত্রীর সামনে এ-রকম বেসামাল হওয়া শিষ্টাচারের খেলাপ।

আমার ভাবী স্ত্রী, শাস্ত্রীয় বিধানে রূপায়িত এবং স্ত্রীরূপের নির্যাস, অজন্তার দেয়ালে আঁকা 'রাজকন্যা'র মতো দেখতে হবে, এমন দুরাশাকে স্বপ্নেও কোনোদিন মনে ঠাঁই দিই নি। অবিলম্বে বিবাহ করা আমার পক্ষে যতোই জরুরী হোক না কেন, তাই বলে, আপাদমস্তক শুধু সমান দেখার একটি সমতল উদ্যান এবং প্রত্যঙ্গহীন ত্রিমাত্রিকতার একটি উৎকৃষ্ট নমুনা আমার জীবনসঙ্গিনী হবেন, তারও কোনো যুক্তি দেখি না। অবিশ্যি প্রেমে পড়ে অন্ধ হয়ে অনেকেই অযৌক্তিক সব কাণ্ড-কারখানা করেন। এই তো আমার বাল্যবন্ধু জয়ন্ত। কার্তিকের মতো সুদর্শন এবং উচ্চপদস্থ সরকারী কর্মচারী। বাপ-মার ঘোরতর আপত্তি থাকার দরুণ অতি সাধারণ শ্যামবর্ণা, ছবির মতোই 'স্বাস্থ্যবতী' এবং ডিভোর্সি রমাকে নিয়ে পালিয়ে গেল। এক রাতের জন্যে ইস্লাম ধর্ম গ্রহণ করে বিয়ে করে ফেললো। এমন গভীর হার্দ্য সম্পর্ক হলে তো আমিও ছবিকে, আমার মাথার মুকুট করে, ইন্দোরে ফিরে যেতাম। আমার মনে এ-সব তর্কবিতর্কের তুমুল ঝড় বয়ে যাচ্ছে, প্রচণ্ড মানসিক ধাক্কার থেকে নিজেকে সামলে নেবার চেষ্টা করছি, এমন সময় আমার মনের অবচেতন স্তর থেকে অকস্মাৎ একটি ছবি মূর্ত হয়ে উঠলো। এ দেখে আমি আরো শঙ্কিত হলাম। মানুষের আকৃতি নিয়ে ঠাট্টা-তামাসা করা আমার শিক্ষা এবং রুচি-বিরুদ্ধ। কিন্তু পাত্রীর দিকে যখনই আমার নজর যাচ্ছে, তখনই তাঁর শরীরটি, মিলিয়ে গিয়ে এ নতুন আকারটিতে রূপান্তরিত হচ্ছে। ঠিক যেন চার্লি চ্যাপলিনের গোল্ডরাশ ছবির বিখ্যাত দৃশ্যটি—যে দৃশ্যটিতে হৃষ্টপুষ্ট পুরুষটির আকার আস্তে আস্তে বদলে গিয়ে একটি বিরাট মোরগের রূপ নিচ্ছে। চোখ খুলে সামনের দিকে তাকিয়ে যে রূপান্তর দেখছি, চোখ বুজেও তাই। এ তো মহা জ্বালা! মন থেকে বস্তার ছবিটা যতোই তাড়াবার চেষ্টা করি না কেন, ততোই অবিকল সিনেমার মতো, 'মিক্স' করে, সেটি ফিরে ফিরে আসে। এখন কি করি! এমন সময় সেই ছিমছাম সুদর্শনা তন্বীটি, একটি ট্রেতে, চা, সন্দেশ পান্তুয়া এবং সিঙাড়া নিয়ে হাজির হল। ঘরের মধ্যে নিঃশব্দের একটি তরঙ্গ তুলে দিয়ে বেরিয়ে গেল। সমস্ত বিভ্রান্তি এবং গণ্ডোগোলের মূলে তো ইনিই।
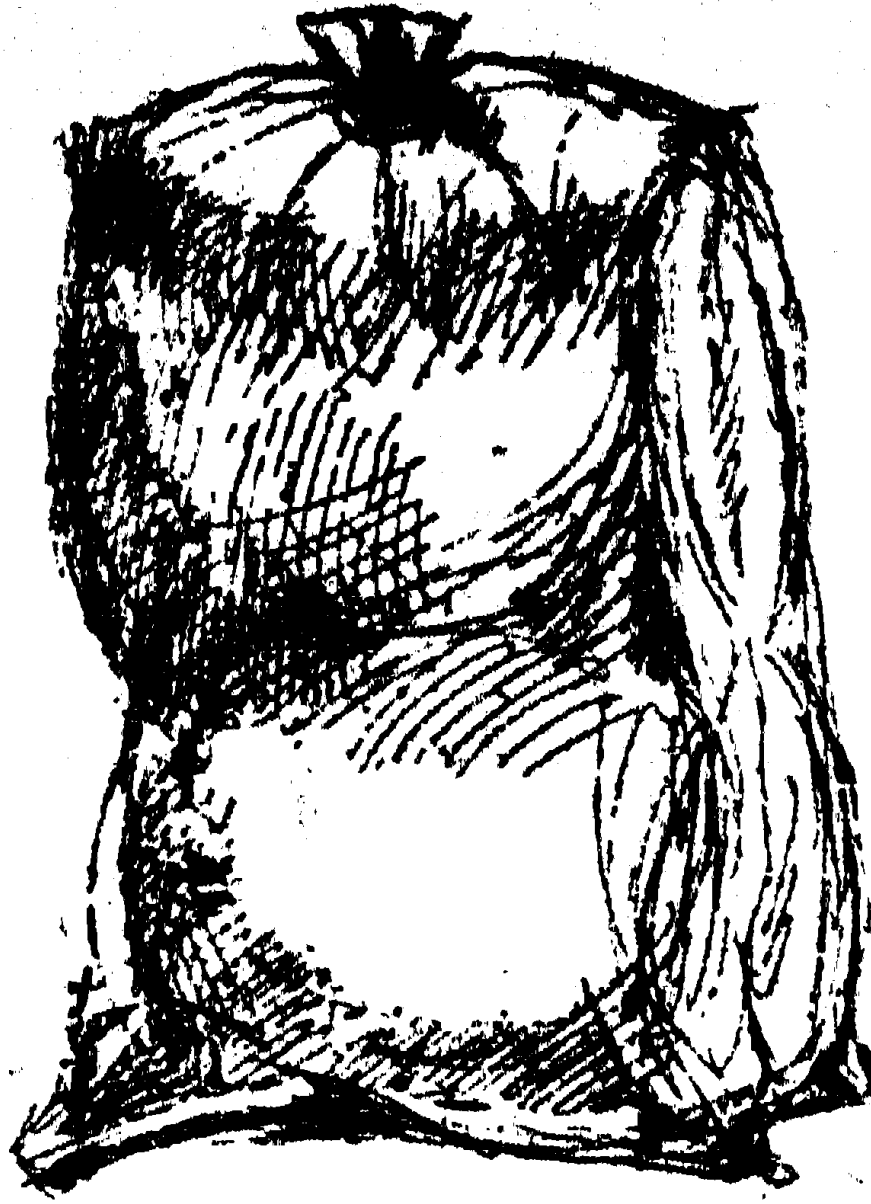
কি মুস্কিল! এতোক্ষণ শুধু বস্তার ছবিটিই আমাকে বিরক্ত করছিল। কিন্তু এ তন্বীটির অকস্মাৎ আগমন জটিল পরিস্থিতিকে জটিলতর করে তুললো। হঠাৎ ছবির ওপর চোখ পড়তেই দেখি এই তন্বীটি তাঁর স্থানে বসে আছে। এতোক্ষণ ছিল ছবি আর বস্তার 'মিক্স'! এখন শুরু হল ছবি আর তাঁর বোনের—। সরলরেখা এবং স্থূলতা লোপ পেয়ে তার স্থান নিল, আনন্দোচ্ছল, সর্পাকার বক্ররেখা এবং নিভিন্ন অঙ্গের সুষমায় মণ্ডিত একটি অপরূপ মেয়ে। আমি তাঁর উষ্ণতা অনুভব করছি। তাঁর দেহসৌরভ আমার নাকে ভেসে আসছে। আমার তখন মনে হলো যেন আমি বহু পুষ্পিত, মলয় নিমন্ত্রিত, এক উদ্যানে, উজ্জ্বল লাল বর্ণের একটি দোলনায় বসে আছি। সে যেন আমাকে দোলাচ্ছে। তার সঙ্গে দুটি কথা বলার বাসনায় আমি কিঞ্চিৎ এগিয়ে বসি। ঠিক এমন সময় তন্বীর ছবিটি মিলিয়ে গিয়ে আগের ছবিটি ফিরে আসে। এক মুহূর্তে সুদর্শনা এই মেয়েটি, পর মুহূর্তেই আমার অনাটি—এ দুয়ের টানা-পোড়েনে আমার অবস্থা তখন বেশ শোচনীয়। কল্পনা-বিলাসী হবার এই তো বড়ো বিপদ। লোকের সামনে কঠোর বাস্তব থেকে পালিয়ে গিয়ে মরীচিকার পেছনে ছোটা—শিল্পী-

[illegible]

হাতে পড়লে ছবির আর চিন্তা কিসের! এ বিদায় ছবির সমস্ত অভাব-অভিযোগই তো পরিতোষ মিটিয়ে দিতে পারবে। কি বল পরিতোষ!' এই বলে তিনি আমার দিকে তাকালেন। তেতালার ঘরের মেঝেটি যেন আমার নিতম্বের তলা থেকে খসে পড়ছে। আমি এক অন্ধকার অতলে তলিয়ে যেতে থাকলাম। এরই মধ্যে বন্ধু আমাকে তাঁর জামাতা বানিয়ে ফেলেছেন। সর্বনাশ! এই হারে, আর খানিকক্ষণ এখানে অপেক্ষা করলে তো পুরুত ডেকে সন্ধ্যার আগেই ছবির সঙ্গে বিয়ে দিয়ে ছাড়বেন। আতঙ্কে আমার বুকের ভেতরটা চিংড়ি মাছের মতো লাফিয়ে উঠলো। আর কথা না বাড়াবার উদ্দেশ্যে প্রমোদদাকে চিমটি কাটলাম। তিনি আমার সংকেত চটপট বুঝে নিলেন। বিপদের পালাটি সংক্ষেপ করার চেষ্টায় পাত্রীর বাবাকে বললেন, 'আচ্ছা ছবিকে এবার ভেতরে যেতে বলুন। ওকে শুধু শুধু কষ্ট দিয়ে আর লাভ কি।' ভদ্রলোক অভিমানের সুরে আমার বললেন, 'আপনারা ওকে তো তেমন কিছু জিজ্ঞেস করলেন না?' প্রমোদদাও তেমনি পেশাদারী পাত্রী দেখিয়ের মতো জবাব দিয়ে বললেন, 'ভাত সেদ্ধ হয়েছে কিনা, তা হাঁড়ির একটা ভাত টিপলেই তো বোঝা যায়। ওঁর ছবি আঁকার হাত দেখেই তো বুঝেছি নিশ্চয় যে এমন ব্যাপারেও ওঁর সমান পারদর্শিনী। আচ্ছা আজ উঠি।' এই বলে আমরা উঠে দাঁড়ালাম। ছবি মাথা নীচু করে আমাদের নমস্কার জানিয়ে বিদায় নিল। আমরা সিঁড়ি দিয়ে নিচে নামলো, এমন সময় আমার চোখ পাশের বারান্দাটির দিকে গেল। যত বিভ্রান্তি এবং গন্ডগোলের সূত্রিকর্ত্রী সেই তরুণীটি দাঁড়িয়ে আছে। এক পা সিঁড়িতে বাড়িয়ে আমি থেমে গেলাম। অপলক নয়নে আমি তাঁর দিকে তাকিয়ে আছি দেখে, মেয়েটি, অস্বোয়াস্তি বোধ করে, ঘরের ভেতর চলে গেল।

সময় কম। সেদিন সন্ধ্যাবেলায় আরো দুটি পাত্রী দেখার তাড়া ছিল। তাই চটপট ট্যাক্সি ধরে টালিগঞ্জে এক বাড়িতে পৌঁছলাম। পাত্রী গায়িকা। চাক্ষুষ না দেখলেও রেডিওতে জনপ্রিয় রবীন্দ্রসঙ্গীত এবং হাল্কা রাগপ্রধান গায়িকা হিসেবে তাঁর পরিচয় জানা ছিল। তাঁর সঙ্গীতগুরু দূর সম্পর্কের আত্মীয়। এটি এ গুরুরই বাড়ি। আমার সম্বন্ধে পাত্রীকে কিছুই জানানো হবে না বলে আগে থেকেই স্থির ছিল। ধরা যাক শিক্ষকের নাম শিশিরবিন্দু এবং ছাত্রীর নাম সীতা। শিশিরবিন্দুই আগ্রহ করে এই সম্বন্ধ পাতিয়েছেন। শাস্ত্রীয় সঙ্গীতের প্রতি আমার পক্ষপাতিত্ব থাকা সত্ত্বেও শিক্ষকের মুখে সীতার গুণের উচ্ছ্বাস শুনে তাঁকে দেখতে আমি স্বভাবতই খুব উৎসুক ছিলাম।

রেডলাইটের পাশে পুরোনো একতলা বাড়ি। সেদিন, কোনো কারণে, বিজলির আলো জ্বলছিল না। টেবিলের ওপর একটি হ্যারিকেনের বাতি। শিশিরবিন্দু হার-মোনিয়মে বসেছেন। গানের বই হাতে সীতা গাইছেন, 'আমার পরান যাহা চায়, তুমি তাই, তুমি তাই গো.........' শব্দের সঙ্গে ভাবাবেগের প্রাচুর্য দেখে মনে হল, গায়িকার হৃদয় কুসুমটি যেন একটি ফুটন্ত ভাতের হাঁড়ির মতো টগবগিয়ে উঠেছে। 'তুমি তাইগো, তুমি তাইগো' কথা কটি উচ্চারিত হবার সময় গায়িকার কন্ঠে, একদিকে অস্থিরতা এবং নিঃসহায়তার, অন্যদিকে আত্মসমর্পণের আকুল আকুতি প্রকাশ পেল। কাল্পনিক কিংবা বাস্তবই হোক, যাকে কেন্দ্র করে এ ভাবাবেগের জোয়ার ছুটছে, তাঁর প্রতি কিঞ্চিৎ অহেতুক হিংসে আমার অন্তরকে ছোঁকা দিল।

সীতার মুখটি অবিকল হিমসাগর আমের মতো গোল। উজ্জ্বল শ্যামবর্ণা। কোমলাঙ্গী। গলার স্বরও বেশ মধুর। সহজ সরল ব্যবহার। মোটামুটি, বেশ একটি আকর্ষণীয় পাত্রী বললে অত্যুক্তি হবে না। তাঁর মুখে এবং শরীরের এক পাশে হ্যারিকেনের মোলায়েম আলোর স্পর্শ লেগেছে। পায়ে হাল্কা আসমানি রঙের সাধারণ শাড়ি। অন্ধকার পটভূমিকায়, সব মিলে পরিমিত রঙের আঁকা পাশ্চাত্য ধরণের, আলো ছায়ার, ছোট্ট একটি অয়েল পেন্টিং-এর মতো দেখাচ্ছে।

গান শেষ হতেই শিশিরবিন্দু আমাদের সঙ্গে সীতার পরিচয় করিয়ে দিলেন। আমা-দের নমস্কার জানাবার উদ্দেশ্যে উঠে দাঁড়াতেই তাঁর একটি খুঁত আমার নজরে পড়লো। আকৃতিতে সম্পূর্ণ নিখুঁত এমন পুরুষ কিংবা স্ত্রী, দশলাখে হয়ত একটিই দেখা যায়। তাহলেও, আমার সঙ্গে তাঁর ভবিষ্যৎ সম্পর্কের বিচারে খুঁতটি একদিক থেকে বেশ গুরুতরই বলা যায়। উচ্চতায় আমি ছয় ফুট। সীতা খুব বেশী হলেও সাড়ে চার ফুট। অর্থাৎ আমার কোমর এবং বক্ষের মাঝামাঝি। এক কথায় সা[illegible] পক্ষীর পাশে [illegible] শাবক। আমার পাশে [illegible] নিতান্তই বেমানান দেখানো ছাড়াও, দাম্পত্য জীবনে নানা রকম যথার্থ অসুবিধে দেখা দিতে পারে—এসব অহেতুক দুশ্চিন্তা আমার মনের মধ্যে ঘোরাফেরা করতে থাকলো। যাইহোক সমাধানের পক্ষে এমন কিছু অসাধ্য সমস্যা নয়। ভালো লেগেছে, এটাই তো সবচেয়ে বড়ো কথা! এসব খুঁটিনাটি পরে বিবেচনা করা যাবেখন। এদিকে আরেকটি পাত্রী দেখতে যাবার সময় হয়েছে। তাই সীতার গানের তারিফ করে আমরা উভয়ের কাছ থেকে বিদায় নিলাম।

অল্পক্ষণের মধ্যেই দক্ষিণ কলকাতার একটি পার্কের কোণে এক লেখক, এবং হালে চলচ্চিত্রের নির্দেশকের বাড়ী হাজির হলাম। তাঁর স্ত্রীও পর পর তিন-চারটি জনপ্রিয় বাংলা ছবির প্রধান অভিনেত্রী হিসেবে বেশ নাম করেছেন। পাত্রী লেখকের ভাগ্নী। লেখকের সঙ্গে আমার অল্প পরিচয় থাকলেও, আমার [illegible]

কনিষ্ঠতা ছিল। তাই সুন্দর অভ্যেস পাকি-
যেন। খানিকক্ষণ গল্প-গুজব করার পর
তাঁর স্ত্রী একটি ২৪-২৫ বছরের মেয়েকে
সঙ্গে নিয়ে প্রবেশ করলেন। দুজনেরই হাতে
চা এবং মিষ্টির প্লেট। মেয়েটির নাম
সুনীতা। শুধু গৌরবর্ণা বললে তার ওপর
অবিচার করা হবে। জরীর কাজে অলংকৃত
কাল রঙের শাড়ী এবং ব্লাউজের সঙ্গে তাঁর
গায়ের রঙটি, হাতের সোনার বালা এবং
কানের দুলকেও যেন হার মানিয়ে দেয়।
তাঁর হাত দুটি কচি কলাগাছের মতই
নিটোল। কনুইয়ের ওপর যেন ব্লাউজের সেলাই
ছিঁড়ে একদিন, খোঁপায় বাঁধ দেয়া নদীর
মতই কেটে পড়বে। দৈর্ঘ্যের দীর্ঘতা যেমন স্বল্প
হলেও তাঁর দেহকে যাবতীয় স্ত্রীসুলভ
সমৃদ্ধি দান করেছেন। তাঁর এই দেহের
প্রত্যেক রোমকূপ থেকে যৌন আবেদনের
ছটা চারদিকে এমনই বিকিরিত হচ্ছে
যে, জ্যৈষ্ঠের শেষের গুমোট সন্ধ্যেটিকে যেন
আরও গুমোট করে তুলেছে। এত সমৃদ্ধির
অধিকারিণী হয়েও বিধাতা একটি ব্যাপারে
তাঁকে নির্মমভাবে বঞ্চিত করেছেন। তাঁর
গন্ড এবং চোয়ালের হাড়গুলো এতই চওড়া
এতই লক্ষণীয় যে, তাঁর মুখশ্রী একটি
অনমনীয়তার প্রলেপে আচ্ছাদিত হয়ে
আছে। লাবণ্যের অভাবকে আরও সুস্পষ্ট
করে তুলেছে, তাঁর সম্পূর্ণ কামান ভ্রূ
দুটি। সেখানে কাল পেন্সিলে আঁকা
চুলের মত সরু দুটি রেখা, অযথা একটি
কর্কশতার ছাপ ফেলেছে। আমি তাকে কি
করে বোঝাই যে, স্বাভাবিক, পুরু,
ভোমরার মত কাল, কুচকুচে ভুরুগুল
তার মুখের বিশেষ আদলের সঙ্গে খুবই
মানানসই হত। বলাবাহুল্য, আজ থেকে
প্রায় ত্রিশ বছর আগে বাঙালী মধ্যবিত্ত
পরিবারে ভ্রূ-কামান, আজকালকার মত
স্ত্রী- ফ্যাসানের একটি প্রচলিত অঙ্গ ছিল
না। এক শ্রেণীর থিয়েটার, সিনেমা কিংবা
যাত্রার অভিনেত্রীদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল।
তাই এ ব্যাপারটি আমার কাছে, তাঁর
অমার্জিত রুচির পরিচায়ক বলে মনে হল।
আমার এ ধারণাটি নেহাৎই ভিত্তিহীন নয়,
তার সমর্থন পেতে বেশী দেরি হল না।

দক্ষিণ কলকাতার এক প্রেক্ষাগৃহে
তখন প্রমথেশ বড়ুয়ার, পর পর, বেশ
কয়েকটি পুরোন ছবি দেখান হচ্ছে। বাংলা
চলচ্চিত্রে শ্রীবড়ুয়ার অবদান কি, এই নিয়ে
আলাপ-আলোচনা চলছিল। আমি কথার
ফাঁকে ফাঁকে, আড় চোখে, পাত্রীর শরীরের
জৌলুস তারিফ করছি। সুনীতা চুপ করে
বসে আছে দেখে প্রবোধদা তাকে প্রশ্ন
করলেন, 'সুনীতা, বড়ুয়ার কোন্ ছবিটি
তোমার বেশী ভাল লাগল?' সোনার বরণ
মেয়েটির উত্তর শুনে আমি চেয়ার থেকে
চিৎ হয়ে মেঝেতে পড়ে যাচ্ছিলাম আর
কি।

তিনি বললেন, 'প্রমথেশ বড়ুয়ার
সব ছবির মধ্যে আমার সব থেকে ভাল
লেগেছে 'দেবদাস আর চোড়ুরী'। অভি-
নেত্রীর মার্জিত কথাবার্তার তুলনায় এই
মেয়েটির প্রত্যেকটি কথা আমার কানে যেন
একেকটি স্ক্রু-ড্রাইভারের মত প্রবেশ
করল। আমি মনে মনে বলি, 'অচল।
অচল।' প্রবোধদা আমার পাশেই বসে-
ছিলেন। কনুই দিয়ে আমাকে আস্তে করে
গুঁতো দিতেই আমি তাঁর প্রতিক্রিয়া বুঝে
নিলাম। আরও কি সব [illegible] করে বলতে
যাচ্ছিল দেখে প্রবোধদা তাড়াতাড়ি তার
কথা থামিয়ে দিয়ে বললেন, 'কেন? গৃহ-
দাহও খুব ভাল।' যাই হোক, চা-মিষ্টি এবং
লেখকের নানা খোশ গল্পের মধ্য দিয়ে
পক্ষান্তরে সন্ধ্যেটি ভালই কাটল। লেখক
এবং অভিনেত্রীকে অজস্র ধন্যবাদ জানিয়ে
বাড়ি ফিরে এলাম।

পরবর্তী চার-পাঁচ দিনে আরও বেশ
কয়েকটি পাত্রী দেখা হল। সবিতা, মৃদুলা,
বেলা, কেতকী, কবিতা, কেয়া, ছায়া, ছন্দা,
দোলা, প্রিয়া, ভারতী, তাপসী, ললিতা,
অনিতা ইত্যাদি। উল্লেখ করবার পক্ষে
নামগুলোর মতই আকৃতিতেও তাঁরা
বৈশিষ্ট্যহীন। এবেলা-ওবেলা, সন্দেশ, রস-
গোল্লা, পান্তুয়া, সিঙাড়া ইত্যাদি খেয়ে
আমার মত আজন্ম মেঠাই-পাগল লোকের
জিভেও অরুচি ধরে গেল। এদিকে পাত্রী
যতই দেখছি, ততই বিভ্রান্ত হয়ে যাচ্ছি।
এদের মধ্যে দু-একজনকে বড়জোর চলনসই
বলা যায়, যেমন ছন্দা আর তাপসী। কিন্তু
ছন্দার গীটার বাদ্যযন্ত্রপ্রীতি দেখে, বিনা
বিতর্কে তাঁকে বাতিল করতে বাধ্য হলাম।
এই কথাটি আমার কানের বিষ। আর
তাপসীর তেল-চিটচিটে বিনুনি অতি সাদা-
সিধে, বর্ণহীন, এক কথায় বিধবার মত,
পোশাক-আশাক আর গম্ভীর প্রকৃতি দেখে
আমি ঘাবড়ে গেলাম। আমি নিজে গল্পো-
গুজবে লোক, হাসি-ঠাট্টায় আমার দিন
কাটে। তাই, যে মেয়ে গাম্ভীর্যের উপাসক
এবং সাজ-সজ্জায় বিরূপ, সে মেয়েকে নিয়ে
ঘর করা, অনেকটা খাল কেটে কুমীর
আনারই সামিল নয় কি! এসব বিষয়ে আমি
বেশ আধুনিক ভাবাপন্ন, এবং রুচিসম্পন্ন
হাল-ফ্যাশানে বিশ্বাসী। এরূপ নানা রকম
তর্ক-বিতর্ক, বিচার-বিবেচনা আমার
মস্তিষ্কে বেশ জট পাকাচ্ছে। ছুটি
ফুরোতে আর মাত্র তিন দিন বাকী। তার
শেষ ইচ্ছেটা কি তাহলে আমি পূর্ণ করতে
পারব না। দুশ্চিন্তায় রাত্রিতে ঘুম নেই।।
সেই ছাদে দেখা মেয়েটিই তো যত গোলমাল
বাধাল। তাঁর রূপ-কান্তিতে [illegible]
সবাইকে, কি রকম ফিকে লাগছে। এমন
সময় এক সাংবাদিক বন্ধুর মারফৎ আরেকটি
সুযোগ্যা পাত্রীর খবর এল। তাঁর দৃঢ়
বিশ্বাস যে, আমার পক্ষে হাসি আদর্শ
পাত্রী। হাসি তাঁর স্ত্রীর বড় বোনের
ননদ। এম-এ পাশ, সুশ্রী ইত্যাদি ইত্যাদি।
স্থির হল য, দাদা-বৌদির ইচ্ছেয়, হাসি
তাঁদের বাড়িতে সারা দিন কাটাতে
আসবেন। তাঁকে যে আমরা দেখতে যাব,
এ কথাটি তার কাছ থেকে গোপন রাখা
হবে। আমি এবং আমার সাংবাদিক বন্ধু,
সন্ধ্যে ছটা নাগাদ তাঁদের বাড়ি উপস্থিত
হব।

সেদিন রবিবার। জ্যৈষ্ঠের কাঁঠাল
পাকা গরমে, দিনটা সকাল থেকে ভীষণ
গুমোট হয়ে আছে। বিকেল হতেই উত্তরের
আকাশে ঘন কাল মেঘ দেখা দিল। কথা
ছিল, আমি এবং সাংবাদিক বন্ধুটি আলাদা-
নির্ধারিত সময়ে হাসির দাদার বাড়ি
পৌঁছব। গরদের পাঞ্জাবি এবং ধুতি পরে
নিলাম। হাতে ছাতা। একটি রিক্শায় চড়ে
'সিদ্ধিদাতা গণেশায় নমঃ, শ্রীশ্রীপ্রজাপতয়ে
নমঃ'—এসব বলতে বলতে গন্তব্যস্থল

বালীগঞ্জ সার্কুলার রোডের দিকে রওনা হলাম।

[illegible] স্টেশনে না পৌঁছতেই প্রচণ্ড দুর্যোগ শুরু [illegible] কিন্তু [illegible] মনেই মুষল [illegible] বৃষ্টি [illegible] রিক্সা থামিয়ে কোথাও [illegible] দেবার সময় নেই। এদিক [illegible] সময় গর্জাতে লাগল। রিক্সা [illegible] করে টুং-টাং আওয়াজে, [illegible] এগুচ্ছে। বৃষ্টির [illegible] দিক থেকে অবিশ্রান্তভাবে তীর [illegible] আসছে। [illegible] এবং রিক্সার [illegible] আমার [illegible]

হল, যেন পুকুরে ডুব দিয়ে উঠেছি। বাড়ি ফিরে গিয়ে জামা-কাপড় বদলে নেব এমন সময়ও হাতে নেই। তাছাড়া ইচ্ছেও নেই। শুনেছি 'ম্যারেজেস আর মেড ইন হেভেন' [illegible] সত্যিই তাঁর সঙ্গে আমার মিলনের ব্যবস্থা করে থাকেন তাহলে তাঁদের চোখে, আমার এ ভিজে কাকের মত [illegible] কার্তিকের মত সুদর্শন লাগবে। হয়ত তিনি মিক মিক করে, মুচকি হেসে বলবেন, 'হাউ রোম্যান্টিক!' এসব ভাবতে-ভাবতে সঠিক ঠিকানায় পৌঁছলাম।

উঁচু পাঁচিল দিয়ে ঘেরা কম্পাউন্ড। গেটের তলায় রিক্সা থামতেই দেখি আমার বন্ধু এবং [illegible] এক মহিলা দাঁড়িয়ে আছেন। 'আমি হাসির বৌদি' বলে তিনি নিজের পরিচয় দিলেন। আমাদের ড্রইং রুমে বসতে বলে ভেতরে চলে গেলেন। তাঁকে দেখে কিঞ্চিৎ চিন্তিত মনে হল। ভাবিবার জামাই যে স্নান করে ভিজে কাপড়ে লেপ্টে এসে হাজির হবেন, এমন একটি অভাবনীয় দৃশ্য হয়ত কল্পনাও করতে পারেন নি। তাই তিনি তাঁর স্বামীর গেঞ্জি, ধুতি এবং পাঞ্জাবি এনে আমার হাতে দিয়ে বললেন, 'পাশের বাথরুমে গিয়ে শিগ্গির চেঞ্জ করে নিন।' উত্তরে আমি বললাম, 'থাক! দরকার কি! এই তো, পাখার তলায় বসেছি, এক্ষুনি শুকিয়ে যাবে।' সর্দি লাগবে, জ্বর হবে। এসব ভয় দেখিয়েও তিনি আমাকে রাজী করাতে পারলেন না দেখে, অগত্যা হাল ছেড়ে দিলেন। আমার কর্মস্থল ইন্দোর কেমন জায়গা, কলকাতা থেকে কত দূরে, সেখানে বাঙ্গালী সমাজ আছে কিনা, বৌদির এসব নানা প্রশ্নের মোকাবিলা করছি, এমন সময় হাই-হীলড জুতোর খট-খট আওয়াজে, নাটকীয়ভাবে, একটি মেয়ে প্রবেশ করল। বৌদি পরিচয় করিয়ে দেবার আগেই আমি অনুমান করে নিলাম ইনি কে। যাই হোক, পরিচয়ের সঙ্গে নমস্কার বিনিময় শেষ না হতেই হাসি বৌদিকে লক্ষ্য করে বললেন, 'একি বৌদি! টি হ্যাজন্ট বিন সার্ভড ইয়েট!' বেয়ারা! বলে জোরে হাঁক দিলেন। উর্দি-পরা বেয়ারা দরজায় দেখা দিতেই হাসি তাকে চা আনবার আদেশ দিলেন। আমি মনে মনে বলি, 'বাঃ! বেশ স্মার্ট তো! সাজ-পোশাকেও তেমনি হালফ্যাশনদুরস্ত। এ ব্যাপারে তাপসী-ললিতার দল যে রীতিমত পাইঁয়া সে বিষয়ে আর সন্দেহ কি। গত কদিনের তুলনায় বর্তমান অভিজ্ঞতাটি আমার খুব মনমত লাগছে। একটু আড়ষ্ট বোধ করলেও আমি বেশ উপভোগ করছি।

অপরূপ সুন্দরী না হলেও হাসির মুখটি, যে কোন মানদণ্ডের বিচারেই বেশ আকর্ষণীয় বলা যায়। তদুপরি আছে প্রসাধনের সুবিন্যাস। আকারে তার মুখটি অশ্বত্থ পাতার মত। উচ্চতায় বাঙ্গালী মেয়েদের তুলনায় বেশ দীর্ঘাঙ্গী। কাঁধ অবধি ঢেউ খেলান, সযত্নবিন্যস্ত-করা রেশমী চুল। পাখার হাওয়ায়, থেকে থেকেই তার কয়েক গাছা চুল চোখের ওপর উড়ে আসছে। সেগুলোকে সাবলীল ছন্দে, মৃদু মাথার দোলায়, সরিয়ে দেবার চেষ্টায় তার সুন্দর, লম্বা নিটোল গলাটি এবং অনাবৃত ও মসৃণ কাঁধটি আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করল। তাঁর চোখের পাতায় সূক্ষ্ম কাজলের রেখা। ছোট, পুরু, ঠোঁট জোড়া রক্তবর্ণ লিপ-স্টিকে রঞ্জিত। ত্বকে ফাউন্ডেশন ক্রিমের ওপর পাউডারের ছোঁয়া এতই হাল্কা যে বিশেষ নজর না দিলে তা বোঝা যায়। কানে পান্না বসান অভিসুক্ষ্ম দুটি সোনার দুল। গলায় মারাঠী মঙ্গলসূত্র। হাতে এবং

পায়ের সঙ্গে মানানসই রঙের নেলপালিশ। এ সব কিছুরই ব্যবহার পরিমিত এবং মার্জিত রুচির ছাপে সুস্পষ্ট। পরনে পেঁয়াজি রঙের দক্ষিণ ভারতীয় দামী সিল্কের শাড়ি। এই পোশাকটি তাঁর পাকা ধান রঙের ত্বকটিকে আরও উজ্জ্বল করে তুলেছে। এ রঙের সঙ্গে সংযত সবুজ রঙের হাত-কাটা ব্লাউজটিও খুব মানানসই হয়েছে। কটিদেশ হুবহু মৌমাছির মত না হলেও সরুই বলা যায়। বাকী শ্রীসুলভ অঙ্গের মাপজোক সংগীতার মত না হলেই বা কি। যে সম্পদ আছে, আমার মত পুরুষের মন মজাতে তাই যথেষ্ট। এত স্তুতি গাইবার পরও যদি পাঠকেরা মনে করেন যে, আমি এখনও লাট্টু হয়ে যাইনি, তাহলে নিতান্তই ভুল করবেন।

আমার জামা-কাপড় এখনও বেশ ভেজা। একটু শীতও করছে। হাসি চা ঢালতে শুরু করলেন। তাঁর সব ব্যাপারেই একটা আত্মসচেতনতার অনুপস্থিতি আমাকে আকৃষ্ট করল। বৌদির হাতে চায়ের কাপ তুলে দিয়ে, আমার জন্যও ঢাললেন। তারপর জিজ্ঞেস করলেন 'হাউ মাচ সুগার প্লিজ?' নিছক নিজের সতর্কতা জাহির করবার উদ্দেশ্যে বললাম, 'নান্ প্লিজ, দুধও নয়! আমার দিকে অবাক হয়ে তাকিয়ে বললেন, 'সে কি! আপনি একেবারেই চিনি খান না?' পাছে আমাকে ডায়াবেটিসের রোগী ঠাউরে নেন, তাই তাড়াতাড়ি বলে ফেললাম, 'হ্যাঁ, খুব খাই, শুধু চা-কফির সঙ্গে খাই না।' এতক্ষণে হাসি আমার দিকে তেমন নজর দিচ্ছিল না। তাই সরাসরি তাঁর দৃষ্টি আকর্ষণ করতে পেরে নিজেকে বাহবা দিলাম। বৌদি ফ্রুটকেক এগিয়ে দিতে দিতে বললেন, 'কিছু মনে করবেন না, উনি এক জরুরী তলবে অল্পক্ষণের জন্যে রাইটার্স বিল্ডিং-এ যেতে বাধ্য হয়েছেন। এক ঘন্টার মধ্যেই ফেরবার কথা। আশা করি আপনাদের তাড়া নেই। তাড়া কিসের। উনি যত দেরি করে ফেরেন ততই তো ভাল। হাসির সঙ্গে আরও বাড়তি কিছুক্ষণ সময় কাটান যাবে!

ফুটবল খেলা থেকে শুরু করে,—রবীন্দ্র গীতিনাট্য, আধুনিক ইংরিজি ফিকশান, দেশের রাজনীতি,—এসব পাঁচ-মিশালি আলোচনায় হাসির সক্রিয় অংশ গ্রহণ থেকে বোঝা গেল যে এসব বিষয়ে তিনি বেশ অবহিত। কথায় কথায় এও জানা গেল যে, তিনি ইংরিজী সাহিত্যের ছাত্রী। আমি মুগ্ধ হয়ে তার চালচলন, কথাবার্তা দেখছি আর শুনছি। তাঁকে আমার স্ত্রী হিসেবে কল্পনা করছি, আমাদের দুজনের কি রকম আদর্শ জুড়ি হবে, সবাই আমাদের দেখে কি রকম হিংসেয় জ্বলে-পুড়ে মরবে, আমার ইংরেজ প্রিন্সিপাল, হাসির ইংরিজি শুনে, তার স্মার্টনেস দেখে, আমাকে কি সুনজরে দেখবে এবং তার ফলে আমার পদোন্নতি অবশ্যম্ভাবী—এসব কথা ভাবতে ভাবতে কখন যে অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিলাম টেরও পাই নি। হঠাৎ চায়ের কাপটা আমার হাত থেকে ফস্কে গিয়ে ঠাস করে মার্বেলের মেঝেতে পড়ল। হাসি আমারই উল্টোদিকে বসেছিল। খানিকটা চা ছিটকে গিয়ে তার দামী শাড়ির পাড়ের একটা অংশ ভিজিয়ে দিল। আমি অত্যন্ত বিব্রত বোধ করে বলি, আই অ্যাম সরি'। 'দ্যাটস অল রাইট' বলে ব্যাপারটা তিনি উড়িয়ে দেবার চেষ্টা করলেন। আমি যতই বলি, 'আপনি প্লিজ চেঞ্জ করে আসুন। শাড়িটাকে এক্ষুনি জলে ভিজিয়ে দিন, তা না হলে চায়ের দাগ আর কোনদিন উঠবে না।' তিনি ততই এমব্যারাস্ড বোধ করেন। জোর করে ঠোঁটের কোণে হাসি ধরে বলেন, 'দ্যাটস অল রাইট, দ্যাটস অল রাইট'। আমি আরেকবার, 'আই অ্যাম রিয়েলী ভেরী সরি' বলতে যাচ্ছি, এমন সময় অচানক, আমার নাক থেকে এমন জোরে একটা হাঁচি এল যে সমস্ত ঘরটা কেঁপে উঠল। হাসির চোখ-মুখের ভাব দেখে আমার সন্দেহ হল যে, ব্যাপারটা খুব শোভন হল না। একথা ভাবতে ভাবতেই পর পর আরও পাঁচ-ছটা হাঁচি এল। কিছুতেই থামাতে পারছি না। আমার একটুকুতেই সর্দি-কাশি লেগে যায়। আপশোস হয় যে, কেন বাহাদুরী দেখাতে গেলাম। ভেজা জামা-কাপড়টা তখন বদলে নিলেই হত। বৌদি উঠে গিয়ে আরেকটা কাপ চা আর অ্যাসপ্রো নিয়ে এলেন। গরম চা ঢেলে দিয়ে আমাকে চটপট বড়ি দুটো খেয়ে নিতে বললেন। বেয়ারা এসে মেঝেটা মুছে দিল। ভেতরে যেতে যেতে আড় চোখে আমার দিকে তাকাল। পকেট হাতড়ে দেখি রুমাল নেই। অথচ ওটার প্রয়োজন ভীষণ জরুরী হয়ে পড়ল। কি করি। 'এক্সকিউজ মি' বলে বাথরুমে চলে গেলাম। সেখানে আয়নায় চোখ পড়তেই হকচাকিয়ে গেলাম। নিজেকে নিজেই চিনতে পারছি না। লম্বা চুলগুলো তেলে-ভেজা প্রদীপের সলতের মত লেপ্টে তখনও

দ্বৈরথ

সুজিত দাশগুপ্ত

কবে যে একদিন অপার্থিব সুরে এক আশ্চর্য সুরেলা শব্দ বিভিন্ন পর্দায় ওঠা নামা করতে শুনেছিলাম, আজও মাঝে মাঝে তা আমাকে তাড়িয়ে বেড়াচ্ছে। যেন বহু ওপর থেকে টুং-টাং শব্দ তুলে অন্ধকারের গাড়ির এধার-ওধার ছুটতে ছুটতে কাঁপিয়ে আসছে নিতান্ত ভারী কোনো বস্তু। একটা বেশ জলদি শুনতে পাই। অথচ কোনো পর্দায় তাকে ধরে রাখতে পারিনি। আমাদের অর্কেস্ট্রার এই শব্দ যেন ছোঁয়া যায় না। গম্ভীর কোনো শব্দের মতো। গৌতমকে বলেছিলাম, ওর ইলেকট্রিক গিটারে ঠিক আসে না। গৌর পারে না। আমি আমার স্প্যানিশ গিটারে পারি না। রতীন পিয়ানো একর্ডিয়ান বাজায়। রতীন পারে নি। তোতা মাউথ অর্গান বাজায়। তোতা খুব ভাল বাজায়, ও আমাদের হীরো। অথচ এ পারবে না জানি। চতুর্দিকের এক ভীষণ নৈঃশব্দের মধ্যে টুং-টাং আওয়াজ তুলে দূরের অজানা গন্তব্যে ছুটে যাচ্ছে কোন বস্তু—আমাদের কারুর পক্ষেই এইরকম একটা পরিবেশ ফুটিয়ে তোলা সম্ভব নয়।

ইয়ং অর্কেস্ট্রা—এই নাম আমাদের [illegible] [illegible] [illegible] সদস্য। [illegible] দু-জনের একরকম দেখা। গৌতমের ভাই। [illegible] বাজায়। [illegible] [illegible] [illegible]। পৌঁছবার অনেক কিছু ঘটে যায়। অনেক সমস্যা আসে। সমাধানও হয় নিশ্চয় কিছু কিছু। কিন্তু ইয়ং অর্কেস্ট্রার ছজন মানুষ তাতে কিছুমাত্র বিচলিত হয় না। আমরা খবর রাখি না তা নয়। আমরা ধ্বংসের খবর রাখি। ভূকম্পনের খবর রাখি। কিন্তু তারা কখনই আমাদের নিজেদের মধ্যে আলোড়িত হয় না। বরং ধর্মতলার কোন দোকান ইদানীং স্প্যানিশ গিটার, বেশ বিক্রী করে সুনাম কুড়িয়েছে তার আলোচনা করি। এবং প্রায়ই নতুন হিট গান আমাদের নিজস্ব ঢঙে তুলে নেওয়ার জোরদার আয়োজন চলতে থাকে।

এইভাবেই কেটে যাচ্ছিল। অফিস থেকে ফিরে এসে গৌতমের দোতলা বাড়ির একধারের কোণের ঘরে সবাই জড় হওয়া। তারপর একই সুরে বারবার বাজিয়ে ভুল-ত্রুটিগুলো শুধরে নেওয়া। আর কোনো পার্টির এবং শীত শেষের সন্ধ্যায় বহুলোকের সামনে বসে সেই সুর বাজিয়ে আসা।

আমাদের সুনাম আমাদের অঞ্চল ছাড়িয়ে আরও বহুদূর পর্যন্ত ছড়িয়ে যেতে লাগল। ফলে আমাদের উৎসাহের আগুনে [illegible] টাকাপয়সা এসে দাঁড়াল। কারণ ফাংশনে গিয়ে দাঁড়ালেই অযাচিত সম্মান [illegible] একের পর এক অনুরোধ। প্রিয় গান শুনতে শুনতে ওদের মধ্যে থেকে কেউ সিটি দেয়। কেউ কেউ চেয়ারে উঠে কোমরে হাত রেখে নাচতে থাকে। ক্রমশ উত্তেজনা আমাদের মধ্যেও পেট্রোলে আগুন লাগার মত ছড়িয়ে যায়। অথচ আমরা এসে বসলে প্রথমে পরিবেশ বেশ শান্ত থাকে।

শুরুতে বাজান হয় রবীন্দ্র সঙ্গীতের সুর। এটাই নিয়মে দাঁড়িয়ে গেছে। হয়, যে রাতে মোর দুয়ারগুলি....অথবা তোমায় কিছু দেব বলে....নয়ত, জাগরণে যায় বিভাবরী...এইরকম কয়েকটা গান তোলা আছে। তারই একটা বাজিয়ে দিই। তারপরই শুরু হয় গাইডের সেই গান ও কোন হ্যায় জো মুসাফির যাওগি কাঁহা। এরপরই একনাগাড়ে...বাজার হিটকরা গানগুলোর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ি। দর্শকদের চেয়ারগুলো ছেড়ে ধীরে ধীরে চলে যায় কয়েকজন বয়স্ক নারী-পুরুষ। মেয়েদের মধ্যে থেকেও অনেকেই চলে যায়। যারা ম্যাক্সি পরে আসে ফ্রিলের আঁটসাঁট জামা অথবা বেলবটস সেইসব মেয়েরা নড়েচড়ে বসে পায়ে তাল দেয় এবং জেন্টস নামাঙ্কিত হলের অন্যদিকে আড়চোখে তাকায়।

সেইদিন থেকে আমাদের রেট প্রায় দ্বিগুণ হয়ে গেল যেইদিন আমাদের দলে এল তুলা। প্রথম দু-একটা ফাংশনে তুলা গাইবার পর দিনে গড়ে প্রায় তিন-চারটা জায়গা থেকে বায়না করতে আসে। কোন

কোন দিন আরও বেশী। ফিরিয়ে দিতে বাধ্য হই। তৃণাকে আবিষ্কার করেছিল ভোলা। ওর চোখমুখ ধারালো। ফর্সা। আঙ্গুলের সরু ডগায় পরিষ্কার কাটা নখের ওপর লাল নেলপলিস। এখন পায়েগতি লেগে আরো রং খুলেছে ওর। আরও সুন্দর হয়ে উঠছে। ও যখন আমাদের দলে এল তখন ওর পরিবারে দু-বেলার অনটন। অনেকগুলো ভাই-বোন। ওর বড় এক দাদা আছে। কিছুই করে না। এখন আমাদের যেদিন যেখানে ফাংশন থাকে সেখানে যায়। সামনের রোডে বসে। আমাদের বাজনার শেষে উইংসের আড়াল থেকে তৃণা এসে দাঁড়ায়। ওর ঘুরে বেড়ানোর জন্য স্টেজে জায়গা ছাড়া থাকে। হাতে মাউথপিস নিয়ে তৃণা ঘুরে ঘুরে গান গায়। প্রথমে ভোলা এসে মাউথপিসটা ঠোঁটের কাছে নিয়ে ভারী গলায় বলে, আপকা নাম?

—মেরা নাম?

একটু থামে তৃণা। হাসে। বুকের লকেটটা ধরে নাড়াচাড়া করতে করতে লজ্জার হাসি মিশিয়ে বলে, মেরা নাম সুনীতা।

ঠিক তেমনিভাবে যেমন ছিল 'ইয়াদো কি বরাত' ছবিতে। তারপর শুরু হয় সেই গান, দম মার দম....।

তৃণার গানের মাদকতা দর্শকদের মধ্যে ছড়িয়ে যায়। ওরা কেউ নাচে। কেউ সিটি দেয়। তৃণার দাদা হাঁ করে তাকিয়ে থাকে স্টেজের দিকে। পা নাচায়। সাদা আলোয় তৃণার মাখন রঙা পেট, নাভি শাড়ীর আড়াল থেকে উদ্ভাসিত হয়। তৃণার পরিষ্কার বাহু-মূল, আর ওই অত্যুজ্জ্বল আলোয় ঘরভর্তি দর্শকের হৈ-চৈ-এর মধ্যেও স্পষ্ট শুনতে পাই ভারী কিছু পতনের শব্দ। লোহার বিমে ঠোক্কর খেয়ে খেয়ে ক্রমশ অতলে ডুবে যাচ্ছে। তৃণার বাবা একটা সাধারণ অফিসের সাধারণ করণিক। লোকটার ঘিয়ে রংয়ের জামা জুড়ে অজস্র ঘামের দাগ। এই গরমের দিনে সবসময় দাগ ধরা জামা লোকটার গায়ে। কেমন ঝুঁকে পড়ে ক্লান্ত পায়ে ছেঁড়া ব্যাগ হাতে অফিসের দিকে হেঁটে যায় লোকটা।

আমরা ছাড়া এ অঞ্চলে আর একজন আছেন। অমরেশ আচার্য। ভাল বেহালা বাজান। আগে বহু ফাংশনে বাজাতেন। লোকে ধৈর্য ধরে শুনতে শুনতে একসময় আত্মমগ্ন হয়ে উঠত। আলাপ ছেড়ে ক্রমশ দ্রুতের দিকে এগিয়ে যেত অমরদার ছড়ি। পাশে তবলচি যন্ত্রের মত হাত নেড়ে যাচ্ছে বাঁয়া তবলার ওপর। অমরদা স্টেজের ঠিক মাধাখানে। দর্শকরা সেইদিকে তাকিয়ে চুপ-চাপ বসে আছে। কেউ কেউ নিজের অজান্তে মাথা নাড়ছে সুরের ওঠানামার সঙ্গে। মনে হত হলের মধ্যে একটা সূচ ফেললে তার আওয়াজ শুনতে পাব—আত্মমগ্ন-সুখী এই-রকম এক অবিচল স্থৈর্যে ভরা থাকত হলের এধার-ওধার। কিন্তু বেশ কিছুদিন যাবৎ অমরদা আর কোনো শ্রোতা পান না। এখন উনি কেমন যেন বহুদিন আগের মানুষ হয়ে গেছেন। বিয়ে করেন নি। বেহালার ওপর নির্ভর করে জীবন চলে যাচ্ছিল। একসময় ছাত্র ছিল অনেক। এখন আর ছাত্র জোটে না। সবাই গিটার শেখে। বঙ্গো বাজায়। অমরদার পৃথিবীতে বেহালা শেখার মানুষ খুঁজে পাওয়া যায় না। আমরা তৃণাকে সঙ্গে নিয়ে ভাড়া করা গাড়ির ওপরে অ্যামপ্লিফায়ার, বক্স ইত্যাদি চাপিয়ে হৈ হৈ করতে করতে চলে যাই। অমরদা রাস্তার ধারে দাঁড়িয়ে সেই আমাদের দিকে ফ্যালফ্যাল চোখে তাকান। আমাদের গাড়ির চাকার তলায় পড়ে ছিটকে যাওয়া কাদা তাঁর কাপড়ে কখনো পড়লেও পড়তে পারে। কিছুই অসম্ভব নয়। অমরদা যিনি ফিনফিনে ধুতি-পাঞ্জাবি আর ঝকঝকে চেহারার লোক ছিলেন তিনি আজকাল অন্ধকার মাখানো চায়ের দোকানে বসে মাছি তাড়িয়ে পাউরুটি ডোবান চায়ের গ্লাসে। কখনো সখনো ঘরোয়া ফাংশনে বেহালা বাজানোর ডাক আসে। কিন্তু অর্থ আসে না। তবু অমরদা যান। আগে সঙ্গে শিষ্যরা থাকত। এখন তিনি একাই বেহালা হাতে এগিয়ে যান লাহা অথবা সান্যালদের বাড়ির উদ্দেশ্যে। রাস্তায় দেখা হলেই ঠোঁটে হাসি আনার চেষ্টা করেন, কি ভাল তো?

—হ্যাঁ সূচক মাথা নাড়ি।

—আপনি?—

—এই চলে যাচ্ছে ভাই।—

এই সময় অমরদার গলার স্বর উদাস হয়ে আসে। আর আমি হঠাৎ শুনতে পাই ভারী কিছু পতনের শব্দ। লোহার বিমে ঠুং-ঠাং আওয়াজ তুলে ক্রমশ অতলে হারিয়ে যাচ্ছে।

একা এক নির্জন ঘরে অমরদার সন্ধ্যা কাটে। জীবনের সমস্ত দিনই হয়ত কেটে যায়। কখনো কোনো দিন ও'র ঘরে গেলে দেখতে পাই এক আশ্চর্য শূন্যতা মেশানো হাসি। মুখের উচ্চাবচ ভূমি জাগিয়ে হাসেন অমরদা, আয় আয়।—

তখন হয়ত তিনি রান্না করছেন। উনুনের সামনে বসে পরনের ছেঁড়া লুঙ্গিটাকে লজ্জা নিবারণের চেষ্টায় দুই হাঁটুর মাঝখানে চেপে রাখার অস্বস্তিতে কষ্ট পাচ্ছেন। সেদিক থেকে চোখ ঘুরিয়ে নিই। বলি,—কেমন আছেন?

—আর ভাই...

হয়ত বলার কথা ফুরোয় না। কিন্তু হঠাৎ থেমে যান। ঘরের একধারের দড়িতে ঝোলে দুটো গেরুয়া রংয়ের পাঞ্জাবি। একটা পায়জামা। দাগকরা তেলচিটে বিছানার একধারে সযত্নে রাখা থাকে বেহালার বাকস। দক্ষিণের জানালাটা আমিই খুলে দিই। মরচে ধরে ফুটো হয়ে যাওয়া টিনের দেওয়াল ভেদ করে এসে পড়ে রোদের রেখা। বাইরে তখন নীল আকাশে খঞ্জন-বিলাসী সুর তোলে কোনো শঙ্খচিল। বাইরের দিক থেকে চোখ গুটিয়ে হঠাৎ আমার দিকে তাকান অমরদা। বলেন, চলে না রে।...এইভাবে কখনো কোনো মানুষের চলতে পারে? ....দেনা তোদের টিমে একটা চান্স। আমি খুব ভালো বেহালা পারি। খুব ভাল বাজাতে পারি। ....দিবি....

অমরদার চোখ উদ্দীপ্ত হয়ে ওঠে। আমি নিষ্প্রভ হয়ে পড়ি। জানি, ইয়ং অর্কেস্ট্রা কোনো দিন ও'কে বেহালা বাজাতে ডাকবে

কুমারটুলির দুর্গাপ্রতিমা

দল এখানে এসে স্থায়ীভাবে বসবাস আরম্ভ করলেন। শহরের ধন-সম্পদ উত্তরে কেন্দ্রীভূত হওয়ায় এবং গঙ্গার ধারে মাটি সহজলভ্য হওয়ায় তাঁরা কুমারটুলি অঞ্চলটিই বেছে নেন। অবশ্য উত্তর কলকাতায় গঙ্গার ধারে তো আরো জায়গা রয়েছে। কিন্তু বিশেষ করে কুমারটুলি কেন এ প্রশ্নের সঠিক ঐতিহাসিক উত্তর দেওয়া সম্ভব নয়। হয়তো প্রথম দলটি এসে এখানেই ছিলেন এবং দ্বিতীয় দলটিও। ফলে পরবর্তী দলগুলিও এখানে বসতি স্থাপন করলেন। কলকাতার উত্তর অংশে যেমন এঁরা ধনীদের আকর্ষণে কেন্দ্রীভূত হলেন দক্ষিণ অংশে তেমনি ভিড় করলেন কালী মন্দিরের ভক্ত সাধারণের আকর্ষণে। কালীঘাট মন্দিরের পুণ্যার্থীদের পৃষ্ঠপোষকতায় মাটির পুতুলের সংগে সংগে গড়ে উঠেছিল পট শিল্পের একটি সজীব ধারা পরে যা কালীঘাটের পট নামে বিশ্ব বিখ্যাত হয়।

কুমারটুলি ঘাটের পেছনে গঙ্গার ধারের বাড়িগুলির প্রাচীনতা দেখলেই কুমারটুলি অঞ্চলটির প্রাচীনতা অনুমান করা যায়। ঘাট থেকে উঠে রেল লাইন পার হয়ে একটু ভেতরে গেলেই কবিরাজ বাড়ি। দরজার পাশে শ্বেত পাথরের ফলকে [illegible] [illegible] আর দেখতে নেই। [illegible] ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের পদধূলি দানের বার্তা। [illegible] গলি, আরো সরু—[illegible] কষ্ট হয়। কি চাপা আর দমবন্ধ করা। [illegible] মাটি [illegible] তারই মধ্যে গলির মোড়ে মোড়ে তেলেভাজার দোকান। [illegible] এই সব সংকীর্ণ গলির মধ্যে আটকে পড়েছে যেন। কি স্যাঁতসেঁতে আর অস্বাস্থ্যকর। [illegible] [illegible] কোথাও [illegible] [illegible] [illegible] পুতুলের প্রাথমিক সাদা রং লাগাবার কাজ [illegible] [illegible] নেই, [illegible] কাজে [illegible] হয়েছে। এরই মধ্যে বাস করেন দুশো ঘর মৃৎশিল্পী। কুমারটুলিতে এখন [illegible] কর্ম চঞ্চল। দাঁড়িয়ে [illegible] মুখে [illegible] মত। এক-একটি ছোট ছোট চালায় ঠাসা রয়েছে অর্ধ সমাপ্ত সব মূর্তি। তারই মধ্যে কোথাও হ্যারিকেন জ্বেলে, কোথাও মোমবাতি প্রতিমার বুকের খুব কাছে নিয়ে গিয়ে ন্যাতা বোলাচ্ছেন বা নিখুঁত করছেন প্রতিমার গলা, বুক বা কোমরের স্ফীত অংশটি। কেউ আরো তন্ময় হয়ে বাঁশের ধারাল কাঁথ দিয়ে স্পষ্ট করছেন নারী দেহের সেই সব ভাঁজ যা বারোয়ারি পুজোর পৃষ্ঠপোষকদের উদ্ভুদ্ধ করবে এই সব মূর্তি কিনতে।

যাঁরা পূর্ববঙ্গ থেকে এসেছেন তাঁদের আর বাড়ি বলে কোন বস্তু নেই। কিন্তু যাঁরা শান্তিপুর, নবদ্বীপ বা কৃষ্ণনগর থেকে আসেন তাদের কর্মস্থলই কেবল এখানে। পরিবার ও প্রতিমা রয়েছে দেশে [illegible] ওঁরা যাবো যাবো যান এই [illegible]

[illegible]

বেরিয়ে। কয়েকটা দিন কাটিয়ে আসেন খোলা আলো-হাওয়ার মধ্যে, চারপাশ সবুজের দেখা-শোনা করে।

'এখানে কাজ করা যায় না। কি ছোট জায়গা। তার ওপর সর্বদাই জল পড়ছে। [illegible] কেমন ভেঙে পড়েছে দেখুন। [illegible] যে কতদিনের পুরনো তা কে জানে। [illegible] হয়ে গেছে। [illegible] তো [illegible] আছেই। আর নেই যে বিকেলের আগে আলো নেই এমন [illegible] আটটা হতে চলল আমার [illegible] নেই। এ [illegible] কদিন আর চালাব বলুন। আপনাকে যে বসতে দিই কোথায়। —একটানা কথাগুলো বলে চুপ করলেন কৃষ্ণনগরের সুধীর পাল। বেশ পরিষ্কার ধুতি গেঞ্জি গায়ে আর চোখে মোটা [illegible] চশমায় সুধীর পালকে বেশ উদ্বিগ্ন দেখাচ্ছিল।

আপনার পরিবার কি কৃষ্ণনগরেই থাকেন?

—'তা ছাড়া উপায় কি বলুন। এই নোংরা পরিবেশে তো মনও নোংরা হয়ে যাবে। এখানে কি কেউ থাকে। আমার, জানেন, কুমারটুলির প্রধান সমস্যা মনে হয় এর বসতির সমস্যা। বিশ্বব্যাংক থেকে সাহেবরা এসেছিলেন আমাদের অবস্থা দেখতে। আমি বললাম আমাদের একটু জায়গা দিন আর ছাদটা একটু পাকা করে দিন। আর কিছু চাই না।'

সুধীর পাল প্রতিমা তৈরীর মধ্যেও ভাস্কর্য বিস্মরা হরিনাথ দের একটি মূর্তি তৈরী করছেন তাঁর জন্ম-শতবর্ষ কমিটির জন্যে।

সমস্যা অবশ্য শুধু বসতির নয়। কুমারটুলিতে সমস্যা অনেক। সমস্যা টাকার বিদ্যুতের জিনিসপত্রের ক্রমবর্ধমান মূল্যের। এ সবই এদের নিজস্ব সমস্যা। কিন্তু শিল্পের একটি বড় সমস্যা আছে যা একান্তই শিল্পগত সমস্যা। দ্রুত ফ্যাশানের [illegible] কুমারটুলির

শিল্পীরা এখন হিমসিম খাচ্ছেন। নতুন জেনারেশন-এর কাছে এটা ততটা নয় যতটা প্রাচীনদের কাছে। অবশ্য কুমারটুলিতে এখন যৌবনের বাণ। নতুন একটি জেনারেশন কাজ করছেন এখন। ষাটের ঊর্ধ্বে শিল্পী খুব বেশী চোখে পড়ে না।

প্রায় শিশু বয়েস থেকেই এঁদের কাজ আরম্ভ করতে হয় বাবা-কাকার সঙ্গে। খড় বাঁধা মাটি লাগান, ন্যাতা দেওয়া—আরও কত খুঁটিনাটি কাজ শিখতে হয় প্রথমে। ২০।২২-এ এসে অল্প-স্বল্প কাজ করার স্বাধীনতা পান। যদিও স্বচ্ছন্দভাবে সেখানেও থাকে বাবার কড়া শাসন। ২৫ থেকে ৫০ বছর হল কাজ করার সবচেয়ে ভাল সময়। যৌবনের কল্পনার ও তেজে নিজেকে তখন অসুরের মত মনে হয়। মৃৎশিল্পীদের কায়িক পরিশ্রম করতে হয় অত্যন্ত কঠোরভাবে। তার জন্যে দরকার উপযুক্ত আহার, বিশ্রাম ও ব্যায়াম। চল্লিশের পরের আরও দশ বছর কাজ করেন অপেক্ষাকৃত অল্প দাপটের সঙ্গে। পঞ্চাশের পর থেকে শরীর শিথিল হতে থাকে। চোখের দৃষ্টিও ক্ষীণ।

'আমার বাবার মত আমরা কেউই খাটতে পারি না। এই সব ২০।২২ হাতের বড় বড় মূর্তি একাই করতে পারতেন। এখন বয়েস পঁচাশি বছর। থাকেন নবদ্বীপে। আমি বাবার কাছেই কাজ শিখি। আজকাল তো সে সব কাজের কোন কদর নেই। বছর কয়েক হল ওরিয়েন্টাল স্টাইলেরই চাহিদা বেশী।' —বললেন কেনা পাল। সংস্থার নাম মডার্ণ আর্ট স্টুডিও। কেনা পালকে অপ্রেক্ষাকৃত সচ্ছল মনে হল কুমারটুলিতে মূর্তি শিল্পের শ্রেণী বিভাগটি বেশ মজার।

১। বাংলা ঠাকুর, ২। আর্টের ঠাকুর, ৩। ওরিয়েন্টাল ঠাকুর।

বাংলার ঠাকুর হল ঐতিহ্যপূর্ণ এক চালার শিল্পীত প্রতিমা যার আবহমান কাল

[illegible]

ও আদলে প্রতিমার বাঁকুড়াতে পুজো হয়ে আসছে। এই সব প্রতিমা তৈরী হয় শাস্ত্রীয় মাপ-জোখ ও নিয়ম-কানুন অনুসারে। এখনও কখনও কোথাও দেখা ভক্তের সাধের ঠাকুর এই স্টাইলেই হয়। ভক্তে পানের মত মুখ, টানা চোখ, বর্ণখচিত বিশাল মুকুট ও পোষাকে স্পষ্টতই একটি একটি দেবীর ভাব আসে। তার ওপরে মূর্তিকে [illegible] ত্রিমাত্রিক গঠন থেকে ক্যাটি দ্বিমাত্রিক গঠনে নিয়ে যাওয়া এর অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য। ২। আর্টের ঠাকুরের সংজ্ঞা নির্ণয় করা বেশ কঠিন। এই স্টাইলের মূর্তি বলতে বোঝায় যা কিছু অপ্রচলিত, আধুনিক ও উদ্ভট। এখানে চূড়ান্তভাবে শাস্ত্রকে মেনে চলা হয়, যা ঠিক বাংলা ঠাকুরের বিপরীত। কম্পোজিশন-এর দিক থেকে এর একবৈপ্লবিক পরিবর্তন করেন শিল্পী জি পাল প্রায় ৬০ বছর আগে। মূর্তিগুলিকে তিনি এক চালার মধ্যে না রেখে তাদের দাঁড়িয়ে দেন বিভিন্ন দিকে।

ফলে এক চালার সেই প্রথাই ঘনবদ্ধতা ভেঙে গিয়ে প্রতিটি মূর্তি আলাদাভাবে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। কিন্তু অসামান্য প্রতিভাবান শিল্পী জি পালের পক্ষে যা সম্ভব হয়েছিল পরবর্তী অনুকরণকারদের হাতে তা গত ৬০ বছর ধরে কলকাতার বারোয়ারী পুজোর পৃষ্ঠপোষকদের চাহিদা ও মৃৎশিল্পীদের স্বেচ্ছাচারিতার মিশ্রণে এই ধারা পল্লবিত হতে হতে এখন এক অভাবনীয় বিকৃতিতে এসে পৌঁছেছে।

গোপেশ্বর পাল (জি পাল নামেই প্রসিদ্ধ) ছিলেন কুমারটুলির এক অসামান্য প্রতিভা। মাটিকে নিজের আয়ত্তে আনার এক ঐশ্বরিক ক্ষমতার অধিকারী হন অল্পবয়স থেকেই। মাটির এই প্লাস্টিক রূপ বিষয়ে তিনিই প্রথম সচেতন হন কুমারটুলির মৃৎশিল্পী সমাজে। এর

কলকাতায় যে ধারাটি কৃষ্ণনগরের মৃৎশিল্পে এ যাবৎ কাল সযত্নে ছিল তার প্রতিফলন প্রকাশ দেখা গেল জি পালের করা ঠাকুর দেবতার মূর্তিতে, জীবজন্তু, ফল, পাখি ও মানুষের মুখের নানা অভিব্যক্তির মধ্যে। তাই ১৯২৬ সালের ইংরেজ সরকার লন্ডনের Wembley Park এর প্রদর্শনীতে যখন গোপেশ্বর পালকে মনোনীত করে পাঠান তখন DAILY TELEGRAPH এই রকমভাবে খবরটি ছাপিয়ে বিস্ময় প্রকাশ করে :

'Mr Gopeswar Pal at work
in Bengal Court, Indian
Pavilion.
Lightning Sculptor
Genius from Bengal Exhibits his
Skill at Wembley'.

ফলে জি পালের কাজে শাস্ত্রসম্মত চূড়ান্ত প্রকাশ দেখা গেলেও তাঁর প্রতিভার দ্যুতি কখনো কোন বিকৃতিকে প্রশ্রয় দেয় নি। মাঝে মাঝে তাঁর এই বাস্তব-নিষ্ঠা পাগলামির পর্যায়ে গিয়ে পৌঁছত যখন নিখুঁত মহিষের নাড়ি-ভুঁড়ির গঠন ও রঙ যথাযথ হয়েছে কিনা তা নিশ্চিত হওয়ার জন্যে মেডিকেল কলেজের সার্জেনের শরণাপন্ন হতেন অথবা ময়ূরের পালকের অবিকল রঙ আনার জন্যে সারা দিন চিড়িয়াখানায় কাটাতেন। বরং তাঁর কাজেই প্রথম বোঝা গেল যে প্রতিমার গঠন বাস্তব-নিষ্ঠ হয়েও তা দেবীত্বে কিভাবে উন্নীত হতে পারে। কারণ এরও একশো বছর আগে কলকাতার বারোয়ারি পুজোর যে বর্ণনা হুতোম প্যাঁচার নকশায় বর্ণনা করা হয়েছে তা পড়লেই জি পালের কৃতিত্ব বিষয় আমরা নিশ্চিত হই।

বর্ণনাটি এই রকম—

'বারোইয়ারি প্রতিমেখানি প্রায় বিশ হাত উঁচু — ঘোড়ার চড়া হাইল্যাণ্ডের গোরা, বিবি, পরী ও নানাবিধ চিড়িয়া, সোলার ফুল ও পদ্ম দিয়ে সাজানো—মধ্যে মা ভগবতী জগদ্ধাত্রী মূর্ত্তি,—সিঙ্গির গা রূপোলী গিলটি ও হাতী সবুজ মখমল দিয়ে মোড়া। ঠাকুরুণের বিবিয়ানা মুখ—রঙ ও গড়ন আসল ইহুদী ও আরমানী কেতা, ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর ও ইন্দ্র দাঁড়িয়ে জোড় হাত করে স্তব কচ্চেন। প্রতিমার উপর ছোট ছোট বিলাতী পরীরা ভেঁপু বাজাচ্চে—হাতে বাদশাই নিশেন ও মাঝে ঘোড়া সিংগিওয়ালা ক্রাইনের ইউনিফরম ও ক্রেস্ট।'

কেনা পালের এবং তার সঙ্গে আরো অনেকের কাজ দেখে ওপরের হুতোমী বর্ণনাটি আবার অত্যন্ত সত্য হয়ে ওঠে আধুনিক কালের পরিপ্রেক্ষিতে। গত কয়েক বছর কলকাতার পুজোর প্রতিমা না দেখায় এবারে মূর্তি দেখে আমাকে একটু ধাক্কা খেতে হল। বেশ কিছু দিন ধরেই প্যাণ্ডেল এবং আলোর জৌলুসে মূর্তিকে যেভাবে অবহেলা করা হচ্ছিল তার একটি অন্য রূপ এবারের পুজোর মূর্তিগুলিতে দেখা গেল। অবশ্য খবর নিয়ে জানলাম যে কয়েক বছর ধরেই চলছে এই রীতির জনপ্রিয়তা। এবারেও মূর্তিকে ভীষণভাবে উপেক্ষা করা হয়েছে কিন্তু পরিবর্তে নিপুণ যত্নে তৈরী হয়েছে অসুর ও সিংহ।

বুঝতে অসুবিধে হয় না যে গত এক দশকে মধ্যবিত্ত বাঙালীর সমাজ জীবনে হিপ্পির স্টাইলটি কত স্থায়ী হয়েছে। নকশাল-নবকংগ্রেস ও অতীতে শিক্ষিত চুল-দাড়ি ট্রাউজার্স শোভিত কেতা-দুরস্ত বিপ্লবী বিলাসীদের মিশ্রিত বাঙালী রূপটি। অবিকলভাবে মূর্ত হয়েছে অসুরের নানা ভঙ্গীতে। অসুরের চেহারায় হিপ্পির উপস্থিতিটাই তো স্বাভাবিক। এবং তা এত দিন একটি ক্যাসিকাল রূপও পেয়েছিল। কিন্তু এবারে অসুরের প্লাবিত চুল ও দীর্ঘ পরিপাটি জুলপি আমাদের কেবল এক জোড়া বেল-ট্রাউজার্সের অভাবের কথাই মনে করিয়ে দেবে। মনে হচ্ছে যেন অসুর ড্রেসিং টেবিল থেকে প্রসাধন সেরে ওয়ারড্রবের দিকে যাবার মুখে আক্রান্ত হয়েছে। এবং সেই আক্রমণ মোকাবিলা করছে চুলের পারিপাট্যকে বিসর্জন দিয়ে নয়। হয়ত হেয়ার ড্রেসারের জন্যেই সম্ভব হয়েছে এই ধরনের অবাস্তব কাণ্ডটি। কেনা পালের অসুর ফোরগ্রাউণ্ডে থেকে বড় হয়ে আমাদের প্রধান মনোযোগের বস্তু হয়ে উঠেছে। দুর্গা অনেক জায়গাতেই বেশ অসহায়। একটি জটিল কম্পোজিশন আছে কেনা পালের চালাতেই। দু পায়ে ভর দিয়ে সিংহ সোজা দাঁড়িয়ে আক্রমণ করছে অসুরকে এবং ততোধিক বিক্রমে চুল ও জুলপিকে অক্ষত রেখে অসুর আক্রমণ প্রতিহত করছে। দুর্গাকে এখানে মনে হচ্ছে আধুনিক মুষ্টিযুদ্ধের আসরে কোন নারী দর্শক। শুধু কেনা পাল নয় কুমারটুলিতে অনেকের কাজেই দেখা গেল দুর্গার অবস্থা বেশ শোচনীয়। কিন্তু এ সব সত্ত্বেও যে একটি ব্যাপারে বিস্মিত না হয়ে কোন উপায় থাকে না তা হল এই অল্প পরিসরে এই সব বিরাট মূর্তিকে আয়ত্তের মধ্যে আনা। এটা যেন মিকেলাঞ্জেলোর সিস্টিন চ্যাপেলে শুয়ে কাজ করার মত। লক্ষ টাকায় নির্মিত আলোকোজ্জ্বল প্যাণ্ডেলের মধ্যে মূর্তি কিভাবে থাকবে এবং দর্শকের থেকে তার দূরত্ব ও উচ্চতার এই অ[illegible], ঘিঞ্জি গলির মধ্যে বসে তা সঠিক অনুমান করা যে শক্ত তা আশা করি বুঝিয়ে বলার দরকার হবে না।

কুমারটুলির তৃতীয় ভঙ্গীটির নাম ওরিয়েন্টাল ঠাকুর। ওরিয়েন্টাল ঠাকুর অনেকটা বাংলা ঠাকুর ও আর্টের ঠাকুরের মাঝামাঝি রূপ। যেন দুই রীতির মধ্যে যোগসূত্র। এই রীতি হল অজন্তার চিত্রিত নারীদের অনুকরণে রচিত মূর্তি। বিষ্ণু দের ভাষায় বলা যায় 'স্তনচূড়া দিল ক্ষীণ কটিতটে ছায়া।' এই রীতির প্রধান বৈশিষ্ট্য হল অজন্তার ঢং-এ মূর্তিটি করার পর সারা গায়ে, হাতে, মুখে এমন কি জামা-কাপড়েও বোনে বড়ির বোঁদের মত চাপ চাপ মাটির অলংকার বসিয়ে দেওয়া। এবং অলংকারগুলি সূক্ষ্ম না হওয়ায় তার ভারে মূর্তিটি প্রাণ হারিয়ে ভোঁতা হয়ে যায়। ওরিয়েন্টাল বিষয়ে জনসাধারণের ধারণার এটি একটি নিদর্শন। এবং এই রীতির চাহিদাই কয়েক বছর হল খুব বেশী।

'এই স্টাইল ব্যাপারটি কি জন-সাধারণের ওপর আপনারা চাপান না কি জনসাধারণ আপনাদের ওপর চাপায় ?

এই প্রশ্ন একাধিক শিল্পীকে করে আমার মোটামুটি এই ধারণা হয়েছে যে, হয়ত কোনবার বিশেষ কোন বারোয়ারি প্রতিমা দর্শকসাধারণের মনে ধরল অর্থাৎ সেই প্যাণ্ডেলে ভিড় হল, কাগজে ছবি ছাপা হল বা শ্রেষ্ঠ মূর্তি হিসেবে সরকারী পুরস্কার মিলল। ব্যস, পরের বছর সমস্ত পুজো কমিটি আব্দার ধরল, 'ঐ রকম মূর্তি করে দিতে হবে আমাদের।' প্রথম বছরটা হয়ত শিল্পীরা অতটা প্রস্তুত হতে পারলেন না তার পরের বছর ভরিয়ে দিলেন সারা শহর সেই মূর্তিতে। সাহিত্য শিল্প থেকে আরম্ভ করে পোষাক-প্রসাধন পর্যন্ত জনরুচির চরিত্রটি একই রকম।

গত গত বছর একটি মূর্তি থেকে সাড়ে সাত হাজার টাকাও পাওয়া গেছে। অবশ্য রমেশ পালের মূর্তির দাম আরও বেশী—পনের হাজার পর্যন্ত।'

'কার করা মূর্তি থেকে সাড়ে সাত হাজার টাকা পাওয়া গেছে ?'

'এই আমাদেরই'—ঈষৎ লাজুক হাসি হেসে জবাব দিলেন তরুণ শিল্পী বলরাম পাল। 'আমরা পূর্ববাংলা থেকে আসি বড় দাঙ্গার পর।'

বলরামের পিতা গোরাচাঁদ পালের বয়স এখন ৬০ বছর। পূর্ববাংলায় জাত ব্যবসা ছিল হাঁড়ি-কলসী গড়া। কিন্তু যৌবনে মামা সনাতন পালের কাছে মূর্তি গড়া শেখেন। তারপর থেকে মূর্তিই গড়েন। দেশ বিভাগের পর কলকাতায় এসে সরকারী সাহায্য প্রত্যাখ্যান করেন ক্যাম্পে থাকার ভয়ে। কুমারটুলিতে এসে নতুন জীবন আরম্ভ করলেন কঠোর সংগ্রামের মধ্যে। গোরাচাঁদবাবুর সাত ছেলের চারজন আছেন মূর্তি গড়ার কাজে। বলরামের কাজ অত্যন্ত পরিচ্ছন্ন এবং কোথাও বাহাদুরী দেখাবার চেষ্টা নেই। যদিও আর্টের ঠাকুরের যা যা সুলক্ষণ তা সবই রয়েছে তাঁর কাজে। অন্য তিনজনের একজন ব্যাংকের কর্মচারী ও আর একজন একটি বীমা কোম্পানীর দালাল এবং একেবারে ছোটজন সরকারী আর্ট কলেজে ভর্তি হবার চেষ্টা করছেন।

'আপনারা কেউ আর্ট কলেজে যান নি ?'

বলরাম পাল দৃঢ়ভাবে উত্তর দেন আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে — 'আমাদের কখনো আর্ট কলেজে যাবার দরকার হয় নি। বাবার কাছেই সব শিখেছি। ছোটবেলা থেকে বাবার সঙ্গে কাজ করছি। ছোট ভাইকে কলেজে পাঠাতে হল এই জন্যে যে আর্ট কলেজের সার্টিফিকেট না থাকলে সরকারি অর্ডার পেতে অসুবিধে হয়। তাই প্রায় সব ঘর থেকেই একজন করে আর্ট কলেজে পড়তে যায়।

এ ছাড়া আর কি অসুবিধে ?

'অসুবিধে তো অনেক। জিনিসপত্রের যা দাম বাড়ছে তাতে মূর্তির সংখ্যা বাড়লেও লাভ কমে গেছে। গত বছর যেমন এক ঠেলাগাড়ি মাটির দাম ছিল ১২ থেকে ১৫ টাকা এবারে তার দাম হয়েছে ২০ টাকা। বাঁশ ছিল ৬ টাকা এবারে হয়েছে ৮ টাকা। কাঠ, খড়, রঙ, সুতলী—সবেরই [illegible] দাম বাড়ছে। মাটি [illegible] বেড়েছে। যে মূর্তি আমরা [illegible] টাকায় কিনলাম তা তৈরী করতে খরচ লাগবে আরও ২০ টাকা, মজুরী আর পানের ভুবি নিয়ে। কিন্তু সবচেয়ে বেড়েছে গরান কাঠের দাম। গরান আসে সুন্দরবন থেকে। এবারে সরকারী হুকুমে কাঠ কাটা বন্ধ হওয়ায় দাম খুব চড়া। অথচ শক্ত গরান কাঠ না হলে মূর্তি দাঁড়াবে কি করে। তার পর তো এবারে নতুন ঝামেলা বৃষ্টি। এই বৃষ্টিতে মূর্তি শুকোতে চাইছে না। তাই আগুনে সেঁকে শুকোতে হচ্ছে। রাত্রে কাজ করা তো বন্ধই হয়ে গেছে বিদ্যুতের অভাবে। তবু যাই [illegible]

নব্বই বৎসরের মৃৎশিল্পী বিপিন পাল

সেই ১৯৭০-৭১ থেকে। তাদের তো আর ব্যাংক টাকা দেবে না। নকশাল হাঙ্গামার সময় সেই দুটো বছর যে আমাদের কি ক্ষতি হয়েছে তার ফল এখনও বহু ঘর ভোগ করছে। ব্যাংক ধার দিচ্ছে বটে কিন্তু তা প্রয়োজনের তুলনায় কম। বছরে ২৫টি দুর্গা, ৩০।৩৫টি কালী, ১৫০টি সরস্বতী ও ছোট লক্ষ্মী-গণেশ অন্যান্য প্রতিমা করে চলে যায় আমাদের। বাবা তো এখন আর কাজ করতে পারেন না।'

গোরাচাঁদ পালের মত আরও অনেক মৃৎশিল্পী দেশ বিভাগের পর কুমারটুলিতে এসে বাসা বাঁধেন ঠিক যেমন দুশো বছর আগে কৃষ্ণনগর থেকে শিল্পীরা এসে বসবাস আরম্ভ করেছিলেন। বলাই বাহুল্য প্রথম দিকে এখানে এসে স্থানীয় শিল্পীদের জীবিকার ভাগ বসান খুব সহজ হয় নি। তাই পুরনো কুমারটুলি মৃৎশিল্প সমিতির সঙ্গে যোগ না দিয়ে পূর্ববঙ্গের শিল্পীরা নিজেদের একটি সমিতি গঠন করেন এঁদের বিশেষ ধরনের সমস্যা সমাধানের জন্যে। অনেক দিন পরে এই পূর্ববঙ্গ পশ্চিমবঙ্গের ভাগটি দেখে বেশ মজা লাগল। সাধারণভাবে এক কলকাতার [illegible] ছাড়া বাইরের এই ভাগটি সচরাচর চোখে পড়ে না।

'আপনার বয়স কত ?'

'এই প্রায় নব্বই। প্রায় কেন ঠিক নব্বই।'

[illegible] পরিষ্কার শান্তিপুরী বাংলায় উত্তর দিলেন শিল্পী বিপিন পাল। শীর্ণ, বয়সের ভারে একটু নুয়ে পড়েছেন কিন্তু খুব জোরে হাঁটতে পারেন এখনও। স্পষ্ট, তীক্ষ্ণ উচ্চারণ তার সঙ্গে অবিশ্বাস্য রকমের উজ্জ্বল স্মৃতি। তাঁর কাছে বসে গত একশ বছরের কুমারটুলির ইতিহাস শোনা এক রোমাঞ্চকর অভিজ্ঞতা। দশ বছর বয়সে বিপিনবাবু কলকাতায় আসেন পিতা গোপালচন্দ্র পালের সঙ্গে।

'আমার ঠাকুরদা উমেশ পালও কুমারটুলিতে কাজ করতেন। দশ বছর বয়সে নৌকো করে বাবার সঙ্গে কুমারটুলি ঘাটে এসে নামি। বাড়ির জন্যে মন কেমন করত

নব্বই বছরের বিপিন পালের স্ত্রী মারা গেছেন মাস দুয়েক আগে বিরাশি বছর বয়সে। তাই একটু উদাসীন থাকেন আজকাল। সারা জীবন বহু শোক ও দুঃসহ দারিদ্র্যের মধ্যে কেটেছে বলে কোন ক্ষোভ নেই।

'আমি তো রেডি হয়ে আছি। মা যেদিন ডাকবেন চলে যাব। কিছুই পরোয়া করব না।'

'বেশ শান্তিতে কাটিয়েছি আমি। মাঝে মাঝে ভয়ানক অসুবিধের মধ্যে পড়তে হয়েছে কিন্তু মা সব কিছু উদ্ধার করে দিয়েছেন। জামাই মারা যাবার পর বাচ্চাদের নিয়ে মেয়ে উঠল আমার কাছে। তখন বাড়িতে ১২।১৪ জন লোকের খাওয়া। কিন্তু কোন অসুবিধে হয় নি।'

'আমার মা এই তো কিছুদিন আগেও স্বপ্নে দেখা দিলেন। পরিবারের সঙ্গে মাঝে মাঝে ঝগড়া হত কিন্তু মা স্বপ্নে এসে সব মিটিয়ে দিতেন।'

'একবার স্বপ্নে বললেন, বিপিন সব ঠিক হয়ে যাবে।'

'আমার কোন ছেলে নেই। শান্তি আমার মেয়ের ছেলে। খুব ভাল কাজ করছে। কিন্তু আমি বাংলা ঠাকুর ছাড়া পারি না। ইংরিজী ঠাকুর গড়তে পারি না। কোনদিন ও কাজ করব না। আমি এই রকম [illegible] এখন সব দেখি মানুষের মত [illegible]। কত জায়গায় দেখি ঠাকুর [illegible] লোকেই নিয়ে গেল ঠাকুর [illegible]—[illegible] ঠাকুর। আমি চোখ আঁকার [illegible] ছিলাম। মা চাইতেন আমি চোখ আঁকি।

[illegible] আঁকতে পারেন ?

[illegible] আমাদের [illegible] হয়। [illegible] মাথার উপর চারদিক [illegible] নয়। তবে এখন পারব না। চোখে দেখি না [illegible]। একদিন সকালে আসবেন [illegible] নিয়ে [illegible]।

কি খান সারা দিন ?

'সকালে [illegible] দিতে। [illegible] ভাত। মাছ মাংস রান্না [illegible] দিলে খাই। খুব নরম [illegible] নেই তো। আবার [illegible] দুধ রুটি।'

[illegible] করেন এখনো।

'কাল গোটা পাঁচেক প্রতি বছর। মা চান বলেই করি। এখানে এখনো আমাকে [illegible] কিনি নি। এই জন্য সবাই লোকেই আমাকে [illegible]। চোখটাই সবচেয়ে ঝামেলা করে। আর কদিনই বা কাজ করব। মা ডাকলেই চলে যাব।'

এবং বিপিন পাল যেদিন চলে যাবেন কুমারটুলিতে সেদিন [illegible] বাংলা ঠাকুরের যুগও শেষ হবে।

সাড়ে তিন হাজার বৎসর ধরিয়া এই উৎসব চলিয়া আসিতেছে। দুর্গোৎসবের মত,

পেলে দ্য সকার কিং

রূপক সাহা

'পেলের সম্পর্কে আর কিছু বলার বাকী আছে কি? বিশ্বের সবচেয়ে কমপ্লিট ফুটবলার উনি যার মধ্যে বিন্দুমাত্র খুঁতও নেই। পেলে আমাদের সময়ের শ্রেষ্ঠ খেলোয়াড়—এবং সম্ভবত সর্বকালের। ওর সহজ গোলের অভিজ্ঞতাই—ওর অসাধারণ নিপুণতার প্রমাণ'—বলেছেন ইংল্যান্ডের প্রাক্তন অধিনায়ক ববি মুর।

আমি সকার স্টোরি বইটিতে ববি তার আত্মকথনে স্বীকার করেছেন—'পেলের অসাধারণ দক্ষতার স্মৃতিগুলো স্মরণ করে এবং নিজের উপলব্ধি থেকেই একথা বলছি। বেশ মনে আছে, একবার মাত্র কাঁধ ঝাঁকুনিতে ধোকা দিয়ে আমাকে উল্টোদিকে ছিটকে ফেলে কত সহজে বল নিয়ে চলে গিয়েছিলেন তিনি—অথচ সেই মুহূর্তে ওকে সাইড লাইনের কাছে কোণঠাসা করে আমি ট্যাকল করার ফিকির খুঁজছিলাম।'

'পেলে অসাধারণ, অতিপ্রাকৃত। ব্রাজিল টিম থেকে ওকে সরিয়ে নিন—দেখবেন, আমরাও ব্রাজিলের চেয়ে কোন অংশে কমতি নই।'

চৌষট্টি সালে রিও-র মারকানা স্টেডিয়ামে ব্রাজিলের কাছে ৫—১ গোলে বিধ্বস্ত হবার কারণ জানাতে গিয়ে এই-ভাবেই ববি মুর একবার সাংবাদিকদের কাছে মন্তব্য করেছিলেন। ওর নেতৃত্বে ইংল্যান্ড তখন ছেষট্টির বিশ্ব কাপ [illegible]র স্বপ্ন দেখছে। মারকানা স্টেডিয়া[illegible]সেই ম্যাচটির দু বছর পর অবশ্য ববি তার দেশবাসীকে উপহার দিতে পেরেছিলেন জুলে রিমে কাপ।

শুধু ববি মুরই নন, বিশ্বের প্রথম সারির বহু ফুটবল নায়কও পেলে সম্পর্কে তাদের উচ্ছ্বাস চেপে রাখতে পারেননি। ববি চার্লটনের কথায়—'আমার দেখা সবচেয়ে উত্তেজক খেলোয়াড় পেলে। ওর নামের চারপাশে যা কিছু শব্দ্যামার তার তিনি যোগ্য। ওর খেলাই তাকিয়ে দেখতে ইচ্ছে করে—কোন শৈলীতে উনি ফুটবল খেলেন। ফুটবল ওর কাছে কবিতার মতো ছন্দোময়।'

ববি বলেছেন—'পেলের খেলার সব-চেয়ে বৈশিষ্ট্য হলো বোধহয়, ওর সেই সব গোল করার ক্ষমতা যখন তার মুহূর্ত মাত্র আগেও গোলের ক্ষীণ সম্ভাবনা ছিল না। মাঝে মাঝে মনে হয়, ফুটবলের জন্মই হয়েছিল হয়তো এই যাদুকর খেলোয়াড়ের জন্য।'

ফুটবল দুনিয়ার আরেক তারকা জিওফ হার্স্ট অভিভূত হয়ে বলেছেন—'পেলে সম্পর্কে আমি শুধু পাগলের মতো বকবক করে যেতে পারি। ওর মতো কেউ—একটা জীবনে একবার আসে কিনা সন্দেহ। তোমার দলে নিয়ে ওকে শুধু বল বাড়িয়ে দেবার ধান্দা করো এবং তারপর প্রার্থনা করো ওর বাকী কাজটা করার।'

'ইউরোপের কালো মুক্তো' ইওসেবিওর ভাষায়—'পেলের খেলা—আমি কেবল স্বপ্নেই খেলে থাকি। আমাকে যারা ওর চেয়েও বড় বলছেন, তাদের জানাই—কোনদিনও আমি ওর সমান হতে পারব না। আমাকে বড় বানাতে গিয়ে, দয়া করে ওকে ছোট করবেন না। পেলে ফুটবলের রাজা, বাদশা—আমি গোলাম মাত্র।'

জার্মান মুলের কথায়—পেলেকে

দেখার আগে বিশ্বাস করতাম না একজনকে নিয়ে একটা ফুটবল টিম তৈরী হতে পারে। পেলে সমেত ব্রাজিল সবসময়ই বিপজ্জনক. উনি ছাড়া এমন একটি দল—যাকে হারানো যায়। এডসন অ্যারেন্টাস ডো ন্যাসিমেন্টো নামটা বর্ণবহুল কিন্তু কোনমতেই নামের মালিকের চেয়ে নয়। কেউ যখন পেলে শব্দটি উচ্চারণ করে তখন সবাই বুঝে যায় কার সম্বন্ধে বলা হচ্ছে। এটা তার যশের প্রতিই শ্রদ্ধাপ্রকাশ।'

একজন নামী ব্রিটিশ ফুটবল সমালোচক লিখেছেন—স্ট্যানলি ম্যাথুজ, গ্রীভস, হিডেকুটি, পুসকাস এবং স্টিফেনয়ো—প্রত্যেকেই নিজ নিজ বৈশিষ্ট্যে সমুজ্জ্বল কিন্তু একমাত্র পেলেই এদের দক্ষতার নির্যাসে তৈরী।

আরেক ফরাসী সাংবাদিক পেলে সম্পর্কে তার অনুভূতি এইভাবে ব্যক্ত করেছেন—'ওর প্রথম দেখার পর থেকে একমাস শুধু ভেবেছিলাম কি লিখবো: ওর কোন উপমা খুঁজে পাইনি—উনি অতুলনীয়।'

পেলের শ্রেষ্ঠত্ব সম্পর্কে সন্দিহান ছিলেন না আটান্নর বিশ্বকাপে ব্রাজিলের কোচ ভিসেন্ট ফিওলাও। ফুটবলের ওই সেরা লড়াইয়ের আসরে ওকে নামিয়েছিলেন ফিওলাই অনেকের আপত্তির তোয়াক্কা না করে। ফিওলা বলেছেন—'পেলের মতো বল নিয়ে যা খুশি তাই করার ব্যাপারটা আর কারো আসে না। চার্লটন, মুর ও ইউসেবিও সকলেই উঁচু জাতের ফুটবলার কিন্তু পেলের মতো নন।'

সুইডেনের, সেই আসর থেকে জুলে রিমে কাপ প্রথম নিয়ে এসেছিলেন ফিওলা ব্রাজিলে। ওখানেই অভিষেক হয়েছিল সতের বছরের তরুণ এক ফুটবল যাদুকরের। বিশ্বের বাঘা বাঘা ফুটবল সাংবাদিকরা সেদিন পেলের শিল্প সমন্বিত খেলার বর্ণনা দিয়েছিলেন সমস্ত আবেগ উজাড় করে দিয়ে—'পেলে ভোজবাজি জানা একজন ফরোয়ার্ড, মেধাবী ড্রিবলার। উনি অনতিক্রম্য গতিতে ধোকা দেন, এবং বল ঘোরান। বল যখন শূন্যে তখন কেউটের ছোবলের মতো আঘাত করার ক্ষমতা আছে ওর হেডে।'

পেলের ক্লাব সান্টোস ইওরোপে যখন তাদের সদর্প অভিযান চালাচ্ছিল তখন একটি টিমের ট্রেনার বলেছিলেন—'ওদের অনুকরণ করার কথা অর্থহীন। আমাদের ছেলেরা ওদের ছাঁচে তৈরী নয়। আমার ছেলেরা যদি পেলের মতো চটপটে ও প্রতারণাময় ড্রিবলিং, ট্রুইস্টিং, ফেইন্টিং করতে যায় তাহলে প্রতিটি পেশীতে টান ধরবে: পেলে একজন যাদুকরের মানুষ যার ভেতরটা লোহার তৈরী। ওকে মাঠে এতো আঘাত করা হয় তবুও উনি ফিরে ফিরে আসেন... কোন মানুষের সাধ্য নেই ওকে আটকায়।'

পেলের সম্বন্ধে প্রশস্তি গেয়ে বহু কোটি শব্দ উচ্চারিত হয়েছে এ যাবৎ কিন্তু সেই ব্রিটিশ সাংবাদিকের কলমে ওঠা কলমটির বোধহয় তুলনা নেই যিনি লিখেছিলেন—'ফুটবল রাজ্যো—যার সীমায় সীমায় বিশ্বের সব দেশগুলোই বর্তমান—একমাত্র রাজা পেলে। ওর ওপরে আছেন সেই আধ্যাত্মিক শক্তি যিনি স্বর্গেরও শাসনকর্তা।'

পেলের মতো ফুটবলার পৃথিবীতে জন্মায়নি—হয়তো জন্মাবেও না। উনিই সেই খেলোয়াড় যার সম্বন্ধে তুলনা বোঝাবার জন্য কিছু পাওয়া যায় না। ওর খেলা চোখ ধাঁধিয়ে দেয়। যাবতীয় বিদ্বেষ, হানাহানি, যান্ত্রিকতা আর রাজনীতির ঊর্ধ্বে ওর ইমেজ। বিশ্বের প্রতিটি কোণে ওর জন্য সাদর অভ্যর্থনা অপেক্ষা করে। আকাশ ছোঁয়া জনপ্রিয়তার মাঝে বসে উনি নিজের সম্বন্ধে কি বলেন ?

একবার উনি বলেছিলেন—'নিজের সম্বন্ধে আর ভাবি না। আমি এখন শুধু ঈশ্বর আর আমার চারপাশের লোকের কথাই ভাবি। আমি কি তাই-যা লোকে বলে ? মাঝে মাঝে মনে হয় আমি হয়তো সেই লোকটি নই। কিন্তু একটা ব্যাপারে আমি নিশ্চিত যে আমি একলা নই। আজ যা হয়েছি তার জন্য আমি অনেকের কাছে ঋণী। ওরা আমাকে নানাভাবে অনেক কিছু শিখিয়েছেন।'

'আমি আজ যা হতে পেরেছি তার কারণ আমি সাহায্য উৎসাহ ও পরামর্শ পেয়েছি। আমাকে শেখানো হয়েছিল, উত্তেজিত এবং সমালোচনা করা হয়েছিল। আমি বিশ্বাস করি না যে, জন্মগত ফুটবলার বলে কিছু আছে। হয়ত কেউ সহজাত কিছু স্কিল এবং প্রতিভা নিয়ে [illegible] পারেন কিন্তু [illegible] এটা আমার কা[illegible] মনে হয় যে—ফুটবলার [illegible] জন্মায়। সাফল্যটা কোন দুর্ঘটনা নয়। ওটা আসে কঠিন পরিশ্রম, অধ্যবসায়, শেখার ইচ্ছে এবং সর্বোপরি শেখার জন্য ভালবাসা এবং আত্মত্যাগ থেকে।'

ফুটবল সম্পর্কে এই 'সুপারম্যান'

না কেন ওর আটোগ্রাফ চাইতে পেলে নারাজ হন না। লোকে ওকে বড়ো বড়ো খেলোয়াড়ই বলুক না কেন—ট্রেনিংয়ের সময় পেলে শুভার্থীরা মাঠ ছেড়ে চলে না গেলে ড্রেসিং-রুমে ঢোকেন না। ছেঁকে ধরা সাংবাদিকরা যত প্রশ্নই করুক না কেন—পেলে প্রতিটির উত্তর না দিয়ে উঠে যান না। সবচেয়ে বড় কথা, উনি ঘৃণা করেন ওকে যখন বিশ্বের শ্রেষ্ঠ ফুটবলার বলে ডাকা হয়।

ফুটবল বোদ্ধারা বলেন—'যেখানে সেরা ফুটবলারদের শেষ, সেখানেই পেলের শুরু।' ওকে আটকাতে না পেরে আঘাত করে সরিয়ে দেবার প্রচেষ্টা বহুবার হয়েছে। ওর ডান হাঁটু—যা দিনের পর দিন মার-কুটে খেলোয়াড়দের শিকার হয়েছে—দেখে এক স্পেশালিস্ট বলেছিলেন পঞ্চাশোর্ধ্ব ব্যক্তিদের হাঁটুর সঙ্গে তুলনা করা যায়। খ্যাতির মূল্য পেলে এইভাবে দিয়েছেন, এখনও দিচ্ছেন। পেলে বিক্ষুব্ধ হয়েছেন? প্রতিশোধ নিতে চেয়েছেন? তাহলে এই তিনটি ঘটনা আপনাদের জানানো দরকার। চৌষট্টিতে ব্রাজিল-আর্জেন্টিনা ম্যাচে পেলে আঘাতের পর আঘাত সহ্য করতে করতে একসময়ে ধৈর্য হারিয়ে ফেলেছিলেন। দর্শকদের অবাক করে একসময় ঘুষি মেরে বিপক্ষের একজন খেলোয়াড়—মেসিয়ানোর নাক ফাটিয়ে দিয়েছিলেন। কেন এমন করলেন? খেলার শেষে ভাঙ্গা গলায় স্বীকার করেছিলেন উনি—'আমাকে মেরে বসিয়ে দেবার চক্রান্ত হয়েছিল যাতে এই ম্যাচের পর সান্টোসের হয়ে লীগের পরবর্তী গুরুত্বপূর্ণ খেলাটি না খেলতে পারি। যখন দেখলাম শোনা কথাটা সত্যিই—আমাকে খেলতে দেওয়া হচ্ছে না, শুধু ফাউল করা হচ্ছে তখন আর নিজেকে ধরে রাখতে পারিনি—পাল্টা জবাব দিয়ে বসেছি। আর বোধহয় আমার ফুটবল খেলা উচিত নয়।'

পরের বছর জানুয়ারী মাসে সান্টোস-বোটাফোগোর খেলায় পেলেকে অসহিষ্ণু হতে দেখা গিয়েছিল। প্রথম থেকে ওকে ফাউল করা হচ্ছিল এবং যখনই উনি বিপক্ষের গোল খুঁজে পাচ্ছিলেন তখনই পেছন থেকে ধাক্কা মেরে ফেলে দেওয়া হচ্ছিল। শেষ পর্যন্ত পেলে স্থৈর্য রাখতে পারেন নি—রেফারীর চোখের সামনেই পাল্টা মার দিয়েছিলেন। তাকে মাঠের বাইরে পাঠানো হয়েছিল। পেলের খুঁড়িয়ে হাঁটা মূর্তিটি যখন ড্রেসিংরুমে যাচ্ছিল তখন দর্শকরা রেফারীকে অভিসম্পাত করছিলেন। এর পরের ইতিহাসটা অন্যরকম। ব্রাজিলের ফুটবল সংস্থা রেফারীর সিদ্ধান্তে পেলের অসন্তুষ্টিতে একটি সভা ডাকেন এবং সেখানে প্রমাণ হয়, পেলে নির্দোষ। রেফারী আর্মান্দো জানফেরাই তিরিশ দিনের জন্য সাসপেন্ডেড হন।

তৃতীয়বার এই ধরনের অনভিপ্রেত ঘটনাটি ঘটে পেলের সহস্রতম গোলের ঠিক পরের ম্যাচটিতেই। সান্টোস খেলছিল পোর্তো-গেজের সঙ্গে। শুরুর আগে পেলেকে ফুটবল রাজা হিসেবে অভিষিক্ত করা হয় সোনার পাতার মুকুট পরিয়ে। সেদিন ম্যাচের সময় পেলে বল ধরলেই দর্শকরা পাগলের মতো চীৎকার করছিলেন। তারপর একত্রিশ মিনিটের মাথায় সেই অবিশ্বাস্য ঘটনাটি ঘটে। বিপক্ষের গোলকীপারকে ধাক্কা মারায় পেলেকে মাঠ থেকে বার করে দেওয়া হয়। উনি মাথা পেতে সিদ্ধান্তটি স্বীকার করে নেন। ঐদিন মাঠ থেকে পেলেকে বার করে দিয়ে রেফারী এক দুঃসাহসিক কাজ করেছিলেন। সেদিন টগবগে জনতা হয়ত একটি খণ্ডযুদ্ধ বাধাতো কিন্তু ফুটবল রাজা নিজেই রেফারীর সিদ্ধান্ত মেনে নিয়ে তার অনুগত প্রজাদের শান্ত করেছিলেন।

ফুটবল মাঠে অতিপ্রাকৃত পেলে—সাধারণ জীবনে আর পাঁচটা মানুষের মতোই অনুভূতিপ্রবণ। গোল করার পর ওর লাফ দিয়ে ফিরে আসার ভঙ্গীটি অনন্যসাধারণ। আনন্দ ওকে আবেগপ্রবণ করে: যেমন স্পর্শ করে দুঃখ, বেদনা। জীবনের সহস্রতম গোলটা করার পরেই উনি যে উক্তিটি করেছিলেন তা ভোলা যায় না—'আমি সেই প্রত্যাশিত গোলটি করেছি। এই মুহূর্তে মনে পড়ছে জগতের সেইসব দরিদ্র ছেলেদের কথা যাদের কিছুই নেই এবং অন্ধ বোবা ছেলেদের কথা যাদের আমি কিসমাসে সাহায্য করতে চাই।'

আরেকবার—ট্রেনিং শেষে ক্লান্ত পেলে ড্রেসিংরুমে বিশ্রাম নিচ্ছেন। একটি বাচ্চা ছেলে অটোগ্রাফ নেবার জন্য বাইরে অপেক্ষা করছিল। পেলে বেশ কয়েকবার ফিরিয়ে দেবার পর কি ভেবে ডেকে পাঠিয়েছিলেন ছেলেটিকে। ওর সঙ্গে কথা বলে ছেলেমানুষের মতো কেঁদে ফেলেছিলেন, আদর করে, জড়িয়ে ধরেছিলেন বুকে। একটা কাগজের ওপর দিয়েছিলেন ওর অমূল্য অটোগ্রাফ।

ছেলেটি কোনদিন পেলের খেলা দেখেনি। কারণ সে ছিল জন্মান্ধ।

শ্যামল রায়

(১০)

আমি উঠে বসলাম। অধ্যাপক ছেলেটি অঘোরে ঘুমুচ্ছে। লোকটি বলল, 'ওকে তুলে দিন।' আমি অধ্যাপক ছেলেটির গায়ে হাত দি। ও চমকে, উঠে বসে। 'আমার কি হল?'

'কিছু নয়, বড়বাবু ডাকছেন।' বলে, লোকটি দরজার দিকে দেখিয়ে দিল। ঘরের ভিতরে একটা আলো জ্বলছিল। স্তিমিত আলো। সেই আলোয় দেখতে পেলাম, আমাদের জামা কাপড়ে, শরীরে ধুলো বালি মাখা লেগে রয়েছে। আমি আর অধ্যাপক ছেলেটি দুজনে দু-হাত দিয়ে আড়মোড়া ভেঙে উঠে দাঁড়াই। লোকটি বলল, 'চলুন।'

'এই নিয়ে এলেন, এই নিয়ে যাচ্ছেন [illegible]।'

'ও সব কথা ওখানে গিয়ে বলবেন।' লোকটি বলল। অধ্যাপক ছেলেটি মনে মনে, মুখে কি সব বলতে থাকে। ওর চিঠি পড়া আমি দেখতে পাচ্ছিলাম।

'হাত বাড়ান।' ছেলেটি বলল। লোক দুটি আমাদের দুজনের হাত আরো জোরে মুচড়ে দিয়ে নিয়ে যেতে লাগল। আমরা হাঁটতে লাগলাম। সেই সিঁড়ি, দু-পাশে ঘর, মাঝখানে সরু বারান্দা, কোথাও আলো, কোথাও অন্ধকার পেরিয়ে পেরিয়ে আমরা হাঁটতে লাগলাম।

'ঘুমিয়ে ছিলেন নাকি?' একজন বলল।

'হ্যাঁ।'

'এর মধ্যে ঘুম হয়?'

'হবে না কেন?'

লোক দুটো হাসতে লাগল। ওদের শরীরের ঝাঁকুনি আমি হাতের মধ্যে অনুভব করতে পারছিলাম।

'ভোজনং যত্রতত্র, শয়নং হট্ট মন্দিরে—ঘুম হবে না কেন?' বলে, লোক দুটো খুব জোরে হেসে উঠল। অধ্যাপক ছেলেটি আমার পা জড়িয়ে দেয়। সংকোচে মুখ তুলে তাকায়। আমি বললাম, 'ঠিক আছে।' বড়বাবুর ঘর। দরজা বন্ধ। একটি লোক এগিয়ে গিয়ে, হাত দিয়ে দরজার ওপর শব্দ করলো।

'কে?'

'আমরা স্যার।'

'দাঁড়াও একটু।'

আমরা দাঁড়িয়ে রইলাম। ঘরের ভিতর কি হচ্ছে বোঝা গেল না। আশেপাশে লোকজন খুব একটা নেই। ইতস্তত বিক্ষিপ্তভাবে কয়েকজন লোক বসে আছে, ঘুরছে। আমার খুব গরম লাগছিল। হাতের তালু, মুখে, নাকে ঘাম হচ্ছিল। দরজা খুলে গেল। কয়েকজন লোক ঘরের ভিতর গোল হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। বিশাল বিশাল চেহারা, কালো, খালি গা, পরনে কারো লুঙ্গী, অথবা অন্য কিছু। আমি ওদের দিকে তাকালাম হি......হি......হি......হাসির শব্দ। আমি শুনতে পাচ্ছিলাম। ক্ষীণ থেকে ক্ষীণতর হয়ে সেই শব্দ কোথায় দূরে মিলিয়ে যেতে থাকে। সমস্ত দিকে আলোর রূপ ঝাপসা হয়ে আসছে। বুকের ভিতরে খুব কষ্ট। কে যেন আমাকে ছুঁয়ে ফেলছে—ধরে ফেলছে।

'হোয়াট আর ইউ ডুইং হিয়ার?'

একটা লোক আমার ঘাড়ে থাবা দিয়ে বসিয়ে দিল।

'স্কাউন্ড্রেল, হোয়াট আর ইউ......'

ঘাড়ের ওপর একটা যন্ত্রণা নিয়ে আমি বসে পড়লাম। একটু দূরে কৃষ্ণ আর শিপ্রা বিহ্বল হয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

আমার চোখের দৃষ্টি [illegible] ঝাপসা হয়ে আসছে। বুকের ভিতরটা টনটন [illegible] করছে।

আমি উঠে দাঁড়াতে চেষ্টা করি। লোকটি আমার ঘাড়ে থাবা মেরে বসিয়ে দেয়। কৃষ্ণ এগিয়ে আসে, বলতে চেষ্টা করে, আমরা......। লোকটি কৃষ্ণর দিকে তেড়ে যায়। 'চোপ, তুম উধার ঠারো....'

কৃষ্ণ একটু দূরে সরে গিয়ে দাঁড়ায়। শিপ্রাকে দেখি, ভয়ে আতঙ্কে নীল হয়ে গেছে। আমি ওপরের দিকে তাকাই, দশ-বারোজন লোক, কালো কুচকুচে বিশাল শরীর। সাদা, নীল, হলুদ, সবুজ জাঙিয়া পরে, অনেকটা জায়গা জুড়ে গোল হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। সবার শরীর ভিজে, টলটল করে জল পড়ছে। কেউ হাসছে, কেউ গম্ভীর হয়ে এগিয়ে আসছে। আমার শরীর হিম হয়ে আসতে থাকে।

আমরা যখন বাস থেকে কণ্টাই রোডে নেমে এখানে আসছি, তখন ওদের আমরা দেখেছিলাম। দূরে একটা পুকুরে সবাই মিলে স্নান করছিল। কৃষ্ণ জিজ্ঞেস করেছিল,

বনবিবির উপাখ্যান

বরেন গঙ্গোপাধ্যায়

—ওটাই তো চালাকি। ধর না, কাল যে তোকে লুৎফাবিবি দেখালাম, আমি যদি বলি ওর মধ্যেও আমি কালী দেখেছি।

—তা তো দেখতেই পারিস। যা ভূষো কালীর মতো চেহারা।

—চেহারা কালো হতে পারে। কিন্তু কিরকম রসকস করছিল বল। আমি তো অনেককাল পর এলাম, অথচ লক্ষ্য করেছিস, আমাকে একদম ভোলে নি।

—ওরা কাউকে ভোলে না। ভুললে ওদের রোজগার থাকে না।

চৈতন্য বলল, আমাকে না ভোলার কারণ আছে, আমি ওকে একবার একটা চক-চকে লাল রঙের জামা কিনে দিয়েছিলাম। চল না ওকে গিয়ে জিজ্ঞেস করবি?

নিশি গম্ভীর হয়ে গেল, না, তুই যা।

—কেন? তুই যাবি না? ভাল লাগেনি তোর? ভাল না লাগলে চল অন্য জায়গায় যাই।

—বলেছি তো তুই যা। তোর সখ, তুই মিটিয়ে আয়।

—বাহ্‌, বাবা, তুইও দেখছি হাফ সন্ন্যাসী হয়ে উঠলি রে।

নিশি বলল, বাজে কথা ছাড়। ছোট কর্তার সঙ্গে দেখা করতে হবে মনে আছে। আগে রাজবাড়ি চল। তারপর তোর যেখানে ইচ্ছা সেখানে যা।

চৈতন্য বোঝাল, রাগ করিস না নিশি। কলকাতায় আবার কবে আসব তার ঠিক আছে। এর মধ্যে বাদে কুমিরেও আমাদের খেয়ে ফেলতে পারে।

নিশি চুপ করে থাকল।

চৈতন্য বলল, আজ বরং দুজনে দুটো বেলফুলের মালা নিয়ে যাব। কালই আমাদের নিয়ে যাওয়া উচিত ছিল।

নিশি তবু নীরব আছে দেখে চৈতন্য বলল, ঠিক আছে, তুই যাস আর না যাস, আমি সন্ধ্যা পর্যন্ত হাফ সন্ন্যাসী হয়ে কাটাব, তারপর সন্ধ্যা হলে একা একাই হাফ-গেরস্ত লুৎফাবিবির কাছে চলে যাব।

আমার কালী তাই দক্ষিণেশ্বরে নেই, ঐ লুৎফার কাছেই পড়ে আছে।

দুজনে মুখ গোঁজ করে হাঁটতে লাগল।

।।ছাব্বিশ।।

শীতের প্রকোপ প্রচণ্ড বাড়ল। রোদে দাঁড়িয়েও হি হি কাঁপতে হয়। গাছের গায়ে কুড়ুল মারতে গেলে এখন ঝনঝন করে উঠবে সারা শরীর। গত কয়েক বছরের মধ্যেও এমন ধারাল শীত আর পড়েছে কিনা সন্দেহ!

শুকদেব আর জগন্নাথ সারা রাত মাচায় কাটিয়ে ভোর ভোর ফিরে এসেছে। এসেই জগন্নাথ বিছানা নিয়েছে, শুকদেব যোজ করে গাঁজার ছিলিম সাজিয়েছে। গাঁজা টেনে বুঁদ হয়ে খালি-গা হল, তারপর উঠোনে নেমে এসে ধিঙ্গি নাচ নাচতে শুরু করল। ব্যোম ব্যোম মহাদেব!

গাঁজায় সর্ব শরীর এখন চাঙ্গা, চোখ দুটো লাল জবাফুলের মতো টকটকে। [illegible] মাচায় বসে রাত জেগে [illegible] ছিল। এখন বসে হঠাৎ সব [illegible] ওর বাতাসে মিলিয়ে গেছে।

ওদিকে মকবুলকে দেখা গেল। মকবুল এখন অল্প অল্প হেঁটে চলে বেড়াতে পারে। হাতে একটা লাঠি নিয়ে মকবুল ঠুকঠুক করে উঠোনে নেমে এল। যেমন, লাঠুয়া দলের অধিকারীর মতো ভঙ্গি করে গান জুড়েছে শুকদেব,

গাঁজা খেলে গাঁজা বাড়ে
গর্দানে বাড়ে জোর

মকবুল থমকে দাঁড়ায়, বটে বটে আর কি হয়?

শুকদেব উৎসাহ পেয়ে নেচে ওঠে,

(দাদা) গর্দানে বাড়ে জোর
বাবা-দাদার নাম ডুবিয়ে
হলাম গাঁজাখোর।

বটে রে গাঁজাখোর? আজ যে বড় ফুর্তি? কী হয়েছে?

শুকদেব হি হি করে হাসল, কেমন গাইলাম বলো?

মকবুল বলল, ঠিক কালের গানের মতো। কিন্তু সারা রাত জাগার পর সকালে এমন কি ঘটল যে এত ফুর্তি?

শুকদেব বলল, গাঁজা একবার টেনে দেখ না, তাহলেই বুঝতে পারবে কেন ফুর্তি! খাবে?

এমন সময় দুজনেই কিছুটা থমকে দাঁড়াল, আরে সেই নতুন লোক না! হ্যাঁ সেই লক্ষ্মণই। মুখটা কেমন চাগসে মেরে গেছে। দু দিনেই লোকটার চেহারা কেমন পালটে গেছে।

শুকদেব ডাকল, এই যে খেস্টান সাহেব! ভালো আছো? চলবে নাকি এক টান?

লক্ষ্মণ এগিয়ে এল, কি?

—মহাদেবের পেসাদ গো। খেয়ে গায়ে গর্দানে জোর বাড়িয়ে নাও। যারা বনে এসেছে,

[illegible] সর্দারদের সঙ্গে লড়তে হবে [illegible] [illegible] না। এসো।

লক্ষ্মণ বললো, তোমরা খাচ্ছ, খাও। আমার ওসব [illegible] না। [illegible] আমার কাজ আছে।

—না বাবা, তোমার [illegible] কাজ কি [illegible]? [illegible] এখন [illegible] [illegible] [illegible] দেবো? [illegible]—

—[illegible]! লক্ষ্মণ [illegible] [illegible], [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]।

[illegible]

[illegible]

—[illegible] [illegible]

[illegible] [illegible]—

লক্ষ্মণ [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] না। [illegible]

মতোই অবস্থা। কী কুক্ষণেই যে গৌরীকে নিয়ে এখানে এসে হাজির হল ও। এখন ওকে নিয়ে না যাওয়া যাবে পার্বতীর পাড়ায়, না নিশ্চিন্তপুরে। যাতে সেভাবে ও কার্তিককে নিয়ে মারতে এসেছিল, সে দৃশ্য কিছুতেই ভোলার নয়। কেন, কেন গৌরী অমন মান-মুখী হয়ে গেল ওর ওপর। কি এমন অন্যায় করেছে ও।

সারাটা রাত নৌকাতে ছটফট করে কাটিয়েছে লক্ষ্মণ। মুহূর্তে পাতে নি। একে শীত, তার উপর হাজার রকম দুশ্চিন্তা। চিন্তার কোন শেষ নেই। প্রতিটি মুহূর্তে মনে হচ্ছে, মহাশূন্যে ও ভাসছে। কেউ নেই, ওকে হাত ধরে মাটিতে দাঁড় করিয়ে দেয়।

ভোরের দিকে প্রচণ্ড অবসন্নতার মধ্যে ও টের পেল, কারা যেন হৈ-চৈ করতে করতে সর্দিড় অবধি এল। তারপর নৌকো নিয়ে ভেড়ির ধার ঘেঁষে ঘেঁষে এগোতে শুরু করল। লক্ষ্মণ চিনতে পারল ঈশানকে, রজনীকে। চারপাশের ভেড়ির অবস্থা দেখবার জন্য ওরা বেরিয়ে পড়েছে। ওর মনে হল এই তো ওর সময়। গৌরীকে একা পেতে হলে এই তো সময়। কাঠুরেরা এতক্ষণ দা কুড়োল নিয়ে এখনই জঙ্গলে ঢুকবে। এমন সুবর্ণ সুযোগ যেন আর ও হাতে পাবে না কোন দিন। একটা শেষ বোঝাপড়া ওকে করতেই হবে এবার।

নৌকো থেকে টলতে টলতে বেরিয়ে পড়েছিল লক্ষ্মণ। বাইরের কনকনে শীত ওর সারা দেহে যেন তীরের ফলার মতো বিঁধে যাচ্ছিল। কিন্তু, কাছারিবাড়ির উঠোনে এসেই কেমন যেন হকচকিয়ে গেল ও। কাঠুরেরা অনেকেই এখনো কাজে বেরোয় নি। গৌরী কোথায়? গৌরী কি এখনো ঘরেই পড়ে পড়ে ঘুমুচ্ছে।

লক্ষ্মণ দেখলো উঠোনের একপাশে হরিণটা বাঁধা। পা গুটিয়ে অদ্ভুতভাবে বসে আছে হরিণটা। চোখ দুটো বন্ধ করে।

কিন্তু গৌরী কোথায়। তবে কি গৌরীকেও সঙ্গে নিয়ে গেছে ওরা। কিন্তু, না তা কি করে সম্ভব। স্পষ্ট ও ঈশান আর রজনীকে নৌকোয় উঠতে দেখেছে। দেখেছে আরো দু-তিনটে লোককে, তার মধ্যে গৌরী ছিল না। তবে কোথায়, কোথায় গৌরী।

দুয়ারের একপাশে একটা খুঁটিতে হেলান দিয়ে বসে পড়ল। লক্ষ্মণ ওকে এড়িয়ে যাবার জন্য সরে এল। কাঠুরে ডেরার পেছন দিকে এগিয়ে এসে মিষ্টি জলের পুকুরটার কাছে দাঁড়াল। জলের ওপর এখনো কুয়াশা দুলছে। ঘাট ফাঁকা, কেউ নেই।

সরে এল ভেড়ির দিকে। ভেড়ির ওপর আগুনের কুণ্ডলির পোড়া কাঠ আর ছাই পড়ে আছে। কাছাকাছি এগিয়ে একটু হাত-পা সেঁকে নিল। কানের লতি দুটো বরফের মতো জমে আছে। হাত সেঁকে সেঁকে কান ঘাড় গলা গরম করে নিল লক্ষ্মণ। তারপর আবার অলস ভঙ্গিতে হাঁটতে শুরু করল।

নদীতে রোদ ঝিকোচ্ছে। নদী থেকে ছড়িয়ে গিয়ে অদ্ভুত এক আলোর আভা চার পাশে। ওদিকে নদীর ওপারে জঙ্গলের মাথায় পাখির ঝাঁক। অথচ কোন দৃশ্যই ওর ভাল লাগছিল না। রাগে ক্ষোভে সমস্ত কিছুই তছনছ করে একশা করে ফেলতে ইচ্ছে করছিল ওর। ক্ষমতা থাকলে ও কাঠুরে ডেরা আর কাছারিবাড়িতে আগুন ধরিয়ে দিত। লোকগুলির মাথায় কুড়োল চালিয়ে চালিয়ে মনের ঝাল মেটাত। কেমন করে যে লোকগুলির ওপর প্রতিশোধ নেওয়া যায়, কিছুই মাথায় আসছিল না ওর। অভিমানে বুকের ভেতরে কেবল গুড়গুড় করে কাঁপতে থাকল লক্ষ্মণ।

ক্ষণিকের জন্য চোখে ঘোলা দেখতে শুরু করল ও। পর মুহূর্তেই আবার চোখের ঝলসে ভাবটা কেটে গেল। ঘাটের কাঠ টানার নৌকোটার দিকে চোখ পড়ল। দু'চার জন দৈত্যের মতো মানুষ সেই নৌকোর কাঠ সাজাচ্ছে। ওদিকে এগোতে ইচ্ছে হল না। লোকগুলো লক্ষ্মণকে দেখলেই [illegible] টিপে টিপে কথা বলবে। অসহ্য।

নৌকাটা ছাড়িয়ে আরো [illegible]টা এগিয়ে গেলে ভাঙা ভেড়ির নতুন বাঁধটাকে দেখা যেত। ভেড়িটা ওদিকে দু-তিনটে বাঁক নিয়ে জঙ্গলের মধ্যে ঢুকে গেছে। এই ভেড়ির গা ধরে ধরেই নৌকো নিয়ে বেরিয়েছে ঈশানরা।

নদীর ঢালের দিকে তাকাল লক্ষ্মণ। ভাটা চলছে বোধ হয়। ঢালে কাদার মধ্যে লাল কাঁকড়ার ঝাঁক। মাটি খুঁড়ছে। কাদায় ডুব দিয়ে দিয়ে গা লুকোচ্ছে। আবার ভেসে উঠে কাদার উপর চিত্র আঁকছে। নোনা মাছ সাপের মতো। কাদার ভেতরও ডুব সাঁতার দিতে পারে যেন। অদ্ভুতভাবে বেশ কিছুক্ষণ কাদার দিকে তাকিয়ে থাকে লক্ষ্মণ। ভীষণ একা একা লাগছে। ভীষণ অসহায় লাগছে। ভীষণ কান্না পাচ্ছে।

(চলবে)

লীলা মজুমদার

পাকদণ্ডী

সে বার ঠাকুরমার আশী বছর বয়স হল। তাঁর যে পেটে ক্যান্সার ছিল একথা কেউ আমাদের বলেনি। একদিন খুব অসুস্থ হয়ে ঠাকুমা দেশ থেকে এসে বড় জ্যাঠা-মশায়ের বাড়িতে উঠলেন। দেখতে দেখতে তাঁর জীবন শেষ হয়ে গেল। চারদিকে ছেলেমেয়ে, নাতি-নাতনি ঘিরে রইল, মাঝখান থেকে ঠাকুরমা স্বর্গে গেলেন। গল্প শুনেছিলাম ৩৩ বছর বয়সে ঠাকুমার শ্বশুরের ইচ্ছা-মৃত্যু হয়েছিল। বুড়ো মা-বাবা, ছেলেমানুষ স্ত্রী আর ছোট্ট এক ছেলে রেখে মারা যাবার সময় তিনি স্ত্রীকে বলেছিলেন 'দুঃখ কর না তোমার ঐ এক ছেলে থেকে একশো হবে।' সেই ছেলে আমার ঠাকুরদা; ঠাকুরমার আট ছেলে-মেয়ে ও ৫৪টি নাতি-নাতনি হয়েছিল। তাদের ছেলেমেয়েদের ধরলে ১০০ না হলেও কাছাকাছি হবে। মুশকিল হল ঠাকুমার নাতি-নাতনিদের কারো একটি কারো দুটি সন্তান কারো কেউ নেই, আবার কেউ কেউ বিয়েই করেনি।

(১৯)

অনেকে জানতে চায়—পাকদণ্ডী নাম কেন। পাকদণ্ডী হল তো পাহাড়ের খাড়াই ওঠার সাপের মতো আঁকা-বাঁকা পথ। সেই পথ-ই। ছোটবেলায় দেখতাম, মধ্যিখানে আমাদের শহরখানি, তার প্রায় চারদিক ঘিরে পাহাড়। কাছের পাহাড়ের দিকে চেয়ে দেখতাম, একেবারে তলা থেকে চুড়ো অবধি পথ চলে গেছে। সে-পথ সোজা নয়। সোজা পথ-ও একটা থাকত, পাকদণ্ডীর বাঁক থেকে বাঁকে সে-পথ খাড়া উঠে যেত। ভারি কষ্টকর, হাঁপ-ধরা পথ সেটা, পাকদণ্ডীর সিকি ভাগ লম্বা, কাজের মানুষদের পথ। খাসিয়া মেয়েরা পিঠে বোঝা নিয়ে সেই পথ দিয়েই উঠত। আরাম করা কাকে বলে তারা জানত না।

কিন্তু পাকদণ্ডী আস্তে আস্তে, ঘুরে ঘুরে, ছায়ায় ছায়ায় উঠত। মাঝে মাঝে মনে হত বুঝি বনের মধ্যে ঢুকল। দুদিকের গাছ ঝুঁকে পড়ে পথটাকে কোলে নিত। একদিকে তার পাহাড়ের গা, একদিকে ঢাল নেমে গেছে। পাহাড়ের গায়ে, পাথরের খাঁজে খাঁজে সিলভার-বাহার। সিলভার-ফার্নের তলায় কে যেন খড়ি মাখিয়েছে, হাতে চেপে ধরলে, ফার্নের ছাপ হাতে উঠে আসে। আর ফুলের কথা কত বলব। বুনো ভায়োলেট, বুনো স্টবেরি, পাতার সঙ্গে মিশিয়ে-থাকা লজ্জাশীলা হানি-সাকল, তার মধু-গন্ধ চারদিকে ছড়িয়ে পড়ত। দেখতে দেখতে ফুল-পাতা তুলতে তুলতে, পাহাড়-চড়া। সে-পাহাড় চড়াতে কোনো কষ্ট থাকে না। একমাত্র মুশকিল হল, গন্তব্যস্থানে পৌঁছবার সময় না-ও পাওয়া যেতে পারে। কার কখন সূর্য ডোবে কে জানে। গন্তব্যস্থানের কথা ভুলে যাওয়াও বিচিত্র নয়।

এই জন্য পাকদণ্ডী নাম। এর বেশি কি বলব? ভালো জিনিস দেখে দেখে চলা, মন বোঝাই করে সুন্দর জিনিস জমা করা।

এদিকে ১৯২২ শেষ হল, ১৯২৩ শুরু হল। আমার পনেরো বছর বয়স হল। নাবালকত্বের আর কিছু বাকি রইল না। এর আগেই মা দিদিকে, আমাকে ডেকে নিয়ে একদিন, অন্যদিকে তাকিয়ে বললেন, 'মানুষের ছেলেমেয়ে কেন হয় জানিস?' আমরা তো অবাক। আমতা আমতা করে বললাম, 'জানি না কেন।' মা সোজা আমার মুখের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'হাতে করে কিছু দেন না, মানুষরা নিজেরা পাকায়।' এই বলে সোজা বাংলায় আমাদের মুখের দিকে চেয়ে মানুষের জন্ম-রহস্য উদ্ঘাটন করে দিলেন। আমি তখন হয়তো ১৩ পূর্ণ হয়ে ১৪-য় পড়েছি। আমাদের ভিক্টোরীয় মায়ের মুখে এমন অকথ্য সংবাদ শুনে বলা বাহুল্য আমরা শকড্। একেবারে 'শকড্'। জাপানী ভাষায় উপ-যুক্ত শব্দ না থাকায়, ওরা শকড্‌কে বলে 'শকড্'।

'শকড্' হলেও একেবারে বুদ্ধিশুদ্ধি লোপ পায়নি। অনেকগুলি জিজ্ঞাস্য বিষয়ে সেই সুযোগে জেনে নিলাম। ছেলেপুলে হওয়ার যখন এমন সহজ উপায় আছে, তখন রাজারা পুত্রেষ্টি যজ্ঞ করত কেন? মা তারো সহজ উত্তর দিলেন। অতিরিক্ত বিলাসী আর উচ্ছৃঙ্খল জীবন কাটানোর ফলে ছেলে হত না। ওষুধপত্র, তাবিজ, শেকড়, কিছুতেই কিছু হত না।

'তাহলে তো বিয়ে না হলেও ছেলে হতে পারে।'

মা বললেন, 'পারেই তো।' তার অসুবিধাগুলোও বুঝিয়ে দিলেন। মা সেই একদিনেই ঘণ্টাখানেকের মধ্যে আমাদের একটা চলনসই যৌনবিজ্ঞানের পাঠ দিলেন। আর কোনো দিনও বিষয়টা উত্থাপন করেননি। তবে কতকগুলো ভালো ইংরিজি বই কিনে দিয়েছিলেন। আমার ভিক্টোরীয় আদর্শে মানুষ মায়ের পক্ষে এই পাঠ দেওয়া যে কত শক্ত কাজ ছিল এবং তিনি যে কি স্পষ্ট ও নির্মলভাবে সে-পাঠ দিয়েছিলেন, ভেবে আশ্চর্য হই।

বাস্, আর কি চাই? আমাদের বড় হওয়ার আর কি বাকি রইল? তবু ছিল ছিল বাকি। সেই বছর দুটি ভালোবাসার মানুষকে হারালাম। দুটি কেন, বলতে হয়

[illegible]

[illegible]

মাকড়সা নেই, বড়-জ্যাঠাও গেলেন, কেমন একলা লাগত।

কাজে ভরা ছিল জ্যাঠামশায়ের জীবনটা। যৌবনে বাপকে হারিয়ে, তার সব দায়িত্ব নিজে বহন করেছিলেন। ছোট বোনের বিয়ে দেওয়া, ছোট ভাইদের মানুষ করা, সবই তাঁর দায়িত্ব হয়ে দাঁড়িয়েছিল। ঐ গম্ভীর চেহারার পিছনে আশ্চর্য উদার প্রাণরসে ভরপুর একটা চিত্ত ছিল। বাংলার যুবকদের জীবনযাত্রার মোড় তিনি ঘুরিয়ে দিয়েছিলেন। এ-রাজ্যের তরুণেরা একটা বলিষ্ঠ ক্রীড়ানুরাগী, আদর্শ উত্তরাধিকাররূপে পেয়েছিল। একদিকে সংস্কৃত ব্যাকরণ, দুরূহ গণিতশাস্ত্রের বই রচনা করেছেন, অন্যদিকে সবকনো বাঙালী ছেলেদের খেলার মাঠে তিনিই প্রথম ছেড়ে দিয়েছিলেন। তাঁর আগে পর্যন্ত এ-দেশের শিক্ষাবিদদের একটা বদ্ধমূল ধারণা ছিল যে, গড়ের মাঠে গিয়ে সবার সামনে বল পেটালে সে-ছেলে মানুষ হয় না। এই বড়ো গম্ভীর মানুষটির পৃষ্ঠপোষকতা পেয়ে চিরকালের মতো বাঙালী ছেলেরা বেঁচে গেল।

প্রথম উল্লেখযোগ্য, ক্রিকেট খেলার দেশী ক্লাব হল টাউন ক্লাব। ১৯০০ সালেরও আগে, বিশেষ করে বড়-জ্যাঠামশায়ের আগ্রহে ও অপরিসীম চেষ্টায় কয়েকজন দূরদর্শী ও চিন্তাশীল বাঙালী মিলে এই ক্লাবের পত্তন করেছিলেন।

চাট্টিখানিক কাজ নয়, একটা গোটা জাতিকে বোঝানো মাঠে গিয়ে ছোট ছেলেদের হাতে একটা কাঠের চ্যাপটা ডাণ্ডা দিয়ে শক্ত একটা গোলাকে পেটা-পিটি করলে কিভাবে দেশের ছেলেদের উপকার হতে পারে। পৃষ্ঠপোষক অভিভাবক আরো ছিলেন: নাটোরের মহারাজা, ভূ-কৈলাসের রাজা, মহেশতলার বসু পরিবারের কয়েকজন মাতব্বর আর অনেকগুলো আগ্রহে অধীর যুবক। এই উৎসাহী যুবকদের দলে আমার বাবা প্রমদারঞ্জন, আর দুই জ্যাঠা মুক্তিদা আর কুলদাও ছিলেন। পরে মুক্তিদারঞ্জনের ছেলেরা, সোনা পিসিমার ছেলেরা, আমার আপন পিসেমশায়ের ছেলেরা বেচু দত্তরায়, পেমো দত্তরায় এবং আরো অনেকে জ্যাঠামশায়ের দেখানো পথ ধরেছিলেন।

টাউন ক্লাব হল। এখন যেটাকে সকলে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের মাঠ বলে সকলে জানে, গোড়ায় সেটাই ছিল টাউন ক্লাবের মাঠ। পরে কোনো কারণে ক্লাবটি উঠে পাশের মাঠে চলে যায় এবং এখনো সেখানে আছে। বলা যেতে পারে বাঙালী ক্রিকেট ক্লাব বলতে, টাউন ক্লাবই প্রথম। পরে অবশ্য খ্যাতিতে, উয়াড়ী, স্পোর্টিং ইউনিয়ন ক্লাব তাকে ছাড়িয়ে গিয়েছিল; কিন্তু টাউন ক্লাবই বাঙালী ক্রিকেট ক্লাবের পিতামহ।

ক্লাব তৈরি হয়েছিল, ভালো ভালো খেলোয়াড় তৈরি হয়েছিল, আমাদের গোটা পরিবারের ক্রিকেটের ওপর একটা জন্মগত আত্মীয়তাও গড়ে উঠেছিল। কিন্তু জনসাধারণকে ক্রিকেটমুখী করতে আরো প্রায় ৫৫ বছর লেগেছিল। ক্রিকেটের মাঠে মেয়ে দর্শক কেউ ভাবতেও পারত না। টিকিট, গ্যালারি, একে-ওকে ধরাধরির কথা কেউ স্বপ্নেও কল্পনা করতে পারত না।

ছোট জ্যাঠামশাই বোধহয় সবটাতে বাড়াবাড়ি করতেন। একদিন ১৯২২ সালে, ভাগ্নী-ভাইঝিদের একটা দল নিয়ে ইডেন গার্ডেনে উপস্থিত হলেন। ক্যালকাটা ক্লাবের সায়েবদের সঙ্গে টাউন ক্লাবের খেলা। বড়-জ্যাঠামশাই উপস্থিত থাকবেন। বলা বাহুল্য, এই পরিকল্পনার কথা তাঁকে আদৌ বলা হয়নি। ছেলেদের শিক্ষা সম্বন্ধে যতই উদার হন, নিজের মেয়েদের বাড়িতে পড়াশুনোর ব্যবস্থা করেছিলেন, স্কুলে দেননি। ১৫-১৬ বছরের মধ্যে বিয়ে দিয়ে দিয়েছিলেন। কাজেই আমাদের খেলার মাঠে যাওয়া সম্বন্ধে তাঁর সমর্থন থাকা অসম্ভব। না জানানোই ভালো।
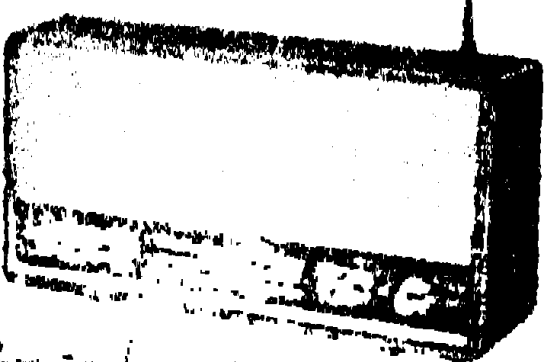
এখানে বাবার মনোভাব প্রণিধানযোগ্য। কথাটা পাড়তেই তিনি ছোট জ্যাঠামশাইকে বললেন, 'দেখ ছোড়দা, তুমি যা খুশি করতে পার, খালি আমাকে এর মধ্যে জড়িও না। একপাল মেয়ে নিয়ে তুমি মাঠে যেও, আমি বাধা দেব না। কিন্তু আমি আলাদা যাব।'

তাই করা হল। ছোট-জ্যাঠাকে গড়পার থেকে নিজের দুই মেয়ে, আমহার্স্ট স্ট্রীট থেকে পিসিমার দুই মেয়ে আর রসা রোড থেকে আমাদের দুই বোনকে নিরুপদ্রব গাড়ির অভাবে সংগ্রহ করতে কতখানি বেগ পেতে হয়েছিল, সহজেই কল্পনা করা যায়। ভুলে গেছি, তবে মনে হয়, উত্তর কলকাতার চার মেয়েকে সম্ভবতঃ সন্দেশ-জ্যাঠার ঘাড়ে চাপিয়ে দিয়েছিলাম। আবছায়া মনে পড়ছে তাঁদের বাড়িরও গোটা দুই বোন এসেছিল। আমাদের দুই বোনকে ছোট জ্যাঠামশাই ট্যাক্সি করে ইডেন গার্ডেনে নামালেন।

সে ইডেন গার্ডেনের কথা আজকালকার লোকে ভাবতেই পারে না। মাঝখানে খেলা হত, তার চারদিক ঘিরে সেই নন্দনকানন ছড়িয়ে থাকত। যত্ন করে ছাঁটা ঘাসজমি, তার মধ্যখানে নিখুঁত পিচ, দেখেও চোখ জুড়োত। কেমন একটা অন্য জগৎ। হৈ-হল্লা নেই, ঠেলাঠেলি, গালাগালি নেই। মাথার ওপর নীল আকাশ, গায়ে লাগে গঙ্গার বাতাস, চারধারে ফুলের বাহার, সবুজ মাঠে সাদা পোষাক-পরা বাইশটা খেলোয়াড় আর তাদের সাহায্যকারীরা।

(চলবে)

লোকনাট্যের মুক্তিদীক্ষা পালায় শিবদাস মুখার্জি ও অনাদি চক্রবর্তী

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

সংগীত এবং সংলাপের অধিকারী শম্ভুবাবু, মহলায় তাঁকে বললেন, 'আজ চারটে ক্লাস করে এলাম। লাস্ট পিরিয়ডে [illegible] কোম্পানির ইংরেজি পড়িয়েছি।' সম্প্রতি মধুসূদন বিদ্যাপীঠের বিজ্ঞান শিক্ষক শম্ভুবাবু মঞ্চের নিয়মিত অভিনেতা। এ বছরই প্রথম যাত্রা করবেন।

'শিরাজি বলে কেউ ভাবে হতে আসেনি'—মোসাহেবের কণ্ঠেও বেদনা। মনোজকুমার করেছেন মোসাহেব। দক্ষ এবং অভিজ্ঞ এই অভিনেতা যথেষ্ট উজ্জ্বল। এ পালায় তিনি সম্পদ।

সাহানা বিবিধ ভূমিকায় রেখা ভাণ্ডারী, বাসুদেব শিরোমণি রূপে অজিত মুখার্জি এবং খালেদ-এ অনিল বসু নিজস্ব কৃতিত্ব দেখালেন মহলায়।

ক্রিকেটের শার্ট আর পাজামা পরে বসেছিলেন অমিতাভ বসু, দুটো একেবারে [illegible] দেখে বোঝা দায়। এদের মহলা দেখতে পেলাম না। প্রথম দিকের মহলা, কেউ কেউ পার্ট ভুলে যাচ্ছিলেন।

নির্দেশক মৃণাল ঘোষ উঠে দাঁড়িয়ে বললেন—'মনে করবেন না, আমি সব ভুলে গেছি। উনি বসে আছেন বলে কিছু বলছি না।' উনি অর্থাৎ আমি, কাজেই আমাকে উঠে পড়তে হল।

মহলা তো শিক্ষণপর্ব। ত্রুটি সংশোধনের জন্যই মহলা। মহলায় নিষ্ঠার ফলাফল আসছে প্রতিফলিত হবে।

মৃণালবাবু বললেন—"এর সেট দেখবেন। একেবারে অন্যরকম। যাত্রাতে এরকম সেট কখনো হয়নি।

'দেখবো তো নিশ্চয়ই'। আমার মহলা খবরের না বলা উত্তরটা লিখতেই হল।

সপ্তর্ষি

২১ আগস্ট মধ্য হাওড়ার 'সপ্তর্ষি' এক বৈচিত্র্যময় অনুষ্ঠানের মধ্যে দিয়ে দশম বর্ষ পূর্তি উৎসব পালন করল। কৃষ্ণা ঘোষের কণ্ঠে রবীন্দ্রসংগীত দিয়ে অনুষ্ঠান শুরু হয়। পরে বাৎসরিক পুরস্কার বিতরণ করেন প্রধান অতিথি বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্র। অনুষ্ঠানের একেবারে শেষ পর্বটি ছিল 'নৃত্যশ্রী' গোষ্ঠীর লোক-নৃত্য ও কবিগুরুর নৃত্যনাট্য 'তাসের দেশ'। লোকনৃত্যের অনুষ্ঠানটি খুব একটা উপ-ভোগ্য না হলেও, 'তাসের দেশ' প্রশংসার দাবি রাখে। বিশেষ করে তাসের দেশে তাসেদের বৃত্তাকারে নাচের দৃশ্যটির উপ-স্থাপনা বা তাসেদের সঙ্গে রাজপুত্র ও সদাগর-পুত্রের সংলাপ বিনিময় এবং শেষ দৃশ্যে 'বাঁধ ভেঙে দাও' গানটির সঙ্গে তাল মিলিয়ে নাচ রীতিমত ভালো হয়েছে। প্রতিটি অভিনয়ে নিষ্ঠার ছাপ ছিল। সব-কটি চরিত্রই সু-অভিনীত। তার মধ্যেও বেশি মন কাড়ে রাজপুত্র ও সদাগর-পুত্রের অভিনয়। এই দুটি চরিত্রে ছিলেন যথা-ক্রমে মৌসুমী মুখার্জি ও মধুমিতা সিনহা। হরতনের চরিত্রে সুমিতা ঘোষালের অভিনয়েও মুন্সিয়ানার ছাপ মেলে। বিশেষ করে, তার মূকাভিনয় ও হাতের মুদ্রায় হরতনের চরিত্র ফুটিয়ে তোলার কাজে। পত্রলেখা চরিত্রে শম্পা ব্যানার্জি, রুইতন—পাঁনা কবাতি, রাজা—সুমিত্রা চ্যাটার্জি ও রানীর ভূমিকায় রুমা বসু নিজ নিজ চরিত্রে যথাযথ। সংগীত-নির্দেশনা ও রাজপুত্রের কণ্ঠসংগীতে ছিলেন সমীর মিত্র। এছাড়াও স্বপন চ্যাটার্জি, কেকা মুখার্জি, রীণা ব্যানার্জি ও হেনা ব্যানার্জির কণ্ঠদান প্রশংসার দাবি রাখে। তাযেত্য ছিলেন নূপুর ভদ্র ও কানাই দাস। সমগ্র অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন লক্ষ্মী মুখার্জি।

[illegible]

প্রদর্শনী

গোপাল সান্যালের ছবি

ম্যাকসমূলার ভবনের দরজার কাছে পৌঁছেই অদূরবর্তী দেয়ালে পাখী-বিক্রেতাকে দেখে দর্শকদের অনেকে থমকে দাঁড়াতে পারেন কৌতূহলবশতঃ এবং এই কৌতূহল আরও উদ্দীপিত হতে থাকলে দর্শক আরও এগিয়ে যাবেন। তখন তাঁর চারপাশে ভিড় করে দাঁড়িয়ে থাকা কয়েকটি বহুবর্ণরঞ্জিত ক্যানভাস বিচ্ছিন্নভাবে ইতস্ততঃ। এগিয়ে গেলেই দেখা যাবে ডানে-বামে—কোথায়ও পুরোনো মন্দির বর্ণাঢ্য উজ্জ্বলতায় দাঁড়িয়ে। কোথায়ও প্রেমিক উন্মুখ আয়তনয়নে, কোথায়ও নতশিরে ভ্রাম্যমান শূকর। কোথায়ও বা যেন বাতাসে ভাসমান অশ্ব লীলায়িত ভঙ্গীতে—কোনখানে বাঁশী-বাদকের পরিবার মুগ্ধতায় ম্রিয়মান। আলো-আঁধারী অ্যাকোয়ারিয়মে রঙ্গীন ভাসমান মাছ কখনও বা ইতস্ততঃ।

সমগ্র পরিবেশটায় কোন চমক নেই, নেই কোন উজ্জ্বলতা। বরং বলা যায় একটা স্নিগ্ধ নিশ্চুপ অস্তিত্ব রং রূপ রেখার মধ্যে বিধৃত বেদনায় কিছুটা বিহ্বল। গোপালের জগৎ নাড়া দেয় সেই চৈতন্যকে যেখানে রূপ, প্রমাণ, ভাব, ধারণা—সব এক হয়ে স্রষ্টা ও সৃষ্টির ব্যবধান ঘুচিয়ে দেয়।

ম্যাকসমূলারকে ধন্যবাদ যে গোপালের শিল্পসম্ভারকে তাঁরা সযত্নে কোলকাতার কলারসিকদের কাছে উপস্থিত করেছেন।

বেশ কয়েক বছর বাদে গোপাল সান্যাল তাঁর রচনাসম্ভার নিয়ে কোলকাতার শিল্পজগতে আবির্ভূত হয়েছেন। দীর্ঘকাল তাঁর এই নীরবতায় কোলকাতার শিল্পপ্রিয় দর্শকরা বঞ্চিত থাকলেও, শিল্পী গোপাল সান্যাল থেমে থাকেননি। যেখানে তাঁর মন রং খুঁজে পেতে চেয়েছে কিন্তু পায়নি, সেখানে অনাসক্তভাবে সাদা-কালোর মধ্যে নিজেকে পেতে চেষ্টা করেছে। সর্বদা কাজ করে যাওয়ার মধ্যে গোপালের একটা আত্মসমীক্ষার ইঙ্গিত থাকে। জগতকে বুদ্ধি দিয়ে জানার চাইতে মানবিক প্রবৃত্তিতে তাড়িত হতে গোপাল স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করেন—করাই স্বাভাবিক তাঁর পক্ষে। তাঁর কথাতেই বলা যায় 'আমি সাধারণ জীবনের ছবি আঁকতে চাই—যা আমরা আমাদের চারপাশে দেখি—যেখানে মানুষ সব সময় তার প্রতিকূল পরিবেশের সঙ্গে সংগ্রামরত। অস্তিত্ব বাঁচাতেই জীবনের সংগ্রাম। অধিকতর সুখ এবং শান্তিপূর্ণ জীবন পেতে মানুষ তার সবকিছু প্রতিকূল পরিবেশের সঙ্গে সর্বদা সংগ্রামরত। এবং আন্তরিক ও সৎভাবেই বুদ্ধিগ্রাহ্য দৈনন্দিন ঘটনাকে আমি চিত্রায়িত করে থাকি।'

খুবই স্বাভাবিক যে, গোপাল জটিল জীবন-রহস্যে বিশ্বাসী নয় চিত্রগত বিষয়ে। যে কারণে সব সময় তাঁর অন্তর্মুখী চেতনাকে খুব সাধারণ মানবিক সম্পর্কের সঙ্গে সম্পৃক্ত হতে হয়। পাখী, মানব-মানবী, জন্তু-জানোয়ার অবাধে তাঁর চিত্ররাজ্যে বিচরণ করে। তুচ্ছ অরোপিত বস্তুকেও মনোগ্রাহী করে তুলতে জমির বিভাজন। বর্ণপ্রলেপ, রেখার গতিময়তা—সবকিছুই তাঁর দক্ষ কারুময়তা ইঙ্গিতবহ। এমনকি বলিষ্ঠ রেখা দিয়ে যখন তিনি তাঁর মানব অভিলাষ ব্যক্ত করতে প্রয়াসী, সে-ক্ষেত্রেও সামান্য অলংকরণের প্রয়োজন সংস্থাপন তাঁর চিত্রভাসকে অনেক বেশি সংবেদনশীল করে তোলে। তাঁর সাদা-কালো রেখাচিত্রের পাশে তাঁর তেলের ছবিগুলো অনেক বেশি বর্ণাঢ্য—যদিও বিন্যাসে কোন অসংযমের আধিক্য লক্ষ্য করা যায় না। মূলতঃ গোপাল রোমান্টিক মানসিকতার লোক। পারিপার্শ্বিক পরিবেশের মধ্যে যে মালিন্য অবশ্যই তা তাঁর রচনাকে কিছুটা বিষণ্ণতার ছাপ দিয়েছে। এখানে তাঁর সবকিছু, অংকিত বস্তুতে তাঁর অন্তরচেতনার যে-ছাপ পাওয়া যায়, তাকে নৈরাশ্যব্যঞ্জক বলা যায় না কোনভাবে। কিন্তু একটা সতেজ বিষণ্ণতার মেদুর। বোধহয় এই কারণে গোপাল বিশিষ্ট এবং তাঁর সমকালীন শিল্পীদের তিনি যে বিচ্ছিন্নভাবে বিশিষ্ট তা স্পষ্ট ধরা পড়ে। ছবির ক্ষেত্রে আধুনিকতা বলতে দর্শক সাধারণের যে অনীহা গোপালের শিল্পভাবনায় তার স্বাক্ষর নেই। আবেগ-তাড়িত বলেই গোপাল তাঁর শিল্পকলাকে সহজেই হৃদয়গ্রাহ্য করে তুলতে পারেন।

গোপালের লেখার সর্পিলগতি অনায়াসে স্বাচ্ছন্দ্যলাভ করে যখন তাঁর আবেগপ্রবণ মন জিজ্ঞাসু না হয়ে হৃদয়ানুসন্ধানরত থাকে। গভীর ঘন কালো রেখা কখনও সরু কখনও মোটা হয়ে অংকিত-বস্তুকে সজীব উন্মাদনায় গভীর করে তোলে। পরিসর বিভাজনের ক্ষেত্রে তিনি কখনও ভারসাম্য হারান নি।

বিষয়বস্তু হিসাবে ঘোড়া বরাবর শিল্পীদের খুব প্রিয়। গোপালের কাছে তার ব্যতিক্রম হয়নি। গোপালের ঘোড়া

কিন্তু অন্যান্য শিল্পীর হাত থেকে বিশিষ্ট। যেখানে [illegible] নাটককে তিনি যথার্থভাবে ধরতে পারেন ইচ্ছামত। [illegible] সত্যি, [illegible] করে [illegible] পারেন। [illegible] একটা ছোট [illegible] অবকাশ থাকে। [illegible] ওপর [illegible] থেকে উপায় [illegible] তিনি সার্থকতা দেখিয়েছেন। ফলে তাঁর [illegible] একটা [illegible] প্রকাশ পেয়েছে [illegible] করে। [illegible] ছেড়ে [illegible] এবং যথাযথ। তাঁর [illegible] বর্ণাঢ্য [illegible] স্পষ্ট করে তুলেছে। [illegible] পিঠে [illegible] একটা ছোট প্রাণী— [illegible] তিরস্কার করছে। এখানে বর্ণবিন্যাসে রোমান্টিক [illegible] থাকলেও [illegible] [illegible] ভাব প্রকট। কিন্তু এখানে তাঁর [illegible] উপস্থাপনায় যে [illegible] পাওয়া যায় তা সহজেই [illegible] সমর্থ।

[illegible] এবং [illegible]—এ [illegible]-এর ক্ষেত্রে [illegible] তাঁর নিজস্ব [illegible] লাগিয়েছেন। [illegible] তাঁর সব রচনাতে একটা [illegible] পাওয়া যায়—[illegible] তাঁর [illegible] আন্তরিক। এবং এই [illegible] থেকে [illegible] দিয়ে যান।

রবীন মণ্ডল

নীলাম

নীলাম। ২৮ আগস্ট। ঘড়িতে এখন প্রায় সাড়ে বারোটা। আমি এখন দাঁড়িয়ে [illegible] রাসেল স্ট্রীট, পার্ক স্ট্রীট, কারনানি ম্যানশনের [illegible] একতলায়—নীলামদার স্টেইনার এ্যান্ড কোং-এ। ডাক উঠছে [illegible] টাকা। ভালো কাঠের একটা ডাইনিং রুম ক্যাবিনেট। কিনতে [illegible] একজন ঝুঁকে [illegible] কাঁচের ওপর [illegible]। ক্যাবিনেটটার [illegible] দিলেন [illegible] 'দুশো'। [illegible] একজন [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

টাকায় ঐ ডাইনিং-রুম ক্যাবিনেটটা পেয়ে মাঝবয়সী ভদ্রলোকটি নিশ্চিন্তে সিগারেট ধরালেন।

চারিদিকে লোক গিজগিজ করছে। মাঝে মাঝে হুশ করে গাড়ি এসে থামছে। আবার কাদা-পায়েও ঢুকে পড়ছে বহু লোক। সবারই ইচ্ছা, তাদের পছন্দমতো জিনিসটি যেন তারা পায়। ভবানীপুরের দুই তরুণের সঙ্গে আলাপ হল। তাঁরা আজই প্রথম এসেছেন নীলামের বাজারে। উদ্দেশ্য, পছন্দ হলে একটা বুককেস কিনবেন। ঠিকমতো কিনতে পারলে বাজারের থেকে এখানে সস্তায় পাওয়া যায় বলেই তাঁরা এখানে এসেছেন। সস্তায় যে পাওয়া যায়, তার প্রমাণ আমি একটু আগেই পেয়েছি ডালহৌসী এক্সচেঞ্জে। রাসেল স্ট্রীটের ঐ দোকানে এক ভদ্রলোক মাত্র বাইশ টাকায় কিনলেন চারখানা হাওয়াই শার্ট।

কী পাওয়া যায় না এখানে? লোহার কড়াই থেকে শুরু করে দামী পাথরের বুদ্ধমূর্তি, পালংক, সেফটি রেজার ডাইনিং টেবিল-চেয়ার, কাঁচি, তালা-চাবি —সবকিছুই ক্রেতার জন্য নীলাম-টেবিলে উঠেছে।

স্টেইনারে তখন নীলামদার হাঁকছেন, 'বার্মা টিকের রাইটিং টেবল। একেবারে আনকোরা। ষাট টাকা। ষাট। বলুন কেউ।'

এক মাঝবয়সী ভদ্রমহিলা বললেন, 'পাঁয়ষট্টি।' অনেক বিবেচনা করে তিনি ঐ দাম বলেছেন বলেই মনে হয়। মুখ-চোখ একেবারে তীক্ষ্ণ। উত্তেজনায় দাঁতে নখ কাটতে শুরু করেছেন। আমি সারা দোকানটায় একবার ঘুরে নিলাম। ওদিকে, ঘরে, এককোণে এক দম্পতি একটা ডবল বেডের পালংক দেখছেন ঘুরে ঘুরে, আর নিজেদের মধ্যে ফিসফিস করে কথা বলছেন। স্বামী ভদ্রলোক সিগারেট ধরাচ্ছেন। ততক্ষণে বার্মা টিকের রাইটিং টেবিলটা সত্তর টাকায় একজন হেঁকে নিয়েছেন। বেশ ঝকঝকে চেহারা এক তরুণ।

এবার নীলাম হচ্ছে একটা সোফা-সেট। ডাক উঠেছে তিনশো কুড়ি টাকা। পঁচিশ। তিরিশ। শেষকালে তিনশো চৌত্রিশ টাকায় এক দম্পতি আরামদায়ক সোফা-সেটটি পেয়ে গেলেন। ভদ্রমহিলা সোফায় একবার বসে দেখেও নিলেন। তাঁদের দুজনকেই বেশ খুশি খুশি ভাব।

ভদ্রমহিলা ঘড়ি দেখলেন একবার। বোঝা গেল, দেরি হয়ে গেছে অনেক।

কোম্পানির একজনকে জিজ্ঞেস করে জানা গেল, দোকান খোলে এগারোটায় এবং নীলাম শেষ হবার পর বন্ধ হয়। কিন্তু সময় হাতে নিয়ে এখানে আসাই উচিত। বেশ ঘুরেফিরে কেনবা একটা আনন্দ আছে। তবে, সঙ্গে একজন থাকলে সুবিধে হয়। একা-একা পেরে ওঠা যায় না। একগুঁয়েমি করে ডাক উঠিয়ে যাতে না যায়। সেদিকেও লক্ষ্য রাখতে হবে।

ঘড়িতে প্রায় পৌনে দুটো। এখন আরো ভিড় বেড়েছে। নীলামদার তখনো হেঁকে চলেছেন, 'একটা এইচ এম ভি এ্যাস রেডিও। একেবারে নতুন' একটা লোক নবটা ঘোরাতেই মেয়েলী গলায় হিন্দুস্থানী গান ভেসে এল। ওদিক থেকে একজন কত দাম বললেন বোঝা গেল না।

একরাম আলি

আবৃত্তির আসর

আবৃত্তিলোক আয়োজিত সুজাতা সদনে গত ২৯ আগস্ট একটি আবৃত্তির অনুষ্ঠান হয়ে গেল। প্রসঙ্গ : কবি সুকান্ত ভট্টাচার্যের জন্মবার্ষিকী। অনুষ্ঠানে যোগদান করেছিলেন তৃপ্তি মিত্র, অমিয় রায়চৌধুরী, দেবদুলাল বন্দ্যোপাধ্যায়, শংকর ঘোষ, সৌমিত্র মিত্র, কাজল চৌধুরী, কুমকুম দে, কেয়া মুখোপাধ্যায় ও মাধবী কাহালী, কুমার রায় এবং আরো অনেকে।

প্রথম পর্বে সুকান্তর স্মরণে সুকান্তর কবিতা পাঠ ও আবৃত্তি করে শোনান শংকর ঘোষ, তৃপ্তি মিত্র, কেয়া মুখোপাধ্যায়, কুমকুম দে, দেবদুলাল বন্দ্যোপাধ্যায় ও কাজল চৌধুরী নিবিড় কণ্ঠে।

তৃপ্তি মিত্রের 'বোধন' কবিতার আবৃত্তি হৃদয় স্পর্শ করে যায়। 'বোধন' কবিতায় উচ্চারণ গলার নিচু পর্দা থেকে উঁচু পর্দায় অনায়াসে চলাফেরা অনেকক্ষণ কবিতার সঙ্গে একাত্ম করে তোলে। মনে দাগ কাটে শংকর ঘোষের কবিতা পাঠ। সৌমিত্র মিত্রের বিষ্ণু দে-র কবিতা '[illegible]ই চম্পা'র আবৃত্তিতে যথেষ্ট মুন্সিয়ানার পরিচয় ছিল।

দ্বিতীয় পর্বে 'স্বাধীনতা তুমি' এই শিরোনামে মধুসূদন দত্ত থেকে রবীন্দ্রনাথ, নজরুল, জীবনানন্দ [illegible] বুদ্ধদেব বসু, প্রেমেন্দ্র মিত্র, বি. দে, দীনেশ দাস, সমর সেন, সুভাষ মুখোপাধ্যায়, অরুণ মিত্র, বিমলচন্দ্র ঘোষ, সুকান্ত ভট্টাচার্য, মঙ্গলাচরণ চট্টোপাধ্যায়, বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, মণীন্দ্র রায়, রাম বসু, সিদ্ধেশ্বর সেন, নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী, অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত, শঙ্খ ঘোষ, শক্তি চট্টোপাধ্যায়, অমিতাভ দাশগুপ্ত, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, এবং বাংলাদেশের কবি আলাউদ্দিন আল আজাদ শামসুর রহমানের কবিতা, পাঠ ও আবৃত্তি শোনা গেল এই অনুষ্ঠানে।

তরুণ চৌধুরী

[illegible] পক্ষে শ্রীসুপ্রিয় সরকার কর্তৃক পত্রিকা প্রেস১৪ আনন্দ চ্যাটার্জি লেন, কলিকাতা-৩
[illegible] ১১।১, আনন্দ চ্যাটার্জি লেন, কলিকাতা-৩ হইতে প্রকাশিত।
মূল্য ৭৫ পয়সা ॥ অতিরিক্ত বিমান মাশুলে ৭ পয়সা ॥ ইণ্ডিয়ান অ্যাণ্ড ইস্টার্ণ নিউজ পেপার সোসাইটির সদস্য।

অমৃত
১৭ বর্ষ ২২ সংখ্যা
২০ আশ্বিন ১৩৮৪
7 Oct. 1977.

প্রচ্ছদকাহিনী

আগামী সংখ্যায়

প্রচ্ছদ কাহিনী
আমাদের পোশাক
লিখেছেন নিশীথরঞ্জন রায়

অমিয়ভূষণ মজুমদারের গল্প

উৎপলকুমার বসুর
একালের দাস ব্যবসা

কবিতা সিংহের
ম্লান ফটোগ্রাফ

এ সংখ্যার প্রচ্ছদ এঁকেছেন স[illegible] তাষ গুপ্ত. ভিতরের ছবি ও অলংকরণ সুবোধ দাশগুপ্ত এবং অসিত কুণ্ডু

আ মরি বাংলা ভাষা

বাংলাভাষায় সরকারি কাজকর্ম চালানো হবে বলে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। প্রস্তাবটি অবশ্য অনেক কাল আগেরই, কিন্তু তখন এ-বিষয়ে খুব যে একটা কাজ এগিয়েছিল এমন শোনা যায়নি। বরং আপত্তির কথাই শোনা গেছে নানাদিক থেকে। কখনো বলা হয়েছে যথেষ্ট রকম পরিভাষার অভাব আছে বাংলাভাষায়। কখনো আবার বাহানা শোনা গেছে, প্রয়োজনীয় সংখ্যার টাইপরাইটার নেই। ফলে উৎসাহের গ্যাস প্রস্তাবের বয়ান রচনাতেই শেষ হয়ে গিয়েছিল।

পৃথিবীর পূর্ণ বিকশিত ভাষাগুলোর মধ্যে বাংলার স্থান একেবারে প্রথমের দিকে। বাংলা সাহিত্য গোটা দুনিয়ার অন্যতম শ্রেষ্ঠ সাহিত্য। এই ভাষায় সরকারি কাজকর্ম চালানো যাবে না, এ-যুক্তি হাস্যকর বললেও বাড়িয়ে বলা হয় না। বাংলায় পরিভাষা নেই, কিন্তু বাংলা মানে কি সংস্কৃত ? এই বঙ্গদেশেই বহাল তবিয়তে বহুকাল পাঠান-মোগলেরা রাজকার্য চালিয়েছে, এবং অবশ্যই তা ইংরেজিতে চালানো হয়নি। পরিভাষার অভাবে তাদের রাজ্যপাট যে রসাতলে গেছে তাও শোনা যায়নি। আসলে সরকারি দপ্তরখানার পণ্ডিতেরা ইংরেজি ছাড়া আর কিছুই জানেন না বলেই এত টালবাহানা। নয়তো সরকারি কাজের পরিভাষা বঙ্গদেশে যথেষ্টই আছে। হয়তো সেগুলো লৌকিক শব্দ বা ফারসি। কিন্তু সাধারণ বাঙালিরা তা বোঝে, এখনো বোঝে। রাইটার্স বিল্ডিং-এর সাহেবরা যদি সেই শব্দগুলো শিখে নিতেন, সরকারি কাজ অতি সহজেই চালানো যেত।

তাছাড়া আরো দুটি শিখে নেবার জায়গা আছে—ত্রিপুরা এবং বাংলাদেশ। সকলেই জানেন, ত্রিপুরা যখন দেশীয় রাজ্য ছিল, তখন তার সরকারি কাজ বরাবরই চলত বাংলাভাষায়। কাজেই সেখানে তৈরি পরিভাষা অজস্র সংখ্যাতেই পাওয়া সম্ভব। আর বাংলাদেশ তো স্বতন্ত্র একটি রাষ্ট্র, তার কাজকর্ম যে বাংলাভাষাতেই চলে এ তো সর্বজনবিদিত।

তবে একটা কথা। পরিভাষা তৈরি করতে বসলে সবার আগে দেখা দরকার, চালু ইংরেজি কথাটি সাধারণভাবে গৃহীত হয়ে গেছে কিনা। যদি তা গিয়ে থাকে, এবং শব্দটি যদি বাংলাভাষার সঙ্গে ইতিমধ্যেই খাপ খাইয়ে নিয়ে থাকে, তাহলে আর নতুন করে শব্দ খোঁজার মানে হবে না। বরং তাতে সোজা কাজকে জটিল করে তোলা হবে। আগে যখন পরিভাষা কমিটি বসানো হয়েছিল তাতে এ-রকম বিপত্তির সূত্রপাত ঘটেছিল বলেই কথাটা বিশেষ করে মনে রাখা দরকার।

যাই হোক, ভালো কাজ একেবারে অবহেলিত থাকার চেয়ে দেরিতে শুরু হলেও ভালো। এতদিনে হয়তো বাংলাভাষার সত্যিকারের বন্ধনদশা ঘুচবে, এবং তার গতিও হবে আরো বেশি সচ্ছন্দ ও সর্বত্রগামী।

অজিতেশ কেয়া রুদ্রপ্রসাদ

কেয়ুর এবং কালিদা এখন আলাদা

নান্দীকার এবং নান্দীমুখ—এই দুই নামে দুটি নাটকের দলের বিজ্ঞাপন দেখলাম কাগজে।

নান্দীকার একটি পরিচিত নাম। এই নামের সঙ্গে এতদিন ধরে তিনজন জড়িত—অজিতেশ, কেয়া, রুদ্রপ্রসাদ।

কেয়া নেই।

এখন দেখছি : নান্দীকারে একটি নাম নেই। সে নাম : অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায়। এই বিখ্যাত নামটি জড়িত হয়েছে একটি নতুন দলের নির্দেশনায়। সে দল হোল—নান্দীমুখ।

আমরা ওই তিনজনকে একসঙ্গে ভাবতে অভ্যস্ত। কেয়ার মত অমন একজন মানুষের মৃত্যুর ধাক্কা বাংলা থিয়েটার এবং দর্শক এখনো সামলে উঠতে পারে নি। ওঠাও কঠিন।

তারপর ধাক্কা খেলাম সকালের কাগজের বিজ্ঞাপন দেখে। দুই দল। দুদিকে দুজনের নাম। কেয়ুর এবং কালিদা এখন আলাদা। হাজার হলেও অজিতেশ এবং রুদ্রপ্রসাদ—দুজনেই বাঙালী। ওঁরা আমাদের চরিত্র অনুযায়ী কাজ করেছেন। একটা জিনিস গড়ে তোলে ওঁরা দুজনে দু টুকরো করলেন। যিনি বেঁধে রেখেছিলেন তিনি নেই।

সওদাগরের নৌকো দেখতে গিয়ে আকাদেমিতে কেয়ার সঙ্গে দেখা হয়েছিল। দুই রোজের মাঝখানে দাঁড়িয়ে তিনি বলেছিলেন, আজ অজিতদার নাটক—আমি ভলান্টিয়ার।

বিনোদিনীতে রুদ্র ছিলেন—অ বাবু। অজিতেশ গিরীশ ঘোষ। কেয়া বিনোদিনী। অজিতেশ ডাকছেন—বিনোদ। মঞ্চের পেছনটায় ঝমঝম করে আগেকার বৃন্দবাদন।

ভালো মানুষে শান্তা রূপিণী কেয়ার সামনে সেজুন মালিক অজিতেশ। বিয়ের আসরে বর রুদ্র গান গাইছেন।

আন্তিগোনের মঞ্চসজ্জা নিয়ে বেশি রাতে রুদ্রের সঙ্গে ফোনে কথা হচ্ছিল। ১৪ রকমের রঙীন কাপড় দিয়ে মঞ্চকে ভাগ করা হয়েছিল। তার ভেতর দাঁড়িয়ে অজিতেশ কেয়াকে নিরাপদ রাস্তায় আনতে চাইছিলেন। নির্দেশনা : রুদ্রপ্রসাদ সেনগুপ্ত।

ফুটবলের প্রথম অভিনয়ের ক'দিন আগে কেয়ার ফোন। আমাদের বিশেষ অভিনয়—দেখবেন না ? বললাম, জানতাম না। অজিতদাকে বলুন। খুশী হবেন। আমার কথা বলবেন না যেন।

ঠা ঠা কোন্নগরে ফেরিঘাটা লেকের কাছে সিঁড়ি ভেঙে সেই চাবতলায়। অজিত খেতে বসেছিলেন। উঠে এলেন অজিতেশ। বললেন, এটা রাজের [illegible]

ভালো হোত। বেশ খরচের প্রোডাকশন। আমি একজন প্রযোজককে খোঁজ করছি। আমি কম খরচের প্রোডাকশন করি। উপন্যাসের একটি লেখা নিয়ে নাটক করবো।

ট্যাক্স। হল নেই। চড়া দরে ভাড়া ও বিজ্ঞাপন। উপযুক্ত নাটক নেই। কয়েক বছর ধরে দর্শককে অভ্যস্ত করে করে একদিনে দর্শকধন্য অ্যাক্টিভিটি পাওয়ার মুখে মুখে দু-টুকরো হয়ে গেলেন আপনারা। এখনো তো কেয়ার কাল-অশৌচের বছর কাটেনি। কেউ কি আপনারা ডিরেক্টর থেকে ডিক্টেটর হয়ে উঠেছিলেন ? কাউন্টার সেলের ক্যাশ অনেক সময় গ্রুপ থিয়েটার ভেঙে দেয়। কিন্তু যতদূর শুনেছি—ফুটবলের আয়ব্যয় প্রায় সমান সমান।

মহলা এবং অভিনয়—সবই ফুটবলে নাকি দারুণ দেখলাম তাহলে ?

তবে কি পার্সোনালিটি ক্ল্যাস ? অহং ? নামের বিজ্ঞাপনে ছোট বড় টাইপ ? বড় রোল ? ছোট রোল ? সেসব নিশ্চয় নয়। এসব তো পাড়ার ক্লাবে হয়।

আপনারা গ্রুপ থিয়েটার করে আসছেন এতদিন। থিয়েটার আপনাদের কাছে আন্দোলন। সবার ওপরে ডিসিপ্লিন। দু' আড়াই বছর আগে কেয়া থাকতে আপনারা তিনজন এসব কথাই একজায়গায় বসে বলেছিলেন। আপনাদের বয়স এখন তেতাল্লিশ থেকে পঁয়তাল্লিশের ভেতর। গরম দেশ। ব্লাড সুগার, টেনশন ইত্যাদি যো বিজ্ঞানের সহযোগী। বিদেশী নাটক তর্জমা, তার মহলা এবং তাকে মঞ্চসফল করার একটা পরিশ্রম আছে। কান্তি, কণ্ঠস্বর ও সতর্ক শিল্পী হয়ে থাকাও কঠিন। আমাদের আয়ু চল্লিশ বছর নয়। কর্মক্ষম, প্রতিভাবান, মধ্যবয়সীর সংখ্যা সব সময় খুব কম। আপনাদের আমরা 'প্রতিভা' বলতে শুরু করেছি। আর ঠিক এই সময়ে এই কাণ্ড !

হয়তো মানুষ বলেই এরকম করেছেন।

আপনাদের দুজনের দলকেই আমরা সব সময় অভিনন্দন জানাবো।

একটা জিনিস রুদ্রপ্রসাদ। আপনার ফুটবলের সঙ্গে ওদেশের যোগ কোথায় ? এক পাতা আবৃত্তি। গণবিবাহ। নাট্যসঙ্গীত। বিষ্ণু দের স্মৃতি সত্তা ও ভবিষ্যৎ। কাগজের বিজ্ঞাপনে এসব কথা রয়েছে। মানে নান্দীকারের সহযোগিতায় ওসব হবে। কেন ? আজও বুঝতে পারছি না।

প্রিয় দেশ আন্দোলন। আপনি এখন ব্রাত্য পাতেজীর দেখে

নান্দীকারে ভাঙন

চিত্তরঞ্জন ঘোষ

পয়লা সেপ্টেম্বর, বৃহস্পতিবার। অ্যাকাডেমিতে নান্দীকারের ফুটবল হওয়ার কথা। অগ্রিম বিক্রি ছিল প্রায় দেড় হাজার টাকা। সেই দিন টিকিট কিনতেও এসেছিল অনেকে। কিন্তু শো হলো না। নান্দীকার টাকা ফেরত দিল, দর্শকদের হয়রানি করার জন্য ক্ষমা চাইলো। দর্শকদের প্রশ্ন : কেন শো হবে না? নান্দীকারের উত্তর : অনিবার্য কারণে।

কী হতে পারে সেই অনিবার্যতা, তাই নিয়ে দর্শকদের মধ্যে আলোচনা চলে। বহু লোক জড় হয়েছে অ্যাকাডেমি হলের সামনে। অনুমানের চেষ্টা, আলোচনা, বিতর্ক বিবাদ, উত্তেজনা। নান্দীকারের জীবনে এ ঘটনা এর আগে কোনোদিন ঘটেনি। এই প্রথম। তাহলে কি নান্দীকার ভাঙছে? অন্তর্বিরোধ কোথায়? সে অনিবার্যের পর কথা যায় না? এইসব প্রশ্ন, ক্ষোভ, হতাশা ও কৌতূহলের মধ্যে সব দর্শক বারবার একটা কথা বলেছে, কেয়া থাকলে এমন হোতো না। হতে পারত না। শো বন্ধ হোতো না।

পরের দিন খবরটা অ্যাকাডেমি হল ছাড়িয়ে থিয়েটার অনুরাগী অনেক মানুষের কাছে পৌঁছলো। তাদেরও একটা কথা : কেয়া থাকলে নিশ্চয়ই ঠেকাতে পারতো।

নান্দীকারের সদস্য ও কর্মীদের প্রায় সবার মুখে ঐ একই কথা উচ্চারিত হতে শুনেছি : কেয়া নেই, তাই ঠেকানো গেল না। কেয়াদি থাকলে এমন হোতো না—হতে পারতো না।

সকলেরই অগাধ বিশ্বাস— প্রায় যেন অলৌকিক বিশ্বাস।

কেন এই বিশ্বাস? কী করেছিল কেয়া? কী ক্ষমতা ছিল কেয়ার? নাটকের জন্যে একজন সদস্য ছিল, নাটকের জন্যেই অভিনয়ের জন্যে চাকরি ছেড়েছিল। সংগঠনের জন্যে প্রচুর কাজ করত—বোধহয় নান্দীকারের ব্যস্ততম কর্মী ছিল সে। প্রচার, হিসেব ইত্যাদির দায়িত্ব ছিল তার। শেষদিকে প্রায় সব বইয়েরই নায়িকা ছিল সে। নান্দীকারের ছোট লাইব্রেরী প্রধানত তার উদ্যোগেই গড়ে ওঠে। গ্রামের জনসাধারণের কাছে নাটক কী ভাবে নিয়ে যাওয়া যায় তার জন্যে ছিল উদগ্রীব ও সচেষ্ট। কোনো ধরনের কাজেই পেছপাও নয় : যত পরিশ্রমই হোক, শরীর ভাঙুক, কাজ বাদ দিত না। দলের যে কোনো সংকটে এগিয়ে সামনে দাঁড়াতো। অর্থ সংকটের দিনে ব্যক্তিগত দায়িত্বে হাজার হাজার টাকা ধার করত, নিজের গয়না বিক্রি করত, বন্ধক দিত। ভাঙনের চিহ্ন দেখলে ঝাঁপিয়ে পড়ে ঠেকাতো। সৎ, আন্তরিক, উদ্যোগী কেয়ার কথা কেউ ফেলতে পারত না। তার ভালবাসা বেশি ছিল বলে জোরও বেশি ছিল। সে যেন ছিল নান্দীকারের বিবেক—এ কথা শুনতে অতিরঞ্জিত হলেও সত্য। শুধু নান্দীকারে নয়, তার বন্ধুমহলে, সহকর্মী মহলে ধীরে ধীরে ঐ রকম একটা স্থান তার হয়ে গিয়েছিল, হয়ে যেত। সবাইকে সে প্রখরভাবে সততার মুখোমুখি করিয়ে দিত—আত্মপ্রতারণা বা অন্য কোনো ভঙ্গী দিয়ে আড়াল করতে দিত না। এ বিবেক একটি শুধু বোধ মাত্র নয়, সক্রিয় একটি সত্তা। বন্ধুর দোষ দেখাতো সে নির্মমভাবে। অন্যদের গুণ দেখলে তাকে লালন করার সব দায়িত্ব হাসিমুখেই গ্রহণ করে নিত। নিজের এক কণা স্বার্থপরতা ছিল না বলে অন্যের স্বার্থপরতার সঙ্গে আপোস করত না। খুব সংক্ষেপে এই ছিল কেয়া।

নান্দীকারে মতান্তর মনান্তর এই নতুন ঘটছে না। অনেকবার হয়েছে। যেমন সব দলেই হয়ে থাকে। হয়েছে, আবার মিটেছেও। অনেকের শুভেচ্ছায় ও চেষ্টায়, বেশির ভাগ সময়ে কেয়ার চেষ্টায়।

একবারের কথা মনে পড়ছে। তখন নান্দীকার রঙ্গনায় নিয়মিত অভিনয় করে। একটি ঘটনায় নান্দীকার পুরো ভাঙনের মুখে এসে পড়ে। রঙ্গনা থেকে চলে আসে অজিত। বাড়িতে কিছু দুঃখ ক্ষোভ প্রকাশ করে, রাতের খাওয়া সেরে, অজিত শুয়ে পড়ে। রাত বারোটায় দরজায় ঠক-ঠক শব্দ। দরজা খুলে দেখা গেল—কেয়া, রুদ্র, সুব্রত। কেয়া এর মধ্যে অনেকের সঙ্গে তর্ক করেছে, আলোচনা করেছে। নান্দীকার ভেঙে যাবে এই দুঃখে নিভৃতে কেঁদেছে। কথাবার্তার শেষ ধাপ—অজিতের বাড়িতে। যখন মীমাংসা হোলো তখন রাত সাড়ে তিনটে। বাকি রাতটা সবাইকে ওখানে থাকতে বললো অজিত। কিন্তু ভাঙন রোধ করে কেয়ার প্রাণে তখন ফুর্তি এসে গেছে। তা ছাড়া, রাতের কলকাতা দেখতে কেয়া ভালবাসতো। সুতরাং বেরিয়ে পড়া যাক। বেলেঘাটায় নতুন লেক হয়েছে। সেটা ভালো করে দেখা হয় নি। রাতে সেটা দেখতে নিশ্চয়ই খুব ভালো লাগবে। চল। কেউ না যায়, কেয়া একাই যাবে। কেয়া বেরোলো। নতুন বেলেঘাটার চওড়া রাস্তা। একদম ফাঁকা। একটু এগোলে অন্য রাস্তা। রাস্তায় লোক শুয়ে আছে যথারীতি। এই যারা ফুটপাতে শুয়ে জীবন কাটাচ্ছে তাদের জীবনের সঙ্গে নান্দীকারের নাটকের কোনো সম্পর্ক আছে? নেই। তাহলে কীসের এই ঝগড়া-বিবাদ? ঝগড়ায় [illegible] লজ্জা হওয়া উচিত, কাজের কাজ [illegible] করতে পারা গেল না। ঝগড়া আর ঝগড়া-মেটানোয় এনার্জি না দিয়ে আসল কাজে দেওয়া দরকার। সাধারণ মানুষের কাছে পৌঁছনো দরকার। নইলে নাটক করে কী লাভ? নান্দীকার রেখে, তার ভাঙন রুখেই বা লাভ কী? এইটুকু লাভ যে পরে চেষ্টা করা যাবে। নান্দীকার না থাকলে তো চেষ্টাও করা যাবে না।

শেষ রাতের নিঃশব্দ নির্জনতায়, আলোয়, আঁধারে বেলেঘাটার রাস্তায় হাঁটে কেয়া। আশ্চর্য আলাদা দেখাচ্ছে এখন কলকাতাকে। বিরোধ মিটেছে বলে একটু নিশ্চিন্ত লাগে কেয়ার। ভোর-ভোর সময়ে বাড়ি ফিরে শিশুর মতো ঘুমোয় কেয়া।

এবার কী হোলো? পয়লা সেপ্টেম্বর শো হোলো না। রাতে মিটিং হোলো—প্রায় সারা রাত। তাতে মীমাংসার জন্য কথাবার্তা চালাবার সিদ্ধান্ত হয়। কারো কারো ওপর এই দায়িত্ব দেওয়া হয়। তাঁদের চেষ্টায় ৮ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত এক ধরনের **স্থিতাবস্থায় সকলে রাজী হয়। এই**

মৃত্যুদণ্ড শেষ বিচার হতে পারে না

যোগনাথ মুখোপাধ্যায়

জিঘাংসা মানুষের পাশব অতীতের উত্তরাধিকার। পশু-জগতে হত্যাই জীবনের অলংঘ্য শর্ত। নিজের বাঁচার জন্য চাই অন্যের জীবন, নিজের নিরাপত্তার জন্য চাই অন্যের বিনাশ। ক্ষুদ্র বৃহতের শিকার, বৃহৎ বৃহত্তরের। প্রকৃতির রাজ্যে জীবন তাই বাঘের মুখে থাকা হরিণের মতো সর্বদাই সচকিত এবং বিপন্ন।

হত্যা নিঃশ্বসিত পশু জীবন থেকে মানুষের মনুষ্যত্বে উত্তরণ লক্ষ বছরের কাহিনী হলেও পশু জীবনের অনিবার্য প্রবৃত্তি-গুলি আজও মানুষের মনের মধ্যে শিকড় ছড়িয়ে রয়েছে। মানুষের বিচার-বুদ্ধি, মানবিক বোধ ও সংযম ঐসব পাশব প্রবৃত্তিকে নিয়ন্ত্রণে রাখে। মনুষ্যত্ব লাঞ্ছিত হলেও ক্রুদ্ধ এবং উত্তেজিত পশুত্বকে আবার ছাড়া হতে দেয় না। কিন্তু মুহূর্তের অসতর্কতায় কিংবা প্রশ্রয়ে চাপা থাকা পশুত্ব যখন শিকল ছেঁড়া হিংস্র জন্তুর মত দুঃসহ উত্তেজনায় দিশাহারা হয়, তখন পলকে মানুষ তার আরণ্যক অতীতে ফিরে যায়, জিঘাংসা হয় তার আত্মঘাতিক বৃত্তি। মানুষ মানুষকে পশুর মত আঘাত করে হত্যা করে। সুতরাং হত্যাকারী প্রকৃতপক্ষে পরাজিত মনুষ্যত্বের অসহায় বলি। সে জয়ী নয়, সে পরাস্ত। তাকে বাঁধার প্রয়োজন আছে, নিরাপত্তার প্রয়োজনে সমাজ থেকে দূরে সরিয়ে দেওয়ার দরকার আছে। কিন্তু তাকে পশুর মত হত্যা করা অনিবার্য প্রয়োজন কিনা—এ প্রশ্ন খুব বেশি দিনের না হলেও আজ বিশ্ব-জনীন।

দেশে দেশে সমাজবিজ্ঞানী, মানবদরদী ও রাষ্ট্রনায়কদের কাছে জিজ্ঞাসা—মৃত্যুদণ্ড তো হাজার হাজার বছর ধরে অগণিত মানুষকে দেওয়া হয়েছে, কিন্তু তাতে সমাজজীবন বিপন্মুক্ত হয়েছে কি? আজও পৃথিবীর অধিকাংশ দেশেই একটি জীবনের বদলে অপর জীবন নেওয়া হয়, লক্ষ লক্ষ মানুষের চোখের সামনে হত্যাকারী কিংবা রাষ্ট্রদ্রোহীকে গুলি করে, ফাঁসি দিয়ে, তরোয়াল দিয়ে মাথা কেটে, এমন কি পিটিয়ে মারা হয়। তবু ঐসব দেশে রাষ্ট্রদ্রোহী ষড়যন্ত্র কিংবা নরহত্যা বন্ধ হয়েছে কি? হত্যা দিয়ে যে হত্যার প্রতিকার হয় না, একি আজ কোন প্রমাণের অপেক্ষা রাখে? চার হাজার বছর আগে ব্যাবিলনের রাজা হামুরাবির লেখা দণ্ডবিধিতে মৃত্যুদণ্ডের উল্লেখ পাওয়া যায়। আজও সভ্য দুনিয়ায় মৃত্যুদণ্ড বহাল আছে। কিন্তু তারই পাশাপাশি সমান্তরাল গতিতে চলে এসেছে নরহত্যা। —হত্যা জীবিকার জন্য, হত্যা খেলার জন্য, হত্যা অকারণে, হত্যা অনিচ্ছায় বশে।

কিন্তু মৃত্যুদণ্ড শুধু হত্যাপরাধেই দেওয়া হয়েছে, একথা মনে করলে ভুল বলা হবে। হাজার হাজার বছর ধরে, এমন কি উনিশ শতাব্দীতেও এমন সব কারণে অসংখ্য হতভাগ্যকে জীবন দিতে হয়েছে যেগুলি সামান্যতম অপরাধ বলেও আজকের মানুষের কাছে গণ্য হওয়া সম্ভব নয়। মিশর, ব্যাবিলন, অ্যাসিরিয়া, হিব্রু, পারস্য, গ্রীস, রোম—সব প্রাচীন সভ্যতায় মৃত্যুদণ্ডের বিধান ছিল এবং মৃত্যুদণ্ড-যোগ্য অপরাধ তালিকায় এমন সব অপরাধের উল্লেখ ছিল, যেগুলির জন্য একালে ছ মাস কারাদণ্ডও কঠিন শাস্তি বিবেচিত হয়। যেমন হামুরাবির দণ্ডবিধিতে মদ বেচায় দুর্নীতি ছিল মৃত্যুদণ্ডযোগ্য অপরাধ, ইহুদি (হিব্রু) আইনে মূর্তিপূজার শাস্তি ছিল মৃত্যুদণ্ড। ভুল করেও কেউ যদি রাজার সিংহাসনে বসে পড়ত তাহলে প্রাচীন পারসিক আইনে সে বেচারার প্রাণ বাঁচানোর কোন উপায় ছিল না। পেরিক্লিসের সময়ে গ্রীসে পুরাকীর্তির অসম্মানের (স্যাক্রিলেজ) মূল্য দিতে হত প্রাণ দিয়ে। প্রাচীন রোমে প্রজাতন্ত্রে একজনের খেতের আনাজপাতির চারা চুরি করারও সর্বোচ্চ শাস্তি ছিল মৃত্যুদণ্ড। ব্যভিচার, মূর্তিপূজা, [illegible] ছড়ানো, [illegible] ইত্যাদির [illegible]

হাজার হাজার বছর ধরে সভ্য দুনিয়ার অগণিত হতভাগ্যকে প্রাণ বলি দিতে হয়েছে।

ইংলণ্ডে পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষে আটটি গুরুতর অপরাধের জন্য মৃত্যুদণ্ডের বিধান ছিল। সে অপরাধগুলি হল— রাষ্ট্রবিরোধী ষড়যন্ত্র (প্রস্তুতি ও প্রয়াসসহ), ক্ষুদে ষড়যন্ত্র (যেমন কারও স্বামীকে হত্যার চেষ্টা), খুন, চুরি, ডাকাতি, সিঁধ কেটে চুরি, ধর্ষণ ও অগ্নি সংযোগ। কিন্তু পরবর্তীকালে ঐ তালিকা সমানেই দীর্ঘ হতে থাকে এবং টিউডর ও স্টুয়ার্ট যুগে প্রায় সব অপরাধই, যেমন ঘোড়া চুরি, ভেড়া চুরি, পার্ক থেকে গাছ কাটা, মৃত্যুদণ্ডযোগ্য অপরাধ বলে ঘোষণা করা হয়। ১৭৮০ সালে, প্রথম তিন হ্যানোভার বংশীয় রাজার রাজত্বের শেষে বৃটেনে মৃত্যুদণ্ডযোগ্য অপরাধের সংখ্যা দাঁড়ায় ৩৮০।

আর মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করতে যে সব ব্যবস্থা একদা প্রচলিত ছিল তা একালে কল্পনা করাও কঠিন। ফাঁসি, পুড়িয়ে মারা, গরম তেলের কড়ায় ফেলে দেওয়া, হিংস্র পশুর মুখে ছেড়ে দেওয়া, জীবন্ত মানুষের ছাল ছাড়িয়ে নেওয়া, জলে ডুবিয়ে মারা, পেষণযন্ত্রে গুঁড়িয়ে ফেলা, ক্রুশবিদ্ধ করা, ঢিলিয়ে মারা, শূলে চড়ানো, শ্বাসরোধ করে হত্যা করা, শিরশ্ছেদ করা, ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করা, ঊর্ধ্ববাহু করে বেঁধে নাড়িভুঁড়ি টেনে বার করা প্রভৃতি ব্যবস্থা দেশে দেশে বিভিন্ন সময়ে প্রচলিত ছিল। তবে নৃশংসতার সব দৃষ্টান্ত ছাড়িয়ে গিয়েছিল প্রাচীন পারস্যের 'নৌকা পদ্ধতি,' তাতে দণ্ডিতকে একটি নৌকায় শুইয়ে তার ওপর আর একটি নৌকা উপুড় করে চাপিয়ে দেওয়া হত, যার ভিতর থেকে বেরিয়ে থাকত শুধু দণ্ডিত ব্যক্তির মাথা ও হাত পা। তারপর মুখে ও হাত পায়ে মধু মাখিয়ে তার ওপর পিঁপড়ে মৌমাছি, বোলতা প্রভৃতি ছেড়ে দেওয়া হত। মুখটা থাকত সূর্যের দিকে উন্মুক্ত করা। যাতে চট করে অপরাধীর মৃত্যু না হয় তার জন্য মাঝে মাঝে জোর করে তাকে কিছু খাওয়ানো হত। ঐভাবে কয়েক দিন থাকার পর, কীট দংশনে সমগ্র দেহ বিষাক্ত হয়ে সেই হতভাগার মৃত্যু ঘটত। আমাদের দেশের রাজা-উজির জমিদাররাও একদা অর্ধ-প্রোথিত মানুষকে ডালকুত্তা দিয়ে খাওয়ানোর মত নানা নিষ্ঠুর পদ্ধতি উদ্ভাবন করেছিলেন বলে গল্প শোনা যায়। বর্তমানে আরব দুনিয়ায় ও আফ্রিকায় মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিতকে প্রকাশ্যে জনতার সামনে গুলি করে, তরবারি দিয়ে মাথা কেটে অথবা ফাঁসি দিয়ে হত্যা করার ব্যবস্থা প্রচলিত আছে। কিন্তু পৃথিবীর যে সব দেশে এখনও মৃত্যুদণ্ড প্রচলিত আছে তার বেশির ভাগই ঐ দণ্ড অতিদ্রুত, সবচেয়ে কম কষ্টদায়ক পদ্ধতিতে ও গোপনে, লোকচক্ষুর আড়ালে সাঙ্গ করার পক্ষপাতী। বৃটেনে ও কমনওয়েলথভুক্ত দেশগুলিতে ফাঁসি সর্বাধিক প্রচলিত পদ্ধতি। ফ্রান্সে গিলোটিনে দণ্ডিতের শিরশ্ছেদ করা হয়। স্পেনে মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করা হয় গ্যারোট নামক যন্ত্রে। তাতে অপরাধীর গলায় একটি তামার বেড়ি পরিয়ে তার স্ক্রু এঁটে এঁটে সেটিকে ছোট করা হয় আর সেই সঙ্গে শ্বাসরুদ্ধ অপরাধীর গলায় সেই সব স্ক্রুর আগার দিকটা সিঁধিয়ে যায়। অর্থাৎ শুধু শ্বাসরোধই নয়, সেই সঙ্গে বিঁধে যাওয়া স্ক্রুর অসহ্য যন্ত্রণা সহ্য করতে করতে হতভাগ্য অপরাধী এক সময় প্রাণ হারায়। প্রাচীন গ্রীসে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিতকে বিষ খেয়ে আত্মহত্যার বিকল্প বেছে নিতে বলা হত এবং সক্রেটিস তাই করেছিলেন। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের যে সব রাজ্যে এখনও মৃত্যুদণ্ড বহাল আছে সেখানে অপরাধীকে গ্যাসচেম্বারে ঢুকিয়ে কিংবা বৈদ্যুতিক চেয়ারে বসিয়ে হত্যা করা হয়। কোন কোন রাজ্যে অপরাধীর ইচ্ছামত ফায়ারিং স্কোয়াডের সামনে দাঁড় করিয়ে অথবা উল্লিখিত দুটি পদ্ধতির যে কোন একটি প্রয়োগ করে জীবনের

Brazil 1967

পরিসমাপ্তি ঘটান হয়। ভারতে মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করা [illegible] জেলের ভিতরে, রাত্রির অন্ধকারে। সে সময় সেখানে কিছু প্রহ[illegible] ও কয়েকজন সরকারি কর্মচারী উপস্থিত থাকেন। ফাঁসির ম[illegible] তোলার আগে দণ্ডিতের সঙ্গে যতটা সম্ভব সহৃদয় ব্যবহার ক[illegible] হয়। তাকে শেষ প্রার্থনার সুযোগ দেওয়া হয় এবং তার ধর্মবিশ্ব[াস] অনুযায়ী একজন যাজক উপস্থিত থেকে তার পারলৌকিক ম[ঙ্গল] কামনা করেন।

মানব সভ্যতার সূচনাকালে যে কোন অপরাধকে ব্যক্তি[র] বিরুদ্ধে ব্যক্তির অপরাধ বলে মনে করা হত এবং সংশ্লিষ্টদে[র] তার প্রতিকার করতে হত। কেউ হত্যা করলে নিহত ব্যক্তি[র] আপনজনেরা একজোট হয়ে সাধ্যমত তার বদলা নিত। [illegible] মানব সমাজ সংঘবদ্ধ ও সুসংহত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে অপরা[ধ] সম্পর্কে ধারণা পাল্টাতে থাকে, এবং চার হাজার বছর আগে [illegible] রাবির দণ্ডবিধিতেই দেখা যায় অপরাধকে ব্যক্তির বিরুদ্ধে [illegible] বলে সমগ্র সমাজের বিরুদ্ধে অপরাধ বলে ঘোষণা করা হয়েছে এবং অপরাধীর দণ্ডবিধানের দায়িত্ব রাষ্ট্রের ওপর দেওয়া হয়েছে সাড়ে তিন হাজার বছর আগে হিব্রু রাজ্যেও যে কোন অপরাধ[কে] রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে অপরাধ বলে ঘোষণা করা হয়।

রাষ্ট্রের শৃঙ্খলা রক্ষার দায়িত্ব রাষ্ট্রনায়কদের। সুতরা[ং] সাবধানের মার নেই ভেবে তাঁরা যে কোন অপরাধকেই [illegible] দণ্ডনীয় বলে ঘোষণা করেন। সমাজ গড়ে উঠেছে পরিবার নিয়ে সুতরাং সমাজের শান্তির স্বার্থে কোন পরিবারে অশান্তি ঢুকতে দেওয়া হবে না। তাই ব্যভিচার, অসতীত্ব, স্বামীর বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র, এমন কি বাপ-মার প্রতি কটূক্তি আইনত নিষিদ্ধ হল অতি সাবধানীরা মৃত্যুদণ্ডের শাস্তি বিধান দিলেন ঐসব অপরাধের জন্য। [illegible]

[illegible] ছিল খুবই, শীতপ্রধান দেশে পশম ও মাংসের জন্য ভেড়া ছিল অমূল্য। অতএব ঘোড়া চুরি, ভেড়া চুরির মত কাজও মৃত্যু-দণ্ডযোগ্য অপরাধ বলে ঘোষিত হল ইংলণ্ডে। সমাজে অপরাধ-প্রবণতা প্রশ্রয় পাওয়া উচিত নয়, সে কারণে দোকান থেকে পাঁচ শিলিং-এর বেশি দামের জিনিস চুরি, রাস্তার ধারের বা পার্কের গাছ কাটা, এমন কি খরগোশ শিকার পর্যন্ত একদা মৃত্যুদণ্ডযোগ্য অপরাধ বলে ঘোষিত হয়েছিল ইংলণ্ডে ও ইউরোপের বহু দেশে। এইভাবেই মৃত্যুদণ্ডযোগ্য অপরাধের সংখ্যা বাড়তে বাড়তে তিনশ'র কাছাকাছি দাঁড়ায়।

কিন্তু, ইংলণ্ডের মানুষের সেই ভ্রম হ্রাস হল বেশিদিন দেখল সাধারণতম অপরাধের জন্য মৃত্যুদণ্ডের বিধান থাকা সত্ত্বেও অপরাধ না কমে দিনে দিনে বেড়েই চলেছে। সমাজ-বিজ্ঞানীদের পক্ষে কারণ খুঁজে পাওয়াও কঠিন হল না। তাঁরা বললেন, অপরাধের বিচারকেরা মানুষ, দস্যু নন। ভেড়া চুরির জন্য ৬ মাস জেল তাঁরা অপরাধীকে অনায়াসেই দিতে পারেন, কিন্তু তার জন্য ফাঁসির নির্দেশ দেওয়ার মত নির্দয় কেউই হতে পারেন না। বিচারপতিদের এই অনুকম্পাই লঘু অপরাধে গুরু দণ্ডের প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়াচ্ছে। সুতরাং শাস্তির বিধান দিতে হবে অপরাধের গুরুত্ব অনুসারে।

স্যার রবার্ট পীল যখন বৃটেনের প্রধানমন্ত্রী, তখনই এই নতুন দৃষ্টিভঙ্গী অনুসারে দণ্ডবিধি সংশোধিত হয়। অপ-রাধের শাস্তি নির্দিষ্ট হয় অপরাধের গুরুত্ব অনুসারে। শাস্তির উদ্দেশ্য প্রতিশোধ বা বদলা নেওয়া নয়, শাস্তির উদ্দেশ্য সংশোধন —এই নীতিও সে সময় রাষ্ট্রীয় স্বীকৃতি লাভ করে। বৃটেনে ১৮৩৭ সালে মৃত্যুদণ্ডযোগ্য অপরাধের সংখ্যা হ্রাস পেয়ে হয় ১৫ এবং ১৮৬১ সালে মাত্র ৪টি অপরাধে মৃত্যুদণ্ডের বিধান বলবৎ থাকে। সে অপরাধগুলি হল—নরহত্যা, পুলিশ হেফাজত থেকে পালানো ও মালপত্রের সমুদ্রে গোপনভাবে বাধাদানের চেষ্টা, [illegible] ও অস্ত্রাগারে আগুন অথবা ধ্বংসের চেষ্টা এবং রাষ্ট্রদ্রোহিতা। আবার এর শতাব্দীকাল পরে, ১৯৬৫ সালে বৃটেনে মৃত্যুদণ্ড সম্পূর্ণ লোপ পায়।

বৃটিশ শাসনকালে আমেরিকায় মোট ১২টি অপরাধে মৃত্যুদণ্ডের বিধান ছিল। কিন্তু দণ্ডবিধি এখনকার মত তখনও ছিল রাজ্য তালিকাভুক্ত বিষয়, সমগ্র উপনিবেশে কোন কেন্দ্রীয় দণ্ডবিধি বলবৎ ছিল না। ফলে মৃত্যুদণ্ড সম্পর্কে রাজ্যগুলির মনোভাব ও নীতিতে ছিল ব্যাপক পার্থক্য। যেমন ম্যাসাচুসেট রাজ্যে পৌত্তলিকতা, ডাইনিবিদ্যা, ঈশ্বর নিন্দা (ব্ল্যাসফেমি), নরহত্যা, মারাত্মক আঘাত হানা, পায়ুকাম (সডমি), ব্যাভিচার (অ্যাডালটারি), নারীধর্ষণ, মানুষ চুরি, মৃত্যুদণ্ডযোগ্য অপরাধে মিথ্যা সাক্ষীদান ও রাষ্ট্রদ্রোহিতার জন্য মৃত্যুদণ্ডের বিধান ছিল। আবার পেনসিলভানিয়া রাজ্যে মাত্র রাষ্ট্রদ্রোহিতা ও নরহত্যা—এই দুটি অপরাধ মৃত্যুদণ্ডযোগ্য বিবেচিত হত।

ঊনিশ শতকের গোড়াতেই আমেরিকায় মৃত্যুদণ্ডের বিরুদ্ধে আন্দোলন শুরু হয় এবং ১৮৪৫ সালে গঠিত হয় 'আমেরিকান সোসাইটি ফর দি অ্যাবোলিশান অফ ক্যাপিটাল পানিশমেন্ট'। আজ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে কার্যত মৃত্যুদণ্ডের অবসান হয়েছে, কিন্তু সে আলোচনায় পরে আসছি। এখন মৃত্যুদণ্ড রদের বিরুদ্ধে গোড়ার আন্দোলনের কথা বলি।

মৃত্যুদণ্ডের বিরুদ্ধে প্রথম আন্দোলন গড়ে ওঠে ইউরোপে, অষ্টাদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি। এ ব্যাপারে সবচেয়ে বেশি সাড়া জাগায় ইতালির বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ ও অপরাধ-বিজ্ঞানী সি বি বেচারিয়ার প্রবন্ধ 'দেই দেলাত্তি ই দেলি পেনে' (অপরাধ ও শাস্তি), যা ১৭৬৭ সালে প্রকাশিত হয় ও অল্প কিছু দিনের মধ্যেই সমস্ত ইউরোপীয় ভাষায় অনূদিত হয়। ফ্রান্সের বিশিষ্ট মানবতাবাদী চিন্তানায়ক ভলতেয়ার ঐ প্রবন্ধের যুক্তির দ্বারা প্রভাবিত হন এবং তিনিও মৃত্যুদণ্ড লোপের ধ্বনি তোলেন। ভলতেয়ার বলেন, শুধুমাত্র ঐ একটি রচনার জন্যই বেচারিয়া অবিস্মরণীয় হয়ে থাকবেন। ইংলণ্ডে মৃত্যুদণ্ড রদের দাবিতে সমর্থন জানালেন ডেভিড হিউম, অ্যাডাম স্মিথ, টমাস পেইন, জেরেমি বেনথাম প্রমুখ মানবতাবাদী মনীষী। রাশিয়ার সম্রাজ্ঞী ক্যাথারিন বেচারিয়ার যুক্তি ও আবেদনে প্রভাবিত হয়ে রাশিয়ায় মৃত্যুদণ্ড রদের নির্দেশ দেন।

বেচারিয়ার বক্তব্যের সার কথা—অভিযুক্ত ব্যক্তিমাত্রই অপরাধী নয়। সুতরাং অভিযুক্তের উপর পীড়ন না করে তাকে আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগ দিতে হবে। বিচার হতে হবে প্রকাশ্য আদালতে এবং উভয় পক্ষের যুক্তি বিচারকে নিরপেক্ষ মন নিয়ে শুনতে হবে। আর অপরাধীকে শাস্তি দিতে হবে অপ-রাধের গুরুত্ব অনুসারে। তিনি মৃত্যুদণ্ড সম্পূর্ণ লোপের প্রস্তাব দেন এবং নরহত্যার জন্য যাবজ্জীবন কারাদণ্ডই [illegible] শাস্তি বলে অভিমত প্রকাশ করেন। এই প্রসঙ্গে তিনি [illegible]-সংস্কারেরও প্রস্তাব দেন। তিনিই প্রথম বলেন, অপরাধীকে শাস্তিদানের উদ্দেশ্য প্রতিশোধ নেওয়া নয়, তাকে সংযত ও সংশোধিত করা। এই জন্য তিনি লঘু ও গুরু অপরাধের অপরাধীদের কারাগারে এক জায়গায় না রাখার প্রস্তাব দেন।

বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে, বেচারিয়ার দণ্ডনীতি সম্পর্কিত প্রস্তাব ও সুপারিশ আজ পৃথিবীর প্রায় সমস্ত সভ্য রাষ্ট্রে নীতিগতভাবে গৃহীত হয়েছে। বেচারিয়ার প্রস্তাবের আগে ইউরোপের খুব কম দেশেই কারাগার ছিল। অপরাধীদের চাবুক মারা, গরম ছেঁকা দিয়ে দাগিয়ে দেওয়া, হাত-পা কেটে দেওয়া প্রভৃতি ছিল ছোট অপরাধের শাস্তি। বড় অপরাধের শাস্তিগুলির কথা ত আগেই বলা হয়েছে। দৈহিক পীড়ন ছাড়া যে শাস্তি হতে পারে, সপ্তদশ শতাব্দীর আগে পর্যন্ত ইউরোপের মানুষ সে কথা ভাবতে পারে নি। আবার কারাগারও প্রথম দিকে ছিল অন্ধকূপের মত ভয়ংকর। সেখানে প্রবেশের পর খুব কম লোকই জীবিত

বেরিয়ে আসতে পারত, যারা আসত, রুগ্ন দেহ নিয়ে বাকী জীবন সমাজের বোঝা হয়ে বেঁচে থাকত। কারাগার যে সংশোধনাগার এবং বিভ্রান্ত বিপথগামী মানুষকে আবার সমাজ জীবনের উপযোগী করে গড়ে তোলাই যে তার কাজ, রাষ্ট্রবিধায়কদের এ উপলব্ধি সম্পূর্ণ হতে অষ্টাদশ শতাব্দী অতিক্রান্ত হয়েছে।

ইউরোপের অণুরাষ্ট্র লিখটেনস্টিনে ১৭৯৮ সালের পর কারও মৃত্যুদণ্ড কার্যকর হয় নি। তার পরেই এ ব্যাপারে অগ্রণী দেশ ইউরোপের অপর ক্ষুদ্র রাষ্ট্র লাক্সেমবুর্গ, সে দেশে শেষ ফাঁসি হয় ১৮২১ সালে। এর পর উদ্যোগী হতে দেখা যায় লাতিন আমেরিকার দেশগুলিকে। ভেনেজুয়েলায় মৃত্যুদণ্ড রদ হয় ১৮৬৩ সালে, কোস্টারিকায় ১৮৮০, ব্রেজিলে ১৮৯১, ইকুয়েডরে ১৮৯৭, পানামায় ১৯০৩, উরুগুয়েতে ১৯০৭, কলম্বিয়ায় ১৯১০, আর্জেন্টিনায় ১৯২২, ডোমিনিকান রিপাবলিকে ১৯২৪ ও মেক্সিকোয় ১৯২৮ সালে। পর্তুগালে মৃত্যুদণ্ড রদ হয় ১৮৬৭ সালে এবং স্পেনে ১৯১০ সালের পর কাউকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয় নি। প্রকৃতপক্ষে ইউরোপের আইবেরিয়া উপদ্বীপের ঐ দুটি দেশের সিদ্ধান্তই লাতিন আমেরিকায় তাদের প্রাক্তন উপনিবেশগুলিকে এই ব্যাপারে প্রভাবিত করে। ফিনল্যাণ্ডে ১৮২২ সালের পর অসামরিক অপরাধে কোন ব্যক্তিকে প্রাণদণ্ড দেওয়া হয় নি। এবং ১৯৪৯ সালে ঐ দেশে মৃত্যুদণ্ড সম্পূর্ণ রদ হয়। সুইডেনে মৃত্যুদণ্ড রদ হয় ১৯২১ সালে এবং ডেনমার্কে ১৯৩০ সালে। অস্ট্রিয়া, সুইজারল্যাণ্ড, পশ্চিম জার্মানী, আইসল্যাণ্ড ও ইতালিতে চল্লিশের দশকে মৃত্যুদণ্ড লোপ পায়।

কমনওয়েলথ দেশগুলির মধ্যে প্রথম মৃত্যুদণ্ড ও সেই সঙ্গে বেত্রদণ্ড লোপ পায় নিউজিল্যাণ্ডে। অস্ট্রেলিয়ার ছটি অঙ্গরাজ্যের মধ্যে চারটিতে মৃত্যুদণ্ড নেই। শ্রীলংকায় পরলোকগত প্রধানমন্ত্রী সলোমন বন্দরনায়েকের শাসনকালে মৃত্যুদণ্ড লোপ পায়। কিন্তু বন্দরনায়েক স্বয়ং আততায়ীর হাতে নিহত হওয়ার পর ৪৮ ঘন্টার মধ্যে সেদেশে আবার মৃত্যুদণ্ড বহাল হয়। কানাডায় মৃত্যুদণ্ড রদ হয় ১৯৬৭ সালে। এশিয়ার দেশগুলির মধ্যে মৃত্যুদণ্ড নেই নেপালে ও ইজরাইলে। নেপালে ১৯৩১ সালে মৃত্যুদণ্ড রদ হয়। ইজরাইলে ১৯৫৪ সাল থেকে নরহত্যার জন্য মৃত্যুদণ্ড বন্ধ হয়েছে, কিন্তু রাষ্ট্রদ্রোহিতা ও নাজি জার্মানীর সঙ্গে সহযোগিতা সেদেশে এখনও মৃত্যুদণ্ডযোগ্য অপরাধ।

বৃহৎ রাষ্ট্র নামে পরিচিত ৫টি দেশের মধ্যে একমাত্র বৃটেনে মৃত্যুদণ্ড রদ হয় ১৯৬৫ সালে। ফ্রান্স, রাশিয়া, চীন ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে এখনও বিভিন্ন অপরাধে প্রাণদণ্ড দেওয়া হয়, যদিও তার সংখ্যা অনেক কমে এসেছে। রক্ষণশীলতা ও সতর্ক অগ্রগতি বৃটেনের জাতীয় চরিত্রের বৈশিষ্ট্য। কোন আবেগ-প্রতিক আন্দোলনই ঐ দ্বীপ রাষ্ট্রটিকে সহজে প্রভাবিত করতে পারে না। তাই দীর্ঘ পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর সেদেশে মৃত্যুদণ্ড রদের প্রস্তাব পার্লামেন্টে উত্থাপিত হয় এবং শ্রমিক সরকারের পক্ষ থেকে ঐ প্রস্তাব উত্থাপিত হলেও শ্রমিক দল বা রক্ষণশীল দলের সদস্যদের ওপর ভোট দেওয়ার ব্যাপারে কোন দলীয় নির্দেশ বা হুইপ থাকে না। উভয় দলের সদস্যই নিজের বিচার-বিবেচনা মত প্রস্তাবের পক্ষে বা বিপক্ষে ভোট দেন। তারপরও সমগ্র পরিস্থিতির উপর সতর্ক দৃষ্টি রাখা হয়েছে এবং মাঝে মাঝেই এ সম্পর্কে তথ্যানুসন্ধান কমিটির রিপোর্ট পার্লামেন্টে পেশ করা হয়ে থাকে। এ সতর্কতার অবশ্যই প্রয়োজন আছে এবং এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই যে, বৃটেনের সাফল্যের উপরেই নির্ভর করছে অন্য বৃহৎ শক্তিগুলির মৃত্যুদণ্ড সম্পর্কে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত।

সোভিয়েট ইউনিয়নে শুধু নরহত্যা ও রাষ্ট্রদ্রোহিতার অপরাধে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয়। কিন্তু বিপ্লবের পর থেকে বিশেষ করে স্তালিনের দীর্ঘ শাসনকালে রাজনৈতিক কারণে যে কত মানুষকে হত্যা করা হয়েছে তার হিসাব কারও জানা নেই। সেদেশে রাজনৈতিক ষড়যন্ত্রের শেষ উল্লেখযোগ্য বলি লেভরেন্তি বেরিয়া। ক্রুশ্চেভের শাসনকাল থেকে রাশিয়ায় রাজনৈতিক হত্যা বন্ধ হয়।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ১৯৩০-৭২ সালের মধ্যে মোট ৩,৮৫৯ জনকে অসামরিক অপরাধে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত করা হয়। তবে ঐ সময়ের শেষ ক'বছরে মৃত্যুদণ্ডের সংখ্যা খুবই কম ছিল। যেখানে ১৯৩৫ সালে ফাঁসি হয় ১৯৯ জনের, সেখানে ১৯৬৬ সালে ফাঁসির সংখ্যা এক ও পরবর্তী বছরে দুই। ১৯৬৮-৭২ সালের মধ্যে একজনেরও ফাঁসি হয়নি। ১৯৩০ সাল থেকে আজ পর্যন্ত যুক্তরাষ্ট্রে যতজনের ফাঁসি হয়েছে তার মধ্যে ৩,৩৩৪ জনের হয়েছে খুনের জন্য ও ৪৫৫ জনের হয়েছে ধর্ষণের জন্য। দণ্ডিতদের মধ্যে ২,০৬৬ জন (৫৩.৫ শতাংশ) কৃষ্ণাঙ্গ, ১,৭৫১ জন (৪৫.৪ শতাংশ), শ্বেতাঙ্গ ও ৪২ জন অন্য বর্ণের লোক ছিল। দণ্ডিতদের মধ্যে ৩২ জন নারী যাদের মধ্যে ২০ জন শ্বেতাঙ্গিনী ও ১২ জন কৃষ্ণাঙ্গী।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে সম্প্রতি যে সব মৃত্যুদণ্ডের আদেশ চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করে তার মধ্যে রোজেনবার্গ দম্পতির মৃত্যুদণ্ড বিশেষ উল্লেখযোগ্য। গুপ্তচরবৃত্তির অভিযোগে ১৯৫৩ সালে তাঁরা দণ্ডিত হন। আমেরিকায় ও কম্যুনিস্ট দুনিয়ায় তাঁদের রক্ষার দাবিতে প্রবল আন্দোলন গড়ে ওঠে। সে আন্দোলন সফল না হলেও মার্কিন নাগরিকদের চিন্তাধারা তার দ্বারা বিশেষভাবে প্রভাবিত হয়। ১৯৬০ সালে আবার সিরিল চেসম্যানকে রক্ষার জন্য সারা আমেরিকা উত্তাল হয়। সে প্রয়াসও সফল হয় নি, কিন্তু আমেরিকার মানুষ মৃত্যুদণ্ড সম্পর্কে একটা চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য অস্থির হয়ে ওঠে। ঐ পরিস্থিতিতে ১৯৭২ সালের ২৯ জুন আমেরিকার সুপ্রীম কোর্টের এক রায়ে মৃত্যুদণ্ডকে 'নিষ্ঠুর ও অস্বাভাবিক' এবং সে কারণে মার্কিন সংবিধানে ঘোষিত মৌল অধিকারের সঙ্গে 'সঙ্গতিহীন' বলে ঘোষণা করা হয়। রায়টির ভাষা অবশ্য খুব স্পষ্ট ছিল না এবং মাত্র ৫-৪ সংখ্যাগরিষ্ঠতা ঐ রায়ের পক্ষে ছিল। বিচারকদের মধ্যে কেবলমাত্র দুজন সুস্পষ্ট ভাষায় মৃত্যুদণ্ডকে মার্কিন সংবিধান-বিরোধী বলে অভিমত দেন। রায়টি প্রকাশিত হওয়ার সময়ে যুক্তরাষ্ট্রের ৫০টি অঙ্গ রাজ্যের মধ্যে ১৬টিতে মৃত্যুদণ্ড সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ ছিল এবং অন্য অঙ্গ রাজ্যগুলিতেও কদাচিৎ কোন গুরুতর অভিযোগে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হত। যাই হোক, সুপ্রীম কোর্টের রায় ঘোষিত হওয়ার পর ১৯৭৭ সাল পর্যন্ত মাত্র একজনের সেদেশে ফাঁসি হয়েছে। রবার্ট কেনেডি বা মার্টিন লুথার কিং-এর হত্যাকারী কারও ফাঁসি হয় নি।

মৃত্যুদণ্ডের অসার্থকতা সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে জর্জ বার্নার্ড শ' বলেন, হত্যা ও মৃত্যুদণ্ড পরস্পর বিরোধী নয় যে একের জন্য অন্যটি বিলুপ্ত হবে, তারা একই এবং এক থেকে অন্যের উদ্ভব। একথা যে কতটা সত্য তা [illegible]ন যে সব দেশে

রক্তের বদলে রক্ত ?

মিহির গঙ্গোপাধ্যায়

রক্তের কালচে লাল দাগ শুকিয়ে গেছে অনেক দিন। কালের যাদুকরী প্রলেপ স্মৃতির দগদগে ক্ষতচিহ্নটাকেও সারিয়ে দিয়েছে। শুধু আজও যা জেগে আছে তা হাড় হিম করে দেওয়া একটা দুর্দান্ত ভয়, একটা দারুণ ত্রাস। এমন এক শরতের মধ্যাহ্নে সেই দুর্দান্ত ত্রাসে শিউরে ওঠা একটা পরিবারের মুখোমুখি আমি দাঁড়িয়ে আছি মধ্য কলকাতার একটি দেড় কামরার বাসায়।

ভয়ে মূক যে পরিবারের ভগ্নাংশটি এখন আমার সামনে হাজির রয়েছে তাঁরা যে মুহূর্তে আমার সাংবাদিক পরিচয় পেলেন সেই মুহূর্তে চুপ করে গেলেন। তক্তাপোশে ময়লা বিছানা, দড়ির আলনায় কিছু আধ ময়লা শাড়ি, পাজামা, ফ্রক। এক কোণে কয়েকটা থেকো বাসনকোসন। তক্তাপোশের পাশে রং চটা টিনের তোরঙ্গ। তার ওপরেই দু-এক জোড়া সস্তা জুতো।

[illegible] কলকাতায় যে সব [illegible] দিনেও সূর্যের আলোর প্রবেশ নিষেধ সেই রকম এক এলাকার মধ্যে এক নিহত পুলিশ কনস্টেবলের পরিবারটির আস্তানা। না, নিহত সেই পুলিশের নাম কিছুতেই বলা যাবে না। এই কথা স্বীকার করে নেবার পরই আমি এই বোবা মুখগুলিকে একটু মুখর করতে পেরেছিলাম।

তাঁদের কাছে আমাকে আরও কবুল করতে হয়েছে যে, পরিবারের যাঁরা বেঁচে আছেন তাদের কারও নাম, ধাম কিছুই আমি লিখতে পারব না। এমন কি ট্র্যাফিক ডিউটি করার সময় কলকাতা শহরের ঠিক কোন এলাকাটাতে প্রায় ৪০ বছরের বয়সের পুলিশটি জখম হয়ে কাটা পাঁঠার মত ছটফট করছিল সে কথাও আমি লিখতে পারব না— এই শপথও আমায় করতে হয়েছে তিরিশ পার হওয়া রোগা শোক-বিধ্বস্ত বিধবাটির কাছে।

নিরুপায়ে আমি ও'র সব কথাতে সায় দিই। মনে মনে কিন্তু আমি তখন ভাবছিলাম তবে কি সাদা খাতা নিয়েই ফিরতে হবে আমাকে। মনে এই ভাবনা জাগতেই আমি ভদ্রমহিলাকে মরিয়া হয়ে জিজ্ঞাসা করলাম, তবে কি কোন কিছুই আপনাদের সম্পর্কে লেখা যাবে না।

তিনি বললেন, তা কেন? আমাদের পরিচয় প্রকাশ না করে বাকি সব কথাই লিখুন। কিন্তু কিই বা লিখবেন আমাদের নিয়ে।

মহিলার শ্বশুর বললেন, বৌমা ঠিকই বলেছে। আমরা তো আর কোন শহীদের পরিবার নই। কে আমাদের খোঁজ রাখে বলুন? আমার জোয়ান ছেলেটা আর কোন কাজ না পেয়ে পুলিশে নাম লিখিয়েছিল। কোন দিনই মাথাব্যথা করার দিকে তার ঝোঁক ছিল না। তবু কলকাতায় যখন গলা কাটাকাটি শুরু হল তখন সে ভয় পেত। বলত, যদি কোন দিন আমাকেও কাটতে আসে।

আমি ওকে সাহস দিতাম। বলতাম, তোর ভয় কি ? তুই তো শুধু ট্রাফিক ডিউটি করিস। বৌমাও তাই বলত। তবে মাঝে মাঝে কালিঘাটে পুজো দিতে যেত। মায়ের প্রসাদী ফুল দিয়ে দিত তার জামার পকেটে।

আমরা সবাই ওকে সাহস দিতাম। কিন্তু আমাদের বুকেও ভয় ছিল। কাগজ খুললেই দেখতাম রক্ত আর আগুন। নাকে আসত বারুদের গন্ধ। ছেলেটা যতক্ষণ ঘরে না ফিরত স্বস্তি পেতাম না।

এমনি করে যে দিনটা কাটত, সে দিনটা পর্যন্ত ছেলেটার পরমায়ু ছিল বলে মনে করত নিহত পুলিশ সেপাইয়ের বাবা।

সেটা সেই যুগ যখন দেওয়ালে নানা লিখনের সঙ্গে, চলছে-চলবে'র ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গে লেখা হত, পুলিশ তুমি যতই মারো, মাইনে তোমার একশ বারো।

বৃদ্ধ বললেন, ছেলে যখন কাজে ঢুকেছিল তখন সেপাইদের মাইনে ছিল মোটে আশী টাকা। বছরে বাড়ত দু' টাকা করে। এমনি করে একশ বারো টাকা মাইনে হলে আর বাড়ত না। ও যখন মারা গেল তখন মাইনে পেত

মৃত্যুদণ্ড আছে এবং যে সব দেশে মৃত্যুদণ্ড নেই তাদের সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় জীবন তুলনা করলেই বুঝতে পারি। ইউ-রোপের দেশে দেশে মৃত্যুদণ্ড নেই, কিন্তু সে সব দেশ দুঃস্ব-প্নের দেশে ডুবে যায় নি। অপর দিকে আমরা দুনিয়ার ও আফ্রিকার বহু দেশে মানুষকে ফাঁসি কাঠে ঝুলিয়ে অথবা গুলি করে মেরে ফেলেও স্থায়ী শান্তি প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব হচ্ছে না। নাইজেরিয়া সরকারকে হত্যার চেষ্টার অপরাধে এক সঙ্গে ৫৫ জনের মৃত্যুদণ্ড হয়। কিন্তু সে রক্তের দাগ না শুকোতেই আবার একটি বড় ষড়যন্ত্র ধরা পড়ে এবং আবার কয়েকটি প্রাণ বলি হয়। ইথিওপিয়ার অত্যাচার ও পাল্টা অভ্যুত্থানের মধ্যে অনেক মাস আগে এক দিনে ৪৮ জনকে গুলি করে হত্যা করা হয়, কিন্তু সেদেশে আজও শান্তি আসে নি। সুতরাং মৃত্যুদণ্ডের ভয় মানুষের হত্যা প্রবৃত্তিকে সংযত রাখে এর সমর্থনে কোনো যুক্তি কোথাও খুঁজে পাওয়া যাবে না। মানুষ যখন হত্যার নেশায় উন্মত্ত হয় তখন নিজের জীবনের কথা সে মুহূর্তের জন্যও চিন্তা করে না। আর যে প্রাণভয়ে ভীত তার পক্ষে খুন করা তো দূরের কথা, কাউকে একটা চড় মারার সাহসও কখনো হয় না।

মৃত্যুদণ্ডের সমর্থকরা বলেন, বড় নরঘাতী, নিষ্ঠুর, স্বভাব দুর্ধর্ষ আসামী জেলে আটক রাখা হলে জেলের শান্তি বিঘ্নিত হয়, জেলের অন্যান্য কয়েদী এবং প্রহরীদেরও ঐ সব ভয়ংকর প্রকৃতির মানুষের ভয়ে সর্বদা উদ্বিগ্ন থাকতে হয়। তার পর নির্দিষ্ট মেয়াদ জেল খেটে বেরিয়ে এসে আবার সে সমাজ-জীবন সন্ত্রস্ত করে। আর মানুষ খুন করে সে এমন কোন সুকাজ করে নি যার জন্য তাকে শান্তিপ্রিয় করদাতাদের পয়সায় সারা জীবন বসিয়ে খাওয়াতে হবে। এমন যুক্তির জবাবে মৃত্যুদণ্ডের বিরোধী সমর্থকদের বক্তব্য, অপরাধতত্ত্ববিদরা দেখেছেন, জেলের মধ্যে দীর্ঘমেয়াদী কয়েদীরাই সবচেয়ে সুশৃঙ্খল ও শান্ত। তারা থাকেন এর বিপরীত অল্পমেয়াদীদের দিকে। স্বল্পমেয়াদী মুহূর্তের উত্তেজনার চরম অসময় মারে থাকলেও সে স্বভাব দুর্দম নয়। তাই একবার মুক্তি পেলে সে আর কখনও ফিরে আসে না। কিন্তু চোর, পকেটমার, জালিয়াতরা জেলখানা মানে তাদের সারা জীবনের আস্তানা। তারা ছাড়া পাওয়ার কিছু পরেই আবার একটা অপরাধ করে ফিরে আসে। সুতরাং জেলের আবহাওয়া তারাই বেশী দূষিত করে এবং শান্তিপ্রিয় করদাতাদের পয়সা তাদের জন্যই খরচ হয় বেশী। এমন পকেটমার সব জেলেই খুঁজে পাওয়া যাবে যারা সাজা হয়েছে অন্ততঃ বিশ-পঁচিশ বার এবং জেল খেটেছে প্রায় পঁচিশ-তিরিশ বছর।

তারপর মৃত্যুদণ্ড দিতে সব বিচারক ও জুরি এত বেশী সতর্ক যে প্রায় ক্ষেত্রেই অপরাধী সন্দেহের অবকাশে মুক্তি পেয়ে যায়। মৃত্যুদণ্ডের বিধান না থাকলে হয়ত অনেক ক্ষেত্রেই অপ-রাধীর শাস্তি হতে পারত। অকারণে অথবা সন্দেহযুক্ত কারণে একজনকে ফাঁসিকাঠে ঝোলাতে সকলেরই ভয়। তাই অভিযুক্ত ব্যক্তিকে দোষী জেনেও সামান্যতম অজুহাতে জুরি অনেক সময় অপরাধীকে 'নট গিল্টি' বলে ছেড়ে দেন।

বিচার-বিভ্রাট যে কী মর্মান্তিক হতে পারে তা ইংলণ্ডের একটি ঘটনা থেকে বুঝতে পারা যাবে। ১৯৫০ সালে টিমথি ইভান্স নামে এক ব্যক্তিকে স্ত্রী ও কন্যা হত্যার দায়ে মৃত্যু-দণ্ডে দণ্ডিত করা হয়। কিন্তু মৃত্যুর পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত

একশ'র ওপর আর কয়েকটা টাকা। বোধহয় চার হবে। হ্যাঁ তি-এ কিছু ছিল বোধ। সব মিলিয়ে দুশোও নয়।

দুশোটা টাকাও এই আগুনের বাজারে যে ছেলে রোজগার করতে পারত না তাদের সংসার যেমন চলার কথা তেমন চলত। তবুও সেই ছেলের শোকে গোটা পরিবারটা যেন কাহিল হয়ে গেল।

বৃদ্ধ বললেন, ওকে মেরেছিল ছুরি আর ভোজালী দিয়ে।

তখন কলকাতায়, রাণাঘাটে, বারা-সাতে, হাওড়ায় নকশালপন্থী সন্দেহে ছেলেদের পুলিশ মারছে পয়েন্ট ব্ল্যাংক রেঞ্জ থেকে গুলি করে। কাউকে মারা হয় কুকুরের মত পিটিয়ে। তথাকথিত নকশালপন্থী শহুরে গেরিলাদের হাতিয়ার ছিল ছুরি, ভোজালী, পাইপ গান আর বোমা।

বৃদ্ধ জানেন না, আমি জানি যে ১৯৭০ সালে এই রকম সব হাঙ্গামায় রাজ্যে গোটা চারশো মানুষ খতম হয়ে-ছিলেন।

ঐ বছর মোট ৫২৬ জন পুলিশের ওপর আক্রমণ হয়েছিল। তার মধ্যে মারা গিয়েছিলেন ৪১ জন। আহত অথবা নিহত—এই ছিল সেই বছরের খতিয়ান।

কলকাতা পুলিশের ট্রাফিকের এই লেখাই আমার কাছে করছ না, তাই বোধহয় তাকে মরতে হল। তার শরীরের সব জায়গায় সেদিন আঘাত করা হয়েছিল। প্রথম মানুষটিকে আরও তাড়াতাড়ি হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে বাঁচান যেত কি না তা বৃদ্ধ বা তাঁর বউমা বলতে পারলেন না।

বৃদ্ধ বললেন, ও সব কথা ভেবেই বা লাভ কি? কাল ফুরিয়ে ছিল, চলে গেছে, এই ভেবে মনকে সান্ত্বনা দিই।

বাড়িতে যখন খবর এল তখন সব শেষ। শেষ সময়েও আমাদের কাউকে কাছে পায় নি। জানি না শেষ সময় ও কি বলে গিয়েছিল।

নেহাতই নির্লজ্জের মত ওঁদের জিজ্ঞাসা করলাম, যখন শুনলেন উনি খুন হয়েছেন তখন আপনাদের কি মনে হল?

আবার বৃদ্ধই জবাব দিলেন। বললেন, আপনি হয়ত মনে করছেন, আমি তখন ভাবছিলাম এর পর সংসারটা কি করে চলবে? কে মানুষ করবে আমার নাতি-নাতনীদের? তাই না?

আমি বলি, না, না। ঠিক তা নয়। এমনিই জিজ্ঞাসা করছিলাম।

বৃদ্ধ বললেন, তবে শুনুন, আমি তখন ভাবছিলাম, কোন এমন লোক, কার রক্তের বদলা নেওয়া হল আমার ছেলের রক্তে?

সেদিন বৃদ্ধ তাঁর অনুচ্চারিত প্রশ্নটির জবাব পান নি। আজও পেলেন না।

ছেলের মর্মান্তিক মৃত্যু নিয়ে এ-সব কথা আলোচনা করার সময় বৃদ্ধ রাগেন নি, কাঁদেন নি—এমন কি বিরক্তও হন নি। তাই ভরসা পেয়ে ওঁকে জিজ্ঞাসা করলাম, কাগজে দেখেছেন, রাজবন্দীদের ছেড়ে দেওয়া হচ্ছে?

—হ্যাঁ, তা দেখেছি।

—কাজটা ভাল হচ্ছে, না মন্দ হচ্ছে?

এবার তিনি কিছুক্ষণ চুপ করে রইলেন। তারপর জবাব দিলেন, দেশের সবার কথা আমি বলতে পারব না। যদি শুনতে চান, তবে আমার কথাটা বলতে পারি।

আমি ওঁকে অনুরোধ করি, তাই বলুন।

উনি জবাব দেন, আমরা ছোটবেলা থেকে শিখে এসেছি রক্তের দাগ রক্ত দিয়ে মোছা যায় না। আমার, ওই কচিটার, ওই নাবালক ছেলে-মেয়েগুলোর তো যা হবার তা হয়েছে। ঐ অপরাধ যারা করেছে তাদের ফাঁসি দিলে তো আর ছেলে ফিরবে না।

ওতো রক্তের বদলে রক্তের মত কথা হয়ে গেল। না, না সত্যিই তা আমি চাই না।

এইবার বৃদ্ধ কাপড়ের খুঁট দিয়ে চোখ দুটো মুছলেন।

এর আগে আন্ধার্ মন্দিরে প্রবেশ করেছে ভক্তি নিয়েই সঙ্গে তার বউ বাচ্চারা ছিল। মদনমোহন মন্দিরকে কেন্দ্র রেখে উত্তরবঙ্গের সর্ববৃহৎ দীর্ঘতম মেলা জমে, রাসের মেলা, এক মাইল ব্যতম বড় সে মেলাটা। স্টেডিয়াম সংলগ্ন মাঠ, জেলখানা-ভিক্টোরিয়া কলেজএর রাস্তা, মোড়, বড়বাস্তা, অলিগলিতে সংখ্যাতীত দোকানপাট, হরেকমাল মাথাচুলকার বাক্স গোলাপিমার্কা পালাগান কলকাতার সার্কাস কলকাতার ম্যাজিক, মাদ্রাজের জাঁকজমক, উজ্জ্বল আলোর বানে নাগরদোলা। অন্ধ্যবনা সাপচুম্বন, পুতুল খেলার চাসনাকা এবং আমেরিকান সবমত পান করা, কথা বলা ভুল। চতুর্দিক একেবারে জমজমাট। জিলাপী চাঁদলুচি চুড়িমালক পাথর-বাটি চক্রের জাদা কামপাসু পাঁচালি চিনির হাঁড়ি হাতি শিস সেপাই পদার্থ দস্ত কি, আর লকলক উৎফুল্ল মানুষ। অধিকাংশই গ্রামা চাষা। মেলাময় দিঘি খেলনার টেলিগাড়ির চেয়ে ধাপনা অসমর্থ হেলানশালো, গাঁজা গাঁজীর জাত যেন ভীড়ের কালো চুলের জালে ভেসে যায় শতদল। রাসের দিনে রাজাবানী আমেরিকান কারে মদনবাড়িতে আসতেন আর তামাম মেলাটা জোড়ে তখন করত রাজা দর্শন। আন্ধারুয়াও রাজা দেখেছিল গোটা জীবনে একবার, সাক্ষাৎ মদন। রাজার দেহের বাটা সদা বিয়ানো গাইয়ের মোটা দুধের মতন। তেত্রিশ কোটি দেবতা আঁকতে ভাগাচক্র বড় দেউনিয়ার পোষাল পাখির মতো আকাশ উঁচু, আর দেশী অশ্বের মতো মোটা বেকে আধা চোখা, বাবালো। এই ভাগাচক্র না ঘোরালে নাকি রাসে আসাই বৃথা। রাজা রানীও ঘোরায়। আন্ধারুয়াও ঘুরিয়েছিল। এই সময় একটা কাণ্ড হয়, রানীর এক দাসীর ছোঁয়া তার হাতের কনুইতে লাগে। সে ছোঁয়া কোন কালেই তাড়ানো গেলোই না এতো আনামিয়া। যাহোক, পায়ের পাতার উপর ভর দিয়ে তার বউ কেবল শূন্যে হাত নাড়ে, কাঁধে নিলে বাচ্চারা নাগালে পায়। কিন্তু ভয়ে কাঁদে। —'এই সরি যাও। সরি যাও দেউনিয়ার ঘর।' ভীড়ের স্রোত তাদের ঠেলে সরিয়ে দেয়। ঠেলা খেয়েও সে রাগে না। সবাইকে তো একবার ভাগাচক্র নাড়িয়ে ভাগ্য যাচাই বা ভাগ্যসুখ বাসনা করতেই হবে। বরং সে একটা চকচকা আধুলি ছুঁড়ে দেয় অবতার দেবতাদের সিংহাসনের তলে মেঝে, যেন পাণ্ডাদের নজরে পয়সাটা না পড়ে। বড়পাণ্ডা, কালো চন্দন রঙ। গায়ের পাণ্ডা যাকে তাকে পাত্তা দেয় না। দশ বিশ একশ টাকার নোট নিক্ষেপ সন্তোষে কোমরের কাপড়ে গোঁজে, ফোলা মোলায়েম পেটের নাভির গর্তে টাকা সেঁটে থাকে। অন্য এক পাণ্ডা, বউ যখন কোলাব্যাঙএর মতো প্রণামে মগ্ন, সিঁড়িতে বউয়ের হাত ঝিকাঝিকি বার দেয়। বোকার অবস্থায় আন্ধারু মজাই পায়। অমনি তার চোখে জল আসে, বাচ্চাদিগুলের

কপালে ফুলে নমো নমো করে। মন্দিরের প্রাঙ্গণে সামিয়ানায় জলায়, মঞ্চে, নামগান, বাউল সংগীত, কৃষ্ণকীর্তন, যাত্রা, মহাভারত, বেদ পাঠ হয়। ভীড়। ঐদিন গোবিন্দদাসের নামগান হচ্ছিল। সারা অঞ্চলে তার গান গলায় খ্যাতি। আন্ধারুয় বউ বাচ্চাদের নিয়ে সামিয়ানার ছাওয়ায় ত্রিপলের মধ্যে কোনরকম করে জায়গা নেয়। গান শোনা তারপর রাত কাটানো। গায়কেরা গৌরাঙ্গ খোলের লহরায় আর গানের রসের ভারে বসা থেকে উঠে নেচে গাইছিল : 'নামে প্রেমে প্রেমে জগৎ নাচাবে বলে গৌরাঙ্গ নিজেই তো নাচিছে। হরিবোল।।' হরিবোল।। হঠাৎ এই উত্তুঙ্গ সময়, নৃত্যরত উর্ধ্বে তোলা গায়কদের কাছা কাপড় খসে গেলো। কেউ হাসলো না। তার বাচ্চা চাংড়া দুটি অসভ্যের মতো খিল খিল করে হেসে উঠলেই আন্ধারুয়াও হাসতে লাগলো। বউও সেই রকম। কি হাসি। এক রোগা বুড়ো পাকা ভ্রূ পাকিয়ে রোষে রাগে বলল গগন—'লজ্জা নাইরো?' তাড়াতাড়ি সে মুখে হাত চাপা দিয়ে আর চিমটি কেটে বউ-বাচ্চাদের হাসি থামায়।

আজ আন্ধারুয়া একাএকা। চারদিকে ডাকাডাকি করে অপেক্ষাকৃত অন্ধকার কোণায় দরজা দিয়ে সুযোগমত ঢুকে যায়। মন্দিরের মধ্যে। লোকে কেবল মদনের মাহাত্ম্যেই বিশ্বাস থাকে না বা নেহাৎ ভক্তিই দেয় না, আলাদা ধান্দায়ও থাকতে পারে। যেমন, দর্শনের এক পণ্ডিত নাকি ছিলেন যিনি সারা বছর বিদ্যালয় ও গৃহ ছাড়া বড় কোথাও যেতেন না। জ্ঞান ব্যবহারের যশে তিনি স্বনামখ্যাত, অজাতশত্রু, সৌম্য সুন্দর। বৎসরে একবার মাত্র বেরুতেন। তখন, রামকৃষ্ণ আশ্রমের মেলায়, শ্বেত-পাথরের মন্দিরে উপাসনা করে ফেরবার কালে ঠিক ভুল করে পুরানো চটিজোড়া ফেলে নতুন কোনো চটি পায়ে গলিয়ে চলে আসতেন। ব্যাপারটা নাকি সকলেই জানতো। অথচ কেউ তাকে খেয়াল করাতো না। বরং

শোনা যায় যার যার চটি পদযুগলে গলাতেন তার ফেলে যাওয়া পুরাতন চটিজোড়া ধন্য বোধ করেছেন। এরকম আত্মভোলা নিয়ে কোন দুশ্চিন্তাই করা যায় না। কি বড় রকম সত্যিকার শেয়ানা শয়তান থাকে। তাই মন্দিরের সব দরজায় কোলাপসিবল।

আন্ধারুয়া তো বুঝেই নেয় সে মদনের মন্দিরে যাওয়াটা সুবিধের হবে কোনকালেই হবে না। অবশ্য প্রসাদ পরিমাণ অনেক আর সরেস। সাত আসলটা এখনও প্রায় নাকি জগন্নাথ ভোগের তুল্য। সে উচ্চাভিলাষ না ক পাতাবাহার কাণ্ডে আড়ালকরা নিরালা অবতারের পানের দিকে ছায়ায় ছায়ায় দ হেঁটে যায়। কাছাকাছি মানুষজন নে গাইলা মদনের বারান্দায় জড়ো। যেন নির্জন বনের মধ্যে বনদেবতার স্থান, দেউলের দ খোলা, কোত্থরে বড় বড় পদ্যতে সপে বাতাসা। একটু ইতস্ততঃ করে আন্ধার কোমর ভেঙে হাঁটু গেড়ে, থামের পাশে ব তামার পাত্রভরা চরণামৃতে কলসিতে তু হাতের গণ্ডুষে ঢেলে চেটে চেটে খা পুনরায় সে কুশি ডুবায়। যেন অমৃত। মধ্যে অসুর অবতারের আবডালে কে গেছে, ঠিক মানসাই চরের মতো ভুক এলাম। তবু সে তামপাত্রটা তুলে চুমু দিতে পারে না, প্রকৃতই পাপের ভয়। ইত সময়ে পায়ে জোড়া গোদ, নাভিতে ক পৈতা, কপালে মোটা দাগের সিন্দুর টা রক্তশালী, অবতার মন্দিরের পাণ্ডা এসে কে মেজাজ না দেখিয়ে আলগোছে তাকে ধা পাকড়ে, ঠেলে গেটের বাইরে ভাগিয়ে দেয় তার কেমন যেন অপমান লাগে। তব আহারের বাড়, মন্দির কমিটির সুপারিশম চন্দনের লোহিশ্যান বন্ধ হয়ে যেতে থাকে সে জীব লাগিয়ে মিঠা ঠোঁট চাটে।

মদনবাড়ির মোড়ের কালভার্ট আন্ধ রাস্তা একাই দখলে পায়। এত রাতে স্টেশনে প্লাটফর্মও বেদখল হয়ে গেছে। তাছাড়া

খিল খুলে গেলে, লোকজন চাকর বাকর সব বেরিয়ে এলে বোঝা যায় বাড়িটা কত জন-জমাট, কত বড়। কর্তা এখানে আসবার সময় দেশের জোত জমিন বেচে মোটা ক্যাশ আনতে পেরেছিলেন শোনা যায়। সেই ক্যাশ তিনি গ্রামেগঞ্জে সুদে দাদনে লাগিয়ে ডবল করলেন। বড় ছেলে গোড়াতেই বিড়ির ব্যবসায় নামলো, এ জেলা পাট তামাকের জন্য প্রসিদ্ধ। বর্তমানে বিড়ি ফ্যাক্টরিতে দু শ কারিগর অর্থাৎ কারিগর-এর মাথাপিছু দুই টাকা হলে চারশত টাকা রোজ লাভ। এ টাকায় ভাড়া খাটানো দুটো লেল্যান্ড। মেজটি উকিল, বেশ নামডাক, সেজোজন ডাক্তার ও মনমাতানো ডিসপেনসারির মালিক, কাজেই হসপিটাল আর সবার আদরের ছোট-ছেলে ক্লাশ ঠিকাদার। কর্তা এখন নেহাৎ যাকে বলে সিলিপিং পার্টনার, খোলো কলের, পাটগোলার। নিত্যনৈমিত্তিক সন্ধ্যায় গীতা পাঠ করেন। গন্ধরের নিমা গায়ে কর্তা এই বয়সে দোতলা থেকে একটা খারাপ খিস্তি দিয়ে রাগে পায়ের বইলা খড়ম ছুঁড়ে মারতেই তুলসী বেদীতে লাগলো। আর চোরকে প্রহার শুরু হলো। বড় ভাইয়ের শরীরে চর্বির আধিক্য, সেই পেটে লাথি মেরে রোগা চোরকে চিৎ করে ফেলে দেয়। তারপর ঠিকাদারের হাতপা সমান চললো, জোরের কারণও জানে সে, সেদিনও পাড়ায় মাস্তান ছিল। বুড়ো বাপের গালিগালাজ, কলাবাগান রাস্তাতে তার আলাদা পাকা খবই আছে, বয়সে সয় না আর তাই যায় না। এবং প্রহারের চোটে চাপা পড়ে গেছে চোরের চিৎকার। চোরটা পাকামাল না। বাড়ির সুন্দরী প্রতিমার মতো বউরা ঘোমটার ফাঁক দিয়ে মারটা চোরকে দেখছিল আর নিজেদের মধ্যে ফিসফাস করে কি যেন বলা-বলি করে মেয়েলী তরলতায় হাসছিল। দুষ্টু দুষ্টু টুকটুকে বাচ্চারা আধো গলায় 'আরো মারো, আরো মারো' বলে সিঁড়ি বেয়ে ছুটে ছুটে নামছে উঠছে। এই এক মজার খেলা পেয়েছে এতো রাতে। উকিল ছেলে গম্ভীর গলায় রেলিং-এ ভর দিয়ে বলল,—দেখিস বেজায়গায় যেন মারিস না ভাই। এই কথায় ভাই ক্ষেপে গিয়ে উপরের দিকে চেয়ে বলে—বানচোৎ! তোর বড় দরদ, না? শালা চোর-চামারদের কেস লড়ে চাঁড়ালের মতো পয়সা কামাস তো। তাই লেকচার।—এই বাজে বকিস না। মারবি তো মার জামা পেঁচিয়ে মার, শরীরে যেন দাগ না পড়ে। চোরকে মারার কোন আইন নেই। এরপর বড় ভাই গিয়ে ছোট ভাইকে নিরস্ত করলো। কারণ, মা-বউরা নার্ভাস হয়ে যাচ্ছে। যাহোক মেয়েছেলে, এরা খুব নরম আর মায়াদয়ায় হয়। চোরটা আঙিনায় কাতরাচ্ছিল। ছানার ঝামেলা না করে সাত মাসের বাচ্চার বিভার পাউডার দুধ গোলাবার জন্য ঈগল ফ্ল্যাকসে রাখা গরম জল, চৈত্র-দুপুরে পিপাসায় নিরুৎসাহিত অরেঞ্জ স্কোয়াশের বোতল ভরে তা দিয়ে কৌশলে মেরে চোরের লাশটা গলিয়ে দেখা হলো। ডাক্তার ছুটে এসে রাস্কেল! মেরে ফেললি নাকি? চোরের নাড়ি টিপে দেখে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে—না, মরে যায়নি। তারপর ভিড়ের দিকে চেয়ে বলে—তাড়াতাড়ি কেউ ফোন কর থানায়। ইডিয়েট। ছোট ভাইটি ডাক্তারদাদাকে সমীহ করে চলার দরুন মাথা হেঁট করে আড়ালে চলে যায়। বউ তাকে ঘাম মোছার জন্য মোরগা তোয়ালে দেয়।

এসব কেসে জিজ্ঞাসাবাদ তেমন বিশেষ হয় না। চোর মালামালসহ হাতেনাতে ধরা পড়েছে। ভোরে, শেয়াল-কুকুরে খাওয়া লাশের মতো ছেঁড়াখোঁড়া চোরটা পড়েছিল উঠোনেই। পুলিশ অফিসার বললেন—দাগী কোথায় মশায়? আপনারাই তো দেখি থার্ড ডিগ্রী মেথড এপ্লাই করেছেন। উচিত হয়নি। কোথা দিয়ে চোর ঢুকেছিল? রান্নাঘরের ভাঙা নালাটা তিনি দেখলেন। ডায়রীতে বিবরণ টুকলেন। শেষে দারোগা দৃঢ়ভাবেই বললেন—ছেলেদেরকে থানায় যেতে হবে। আমরা যাচ্ছি। উইদাউট ডিলে চলে আসুন। মেয়ে-বউরা এখন কাঁদতে লাগলো, যেন বা আপন মানুষ মরার শোকেই কান্না। দুজন কনস্টেবল হাত-পা ধরে চোরটাকে ভ্যানে তুললো। সে অমানুষিক কষ্টে গোঙায়। ভ্যানটা ছেড়ে দেয়, গন্তব্যস্থল হাজত নয়, আপাতত হসপিটাল। সত্যি কথা কি, অপরাধও তো একরকম রোগ।

কাৎ হয়ে পড়ে থাকা বিক্ষত উলঙ্গ দেহটার কোন কোন অংশ নড়ছিল কাটা কাছিমের কলিজার মতো। পুরানো ভ্যানটা ভাঙা রাস্তার ঝাঁকিতে ঝর-ঝর করে, এরিয়াল পারেড-এর টিকির মতো ল্যাক্-পেকায়। মোড় ঘুরে সাগরদীঘির পাড়-ঘেঁষা আদালতের রাস্তায় ভ্যানটা পৌঁছতে নিতেই চোরটা অতিকষ্টে চিৎ হয়ে জল চাইলো। একজন কনস্টেবল চলন্ত গাড়িতে টলতে টলতে এগিয়ে জালের ভেতর দিয়ে অফিসারকে বলল—জল চাইছে স্যার। —চাক। —সাগরদীঘি থেকে এক অঞ্জলি জল এনে দেবো? মরে যাবে বোধহয়। —এ জল কি দেয়া যায়?? —কেন —কেবল গরম জল দেয়া যায়। অফিসার জবাব দেয়। —মানে? —অত তোমার বোঝে নেই। এই জল যে খারাপ নয় তার প্রমাণ কি? দারোগা কনস্টেবলের মুখের দিকে চেয়ে—মুশকিল। ধরো দয়া দেখিয়ে জল দিলে আর গিলতেই মারা গেলো। তখন উকিল লাগিয়ে বলতে পারে যে, জলে বিষ ছিল। কেস ফাঁসাবার জন্য পুলিশই মেরে ফেলেছে। ভীষণ রিস্ক, রাজার আমল তো নয় যে, সাগরদীঘির পাড়ে সর্বক্ষণ কোতোয়াল থাকে। এখন বারোয়ারী মাল, যার খুশি হাগছে-মুতছে। এ-জল নোংরা। —এ-জল কত লোকে খায় স্যার?—মরেও। এও কি কম ক্রাইম? অফিসার সিগারেট ধরালেন, উদাস হয়ে গেলেন। —এ-জলে কিন্তু খুব ভালো ডাল সিদ্ধ হয়। —ঐ তো হলো গরম। গরম জলের দোষ নেই। অফিসার একটু বিরক্তই হলেন, তার ভালো লাগছিল না কেমন। কনস্টেবল রামকৃষণ ভগত চোরটার দিকে চেয়ে আক্ষেপ করে বলল—মোরার আগে এক আদমি মাঙলো, দিলাম না, পাপ না লাগে? —রামকৃষণ এরপর থেকে ডিউটিতে বেরুবার সময় হৃদয়টা উঠোনে পুঁতে রেখো এসো। মরণাপন্ন মানুষকে আচমকা জল দিলে হার্টফেল করে। হস-পিটাল তো এসেই গেলো। দারোগা ভোরের আলোয় দ্রুতবেগে পেরিয়ে-যাওয়া পার্টিকল স্বর্গ কোর্ট কাছারির দিকে তাকিয়ে রাত-জাগা চোখের জ্বালার মতো বলে ফেলল। একটাকেও রেহাই দেবো না। ফাটক খাটাবো। দেখিস রামকৃষণ, তোরাও আজ ভাত খেতে পারবি না। দেখিস অভিশাপ লাগবে, অভিশাপ। নামেই সাগর।

কালো ভ্যানটা হসপিটালে ঢুকতেই ওষুধগন্ধী বাতাস নাক দিয়ে ঢোকে দিয়ে গিয়ে আন্ধারমুন্না নরককুণ্ড হয়। চিকিৎসার আয়োজন কি একফোঁটা স্যালাইনও লাগলো না।

শ্বশুর বাড়ি ঘুরলে নববধূ হয়ে যান, প্রথম শ্বশুরঘর করতে আসার স্মৃতি কি তাঁর মনে পড়লো?

'কী সুন্দর বারান্দা! আমি এখানে তুলসীগাছ করবো। নিচে লাউ-পুঁই। যাক, এতোদিনে একটা মনের মতন বাড়ি পেলি।'

নিচতলায় জিনিসপত্র স্তূপাকার হয়ে আছে। সূর্য ডুবলে গোছগাছ করার অসুবিধে। এখনো সব ঘরে বাল্ব লাগানো হয়নি। ঢাকুরিয়া থেকে খুলে-আনা বাল্বগুলো কোথায়, কিসের মধ্যে আছে খুঁজে পাওয়া শক্ত। দুয়েকটা বোধহয় কিনতেও হবে। এখানে ইলেকট্রিকের দোকান কোথায় জানি না। বাড়ি ছেড়ে যাওয়াও এখন সম্ভব নয়। মনে হচ্ছে, আজকের মতো অর্ধেক আলোতেই চালিয়ে নিতে হবে। সন্ধে হলেই বাড়ির অর্ধেক অন্ধকার।

মাকে বললাম, 'বেলা থাকতে-থাকতে বিছানা-টিছানা কোনটা কোথায় হবে তুমি দেখিয়ে দাও। রান্নার জিনিসপত্র, চাল-ডাল কোনটা যে কিসের মধ্যে তালগোল পাকিয়ে আছে কে জানে।'

'তুই যা, আমি যাচ্ছি। চল, ছাদটা একবার দেখে যাই।'

'না, মা। খালি পায়ে আমার গা শিরশির করছে। হাওয়াই চপ্পলগুলো কোথায় জানো?'

একটা বালতির মধ্যে কাগজে মুড়ে তো রেখেছিলাম। চল, নিচেই যাই। তালাগুলো কোথায় রেখেছি বল তো? রান্নঘরে তো তালা দিতে হবে।'

সিঁড়িতে এর মধ্যেই আবছা অন্ধকার। মা দেয়াল ধরে নামতে থাকেন। আমি পায়ের আন্দাজে, মায়ের পিছু-পিছু।

নিচে এসে দেখি বিছানা-বাক্সের স্তূপের ওপর হাতে মাথা রেখে মিলি মেঝের বসে আছে। মোমের মূর্তি।

'ওমা! তুই বসে! খুচরো জিনিস-গুলো একটু হাত লাগিয়ে গোছগাছ করে রাখতে পারতিস!'

'তোমাদের জিনিস, তোমরা গোছাও। কখন থেকে একবার বাথরুম যাবো ভাবছি—বাথরুম নেই, কিছু নেই, আমি বড়দার ওখানে গিয়ে থাকবো।'

মিলি ওইরকমই। কথায়-কথায় রাগ, একটুতেই অভিমান। সবে স্কার্ট-ব্লাউজ ছেড়ে শাড়ি ধরেছে। ম্যাক্সিও পরে। কলকাতা ছেড়ে এসে ও যে খুব দমে যাবে সে আমি জানতাম।

মুখে গোঁজ করে বসেছিলো। ওকে দেখে এই প্রথম আমার বাড়ি নির্বাচন নিয়ে দ্বিধা হয়। সবাই বলে আমি পাগলে আমরা কেউ কিছু না। জন্ম থেকে ঢাকুরের আড়াই ঘরের ফ্ল্যাটে মানুষ, শহুরেপনার মধ্যমূলে, তবু ওকে আমার হঠাৎ-হঠাৎ রূপকথার কিশোরী মনে হয়। লাগোয়া বাথরুমের অভ্যেস, উঠোন পেরিয়ে টিনের চালা ও কী করে মানিয়ে নেবে?

মা বললেন, 'কেন, পাঁচিল-ঘেরা জায়গায় অতো লজ্জা কিসের? কল-কাতায় ওরকম কতো কলঘর আছে। লোকেরা চান-টান সবই করে।'

'পাঁচিল ঘেরা না ছাই। হাড়-পাঁজরা-বেরুনো দেয়াল, এখানে ফাটল, ওখানে ফোঁকড়, বদমাশগুলো যেন উঁকি মারছে।' মিলি কেঁদে ফেলে।

'আমি কাল মিস্তিরি ডেকে সারিয়ে দেবো। কাঁদিসনি। বাল্বগুলো কোথায় জানিস?'

মিলি ভিজে চোখের ইঙ্গিতে জুতোর একটা বাক্স দেখিয়ে দেয়। গতবারের পুজোর। ওটাও মা এতোটা পথ টেনে এনেছেন। আমি সাবধানে খুলি। ভাঙা কাচের টুকরোয় বাক্সের তেতরটা চিকচিক করে ওঠে।

মিলি উঠে কলঘরে যায়। শব্দ করে টিনের দরজা টানে। হয়তো ঠিকমতো বন্ধ হয়নি, প্রায় আধ মিনিট ধরে তার দরজা বন্ধের কসরৎ শোনা যায়!

কলকাতায়ও একবার বাথরুমের একটা পাল্লার কব্জা জলে-জলে ক্ষয়ে গিয়েছিল, দরজা দিলেও অল্প একটু বাঁকা ফাঁক থাকতো, মিলি তিনদিন চান করেনি। নতুন-তোলা দোতলার বাড়িওলা তখন এক ব্যবসায়ী ভাড়াটে বসিয়েছে। লিলুয়া, না কোথায় তার পাঁপড়ের ব্যবসা। তিনটি ধাড়ি মেয়ে, একগা গয়না-পরা বৌ। মিলির চান করে বেরুনোর সময়টা লোকটা বার-বার ওপরের বারান্দায় ভিজে গেঞ্জি শুকোলো কি-না দেখতে আসবে। হাত তারে, চোখ নিচে। বদমাইশের ধাড়ি।

মিলিকে বড়দার বাড়িতেই মানা-তো। বেচারি। ভালো পরিবেশের একে-বারে কাঙাল। একবার গেলে আর আসতে চায় না। একটা মাত্র বোন, তাকে

রাখতে বড়দার কী [illegible] অসুবিধে আমি বুঝি না।

বড়দার নিজের ফোটোটা আর বাবার ফোটো মা পাশাপাশি টাঙালেন। বাবাকে বড়দার প্রায় সমবয়েসী লাগে। যেন দুই ভাই। বড়দার [illegible] ফোটো মা আমায় হাতে দিয়ে বলেছেন [illegible] পড়লো। আস্ত আছে।'

বিকেল [illegible] আমি পাশের ঘরে টেবিল [illegible] ছিলাম। [illegible] আঙুলে [illegible] রক্ত জমে যায়।

বাবার ওপর নতুন করে আমার রাগ হয়। যে মানুষ [illegible] সেই মানুষ [illegible] কে তোমাকে মাথার দিব্যি দিয়েছিল। অসহায়দের আমি দু-চক্ষে দেখতে পারি না।

মা বাক্সের [illegible] বসেছেন। মিলি আপন মনে [illegible]। [illegible] মা কেউ দেখেনি। আমি [illegible] আমার [illegible] পাইজামাটা খাটের নিচে ঢুকিয়ে দিই।

মিলি জামা-কাপড় বার করে আলনায় রাখতে রাখতে বললো, 'চা খাবে?'

'তুই এদিকটা গুছিয়ে ফেল, আমি চা করছি।'

মা স্টোভ নিয়ে রান্নাঘরে যান।

আমার আঙুল টাটাচ্ছিল। চেঁচিয়ে বললাম, 'স্টোভ একটু পরে ধরিয়ো। আমি বেরোচ্ছি। দেখি যদি কোনো ইলেকট্রিকের দোকান পাই।'

'কাল যাস। ওপরে-নিচে দুটো তো প্লাগই আছে।'

'নতুন জায়গা। অন্ধকারে তোমারই কষ্ট হবে। মিলিটা না [illegible]।'

এটা তো শুক্লপক্ষ। আজ একাদশী কি দ্বাদশী। জানলা খুললে রাখলে জ্যোৎস্না পাওয়া যাবে। দোতলায় ভয় কিসের?'

মা বরাবরই একটু সাহসী। মিলির জন্মের পর বাবার আপত্তিকে হেলা [illegible] সংসারের হাল ধরেন। [illegible] নিরুদ্দেশ, মা [illegible]।

'সংসার [illegible]' লিখে বাবা এক রাত্রে বাড়ি ছেড়ে যান। পরদিন সকালে [illegible] আমরা [illegible] উঠি। [illegible] বাড়িতে। সেদিন [illegible] ফোটো [illegible] এক বছরের [illegible]। [illegible] এলে মা [illegible] জাগিয়ে রাখেন। সেই দৃষ্টির মধ্যেও জেদের মতন কঠিন কিছু থাকতো। হয়তো দুঃখে একেকজনের জীবনে একেক বেশে বাসা বাঁধে। মায়ের দুঃখ হয়তো তার জেদের চেহারা নিয়েছে। এমনিতে বাবার ফোটো দেয়ালে ঝোলে, এখানেও নিজের হাতে টাঙালেন। কিন্তু ভুল করেও কখনো বাবার কথা বলেননি। কোনোদিন বলেন না। আমার একটা ভয় ছিলো, নতুন বাড়িতে মা হয়তো বাবার কথা মনে করে কষ্ট পাবেন। ট্রেনে সারাটা পথ মা চুপ করে বসে ছিলেন। কিছু ভাবছিলেন। হয়তো পিছনের স্মৃতি। হয়তো আমার বাবার কথা। মাকে ওইরকম ভাবে থাকতে দেখলে বাবার ওপর আমার রাগ আরো বেড়ে যায়।

মা চা নিয়ে এলেন। নিজে খান না। কাপটা নিয়ে আমি একটা ট্রাংকের ওপর বসে দেয়ালে পিঠ রাখি। একটু ক্লান্ত লাগে।

'তোকে কি কালই অফিস যেতে হবে?'

'এখন দেখছি, দু-দিন ছুটি নিলেই হতো। রোজ সকালে ট্রেন ধরতে কেমন লাগবে কে জানে।'

'কতো লোকই তো ডেলি-প্যাসেঞ্জারি করে। তোর মান্থলি টিকিট করতে হবে। দূরে এসে পথ খরচা কিন্তু কমলো।'

মিলি পাশের ঘরে উঃ করে ওঠে। এই তো কাপড় গোছাচ্ছিল। আমি দৌড়ে যাই। উবু হয়ে বসে বাঁ পায়ের বুড়ো আঙুল টিপে ধরে আছে।

'কী হলো? কই, দেখি।'

মিলি জবাব দেয় না। মেঝেয় রক্ত। ঠিক ওর পায়ের নিচে। নিশ্চয়ই হোঁচট খেয়েছে। নয়তো ভারি কিছু আঙুলে পড়েছে। নিচু হয়ে দেখলাম, নখের কোণ চুঁইয়ে রক্ত বেরোচ্ছে। মিলির এই এক স্বভাব, কেটে-ফেটে গেলে টিপে-টিপে আরো রক্ত বার করবে।

'ডেটল কি বার্নল লাগিয়ে দে। আমার শেভিং সেটটার সঙ্গে ডেটল ছিলো না?'

চারপাশে চোখ বুলোই। স্তূপাকার জিনিসপত্রের মধ্যে কোথায় ডেটল, কোথায় বার্নল। মিলি একবারও মাথা তোলে না। দু-হাতের আঙুলের চাপে রক্ত ঝরায়। ভুরু কোঁচকালো। সেলাই-মেশিনের পাশে তার চায়ের কাপ থেকে চুঁইয়ে চুঁইয়ে ধোঁয়া ওঠে।

বাবার সম্পর্কে মিলির মনোভাব আমি ধরতে পারি না। আমার মতন ওরও কি রাগ হয়? না-কি বাবার কথা ভেবে ও কষ্ট পায়, গোপন অভিমান পোষে? ওর জন্মসন বাবার গৃহত্যাগে পুরোনো মন্বন্তরের মতন এক দুঃস্বপ্ন স্মৃতি হয়ে আছে। মিলি কখনো কখনো দীর্ঘশ্বাস ফেলে আমি দেখেছি। রূপকথার মতন যার রূপ, তার কেন এতো দীর্ঘশ্বাস? আম মাঝে মাঝে মনে হয়, ওর জন্মটা একটা অভিশাপ। ও যেন একটা হাঁস; ও দীঘি চেয়ে শুধু ঘোলা জলের ডোবা সাঁতরে ফেরে।

আপনা থেকেই আমার গলায় মমতা এসে যায়, 'মিলি, উঠে আয়, আমি ডেটল লাগিয়ে দেবো।'

মিলি আঙুল টিপে ধরে বসে থাকে। নখের কোণ উপচে রক্ত গড়ায়।

রক্ত ওভাবে নষ্ট করতে নেই রে। তাছাড়া বাড়িময় ধুলো, কোন রোগের বীজ কখন রক্তে মিশবে। রাগ করে থাকিসনি, আয়।

কলকাতা শহরে কি আর বাড়ি ছিল না, ছোড়দা?

বাড়ি ছিলো। রোজই তো কতো নতুন নতুন বাড়ি উঠছে। সেসব আমাদের জন্যে নয়।

যেখানে ছিলাম সেখানেই না-হয় থেকে যেতাম। এই ধাধধেড়ে গোবিন্দ-পুরের চেয়ে তো ভালো।

সব কথা তুই [illegible] না মিলি। কলকাতায় আমাদের [illegible] পোষাচ্ছিল না, খরচ চালাতে পারছিলাম না। তাছাড়া দোতলার নীলমণিবাবুকে তো দেখেছিস। ওদের হাত থেকে তোকে আমি বাঁচাতে পারতাম না। ওদের হাতে টাকা, ওরাই এখন রাস্তা দাপিয়ে হাঁটে।

ডেটলের শিশি খুঁজে বার করতে আমার কপালে ঘাম ফোটে। মিলি আমার হাত থেকে শিশিটা নিয়ে পায়ের আঙুলে ডেটল লাগায়।

আমি মিলিকে সান্ত্বনা দিই, একটু দূর হলো তা-ও কী আর এমন কলকাতা থেকে কুড়ি কিলোমিটার, ইলেকট্রিক ট্রেনে আধ ঘন্টার পথ, বাড়িটা কিন্তু অনেক বেশি খোলামেলা। দিব্যি হাত পা ছড়িয়ে থাকা যাবে; বাড়িওয়ালা নেই, নীলমণিবাবুরা নেই, একেবারে স্বাধীন। আর এই জানলা খুললেই গাছপালা, এতোটা আকাশ—তুই তো কিছুই দেখলি না।

এখন থেকে তো এই সবই দেখতে হবে। ছোড়দা, আমি ভাবছি, রেজাল্ট বেরুনো পর্যন্ত বসে না থেকে শর্টহ্যান্ড ক্লাসে ভর্তি হয়ে যাই।

প্রায়ই দেখি লেডি স্টেনো, সেক্রেটারির বিজ্ঞাপন থাকে। মাইনে বেশ ভালোই। তুমি কী বলো? ছমাস এক বছরের কোর্স। শুধু শুধু কলেজে এক কাঁড়ি টাকা নষ্ট করে লাভ কী?

উঃ, জ্বলে যাচ্ছে।

ব লাগিয়েছিস বুঝি? জল মিশিয়ে নিতে হয়।

মাকে কিছু বলিনি। তুমি কী বলো?

শোন, সন্ধে হয়ে আসছে, এখন এসব কথা থাক। চ, ছাদটা দেখে আসি। মা কোথায় দেখ তো।

মা কিন্তু বাড়ি দেখে খুশি। অনেক দিন পর মার হাসিমুখ দেখলাম।

মিলির সঙ্গে অন্ধকার সিঁড়ি ভাঙতে-ভাঙতে বললাম, তোর কান্না মুখ আমার ভালো লাগছে না। তুই একেবারে কলকাতাই হয়ে গেছিস। শোন মিলি কাল ভোরে তোকে নিয়ে আমি বেরুবো। দেখিস, এখানকার পরিবেশ তোর ভালো লাগবে। কলকাতায় আবার মানুষ থাকে নাকি। রাস্তায় দেখিসনি সব কী রকম চোখে তাকায়।

মিলি কথা বলে না, পা দিয়ে সিঁড়ি খুঁজে খুঁজে উঠতে থাকে।

তাছাড়া মেজদাকে সামনের মাসে হাসপাতাল থেকে ছেড়ে দেবে। অতো বছর ভুগলো, এখন ওর আলো-হাওয়ার খুব দরকার।

মিলি নিঃশব্দে সিঁড়ি ভাঙে। দীর্ঘশ্বাস শুনে আমি ওর মুখের দিকে তাকাই। ওর কি বাবার কথা মনে পড়লো? অন্ধকারে ওর মুখ ঝাপসা দেখায়। সিঁড়িটা অল্পেই অন্ধকার হয়ে যায়। বিকেল থেকেই এখানে একটা আলো জেলে রাখা দরকার। বাল্‌ব-গুলো কালই কিনতে হবে।

মিলি দাঁড়িয়ে পড়ে। আমার দিকে মুখ ফিরিয়ে বলে, মেজদা কোনো দিন চাকরি করতে পারবে না ভেবে এমন কষ্ট হয়। ছোড়দা, আমি প্রাইভেট সেক্রেটারির কোর্সটাই নেবো।

দূর। এতোটুকু মেয়ে খবার এসব ভাবে নাকি।

মিলি ওপরে উঠতে-উঠতে বলে, আমি আর পড়বো না।

আস্তে। আবার হোঁচট খাবি। তোর অন্নজল কমেছে? আগে এম এটা পাশ কর, তারপর একটা মেয়ে কলেজে পড়াতে পড়াতে প্রাইভেট সেক্রেটারি হবার কথাটা ভেবে দেখা যাবে।

দোতলায় চমৎকার গোপগুল। মা এর মধ্যেই ঘর-দুটো গুছিয়ে ফেলেছেন। এতোক্ষণে আলাদা একটা শ্রী ফুটেছে। মনে হচ্ছে, এ যেন আমাদেরই বাড়ি, একেবারে নিজস্ব।

মাকে দেখে আমার মন ভরে যায়। কী খুশি। কী উৎসাহ। আমাদের দেখে বললেন, বিজয় থাকবে ওই ঘরটায়। পুবে দক্ষিণে পাঁচটা জানলা, খুব আলো-হাওয়া। তুই এ-ঘরে। পায়চারি করা অভ্যেস, বারান্দায় চক্কর দিতে পারবি। আমি মিলিকে নিয়ে নিচতলায় থাকবো।

একলা একতলায় তোমাদের ভয় করবে না?

মা একটা ট্রাঙ্ক খুলেছিলেন. চাবি দিতে দিতে বললেন, ভয় কিসের রে। চ; ছাদটা দেখে আসি।

প্রথমে আমি, আমার পেছনে মন। অন্ধকারে মায়ের গলা শুনি, এবার বাড়িতে একটা বউ চাই। কদিন পর মিলি কলেজে যাবে, আমি সারাদিন একা থাকবো নাকি?

এই প্রথম মিলির গলায় খুশির ছোঁয়া লাগে, ছোড়দা?

সাবধানে আয়। হোঁচট খাবি।

ছাদে পৌঁছে তিন জন তিন দিকে ছড়িয়ে যাই। চারদিক বড়ো অপরূপ। সন্ধের আকাশও যে এমন নীল হতে পারে, আমি জানতাম না।

আমরা তিনজনেই ঘুরে ঘুরে দেখি। বুক ভরে নিশ্বাস নিই। আমাদের পায়ের তলায় কর্কশ ছাদটাও বড়ো স্বাদ লাগে। পায়ের চাপে চাপে সুখ, স্বস্তি, অধিকারের স্পর্শ নিতে থাকি আমরা।

হঠাৎ উত্তর-পশ্চিম কোণ থেকে মা প্রায় দৌড়ে আমার কাছে এসে ভয় পাওয়া গলায় বললেন, চ খোকা, নিচে যাই।

আমি অবাক হয়ে বললাম, কী হয়েছে মা?

শিগ্‌গির চ। শিগ্‌গির। মিলি। বলে তিনি দুহাতে আমাদের দুজনকে প্রায় টানতে টানতে সিঁড়ির দিকে নিয়ে চললেন।

কী হয়েছে, কী ব্যাপার? মা, তুমি অমন করছো কেন?

আঃ খোকা। বলছি চল। শিগ্‌গির।

রাস্তায় কাউকে দেখলে? হঠাৎ ভয় পেলে কেন? মা।

মিলি বললো মা তোমার কী হয়েছে? রাস্তায় কোনো সন্ন্যাসী দেখে ভয় পেয়েছো?

মা অল্প অল্প হাঁপাচ্ছেন। আমি জোর করে হাত ছাড়িয়ে নিয়ে ছাদের উত্তর-পশ্চিম কোনের কার্নিশে ঝুঁকে রাস্তা দেখলাম, একটা ছাগলছানা ঘাস খেতে-খেতে আপনমনে এগোচ্ছে।

সিঁড়ির মুখ থেকে মা চেঁচিয়ে ওঠেন, খোকা। ওখানে দাঁড়াসনি। শকুন।

মুখ তুলে দেখি রাস্তার ঠিক পাশেই তালগাছে একটা শকুন জুবুথুবু মেরে বসে আছে। আমাদের কার্নিশ থেকে মাত্রই দশ-বারো হাত দূরে। কিন্তু সন্ধের অন্ধকারে এমন ভাবে মিশে আছে, এতো কাছ থেকেও চট করে চোখে পড়ে না।

আমি একটা ঢিল কুড়িয়ে নিয়ে শকুনটাকে তাড়াতে যাচ্ছি, মা পেছন থেকে এসে আমার হাত চেপে ধরলেন, কী করছিস। আর এক মুহূর্তও নয়। শিগ্‌গির চল।

নিচে নেমে মা উত্তর-পশ্চিমের

অমরনাথ ভট্টাচার্যের কণ্ঠে পাখোয়াজ সংগতে শুনেছিলাম একটি রবীন্দ্রসংগীত 'স্বরূপ লইয়া থাকি আমি তাই'। ওঁর মুখের সেই এক্সপ্রেশন গলায় ধরা আমার জীবনে রীতিমত একটা অভিজ্ঞতা। সেইদিন এক ঝলক বিদ্যুতের মতই একটা উপলব্ধি যেন হঠাৎ জ্বলে উঠেছিলো মনের অতল গহনে—ধ্রুপদের ধ্যানগম্ভীর স্তব্ধতায় মনটা ভিজিয়ে না গেলে এসব গান এমন করে গাওয়া যায় না। গৈরিক বসন ত্যাগীকেই সাজে। ভোগীকে নয়—

'বাঃ। চমৎকার বলেছেন—ছোটবেলা থেকে ধ্রুপদ শুনতে শুনতে ত আপনারও বেশ একটা দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গি গড়ে উঠেছে—

এ্যা-ই। আমার তারিফে আবার উচ্চকিত হাসিতে বিগলিত অনিলদা।

কি বলছিলাম? ....বেশ আনন্দ করে গান-বাজনা শুনে দিন কেটে যাচ্ছিলো। গোল বাধলো কনফারেন্স শুরু হবার পর। পাথুরিয়াঘাটার ভূপেন্দ্রকৃষ্ণ ঘোষ এই সংগীত সম্মেলনীর প্রেরণা পেয়েছিলেন এলাহাবাদে প্রয়াগ সঙ্গীত সম্মেলনের প্রতিষ্ঠাতা দক্ষিণারঞ্জন ভট্টাচার্যের কাছে। এই সম্মেলনেই হীরুবাবুকে নিয়ে ভূপেনবাবু গিয়েছিলেন। সেখানের সাতদিনব্যাপী সংগীত উৎসব দেখে ভূপেনবাবুর মনে ইচ্ছে জাগলো। কলকাতাতেও এই ধরণের সম্মেলন প্রচলন করবার।

ওঁরা দেওয়ান ছিলেন। ভূপেনবাবু খিলাত ঘোষের ভাইপো। তিনি লালাবাবুকেও সঙ্গে নিলেন—এগিয়ে এলেন কলকাতা ও তার চারপাশের রাজা-মহারাজা, ধনী জমিদার। কারো এগোতে দেরি হল না। কিন্তু তখন থেকে গানের সভার চেহারা আস্তে আস্তে পালটাতে শুরু করলো।

কেমন করে?

এই প্রথম সাধারণ দর্শক ওপেন-টু-অল ফাংশনে আবদুল করিম, ফৈয়াজ খাঁ, আলাউদ্দিন খাঁ, হাফেজ আলি প্রমুখ শিল্পীদের দেখবার ও গান শোনবার সুযোগ পেলেন। এর আগে মুষ্টিমেয় কিছু ধনী সম্প্রদায় ছাড়া অন্য কারো এ রস আস্বাদনের পথ ছিলো না। রায়বাবুর বাড়ি যখন মালকা জান, কেশরীবাঈ আরো সব বিশেষ বিশেষ অনুষ্ঠান হত তখন সদর দরজা বন্ধ করে দেওয়া হত। আমার মত নাছোড়বান্দা লোকও সেসব গান শুনতে পারেনি। কারণ সেসব ছিলো সৌখিন পয়সার বাড়ির উৎসব। নিমন্ত্রিত অভিজাতমহলই সেসব গান বাজনা শোনবার অধিকারী ছিলেন। জনসাধারণের সঙ্গে এসব আসরের কোনো সম্পর্ক ছিলো না।

এই নিরিখে বিচার করে দেখলে উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত প্রচারের পরিধি অনেকখানিই বিস্তৃত হল। প্রথমে খানিকটা কৌতুহলের বশে, খানিকটা অন্যের কাছে বাহাদুরী দেখাবার উদ্দেশ্যে অনেকেই মানে একটু সঙ্গতিপন্ন অবস্থার মানুষ এইসব কনফারেন্সে যেতে শুরু করলেন। তারপর যেতে যেতে কেমন একটা নেশা লেগে গেলো। সারা রাত জেগে বসে আবদুল করিম, ফৈয়াজ খাঁ, ওংকারনাথ আলাউদ্দিন খাঁর গানবাজনা শোনেন তাঁদের অন্যরা মানে, যাদের সে সুযোগ নেই রীতিমত সম্ভ্রমের চোখে দেখতে শুরু করলেন। এ সবের একটা মোহ ত ছিলই।

এই মোহ বা নেশাই ক্রমে ভাল লাগায় রূপান্তরিত হল। তারপর এমন হল যে এই সব রাতের আসরে না গেলে প্রাণ হায় হায় করে। এই রকম ভাবে একটা বিরাট বিদগ্ধ শ্রোতৃগোষ্ঠী তৈরি হয়ে গেল। তাদের কান-প্রাণ সবই উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের জন্য উতলা হয়ে উঠলো।

সংগীত জগতের উল্লেখযোগ্য পট-পরিবর্তন ঘটালো এই অল বেঙ্গল মিউজিক কনফারেন্স। বড় বড় ওস্তাদ ও বাইদের গান শুনতে শুনতে ক্রমশঃ শিক্ষিত ছেলে-মেয়েদের মধ্যে উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত শেখবার উৎসাহ জাগলো। তখনই স্কুল-কলেজে সংগীত শাস্ত্র নিয়ে গবেষণা করবার প্রেরণা দেখা গেলো। ভাতখন্ডের বই-এর খোঁজ পড়লো। আরও অনেকে এসব বিষয়ে বই লেখবার প্রেরণা পেলেন। এই-ভাবে রাগ রাগিণীর পর্দা চলন এসব বিষয়ে শিক্ষার্থীদের একটা ধারণা গড়ে উঠতে লাগলো। এর আগে এখানে ওখানে হঠাৎ গানের কিছু অংশ শুনে গলায় তুলে নিতো। তার একটা মজা ছিলো বটে কিন্তু সে সুর হারিয়ে যাবার ভয়ও ছিলো। সে আলোচনায় পরে আসছি। তার আগে নিজের কথাটা বলে নিই।

কনফারেন্স, টিকিট সেল এইসব সিস্টেম চালু হবার পর আমার খুব অসুবিধে হয়ে গেলো। অত টাকা দিয়ে টিকিট কেনবার সামর্থ্য নেই। ভেতরে ঢুকব কেমন করে? প্রথম সমস্যার ধাক্কাটা কাটতেই আস্তে আস্তে রাস্তা খুঁজে পাওয়া গেলো। আমাদের অফিসেই কাজ করতেন খ্যাতনামা পাখোয়াজী খগেনবাবু। তিনি পাখোয়াজে দুর্লভবাবুর এবং তবলায় হীরুবাবুর বাবা কনকবাবুর শিষ্য। তাঁরই দৌলতে উদ্যোগে সংগীত জগতের দু-চারজন মানুষের সঙ্গে জানাশোনা হয়ে গেলো। তাঁদেরই কেউ হয়ত বলতেন 'অমুক সময় গেটের কাছে দাঁড়িয়ে থেকো কখনও বা সেরকম কোনো সুবিধা থাকে তোমায় ঠিক ঢুকিয়ে দেব।' কখনও দিতেন না। তখন অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে ফিরে আসতাম।

খগেনবাবু যখন দেরি করে যেতেন ওঁর কার্ড নিয়ে আমি হয়ত আগে যেয়ে খানিকটা শুনলাম, ওঁর সঙ্গে নির্ধারিত সময়ে আবার বেরিয়ে এলাম, উনি কার্ড

শোনার থাকার জন্যে অর্থচিন্তার চাপটা অনেক কম ছিলো। যখন একাধিক কনফারেন্স হল তখন সংগঠকদের পরস্পরের মধ্যে একটা প্রতিযোগিতা চলতে লাগলো। একজন বলেন আমরা অমুক অমুক আর্টিস্টকে এনেছি তাঁকে অন্য কেউ আনতে পারেননি। অপরজন বলেন 'আমরা এনেছি অমুক অমুক শিল্পীদের তাঁরা আমাদের কনফারেন্সেরই শোভাবর্ধন করা। সংগঠকদের পরস্পরের মধ্যে এইরকম প্রতি-দ্বন্দ্বিতা চলার জন্যে আখেরে শ্রোতাদের লাভ ছাড়া ক্ষতি কিছু হয়নি। ভারতবর্ষের অনেক প্রান্তের শিল্পীদেরই তাঁরা প্রাণ ভরে শোনাতে পেরেছেন।

সর্বপ্রথম কনফারেন্স হল অল বেঙ্গল মিউজিক কনফারেন্স। ১৯৩৪ সাল থেকে। তারপর ১৯৪৫ সাল থেকে অল ইণ্ডিয়া মিউজিক কনফারেন্স। শিল্পী মূল্যায়নের পরিপ্রেক্ষিতে বলব এসব কনফারেন্সে আবদুল করিম খাঁ সাহেব, ওংকারনাথ ঠাকুর, ফৈয়াজ খাঁ সাহেব কেশরবাঈ যে সম্মান পেতেন সে সম্মান পেতেন না গোলাম আলি খাঁ সাহেব। আবদুল করিম, ফৈয়াজ খাঁর দেহাবসানের পর গোলাম আলি খাঁ সাহেবকে নিয়ে হইহই পড়ে গেলো।

যাই হোক কনফারেন্সের আগে মুষ্টিমেয় কিছু সঙ্গীতরসিক উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের রসাস্বাদনের অধিকারী ছিলেন। কনফারেন্স চালু হবার পর কিছু অর্থ ব্যয় করলে সকলেই এসব গান শুনতে পাবেন ও বোধ জাগবার সঙ্গে সঙ্গেই ক্রমশঃ সাধারণ মানুষ সচেতন হল যে এ গান কোনো বিশেষ সম্প্রদায়ের সম্পত্তি নয়, সকলেরই আছে এ গান শোনবার ও উপভোগ করবার অধিকার। সবাই মুগ্ধ হয়ে শুনলো আবদুল করিম খাঁ, ওংকারনাথ, ফৈয়াজ খাঁ, হীরাবাঈ, কেশরবাঈ-এর গান— আলাউদ্দিন খাঁ, হাফেজ আলি এনায়েৎ খাঁর বাজনা। তাঁরা ছিলেন কলকাতার বাইরের গুণীজন—পালসকর, কুমার গন্ধর্ব তখন তরুণ শিল্পী। কি যুগ ছিলো। ভাবুন একবার।

একবার আবদুল করিম খাঁ সাহেবকে খুব কাছ থেকে দেখতে ও শুনতে ইচ্ছে হোলো। বরাবর বাইরে দাঁড়িয়ে শুনি। একবার চেহারাটা দেখব না? কেন জানি না আমার মন বলছিলো উনি আর বেশীদিন থাকবেন না। আমি খগেনবাবুকে বলেও ছিলাম সে কথা। উনি বললেন, তোমার মনটা এত চঞ্চল হচ্ছে? আচ্ছা দেখি কি করতে পারি।

ওঁকে অল বেঙ্গল মিউজিক কনফারেন্স থেকে খাতির করে একটা ব্যাজ দিয়েছিল। সেই ব্যাজ উনি আমায় দিয়েছিলেন ভেতরে ঢোকবার জন্য। ব্যাজের দৌলতে ভেতরে গিয়েই আমি ব্যাজটি খুলে এক ফাঁকে চুপিচুপি খগেনবাবুর হাতে ফিরিয়ে দিয়েই হাঁফছেড়ে ঘুরে বেড়াতে লাগলাম। তারপর ওঁর সঙ্গে হেসে হেসে কথা বলছি, ওর গানের ভিতরে থেকে গান শুনলে—ভাবছি যেন আমিই সেখানের মনুষ্যদের একজন। সে আসরে শুনেছিলাম আবদুল করিমের গান, একেবারে তাঁর আত্মাকেই যেন স্পর্শ করে তাঁর স্পর্শ মেলাচ্ছে। ভগবান সেদিন আমার মনের বাসনা পূর্ণ করেছিলেন। কি গান যে সেদিন গেয়েছিলেন! গান শেষ হবার পর অত লোক যখন বেরিয়ে আসে একটা হৈ হৈ হয় না? কিন্তু সেদিন কোনো কোলাহল নেই, শব্দ নেই, কারো মুখে কোনো কথা নেই। কেমন একটা থমথমে ভাব সারা হলে। সবাই নীরবে বেরিয়ে আসছে। যেন কি একটা হারিয়ে গেছে। সে কণ্ঠের মায়াময় সুরে ভাবে সবাই যেন একেবারে মেসমেরাইজড।

এ গান শোনার পর বাড়িতে এসেও কারো সঙ্গে কথা বলতে পারিনি সারাদিন। যতবার সেই অপরূপ কণ্ঠের সুর কানের ভেতর গুনগুনিয়ে উঠছিলো নিজেকে অত্যন্ত সার্থক মনে হচ্ছিলো। আর বারবার মনে মনে প্রণাম জানাচ্ছিলাম শ্রদ্ধেয় খগেনবাবুকে। তাঁর অনুগ্রহেই ত এমন গান শুনতে পেলাম এতবড় শিল্পীর একেবারে কাছটিতে বসে? আমার মত অনুগত মানুষের প্রতিও তাঁর কত দয়া?

আবদুল করিমের গানে অতিবড় নাস্তিককেও 'আহা' করে উঠতে হত। অমন তাঁর চেহারা দেখে অতবড় প্রতিভার কোনো আন্দাজ পাওয়া যেতো না। অতি সাধারণ। মেহনতী মানুষের মত দেখতে। শুধু তাঁর লক্ষ্য করলে তবেই স্বল্পবাক মানুষটির মধ্যে একটা আত্মভোলা ভাবুক ছায়া চোখে পড়তো।

ফৈয়াজ খাঁ সাহেবের খুব রাজকীয় চেহারা ছিলো। সাদা আচকান, কুচকুচে কালো পাগড়ী, রুপো বাঁধানো লাঠি নিয়ে আসরে ঢুকলেই আসরে সাড়া পড়ে যেতো। উনি যখন লাঠিতে রাখা হাতের ওপর চিবুক রেখে গোঁফ মুচড়ে মহারাজার মত বসতেন—ওঁর ধারে কাছে কেউ ঘেঁষতে সাহস করতো না।

ওংকারনাথের ছিলো রাজর্ষির মত চেহারা। উনি খুব রসিক মানুষ ছিলেন। সবার সঙ্গে হাসতেন, কথা বলতেন কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে নিজের একটা দূরত্বও বজায় রাখতেন।

মজলিশী মানুষ ছিলেন বড়ে গোলাম আলি খাঁন। গলাগলি করে আমায় ডেকে বসতেন। আমায় দেখলেই বলতেন 'তোমাকেই ত এতক্ষণ খুঁজছিলাম। কোথায় ছিলে? তুমি না এলে কি আসর জমে?

(চলবে)

ঈশান চেঁচিয়ে উঠল, মাছ ধরার গুনে দিয়ে আর জগন্নাথ। শুধু জোয়ানরা বাঁশ আছে, নিয়ে আয়।

মাছ ধরার গুনে আনতে জগন্নাথ ছুটে গেল।

গৌরী আবার চেঁচিয়ে উঠল, আমার কী হবে গো—

রজনী বলল, আর দেরি করিস না ঈশান। যা, লোকেরা ওঠ। আমি আছি ওর পাশে। তুই যা।

এখন যথা গুনের সাইজের গুনের বলেই রোদের তেজটা গায়ে লাগছে না।

রজনী মেয়েটার দিকে তাকাল। মেয়েটা ফুলে ফুলে কাঁদছে। কান্না অনেকটা সংক্রামক রোগের মতো। রজনীর খুবই খারাপ লাগতে থাকে। লক্ষ্মণটাকে এভাবে তেড়ে না গেলেই হত। অন্যায় যা ও করেছে তার জন্য আলাদা সাজা একে দেওয়া যেত। মেয়েটার জন্যই কেমন যেন মন ভিজে উঠেছিল রজনীর। আর রাগটা আছড়ে পড়েছিল ঈশানের ওপর। একটা না একটা গোলমাল ও বাঁধিয়েই চলেছে। মেয়েটাকে নিয়ে এখন আবার কি বিপদে পড়তে হয়, কে জানে।

ওদিকে বড় বড় কয়েকটা বাঁশ জোগাড় হয়ে গেছে। মাছ ধরার গুনেও চলে এল। পাড়ে দাঁড়িয়েই কয়েকজন গুন ছোড়াছুঁড়ি শুরু করে দিল। গুনের কাঁটা জলের তলদেশে গড়াতে গড়াতে আবার উঠে আসছে ফাঁকা, কিছু নেই। বেমালুম যেন জলের সঙ্গে বিন্দু বিন্দু হয়ে মিশে গেছে লক্ষ্মণ।

গুন টেনে যে লক্ষ্মণকে পাওয়া যাবে না তা আগেই জানা ছিল। তবু গুন না টানলে মনের অস্থিরতাও থেকে যেত। ওদিকে ডিঙি নৌকোয় চার-পাঁচজন উঠে পড়েছে। জলের তোড়ে নৌকা সামলান দায়। রসিকলাল বৈঠা ধরল। বাঁশ হাতে ঈশান আর জগন্নাথ। জলে বাঁশ ডুবিয়ে ধরে রাখা দায়। এই মনে হয় কিছু বুঝি একটা ঠেকছে, কিন্তু না, কিছুই না।

একটা ঘেরা জাল পেলে ছুঁড়ে ছুঁড়ে দেখা যেত। কিন্তু জাল বয়ে আনার কথা কারোরই মাথায় ছিল না। এই অরণ্যের দেশে জাল সঙ্গে রাখার কথা কেউই ভাবে নি আগে।

জগন্নাথ বলল, লোকটা এত অল্প সময়ের মধ্যে কোথায় হারিয়ে যেতে পারে বল দেখি?

ঈশান বলল, কাদার তলায় ঢুকিয়ে ছিল। শিবের সাধ্যি নেই ওকে বাঁচায়।

আবার বাঁশ খোঁচাতে শুরু করে ওরা। জলের টানে বাঁশের গোড়া ভেসে ভেসে ওঠে। অসম্ভব শক্তি দিয়ে মাটির মধ্যে গুঁজে গুঁজে দেখতে হয় ওদের।

রজনী মেয়েটার কাছে— মেয়েটা এখনো কাঁদছে— হঠাৎ— মেয়ে শিউরে উঠে লেগেছে। ঘোলাটে চোখ। মুখের ওপর ছড়িয়ে চুল

ধরা। [illegible] দিকে [illegible] করে [illegible] আছে। [illegible] এই [illegible] [illegible]

[illegible]

[illegible]

—[illegible] জগন্নাথ

[illegible]

—[illegible]

—[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible] ঈশান আবার [illegible]

জগন্নাথ বলল, লগিতে ধরা পড়বে না। যদি ধরা পড়ে ওদের গুনে টানাতেই ধরা পড়বে।

খুপাখুপ পড়ে ছুঁড়েছিল ওরা। কিন্তু বৃথাই টানা। পরিষ্কার গুনের কাঁটা উঠে আসছিল ডাঙায়।

জগন্নাথ এসময় সরাসরি অভিযোগ করল, তুই অমন করে কাটারিটা ওর দিকে না ছুঁড়লেও পারতিস।

ঈশান চমকে উঠল, আমি! না আমি না।

—আমায় চোখকে ফাঁকি দিতে পারবি না ঈশান। তোর কাটারিটা ওর মুখে লেগেছে।

ঈশান রুখে দাঁড়াল, বাজে কথা। আমি ছুঁড়ি নি। কিন্তু হাত থেকে লগিটা ওর ঘাড়ে গেল।

জগন্নাথও ছাড়বার পাত্র নয়, অনেকেই অনেক কিছু ছুঁড়েছে কিন্তু তোর কাটারিতে ওকে ঘায়েল করেছে। ও সামলাতে পারে নি।

ঈশান তেড়ে এল জগন্নাথের দিকে, কেন আমার নামে দোষ চাপাবি তো শেষ পর্যন্ত তোকেও হিসেব দিতে হবে জগন্নাথ।

রসিক মাঝখানে পড়ে থামিয়ে দিল দুজনকে।

জগন্নাথ ভেড়ির দিকে তাকাল। যেন শালা, লক্ষ্মণের জন্য দরদ দেখাচ্ছিস? ভেড়িতে গর্ত খুঁড়েছিল কে?

জগন্নাথ ভেড়ির দিকে তাকাল। যেন রজনীকেই ও এসময় পাশে খুঁজছিল। রজনী মেয়েটাকে আগলে গায় গায় হয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

—শালা, ফন্দি এঁটেছিল, আমাদের নদীর জলে ডুবিয়ে মারবে। সেদিন যে বাঁধ ভাঙল, সেটাও ওরই কীর্তি জানিস?

জগন্নাথ তাকিয়ে থাকল। উত্তর দিলেই ঝগড়া হবে। চুপ করে থাকাই ভাল।

রসিক নৌকাটাকে এবার তীরের দিকে ঘুরিয়ে আনল।

ঈশান বিড়বিড় করে বলল, শালা নিজের পাপে নিজে মরেছে। আমরা কেউ ওকে মারি নি।

ভেড়ির ওপর থোকা থোকা মানুষ। গভীর আগ্রহে সবাই অপেক্ষা করছে, গুনের টানে কিছু একটা ভেসে উঠলেও উঠতে পারে।

জগন্নাথ ডিঙি থেকে নেমে পড়ল। এক হাঁটু কাদা। কাদা ডিঙিয়ে ডিঙিয়ে ও ভেড়ির ওপরে মকবুলের দিকে চলে গেল। নেমে পড়ল ঈশানও। এগিয়ে এল গৌরীর দিকে।

রজনী ফ্যাল ফ্যাল করে জলের দিকেই তাকিয়ে আছে। ঈশানকে পাশে পেয়ে শুধাল, পেলি না?

ঈশান বলল, কপালে থাকলে এখনো পাওয়া যেতে পারে, ওরা গুন টানছে।

—আমার কী হবে ঈশানদা? আবার ডুকরে উঠল গৌরী। লোকটা যে আমাকে বাড়ি পৌঁছে দেবে বলে বেরিয়েছিল।

—খোঁজাখুঁজি তো হচ্ছে। ঈশানের আর কিছু বলতে সাহস হল না।

—লক্ষ্মণ দা তো পাহাড়পাড়া থেকে বেরুতে চায় নি। আমিই ওকে জোর করে বার করে এনেছিলাম গো—

—একটা শয়তানকে তুমি জোগাড় করেছিলে। ওরকম মানুষ ঘরের চালেও আগুন লাগাতে পারত।

—তোমরা ওকে মারলে কেন? আমাদের তাড়িয়ে দিলেই তো পারতে।

—আমরা মারি নি। নিজেই গিয়ে জলে ঝাঁপিয়ে পড়েছে।

গৌরীর শরীরটা ফুলে উঠল, তোমরা ওকে তাড়া করে এনে এই নদীর জলে ফেলে দাও নি বলতে চাও?

ঈশান কিছুটা থমকে যায়। সব সময় বলা ঠিক বলা যায় না। যদি ওর শয়তানি চোখে না দেখতাম, তাহলে এক কথা ছিল

রজনী বলল, আমি তোদের আগেই লোকজনায় ঈশান, ওদের তাড়িয়ে দে। কি রকম বাপু, ঝামেলায় যাওয়া।

ঈশানের আর তর্ক করতে ইচ্ছে হচ্ছিল না।

—আর তোমাকেও বলিহারি মেয়ে। মহেশবাবু ঘুরে ফিরে আমাদেরই এখানে। আমরা আছি আমাদের জ্বালায়। তার মধ্যে হত সব নাই ঝামেলা ঘাড়ে চাপান।

গৌরী আবার আঁচল গুঁজে ধরল মুখে। একা একটা অসহায় লোক পেয়ে তোমরা ওকে মেরে ফেলবে? তোমরা খুনী।

মকবুলের গলা পাওয়া গেল এ সময়, তোমরা এবার উঠে এসে রজনী ভাই। ওখানে বসে থেকে তো লাভ নেই।

গৌরী জলের দিকে চোখ পেতে বসে থাকল, না, আমি যাব না।

—লক্ষ্মণকে যদি পাওয়া যায়, এমনিতেই যাবে। ওখানে বসে কান্নাকাটি করে কিছু লাভ আছে?

ঈশান ধীরে ধীরে সরে গেল। এক-জনের হাত থেকে গুনের দড়ি ছিনিয়ে নিল, আমাকে দে।

রজনী বলল, ওঠ মেয়ে। যা হয়ে গেছে তা তো আর ফেরান যাবে না, ওঠ।

—না, আমি যাব না। পা থেকে রজনীর হাত ছাড়িয়ে নিল গৌরী।

—মিছি মিছি কেবল বসে থাকা। ওঠ।

—আমাকে তোমরা ঘোষবনেই দিয়ে এস। আমি দাদাদের কাছে সব বলব।

রজনী কেমন গুটিয়ে গেল, লক্ষ্মণকে খুন করে জলে ফেলে দেওয়া হয়েছে, কথাটা এই জঙ্গলের বাইরে গেলেই বিপদ। তখন রজনীকে নিয়েও টানাটানি পড়ে যাবে। ভয়ে মুখ শুকিয়ে এল ওর।

—আমি আর এক মুহূর্ত থাকব না এখানে। তোমরা মানুষ খুন করেছ। লক্ষ্মণদা গো—

আবার ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল গৌরী।

রজনী অবস্থাটা এবার সামাল দেবার জন্য ধমকে উঠল, খবরদার, যা বলছি তাই কর। উঠে পড়।

রজনীর দিকে তাকাল গৌরী। তোমরা আমাকে ঘোষবনে না দিয়ে এলে, আমি একাই বেরুব। আমি একাই চলে যাব।

গৌরী উঠে দাঁড়াবার চেষ্টা করল।

রজনী বলল, আমরা তোমাকে বেঁধে রাখব না। ঘোষবনেই দিয়ে আসব। এখন চলো।

—কোথায়?

—এখানে বসে তো আর লাভ নেই। কাছারি ঘরে চল। কি করা যায় পরে ভাবা যাবে।

—না, আমি যাব না। গৌরী ছুটে ডিঙি নৌকার দিকে আসতেই রজনী খপ করে ওর হাতটাকে ধরে ফেলল। কি পাগলামী শুরু হচ্ছে।

—আমি চলে যাবো, আমাকে ছাড়, ছেড়ে দাও।

রজনী গায়ের জোরে ওকে টেনে নিয়ে এল ডিঙির ওপর। বলেছি তো —পৌঁছে দেব। লক্ষ্মণকে পাওয়া যায় কি না দেখতে হবে না?

গৌরী রজনীর দিকে তাকাল। কেমন যেন বিশ্বস্ত মনে হল ওকে। তবু নিশ্চিন্ত হওয়ার জন্য শুধাল, কালই আমাকে পৌঁছে দেবে তো তোমরা?

রজনী বলল, আগে কাছারিতে চল, কে দোষ করেছে তার বিচার হবে, তারপর না! গৌরী চুপ করে শুনল।

—অন্যায় যে করেছে, তাকে শাস্তি আমরা দেবই। চলো। গৌরীর হাত ধরে টানল রজনী।

কী আশ্চর্য গৌরী এগোতে শুরু করল রজনীর সঙ্গে; দৃশ্যটা তাকিয়ে দেখার মতো। এই রজনীই না দু' দিন আগে মেয়েটার নাম শুনলে তেলে বেগুনে জ্বলে উঠত। তা হলে কি মেয়েটা আজ রজনীকেও বশ করল।

ঈশানও গুন টানা ভুলে গিয়ে তাকিয়ে থাকল ওদের দিকে। ওরা ডিঙি থেকে

নেমে ধীরে ধীরে কাছারি বাড়ির দিকে হেঁটে যাচ্ছে। গৌরীর উত্তেজনা না কমলে ওর কাছে আর এগোন যাবে না। গৌরী কি দেখে ফেলেছে ঈশানের কাটারিটাই ওর মাথায় গিয়ে আঘাত করেছে? আর তাই জের সামলাতে না পেরেই লক্ষ্মণ জলের ভিতর আশ্রয় নিয়েছে?

ঠিক এরকম যে ঘটনা ঈশান স্বপ্নেও ভাবে নি। ও ভাবতেই পারে নি লোকটা নিমেষের মধ্যে পৃথিবী ছেড়ে চিরকালের মতো চলে যাবে। এ অবস্থায় আবার গৌরীর মুখোমুখি হবে কি করে, ও। ধুস শালা, কি কুক্ষণেই যে বাসায় এসে পা দিয়েছিলাম। ক্ষোভে গজরাতে শুরু করল ঈশান।

চার-পাঁচ জন লোক তখনো ছড়িয়ে গিয়ে বিচ্ছিন্ন ভাবে, গুন টেনে চলেছে নদীতে। জলের তলায় ধারে কাছে যদি লোকটা থাকত, ঠিক পাওয়া যেত। তবে কি কুমিরে বা কামটেই ওকে টেনে নিয়ে অন্য কোথাও চলে গেল? অথচ আজ সকালেও লোকটাকে হেঁটে চলে বেড়াতে দেখা গেছে। মানুষের জীবনেরই কোন দাম নেই।

আর ঠিক এতক্ষণ পরে মাটিকের প্রায় শেষ অংশে দেখা গেল শুকদেবটাকে দেখা গেল। রক্তাক্ত চোখ। এতক্ষণ কোথায় বুঁদ হয়ে পড়েছিল, কে জানে। এখানে যে এত বড় একটা ঘটনা ঘটে গেছে বিন্দুমাত্র বোধ হয় টের পায় নি ও। কেমন ঘোলাটে চোখে তাকাল।

—কি হয়েছে গো ঈশান?

ঈশান একপলক তাকাল শুকদেবের দিকে। উত্তর করল না।

—কি হয়েছে বলবে তো? এই দ্যাখো, কেউ না বললে আমি বুঝব কি করে।

—তোর বুঝতে হবে না। ঈশান গলাটা চেঁচিয়ে উঠল, কোদাল গাঁইতা নিয়ে কয়েকজন আমার সঙ্গে চলে আয়। জেটিতে যে খোঁদা বানিয়ে গেছে লোকটা, সেটা আগে বুজিয়ে আসি চল।

মকবুল তখনো দাঁড়িয়ে ছিল জেটির ওপর। যারা গুন টানছিল তাদের উপদেশ দিল, তিন সুরোত মুখ অবধি গুন টানতে টানতে এগিয়ে যা তোরা। তবু না পাওয়া গেলে আর কি করা যাবে।

ঈশান নিজেই একটা কোদাল তুলে নিল। চল, কে কে যাবি আমার সঙ্গে।

শুকদেব আবার চেঁচিয়ে উঠল, কি হয়েছে বলবে তো? আমি কি মানুষ নই?

মকবুল বলল, তুই আমার কাছে আয় শুকদেব, আমি বলছি।

শুকদেব এগিয়ে এল। বলো, তুমিই বলো।

মকবুল বলল, লক্ষ্মণ লোকটাকে কামটে টেনে নিয়ে গেছে জলের তলায়।

—কেন?

—কেন কি? যা, আরো গাঁজা টান গে যা। দেখছিস, সবার মাথা খারাপ, শুধু তোর লজ্জা নেই।

শুকদেব বলল, ডাঙার মানুষকে কামটে ধরে কি করে, সেটাই তো আমার প্রশ্ন গো।

ডাঙার মানুষ জলে পা দিলে কামট ধরবেই। যা, রাত জেগেছিস, এবার ঘুমিয়ে নে গে যা।

শুকদেব আবার কি একটা রসিকতা করল। কিন্তু যা ঘটেছে তা যে আদৌ রসিকতার নয় ওকে বোঝান যাবে না। মকবুল আবার জলের ভাঁটার চোখ ফিরিয়ে আনল। ভাঁটার নদী। জল নামতে নামতে বেশ কিছুটা পাড়ার পেট জাগিয়েছে তীরে। এই ভাঁটায় নদী আরো শুকিয়ে এলেও লোকটাকে যদি পাওয়া না যায় তা হলে আর আশা নেই।

মকবুল জেটির ওপরই বসে পড়ে। ঈশান আট দশ জন লোক নিয়ে খোঁদা সারাইয়ের জন এগোতে থাকে। কাজের এতক্ষণ যারা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে পরিস্থিতি বুঝছিল তারাও এক এক করে জেটির ওপর উঠে এসে বসে পড়ে।

আর ওদিকে গৌরীকে নিয়ে রজনী ততক্ষণে কাছারি ঘরে ঢুকে পড়েছে।

—এই মেয়ে!

গৌরী তাকাল।

—চোখে মুখে একটু জল ছিটিয়ে নাও। মিছিমিছি কেঁদে লাভ নেই। এখানে বসে বিশ্রাম কর। তারপর দেখি কি করা যায়!

গৌরী কাছারির ঘরের মেঝেতেই বসে পড়ে। বুকের ভেতর গুমরে গুমরে কান্না। কোন অপরাধে এত বড় শাস্তি হল ওর। লক্ষ্মণদা কি সত্যি সত্যি সেদিন বাঁধ ভেঙে রেখেছিল। লক্ষ্মণদা কি সত্যি সত্যি আজও জেটি ভাঙবার জন্য ঐ জলের দিকে গিয়েছিল। অসম্ভব, বিশ্বাস করতে পারে না গৌরী। লক্ষ্মণদাকে যতটুকু ও চেনে এ কাজ ও করতেই পারে না। তবে কি ঈশানই মিছিমিছি ওর নামে এত সব দোষ চাপিয়ে এখন শুধু সাজাতে চাইছে।

একটা দীর্ঘশ্বাস ছাড়ল গৌরী। সেদিন রাতে অমন করে ওকে কাটারি তুলে ভয় না দেখালেও হত। লক্ষ্মণদা কি সেই রাগেই লোকগুলোর ওপর প্রতিশোধ তুলতে গিয়েছিল।

—লক্ষ্মণদা গো—আবার ডুকরে উঠল গৌরী।

রজনী খাটে বসে ঠায় তাকিয়ে ছিল গৌরীর দিকে। আবার একটা হুমকি ছাড়ল, কি হল। যা বললাম কানে গেল না। চোখে মুখে জল দিয়ে এলে না?

(চলবে)।

ক্যালিফোর্নিয়া-মলয়

একটি বিভ্রমণ কাহিনী নবনীতা দেব সেন

আর এলিজাবেথ করুণ গলায় বললো—মাথামুণ্ডু কোনো কিছু কি আর খেয়াল রেখেছে কারুর? কী বলতে যে-কী বলছে লোকে, কারুরই মাথার ঠিক নেই এখন। তুমি যেন কিছু মনে করো না অমর্ত্য!"

আমি গ্লাস ভরে তুষার নিয়ে এসে দেখি, আমার তুষারের খরিদ্দার অনেক। এলিজাবেথ, রজার, মলয়কুমারী—সবাই এক এক খাবলা বরফ চাখলেন। আমি বসে রইলুম—কখন তুষার গলবে!.... যদিও বাসের তাপযন্ত্র চলছিলো, তুষারের তরল হওয়ার কোনো লক্ষণই দেখা গেলো না। শেষে ঐ অবস্থাতেই তাকে গলাধঃকরণ করতে হলো। তেষ্টায় তখন তালু অবধি খাঁ খাঁ করছে। বাসের ভেতরটায় শুকনো গরম, জমাট ধোঁয়া, ভাপসা ঘাম, কোণের ছোট্ট কলঘর থেকে অস্বাস্থ্যকর গন্ধ আসছে। একটি শিশু নিম্নস্বরে গুনগুনিয়ে কাঁদছে। মায়েরা মাঝে মাঝে বাচ্চাদের ধমকে উঠছেন কড়া-গলায়।

আরো কতক্ষণ বাসে বসে থাকতে হবে?—

পথ কি সাফ হবে না?—

—গাড়ি ঘোরাও, চলো রিনোয় ফিরে যাই।

—ঘোরাও, গাড়ি ঘোরাও। ড্রাইভার, গাড়ি ঘোরাও না কেন?

নানা কণ্ঠ শোনা যেতে লাগলো। ড্রাইভার বললেন—'আমরা কি সখ করে পথের মধ্যে বসে আছি? একটি বাসের বডার্স-গীয়ার নষ্ট হয়ে গেছে। সে-গাড়ি নড়বে না। ওদের ফেলে কি ফিরে যেতে পারি?'

একটি একটি করে উঠে দাঁড়ালো সব ক'জন যুবক যাত্রী। দস্তানা পরলো, টুপি আঁটলো। তারপরে কোনো কথা না বলে প্রত্যেকে নেমে গেলো বাস থেকে। আমার কর্তাটি শুদ্ধু। অতঃপর শুরু হোলো এদের গাড়ি ঠেলার পর্ব। হাঁটু অবধি বরফে গুঁজে এরা অথর্ব বাসটির গায়ে ঠেলা মারে—বাস কম ইঞ্চি এগিয়ে দেড় ফুট পিছিয়ে আসে পিছলে। অমনি দুড়দাড় করে দুদিকে ছুটে পালায় ছেলেগুলো। আবার জড়ো হয়। আবার ঠেলা লাগায়।....ক্রমশঃ, প্রত্যেকের মাথায় ইঞ্চি-দুই পুরু হয়ে বরফ জমে উঠলো। পোশাক শাদা হয়ে গেলো। অমর্ত্য ফিরে এসে বললেন—'অসম্ভব। ও নড়ানো যাবে না। হাত জমে বরফ হয়ে গেছে আমাদের!'—অমর্ত্যকে প্রায় থাকতে টুপি পরানো সম্ভব নয়। ফলে, মাথাভর্তি ঝাঁকড়া শাদা বরফ। চশমার ফ্রেমেও পুরু বরফ জমে উঠেছে। ঝুলি থেকে কাগজের তোয়ালে বার করে দিলুম, মাথা মুছতে, চশমা মুছতে। মোটা চামড়ার দস্তানা থেকে আঙুলগুলো যখন বেরুলো, তাদের সেই কুঞ্চিত শাদা মূর্তি চেনা শক্ত। একে একে সব ছেলেরাই ফিরলো। সবাই ক্লান্ত। আরো সিগারেট। আরো হতাশা। আরো ধোঁয়া। শ্বাস বন্ধ হয়ে আসে।

হার্ভের ওয়াগন হুইল হোটেল
লেক টাহো—নেভেদা

মন আর মেজাজের রং পাল্টে চলেছে ঘণ্টাগুলোর সঙ্গে। ট্রেনে প্রথম যখন এই পথ হারানোর পালা শুরু হোলো, তখন প্রত্যেকের মনের যে-চেহারাটি প্রথম জেগে উঠেছিলো, তার সঙ্গে এখনকার চেহারাটির কোনো মিল নেই। যখন লাইন বেঁধে সবাই খাবার ঘরে গেছি,—স্বেচ্ছায় অল্পবয়সীরা বৃদ্ধদের এগিয়ে দিয়েছেন, বৃদ্ধরা দিয়েছেন শিশুদের এগিয়ে। যখন তরুণরা খেতে বসেছেন, তখন সবচেয়ে উষ্ণ খাদ্যটুকু অবশিষ্ট থেকেছে, তবু কারুরই ভুরু কুঁচকে ওঠেনি।

'অনুষ্ঠানে'র বেড়া ডিঙিয়ে কোনো এক সময়ে আমরা প্রত্যেকেই প্রত্যেকের পরম আত্মীয় হয়ে উঠেছিলুম। যে মাতাল পুরুষটি প্রথম রাত্রেই পানশালার মেঝেয় আছড়ে পড়ে এক ট্রেন মানুষের বিরাগভাজন হয়েছিলেন,—তিনিই যখন 'কেন্ডী' এলে পর এক পেয়ালা কফি এনে দিতে অনুরোধ করলেন, তখন তাঁরই জন্যে সহ-যাত্রীরা শশব্যস্তে! আটটি কামরা পেরিয়ে তিন পেয়ালা গরম কফি বয়ে এনে দিয়েছিলেন। যে নিগ্রো ভদ্রলোক দুটি বাচ্চা শিশু সামলাতে সামলাতে একলা চলেছেন, তাঁকে খাওয়ার ঘরে খাওয়ার সুযোগ করে দিতে, মধ্য পশ্চিমের গোঁড়া চার্চগামিনী নিজেই এগিয়ে গিয়ে দুরন্ত বাচ্চা দুটিকে রাখতে চেয়েছেন। ভোরবেলায়, ঠাণ্ডায়, অন্ধকারে যখন অন্নজল ছিলো না, যাত্রীরা সকলেই তখন নিজেদের একটি দুটি চকোলেট বা আপেল সাগ্রহে ভাগ করে নিয়েছেন পাশের প্রতিবেশীর সঙ্গে। এখন কোথায় গেলো সেই দরদশীল মুখগুলো?—আমরা সেই পরম সামাজিক প্রাণীগুলিই তো এই বাসের গহ্বরে বসে বসে ভয়ানক সব আত্মকেন্দ্রিকতার কৌশল দেখাচ্ছি।

একটি মহিলা এসে মলয়কন্যাকে বললেন: 'বাসের পিছনদিকে ভীষণ গ্যাস হয়েছে, আমার বাচ্চা দুজোর শরীর খারাপ করছে, একটা জানলা খুলতে পারি কি?'

মলয়কন্যার জবাব এলো: 'আমাকে বারবার বিরক্ত করবেন না। আমি এখন অফ-ডিউটি, মনে রাখবেন।'

এক বৃদ্ধ এসে প্রশ্ন করলেন: 'আর কতোক্ষণ আন্দাজ আমাদের এইখানে বসে থাকতে হবে? অন্যরকম কোনো ব্যবস্থা কী—'

মাথাটা দিয়ে মলয়কুমারী জানালেন: 'দয়া করে নিজেই একটু বুদ্ধি খরচ করে দেখতে পারেন না? আমার কাছে কোনো অলৌকিক সমাধান নেই।'

অথচ, এই মেয়েটিই তো ট্রেনে হাসি-মুখে ছুটোছুটি করে একাগ্রচিত্তে একশো সাতাশটা মনের মাতলো রকম আনন্দের প্রশ্রয় দিয়ে বেড়াচ্ছিলেন?—সোনালী চুল ঝামরে পড়ছিলো কপালে, বিরক্তির রেখামাত্র ছিলো না সেই ব্যস্ত, ব্যাকুল মুখে প্রায় অমানুষিক অতিথিবাৎসল্য দেখিয়েছেন ইনিই, মাত্র কয়েক ঘণ্টা আগে পর্যন্ত। কিন্তু কোথায় যেন হিমের সেই ক্ষীণ পাতটুক, হঠাৎ ফুরিয়ে গেছে। সহসা অতল শূন্যতায় সাঁতরে বেড়াতে শুরু করেছি আমরা প্রত্যেকে, একদম একলা।

বাচ্চাগুলো আস্তে আস্তে উত্তেজনায় নিটিয়ে স্তব্ধ হয়ে গেলো। বড়োদের মধ্যে যে স্নায়ুর যুদ্ধ বেঁধে গেছে, তার চাপটা বোধহয় ওদেরই সইতে হচ্ছে সব থেকে বেশী। কেউ আর কাঁদছে না। এখন ওরা যেন ভয়ংকর একটা বিস্ফোরণের জন্য লোম খাড়া করে পল গুনছে।

এখন আর কেউ বাইরে নেই। বাইরে ঝড় প্রচণ্ড হয়ে উঠেছে। আমরা যে-যার আসনে বন্দী। যেন সবাই কোনো কয়লাখাদে চাপা পড়ে দুর্গন্ধগান্ধ বসে আছি। কোনো-দিন রক্ষাকারীদল আসবে মুক্তির পথ-ওয়ালা নিয়ে, উপরে উঠে এসে দেখবো দুনিয়া আবার পাল্টে গেছে।

আমার মনে মনে ওই বাইজাতির প্রতি সহানুভূতি কখনোই ছিলো বলে ভাবি না। কিন্তু বিদ্রোহিনীর এই স্পর্ধা শহরের মহিলার আরাম বুকে একটা ধাক্কা দিয়ে গেলো। —না, এই মাতা বড় বেশী করে ঘুরিয়ে দিচ্ছে সবাইকে। শেষ পর্যন্ত জামা গায়ে দিলোর পরও জুয়াখেলা বন্ধ হয়ে গেছে। আর সেখানে খেলা যাবে না। একমাত্র ভরসা এখন লেক টাহো।

কোনো রকমে সেখানে পৌঁছলুম ভোর তিনটেয়। ড্রাইভার আমাদের একটি চকচকে এগারোতলা হোটেলে নামিয়ে দিলেন ও হোটেল-কর্তৃপক্ষকে বুঝিয়ে-সুঝিয়ে একশো সাতাশতিম উদ্বাস্তুকে আশ্রয় দিতে রাজী করালেন।

যাত্রীদের মধ্যে আহ্লাদের সঙ্গে সঙ্গেই একটি আধা-আতঙ্ক উপস্থিত হোলো—হোটেল খরচা রেল কোম্পানীই দেবেন তো? যাত্রীদের মধ্যে শতকরা আশীজনেরই আয়ত্তের বাইরে এই বিলাসী Harvey's wagon Wheel Hotel এ রাত্রিবাস। না, খরচ আমাদের নয়। এবারে নিশ্চিন্ত হয়ে যে-যার ঘরে যাই। ঘর। স্নানঘর। বিছানা। এ সবই এখন মহার্ঘ, দুষ্প্রাপ্য। ভোর চারটে নাগাদ উষ্ণ ধারায় স্নান সেরে, কলের ফুটন্ত জলে 'টি ব্যাগ' ভিজিয়ে দুধ চিনি বিহীন চা বানিয়ে খেয়ে—আমরা নরম সাদা বিছানায় জড়িয়ে পড়লুম—চার দিন বাদে প্রথম। সকালে উঠে চিরকালীন নাটকীয় প্রথায় অচেতন মানুষ চেতন। পেয়ে না বলে, সেই—'আমি কোথায়?' বলতে ইচ্ছে হলো। এলাহি ব্যাপার। দেখি, ঘরে সোনালী টেলিফোন, সোনালী টেলিভিশন সেট, বোতাম টিপলেই দেওয়াল থেকে কিন্নরীদের গান বেরোয়, বাথের লাগোয়া সোনালী পাথরের গোল বারান্দা, আর তার বাইরে চিত্রার্পিত লেক টাহো! এত বিলাস-ব্যসনও কপালে ছিল!

দূরে বিস্তৃত ঘন নীল হ্রদ,—ঠিক কাশ্মীরের সেই সমুদ্র না আসমানি পক্ষী-ধারী স্বপ্নগুলির মতো বিপুল, মনোহর, উজ্জ্বলবরণ। তাকে বেষ্টন করে আছে সাদা বরফ-ঢাকা পাহাড়—আপাদমস্তক তাদের ঝকঝকে সাদা। পাশ কাকালীর মতো একফালি সবুজ বনরাজ্যেও তুলনাটা উঁকি না দিয়ে পারে না। ঝকঝকে পেস্তল-রঙের রোদ উঠেছে আজ—চতুর্দিকে তুষার রোদ ঝলসে দিচ্ছে। আজ সাতই জানুয়ারি ১৯৮২। কিন্নরদের হিসেব আবার ফিরে আসছে মাথার মধ্যে।

পাঁচটি দুপুরে সাদের ছিলো বাড়ি ফিরে আপিস-ইশকুল করার কথা—তাঁরা সবাই সাতটি বেলা কাটিয়ে উঠে টাহো-হ্রদের সবুজের তীরে সবে মানসীর [illegible]
[illegible]
ফেরাতে আসছে এই টাহো হ্রদে। হ্রদে

চলে Water-Skiing. পাহাড়ে চলে তুষার-স্কী-ইয়িং আর হোটেলে চলে জুয়া খেলা।

আজ সকালে সবাই শান্ত, সুস্থ, স্বাচ্ছন্দ্য। তুষার ঝড় থেমে গিয়েছে। যদিও রাস্তার সারি বাঁধা গাড়িগুলি ছোটো ছোটো শৈলশেণীর মতো তুষারে সম্পূর্ণ ঢেকে আছে। রং-চঙে মোটেলগুলিকে (মোটর + হোটেল=মোটেল) ঢেকে প্রায় চার ফুট উঁচু তুষার। তুষার ঝড় তো একদিনের দুদিন নয়,—দুটি সপ্তাহ ধরে চলেছে এখানে। একটানা।

এবারে যাত্রীরা একে একে জুয়ার যন্ত্র টিপতে শুরু করে দিলেন। আমি আর অমর্ত্য একটু খেলে দেখলুম যে আমার কপাল এই লাইনে অতিশয় ভালো। পাঁচ সেন্ট ফেলে ফেলে পঞ্চাশ সেন্ট করে পেতে লাগলুম। কিন্তু শেষ অবধি কলের টাকা কলকেই সঁপে দিয়ে, অনেকক্ষণ হেরে গিয়ে লোক গুটিয়ে দুড়দাড় করে পালিয়ে এলুম দুজনে।

সেবার দক্ষিণ ফ্রান্সে মন্টি-কার্লোতে গিয়ে রাজসিক সব কাণ্ড-কারখানা দেখে বাবড়ে গেলেও, আমি সে-তীর্থের মা-কুলো, তা পালন করতে ছাড়ি নি। রীতিমতো একটি গোটা ফরাসী ফ্রাংক (এক টাকা) পুরো দিয়ে রুলেতের বাজি ধরে, সে বাজি হেরে এসেছি। এখন আমি মার্কিন-দেশে ছাত্রীর মত, মন্টি-কার্লোয় হেরে-যাওয়া একজন জুয়াড়ি তীর্থে গেলে বিগ্রহ দর্শন করা চাই। সেখানকার মা। জুয়ার আড্ডায় যাবো, অথচ জুয়া খেলবো না? তাও কি হয়!

এক সময়ে লেক দেখা ফুরোয়। জুয়া খেলা ফুরোয়। যাত্রীদের দুপুরে ভিতরে রওনা হয়। ইতিমধ্যে আমাদের বিশ্ববিদ্যালয় মাস্টারমশাইটি বিশ্ববিদ্যালয়ে টেলিফোন করে জানিয়ে দিয়েছেন যে লেকচারে পৌঁছতে পারবেন না। বেচারীর মন খুব খারাপ, ক্লাসের পরীক্ষা সামনেই। ওদিকে অতগুলো পাবলিক লেকচারটি যে ভেস্তে গেল, সে জন্যে অতটা তেমন দুঃখ দেখলুম না। কিন্তু শিক্ষার্থীর প্রধান, অধ্যাপক শিক্ষার্থীর, এই তরুণ অধ্যাপকের পরীক্ষার্থীদের নিয়ে রীতিমতো দুশ্চিন্তিত হয়ে পড়লেন বলে মনে হোলো। ফোনের পরে ফোন আসছে একেকটি জুয়ার আড্ডা থেকে। প্রথম বারে রিনো থেকে। দ্বিতীয় বার লেক টাহো। এবার শিক্ষার্থী অমর্ত্যকে বললেন—'তোমার নেক্সট ক্লাসটা আমি কভার করছি, খেলে ফিরে পাবো। ভালো-ভাবেই স্ট্যাণ্ডেড করে রাখবে তোমাদের রেল কোম্পানী।' রিনো টাহো এবং লাস ভেগাস নেভাদার জুয়ার ব্যবসায় ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর। বরফঝড়ে আটকে থাকি তো বা, একের পরে এক জুয়ার আড্ডায় আশ্রয় নিতে হবে? এও কি বিশ্বাস্য? অমর্ত্য এই বিপাকে পড়ে কিঞ্চিৎ লজ্জিত এবং বারম্বারই চঞ্চলহৃদয় (ছাত্রদের জন্য এত ভালোবাসা কোন্ বইয়ের ভালো লাগে?) ক্লাস করতে না পেরে। আমার কিন্তু খুব মজা লাগছিলো। কী রোমাঞ্চ, কী উত্তেজনা। এমন এ্যাডভেঞ্চার কি চট করে মানুষের জীবনে ঘটে? কলকাতার ছাপোষা মেয়ে, এমনি বরফ ঝড়ে আচমকা আটকা পড়বো জীবনে কখনো? আমার তো চাকরির পোস্ট-ডক্টরাল রিসার্চের, দু' চার দিন দেরিতে ফিরলে কোনোই ক্ষতি নেই। সত্যি বলতে কি এই দৈব দুর্বিপাকে পড়ে আমি

লীলা মজুমদার
পাকদণ্ডী

এই তিনটি মানুষ, প্রথমে উপেন্দ্রকিশোর, তারপর সুকুমার, তারপর সত্যজিৎ বাংলার শিশু-সাহিত্যের মানদণ্ড-প্রতিষ্ঠার জন্য যা করেছেন, সেটা অসাধারণ। ছোটদের জন্য বই লিখলেই শিশু-সাহিত্যিক হওয়া যায় না। শুধু জ্ঞানমূলক পাঠ্য পুস্তক লিখে গেলে তো নয়ই, ছোটদের বিষয় গল্প লিখলেও সব সময় শিশু-সাহিত্যিক হওয়া যায় না। ব্যাপারটা আরো গভীরে নামে। এখানে রবীন্দ্রনাথের নাম করতে হয়। তিনি উপেন্দ্রকিশোরের বাল্যকালের বন্ধু ছিলেন, সুকুমার একই সঙ্গে আদর্শ ছিল। সুকুমারকে তিনি অত্যন্ত স্নেহ করতেন। মনে আছে বড়দার শেষ অসুখের সময় রবীন্দ্রনাথ তাঁকে দেখতে এসেছিলেন। মৃত্যুপথযাত্রীর জন্য আমি কি করতে পারি? বড়দা গান শুনতে চেয়েছিলেন। রবীন্দ্রনাথ গান শুনিয়েছিলেন। দুঃখের বিষয় আমি সেখানে ছিলাম না।

রবীন্দ্রনাথ ছোটদের জন্য যা কিছু লিখেছেন সবকিছুর মধ্যে আমি তার মধ্যে নির্ভেজাল আনন্দের স্বাদ পাই। সেখানে বড়দের শাসনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের কথা শুনতে সেখানেও বিদ্রোহী মায়ের কাছে [illegible] ভাবা নিছক [illegible] দাঁড়ায়। অথচ রবীন্দ্রনাথ কোথাও সহজে পারতেন না। ছোটদের জন্য লিখে সব লেখাতেই দুটি জিনিস লক্ষ করি — শিশু চরিত্রের ছোটো বিশ্ব প্রকৃতির সব রস উপভোগ করুক এবং বলিষ্ঠভাবে বড় হয়ে উঠুক। এর মধ্যেই গুরুগিরির ছায়া আছে। শিশু-সাহিত্যে গুরুগিরির স্থান নেই, এমন কি গুরুরও স্থান নেই। অথচ বিশ্ব-প্রকৃতির সব রস উপভোগ করে বড় হতে পারার কথা আছে। যেমন করে সকলের অগোচরে ছোট ছেলের শরীরটিও বাড়ে।

উপেন্দ্রকিশোরের লেখার মধ্যে এই সত্য কথাটা বারে বারে প্রকাশ পাচ্ছে। এমন যে চমৎকার সৃষ্টি, একে ছোটদের সামনে তুলে ধরতে হবে। এমন যে উপভোগ্য জীবন, এর মজা বুঝতে পারলে আপনা থেকেই একে শ্রদ্ধা করা যাবে। উপেন্দ্রকিশোরের আগে পর্যন্ত বাংলায় সামান্য যে শিশু-সাহিত্য রচিত হয়েছিল, তার মধ্যে শিক্ষা দেবার দিকটাতেই গুরুত্ব দেওয়া হত। আর তার প্রায় সবই ইংরিজি বই থেকে নেওয়া হত। তাও অনেক সময় নাম-ধাম বদলে, মূল বইটার রস সব নষ্ট করে দিয়ে। উপেন্দ্রকিশোর রসকেই শ্রেষ্ঠ আসন দিতেন। কিন্তু তাঁর লেখা গল্পগুলির মধ্যে খুব অল্পই মৌলিক গল্প। স্বদেশে প্রকাশিত তাঁর গল্প-সল্প ছাড়া। সেগুলি একেবারে মৌলিক এবং প্রাণ-রসে ভরপুর। ভ্রমণ কাহিনী, স্মৃতি-কথা, তথ্যমূলক রচনা সবই নিজে তৈরি করে লিখতেন। গল্পের বেলা কেন লিখতেন না জানি না। যে কোন দেশের বলিষ্ঠ সাহিত্য মৌলিক হয়। ছোটদের জন্য রচনাও।

সেই মৌলিকত্ব সুকুমারের মধ্যে অপূর্ব খেয়াল-রসে ভরতি হয়ে উপচে পড়ত। বড়দা প্রায় সব গল্প নিজে বানিয়ে লিখতেন। কচিৎ দু-তিনটি প্রচলিত ধরনের গল্প লিখেছেন। ঐ সরসতা আর অকৃত্রিমতা দিয়ে বড়দা তাঁর সংক্ষিপ্ত জীবনেই বাংলার শিশু-সাহিত্যকে অলংকৃত করে দিয়ে গেছেন। যতদিন লেখকরা অন্যদের বই থেকে ভূরি-ভূরি মালমশলা ধার করে আনতে থাকেন, ততদিন বুঝতে হবে তাঁদের নিজেদের দেবার মতো কিছু নেই। অর্থাৎ তাঁদের দেশের সাহিত্য তখনো দানা বাঁধেনি। দানা না বাঁধা মানেই রস তখনো কাঁচা, পাতলা পানসে। সুকুমার সেই পাতলা রসে দানা বাঁধিয়ে দিলেন।

তখন আমার পনেরো বছর বয়স। হাজার উচ্চাশা থাকলেও, ক্ষমতা ছিল কাঁচা। তবে এটুকু বুঝতাম বাংলা শিশু-সাহিত্যের জন্য কিছু করতে হলে, শুধু পুরনো রচনায় নির্ভর দিলে হবে না, কিছু সৃষ্টির কাজ করতে হবে। তারপর ৫৪ বছর কেটে গেছে, আমাদেরো সন্ধ্যা নেমেছে, তবু দেখছি সৃষ্টির কাজের শেষ নেই। কে একজন চিন্তাশীল মনীষী বলে-ছিলেন, 'দুনিয়াতে নতুন চিন্তা বলে কিছু নেই। সব কথাই কোনো না কোনো সময়ে, কোথাও না কোথাও কেউ না কেউ, একবার না একবার বলে গেছেন।' সেইগুলিই হয়তো আমাদের মূলধন। কিছু অনুবাদ করেছি, কিছু জীবন-কথা ভ্রমণ-কথা সংক্ষেপে ছোটদের জন্য লিখে দিয়েছি। তার কিছুই আমার নিজের বলে প্রকাশ করিনি। মূল্যবান জিনিস যদি পাঠকদের চোখ এড়িয়ে যায়, তাই তুলে ধরেছি। বড়দের বই যে অনুবাদ করেছি, সেও ঐ একই কারণে, নয়তো নিছক বাস্তব উদ্দেশ্যে। তাও বই পছন্দ না হলে নয়।

সত্যজিৎ আমার চাইতে তেরো বছরের ছোট। কর্মবহুল জীবনের মধ্যেও বাগ্‌দেবীর তাড়ায় না লিখে পারে না। সব মৌলিক, অভিনব, চমকপ্রদ। অতিশয় উত্তেজনাময় কাহিনীর তলায় তলায় সরসতার নদী বয়ে যায়। এমন গল্প এর আগে বাংলায় লেখা হয়নি যদিও দুঃসাহসিক অভিযানের [illegible], ভালো ভালো আছে। এ-সব হল দুঃসাহসিক চিন্তার গল্প। এ-সব গল্পের বৈশিষ্ট্য হল যে, পাঠক-বর্গের যে একটা বৃহৎ অংশের যোগ্য বই বাংলায় বিশেষ লেখা হয় না—অর্থাৎ মোটামুটি ১৫ থেকে ১৮ বছর বয়স্কদের কথা বলা হচ্ছে—মানিক তাদের অভাব ঘুচিয়ে দিচ্ছে। এবং যোগ্য-ভাবেই দিচ্ছে। যেমনি গল্পের রোমাঞ্চ, তেমনি ভাব, তেমনি ভাষা, রুচিও কোথাও এতটুকু ক্ষুণ্ণ হয় না। গুরুজন-দের আপত্তিতে কোনো অবকাশ থাকে না। যে-দেশেরই সাহিত্য পরিণতি লাভ করেছে, সেখানেই এই ধরনের বই লেখা দিয়েছে। গত কয় বছরের মধ্যে বাংলায় বেশ কটি তথ্যমূলক, কিম্বা একেবারে কাল্পনিক দুঃসাহসিক অভিযান ও অভিজ্ঞতার বই প্রকাশিত হয়েছে। এগুলি হল ছোটদের সাহিত্যের শেষ অধ্যায়। সুখের বিষয় মানিকের ভক্ত লেখকদের একটা বড় দল

ক্রমে তৈরি হয়ে উঠছে। তারা যদি সত্যজিতের গল্পের উচ্চ মান রক্ষা করতে পারে, বাংলা কিশোর-সাহিত্যের সমৃদ্ধি তাহলে এসে গেল।

আমার এত কথা বলার উদ্দেশ্য হল এইটুকু প্রকাশ করা যে বড়দা উত্তরাধিকার স্বরূপ বাপের কাছ থেকে যে প্রতিভা লাভ করেছিলেন, ৩৬ বছরের জীবনে তাতে এমনি প্রাণ-শক্তির প্রতিষ্ঠা করে দিয়েছিলেন যে আজ পর্যন্ত তার কাজ অব্যাহতভাবে চলেছে। এ বিষয়ে সত্যজিতের অবদান নেহাৎ কম নয়।

তবে বাবকাকে বলত একটা মস্ত গুণ। তখন সেই ভক্ত তারা করিনি। নিজে সাবালিকা হবার জন্যে বড় বেশি ব্যস্ত ছিলাম। ১৯২৩-২৪ সালের কথা ভাবতে চেষ্টা করি। দেশে তখন স্বাধীনতা-সংগ্রাম ক্রমে বল পাচ্ছিল। তার আগে নব শুদ্ধ বোমা বারুদ বিস্ফোরণ পিকেটিং ও কারা-বরণ। সে সব তো ছিলই। তা ছাড়াও ভিতরে ভিতরে দেশটাকে যে একটা বড় কিছুর জন্য তৈরি হতে হবে এবং হচ্ছেও, একথা আমি বিশ্বাস করতাম।

কথকগুলো মুশকিলও ছিল। বাবা সরকারী চাকরে। পরীক্ষা দিয়ে নিজ গুণে সার্ভে অফ ইন্ডিয়াতে ঢুকে, ক্রমে ক্রমে প্রভিন্সিয়াল সার্ভিস থেকে ইম্পিরিয়েল সার্ভিসে উন্নীত হয়েছিলেন। সেটা তত সহজ বিষয় ছিল না—অতএব তাতে বাহাদুরি কোথায়? —এতটা ছিল আমার

শারদ সাহিত্যের পাশাপাশি

শাড়ি

পেঁচাপাড় এবছর পশ্চিমবঙ্গ সরকারের তৃতীয় পুরস্কার পাওয়া শাড়ি। আধ ইঞ্চি কালো বর্ডার, তারপর লাল আর্ট সিল্কের সারিবদ্ধ পেঁচা, আবার আর্ট সিল্কের কালো রেখা, নিচেই আসামের মুগার এক ইঞ্চি চওড়া রেখা তার নিচে লাল আর্ট সিল্কের রেখা, তারপর আবার কালো পেঁচার সারি—একবার একটা পেঁচা, একটা ফুল এইভাবে। আবার লাল, মুগা, কালো বর্ডার পেরিয়ে লাল রঙের পেঁচার সারি। সব-নিম্ন কালো বর্ডার। জমি ধবধবে সাদা। সুতো সেই ১০০ কাউন্টের। টানা পোড়েন দু-দিকেই।

গাছের ছায়ায় তাঁতঘরে বসে এ-রকম একটা পেঁচাপাড় শাড়ির ফিনিশিং-এর কাজ করছিলেন চন্দ্রনাথ বসাক। সরকারের পুরস্কৃত শাড়িটিও এঁরই হাতের রচনা। সেটার জমিতে অবশ্য রঙিন বুটি ছিলো। এখানে ছাড়া হচ্ছে বুটিহীন শাড়ি। কেননা বুটিতে বড্ড বেশি পরিশ্রম, খরচও বেশি। যে-কেউ এখানে এসে এই শাড়ি ৭৫ টাকায় কিনতে পারেন। শিয়ালদা থেকে ফুলিয়া ট্রেনে ঘন্টা দুয়েকের পথ। স্টেশন থেকে বসাকপাড়ার রিক্সা ভাড়া ধরে যাওয়া-আসার খরচ ১০ টাকা ধরে নিলেও ২৫ টাকার সাশ্রয়। কলকাতার দোকানে পেঁচা পাড় শাড়ির দাম ১০০ টাকা। বড়োবাজারের পাইকাররা ফুলিয়ায় কেনেন ৭০ টাকা করে। ফুলিয়ার পরের স্টেশন শান্তিপুর। সেখানকার তাঁতি পাড়াও এই সঙ্গে ঘুরে আসতে পারেন।

রঙের শেষ নেই, নকশার সীমা নেই। মানুষের কল্পনাকে কে আর কবে সীমার গণ্ডি টেনে এক ঠাঁই বসিয়ে রাখতে পারে! তাঁতের শাড়ি দেখতে দেখতে মনে হয় এটি এ সৌন্দর্যের খনি। মাঝারি, এমনকি সাধারণ কাজও চোখে পড়লো। খরচ না বাড়িয়ে শুধু শিল্পগুণে কল্পনানৈপুণ্যে এগুলো আরো মনোরম করা যায় না? টসটসে নীল আকাশের গায়ে ধবধবে সাদা মেঘের স্তূপ চুপ করে ভেসে আছে কিংবা আকাশে লাল আলপনা আঁকছে বসন্তের কৃষ্ণচূড়া, কি যামিনী রায়ের ছবি, কি জীবনানন্দের রূপসী বাংলা এইসব সুর-রেখা কবিতা সুতোয় গাঁথা যায় না? হয়তো যায়। হয়তো একদিন যাবে। যদি বাংলার তাঁত বাঁচে। তাঁতী বাঁচে। নাইলন টেকরনের সঙ্গে প্রতিযোগিতা আছে। নিজেদের বিক্রয় সংগঠন নেই। বাকে শাড়ি বেচে পাওয়ার আশায় হা-ক'রে বসে-থাকা আছে। কাঁচা মালের সমস্যা আছে। এতো সব ঝঁড়া কাটিয়ে বাংলার তাঁত আরো কতো দিন প্রাণের সাড়া জাগিয়ে, পাড়া জাগিয়ে খটাখট করে যাবে, জোর করে বলা যায় না। কৃষ্ণনগরের মৃৎশিল্প, খাগড়ার কাঁসার শিল্প—বাংলার নিজস্ব এরকম কতো শিল্পই আজ ধুঁকছে।

ফুলিয়ায় গিয়েছিলাম ঠিক এক মাস আগে। টাঙ্গাইল তাঁতের রং-ঢং, শিল্প-রুচি, রূপলাবণ্য মনে করতে গিয়ে দেখি, এর মধ্যেই সব ঝাপসা ঠেকছে। শাড়ির কাঁচা রং, কি নকশার শিথিল বুনোন তার কারণ নয়। সত্যি বলতে কী, একমাত্র তাঁতে কাজ ফুলিয়ার সব রঙই পাকা, প্রায় শাশ্বত। আর বুনোন? সুতোয় হয়তো সূক্ষ্ম, হয়তো স্থায়ী কাজ বিস্ময়কর। সেই চোখ জুড়োনো রং, সেই মনোমুগ্ধকর নকশাও আজ ধূসর লাগে, তাঁত-ঝলমল বসাকপাড়ার কথা ভেবেও আমার মন নেচে উঠছে না, তার কারণ বসাকপাড়ার দারিদ্র্য। ঘরে-ঘরে অনটন। পাড়া ঘুরে পাড়াময় আমি দুঃখের স্থায়ী নকশা দেখেছি।

খোঁজ নিয়ে জানলাম, এখানকার উন্নয়ন আর সমবায় সমিতিগুলো গড়ে উঠবার আগে অনেক তাঁতীকেই মাটি কাটার কাজ করতে হতো। সমিতি হয়ে সেই দুর্বিষহ দশা কিছুটা কেটেছে ঠিক, কিন্তু, সূর্যোদয় থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত যাঁরা এতো খাটেন, তাঁরা কেন অন্ন-জল দুধে ভাতে থাকবেন না, আমি কিছুতেই ভেবে পাই না। শুধু ফুলিয়াই নয়, শান্তিপুর, ধনেখালি সবখানেই তাঁতীদের জীবন যাপনের ছবি একই। এদেশে যাঁরাই সাধ্যাতীত শ্রম করেন, তাঁরাই বেশি সত্যিকার দরিদ্র। অমরেন্দ্র চক্রবর্তী

দেবাশিস বন্দ্যোপাধ্যায়ের কবিতা

হাত

আমার হাত পাগলো ছড়িয়ে পড়েছে ঘরের বাইরে
বেড়ার ওপাশ থেকে আমি ওদের গুটিয়ে নিয়ে আসি
ঘুমের সময় স্বপ্নে দেখি   জানলার বাইরে
বেড়ে বেড়ে যায় আমার হাত—
যেখান থেকে জোৎস্না ঝরে পড়ে সেই মাটির ফুটো
হাঁড়িটা ওরা নামিয়ে আনতে চায়,
কিন্তু আমি ওদের গুটিয়ে আনি অভ্যস্ত চেহারার মধ্যে
বলি, দাঁতদের কাজ বাড়িয়ে দিয়ো না ক্রমশ
বশীকরণের মন্ত্র শেখাই ওদের, শেখাই কী করে
কবিতা লিখতে হয় রক্ত দিয়ে, আর না পারলে কী করে
শান্তভাবে ঘুমিয়ে পড়তে হয় বিছানায় আমার শরীরের পাশে....

ছাঁকনি

ছাঁকনির ভিতর দিয়ে গলে পড়ার নামই কৃতিত্ব
কেউ পারে না, কেউ পারে!
কোনো রকমে একটি কাপের হৃদয়ে আশ্রয় নিতে হয়
তারপর সরাসরি জয় করতে হয় তাবৎ পেটের সাম্রাজ্য!

ধূমায়িত এক কাপ কফির আমি সাক্ষাৎকার গ্রহণ করি
জেদী হয়ে সে খ্যাতির অন্ধকারে হারিয়ে যেতে চায় না
রণনীতি তার পছন্দ নয়, ফিরে যেতে চায়
যেখানে থেকে এসেছিল সেখানে
কিন্তু ছাঁকনির ভিতর দিয়ে যারা আসে এপারে একবার
গা গতরে হয়ে যায় মোটা, ফিরতে পারে না,—
ছাঁকনিও ফিরতে পারে না তার ছিদ্রহীন
জমাট আসল অস্তিত্বে।

পা

লাথি মারলে সোজা ফুটবলের মতো উঠে যাই আকাশে
ফুল হয়ে ফুটি, অথবা ছড়িয়ে পড়ি বিশাল বটগাছের মতো
আমার এই ছড়িয়ে পড়ার জন্যে তাহলে প্রয়োজন ছিল
কয়েকটি লাথির? লাথির জন্যে পা? নাকি সে
ঘুরে ঘুরে চোখকে দেখতে সাহায্য করে
সারা পৃথিবী জুড়ে শুধু, ছড়িয়ে আছে
ছোট ছোট পাথর আর ঢেলা!....
জ্যোৎস্না সুখী নয় সেখানে, তবু ফোটে!
বিবর্তিত সেই মেয়েটির মতো যে ছেড়ে যেতে পারে না
তার স্বামীকে কিন্তু অসুখী। কোথায় সুখের জন্যে
পাথরের ওপর দিয়ে হেঁটে যায় দুবেলা
সে তার নিজের পা চিবিয়ে খায় দুবেলা
দুবেলা মাংস খুবলে সাজিয়ে রাখে থালায়
অথচ রোদে সারা পৃথিবী জুড়ে শুধু গোল গোল
পুরোনো নিরেট থালা সাজানো আছে ...
পা হেঁটে যাচ্ছে তার ওপর দিয়ে
আর মাঝে মাঝেই লাথি মেরে দেখছে
একটা থালা আরেকটা থালার গায়ে আছড়ে পড়ে কিনা।

ভাষা নেই

[...য়ের জন্যে অ-শোক কয়েকপংক্তি]

গৌরাঙ্গ ভৌমিক

...ছে আরো বহু কিছু আছে,
...কৃত দুঃখেরই কোনো প্রতিশব্দ নেই।
...তো-বা ঐশ্বরিক, সে অনন্য, নিরক্ষর—
...বার ভাষার মতো ঠোঁটের ওপরে শুধু কাঁপে।

...ী যে তার পরিতাপ।
... আর ওজনে তাকে মাপে?
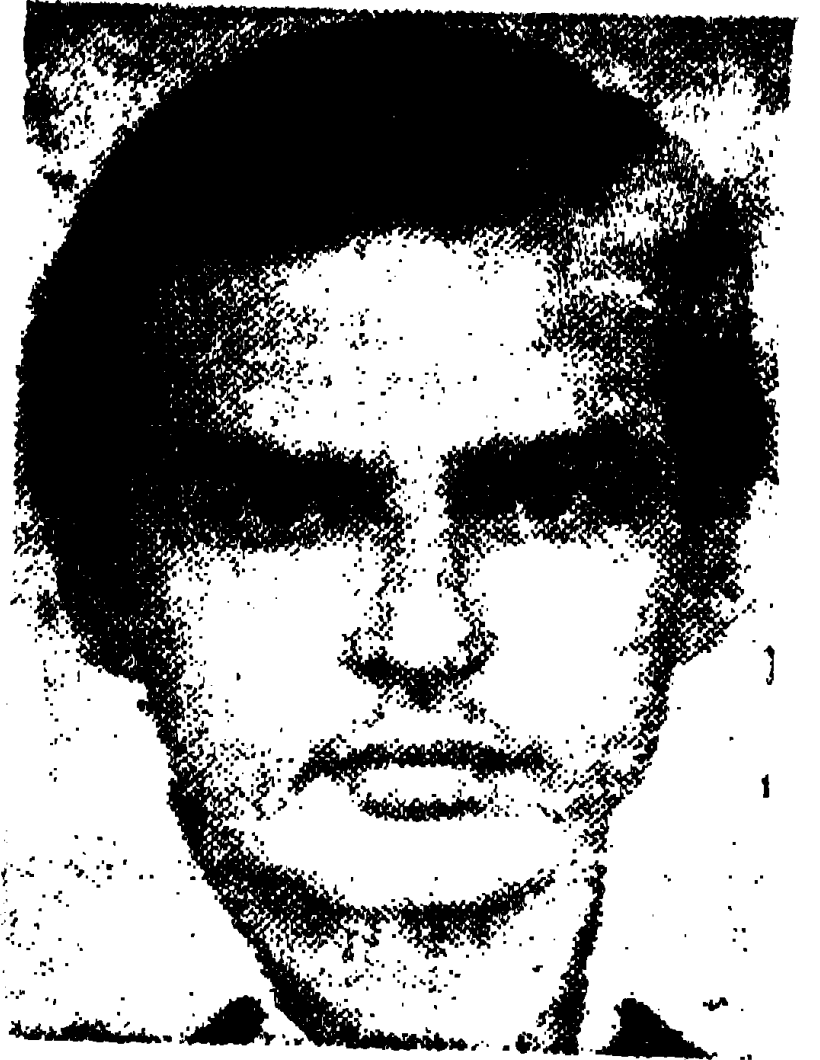
...ছে আরো বহু কিছু আছে,
...কৃত শোকেরই শুধু প্রতিশব্দ নেই।
...ন্দির-চূড়োয় সূর্য ডুবে গেলে
যদি কেউ অতর্কিতে কাঁদে,
... পারে তেমন কান্না জীবনে থামাতে?
...ই তার বিকল্প ও সমব্যথী নেই—

হৃদয়ধর্মিতা বুঝি নেই?
...রের প্রতিবেশী নক্ষত্রেরও তত বেশি
...ই দুঃখ, নেই শোক, সমান মাপের ভালোবাসা।
...ই কোনো বেদনার বিকল্পের ভাষা!
...য়ের ভেতরে থাকে স্মৃতি।

...সহায় আমরা বুঝি, বড়ো অসহায়!

রাত্রি বাতাসকে

দেবপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়

...সো ভাসো রেল লাইনের কাছে গিয়ে গভীর ব্যাপক বাতাস,
...ও আমায় জড়াও করো তোমার সমধর্মী।
...ড়ো এবং ওড়াও গাছের জীর্ণ পাতার রাশ,
...ড়ো আমায় নষ্ট করো পাগল সহকর্মী।
...মার যেমন বিরতি নেই, নেই বুকে আর খুচরো কোন পয়সা।
... হাতে সব ছড়িয়ে তোমার আনন্দ শব-বহন—
...মার যেমন প্রতিদিনই আধুনিকের নেশা,
...সাও আমায় ভাঙো আমার নষ্ট মেয়ের স্মরণ।

বিবাহ॥

অমিতাভ গুপ্ত

এই সন্ধ্যার অধৈর্যপরায়ণ বাতাসে আমার খবর আমি
পাঠিয়ে দিলাম তোমাদের কাছে
তোমাদের খবর কী, জানতে ইচ্ছে করে
তোমাদের ঘর ও গেরস্থালি, আঁকাবাঁকা ফসলের মাঠ,
মাঠের প্রান্তে একটি টিলা
টিলার ওপর এখন আঁকা হয়ে আছে সূর্যাস্তের একটি দৃশ্য
মাঠ ছেড়ে চলেছে রাখাল, তীর ছেড়ে চলেছে নৌকো
একটি শেওলাভ নদী ঘিরে আছে তোমাদের

তোমরা কেমন আছ? আমার কথা কখনো মনে পড়ে কিনা
এতদূরে বসে আমার বোঝা অসম্ভব,
শুধু এই সন্ধ্যার বাতাস
হয়ে উঠেছে মুখর ও চঞ্চল
একটি ফেলে আসা নদীর কথা মনে পড়ে যায় আমার
একটি ফেলে আসা সূর্যাস্তের দৃশ্য সমস্ত মাঠ পেরিয়ে
হিমার্ত এবং উষ্ণ ঋতুগুলি পেরিয়ে
জ্বলে ওঠে আমার চোখের সামনে ছড়িয়ে থাকা বনভূমির
সীমান্তরেখায়

যেন ওই বনভূমিকে এবার পেয়েছি আমি বিবাহবন্ধনে।।

কোলকাতা

আনন্দ ঘোষ হাজরা

রাত্রি গভীর হলে কোলকাতা ফুটপাতে একা একা বসে
ভাটিয়া পসারী তুলে নিয়ে যায় শীতের পোষাক
বৌবাজারের মোড়ে নিভে যায় উজ্জ্বল ঝরোকা
ছেঁড়া কাঁথাকানি তুলে সরে পড়ে দিনের জ্যোতিষী
গাড়ির গাড্ডোলগুলো ডুবে গেলে মদে ও নারীতে
কোলকাতা জ্বলে খাওয়া আত্মীয়ের অনবদ্য চায়।

তখনি সযত্নে নামে বুক জুড়ে কোলকাতা আবরণহীন
সুখে নিমজ্জিত হয় দুখে ডোবে কী ভীষণ অবসাদে ভোগে
রাত্রি নয় যেন দিন বেবুশ্যে রমণী খোঁজে তৃপ্ত বিছানায়
গভীর ঘুমের স্মৃতি ভিজে চোখে অসম্ভব লুকোচুরি খেলে।

আর করার কিছুই থাকে না। অধিকাংশ
এরা অত্যাচার সহ্য করতে না পেরে,
র করে। কোন্ কোন্ ক্ষেত্রে অত্যাচার
মৃত্যু ভয়ের মনাও করে। একবার
ত থাকলে পুলিশ ওদের খুব তোয়াজ
অনেক সুযোগ সুবিধা দেয়।
তাদের হাতের মুঠোয় নিয়ে
। একবার এসে গেলে পুলিশ তখন
দিয়ে নানা কাজ করায়; তার মধ্যে
পাঠিয়ে খোচরের কাজ করানোটাই
। পুলিশ ওদের বলে দেয় জেলে গিয়ে
দীদের মধ্যে থাকবি। চুটিয়ে রাজনীতি
। প্রয়োজন হলে লড়াই করবি। সব
এক নম্বর কমরেড হতে চেষ্টা করবি।
হয়ে গেলে আমাদের সঙ্গে যোগাযোগ
। আমাদের লোক জেলে থাকে। তাদের
তোর একটা ব্যবস্থা করে দেব। তোকা
। ভয় কি ? কিন্তু কথা মত কাজ
করলে ভয় অবশ্য একটু আছে। তোকে
থানা থেকে বিপ্লবী করে জেলে
ঠিয়ে দেব—ভয় কি ?

'কিভাবে বিপ্লবী করে জেলে
ঠাবে ?'

'কেন ? মেরে! আমি একজনকে
নি। সে পুলিশকে সব বলে দিয়েছিল।
থেকেই পুলিশ তার গায়ে হাত দেয়
। কিন্তু যেদিন থানা থেকে জেলে
ঠাবে। তার আগের দিন রাত্রে ছেলেটিকে
গিয়ে হাতের, পায়ের হাড়গোড় ভেঙে
ফাটিয়ে মুখ দিয়ে রক্ত বার করে
লক-আপে নিয়ে এল। আমরা
লেটিকে আগলে রাখলাম লক-আপের
তর যারা ছিল, তারা সবাই ওকে সমীহ
তে লাগল। পরে ও জেলে গিয়ে খুব
ডাক্ হয়েছিল। জেলের ভিতরকার
গঠনের সব খবর ও পুলিশকে দিত। পরে
পড়ে যায়। তারপর থেকে সেই জেলে
কে আর দেখা যায় নি। দ্বিতীয়তঃ পুলিশ
উকে ধরার পর যখন দেখে, সে মোটামুটি
লেখাপড়া জানে, রাজনীতি জানে,
ঝে, সংগঠন করার ক্ষমতা আছে, ভাল
তে কইতে পারে, তখন তার সম্পর্কে
না কৌশল নিয়ে থাকে। তাকে বিশ্বাস-
তক বানিয়ে জেলে পাঠানো। যাতে সে
লে গিয়ে রাজনীতি করতে না পারে।
গঠন করতে না পারে। রাজনীতি থেকে
সে যাওয়া ছেলেদের তুলতে না পারে।
কৌশলটা খুবই সোজা। তাকে প্রয়োজনের
অতিরিক্ত জিজ্ঞাসাবাদ না করা। পুলিশের
বিরুদ্ধে সে যাই বলুক, করুক, গায়ে হাত
না দেওয়া। পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করে
হাজতে রাখা। কখনো একা একা, কখনো
সবার সঙ্গে লক-আপে রাখা, যাতে সবাই
সন্দেহ করে—এ-সব বলে দিয়েছে, তাই
মার খায় নি, ভাল আছে, ভাল থাকবে।'

আমি বললাম, 'বেশ ব্যবস্থা!'

'বেশ তো বটেই। তবে এটা মনে করা
ঠিক নয় যে, যারা মার খেয়ে জেলে যায়
তারা সবাই খোচর। অথবা যারা মার না
খেয়ে জেলে যায় [illegible]

এর বহু ব্যতিক্রম আছে। ব্যতিক্রম না
থাকলে এই কৌশলের কোন মূল্যই
থাকতো না।

আমি বললাম, 'সে তো বটেই।
আপনি জেলে ছিলেন কবে?'

'ছিলাম সত্তর একাত্তরে—কেন?'

'না, অভিজ্ঞ লোক মনে হচ্ছে, তাই।'

'আমার আর কি অভিজ্ঞতা—জেলে
যান নিজেই অভিজ্ঞ হয়ে উঠবেন।' বলে
অধ্যাপক ছেলেটি উঠে দাঁড়াল। এগিয়ে
গেল লক-আপের দিকে। আমি বসে
রইলাম। মানুষজন জেগে উঠেছে। জেগে
ওঠার স্বাভাবিক শব্দ আশপাশ থেকে উঠে
আসছে। লক-আপের সামনের দিকে একজন
ছুটে গেল,. দড়ির এক প্রান্ত তার কোমরে
বাঁধা, অন্য প্রান্ত ধরে পিছনে পিছনে
কনেস্টবল ছুটছে—হাসছে। লোকটি
সকালের কাজ সারতে গেল। অধ্যাপক
ছেলেটি লক-আপের মুখ থেকে ফিরে এল।
বলল, 'আমাদের দেবে না?'

'দেবে, একজন তো গেল—ফিরে
আসুক।'

'তা এখনো এলো না?'

'আসবে, বসুন—এত ছটফট করছেন
কেন?' অধ্যাপক ছেলেটি লক-আপের
ভিতরে পায়চারি করতে থাকে। আমি বসে
বসে দেখি।

বললাম, 'আপনাকে কোর্টে নিয়েছিল?'

'হ্যাঁ।'

'জামিনের চেষ্টা করলেন।'

'না।'

'উকিল দিয়েছেন?'

'না।'

'কেন?'

'জামিন - টামিন, উকিল - মুকিলে
বিশ্বাস করি না।'

'এতে বিশ্বাস অবিশ্বাসের কি আছে?'

'আছে। যে রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে আমরা যুদ্ধ
ঘোষণা করেছি—তার কাছে আবার জামিন
কি?—উকিল কি?' আমি ওঁকে কাছে

থাকতে চান, থাকুন। আমার কোন
ও নেই।' বলে, বৃদ্ধ লোকটি ঘরের
চলে গেলেন। অমল ফিরে আসে।
কার সঙ্গে কথা বললে?'
স্টেশনের কেউ হবে।'
কি দরকার ছিল কথা বলার।'
বলে রাখা ভাল। না হলে অনেক
ঝামেলা হয়।'
কি আর ঝামেলা হবে। একটু পরে
দেখবে আমরা স্টেশনে নেই—তখন
করবে—কি ভাববে।'
কি আর ভাববে—ভাববে, আমরা
াচ্ছি।'
আমাদের জামা কাপড় ভিজে গিয়ে-
গা গড়িয়ে জল পড়ছে। অমলের
বই সব ভিজে গেছে। পেটের নীচ
বইগুলো বার করে আমার হাতে
বলল, 'আপনার ব্যাগে ঢুকিয়ে
রাগে দিলে ভাল হত।' আমি ওর
কে বইগুলো তুলে নি। 'রেড-বুক',
লেখা', 'জনগণের সেবা কর।'
এখন কি করবে?'
আর করবো? একটু বসি, বৃষ্টি
তারপর বেরিয়ে পড়বো।'
তার আগে, জামা-কাপড়গুলো নিংড়ে

ক বলেছেন।' বলে, অমল জামা-
খুলতে থাকে। আমিও খুলতে
।-ওর দিকে মুখ ফিরিয়ে সব কিছু
খুলে নিংড়ে নেই। বাইরে বৃষ্টি
থাকে। অমল হাসছিল। আমি
'খুব খিদে পেয়েছে অমল, ধারে
খাও কিছু নেই?'
এখানে ধারে কাছে বলে কিছু
আছে শর্মার বাড়ি, ওখানে গেলে
ত পারে।
হলে চল। বৃষ্টির জন্য অপেক্ষা
নেই।'
শর্মার হয়েছে?'
।'
ন তবে, দেখা যাক কি হয়।'
বারান্দা পেরিয়ে সিঁড়ি দিয়ে
ষ্টির ভিতরে চলে যাই। এখন
অনেকটা হাল্কা—মসৃণ। বেশ
হাঁটতে। অমল বলল, 'কাকে
রি বলুন তো?'
?'
র বাড়ি কোথায়।'
চেন না।'
অনেকদিন আগে এসেছিলাম—
ড়ছে না।'
কর—জিজ্ঞেস করতে হবে না।'
বলল, 'ঠিক আছে—আসুন

আমরা এসে নেমেছিলাম।
একটু দাঁড়াল। লাইনের
তাকিয়ে কিসব দেখলো। আমি
কে কি?'
বাড়ি।'

অমল রেল লাইন পেরিয়ে উল্টো দিকে হাঁটতে থাকে। এ-দিকটা জল আর কাদায় পথ ডুবে আছে। বৃষ্টি প্রায় থেমে এসেছে। এই অন্ধকারেও একটা আলোর আভা জলের ওপর খেলছিল। কালো সিসের বুকে যেমন সাদা থাকে, জলের বুকে সেই সাদা ভাসছিল। অমল বলল, 'সাদা জায়গায় পা দেবেন না—ওটা জল। কালো জায়গায় পা দিন।' আমি হেসে বলি, 'আমাকে কি আনাড়ি পেয়েছ?' ব্যাঙ খোকার মত জল টপকে টপকে আমরা এগিয়ে যাচ্ছিলাম। একটু দূরে জমি একটু ওপরে উঠে গেছে। তারপর একটা ফাকা জমি। জমির ডানদিকে বাঁদিকে কয়েকটা ঘর অন্ধকারের পাথর হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। আশেপাশে বাঁশের ঝোপ—আম জাম আর বনজ গাছ পেরিয়ে কলা গাছের সারি। ঝিঁঝির একটানা শব্দ নিঝুম করে দিয়েছে চারদিক। দূরে কোথাও শিয়াল ডেকে উঠলো। আমি বললাম,

'কি—চিনতে পারছো?'

'মনে হয় পারছি—আসুন না।'

কেউ কোথাও জেগে আছে বলে মনে হয় না। এখানে কেউ ছিল বলেও মনে হয় না। অথচ অমল হাঁটতে থাকে, এগিয়ে যায়।

'এখন কেউ কি জেগে আছে?'

'না। সন্ধ্যা হলেই এখানে সব শুতে যায়। আজ বৃষ্টির রাত, কে জেগে থাকে?'

'তাহলে কি করবে?'

'ডেকে তুলবো।'

আমি ঠাট্টা করে বলি, 'জনগনের কাঁচা ঘুম ভাঙবে?'

অমল হেসে ওঠে। 'কাঁচা ঘুম কোথায়? হাজার বছর ধরে ঘুমাচ্ছে।'

আমরা আর একটু এগিয়ে যাই। ঘরগুলোর কাছাকাছি চলে আসি। একটা ঘরের চালের নীচ দিয়ে ধোঁয়া বেরিয়ে আসছিল। আমি অমলকে বললাম 'দেখ, ওই ঘর থেকে ধোঁয়া আসছে। হয়তো কেউ জেগে আছে—চল।' অমল বলল, 'আসুন।

একটু পরে অমল চেঁচিয়ে ওঠে, 'পেয়ে গেছি—এটাই শর্মার বাড়ি।'

আমি বললাম, 'দেখ ভালো করে!'

'দেখতে হবে না—এটাই—আসুন।'

পাশাপাশি কয়েকটা ঘর। ঘরের গা ঘেঁষে কয়েকটা সুপারী গাছ সোজা উঠে গেছে আকাশের দিকে। ডাইনে বাঁয়ে বাঁশের বেড়া। বেড়া টপকে আমরা উঠোনে এসে দাঁড়ালাম। পরিষ্কার উঠোন। জলে ভিজে চিকচিক করছে। একটি বউ উঠোন পেরিয়ে এ ঘর থেকে ও-ঘরে যাচ্ছিল। আমাদের দেখে প্রায় দৌড়ে সামনের ঘরে ঢুকে দরজা বন্ধ করে দিল। ঘরের ভিতর আলো জ্বলছে। অমল ডাকলো, 'কে-আছেন?' কোন সাড়াশব্দ নেই। ভেজা জামা কাপড় নিয়ে আমরা ভিজে উঠোনে দাঁড়িয়ে থাকি। অমল আবার ডাকল। এ-বার সাড়া এল ভিতর থেকে।—'কে?'

একজন মাঝবয়সী লোক দরজা খুলে বেরিয়ে এল। খালি গা। পরনে খাটো ধুতি। মাথায় ঝাকড়া চুল। কালো। আমাদের দেখে তিনি দরজার ওপরে দাঁড়িয়ে রইলেন। 'কাকে চাই?'

'শর্মা আছে?'

'কোন শর্মা?'

'আমাকে চিনতে পারছেন না মেজদা—আমি অমল।'

'ও—তা, বিরু তো বাড়িতে নেই।'

'কোথায় গেছে?'

'দেশে।'

'কবে ফিরবে?'

'ঠিক নেই,—কেন?'

'একটু দরকার ছিল।'

'কোন দরকার নেই—ও অর পার্টি-ফার্টি করবে না—আপনারা যেতে পারেন।'

'বলছিলাম কি..........

'আপনারা যেতে পারেন।'

অমল আমার মুখের দিকে চোখ তুলল। ধীরে স্বর নামিয়ে বলল, 'কি করি বলুন তো?" ওদিকে দরজা বন্ধ করে মেজদা ঘরের ভিতরে চলে যান।

আমি বললাম, 'এই বাড়িতে নিশ্চয়ই কিছু একটা হয়েছে। এত রাতে সবাই জেগে—ব্যাপার কি?

অমল একটু উদ্যোগী হয়ে বলল, 'দেখবো।'

(চলবে),
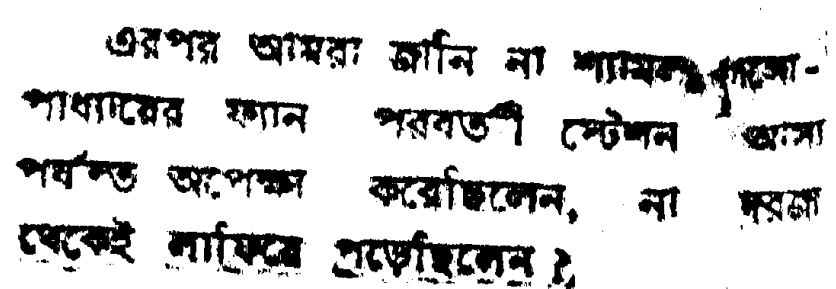
মাল দামু নেই

কলকাতা ময়দানের দামাল ছেলে দামু গেলেন। বড় অপ্রত্যাশিত, বড় বেদনা- এই মৃত্যু। যিনি কোনদিন কোন কই পরোয়া করেন নি সেই অনিল দিনকয়েক আগে হার স্বীকার করতে অজ্ঞাতনামা কয়েকজন দুর্বৃত্তের কাছে। আক্রমণে মাথার পেছন দিকে প্রচণ্ড ত পেলেন অনিল দে।' সেই আঘাতই রূপ ধরে তাঁকে ছিনিয়ে নিয়ে গেল ার (২৩-৯-৭৭) বেলা এগারোটা।

মাঠের সঙ্গে অন্তরঙ্গ মিল ছিল তাঁর। দামালই। তিরিশ-চল্লিশের দশকে তাঁর নামী খেলোয়াড় অল্প ক'জনই যা । খেলতেন ঝড়ের বেগে। নিজেকে ন বেঁধে রাখেন নি কোন একটি জায়গায়। প্রথমে খেলতেন ইনসাইড ড' হিসেবে। তারপর নেমে এসে রাইট াকে।

া যুগে সবচেয়ে জনপ্রিয় খেলোয়াড় অনিল দে। ১৯১১ সালে প্রথম আই শীল্ড জয়ের পর থেকে মোহনবাগান ডাকসাইটে দল। সেই মোহন- নেতৃত্বের ভার তাঁর ওপর পড়েছে ার।

তু তাঁর ঐ বেপরোয়া মনোভাব দ চরিত্র তাঁকে বার বার অহেতুক জড়িয়ে ফেলেছে। কিন্তু মনটি ঘোড়ার মতো টগবগে।।

চল্লিশের দশকের গোড়ার দিকে দশ জুড়ে যখন স্বাধীনতা আন্দো- ামা বেজে চলেছে তখন দামাল াঁপিয়ে পড়লেন। কিন্তু বড় ইডেনে তখন বসেছে বড় আসর। খেলতে এসেছেন বিশ্ব খেলোয়াড়রা। খেলছেন কিথ মিলার, পটন। তখনই 'বিদেশী খেলা বন্ধ আওয়াজ তুলে রসিদ আলি নিল দে তাঁর দলবল নিয়ে পড়েছিলেন। একদিনের জন্যে তুলেছিলেন ইডেন উদ্যানকে।।

তু নিজেকে কোনদিনই স্থির াজেন নি অনিল দে।' তাঁর দামাল কিছু যেন লণ্ডভণ্ড করে দিত। বার বার ঝাঁপিয়ে পড়তেন, জড়িয়ে মন সব কাজে যা তাঁকে মানায় না।। মানায় না। কিন্তু ওঁর ঐ দামু ন ওঁকে দামাল করে দিত।

অনিল দে

বেশী দামাল হয়ে উঠেছিলেন। কোন বাধা মানতেন না। কোনকিছু পরোয়া করতেন না।

ময়দানকে বড় ভালোবাসতেন অনিল দে। গড়ের মাঠের সবুজ ঘাস তাঁকে টানতো। ফুটবল ছিল তাঁর প্রাণ।' তাই সুযোগ পেলেই ভেটারেন্স ক্লাবের জার্সি গায় চড়িয়ে দামাল দামু নেমে পড়তেন মাঠে। ভেটারেন্স ক্লাবের সঙ্গে খেলতে যখন বাইরে যেতেন তখন তিনি একাই মাতিয়ে রাখতেন দলটাকে।' হাসি, হুল্লোড় আর গল্পে কেটে যেতো সময়।।

খেলতে খেলতে তাঁর জীবনের সাতাশটি বসন্ত যে কেটে গেছে একথা কোনদিন কাউকে বুঝতে দেন নি। অবশ্য আজ-কালকার দিনে সাতাশ কোন বয়সই নয়।

কিন্তু তাঁর ঐ দামাল চরিত্রটিই হয়তো তাঁর অপ্রত্যাশিত শেষের দিনটিকে তাড়াতাড়ি করে টেনে আনলো। তাঁর মাথার পেছনে লোহার রডের প্রচণ্ড আঘাত এবং প্রচুর রক্তপাত গোলবার তিনজন হাস-পাতালে অনিশ্চয় সম্পর্কটি থলে এসে ইতির দাঁড়ি টেনে দিল ময়দানের একটি দামাল চরিত্রের ওপর। বড় নিষ্ঠুর এই আঘাত, বড় করুণ এই মৃত্যু।

শান্তিপ্রিয় বন্দ্যোপাধ্যায়

খেলা

প্রদর্শনী ফুটবল

ইডেনের দর্শক স্টেডিয়ামে বহু প্রচারিত কসমস বনাম মোহনবাগানের প্রদর্শনী ফুটবল খেলাটি ২—২ গোলে অমীমাংসিত থেকে গেছে। তারকাখচিত এই কসমস ফুটবল দল নর্থ আমেরিকান ফুটবল লীগের খেলায় এবছরের লীগ চ্যাম্পিয়ান। মোহনবাগান ক্লাবের আমন্ত্রণে তারা কলকাতায় এই প্রদর্শনী ফুটবল ম্যাচ খেলতে এসেছিল। এই দলের প্রধান আকর্ষণ ছিলেন ফুটবলের সর্বকালের সম্রাট পেলে।

প্রতিশ্রুতিমান খেলোয়াড়পুষ্ট কসমস দলের খেলা দেখে দর্শকরা কিন্তু খুবই হতাশ হয়েছেন। অপরদিকে মোহনবাগান অসাধারণ ভাল খেলে দর্শকদের মন জয় করেছিল। মোহনবাগানের অতি গোঁড়া সমর্থকরাও ভাবতে পারেননি মোহনবাগান এত ভাল খেলবে। দর্শকদের দারুণ হতাশ করেছেন ফুটবলের সম্রাট পেলে। খেলার মাধ্যমে পেলে এইদিন দর্শকদের সামনে সম্রাটের ভাবমূর্তি ধরে তুলতে পারেননি। ৯০ মিনিটের খেলায় তাঁর মাত্র কয়েকটা পায়ের কাজ, শট এবং সপ্রতিভ ক্রীড়া-তৎপরতা প্রমাণ করে তিনি একজন জাত খেলোয়াড়। কিন্তু এতে কি দর্শকদের মন ভরে?

কয়েকদিন ধরে সারা কলকাতা শহর যেমন কসমস ক্লাব এবং ফুটবলের সম্রাট পেলের খেলা দেখা নিয়ে মেতে উঠেছিল, এখন তেমনি তাদের খেলা নিয়ে কঠোর সমালোচনায় মুখর হয়ে উঠেছে ফুটবলের অনুরাগী মহল। সর্বত্র আলোচনা চলছে পেলের এবং কসমস ক্লাবের নৈরাশ্যজনক খেলা নিয়ে। এই খেলা দেখানোর জন্যে লক্ষ লক্ষ টাকা খরচ হল। মিলেছে বিরাট অর্থ এবং সময়ের অপব্যয়। জনসাধারণের উদ্দেশ্যে বলা হয়েছিল, এই খেলা থেকে আমাদের দেশের অধিকাংশের ফুটবল খেলোয়াড়রা নাকি ফুটবল খেলায় অনেক কিছু কলা-কৌশল তুলে নিতে পারবে এবং তারকাখচিত ফুটবল খেলোয়াড়দের খেলা দেখে দেশের ছেলে-মেয়েরা ফুটবল খেলায় অনুপ্রাণিত হবে। ফুটবল খেলায় অনুপ্রাণিত হবে। খেলার শেষে দেখা গেল অর্থশিত দর্শক প্রচণ্ড ঘৃণা এবং ক্ষোভে খেলার টিকিট টুকরো টুকরো করে ছিঁড়ে ফেলেছেন। সময় এবং অর্থব্যয়ের জন্য আপসোস করছেন। তাঁদের মধ্যে একমাত্র বড় সান্ত্বনা যে, মোহনবাগান ক্লাব জাতীয় ফুটবল খেলার মুখ রেখেছে। এবং অনেকের মতে তাদের এইদিনের খেলার মধ্যেই [illegible] হয়েছে।

প্রথমার্ধের ১১ মিনিটের মাথায় পেলের কাছ থেকে বল পেয়ে কসমস দলের কার্লস আলবার্তো এইদিনের খেলায় প্রথম গোলটি দেন। এই গোলের আগে হাবিব কসমস দলের গোলের মুখে একমাত্র গোলকিপারকে কয়েক গজ দূরে পেয়েও গোল দেওয়ার সহজ সুযোগ নষ্ট করেন। গোল খাওয়ার দু'মিনিট পরেই মোহনবাগানের শ্যাম থাপা গোল শোধ করে দেন। প্রথমার্ধের খেলার ৩০ মিনিটের মাথায় হাবিব দলের দ্বিতীয় গোল করেন। বিরতির সময় মোহনবাগান ২-১ গোলে এগিয়ে ছিল। মোহনবাগান এইদিনের দ্বিতীয়ার্ধের খেলায় পাঁচজন খেলোয়াড় বদলী করে। অপরদিকে কসমস ক্লাব করে দু'জন। খেলার ৭৩ মিনিটের মাথায় এক বিতর্কিত পেনাল্টি কিক থেকে কিনালিয়া গোল দিয়ে খেলার ফলাফল সমান করেন। কসমস দলের কোচ মোহনবাগানের বিপক্ষে এই পেনাল্টি দেওয়ার সিদ্ধান্তে রেফারীর সঙ্গে একমত হতে পারেন নি। খবরে প্রকাশ, মোহনবাগানের এইদিনের খেলা দেখে পেলে বিস্ময় প্রকাশ করে তাদের খেলার প্রশংসা করেন।

দুই দলের খেলোয়াড়

মোহনবাগান : শিবাজী ব্যানার্জি (বিশ্বজিৎ দাস); সুধীর কর্মকার, সুব্রত ভট্টাচার্য, প্রদীপ চৌধুরী ও দিলীপ পালিত (অনীল দত্ত); গৌতম সরকার (দিলীপ সরকার) ও প্রসূন ব্যানার্জি; হাবিব, আকবর (সুভাষ ভৌমিক), শ্যাম থাপা (মানস ভট্টাচার্য) এবং বিদেশ বসু।

কসমস : ইরল ইয়াসিন; কার্লস আলবার্তো; ওয়ার্নার রথ, নেলসি মোরাইস (রোমেরো) ও রিলডো মেনেজেস; টেরি গারবেট (কানটিলো) এবং ভিটোরিও ডিমিট্রিজ; টনি ফিল্ড, স্টুয়ার্ট ফলিয়ান, পেলে এবং কিনালিয়া।

আই এফ এ শীল্ড

১৯৭৭ সালের আই এফ এ শীল্ডের ফাইনালে উঠেছে দুই চির প্রতিদ্বন্দ্বী—মোহনবাগান এবং ইস্টবেঙ্গল।

প্রথম সেমি-ফাইনালে মোহনবাগান ৩—০ গোলে এরিয়ান্সের বিপক্ষে জয়ী হয়। মোহনবাগানের পক্ষে গোল করেন মানস ভট্টাচার্য (২), শ্যাম থাপা এবং বিদেশ বসু। দ্বিতীয় সেমি-ফাইনালে ইস্টবেঙ্গল ২—০ গোলে বি এন আর-কে পরাজিত করে। ইস্টবেঙ্গলের পক্ষে দুটি গোলই দেন রঞ্জিত মুখার্জি।

এই নিয়ে মোহনবাগান ২৫ বার এবং ইস্টবেঙ্গল ২৪বার আই এফ এ শীল্ডের ফাইনালে উঠলো। ইতিপূর্বে ইস্টবেঙ্গল ২৩বার ফাইনালে উঠে জিতেছে ১৫বার, রানার্স-আপ হয়েছে ৫বার এবং তাদের খেলা পরিত্যক্ত হয়েছে ৩বার (প্রতিবারই মোহনবাগানের বিপক্ষে)। অপরদিকে মোহনবাগান ২৪ বার ফাইনালে উঠে জয়ী হয়েছে ১০বার, রানার্স-আপ ১০বার এবং তাদের খেলা পরিত্যক্ত হয়েছে ৪বার (রাজস্থানের বিপক্ষে একবার এবং ইস্টবেঙ্গলের বিপক্ষে তিনবার)।

মোহনবাগান প্রথম আই এফ এ শীল্ড বিজয়ী হয় ১৯১১ সালে ইস্ট ইয়র্কের বিপক্ষে ২—১ গোলে। এটা ছিল মোহনবাগানের প্রথম আই এফ এ শীল্ড ফাইনাল খেলা। অপরদিকে ইস্টবেঙ্গল ১৯৪২ সালে তাদের প্রথম আই এফ এ শীল্ড ফাইনাল খেলায় ১—২ গোলে মহামেডান স্পোর্টিং দলের কাছে হেরে যায়। ইস্টবেঙ্গল প্রথম আই এফ এ শীল্ড জয় করে ১৯৪৩ সালে পুলিশকে ৩—০ গোলে হারিয়ে।

ইতিপূর্বে আই এ শীল্ডের ফাইনালে মোহনবাগান এবং ইস্টবেঙ্গল পরস্পরের সঙ্গে মিলিত হয়েছে ১৫বার। এই খেলার ফলাফল দাঁড়িয়েছে : ইস্টবেঙ্গলের জয় ৯বার (এর মধ্যে দু'বার যুগ্মবিজয়ী), মোহনবাগানের জয় ৫বার (এর মধ্যে দু'বার যুগ্মবিজয়ী), খেলা পরিত্যক্ত ২বার এবং ১৯৫৯ সালে এই দুই দলের ফাইনাল খেলার আসর একেবারেই বসেনি।

— [illegible]

শান্তিগোপাল

-যা যা একটা পালাকে জনপ্রিয় তে পারে, সবই আছে। কিন্তু রজনীর অভিনয় দেখা একধরনের তা, ফলতই তরুণ অপেরার যা -দলগত নৈপুণ্য এবং অভিনয়-রিমার্জনের অভাবে তা সেদিন বেশ া। এমনকি কিংবদন্তীর নায়ক পালও তবে যেহেতু ঘটনার প্রেক্ষা-২, ফলতই পোষাক, মেক-আপ, াবং সংগীতের সুর ১৯৭৭-র মতো হয় দায়িত্ব পালন হলো না। ন হলো, শুধুমাত্র পালা জমানো াস থেকে বহুদূরে সরে যাওয়া এক জ্ঞতা। এমনিতেই বহু অসংলগ্ন-পালা দুর্বল। সংগীতও। তবে সম্পাদনায় নিশ্চয় এ ভুল যাবে। বোধকরি, তরুণ অপেরা র প্রথম প্রয়োজন। যেখানে অভিনয়ে পাই একমাত্র নন, সার্বিক দলগত অপরিহার্য। চোখে পড়েও তাই।

শেষে, বিরতিহীন সাড়ে তিনঘণ্টা পর পর যখন কোমর টনটন, তখন া—মাথার উপরে খোলা আকাশ, ওম, ঠ্যাং ছড়িয়ে বসা এবং ধূম-াধীনতা ছাড়া অভিজাত প্রেক্ষাগৃহে খা অসম্ভব। মানায়ও না। এবং কোন উত্তর দিতে পারলাম না যখন লেন—চা-বাগান এবং কোলিয়ারি খল করতে গেলে ঐসব ঐতিহাসিক ই কিছু যায় আসে না, আর, পাঁচ ় করে কোন গাঁয়ের কৃষক বা শ্রমিক চার ঘণ্টার পালা না পেলে প্যান্ডেল দেবে। এসব কথা শহুরে বুদ্ধি-একটু ভেবে দেখবেন?

কবিতায় জং

ভরত সমশের জং বাহাদুর রাণা এক নতুন অভিজ্ঞতা দিলেন। বুঝিয়ে দিলেন টাকার সবকিছুই হয়। এতদিন জানতাম আর যাই হোক অন্ততঃ শিল্প-সংস্কৃতি হয় না। বিক্রমাদিত্যের সময়কার ইতিহাস বলে, তিনি অপরাজেয় সম্রাট হয়েও কবি বা গায়ক ইত্যাদি হতে সাহস করেননি। পরিবর্তে নবরত্ন সভার পৃষ্ঠপোষকতা করেছেন। ঐ সব যুগে বিক্রমাদিত্যেরা যা পারেন নি, আজ রাণা বাহাদুরেরা তা করতে সক্ষম হয়েছেন। টাকার জোরে তাঁরা অভিনেতা। নেত্রীদের যা খুশী বানান, ইচ্ছে মতো হাত পা নাড়ান, মাথামুণ্ডুহীন ঘটনা গড়ে তার ছবি তোলেন এবং তা সিনেমা নামে সাধারণে দেখানোর সাহস রাখেন। কবিতা তার একটি উৎকৃষ্ট উদাহরণ।

ফেড ইন ফেড আউট

॥ সে এক মানুষ—অনন্যপ্রতিভা ॥

একবার এক চিত্র পরিচালক জানতে পারলেন, তাঁর ছবি বিদেশে আমন্ত্রিত হয়েছে। সাবটাইটেল চাই। অথচ হাতের কাছে ঐ ছবির কোনো স্ক্রীপ্ট বা চিত্রনাট্য ছিল না। কিন্তু পরিচালক দমলেন না, তিনি অনেকটাই মুখস্থের মতো বলে গেলেন ছবিটির সাবটাইটেল কি হবে। তাঁর এক ছাত্র ঐ সাবটাইটেল কপি করছিলেন খুবই ভীতগ্রস্ত ভাবে। স্ক্রীপ্ট নেই, হাতের কাছে চিত্রনাট্য নেই, অথচ মদ্যপান অবস্থায় পরিচালক যা বলছেন তা সঠিক তো! আশ্চর্যের কথা এই দেখা গেল মূল ছবির সঙ্গে সাবটাইটেলটি কমা, পূর্ণচ্ছেদ অব্দি মিলে গেছে। এই মহাস্মৃতিধর পরিচালকের নাম ঋত্বিককুমার ঘটক।

*

॥ রূপালী পর্দায় যদি এমন ॥

যদি কোন সিনেমা দেখতে বসে দেখেন যে আপনার প্রিয় হিরো হিরোইন কখনো ছিপছিপে গড়ন, আবার আরেক মুহূর্তে থলথলে, মোটা, স্থূলকায়। কখনো চলায় লঘু ছন্দ, কিন্তু তারপরেই গোদা পায়ের মন্থর গতি, আপনি কি খুবই অবাক হবেন না! বিশ্বাস করুন বা না করুন এমনটি ঘটেছিল তামিল ছবি থেন আমায়াই (?) সেলপম্ম ছবিতে। ক্যামেরার কারসাজি ভাবছেন। মোটেই কিন্তু নয়, আসলে ছবিটিন স্যুটিংএর সময়োগ হেরফেরে এই কাণ্ড। নায়ক তরুণ শিবাজী গনেশন, নায়িকা তন্বী পদ্মিনী। এদের নেওয়া ছবিটি তৈরী হওয়ার প্রথম দিকে ছিল যেমন, তারপর পার হয়েছে দশ দশটি বছর। দেহের মেদ বেড়েছে যথেষ্ট। ফলে যা হবার ঘটেছে।

সুচিত্রা-কমিশন

প্রযোজকের সঙ্গে ছবির চুক্তি করে শেষমেষ সেই চুক্তি খারিজ করায় জনৈক বাংলা চলচ্চিত্রের নামী অভিনেত্রী সুচিত্রা সেনের বিরুদ্ধে কোন এক প্রযোজক কেস ঠুকেছেন। এদিকে শ্রীমতী সেন তাঁর বক্তব্য রাখার জন্য কমিশন নিযুক্ত করেছেন। বাংলা সিনেমায় নাকি এমন কমিশন এই প্রথম

আবার কিসসা কুর্সি কা?

জরুরী অবস্থায় শ্রীঅমৃত নাহাটা পরিচালিত যে ছবিটি সম্পূর্ণ নষ্ট হয়ে গেছে সেটি প্রযোজক শ্রীনাহাটা পুনরায় চলচ্চিত্রায়িত করতে ইচ্ছে প্রকাশ করেছেন। শোনা যাচ্ছে এই শতাব্দীতে তিনি ছবির স্যুটিং শুরু করার [illegible] শুরু করার আগেই [illegible]

যে বেশ কয়েক কোটি টাকায় ব্যবসা করবে তা জ্যোতিষ না জেনেও বলা যায়।

কেচ্ছা-প্রীতি

সেদিন এক অভিনেত্রী সাংবাদিকদের ওপর রেগে বাপ্পা। সাংবাদিকেরা নাকি তাকে তত গুরুত্ব দিচ্ছেন না। অথচ ঐ দিনের কাগজেই তাঁর ছবি ছাপা হয়েছে। পরে জানা গেল তিনি ক্ষুব্ধ, যেহেতু তার বিষয়ে নরম-গরম কেচ্ছা কেলেঙ্কারী আজকাল কাগজে থাকছে না। এখনকার দর্শকেরা ছবির অভিনয়ের চেয়ে কার কত কেচ্ছা তাই জানতে আগ্রহী। কেচ্ছা ছাড়া বড় এ্যাকট্রেস? নৈব নৈব চ।

বাংলা ফিল্মের পুরনো একটি বিজ্ঞাপন

নবকেতনের 'অফসর' চিত্রের বিজ্ঞাপন: 'মিলনের মধুরাতায় চুম্বনের মাদকতায়-আলিঙ্গনের উষ্ণতায়—যে প্রেম সার্থক হয়ে আছে যান্ত্রবের অনুভূতির মাঝে, আজ রূপালী পর্দার বুকে তাদেরই মিলন ও হৃদয় প্রীতিভাব—নবতর মাধুর্যে অভিব্যক্ত।

বাংলা-দেশের কাঁচির স্পর্শমুক্ত প্রথম আদিরসাশ্রিত চিত্র-নাটক অফুরন্ত নৃত্যগীতাদি সম্ভারে পরিবেশিত অসাধারণ কৌতুক চিত্র।'

এই বিজ্ঞাপনটি যুগান্তর পত্রিকায় ২৭ বছর আগে ১৩৫৭ সালের ২২শে আষাঢ় প্রকাশিত হয়েছিল।

দীপ দত্ত

যুসাস

অক্টোবর, '৭৭

নমস্কার। আনাতীর দ্বিতীয় সম্পাদিত 'যুসাস'টি আপনাদের হাতে পৌঁছে গেছে। কেমন লাগলো জানিয়ে চিঠি পাচ্ছি। আরও পেতে চাই। সেগুলো ছাপবো আগামী সংখ্যায়। মনে, পুজোসংখ্যা নয়। যদিও সংখ্যাটি পুজোর আগেই হাতে পৌঁছে দিচ্ছি। কী থাকছে এতে? কেবল ছোটগল্প আর সাম্প্রতিক ছোটগল্পের উপর ক্ষুরধার আলোচনা। এইসব উদীয়মান স্রষ্টারা আগামীদিনের ছোটগল্পকার ও সমালোচক।

জানেন, দুঃখ কী? নিগূঢ় ও শাণিত ছোটগল্পের বড় অভাব এখন! আপনি কি এই দুঃখমোচনে তৎপর হবেন না?

তাহলে আপনার শ্রেষ্ঠ গল্প বা নিবন্ধটি এক্ষুনি আমাদের দপ্তরে পাঠিয়ে দিন।

যোগাযোগ : সম্পাদক—যুসাস, ৫৬।বি ছিদামাম ব্যানার্জী লেন, কলি-১২।

বিচিত্রা

কফি হাউস

কফিহাউসে ঢুকতে গিয়েও, আনন্দ বেরিয়ে আসে। আনন্দ যে কেন এরকম ব্যবহার করছে, বোঝা যাচ্ছে না। প্রায় চারটে থেকে ওর সঙ্গে আমি আছি—এখন ছ'টা; আর শনিবারের বিকেল অ্যালবার্ট হল জমজমাট, আনন্দকে অন্তত চারটে লেখাও দিতে হবে চারটে লিটল ম্যাগাজিনে—তা-ও, আনন্দ বেরিয়ে এলো। আমার খুব খারাপ লাগছে; কারণ, এই দু'ঘণ্টায় মোট তিনটি কথা ও বলেছে। অথচ, ওর মেজাজ খারাপ বুঝে ওকে একা রেখে, চলে উঠে যাওয়াটাও প্রাণে লাগছে।

কলেজ স্কোয়ারে এসে, জলের 'পর বসে, আনন্দ খানিকটা ঠাণ্ডা হলো। আমি এবার বললাম, কিরে, এতো গম্ভীর হয়ে আছিস যে? কিছু কমিট করিস নাকি? আনন্দ চাপা নিঃশ্বাস ছেড়ে বললো, বুঝতে পারছি তোকে বোর করছি খুব, কিন্তু না। আসলে, লেখার সময়টাতেই বড়ো গণ্ডগোল বাধে। আমি চুপ করে থাকলাম। আনন্দ আবার বললো, সকালে বেলল থেকে এসে বাড়ির খাইখোরাক বুঝে নিয়ে কপি করতে বসলাম, বুঝলি? ওই বলেছিলি না, শেষ তিনটে লাইন ফ্ল্যাট লাগছে? আমি ভাবছিলাম কিভাবে পালটানো যায়। প্রথমে মনে হলো, না, পালটাতে পারবো না। কপি করতে করতে হঠাৎ দুটো লাইন এলো, লাইন দুটো কিন্তু একটার পর একটা নয়। মাঝখানের লাইনটা নেই। অথচ সেই দুটো লাইনে—মনে হলো, হাঁ, একটা টুইস্ট আছে। লাস্ট মিসিং লাইনটা হাতড়াচ্ছি—কি অবস্থা বোঝ—তখন মা এসে বললো বাজারে যেতে হবে। কেন? বাবা মাছ দেখে আনেনি—সেটা পালটাতে হবে। বাবার নাকি চেনা দোকানী, অসুবিধে হবে না। তুই বোঝ, ভেটকি মাছ আমি আদপেই চিনি না। বললাম, একটু পরে গেলে হয় না? মা বুঝলি কাগজ দেখে কিরকম [illegible] হয়ে গেলো, তক্ষুনি বেশ কড়া করে বলে দিলো যে, বাজার না হয় [illegible] —[illegible] —কিন্তু, [illegible] তিনি [illegible] [illegible]

শেষ। টাটকা মাছ যদি নিতে হয় তবে চোদ্দ টাকা কেজির কি একটা রুই-টাইপের মাছ আছে—নটি একটি টাকা গাঁটগচ্চা দিয়ে তাই নিলাম পচা ভেটকি পালটে। বুঝলি, তারপর তা দেখেও মা-র গজর-গজর আর থামতে চায় না। একে তো মিসিং লাইনটা পাইনি, তারপর ঝট করে রাগ হতেই বাকি দুটোও ভ্যানিশ। আরো রাগ চড়ে গেলো। বলে বসলাম, থামবে? আরে ধ্যাস, ফ্যামিলি একাকার হয়ে লেগে গেলো। দি ওল্ড ম্যান মুখ হাঁড়ি করে ফেললো, বুপ-ঝুপ, মাকে এনথু দিতে লাগলো। মিডিওকার আপব্রিঙ্গিং নিয়ে কবিতা লেখাটা একটা ফার্স মাইরি—

আমি নীরস মুখে বললাম, বাড়ি থেকে এনকারেজ করলে, ছেলে আমার কবি বলে টাটে বসিয়ে রাখলে তোর ভালো লাগতো?

আনন্দ বললো, না। আমি পুজো-টুজো চাই না, কিন্তু, এটাও বুঝি না যে, লিখি বলে এতোটা টিজ করারই বা কি আছে?

আমি চুপ করে গেলাম। আমাদের সমস্ত বন্ধুবান্ধবদের বাড়িতে অবস্থাটা যে একরকম তা নয়। যে তাপসের কড়া গলা মাঝেমধ্যেই আমাদের জানিয়ে দেয় যে, লেখা থেকে সমস্ত সেন্টিমেন্টালিজমকে ইরেজ করতে হবে, সেই তাপসের বড়দির সঙ্গে তাপসসুদ্ধ আমাদের তিনজনের পরশুদিন এসপ্ল্যানেডে দেখা হয়েছিলো। একথা-সেকথার পর বড়দি বললেন, তপুকে তো আর নাগালই পাওয়া যায় না—সব-সময়ই যে কি ভাবের ঘরে থাকে তা ও-ই জানে। 'ভাবের ঘরে' বলবার সময় বড়দি ঠোঁট মুচড়ে হাসলেন। তাপসের বড়দি বয়েসে অনেক বড়ো, এখনো তাপসদের বাড়ির একজন অর্থকরী নির্ভর তিনি—তাপস ছোটো মেজো-বড়ো অনেকরকম চোখ দিয়ে ফেললো শুধু। কিন্তু, অত্যন্ত বুদ্ধিমান ছেলে দীপংকর—সে একদিন হাসতে হাসতে বললো, ভাই সাড়ে দশটার পর আলো জ্বালাতে দেয় না। কাজেই, সকালে আমি লিখবার একটা প্ল্যান করি।

খুব সকালেই। জানি, দু' লাইন লিখলেই বাবা জানবে। কিন্তু, বাবাকে তো অফিসে যেতে হবে ডিয়ার—দুপুরটা?

—অতোক্ষণ ম্যানেজ করতে পারিস?

দীপংকর ঝকঝকে চোখে তাকিয়ে বললো, করতে হবেই। এখনকার কবিদের মুড়ি হলে চলে না। এই তো বাড়িতে এতোগুলো ম্যাগাজিন আমি নিয়ে যাই, কেউ খুলেও দেখে না। অথচ সেদিন দেখে পাড়াটা [illegible] বলে, একটু স্পেশাল খাতির হলো আমার—দিন দুই সবাই এমন [illegible] মাঝে ঘুরতে লাগলো যেন বংশের [illegible] ফেলেছি। আমি তো মনে মনে [illegible]। জানিস, ওই লেখাটাও বাড়িতে কেউ পড়েনি? দু'দিন বাদে আবার সব যেমন তেমন—

তরুণতম কবি দেবাঞ্জন এই সেদিন বললো, ক্লাশ নাইন থেকে ইলেভেন অবধি বাবা রেগুলার ঠেঙিয়ে গেছেন লেখা ছাড়ানোর জন্যে। অথচ দেখুন, বাবা কিন্তু রীতিমতো সাহিত্যপাঠক। এখন বুঝতে পেরেছেন, কিছু হবে না, টায়ার্ড হয়ে মেনে নিয়েছেন।

সমস্ত তরুণ কবি-লেখকরাই যাঁদের বয়স ষোলো থেকে বত্রিশ, অনেক বেশি একা। যে পরিবারের তাঁরা আছেন, সেই পরিবারে কারোর সঙ্গেই তাঁদের সত্যি-কারের আত্মীয়তা হয় না। তাঁদের উদ্বেগ, পরিশ্রম, ভাবনার অংশীজন তাঁদেরই বাবা মা-ভাই-বোন—লেখা ধরার আগে, যাঁরা সত্যিই তাঁদের প্রথম আপনার জন ছিলেন। লেখা এঁদের তফাতে নিয়ে যায়। একজন লেখক মাঝে মাঝে ঘরে ঢুকে দেখতে পান, মা-পিসিমা হয়তো টেবিলের কাগজপত্র গুছিয়ে রাখছেন—একমুহূর্ত ভালো লাগে, তারপরই তাঁর মনে পড়ে যায়, এটা নিছক বাৎসল্য—ঐ মা বা পিসিমা লেখাগুলি কখনো পড়বেন না। মাঝে মাঝে তিনি দেখতে পান, বোন কৌতূহলে একটা সদ্যলেখা গল্প পড়ে যাচ্ছে—তাঁরা বোঝেন যে, ভগিনী আসলে ভাইয়ের স্বপ্ননায়িকার হদিশ পাবার জন্যে গোয়েন্দাগিরি করছেন। মাঝে মাঝেই আত্মীয়েরা তাঁদের স্মরণ করিয়ে দিয়ে থাকেন, ঘরের খেয়ে বনের মোষ না তাড়িয়ে আরো মন দিয়ে রেজাল্টটা ভালো করা উচিত—একটা চাকরি, বিপুল বেকার-সমস্যা সত্ত্বেও পাওয়া উচিত—ছোটো ভাইবোনের সুকুমার খোঁজখবর নেওয়া উচিত। লিখে কি হয়? কোন স্বর্গে বাতি দেওয়া হয়? তা-ও আবার মন ভারি করা ধোঁয়াটে লেখা সব। মাস দুয়েক আমি কিছু লিখতে পারছিলাম না। আর সবাইকার মতো কোথাও সুখের পায়রা—সকলে দলসমেত উড়ে যায়। মাস দুই এক লাইনও না লিখে আমার [illegible] হলো, যাঃ! তাহলে তো সব খতম! আমাকে কি আর কোনোমতেই লেখক বলা উচিত? দু' সেকেন্ড আমি [illegible] নিঃশ্বাসে এসে পড়লাম যে ইহজীবনে আমি আর কখনোই লিখতে পারবো না। তখন, বেশ নিশ্চিন্ত হয়ে আমি ভাবলাম, ঠিক আছে, লেখকদের লেখার সময় গিয়ে পড়ে এবার দেখবো—কেন অন্যেরা তাদের জ্বালাতন করে। আমি এখন অলেখক, নির্ঘাৎ বুঝতে পারবো মনস্তত্ত্বটা কি।

তাপসের বাড়ি গেলাম। একতলাতেই তাপস থাকে। জানালা দিয়ে দেখে নিলাম, সে লিখছে। তাপসকে আমরা বরাবরই রাগী বলে জানি—তার মুখ দেখে অল্প

অমৃত
১৭ বর্ষ
২৪ সংখ্যা
৪ কার্তিক
১৩৮৪
21 OCT 1977

আগামী সংখ্যায়

নতুন ধারাবাহিক রচনা
মানুষ কেনাবেচার ইতিকথা
লিখেছেন ব্রজমাধব ভট্টাচার্য
নতুন জীবনধারা
লিখেছেন সন্দীপন চট্টোপাধ্যায়
দ্বন্দ্বমুক্ত
লিখেছেন গজেন্দ্রকুমার মিত্র
অমল মুখোপাধ্যায়ের গল্প
প্রচ্ছদ কাহিনী
বাঙালির বাড়ির ভিতরে
সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়

এবারের প্রচ্ছদ এঁকেছেন
নিতাই ঘোষ
ভিতরের ছবি এঁকেছেন
সুবোধ দাশগুপ্ত এবং ধ্রুব রায়

'বন্যেরা বনে সুন্দর'

বন্যপ্রাণী সংরক্ষণের দিকে ইদানীং সারা পৃথিবীতেই সচেতনতা দেখা দিয়েছে। ভারতেও সম্প্রতি বন্যপ্রাণী সপ্তাহ পালিত হল। কিন্তু সরকারি স্তর ছাড়িয়ে এই কর্মসূচি সাধারণ মানুষের মধ্যে কতটা প্রভাব বিস্তার করেছে বলা শক্ত।

এবং শুধু তাই নয়। যাঁরা শিক্ষিত মানুষ এবং যাঁদের বলা হয় মানীগুণী ব্যক্তি তাঁরাও এ ব্যাপারে খুব যে ওয়াকিফহাল তা নয়। কিম্বা তা যদি হনও, বন্যপ্রাণী সংরক্ষণের দিকে তাঁরা কতোটা আন্তরিক তা নিশ্চিত করে বলা যায় না।

সকলেই জানেন, সংরক্ষণের জন্যে কড়া আইন ও সতর্ক পাহারার ব্যবস্থা আছে। কিন্তু তা সত্ত্বেও সংরক্ষিত প্রাণী, এমনকি যাদের নিয়ে যথেষ্ট আলাপ আলোচনা হয়ে থাকে সেই বাঘগণ্ডারও চোরাগাপ্তা খুন হয়, এবং শিকারীরা সকলেই অজ্ঞ ব্যক্তি এমন মনে করার কারণ নেই।

আসলে বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ কী জন্যে এত জরুরী, সেই বোধই সঞ্চারিত করা যায় নি এখানে। বাঘগণ্ডার মেরে তার ছাল ও শিঙ বেচে টাকা রোজগার করা যায়, এ প্রলোভন যে অনেকের কাছেই জোরালো তাতে সন্দেহ নেই। কিন্তু বিলীয়মান প্রাণীগুলো নিশ্চিহ্ন করে দিলে প্রাকৃতিক ভারসাম্য এবং সৌন্দর্যবোধের দিক থেকে কতোটা ক্ষতিকর এ চেতনাও যথেষ্ট শক্তিশালীভাবে গড়ে তোলা সম্ভব। অন্তত পৃথিবীর বহু দেশেই এ বোধ সঞ্চারিত হয়েছে তা বাস্তব সত্য। আমাদের দেশেও এ কাজ করা সম্ভব যদি অবশ্য আন্তরিকভাবে সে চেষ্টা চালানো হয়।

প্রশ্ন সেই আন্তরিকতাতেই। কিছু কিছু ব্যক্তি হয়তো সত্যিকারের উৎসাহ নিয়ে কাজ করে যাচ্ছেন। কিন্তু তাঁরা সংখ্যালঘু। বেশির ভাগ ব্যক্তিরই লক্ষ্য মনে হয় আত্মপ্রচার এবং চাকরির পদোন্নতি। নয়তো ব্যাঘ্রপ্রকল্পের মতো বহুল প্রচারিত কর্মকাণ্ডেরও উঁচু পদের কোনো কোনো কর্মীর বিষয়ে নানারকম অভিযোগের কথা শোনা যায় কেন?

অবশ্য তার মানে এ নয় যে প্রকল্পটি ব্যর্থ হয়ে গেছে, কিম্বা বন্যপ্রাণী সংরক্ষণের সংকল্পে কোনো গতিবেগ নেই। মোটেই তা নয়। কথা হচ্ছে, কী করে তাকে আরো সক্রিয় এবং ফলপ্রসূ করা যায়।

এর প্রথম উত্তর, আন্তরিকতার সঙ্গে সাধারণ মানুষের কাছে যাওয়া। এবং শেষ উত্তর, তাঁদের অন্তরের কাছে আবেদন করা।

প্রথম সন্তান সকলের আদরের দুলাল তাকে আনন্দে বড় হতে দিন

এর জন্যে অন্ততঃ তিন বছর চাই-ই চাই...

তার মধ্যে আরেকটি সন্তান আসা উচিত নয়। শিশুর দেহমনের পূর্ণ বিকাশের জন্যে তার জীবনের প্রথম তিনটি বছরের গুরুত্ব অনেক। তিন বছরের মধ্যেই যদি আরেকটি কোলে আসে তাহলে ছোটটির দিকে নজর দিতে বড়টি যত্নআত্তি পায় না।

শুধু তাই নয়, মা ও সন্তানের সুস্বাস্থ্যের জন্যেও দুটি সন্তানের জন্মের মধ্যে তিন বছরের ব্যবধান থাকা অপরিহার্য। নিরোধ, পিল বা 'আই. ইউ. ডি.'র সাহায্যে এটা করা সম্ভব।

এ বিষয়ে বিস্তারিতভাবে জানতে হলে সবচেয়ে কাছের স্বাস্থ্যকেন্দ্রে খোঁজ নিন।

প্রথম সন্তান কোলে এলে
তিন বছর থাক হেসে খেলে

davp-77/199

বৃষ্টির মতো

মিতা দে বিশ্বাস

দিদিভাই মারা গেলেন ডিসেম্বরের প্রথম দিকে। তখন বাড়ীতে আমরা তিনজন— আমি, আর আমার ছোট দুই বোন, সোমালী ও সোনালী। বাড়ীটা অসম্ভব ফাঁকা লাগতে লাগল আমাদের কাছে। অত বড় বাড়ীটা যেটা এতদিন ছিল সরগরম আর প্রাণোচ্ছ্বাসে পরিপূর্ণ, একজন মানুষের বিদায় নেবার সঙ্গে সঙ্গেই সেটা হয়ে পড়ল যেন একটা ইট-পাথরের তৈরী খাঁচা প্রাণের সাড়া গেল মুছে। আর এই প্রথম আমরা অনুভব করতে পারলাম যে মাথার উপরের সেই আকাশটা যেটা এতদিন আমাদের রক্ষা করেছে কত ঝড় বৃষ্টির হাত থেকে, হঠাৎই যেন ভেঙে পড়েছে প্রকৃতির দুর্যোগে, আমাদের একটা অজানা অচেনা পৃথিবীর মধ্যে দাঁড় করিয়ে রেখে।

সোনালী প্রথমদিকে দিদিভাইয়ের মারা যাওয়ার কথাটা বিশ্বাস করতে চায় নি। ছ' বছরের ছোট্ট মেয়ের পক্ষে মৃত্যু, অন্ততঃ বিষাক্ত আবহাওয়ার সৃষ্টি করতে পারে ভেবে আমরা এ ব্যাপারে সোনালীকে কিছু বোঝাবার চেষ্টা করতাম না। ওকে আমরা বুঝতে দিতে চাইতাম না যে দিদিভাই আগের মত আর কোন দিনই ভোরবেলা সোনালীর হাত ধরে সেই পরিচিত কিন্ডারগার্টেনের বাগানে বেড়াতে বেড়াতে আজব কোন মজার গল্প শোনাবেন না। দুপুরবেলার সেই মিঠে গলার নিমন্ত্রণে আর কোন দিনই আমাদের ডাক আসবে না উপরের ঘর থেকে, যে ডাকটার জন্য দুপুরের খাওয়া সারা হলে অসীম আগ্রহে আমরা প্রতীক্ষা করে থাকতাম।

কিন্তু সোনালী বুঝেছিল। কে ওকে কি বলেছিল জানি না, তবে কিছুদিন পর [illegible] হয়ে গিয়েছিল। তবে মাঝে মাঝে ওকে আমরা আবিষ্কার করতাম দিদিভাইয়ের সেই জাপানী শিল্পীকে দিয়ে আঁকানো বিরাট অয়েল পেন্টিংটার সামনে চুপচাপ বসে থাকতে। আমরা সেখান থেকে সরে আসার চেষ্টা করতাম। সোমালী কাঁদত আর আমি পশ্চিমের বারান্দায় দাঁড়িয়ে থাকতাম উদাসীনের মত।

চার মাস কেটে গেল এইভাবে। দেখতে দেখতে। আমরা তিন বোনে অধীর আগ্রহে প্রতীক্ষা করে থাকতাম বাবা কবে আসবেন এই আশায়। কত দিন অনেক রাত অবধি তিন বোনে জেগে বাবার কথা বলতাম. তারপর সোনালী যখন ঘুমিয়ে পড়ত তখন আমরা অন্ধকার বাগানের সামনের ঘেরা বারান্দাটায় বসে থাকতাম। আমাদের অজানা, অদূর ভবিষ্যতের কথা ভাবতে বৃথা চেষ্টা করে করে এইভাবে যে কতদিন কত রাত কাটিয়ে দিয়েছি তার বোধ হয় শেষ নেই।

আমার তখন আঠারো চলছে। সোমালীর পনেরো। বড় বলেই হয়ত চিন্তার বোঝাটা আমার উপরই রীতিমত ছিল বেশি। তাছাড়া আমি ছিলাম সব ব্যাপারেই ভাবপ্রবণ। একটু বেশি কল্পনাবিলাসী। সব সময়েই কল্পনার স্রোতে গা ভাসিয়ে দিতাম। ভেসে যেতে ভাল লাগত।'

অবশেষে একদিন দীর্ঘ প্রতীক্ষার পরে বাবা এসে পৌঁছোলেন। চাকরী থেকে কিছু দিনের ছুটি নিয়ে।

বাবাকে আমি কখনো ভেঙে পড়তে দেখিনি। এবারও [illegible] মানুষ। তাঁকে আমরা তাই ভালোবাসতাম [illegible]।

বাবাকে দেখেছি দিদিভাইয়ের পিয়ানোটা নিয়ে মাঝে মাঝে বাজাতে। গভীর রাতে ঘুম ভেঙে জেগে উঠে কখনো কখনো কানে আসত নীচের ঘর থেকে ভেসে আসা দিদিভাইয়ের পিয়ানোটার মিষ্টি অথচ করুণ সুর। আর তখন কি জানি কেন আমার হঠাৎই মনে পড়ে যেত পাঁচ বছর আগের মার মারা যাওয়ার সেই দৃশ্যটা। মনে পড়ে যেত দিদিভাইয়ের সোনালী ফ্রেমের আড়ালে উজ্জ্বল চোখ দুটোর কথা। ডুকরে কেঁদে উঠতে ইচ্ছে করত আমার তখন। কেন জানি না নিজেকে কী ভীষণ নিঃসঙ্গ মনে হত সেই মুহূর্তে।

বাবা বোধ হয় আমার মানসিক অবস্থা কিছুটা বুঝতে পেরেছিলেন, তাই কিছুদিন যেতে না যেতেই সন্ধান শুরু করলেন ভাল একটি ছেলের। যাতে নিঃসঙ্গ জীবনটার অবসান ঘটে।

দেখতে আমি বোধ হয় নেহাৎ খারাপ ছিলাম না। যদিও আমাদের বাড়ীতে সাজ-সজ্জার আয়োজন করা একরকম নিষিদ্ধই ছিল বলতে গেলে। তবু যে দেখেছে সেই আমার সুখ্যাতি না করে পারত না। অপরূপা না হলেও শুনেছি আমার মধ্যে কি যেন নাকি একটা ছিল, যার জন্যে একবার দেখলে আমাকে নাকি ভোলা যেত না।

শুনেছি আমাকে নাকি ঠিক আমার মার মতন দেখতে। মনে পড়ে যায় মায়ের

কথা। নিখুঁত ছিল আমার মা'র মুখটা, ঠিক যেন দুর্গাপ্রতিমা। ভোরবেলা শিব-মন্দিরে পুজো দিয়ে মা যখন ফিরতেন তখন যে মাকে কি অপূর্ব দেখাত সে-কথা বোধ হয় বুঝিয়ে বলা যায় না। ঘন কালো একরাশ চুল ছড়িয়ে থাকত মা'র পিঠের ওপর, কপালে জ্বলজ্বল করত বিরাট একটা সিঁদুরের টিপ, হাত থেকে পুজোর থালা নামিয়ে মা যখন বাবাকে হেসে সকালে প্রণাম করতেন তখন কেন জানি না আমার ভীষণ ভীষণ ভাল লাগত। গোটা পৃথিবীটাকে আমার খুব ভালবাসতে ইচ্ছা করত।

আমার বিয়ে নিয়ে বাবার চেষ্টার কোন অন্ত ছিল না। ইতিমধ্যে আমাকে দেখতে এসেছিলেন দু-একদল মানুষ। শেখানো পড়ানো টিয়াপাখীর মত তাঁরা যা যা প্রশ্ন করতেন তার উত্তর দিতাম। তা নিয়ে কখনো মাথা ঘামাইনি। তবে কখনো কখনো আমার ভেতরের মনটা যখন উধাও হয়ে হারিয়ে যেত অনেক দূরে—ছোট সোনালীকে যখন রূপ-কথার সেই ঘুমন্ত রাজকন্যাকে উদ্ধার করতে আসা রাজপুত্রের গল্প পড়ে শোনাতাম, তখন কেন জানি না আমার জীবনের সেই ভাবী রাজপুত্রের কথা জানতে আমার ভীষণ ইচ্ছে করত।

কল্পনার রঙে রং চড়িয়ে কখন যেন অজান্তেই আমি একটা কাল্পনিক মানুষকে তৈরী করে নিয়েছিলাম।

সেটা ছিল আমার জীবনের বিশেষ একটা সময়। বোধহয় শুধুমাত্র আমিই নয় আমার মনে হয় এই সময়টা প্রত্যেক মেয়ের কাছেই বিশেষ একটা মূল্য পেয়ে থাকে। খুব সাধারণ সময়গুলোকেও যেন অসাধারণ করে দেখতে ভাল লাগে। রোজকার মতই সূর্য ওঠা বা ডোবা দেখতে দেখতেও মনে হয়ত এরও কোন মানে আছে। বর্ষার স্বাভাবিক বৃষ্টি দেখতে দেখতেও যেন মনে হয় বৃষ্টিটা বুঝি কী একটা বলতে চায়। এককথায় জীবনটা হয় যেন একটানা একটা গানের মতো।

দিদিভাইয়ের স্মৃতিগুলো এরই মধ্যে আমার কাছে একটু একটু করে স্বাভাবিক হতে শুরু করেছিল। মানুষের মনটা বোধ হয় নদীর উপকূল। যেখানে মুহূর্তগুলো পলি হয়ে যেতে থাকে একটু একটু করে। এইভাবে জমে যায় পলির পর পলি, অতীত হয়ে আসে ঝাপসা। আমার বেলাতেও এ নিয়মের ব্যতিক্রম ঘটাতে পারলাম না।

আগেই তো বলেছি, আজ-কালকার যুগে জন্মালেও যুগের আবহাওয়ার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে আমরা চলতে শিখিনি। ভাবলে হাসি পায় যে এই নারী স্বাধীনতার যুগেও একমাত্র স্কুলের বাসে চড়ে যাওয়া-আসা ছাড়া অন্য কোন রকম স্বাধীনতার আস্বাদ আমরা পেলামই না। তাও এটুকুকেও দিদিভাই বলতেন 'স্বাধীনতা'। কিন্তু এই যাওয়া আসার মধ্যে স্বাধীনতার গন্ধও যে দিদিভাই কোথায় পেতেন তা আমি অনেক চেষ্টা করেও বুঝতে পারিনি।

তাই চার দেয়ালের মধ্যে আটকা পড়ে গিয়ে আমি হয়ে পড়েছিলাম ভীষণ রোমা-ন্টিক। আর খানদানী পরিবারের ঐতিহ্য বজায় রাখতে গিয়ে মাটির দিকে চোখ ফেলে হাঁটতে হাঁটতে কোন অচেনা যুবকের সঙ্গে চার চোখের মিলন ঘটাবার সৌভাগ্য আমার জীবনে তাই হয়ে উঠল না। কাজেই সেই আদর্শ স্বামী ও প্রতিভাবান মানুষটির চেহারা আমার মনেই রয়ে গেল। বাস্তব আর কল্পনার মধ্যে যে বিরাট একটা প্রাচীর আছে সে কথা বুঝে উঠতে পারলাম না॥

শুধু কল্পনার রঙে রঙ মিশিয়ে ছবিই আঁকলাম। কিন্তু সত্যিকারের কোনো অভিজ্ঞতা তো ছিল না। একথা তাই একবারও মনে হল না, বৃষ্টির জল লেগে কল্পনার সে রঙও একদিন ধুয়ে মুছে যেতে পারে।

একবারও মনে এল না যে কিছু পেতে গেলে কিছু হারাতেও হয়। শুধু আকাশের নীলে হাউই হয়ে উড়তে চাইলাম, ভেবে দেখলাম না যে তার আয়ু কতটুকু। আর ঠিক সেই কারণেই আমার কল্পনার কাজলে আঁকা চোখ দুটোকে হতাশ করল আমার শুভদৃষ্টির সেই দিনটি। যে হাউইটা ছুটে চলেছিল আকাশের দিকে বড় তাড়াতাড়ি সেটা ফিরে এল পৃথিবীর মাটিতে।

আমার স্বামী মানুষটি যদিও খারাপ ছিলেন না তবু ওঁকে আমার ভাল লাগত না॥ তিনি ছিলেন নিতান্তই ভালো মানুষ আর ভাবলেশহীন ঠাণ্ডা স্বভাবের মানুষ, যা আমি একেবারেই পছন্দ করতাম না। ওঁর চরিত্রের ব্যক্তিত্বের এই অভাবটুকু আমাকে ধাক্কা দিত ভীষণভাবে। ওর মধ্যে এমন কোন জোর ছিল না যা আমাকে চুম্বকের মত টানতে পারত। ওঁর চাওয়াটা ছিল ভিখারীর মত, অথচ আমি চেয়েছিলাম ঝড়ের মত, নদীর উত্তাল স্রোতের মত ভাল-বাসা পেতে। কিন্তু ওর ভালবাসার ঐ শান্ত শীতের বাতাস আমাকে ক্রমশঃ বরফের মত জমাট বাঁধিয়ে দিতে শুরু করল।

ওর ইচ্ছেটা ছিল তপস্যা দিয়ে

স্তুতিকে দেখা, তর্ক দিয়ে শিশুর্নাদকে মুখ ফেরানো যা আমাকে ক্রমশঃ ওর কাছ থেকে অনেক দূরে সরিয়ে নিয়ে যেতে শুরু করল।

কোথায় যেন পড়েছিলাম, প্রকৃতির অকৃত্রিমতায় বাধা অসাড় করার ওষুধ আছে। যখন কোন একটা গভীর সম্বন্ধের লক্ষ্মী কাঠী পড়তে থাকে তখন ভিতরে ভিতরে কখন যে সেই ওষুধের যোগান ঘটে তা কেউ জানতে পারে না। অবশেষে একদিন জেগে উঠে দেখা যায় মস্ত একটা ব্যবচ্ছেদ ঘটে গিয়েছে।

আমার বেলাতেও এই নিয়মের কোন ব্যতিক্রম ঘটল না। প্রকৃতির হাতের পুতুল আমার এই নারী চরিত্র হৃদয়ের প্রবল আবেগের জোয়ারে ভাসতে ভাসতে ক্রমশঃ সামনের দিকে এগিয়ে যেতে শুরু করল।

একটা হতাশাজনিত মনোভাবের ফলে আমার শরীর মন দুই-ই আস্তে আস্তে ভেঙে পড়তে লাগল, প্রথমদিকে উনি আমাকে খুশি রাখার জন্য অনেক চেষ্টা করেছিলেন, মন ভাল রাখার জন্য হেন জিনিস নেই যা উনি করেন নি। উনি বুঝতে পেরেছিলেন যে কোন কারণে আমার মন ভালো থাকত না অথচ আশ্চর্যের কথা তা নিয়ে উনি আমাকে কখনো কোন প্রশ্ন করতেন না।

এইভাবেই কেটে গেল মাঝের দুটো বছর। আমরা কথা বলতাম, গল্প করতাম, বেড়াতেও যেতাম কোন কোন দিন, বাইরে ভেতরে ভেতরে আমরা ছিলাম ভীষণ অসুখী আর অসুখের জীবাণুটা বহন করে এনেছিলাম আমিই, সেটা ক্রমশঃই সংক্রামক ব্যাধির মত ওকেও আক্রমণ করেছিল।

উনি বোধহয় খুব ভালভাবেই বুঝতে পেরেছিলেন যে, এইভাবে থাকাটা আর আমাদের পক্ষে বেশিদিন সম্ভব নয়। তাই একদিন উনি ওঁর শেষ সিদ্ধান্ত জানালেন।

মনে মনে আমিও বোধ হয় সেদিন একটু মুক্তি খুঁজেছিলাম। নিজের অজান্তেই সেই মুক্ত জীবনটা কেমন হবে সেকথা না ভেবেই। খাঁচার পাখি যখন মুক্তির আকাশে ওড়ে সে কি একবারের জন্যেও ভাবে পৃথিবীর মাটির কথা? আমারও তখন হয়েছিল সেই দশা।

মেয়েদের স্বভাবটাই বুঝি এই রকম। যখন কোন একদিক থেকে টান পড়ে তখন স্রোতের মতনই এগিয়ে চলে তারা সেই দিকে। পরিণতির কথা চিন্তা না করেই। আর অত কথা ভাববার আমার সময় কোথায় তখন? আমি তখন জোয়ারের টানে ভাসতে শুরু করে দিয়েছি।

সামনের ইউক্যালিপটাসগুলোকে ছুঁয়ে ছুঁয়ে যেমনিভাবে ঝরে যায় অজস্রধারায় মুক্তো-দানা ঠিক তেমনিভাবেই আমার জীবনের ওপর দিয়ে এরই মধ্যে কেটে গেছে আরো তিন-তিনটে বছর, ওঁর আমাকে ছেড়ে চলে যাওয়ার পর থেকে। তিনি চলে গেছেন। আমাকে এখানে একা রেখে। দিয়ে গেছেন অবাধ মেলামেশা আর স্বাধীনতার অধিকার।

কিন্তু মুক্তির প্রকৃত আনন্দ কি আজ আমি অনুভব করতে পারি? কি জানি?

নিজেকে অনেকবার প্রশ্ন করেছি যে বন্ধ জীবনের বাঁধনটা তো কেটে গেছে চির দিনের মত তবে কেন আজও নিজেকে সেই আঠারো বছরের মনটায় ফিরিয়ে নিয়ে যেতে পারি না? কেন এমন হয়? অথচ আমি তো বাঁচতেই চেয়েছিলাম। ওঁকে আমি ভালবাসিনি, বাসতে পারিনি। সেটা কি আমার দোষ? নিজেকে অনেক প্রশ্ন করেও কোন সদুত্তর পাইনি।

তবে এখনো সন্ধ্যে বেলায় আকাশে যখন ঘন কালো মেঘ একের পর এক জড়ো হতে হতে অঝোর ধারায় বৃষ্টি শুরু হয় তখন এই বিরাট বাড়ীটার মধ্যে একলা বসে পিয়ানো বাজাতে বাজাতে আমার এক-এক দিন কি-জানি কেন কান্না পায়। ঠিক সেই সময়টায় ওঁকে আমার মনে পড়ে যায় ভীষণভাবে—অদ্ভুত একটা চাপা কষ্ট হয় বুকের ভেতরে। আশ্চর্য মানুষের এই মন।

দিন যায় রাত আসে। আমি দাঁড়িয়ে থাকি কাজের অবসরে সেই রেলিং ঘেরা বারান্দায়। বৃষ্টি এসে আমার পা ছুঁয়ে ছুঁয়ে চলে যায়, মনে কোন সাড়া জাগাতে পারে না।

সবাই বলে আমি নাকি খুব অন্যরকম হয়ে গেছি। সত্যিই কি তাই? আর কেনই বা? তবে কোন কোন দিন গভীর রাতে যখন সারা পৃথিবীটা ঘুমিয়ে পড়ে স্বপ্নের কোলে মাথা রেখে তখনও স্বপ্নবিহীন এই চোখ দুটো নিয়ে আমি একা একা জেগে থাকি। ইন্দ্রের ঐরাবতের আশীর্বাদে যখন বৃষ্টি এসে স্নিগ্ধ করে দিয়ে যায় লাল ফুলে ঘেরা বোগেনভেলিয়া গাছটার পাতাগুলোকে, সেই গভীর রাতের আড়ালে আমার সমস্ত চুলের রাশিকে এলোমেলোভাবে ছড়িয়ে দিয়ে ভিজে স্নিগ্ধ হতে হতে নিজেকে মনে হয় কোন ঘুমন্তপুরীর বন্দিনী রাজকন্যা। বৃষ্টির স্নিগ্ধ ছায়া যখন আমার পা ছুঁয়ে ছুঁয়ে কেবলি খেলা করতে থাকে, তখন মনে হয় আমার জীবন থেকে যেন আজ অনেক কিছু হারিয়ে গেছে। অ-নেক কিছু। যা আর কোন দিনও ফিরে আসবে না, একদিক আজ আমি চাইলেও না।

[illegible] ছাল ভাবের এক ঘোরে জীবনে ছোরাদের বড় অভাব, তাই তারা উদ্ভ্রান্ত ঘোরে। জল এইতে সেটি না পেলে, বাজে বই থেকেই নিষ্কাম পথ ধরে ও-জিনিস আহরণ করে। বলেছি-ই তো সৃষ্টিকর্মের আনন্দ বুকে ওঠা চাই। আর তাই যদি বলা যায়, তলবানের জোরাজুরিতেই কি সব সময় লেখা যায়? নিজস্ব-এর মতন গাছে এক রকম বিকট শুঁয়ো-পোকা দেখতাম। ও টাই লম্বা, বুড়ো আঙুলটার মত মোটা; মোটা ছাই রঙের গা, পিঠের ওপর দু-সারি ছোট্ট ছোট্ট টিবলি মত। একটা কাঠি গায়ে লাগালেই ফোঁস করে শব্দ হত আর টিবলিগুলোর ভেতর খুলে গিয়ে, ভেতর থেকে বিস্মিত করে [illegible] বেরুত, প্রজাপতির আকার [illegible] মত কি একটা অনুমান। আমাদের [illegible] বলত ও জিনিস হাতে লাগলে জীবনে কখনো যা শুকোবে না, খেয়ে খেয়ে হাড় অবধি গিয়ে পৌঁছবে। ভাবতাম, এত যার ক্ষমতা, তিনি ঐ জানোয়ার তৈরি করলেন কেন? লেখকরা [illegible] তাই।

ছোটদের জন্যে সেকালের অন্যান্য সীতা দেবী শান্তা দেবীর লেখা বেরুত, 'নিরেট গুরুর কাহিনী' আর বিদেশী মজার গল্পের অনুবাদ। হিন্দুস্থানী উপকথা তো খুবই প্রশংসনীয়। তবে এ সব গল্প মৌলিক ছিল না। আমি মৌলিক রচনায় বেশী প্রশংসা করি।

সীতা দেবী শান্তা দেবীর উপন্যাস-গুলি ছিল একেবারে মৌলিক, অর্থাৎ একটা বিশেষ সমাজের নিত্য নৈমিত্তিক জীবনযাত্রার গল্পকে যদি মৌলিক বলা যায়। কিন্তু কাহিনীগুলি তাদের কল্পনাপ্রসূত। সে সময় আর অনেক নামকরা কাহিনীর বিষয় এ কথা বলা যায় না। এমন কি 'মন্ত্র-শক্তি'র মত একটি সার্থক রচনার অনেক-টির সঙ্গে [illegible] 'দি [illegible]' [illegible] অদ্ভুত সাদৃশ্য দেখে বিস্মিত হয়েছিলাম। অবিশ্যি দুটি দেশের দুজন লেখক নারীর পক্ষে একই কাহিনী কল্পনা করাও অসম্ভব নয়। মোট কথা সীতা দেবী শান্তা দেবীর গল্পের সঙ্গে আমাদের জীবনের অনেক সাদৃশ্য ছিল। বলা বাহুল্য, ঐ সব [illegible] বাবা একেবারেই [illegible] না। [illegible] তিনিস [illegible] [illegible] ছোটদের লেখক এই দুই লেখিকা [illegible] আমাদের [illegible] দিয়ে ছিলেন। [illegible] কেউই [illegible] ছিলেন না। [illegible] এক [illegible] [illegible] [illegible] ছিলেন। এঁদের [illegible] প্রথম প্রতিভা-সম্পন্ন লেখিকা ছিলেন, যেমন নিরুপমা দেবী, জ্যোতির্ময়ী দেবী। কিন্তু আমাদের ঐ ১০, ১২, ১৩ বছর বয়সে সীতা দেবী শান্তা দেবী [illegible] [illegible] লিখেছেন, [illegible] সঙ্গে আমাদের কোন সম্পর্কই ছিল না। দূরে দেখবার মত জ্ঞানবুদ্ধিও ছিল না। এর পরেই শরৎচন্দ্রকে পেলাম। সীতা দেবী শান্তা দেবীর সঙ্গে অন্য লেখকরা বিদায় নিলেন।

ম্যাট্রিক পরীক্ষা দিয়ে বাংলা বইয়ের পাঠও ফুরোলো। বুঝেছি শুধু ইংরিজি বিদ্যা দিয়ে হবে না; যদি কিছু লিখতে হয় বাংলাতেই লিখতে হবে। যে-সব ভারতীয়রা মাতৃভাষা ছেড়ে ইংরিজিতে সাহিত্য-সাধনা করতেন, তাঁদের সঙ্গে আমার মনের মিল ছিল না। পরে কিছু ইংরিজি প্রবন্ধ লিখেছিলাম, ভালই লিখেছিলাম, কিন্তু ও-পথে পা রাখার মাটি খুঁজে পাই নি। ইংরিজি বিদেশী ভাষা। এতক্ষণ শুধু নিজেদের পরিবারের কথাই বলে এসেছি। তার একটা কারণ অনাত্মীয় সাহিত্যিক রবীন্দ্রনাথকে ছাড়া কাউকে দেখিনি। তাঁকেও দেখেছি বললে ঠিক বলা হবে না, বরং দর্শন করেছি। অর্থাৎ বাইরে থেকে দেখেছি। কলকাতায় সেই সময় আরেকটি বাড়িও ছিল, যাদের সঙ্গে আমাদের কোন রক্ত-সম্পর্ক না থাকলেও এত বেশী ঘনিষ্ঠতা ও ভালবাসা ছিল যে অনেকে ভাবত ওঁরা আমাদের নিকট আত্মীয়। তাঁরাও ময়মনসিংহ থেকে এসেছিলেন। মেজ জ্যাঠামশায়ের বন্ধু গগনচন্দ্র হোম। এঁর বড় ছেলে অমল হোম সামাজিক কাজে, রবীন্দ্র সাহিত্য ব্যাখ্যানায় আর মৌলিক সমালোচনায় এক সময় খ্যাতি লাভ করেছিলেন। আমার প্রিয় বন্ধু, ডঃ নীহাররঞ্জন রায় গগনচন্দ্রের ভাইপো। এঁদের বাড়িতে সাহিত্যের বড় আদর ছিল, যদিও গবেষণা আর সমালোচনার দিকেই এঁদের মন ছিল, গল্প-কবিতা লেখার দিকে নয়।

গল্প শুনেছি এই গগনচন্দ্রের ব্রাহ্ম সমাজের সংস্পর্শে বিষময় প্রভাব থেকে তার আদরের পোষ্যপুত্র উপেন্দ্রকিশোরকে রক্ষা করবার জন্য, আমার বাপ-জ্যাঠাদের দূর সম্পর্কের কাকা হরিকিশোর প্রাণপণ চেষ্টা করেছিলেন এবং বলা বাহুল্য একেবারে ব্যর্থ হয়েছিলেন। ময়মনসিংহ থেকে উচ্চ প্রশংসার সঙ্গে এন্ট্রান্স পাস করে উপেন্দ্রকিশোর কলকাতায় পৌঁছে একেবারে গগনচন্দ্রের মুঠোর মধ্যে এসে পড়লেন। ব্রাহ্ম সমাজের শ্রেষ্ঠ কর্মীদের সঙ্গে পরিচয় হল। ফলে যা হবার তাই হল। উপেন্দ্রকিশোর ব্রাহ্ম হলেন। সেই ইস্তক গগনচন্দ্রের বাড়ির সঙ্গে উপেন্দ্রকিশোরের পরিবারের আত্মীয়তা। উপেন্দ্রকিশোরের সঙ্গে আত্মীয়তা মানে তাঁর ভাইদের সঙ্গেও আত্মীয়তা। উপেন্দ্রকিশোর যখন দ্বারিক গাঙ্গুলীর মেয়ে বিয়ে করলেন, সারদারঞ্জন প্রমাদ গণলেন। অমনি উপেন্দ্রকিশোরের পরের ভাই মুক্তিদারঞ্জনের বিয়ে দিয়ে দিলেন। আসলে মুক্তিদার তখনো বিয়ের বয়স হয় নি। হয়তো সবে উনিশ পেরিয়ে কুড়িতে পড়েছিলেন। বাকি তিনজন অবিবাহিত ছিলেন; এত তাড়াতাড়ি বিয়ে দিলেন। তবে বিয়েতে [illegible] সাহস পান নি। আমি নিজের চোখে দেখেছি ঐ বিয়ে কত সুখের ছিল। তাছাড়া সারদারঞ্জনের আশঙ্কা যে নিতান্ত অমূলক ছিল না, তার প্রমাণ পাওয়া গেল, যখন এ সব ব্যাপারের অনেক বছর পরে কুলদারঞ্জন এবং আমার বাবা দুজনেই ব্রাহ্ম মতে বিয়ে করলেন। তবে উপেন্দ্রকিশোর ছাড়া কেউ ব্রাহ্মধর্মে দীক্ষা নেন নি। দীক্ষা না নেওয়াতে বাবার কোন অসুবিধাও হয় নি, তিনি দস্তুর মত গোঁড়া ব্রাহ্ম ছিলেন। যিনি এই সর্বনাশের মূলে, সেই গগনচন্দ্র হয়তো উপেন্দ্রকিশোরের চেয়ে বয়সে বড় ছিলেন না, তবু বাবারা সবাই তাঁকে গগনমামা বলতেন। আমরা বলতাম গগনদাদামশাই। এমন অমায়িক স্নেহশীল মানুষ খুব বেশী দেখি নি। অবারিত দ্বার। তাঁদের বাড়িতে গিয়ে অচেনা লোকেও খেয়েদেয়ে এলে তাঁরা কৃতার্থ হতেন। শুধু, গগনদাদামশাই নয়, তাঁর স্ত্রী-ও। তাঁকে আমরা ডাকতাম গগন-বৌদি। তাঁর হাসিখুশি শামলা মুখখানি চোখের সামনে ভাসে। এঁদের বড় ছেলে অমল হোমকে আমরা বলতাম নমী-কাকা। নমীকাকার বিয়ের সময় বাবার সঙ্গে গগনদাদামশায়ের মনোমালিন্য হল। সে আরো কয়েক বছর পরের কথা। তবে গগন-দাদামশায়ের সঙ্গে আমাদের সম্বন্ধটা যে কত ঘনিষ্ঠ ছিল তাতেই বোঝা যায়।

সে সময় প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশের নেতৃত্বে ব্রাহ্ম যুবকদের মধ্যে একটা বিদ্রোহের ভাব দেখা গেছিল। প্রশান্তচন্দ্র বললেন, হিন্দু বিয়ে যখন রেজিস্টি করতে হয় না, আদি ব্রাহ্ম সমাজের বিয়েও যখন রেজিস্টি করতে হয় না, নববিধান ও সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজের বিয়েই বা রেজিস্টি করা হবে কেন? এই নিয়ে মহাআন্দোলন শুরু হয়ে গেল। এদিকে বিখ্যাত ব্রাহ্ম নেতা হেরম্বচন্দ্র মৈত্রের মেয়ের সঙ্গে প্রশান্তচন্দ্রের বিয়ের সব ঠিক। হেরম্বচন্দ্র ভয়ানক রেগে গেলেন। রেজিস্টি না করলে ব্রাহ্ম বিয়ে বে-আইনী। তাঁর মেয়েকে তিনি এভাবে বিয়ে দিতে পারেন না। কেউ নিজের মত ছাড়লেন না। শেষ পর্যন্ত বাপের অমতেই মেয়ের বিয়ে হল। পরে বাপ তাঁদের ক্ষমাও করলেন। এর বছর দুই-তিন পরে অধ্যাপক সুশোভন সরকারের সঙ্গে প্রশান্তচন্দ্র তাঁর কনিষ্ঠা বোনের বিয়ে দিলেন। সে বিয়েও রেজিস্টি [illegible] না। আরো পরে স্বয়ং শিবনাথ শাস্ত্রীর মেয়ে হেমলতা সরকারের মেয়ের সঙ্গে অমল হোমের বিয়ে হল। কে আমাদের বাড়িতে খবর দিল এ বিয়েও রেজিস্টি হবে না। শুনেই বাবা মহা চটে গেলেন। 'তাহলে আমি বিয়েতে যাব না।'

বাবা বিয়েতে যাবেন না মানে আমরাও যাব না। আমাদের দুঃখ দেখে কে! বলা বাহুল্য বাবার কথা শুনে গগন-দাদামশাই যেমনি অবাক, তেমনি ক্রুদ্ধ! 'তবে প্রশান্তর বিয়েতে আর তার বোনের বিয়েতে কেন গেছল?' বাবা বলতে চাই-ছিলেন যে তারা নিছক পর, তারা কি করে না করে তাতে আমি কি বলব? কিন্তু গগনমামার ছেলের কথা আলাদা! এ-সব সূক্ষ্ম বিশ্লেষণের সঙ্গে কারও সহানুভূতি থাকা সম্ভব নয়। বাবার সঙ্গে গগন-দাদামশায়ের মুখ দেখাদেখি রইল না।

পৌণ্ড্রবর্দ্ধন ও বর্ধমানভুক্তি

কালিদাস দত্ত

১৩৩৯ বঙ্গাব্দের সাহিত্য-পরিষদ পত্রিকার দ্বিতীয় সংখ্যায় শ্রীযুক্ত রজনীকান্ত চক্রবর্তী মহাশয়, 'লক্ষ্মণসেনের মহাদিগ্বিজয় ও কর্ণসুবর্ণ শাসন ও প্রাচীন বঙ্গের ভৌগোলিক বিভাগ' প্রবন্ধে, বঙ্গদেশের প্রাচীন রাজনৈতিক বিভাগগুলি নির্ণয় করার চেষ্টা করেছেন। তিনি প্রচুর পরিশ্রম করে বহু গবেষণা করে, তাতে অনেক ভুক্তি, মণ্ডল ও চতুরকের সীমা নির্দেশ করেছেন। কিন্তু পৌণ্ড্রবর্ধন-ভুক্তির দক্ষিণভাগের পশ্চিম সীমা ও বর্ধমান-ভুক্তির দক্ষিণ অংশের পূর্ব সীমা বোধহয় ঠিকমতো নির্ণয় করা হয়নি। শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র রায় মহাশয়ও সম্প্রতি, 'প্রাচীন বঙ্গের বিভাগ' প্রবন্ধে, ঐ বিভাগ দুটির সীমা সম্বন্ধে আলোচনা করেছেন। আমি বছর কয়েক সুন্দরবনের পুরাতত্ত্ব অনুসন্ধান করে ঐ বিভাগ দুটির পূর্বোক্ত সীমা যতদূর নির্দেশ করতে পেরেছি, তা এই প্রবন্ধে প্রকাশ করলাম।

শ্রীযুক্ত চক্রবর্তী মহাশয় কলকাতার দক্ষিণ থেকে, বর্তমান সময়ে হুগলী নদীর যে অংশ হাওড়া, মেদিনীপুর ও চব্বিশ পরগণা জেলার ভেতর দিয়ে গিয়ে সাগরে মিশেছে, তাকেই গঙ্গা বা ভাগীরথী ধরে ঐ বিভাগ দুটির সীমা নির্দেশ করেছেন। কিন্তু, সেটি গঙ্গা নদী নয়— বর্তমানে লুপ্ত সরস্বতী নদীর নিম্নাংশ। সেকালে একটি ছোট খাল ভাগীরথীর শাখা হিসেবে এখনকার খিদিরপুরের কাছে আদি গঙ্গা নদী থেকে বেরিয়ে, শাকরোলে সরস্বতীর সঙ্গে যুক্ত ছিল। প্রবাদ যে, নবাব আলিবর্দী খাঁর শাসনকালে ইংরাজরা কলকাতায় জাহাজ যাতায়াতের সুবিধার জন্য ওটি প্রশস্ত করে ভাগীরথীর জল ঐ পথে প্রবাহিত করেছিলেন। গঙ্গার এই অংশ কৃত্রিম বলে হিন্দুরা আজও এখানে শবদাহ করেন না এবং ঐ জলে স্নান করলে গঙ্গাস্নানের ফল হয় না বলে বিশ্বাস করেন। শাকরোল পর্যন্ত পূর্বোক্ত খাল কোন সময়ে কে কাটিয়েছিলেন, তা আজও জানা যায়নি। ডি ব্যারোর ম্যাপ দেখলে বোঝা যায়, খ্রীষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়েও সেটি বর্তমান ছিল।

এখন খিদিরপুরের বিখ্যাত সেতুর নীচ দিয়ে হুগলী নদীর যে একটি ক্ষীণ স্রোত, প্রথমে পূর্ব মুখে ও পরে ক্রমশঃ দক্ষিণ মুখে গিয়ে, কালীঘাটের ওপর দিয়ে 'টালির নালা' বা 'আদি গঙ্গা' নদী নামে প্রবাহিত আছে, তাই সেকালে ভাগীরথী নদীর মূলস্রোত ছিল, এবং তখন কালীঘাটের দক্ষিণ-পূর্ব দিকের 'রসা' নামক জায়গার পশ্চিম দিক দিয়ে বৈষ্ণবঘাটা, রাজপুর, কোদালিয়া, মাহিনগর, দক্ষিণ গোবিন্দপুর, বারুইপুর, শাসন, সূর্যপুর, মুকুটী, দক্ষিণ বারাসত, সরিষাদহ, জয়নগর, মজিলপুর, জলঘাটা ও ছত্রভোগ ও খাড়ী প্রভৃতি গ্রামের ওপর দিয়ে সে-স্রোত প্রবাহিত হত। প্রাচীন বিবরণের মধ্যে খ্রীষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীতে লেখা বৃন্দাবন দাসের চৈতন্য ভাগবত, বিপ্রদাস চক্রবর্তীর মনসার ভাসান, মুকুন্দরাম চক্রবর্তীর চণ্ডীমঙ্গল, এবং সপ্তদশ শতাব্দীতে লেখা কৃষ্ণরামের রায়মঙ্গলে, শ্রীচৈতন্যদেবের নীলাচলগমন এবং চাঁদ, ধনপতি ও শ্রীমন্ত প্রভৃতি সওদাগরের বাণিজ্যযাত্রা প্রসঙ্গে ঐ স্রোতের ও তার উভয় তীরে পূর্বোক্ত অনেক জনপদের উল্লেখ আছে।

ভাগীরথী নদীর এই গর্ভ, মজাগাঙ বা 'গঙ্গার দাঁড়া' নামে এক বিস্তৃত নিম্ন-ভূমির রূপ নিয়ে ঐ গ্রামগুলির পাশে আজও রয়ে গেছে। এ দেশের হিন্দুরা এখনও গঙ্গা এখানে অন্তঃসলিলা হয়ে প্রবাহিত হচ্ছে, এই বিশ্বাসে ও বিখ্যাত স্মার্ত পণ্ডিত রঘুনন্দন ভট্টাচার্যের বিধানমতে, এই গঙ্গার 'দাঁড়া' নামের নিচু জমির ওপর শবদাহ করেন এবং ঐ জায়গায় খোঁড়া পুকুরগুলির জলও গঙ্গার জল হিসেবে ব্যবহার করেন।

চৈতন্য ভাগবতে জানা যায়, খ্রীষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীতে এই ভাগীরথী পূর্বো পূর্বোল্লিখিত জনপদগুলির ওপর দিয়ে প্রবাহিত হয়ে, ছত্রভোগের [illegible]

এই রকম অপকীর্তি হল পর্তুগীজ জলদস্যুদের আক্রমণ লক্ষ্যেরই অপরূপ।

সাগরদ্বীপ ছাড়াও কুলপী ও তাড়দহে ছিল ফিরিঙ্গি বসতি। হুগলি নদীর ওপর সাগরদ্বীপের কিছু দূরে কুলপী হারবারের প্রান্তে একজন পর্তুগীজ মহিলার কবর দেখতে পাওয়া যায়। এটি মগ বিবির গোর নামে পরিচিত। ইটের তৈরি কবরটি চারাঘরের অনুকরণে তৈরি মন্দিরের মত প্রায় পঁয়ত্রিশ ফুট উঁচু। হুগলি নদীতে যাতায়াতকারী জলযানগুলিকে এই স্মৃতি-স্তম্ভ থেকে আলো দেখান হতো। শিখরে লোহার মঞ্চ তৈরি করা হয়েছিল। শোনা যায়, মগ বিবি ছিলেন একজন পর্তুগীজ মহিলা (রাধারমোহন ঘোষের মগ রেইডার্স অফ বেঙ্গল)। সুন্দরবনে 'ফিরিঙ্গি খাল', 'ফিরিঙ্গির মোহানা' 'ফিরিঙ্গি ফাঁড়ি' প্রভৃতি নামে কয়েকটি স্থান আছে। দক্ষিণ সাওতাল কয়েকটি অঞ্চলে এখনও মগ ও পর্তুগীজদের দেশীয় স্ত্রীদের সন্তান-সন্ততিদের উত্তরপুরুষেরা বসবাস করছে।

বিদ্যাধরী নদীর ওপর তাড়দহ। কলকাতা শহর প্রতিষ্ঠা হওয়ার একশত বছর আগে এখানে এসেছিল পর্তুগীজরা।

"The English were not the first European nation to settle in the District. The Portuguese are said to have occupied Tardaha on the Bidyadhari, at the spot where Tollys Nullah now joins that river, century before the foundation of Calcutta".

এই সব এলাকায় পর্তুগীজরা সৃষ্টি করেছিল ত্রাসের রাজত্ব। নিম্নবঙ্গের জনপদে হামলা চালিয়ে বহু মানুষকে ধরে নিয়ে জাহাজে তুলত। তাদের দাক্ষিণাত্য ও অন্য দেশে নিয়ে গিয়ে ডাচ, ইংরেজ ও ফরাসি ব্যবসায়ীদের কাছে বিক্রি করত। দামও পাওয়া যেত ভাল। তমলুক, বালেশ্বরে বিক্রি হত ক্রীতদাসী। সেখানে বন্দর ছিল। জলদস্যুদের নজর সেখানে বিশেষ আতঙ্ক ছিল অবর্ণনীয়।

প্রখ্যাত মুসলমান ঐতিহাসিক শিহাবুদ্দিন তালিশের বিবরণে ফিরিঙ্গি নির্মমতার প্রসঙ্গ আছে :

"They carried off Hindus and Moslems .... threw them one another in the docks of their ships and sold them to the Dutch, English and French merchants at the ports of Deccan. Sometimes they brought the captives to sell at a high price to Tamluk and the port of Balasore", (Journal of the Asiatic Society of Bengali 1907)

পর্তুগীজদের এই নির্মম অত্যাচারেই সম্পন্ন সাগর তীরবর্তী জনপদগুলি পরিত্যক্ত হয়ে যায়। তারপর ধীরে ধীরে পরিণত হয় অরণ্যাঞ্চলে। বার্ণিয়ের ও অন্যান্য বিদেশীদের বিবরণে এর সমর্থন পাওয়া যায়। বার্ণিয়ের লিখেছেন :

"Their ordinary trade was robbery and piracy. With some small and light galleys they did nothing but coast about that sea, and entering into all rivers thereabout, and into the channels and arms of Ganges and between all these isles of the lower Bengal and often penetrating even as far as forty or fifty leagues up into the country, surprised and carried away whole towns, assemblies, mar-

খেলার নাম দাবা বোড়ে

প্রশান্ত চৌধুরী

[illegible] দরবারের মতন হরিধ্বনি দিয়ে কনে-[illegible] মুখে পাটকাঠির আগুনটা [illegible] দিল বিপিন, তখন একবার [illegible] ছাড়া আর কাউকেই চোখ মুছতে [illegible]।

[illegible] না পাবার কথাও নয় কারুর। কেন [illegible]কুমার বয়েসটা চুরাশী পার হয়ে [illegible] ফাল্গুনে। তার চেয়ে বড় কথা, [illegible] বছর তিনি পাগল হয়ে মিথ্যে [illegible] বেঁচে ছিলেন।

[illegible] জন্যে কাঁদবার কোনও হেতু, কোনও মানে হয়?

তবু হরিপদদাদাটা কাঁদল।

হরিপদদাদা কনেকুমার চেয়ে বছর ছয়েকের ছোট। তোবড়া গাল। ঝুলে-পড়া নাক। চোখে মোটা কাঁচের রূপোর চশমা। পঁচাশি বছর আগে বিপিনদের চোরবাগানের বৃহৎ সংসারে যখন সে এসে ঢুকেছিল, তখন তার বয়েস পনেরো; আর বিপিন তো [illegible] তার, বিপিনের জেঠাকারও তখন জন্ম হয় নি।

সেই হরিপদদাদাটাই শুধু কাঁদল। কাঁদতে কাঁদতে কোঁচার খুঁটে চোখ মোছা তার আর থামে না। —কী মুশকিল।

চিতার আগুনটা ঠিকমত ধরে যেতেই বিপিন কাছে সে বলল,—শুধু শুধু কাঁদছ কেন হরিপদদাদা? একটা মিথ্যে-মানুষ হয়ে এতকাল বেঁচে থাকার কোনও মানে ছিল?

না, ছিল না। সত্যিই ছিল না। কিন্তু এ জীবনটার সব মানেগুলো মিথ্যে হবার কথা কি ছিল? ছিল না রে ভাই। তোদের মোটা ডিকশনারীতে একেকটা কথার সাতেরো রকমের মানে থাকে না? এই যে জীবনটা পুড়ে আঙরা হয়ে যাচ্ছে এই জীবনটারও একশো গণ্ডা মানে হতে পারত।

[illegible] না দিয়ে শান্তি নেই কারুর। মনে [illegible] ভাবনা।—এমন রূপের ডালি [illegible] পাঠিয়ে বুক বেঁধে থাকা যায় না ?

চোদ্দয় পড়তেই ঘটকী আসে সাত [illegible] থেকে। পাথুরেঘাটা, জোড়াসাঁকো, [illegible], পাইকপাড়া, ভবানীপুর, শ্যাম-[illegible], পদ্মপুকুর। কিন্তু কুলীনের ঘরের [illegible] তো আর অকুলে ভাসানো যায় না। [illegible] কুল তার পর ঘর-বরের চুলচেরা [illegible] হিসেব।

মাঝখান থেকে ছাতে ওঠা বন্ধ। পাট-[illegible] জুড়ে ধপ-লাফালাফি খেলায় কুলুপ [illegible]। মা, জেঠাই আর খুড়ি বললেন, হরিশ [illegible] নিচেই থাকুক। আর ওর ওপরে ওঠা মানায় না।

বার শুনে হরিশের বুক ঠেলে চাপা কান্না।

জাঁদুই দিদির কিন্তু নাছোড় জিদ্।—[illegible] থাকবে আমার সঙ্গে সঙ্গে। বাঘবন্দী খেলবে। নইলে ভাতের থালায় বসব না।

জাঁদুইদিদির ইচ্ছের অন্যথা করবে, সাধ্যি কি চাটুজ্জ্যেবাড়ির কারুর।—ইস্ রে !

চোদ্দ থেকে একুশ, সাত বছর ধরে নতুন খেলায় মাতলো জাঁদুইদিদি। দেয়াল-[illegible] পেল্লাড আর্শির সামনে দাঁড়িয়ে নিজেকে সাজানো আর দেখা, দেখা আর সাজানো।

ঘরের চৌকাঠে হরিশের হাঁটুবাটা যেন [illegible], ঠিক থাকে সবসময়। একচুল এদিক-ওদিক হবার জো নেই।

হরিশ ?

দিদি।

আসমানী খোঁপায় আমায় কেমন মানায়

হরিশ ?

দিদি।

নীলাম্বরী না ঢাকাই, কোন্ শাড়িতে আমায় বেশি ভাল দেখায় রে ?

হরিশ ?

দিদি।

মটরমালা না ডবল বিছে, কোন্ হারটা আমার গলায় দুললে তোর ভাল লাগে রে ?

হরিশ ?

দিদি।

সেই যে সেদিন গাঙ্গুলীদের বাড়িতে [illegible] নেমন্তন্নে গেলুম না—তিন বাড়ির [illegible] আর চার বাড়ির গিন্নি ছেঁকে ধরেছে আমায়,—কার বাড়ির মেয়ে গো, কোন্ ঘরের [illegible]—বৌ করবার জন্যে জেঠিমার সঙ্গে [illegible] বায়না। যে দ্যাখে, সেই বলে, এমন রূপসী দেখিনি। কই, তুই তো কোনো দিন কিচ্ছুটি বলিস না।

কোনো কথা! হাজার বাড়ির হাজার কামের ভাষা যেখানে কলর-বলর করে থই [illegible] না, সেখানে মুখ্যু-সুখ্যু হরিশের [illegible] কি বাক্যি সরে না কি ?—বাপরে!—[illegible] শুধু চেয়ে দেখবে। হরিশ শুধু বোবা [illegible] চেয়ে দেখবে। আর, বাড়িরে সিঁড়ির [illegible]—

এই দেখতে পাওয়াটা যেন ফুরোয় না গো। তাহলে হরিশ আর বাঁচবে না।

হরিশ ?

দিদি।

তুই আমাকে একটুও পছন্দ করিস না।

হরিশ হতচ্ছাড়া তোমার পায়ের গোলাম দিদি।

হরিশ ?

দিদি।

আমি কিন্তু তোকে খুব ভালবাসি রে।

হরিশ হতভাগা তোমার রাঙা চরণের মলের চটি কি দিদি।

জানিস হরিশ।

কি গো দিদি ?

পাশের বাড়ির বৌটা কি বলে জানিস ?

কোন্ বৌটা গো ?

ঐ যে রে, যার রঙটা ময়লা, ভুরুতে কাটার চিহ্ন, গালে বসন্তের দাগ।—ঐ যে রে, যার বরটা বাড়িতে বাড়ি ফেরে না।

বৌটা বড় দুঃখী গো দিদি।

ও' কি বলে জানিস ?

কি বলে ?

বলে, ওলো জাঁদুই, তুই যখন তোর বরের সঙ্গে দাবাবোড়ে খেলবি, তখন তোর বরটা কেবল-কেবল গো-হারান হারবে।—আমি বলি, কেন ? ও' বলে—তোর বরটা তো ঘুঁটির দিকে না তাকিয়ে তোর মুখের দিকেই চেয়ে থাকবে সারাক্ষণ। তুই বলবি, তোমার বড়ে গেল। সে বলবে, গেল। তুই বলবি, তোমার ঘোড়া মলো। সে বলবে, মলো। তুই বলবি, তোমায় গজ কাৎ। সে বলবে, কাৎ। তুই বলবি, তোমার রাজায় কিস্তি। সে ঘাড় ঝাঁকিয়ে বলবে, মাৎ।

বৌটা বড় দুঃখী গো দিদি।

তা আমি কি করব ? আমি তো আর আমার রূপ থেকে ওকে ধার দিতে পারিনে।

জাঁদুইদিদির সব ভাল ছেল। রূপ, গুণ, গানের গলা, হাতের রান্না, পানের খিলি মোড়া, কুরুশ কাঠির সেলাই বোনা—সব ভাল। শুধু রূপের বড় হংকার ছেল। তা হংকার করার মতই রূপও তো ছেল বটে। তবু ওটা না থাকলেই বোধহয় ভাল ছেল।

অত রূপ থাকতেও পুরো একুশ অবধি বাপের বাড়িতে। কুলীনের মেয়ের কুল আর মেলে না।—শেষ অবধি চোরবাগানের মুখুজ্যে বাড়িতে বদল হল সেই কুলের।

[illegible] তিন কর্তার তিনটে জুড়ি। ঠাকুরদালানে দুর্গা, কালী, জগদ্ধাত্রীর মূর্তি গড়ে কি বছর। তিন ভাইয়ের ছেলে-[illegible] সবার ছোট। ওস্তাদ রেখে গান শিখছে। সেই সঙ্গে বার-দোষও ঘটেছে একটু।

শুনে চাটুজ্জ্যে বাড়ির গিন্নিমায়েরা বললেন—আমাদের মেয়ের চাঁদপানা মুখ দেখলে বার-দোষ শিকেয় উঠবে। ও নিয়ে ভাবি না।

পাশের বাড়ির সেই দুঃখী বৌটাও তো বলেছিল—তুই বলবি, তোমার রাজায় কিস্তি। সে ঘাড় ঝাঁকিয়ে বলবে, মাৎ।

কিন্তু জেবনের সবটাই কি যেনের দোকানের মানলাল—যে, দেলেট পেন্সিলকে কাঁচক কাটলেই অংক মিলে যাবে ?—ধুস্ !

ঘটার বিয়ে ! সাত দিনের বাঁধা রোশন-চৌকি ! বাড়িভর্তি খাসগেলাসের চোখ-পিটপিট আলোর বাহার।

জুঁইদিদি যাবে শ্বশুরবাড়ি, সঙ্গে যাবে কে ?

না, বাড়িতে আছে মামলা দাসী, কোমর বেঁকেছে।

জুঁইদিদি বললে,—উঁহু, হরিশ যাবে আমার সঙ্গে।

শুনে সবার গালে হাত।—ওমা ! সে আবার কি হয় নাকি ? বৌয়ের সঙ্গে ব্যাটা-ছেলে যায় নাকি ? ওরা রাজি হবে কেন ?

হল। রাজি হল। জুঁইদিদির ইচ্ছের অমর্যাদা করবে, সাধ্য কি চাটুজ্যে কিংবা মুখুজ্যেবাড়ির কারুর।

রূপ পাচ্ছ, দাম দেবে না ?—টাঁক নাকি ?

চোরবাগানের মুখুজ্যেরাও ছিল; কিন্তু কড়ার হল,—হরিশ বারবাড়িতে ঠাঁই পাবে; তবে হুট বলতে যখন-তখন অন্দরে ঢুকবে না। দিনান্তে একবার। তাও হাঁক পেড়ে সবাইকে জানান দিয়ে !

তাই সই গো, তাই সই। তবু দিনান্তে একটিবার জুঁইদিদিকে দেখতে পাবে তো হরিশ। সেই ওর পরম ভাগ্য।—এককালে যখন বাপের সঙ্গে ঘুরঘুর করে গোহালে থাকত, তখন গোবর-চোনার গন্ধ নাকে না পেলে রেতেরবেলা ঘুম আসত না হরিশের চক্ষের পাতায়। তারপর জুঁইদিদির সঙ্গে ঘুরঘুর করে এখন এমন হয়েছে,—জুঁই-দিদিকে দিনান্তে একটিবার অন্তত না দেখতে পেলে রেতেরবেলা শয্যাকন্টক হবে।

তা সে বাসি বিয়ে চুকল, ফুলশয্যে চুকল,—হরিশের ঠাঁই হল চোরবাগানের মুখুজ্যে বাড়ির বালমহলে।

মাঝে মাঝে ঘুরে যায় পটলডাঙার চাটুজ্যেবাড়ি। মা, খুড়ি, জেঠাই হরিশকে ডেকে নেন অন্দরে। তিনজনে ঘিরে বসে শুধোন,—মেয়েকে কেমন দেখছিস হরিশ ?

ভাল। খুব ভাল।—অত ভাল না হয়ে পারে ?

পাশের বাড়ির কালো কুৎ বোটাও ফাঁক পেলে কখনো-সখ বেন,—হ্যাঁগো হরিশ, তোমার দি দেখেনে ? সুখী তো ?

ঐ দুখী বোটার কাছে স করতে মন-কেমন করে হরিশের। —সুখ কি কানিশের গোলা-পা বৌদিদি যে, থাবা চাপা দিলেই ধর প্রকাণ্ড সংসারের বৌ। পাঁচজ রাখতেই হিমশিম। অবোস নেই মাথার।

আর ঘরের মানুষ ? সোয়াম খবর ?

ঐখানটাতেই কেমন খটকা হরিশের। কোথায় কী যেন বেসুর বাজে। যেন কাঁসী কোষ্টুজীর একতা কেটে গেছে;—কেজনে আর রস আ তাই সে বলে,—মানুষটা ভালয়-ম রকমের। তবে বোধহয় চোখের দো জুঁইদিদিকে দেখে মজেছে, এমন ক পেড়ে বলতে পারি নে গো।

শুনে সেই দুঃখী বোটা কি ধ —কে জানে বাপু। সেখেনেও হরিশে কাটে না।

একদিন ফাঁক পেয়ে বলেওছিল জুঁইদিদিকেই—গুনীনকে দিয়ে এক করিয়ে আনব জুঁইদিদি ?

কেন ?

শুনেছি তারিণী গুণীনের ব কবচ কথা বলে।

আমার রূপে কি কোথাও ভাঁটা হরিশ ?

পাগল ! খোলতাই বেড়েছে আগে

তবে ?

এ-'তবে'র উত্তরটা কি আর প বলা যায় ? হরিশ তাই চুপ করে থা

জুঁইদিদি তা মস্ত খোঁপায় ফুলের মালা জড়া জড়াতে বলে,— আমার সম্মান ? বশীকরণ কবচ দিয়েছে ? গুণীনের কাছ থেকে ব ধার নিতে যাব কোন দুঃখে।

অহংকার ! অহংকার !—রূপের অহংকা দেমাকেই মাটিতে পা পড়ত না জুঁই এক কলসী গুণের দুধে ঐ এক দেমাকের চোনা।

সেই এক ফোঁটার দোষে এক দুধ কেটে গেল। তাতে আর না হল পায়েস, না হল ক্ষীরপুলি।

শেষ পর্যন্ত চোরবাগানের চাট বাড়ির কনেদাদাবাবু ঘর ছেড়ে বিবাগী

কোথায় গেল, কোথায় গেল ?

পাঁচ-কান পাঁচ-চোখ পাঁচ বাঁচিয়ে চুপিসাড়ে খোঁজ করা হল গাছির বাইজীপাড়ায়।—এমন চাটুজ্যে অ নেই।

বাইজী-পাড়ায় আড্ডাকে দিয়ে চলের টিকিট কেটেছে।

আমাদের ডাক্তার বলেছিলেন: "বাচ্চার কোমল হজমশক্তির দরুন অন্য যে কোনো শক্ত আহারের আগে ওর প্রথমে দরকার ফ্যারেক্স"

ডাক্তাররা বলেন : প্রথমেই ফ্যারেক্স ! কেন ?

৩ মাসে পড়তেই আপনার বাচ্চার শক্ত আহার দরকার, কারণ ওর যেসব পুষ্টিগুণ পাওয়া দরকার শুধু দুধই তা যোগাতে পারে না, আর তাছাড়া, এ সময় থেকে ওর চিবিয়ে খাওয়ার অভ্যাসও ক'রে তোলা দরকার। তবে বাচ্চার হজমশক্তি এখনও খুবই কোমল ব'লে— যে-কোনো শক্ত আহার হ'লেই চলবে না— এমন কি চটকানো-আলুর মত নরম খাবারও নয়। ওর দরকার ফ্যারেক্স-এর মত— বিশেষভাবে তৈরী এক আহার—যা ওর কোমল হজমশক্তির উপযোগী।

অন্য আর কি কি ভাবে ফ্যারেক্স বাচ্চার চাহিদা মেটায় ?

ফ্যারেক্স বাচ্চার বিশেষ বিশেষ চাহিদা মেটায় আরও অনেক ভাবেই। যেমন বাড়, মস্তিষ্ক আর শরীরের বিকাশের জন্য ফ্যারেক্স সঠিকভাবে যোগানো আর সহজে হজম করার প্রোটিন যোগায়। শক্তির জন্য যোগায় কার্বোহাইড্রেট।

আপনার বাচ্চার জন্মের সময় আপনি ওকে ৩ মাসের মত আয়রণ যুগিয়ে দিলেন, যা স্বভাবতই বাচ্চা ৩ মাসে পড়তেই নিঃশেষ হয়ে যাবে। আপনার বাচ্চার চাহিদা পুরোপুরি পূরণ করার জন্য এবং ওর রক্ত সুস্থ রাখার জন্য ফ্যারেক্সে আছে পর্যাপ্ত আয়রণ। এ ছাড়াও ফ্যারেক্স যোগায় পর্যাপ্ত ক্যালসিয়াম, ফসফোরাস আর ভিটামিন ডি২ যার জোরে বাচ্চার গ'ড়ে ওঠে মজবুত হাড় আর শক্ত দাঁত।

৩ মাসে পড়তেই কেন ?

কারণ, এ সময় থেকেই বাচ্চাকে চিবিয়ে খাওয়া শেখানো দরকার। তা না হলে, পরে আপনি ওকে যে খাবার দেবেন ও হয়ত তা' গিলে খেতে শুরু করবে, তাতে ওর পেটে ব্যথা হবে আর শরীরের পুষ্টিও ভাল হবে না। এখন থেকেই ওকে ফ্যারেক্স খাওয়াতে শুরু করুন আর তাতে পরের দিকে "বড়দের" খাবার আরম্ভ ক'রে দিতে ওর পক্ষে সহজ হবে এবং ও ভালভাবে চিবিয়ে খেতে আর ঠিকমত হজমও করতে পারবে।

কখন থেকে ওকে "বড়দের" খাবার খাওয়াতে শুরু করবেন ?

যখন থেকে ও হেলেদুলে হাঁটতে শুরু করবে। এ সময় থেকেই ও "বড়দের" খাবার গ্রহণ করতে শুরু করবে, যেমন— শাকসব্জি, ডাল, ফল, ডিম। তবে ফ্যারেক্স-এর বিশেষ পুষ্টিগুণ তখনও ওর দরকার। তাই বাচ্চার বয়স ৩ বছর না হওয়া পর্যন্ত একটু ধৈর্যের সাহায্যে আর আপনার স্নেহ উজাড় ক'রে ওর সমস্ত আহারের সঙ্গেই ফ্যারেক্স দেবেন।

FAREX

শিশুদের প্রথম শক্ত আহার—সব দিক থেকে দ্রুত বেড়ে ওঠার জন্য

লিনটাস-GF.58-2816 BG

ভোজন বিলাস

উৎপলকুমার বসু

বর্তমানে, বাজারে জিনিসপত্রের যে কী রকম দাম বেড়েছে তা খবরের কাগজ পড়ে জানতে হয় না। আমরা, মধ্যবিত্ত বাঙালীরা, যদি পারিবারিক আলোচনার অর্ধেক সময় রান্নার আলোচনায় ব্যয় করি তবে সে বিলাসিতার জন্য আমাদের দোষ দেওয়া চলে কি? প্রকৃত অর্থে, আজকাল আলোচনার ভিতর দিয়েই যেন আমাদের পানভোজনের আনন্দলাভ হয়। আমি ইউ-রোপীয় সুখাদ্যের বিষয়ে আপনাদের কিছু জানাই—ইচ্ছে হল।

পাশ্চাত্য রান্নার বৈশিষ্ট্য হল মশলা-বর্জন। শুধু এটুকু বলা যথেষ্ট নয়। অতিরিক্ত মশলার ব্যবহার বহু প্রাকৃতিক উপকরণের স্বাদ ও গন্ধ নষ্ট করে। সবুজ তরকারি বাদামী রং নেয়—সাদা মাছের বর্ণ হয়ে দাঁড়ায় গাঢ় হলুদ। চীনা খাদ্যের সঙ্গে যদি আপনার পরিচয় হয়ে থাকে তবে নিশ্চয়ই লক্ষ্য করেছেন যে এ বিষয়ে তারা অতিসচেতন। চীনা আহারের তিন আদর্শ হল—স্বাদ, ঘ্রাণ ও পরিবেশন। অর্থাৎ রান্না সুস্বাদু হওয়া চাই, ঘ্রাণ যেন মনোহরণ করে এবং উপযুক্ত পরিবেশে যেন সে খাদ্য সাজিয়ে দেওয়া হয়। ইউ-রোপীয় রন্ধনবিদ্যারও প্রথম পাঠ হল ঐ তিনটি অধ্যায়।

সপরিবারে, এক টেবিলে, বসে আহার করার রীতি ইউরোপে প্রচলিত। সাদা চাদর বিছানো টেবিলটা যেন ভালোভাবে পাতা হয়, প্লেটগুলি অবশ্যই গরম থাকবে এবং ছুরিকাঁটা গেলাস যেন পরিষ্কার ঝকঝক করে। গৃহিণী যদি রন্ধনাগারে ব্যস্ত থাকেন তবে গৃহকর্তার দায়িত্ব এটি। কী পানীয় দরকার? জল বা মদ। মদ মানে অবশ্য হুইস্কি ব্র্যান্ডি নয়। সাধারণ টেবিল ওয়াইন—ফরাসীতে যাকে বলে ভাঁ অর্দিনেয়ার। শ্বেত চাদরের উপর উজ্জ্বল বাসন, রঙীন ফুল ও রক্তিম মদের সমা-বেশে যে ছবিটি প্রত্যক্ষ হয় তা ক্ষুধা-উদ্রেককারী ও নয়নসুখকর—বলা বাহুল্য।

প্রথম দফায় আসে সুপ। এই উষ্ণ খাদ্যের প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা করার প্রয়োজন নেই। ইউরোপ শীতের দেশ। সেখানে শাক সবজির সুপ বা মাছের ঝোলের সমাদর আছে। মাংস ও সবজি এবং তাদের নির্যাসের সমন্বয় ঘটে এই জোলো পদার্থে। কিন্তু টাটকা পাঁউরুটি টেবিলে থাকে। কেউ খায়। কেউ খায় না। নুন, মাখন ও গোল মরিচের জন্য কেন এ সময় ছুটোছুটি করতে হয়। ইউরোপীয়রা নিঃশব্দে [illegible] বটে কিন্তু আলাপ-আলোচনা ও হাস্য পরিহাসে বাধা নেই। বস্তুত, সুখাদ্য পেটে পড়লে কার না মুখ খোলে।

দ্বিতীয় দফায় আসে মাংস। ভো[illegible] দ্রব্যের সঙ্গে যদি, মাছের সমাদর [illegible] মাছ বেড়াল-কুকুরে খায়—এমন একটা ধারণা প্রায় বদ্ধমূল। তবু, একদা, প্রতি শুক্র[illegible] টেবিলে মাছ পরিবেশিত হতে দেখে [illegible] জানতে পারি ক্যাথলিকরা নাকি ঐ দিন মাংস ছোঁয় না। আপনি যদি মৎস্যপ্রিয় [illegible] হন, তবে পাশ্চাত্যে নিজেকে ক্যাথলিক ঘোষণা করবেন। মাংস সাধারণত [illegible] হয় রোস্ট হিসেবে। অর্থাৎ একটি [illegible] কাবাবের মতো চুল্লীতে, সমভাবে, [illegible] ভেড়া, শুকর বা গরুর মাংসখণ্ড [illegible] সেঁকা হয়। রোস্টের গায়ে যেন [illegible] চর্বি লেগে থাকে। না হলে শুক[illegible] পোড়া রান্নার জন্য গৃহিণীর দু[illegible] রটবে। মুরগি বা ভেড়ার মাংস [illegible] আপনি অকাতরে গ্রহণ করবেন [illegible] মশলাহীন আহারে আপনার আপত্তি [illegible] থাকে। শুকর বা গরু খেতে আম[illegible] দ্বিধা হওয়া স্বাভাবিক। বিদেশে [illegible] কী না খায়—এ রকম একটা দা[illegible] প্ররোচনায় যদি আপনি পথভ্রষ্ট হন দেখবেন প্রত্যেকটি অতি উপাদেয় [illegible] স্টেক নামক ভাজা মাংসখণ্ডটি দেওয়ার আগে কিছু [illegible] ভাবে তৈরী না হলে ওটি [illegible] দেবেন।

দ্বিতীয় দফার অনুপান হি[illegible] সর্বদাই সবজি পরিবেশিত হওয়া দর[illegible] আলুকে [illegible] উৎস[illegible] [illegible] অলঙ্করণের উপর, [illegible] মাখন মেখে, একটু নুনে সাঁতলে [illegible] ছিটে দিয়ে যে বাঁধাকপি পরিবেশিত তার ইউরোপীয় আভিজাত্য আছে। [illegible] সালাড চলতে পারে।

সালাড, [illegible], আ[illegible] দেশে অবহেলিত খাদ্য। পেঁয়াজ, শ[illegible] সহজ হলে টোমাটোর সমন্বয়ে আ[illegible] ভারতীয় সালাড তৈরী হয়। ইউ[illegible] এর প্রকারভেদ প্রায় শিল্প বি[illegible] সবুজ লেটিস পাতা, হলুদ গাজর, বীট, সাদা বাঁধাকপির কুচি ই[illegible] বর্ণময় প্রাচুর্য যেন পাত্রে উপচে উপরে সামান্য কাঁচা তেল—যা [illegible] অলিভ অয়েল—ঢেলে দিয়ে ভালো মিশিয়ে নিতে হয়। ঐ তৈল পদার্থটি বলা হয় ড্রেসিং এবং গৃহিণীর প্রকাশ পায় ড্রেসিং তৈরীতে। [illegible] তেলের সঙ্গে মিশিয়ে নিন অনু[illegible] হার্ব বা সুগন্ধি গুল্ম যেমন পার্সি[illegible]

পত্রিকায় লেখা প্রকাশ হওয়া সম্ভব তা বলে দিতো। বলা বাহুল্য ছিল না। দিবাকর যে অনেক প্রত্যাশা নিয়ে কলকাতা এসেছিলো, অবাককাণ্ড পথে দেখা হলে প্রতিষ্ঠানে আর কথাও বলে না। নাকেন গুহরা, দেবী মজুমদার, তপন, সন্তোষ সরকারের কথা মনে পড়ছে।

এরা সকলেই কবি হওয়ার জন্য এসেছিল, কবি হতে পারেনি না, মনে হয় কবি হতে পারবেও না। ওদের একমাত্র পুঁজি গ্রামজীবন। সেই গ্রামজীবন যেখানে জন্মগত পরিবেশ অনুকূল নয়, জ্ঞানগত পরিবেশ অনুকূল নয়, যেখানে সাহিত্য-গ্রন্থ প্রায় হিরের মতোই দুর্লভ বস্তু। হত কম এদের জানা, অভিজ্ঞতার পরিধি কতো সংকীর্ণ, পুস্তক-পাঠ কী করুণ সীমিত। কলেজে বাংলা সাহিত্যে অনার্স-নির্বাচনী পরীক্ষার অংশ হিসেবে ছাত্র-ছাত্রীদের সঙ্গে অধ্যাপকদের একটা সাক্ষাৎকারের ব্যবস্থা আছে। এইরকম সাক্ষাৎকারে উপস্থিত থেকে জেনেছি শতকরা নিরানব্বই জন ছাত্র 'পথের পাঁচালী' নামক গ্রন্থের নাম শোনেনি। শংকর বন্দ্যোপাধ্যায় নামের একজন লেখক আছেন বটে, কিন্তু তাঁর কোনো উপন্যাসের নামই এরা জানে না। শরৎচন্দ্রের কিছু উপন্যাসের সংগে এরা পরিচিত এবং তাদের সাহিত্য পাঠের সীমা এই পর্যন্তই। কবিদের প্রসঙ্গ উঠছেই না।

তবু কবিতা রচনার আগ্রহ এদের কম নয়। প্রতি বৎসরই কলেজে ছাত্র বদল হয়, প্রতি বৎসরই নতুন নতুন তরুণ তাদের স্বরচিত কবিতা দেখাতে আসে। অধিকাংশ কবিতাই দুঃখজনক অপাঠ্য, ছন্দজ্ঞান শূন্য ভাষাজ্ঞান জড়, বোধবুদ্ধি পঙ্গু। সন্দেহ নেই, জগন্নাথ ঘোষ অথবা মহম্মদ রফিকের মতো সকলে নয়। তবু এদের কবিতার একটা সামান্য লক্ষণ আছে—এরা অধিকাংশ সময়েই তীব্রভাবে সমাজসচেতন, সমাজের অত্যাচার অবিচার এবং অসাম্যের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ মুখর। এরা মনে করে এটাই আসল আধুনিকতা। প্রাতঃস্মরণীয় ব্যক্তিদের নিয়েও এরা কবিতা লিখতে চায়, যেমন প্রকৃতি বর্ণনাও এদের উৎসাহিত করে। কিন্তু তা [illegible] সেকেলে [illegible] রচনা আধুনিক কবিরা শোষণ এবং [illegible] বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র। এই ধরনের সমাজচেতনা [illegible] জন্যে কবিতা লিখতে সাহায্য [illegible] পারতো কিন্তু অধিকাংশ সময়েই এদের ধ্যান-ধারণা কোনো আন্তরিকতার পরিচয় পায় না; একটা শ্লোগান, কিছু প্রগতিশীল কথা উপর থেকে কুড়িয়ে পায়; উপলব্ধির প্রশ্নই ওঠে না, এমনকি আবেগের কোলাহলও তাদের কবিতাকে রঞ্জিত করে না। নায়ক বিদ্রোহীর মতোই তারা সরাসরি [illegible] ধনী মাত্রই অসৎ [illegible] এবং [illegible] এবং গরীব ব্যক্তিমাত্রই [illegible] এবং এই বোধটার জন্মও কোনো [illegible] থেকে নয়, [illegible] এই [illegible] একটি [illegible] এরই এরা আধুনিকতার [illegible] করে।

যদি কম হলেও, দু-একজনের কবিতায় অবশ্য এমন আধুনিকতাও দেখেছি যা পড়ে প্রায় চমকে উঠতে হয়। যৌনতা-বিষয়ে শহরের কবিরা নাকি অনেককাল অনেক খোলামেলা কিন্তু এদের কবিতার সামনে দাঁড়ালে তারা অনেকেই নিজেদের নীতি-বাগীশ ঠাকুমাদের মনে করবেন। বোঝা যায়, কোনো উপায়ে এরা শহরের বিস্ফোরণ-ধর্মী কয়েকটা পত্রিকা পড়ার সুযোগ পেয়েছে এবং এটা তারই প্রতিক্রিয়া। গ্রামের আধুনিকতা শহরের আধুনিকতাকে অনু-করণ করার জন্য মুখিয়ে থাকে এবং যখন অনুকরণ করে দশগুণ চটকদারী করে করে। শহরের মেয়ে যদি তাঁট ইঞ্চি পেট দেখিয়ে খুশী থাকে, গ্রামের আধুনিক মেয়ে বোলো ইঞ্চি দেখাবে। এই উগ্রতা, একেও মেনে নেওয়া যেত, কিন্তু এদের যৌনবোধ নির্ভেজাল যৌনশোষেই থেমে থাকে, কবিতা হয়ে ওঠে না। কবিতা হয়ে ওঠার জন্য যে ভাষার আনুকূল্য, পঠন-পাঠন, শিক্ষার আনুকূল্য প্রয়োজন তা লাভ করার সুযোগ এরা পায়নি।

তবু এই শহরগুলোর, মহকুমার আনাচে কানাচে অনেক সাহিত্য-পত্রিকাও প্রকাশিত হয়। প্রকাশিত হয় এবং বন্ধ হয়ে যায়। তিন-চারটি সংখ্যার বেশি আয়ু বাড়াতে প্রায় কেউই সমর্থ হয় না। সন্তোষ এক সময় 'মনসভা' নামে একটা পত্রিকা প্রকাশ করতো, দেবী মজুমদার এখনো 'কাবেরী' প্রকাশ করে। অদূরপাড়া গ্রামে আর একটি পত্রিকা আছে। এই সব পত্রিকা চলে গ্রামের বিভিন্ন মানুষের অর্থানুকূল্যে। এদের কেউ [illegible] মালিক, কেউ প্রাইমারি স্কুলের প্রধান শিক্ষক, কেউ প্রতিপত্তিশালী চিকিৎসক। বালক বয়সে, প্রথম যৌবনে দু-একটা রবীন্দ্রনাথের কবিতা পড়া ছিল, নজরুলের দু-একটা। তার অবস্থায় বিদ্যালয়ের পত্রিকায় হয়তো ছাপা হয়েছিল তোষামোদ লাইনের একটি কবিতা। তারই অধিকারে তাঁরা দেবার সংগে সংগে একটি সদ্য-রচিত কবিতাও সম্পাদককে [illegible] দেন এবং বলাবাহুল্য সে কবিতা অবশ্যই প্রকাশিত হয়। সেই সমস্ত কবিতায় দেশপ্রেম থাকে, মানুষের জীবনের কথা থাকে, কপটতা-অসাধুতার প্রতি ধিক্কার থাকে, কখনো এমনকি যে-ঈশ্বর জন্ম যোগাতে পারে না তার প্রতি অভিযোগও থাকে। এবং যেটা থাকে না তা কবিতা। তবু এরই পাশাপাশি হঠাৎ চোখে পড়বে সযত্নে প্রচ্ছন্ন নিহিত একটা আকৃতি, একটা প্রচেষ্টা। তা কবিতা হয়ে উঠতে পারেনি, কবিতা হয়ে ওঠার জন্য উন্মুখ হয়ে আছে। ম্লান মুখে ভাষা, এলোমেলো বাঁধুনি, কালের কবিতা-বিষয়ে অনভিজ্ঞতা, শিক্ষাগত অযোগ্যতা। তবু তারই ভিতর নিবিড় নিশ্চিতভাবে উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে দুটো চোখ যা নতুন করে দেখতে শিখেছে এই পৃথিবীকে, একটি মন যার গড়ন অনিবার্যভাবেই একজন কবির। এরা কবি হয়ে উঠতে পারতো, কবি হতে পারবে না—জগন্নাথ ঘোষ, মহম্মদ রফিকের মতো গ্রামের ইস্কুল মাস্টারি করেই এদের জাগ্রত উদাসীন চোখ আস্তে-আস্তে একদিন ঘোলাটে হয়ে আসবে।

সিনেমা

নাগরিক

১৯৫২ সালে নির্মিত একটি ছবি ১৯৭৭ সালে রিলিজ হল। এ কি ভারতীয় চলচ্চিত্রের বিস্ময় রেকর্ড। নিঃসন্দেহে স্বীকার না করার মত। ছাব্বিশ বছরের সেই যুগ-পরিণতি আমরা দেখেছি হাস্যে লাস্যে, তুড়ি মেরে নিশ্চিন্ত শান্তির প্রশ্রয়ে ঘুমিয়ে—এই সেদিন ১৯৭৬ সালে। এ ছবি করার আগে ঋত্বিক ঘটকের তেমন কোন কঠিন সাধ্য-সাধনা, [illegible] ছিল না চলচ্চিত্র মাধ্যমের উপর। ছিল না পরীক্ষা-নিরীক্ষামূলক কাজের অভিজ্ঞতাও। অবশ্য নাটকের অভিজ্ঞতা জন্ম নিয়েছিল। আর মার্কসীয় দর্শনের প্রতি তখনকার প্রগতিবাদী অনেক শিল্পীর মত ঋত্বিকের আস্থা ছিল গভীর। বস্তুতঃ-পক্ষে দৃষ্টিভঙ্গীর অনুরণনে তিনি দেখিয়েছেন কিভাবে পেটি বুর্জোয়ারা ধীরে ধীরে প্রলেতারিয়েত বা সর্বহারা বনে যেতে বাধ্য হয়। এ কি সেই একই সময় যখন বাংলা ছবির নায়কের ডায়ালগ শুনে সক্রেটিস [illegible] পেছনে লুকোচ্ছেন—এ রকম একটি কার্টুন, একেবারেই অতিরঞ্জিত হত না।

সেই একই সময়ে শ্রেণীসংগ্রামকে স্বীকার করে একটি পূর্ণ দৈর্ঘ্যের ছবি নাগরিক। ছবির কেন্দ্রে এক নিম্নমধ্যবিত্ত পরিবার। যারা শীঘ্র অধোগতি [illegible] সর্বস্ব খুইয়ে বস্তিতে বাস করতে যাওয়ার সময় শপথ নেন যে, তাঁরা [illegible] সংগ্রামে নিজেদের উৎসর্গ করবেন।

শুরুতেই খবরের কাগজের উপর টাইটেল আছে। এ রকম মৌলিকতা তখনকার কোন বাংলা ছবিতে দেখি নি। ঋত্বিক অন্ততঃ টাইটেল থেকেই যে ছবির শুরু—এ ব্যাপারটা বুঝতে পেরেছিলেন। এর পর প্রথম সিকোয়েন্সে যদিও একটু, তবুও হঠাৎ শব্দ ফেড ইন এবং ফেড আউট-এর মধ্যে তার মৌলিকতা অনস্বীকার্য। এ ব্যাপারটা পুরো ছবিতে অনেকবার এসেছে এবং বেশীর ভাগ জায়গায়ই উত্তীর্ণ হয়েছে কিছুটা বাড়াবাড়ি করা সত্ত্বেও। এর পরেই কনে দেখার দৃশ্য। যেখানে সীতাকে দেখতে এসেছে পাত্রপক্ষ। সীতা খাবারের প্লেট হাতে ঘরে ঢোকার সময় ইন্সার্ট কাট-এ রামুকে ধরা অসাধারণ। [illegible] চরিত্র অনেকখানিই প্রতীকিত হয় এখানে। তাছাড়া সীতা নামটাও লক্ষ্য করার মত আলিগরিক। এর পর রামু যখন সীতার সঙ্গে কথাবার্তায় লিপ্ত সে সময়কার মন্তাজ ভীষণ বৈশিষ্ট্যপূর্ণ। ভাবতে আশ্চর্য লাগে এত অরিজিন্যালিটি ঐ যুবক বয়সে আয়ত্ত করেছিলেন অত অল্প সময়ে — আমাদের প্রবীণেরা যার ছিটে-ফোঁটা আজ ১৯৭৭-এও বুঝলেন না। বুঝলে বাংলা ছবির পালে একটু হাওয়া খেলত। এর পর একটি প্রেমের সিকোয়েন্স। একজন যুবক এবং একজন যুবতীর সীতা-রামের সম্পর্ক, এত নিষ্ঠার সঙ্গে আজও কোন ছবিতে স্থান পেয়েছে কি? বাংলা ছবির নায়ক-নায়িকারা কি রকম ন্যাকা হয়ে নাকি নাকি কথা কয়ে ১৯৭৭-এও প্রেম চালিয়ে যাচ্ছেন তারপর।

স্বপ্নের ঘোর রামুর এখনও আছে। এরই মধ্যে ধীরে ধীরে রামু জগতের স্বরূপ চিনছে। একটু পরেই এর পরিচয় পাই যখন রামু বলে ওঠে বাবার কথা জানি না। ঐটুকুর মধ্যেই আমরা শুধু রামুর তারুণ্য উপলব্ধি করি। অভিজ্ঞতায় রামু তার বৃদ্ধ বাবাকে ছুঁয়ে ফেলেছে। রামুর তারুণ্য বাজনা শুনে সংগ্রামে নামবার প্রেরণা পায়। এরই পাশাপাশি রাত্রে বিছানায় শুয়ে মার কান্না হঠাৎ টুঁটি চেপে ধরে।

এর পর আবার একটি অসামান্য, বিরলপ্রায় সিকোয়েন্স আছে। রামুর আশা ধোপে টেঁকে নি। চাকরি পায় নি। এর সঙ্গে বাড়িওয়ালার তাগাদা। সীতার অলস নিঃশব্দ দুপুর। কর্মহীন বাবা বাড়ির মধ্যে হঠাৎ খানিকটা ঘুরে বেড়ায়। এর সঙ্গে দূরে থেকে ভেসে আসা একটানা একটি মৃদু যান্ত্রিক শব্দ—একটি খুব সাধারণ চেনা পরিবেশ অসামান্য এক শিল্পীর তুলির এক টানে কি রকম বিষণ্ণ হয়ে দেখা দেয়। এই বিষণ্ণতা, নিরালম্ব কয়েকটি প্রাণীর প্রাণের বিষণ্ণতা। ছোট একটা সিকোয়েন্স-এর মধ্যে এত প্রচণ্ড এক্সপ্রেশন-এর শক্তি এক ঋত্বিক ঘটকেরই আয়ত্তাধীন ছিল। আর কেউ নয়। এক এবং অদ্বিতীয় ঋত্বিক।

নাগরিক ছবির দৃশ্য

সারা ছবিতে এ রকম অসামান্য সিকোয়েন্স অনেক অনেক আছে। হয়ত চরিত্রগুলোর অতিশয়োক্তি বা অতিকথন মাঝে মাঝে অবাস্তব মনে হতে পারে কিন্তু প্রতি চরিত্রের প্রতিটি কথার মধ্যেই একটি বক্তব্য-এর ব্যঞ্জনা আছে। সেই ব্যঞ্জনার স্বরূপটি চিনতে পারলে কিন্তু চরিত্রকে ভাল না বেসে পারা যায় না।

রাজনৈতিক ছবি হিসেবে নাগরিকের ভূমিকা উল্লেখনীয়। আমাদের সর্বংসহা সমাজ ব্যবস্থার প্যানপ্যানে ভূতে তাড়িয়ে ২৫ বছর আগে এ রকম সংগ্রামী চলচ্চিত্র তৈরী হয়েছিল যার দোসর আজও জন্মাল না।

ঋত্বিক ঘটকের সঙ্গে আরও যে দুজন ছবির বৈশিষ্ট্যের জন্য বিশেষ দাবী জানাতে পারেন তাঁরা হলেন ক্যামেরাম্যান শ্রীরামানন্দ সেনগুপ্ত এবং এডিটর শ্রীরমেশ যোশী। (একজন ভাল পরিচালক (যার মিডিয়াম এর উপর দখল আছে) সাধারণ একজন টেকনিসিয়ানকে দিয়েও ভাল কাজ দেখাতে পারেন তবুও রামানন্দবাবুর অপারেশন এবং ইনডোর-এর কাজ ভীষণ ভাল। ছবির সেটিংও বিশেষ বৈশিষ্ট্যপূর্ণ। অভিনয়াংশে মোটামুটি।

সুদর্শন বসু

এই অভিযোগ এই ছেচল্লিশ বছর পরে আমাদের কলকাতার যে কোন তরুণ পরিচালক করতে পারেন। করেন না কেন বুঝি না। এখানে ছবি তৈরীর প্রধান প্রথম ও শেষ প্রি-কণ্ডিশানই হল ছবিকে লাগিয়ে দেওয়া।

সব পরিচালকেরই ছবি করার উদ্দেশ্য ব্যবসায়িক সাফল্য লাভ নয়, হতে পারে না, হওয়া উচিত নয়। কারণ এখনও কেউ কেউ বলার সাহস রাখেন—আমি বিশ্বাস করি না যে, আমার কোন শিল্পকর্ম করার অধিকার আছে, যদি না আমার দেশের সংকটকে কোন-না-কোন দিক থেকে উদ্ঘাটিত করে তুলতে পারি...., কিন্তু এঁদের জন্য এই কলকাতায় টাকা নিয়ে কেউ এগিয়ে আসছে না, আসেও নি।

একে বাংলা ছবির তো এখন যাই তখন যাই অবস্থা। উপরন্তু পুরনো প্রযোজকরাও প্রায় হাত গুটিয়ে বসে আছেন। অরোরা ফিল্ম কর্পোরেশন প্রায় উঠেই গেল, ছায়াবাণী বছরে একখানা ছবি করেই ক্ষান্ত। অসিত চৌধুরীও এখন বাজারের হালচাল দেখে নিরাপদ জায়গায় টাকা খাটাচ্ছেন, অন্যত্র নয়। মিতালী ফিল্ম বা চণ্ডীমাতা কোনদিনই কোন দুঃসাহসী তরুণের কাছে টাকা নিয়ে এগিয়ে যান নি, সুতরাং ওঁদের কাছে আমাদের কোন আশা নেই। চিত্রলিপি ফিল্মও এখন টিঁকে থাকার যুদ্ধে ব্যস্ত।

বাংলা ছবির তথাকথিত প্রতিষ্ঠ প্রযোজকদের অবস্থা যখন এ রকম তখন মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রাগৈতিহাসিক বা পুতুল নাচের ইতিকথাকে কোন তরুণ আর সেলুলয়েডে তোলার কথা ভাববে?

এখন তাই টালিগঞ্জ পাড়ায় কিছু নতুন ফুলের বাহার লক্ষ্য করা যাচ্ছে। যাঁরা তৈরী করতে আসছেন একমাত্র অর্থ-লোভী কিছু ব্যবসায়ী। লোহালক্কড়, সেক্স বা চিট ফাণ্ডের ব্যবসা করে কিছু কাঁচা পয়সা হাতে নিয়ে আগরওয়ালা-চনচনিয়া-কেজরিয়া প্রমুখ মুৎসুদ্দীদের আনাগোনা চলছে। এঁদের চিন্তায় ফিল্ম নেই, ফিল্ম কি বস্তু সে চিন্তা এঁদের বুদ্ধির বাইরে। শিল্প সৌষ্ঠব তো দূরের কথা, এঁরা শুধু বোঝেন জাল বাক্সের টাকা কামানোর ফন্দী।

সুতরাং প্রগতিশীল চিন্তায় পুষ্ট সৎ ছবি করায় এঁদের অ্যালার্জি। বাঁধাধরা পেটেন্ট মিকচার গিলতে এঁদের আপত্তি নেই। কিন্তু রোগটা যে মিকচার দিয়ে সারান যাবে না, স্পেশালিস্টের দরকার তা এঁরা বুঝতে রাজী নন।

আগেই তো বললাম যাঁরা কিঞ্চিৎ বুঝতে চেষ্টা করতেন তাঁরা এখন হুণ্ডি-ওয়ালাদের খপ্পরে পড়ে নিজেদের প্রাণ বাঁচাতে ব্যস্ত। এতদিন ব্যবসায়ে বাঙালীর দুটি মাত্র জায়গা ছিল—বই আর ফিল্ম। কোম্পানী বঙ্গপুঙ্গবরা এখন শুধু বই আঁকড়েই আছেন। ফিল্মে তাঁদের স্থান নেই। একমাত্র আগরওয়ালা-চনচনিয়া-কেজরিয়াদের চাটুবৃত্তি করা ছাড়া।

সুতরাং বাংলা ছবির অবস্থা দিনে দিনে আরও খারাপ হবে। ব্যবসাও করতে পারবে না সৎ শিল্পসৃষ্টির চেষ্টা তো হবেই না।

প্রতিষ্ঠ বাঙালী ফিল্ম প্রতিষ্ঠান-গুলোর এই করুণা উদ্রেককারী হাল হবার কারণ অবশ্যই তাঁদের অতিরিক্ত অর্থ-গৃধ্নুতা। দোষারোপ করে কোন লাভ নেই জানি, কিন্তু করণীয়ই বা আছে কি নিজেকে গালাগালি দেওয়া ছাড়া। যে কলকাতায় ক বছর আগেও বছরে অন্ততঃ ৫।৬ খানি শিল্পগুণান্বিত ছবির দেখা মিলত, আজ সেখানে ভিড় জমেছে অজস্র 'মা-বাবা-ঠাকুর' ভক্তদের। বম বম করে চলছে মুৎসুদ্দীদের বেওসা।

প্রযোজকরাই যেখানে চরিত্র-হীন, কোন মানবিক বোধ যাঁদের নেই সেখানে নতুন কোন আশার আলো মরীচিকা মাত্র। তার চাইতে বরং একটা প্রস্তাব রাখি—

অরোরা - ছায়াবাণী - চিত্রলিপি - চণ্ডীমাতা - মিতালী একযোগে প্রতিজ্ঞা করুন বাংলা ভাষায় অবাংলা ছবি করবো বা অবাংলা ভাষায় বাংলা ছবি করব। এই ফর্মুলাই এখন চলছে সারা ভারতে। কারণ এখানে তো ছবির উৎপাদন পুঁজিপতিদের অর্থ দ্বারাই নিয়ন্ত্রিত।

নির্মল ধর

চলচ্চিত্র ও সাহিত্য

কোনো গল্প বা উপন্যাস রয়েছে তার সাহিত্যের নিজস্ব ধর্ম অনুযায়ী; সেখানে তার পরিবেশ, সংলাপ ইত্যাদি সবকিছুই সাহিত্যের মানদণ্ডে দাঁড়িয়ে। এদিক দিয়ে চলচ্চিত্রেরও একটা নিজস্ব ভাষা আছে। চিত্রনাট্য, সংলাপ, সম্পাদনা, সঙ্গীত ইত্যাদির উপর সে ভাষা দাঁড়িয়ে আছে। গল্পে সে ঘটনা, দৃশ্য বা উপাদান বর্ণনা মারফত ফিল্মে তাকে সব সময় সেইভাবে মেনে নেওয়া যায় না। কেননা সাহিত্যে যতখানি পাতা, ফিল্মে ততখানি দৃশ্য। ফিল্মের সংলাপ আর গল্প উপন্যাসের সংলাপ এক হতে পারে না। ফিল্মের প্রতীকী ব্যবহার সাহিত্যের মাধ্যমগুলো থেকে অনেক আলাদা।

তাই সিনেমা কখনোই সাহিত্য নয়। এবার হয়তো প্রশ্ন আসবে, এটা কি কোনো নতুন কথা? না, কথাটা ভারি মামুলি। কিন্তু মজা হচ্ছে, এই জানা সত্যটাকে আমরা, আমরা দর্শক কি পরিচালক কেউই সোজাসুজি স্বীকার করতে চাই না। আজকের ছবিগুলোর দিকে তাকালেই এর প্রমাণ পাওয়া যায়। এর ফলও হচ্ছে তেমনি। মানিক, সেই মান্ধাতার আমল থেকে আজো অবধি ছবির গায়ে সাহিত্যে গন্ধ এমনভাবে লেপটে আছে যে তা ছবিকে কোন নিজস্ব চরিত্রে আসতে দিচ্ছে না। যেন নিটোল নিখাদ গল্প বলাই যেন ছবির ধর্ম।

কিন্তু চলচ্চিত্রের প্রথম কথা সে চলচ্চিত্র। এবং তা কিছু প্রক্ষিপ্ত ঘটনার সমষ্টিমাত্র। যদি কোন সময় সেটা গল্পের দানা বাঁধে তো বাঁধুক।

কয়েকটি উদাহরণ রাখলে ব্যাপারটা আরো পরিষ্কার হয়ে যায়। কুরোসাওয়ার

অমৃত

১৭ বর্ষ
২৫ সংখ্যা
১৮ কার্তিক
১৩৮৪
4 NOV. 1977

আগামী সংখ্যায়

প্রচ্ছন্ন কাহিনী
সেকালের রেস একালে
লিখেছেন
নারায়ণ দত্ত
দেবাশিষ বন্দ্যোপাধ্যায়

সাইবার গাড়ী
লিখেছেন
মিহির গঙ্গোপাধ্যায়

গল্প লিখেছেন
মনোজিৎ মিত্র
সমীরকান্তি বিশ্বাস

এ সংখ্যায় প্রচ্ছদ এঁকেছেন গৌতম রায়
ভিতরের অলংকরণ করেছেন
সুবোধ দাশগুপ্ত, অনুপ রায় এবং
প্রশান্ত মাইতি

উৎসবের শেষে

বিজয়ার প্রীতি নমস্কার গ্রহণ করুন।
এবার পুজোর কদিন বৃষ্টি হয়নি। তাছাড়া ইদানীং যা প্রায় দৈনন্দিন দুঃস্বপ্ন হয়ে উঠেছিল সেই বিদ্যুৎ ছাঁটাইয়ের পীড়ন থেকেও রেহাই পাওয়া গিয়েছে কদিন। ফলে গোটা কলকাতা শহরই যেন রাস্তায় নেমে পড়েছিল।

এ এক আশ্চর্য ব্যাপার এই বাংলাদেশে, উৎসবের নামে বাঙালি সব বাধা কাটিয়ে উঠতে পারে। অভাবের তাড়না তো প্রতিদিনের সঙ্গী। তাছাড়া বাজারও নিরন্তর ঊর্ধ্বমুখী। কিন্তু তা সত্ত্বেও আনন্দের ভাগে কিছু কম পড়েনি। প্রত্যেকে তার নিজের গণ্ডি কাটিয়ে অন্যের সঙ্গে এক হয়ে একটি সর্বজনীন আনন্দের পরিবেশ রচনা করে নিয়েছে। আত্ম-অতিক্রমণের এই ক্ষমতা বাঙালি চরিত্রের এক বিশেষ গুণ। বাংলার বাইরেও বাঙালির দুর্গোৎসব অনুষ্ঠানগুলি এই কারণেই একটি সর্বজনীন চেহারা নিতে শুরু করেছে। এবং বাঙালির আঞ্চলিক উৎসব ক্রমেই যেন উন্নীত হচ্ছে জাতীয় উৎসবের পর্যায়ে।

কলকাতাতেও বিভিন্ন রাজ্যের অধিবাসীরা, এমন কি অন্য ধর্মের মানুষও, শারদীয় উৎসবের প্রাঙ্গণগুলিতে যথেষ্ট সংখ্যাতেই এসে থাকেন। মানুষের সংসারে মানুষই মানুষের শেষ আশ্রয়। যে উৎসব লক্ষ লক্ষ মানুষকে একত্র করে, তার চুম্বক শক্তির প্রভাবকে কোনো ব্যক্তিই অস্বীকার করতে পারেন না। এবং অন্য অনেক কিছুর মত এ বিষয়েও আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন প্রথম রবীন্দ্রনাথই। বাঙালির এই জাতীয় উৎসবের সঞ্জীবনী ক্ষমতাকে তিনি শ্রদ্ধা জানিয়েছেন।

এ কথা অবশ্য ঠিকই যে, উৎসব প্রতিদিনের ঘটনা নয় বলেই এত মাধুর্যময়। আলোকসজ্জায় এই অপরূপ মোহময় রাত্রিগুলির পরই হয়তো দেখা দেবে খামখেয়ালী বিদ্যুৎ ছাঁটাইয়ের পর্যায়ক্রমিক বিভীষিকা। হয়তো নিত্য-প্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের দামও চট করে আমাদের আয়ত্তের মধ্যে আসবে না। কিন্তু উৎসব তার শুশ্রূষার স্পর্শে আমাদের ক্লান্ত মনকে ইতিমধ্যে সঞ্জীবিত করে তুলেছে। তাই নিশ্চয়ই আমরা অনেক বেশি পরিমাণে আশাবাদী হতে পারব এবং ভবিষ্যতের প্রতি ভরসা রাখব।

এটাও তো কম নয়।

[illegible] প্রকাশ [illegible]
[illegible]

[illegible] জীবন প্রীতি আলোচনায় প্রসঙ্গে বিবেকী বলেছিলেন, দূরবীক্ষণ, বিজ্ঞান ছোট জিনিসকে বড় করে দেখবার যন্ত্র আবিষ্কার করেছে, কিন্তু বিদ্যাসাগরের জীবন এমন একটি অণুবীক্ষণ যন্ত্র পাশে যে কোন বড় জিনিস রাখলে ছোট দেখায়। সেই একই ভঙ্গিতে রামকৃষ্ণের জীবন ও অধ্যাত্ম সাধনা সম্পর্কে বলা যায় তাঁর জীবন এমনই এক বিস্ময়কর ব্যাপার যে সাধারণ কার্য-কারণ নিয়মের সাহায্যে তার ব্যাখ্যা হয় না এবং তাঁর সাধনা এমন এক স্তরে উত্তীর্ণ হয় পাশে পৃথিবীর যে কোন সম্প্রদায়ের ধর্ম ও আধ্যাত্মিকতা অর্থপূর্ণ হয়ে ধরা দেয়।

আঠার বছর বয়সে গদাধর দক্ষিণেশ্বরে এসেছিলেন। তাঁর বিস্ময়কর জীবনের ষোল বছর কেটেছিল কামারপুকুরে। সেই সময়ের খুটিকয়েক ঘটনা এখানে উল্লেখ করা হবে তাঁর পরবর্তী জীবনের সূত্র ধরার জন্য।

সংস্কারমুক্তিমক ধারা লক্ষ্য করলে দেখা যায় জন্ম থেকেই গদাধরের মধ্যে ধর্মভাব স্বাভাবিক। সংরক্ষণশীল, নৈষ্ঠিক ব্রাহ্মণ পরিবারে গদাধরের জন্ম। বাবা ক্ষুদিরাম চট্টোপাধ্যায় একজন সত্যনিষ্ঠ, ন্যায়পরায়ণ, ধর্মপ্রাণ মানুষ। সত্যের কথা অনেকে বলেন, কিন্তু সত্যের জন্য ত্যাগ স্বীকার করতে কজন রাজী থাকেন? ক্ষুদিরাম চট্টোপাধ্যায়ের নৈষ্ঠিক জীবন সত্যনিষ্ঠার এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। মিথ্যা সাক্ষী দিতে রাজী না হওয়ায় নিজের বাস্তুভিটা ছেড়ে স্ত্রী, পুত্র, কন্যার হাত ধরে তাঁকে একদিন অনিশ্চিতের পথে পা দিতে হয়েছিল। আদর্শ-নিষ্ঠ ব্যক্তিদের জীবনের প্রধান বৈশিষ্ট্য হল তাঁরা ঐ আদর্শকে বাস্তবে রূপায়িত করতে চান। সাধারণ হিসাবী মন আদর্শের কথা বলেন ঠিক, অবসর সময়ে ঐ সম্পর্কে তাঁরা আলোচনাও করেন, কিন্তু তাঁরা ভুলে যান জীবন

[illegible] জীবন-আদর্শ। আদর্শের কথা নিজের জীবন দিয়ে তা প্রমাণ করে গেলেন। ক্ষুদিরাম চট্টোপাধ্যায়ের ব্যক্তিনিষ্ঠা কোন কল্পকথা নয়, বাস্তব জগতের এক সত্যনিষ্ঠ প্রমাণ।

গদাধরের মা চন্দ্রাদেবী একজন ধর্মপরায়ণা মহিলা ছিলেন। সত্যধর্ম পালন ছিল তাঁর জীবনের মুখ্য সাধনা। অনেকের চেয়ে তিনি একটু বেশি ভাব-প্রবণ ছিলেন। সরল বিশ্বাসী এই মহিলার জীবন নানা বিচিত্র অভিজ্ঞতায় ভরা। গদাধরের জন্মের আগে গর্ভধারণ কাল থেকেই তিনি নানা অলৌকিক ঘটনা দেখতে থাকেন। নিজেরই বিছানায় একদিন তিনি দিব্য-দেহধারী এক ব্যক্তিকে শায়িত অবস্থায় দেখেন, আর একদিন তাঁর বাড়ির কাছের শিবমন্দিরে মহাদেবের শরীর থেকে দিব্য জ্যোতি বেরিয়ে মন্দির ভরে যেতে দেখেন। তিনি অনুভব করলেন ঐ জ্যোতি তরঙ্গাকারে তাঁর দিকে ছুটে এসে তাঁর সারা দেহকে আচ্ছন্ন করে ফেলছে। মহাপুরুষের জন্মের আগে ঐ ধরনের ঘটনার অনেক দৃষ্টান্ত পুরাণ, ইতিহাসে পাওয়া যায়। অবতার শ্রেষ্ঠ শ্রীরামচন্দ্র, শ্রীকৃষ্ণ ভগবান স্বয়ং, ভগবান বুদ্ধ, আচার্য শংকর, চৈতন্য মহাপ্রভু, ধর্মাবতার যীশু, প্রভৃতি লোকোত্তর মহাপুরুষের জন্মের সঙ্গে বহু অলৌকিক ঘটনা জড়িত আছে। উপমা প্রমাণের প্রশ্ন না তুলে প্রসঙ্গত তথ্যের দিক থেকে গদাধরের জন্মের সঙ্গে জড়িত আর একটি ঘটনা এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে। গদাধরের বাবা ক্ষুদিরাম চট্টোপাধ্যায়ের কথা আমরা আগেই বলেছি। কামারপুকুরে চন্দ্রাদেবীর অলৌকিক দর্শন সময়ে তিনি গয়ায় গিয়েছিলেন পিতৃপুরুষদের উদ্দেশে পিণ্ডদান করার জন্য। সেখানে তিনি তাঁদের কুলদেবতা রঘুবীরের কৃপায় এক অপূর্ব স্বপ্ন দেখলেন, যার মূল কথা হল তাঁদের

[illegible]

[illegible] কি আমরা সবাই করতে পারি না? তা হলে সাধারণের জীবন থেকে অসাধারণের জীবনের স্বাতন্ত্র্য কোথায়? কেনই বা কোন জীবনকে আমরা অসাধারণ বা অলৌকিকরূপে ব্যাখ্যা দিই? উত্তরে বলা যায় লৌকিক দৃষ্টিতে যা সাধারণ নয়, তাকেই আমরা অসাধারণ বা অলৌকিক বলি। এখন সাধারণ লোক কি চায়? তারা চায় ধন, মান, যশ, লৌকিক জীবনে প্রতিষ্ঠা, বৈষয়িক আনন্দ লাভ তাদের জীবনের কাম্য। ফলে রুচি ও পরিবেশ ভেদে সাধারণ লোকের দুজনের মধ্যে যে পার্থক্য তা পরিমাণগত দিক থেকে ব্যাখ্যা করা যায়। সেখানে গুণগত কোন ভেদ নেই। কিন্তু খুব ছেলেবেলা থেকেই গদাধরের জীবন স্বতন্ত্র। তাঁর আচার, ব্যবহার, মানসিকতা, জীবনের লক্ষ্য সবই যেন সাধারণের থেকে বিপরীত। অল্প বয়সেই গদাধর বাবা-মাকে হারান। এক গভীর শূন্যতা যেন তাঁকে পেয়ে বসে। 'মধুই মোড়ল' ও 'ভূতির খালের শ্মশান,' বাড়ি থেকে দূরে মানিক রাজার আমের বাগান ইত্যাদি জনশূন্য জায়গায় নিঃসঙ্গ ঘুরে বেড়ান, ঐ সময় তাঁর খুবই প্রিয় ছিল। বালক গদাধর তখন থেকেই চিন্তাশীল ও নির্জনতাপ্রিয় ছিলেন। তাঁর জীবনে আত্ম-নকলের বিচার তখন থেকে আরম্ভ হয়েছে।

গদাধরের সাত-আট বছর বয়সেই বিষ্ণু উপাসক, শিবভক্ত, ধর্ম পুরুষ—

শ্রীগদাধর চট্টোপাধ্যায়

শ্রীরামকৃষ্ণের [illegible]

[illegible] করে। দুয়ের মেলবন্ধেই তিনি সব কথা বলেছেন।

সতের বছর বয়সে গদাধরের সন্ন্যাস জন্য প্রস্তুত হন। তাঁর চিত্তপট তখন তৈরী। দুয়ের কল্যাণকামী মুনিঋষিদের প্রেরণায় তিনি সর্বত্যাগের সাধনার পথে পা বাড়ালেন। কলকাতায় জাহ্নবীতীরে দক্ষিণেশ্বরে তাঁর সাধনার বেদী প্রস্তুতির পথে। আসল পর্বের পক্ষে গদাধরের মানসিক প্রস্তুতি-পর্ব শেষ, কামারপুকুরের লীলাখেলা সাঙ্গ করে গদাধর কলকাতায় এলেন।

সাধক রামকৃষ্ণ—দক্ষিণেশ্বর

কামারপুকুরের বাল্যলীলা শেষ করে গদাধর কলকাতায় এলেন। তখন তাঁর বয়স সতের। গদাধরের বড় ভাই রামকুমার চট্টোপাধ্যায় শাস্ত্র পাঠ ও টোল চালাবার জন্য তাঁকে কলকাতায় আনেন। ঝামাপুকুরের দিগম্বর মিত্রের বাড়ির কাছে রামকুমারের টোল, সেখানে স্মৃতিশাস্ত্র ও জ্যোতিষ পড়ান হত। টোলের ছোটখাট কাজ সেরে আশ-পাশের সম্ভ্রান্ত পরিবারে দেবসেবা করতেন গদাধর। ঝামাপুকুর অঞ্চলের সম্ভ্রান্ত বাড়ির মেয়েরা গদাধরের মধুর ব্যবহার ও ভজন গান শুনে মুগ্ধ হতেন। ফলে, কামারপুকুরের মত ঝামাপুকুরেও গদাধর পরম আনন্দে দিন কাটাতে লাগলেন। শাস্ত্র পাঠের দিকে গদাধরের কোন আগ্রহ নেই দেখে জ্যেষ্ঠ রামকুমার একদিন তাঁকে মৃদু ভর্ৎসনা করলেন। সরল গদাধর সহজভাবে সেদিন তাঁর মনের কথা বলে ফেললেন। অর্থকরী বিদ্যার প্রতি তাঁর সামান্যতম মোহ নেই। দু দিনের ভোগ-লালসা ও প্রতিষ্ঠার জন্য সংসারী লোকদের আজীবন পরিশ্রম যে কত তুচ্ছ ব্যাপার, সে কথা অতি অল্প বয়সেই গদাধর বুঝেছিলেন এবং রামকুমারকে সেদিন তাই-ই বলেছিলেন। কিন্তু গদাধরের মনের কথা শাস্ত্রজ্ঞ রামকুমার সেদিন ধরতে পারেন নি।

রামকুমার ও রামকৃষ্ণ দুজনেরই জীবনে একটা বড় পরিবর্তন দেখা দিল। কলকাতার দক্ষিণ অংশে জানবাজারে রানী রাসমণির বাস। ১২৬২, ১৮ জ্যৈষ্ঠ স্নানযাত্রার দিনে রানী রাসমণির সংকল্প অনুযায়ী গঙ্গার পূর্ব কূলে দক্ষিণেশ্বরে * শ্রীশ্রীভবতারিণীর বিগ্রহ মন্দির প্রতিষ্ঠিত হয়। কান্যকুব্জ, বারাণসী, শ্রীহট্ট, চট্টগ্রাম, উড়িষ্যার পণ্ডিত প্রধান অঞ্চল থেকে বহু খ্যাতনামা পণ্ডিত সেদিন দক্ষিণেশ্বরে আমন্ত্রিত হন এবং ঐ বিগ্রহ-প্রতিষ্ঠা অনুষ্ঠানে অংশ গ্রহণ করেন। শাস্ত্রীয় বিধি অনুসারে বিগ্রহ প্রতিষ্ঠার অনুষ্ঠানিক ব্যাপার পরিচালনা করেন, [illegible] দেবী ভক্ত রামকুমার চট্টোপাধ্যায়। দেবালয় প্রতিষ্ঠা উপলক্ষে রানী রাসমণি বহু লক্ষ মুদ্রা ব্যয় করেন এবং তাঁর একান্ত ইচ্ছা এবং মথুরবাবুর বিশেষ অনুরোধে রামকুমার কালিকা দেবীর পূজকের পদে নিযুক্ত হন।

সেদিনের অনুষ্ঠান ও আনন্দোৎসবে গদাধর প্রাণ খুলে যোগ দেন, কিন্তু খাওয়া-দাওয়া সম্পর্কে তাঁর বাদ-বিচার থাকায় সেদিন তিনি কিছু খান নি। বাজার থেকে এক পয়সার মুড়ি-মুড়কি কিনে খেয়ে দক্ষিণেশ্বর থেকে পায়ে হেঁটে ঝামাপুকুর চতুষ্পাঠীতে যান। পর দিন খুব সকালে গদাধর দক্ষিণেশ্বরে যান এবং সমস্ত অনুষ্ঠানে যোগ দিয়ে আবার ঝামাপুকুরে ফিরে যান। ঐ সময় গদাধরের মনে একটা দ্বন্দ্ব দেখা দেয়। একদিকে তাঁর বাবার আচরণ-অনুগত ব্যক্তিত্ব ও অপ্রতিগ্রাহিত্ব, অন্যদিকে তাঁর বড় ভাই শাস্ত্রজ্ঞ রামকুমারের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত মন্দিরের পূজারীর কাজ নেওয়া। তিনি তাঁর বাবার আচরণ বড় ভাইকে স্মরণ করিয়ে তাঁকে পূজারীর পদ ছেড়ে দিতে বলেন। রামকুমার তাঁর ঐ পদ গ্রহণের স্বপক্ষে শাস্ত্রের অনুশাসন ও যুক্তি দেখিয়ে রামকৃষ্ণকে বোঝাবার চেষ্টা করলেন। কিন্তু রামকৃষ্ণের মনে কিছুতেই ঐ সব কথা দাগ দিল না। শেষে ধর্মপত্রে প্রকাশিত—'রামকুমার পূজকের পদ গ্রহণে স্বীকৃত হইয়া নিন্দিত কর্ম করেন নাই',—ফতোয়া দেখে রামকৃষ্ণ কিছুটা আশ্বস্ত হলেন। রামকৃষ্ণ সেদিন দক্ষিণেশ্বরে এসে থেকে গেলেন। কিন্তু মুশকিল হল তাঁর খাওয়া নিয়ে। দক্ষিণেশ্বরের মন্দিরের প্রসাদ খেতেও তিনি রাজী হলেন না। অন্য উপায় না দেখে রামকুমার গদাধরকে 'সিধা' নিয়ে গঙ্গাতীরে স্বপাকে ভোজন করতে বললেন। গঙ্গা দেবীর প্রতি রামকৃষ্ণের ভক্তি তাঁর আহার-সম্পর্কিত বিধি-নিষেধ অনেকখানি শিথিল করল। গঙ্গাতীরে স্বপাকে খেয়ে দক্ষিণেশ্বরে তিনি দিন কাটাতে লাগলেন। এখানে প্রশ্ন,—আহার সম্পর্কে রামকৃষ্ণের
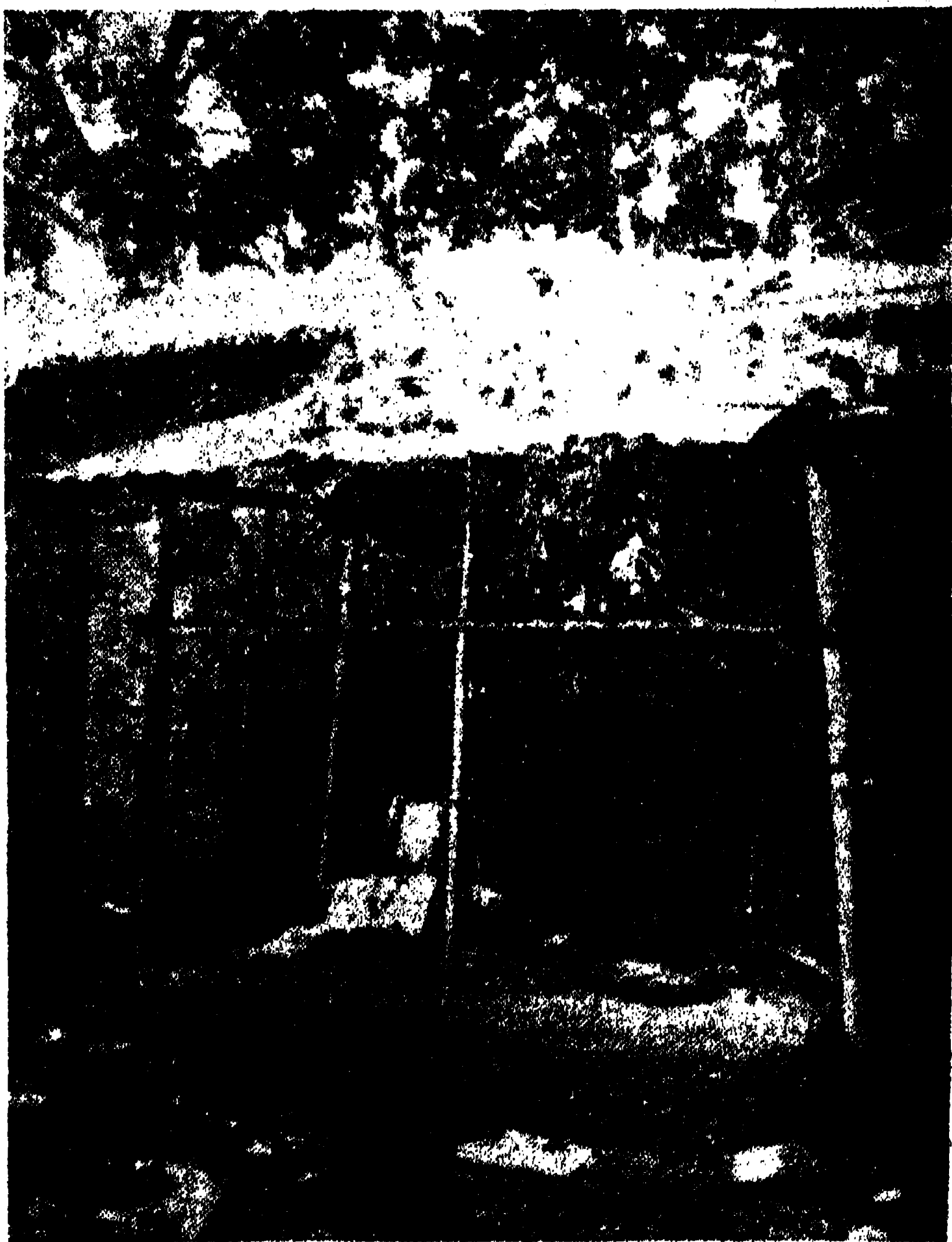
---

* দক্ষিণেশ্বরে যে জায়গাটি বিগ্রহ প্রতিষ্ঠার জন্য রানী রাসমণি ঠিক করেন তার কিছুটা অংশ একজন সাহেবের আর কিছু অংশ মুসলমানদের কবরখানা ও গাজী সাহেবের পীরের জায়গা ছিল। স্থানটির আকার কূর্ম পৃষ্ঠের মত। সাধনার পক্ষে কূর্ম পৃষ্ঠের স্থানে শক্তি প্রতিষ্ঠা [illegible]

আত্মিক নিষ্ঠা কি তাঁর অনুরাগের মনোভাবের পরিচায়ক নয়? উত্তরে বলা যায়, না। কারণ অনুরাগ আসে অহংকার থেকে, আর নিষ্ঠার উৎস হল আস্তিক্য। শাস্ত্র ও মহাপুরুষের অনুশাসনের প্রতি বিশ্বাস। অতএব, নিষ্ঠা ও অনুরাগ, — প্রথমটি যত বাড়তে থাকে, অপরটি ততই কমতে থাকে, এবং পরিণামে অহংকার দূর হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে অনুরাগও লোপ পায়। শাস্ত্র নির্দেশের প্রতি নিষ্ঠা রেখে আমরা যদি আধ্যাত্মিক অনুশীলন [illegible] করতে এগোই তাহলে যথার্থ উপলব্ধির অধিকারী হয়ে আমরা যথার্থ শান্তি লাভ করতে পারি। ঠাকুর নিজেই [illegible] নিষ্ঠাকে অবলম্বন করে সাধনার উচ্চতায় পৌঁছিতে হয়। শাস্ত্র নিয়ম অনুসরণ করেই সাধনা-পন্থ, নিয়মাতীত অবস্থা লাভ করতে হয়। রামকৃষ্ণ সব সময়েই [illegible] আচরণ সম্পর্কে সজাগ থাকতেন এবং সত্য লাভের চেষ্টা করতেন।

রামকৃষ্ণের সাধক জীবনে নতুন অধ্যায় দেখা দিল। মন্দির প্রতিষ্ঠার অল্প দিনের মধ্যেই রানী রাসমণির জামাতা মথুরবাবু রামকৃষ্ণের মনে ভক্তি, নিষ্ঠা ও চারিত্রিক দৃঢ়তা দেখে আকৃষ্ট হন। রামকৃষ্ণের ব্যবহারিক জীবনে মথুরবাবুর অবদান অবিস্মরণীয়।

আহার, বিহার, সব বিষয়ে উদাসীন, নিঃস্বার্থ ভাবুক রামকৃষ্ণের জীবনে মথুরবাবুর মত আর একজন স্নেহপরায়ণ সহযোগী, উদ্যমী মানুষ নিতান্ত প্রয়োজন [illegible] পূর্ণ করল ঠাকুরের নিজের ভাগ্নে হৃদয়রাম মুখোপাধ্যায়, তিনিও ঠিক ঐ সময়ে কাজের জন্য দক্ষিণেশ্বরে এসে হাজির হন। রামকৃষ্ণের প্রতি হৃদয়রাম এক অনির্বচনীয় আকর্ষণ বোধ করতেন এবং ছায়ার মত সব সময় তাঁর সঙ্গে থাকতেন। কোন রকম গুরুত্বপূর্ণ কাজের দায়িত্ব না নিয়ে স্বচ্ছন্দে দক্ষিণেশ্বরে রামকৃষ্ণের দিন কাটতে লাগল। কামারপুকুরের প্রতি আকর্ষণ ধীরে ধীরে তাঁর কমে গেল।

একমাত্র পূজা-অর্চনা, ধ্যান, ধারণা ছাড়া অন্য যে কোন কাজের দিকে রামকৃষ্ণের প্রবল অনিচ্ছা ছিল। মথুরবাবু তাঁকে দক্ষিণেশ্বরে কোন দায়িত্বপূর্ণ কাজে নিয়োগ করতে পারেন, এ-আশংকায় রামকৃষ্ণ যথাসম্ভব মথুরবাবুকে এড়িয়ে চলতেন। একদিন মথুরবাবু কালী মন্দির দেখা-শুনো করতে এসে ঠাকুরকে ডাকিয়ে দেবীর বেশকারীর পদ ও হৃদয়রামকে তাঁদের সহকারীর কাজ করতে অনুরোধ জানালেন। হৃদয়রামকে সহকারী হিসেবে পেয়ে রামকৃষ্ণ ঐ কাজ করতে রাজি হলেন। দেবালয় প্রতিষ্ঠার তিন মাসের মধ্যে এ সব ঘটনা ঘটল। কিন্তু ঐ সময়ের একটা ঘটনা রামকৃষ্ণের বিচার ও সাধক জীবনের পক্ষে বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ঘটনাটি ঘটে ১২৬২র ভাদ্র মাসে। তখন ক্ষেত্রনাথ চট্টোপাধ্যায় ছিলেন দক্ষিণেশ্বরে রাধাগোবিন্দজী মন্দিরের পূজারী। জন্মাষ্টমীর পরদিন নন্দোৎসব। রাধাগোবিন্দজীর বিশেষ পূজা ও ভোগ শেষ হলে পূজারী ক্ষেত্রনাথ গোবিন্দজীকে শুইয়ে দিতে যাওয়ার সময় হঠাৎ পড়ে যেয়েন এবং বিগ্রহের একটি পা ভেঙে গেল। রানী পণ্ডিতদের মতামত নেওয়া হল, তাঁরা বিধান দিলেন ভগ্ন বিগ্রহ বিসর্জন দিয়ে নতুন বিগ্রহ প্রতিষ্ঠার কথা সকলেই বললেন, কারণ, ভাঙা বিগ্রহে দেবতার পূজা সিদ্ধ হয় না। রামকৃষ্ণ কিন্তু ঐ সম্পর্কে ভিন্ন মত দিলেন। ভগ্ন বিগ্রহটি সুন্দরভাবে মেরামত করে তিনি ঐ বিগ্রহটিকেই পূজার নির্দেশ দিলেন। প্রশ্ন,—রামকৃষ্ণ সেখানে ভিন্ন মত দিলেন কেন? বরানগরের জমিদার জয়নারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায়কে রামকৃষ্ণ এ প্রশ্নের জবাব দিয়েছিলেন। বরানগরের কুঠীঘাটার কাছে রতন রায়ের ঘাট, সেখানে দশমহাবিদ্যার মন্দির আছে। রামকৃষ্ণ একদিন সেখানে মন্দির দেখতে যান। দক্ষিণেশ্বরের ভাঙা গোবিন্দজীর পূজা সম্পর্কে জয়নারায়ণবাবু কথা তুললেন, রামকৃষ্ণ বললেন, যিনি অখণ্ড মণ্ডলাকার তিনি কি কখনও ভাঙা হতে পারেন? তা ছাড়াও দেব-দেবীর সঙ্গে আমাদের আত্মিক যোগ, বাৎসল্য, সখ্য প্রভৃতি নানাভাবে আমরা দেব-দেবীর ভজনা করি। আমাদের আত্মীয়ের যদি কোন অঙ্গ হানি হয়, তাকে কি মৃতজ্ঞানে আমরা ফেলে দি? নিশ্চয়ই না, তবে বিগ্রহের ক্ষেত্রে অন্য ব্যবস্থা হবে কেন? রানী রাসমণিকে তিনি ঐ ধরনের জবাব দেন। ঐ সম্পর্কে রামকৃষ্ণকে আর কেউ কোন প্রশ্ন করেন নি। অনবধানতার অপরাধে পূজারী ক্ষেত্রনাথের কাজ গেল, রাধাগোবিন্দের পূজার ভার পড়ল রামকৃষ্ণের ওপর।

রামকৃষ্ণের পূজা ছিল এক বিস্ময়কর ব্যাপার, দেখবার মত জিনিস। অঙ্গন্যাস, করন্যাস প্রভৃতি সম্পন্ন করবার সময় ঐ মন্ত্রগুলির ছাপ নিজের দেহে তিনি দেখতে পেতেন। পূজার আসনে বসে রামকৃষ্ণ অনুভব করতেন সর্পাকৃতি কুণ্ডলিনী শক্তি নিজ দেহের সুষুম্না পথ দিয়ে সহস্রার দিকে এগিয়ে চলেছে এবং দেহের যে যে অংশ ঐ শক্তি ত্যাগ করে যাচ্ছে, দেহের সেই সেই অংশ অসাড় ও মৃতবৎ হয়ে যাচ্ছে। আবার 'রং-ইতি জলধারয়া বহ্নি প্রাকারান্ বিচিন্ত্য'—পূজার বিধি অনুসারে 'রং'-মন্ত্রবর্ণ উচ্চারণ করে জল ছিটিয়ে ভাবতে হয় অগ্নির প্রাচীরে পূজাস্থল যেন বেষ্টিত আছে, এবং সে জন্য কোন বাধা-বিঘ্ন সেখানে প্রবেশ করতে পারে না। রং-মন্ত্র উচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গে রামকৃষ্ণ দেখতেন অগ্নির লেলিহান শিখা চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়ে পূজার জায়গাকে সব রকমের বিঘ্ন থেকে রক্ষা করছে। পূজার সময় রামকৃষ্ণের তেজোদীপ্ত চেহারা দেখে [illegible] দর্শক বলাবলি করতেন, সাক্ষাৎ ব্রহ্মণ্য দেব যেন নরশরীরে পূজা করছেন।

পূজা-অর্চনা ব্যাপারে উৎসাহ ছাড়া রামকৃষ্ণের মধ্যে ঐ সময় একটা নিঃসঙ্গ, উদাসীন ভাব [illegible] লক্ষ্য করতেন। কখনও কখনও পঞ্চবটীতে রামকৃষ্ণকে একাকী ঘুরে বেড়াতে দেখা যেত, পঞ্চবটীর তলায় একা বসে থাকতেন। আবার পঞ্চবটীর চারদিকে যে [illegible]

[illegible] তিনি ছিলেন। তার ঐ কাজের উদাসীনতা দেখে? রামকুমার তাঁর কাছে [illegible] বড় কোন প্রভাব পড়ল নি।

অন্য দিকে মথুরবাবুর অনুরোধে প্রথমে দেবীর বেশকারীর পদে, পরে রাধাগোবিন্দজীর পূজারীর পদে অধিষ্ঠিত হয়ে রামকৃষ্ণ কৃতিত্বের সঙ্গে কাজ চালিয়ে যাচ্ছেন দেখে রামকুমার রামকৃষ্ণ সম্পর্কে অনেকটা নিশ্চিন্ত ছিলেন। তিনি তখন রামকৃষ্ণকে চণ্ডীপাঠ, মাকালীর পূজা, অন্যান্য দেবদেবীর পূজা শেখাতে লাগলেন। শক্তি দীক্ষায় দীক্ষিত না হলে দেবী পূজা করা প্রশস্ত নয় শুনে শক্তিমন্ত্রে দীক্ষিত হওয়ার জন্য রামকৃষ্ণ প্রস্তুত হলেন। কলকাতার বৈঠকখানা বাজারে তখন শ্রীযুক্ত কেনারাম ভট্টাচার্য নামে একজন প্রবীণ শক্তিসাধক থাকতেন। রামকৃষ্ণ তাঁর কাছে দীক্ষিত হবেন স্থির করলেন। শুভদিনে রামকৃষ্ণ দীক্ষিত হলেন। দীক্ষা গ্রহণের সঙ্গে সঙ্গে রামকৃষ্ণ সমাধিস্থ হলেন। শ্রীযুক্ত কেনারাম তাঁর অসাধারণ ভক্তি দেখে মুগ্ধ হলেন, এবং শীঘ্রই যে তিনি ইষ্টলাভ করবেন সে বিষয় তিনি নিশ্চিত হলেন। রামকৃষ্ণকে তিনি প্রাণভরে আশীর্বাদ করলেন।

এদিকে রামকুমারের শরীর ক্রমশই অপটু হয়ে পড়তে লাগল। তখন তিনি [illegible] করতেন এবং [illegible] অভ্যাস করতে লাগলেন। [illegible] ঐ কথা শুনে তাঁর [illegible] রামকৃষ্ণকে পাকাপাকি কালীঘরের পূজায় নিযুক্ত করলেন। এবং রাধাগোবিন্দজীর পূজার ভার পড়ল রামকুমারের উপর। রামকৃষ্ণের সাধক জীবনের পট পরিবর্তন হল।

ইচ্ছাময়ীর ইচ্ছা কে বুঝতে পারে? ঐ সময় একটা অঘটন ঘটল, যা রামকৃষ্ণের সাধক জীবনে এক নতুন প্রবাহ নিয়ে এল। অসুস্থ রামকুমার শ্যামনগরে তাঁর এক আত্মীয়ের বাড়িতে গেলেন এবং সেখানে দেহ রাখলেন। সেটা ১২৬৩-র প্রথম দিকে। পিতৃতুল্য অগ্রজ রামকুমারের মৃত্যুতে রামকৃষ্ণ ব্যথিত হলেন ঠিক, কিন্তু ঐ সময় থেকেই তিনি জগন্মাতার পূজায় নিজেকে একেবারে ডুবিয়ে দিলেন। রামকুমারের মৃত্যু রামকৃষ্ণের মধ্যে সংসারের অনিত্যতা বোধ একেবারে পাকা করে দিল। ঐ সময় তিনি লোকসঙ্গ এড়িয়ে চলতেন। পূজার কাজ ছাড়া সব সময়ই তিনি ধ্যানমগ্ন থাকতেন। রামকৃষ্ণের ঐ অবস্থা দেখে হৃদয়রাম খুব চঞ্চল হয়ে উঠলেন। তিনি সব সময় রামকৃষ্ণের সঙ্গে থাকতেন। একদিন গভীর রাত্রিতে পঞ্চবটীর পাশের জঙ্গলে [illegible] দেখলেন, তিনি [illegible] ঐ [illegible] উপবীত পর্যন্ত খুলে, শীল, ভয়, লজ্জা, জাতি ও অভিমান—এই আটটি পাশে মানুষ বাঁধা; তাই সর্বস্ব ত্যাগ করে ধ্যান করতে হয়। এমনকি উপবীত পর্যন্ত ত্যাগ করতে হয়। রামকৃষ্ণ যা [illegible] করতেন তা [illegible] সর্বতোভাবে পালন করতেন। টাকা ও মাটি উভয়ের প্রতি সমবোধ না হলে মানুষ প্রকৃত যোগমার্গে ও ঈশ্বরমুখী হতে পারে না। এ-বিশ্বাস পাকা করবার জন্য রামকৃষ্ণ টাকা ও মাটি মুঠিতেই এক সঙ্গে গঙ্গায় ফেলে দিয়েছিলেন। অর্থাৎ নিজের এ-চিন্তা দৃঢ় করার জন্য তিনি কাঙালীদের এঁটো পাতার দেবতার প্রসাদ জ্ঞানে খেয়ে নিজের মাথায় দিতেন। কাম ও কাঞ্চনে আসক্তি ও ঈশ্বর বিশ্বাস এক সঙ্গে চলতে পারে না। তামাক ও দুধ এক সঙ্গে খাওয়া যায় না। মনে উত্তেজনা আসে এমন সব শারীরিক চিহ্ন ও অনুষ্ঠান রহিত তপস্যা শুধুমাত্র বাগ্ বিলাস সহায়ে মানুষ কখনও আত্ম-সাক্ষাৎকার লাভে সমর্থ হয় না। সাধনার উৎকর্ষের সঙ্গে সঙ্গে সাধকের মন স্থূল থেকে সূক্ষ্ম, সূক্ষ্ম থেকে কারণে ক্রমশ উন্নীত হতে থাকে।

(চলবে)

জীবন। কোর্ট অফ ওয়ার্ড মাই-খা টাকা দিল। নিজের সম্পত্তি রক্ষণ হেতে, বিক্রি করে তিনি দিতা অতিথিসেবা, দুঃস্থকে দান, বিদ্যা শিক্ষার জন্যে অর্থ সাহায্য, আশ্রিতদের অনেকের জন্যে কোঠা-বাড়ির ব্যবস্থা করা, কোনো কাজই বাকি রাখলেন না। স্বামীর কালের ধারাকে প্রবাহিত রাখলেন। নীলমণি মল্লিকের মৃত্যুর বিশ বছর পরেও সাধারণ মানুষ দল বেঁধে বাড়ির সামনে এসে হেঁকে যেতো—জয় নীলমণি মল্লিকের জয়।

ওয়েলসার ঘোড়ায় টানা লাল আর হলদে রঙের ভিকটোরিয়া গাড়ি এসে দাঁড়াল, চোরবাগানের মল্লিকবাড়ির সদর দরজায়। নেমে এলেন হগসাহেব: হাতে একটা তারের খাঁচা। খাঁচার একদেশে বিরল দুটো বিদেশী পাখি। তোমার ইয়ং মাই সান রাজেন্দ্র। তোমার জন্য দুটো পাখি আনিয়েছি। কিপ দেম। টেম দেম। টিচ দেম। অ্যাকোয়ার এ টেস্ট ফর দি ন্যাচারাল লাইফ, মাই বয়। ইউ মাস্ট বি বেটার দেন্ট। বেটার দ্যান ইওর ফাদার, ইওর গ্র্যান্ড-ফাদার। ইউ মাস্ট কার্ভ এ নেম ফর ইওর ফ্যামিলি।

ইতিহাস, পুরাতত্ত্ব, চারুকলা, কারুকলা, প্রকৃতি বিজ্ঞান, বিদেশী ভাষা, বিদেশী বৃত্তি, জীবনের যা কিছু সুন্দর, সবকিছু দিয়ে কিশোর রাজেন্দ্রকে সাজিয়ে দিলেন স্যার জে ডবলু হগ। ক্রমশ রাজেন্দ্রের মনে মহত্বকে মন্ত্র করে দিলেন। মহেশ সুখমণ্ডু। আপন ভূমি সুখী হবার জেনে নও। ভূমির মহত্বের জন্যে মানুষের, মহাদেশের জন্যে মহত্ত্ব। হগসাহেব রাজেন্দ্রকে ভর্তি করে দিলেন হিন্দু কলেজে। বাংলাভাষা তো শিখবেই, তোমার মেদকেই বেঙ্গলী নাই বা। দেশ-বিদেশের বই পড়। পৃথিবীটাকে জানো। ওয়ার্ল্ড ইজ এ বিউটিফুল প্লেস। এর ফ্লোরা, ফনা, জীবজগৎ। রোম, গ্রীস, ইতালি, ভাস্কর্য, স্থাপত্য, ললিতকলা, সব তোমাকে জানতে হবে। বি এ ফার্স্টক্লাস ম্যান। বি এ নোবল ম্যান।

রাজেন্দ্র তাই হলেন। সংস্কার ছিল ভাল তার উপর পড়ল [illegible]। রুচির ঐশ্বর্য ফুটে উঠল। তৈরি হল মন আর মেজাজ। চোরবাগানের মল্লিকবাড়ির অতিথি ভবনের দালানে বসে হগসাহেব জাপানী পাথরের লম্বা লেজের পানক ছাঁটছিলেন কাঁচি দিয়ে। রাজেন্দ্র এলেন। ষোল বছরের স্বাস্থ্যবান যুবক। আংকল আই হ্যাভ এ প্ল্যান। আই ওয়ান্ট টু কনস্ট্রাক্ট এ প্যালেস, এ মার্বেল প্যালেস। যার স্থাপত্যে থাকবে ইতালির মেজাজ, যার মেঝেতে পাতা থাকবে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠতম শ্বেতপাথরের ঐশ্বর্য। যার ঘরে ঘরে ঝুলবে আশ্চর্য সব ঝাড়লণ্ঠন। যার সবুজ লনে থাকবে অসাধারণ সব ভাস্কর্য। পুরো প্রাসাদটা হবে একটা মিউজিয়াম। একপাশে থাকবে চিড়িয়াখানা। কলকাতার প্রথম জু হবে আমার বাড়িতে।

আইস এ ভেরি গুড আইডিয়া মাই সান। ইমপ্লিমেন্ট ইট। আমি তোমাকে সাহায্য করব উইথ মাইট এন্ড মেন। রাজেন্দ্রর মা ইতিমধ্যে মারা গেছেন। রাজেনর বয়স তখন মাত্র এগারো। এগারো থেকে ষোলো এই পাঁচ বছরে নিজে কিশোর মনে, চরিত্রে আরো দৃঢ় হয়েছেন। আরো স্বাবলম্বী হয়েছেন। সংস্কৃত শিখেছেন, শিখেছেন পারসী আর ইংরেজী। পশ্চিম দিক জমির ওপর ভিত পড়ল। শ্রেষ্ঠ স্থপতিদের নিয়ে এলেন হগসাহেব, নিয়ে এলেন ভাল ভাল দেশ-বিদেশের কারিগর। সব মিলিয়ে সংখ্যা দাঁড়াল পাঁচ হাজার। ইতালি এবং ইংল্যান্ড থেকে এসেছেন বড় কারিগর। চোরবাগানে ভিড় পড়েছে। হৈ হৈ ব্যাপার। মল্লিকদের বাড়ি তৈরি হচ্ছে। নীলমণি মল্লিকের ছেলে রাজেন মল্লিক দেখিয়ে দেবে দুনিয়াকে। সাহেব বিল্ডারদের মেলা কাজ।

(৫)

হগসাহেবের টেবিলে আর্কিটেক্টের প্ল্যানটা মেলে ধরলেন। উৎসুক রাজেন্দ্র। আর মাই সান: দেখ কি জিনিস হচ্ছে। দিস ইজ সর্ব। উত্তরে থাকছে তেকাউন্ট গ্রীন লন। লনে থাকছে বিশাল ফোয়ারা। ফোয়ারার ভাস্কর্য তুলে ধরবে ঋতুচক্রের আবর্ত—সাইকল অফ সিজনস। রাতে আলোকিত। এটা হবে ফরাসী ধরনের কাজ। এই দিকেই থাকছে জলাশয়। এখানে থাকছে ইতালির ঢঙের একটি ফোয়ারা, ফোয়ারায় থাকছে টিটেনস এবং মারমেডস। থাকছে একজোড়া স্ফিংকস্। জাপানী একটি মন্দিরের প্রতিরূপ। আর থাকছে একজোড়া জাপানী ভাস। পশ্চিমের লনে থাকছে আর একটি ফোয়ারা, চারদিকে থাকছে নেপচুনের মূর্তি। রাজা পরে এই লনে বসিয়েছিলেন—গডেস অফ ফরচুন, জাপানের দেবীকে, গৌতম বুদ্ধ, দশ থেকে চতুর্দশ শতকের দশটি প্রাচীন ভাস্কর্য, মার্কারি, ভেনাস, একটি মেয়ে, মা ও শিশু, চারটি হাতির মুখ, রেড ইন্ডিয়ান, নিগ্রো, মঙ্গোল, ককেশিয়ান, একটি ইংরেজ পরী। পরীর মূর্তির মালিক ছিলেন—স্যার এলিজা ইম্পে, বাংলার প্রথম প্রধান বিচারপতি।

আচ্ছা এইবার এসো বাড়িতে। এই হল তোমার বড় বড় থামওলা বারান্দা। বারান্দা দিয়ে ঢুকছো রিসেপশন হলে, রিসেপশন হল থেকে আসছে মার্বেল চেম্বারে, সেখান থেকে যাচ্ছো বিলিয়ার্ড চেম্বারে। এই দেখ বাড়ির ভেতরের প্রশস্ত প্রাঙ্গণ, প্রাঙ্গণের একপাশে প্রধান উপাসনা কক্ষ। এইবার দক্ষিণের সিঁড়ি দিয়ে উঠছো দোতলায়, প্রথমবার, বারান্দা. চারদিকেই বারান্দা, এইটা হবে দরবার হল। নীচে কোর্টইয়ার্ড ছাড়া চারটে ঘর, দোতলায় ছটা ঘর। বাইরের কাজ হবে গ্রীক বা করিন্থিয়ান স্টাইলে, ভেতরে থাকবে ক্লাসিক্যাল আর্চ, ডোরিক আর রোমান স্থাপত্য।

হুগলী তটে জাহাজ ভিড়েছে। দেশ-বিদেশের মূল্যবান মার্বেল এসেছে রাজেন্দ্রবাবুর বাড়ির জন্যে। বিয়াল্লিশ রকমের মার্বেল বসবে, মেঝেতে, দেয়ালে, টেবিলটপে, মূর্তির বেদীতে।
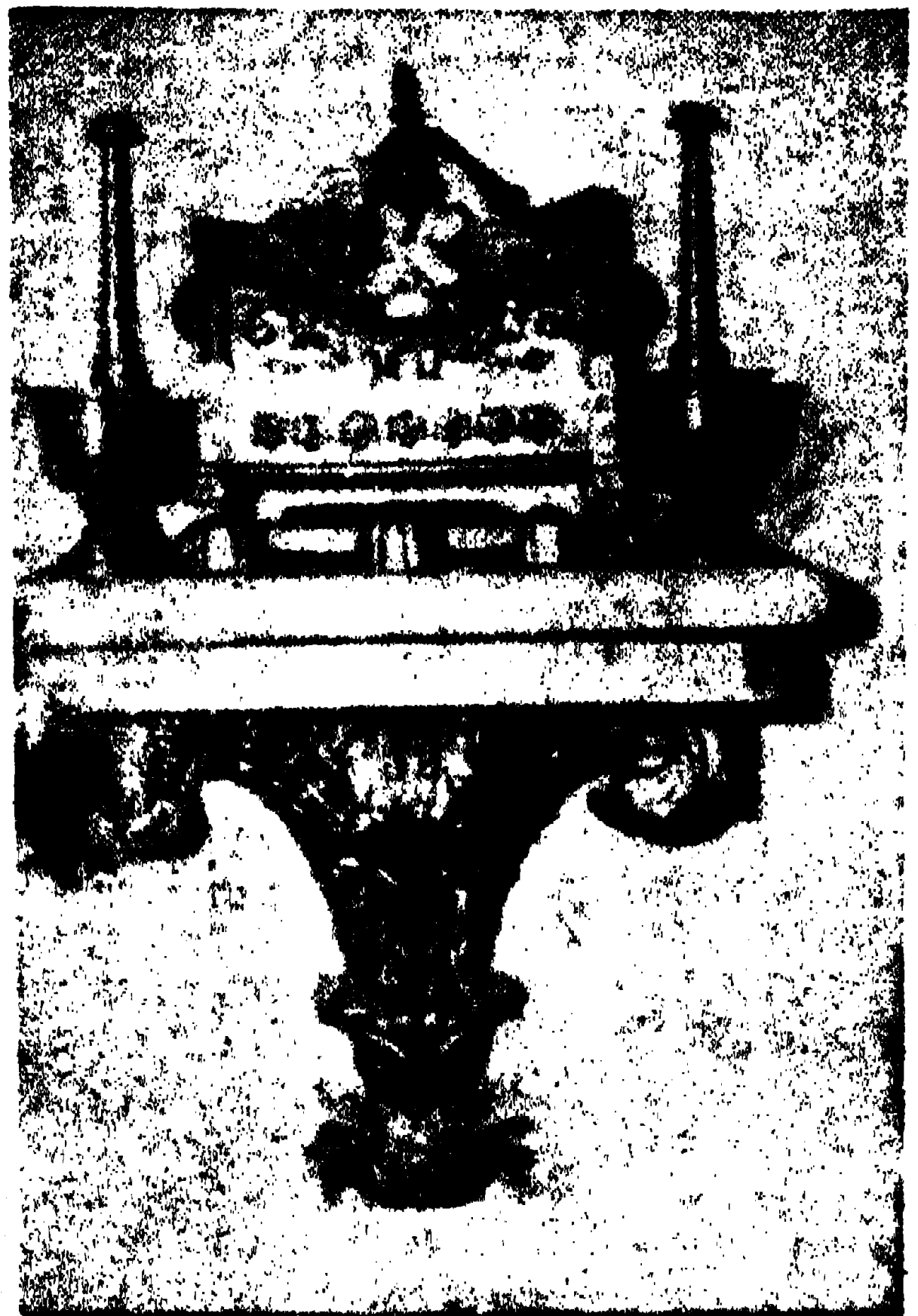
ফ্রিডারিক ওভেন্সের হাতে শিপিং মিন্ট। রাজেন্দ্র একবার চোখ খোলালেন, পাশে দাঁড়িয়ে বিদেশী স্থপতি। শিরাজোজরো, বড় দুর্লভ পাথর, সাদা গায়ে ছড়িয়ে আছে সোনালী রেখা, আসছে ইতালি থেকে। রাশিয়ার উরাল থেকে আসছে—ধূসর রংএর পাথর। উরালের ভেরো মাইল দূরের আর একটি অঞ্চল থেকে আসছে—বহুমূল্য মার্বল, প্রায় স্বচ্ছ, ঈষৎ গোলাপী, অলংকার তৈরির কাজে লাগে। মোর থেকে আসছে বাঘছাল মার্বল, ঠিক যেন বাঘের গায়ের রঙ। ইংল্যান্ড আর ইতালি থেকে আসছে অনিকস, আসছে অ্যালাবাস্টার।

পাঁচ হাজার কর্মী পাঁচ বছরে তৈরি করে দিল চোরবাগানের মল্লিকপ্রাসাদ মার্বল প্যালেস, পাথরের কাব্য, ওরিয়েন্টাল স্থাপত্যের অনন্যসাধারণ নিদর্শন। ষোল বছরের যুবক তখন একুশ বছরে পা রেখেছেন। ব্যক্তিত্ব তখন পরিপূর্ণ। কলকাতার সুধীসমাজে রাজেন্দ্র মল্লিক তখন মানী মানুষ। মার্বল প্যালেসে তখন একাধারে যাদুঘর, চিড়িয়াখানা, জ্ঞানপীঠ, মিলনতীর্থ। প্রাচ্য আর পাশ্চাত্যের ভাবের মিলন কেন্দ্র। ফরাসী দেশের বিখ্যাত আর্ট-ডিলার মিঃ ফরিনাম্ভিকের কাছ থেকে ক্যাটালগ এসেছে, ইতালি মিঃ পিচ ভেনাসের কাছ থেকে এল। সারা বিশ্বের বিখ্যাত কারু-ব্যবসায়ীরা এগিয়ে এলেন রাজেনবাবুর মিউজিয়াম সাজিয়ে দিতে। মল্লিকমশাই জানাতেন শিল্পের দুনিয়ায় দুর্লভ বস্তু কি কি! তার কৌলীন্য কত ওপরে!

বাগানের নাম রাখলেন নীলমণি নিকেতন। পিতার স্মৃতি-মাখানো সবুজ শিশির-ভেজা মাঠ, দুর্লভ গাছ, ফোয়ারা, জলাশয়। অবাক দর্শক এ কোথায় এলেন! জলে গা ভাসিয়ে আছে চীনের ম্যান্ডারিন হাঁস, ঘুরে বেড়াচ্ছে অস্ট্রিচ এমু। আর কয়েক পা এগোলেই নীল আকাশ ছোঁয়া স্তম্ভ। ছায়া ঘেরা বারান্দা, ইংরেজ বলবেন কুল কলোনেড। থমকে আছে মধ্যযুগ। ভাইকিং নাইট হাত বাড়িয়ে আলো দেখাচ্ছে অতিথিকে। বলছে চলে এস, আরো বিস্ময় তোমার জন্যে অপেক্ষা করছে অন্তঃপুরে। গোল্ড ভিইন মার্বলের ওপর আলতো পা রেখে উঠে এস ওপরে। সিক্ত বসনা ভেনাস, সাইক জ্যানী মিনার্ভা, সোফোক্লিস, টাজিক মিউজ, ডেমোসথেনিস, এথেনা, হারানো সময়ের গর্ব নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। চলে এস বিলেপশান হলে।

মাথা তুলে সিলিংয়ের দিকে তাকাও। সারি সারি ঝুলছে ভেনিসের ঝাড় লণ্ঠন। আলোর সঙ্গে অল্প একটু অন্ধকার মিশিয়ে তরল আলোকে একটু ঘন করা হয়েছে। দৃষ্টি কেড়ে নিচ্ছে ম্যাইডিয়ান ভেনাস। পৃথিবীর কোনো আর্ট গ্যালারীতে এই ভেনাস তার উলঙ্গ সৌন্দর্যের জন্যে স্থান পায়নি। রাজেন্দ্র স্থান দিয়ে-ছিলেন, 'আর্ট ফর আর্টস সেকের' জন্যে। আর একটি ভাস্কর্য দেখ, ভেনাস আর কিউপিড উঠে আসছে সাগর থেকে, দেখ নৌডটি ভেনাস, জানলার কাঁচে ভেনিসের শিল্পীদের হাতের এচিং, অণু-চক্রের আবর্তন। মাথার ওপর ঝুলছে বেলজিয়ামের ঝাড়। দুষ্প্রাপ্য তেত্রিশটি শিল্প নিদর্শন অভ্যর্থনা কক্ষ স্বাগতম জানাচ্ছে।

এইবার চলে এস রেড-ভিইনড মার্বল চেম্বারে। পাথরের মেঝেতে প্রকৃতির নিজের হাতের কাজ, লাল শিরা-উপশিরা ছড়িয়ে আছে এ দেয়াল থেকে ও দেয়ালে। প্রথমেই নজরে পড়বেন মহারানী ভিক্টোরিয়া, কাঠের কাজ। রানীর রাজ্যাভিষেকের সময় ইংরেজ-শিল্পী তৈরি করেছিলেন। রাজেন্দ্র হাতছাড়া হতে দিলেন না। এর কোনো দ্বিতীয় নেই। এই ঘরেই আছে তাং আর হান ডাইনাস্টির জোড়া জোড়া ফুলদানী। চীনের সবচেয়ে বড় একটি ফুলদানী এই ঘরেই আছে। ভারতের আর কোথাও এতবড় ফুল-দানী নেই। এই কক্ষে প্রদর্শিত বস্তুর সংখ্যা বারোটি।

বিলিয়ার্ড ঘরের দেয়ালে ঝুলছে ফরাসী শিল্পীদের আঁকা ছবি। এছাড়া আছে মার্বল, ব্রোঞ্জ ও পোর্সিলেনের তিরিশটি প্রদর্শনী। চিপেনডেলের ডিজাইনে দেয়াল জোড়া বিশাল আয়নায় সময় ধরা আছে। ১৭০০ সালের ঠাকুর্দা-ঘড়ি শত আড়াইশো বছর ধরে সমানে গম্ভীর স্বরে সময় ঘোষণা করে চলেছে।

বিলিয়ার্ড ঘর ছেড়ে ভেতরের উঠোনে একটু থমকে দাঁড়াই। দরজার পাশে দেয়াল ঘেঁষে মার্বলের বসার আসন। পাথরে পাথর মেলানো কাজ। উঠোনটি এমন কায়দায় সাজানো, যেখানেই দাঁড়ানো যাক সবদিক দেখা যাবে। দোতলার অলিন্দ থেকে উঠোনটি পরিপূর্ণ দৃশ্যমান। এক মাথায় প্রার্থনা-কক্ষ। চাতালের ওপর সিংহাসন। মেঝেতে পাথর বসাবার ডিজাইন রাজার নিজের করা। ভাস্কর্যে কোরিনথিয়ান ও ডোরিক ডিজাইনের মিলন যার ফলে মঠ অভ্যন্তরের আবহ এসেছে। সিলিং আর দেয়ালে ওয়াটার কালারের কাজ। দেখে মুগ্ধ হতে হয়। ফরাসী ঝাড় শতদল হয়ে ঝুলছে। একজোড়া ফরাসী পর্দা হাওয়ায় কাঁপছে। বারোটি শিল্পকীর্তি প্রার্থনা কক্ষের পরিবেশের সঙ্গে মিশে আছে। সর্বদেবতা আশেপাশে একদিকে, অন্যদিকে বিদেশী আসবাব। কিউপিড আসছে আলো হাতে। পাশাপাশি সাদা মার্বল আর ব্রোঞ্জ মূর্তির ছড়াছড়ি। এইখানেই আছেন ওয়ারেন হেস্টিংস, নেপোলিয়ন, সোফোক্লিস। উনপঞ্চাশটি শিল্পবস্তু বছরের পর বছর পরস্পর ভাববিনিময় করে চলেছে।

এরপর দক্ষিণে সিঁড়ি বেয়ে ওপরে ওঠা যেতে পারে। উঠতে উঠতে থামি দেখি। ইউরোপের শিল্পীদের মাস্টারপিস, ইতালি, ফ্রান্স, ব্রিটেন, ডাচ, বেলজিয়াম, চীন, ভারত। সব মিলিয়ে বর্তমান সংখ্যা ৩৮। প্রতি ধাপে ধাপে দাঁড়িয়ে আছে ব্রোঞ্জমূর্তি। উপরে উঠতে উঠতে চোখে পড়বে এইরকম ২১টি নিদর্শন। চোখে পড়বে রাজা রাজেন্দ্র মল্লিকের জীবনের সঙ্গে জড়িত বিভিন্ন বিশিষ্ট মানুষের ছবি, লর্ড ক্যানিং, পশুপক্ষির ব্যাপারে যাঁর সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা ছিল, আর যে অবশ্যই হল রাজার প্রতিকৃতিশিল্পী। অবশ্য অবশ্যই হান্টার নিনলওয়াচা, চিরাহ্-এর আঁকা রাজার পোর্ট্রেট।

নিচ্ছেন। বললেন, লাউডন স্ট্রীটে গিয়ে লাভ নেই।

আমি, সিকিউরিটি ফোর্সের মিঃ কোহ্‌লি অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলাম, কেন?

—সিকরেসি নষ্ট হয়ে গেছে।

কোহ্‌লি বললেন, মাল তো এত তাড়াতাড়ি সরাতে পারবে না।

—মাল সরানো হয়ে গেছে।

আমি অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করলাম, সেইভ প্রোগ্রেম তো আমরা ঘন্টা দুয়েক আগে তৈরী করলাম। চোখের তারা আর নল ভুরু নাচাতে নাচাতে গুপ্ত সাহেব বিড়বিড় করে বলে চললেন। গভর্ন-মেন্টের চেয়েও ওঁর এ্যাসপায়োনেজ খুব ছোট নয়। দারুণ ইনটেলিজেন্ট লোক। যেমন চেহারা—সাহেবের মত টকটকে করছে গায়ের রং। তেমনি হাইট। ছয় না হলেও পাঁচ দশ-এগার তো হবেই, অধিকাংশ চুল পেকে গেছে অল্প বয়েসেই। সাদা কালোয় মেশামেশি হয়ে কোঁকড়ানো। জুলপি দুটো বেমক্কা সাদা। ইমক্যাকুট একটা টপ্ ইনটেলেক-চুয়াল লুক। পোশাক পরিচ্ছদের তো কথাই নেই।। একটা সেন্ট ব্যবহার করে, গন্ধ শুঁকলে তুমি পাগল হয়ে যাবে।

কোহ্‌লি রসিকতা করে জিজ্ঞেস করে, নিশ্চয় ফরাসী এবং সবচেয়ে দামী?

চশমাতে খোঁচা দিয়ে গুপ্ত সাহেব বলে ওঠেন, সিকিউরিটির বুদ্ধি আর কতদূর যাবে।

কোহ্‌লি লাল হয়ে ওঠে। অজ্ঞতা ঢাকা দেওয়ার জন্য কিঁউ কিঁউ করে বলে, তেন মেরিকান?

গুপ্ত সাহেব আরো রেগে ওঠেন। থোঃ, মেরিকানের নিকুচি করেছে।

এবার কোহ্‌লি সারেন্ডার করে। গদগদ ভাব নিয়ে জিজ্ঞেস করে—তাহলে কোথাকার স্যার? গুপ্ত সাহেব সময় নিয়ে মোটা একটা চুরুট ধরালেন। এবং বেদ-বাক্য প্রকাশের ভঙ্গিতে বললেন, চোলাই। আমি আতংকে প্রায় চীৎকার করে উঠলাম, চোলাই?

জীবনে অনেক রকম উদ্ভট কথা শুনেছি। চোলাই মদ গাঁজা ভাং মায় হাসিস মারিজ্ তো আজকাল ডাইনে বাঁয়ে। কিন্তু সেন্ট পর্যন্ত চোলাই হতে শুরু করেছে—সাঁচা এখবর আমার জানা ছিল না।

গুপ্ত সাহেব একটু ভর্ৎসনার চোখে আমার দিকে তাকালেন। বললেন, আমার মতো তুমিও তো খবির খাড়?

ভেবেছ সব জেনে ফেলেছ।

আমি হে হে করে উঠলাম—না স্যার, আমি সেইভাবে বলিনি।

তবে শোন। বলে গুপ্ত সাহেব শুরু করলেন। দার্জিলিঙের জলাপাহাড়েই বাড়। এরা আদিবাসী। আগে রাজা মহারাজারা ... জায়গা দিতো। একটা বুড়ো পরিবার আছে।

হরিণের নাভিগন্ধ থেকে ওটা তৈরী হয়। বছরে এক শিশি কি দুই শিশি।

সরল শিশুর মত জিজ্ঞেস করলাম, কত দাম হবে স্যার?

একটু ক্ষেপে যাওয়ার ভঙ্গিতে বললেন, দাম আর কি? প্রাইসলেস্। দশ পনের বিশ হাজার।

গদগদ হয়ে বললাম, স্যার, ভদ্র-লোককে একবার দেখতে ইচ্ছা করছে। বাঙালী তাহলে এখনো মরেনি?

হেড কনেস্টবল জনার্দন সিং বাজখাঁই করে এক সোলুট ঠুকে ঘরে ঢুকলো। বললো, খানেকা টাইম উতার যাতে হুজুর।

গুপ্ত সাহেব লাফিয়ে উঠলেন, লেট আস স্টার্ট।

●

কিছু পাওয়া গেল না। শিল্প-পতিকে তো নয়ই। ওঁর স্ত্রীকে দেখে থমকে গেলাম। খাঁ খাঁ করা রূপ। চোখ তাকানো যায় না গোছের। বয়সের সামান্য ছাপ আছে বটে। সে বোঝা যায় কি না যায়। শুনলাম মিসেস চোপরা র্যোর্মশির মেয়ে। ব্যবসার ব্যাপারে মিঃ মিত্র এই পরিবারের সুনাম দুর্নাম দুই-ই আছে। বাপ মোহন চোপরা'র গাজিয়াবাদের অরিয়েন পেইন্টসের কার-খানায় মিঃ মিত্র ছিলেন সামান্য কর্ম-চারী। পরে তীক্ষ্ণ বুদ্ধি ও তৎপরতার বলে মোহন চোপরার বিশ্বাস ও একমাত্র কন্যা দুই-ই তিনি লাভ করেছিলেন।

ঠাকুমা পিসিমাদের মত চওড়া পাড়ের শাড়ি আটপৌরে ধরনে পরা। খোঁপাতে চাবির গোছা। ভদ্রমহিলা ঘুম জড়ানো চোখে অকুতোভয়ে অনেক কথাই বলে গেলেন। ভদ্রলোকের নাকি এখন খুব সময় খারাপ যাচ্ছে। বেহালা ও মধ্যমগ্রামের কারখানা লিকুইড করে দিয়েছেন। দুর্গাপুরের কারখানায় লক-আউট। যশোর রোডের বাগানবাড়ি লিজ দেওয়া হয়েছে এক অনাথ আশ্রমকে নামমাত্র ফীতে। বক্সগের যে বাড়িটাকে লোকে প্রমোদ উদ্যান বলে—যেখানকার তিনটি ফোয়ারা দিয়ে জলের বদলে বিলেতী পানীয়ের বারিধারা বর্ষিত হয়, বলে জনশ্রুতি আছে আসলে সেটা বসতবাড়ি। মিঃ মিত্র অধিকাংশ সময় ওখানে থাকেন। ওঁর অফিসের টপ্ লেভেল কাগজপত্র ওখানেই থাকে। তবে বন্ধুবান্ধবরা ওঁর ওখানেই অধিকাংশ সময় ভিড় করে। অনেক রাত পর্যন্ত জেগে থাকা ওঁর অনেক বছরের অভ্যাস। সামান্য ইনসো-মোনিয়াও আছে।

এখানে অর্থাৎ লাউডন স্ট্রীটে থাকেন ভদ্রমহিলা নিজে, ছেলে ও মেয়ে। ছেলে টিম্বেরেতে সার্জেন্ট। ওখানেই থাকে। মাঝে মাঝে ছুটিতে আসে। মেয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ায়। ফিজিওলজির ডক্টরেট।

লাউডন স্ট্রীটের বিরাট ওষুধের দোকানটা ভদ্রমহিলা নিজেই দেখাশোনা করেন। বিদেশী ওষুধ আমদানীর লাইসেন্স আছে। বিদেশী কোম্পানীর সঙ্গে যোগা-যোগের ব্যাপারটা স্বামী দেখেন। কল-কাতায় থাকলে শনি কি রবিবার লাউডন স্ট্রীটের বাড়িতেই থাকেন। ভদ্রমহিলা নিজেই চাবির গোছা আমাদের হাতে তুলে দিলেন।

মোটা বার আলমারি ও লকার দেখা হল। একটা আধুনিক আন্ডার গ্রাউন্ড ভল্ট। ভদ্রমহিলা নিজেই দেখালেন।

মিঃ গুপ্ত বললেন, আর দরকার নেই।

বাংলোতে আজকা গুড্‌নাইট জানিয়ে বেরিয়ে এলাম। ইংরেজী মতে ওটা ছিল ব্ল্যাক মর্নিং।

ঐ রাতেই গাড়ির মুখ ঘুরিয়ে দোলাম বক্সগর। মনের বাড়িতে ঢুকতেই মনে হল, এইবার পাওয়া যাবে। মিঃ লস্কর বাঙালী আর্টিস্টকে ঘাড় ধরিয়ে —ভর সৌখিনে, অনেক জিজ্ঞাসাবাদ করলাম। সকলেই বললো, মনিব এখন ভগবান।

তন্নতন্ন করে খোঁজা হল। কিছুই পাওয়া গেল না। আমি বললাম—স্যার মনে হচ্ছে ইনফরমেশন এবং কোলাকুলো-শান দুটোতেই কোনো গণ্ডগোল আছে।

কমিশনার সাহেব নাছোড়বান্দা। খবর সংগ্রহ হল। ভদ্রলোক দার্জিলিং জেলার শুকনাতে বিশ্রাম নিচ্ছেন। আশে-পাশের চা বাগানে অনেক শেয়ার আছে। আবার মানে শুনুন, শুকনিত গুলিয়াই হবে মিরিকের পথে নেপালের আন্ত-র্জাতিক চক্রের সঙ্গে যোগ নেই—এমনও বলা চলে না। বিরাট কম্পাউন্ড নিয়ে এক সাহেবী বাংলো কিনেছেন। ওঁর স্ত্রী এইটার কথা একদম চেপে গিয়ে-ছিলেন।

পরের দিন ভোরের ফ্ল্যাইটে আমরা বাগডোগরা রওনা হলাম। এবার ব্যবস্থা একটু অন্য ধরনের করা হল। নিখুঁত ব্যূহ রচনা হল। আগে থেকেই এস ও এস পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছিল—কার্শিয়াং কালিম্পং ও দার্জিলিং। সঙ্গে সাথায় আমরাও গিয়ে পৌঁছলাম। অনেকটা অতিথির ভঙ্গিতে।

গেটে দাঁড়িয়ে আমাদের রিসিভ করলেন বিখ্যাত শিল্পপতি মিঃ মিত্র নিজেই। যেন আগে থেকেই জানা ছিল। এই আমি প্রথম তাঁকে দেখলাম। এবং সাঁচা কথা বলতে কি ... থেকেই লোকটি সম্পর্কে ... আমার মনো ভাব ... লাগলো।

আমার দিকে হাসি হাসি ... করে তাকালেন ... মিঃ গুপ্ত সার্চ ওয়ারেন্ট দেখালেন। একটু অবাক হলেন না। ... বললেন, সে সব হবে। আগে ...

[illegible] [illegible] বিপরীত ওষুধের জন্য তোমাকে [illegible] শেষ পর্যন্ত আমার [illegible] [illegible] [illegible] অবশ্যই হবে। [illegible] [illegible] বয়সের যে বড় বড় [illegible] [illegible] অনুরোধ পত্র দিলে [illegible] [illegible] পাই।

একদিন [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] পড়েছিলাম। তখন অকৃপণভাবে [illegible] দুই হাতে দিয়েছ। আজ কোনো কিছু করলেই বা অনেক কিছু করলেও সে ঋণভার থেকে আমি কোনোদিন মুক্তি পাব না, জানি। কতগুলি উপকারের কৃতজ্ঞতা হয় না, যেমন কতগুলি ঋণ থেকে মুক্তি।

নিতান্তই যদি দরকার পড়ে তুমি আমাকে লোক মারফৎ বা যেমন করে ওষুধের নামটা জানিয়ে দিও। দুই গোলার্ধের কোথাও একশিশিও থাকলে তুমি পাবে, এ ভরসার মধ্যে একটুও আস্ফালন নেই।

তোমার নিজের আসার দরকার নেই। শুধু ওষুধের নামটা। তোমার বাড়িতে ওষুধ পৌঁছে যাবে। কার অসুখ, কি অসুখ, এসব আমাকে বলার দরকার নেই। ওষুধ ঠিক তুমি পেয়ে যাবে।

তুমি নিজে এসে আমার কষ্ট করবে কেন। একটা চিঠি দিয়ে লোক পাঠিয়ে দিও। চিঠিতে আমার সঙ্গে তোমার পরিচয়টা লিখতে ভুলো না। এত রকমের চিঠি প্রতিদিন পাই, দু-একটার উপর অবিচার হয় না—এমন বুক ঠুকে বলতে পারি না।

তা বলে তোমার নিজেকেই আসতে হবে এমন বলছি না। নিতান্তই হাতের কাছে লোক না-পেলে আসবে বৈ কি। তবে, না-আসাই ভাল।

সত্যি বলছি, তুমি নিজে আমার সামনে এসে পড়ো না। বেসামাল হয়ে পড়ার ভয়ে বলছি না। সে ভয় এই বয়সে আর নেই।

শুধু ভয় একটাই। বড় কষ্ট পাব।

তুমি তো আয়নায় নিজেকে যখন যেমন দেখেছ, তেমনি করেই চিনেছ। আমি তোমাকে চিনেছি তোমার তেইশ থেকে সাতাশ বছরের মধ্যে। তারপরের তোমাকে আমি আর চিনি না। আমি চিনি তোমার উজ্জ্বলতম সময়ে। আমি চোখ বুজলে তোমার সেই ছবি দেখতে পাই। কী চোখ, কী ভ্রূ, কী আঁখি-পল্লব—শীতের শান্ত সরোবরে মৃদু বায়ুপ্রবাহে কম্পিত ঢেউএর মত কালো কোঁকড়ানো চুল—প্রশস্ত নিতম্বের সমস্তটা ঢেকে রেখেছে। তোমার কণ্ঠস্বর, তোমার সাজানো দাঁত, গর্জন তেল মেশানো শ্যামলাভ রং। আর দৃষ্টি, তাকে ভাষা দিয়ে বোঝাবো কি করে?

সেদিন বুঝিনি। আপত্তি করেছিলাম বটে। সে মন্দের জোরে। বয়সের [illegible]। যখন তুমি বলেছিলে, [illegible] সেজেই, নাকি এই [illegible] ইতিহাস কাণ্ড হয়ে থাকে। জীবনের [illegible] থেকে এই [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] নাকি কিছুই বাদে আসবে না।

সেদিন [illegible] [illegible] [illegible] না। অনেক চেষ্টা করেও [illegible] [illegible] পারছিলাম না। তোমাদের [illegible] [illegible] [illegible] রেস্টুরেন্টে যাই, সিনেমা দেখি। আমরা তো না [illegible] [illegible] যাই।

মাঝে মাঝেই পাঁচ দশ টাকা হাত খরচের জন্য জোর করে পকেটে গুঁজে দাও। স্বাভাবিক কারণেই, তোমার [illegible] একটা অস্বাভাবিক [illegible] অবৈজ্ঞানিক মিলনে আমি গরিবার মত চাপ দিতে পারিনি।

প্রাকৃতিক নিয়মে তুমি চলে গিয়েছিলে।

অর্থনৈতিক নিয়মে আমি [illegible] পড়েছিলাম।

ইতিমধ্যেই বাইশ বছর কেটে গেছে।

তুমি জীবন সম্বন্ধে নূতন কথা জেনেছ। অনেক, নিশ্চয়। কি জেনেছ তা জানার আমার বিন্দুমাত্র আগ্রহ নেই। কিন্তু আমি জেনেছি তুমি আমাকে প্রশমিত ও প্রবোধ দেবার প্রয়াসে বাইশ বছর আগে যে-সব কথা বলেছিলে, তা মিথ্যা মিথ্যা মিথ্যা।

তোমাকে আজ অকপটে বলছি। তুমি চুপ করে পর্দার আড়ালে দাঁড়িয়ে কান মন স্থির করে শোনো। আমার স্ত্রী রূপসী। বাংলাদেশে রূপসী বললে যা বোঝায়—সেই অর্থে নয়। উচ্ছ্বসিত স্বাস্থ্য এবং দুর্বল করে দেওয়ার মত রূপ দুই তার আছে। আমার প্রতি তার প্রেম ও ভালবাসা সম্পর্কে আমার বিন্দুমাত্র সংশয় নেই। একটি মেয়ে আছে যাকে পেয়ে আমি গর্বিত। একটি ছেলে—ছেলের যেমন হওয়া উচিত তেমনি একটি ছেলে।

টাকা পয়সার অভাব আমার নেই। কোনো অর্থেই নেই। কি সামান্য মাল-মুয়াচুরী করলে কত অফুরন্ত টাকা রোজগার করা যায়, সে সব আমার দেখা হয়েছে। তোমার সঙ্গে ঘুরে বেড়াবার বয়সে যাদের নাম উচ্চারণ করেছি পরম শ্রদ্ধায়, তাঁদের অনেকের সঙ্গেই এখন গভীর রাতে পানপাত্রে মিলিত হই।

[illegible]

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] করতে পারি। সে [illegible] [illegible] [illegible] [illegible], [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] চেপে রাখতে পারি।

আমার আর [illegible] মোহ নেই। বিশ্বাস কর, আমার আর কোনো মোহ নেই। আমি টাকা চাই না, প্রশংসা চাই না। বাড়ি গাড়ি ধন দৌলতের মোহ আমি পার হয়ে এসেছি। অজস্র যৌনসম্ভোগ আমি করেছি। এখন এতে আমি আর কোনো উদ্দীপনা লাভ করি না। মদ খাওয়া আমি ছেড়ে দিয়েছি। ছেলেমেয়ে, স্ত্রীকে নিয়ে একটা নূতন নেশা তৈরী করার চেষ্টা করছি। সেই মন নিয়ে বেশ আরামেই আছি। এর বাইরে এখন অন্য কিছুই নেই। নেই মানে, রাখিনি। জপ তপ সন্ধ্যা আহ্নিক নিয়মিত ও নিয়মমত করার চেষ্টা করি। গুরুদেবের কাছে প্রায়ই যাই। সেখানে গেলে শান্তি পাই। অনেক গুরুভার হাল্কা হলো মনে হয়। নিজের বলে আর কিছুই রাখিনি।

যথার্থ অন্তরের মধ্যে তোমার একটা ছবি আছে। কাগজে ছাপা ছবি নয়। মনের মধ্যে। এত বড় শহর, এত পালা-বদল, এত বিশ্বাস অবিশ্বাসের মধ্যে সেই ছবিটা অটুট আছে। একটু দুমড়ায়নি। একটু মোচড়ায়নি। এক কোণাও ছেঁড়েনি। রং একটুও জলুসেটে হয়নি। ঝকঝকে। যেন এইমাত্র তোলা হয়েছে, এমন। চোখ বুজলেই দেখতে পাই। কী চোখ, কী ভ্রূ, কী আঁখি-পল্লব। প্রতিভারের বসন্তের মত নবীন। প্রাণে ভরা সেই ছবি।

তোমার পায়ে পড়ি, তিনপাহাড়ে এসে, বড় যত্নে বড় সোহাগে বড় আদরে তুলে রাখা সে ছবি আমার, নিজ হাতে টুকরো টুকরো করে দিয়ে যেও না।

তুমি নিজে এসো না।

ধরেছে বড় অকটোপাসের। জো আর জ্যাক দুজনেই অসম সাহসী, অকটোপাসের আক্রমণ থেকে বিপদের আশংকা তারা হেসেই উড়িয়ে দিতে চাইল, কিন্তু লেইনা বলল, 'মনে রেখ, বিপদে পড়লেই দড়িটা চারবার টানবে।'

ওরা ডুবুরির পোশাকে সজ্জিত হল, লেইনা সে ব্যাপারেও তদারক করতে ছাড়ল না। মাথায় ডুবুরির টুপিটা আঁটবার পর মুখের সামনের ঢাকনাটা নামিয়ে দেবার পূর্ব মুহূর্তে লেইনা হঠাৎ একটা কাণ্ড করে বসল। জোকে জড়িয়ে ধরে একটা দীর্ঘ চুম্বন এঁকে দিল ওর ঠোঁটে। জো নিজেও কম বিস্মিত হয়নি। মুখের ঢাকনাটা নামাতে নামাতে জ্যাক ভাবল এই প্রথম তাদের দুজনের মধ্যে কাকে বেশি পছন্দ করে তার স্পষ্ট আভাস দিল লেইনা।

জলে নামার আগে ছুরিটা খাপে ঠিকমত আছে কিনা দেখে নিল জ্যাক। একটু অসাবধান হলেই ধারালো ছুরিটা এয়ার হোসের ক্ষতি করতে পারে। পরিষ্কার টলটলে জল। ওরা দুজনে একই সঙ্গে স্পর্শ করল প্রবালের মেঝে। চারদিকে তাকিয়ে ওরা অবাক না হয়ে পারল না। এত গভীরেও চারপাশ স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। প্রবালের ঢিবিগুলোকে অস্পষ্ট রামধনুর মত দেখাচ্ছে, আর রং-বেরঙের মাছ ভেসে বেড়াচ্ছে তাদের চারপাশে। ওরা দুজন সমুদ্রের তলায় সন্ধানী দৃষ্টি ফেলতে লাগল। প্রবালের ঢিবিগুলি কিন্তু খুবই ধারালো।

ক্রমে ওরা বেশ একটু খোলা-মেলা জায়গায় এসে পড়ল। সামুদ্রিক উদ্ভিদ দাঁড়িয়ে আছে এখানে ওখানে। ওপর থেকে ঝুলিয়ে দেওয়া দড়ি দুজনের ওদের সীমানা নির্দেশ করছে তা প্রায় স্পর্শ করেছে ওরা, কিন্তু কোথায় সেই ঝিনুক? গভীর জলের হিমশীতলতা জ্যাককে যেন বিষণ্ণ করছিল। হাল ছেড়ে ও ওপরে উঠবে ভাবছে ঠিক তখনি একটা ঝলমলে দ্যুতি দৃষ্টি আকর্ষণ করল ওর। ঘন সামুদ্রিক আগাছার আড়ালে বিদ্যুৎচমকের মত ওটা যেন ক্ষণেক উঠেছিল। ব্যাপারটা কি দেখবার জন্য এগিয়ে গেল জ্যাক, বেশ পরিশ্রম করেই ওখানে পৌঁছুতে হল ওকে। তারপরই হঠাৎ ওর সমস্ত ক্লান্তি যেন মুহূর্তে দূর হয়ে গেল। প্রচণ্ড উত্তেজনা শিরা উপশিরায় জাগল শিহরণ। একটা ঝিনুককে সে খুলতে আর বন্ধ হতে দেখেছে। আসলে ওরা ঝিনুকের আস্তরণের ওপর দিয়েই এতক্ষণ চলছিল। ঝিনুকের ভেতর থেকে মুক্তোটা ঝিলিক দিয়ে না উঠলে ওরা ওদের অস্তিত্ব টেরই পেত না। নিজেদের ছদ্মবেশের আড়ালে ঝিনুকের খোলাগুলি শত্রুর চোখে ধুলো দিয়ে আত্মরক্ষার চেষ্টা করছে।

জোকে ও ইসারায় ডাকল আর সেই সঙ্গে দড়িতে টান দিয়ে ঝিনুক তোলার জেটি ঝুড়ি নামিয়ে দেবার জন্য খবর পাঠিয়ে দিল ওপরে। আনন্দের আতিশয্যে দুই বন্ধু করমর্দন করল, তারপর একটা করে ঝিনুক ছুরি দিয়ে খুঁড়ে তুলতে লাগল। ওদের কাজ কিন্তু খুব ধীরগতিতে এগোচ্ছিল, অর্থাৎ হাতে চটপট ঝিনুক তোলা সম্ভব হচ্ছিল না। তা ছাড়া ঝিনুকের শক্ত খোলা আর ধারালো প্রান্ত ক্ষতবিক্ষত করে তুলেছিল ওদের হাত। যাহোক ছোট ঝুড়িটা ভরে ওরা ওপরে পাঠিয়ে দিল, তারপর দড়িতে টান দিয়ে ওদের ওপরে তোলার সংকেত পাঠাল। শুরু হল দীর্ঘ এবং [illegible] ওপরে ওঠা। ওদের জানা দরকার সত্যিই আদৌ দ্বীপপুঞ্জের কালো মুক্তোর সন্ধান তারা পেয়েছে কিনা! ওপর থেকে পাম্পের মৃদু হিস হিস শব্দ এয়ার হোসের ভেতর দিয়ে জ্যাকের কানেও প্রতিধ্বনি তুলছিল, সেটা যেন বলছিল, 'এটা কি আরু?......এটা কি আরু?...এটা কি আরু?'

ওরা দুজন দড়ির সিঁড়ি বেয়ে যখন জাহাজে উঠে এল তখন ক্লান্তিতে ওদের শরীর যেন ভেঙ্গে পড়ছে। লেইনা যে ছেলে দুটিকে এনেছিল তারা চটপট [illegible] অতিরিক্ত ওজন কেটে অনেকটা হাল্কা করল ওদের, আর ওরা টলতে টলতে দুটো চেয়ারে ধপ করে বসে পড়ল, প্রায় জ্ঞান হারাবার মত অবস্থা। ওই অবস্থাতেই জ্যাকের চোখে পড়ল খোলা ছাড়ানো ঝিনুকগুলি প্ল্যাটফর্মে ছড়িয়ে আছে। মুখের ঢাকনাটা সরিয়ে প্রাণভরে তাজা নিঃশ্বাস নেবার জন্য ও চেষ্টা করছিল। হঠাৎ লেইনা নিজের ডান হাতের তালুটা ওর নাকের সামনে মেলে ধরল। সেই তালুতে দুটো নিখুঁত, খাঁটি কালচে-সবুজ মুক্তো টল টল করছে। লেইনা যে ওদের ঠিক জায়গায় নিয়ে এসেছে সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। সে দিনটা উৎসব করল ওরা।

পরবর্তী দিনগুলিতে জ্যাক উপলব্ধি করল লেইনা আর জো সত্যিই পরস্পরকে ভালবেসেছে। বাহুবন্দী অবস্থায় ঘণ্টার পর ঘণ্টা কাটাছিল ওদের। সুখী হাসি-খুশী একজোড়া প্রেমিক প্রেমিকা। ভবিষ্যতের রঙীন পরিকল্পনায় মেতে উঠেছিল ওরা। এমনকি খাবার সময়েও লেইনা পাত থেকে বাছা বাছা মাংসের টুকরোগুলি তুলে জোর মুখে গুঁজে দিত, আর দুজনে একসঙ্গে সকৌতুকে হেসে উঠত। লেইনা তার মনের মানুষকে বেছে নিয়েছে সুতরাং জ্যাকের কিছু বলার নেই, কিন্তু একটু ঈর্ষা অনুভব না করেও পারেনি। ও নিজের কাজে আরও ডুবিয়ে দিল নিজেকে। সাজ-পোশাক ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধরে ঝকঝকে করে রাখা, ছুরিগুলি শান দিয়ে ক্ষুরের পাতলা ফলার মত ধারাল করা, এসব নিয়েই মেতে ছিল ও। প্রচুর ধনের মালিক হয়ে সিঙ্গাপুরে ফিরে যাবে জ্যাক, তারপর খুঁজে নেবে মনোমত পাত্রী, লেইনার চাইতে অনেক সুন্দরী একটি মেয়ে।

একদিন রাত্তিরে ঘুম আসছিল না ওর চোখে। ছেলে দুটোকে ও ঘুম থেকে জাগাল, তারপর ওদের হাতে পাম্পের ভার দিয়ে জলে নেমে পড়ল। বেশি নিচে ও নামেনি, হঠাৎ যেন মুহূর্তেই ওকে ওপরে টেনে তোলা হল। জো আর লেইনা পাম্পের শব্দ শুনে উঠে এসেছে, তারপর হুকুম করেছে ওকে টেনে তুলতে। তারা ওকে হঠকারিতার জন্য খুব বকাবকি করল। জ্যাক অবশ্য একটু বোকা হাসি হাসল, শুধু মনে মনে সে ওদের ধন্যবাদই দিল, কেননা রাতে জলের তলায় গাঢ় অন্ধকার ওর কাছে দুঃস্বপ্নের মত হয়েছিল। আরও একটা জিনিস ও [illegible] হয়েছিল, রাগলে লেইনাকে তপ্ত কাঞ্চন-বর্ণের মত সুন্দরী দেখায়। জ্যাক হঠাৎ আবিষ্কার করল সে-ও ভালবাসে লেইনাকে।

পুরো মাসটাই ওরা ঝিনুক তোলার কাজে ব্যস্ত রইল। সব ঝিনুকে অবশ্য মুক্তো ছিল না, কিন্তু যেগুলিতে ছিল সেগুলি আকারে বিরাট। নিখুঁত মুক্তোর সংখ্যা [illegible] দাঁড়াল গেল। এপর্যন্ত হাঙর বা অকটোপাস থেকে ওদের কোনো বিপদ আসেনি। কয়েকটা হাঙরের সামনে অবশ্য ওরা পড়েছিল, কিন্তু তারা অলস কৌতূহলে ওদের লক্ষ্য করা ছাড়া আর কিছু করে নি। লেইনা বলল পেট ভরাবার জন্য প্রচুর মাছ তাদের জোটে তাই মানুষ দেখে চিত্ত চঞ্চল হয়নি। প্রবাল গুহায় বসবাসকারী রাক্ষুসে অকটোপাসের দেখা কিন্তু ওরা পায় নি। ওখানে ওগুলোর অস্তিত্ব সম্বন্ধে তাদের মনে সন্দেহ জেগেছিল। ওদের ডুবুরির পোশাক আর হাতের দস্তানা চটের কাপড়ে মোড়া থাকত—ওটা ছিল আত্ম-সংরক্ষার একটা অঙ্গ। লেইনা ওদের বলেছিল চটের কাপড়ের স্পর্শ অকটোপাসেরা পছন্দ করে না। কোনো অকটোপাস যদি ওদের দিকে এগিয়ে আসে তবে [illegible] ওরা স্থির হয়ে থাকে। অকটোপাস ওদের আপাদমস্তক অনুভব করতে পারে, [illegible] চটে ঢাকা থাকবে না। এই অতিরিক্ত সতর্কতা কিন্তু ওদের মোটে পছন্দ হয় নি।

একদিন সকালে জো একা সমুদ্রের তলায় নেমেছে। জ্যাক তার শিরোস্ত্রাণে একটা নতুন [illegible] পরাবার কাজে ব্যস্ত, হঠাৎ লেইনা তীক্ষ্ণ আর্তনাদ করে উঠল। যে যেখানে ডুব দিয়েছে ও সেখানকার দড়িটার ওপর নজর রাখছিল, দড়িতে বেশ জোরে চারবার টান পড়েছে। অর্থাৎ বিপদের সংকেত। জ্যাক আর ছেলে দুটো দড়ি ধরে সজোরে টানল। কিন্তু ওটা যে কিছুতে আটকে গেছে, একটুও উঠে এল না। সমুদ্রের তলায় কিছু একটা আঁকড়ে ধরেছে জোকে। লেইনা মিনতিভরা দৃষ্টিতে তাকালো জ্যাকের দিকে। জ্যাক নিঃশব্দে তার সাজ-পোশাক গায়ে চাপাতে লাগল। তার প্রিয় বন্ধু সাহায্য চাইছে, সে কি উপেক্ষা করতে পারে! তার পোশাকের বাহু মুক্তের আধারে দুটো অতিরিক্ত ছুরি গুঁজে দেওয়া হল। একটা অজানা বিপদের আশঙ্কায় অতি বড় সাহসী যে জ্যাক, সে-ও ঘামতে থাকে।

জ্যাক অতিরিক্ত একজন পাউন্ড ও[illegible] নিয়ে জলে নামল, ছেলে দুটিকে বলল, [illegible] নিজের এবং জোর দড়ি যাতে জড়িয়ে [illegible] যায় সেদিকে লক্ষ্য রাখতে। বাঁদিকে জো[illegible] দড়িটা থরথর করে কাঁপছে এটা তার নজরে পড়ল। সমুদ্রের তলায় পৌঁছে সেই দ[illegible] অনুসরণ করে এগুতে থাকে ও। সামনে একটা প্রবাল গুহা আর মুখে একটা শিল[illegible]

শিলাখণ্ডের কাছে পৌঁছে অবস্থাটা বুঝে নেবার জন্য ও থমকে দাঁড়াল। হয়তো ওটাই বাঁচিয়ে দিল ওকে। ঠিক তখনি একটা অকটোপাসের বাহু বা শুঁড় চাবুকের মত আছড়ে পড়ল ওর কয়েক হাত সামনে। ও যদি না থেমে এগিয়ে যেত তবে আচমকা ওই শুঁড়ের আলিঙ্গনে অসহায় হয়ে পড়ত। শুঁড়টাকে যেমন দীর্ঘ তেমন স্ফীত দেখাচ্ছিল, জায়ান্ট অকটোপাসের যেমনটি হয়। শিলাখণ্ডের ওপাশ থেকে আঘাত হানবার চেষ্টা করছিল ওটা। শুঁড় বা বাহুটা জলে আছড়ে পড়ার যে প্রচণ্ড আলোড়নের সৃষ্টি হল তা জ্যাককে মাটি ছাড়া করে শূইয়ে দিল. ঠাণ্ডা একটা হিম শিহরণ বয়ে গেল ওর মেরুদণ্ড বেয়ে। নিজেকে সামলে তাল করে জীবটাকে দেখার জন্য ও সাবধানী দৃষ্টি ফেলল। হ্যাঁ, রাক্ষসটা ওর আটটা শুঁড়ের দুটো দিয়ে ওই শিলাখণ্ড আঁকড়ে আছে, বাকিগুলো দিয়ে জোঁকে আস্টে-পৃষ্ঠে বেঁধে ওটার কুৎসিৎ মুখের কাছে টেনে হিঁচড়ে নেবার চেষ্টা করছে। বেচারা জো কোনমতে একটা হাত মুক্ত রেখে ওটাকে লক্ষ্য করে ক্ষীণভাবে এলোপাথাড়ি ছুরি চালাচ্ছে, স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে ওর শক্তি নিঃশেষ হয়ে আসছে। মুহূর্তের দ্বিধা না করে জ্যাক 'অকটোপাস মারার' বড়, ভারী, ধারালো ছুরিটা হাতে নিয়ে ছুটে গেল দানবটার দিকে।

প্রবালের একটা স্তরের ওপর দিয়ে এগিয়ে যাবার সময় হিংস্র জীবটার তুলনায় তার দৈহিক শক্তি আর সামান্য ছুরি যে কত নগণ্য তা মর্মে মর্মে উপলব্ধি করল জ্যাক। যে শুঁড় দুটো দিয়ে ওটা শিলাটাকে আঁকড়ে শরীরের ভারসাম্য রক্ষা করছিল, সে-দুটো লক্ষ্য করে ক্ষুরধার ছুরি চালাল জ্যাক। শুঁড় দুটো আলগা হয়ে গেলে দানবটা বে-সামাল হয়ে পড়বে এটা মনে মনে হিসেব করে নিয়েছিল ও। জ্যাকের হিসেবে ভুল হয়নি। শুঁড় দুটো কাটা পড়তেই অকটোপাসটা সত্যিই ভারসাম্য হারিয়ে ছেড়ে দিল তার শিকারকে আর উন্মত্তের মত বাকি কটা শুঁড় জলে আছড়াতে আছড়াতে এমন একটা প্রচণ্ড ঘূর্ণি সৃষ্টি করল যে, তার আলোড়নে অসহায়ের মত ডিগবাজি খেতে লাগল জো। জ্যাক মরীয়ার মত নিজেকে সামলাবার চেষ্টা করছিল। সাক্ষাৎ শয়তানের মত অকটোপাসটা এবার ওর ওপর চড়াও হল। জ্যাক দু হাতে দুটো ছুরি নিয়ে আক্রমণের মোকাবিলার জন্য প্রস্তুত হয়ে দাঁড়াল। মনে মনে ও প্রার্থনা করছিল যেন ওর এয়ার হোসটা বিকল হয়ে না যায়।

রাক্ষুসে জীবটা জ্যাকের কাছাকাছি এসে দাঁড়িয়ে পড়ল, তারপর অনুসন্ধানী একটা নরম আকর্ষ প্রসারিত করল ওর দিকে। জ্যাক সঙ্গে সঙ্গে ছুরির এক ঘায়ে আকর্ষটিকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলল শরীর থেকে। ওটা যখন রাগে ফুঁসতে ফুঁসতে ঠিকরে ঠিকরে ওঠানামা করছিল তখন জ্যাক স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছিল ওটার রং বদলে যাচ্ছে। তারপরই হিংস্রভাবে ওটা ঝাঁপিয়ে পড়ল ওর ওপর। ওকে আলিঙ্গন করতে উদ্যত শুঁড় লক্ষ্য করে পাগলের মত ছুরি চালাতে লাগল জ্যাক। ওর হেলমেটের কাছে দুটো বড় বড় গোল চোখ আর একটা কুৎসিৎ ঠোঁট দেখা দিল। বাঁ হাতের ছোট ছুরিটা একটা চোখে আমূল বসিয়ে দিল জ্যাক। রাক্ষসটা ছিটকে সরে গেল ওর কাছ থেকে।

জলের আলোড়ন জ্যাককে প্রবাল ঢিবি থেকে ঠেলে ফেলে দিয়েছিল। হাঁটুতে ভর দিয়ে ও উঠে দাঁড়াল, ওর কয়েক হাত দূরেই জো উঠে দাঁড়াবার চেষ্টা করছে। জ্যাক ভাবল জো নিজেকে সামলে না নেওয়া পর্যন্ত ও যদি অকটোপাসটার দৃষ্টি তার থেকে সরিয়ে রাখতে পারে তবেই তাদের দুজনের বাঁচার সম্ভাবনার কথা ভাবা যেতে পারে, নতুবা নয়। শয়তানটা গেল কোথায়? আর একটা ছুরি নিয়ে ও প্রস্তুত হল, আর তখনি হঠাৎ ওটা তেড়ে এল ওর দিকে। দু' হাতে দুটো ছুরি শূন্যে উঁচিয়ে একপাশে সরে যাবার চেষ্টা করল জ্যাক। অকটোপাসটা আবার থেমে পড়ল, ওর রংটা এবার কেমন যেন নীলবর্ণ হয়ে গেল, তারপরই অবিশ্বাস্য ক্ষিপ্রতায় পেছন দিকে হটে একটা প্রবাল গুহার মুখে গিয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল। জ্যাক অস্পষ্টভাবে দেখতে পাচ্ছিল আকর্ষগুলির ওপর ভর দিয়ে ওটা রবারের বলের মত ওঠানামা করছে আর যেন দ্রুত রং বদলাচ্ছে।

খাপে ছুরি দুটো ভরে জ্যাক তাড়াতাড়ি বন্ধুর দিকে এগিয়ে গেল। প্রবালের একটা খাঁজে জো'র লাইনটা আটকে গিয়েছিল, সেটা ও ছাড়িয়ে দিল। তারপরই পাগলের মত চারবার টান দিল দড়ি ধরে। আস্তে আস্তে ওটা ওপরে উঠতে লাগল, বন্ধুকে বাঁচাতে পেরেছে জ্যাক।

ইতিমধ্যে ও পা দুটো যথাসম্ভব শক্তভাবে মাটিতে রেখে ছুরি দুটো দু' হাতে উঁচিয়ে ঘনঘন নাড়াচ্ছিল। জো'র দিক থেকে শয়তানটার দৃষ্টি সরিয়ে নেবার জন্যই অমন করছিল ও। কিছুই ঘটল না। ওটাকে আর সে দেখতে পাচ্ছে না। বিপদ এড়ানো গেছে মনে করে একপা একপা করে ও পেছোতে লাগল। হঠাৎ চাবুকের মত কি যেন একটা ছুঁয়ে গেল ওর ডুবুরির টুপিটা। অন্যের মত ও ছুরি চালাল। কিন্তু একটার আঘাত করল ছুরিটা। হঠাৎ কোথা থেকে কালো একটা শুঁড় এসে সাপের মত বেঁধে ফেলল ওকে, মাটি ছাড়া হয়ে শূন্যে উঠে গেল ও। একটা প্রচণ্ড চাপে ওর নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে আসছে, এই বুঝি জ্ঞান হারিয়ে ফেলবে। নিঃশ্বাসের সঙ্গে আটকানো বাতাসের বুদ্বুদের হিস্ হিস্ শব্দ হঠাৎ বন্ধ হয়ে গেল। এই অবস্থাতেও মাথা ঠাণ্ডা রেখে ওর সর্বাঙ্গে আষ্টে-পৃষ্ঠে জড়ানো শুঁড়গুলি ও পেঁচিয়ে পেঁচিয়ে কাটতে লাগল, শরীরটাকে মোচড় দিয়ে, ঘুরিয়ে, আলিঙ্গনের বাঁধন আলগা করার জন্য মরীয়া হয়ে লড়তে লাগল। চকিতে একটা দানবীয় মুখ ভেসে উঠল ওর সামনে। শেষ শক্তিটুকু দিয়ে অকটোপাস মারার ছুরিটা ওটার কদর্য ঠোঁটের তলায় বসিয়ে দিল জ্যাক। এতেই কাজ হল। মৃত্যুপথযাত্রী সময়ে রাক্ষসটার মুখ থেকে ফোয়ারার মত উৎসারিত কালিবর্ণ রং চারদিক অন্ধকার করে ফেলল। জ্যাকের শরীরের চাপটা হঠাৎ যেন প্রচণ্ডতর হয়ে উঠল, তারপরই সাপ-পাশ আলগা হতে লাগল। কর্তিত শুঁড়গুলো ওর দেহ থেকে খসে খসে পড়তে লাগল। লড়াই শেষ।

ওর শিরস্ত্রাণে বাতাসে ঢোকার হিস্-হিস্ শব্দটা আবার শুরু হয়েছিল। কৃতজ্ঞের মত সেই বাতাস বুক ভরে ও টানল, তারপরই নিজের দড়ি ধরে টান দিল চারবার। যখন ওপরের টানে ও আস্তে আস্তে উঠে যাচ্ছিল তখন ওর মনে আছে ও শিশুর মত কেঁদেছিল। ওকে জাহাজের পাটাতনে তুলে হেলমেটটা খুলে সরিয়ে নেওয়া হল। সেইনা হঠাৎ একটা কাণ্ড করে বসল, ওর অধরে এঁকে দিল একটা উষ্ণ চুম্বন। জোকে বাঁচিয়েছে বলেই কি এই পুরস্কার, না ও নিজে নিরাপদে ফিরে এসেছে বলে চুম্বনটায় আনন্দের বহিঃপ্রকাশ!

এ ঘটনার পর ওরা দুজনেই সমুদ্রের তলায় আবার ঝিনুকের সন্ধানে নামতে তেমন আর উৎসাহ বোধ করছিল না। এ সত্যটা ওদের কাছে স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল যে, ভাগ্য

সৌভাগ্য ছিল বলেই অক্টোপাসটার হাত থেকে নিস্তার পেয়ে ওরা ফিরে আসতে পেরেছে। বারবার ভাগ্য ওদের সহায় হবে এ আশা করা অনুচিত। ওদের মোকাবিলার জন্য চাই উপযুক্ত সাজ-সরঞ্জাম, শুধুমাত্র ছুরি নিয়ে ওদের মুখোমুখি হওয়া বাতুলতা মাত্র।

জ্যাকই পরামর্শ দিল, জো বারোটা মুক্তো নিয়ে সানফ্রান্সিসকোয় চলে যাক। সেখানে ডুবুরির সর্বাধুনিক যন্ত্রপাতি সম্বন্ধে ও খোঁজ-খবর করবে। একটা ইলেকট্রিক ঘণ্টা-যুক্ত পোশাকের কথা ওরা শুনেছিল। ওটা নাকি সমুদ্রের গভীরে নামানো যায়। ওটায় একটা বিশেষ দরজা থাকে, যা দিয়ে ডুবুরিরা ঢুকতে বেরুতে পারে, সামুদ্রিক জীবের হাত থেকে আত্মরক্ষার পক্ষে চমৎকার একটা আধার। প্রবাল গুহায় ডেপথ বম্ব ফাটিয়ে অক্টোপাস তাড়াবার কথাও ওরা আলোচনা করল, কিন্তু তাতে হিতে বিপরীত হতে পারে ভেবে প্রস্তাবটা নাকচ হয়ে গেল। শেষ পর্যন্ত স্থির হল জো বারোটা মুক্তো নিয়ে সিঙ্গাপুর থেকে আকাশপথে সানফ্রান্সিসকোয় পাড়ি দেবে। লেইনা আর জ্যাক দুটো করে মুক্তো নিজেদের কাছে রাখবে। জো অন্তত কুড়ি টনের একটা নতুন জাহাজের সন্ধান করবে। তার কারণ নতুন সাজ-সরঞ্জাম আর মুক্তো ঝিনুক রাখার জন্য আরও বেশি জায়গার দরকার।

ওরা সিঙ্গাপুরে ফিরে গেল। কথামত জো সানফ্রান্সিসকোয় রওনা হয়ে গেল, বলে গেল ছ' মাসের মধ্যে ফিরে আসবে, তারপর নতুন উদ্যমে ওরা আবার যাত্রা করবে আর দ্বীপপুঞ্জে মুক্তোর সন্ধানে। বিমানবন্দরে লেইনা সজল চোখে বিদায় জানাল জোকে, সে-ও প্রতিশ্রুতি দিল লেইনার জন্য একটা সুন্দর সাদা বিয়ের পোশাক নিয়ে আসবে, নিউগিনি যাবার আগেই বিয়েটা সেরে নেবে ওরা।

ছ'মাস দেখতে দেখতে কেটে গেল, কিন্তু জোর কোনো খবর নেই। এক বছর কেটে গেল। কি হল জ্যাকের প্রাণের বন্ধুর? কেউ কি মুক্তোগুলির জন্য তাকে খুন করেছে? জো ঠিক করল ব্যাপারটা কি জানা দরকার। একটা মালবাহী জাহাজে খালাসির কাজ নিয়ে তাই সে এসেছিল সানফ্রান্সিসকোয়; তার গলায় কালো হরিণের চামড়ার থলিতে ছিল দুটো মূল্যবান কালো মুক্তো। বন্ধুর খোঁজে সারা শহর ও চষে বেড়িয়েছিল, কিন্তু তার খোঁজ সে পায় নি। মুক্তোগুলি নিয়ে জো সরে পড়েছে এ চিন্তা ওর মনে একবারও ঠাঁই পায় নি। কেন সে তা করবে? দু বর্গমাইল জুড়ে যেখানে ছড়িয়ে আছে মুক্তোগর্ভ ঝিনুক সেখানে বারোটা মুক্তো কিছুই নয়। না, নিশ্চয়ই কিছু ঘটেছে ওর। হয়তো সানফ্রান্সিসকোয় পৌঁছতেই পারে নি জো, কিংবা পৌঁছবার পর কিছু একটা দুর্ঘটনা ঘটেছে ওর জীবনে।

অক্টোপাস মারার জন্য জলের তলায় ব্যবহার করা হয় এমন বন্দুকের সন্ধান পেয়েছে জ্যাক। প্রায় তিরিশ ফুট দূর থেকে একটা অক্টোপাসকে খতম করা যায় এই বন্দুক দিয়ে। আবার অভিযান শুরু করার সব কিছুই ঠিক, কিন্তু কোথায় জো?

এই হচ্ছে জ্যাকের কাহিনী, বিস্ময়কর নিশ্চয়ই। ভাল কথা, লেইনার কি হল? সেটা অবশ্য চমকপ্রদ কিছু নয়। যেদিন জো সানফ্রান্সিসকো যাত্রা করল তার পরদিনই জ্যাককে বিয়ে করেছে লেইনা। এটাকে অবশ্য প্রথম দর্শনেই প্রেম বলা যায় না, বরং বলা যেতে পারে দ্বিতীয় দর্শনে প্রেম।

নিউগিনির অদূরে, জনবসতিহীন আর দ্বীপপুঞ্জের নির্দিষ্ট এক জায়গায়, কাঁচে-সবুজ মুক্তো ছড়ানো রয়েছে সমুদ্রের অতলে। প্রায় দু বর্গ মাইল জুড়ে রয়েছে বড় বড় মুক্তো ভরা ঝিনুক, অপেক্ষা করছে সেই দুঃসাহসীর যে বা যারা বন্দীদশা থেকে মুক্ত করে আনবে সেই মুক্তোদের সমুদ্রগর্ভ থেকে; আর তাদের পাহারা দিচ্ছে সমুদ্রের শয়তান, সাক্ষাৎ যমদূতের মত খুনে অক্টোপাস বাহিনী—প্রবাল গুহায় যাদের বাস।
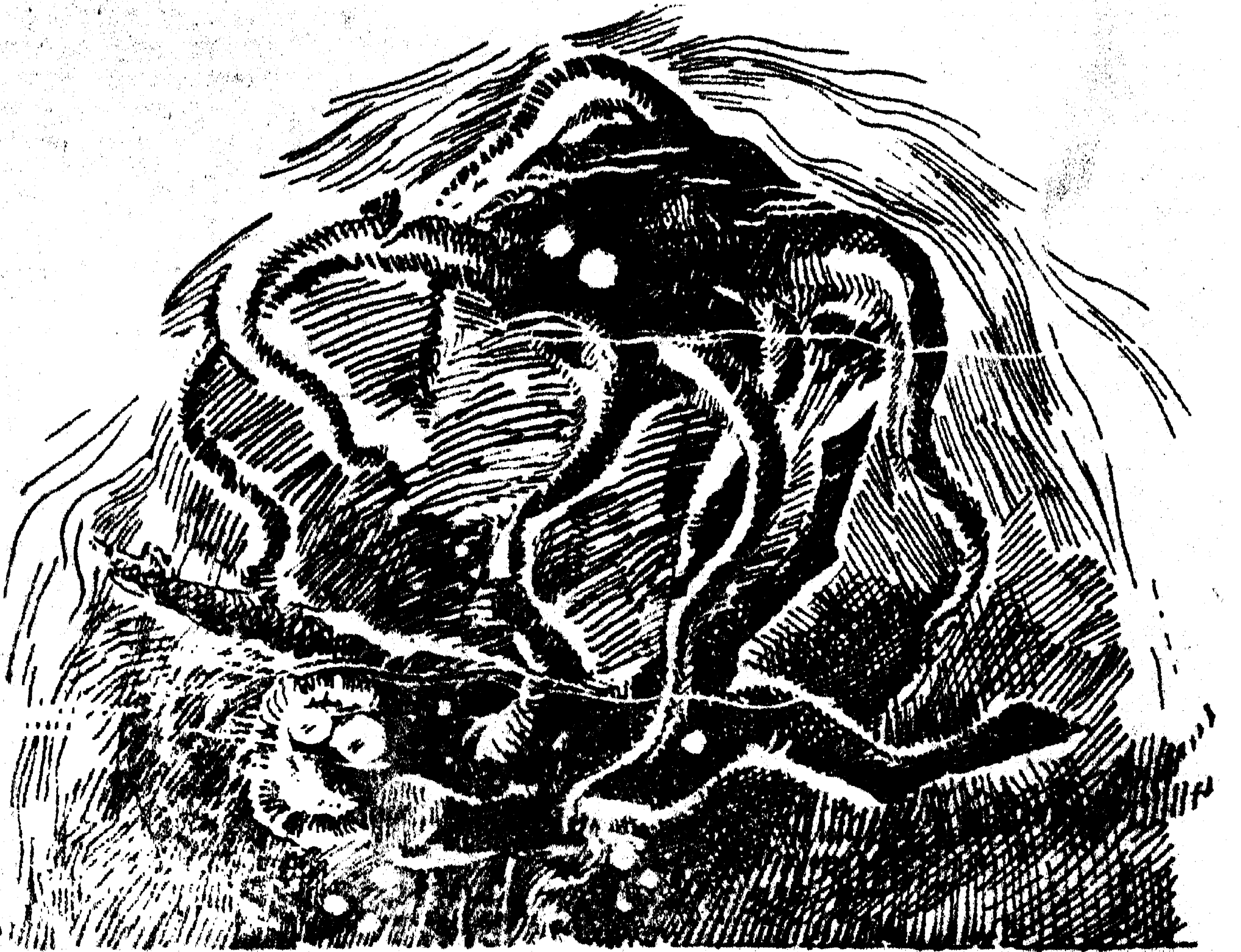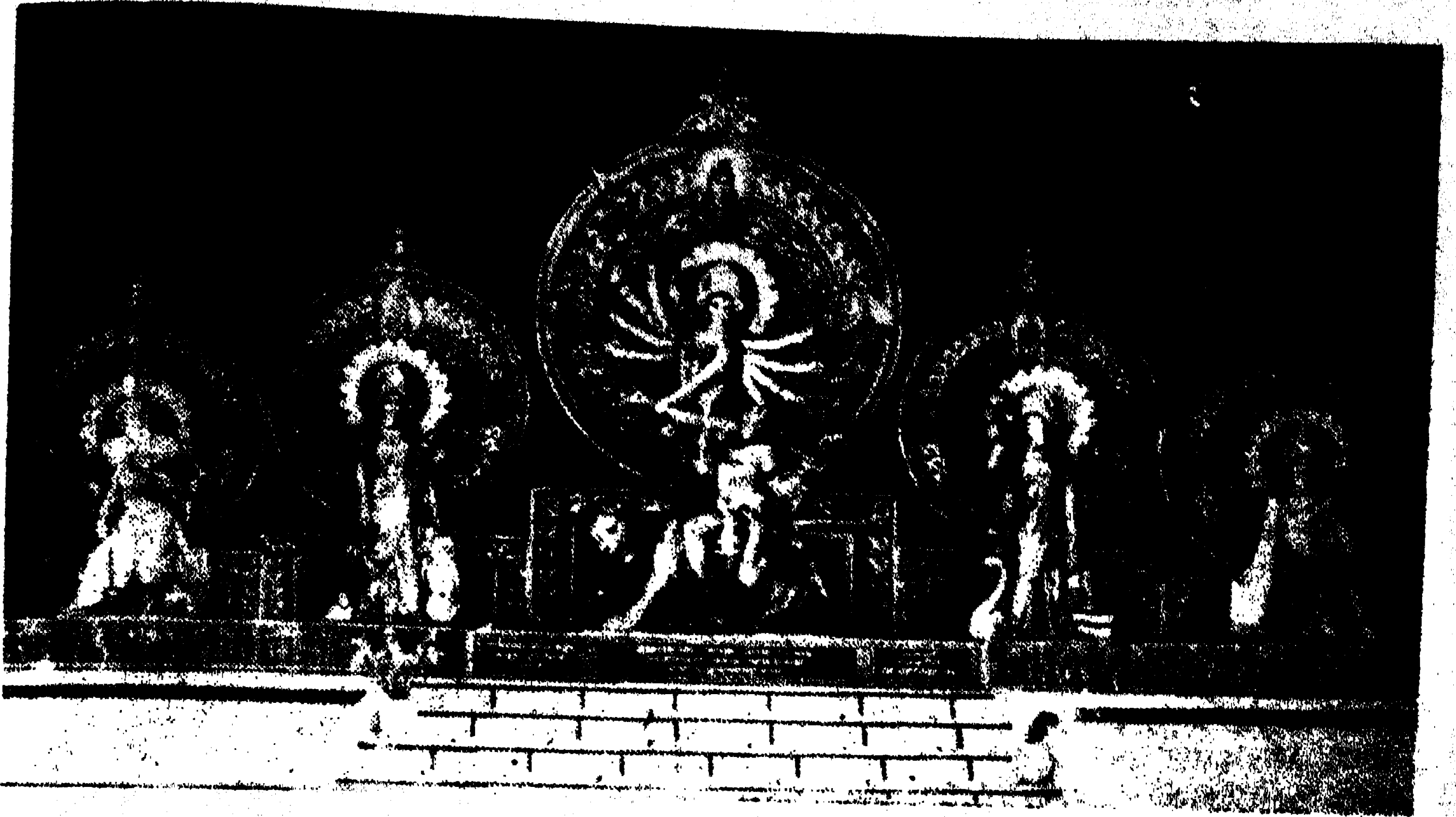
ঈশ্বরীকে নিয়ে বাদ-বিসম্বাদ

গৌরাঙ্গ ভৌমিক

রমেশ পালের মুখে শুনেছি, কুমোরটুলিতে এখনো এমন শিল্পী আছেন, যিনি একতাল কাদা মাটিকে মানুষের মুখে পরিণত করতে পারেন মুহূর্তের মধ্যে। একজন পেইন্টার এত কম সময়ে একটা পোর্ট্রেট আঁকার কথা ভাবতেও পারেন না।

কথা হচ্ছিল তাঁর স্টুডিওতে বসে। স্টুডিওর ঘূর্ণায়মান মঞ্চে এখন দাঁড়িয়ে আছেন অসম্পূর্ণ বিধানচন্দ্র রায়। দেশবন্ধু, মাতঙ্গিনী হাজরা, সূর্য সেন ময়দানে চলে গেছেন প্লাস্টার অফ প্যারিসের খোলস ফেলে রেখে। মূর্তি বানাবার আগে, তিনি বিস্তর ছবি এঁকেছেন জলরঙে, তেলরঙে। তারই দু-একটা নিদর্শন ঝুলছে স্টুডিওর দেয়ালে। পৌরাণিক নয়, নিসর্গ-চিত্র।

'এখন আছি ঐশ্বরিক পরিবেশে।' রমেশবাবু বলেছিলেন, 'বছরে দু মাস দেবী-সান্নিধ্যে কাটাই। ধর্মীয় শিল্পের চর্চা করি। বাকি দশ মাস থাকি মানুষের সঙ্গে। মানুষের মূর্তি বানাই।'

সঙ্গে সঙ্গে আমার মনে পড়ে গিয়েছিল যতীন্দ্রনাথ মজুমদারের নাম। শুনেছি, রাধাকৃষ্ণ বিষয়ক ছবি আঁকার সময় যতীনবাবু গুন গুন করে কীর্তন গান গাইতেন। সিগারেট খেতেন না। বিড়ি খেতেন। রমেশবাবুও অনুরূপ পারিবেশিক পরিস্থিতির ওপরে গুরুত্ব দিতে চান। তাঁর মতে, পরিবেশ অনুকূল না হলে শিল্পচর্চায় ব্যাঘাত ঘটে।

কুমোরটুলিতে কি এখন সেই পরিবেশ আছে?

না।

সময়ের হাওয়া লেগেছে এখন কুমোরটুলিতে। দেশজ ও ধর্মীয় রীতিতে তৈরি প্রতিমার চাহিদা নেই। প্রতিমার সঙ্গে তৈরি হয় পুতুল। ছাচে ঢালাই কার্তিক, গণেশ, লক্ষ্মী, সরস্বতী আসেন লরি বোঝাই হয়ে কুমোরটুলিতে, নানা জায়গা থেকে। আগে দেব মুখ ও মুখোস। দ্বিতীয়ত সাম্রাবাদ লাগে। আসেন রবীন্দ্রনাথ, গান্ধী, রামকৃষ্ণ, বিবেকানন্দ, নেতাজী। শিল্পী-পরিবারের ছেলেরাও আর পুরুষানুক্রমিক সন্তুষ্ট নন। আর্ট কলেজের ডিপ্লোমা নিয়ে তাঁরা এখন আধুনিক ভাস্কর্যের ধারণাকে আত্মসাৎ করে চলেছেন। দেবদেবীর বাহনেরা জন্তুজানোয়ার হওয়ায় চিড়িয়াখানায় গিয়ে বাঘ, সিংহ, ময়ূরের অঙ্গভঙ্গি স্টাডি করেন। তাঁরা চান, প্রতিমার অবয়ব বাস্তবধর্মী ও মানবিক হয়ে উঠুক।

শৈল্পিক ধারণাগত এই পরিবর্তনের সূত্রপাত হয়েছে কবে? কেউ জানেন না। হয়তো 'বন্দেমাতরম' রচনার কালে। হয়তো বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের সময়ে। এই শতকের গোড়ার দিকে যখন ভারতীয় দেবদেবীর রাজা রবি বর্মার ওলিওগ্রাফ ছড়িয়ে পড়ে কলকাতায়, তখন ছবির মূর্তিকে নকল করে কুমোরটুলির শিল্পীরা সাজাতে থাকেন এমন এক ধরনের মূর্তি, যা মেজাজে ধ্রুপদী হলেও পরিপূর্ণ ধ্রুপদী নয়। তাঁরা এই প্রবণতাটির প্রায় যেন অভিভাবক।'

প্রবণতাটি রয়ে গেছে এখনো।

এই প্রবণতায় বিশ্বাসী শিল্পীরা প্রতিমার চালচিত্র তৈরি করেন ভারতীয় মন্দির-স্থাপত্যের অনুকরণে। মূর্তির চোখে, মুখে, সাজসজ্জায় প্রাচীন ভারতীয় ভাস্কর্যের আদলটিকে ফুটিয়ে তুলতে চেষ্টা করেন।

কিন্তু এ প্রতিমা অর্চা নয়। অর্চা হল খাঁটি বাংলা প্রতিমা। কেননা, বাংলা প্রতিমার শরীর তৈরি হয় ভক্তের কল্পনার সঙ্গে শিল্পীর কল্পনা যুক্ত হয়ে। এ ধারণা যাঁরা পোষণ করেন, তাঁদের মতে, ধর্মীয়-সংস্কারহীন ধর্মীয়-শিল্পের অস্তিত্ব অসম্ভব। মন্ত্রে বলে, 'অতসী বর্ণাভাস....' অথচ গোলাপী রঙের রমণীয়তা বা তামাটে রঙের কাঠিন্য কোথায় প্রতিমার গায়ে—এ বৈপরীত্য চলতে পারে না।

খাঁটি বাংলা প্রতিমায় দুর্গার দুটো চোখ কপালের অনেকটা জায়গা জুড়ে থাকে, পদ্মের দুটো পাপড়ির মতো। ভ্রু দুটো কালো কালিতে আঁকা। দেখলে মনে হয় নিম কিংবা বাঁশ পাতা। ভ্রুর নিচে থাকে পরপর পাঁচটি রঙের পোচ—লাল, কালো, সবুজ, গেরুয়া, খাঁটি লাল।

এই পাঁচ রঙের সমাবেশে চোখ দুটোকে স্বপ্নাচ্ছন্ন মনে হয়।

চোখের তারা দুটো অন্তর্ভেদী। ওপরের বা নিচের পাতাকে স্পর্শ করে না। যেদিক থেকেই তাকানো যাক না কেন—ডান, বাম, সম্মুখ দিক থেকে মনে হয়, দুর্গা তাকিয়ে আছেন সোজাসুজি।

ভাল [illegible] অনেক উঁচু। জোহার বড় আলো [illegible] কোমরে বেল্ট, মাথায় টুপি, [illegible] নিয়ে কনেস্টবল দাঁড়িয়ে [illegible]। আশে-পাশে জিপ, কালো ভ্যান, মোটর সাইকেল, স্কুটার। যানবাহনের ভাল ব্যবস্থা। মোটর-লোরি ছুটোছুটি পথানে চলছে। এর মধ্যে নানা জাতের গাড়ি আসছে, যাচ্ছে।

'আসুন, এদিকে, ওপরে উঠতে হবে।'

আমরা বাঁদিকে ঘুরে যাই। সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠতে থাকি। সিঁড়ির দেয়ালে কাঠের বোর্ডে এক জায়গায় লেখা 'সি-আর-এস'। আমরা শেষ ধাপ উঠে যাই। লম্বা করিডোর। বাঁ-পাশে তারের জাল। ডান পাশে সারি সারি ঘর। অফিস চলছে। করিডোরের ওপর বেশ কিছু ছেলে-মেয়ে দাঁড়িয়ে আছে। কারো হাতে হাতব্যাগ, কারো কোমরে দড়ি। লম্বা লাইন। এতগুলো তরতাজা যুবক যুবতী কোথায় দাঁড়াতে পারে? আমার মনে হল এমপ্লয়মেন্ট এক্সচেঞ্জের অফিসে এসেছি। বেকার ছেলেমেয়ে জীবনের কাছে এসে দাঁড়িয়েছে। ক্রিমিনাল রেকর্ড সেকসন! সামনের ছবি, পিছনের ছবি, ডানের ছবি, বাঁয়ের ছবি, হাতের ছাপ, পায়ের ছাপ,.... দেশদ্রোহী,... ক্রিমিনাল। ভিড়ের মধ্যে আমি সেই মেয়েটিকে দেখতে পেলাম যাকে প্রথম দিন ওয়াগন ব্রেকার আর ডাকাতদের সাথে এক লক-আপে রাখা হয়েছিল। সারা রাত।

আমি পুলিশ ভদ্রলোককে ডাকি। উনি খুব আন্তরিক ভঙ্গিতে এগিয়ে আসেন। কি হয়েছে? কি চাই! এমন একটা ভাব। মেয়েটিকে দেখিয়ে বলি, 'ওঁকে চেনেন আপনি?'

'কে?.... ও... ও' তো... দত্তা—কেন?'

'আমি ওঁর সাথে একটু কথা বলবো—দেবেন বলতে?'

'চেনেন ওকে?'

'না।'

'তবে... কথা কি?'

লাইনের শেষ মাথায় একটি ছেলে দাঁড়িয়ে নাম ডাকছে। পুলিশ কিনা বোঝা যায় না। হাতে একটা লম্বা ফর্দ, কোমরের নীচে পর্যন্ত নেমে গেছে। পুলিশ ভদ্রলোকটি বললেন, 'ওর সঙ্গে কথা বলে কাজ নেই।'

'কেন?'

'সাংঘাতিক মেয়ে।'

'সাংঘাতিক কেন?'

পুলিশ ভদ্রলোক আমার মুখের দিকে কিছুক্ষণ চেয়ে রইলেন। বললেন, 'পরে বলবো.... [illegible]'...এক, দুই করে নাম ডাকছে। এক দুই করে এগিয়ে যায় ছেলে-মেয়েরা। একটা ঘরে ঢোকে, কিছুক্ষণ বাদে বেরিয়ে এসে চলে যায়। করিডোরের শেষ প্রান্তে। ওখানে একটা ছোট্ট ঘর। [illegible] আমরা দাঁড়িয়ে আছি। যারা যাচ্ছে তাদের নিয়ে ঘরে ঢুকছে। ঘরের দরজায় কালো পর্দা। ঘর থেকে যায়।

'ওখানে কি হয়?'

'কোথায়?'

'ওই যে—ওই ঘরে।'

'ও.... ছবি,... ছবি তোলা হয়।'

'বেশ ভাল ব্যবস্থা—না?'

'হ্যাঁ, ব্যবস্থা ভালই—আপনার ভাল লাগছে?'

'না।'

'তবে চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকুন, বকাবেন না।'

আমি চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকি।

আমি লাইন থেকে একটু দূরে, কিছু একটা দেখছিলাম। বেশ ভালো লাগছিল। অনেক স্মৃতি জড়ানো ইতিহাস আছে এই লাল বাড়িতে, অনেক স্মৃতি, বিস্মৃতি। অবশেষে আমি সেই ঘরের কাছে এলাম। আমার সামনে দুটো ছেলে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করছে। আমি তৃতীয় অপেক্ষা। দরজার ভেতর দিয়ে চোখ চালিয়ে দেই ভেতরে। চৌকো ঘর, মাঝারি গড়ন। মাঝখানে পাশা-পাশি জোড়া লাগান দুটো টেবিল। টেবিল ঘিরে, চার ছটি চেয়ার। প্রত্যেক চেয়ারে সুশ্রী কয়েকটি মেয়ে বসে কাজ করছে। নিজেদের মধ্যে হাত ফেরতা কি একটা জিনিস নিয়ে হাসাহাসি করছে। সুন্দর লাগছে দেখতে—সুন্দর। পুলিশ ভদ্রলোক আমার কাছে এগিয়ে এলেন। কানের কাছে মুখ নিয়ে ফিস ফিস করে কি সব বললেন।

বোঝা গেল না। সরে গেলেন। বললাম, 'কি' উনি বাঁ-হাত তুলে ইঙ্গিতে বললেন, পরে...পরে হবে। আমার সামনের ছেলেটি আমার দিকে ফিরে তাকাল। শুধু চুলকে ফিরে তাকাল। সারা মুখে কি একটা খেলছে ওর। সারা মুখ চোখের দৃষ্টি যেন বলছে, ওর সাথে কথা কি...কি বলছে তোমাকে? পুলিশ ভদ্রলোকটির ওপর আমার খুব রাগ হল। কিছু বলল না অথচ অনেক কিছু বলে গেল। যা আমি শুনতে পাই নি ওরা শুনেছে, বুঝতে পেরেছে। সেই সময় আমার ভিতর একটা অস্বস্তি [illegible] করছিল—কষ্ট হচ্ছিল খুব।

[illegible] অনেক [illegible] আমি [illegible] না। [illegible] যা।

[illegible] মেয়েটি [illegible] গেল। আমি [illegible] দেখতে পাচ্ছি। দুটি [illegible] বসে, [illegible] করছে। মেয়েটি [illegible] সামনে গিয়ে দাঁড়াল। [illegible] জায়গা নেই। প্রয়োজন মনে করে কি [illegible], প্রয়োজন নেই। একটি মেয়ে [illegible] দিকের কাছে বসে আছে। বাঁ-দিকের কাছে অন্য একটি মেয়ে। সেই প্রথমে মুখ তুলল, চোখ তুলল। বড় বড় [illegible] চোখ। মেয়েটি [illegible]।

'কি করা হবে?'

'লেখাই তো আছে।'

'দেখেছি, কি করা হবে?'

'লেখা আছে, আপনার দেখুন।'

এবার মেয়েটি হেসে ফেলল। টেবিলে একটা চাপড় মেরে হাতটা উঁচুতে রাখল। বলল, 'লেখা আছে, তুই একটা মেয়েকে খুন করেছিস। ঠিক?....

মেয়েটি দাঁড়িয়ে থাকে। ওঁর মুখ আমি দেখতে পাচ্ছিলাম না। কি যেন বলতে গিয়ে ও থেমে যায়।

'কি রে, থাকবে গেলি যে... ইচ্ছে ছিল এখানে আসতিস...তোর [illegible] করে কেন?...আমাদের কি পছন্দ হয় না...?

ডান পাশের মেয়েটি প্রতিবাদ করে। 'ওসব কথা ওকে বলো না। [illegible] করে... ওসব কথা ওকে কেন?

'[illegible] করে তো কি হয়েছে....'

সব কটি মেয়ে এক সাথে হেসে ওঠে। ডান পাশের মেয়েটি খুব গম্ভীর হয়ে যায়। হাসি থামে।

(ক্রমশ)

খেলা

দলীপ ট্রফি

বোম্বাইয়ের ওয়াংখাড়ে স্টেডিয়ামে ১৯৭৬-৭৭ সালের দলীপ ট্রফি আঞ্চলিক ক্রিকেট প্রতিযোগিতার ফাইনালে পশ্চিমাঞ্চল প্রথম ইনিংসে বেশী রান করার সুবাদে উত্তরাঞ্চলকে হারিয়ে দলীপ ট্রফি জয়ী হয়েছে। গত ষোল বছরের এই আঞ্চলিক ক্রিকেট প্রতিযোগিতায় দলীপ ট্রফি জয়ী হয়েছে এই চারটি দল—পশ্চিমাঞ্চল ৯ বার (এর মধ্যে একবার যুগ্ম বিজেতা), দক্ষিণাঞ্চল ৬ বার (এর মধ্যে একবার যুগ্ম বিজেতা), উত্তরাঞ্চল ১ বার এবং মধ্যাঞ্চল ১ বার। ১৯৬৩-৬৪ সালের প্রতিযোগিতায় পশ্চিমাঞ্চল এবং দক্ষিণাঞ্চল যুগ্ম-বিজেতা হয়েছিল।

উত্তরাঞ্চলের অধিনায়ক মদনলাল টসে জিতে পশ্চিমাঞ্চলকে ব্যাট করতে পাঠান। তিনি ভেবেছিলেন ভিজে পীচে তাঁর দলের বোলাররা খুবই সুবিধা পাবেন। কিন্তু তা হয়নি। তাছাড়া দলের ফিল্ডিং খুব খারাপ হয়েছিল। প্রথম দিনের খেলায় পশ্চিমাঞ্চলের প্রথম ইনিংসের ২টো উইকেট পড়ে ২২৪ রান উঠেছিল। পশ্চিমাঞ্চল দলের অধিনায়ক সুনীল গাভাসকার ৮৯ রান করে আউট হন। দিলীপ বেঙ্গসরকার ৩৫ রান করে অসুস্থতার কারণে খেলা থেকে অবসর নেন এবং অশোক মানকাদ ৪৬ রানে অপরাজিত থাকেন।

দ্বিতীয় দিনে পশ্চিমাঞ্চল তাদের প্রথম ইনিংসে ৪৮২ রানের (৮ উইকেটে) মাথায় খেলার সমাপ্তি ঘোষণা করে। খেলার বাকি সময়ে উত্তরাঞ্চল কোন উইকেট না খুইয়ে ৩১ রান তুলেছিল। দ্বিতীয় দিনের খেলায় উল্লেখযোগ্য ঘটনা, বেঙ্গসরকার এবং অশোক মানকাদের সেঞ্চুরী। তাছাড়া ৪র্থ উইকেটের জুটিতে মানকাদ এবং ঘাউড়ির ১১০ মিনিটের খেলায় ১০৯ রান সংগ্রহ। ঘাউড়ি ৬৭ মিনিটে তাঁর অর্ধশত রান পূর্ণ করেন। অশোক মানকাদ ১২৭ রান করে মাংসপেশীর টানে খেলা থেকে অবসর নিতে বাধ্য হন। তিনি ৩০৯ মিনিট উইকেটে থেকে তাঁর ১২৭ রানে ৯টা বাউন্ডারী এবং একটা ওভার বাউন্ডারী করেছিলেন। দিলীপ বেঙ্গসরকর ৩৫২ মিনিট খেলে তাঁর ১৫৭ রানে ১৯টি বাউন্ডারী এবং একটা ওভার-বাউন্ডারী মেরেছিলেন। উত্তরাঞ্চলের ফিল্ডিং খুবই খারাপ হয়েছিল। কম করে তারা ১২টা ক্যাচ ফেলেছিল। প্রথম দিনের খেলায় যেখানে ২২৪ রান উঠেছিল, দ্বিতীয় দিনে সেখানে উঠেছিল ২৮৯ রান—পশ্চিমাঞ্চলের ২৫৮ রান এবং উত্তরাঞ্চলের ৩১ রান।

তৃতীয় দিনে উত্তরাঞ্চলের প্রথম ইনিংসের রান দাঁড়ায় ২৫৬ (৫ উইকেটে)। ওপেনিং ব্যাটসম্যান চেতন চৌহান ১১২ রান করে অপরাজিত থাকেন। এছাড়া মহিন্দার অমরনাথের ৩৪ এবং সুরিন্দার অমরনাথের ৩৭ রান উল্লেখযোগ্য।

শেষ চতুর্থ দিনে উত্তরাঞ্চলের প্রথম ইনিংস ৩২৪ রানের মাথায় শেষ হলে পশ্চিমাঞ্চল ১৫৮ রানে এগিয়ে যায়। চৌহান ১২৮ রান করে আউট হন। পশ্চিমাঞ্চল দ্বিতীয় ইনিংস খেলতে নেমে ১২১ রানের (৬ উইকেটে) মাথায় খেলার সমাপ্তি ঘোষণা করে। যজুর্বেন্দ্র সিং ৫২ রান করে অপরাজিত থাকেন। খেলার বাকি সময়ে উত্তরাঞ্চল দ্বিতীয় ইনিংসের কোন উইকেট না খুইয়ে ৭৭ রান সংগ্রহ করেছিল। মহিন্দার অমরনাথ ৫৪ রান করে অপরাজিত থেকে যান।

সেমি-ফাইনালে গত বছরের চ্যাম্পিয়ান পশ্চিমাঞ্চল প্রথম ইনিংসের রানে মধ্যাঞ্চলকে এবং উত্তরাঞ্চলও প্রথম ইনিংসের রানে দক্ষিণাঞ্চলকে হারিয়ে ফাইনালে উঠেছিল।

সংক্ষিপ্ত স্কোর

পশ্চিমাঞ্চল ঃ ৪৮২ রান (৮ উইকেটে ডিক্লেয়ার্ড)—বেঙ্গসরকার ১৫৭, গাভাসকার ৮৯, অশোক মানকাদ ১২৭—অবসৃত এবং ঘাউড়ি ৫৭ রান। চৌহান ৬৭ রানে ৩ এবং মহিন্দর অমরনাথ ৫২ রানে ২ উইকেট)

ও ১২১ রান (৬ উইকেটে ডিক্লেয়ার্ড। যজুর্বেন্দ্র সিং ৫২ অপরাজিত। কপিল দেব ২৫ রানে ২, গোয়েল ২৩ রানে ২ এবং চৌহান ৩০ রানে ২ উইকেট)

উত্তরাঞ্চল ঃ ৩২৪ (চৌহান ১২৮ রান। পারসানা ৮০ রানে ৫ এবং যোশী ৫৫ রানে ৩ উইকেট)

ও ৭৭ রান (কোন উইকেট না পড়ে। এম অমরনাথ ৩৪ অপরাজিত এবং গিদোয়ানি ৩২ অপরাজিত)

দলীপ ট্রফি বিজয়ী

১৯৬১-৬২ পশ্চিমাঞ্চল ১৯৬২-৬৩ পশ্চিমাঞ্চল, ১৯৬৩-৬৪ পশ্চিমাঞ্চল এবং দক্ষিণাঞ্চল (যুগ্মবিজয়ী), ১৯৬৪-৬৫ পশ্চিমাঞ্চল, ১৯৬৫-৬৬ দক্ষিণাঞ্চল, ১৯৬৬-৬৭ দক্ষিণাঞ্চল, ১৯৬৭-৬৮ দক্ষিণাঞ্চল, ১৯৬৮-৬৯ পশ্চিমাঞ্চল, ১৯৬৯-৭০ পশ্চিমাঞ্চল, ১৯৭০-৭১ দক্ষিণাঞ্চল, ১৯৭১-৭২ মধ্যাঞ্চল, ১৯৭২-৭৩ পশ্চিমাঞ্চল, ১৯৭৩-৭৪ উত্তরাঞ্চল, ১৯৭৪-৭৫ দক্ষিণাঞ্চল, ১৯৭৫-৭৬ পশ্চিমাঞ্চল ১৯৭৬-৭৭ পশ্চিমাঞ্চল।

ভারতীয় ক্রিকেট দলের সফর

অক্টোবর ২৪ তারিখে বিষেণ সিং বেদীর নেতৃত্বে ভারতীয় ক্রিকেট দল অস্ট্রেলিয়া অভিমুখে যাত্রা করেছে। এটা ভারতীয় ক্রিকেট দলের তৃতীয়বারের অস্ট্রেলিয়া সফর। এর আগে ১৯৪৭-৪৮ সালে লালা অমরনাথের এবং ১৯৬৭-৬৮ সালে মনসুর আলীর নেতৃত্বে ভারতীয় ক্রিকেট দল অস্ট্রেলিয়া সফরে গিয়েছিল। আগামী ১৯৭৭-৭৮ সালের অস্ট্রেলিয়া সফরে ভারতীয় ক্রিকেট দলটি খেলবে মোট ২০টি ম্যাচ—পাঁচদিনব্যাপী টেস্ট ম্যাচ ৫টি, চারদিনব্যাপী খেলা ৬টি, তিনদিনব্যাপী খেলা ২টি, দুদিনব্যাপী খেলা ১টি এবং এক দিনের খেলা ৬টি।

অস্ট্রেলিয়াগামী তৃতীয় ভারতীয় ক্রিকেট দলে যে ১৬ জন খেলোয়াড় নির্বাচিত হয়েছেন তাঁরা শুধু চারটি রাজ্যের—কর্ণাটকের ৫ জন, দিল্লীর ৫ জন, বোম্বাইয়ের ৪ জন এবং তামিলনাড়ুর ২ জন। ভারতের পূর্ব এবং মধ্যাঞ্চল থেকে একজন খেলোয়াড়ও দলে স্থান পাননি।

গত বছর যে ভারতীয় ক্রিকেট দলটি নিউজিল্যান্ড এবং ওয়েস্ট ইন্ডিজ সফর করেছিল তার ১৭ জন খেলোয়াড়ের মধ্যে এই পাঁচজন খেলোয়াড়—পার্থসারথি শর্মা, সুধাকর রাও, কৃষ্ণমূর্তি, অংশুমান গায়কোয়াড় এবং সোলকার অস্ট্রেলিয়াগামী বর্তমান ভারতীয় ক্রিকেট দলে স্থান পান নি। এই পাঁচজনের বদলে দলভুক্ত হয়েছেন চেতন চৌহান, ভরত রেড্ডি, কারসন ঘাউড়ি এবং অশোক মানকাদ। ভেংকট-রাঘবনের দলভুক্তি [illegible] অনুমানের কারণ হয়েছে। ১৯৭৬-৭৭ [illegible] ইংল্যান্ডের বিপক্ষে টেস্ট সিরিজের শেষ চারটি খেলায় ভেংকটরাঘবন ভারতীয় দলে স্থান পাননি।

১৯৭৭ সালের অস্ট্রেলিয়াগামী ভারতীয় ক্রিকেট দলের নির্বাচিত ১৬ জন খেলোয়াড় ঃ

বিষেণ সিং বেদী (অধিনায়ক), সুনীল গাভাসকার (সহ-অধিনায়ক), দিলীপ ভেঙ্গসরকার, চেতন চৌহান, জি বিশ্বনাথ, অশোক মানকাদ, সুরিন্দর অমরনাথ, মহীন্দর অমরনাথ, ব্রিজেশ প্যাটেল, সৈয়দ কিরমানি (উইকেটকিপার) ভরত রেড্ডি (উইকেট কিপার), এরাপল্লী প্রসন্ন, চন্দ্রশেখর, বেংকটরাঘবন, কারসন ঘাউড়ি এবং মদনলাল।

টেস্ট খেলার স্থান ও তারিখ

১৯৭৭-৭৮ সালের ভারত বনাম অস্ট্রেলিয়ার টেস্ট খেলার স্থান এবং তারিখ নীচে দেওয়া হল ঃ

১ম (ব্রিসবেন) ডিসেম্বর ২—৭

২য় (পার্থ) ঃ ডিসেম্বর ১৬—২১

৩য় (মেলবোর্ন) ঃ ডিসেঃ ৩০, ৩১ ও জানুয়ারী ২—৪

৪র্থ (সিডনি) ঃ জানুয়ারী ৭—১২

৫ম (এডিলেড) ঃ জানুয়ারী ২৮—৩০ ও ফেব্রুয়ারী ১ ও ২

টেস্ট খেলার বিরতি ঃ ডিসেম্বর ৫ ও ১৯ এবং জানুয়ারী ১, ১০ ও ৩১

অস্ট্রেলিয়া সফরের ফলাফল

১৯৪৭-৪৮ ঃ প্রথম অস্ট্রেলিয়া সফরে ভারতীয় দল যে ১৪টা প্রথম শ্রেণীর ম্যাচ খেলেছিল তার ফলাফল ঃ জয় ২, হার ৭ এবং ড্র ৫।

১৯৬৭-৬৮ ঃ দ্বিতীয় অস্ট্রেলিয়া সফরে ভারতের প্রথম শ্রেণীর খেলার ফলাফল ঃ খেলা ১৫, জয় ৪, হার ৬ এবং ড্র ৫।

দর্শক

সিনেমা

চলচ্চিত্রে ও নাটকে শব্দ

এই আলোচনায় যাঁরা অংশ নেবেন, তাঁদের কাছে শব্দ কি বা কেন, নাটকে-চলচ্চিত্রে তার গুরুত্ব কি এসব নিশ্চয়ই বলার অপেক্ষা রাখে না। তাই আসলে আমরা তারপর থেকেই শুরু করি। এই লেখাটা যখন লিখছি, তখন বাহির থেকে জল পড়ার আওয়াজ, চিৎকার, হাতুড়ির ঘা, গাড়ির হর্ন ইত্যাদি নানা শব্দ ভেসে আসছে। আমার এই লেখার দৃশ্যটাই যদি মঞ্চে বা পর্দায় আনা যায়, তাহলে স্বাভাবিকভাবে তার পারিপার্শ্বিক শব্দও এসে যায়। তবে পূর্বকথিত সব শব্দ নয়, ঐ ঘটনার সময়, এবং আমার ও আমার লেখার চরিত্রকে সামনে রেখে প্রয়োগ হয় সেই শব্দের যা আমার ঐ অবস্থাকে এক বিশেষ ব্যঞ্জনা দিতে পারে। শব্দের কাজ এখানেই। কোন শব্দ শুধুমাত্র তার পরিবেশ সময় বা ঘটনার বিশ্লেষণ করেই ক্ষান্ত থাকে না, তার পরবর্তী ঘটনা কি হতে পারে, সেই সংকেতও রেখে যায়।

এক সন্ধ্যায় নদী বাঁধে কোন যুবক প্রেমিকার কাছে তার একাকীত্বের কথা বলছে। ঐ পরিবেশ সৃষ্টিতে নিশ্চয় সেতারের সাহায্য নেওয়া যেতে পারে। দূরে থেকে সন্ধ্যার সমুদ্রস্রোতের যে শব্দ ভেসে আসে তা বিষণ্ণ, গভীর ও নিঃসঙ্গ। কিন্তু ঐ একই কথা যদি কোন প্রেমিক প্রেমিকার মধ্যে না হয়ে সম্পর্কহীন দুই ছেলেমেয়ের মধ্যে হত, তাহলে পরিবর্তন হত শব্দের। যেহেতু চরিত্রের পরিবর্তনে সংলাপের দ্যোতনাও বদলে যায়। তাই সমুদ্রস্রোতের বদলে শোনা যেতে পারে ঝিঁঝিঁর ডাক বা দূর থেকে ভেসে আসা কোন দীর্ঘশ্বাসী কণ্ঠ। আবার ঐ একই ঘটনা যদি কলকাতার কোন পার্কে ঘটত, তাহলে আর সমুদ্রস্রোত ইত্যাদি নয়, তার বদলে শোনা যেত যাত্রীহীন ক্লান্ত রিকসার ঠুং ঠাং আওয়াজ বা বহু উঁচু থেকে ভেসে আসা এরোপ্লেনের শব্দ।

ঘটনায় যখন কোন নতুন চরিত্র এসে হাজির হয়, সে কে, কি করে এসব কিছুই যখন দর্শক জানেন না, তখন যদি তার আসার সঙ্গে সঙ্গেই কোন শব্দের প্রয়োগ ঘটে তাহলে আমরা ঐ চরিত্র সম্পর্কে কিছু আন্দাজ করে নিতে পারি। যেমন, কেউ এল, অমনি শুনতে পেলাম ঘোড়ার খুরের শব্দ, আর তখনই বুঝে নিলাম চরিত্রটি বেশ উদ্দাম ও দুরন্ত। আবার কেউ আসার সঙ্গে সঙ্গে যদি টাইপরাইটারের শব্দ শোনা যায়, তাহলে ঐ চরিত্র সম্পর্কেও একটা স্পষ্ট ধারণা গড়ে ওঠে। কিন্তু একটা কথা অবশ্যই মনে রাখতে হবে যে, এই প্রয়োগের ক্ষেত্রে আমরা যেন আন্তরিকভাবে সময় ও পরিবেশকে অনুধাবন করি। কেননা যদি কোন অজ পাড়াগাঁয়ে টাইপরাইটার ঠকাঠক করে যায়, তাহলে খুব হাস্যকর লাগে।

কোনো ঘটনার সঙ্গে তাল রেখে গতানুগতিক শব্দ প্রয়োগ না করে মাথা খাটিয়ে যদি একটু ভিন্নজাতের শব্দ প্রয়োগ করা যায়, যা আমাদের দৈনন্দিন জীবনের সঙ্গী, যা আমরা প্রায়ই শুনি, এমনি সব শব্দের উপযুক্ত প্রয়োগে অদ্ভুত দ্যোতনা সৃষ্টি হয়। ধরা যাক একটি মেয়ের রেজাল্ট বেরিয়েছে, তার বাড়ীর লোকে জানতে গেছে তার রেজাল্ট, মেয়েটা উদ্বিগ্নচিত্তে বসে, এমন সময় লোকটি এসে বলল 'পাশ'—সঙ্গে সঙ্গে যদি একটি সদ্যোজাত শিশুর কান্না ভেসে আসে, তাহলে সেই পরিবেশ এক চূড়ান্ত অবস্থা সৃষ্টি করে। কিন্তু এখানে যদি কোন মেয়ের বদলে ছেলে থাকে তাহলে তার পাশ করার সংবাদে শিশুর কান্নার চেয়ে 'মোরগ' ডাকার চিৎকার বা ঐ জাতীয় কোন শব্দের প্রয়োগ বাঞ্ছিত অবস্থাতে সাহায্য করে। অন্যদিকে যদি সংবাদদাতা 'পাশ' এর বদলে 'ফেল' বলে, তাহলে শব্দের চেয়ে শব্দশূন্যতাই পরিবেশের যাথার্থ্যকে সাহায্যে আসে। যেমন সে যখন খবরের প্রত্যাশায় বসে, ভেতর থেকে গোলমালের নানা শব্দ ভেসে আসে, সে দেখে লোকটি আসছে, ঐ শব্দও ক্রমশ বাড়তে থাকে, লোকটি এসে জানায় সে ফেল করেছে, সঙ্গে সঙ্গে ঐ শব্দও থেমে যায়। এই হঠাৎ শব্দশূন্যতা ঐ পরিবেশ ধরে রাখতে যে পরিমাণে সাহায্য করে পৃথিবীর কোন শ্রেষ্ঠ শব্দ বা সঙ্গীত তার কাছাকাছি আসতে পারে না।

মিঃ ক ছোটবেলায় এক বিশেষ ঘটনা কিছুতেই ভুলতে পারেন না। বাস এক্সিডেন্টে তার মা মারা গেছিল। একদিন রাতে কোন বিশেষ অবস্থায় সে ঐ কথাটা ভাবছে, আর সেখানে বাস এক্সিডেন্ট দেখানোরও একেবারে সুযোগ নেই, কিন্তু ঐ সময় যদি ঐ এক্সিডেন্টের শব্দটাই পরিবেশিত হয় তাহলে তার

বিচিত্রা

পুতুল/ইকাবানা

৪৭-২৮১০-এ ডায়াল করে যখন জানতে পারলাম যে, যিনি ফোন ধরেছেন, তিনিই পুতুল তৈরি ও ইকাবানা শেখান তখনই তাঁর সঙ্গে প্রয়োজনীয় কথাবার্তা হয়ে যায়। কথা শেষে হঠাৎ তিনি জিজ্ঞেস করেন, 'আপনি আমার নাম জানতে চাইলেন না তো?'

অপ্রস্তুত হয়ে আমি বলি, 'দুঃখিত, এখন জানাবেন কি?'

মিসেস মঞ্জুলা সেনগুপ্ত আমাকে এভাবেই তাঁর নাম জানান।

দুদিন পর তাঁর চার নম্বর ডোভার প্লেসের বাড়িতে গিয়ে দেখি যে, এখন চারজন ছাত্রী এইসব শিখছেন তাঁর কাছে। বাড়িতেই স্কুল খুলেছেন। মোট ষোলটি ক্লাসে এসব শেখানো হয়। যাবতীয় খরচ একশো পঞ্চাশ টাকা। এছাড়া পুতুল তৈরির আসবাব ও ইকাবানার জিনিসপত্রের খরচ আছে। অবশ্য, সেগুলো এমন কিছু নয়।

আমার প্রশ্নের উত্তরে তিনি জানান, 'ছোটবেলা থেকেই এসবদিকে আমার ঝোঁক। ছোট বয়সে পুতুলখেলাই ছিল কাজ। এখন ছেলেমেয়েরা বড় হয়েছে; আমার সেই পুতুলখেলা। দুপুরে বসে বসে এইসব তৈরি।'

ইকাবানা শিখেছেন ইন্দো-আমেরিকান-এ নমিতা ভট্টাচার্যের কাছে। তবে, শ্রীমতী সেনগুপ্তের মতে, ওখানে শিখতে গেলে খরচ হয় বেশী। মধ্যবিত্ত পরিবারের পক্ষে সেটা কষ্টের ব্যাপার।

ইকাবানা প্রসঙ্গে বললেন, 'এ-ব্যাপারে পড়াশুনোর দরকার আছে। ইকাবানা, মরিবানা, নাগিইরে—এরকম স্তরপরম্পরায় না-এগোলে অসুবিধে হয়। এর যে অনেক ভাগ আছে; তা' অনেকেই জানেন না।'

এছাড়াও অন্যান্য কিছু তিনি শেখান। বাঁশের চালুনির ওপর ডাল ঢেলে চমৎকার দেওয়াল-সজ্জা তৈরী করেছেন তিনি। এবং পাটের নানা জিনিসপত্রও করেছেন।

'আজকাল স্কুলে ওয়ার্ক-এডুকেশন আবশ্যিক হয়েছে। একারণে মেয়েদের এসব শিখতেই হচ্ছে। তবে, সেরকম ছাত্রী এখানে কেউ নেই।' কথা প্রসঙ্গে জানালেন, 'এসবদিকে বাঙালী মেয়েদের এখন চোখ পড়ছে। আগ্রহ বাড়ছে। 'পুতুল তৈরী কোন্ বাঙালী মেয়ে জানে না, বলুন তো?' জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে না-তাকিয়ে তিনি নিজেই উত্তর দেন, 'সবাই জানে। তবে, সেটাকে সঠিক তৈরী করা ও পুতুলের মধ্যে একটা ভাব ফুটিয়ে তোলা—এসব সবাই পারে না। এর জন্যই শিখতে হয়। এটাও যে একটা শিল্প—এটা তো মানতেই হবে।' বলে তিনি পুতুলের আলমারী দেখান। বাস্তবিকই, ঘরখানা চমৎকার সাজানো। বাহুল্য নেই। মাত্র দুটি ইকাবানা ও এক আলমারী পুতুলে ঘরটি মনোরম হয়ে উঠেছে।

একজন ছাত্রীকে জিজ্ঞেস করলাম কয়েকটি কথা। উনি গার্ডেনরীচ থেকে সপ্তাহে দুদিন আসেন। পুতুল তৈরি শেখা শেষ হয়েছে। শীতে ইকাবানা শিখবেন। কেননা, সেসময় নানারকম ফুল সহজেই পাওয়া যায়। নেহরু মিউজিয়াম ও অন্যান্য প্রদর্শনীতে এসব দেখে ওঁর শেখার ইচ্ছা হয়। এখানের খোঁজ পেয়েছেন কাগজের বিজ্ঞাপনের মাধ্যমে। এখানে ঘরোয়াভাবে শেখানো হয় বলে অনেক সুবিধে আছে। এখন উইমেন্স ক্রিশ্চান কলেজের ছাত্রী। 'শেখার আর কি কারণ [illegible]?' জিজ্ঞেস করতেই ইনি জানান, '[illegible]রে চাকরি করা আমার পছন্দ নয়। পরে বাড়িতে স্কুল খুলতে পারি। পুতুলও বিক্রি হয় বেশ ভালো দামে।'

অর্থোপার্জনের এরকম নির্ঝঞ্ঝাট ও মোলায়েম পদ্ধতি মেয়েদের, বিশেষ করে বাঙালী মেয়েদের, খুব বেশী নেই। আশা করা যায়, সোয়েটার ইত্যাদি বোনার মতোই অদূর ভবিষ্যতে পুতুল তৈরি ও ইকাবানাও মেয়েদেরকে ব্যস্ত করে তুলবে।

নীলাম

জেনেছিলাম ভিড় হবে না। কিন্তু গিয়ে দেখি, এরকম বৃষ্টিতেও যথেষ্ট লোকজন হাজির। আর সুমনস্ একসচেঞ্জ বন্ধ ছিল। তাই দেখে ঢুকে পড়লাম মডার্ন একসচেঞ্জে। সানন্দাস নীলাম হচ্ছে। একজোড়া বত্রিশ টাকায় বিক্রি হল। ব্যাটারি-চালিত সেফটি রেজার উঠল তারপর। ওদিক থেকে এক মহিলা সবার দৃষ্টি আকর্ষণ করে বললেন আশি টাকা। সবাই ওঁর দিকে তাকিয়ে আছে। উনি ডেকে ডেকে সাড়েনব্বই টাকায় নিয়ে গেলেন। একজন একশো হাঁকতেই বোঝা গেল, ভদ্রমহিলার সঙ্গে একজন সুদর্শন পুরুষ রয়েছেন। এবার তিনিই এগিয়ে এসে দেখেশুনে একশো আট টাকায় জিনিসটি কিনলেন। সকলে প্রায় হাঁফ ছাড়ল।

নিম্ন মধ্যবিত্তের নিত্য প্রয়োজনীয় সামগ্রী এখানে নীলাম হয় না। নীলামের বাজারে উচ্চমধ্যবিত্তদেরই যাওয়া-আসা। তবে কাঠের আসবাব ও নানারকম কাচের জিনিসপত্রের জন্য এখানে আসা বেশ সুবিধেজনক। [illegible] কাট-গ্লাসের

অমৃত
১৭ বর্ষ
২৯ সংখ্যা
২৫ কার্তিক
১৩৮৪
11th Nov. 1977

আগামী সংখ্যায়

প্রচ্ছদ কাহিনী
[illegible]
লিখেছেন [illegible]
গল্প লিখেছেন
[illegible] ভট্টাচার্য/সন্দীপ সরকার

'ঘর হতে শুধু দুই পা ফেলিয়া'

দেশভ্রমণ নিশ্চয়ই বেড়েছে, কিন্তু সেটা প্রত্যাশিত পরিমাণে কিনা বলা শক্ত। সম্প্রতি পর্যটন মেলা অনুষ্ঠিত হল কলকাতায়। উদ্দেশ্য নিশ্চয়ই পর্যটনকে জনপ্রিয় করা। কিন্তু সময় নির্বাচন করার আগে বোধহয় আরো একটু বিবেচনা করলে ভালো হত।

দেশ বেড়াতে মানুষ বরাবরই ভালোবাসে। আদিম যুগের যাযাবর স্বভাবই হয়তো এর একটা বড় কারণ। তাছাড়া একালের এই ঊর্ধ্বশ্বাস জীবনযাত্রায় স্নায়বিক পীড়ন এত বেশি যে মাঝে মাঝে জীবনযাত্রার পরিবেশ ছেড়ে বাইরে বেরিয়ে পড়া ছাড়া আর কোনো উপায়ও থাকে না। এটা যে শুধু শারীরিক স্বাস্থ্যের জন্যেই দরকার তা নয়, মনের শুশ্রূষার জন্যেও বিশেষ রকম জরুরী। এবং ইদানীং দেখা যাচ্ছে চিকিৎসকেরা এমনকি অনেক শরীরের অসুখের জন্যেও মনকেই করছেন দায়ী।

হয়তো এই কারণেই ইউরোপ এবং আমেরিকার স্বচ্ছল দেশের মানুষেরা দলে দলে বাইরে বেরিয়ে পড়েন, এবং পৃথিবীর সমস্ত দেশেই টহল দিয়ে বেড়ান। মনের বিপর্যস্ত ভারকেন্দ্রকে পুনর্বিন্যস্ত করার জন্যেই হয়তো তা করেন। কিন্তু একথা ভুলে গেলে চলবে না, তাঁরা শুধু বিদেশেই যান না, নিজের দেশেও যথেষ্টই ঘুরে বেড়ান। অর্থাৎ ভ্রমণ তাঁদের কাছে নেহাৎই একটা শখের ব্যাপার নয়, এটা তাঁদের কাছে অপরিহার্য প্রয়োজন। আবহাওয়া অনুকূল থাকলে প্রতি সপ্তাহের শেষেই তাঁরা ছুটির দিনগুলিতে বাইরে যান।

এই যে জাতিগত অভ্যাস, এটা এখনো আমাদের দেশে দূরে অস্ত। সরকারি প্রচার যদি ভ্রমণকে এইভাবে আমাদের শারীরিক এবং মানসিক স্বাস্থ্যের পক্ষে অপরিহার্য রকম জরুরি বলে চেনাতে পারে, এবং সেভাবে অভ্যস্ত করাতে পারে, কিছুটা অন্তত কাজের কাজ হয়।

শ্যামল দত্ত রায়

প্রচ্ছদের নেপথ্যে [illegible] সালে [illegible] শ্যামল দত্ত রায়ের জন্ম। ১৯৫৫-তে কলকাতার গভর্নমেন্ট কলেজ অব আর্টস অ্যান্ড ক্র্যাফটস থেকে স্নাতক হন। একই সঙ্গে [illegible] এবং [illegible] দক্ষতা দেখানো রীতিমত ক্ষমতার ব্যাপার। শ্যামলবাবু, সেই দুর্লভ ক্ষমতার অধিকারী।
১৯৫৩ থেকেই যৌথ প্রদর্শনীতে অংশ নিচ্ছেন শ্যামল দত্ত রায়। দিল্লীর ললিতকলা একাডেমী, বোম্বাইয়ের 'বোম্বাই আর্টস সোসাইটি', কলকাতার 'বিড়লা একাডেমী', 'অ্যাকাডেমী অফ ফাইন আর্টস' ছাড়াও বিভিন্ন সময়ে একক প্রদর্শনী হয়েছে। [illegible] আমেরিকা [illegible] ও পশ্চিম ইউরোপ, আলজিরিয়া এবং বাংলা দেশেও শ্যামলবাবুর ছবির প্রদর্শনী হয়েছে।
প্রতিভার স্বীকৃতি হিসেবে শ্যামল দত্ত রায় কলকাতার অ্যাকাডেমী অফ ফাইন আর্টস, স্টেট অ্যাকাডেমী ওয়েস্ট বেঙ্গল, বিড়লা অ্যাকাডেমী প্রভৃতি বিশিষ্ট সংস্থা থেকে সম্মানিত হয়েছেন। স্বর্ণ পদকও পেয়েছেন এই স্বীকৃতির জন্য। সোসাইটি অফ কনটেম্পরারী আর্টিস্টস-সংস্থার প্রতিষ্ঠাতা সদস্য।

সাহিত্য

ভাল জিনিস। ৭২ লক্ষ

বৈকুণ্ঠ পাঠক

চিঠিপত্র

কঁাঠালের আমসত্ত্ব

সমালোচক হলেই কবিতা লেখার অধিকারী নন

তাঁর আলোচনা পড়ে এই কথাই মনে

(ক্রমশ)

কেশবচন্দ্র সেনের বাড়িতে কীর্তন আসরে

গদাধর থেকে শ্রীরামকৃষ্ণ

মনোরঞ্জন বসু

নিষ্ঠা, ভক্তি, ব্যাকুলতার সঙ্গে রামকৃষ্ণ যতই মা জগদম্বার পূজা করতে লাগলেন, ততই তাঁর মনে মাতৃদর্শনের ব্যাকুলতা তীব্র হয়ে উঠল। শেষে মা কৃপা করলেন, প্রথম মাতৃদর্শন সম্পর্কে ঠাকুর রামকৃষ্ণ নিজেই বলেছেন—'মার দেখা পাইলাম না বলিয়া হৃদয়ে তখন অসহ্য যন্ত্রণা, অস্থির হইয়া ভাবিলাম তবে আর এ-জীবনে প্রয়োজন নাই। মার ঘরে যে অসি ছিল দৃষ্টি সহসা তাহার উপর পড়িল। এই দণ্ডেই জীবনের অবসান করিব ভাবিয়া উন্মত্ত প্রায় ছুটিয়া উহা ধরিতেছি, এমন সময় মার অদ্ভুত দর্শন পাইলাম।

'একটা অননুভূত জমাট বাঁধা আনন্দ-স্রোত প্রবাহিত হইল, মার সাক্ষাৎ প্রকাশ উপলব্ধি করিলাম।' ...'ঘর, দ্বার, মন্দির সব যেন কোথায় লুপ্ত হইল, কোথাও যেন আর কিছুই নাই এক অসীম অনন্ত জ্যোতিঃসমুদ্র—যেদিকে যতদূর দেখি চারিদিক হইতে তার উজ্জ্বল ঊর্মিমালা তর্জন-গর্জন করিয়া গ্রাস করিবার জন্য মহাবেগে অগ্রসর হইতেছে। দেখিতে দেখিতে উহা আমার উপর নিপতিত হইল এবং আমাকে এককালে কোথায় তলাইয়া দিল। 'সংজ্ঞাশূন্য হইয়া পড়িয়া গেলাম'। 'অসহ্য যন্ত্রণায় সময়ে সময়ে বাহ্য সংজ্ঞাশূন্য হইয়া পড়িতাম, এবং ঐরূপ হইবার পরেই দেখিতাম মার বরাভয় করা চিন্ময় মূর্তি—দেখিতাম ঐ মূর্তি হাসিতেছে, কথা কহিতেছে, অশেষ প্রকার সান্ত্বনা ও শিক্ষা দিতেছে।'

রামকৃষ্ণের দীর্ঘ ১২ বছর (১২৬২—১২৭৩) সাধনকাল বিচিত্র ঘটনায় পূর্ণ। ১২৬২-৬৫ প্রথম [illegible] ছের দক্ষিণেশ্বরের মা ভবতারিণীর পূজারী রামকৃষ্ণের মাতৃ-দর্শন কঠোর সাধনা, দিব্যোন্মত্ত ভাব, বৈধী ভক্তির সীমা অতিক্রম করে অহেতুক প্রেমভক্তি প্রভৃতি উচ্চ মার্গের সাধন, সবই বিস্ময়কর। শ্রীরামকৃষ্ণের উন্মত্ত ভাব যে দিব্যোন্মাদনা, বায়ুরোগ নয় তার প্রমাণ মেলে তাঁর পরবর্তী কালের সাধনায় ও বৈষ্ণব সাধনশাস্ত্রে। সর্বতোভাবে ঈশ্বরে তন্ময় মনে নানা ভাবের কথা আচার্য শংকর তাঁর বিবেক চূড়ামণি-গ্রন্থে বলে গেছেন। ব্যবহারিক জীবনে বাঁধাধরা নিয়ম-কানুন ও অভ্যাস, আচরণের সীমার মধ্যে সাধারণ মানসিকতা-বদ্ধ, সেই মন ও দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে আধ্যাত্মিক জগতের একজন পূর্ণ সাধকের আচরণ ধরা যায় না। তাই সম্ভবতঃ ঐ সময় রামকৃষ্ণের দিব্যোন্মাদনা নিয়ে সাধারণের কাছে নানা প্রশ্ন উঠেছিল।

১২৬৬-৬৯ এই ৪বছর সময়ের শেষ ২বছর রামকৃষ্ণ ব্রাহ্মণী ভৈরবীর কাছে গোকুলব্রত থেকে আরম্ভ করে বঙ্গদেশে প্রচলিত প্রধান প্রধান তন্ত্র নির্দিষ্ট সাধন সকল যথা-বিধি অনুষ্ঠান করেছিলেন। ১২৭০-৭৩ ৪বছর তিনি জটাধারী নামে রামাইত সাধুর কাছে রামমন্ত্রে উপদিষ্ট হন ও রামলালা বিগ্রহ লাভ করেন। তা ছাড়াও বৈষ্ণব তন্ত্রোক্ত মধুরভাবে সিদ্ধি লাভের জন্য ৬-মাস তিনি স্ত্রীবেশ ধারন করে থাকতেন। পরে আচার্য তোতাপুরীর কাছ থেকে সন্ন্যাস গ্রহন করে সমাধির নির্বিকল্পক ভূমিতে আরোহণ করেন। পরিশেষে গোবিন্দর কাছ থেকে ইসলাম ধর্ম সম্পর্কে তিনি উপদেশ নেন। তাছাড়াও ঐ বার বছরের মধ্যে বৈষ্ণব তন্ত্রোক্ত সখ্যভাবের, কর্তাভজা ও নবরসিক প্রভৃতি বৈষ্ণব মতের অবান্তর সম্প্রদায় সকলের সাধন মার্গের সঙ্গে তিনি পরিচিত হন। শ্রীরামকৃষ্ণের অধ্যাত্ম সাধনা এত ব্যাপক ও বিস্তৃত ছিল যে, তাঁর সাধনার সর্বদিক বা কোন একটি বিশেষ দিকের সর্বাঙ্গীণ আলোচনা এই সংক্ষিপ্ত প্রবন্ধে সম্ভব নয়। তবে রামকৃষ্ণ সাধন পরিক্রমার সামান্য আভাস বর্তমান প্র[illegible] দেওয়ার চেষ্টা হবে। সম্প্রদায়গত [illegible] থেকে শ্রীরামকৃষ্ণের সাধনায় যেন একটা আপাত বিরোধ দেখা যায়, কিন্তু পূর্ণতার দৃষ্টি-কোণ থেকে অখণ্ড সাধক শ্রীরামকৃষ্ণের সাধনার ধারা দেখলে দেখা যাবে সেখানে বিরোধের কোন অবকাশ নেই। -প্রথম চার বছর রামকৃষ্ণ সাধনার বৈশিষ্ট্য হল মাতৃ-দর্শন ও যোগবিভূতি লাভ। প্রশ্ন মাতৃ-দর্শন লাভ করার পরেও রামকৃষ্ণকে আবার আনুষ্ঠানিকভাবে সাধনা করতে হল কেন? উত্তরে বলা যায় ধর্ম বিশ্বাস ক্ষেত্রে দর্শন মনকে অনেকখানি দৃঢ় ও ঈশ্বরাভিমুখী করে ঠিক, কিন্তু পরতায় ছাড়া কোন বিশ্বাস [illegible] নিশ্চয় সত্তার যায় না, এবং দেহ ও মনের স্থায়ী সিদ্ধি দিতে পারে না। তাছাড়াও ব্যব-হারিক বা আধ্যাত্মিক যে কোন অনুভব পরীক্ষিত হওয়ার আগে অনুভব [illegible] সত্য পর্যায়ে স্বীকৃত হয় না ফলে শ্রীরাম-কৃষ্ণের অনন্যসাধারণ অনুভবগুলি শাস্ত্র-বাক্য ও অন্যান্য সত্যদ্রষ্টা আচার্যদের

অনুভবের সঙ্গে মিলিয়ে নেওয়ার প্রয়োজন ছিল। অতএব রামকৃষ্ণের আধ্যাত্মিক সাধনার কোন একটি স্তরে সমাপ্তির রেখা টানা যায় না। কারণ রামকৃষ্ণের সাধনায় সাধ্য-সাধক সবই সাধনার অন্তর্ভুক্ত হয়ে এক হয়ে যায়। রামকৃষ্ণের সাধনা ছিল মূলতঃ অকালিক ও অখণ্ড। তা ছাড়াও রামকৃষ্ণ সাধনায় আর একটি বৈশিষ্ট্য হল সে সময়ের পরস্পর বিবাদে রত ধর্মমত-গুলির মধ্যে একটা ঐক্য সূত্রের সন্ধান, তাই তাঁকে ধর্মক্ষেত্রে নানা মতবাদের সাধনা করতে হয়েছিল। সমগ্র অধ্যাত্ম রাজ্যের আচার্য হিসাবে শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস এই পৃথিবীতে এসেছিলেন, ফলে ব্যক্তি-মুক্তির মধ্যেই তাঁর অধ্যাত্ম আদর্শ সীমিত ছিল না। প্রসঙ্গতঃ এখানে বলা যায়, নিরন্তর ত্যাগ ও সংযমের সহায়তায় সাধক যখন নিজের মনকে স্ববশে আনতে পারেন, ঐ মনই তখন তাঁর গুরু হয়। ঐ পবিত্র মনে যে সব ভাব তরঙ্গ ওঠে সেই সব ভাব ভুল পথে নিয়ে যাওয়া ত দূরের কথা সাধককে আপন লক্ষ্যে পৌঁছে দেয়। ঠাকুর রামকৃষ্ণের শুদ্ধ মন গুরুর মত তাঁকে পথ দেখিয়ে সাধনার প্রথম চার বছরেই তাঁকে মাতৃ দর্শনের যোগ্য করে তোলে। শুধু তাই নয়, তাঁকে কখন কি করতে হবে, এমন কি কখন কোন আচরণ করতে হবে, সে নির্দেশও তিনি পেতেন। আবার কখনও কখনও কোন বিগ্রহ তাঁর ভিতর থেকে বেরিয়ে মূর্ত হয়ে তাঁকে ভয় দেখিয়ে বা উপদেশের দ্বারা সাধন পথে উৎসাহ দিতেন। একদিন শাণিত ত্রিশূলধারী এক সন্ন্যাসী রামকৃষ্ণের দেহ থেকে বেরিয়ে তাঁকে বললেন, অবান্তর চিন্তা পরিত্যাগ করে ইষ্ট চিন্তা যদি না করবি তো এই ত্রিশূল তোর বুকে বসিয়ে দেব। তাছাড়াও অনেক সময় ভিতরের ভোগ-বাসনাময় পুরুষকে ঐ সন্ন্যাসী নিহত করে সুরম্য দেব-দেবীর মূর্তি দর্শন করতে করতে অথবা কীর্তন গান শুনে কিছুক্ষণ আনন্দ উপভোগ করে জ্যোতির্ময় রজ্জু অবলম্বনে রামকৃষ্ণের দেহে আবার প্রবেশ করতেন। ঐ সব ঘটনা সাধারণের কাছে আজগুবি মনে হতে পারে, কিন্তু যার মধ্যে বিবেকের উদয় হয় নি তার কাছে বিবেক দংশন শব্দটি যেমন অর্থহীন, তেমনই নীতি রাজ্যে যে প্রবেশ করেনি তার পক্ষে নৈতিক আদেশ বা নৈতিক বাধ্যবাধকতা প্রভৃতি শব্দগুলি কাল্পনিক বলে মনে হয়। আধ্যাত্মিক রাজ্যের অনুভবের খবর যাঁরা না রাখেন তাঁদের কাছে শ্রীরামকৃষ্ণের ঐ দর্শন অবাস্তব মনে হওয়াই স্বাভাবিক। শ্রীরামকৃষ্ণের অলৌকিক দর্শন ও অনুভবগুলি যে দিনের আলোর মতই সত্য তা পরবর্তীকালে তাঁর বিস্ময়কর কাজকর্মে প্রকাশ পেয়েছে। এবং আজও তার প্রভাব অব্যাহত রয়েছে। ঐ সময় তিনি যা দেখেছিলেন বা শুনেছিলেন অথবা যা তিনি অনুভব করতেন সে সব তত্ত্ব তিনি ভৈরবী ব্রাহ্মণী (যোগেশ্বরী) তোতা-পুরী (ন্যাংটা), প্রভৃতি সাধক-সাধিকার কাছে আবার শুনেছিলেন। যা তিনি জানতেন সে কথাই তাঁরা আবার তাঁকে জানালেন। শাস্ত্রবিধির দ্বারা যাচাই করার জন্যই সম্ভবতঃ ব্রাহ্মণী, তোতাপুরী প্রভৃতি সাধক রামকৃষ্ণকে শিক্ষা দেওয়ার জন্য দক্ষিণেশ্বরে আসেন।

রামকৃষ্ণ সাধনার প্রথম পর্ব শেষ হওয়ার সঙ্গে তাঁর জীবনে আবার কতকগুলি পরিবর্তন দেখা দিল, কিছুদিন পরে তিনি তাঁর বাস্তুভিটা কামারপুকুরে ফিরে গেলেন। কারণ তখন তিনি এত ভাবোন্মত্ত থাকতেন যে পূজা-অর্চনা ঠিকভাবে করতে পারতেন না। সেখানে এসে তিনি ভূতির খাল ও বুধুই মোড়ল শ্মশানে দিন-রাতের অনেক সময় কাটাতেন। মণ্ডা, মিঠাই, মিষ্টি ইত্যাদি নিয়ে তিনি শ্মশানে যেতেন এবং বলি নিবেদন করার সঙ্গে সঙ্গে শিয়ালের দল সেখানে এসে হাজির হত, আর উপ-দেবতার নিবেদিত হাঁড়িগুলি শূন্যে মিলিয়ে যেত, আবার কখনও কখনও গভীর রাত্রি পর্যন্ত অশ্বত্থ গাছের তলায় ধ্যানে কাটাতেন। এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে অধ্যাত্ম মুক্তিপথের সাধকদের বিশেষ এক স্তরে অশরীরী জগৎ অতিক্রম করতে হয়, চিত্তকে ভয়শূন্য করবার জন্য

রামকৃষ্ণের হস্তাক্ষর

মণিকর্ণিকা ঘাট। বারাণসী

ঐ সময় তিনি জগন্মাতার অসিমুণ্ডধারী, বরাভয় মূর্তি প্রায়ই দেখতেন। গদাধরের ভাবগতি দেখে তাঁর মা চন্দ্রাদেবী ও মেজভাই রামেশ্বর গদাধরের বিয়ের জন্য পাত্রী খুঁজতে লাগলেন, কিন্তু মনের মত পাত্রী না পাওয়ায় তাঁরা খুব নিরাশ হয়ে পড়লেন। ভাবাবিষ্ট গদাধর হঠাৎ তাঁদের একদিন বললেন,—অন্যত্র পাত্রী অনুসন্ধান বৃথা, জয়রামবাটী গ্রামের শ্রীরামচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের বাটীতে বিবাহের পাত্রী কুটো বাঁধা হইয়া রক্ষিতা আছে। ১২৬৬-র বৈশাখ মাসের শেষের দিকে রামচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের পাঁচ বছরের একমাত্র মেয়ের সঙ্গে গদাধরের বিয়ে হল, গদাধরের বয়স তখন চব্বিশ বছর। বিয়ের পর গদাধর প্রায় এক বছর সাতমাস কামারপুকুরে ছিলেন। ১২৬৭-র অগ্রহায়ণে বধূর প্রায় সাত বছর বয়স হল, কুল প্রথানুযায়ী গদাধরকে একবার শ্বশুরবাড়িতে যেতে হল এবং অল্পদিন থেকে নববধূর সঙ্গে তিনি কামারপুকুরে এলেন। কিছুদিন থেকে এরপর তাঁর দক্ষিণেশ্বরে ফিরে যাবার ইচ্ছা হল। কারও কথা না শুনে তিনি দক্ষিণেশ্বরে ফিরে এলেন এবং শ্রীশ্রীজগদম্বার পূজায় পরিপূর্ণ আত্মনিয়োগ করলেন। সাধক রামকৃষ্ণ জগৎ সংসার সব ভুলে গেলেন। দিনরাত মায়ের স্মরণ, মনন, জপ, ধ্যান। রামকৃষ্ণের মুখ লাল হয়ে থাকত। আত্মীয় বা সাংসারিক কথা তাঁর কাছে অদ্ভুত মনে হত। শারীরিক দিক থেকে বিষম গাত্র-দাহ ও অনিদ্রায় তিনি দিন কাটাতে লাগলেন। মথুরবাবু ঐ সময় রামকৃষ্ণের মধ্যে শিব-কালী রূপ প্রত্যক্ষ করলেন।

১২৬৭—ইং ১৮৬১, রামকৃষ্ণের জীবনে এবং সাধনায় দুটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা ঘটল—রাণী রাসমণির মৃত্যু এবং [illegible] আসা ও আনুষ্ঠানিকভাবে রামকৃষ্ণের তন্ত্র সাধন। শ্রীরামকৃষ্ণের আধ্যাত্মিক প্রতিষ্ঠা তখনও শাস্ত্রীয় দিক থেকে প্রমাণিত হয়ে পূর্ণতা লাভ করেনি। তাঁর সাধনা সম্পর্কে তখনও অনেকের ভুল ধারণা ছিল। শাস্ত্রীয় ধারায় তন্ত্র সাধনার মাধ্যমে রামকৃষ্ণ যেন শ্রীশ্রীজগদম্বার প্রসন্নতার অধিকারী হয়ে দিব্য ভাবে প্রতিষ্ঠিত হন, সে দিকে ভৈরবী মন দিলেন। রামকৃষ্ণের একনিষ্ঠ মন ব্রাহ্মণী নির্দিষ্ট তন্ত্র সাধনার পথে এগিয়ে চলল। অনন্ত সমুদ্রের ঊর্মিমালার বিচিত্র ভাব তরঙ্গে ভেসে না বেড়িয়ে সর্বস্ব ছেড়ে সমুদ্রের তলদেশে ডুবে দেওয়ার মত দুর্জয় সাহস অর্জন করবার জন্য রাম-কৃষ্ণের মন প্রস্তুত হল। রামকৃষ্ণ তন্ত্র সাধনার রহস্যের মধ্যে নিজেকে ডুবিয়ে দিলেন। পরবর্তী কালে রামকৃষ্ণ তাঁর ভক্ত শিষ্যদের ধীর এবং সাহসী হওয়ার শিক্ষা দিয়ে গেছেন।

শ্রীশ্রীজগদম্বার ইঙ্গিতে রামকৃষ্ণ তখন পূর্ণ সাধনায় মগ্ন হলেন। প্রজ্ঞাবতী, কর্মকুশলী ব্রাহ্মণী তান্ত্রিক ক্রিয়ার উপযোগী সামগ্রী সংগ্রহ করতেন এবং ঐ সমস্ত সামগ্রীর উপকারিতা ও সাধন-ক্ষেত্রে তাদের তাৎপর্য সম্পর্কে রামকৃষ্ণকে নানা উপদেশ দিতেন। নর ও অন্য চারটি প্রাণীর মুণ্ড গঙ্গাহীন দেশ থেকে সংগ্রহ করে আনালেন ব্রাহ্মণী এবং দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরবাড়ির উত্তর দিকে বেল গাছের নীচে এবং ঠাকুরের তৈরী পঞ্চবটীর তলায় দুটি সাধনার বেদী তৈরী হল। ঐ মুণ্ডা-সন দুটির উপর বসে জপ পুরশ্চরণ ও ধ্যান ইত্যাদিতে সাধক রামকৃষ্ণ দিন কাটাতেন। সারা দিন কেমনভাবে কাটত সে সম্পর্কে দুর্জয় সাধক ও কুশলী উত্তর বিল্ব বৃক্ষের নিচে অথবা পঞ্চবটীর তলায় সব প্রস্তুত করে ব্রাহ্মণী রামকৃষ্ণকে ডাকতেন এবং তন্ত্র মতে মা জগদম্বার পূজো সেরে তাঁকে জপ, ধ্যানে মগ্ন থাকতে বলতেন। শাস্ত্র-নির্দিষ্ট ঐ সব ক্রিয়া-কর্মের ফল রামকৃষ্ণ সঙ্গে সঙ্গে প্রত্যক্ষ করতেন। দর্শনের পর দর্শন, অনুভবের পর অনুভব, অদ্ভুত, অদ্ভুত কত কি তখন তিনি দেখতেন, শুনতেন তা কথায় বলে শেষ করা যায় না। বিষ্ণুক্রান্তায় প্রচলিত ৬৪ খানা তন্ত্রের যত কিছু সাধনার কথা আছে সবগুলিই একে একে ব্রাহ্মণী রামকৃষ্ণকে শিক্ষা দিলেন। দুরূহ সাধন-গুলি যা আয়ত্ত করতে উচ্চতন্ত্রের সাধকরা পথভ্রষ্ট হন, সাধক রামকৃষ্ণ অতি সহজেই তা সম্পন্ন করলেন। কাম, ক্রোধ, লোভ প্রভৃতি জয়ের জন্য তন্ত্রে যে সকল সাধনার কথা আছে তার ২।১টি এখানে উল্লেখ করা হল।

একদিন রাত্রে এক সুন্দরী যুবতীকে ব্রাহ্মণী কোথা থেকে নিয়ে এলেন, তাকে বিবস্ত্রা করে দেবীর আসনে বসালেন এবং দেবীজ্ঞানে ঐ সুন্দরী যুবতীকে পূজো করার জন্য ব্রাহ্মণী রামকৃষ্ণকে নির্দেশ দিলেন। পূজো শেষ হলে ব্রাহ্মণী তখন ঐ যুবতীকে জগজ্জননী জ্ঞানে তাঁর কোলে বসে রামকৃষ্ণকে জপ করতে বল-লেন। দিব্য শক্তিতে শক্তিমান হয়ে জপ মন্ত্র উচ্চারণ করতে করতে রামকৃষ্ণ ঐ যুবতীর কোলে বসেই সমাধিস্থ হলেন। রামকৃষ্ণের দেহবোধের পূর্ণ লোপ দেখে ব্রাহ্মণী স্তম্ভিত হলেন। আর একদিন মড়ার মাথার খুলিতে মাছ রেঁধে জগ-দম্বাকে অর্পণ করে ব্রাহ্মণী রামকৃষ্ণকে খেতে বললেন, মনে কোনও ঘৃণার ভাব

দিন গলিত মহামাংস খণ্ড নিয়ে ব্রাহ্মণী হাজির হলেন এবং তাঁকে (রামকৃষ্ণকে) জিভ দিয়ে ঐ মাংস খণ্ড স্পর্শ করতে বললেন। রামকৃষ্ণ ঘৃণায় শিউরে উঠলেন, কিন্তু ব্রাহ্মণী যে মুহূর্তে নিজের জিভ দিয়ে ঐ মাংস স্পর্শ করলেন সঙ্গে সঙ্গে রামকৃষ্ণের মনে শ্রীশ্রীজগদম্বার প্রচণ্ড চণ্ডিকা শক্তির উদ্দীপনা এল, রামকৃষ্ণ ভাবাবিষ্ট হয়ে আত্মস্থ হলেন, ব্রাহ্মণী তখন ঐ মাংস খণ্ড রামকৃষ্ণের মুখে দিলেন, তিনি তখন তা নির্বিবাদে গ্রহণ করলেন।....এইভাবে মদ্য, মাংস, মৎস্য, মুদ্রা, মৈথুন....বীরাচার নির্দিষ্ট পঞ্চ 'ম'-কারে ও নানা সাধন ক্রিয়ার মাধ্যমে সাধক রামকৃষ্ণের চিত্ত থেকে লজ্জা, ঘৃণা, ভয় ও ষড় রিপুর কু-প্রভাব ও সংস্কার দূর হল। আনন্দাসনে বসে বীরাচারে সিদ্ধ রামকৃষ্ণ দিব্যভাবে প্রতিষ্ঠিত হলেন। তন্ত্র মতে বীরাচারের এটাই শেষ সাধনা।

সাধক শ্রীরামকৃষ্ণ বলতেন কোন সাধনায় সাফল্য লাভ করতে তাঁর তিন দিনের বেশী সময় লাগেনি। স্ত্রী-শক্তি গ্রহণ না করে বীরাচারী সাধনায় শ্রীরামকৃষ্ণের অতি অল্প সময়েই সিদ্ধি লাভ দেখে এ-কথা স্পষ্ট যে, স্ত্রী-শক্তি গ্রহণ ও পঞ্চ 'ম'-কার সাধন বীরাচারী সাধনার বিশেষ অঙ্গ হলেও অবশ্যকৃত্য নয়। আত্মিক শক্তি প্রভাবে প্রকৃতি নিজেই সাধকের কাছে ধরা দেয় এবং সাধ্য বস্তু লাভে সাধককে সহায়তা করে।

১২৬৭-৬৯ দু বছর পূর্ণোদ্যমে তন্ত্র সাধনা করে বৈষ্ণব সাধনার দিকে রামকৃষ্ণ আকৃষ্ট হন। জটাধারী নামে এক রামাইত সম্প্রদায়ের সাধুর কাছে বৈষ্ণব মতে রামকৃষ্ণ দীক্ষা নেন এবং বাৎসল্য ও মধুর ভাবের সাধনায় নিজেকে সিদ্ধ করেন।

সাধক রামকৃষ্ণের জীবন বিচিত্র, এক বিস্ময়। ১২৬২—যখন তিনি দক্ষিণেশ্বরে কালীবাড়িতে আসেন তখন তিনি জানতেন না তিনিই উত্তর কালের লোকগুরু শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসরূপে যুগের প্রয়োজনে জগৎকে আধ্যাত্মিক শিক্ষা দিতে এসেছেন। তখনও তিনি সরলভাবে বিশ্বাস করতেন তিনি তাঁর পিতৃ-পিতামহের ধারা অনুসরণ করে সৎ জীবন ও সংসার ধর্ম পালন করবেন। সংসারের অন্য কোন লোকের চেয়ে তিনি যে কোন অংশে বিশেষ গুণসম্পন্ন আরেক আত্ম-অভিমানশূন্য রামকৃষ্ণ কখনও তা ভাবেন নি।

কিন্তু কার্যক্ষেত্রে সবই বিপরীত হল। এক অপূর্ব দৈবশক্তি তাঁকে যেন সংসারের রূপ-রস থেকে কোন এক নিগূঢ় রহস্যময় অধ্যাত্ম রাজ্যে নিয়ে গেল। যে কোন ভোগ্য-বস্তুর প্রতি তাঁর কখনও কোন আকর্ষণ আসেনি। তা ছাড়াও রামকৃষ্ণের স্মৃতি-শক্তি ছিল প্রখর যা তিনি একবার শুনতেন তা তিনি কখনও ভুলতেন না। জগদম্বার সন্তান জ্ঞানে তিনি শুনতে পেতেন 'স্ত্রিয়ঃ সমস্তা সকলা জগৎসু'—একথা শুনে তাঁর স্ত্রীজাতির প্রতি কখনও ভোগ-লালসার ভাব জাগেনি।

বৈষ্ণবোক্ত মধুরভাবে সিদ্ধ হয়ে রামকৃষ্ণ ভাব-সাধনার চরম ভূমিতে উন্নীত হলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে তাঁর মধ্যে সব ভাবের অতীত অদ্বৈত সাধনার প্রবল প্রেরণা দেখা দিল। অদ্বৈত সাধনার ব্যবস্থাও মা-জগদম্বা করে দিলেন। ১২৭১-র শেষ ভাগে বৈদান্তিক সন্ন্যাসী তোতাপুরী দক্ষিণেশ্বরে এলেন। অদ্বৈত সাধনায় সিদ্ধ হয়ে তীর্থযাত্রার উদ্দেশ্যে তিনি বেরিয়েছিলেন। পুরীর মন্দিরে যাওয়ার পথে দক্ষিণেশ্বরে এলেন তিনি। রামকৃষ্ণকে অদ্বৈত সাধনার উপযুক্ত দেখে ঐ সাধনায় তাঁকে প্রবৃত্ত হতে বললেন। মধুর ভাব সাধনার পর রামকৃষ্ণের অদ্বৈত সাধনার যৌক্তিকতা সম্পর্কে বলা যায়, ভাব ও ভাবাতীত—উভয়ের মধ্যে সম্বন্ধ উপলব্ধি করবার জন্যই সম্ভবতঃ ঠাকুরের ঐ ইচ্ছা হয়েছিল। ঠাকুরের নিজস্ব কথায় বলা যায়, 'মুক্তাফলের গর্ভে মুক্ত প্রত্যয় মুক্ত আছে দেখি, তেমনি মাকে পাইয়া এবং মার কাছে সর্বদা থাকিয়াও আমার মনে হইত, অনন্ত ভাবময়ী, অনন্তরূপিণী তাঁহাকে নানাভাবে....দেখিব'।

বেদান্ত সাধনে বসার আগে শিখা-সূত্র সব ত্যেজে যথাশাস্ত্র সন্ন্যাস গ্রহণের বিধি, কিন্তু রামকৃষ্ণের প্রেমময় সত্তা নিজের গর্ভধারিণীর ক্লেশের কথা ভেবে গোপনে সন্ন্যাস নিলেন। শুভ মুহূর্তে তোতাপুরীর কাছে দীক্ষিত হয়ে তাঁর নির্দেশে পিতৃপুরুষের তৃপ্তির জন্য শ্রাদ্ধাদি ক্রিয়া এবং নিজ আত্মার তৃপ্তির জন্য পিণ্ডদান করলেন। রাত্রিশেষে শুভ ব্রাহ্মমুহূর্তে হোমাগ্নি জেলে সর্বস্ব ত্যাগের মন্ত্র তোতাপুরী রামকৃষ্ণকে পড়ালেন। পুণ্যতোয়া ভাগীরথীর স্নেহস্পর্শে সমগ্র পরিবেশে এক নতুন জীবনের সঞ্চার হল। সন্ন্যাস দীক্ষার সময় শ্রীমৎ তোতাপুরী গদাধরকে রামকৃষ্ণ নাম দেন। আবার কেউ কেউ বলেন মথুরাবাবু ঠাকুরকে ঐ নামে ডাকেন।

(চলবে)

কোন কাই। কেন আমি মনে হল কটা বলে? পুলিশ ভদ্রলোকটিকে বললাম,

'কটা বাজে?'

'বাজা বাজির দরকার কি?' তিনি আমাকে গাড়ির সামনে নিয়ে আসেন। 'এবার অনুগ্রহ করে ভেতরে গিয়ে বসুন।' বলে, গাড়ির দরজা খুলে দেন। আমি ভেতরে গিয়ে বসি। আশ-পাশ থেকে সশস্ত্র খাকী লোক ছুটো ছুটে আসে। দু-দিক থেকে উঠে আমার দু-পাশে বসে। আমি সিটের ওপর হাত রাখি। জোড়া হাত। নতুন করে ধরার কিছু নেই। পুলিশ ভদ্রলোকটি সামনের সিটে উঠে বসে বললেন, 'চলো।' গাড়ি চলতে থাকে। ডাইনে, বাঁয়ে বাঁক নেয়। চলতে থাকে।

ড্রাইভার মাঝে মাঝে থামাচ্ছেন। পুলিশ ভদ্রলোকটি বললেন, 'শরীর খারাপ নাকি?'

'না, স্যার।'

'খারাপ হলেই বা দোষের কি?'

ড্রাইভার গাড়ি চালান, কোন উত্তর দেন না। পুলিশ ভদ্রলোক আমার দিকে ফিরে তাকান। একটু কাত হয়ে ঘুরে বসেন।

'হয়ে গেল।'

'কি।'

'আপনার ইহকাল, পরকাল ঝড় ঝড়ে হয়ে গেল।'

'কেন?'

'জীবনে আর কিছু করতে হবে না।'

'দেখা যাক।'

'দেখবেন আর কি। সব দেখা শেষ।'

অফিস পাড়া পার হয়ে যায় গাড়ি। ধর্মতলার পাশ দিয়ে ছুটে চলে শিয়ালদহে। কাছে দূরে মানুষজন ট্রাম বাস শোঁ শোঁ করে চলে যায়। আকাশে কালো মেঘ ঢাকতে থাকে। চারদিকের ঝিমঝিম ঝিম-ঝিম শব্দ ঘন হয়ে আসে। বৃষ্টি আসে ঝমঝমিয়ে। সব কিছু ঝাপসা হয়ে যায়। জানালার আস্তরণ ঘুমের মত নেমে আসে নীচে। গাড়ি চলতে থাকে।

(১৪)

সন্দীপদা একটু দূরে বসে আছেন। উঠোনের বুকে জল দাঁড়িয়ে আছে। ঘতিনদা কাছে পিঠে কোথাও আছে বলে মনে হল না। খড়ের চাল চুঁইয়ে জল পড়ছে। টপ-টপ শব্দ হচ্ছে জলের ওপর। কোথাও কোন আলো নেই। একটা নিকষ অন্ধকার নক্ষত্রের ভেতর খেলা করছিল। অন্ধকারের ঝিম-ঝিম শব্দ আমি শুনতে পাচ্ছিলাম।

'নগেন দাসের নাম শুনেছিস?'

'কে নগেন দাস।'

'মিঠেকে বাপ লোকজন ধরে [illegible] গেছে।'

'না।'

একটা বাঁশের খুঁটিতে পিঠ ছুঁইয়ে, হাত তুলে সন্দীপদা বসে রইলেন।

[illegible] [illegible], ওকে [illegible] [illegible]'

'অনেক কিছুদিন, কিন্তু আমরা ধীরে ধীরে। ধীরে ধীরে চিনে নিস।'

'কেন, তোমার বলতে কী?'

'আমার কথা শুনে তাকে চিনতে তোর ভুল হতে পারে।'

'হবে না, বল।'

'হবেই, নিজে দেখে শুনে চেনা বোঝা আর কারো কথা শুনে চেনা বোঝা এক জিনিস নয়।'

'সবাইকে কী দেখে শুনে চেনা যায়?'

'যেখানে সুযোগ নেই সেখানে যায় না, যেখানে আছে সেখানে যায়। কেউ যখন কারো সম্পর্কে কিছু বলে তখন সে নিজের মত করে বলে। তার ভাল লাগা মন্দ লাগা, দৃষ্টিভঙ্গী সব তার নিজের। আমার চোখ আর বোধ দিয়ে নগেন দাসকে চেনাবো কী করে?

'একটু তো চিনবো।'

'সে চেনার কোন মানে হয় না। যদি তুই তেঁতুল গাছ দেখিসনি, খাসনি কখনো তেঁতুল। তোকে যদি তেঁতুল আর গাছ সম্বন্ধে হেনাতেন বলি কী বুঝবি?

'বুঝবো না কিছু, কিন্তু একটা ধারণা তো হবে।'

'যে ধারণা দিয়ে শুধু কথা বলা যায় কিন্তু কোন কাজ করা যায় না—সে ধারণা দিয়ে কী করবি?'

'ঠিক আছে, আমি নিজেই দেখে শুনে নেব, তোমায় কিছু বলতে হবে না।'

সন্দীপদা হো-হো করে হেসে উঠেন। হঠাৎ হাসি বন্ধ করে উঠে আসেন আমার কাছে।

'রাগ করেছিস?'

'না, রাগ কেন!'

'তবে অমন করে বললি যে।'

আমি চুপ করে থাকি। অন্ধকারের ঝিম-ঝিম শব্দ আমাদের ঘিরে ঘুরতে থাকে।

'নগেন দাসের কথা বলবো....শুনবি?'

'না।'

আমার বুকের নীচে একটা চাপ চাপ ব্যথা, চোয়ালে, গালে কী রকম কষ্ট হচ্ছিল। বৃষ্টি থেমে গেছে। হু-হু বাতাস বইছে উঠোন জোর। দূর থেকে একটা শব্দ ভেসে আসছিল....ই....ই....ই....ম...।

সন্দীপ বললেন, 'ও'রা ফিরছে হয়তো।'

আমি ফিরে তাকাই। আকাশের গায়ে একটা লাল আভা ঘন হয়ে ওঠে। কর..কর.. সট..সট. শব্দ শুনতে পাই। কোথা থেকে যেন যতিনদা ছুটে আসেন। দু হাত ওপরের দিকে তোলা।....'হেই ...শান্...হেই শান্..' বলে জেলা উঠোনে নড়বড়ে পায়ে ছুটে আসছিল। 'উঠ গো, ওরা আগুন লাইক্ গেছে....।'

সন্দীপদা উঠে দাঁড়ান। আমাকে বললেন, 'ওঠ।'

'কারা?'

'নগেন দাসের লোকেরা।'

'কোথায়?'

'আমাদের বাড়িতে।' বলে, সন্দীপদা উঠোনে নেমে পড়লেন। আমি ওর সাথে সাথে নামতে থাকি। পায়ের নীচে ঠাণ্ডা ভিজে মাটি রক্তের ভেতর দিয়ে মাথায় উঠে আসে। হু-হু করা বাতাসের ভেতর ভিজে মাটি, বনোয় ফুল, [illegible] খড়ের গন্ধ ঘন হয়ে ওঠে। যতিনদা দাঁড়িয়ে যান। সন্দীপদা বললেন, 'কার কার ঘর পুড়ছে?'

'মিঠে নিধু, বুধনের ঘর', যতিনদা কথা শেষ করেন না, কাঁদতে থাকেন।

সন্দীপদা বললেন, 'ওই বৃষ্টিতে ঘরে আগুন দিল। ইনিই হচ্ছেন নগেন দাস। কথায় নড়চড় নেই। কেঁদ না যতিনদা ও আগুন জ্বলবে না। পেট্রোল পুড়ে গেলে এখুনি নিভে যাবে।'

যতিনদা কাঁদতে থাকেন। কিছুক্ষণ আগে যে জনমুখিত্রক নির্মম হৃদয়হীন বলে মনে হয়েছিল সে যে অমন করে কাঁদতে পারে জানা ছিল না। আমি সন্দীপদাকে বললাম, 'চল ওখানে—একবার যাওয়া দরকার তাই না।' সন্দীপদা যতিনদাকে কাছে ডাকলেন, আমাকে বললেন, 'গিয়ে কী করবি। যারা আগুন দিয়েছে তারা কেউ নেই, শুধু কয়েকটা পেট্রোলের টিন পড়ে আছে। যাদের ঘর তারা সব জেগে গেছে, গোল হয়ে দাঁড়িয়ে আছে চারদিকে চীৎকার কান্না নিজেদের মধ্যে কথাবার্তা বলছে। আগুন নিভে গেছে। কিছু ধোঁয়া গন্ধ তুলে উঠে যাচ্ছে আকাশের দিকে। এই তো দেখবি।'

আমি ওপরের দিকে তাকিয়ে দেখি সত্যি আকাশের লাল ধীরে ধীরে নিভে যাচ্ছে। অন্ধকারে ডুবে যাচ্ছে আকাশ—নিঝুম নিঃস্তব্ধ হয়ে আসছে চারদিক। যতিনদা মাটিতে বসে পড়েছেন। সন্দীপদা যতিনদার হাত ধরে তুলতে চেষ্টা করছেন। [illegible] কান্নাকাটি [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] হয়নি—[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] হচ্ছো—[illegible]।'

আমি দাঁড়িয়ে আছি; কিছুই বুঝতে পারছি না। [illegible] কিছু [illegible] [illegible] করছে, [illegible] কিছু। বললাম, [illegible] কী এইভাবে দাঁড়িয়ে থাকবো সন্দীপদা? আমি কিছুই বুঝতে পারছি না—কিছু একটা [illegible] দরকার।'

'কিছুই বুঝতে পারছিস না—[illegible] করবিটা কী? এত তাড়া কিসের?'

আমি [illegible] [illegible]। চুপ করে থাকি। কিন্তু একটা [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] গেল, 'তুমি তো বুঝতে [illegible]—তুমি কিছু করছ না কেন?'

সন্দীপদা হাসলেন, 'কাজ [illegible], এই মুহূর্তে [illegible] না। [illegible] [illegible]....[illegible] নিয়ে [illegible] [illegible] [illegible]—[illegible] [illegible] কেন?....[illegible]।'

যতিনদা উঠে দাঁড়ান। [illegible] [illegible]-হাতের [illegible], [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] পেরিয়ে দাওয়ার দিকে চলে যান।

অসহায় নিরস্ত্রভাব একটা ক্যাবলাতো মানুষকে আমি যেতে দেখি।

'আয়।'

আমি দাঁড়িয়ে থাকি।

'আয়।' বলে সন্দীপদা আমার হাত ধরলেন। বললেন, 'এমন দেখবার কিছু নেই আর দাঁড়িয়ে থাকিস না, আর দাঁড়িয়ে কিছু করিস না, কিছুই না করলে উঠে ওদের পুলিশ, পুলিশ বলে চিৎকার করবি। কোনো চুরি না, ... চেষ্টা করিস না কখনো। মনে থাকবে কথা?'

আমি মাথা নাড়ি।

'এই দেখো, তোকে এনে ভালই করেছি, কী বল?'

আমি চুপ করে থাকি।

সন্দীপদা আমার হাত ধরে উঠোন পেরিয়ে দাওয়ার দিকে চলে যান।

চালপাশটা দেখে মনে হয় এখানে কদিন ধরে বৃষ্টি হচ্ছে। থামছে, কমছে, আবার আবার বৃষ্টি হচ্ছে। নগেন দাস কী তা জানে না? ঘরে আগুন দিতে বলল কোন আক্কেলে। কোন আক্কেলে লোক-গুলো আগুন দিল! জলের ওপর আগুন দাঁড়ায় না। যদি দাঁড়াতো? দাউদাউ করা আগুনে দাউদাউ করতো চারদিক। কত কিছু জ্বলে যেতো। পুড়ে যেতো, মরে যেতো হয়তো কেউ কেউ। জলে আগুন দাঁড়ায় না—আগুনে জল। নগেন দাসটা কী?

'তুমি কী করে বুঝলে পেট্রোল দিয়ে আগুন লাগিয়েছে।'

'এই ভেজা ঘর-বাড়িতে পেট্রোল ছাড়া আগুন জ্বলে?'

'কী করে বুঝলে এই আগুন নিভে যাবে।'

'পেট্রোলের আগুন খুব হাল্কা, ভিজে জায়গায় নিজে জ্বলে, অপরকে জ্বালাতে পারে না। উঠে আর একটু বসি। ওরা ফিরে আসবে এখুনি।'

'তুমি ওদের সাথে যাবে বলেছিলে গেলে না যে!'

'বলেছিলাম যাবো। ভেবে দেখলাম যাওয়াটা ঠিক হবে না।'

'কেন?'

'আমি কাছে থাকলে ওদের নিজস্ব বুদ্ধি উদ্যোগ সব হারিয়ে যায়। আমি ঘুরে যাই। এ যে কী কষ্ট তুই বুঝবি না। এতদিন কী আমি ওদের পরনির্ভর করে তুলেছি। স্ব-নির্ভর করে তুলতে পারিনি?'

আমার অবাক লাগে। এমন অসহায় করুণ স্বর, এত অগোছাল কথা সন্দীপদা বলছেন, কিছু একটা বলা দরকার। বললাম, 'তা কেন, তা কেন হবে?' সন্দীপদা ঘাড় তুলে মাথা উঁচু করলেন। বললেন, 'নারে, আমার ভেতরের আগুন খুব হাল্কা। এত-দিন আমি নিজে জ্বলেছি—অপরকে জ্বালাতে পারিনি।'

আমি আকাশের দিকে তাকাই। আলো নেই কোথাও। নিথর কালো অন্ধ-কারে সব ডুবে আছে। গাছপালা, পাখ-পাখালি, মানুষজন—সব। কোথাও কোন শব্দ নেই। ভাঙা ছেঁড়া ফেটে যাওয়া শব্দ উঠে আসছিল আশপাশ থেকে, আবার তলিয়ে যাচ্ছিল। হঠাৎ দূরে একটা গাছে হুস করে শব্দ হল। ডালপালা মাড়িয়ে গাছটা দুলছে। ধুপ করে একটা শব্দ। যেন শব্দটাই চিৎকার করে উঠল... পুলিশ... পুলিশ...।

সন্দীপদা দাওয়ার ওপর পা তুলতে গিয়ে থামিয়ে দিলেন আমাকে। স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন কিছুক্ষণ। খুব আস্তে আমার হাতের ওপর চাপ দিয়ে বললেন, 'এ-দিকে আয়... শুনলি?'

'কী?'

'পুলিশ এসেছে।'

'হ্যাঁ।'

'কী করবি এখন?'

'তুমি বল!'

'ধর আমি নেই।'

'কী আর করবো—লড়বো!'

'কী নিয়ে লড়বি?'

আমি চুপ করে থাকি। যতীনদা ওপর থেকে নেমে আসেন। সন্দীপদা আমার হাতে চাপ দিয়ে আবার বললেন, 'বল তাড়াতাড়ি—কী করবি?' আমি চুপ করে থাকি। যতীনদার মুখ থেকে প্রথম শাঁখ বেজে ওঠে। তারপর পর পর শাঁখ আর কাঁসর ঘন্টা বাজতে থাকে। নিথর কালো অন্ধকারের ভাঙা ছেঁড়া-ফাটা শব্দগুলো একটানা সুর পায়। গাছগাছালির ভেতর থেকে পাখীদের চিৎকার ডানা ঝাপটানোর শব্দ সেই টানা সুরের সাথে মিশে যায়। বহু দূর থেকে ভেসে আসে মানুষের স্বর। কোন স্বর চিনি না কী করবো আমি....কী।

যতীনদা বললেন, 'চল দেখা যাই।'

'কোথায়?'

'বুধনের ঘর।'

'চল'—বলে, সন্দীপদা আমার দিকে তাকিয়ে হাসলেন। সমস্ত গ্রাম কাঁসর ঘন্টা হয়ে বাজতে লাগল। আমরা হাঁটতে হাঁটতে পিছল উঠোন দ্রুত পায়ে পেরিয়ে যাই। মাটির দেওয়াল ধসে পড়েছে এখানে ওখানে। ঘরের ডান দিকে বেশ প্রশস্ত ভাঙন। যতীনদা সেই দিকে এগিয়ে গিয়ে হাতের ইশারায় আমাদের দ্রুত আসতে বললেন। আমরা দ্রুত হাঁটতে থাকি। ঘরে ঘরে আলো জ্বলে উঠেছে। ঘরে ঘরে মানুষের কণ্ঠস্বর আমি শুনতে পাচ্ছিলাম। একটু দূরে এগিয়ে গেলেই সামনে পুকুর। দু-পাশে পুকুর মাঝখান দিয়ে সরু রাস্তা। পুকুর পেরিয়ে যেতেই দেখতে পেলাম কয়েকজন নারী পুরুষ জটলা করছে। ওঁরা আমাদের দেখতে পেয়েই এগিয়ে এল। সবার আগে একটি মেয়ে, অল্প বয়স। সাদা থান কোমরে জড়িয়ে প্রায় দৌড়ে এল।

'তোমরা পেইলে যাও।'

'কেন?'

'তোমাগো খুইজতেছে—বিপিন দাসের বাটারে ধরি লই গেছে। তোমাগো....'

মেয়েটি এক নিশ্বাসে বলতে গিয়ে হাঁপাতে থাকে। তাঁর বুক উঠছে নামছে, চুলগুলো উদভ্রান্ত, হাত পায়ের চলাফেরা তড়িৎ, দৃপ্ত।

'তুমি একটু শান্ত হও যশোদা.... আস্তে কথা বল।' বলে, সন্দীপদা ভিড়ের ভেতর ঢুকে গেলেন। সবাই সন্দীপদাকে ঘিরে ধরল।

ঘটনাটা কী ঘটেছে সবাই এক সাথে বলতে লাগল। সন্দীপদা এর দিকে এক-বার ওর দিকে একবার মুখ করে শুনতে লাগলেন। যশোদার গলার স্বর আবার শুনতে পেলাম।... ঝাগো, পবন নিজের ঘরে আগুন দেইছে...পুলিশ ডেইকে নিয়ে এইয়েছে....।'

সন্দীপদা আমার দিকে ফিরে তাকা-লেন। আমি খুব আস্তে ধীরে বললাম, 'পবন কে?'

'নগেন দাসের লোক।'

যশোদা আমার দিকে এগিয়ে এল। এবার আমি ওঁর মুখ দেখলাম। মিটোল মুখ। বসন্তের কালো কালো দাগ। মস্ত চোখ।

'ই ছেলাটি কে গো?'

'তোমাদের ভাই।'

'লতুন বুঝি...লতুন ভাই!'

আশপাশের ছেলেমেয়ের দল আমাকে ঘিরে ধরল।

শাঁখ আর কাঁসরের শব্দে গম গম করছিল চারদিক। বহু দূর থেকে ভেসে আসছে কোলাহল। সারা গ্রামে আলো,

জ্বলছে ব্যস্ত হয়ে—হ্যারিকেন। মানুষ জেগে উঠছে কাছে দূরে। শ্লোগান উঠছে ইন...ন...ব...! এই সব ছাপিয়ে গিয়ে পুলিশের বাঁশি বেজে উঠলো। সবাই সচকিত হয়ে ঘুরে দাঁড়ায়। আলো নেভে দুপ-দাপ। সারা গ্রাম অন্ধকারে ডুবে যায়।

'নতুন ভাই, ইদিক এইসো।' ঘন অন্ধকারে আমার হাত ধরে কে যেন টানতে থাকে। গলা শুনে মনে হল যশোদা। 'তুই ওদের সাথে চলে যা....' বলে, সন্দীপদা কয়েকজনকে ডাকলেন। ওরা অন্ধকারের ভেতর থেকে ভিড় ঠেলে বেরিয়ে এল। সন্দীপদা ওদের নিয়ে চলে গেলেন। আমি রয়ে গেলাম যশোদার কাছে। ওর আশপাশে কিছু মেয়ে বৌ ছোট ছোট ছেলে-মেয়ে জড়ো হয়ে ছিল। এ-বার সেটা ভেঙে গেল। আমি বললাম,

'ওরা কোথায় গেল, আমি...যাবো।'

'তুমি পথ-ঘাট চিন নি....যাবা কুথা, ইদিক থাক দিকিন!'

'এখানে থেকে আমি কী করবো.... মেয়েদের মধ্যে....!'

'কেনু মেয়েরা কি মানুষ লয়...মরদ জাত—মানুষ তো বটে।'

এ'রা হাঁটতে থাকে। আমাকে মাঝখানে রেখে ওরা হাঁটতে থাকে।

বহুদূরের কোলাহল কাছে আসছে। পূব দিকের অন্ধকারে আলোর আভা দুলছিল। গনগনে লাল আগুন হাতে নিয়ে ও'রা মিছিল করে আসছে। মশাল মিছিল। আমরা হাঁটতে হাঁটতে সেই পুকুরের পাড় দিয়ে একটা বাড়ির সামনে এসে দাঁড়াই।

'ইটা নগার বাড়ি গো নতুন ভাই।'

নতুন বাড়ি। বুক সমান উঁচু ইটে গাথা পাঁচিল। সারি সারি ঘর। সারি সারি সুপারী গাছ। মানুষজন কোথাও নেই। আমরা ক-জন পাঁচিলের সামনে এসে দাঁড়াই।

কোলাহল কাছে আসে। হাতে হাতে আগুন। মশাল জ্বলছিল প্রায় সবার হাতে। কারো হাতে তীর-ধনুক, বল্লম, বর্শা। যশোদা শ্লোগান তুলল ইন-কিলাব সমবেত জনতা উত্তর দিল—জিন্দাবাদ। উত্তর কাছ থেকে দূরে—বহু দূরে ছড়িয়ে যেতে লাগল। বহু দূর থেকে শ্লোগান উঠল—নকসালবাড়ি। উত্তর ভেসে আসতে লাগল লাল সেলাম...লাল সেলাম। যশোদা আবার শ্লোগান তুলল। কে একজন বলল, 'সব এইচে গো...দশ বিশটো গ্রাম আইচে ...আজ শালু নগার ঘর ...ভেইঙ্গে....।'

নগেন দাসের বাড়ির চারদিকে জনতার ভিড় জমতে থাকে। অন্ধকারে নিশ্চুপ নিথর হয়ে দাঁড়িয়ে আছে বাড়িটা।

যশোদা আমার হাত ধরে আছে। হাতে একটা চাপ দিয়ে ও আমাকে নীচু হতে বলল, আমি মাথা নীচু করে ও'র মুখের কাছে কান নিয়ে আসি।

যশোদা ফিস ফিস করে বলে, 'জাইনস্ রে ?'

'কী ?'

'নগার ঘর।'

'ঘর ভেঙে কী হবে ?'

যশোদা মাথা নাড়ে। আমি বললাম, 'পারলে ও'কে ধর।'

'ধইরবো কী গো, ও কি আছে ইখানে ?'

'কোথায় ও....থাকে কোথায় ?'

'থাকে ইখানে....বিশুদ্বার যাগ নিয়ে টাউনে গেল....দিন কয় ফিরবে নি ইদিক।'

'তবে ঠিক কর কী করবে—ঘর ভাঙা ঠিক হবে না।'

যশোদা মাথা নাড়ে। হঠাৎ আমার হাত ছেড়ে যশোদা পাঁচিলের ওপর উঠে যায়। শরীর দুলতে থাকে।

'নগা দাস বাড়িত নাই—ফিরে চলগো সব—ফিরে চল।' বলে যশোদা পাঁচিল থেকে নেমে আসে। একটা গুঞ্জন ছড়িয়ে পড়ে চারদিকে। মিছিল ফিরতে থাকে। যশোদা ফিরে আসে আমার কাছে। 'কাজটা ভাল হলনি।'

'কেন ?'

'সেই রাখাল ছাওয়ালের গপ্প শইনেছো....সেই বাঘের গপ্প।'

'হুঁ্যা।'

'আর ডাইকলে আইসবেনি কেউ... ঘণ্টা বাজিয়ে সার হইবে।'

আমি বললাম, 'তোমাদের ব্যাপার-স্যাপার আমি কিছু বুঝে উঠতে পারছি না। সবাই এসে নগেন দাসের ঘর ঘেরাও করল কেন ? পুলিশ আছে গ্রামে—তার কী হবে ?'

যশোদা কোমরের কাপড় শক্ত করে জড়াতে জড়াতে বলল, 'পুলিশ কি আর থাকে গো....উরা ইদিক আর মারাবেনি। গামের মাইনষের সাড় পেইয়ে কোন ঝোপ ঝাড় দি পেলাই গ্যাছে দেখ।' আশপাশ থেকে মানুষ জন সরে যাচছে দূরে। একটা হাট ভাঙা কোলাহল যেন ছড়িয়ে পড়ছে চারদিকে। আকাশের তারা মিট মিট জ্বলে। চাঁদ ঢেকে কালো মেঘ সরে যায়। 'কত্তা ছিল শাঁখ ঘণ্টা বাজলেই সব্বাই নগার বাড়ি ঘেইরে ধইরবে...শালু...' বলে যশোদা আমার দিকে তাকায়। 'তুমি বইললে ভাঙলোনি ঘর....কাজটা ঠিক হলনি নতুন ভাই!'

আমি চুপ করে থাকি। কাজটা কী ঠিক হলো ? আমি যশোদার মুখের দিকে তাকাই। কত আর বয়স হবে মেয়েটার ? কী আর দেখেছে জীবনে। জীবনে যা পেয়েছে তার চেয়ে বঞ্চিত হয়েছে বেশী। বঞ্চিত হওয়াটাই কী দেখা ?

আমরা হাঁটছি। কোলাহল সরে যাচ্ছে দূরে। আলোর মশাল ছিন্নবিচ্ছিন্ন হয়ে ফিরে যাচ্ছে ঘরে। অন্ধকার কাঁপিয়ে মশালের আগুন লকলকিয়ে উঠে যাচ্ছে... উঠে যাচ্ছে। আমরা সেই পুকুর পাড়ে এসে পড়লাম।

দু-দিকে পুকুর মাঝখানে সরু রাস্তা। রাস্তা পেরিয়ে যতিনদার বাড়ি। যশোদা আমার হাত ধরল।

এর আগে এমন নিশ্চিন্তে কোন মেয়ে আমার হাত ধরেনি। অসহায় পরাজিত হাত।

'নতুন ভাই ?'

'কী ?'

'কাজটো ঠিক হলনি।'

আমি চুপ করে থাকি। ওর হাত থেকে হাত ছাড়িয়ে নিই। এই হাত বেশীক্ষণ ছুঁয়ে থাকা যায় না। আবার বৃষ্টি নামল। আচমকাই হৈ হৈ করা বৃষ্টি। আমরা দৌড়ে উঠোন পেরিয়ে যতিনদার ঘরের দাওয়ায় উঠে আসি। যশোদা হাঁপ ছাড়ে। কোমড় থেকে কাপড় আলগা করতে করতে বলে, 'তুমি ইখানে থাকো নতুন ভাই, আমি ঘর যাই। ছেলাটো একা রইয়েছে—শুইয়ে, উইঠে আমি নাই দেইখলে কাইন্দবে।'

বললাম, 'যাও'। যশোদা ছুটে উঠোন পেরিয়ে বাইরে চলে গেল। নিঝুম বৃষ্টি। কতদূরে ও'র ঘর কে জানে। ওকে থাকতে বললে হত। যাও বললাম আর অমনি চলে গেল। দাওয়ার ওপর একটা মোড়া ছিল, আকাশ চমকে উঠতেই আমি সেটা দেখতে পেলাম। মোড়াটা কাছে টেনে নিয়ে বসতে যাবো। যতিনদার গলা শুনলাম। আরো অস্পষ্ট অচেনা গলা। ও'রা ফিরে আসছে। খুট করে দরজা খুলে গেল। লম্বা পা বাড়িয়ে প্রথমে ঢুকলেন যতিনদা। তারপর অন্ধকার আর বৃষ্টির জলে ভিজতে ভিজতে কয়েকজন ঢুকল। সবশেষে সন্দীপদা। যতিনদা হাত তুলে নাড়িয়ে চাড়িয়ে কী সব বলছেন, বৃষ্টির শব্দ সব কিছু ঢেকে যাচ্ছে। অন্ধকার কালোজলে মানুষগুলোকে মিশিয়ে চুপসে দিয়েছে। একটা উদ্দাম উল্লাস নিয়ে সবাই উঠে আসছে দাওয়ার ওপর। খালি গা, পরনে খাটো কাপড়। জল গড়াচ্ছে দরদরিয়ে। সন্দীপদা আমাকে দেখেই বললেন, 'তুই এখানে ?'

(চলবে)

জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্র

জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্র কবিতা লিখেছেন, গান লিখেছেন, গানে সুর দিয়েছেন এবং গান গেয়েছেন। কিন্তু সারা জীবন ধরে কয়েকশ কবিতা লিখলেও বই ছাপা হয়েছে মাত্র একখানি, তাও অন্যের চেষ্টায়। লিখিত গানের সামান্য এক ভগ্নাংশই খুঁজে পাওয়া যায় অনুরাগীদের কাছে। তার মধ্যে নবজীবনের গান ছাড়া আর কিছুর স্বরলিপিও ছাপা হয় নি। এবং সারা জীবন ধরে রবীন্দ্রসঙ্গীত গাইলেও তাঁর গানের রেকর্ড মাত্র একখানি।

ফলে একালের অনেকের কাছেই তিনি অপরিচিত। যদিও অনেকেই তাঁর নাম শুনেছেন, খানিকটা কিংবদন্তি-এর মতো। কিন্তু কেন তিনি এত বড় তা আন্দাজ করতে পারেন নি। অবিশ্যি খানিকটা কারণ হয়ত এইটেই যে মাঝখানে প্রায় বছর কুড়ি ছিলেন তিনি কলকাতার বাইরে। কিন্তু যখন তিনি কলকাতায় ছিলেন, তাঁর সেই সব থেকে সক্রিয় পর্বেও তিনি যে খুব পরিচিতদের মধ্যে ছিলেন তা বলা যায় না।

রবীন্দ্রনাথ একবার বলেছিলেন যে দেশ-বিদেশে তিনি অনেক রকম জ্ঞানীগুণী বড় মানুষ দেখেছেন কিন্তু তাঁরা কেউই তাঁর বড়দাদা দ্বিজেন্দ্রনাথের মতো বড় নন। তখন তাঁকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল, কিন্তু তাহলে দ্বিজেন্দ্রনাথের সে রকম নাম-যশ হল না কেন? উত্তরে রবীন্দ্রনাথ জানিয়েছিলেন, হল না তার কারণ দ্বিজেন্দ্রনাথের প্রতিভার কোন গৃহিণীপনা ছিল না।

জানিনে গৃহিণীপনা বলতে রবীন্দ্রনাথ কী বুঝিয়েছিলেন। কিন্তু তার মানে যদি হয় সাংসারিক বুদ্ধি তো স্বীকার করতেই হবে দ্বিজেন্দ্রনাথের তা ছিল না। অন্তত তাঁর সম্বন্ধে প্রচলিত নানা ধরনের কাহিনী ও কিংবদন্তী থেকে সেই রকমই মনে হয়।

আমাদের জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্রও ছিলেন খানিকটা সেই ধাঁচের মানুষ। তাঁরও প্রতিভার কোন গৃহিণীপনা ছিল না। কিছুতেই তিনি গুছিয়ে-গাছিয়ে বুঝে সুঝে চলতে পারতেন না। সেজন্য তাঁর সম্বন্ধেও প্রচলিত রয়েছে অনেক রকম গল্প, যাতে বোঝা যায় যে মানুষের প্রতি ভালবাসা তাঁর এত জোরাল ছিল যে নিজেকেও তিনি ভুলে যেতেন।

বলাই বাহুল্য তার জন্যে তাঁকে দাম দিতে হয়েছে। আজকের এই উর্দ্ধশ্বাস সংসারে, উন্নতি এবং আরো উন্নতির জন্যে মরিয়া-প্রতিযোগিতাই যেখানে নিয়ম হয়ে দাঁড়িয়েছে, নিজের প্রতিভার বিষয়ে নিজেই জয়ঢাক বাজিয়ে তাকে বাজারে হাজির করা ছাড়া উঁচু দাম পাবার আশা নেই। জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্র তা পারেন নি কাজেই তাঁকে থাকতে হয়েছে কাজের জগতে বেশ খানিকটা অবহেলিত। কিন্তু মনের জগতে তাঁর স্থান হয়েছে অনেক বেশি উঁচুতে। তাই সেদিন তাঁর মৃত্যুর খবর শুনে শয়ে শয়ে অনুরাগী এসে তাঁরই গান তাঁরই সুরে গেয়ে শোকযাত্রায় অনুগামী হয়েছেন। এবং সাহিত্য-শিল্প-সংস্কৃতির নানা দিকের সুখ্যাত ব্যক্তিরা এসে এই আত্ম-উদাসীন শিল্পীর প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে গেছেন।

॥ ২ ॥

জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্রের জীবনের কোন ঘটনাই চমকে দেবার মত নয়, কিন্তু বৈচিত্র্য তাই বলে কিছু কম নয়। পড়েছিলেন বিজ্ঞান নিয়ে, সেন্টজেভিয়ার্স কলেজ থেকে স্নাতকও হন, কিন্তু স্পেশাল বি-এ পরীক্ষা দিয়ে ভর্তি হলেন তিনি এম-এ ক্লাশে। সঙ্গে কিছু দিন আইনও পড়েছিলেন। এর আগে বি, এস-সি পাশ করার পর ডাক্তারী পড়ার জন্য মেডিকেল কলেজে ভর্তি হতেও গিয়েছিলেন একবার। এবং এম-এ পাশ করার পর ঢুকলেন গিয়ে চার্টার্ড একাউন্টেন্ট ফার্মে শিক্ষানবীশ হিসেবে। কিন্তু সেখানেই শেষ নয়। বছর খানেক পরই সে পথও ছেড়ে দিলেন তিনি। তারপর এক বন্ধুর সঙ্গে খুলে বসলেন ওষুধ তৈরির কারখানা। এবং তারও বছর কয়েক পরে মেদিনীপুরে গিয়ে [illegible] খামার স্থাপন। কিন্তু ইতিমধ্যে তিনি সংসারী হয়েছেন। কাজেই আজীবন স্বপ্নদর্শী এই মানুষটিকে শেষ পর্যন্ত উকিল ডাক্তার হিসাবপরীক্ষক ব্যবসায়ী এবং আদর্শ কৃষক হবার আশায় জলাঞ্জলি দিয়ে, যা ছিল তাঁর অবকাশের আনন্দ এবং সামাজিক যোগাযোগের সেতু, তাকেই ব্যবহার করতে হল রুজিরোজগারের কাজে। প্রথমে গীতবিতানের সঙ্গীত শিক্ষক হিসেবে, এবং পরে দিল্লির সঙ্গীত নাটক একাডেমির সঙ্গীত পরিচালনার বৃত্তিতে।

দিল্লিতে তাঁর সঙ্গে অনেকবারই দেখা হয়েছে। তিনি ছিলেন আমার নিকটআত্মীয়, কিন্তু তার চেয়েও বড় কথা, বয়সে যথেষ্ট বড় হলেও তিনি ছিলেন আমার আকৈশোর বন্ধু। সেজন্য নানাভাবেই তাঁর খুব কাছে আসার সুযোগ পেয়েছি। এবং যাঁরা তাঁকে চিনতেন তাঁরা জানেন তাঁর মত বুদ্ধিদীপ্ত সরস মনের মানুষ লাখে একজন মেলে কিনা সন্দেহ। সত্যি বলতে কি, উইট এবং হিউমারের বোধ ছিল তাঁর মজ্জাগত। কিন্তু দিল্লিতে প্রায়ই অনুভব করেছি, তিনি যেন বেশ কিছুটা মজ্জাগত। কিন্তু দিল্লিতে প্রায়ই অনু-মাছ ডাঙায় উঠে আসার মত। সেখানে জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্রের মত মানুষ যে কী ভীষণ বেখাপ্পা তা মর্মে মর্মে বুঝেছি। তাঁকে দেখলেই মনে জাগত বোদলেয়ারের সেই এলবাট্রস কবিতাটি। সেই সমুদ্রচারী এলবাট্রসও হঠাৎ প্যারিসের রাস্তায় নেমে এসে এই রকম বেমানান হয়ে উঠেছিল—কেননা আকাশে উড়ত বলে সে তার পায়ের ব্যবহার জানত না, এবং আকাশে ওড়ার সেই বিশাল দুটি পাখাও পথের ধুলোর আছাড় খেয়ে খেয়ে তার [illegible]বার পথে বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছিল। এলবাট্রস বলা বাহুল্য একা যাঁরা সত্যিকারের বড় মাপের শিল্পী সাধারণত তাঁদেরই প্রতীক। এবং জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্র ছিলেন সেই মর্মপীড়িত কাতর শিল্পীদেরই একজন।

॥ ৩ ॥

জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্রের বিষয়ে ইতিমধ্যে যেটুকু বলা হয়েছে তাতেই আশা-করি বোঝা গেছে, তাঁর ঝোঁক ছিল জীবনের বহু দিকে। আমার যখন কৈশোর তাঁর তখন যৌবন। সে সময়ে দেখেছি খেলাধুলোয় তাঁর কি তীব্র আসক্তি। ফুটবল আর ক্রিকেট দুদিকেই ছিল তার সমান ঝোঁক। কিছুকাল তিনি কলকাতার এক ক্লাবের হয়ে বড় ম্যাচেও ফুটবল খেলেছেন। অন্যসময় করতেন তিনি জিমন্যাস্টিকের চর্চা। একবার, বোধ-

হয় বি-এল-বি পরীক্ষার আগে পালা-লেন বার থেকে পড়ে গিয়ে বাঁ হাতের কব্জি ভেঙে যায়। সে ভাঙার চিহ্ন সারাজীবনই থেকে গিয়েছিল। তাছাড়া ব্যাডমিন্টন, ক্যারম, যখন যা পেতেন তাতেই তিনি মেতে উঠতেন। পাবনায় থাকার সময় বর্ষায় ভরা পদ্মায় বাড়ির ছোটো বোটে দাঁড় টানা ছিল তাঁর আরেক নেশা।

অথচ এই স্বভাবের মানুষকেই দেখা যেত ঘণ্টার পর ঘণ্টা একা বসে গানের রেওয়াজ করতে এবং কবিতা লিখতে। অর্থাৎ একই সঙ্গে তিনি ছিলেন চূড়ান্ত-রকম একসট্রোভার্ট এবং অবিশ্বাস্য ধরনের ইনট্রোভার্ট।

দিল্লীতেও দেখেছি, সেই ছড়ান-ছিটানো শহরে এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে শুধু আলাপী লোকদের সঙ্গে শিল্প-সাহিত্যের আলোচনা করে বেড়াতে। আবার কখনো কখনো দিল্লির পুরনো কোন বাগানে গিয়ে চুপচাপ বসে থাকতে। এইভাবে একা থাকার স্বভাব থেকেই তাঁর মধ্যে দেখা দিয়েছিল পক্ষী পর্যবেক্ষণের দিকে ঝোঁক। অনেক রকম পাখিকে প্রায় পেশাদারের মতো চিনতেন তিনি, আর সে বিষয়ে বিস্তর পড়াশোনাও করেছিলেন। একবার মনে পড়ে, দিল্লির রিজ অঞ্চলে পাহাড়ী জঙ্গলে সারা দুপুর ও বিকেল ধরে আমাকে পাখি দেখিয়ে ফিরেছিলেন।

এসব কথা বলার কারণ হল এইটে জানান যে, জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্রের কাছে মানুষের প্রতি ভালোবাসা কোন বিচ্ছিন্ন ব্যাপার ছিল না, জলমাটি গাছপালা পশুপাখি নিয়ে যে বৃহত্তর জগৎ তারই অঙ্গ হিসেবে এসেছে। সে জন্যে তাঁর গানের সুরে একই সঙ্গে এসে মিশেছে ভারতীয় রাগের ধ্রুপদী ধারা, রবীন্দ্র-সঙ্গীতের শিক্ষা লোকগীতির ঐশ্বর্য। সেই জন্যেই তাঁর মনের দরজাটিও ছিল সমস্ত রকমের চিন্তা, নতুন ভাবধারা এবং নতুন মানুষের জন্যে উন্মুক্ত।

॥ ৪ ॥

কবিতা এবং গানের ক্ষেত্রে জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্র যা করেছেন সে বিষয়ে আলোচনার সময় এখন নয়। শুধু এই-টুকু বলা যায়, কবিতার ক্ষেত্রে তাঁর প্রধান সৃষ্টি নবজীবনের গান, যা শম্ভু মিত্র এবং তৃপ্তি মিত্রের যুগ্ম আবৃত্তিতে সারা বাংলাদেশের হৃদয় মনকে আলোড়িত করেছে একদিন। সেদিনের ঈষৎ অবহেলিত আধুনিক কবিতার যুগে মধুবংশী গলির মত সুদীর্ঘ কবিতার এই জনপ্রিয়তা ছিল সত্যিই এক অভাবনীয় ব্যাপার। আর গানের দিকে তাঁর অবদান হল, দুর্ভিক্ষের পটভূমিতে রচিত নবজীবনের গান। একটি অতি-পরিচিত কঠিন বাস্তবকে এইভাবে গীত হিসেবে গ্রহণ করে যেভাবে তিনি পর্যায় ক্রমিক গানের ভেতর দিয়ে তাকে অপেরার চেহারা দিয়েছেন একমাত্র রবীন্দ্রনাথ ছাড়া আর কেউ তা তাঁর আগে, এমন কি পরেও, সার্থকভাবে করেছেন কিনা জানিনে। যাঁরা ভাল গান জানেন তাঁরা দেখেছেন মালকোষ, হিন্দোল ইত্যাদি খাঁটি ভারতীয় রাগকে তিনি বিস্ময়করভাবেই প্রয়োগ করেছেন। তেমনি আশ্চর্য তাঁর লোকসঙ্গীতের ভাটিয়ালি সারি-জারি ইত্যাদি সুরের ব্যবহার। দুঃখের বিষয়, এমন আশ্চর্য পালাগানেরও কোন গ্রামোফোন রেকর্ড নেই।

তবে হতাশ হবারও কারণ নেই। জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্র যে ধরনের স্রষ্টা তাঁরা বর্তমানের চেয়ে ভবিষ্যতেই বেশি করে বাঁচেন। একদিন নিশ্চয়ই দেশে এমন সময় আসবে যখন শিক্ষার বিকীরণ সমাজের শেষ প্রান্ত পর্যন্ত গিয়ে পৌঁছাবে, জনরুচিও হবে আজকের চেয়ে অনেক বেশী রকম উন্নত, তখন সেদিনের নতুন মানুষেরা পরম কৃতজ্ঞতার সঙ্গে লক্ষ্য করবেন, জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্র তাঁদের জন্যে কী ঐশ্বর্য রেখে গেছেন।

ইতিমধ্যে জ্যোতিরিন্দ্র খানিকটা তৃষ্ণা, খানিকটা প্রেরণায় যেখান এক অপ্রতিরোধ্য সুর যা কানের কাছে সব সময়েই বলে যাবে—এসো মুক্ত করো, মুক্ত করো, অন্ধকারের এই দ্বার। যার সঙ্গে আশ্চর্যভাবে মিলে যায় রবীন্দ্র-নাথের শিশুতীর্থ কবিতার চিরন্তন প্রার্থনা—মাতা দ্বার খোল।

অশীন্দ্র রায়

জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্রকে শেষ শ্রদ্ধা জানাতে বুধবার কেওড়াতলা শ্মশানে কলকাতার কবি - শিল্পী - সাহিত্যিক —এক কথায় বুদ্ধিজীবীরা সমবেত হয়েছিলেন। সদালাপী, বন্ধুবৎসল—প্রায় শত্রুহীন জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্র— যানে বটুকদা ছিলেন এক আনন্দপুরুষ। শবদেহ ঘিরে যাঁরা দাঁড়িয়েছিলেন জীবিত বটুকদা তাঁদের একসঙ্গে দেখতে পেলে হয়ত নতুন করে জীবনের গান লিখতেন। আক্ষেপের মত শোনালেও, এমন সমাবেশ সচরাচর ঘটে না। সান্ত্বনা এই যে, শ্মশানে তবু সবাই মিলেছিলেন।

বটুকদার গান হচ্ছিল সমবেত কণ্ঠে। তিনি শায়িত। ফুলের পাহাড়ে শুধু মুখটুকু ঢাকা পড়েনি। গানের কথাগুলি যেন মুখের উপর তুড়ি মারছিল। কারণ বটুকদা মরণের মুখে তুড়ি মেরে প্রাণের উপনিবেশে নব-জীবনের ভাষা ফোটাতে চেয়েছিলেন। সে গান আজও গাওয়া হল। বার বার কানে বাজছিল 'মরে যেতে দেবো না, দেবো না, দেবো না।'

জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্র করেন নি এমন কাজ নেই। বিজ্ঞানের আলোক উদ্ভাসিত ইংরাজী সাহিত্যে বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বোচ্চ ডিগ্রিধারী। ছেলেবেলায় ছবি আঁকতেন। পরে কবিতা, অনুবাদ আর গান গাওয়া। বহুদর্শী গানের ভাবে রবীন্দ্র সঙ্গীতের চর্চা তিনি করেছেন। তাই তাঁর গানে প্রথাগত রাগরাগিণীর সঙ্গে তাল-লয়ের উপস্থিতি যেমন পাই, তেমনি গানের শব্দ চয়নে রবীন্দ্রনাথ থেকে নব-কালীন কবিদেরও খুঁজে পাই। জমিদার বংশের রক্ত গায়ে নিয়েও আধুনিক মন আর সংস্কৃতিবান বটুকদা বৈজ্ঞানিক সমাজ বিন্যাসে বিশ্বাসী ছিলেন। ছিলেন আজীবন কম্যুনিস্ট পার্টির সদস্য। জীবনে অনেক কিছুই হয়েছেন, ছেড়েছেন তিনি। ছাড়েন নি কম্যুনিস্ট পার্টি। তাঁর সৃষ্টিকে সমস্ত জুড়ে তাঁর রাজ-নৈতিক বিশ্বাস কতটা সজীব ছিল বলা কঠিন। বটুকদার সৃষ্টির মধ্যে উল্লেখ-যোগ্য মধুবংশীর গলি ও নবজীবনের গান। অক্ষরবৃত্তে মিলে - অমিলে দীর্ঘ কবিতা মধুবংশীর গলি তাঁকে কবি হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেছিল। মন্বন্তরের পটভূমিতে নবজীবনের গান বলিষ্ঠ প্রতিবাদ।

জীবনে কখনও স্থির থাকেন নি। প্রচুর ঘুরেছেন। দেশেবিদেশে। দিল্লীতে রামলীলা (নাকি গীতায়ন) তাঁর সমাজসচেতনতার পরিচয় দেয়। এখানে কর্মী বটুকদাকে দেখতে পাই আমরা। চলচ্চিত্রের সঙ্গীত পরিচালনাও এই পর্যায়ে পড়ে। মনে পড়ে মেঘে ঢাকা তারা'র সেই অপূর্ব রবীন্দ্রসঙ্গীত 'এসো হে, এসো হে মানবজীবন।' সবচেয়ে বেশি করে মনে পড়ে মধুবংশীর গলি আর নব-জীবনের গানের জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্রকে। এখানেই তিনি স্বরূপে প্রকাশিত।

আন্তর্জাতিক গানের সঙ্গে বটুকদা বৈদ্যুতিক চুল্লীতে ঢুকে গেলেন। কানে বাজছিল—'শেষ যুদ্ধ শুরু, আজ কমরেড এসো মোরা মিলি একসাথ।' যাঁরা মিলেছিলেন তাঁরা পায়ে পায়ে বাড়ি ফিরলেন।

বাড়ি ফিরে মধুবংশীর গলিতে চোখ বোলাতে গিয়ে দৃষ্টি ঝাপসা হয়ে এলো—

'হ্যাঁ, বলতে ভুলেছি

আর এক কথা।

এই তো সেদিন, ট্রেন থেকে

দিলো নামিয়ে,

হাতের তলায় সযত্নে চাপা

অচল পুরনো সিকিটা

দিলো কে নামিয়ে অচেনা স্টেশনে

জীবনের ট্রেন থেকে।'

আমরা তোমাকে ট্রেন থেকে নামিয়ে এনেছি। কিন্তু, তোমার নতুন স্টেশনের নাম কি?

সুবোধ বসু

লীলা মজুমদার

পাকদণ্ডী

ষোল বছর বয়সে আমরা জানতাম চকচকে চুল ভারি খারাপ। ছিলও মাথায় এক ঢাল চুল, এলো খোঁপা করাতে বাধা ছিল না। ঠোঁটে রং, ভুরুতে রং, চোখের পাতিতে রং, নখে রং—এসব অন্য জগতের ব্যাপার। ঘামে নাক-মুখ চকচক করলে বিশ্রী দেখায়, তাই একটু পাউডার মাখা চলত। তাও মুখে মাখার জন্য আলাদা রকম পাউডার কিনতে হয়, সেটা শিখতে সময় লেগেছিল।

প্রসাধনের কথা বাদ দিয়েও অন্য সমস্যা ছিল। সারাদিন এক গাদা কাপড়-চোপড় টেনে বেড়াতে হত। সে পোশাকের ডিজাইন হয়েছিল মহারানী ভিক্টোরিয়া যখন প্রথম সিংহাসনে চড়েন নিশ্চয় সেই সময়ে। ১৯২৪ সালে আমরা তখনো তাঁর সময়কার ঢঙের কাপড়-চোপড় পরতাম। অন্তর্বাস কথাটার তখনো চল হয়নি, শুনলে নিশ্চয় একটু অসভ্য-অসভ্য মনে হত। আমরা কি পরে কলেজে যেতাম তাই বলি। প্রথমে হাঁটু পর্যন্ত লম্বা একটা ইজের। তার ওপর গলার কণ্ঠা থেকে পায়ের গোড়ালি অবধি লম্বা একটা সাদা লংক্লথের সেমিজ। তার ওপর কোমর থেকে পায়ের গোড়ালি অবধি লম্বা লংক্লথের সায়া। ওপর দিকে সেমিজের ওপর ছোট হাতাওয়ালা আঁটো একটা বডির ওপর কনুই হাতা, কণ্ঠা অবধি উঁচু একটা ব্লাউজ আর সবার ওপরে ডান কাঁধে পিন দিয়ে আঁটা ব্রাহ্ম-ফ্যাশানে পরা শাড়ি। তখন থেকেই সামনে কুঁচি দিয়ে মাদ্রাজি ফ্যাশানে কাপড় পরার রেওয়াজ শুরু হয়েছিল, কিন্তু বাবার দৃঢ় বিশ্বাস ছিল ও ফ্যাশানটা ভারি অসভ্য, কাজেই দিদি আর আমি এম. এ. পাশ করে স্বাধীন হবার আগে পর্যন্ত ব্রাহ্ম-ফ্যাশানে শাড়ি পরেছি। পায়ে ছোট গোড়ালি শু। বাড়িতে বাঙালী ধরনের কাপড় আর পায়ে চটি, কিংবা খালি পা। সে যাই হক, আমি জোর করে বলতে পারি আমরা ঐ সব পরে যখন সুরক্ষিতভাবে ট্রামে চড়ে এম. এ. পড়তে যেতাম আর ছেলেদের সঙ্গে ক্লাশ করতাম, তখন আমাদের শরীরের কোনো জায়গায় একটুকু উঁচু নিচু কিছু আছে বলে মালুম দিত না। তবে স্বাভাবিক ওজনের চাইতে নিশ্চয় আমরা সের দুই ভারি হয়ে যেতাম। তাছাড়া আরেকটা অসুবিধা ছিল যা ভুক্তভোগী ছাড়া কারো টের পাওয়া অসম্ভব ছিল। সেটি হল যে ঐ তলাকার সেমিজটা তার ওপরকার পেটি-কোটটা আর সবার ওপরকার শাড়িটার আড়াই প্যাঁচ পরস্পরের সঙ্গে মাঝে মাঝে এমনি জড়িয়ে যেত যে হাঁটাই দায় হয়ে উঠত। আর গরু তাড়া করলে যে কি হত সে ভাবলেও গা শিউরে ওঠে।

কলেজে পড়তে যেতাম ভালো লাগত। সে সময় ডায়োসেশান কলেজে ইংরিজি, ইকনমিকস, ইতিহাস ইত্যাদি পড়াবার জন্য বিলেত থেকে ভালো ভালো খাঁটি মেম আনা হত। আর সিস্টার ভেরা ফ্র্যান্সিস তো ছিলেনই। মনে হয় খুব ভালো পড়ানো হত। ইন্টারমিডিয়েট ক্লাসে ইতিহাস পড়াতেন চারুলতা দাশ। এঁর কাছে আমরা স্কুলের ওপরের ক্লাসেও ইতিহাস পড়েছিলাম। পাতলা ছিপছিপে, অতি পরিপাটি করে কাপড়-চোপড় পরা, এক অভিজাত খ্রীশ্চান পরিবারের মেয়ে। ভারি কড়া, কিন্তু চোখ দেখে সন্দেহ হত সেই সঙ্গে বেজায় রসবোধও ছিল। পরে যখন নিয়ম হয়ে গেল যে এম-এ পাস না করলে কেউ কলেজে পড়াতে পারবে না, তখন আধ-বুড়ো চারুদি কোমর বেঁধে লেগে গেলেন। সমানে অধ্যাপনার সঙ্গে সঙ্গে নিজে পড়ে তৈরি হয়ে, ১৯৩০ সালে আমি যেবার এম-এ দিলাম, সেবার উনিও ইতিহাসে এম-এ দিয়ে, পাস করে, পুরনো চাকরিতে ফিরে গেলেন। আরো আট-দশ বছর পরে উনি ডায়োসেশান স্কুলের অধ্যক্ষা হয়ে অনেকদিন অতি দক্ষভাবে বিদ্যালয় চালিয়েছিলেন।

পরে শুনতাম ওঁর নাকি বেজায় কড়া মেজাজ। শুধু ছাত্রীদের নয়, তাদের মা-বাবাদেরও নাকি বকে ভূত ভাগিয়ে দিতেন। আমি কিন্তু তাঁর কাছ থেকে আগাগোড়া অত্যন্ত স্নেহ ও সহানুভূতি পেয়েছি। এক সময় আমাদের ক্লাস-টিচার ছিলেন। মনে আছে তখন আমার বাংলা লেখার চেষ্টা দেখে ভারি উৎসাহ দিতেন। মাস্টারণী জিনিসটি নিয়ে লোকে হাসাহাসি করে। যেন ভারি কৌতুককর কিছু। মা-বাবারা অত সময়ে—বিশেষ করে বাবারা—মেয়েদের কাছে তাদের দিদিমণিদের নীরস চেহারা আর কড়া মেজাজ নিয়ে তামাশা করেন। এ একটা মজার ব্যাপার। পুরুষ অধ্যাপকরা স্বাভাবিক জীবন কাটান, তাঁদের স্ত্রী-পুত্র-পরিবার থাকে। হয়তো মাঝে মাঝে মনে হয় না থাকলেই ছিল ভালো—তবু তাঁদের জীবন থেকে সব রস শুকিয়ে যায় না। তাছাড়া তাঁদের বন্ধু-বান্ধব নিয়ে বাইরের একটা সরস জীবনও থাকে। মেয়েদের কিছুই থাকে না। আমাদের দেশে সব মেয়ের বিয়ে হয়ে যাবার কথা, তা সে সুখের হক কি দুঃখের হক। তবু বিধবারা আছে আর যে কোনো কারণেই হক বিয়ে হল না এমন অনেক মেয়ে আছে। মা-বাবা যতদিন বেঁচে থাকেন, তারা একটা বাড়ির আদর যত্ন পায়। তাঁরা গেলে, প্রায়ই দেখা যায় বোর্ডিং-এ, হস্টেলে, কিংবা কোথাও এক-খানা ঘর নিয়ে, তাঁদের জীবন কাটে। সে ঘরটি একটা নিরাপদ আশ্রয় হলেও, নিজের বাড়ি নয়। মনের কোমল বৃত্তিগুলো শুকিয়ে গেলে আশ্চর্য হবার কিছু নেই। এসব মেয়েরা পরের ছোট ছেলেমেয়েদের দেখলে হয় গলে কাদা হয়ে যায়, নয় নির্মম উগ্র মূর্তি ধারণ করে। উভয় ক্ষেত্রেই ছেলেমেয়ে পড়াবার যোগ্যতা হারায়। আরেক রকম আছে, তাদের অবস্থা ভালো, নিজেদের গুণ আছে, হয়তো বিদেশ ঘুরে এসে ভালো চাকরি করে কিন্তু নিঃসঙ্গ জীবন কথায় কথায় তারা পারিবারিক জীবনের প্রতি ঘৃণা, তাচ্ছিল্য প্রকাশ করে কিশোর মন নিয়ে [illegible] করবেটা কি যতই উইমেন্স লিব [illegible] বেঁধে লম্বা চওড়া কথা শুনি, ততই [illegible] সেই সব বঞ্চি[illegible] নিঃসঙ্গ দিদিমণি[illegible] কথা মনে পড়ে। তাঁদের একজনকেও [illegible] সুখী বলে ম[illegible] হত না। শুধু [illegible] দিয়ে জীবন ভ[illegible] রাখতে পারে লাখে একজন। আর [illegible] যাদের অসাধারণ [illegible] থাকে। নইলে পারিবারিক জীবনের মতো আছে কি? [illegible] তেতো, কিন্তু [illegible] মধুর। চার দিক দি[illegible] এমনভাবে হাত-পা বেঁধে রেখে দেয় [illegible] একবার একা গিয়ে জ্বালামুখী দেখে আ[illegible] এত শখ সত্ত্বেও, সারা জীবনে হয়ে উ[illegible] না! পৃথিবীতে দর্শনীয় এত জায়গা যে [illegible] চারটি ঘরের মধ্যে ডানা গুটিয়ে ব[illegible]

আমাদের একটা মস্ত কাকাতু[illegible] ছিল, পায়ে শেকল পরে সে দাঁ[illegible] বসে থাকত। রোজ সন্ধ্যায় এক[illegible] সে একটানা পাঁচ মিনিট [illegible] বিকট চ্যাঁচাত আর ডানা ঝাপট[illegible] মেয়েমানুষের জীবনেও তাই হয়, দিন[illegible] একবার ডানা মেলে, যে জায়গা ধরা-ছোঁ[illegible] বাইরে সেইখানে উড়ে যেতে ইচ্ছে ক[illegible] অথচ ঐ চারখানি ঘরের মধ্যেও সে এত [illegible] ধরে কে জানত! আমি বাড়ি না থা[illegible] অসুবিধা হয়, আমি এলে কেউ খুশী [illegible] এমন সব মানুষ আছে [illegible] যাদের জন্য সারা দিন কাজ ক[illegible] আমার কাজের শেষ থাকে না। ফেলে [illegible] মতো পাঁচ মিনিটও সময় আমার নেই।

দুঃখ যে না পেল, সে কতটুকু সুখ পেল? তাই জীবনের প্রদোষে, আমার সেই সব দিদিমণিদের— যাঁদের এক কালে জ্বালিয়েওছি কম নয়—তাঁদের কাছে আমার হৃদয়ের ভালোবাসা জানাই।

সঙ্গে সঙ্গে মনে মনে প্রতিজ্ঞা করতাম, যত পারি লেখা-পড়া করব, কিন্তু অধ্যাপনা করে কখনো আমি জীবন কাটাব না। ভাবতাম একটা বড় লাইব্রেরিতে দিন কাটাতে কেমন লাগবে? নয়তো একটা ছাপাখানায় বা প্রকাশনালয়ে? নিদেন একটা বইয়ের দোকানে? যেখানে সারাদিন নতুন বইয়ের গন্ধ পাব; যে বইতে কেউ হাত দেয়নি, সে বই প্রথম খুলব। কিন্তু সর্বদা তার পেছনে থাকবে একটা ছোট বাড়ি, একটা মানুষ আর দুটো একটা ছেলেমেয়ে, আমার ঘর, আমার মানুষ। সেই ষোল বছর বয়সেই জানতাম এদের না পেলে আমার সুখ কোথায়? পৃথিবীর সমস্ত প্রয়াসের উদ্দেশ্যই হল একটি ছাদের তলায়, কটি মানুষ। তা না পেলে ছোটদের জন্য গল্প লিখব কি করে? জীবনের আধখানা ফাঁকা থাকলে, তাকে ভরব কি দিয়ে? নকল জিনিসে তো কাজ হবে না।

বলা বাহুল্য এত গুছিয়ে কথাগুলো ভাবিনি, কিন্তু একবারো ইচ্ছা করেনি নিজেকে বেজায় রকম ভালো করে তৈরি করে, মস্ত একটা চাকরি করে সবাইকে তাক লাগিয়ে দিই। তা ইচ্ছে না হলেও স্বাধীন হবার প্রবল বাসনা ছিল। এই বইতে আমি শুধু আমার প্রকৃত মনের কথা লিখব। সেই কৈশোর থেকে কারো কোনো কর্তৃত্ব আমি ভালো মনে মেনে নিতে পারিনি। না শিক্ষকদের, না বাবার, না মার। নিজের অক্ষমতা মূর্খতা সম্বন্ধে যথেষ্ট সচেতন ছিলাম বলে সেই অবাধ্যতা কখনো কাজে প্রকাশ করিনি। তবে তর্ক করে যতই গুরুজনদের অপ্রীতি-ভাজন হয়েছি, ততই মনে মনে সংকল্প করেছি আমার এই ভালোবাসার মানুষ-গুলোর কাছেও আমার নিজেকে সমর্পণ করব না। তবে এও ভাবতাম যে ভালোবাসার মানুষগুলো সুখী না হলে, আমিও যখন সুখী হতে পারি না, তবে আবার স্বাধীন হব কি করে? অনেক পরে, অনেক সুখ অনেক দুঃখ পেরিয়ে বুঝেছিলাম স্বাধীনতাও বাইরে কোথাও খুঁজে পাওয়া যায় না, তার নিবাস আমারি মনের মাঝে। এত কথা বলার মানে হল আমি ভারি অবাধ্য মেয়ে। অন্য লোকের কথামতো চলা আমার পক্ষে বড্ড কঠিন।

বাবা আমাদের মাঝে মাঝে গড়ের মাঠে হকি ফুটবল খেলা দেখতে নিয়ে যেতে চাইতেন, কিন্তু যখন শেকসপীয়র রেপার্টরি থিয়েটার এসে প্র্যাট স্কুলে অভিনয় দেখান, কলেজ থেকে মেম দলবল নিয়ে টিকিট কেটে দেখতে গেলেন, বাবা আমাদের যেতে দিলেন না। মনে মনে ভয়ানক রাগ হয়েছিল। মার কাছে গিয়ে খুব খানিকটা গজ-গজ করেছিলাম। মাকে শুনলো বাবার বিচারের বিরুদ্ধে একটি কথা বলতে শুনিনি। কিন্তু চোখে বেদনা দেখেছি। এতগুলো ছেলেমেয়ের কারো গায়ে কখনো হাত তোলেননি, খালি আমার আর একটা দুরন্ত ভাইয়ের গালে এক-আধবার চড় বসিয়েছেন। মনে হয় ভগবান থাকলেও সে অবস্থায় চড় দিতেন। ভাগ্যিস তিনি নিরাকার, তাই বড় বাঁচা বেঁচেছি। বলেছি তো যাকে লক্ষ্মী মেয়ে বলে, আমি তা ছিলাম না। তবু কেন আমার মাসি, মেসো, পিসি, জ্যাঠা, জেঠি, দাদা দিদি আর এন্তার বন্ধু-বান্ধবের কাছ থেকে এত স্নেহ পেয়েছিলাম জানি না। আশা করি তাঁদের মনে আমার অবাধ্য স্বভাব শুধরোবার উচ্চাশা ছিল না।

জ্যাঠতুতো পিসতুতো ভাইবোনগুলোও তত দিনে অনেক বড় হয়ে গেছিল। সম-বয়সীদের সঙ্গে একটা কোমল স্নেহের সম্বন্ধ গড়ে উঠেছিল, তাই বলে তর্কাতর্কিও কম হত না। আমার মাসিমা একবার মাকে বলেছিলেন, 'আচ্ছা এদের কারো সঙ্গে কারো মত মেলে না কেন?' মা কাষ্ঠ হেসে বলেছিলেন, 'বুঝতে পারছ না কেন? সবাই যে আর সকলের চেয়ে অনেক বেশি চালাক।' এ হেন মন্তব্য শুনে আমরা একটু-ক্ষণের মতো হাঁ হয়ে গেছিলাম। মাও কিছু কম চালাক ছিলেন না।

১৯২৫ সালের মার্চ মাসে মায়ের ডবল নিউমোনিয়া হল। প্রাণ যায় যায়। ডাক্তার, ওষুধ, অক্সিজেন, রাত জাগা, টাকা-কড়ির শ্রাদ্ধ। একদিন সেই আমাদের ছোটবেলাকার পাতানো কাকারা দুজন আলাদাভাবে এসে দিদির আমার হাতে কয়েক শো টাকা গুঁজে দিয়ে বললেন, 'বাবাকে এখন কিছু বলিস না। সে আমাদের বড় অফিসার। কিন্তু তাই বলে একা একা পারবে কেন?' বলে জোরে জোরে নাক ঝাড়তে ঝাড়তে চলে গেলেন। বাবাকে যখন দিদি বলল, আশ্চর্যের বিষয়, বাবা এতটুকু রাগ করলেন না! বললেন, 'তুলে রাখ। দরকার হলে খরচ করা যাবে।' পরে মা সেরে উঠলে ঐ টাকা ফিরিয়ে দিয়েছিলেন। মা বলেছিলেন, 'টাকা শোধ হলেও ও ঋণ শোধ হয়নি।'

মা সেরে উঠতে কল্যাণের ম্যাট্রিক আর দাদা দিদির ইন্টারমিডিয়েট পরীক্ষা এসে গেল। এবং দেখতে দেখতে শেষও হয়ে গেল। আড়াই মাস পরে ফল বেরোলে দেখা গেল তিনজনেই ভালো করে পাশ করেছে। দিদি মেয়েদের একটা স্কলারশিপও পেয়েছিল। এদিকে ডাক্তার বলেছিলেন রোগ সেরেও মার রোজ ৯৯ ডিগ্রী জ্বর হচ্ছে, কোনো শুকনো জায়গায় চেঞ্জে গেলে ভালো হয়। হাজারিবাগে বাড়ি ভাড়া নেওয়া হল, মায়ের সঙ্গে দাদা, দিদি, কল্যাণ গেল, তাদের লম্বা ছুটি। আর ছোট বোন লতিকা আর ছোট ভাই যতি স্কুল থেকে ছুটি করে নিয়ে সঙ্গে গেল। আমরা বাকিরা কলকাতায় রইলাম, গরমের ছুটি হলে আমরাও যাব। আমি হলাম বাড়ির গিন্নি। আমার গিন্নিপনা অমি-সরোজের কিংবা ভাইপো অশোকের নানান মন্তব্যের বিষয় ছিল। কিন্তু বাবা ঐ সময় আমাদের কাউকে একবারো বকেননি। তার মধ্যে আবার সরোজের গায়ে হাম বেরোল। সবাই মিলে সেবা করলাম। হাম বেরোলে লোককে যে বিকটই না দেখায়। সরোজকে সেকথা বলায় সে অনেকক্ষণ ধরে আয়নায় নিজের মুখ পরীক্ষা করে বলল, 'ঠিক বলেছ!'

মাসিমা লোটন আমাদের সঙ্গে যাবেন। মাঝে মাঝে শিবপুরে মাসিমার কাছে ছুটি-ছাটা কাটাতাম। বেজায় ভালো বাবুর্চি ছিল মাসিমাদের; চপ কাটলেট বা বানাত! আর মাসিমা বড্ড আদর যত্ন করতেন, কি করবেন কোথায় রাখবেন ভেবে পেতেন না। নিজের আত্মীয় বলতে তো ঐ দুই বোন। তার মধ্যে ছোট মাসিমা পাটনায় থাকতেন, আমাদের বাড়িতে দু-একবার যদি বা থেকে গেছেন, বড় মাসির বাড়িতে কখনো না। মাসিমা তাঁর বঞ্চিত শৈশবের বড় সাধ সব আমাদের ওপর মেটাতে চাইতেন। এখন মুশকিল হল যে ওঁদের কারো বেশি খিদেটিদে পেত না। দুপুরে বারোটায় পেট ভরে ভাত খাবার পর, কারো যে চারটে বাজতে না-বাজতে আবার খিদে পেতে পারে একথা মাসিমা ভাবতেই পারতেন না। অথচ আমাদের বেজায় খিদে পেত। বাড়িতে বিকেলে পাঁউরুটি মোহনভোগ কিংবা পাতলা পরটা আলু কুমড়োর ছক্কা, নিদেন আলু পটল কুচি ভাজা দিয়ে রুটি খেতে আমাদের অভ্যাস। মাসির বাড়ি বিকেলে বড়রা এক পেয়ালা করে চা খেতেন, জল-খাবারের কোনো ব্যবস্থাই ছিল না। এমন সময় দেখা গেল বাগানে অযত্নে বেলগাছে পাকা বেল, পেয়ারা গাছে ছোট ছোট ডিঙি পেয়ারা। জামরুল গাছ, কামরাঙা গাছও ছিল, কিন্তু সে সব হয়তো ঐ সময়ে ফলায় না। জলখাবারের ব্যবস্থা হয়ে গেল, আর আমাদের পায় কে। বাস্তবিকই লোটনের মতো সুন্দরী আজ পর্যন্ত দেখিনি। সোনার মতো গায়ের রং। আঙুরের থোপার মতো কোঁকড়া চুল আর মুখখানি যেন প্রাচীন ভাস্করের মূর্তি থেকে কেটে বসানো। আমি একটা পুরনো ফটোগ্রাফ দেখে আয়নায় মুখের নকল করেছিলাম, অবিকল লোটনের মুখ।

সত্যি বলছি মনের মধ্যে তখন আর এতটুকু হিংসে ছিল না। হিংসা হয় সমানে সমানে। যার সঙ্গে কোনো তুলনাই হতে পারে না, তাকে কি কখনো হিংসা করা যায়? লোটনের রূপের গর্ব করতাম আমরা। শুধু রূপ নয়, চমৎকার গাইত, পিয়ানো বাজাত, ছবি আঁকত। আমাদের পেয়ে বেজায় খুশী হত। তবে কাউকে বেশি ভালোবাসার ক্ষমতা বোধহয় ওর একটু কম ছিল। কিন্তু বড্ড ভালো ব্যবহার করত, সেই যথেষ্ট। আমার কাছে রাতে চুল বাঁধতে আসত। আমি ইচ্ছে করে চুলে তেল ঘষে একটা সরু চিরুনী দিয়ে হেঁচড়ে কোঁকড়া চুল-গুলোকে মাথার পেছনে উঁচু করে এক টাইট বেনী বেঁধে দিয়ে, মুখখানি ঘুরিয়ে দেখতাম, তবু পদ্মফুলের মত রূপ ঝরে পড়ছে! সমস্ত মনটা গলে জল হয়ে যেত।

(চলবে)

পাওয়া যাবে। এই রেসুড়েরাই বলে—নারীর চেয়েও বেশী সুন্দর ঘোড়া, আরো সুন্দর মদ্য।

নারীর কথা যখন উঠল বলি মেয়েরাও রেস খেলেন। এমনকি বনেদী বাড়ীর গিন্নিরাও নাকি রেস খেলতে আসেন। মনে পড়ল নির্মল রায়বাবু, মাদ্রাজের মাঠে তাঁর এক অপূর্ব অভিজ্ঞতার কথা আমাকে শুনিয়েছিলেন। লাস্ট রেস সেদিন। একজন সম্ভ্রান্ত মহিলা সেদিন সব টাকা খুইয়েছেন। একেবারে অপরিচিত রায়বাবুর কাছে হাতের বালা খুলে দিয়ে কোনো ভূমিকা না করে বললেন—কিছু টাকা দিন, এটা রাখুন, আমাকে খেলতেই হবে।

রেসের মাঠে টাকা ধার দিতে নেই। তাই সেদিন আমি টাকা দিই নি, বালাটাও ফিরিয়ে দিয়েছিলাম, তাঁকে ফাঁকি দেবার ইচ্ছে ছিল না—রায়বাবু আমাকে বলেছিলেন। মেয়ে ঘোড়া রেসের খেলায় পুরুষ ঘোড়াদের হারিয়ে দেয় কখনো কখনো। বুদ্ধির খেলায় পারে কিনা জানি না। তুলনা করব না, কিন্তু আজ মনে হয় রায়বাবু অবধারিত পরাজয়ের হাত থেকে নেশাগ্রস্ত অচেনা এক নারীকে রক্ষা করেছিলেন নিছক বুদ্ধি দিয়ে নয়, সমবেদনাও সেই মুহূর্তে বেশ কার্যকরী হয়েছিল।

রায়বাবুর মতো বহু মাঠের অভিজ্ঞতাসম্পন্ন রেসুড়েদের কাছে শুনেছি বেশ ভালো ব্যাঙ্গালোর ও বোম্বাইয়ের মাঠে, কিন্তু মাঠ। রয়াল ক্যালকাটা টার্ফ ক্লাব ও টালিগঞ্জ জিমখানায় দুটি মাঠ ভালো কলকাতায়। কলকাতার মাঠের সৌন্দর্যই আলাদা। দুটিই ইডেন গার্ডেনের মতো সুন্দর। বারোমাস খেলা হয় না টার্ফ ক্লাবে। প্রধান খেলা নভেম্বরে শুরু হয়ে শেষ হয় মার্চে। আছে বিভিন্ন স্বতন্ত্র খেলা, ক্রিসমাস মিটিং ইত্যাদি। টার্ফ ক্লাবে যখন খেলা বন্ধ, আসর বসে টালিগঞ্জে। আগে কলকাতায় সকালে রেস হতো, এখন হয় দুপুরে। সপ্তাহে একদিন। ঘোড়া আসে কলকাতার বাইরে থেকে। আগে আরবি ঘোড়ার চল ছিল। সাহেবরা আনলেন ইংলিশ ঘোড়া। কিন্তু একটা সময় পর্যন্ত জাহাজে উত্তমাশা অন্তরীপ ঘুরে আসত বলে দীর্ঘ সমুদ্রযাত্রায় ঘোড়া দুর্বল হয়ে পড়ত। এরপর আসে অস্ট্রেলিয়ান ঘোড়া। এখন যেমন বাইরে থেকে আমদানি করতে হয় না বলে বহু বিষয়েই বৈদেশিক মুদ্রার সাশ্রয় হয়েছে ঠিক তেমনিই দৌড়ে স্বদেশী ঘোড়াই ব্যবহৃত হচ্ছে। ঘোড়ার মালিক কিছু অবস্থাপন্ন বাঙালী থাকলেও বেশীরভাগ মালিকই অবাঙালী। ঘোড়া কেনা ও তা পোষার খরচ প্রবচনের হাতি পোষার মতোই এলাহী ব্যাপার। ইচ্ছে থাকলেও সবাই টাকা খরচ করতে পারেন না। শোনা যায় যে জকি বা ট্রেনার একজনও বাঙালী নেই। স্টুয়ার্ট হিসেবে অবশ্য দু একজন মান্য গণ্য ধনী বাঙালীকে দেখা যায়। রেসের বিষয়ে যাবতীয় বাদ বিতণ্ডায় স্টুয়ার্টের বিচারই চূড়ান্ত। কলকাতার মাঠের দর্শক সম্প্রদায়ের বেশীর ভাগই বাঙালী। কি করে তাঁরা রেসের প্রতি আকৃষ্ট হলেন। কেউ কেউ বলেন ভাগ্য ফেরাতে নিজে থেকেই আগ্রহী হয়েছেন, কেউ গেছেন বন্ধু বা অভিজ্ঞ জনদের হাত ধরে। যেভাবে সিগারেটের নেশা একজনের হাত থেকে আরেকজনের হাতে চলে যায় অনেকটা সেরকম। একজন জাত রেসুড়ে কেবল বলেছেন শরীরে বয়ঃপ্রাপ্তির সঙ্গে সঙ্গে যেমন যৌনচেতনা আসে ঠিক তেমনিই রেসের চেতনা সঞ্চারিত হয়েছে আমার মনে।

আনন্দ, উত্তেজনা ও আকর্ষণের দিক থেকে ঘোড়দৌড়ের সঙ্গে অন্য কোনো খেলার তুলনা হয় না। এর পিছনে আছে পরিশ্রম, বুদ্ধি ও অজস্র অর্থব্যয়। রেস পরিচালনা করা থেকে শুরু করে ক্যাটালগ ও হিস্টরী তৈরী পর্যন্ত সমস্ত বিষয়ই হয় বিজ্ঞানসম্মত-ভাবে। কোনো ভাঁওতাবাজিই এখানে খাটে না বলে এর আকর্ষণ অতুলনীয়। এই বিষয়ে কলকাতার রেসের এক অসাধারণ প্রাণপুরুষ গুলস্টোনের স্মৃতিচারণে একটা সুন্দর গল্প আছে। বার্নার্ড শ-কে নাকি একবার বলা হয়েছিল রেস খেলতে। উনি বলেছিলেন একটা ঘোড়া তো জিতবেই, এতে আর বাহাদুরির কি আছে। গুলস্টোন লিখেছেন—শ-র সামনে সেদিন আমার মতো যদি কেউ থাকত তাঁকে প্রশ্ন করত—বাট মি, শ—হুইচ ওয়ান? এই গুলস্টোন কলকাতায় পড়াশুনো করতে এসেছিলেন সুদূর ইস্পাহান থেকে। মা তাঁকে পথে অনেকদূর পর্যন্ত এগিয়ে দিয়েছিলেন। মা-র সঙ্গে সেই তাঁর শেষ দেখা। কলকাতায় খেলার মাঠে যাবে বলেই টাট্টুতে চড়তেন গুলস্টোন। তাঁর দক্ষতা দেখে একজন বলল—তুমি রেসের মাঠে যাও না কেন। পয়সা পাবে। গুলস্টোন জকি হয়ে অনেক রেস জিতলেন। পরে হন ট্রেনার ও শেষে ঘোড়ার মালিক। গুলস্টোন লিখেছেন এক বাঙালী রেসুড়ের কথা যাঁকে সেই সময়ের বুকিরা চিনতেন। তিনি ধারে খেলতেন। যাকে বলা হয় অ্যাকাউন্ট-এ খেলা তাই। এই অ্যাকাউন্ট-এ খেলার হিসেবপত্র থাকে কাগজে-কলমে। তিনি প্রায় সত্তর হাজার টাকার মতো হারার পর বুকিরা আর তাঁকে ধার দিতে চায় না। বাড়ি বিক্রী করে টাকা দেবার প্রতি-শ্রুতি সত্ত্বেও বুকিরা নিজেদের সিদ্ধান্তে অচল থাকে। এই রেসুড়ের টাকা বুকিরা আদায় করে নিয়েছিলেন সম্পত্তি বিক্রী করে, কিন্তু ভদ্রলোক সেই যে রেসের মাঠ থেকে হারিয়ে গেলেন তাঁকে আর ফিরে আসতে দেখা যায় নি।

গুলস্টোনের কথায় আমরা এসে গেছি ইতিহাসের পাতায়। রেসের ব্যাপারে পুরাণ ইতিহাস কি বলে দেখা যাক। শতপথ ব্রাহ্মণে আছে একটা মজার গল্প। মহামূল্য এক রত্ন নিয়ে দেবতাদের মধ্যে একবার প্রচণ্ড কলহের সৃষ্টি হয়েছিল। অপরূপ সেই মণিখণ্ডের একচ্ছত্র অধিকার পেতে চায় সবাই। বহুদিন যাবৎ সেই দ্বন্দ্বের কোনো সুষ্ঠু মীমাংসা হয় নি। শেষে ঠিক করা হল এই রত্নটিকে বেট রেখে ঘোড়দৌড় হবে। প্রতিদ্বন্দ্বী দেবতাদের ঘোড়ারা সব দৌড়বে। যার ঘোড়া জিতবে, রত্ন হবে তার। প্রাচীনতম সেই ঘোড়দৌড়ের বাজি জিতেছিলেন দেবগুরু বৃহস্পতি। বলা বাহুল্য রত্নটি পেলেন তিনিই!!

কিন্তু শতপথ ব্রাহ্মণের এই কাহিনীটি বৈদিক যুগের পট-ভূমিকায় কোন নতুন কথা নয়। পণ্ডিতরা মনে করেন ঘোড়দৌড় সেকালের এক জনপ্রিয় খেলা। একালের ঘোড়দৌড় সেকালের আজি ক্রীড়া। ঘোড়দৌড়ের মাঠকে বলা হতো আজি। রেসকোর্স ছিল গোল চক্রাকার। যে জায়গা থেকে দৌড় শুরু, হতো চক্কর দিয়ে বাজির ঘোড়া সেখানেই ফিরে আসত। এই চিহ্নিত জায়গাকে বলত 'কাম্মীণ'। দৌড়ের আগে ঘোড়া আর জকি উভয়কেই নানাভাবে সাজানো হতো। দৌড় জেতার পর তো কথাই নেই। ঋগ্বেদে সবচেয়ে নাম করা ঘোড়ার নাম 'বিশপলা'। একবার দৌড়ে ওর পা ভেঙে যায়। তখন তার লোহার পা করে দেওয়া হয়। তবে লোহার পা নিয়ে সে আর কখনও দৌড়য়নি।

না দৌড়াক, কিন্তু ঘোড়দৌড়ের আদিকালের ইতিহাসে সে তার নাম রেখে গেছে নিশ্চয়। আর সঙ্গে সঙ্গে বোধ করি এ প্রমাণও রেখে গেছে যে এদেশের বুকে এ-খেলা এখনো কিছু বিদেশী নয়। ঘোড়ায় চেপে আর্যরা এসেছিলেন এদেশে। তাই ঘোড়ায় চেপে দৌড়ের খেলাই বোধহয় আদিমতম খেলা তাদের। আদিমতম হয়ত বা হতে পারে, তবে জনসমাজের প্রিয়তম বা সুপ্রচলিত ক্রীড়া বোধহয় ছিল না। তাই কি শত শতাব্দীর সেই ধাবমান অশ্বের হেষাধ্বনি ইথারের বুকে তরঙ্গ তুলে একদা মহাব্যোমের মাঝে মিলিয়ে গিয়েছিল। দ্রুতগতি, শক্তিমান সেই ছুটন্ত ঘোড়ার ক্ষুরের দাগ বিস্মৃতির বালুবেলায় নিঃশেষে এমনি করে হারিয়ে গেল? আজি ক্রীড়া কি অশ্বমেধের মধ্য দিয়ে মুঘল যুগে চৌগানে বা পোলো খেলায় আশ্রয় পেয়েছিল? নয়ত অশ্বে যাঁর আসক্তির অন্ত ছিল না সেই সম্রাট আকবরের অশ্বশালায় অজস্র মাইনে করা তুরানী, ইরানী,

খোরসানী তাঁর বাঙী থাকলেও তাঁর প্রকাশনায়, কোন মেয়রবোর্ডের খবর কেন নি কোন আইন-ই-আকবরীর সমগ্রহ-সমূহে শত্তকাম? আকবরনামার পাতায় তার কোন উল্লেখ নেই কেন? এই খেলায় সাম্যালাভর সংবাদ নেই কেন সে-যুগের বিদেশী ভারত পথিকদের ঐতিহাসিক বিবরণে?

সে কথার কোন সঠিক বাস্তব ভিত্তিক উত্তর না দেওয়া গেলেও বিশপলার বন্ধুরা এই প্রায় হাজার দুই বছরের ব্যবধান অকেশে অতিক্রম করে একেবারে হাজির হল অষ্টাদশ শতকের কলকাতায়। নতুন ফোর্ট উইলিয়মের দক্ষিণের বিশাল প্রান্তরে। কলকাতার মসনদে তখন গভর্নর জেনারেল ওয়ারেন হেস্টিংস। কলকাতার গভর্নর হাউস তখনও তৈরী হয়নি। কখনও [illegible] হেঁটে, কখনও বা ঘোড়ায় চড়ে ওয়ারেন হেস্টিংস [illegible] ঘোরাঘুরি করে বেড়াতেন ভারতে বৃটিশ [illegible] স্থাপন করার ঐকান্তিক বাসনায়। [illegible] অপরূপা প্রেয়সী শ্রীমতী ইমহফকে বিয়ে করে [illegible] বেলভেডিয়ারে। তবে তখন তাঁর বিরুদ্ধে [illegible] যে বিষবাষ্প ছড়ানো হয়েছে তিনি তা বিলক্ষণ টের পেয়েছেন। বুঝতে পেরেছেন এদেশে তাঁর দিন শেষ হয়ে এসেছে, [illegible] তাঁকে পাততাড়ি গোটাতে হবে। [illegible] ইংরেজি [illegible] জানুয়ারির সতেরই। [illegible]

মেমসাহেবাদিগকে পাত্তা করার খেলা শুরু হয়েছে। কিন্তু সেসব কন্যা-দেরকে অবেক্ষণে পায়ে মাড়িয়ে কেউ বা পার্লাক, কেউ বা ফিটনে চেপে প্রায় দ' ঘেড়েক ইংরেজ নরা নারীর দল সেই সময়ে মাঠে নানা দাঁকবিকত রেস মাঠে এসে হাজির হয়েছেন। এসেছেন নানা জেলাজুয়ার সেজেগুজে মেমসাহেবরাও। বাহারী পোশাকের ঝিলিক আর বিদেশী আতরের গন্ধ। এরই মাঝে শুরু হল দৌড়ের তোড়-জোড়। ঘোড়া মাত্র দুটি। টাটেট সাহেবের 'গরগন' আর হেন্দকন সাহেবের 'ম্যাচ-লেম-পিটার'। দৌড়ের আগে প্রথানীতি মেলা হয়েছে ঘন্টা। শুরু হল দৌড়। সাহেব মেমদের হৈ হুল্লোড়। যে যার ঘোড়াকে উৎসাহ দিচ্ছে। হাওয়ায় রুমাল উড়ছে, উড়ছে টুপি। গলায় স্বর উদারা, মুদারা থেকে তারায় উঠেছে : বাক আপ, বাক আপ-গরগন গরগন... পিটার...পিটার। আজ এমন একটি দৃশ্য অনায়া-সেই কল্পনা করা যায়। অবশেষে বাজি জিতল গরগন। ঘোড়দৌড়ের মাঠের উপর পড়ল যবনিকা। সাহেব মেমের দল বাঙালীবাবু ও দর্শকদের পিছনে ফেলে দল বেঁধে দৌড়ের মাঠ থেকে সোজা গিয়ে উঠল এই বেলভেডিয়ারে। লিডিয়াম সাহেবের বাগানবাড়িতে। সেখানে পান পর্ব। চা, কফি আর লেমনেডের মধ্যেই তা সীমাবদ্ধ। পানের পর নৃত্য ও গীত। তা চলে বাগানবাড়ির উন্মুক্ত প্রাঙ্গণে বহু সময় ধরে।

কার্জন সাহেব অবশ্য বলেছেন কলকাতায় আরও একটা রেস-কোর্স ছিল—আকড়ায়, গার্ডেন রীচের দিকে। এখানেও খেলা শুরু হয় সতের শ' আশি সাল নাগাদই। ঐ সালে কলকাতা রেস কোর্সে দু হাজার টাকার একটা স্টেকে দৌড় হয়েছিল—তার সাক্ষী সাং-বাদিক হিকি সাহেব। কেরী আর কার্জন—দুজনেই এ কথা মেনে নিয়েছেন। সতের শ' চুরাশি সালে, অর্থাৎ হেস্টিংস বিলেত ফিরে যাবার আগের বছরও ওখানে একটা রেস হয়েছিল শীতকালে। সেখানে রেসের আনন্দের চেয়েও প্রধান হয়ে উঠেছিল ভোজন পর্ব।' ছিল রসনালোভন খাদ্যসামগ্রীর অঢেল সমারোহ। সবাই তো আর বাজি জিতবে না। কাজেই তাদের মনের ক্ষোভ যাতে খাদ্যবস্তু দিয়ে অনেকটা পূরণ করা যায়, তার জন্যেই রেস কোর্সে ব্রেক-ফাস্টের আয়োজন ছিল রেসের পর। আর এই উপলক্ষে খাটান তাঁবুর মধ্যে ছিল দিনদুপুর অবধি নাচগান, হুল্লোড় বিস্তৃত আয়োজন। রেস খেলার জন্য তখন নিয়মিত পত্রসহযোগে আমন্ত্রণ পাঠানো হতো এবং কাগজে স্টুয়ার্ডদের পক্ষ থেকে থাকত তার বিজ্ঞাপন।'

পরের বছর, অর্থাৎ সতের শ' পঁচাশি ওয়ারেন হেস্টিংস বিদায় নিলেন কলকাতার রাষ্ট্রনৈতিক রঙ্গমঞ্চ থেকে। ম্যাক-ফারসন, কর্নওয়ালিশ প্রথম বার এসে আবার চলে গেছেন। স্যার জন শোর তখন কলকাতার দণ্ডমুণ্ডের কর্তা। ভদ্রলোক একেবারেই নিরামিষাশী। সাত মাস যাবৎ কলকাতায় এসে বসেছিল লর্ড কর্ন-ওয়ালিশ কখন তাঁকে গদি ছেড়ে দেবেন এই অপেক্ষায়। থাকতেন কলকাতার সেই বিখ্যাত ভারতবিদ্যাপথিক স্যার উইলিয়ম জোন্সের গার্ডেন রীচের বাড়ির পাশেই। তারপর একদিন কর্নওয়ালিশ সোয়ালো জাহাজে চেপে মাদ্রাজের উদ্দেশে পাড়ি জমালেন কলকাতার চাঁদপাল ঘাট থেকে, মসনদে এসে বসলেন শোর। বেশ সিরিয়াস ধাতের লোক। রাজকার্য বুঝতেন ভালো। আর তাই বুঝি স্বভাব কৃপণ। রবিবারে কোন কাজ করতেন না। যদিও গীর্জায় যাবার বাতিক ছিল তাঁর। জোন্সের প্রতিবেশী ছিলেন বলেই নয়, নিজেও তিনি উর্দু, ফার্সী, আরবি ছাড়াও ল্যাটিন ও গ্রীক জানতেন বেশ। মোটামুটি কাব্যচর্চা করতেন অবসর সময়ে। তবে কলকাতা কখনোই ভালো লেগত না তাঁর, আর তাই বারবার স্ত্রী-পুত্র-পরিবারকে ফেলে ছুটে চলে আসতেন রেসকোর্সে। এদেশ গভর্নর জেনারেলের আমলেই ঘোড়দৌড় বেশ ক্রমে উঠেছিল দেখা যায়।

এ বছর দৌড় হয়েছিল নভেম্বরে। প্রতিযোগী ঘোড়ার সংখ্যা অনেক বেড়েছিল বলেই রেসের আগে হয়েছিল হিট।

রেসের জনপ্রিয়তা এভাবেই আস্তে আস্তে বাড়ছিল। দেখতে দেখতে কলকাতার উপকণ্ঠ বারাসতে রেসের আসর বসেছিল। এখানে হেস্টিংসের কাউন্সিলের অন্যতম সভ্য রিচার্ড বারওয়েলের এক বনা বরাহ শিকারের আস্তানা ছিল। জন কোম্পানীর চাকরি নিয়ে যেসব সামরিক ক্যাডেটরা বাংলা দেশে আসত তাঁদের শিক্ষণের জন্য ছিল একটা বিদ্যায়তন। তবে রণবিদ্যা শিক্ষার চেয়েও বড় হয়ে উঠেছিল রেসকোর্স—বারাসতের রেসকোর্স। রেসের ইতিবৃত্ত-কারগণ অবশ্য মনে করেন সামরিক স্কুলটা উঠে যাবার পরেই ঘোড়দৌড়ও বন্ধ হয়ে যায়। উঠে যায় আকড়ার ঘোড়দৌড়ের মাঠটাও। এখানে একটা 'কুমিফার্ম' স্থাপন করা হয় আঠার শ' তিরিশ সাল নাগাদ। কিন্তু কলকাতা ময়দানের রেসকোর্স জমে উঠেছিল।' দুঃসময় গেছে লর্ড মিন্টোর আমলে, তিনি এ খেলা অপছন্দ করতেন। কাজেই রেসুড়েরা একটু সরে যেত ব্যারাকপুরের মাঠে। খাঁ খাঁ করত কলকাতা ময়দান। দৃশ্যপট বদলে যায় আঠার শ' ষোল সালে। কলকাতা তথা বাঙালীর রেসের ইতিহাসে এই সালটা স্মরণীয়, এই বছরেই প্রথম ডার্বির খেলা হয়। দু বছর পরে, আঠার শ' আঠারোয় যে ডার্বি খেলা হয় তার বিজয়ী ঘোড়ার নাম স্ট্যাম্পেটার। ময়দানে এ বছর হয় পাঁচটি রেস। এবং এই বছরেই প্রথম খেলা হয় অপরাহ্নে।'

কিন্তু কলকাতার বুকে আজকের যে রেসকোর্স তার পত্তন হয় আঠার শ' উনিশে। ফ্যানী পার্কসের ভ্রমণ-বৃত্তান্ত থেকে জানা যায় কলকাতা আর ব্যারাকপুর দুটো মাঠেই ছিল ঘোড়দৌড়ের বেশ বাড়বাড়ন্ত অবস্থা।' তবে অকল্যান্ড কাপ প্রথম খেলা হয় আঠার শ' সাঁইত্রিশে। লর্ড কার্জনও কলকাতার রেসের খুবই জাঁকজমকপূর্ণ ছবি এঁকেছেন। তিনি লিখেছেন তাঁর আমলে রেসের মাঠে ছিল দুটি আসন। একটা গ্র্যান্ড স্ট্যান্ড আর একটা পুরানো, আদি আসন, প্রাচীন প্রেসিডেন্সী জেলের কাছে। শেষের গ্যালারি পরে উঠিয়ে দেওয়া হয়।

বাঙালীর রেসের ইতিহাসে বাবু শ্যামাচরণ মল্লিকের নাম বেশ মোটা হরফে লেখা হয়ে থাকবে। ইনি ছিলেন বাবু রূপলাল মল্লিকের ছোট ছেলে। এ-বংশে কেউই দীর্ঘজীবী নন। শ্যামাচরণ মারা যান মাত্র ছেচল্লিশ বছর বয়সে। বহু রেসের ঘোড়া ছিল তাঁর।' রেসের ঘোড়া নিয়েই নিজে গিয়েছিলেন শোনপুর রেসে। নভেম্বর মাসে। সেখানেই অসুস্থ হয়ে পড়েন। কলকাতা ফিরে আসেন, কিন্তু হৃত স্বাস্থ্য আর ফিরে পান নি। অচিরেই তিনি মারা যান। কলকাতা মেডিকেল কলেজের কৃতী ছাত্রকে সোনার মেডেল দিতেন তিনি। আবার কলকাতার রেসের মাঠেই শুধু নয়, ভারতের নানা জায়গাতেও তাঁর ঘোড়া দৌড়ত।'

কলকাতার রেসের মাঠে বাঙালীদের হেনস্তা নিয়ে বাঙালীরা নাকি নিজেদের একটি রেসের আয়োজন করেন। বেঙ্গল ক্লাবের বদলে যেমন তৈরী হয়েছিল ক্যালকাটা ক্লাব। অনেকে বলেন পান্তার বাবা সুখময়ের দুই ছেলের যে এক শ' বিঘা করে মাঠ ছিল ব্যারাকপুরে চিড়িয়ামোড়ের কাছে, বাগজোলা খালের ধারে, সেখানেই নাকি বাঙালীদের রেসের আয়োজন হয়েছিল। তবে কেমন চলেছিল সেই রেস, কতদিনই বা চলেছিল, কারা ছিলেন নায়ক— তা আজ কিছু সঠিক বলার উপায় নেই। তবে এই রেসের আয়োজন শ্যামা-চরণ মল্লিকের জীবদ্দশায় হয়ে থাকলে মল্লিকবাড়ীর দাক্ষিণ্য বা সমর্থনের যে তাতে অভাব হয়নি, তা আন্দাজ করা যেতে পারে। তবে দেশীয় বাবুদের সমর্থনপুষ্ট এক রেসের খবর জানায় সেকালের হিন্দু প্যাট্রিয়ট। তারিখটা ইংরেজি আঠার শ' আটান্ন একুশে জানুয়ারি। সংবাদটা অনেকটা এই : 'এ শহর [illegible]

ইয়েস্টারডে এন্ড এ কাপ পিজন, বাই দি রাজা অফ কুচবিহার বাই ইবয়ার নেটিভস্।' কুচবিহারের মহারাজার দেওয়া এই কাপে প্রতিদ্বন্দ্বী টাট্টু ঘোড়ার রেসে বাবু রাজেন্দ্রলাল মিত্র পরিচালিত কোর্ট অফ ওয়ার্ডের্স কালেজের এক জমিদারনন্দন সওয়ার হয়েছিলেন। এই ঘটনার গুঢ়ার্থের প্রতি সম্পাদক যে ইঙ্গিত করেছিলেন, সেটা কি? সেটা কি ইস-বঙ্গ রেষারেষির প্রতি; না নবজাগ্রত বাঙালী বিদ্রোহী মানসিকতার প্রতি? সেকালের কাগজে তার কোন নিরিখ নেই।

না থাক, তবে রেসকোর্সে বাঙালীর বিপ্লবী সত্তা যে একটা অগ্ন্যুৎপাতে ফেটে পড়েছিল তার ইতিহাস আমরা প্রায় ভুলতে বসেছি। উনিশ শ' চৌত্রিশ সালের এ কাহিনী। তার দৃশ্য দেখতে হলে বাংলাদেশের এই অসহ্য গুমোট গরম পেরিয়ে বাতাসিয়া লুপের চক্রাকার খেলনা রেলপথ দিয়ে আমাদের দার্জিলিং চলে যেতে হবে। ইংরেজি আটই মে। বৈশাখের রুক্ষ সূর্যের রক্তচক্ষু এড়িয়ে হিমালয়ের হিমশীতল মনোরম কোলে সেদিন উৎসবের বাঁশী বেজেছে। ছোট লাট এসেছেন দার্জিলিং। চারদিকে সাজ সাজ রব। টার্ফ ক্লাব থেকে পাস 'ইস্যু' হয়েছে। সাহেবসুবোরা সব সেজেগুজে চলেছেন লেবাং রেসকোর্সে। চলেছেন কিছুবা অতি উচ্চকোটির কয়েকজন বিশিষ্ট বাঙালী। শ্যেনদৃষ্টি রেখেছে পুলিশ। বাংলাদেশে তখন বিপ্লবীদের বড়ই রবরবা। আর ছোট লাট স্যার জন এন্ডারসন তো রীতিমতো কুখ্যাত ব্যক্তি। পুলিশ পাহারার ওপর পাহারা বসিয়েছে। সামান্য ফাঁকও রাখেনি সাদা পোশাকের গোয়েন্দার দল। লেবাং রেসকোর্সে এসে বসেছেন লাট বাহাদুর। ঘোড়দৌড়ের জন্য উন্মুখ অভ্যাগতরা। হঠাৎ কে যেন বিদ্যুতের মতো বেরিয়ে এসে গভর্নরকে তাক করে তার রিভলভারটা দেগে দিলে। দুম্-দুম্ শব্দে কেঁপে উঠল খেলার মাঠ। তার প্রতিধ্বনি বিপুল শব্দ করে যেন কাঁপিয়ে দিয়ে গেল সারা দার্জিলিং! যেন হা-হা শব্দে সারা পুলিশী ব্যবস্থাকে বিদ্রূপ করে জয়ী হল বাংলার বিপ্লবী সন্তান।

লেবাং রেসকোর্স বিপ্লবী বাংলার ইতিহাসে চিরকালের জন্য ভাস্বর হয়ে থাকলেও, অন্য একটি কারণে বিশিষ্ট হয়ে থাকবে ব্যারাকপুর। এই ব্যারাকপুর রেসকোর্সের জন্যই একদা রেললাইন পেতেছিল বেঙ্গল আসাম রেলওয়ে। দেড় মাইলের কিছু বেশী ছিল এই লাইন। উনিশ শ' আটাশের সাতাশে জানুয়ারি লাইনের উদ্বোধন হয় বিনা অনুষ্ঠানে। ঘোড়দৌড় হয় পরের দিন, শনিবার। ব্যারাকপুরের এই মাঠটাকে রয়াল ক্যালকাটা টার্ফ ক্লাবের নতুন রেসকোর্স বলে উল্লেখ করা হয়। ভিড় সামলাতে পুলিশ ব্যারাকপুরের বাস বন্ধ করে দেয়। খুবই ভিড় হয়েছিল মাঠে। উদ্বোধনী কাপ জেতে ওল্ড ডিকসন। মালিক ডবল্যু এম ক্যাডক্। জকি নিকাস। তিনজন বাঙালীর ঘোড়া দৌড়েছিল। স্যার আর এন মুখার্জীর ঘোড়া 'ইয়ার রিঙ' হয় তৃতীয়। জনৈক এইচ কে দে-র ঘোড়া চতুর্থ হয়েছিল। দে মশায়ের ঘোড়ার জকি ছিল রামপ্রসাদ নামে ক্ষিপ্র তরুণ বাঙালী।

কিন্তু বাঙালী ঘোড়দৌড় নিয়ে সাহিত্য রচনা করে? আশ্চর্যের বিষয় যে রেসে বহু বাঙালী পরিবার ফতুর হয়ে গেলেও তা নিবারণের জন্য কোন কবিই কলম ধরেন নি, কোনো সমাজসংস্কারক বা প্রচারক বিশেষ বাণী দিয়েছেন বলে শোনা যায় নি। কালীঘাটের পটুয়ারা ঘোড়দৌড়ের ছবি এঁকেছিলেন কিছু। কবি ঈশ্বর গুপ্ত চার লাইন ত্রিপদী লিখে রেসের ছবি কিছুটা দিয়েছেন। তাও খুব অযথেষ্টই। তবে এই দুঃখ থেকে বঙ্গজনকে উদ্ধার করেছেন কবি আনন্দ সেনগুপ্ত। তাঁর 'ঘোড়া কর ভগবান' সেকালের এক হিট কবিতা। 'সচিত্র ভারত' পত্রিকার বড় দিন সংখ্যায় কবিতাটি বেরতেই কবি বিখ্যাত হয়েছিলেন। শুধু শুকনো খ্যাতি নয় কবির জীবনে 'জ্যাকপট' লাভ ঘটেছিল এই কবিতাটির কল্যাণে। সচিত্র ভারতের তৎকালীন মালিক শিল্পপতি নরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় তাঁকে অতিরিক্ত দশ টাকা দিয়েছিলেন কবিতাটির সম্মানদক্ষিণা হিসেবে। সে যুগের হিসেবে খুব একটা কম টাকা নয়। যাক কবিতাটির প্রথম কয়েকটি পংক্তি ছিল এরকম:

'মানবজীবন খোঁড়া করে প্রভু ঘোড়া কর ভগবান
বেতো ঘোড়া নয়—ছ্যাকরা টানিয়া আবার খাইবে প্রাণ।
রেস কোর্সের ঈপ্সিত ঘোড়া করে মোরে ছেড়ে দিও,
তোমা চেয়ে বেশী ভক্ত জুটিবে শনিবারে দেখে নিও।'

বাংলা সাহিত্যে রেসের মাঠের আর একটা ছবি আছে। সেও প্রায় পঞ্চাশ বছরের পুরনো। 'বাড়ি থেকে পালিয়ে' একটি ছেলে একদা 'মাই মাদার' নামে ঘোড়ায় বাজি ধরে প্রচুর টাকা পেয়েছিল তার অর্ধেক শেয়ারে। সেই টাকা দিয়ে সে তার মাকে বন্দনা করেছিল। শিবরামের সেই অনবদ্য কিশোর উপন্যাসের এই হৃদয়গ্রাহী ছবি অনেকের মনে থাকতে পারে।

হাসি-কান্না, দুঃখ-আনন্দের ছবির পর ছবি নিয়ে গড়ে উঠেছে কলকাতার রেসকোর্সের ইতিহাস। টাকার প্রলোভন এই ইতিহাসকে আজো পর্যন্ত নিদারুণভাবে সচল রাখলেও হৃদয় এখানে জমে গিয়ে নিরেট পাথরে পরিণত হয়নি। তাই রেস শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই যারা বাড়িমুখো হয় তাদের দিকে ভিক্ষার নিঃস্ব হাত প্রসারিত করে না ভিখারী। যারা কাউন্টার ঘুরে হিসেব-নিকেশ চুকিয়ে বাড়ি ফেরে ভিখারীরা জানে তাদের অন্তত আর কিছু না থাক ভিক্ষা দেবার পয়সা থাকে। সেই লোকগুলিও প্রসন্ন চিত্তে ভিখারিকে সন্তুষ্ট করে।

সন্তুষ্ট করে ঘোড়ারাও তাদের মালিকদের। দু বছর বয়স থেকে দৌড় শুরু করে একটি ঘোড়া চৌদ্দ বছর পর্যন্ত মালিককে টাকা দেয়। 'ঘোড়া নেমকহারাম নয়, যত্ন করলে সে মালিককে টাকা দেবেই।'—রামবাবু আমাকে বলেছিলেন। তাঁর কথা আজো আমার কানে বাজে—'হর্স ইজ এ নোবেল অ্যানিমেল। হেরে যাওয়া হতাশ মানুষের জীবনে রঙীন আশার প্রতীক ছাড়া তাকে আর কিছুই না বলতে পারি।'

নারায়ণ দত্ত
দেবাশিস বন্দ্যোপাধ্যায়

প্রত্যক্ষ কর আইনগুলি জেনে রাখুন

দান কর ধার্যের জন্য দানের সামূহিক হিসাব

১৯৭৬-৭৭ সাল হল তার আগের বছরের দান—কর নির্ধারণের খতিয়ান বর্ষ; দান—করের হিসাব করার সময়ে সংশ্লিষ্ট বছরের আগের চার বছরে দান-কর বিধি অনুযায়ী যদি করযোগ্য কিছু দান করা হয়ে থাকে তারও হিসাব সংশ্লিষ্ট বছরের সঙ্গে জুড়ে ১৯৭৬-৭৭ সালে দান-কর ধার্য করা হবে। এই ব্যবস্থা ১৯৭৬-৭৭সাল থেকে কার্যকর হচ্ছে।

তবে ১৯৭৩ সালের পয়লা জুনের আগে কোনও দান করা হয়ে থাকলে তা সামূহিক হিসাবের মধ্যে ধরা হবে না।

করযোগ্য দান অর্থে বোঝাবে উক্ত যে কোনও বছরে দান করা হয়ে থাকলে তার সর্বমোট মূল্য, যার থেকে নিম্নোক্ত হিসাব বাদ যাবে, যথা ঃ—

* যে সব দান—করের আওতায় পড়ে না এবং
* বার্ষিক ৫,০০০ টাকা পর্যন্ত যে সব দানের ক্ষেত্রে করে রেহাই নির্ধারিত।

দান-কর কিভাবে নিরূপণ করা হবে ?

(১) নিম্নোক্ত ক্ষেত্রে সর্বসাকুল্যে কত দাঁড়ায় হিসাব করুন—

(ক) সংশ্লিষ্ট **খতিয়ান বর্ষের** পূর্ববর্তী বছরে করযোগ্য দানের পরিমাণ এবং

(খ) পূর্ববর্তী বছরের আগের চার বছরে (১-৬-৭৩-এর পরে) করযোগ্য দান করা হয়ে থাকলে, তার সর্বমোট পরিমাণের ওপর, **খতিয়ান বর্ষে** প্রযোজ্য হারে দান-করের পরিমাণ।

(২) পূর্ববর্তী চার বছরের করযোগ্য দানের মোট পরিমাণের ওপর, **খতিয়ান বর্ষে** প্রযোজ্য হারে, দান-করের পরিমাণ হিসাব করুন।

(৩) ১নং অংশের হিসাব মত দান-করের পরিমাণ থেকে ২নং অংশের হিসাব মত দান-কর বাদ দিন। অবশিষ্ট যা থাকবে তাই আপনাকে খতিয়ান বর্ষে দান-কর হিসেবে দিতে হবে।

দান-কর অগ্রিম জমা দিলে রেহাই পাওয়া যাবে।

করযোগ্য কোনও দান করার ১৫ দিনের মধ্যে আপনি যদি দান-কর-বিধিতে উল্লিখিত হারে দান-করের পরিমাণ হিসাব করে তার কোনও অংশ সরকারী খাতে অগ্রিম জমা দেন তাহলে আপনার দান-করের পরিমাণ নিরূপণের সময়ে,

* আপন যে টাকা অগ্রিম জমা দিয়েছেন তা প্রদত্ত বলে ধরা হবে এবং
* অগ্রিম করের এক-দশমাংশ অথবা মোট দান-করের এক-দশমাংশের (সামূহিক হিসেবের ভিত্তিতে এবং নির্দিষ্ট হারে নিরূপিত) মধ্যে যেটা কম হবে সেটা রেহাই দেওয়া হবে।

ডিরেকটোরেট অফ ইন্সপেকশান
(পাবলিকেশান্স অ্যাণ্ড পাবলিক রিলেশান্স)
ইনকাম ট্যাক্স ডিপার্টমেন্ট
নিউ দিল্লী

—ডিএভিপি ৭৭।২৬৩

তখন ফালগুন

কয়েকদিন হল বিকালবেলাটা সোমেন কাটাতে শুরু করেছে এই বুড়োবটের তলায়। এখান থেকে সূর্যাস্তটা দেখতে ভাল লাগে, আস্তে আস্তে অন্ধকার নেমে আসাটাও দেখতে বেশ লাগে। জায়গাটা এখন নির্জন থাকে। হয়ত দূরের আখ ক্ষেতের আশে-পাশে দু-একটা লোক থাকে, বা বাচ্চাগুলো খেলা করে। আর একদিকে বাউরীদের কুঁড়েগুলো দেখা যায়, লোকজন দেখা যায়, তবে এদিকটায় বিশেষ কেউ আসে না। এটা হল [illegible] গাঁয়ের পশ্চিম সীমানা। বুড়োবটের তলায় বসে সূর্যের দিকে চেয়ে থাকলে সামনে প্রকাণ্ড ধানক্ষেত, এখন খালি, ধূ ধূ করে। সাঁই সাঁই করে এক এক দমকা হাওয়া আসে। বুড়োবটের ঝুরিগুলো দোলে, পাতায় পাতায় ঝরঝর সিরসির শব্দ হয়। অনেক দূরে এবড়ো-খেবড়ো মাঠের মধ্যে দিয়ে ছাতা বগলে কে যেন যাচ্ছে, এক গাঁ থেকে আর এক গাঁয়ে। আস্তে আস্তে সূর্য ডোবে। হাওয়া কেমন ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা হয়ে আসে। বুড়োবটের সানবাঁধানো বেদীতে বসে পায়ের পাতা ঘাসে আস্তে আস্তে বোলায় সোমেন, অনুভব করে মাটি কেমন ঠাণ্ডা হয়ে যাচ্ছে, সেই ঠাণ্ডা ঘাসের স্তর ভেদ করে উঠে যেন ছড়িয়ে পড়ছে হাওয়ায়। পায়ের পাশ দিয়ে সড়াৎ করে কাঠবেড়ালী যায়। তারপর পাখীর ঝাঁক কিচমিচ করে ফিরতে শুরু করে। পশ্চিম দিক থেকে অন্ধকার এগিয়ে আসে, যেন [illegible]। তারপর চারদিক [illegible] অন্ধকার হয়ে যায়। দূরে দূরে দু-এক একটা লণ্ঠনের আলো দুলতে দুলতে যায়। বাবলা আর শ্যাওড়া গাছের ডালে, কালকাসুন্দে আর ভাঁটবনের ধারে ধারে জোনাকিরা ঘুরে বেড়ায়।

এখন আর অন্ধকার হয়ে গেলেও ঘরে ফিরতে সোমেনের অসুবিধা হয় না। সাত আটদিনে রাস্তা চিনে গেছে। পুকুর পাড়, ধানের গোলা, রাস্তার উঁচুনীচু, মোড়গুলো এখন মুখস্থ। শুধু ঐ মাঝে [illegible] কুঁড়ের পাশে যেখানে প্রকাণ্ড দুটো শ্যাওড়া গাছ, আলোকলতার ঝাড়, ফণিমনসা আর [illegible] ঝোপ আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে আছে, ঐ জায়গাটা পার হতে ভয় ভয় করে। ওখানে একটা প্রকাণ্ড সাপ আছে, সোমেন ঐ ঝোপে সেটাকে ঢুকতে দেখেছে। বোধহয় কেউটেই [illegible]। এখানকার লোকজনকে জিজ্ঞাসা করে লাভ নেই। হাসতে বলবে হাঁ বাবু, ওনারা সব আছেন ইদিকে উদিকে। আগেতে সংখ্যায় আরও পুষ্ট ছিলেন, এখন কম গেলেও মা মনসার কৃপায় তা দু'চারজন আছেন বই কি। বোধহয় শহরের লোক ভয় পাবে বলেই এর বেশী কেউ বলতে চায় না।

বলতে এরা চায় না আরও অনেক কিছুই, সোমেন বোঝে। আর যা বলতে চায় তার সবটা সে বোধহয় বুঝতে পারে না। সত্যি কথা বলতে গেলে, কতটুকুই বা সে বুঝতে পারছে। অথচ এই বোঝার জন্যেই ত আসা। [illegible] প্রোগ্রাম, ফিল্ড, [illegible] ম্যাপ থাকলেও বোধহয় খুব বেশী বোঝা হবে না তার পক্ষে। ঝুঁকিটা

মনোজিৎ মিত্র

ধর্তিয়ে কথা বলেও সে দেখেছে, এরা সমানা হাসি, চোখের চাউনি, অল্প কথা দিয়ে অনেক কিছু ঢেকে রাখে। কিংবা হয়ত সেটাই বলার ভঙ্গী, শহরের মানুষ ধরতে পারে না। কে জানে!

এখনও অন্ধকার হয় নি, কিন্তু আর একটু পরেই হবে। বাউরীপাড়ায় কে যেন চীৎকার করে গান ধরেছে। দূরে কাটাখালের দিক থেকে কয়েকটি বউ জল নিয়ে ফিরছে। বটের ছেঁড়া পাতাগুলো হাওয়ায় সরসরিয়ে বেড়ায়। কিছুই হল না। সাতদিনে হয় নি, কয়েক দিনেও হবে না। অথচ যেদিন হিজলডাঙায় এল সোমেন, সেদিন মনে মনে কত ছক করে, অঙ্ক কষে তৈরী হয়ে এসেছিল। গ্রামটা সম্বন্ধে শতদলের সমস্ত খবরটবর নিয়ে ভেবেছিল পপুলেশন প্যাটার্ন, সোসিও ইকনমিক গ্রুপস, ক্রপ প্যাটার্ন, ল্যান্ড ডিস্ট্রিবিউশন ইত্যাদি দিয়ে প্রথমেই একটা কাঠামো দাঁড় করিয়ে নেবে। তারপর শুরু করবে হ্যাবিটস ট্র্যাডিশন রিক্রিয়েশন ইত্যাদি সম্বন্ধে খোঁজখবর। একেবারে সম্পূর্ণ গ্রামটা উঠে আসবে তার পেপারে।

এরকম গোড়াতেই একটা গোলমাল বাধিয়ে দিয়েছিলেন ডিরেক্টার সাহেব, ডাঃ ভাদুড়ি। যেমন অফুরন্ত ভদ্রলোকের প্রাণশক্তি, তেমনি অফুরন্ত তাঁর মাথায় রকমারি নতুন নতুন ফন্দি। কিছুদিন হল খেয়াল হয়েছে যে শুধু শুধু স্ট্যাটিস্টিকস আর এ্যানালিসিস করলে চলবে না, কিছুটা সংবেদনশীল লেখাও চাই। এখনকার কোশ্চেন হল ইম্প্রেশনিজম। অর্থাৎ যাও থাক মেলামেশা কর এবং [illegible] যা হিসাবে এল না, যা তৃতীয় [illegible] তাও লিখতে হবে। সোমেনকে ঘরে ডেকে পাইপ টেবিলে ঠুকে [illegible] চীৎকার করে বলেছিলেন, [illegible] চাই। তুমি আমাদের নতুন [illegible], তাই তোমাকে দিয়েই শুরু [illegible] প্রভৃতির অন্য যে সব পার্টিসি-[illegible], সেগুলো শুধু [illegible] এ্যাডমিনিস্ট্রেটরদের জন্যে। [illegible] আর অঙ্ক। কিন্তু আমি চাই [illegible] যে ইনস্টিটিউট অফ সোশ্যাল [illegible] শুকনো শুকনো মনোগ্রাফ [illegible] তৈরী করে না। আই এম [illegible] সব কিছুতে একটা [illegible] থাকা দরকার। এবারে আমরা [illegible] গ্রাম নিয়ে যে [illegible] কাজটা করব, [illegible] শুধু ঐ চার্টগুলো আর [illegible] থাকলে চলবে না। সেখানকার মানুষ কি খায়, কি করে সময় [illegible], কি ভাবে, কি বলে, সেখানে [illegible] ঢেউ লেগেছে কি না, তাদের [illegible] সেন্টিমেন্ট [illegible] সবটাই চাই। [illegible] হয়ত কয়েকটা বড় চ্যাপ্টার আমরা এইসবের উপরেই রাখবো। ইট উইল বি এ পাবলিকেশন উইথ এ ডিফারেন্স।

অবশ্য ডাঃ ভাদুড়ি শুধু উপদেশ দিয়ে ক্ষান্ত হবার পাত্র নন। এই হিজলডাঙা গ্রাম তিনিই বেছে দিয়েছেন। নিজের চেনাশোনা লোকজন দিয়ে খোঁজখবর করিয়ে এই গাঁয়ে কোন বাড়ীতে আই এস এস এর লোক এসে থাকবে সে পর্যন্ত ঠিক করে দিয়েছেন। বলেছেন প্রথমে এসে পনেরদিন থাকতে, যদি দরকার হয়, তিন মাস পরে এসে আবার পনের দিন।

এখানে পৌঁছে মনে মনে ডাঃ ভাদুড়িকে বাহাদুরী দিয়েছিল সোমেন। সেই কোন্ ছেলেবেলায় দু একবার দু'একদিনের জন্যে মুর্শিদাবাদের গাঁয়ে এক আত্মীয়ের বাড়ী যাওয়া ছাড়া গ্রামের সঙ্গে তার বলতে গেলে কোন সম্পর্কই হয় নি। বড় জোর ডায়মণ্ডহারবার। না হলে বেড়ান মানেই দীঘা শান্তিনিকেতন দার্জিলিং পুরী কিংবা দিল্লী লখনউ। ছাব্বিশ বছরের জীবনে সে আর গ্রাম দেখল কবে। কিন্তু ডাঃ ভাদুড়ী সারাজীবন বড় বড় চাকরী করেও এইরকম একটি এঁদোপড়া ঝোপজঙ্গলে ভরা গাঁয়ের খোঁজ জোগাড় করতে পারেন, এটা সোমেনের কাছে প্রশংসার ব্যাপার মনে হয়।

এখন চাঁদ উঠেছে এক ফালি, গাছের পাতার ফাঁক দিয়ে দেখা যায়। আস্তে আস্তে পা চালিয়ে সোমেন ফেরে এবার। জায়গায় জায়গায় লণ্ঠনের ঝাপসা আলো কুঁড়েঘর থেকে এসে রাস্তায় পড়েছে। চাঁদের অল্প আলোয় রাস্তার ফটফটে সাদা ধুলোটুকু বোঝা যায়। শীত ত চলে গেছে, এখনও গরম পড়ে নি। রাত্রে বেশ আরাম লাগে, ভোরবেলায় এখনও একটু ঠাণ্ডার আমেজ, একখানা পাতলা চাদর গায়ে দিলে আরাম। সোমেনের ঘরখানা বাগানের মধ্যে, তাই হাওয়া একটু বেশী, ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা লাগে। লণ্ঠনের পলতেটা নামিয়ে দিয়ে টানটান হয়ে খাটে শুয়ে পড়ে সোমেন। খাবার ডাক আসতে এখনও দেরী আছে।

শুয়ে শুয়ে খোলা দরজা দিয়ে বাড়ীর অন্য মানুষগুলোকে নড়াচড়া করতে দেখা যায়। ঠিক বারান্দার নীচে ঘাসের উপরে একখানা মাদুর বিছিয়ে শুয়ে শুয়ে মশা তাড়াচ্ছে ষষ্ঠীপদ দাস, এ বাড়ীর মালিক, যার অতিথি হয়ে সোমেন আছে। সারাদিন খোরাখুরি কাজকর্মের পর রোজ এই সময়টা ষষ্ঠীপদ ঘাসের উপরে আরাম করে। তার স্ত্রী, যাকে সোমেন মাসিমা বলতে শুরু করেছে, সে এখন খুব ব্যস্তভাবে ঘোরাফেরা করছে। হেঁসেলের রান্নার আওয়াজ আসছে ভিতর থেকে। ছোট ছেলে নিবারণটা একগাদা কাগজ নিয়ে লণ্ঠনের কাছে ঝুঁকে পড়ে কি যেন করছে। বোধহয় ঘুড়ি বানাচ্ছে। ষষ্ঠীপদর দিদি, খাটের উপর বসে, অন্ধকার বারান্দার এক কোণে বসে বকবক করছে। বাড়ীতে এখন নাকি লোক কম। বড় ছেলে কি কাজে দুর্গাপুর গেছে, এক মেয়ে ত শ্বশুরবাড়ী ফিরে গেল সোমেন আসার পরদিনই।

লণ্ঠনের আলোয় ছায়ায় আর একজনকেও বাগানের ঘর থেকে মাঝে মাঝে দেখা যায়। তার চুলের ঢাল, আঁচলের ঝলক, নিঃশব্দ দ্রুত চলা সব মিলিয়ে দূরে থেকে তাকে কেমন রহস্যময়ী মনে হয়। এই গাঁয়ের না-বোঝা অনেক কিছুর সঙ্গে সোমেনের কাছে আর এক সমস্যা এই মেয়ে। ষষ্ঠীপদর ছোট মেয়ে, নাম মালতী। রং কালো, হাসিটি ভালো। ভালো তার চোখের চাউনিও। আরও কি সব যে ভালো, সবটা সোমেন বোঝে না। ভালো, এইটুকু বোঝে। ডাঃ ভাদুড়ীর মাথায় ত এই সমস্যাটা ছিল না। এ ত সোশ্যাল স্টাডির বাইরের ব্যাপার। কিন্তু এসে গেছে। এ্যাসেসমেন্ট, এ্যানালিসিস, ইভ্যালুয়েশন, কনক্লুশন—ভাবতে ভাবতে হাসি পায় সোমেনের।

গাঁয়ে এসেই দুম করে একটা শ্যামলী কালো মেয়ের প্রেমে পড়ে হাবুডুবু খাবে, তেমন অবস্থা সোমেনের নয়। কিন্তু এ ক'দিন ধরে মনের মধ্যে একটা ভাল লাগার সুর গুনগুনিয়ে ফিরছে নাকি? সেটি খুব স্পষ্ট কিছু নয়, আবার মন থেকে তাড়িয়ে দেওয়াও যায় না। অনেক দূর থেকে বাঁশীর আওয়াজ কানে আসার মত, অনেক দূরে নূপুর পরে কেউ নাচলে যেমন মনে হয়, তেমনি। মাঝে মাঝে সুর শোনা যায়, আবার ক্ষীণ হয়ে আসে। নিশ্চিহ্ন, চলে যায় না। এসব নতুন। ঠিক এমনটি কখনও ঘটে নি।

প্রথম দিনটা মনে পড়ে সোমেনের। কলকাতা থেকে ট্রেনে সত্তর মাইল, তারপরে ছোট ট্রেনে কুড়ি মাইল, তারপরে হেঁটে আড়াই মাইল, তারপরে নদী পেরিয়ে এই হিজলডাঙা গ্রাম। পা দিয়ে চোখ জুড়িয়ে গিয়েছিল। চারদিকে ঘাস কি ঘন সবুজ!! খেজুর গাছ কলাবাগান নারকেল, তার মাঝে মাঝে ঘন ঝোপ, তাতে নানারকম ফুল ফুটে আছে। নদীর একধারে চড়া পড়েছে এক ফালি, সেখানে কাশবন হাওয়ায় দুলছে। এবড়ো খেবড়ো আঁকাবাঁকা ধুলোভরা রাস্তা, ক্যাঁচ-ক্যাঁচ শব্দ করে গরুর গাড়ী চলেছে। এপাশে ওপাশে ছোটখাট পুকুর, কোনটা শ্যাওলায় ভরা, কোনটা অর্ধেক পরিষ্কার। তাতে তিড়িং-বিড়িং করে নানারকম পোকা ঘোরে। রাস্তাটা মাঝে মাঝে এক একটা বাগানের মধ্যে দিয়ে গেছে। সেখানে আম কাঁঠাল জামরুলের ঠাণ্ডা ছায়া। মাঝে মাঝে দমকা হাওয়ায় শুকনো পাতার রাশ উড়ে বেড়ায়। ভাঙা নারকেলের গুঁড়ির আশেপাশে ছেলেরা খেলে। হাওয়ায় পাকা নোনার গন্ধ আসে, শিমুলের আঁশ নেচে বেড়ায়। উলুঘাস আর ফণীমনসার ঝোপ পথের উপরে উপুড় হয়ে পড়ে আছে।

অনেক পুকুর আর লজ্জাবতী বউএর মত মাথা নীচু করা কুঁড়েঘর পেরিয়ে অবশেষে ষষ্ঠীচরণের বাড়ী পৌঁছোন গেল। ডাঃ ভাদুড়ীর নির্দেশ হচ্ছে, একজন টিপিক্যাল স্মল ফার্মার এর বাড়ীতে থাকতে হবে। ষষ্ঠীচরণের খোঁজ তিনিই যোগাড় করে সঙ্গে লোক দিয়ে দিয়েছিলেন, সে লোকটি পাশের গাঁয়ে থাকে। পৌঁছে দিয়ে সে চলে গেল। সোমেনকে বলে দিয়েছিলেন, তোমার ব্যবহারে [illegible] আমাকে [illegible] যেন দিতে না হয়, তোমাকে এ ক'দিন ওদের ঘরের লোক হয়ে থাকতে হবে। দরকার হলে বিড়ি টিড়ি খাবে, হুঁকোও ২,

কোথায় জলসা ?

ঐ গোস্বামীদের মণ্ডপে। বাউলগান হবে, আর কি যেন থিয়েটার হবে। আমি যাই।

রাত্রে গোস্বামীদের মণ্ডপে গেল সোমেন। গানগুলো ভালই লাগল। দাড়িওয়ালা এক বাউল নেচে নেচে গাইল।

শ্যামসোহাগীর রূপ দেখে অঙ্গ জ্বলে যায়,
ও যে ঘর মানে না; বর মানে না
কেবল খোঁজে শ্যাম কোথায়....

কিন্তু তারপরে কি একটা অদ্ভুত জিনিস আরম্ভ হল সেটার মাথামুণ্ডু কিছুই সোমেন বুঝতে পারল না। গোটা কয়েক বড় বড় চুলওয়ালা লোক অদ্ভুত ভাঁড়ামি করছে আর তাই দেখে গাঁশুদ্ধ লোক হেসে কুটি-কুটি। সোমেন লক্ষ্য করল, একেবারে সামনে বসে আছে বাউরীপাড়ার মেয়েলোকেরা। খুব হাসছে। কিছুক্ষণ দেখে উঠে এল সোমেন। ঐ ভাঁড়ামি দেখে হাসি। নিজেদের স্বভাবের কথা বলতে গিয়েও হাসি। এরা বাঁচে কিসে ? সোমেন ভাবে, শুধু দেখে যাওয়া ছাড়া তার আর কিছু হবে না। কে দেখাবে তাকে এসব ? দেবেন্দ্র গোস্বামী কতটা খারাপ লোক ? কারা সত্যিকারের ভাল লোক এখানে ? অনেক কুঁড়েঘরে নাকি আলো জ্বলে না। তারাও বোধহয় আছে এই আসরে ? তারাও হাসছে না কি ! ঐ ভাঁড়ামি দেখে ?

এসব ভাবতে আস্তে আস্তে ফির-ছিল সোমেন। রাস্তা অন্ধকার, ফাঁকা। গাঁয়ের সব এখন মণ্ডপে। হঠাৎ সামনে কাকে দেখে থেমে গেল। মালতী। অন্ধকারে দেখা যায়, আজ সে একটু সেজেছে। কপালে কাঁচপোকার টিপ চিকচিক করছে।

তুমি কোথায় ছিলে ?

এই একটা বাড়ী ঘুরে আসতে হল, জবাব দেয় মালতী। আপনি চলে এলেন ? ভাল লাগল না দেখতে ?

না, মন্দ কি ? তবে একটু ঘুম-ঘুম পাচ্ছে।

মালতী খুব তাড়াতাড়ি মণ্ডপের দিকে যাচ্ছিল। কিন্তু এখন দাঁড়িয়ে থাকে। সোমেন বলে, চল, একটু আমায় এগিয়ে দেবে চল। নিঃশব্দে এগোয় দুজনে।

আমার সঙ্গে কথা বলতে তুমি লজ্জা পাও বুঝি ?

না, অস্ফুট জবাব আসে পাশের অন্ধকার থেকে।

জান মালতী, আমার খুব ইচ্ছে ছিল এতদিন বসে তোমার সঙ্গে প্রাণ খুলে গল্প করব। কিন্তু হল না। এবারে ত আমায় চলে যেতে হবে।

চলে যাবেন ? কাজ হয়ে গেল ?

হ্যাঁ, প্রায়। একটু থেমে সোমেন বলে, কিন্তু আমার থাকতেই ইচ্ছে করছে। চুপ করে হাঁটে মালতী।

তোমার টিপটা অন্ধকারেও যেন জ্বলছে।

কোন জবাব নেই। সোমেন অন্ধকারেও বুঝতে পারে, এবার লজ্জা পাওয়ার পালা।

আবার কবে আসবেন আপনি ?

এলে তুমি অনেক গল্প করবে আমার সঙ্গে ? এমনি পালিয়ে পালিয়ে থাকবে না ?

আমি ? আমি কি আপনার সঙ্গে বেশী গল্প করতে পারব কখনও ?

বাড়ী এসে গেছে। দুজনে একসঙ্গে দাঁড়িয়ে পড়ে। হঠাৎ বুকের মধ্যে কেমন একটা উত্তেজনা অনুভব করে সোমেন। অন্ধকারের মধ্যে মালতীর একখানা হাত তুলে নেয় নিজের হাতে।

মালতী, পরের বার তোমায় জন্যে কি নিয়ে আসব বলো ?

কিছু না, কিছু না....আপনি আর কখনও আসবেন না, আমি জানি....হঠাৎ হাত ছাড়িয়ে নিয়ে ছুটে চলে যায় মালতী। মিশমিশে অন্ধকারে কিছু দেখা যায় না।

স্তব্ধ হয়ে কিছুক্ষণ সোমেন দাঁড়িয়ে থাকে। শুধু নিজের বুকের উথাল পাথাল শব্দ শোনে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে। ঝড়ের মত গত কয়েক মিনিটের ঘটনাগুলো ঘটে গেল যেন। কি চেয়েছিল সে ? মালতীকে কাছে পেতে ? কি চেয়েছিল মালতী ? কি পারবে তারা দুজন দুজনকে দিতে ? তাহলে এ কিসের চাওয়া ? গায়ের আশপাশ দিয়ে ফাল্গুনী হাওয়া যায়। দূরে নদীতে কোন মাঝি হৈ দিল গলা ছেড়ে। চারদিক ফাঁকা। হঠাৎ বড় একা লাগে সোমেনের। অবসন্ন পায়ে আস্তে আস্তে এগোয় বাড়ীর দিকে।

পরের দিন একা একা ঘোরে সোমেন সারাটা দিন। সারাদিনই মনে হয়, কাজ শেষ হয়ে গেছে। আর কিছু দেখার নেই, শোনার নেই। বোঝার পালা শেষ।

এদিনও সন্ধ্যাবেলায় মণ্ডপে কি সব গানবাজনা ছিল। দেরী করে ফিরল সোমেন বুড়োবটতলা থেকে।

বাড়ীতে এসে দেখে, সবাই মণ্ডপে গেছে, একা ষষ্ঠীপদ মাদুর পেতে ঘাসে শুয়ে আছে। কি হল, আপনি যান নি, সোমেন জিজ্ঞাসা করে। ষষ্ঠীপদ উঠে বসে, একটু হেসে বলে, না, ওরাই সব গেল, আমি শুয়ে থাকলাম।

শরীর ভাল ত ?

হ্যাঁ, শরীর ভাল। বলে একটু থেমে ষষ্ঠীপদ বলে, বড় চিন্তায় পড়ে গেছি, তাই....তারপর একটু অপ্রস্তুতের হাসি হেসে থেমে যায়।

খুঁচাখুঁচি করে সব বার করে সোমেন।

এই ফাল্গুনে মালতীর বিয়ে প্রায় ঠিক হয়েছিল। ওরা মেয়ে পছন্দ করে গেছে, লেনদেনওয়ালার কথাও প্রায় ঠিকঠাক ছিল। কিন্তু আজ খবর এসেছে, ছেলের সাইকেল চাই। অন্য সব কিছু ধারী ধার-দেনা করে পূরণ করার চেষ্টা করেছে ষষ্ঠীপদ, কিন্তু এর উপরে সাইকেল বোঝার উপর শাকের আঁটি। এর পরে চৈত্র মাস, তখন বিয়ে হয় না। আর তার সঙ্গে শুরু হবে অভাবের মরশুম। আবার কোথায় সম্বন্ধ হবে, কবে বিয়ে হবে, কে জানে।

মালতীর বিয়ে হবে, রাত্রে শুয়ে সোমেন ভাবে। কেমন বর ? নিশ্চয়ই চুলে খুব তেল দেয় ? লাল নীল ফুলকাটা তোরঙ্গ ব্যবহার করে ? মালতী সেখানে সুখে থাকবে, যেমন কোটি কোটি গাঁয়ের মেয়েরা থাকে। সে কি সুখ ? এই হিজলডাঙায় যেমন সুখের চেহারা সেইরকম ? আলাদাই বা কি হবে ? এই গ্রামবাংলায় চিরদিনই ত মেয়েরা চওড়া সিঁদুর পরে, কাঁদতে কাঁদতে, পানাপুকুরে ছাইনে মেখে, ফণি-মনসার পাশ দিয়ে অশ্বত্থগাছের নীচে দিয়ে শ্বশুরবাড়ী যায়। যেমনটি হচ্ছে, তেমনটিই হবে। দূরে আখের ক্ষেতে হাউ হাউ করে শেয়াল ডাকে। রাতজাগা পাখীর শব্দ শুনতে শুনতে সোমেন ঘুমোয়।

দু' সপ্তাহ হয়ে গেছে। কলকাতায় ফেরবার ইচ্ছেটা ক'দিন থেকেই মনে চাড়া দিয়েছিল। পরদিন সকালবেলা অলসভাবে বসে সোমেন ভাবছিল কি করা যায় এমন সময় খানিকদূর থেকে একটা ভয়ংকর কান্নাকাটির শব্দ কানে এল। বাড়ীশুদ্ধু সবাই দৌড়োল, সেও গেল সঙ্গে। গিয়ে দেখে, গগন দাসের বাড়ীর সামনে প্রচুর লোক, মেয়েরা আছড়ে পড়ে কাঁদছে। মাঝখানে একটা খাটিয়ায় শুয়ে আছে গগনের বড় ছেলে নবীন। সোমেনেরই বয়সী হবে, সুন্দর পেশল চেহারা। হাত দুটি বুকের উপরে জড়ো করা, চোখ দুটি বোঁজা। কাল গভীর রাতে জলসা থেকে ফেরার সময় সাপের মুখে পা পড়েছিল।

এত কান্নাকাটি হট্টগোলের মধ্যে কিছু বোঝা মুশকিল। খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে জিজ্ঞাসা করে জানা গেল, পাঁচমুড়ির হেলথ সেণ্টার ছাড়া ধারে কাছে কোন ডাক্তার বদ্যি নেই। পাশের গাঁয়ে এক ছোকরা হাতুড়ে আছে, মাঝরাত্তিরে ঘুম থেকে তুলে তাকে আনা হয়েছিল। সে কিছু করতে পারে নি। তারপরে খেয়ার মাঝিকে তুলে, নদী পার হয়ে, আড়াই মাইল হেঁটে হেলথ সেণ্টারে যখন পৌঁছেছে, তখন কাজ শেষ।

দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতে হঠাৎ একটা প্রচণ্ড রাগে সোমেনের মাথা গরম হয়ে উঠতে লাগল। এখন সব মাটিতে মাথা কুটছে। বাবা রে, বাছা রে ! হাজার হাজার মানুষ থাকে, ডাক্তার থাকে না, ওষুধ থাকে না। আর গাঁ ভর্তি কচুবন কলাবন। মা মনসার পুজো। জমি নিয়ে খালি মামলা আর লড়ে কেন এরা শাবল কোদাল নিয়ে সব

জালগুলো সাফ করে না? সাপ ব্যাঙ ইঁদুরে বিষের ঝাড়বংশ উৎখাত করে দিতে পারে না? কারা করবে এসব? কবে করবে? কোনদিন কি হবে? মেয়েলোকগুলো কি বিশ্রী চীৎকার করে কাঁদছে।

বাড়ী বসে সারাদিন সোমেন নিজের এ'কদিনের নোটসগুলো পড়ল। বিকাল-বেলায় মনে হল, যথেষ্ট হয়েছে। এর চেয়ে বেশী আর হবে না। আর দেখে লাভ নেই। যদি ডাঃ ভাদুড়ী খুশী না হন সে আবার পরে আসবে। কিন্তু এবার ফেরা দরকার। ষষ্ঠীপদকে ডেকে বলে, কাল সকালে আমি যাচ্ছি।

ষষ্ঠীপদ সেই অপ্রস্তুত হাসি হাসে, আর দুটো দিন থাকা যায় না। অবিশ্যি, কষ্ট খুবই হচ্ছে.......

সোমেন বুঝিয়ে সুঝিয়ে ওকে নিশ্চিন্ত করে। ভোর ভোর বেরোন দরকার, পায়রাডুবিতে সকাল সকাল পৌঁছলে আটটা পনেরর ছোট লাইনের গাড়ীটা ধরা যাবে।

সন্ধ্যাবেলায় একলা শুয়ে শুয়ে সোমেন ভাবে, আর কি হিজলডাঙায় কখনও আসা হবে? হয়ত না। আরও কত গ্রামে কতবার যেতে হবে কে জানে? আবার যদি ঘুরেফিরে কোনদিন সে এখানে ফেরে, মালতী কি থাকবে তখন? হয়ত সামনের বার ষষ্ঠীচরণ ধার করে সাইকেলটাও কিনে ফেলবে। তারপর মালতী চলে যাবে ডুলিতে চড়ে, পানাপুকুরের পাশ দিয়ে, অশ্বত্থ-গাছের নীচে দিয়ে। তখন আর এই বাড়ীতে থাকতে কি ভাল লাগবে? সোমেন বোঝে, লাগবে না। নিজের কাছে কি করে অস্বীকার করা যায়, এ কদিন ঐ কালো মেয়েটিকে সে বার বার চুরি করে দেখেছে, কথা বলে ভাল লেগেছে, মনে মনে আরও বেশী করে তার সঙ্গ চেয়েছে। হিজলডাঙার সবচেয়ে বড় পুরস্কার তার কাছে মালতী।

ঠক করে শব্দ হতে তাকিয়ে দেখে মালতী ঘরের কোণে লণ্ঠন রাখছে। সোমেন উঠে বসে।

মালতী, আমি কাল চলে যাচ্ছি।

দরজায় হাত রেখে মালতী দাঁড়ায়। চোখে চোখ পড়তেই মেঝের দিকে তাকিয়ে বলল, বাবা বলছিল....আপনার এখানে কত কষ্ট হচ্ছে....

কষ্ট হয় নি। খুব ভাল লেগেছে।

দুজনে চুপ করে থাকে। বাইরে আমবাগানটায় শন শন শব্দ ওঠে। জানালার বাইরে থেকে একটা জোনাকী হঠাৎ ঘরের মধ্যে ঢুকে পড়ে, উড়ে বেড়ায়। কোথায় যেন শাঁখ বাজল।

আবার আসবেন ত?

এসে কি আর তোমায় দেখতে পাব? তুমি হয়ত চলে যাবে তোমার জায়গায়।

একবার তাকিয়েই মালতী আবার চোখ নামায়।

না, আমি আরও অনেকদিন থাকব। সোমেন হাসার চেষ্টা করে, আমরা সবাই মিলে তোমাকে অন্য জায়গায় পাঠিয়ে দেব, বুঝলে? জবাব নেই। কিন্তু মালতী যায় না, দাঁড়িয়ে থাকে। মাথা নীচু, দরজায় হাত। সোমেন দেখতে থাকে।

মালতী, তোমাকে আমি যদি কিছু দিই, তুমি নেবে?

মালতী চমকে উঠে তাকায়, কিন্তু চোখে চোখ রাখে না। পায়ের আঙুল দিয়ে মেঝের মাটি খোঁড়ে।

মালতী, আমি তোমার বাবার কাছে সব শুনেছি।

আমি জানি না... আমি কিছু জানি না....আমি যদি....যদি সাইকেলটা দিই.... তোমার বাবা নেবেন?

আপনি? মালতী হঠাৎ সোজা হয়ে দাঁড়ায়। লণ্ঠনের টিমটিমে আলোয় তার চোখ দুটো অস্বাভাবিক বড় দেখায়।

আমার বাবা পারছে না বলে আপনি ...আপনি দান দেবেন?

দান নয় মালতী, আমি যদি....

না। আমি নেব না, আমি নেব না। এমন করলে আপনি আর আসবেন না.... অতিথির দান আমরা নিই না....কখনও না..

শেষের দিকে তার গলা বুঁজে আসে। রাগে না কান্নায়, সোমেন বুঝতে পারে না। এগিয়ে যাবার আগেই ঝটকা মেরে ঘুরে দাঁড়ায় মালতী, তারপর বাগানের অন্ধকারে মিশে যায়।

জোনাকীটা তারপরেও অনেকক্ষণ ঘুরল ঘরের মধ্যে। সারারাত আধঘুমে সোমেনের কানে কত শব্দ এল। কতকগুলো এলোমেলো স্বপ্ন এল, গেল। হাওয়ার আওয়াজ বাড়ল, কমল। কি এক অস্বস্তিতে বার বার ঘুম ভাঙল। সারারাত মনের মধ্যে জেগে রইল এক অদ্ভুত বিষাদ। তারপর ভোরের এক টুকরো আলো কেমন যেন অপরাধীর মত এসে ঘরে ঢুকল।

সব কাগজপত্র জামাকাপড় ঠেসে ঠুসে তোবড়ানো ব্যাগটার মধ্যে ঢুকিয়ে অবশেষে বাইরে এসে দাঁড়াল সোমেন। ষষ্ঠীপদ আর তার বউএর মুখে ম্লান মন খারাপ হাসি।

কত কষ্ট হল, তবু আপনি হাসিমুখে রয়ে গেলেন, ষষ্ঠীপদ বলে।

জোরগলায় হাসে সোমেন, না, এখন ত এটা আমার নিজের বাড়ী হয়ে গেল, যখন খুশী আসব। মালতীকে কোথাও দেখা যায় না।

ষষ্ঠীপদ খুব জোরজার করছিল ঘাট অবধি পৌঁছে দেবে বলে, কিন্তু সোমেন কিছুতেই আসতে দিল না। বলল, আপনি আর বেরোবেন না, আমি রাস্তা চিনে গেছি।

আসলে আর এখন কারু সঙ্গ ভাল লাগছে না এই যাবার সময়। এখন একা ভাল, সোমেন ভাবে। মন ভাল নেই, মন ভাল নেই। মাথার উপরে আমের পল্লব দোলে, দূরে বাগানে বউ কথা কও ডাকে এখনও ধুলো ওড়ে নি। পথের দুপাশে ঘাস মখমলের মত হয়ে আছে। ফড়িংগুলো উড়ে বেড়ায়, নীল নীল ডানা। মন ভাল নেই। নারকেলের পাতা রোদে চিক চিক করে। মন ভাল নেই। চারপাশের গ্রাম কেমন যেন নিঝুম নিশ্চুপ। কেমন এক মায়াঝরা মায়াঝরা ভাব। কতকাল যে এমনি চুপ করে ...ড়েগুলো দাঁড়িয়ে আছে। পরদেশী... আসা-যাওয়া দেখছে। মন ভাল নেই।

ঘাটে আগের দিন রাত্রে খবর দেও ছিল। ভরত মাঝি নৌকো নিয়ে তৈরি। ইঁটে পা রেখে নৌকোয় নামতে যা সোমেন, এমন সময় চীৎকার কানে এ বাবু-উ-উ।

তাকিয়ে দেখে, ন্যাড়া। ভী হাঁপাচ্ছে, হাতে ফর্সা কাপড়ে বাঁধা ছোট্ট পুঁটুলী।

মালতী মাসি পাইঠেছে, আপ জন্যে। বইলেছে বাতাসা আইনো রেখেই কাল রেতে, মুড়ি আর নারকোলের দিইয়েছে। বইলেছে পথে ক্ষিদা লাই আপনি খাবেন।

উর্দ্ধশ্বাসে ন্যাড়া আবার গ্রামের দিকে। পুঁটলী হাতে সো দাঁড়িয়ে থাকে কয়েক মুহূর্ত। তা ঘুরে গ্রামের দিকে তাকায়। ঐ অনেক দ ঘোষেদের গোলার পাশে জামরুল হেলান দিয়ে কে যেন দাঁড়িয়ে আছে। এ থেকে তার চুলের চালটুকু শুধু নায়। তার চোখ এদিকেও নয়, অন্যদি নয়। তার চোখ কোথায়, কে জানে।

দেন, জিনিসগুলো দেন, ভরত এগিয়ে আসে। সোমেন ব্যাগটা বা দেয়।

ওটা দেন?

না, এটা না। পুঁটলীটা শক্ত ধরে সোমেন নৌকোয় পা দেয়, এটা এটা আমার কাছে থাক।

ঘড়ি, কলম ইত্যাদি ও প্রতিমা

সমীরকান্তি বিশ্বাস

কণ্ডাকটার আমার দিকে এগোতে এগোতে বলল, টিকিট! এক টাকার একটা নোট তার দিকে এগিয়ে দিলাম। বললাম, একটা পঁচিশ। কণ্ডাকটারের পাশের ভদ্রলোক আমার চোখের দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকার পর জিজ্ঞেস করল, কটা বাজে? কণ্ডাকটারের হাত থেকে টিকিট ও খুচরো পয়সা নিতে নিতে বাঁ হাতের কব্জি চোখের সামনে আনলাম। দেখলাম, হাতে ঘড়ি নেই। অবাক কান্ড ত, ঘড়ি কোথায় গেল। তাড়াহুড়ো করে বাড়ি থেকে বেরুবার সময় কখনও কখনও ঘড়িটা হাতে না পরে প্যাণ্টের পকেটে বা জামার পকেটে রেখে দেই। তাই, প্যাণ্টের পকেট হাতড়াতে লাগলাম। জামার পকেট হাতড়াতে লাগলাম। কোথাও ঘড়ি পেলাম না। লক্ষ্য করলাম, কিছুক্ষণের মধ্যে বাসের ভেতর অনেক লোক বেড়ে গেল। যে ভদ্রলোক সময় জানাতে চেয়েছিল তাকে আর খুঁজে পেলাম না। বাসের ভেতর কিছু লোকের মধ্যে তর্কাতর্কি শুরু হয়ে গেল। ঠিক কারো কথা বুঝতে পারলাম না। আমি ঘড়ির কথা ভাবতে লাগলাম। ঘড়িটা হারিয়ে গেল? আমি মনে করার চেষ্টা করলাম, বাড়ি থেকে বেরুবার সময় কি কি করেছিলাম। আমি কিছুতেই মনে করতে পারলাম না, বাড়ি থেকে বেরুবার সময় ঘড়িটা হাতে পরেছিলাম কিনা।

বাড়ি থেকে বেরুবার সময় প্রতিমার সঙ্গে ঝগড়া করেছিলাম। ঝগড়া করতে করতে ভীষণ রেগে গিয়েছিলাম। রাগে চিৎকার করতে শুরু করেছিলাম। চিৎকার করতে করতে অফিস যাওয়ার জন্য তৈরি হচ্ছিলাম।

আজ সকালে ঘুম থেকে উঠতে না-উঠতেই তর্কাতর্কি শুরু হয়েছিল। ছোট-খাট তর্কাতর্কি করতে করতে চা খেয়েছিলাম। বাজার গিয়েছিলাম। তেল মেখেছিলাম। চান করেছিলাম। ভাত খেয়েছিলাম। আজ সকালে ঘুম থেকে উঠতে না-উঠতেই প্রতিমা খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে অনেক কিছু জিজ্ঞেস করেছিল। আমি কত মাইনে পাই, ভবিষ্যতে উন্নতির সম্ভাবনা কতটুকু, চাকরি থেকে রিটায়ার করার কতদিন বাকি ইত্যাদি। আমি প্রত্যেকটা প্রশ্নের ঠিকঠিক উত্তর দিয়েছিলাম। প্রশ্ন-গুলোর উত্তর শুনে প্রতিমা কিছুক্ষণ চুপ করেছিল। তারপর বলল, আমার ধারণা, তুমি আর সংসার চালাতে পারবে না। বললাম, সংসার ত ভালই চলছে। প্রতিমা চিৎকার করে উঠল, এখন ত কোন রকমে চলছে, ভবিষ্যতে চলবে না। 'ভবিষ্যত' শব্দটা শোনার পর আমি অনেকক্ষণ চুপ করে থাকার পর বললাম, ভবিষ্যতে আরেকটু খারাপ থাকব, ক্ষতি কী। 'এর থেকেও খারাপ থাকব, এর থেকেও খারাপ থাকব' বলতে বলতে প্রতিমা চিৎকার করতে লাগল। হাউ-হাউ করে কাঁদতে শুরু করে দিল। আমিও চিৎকার শুরু করে দিলাম। খারাপ খারাপ ভাষায় প্রতিমাকে গালাগালি করতে লাগলাম।

চিৎকার করতে করতে আমি অফিস যাওয়ার জন্য তৈরি হচ্ছিলাম। তর্কাতর্কি করতে করতে গেঞ্জী পরেছিলাম। জামা পরেছিলাম। জাঙ্গিয়া পরেছিলাম। প্যাণ্ট পরেছিলাম। মোজা পরেছিলাম। আরও আরও অনেক কিছু করেছিলাম। তারপর বাড়ি থেকে বেরিয়ে পড়েছিলাম। আমি এখন কিছুতেই মনে করতে পারছি না, বাড়ি থেকে বেরুবার সময় [illegible]

পেরেছিলাম কিনা। ঘড়ির কথা ভাবতে ভাবতে অফিসে পৌঁছে গেলাম। উপস্থিতি খাতায় সই করার জন্য পকেট থেকে কলম বের করতে গিয়ে দেখি, পকেটে কলম নেই। অন্য একজনের কলম নিয়ে সই করলাম। তারপর ভাবলাম, আশ্চর্য, কলমটাও কি হারিয়ে গেল! না, বাড়িতে ফেলে এলাম! কিছুতেই মনে করতে পারলাম না, বাড়ি থেকে বেরোবার আগে কলমটা পকেটে রেখেছিলাম কিনা। অতীত ভাবতে শুরু করলাম, আমি কি ভাবে অফিস যাওয়ার জন্য তৈরি হচ্ছিলাম। আমি প্রতিমার সঙ্গে ঝগড়া করতে করতে একে একে গেঞ্জী, প্যান্ট, জামা, মোজা ইত্যাদি পরতে লাগলাম। তারপর, আয়নার সামনে গিয়ে দাঁড়ালাম। চাপ করে চুল আঁচড়ালাম। গালে ও ঘাড়ে পাউডার লাগালাম। তারপর প্রতিমার সঙ্গে তর্কাতর্কি করতে করতে বাড়ি থেকে বেরিয়ে পড়েছিলাম। কিন্তু, এখন কিছুতেই মনে করতে পারছি না, বাড়ি থেকে বেরুবার আগে কলমটা পকেটে রেখেছিলাম কিনা। প্রতিদিন অফিসে বেরুবার সময় প্রতিমা খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে জিজ্ঞেস করে, ঘড়ি পরেছি কিনা, কলম নিয়েছি কিনা, অন্য কোন দরকারি জিনিস নেওয়ার কথা আছে কিনা ইত্যাদি। কিন্তু, আজ প্রতিমার সঙ্গে ঝগড়াঝাটি হওয়ায় সব গণ্ডগোল হয়ে গেল।

অফিসের ড্রয়ারে আমার একটা ডট্ পেন আছে। আমি ডট পেন দিয়ে অফিসের কাজকর্ম করতে লাগলাম। অফিসের কাজ করতে করতে প্রতিমার কথা ভাবতে লাগলাম। সেচারাকে আজ খারাপ খারাপ ভাষায় গালাগালি দিয়েছি। আমার দিক থেকে একটা গোঁয়ার্তুমি করা ঠিক হয়নি। প্রতিমা আজকাল একটু খিটখিটে হয়ে পড়েছে। সামান্য ব্যাপারে ঝগড়াঝাটি করে। রাগারাগি করে। তর্কাতর্কি করে। এখন প্রতিমার পেটে বাচ্চা। আমাদের সংসার। শুনেছি, এই সময় সব মেয়েরাই নাকি একটু খিটখিটে হয়। আশ্চর্য, আমি এই কথাটা একদম ভুলে যাই! প্রতিমার শরীরের ও মনের কথা ভেবে ওকে একটু, শান্ত দিলে ক্ষতি কী! প্রতিমার জন্য দুঃখ হতে লাগল। কষ্ট হতে লাগল। আরও অনেক কিছু হতে লাগল। প্রতিমার কথা ভাবতে ভাবতে অফিসের জরুরি কাজগুলো করতে লাগলাম। সামান্য কাজকে এত শক্ত মনে হতে লাগল যে আমি ঘামতে শুরু করলাম। কিছুক্ষণ কাজ করেই ক্লান্ত হয়ে পড়লাম। গাল ও কপালের ঘাম মোছার জন্য পকেট থেকে রুমাল বের করতে গি-দেখি, পকেটে রুমাল নেই। আশ্চর্য, রুমালটা কোথায় গেল! রুমালটাও কি হারিয়ে গেল? বাড়ি থেকে রুমালটা এনেছিলাম তো! আমি কিছুতেই মনে করতে পারলাম না, বাড়ি থেকে রুমালটা এনেছিলাম কিনা। সাধারণত, অফিস থেকে ফেরার পর ময়লা রুমালটা পকেট থেকে ফেলে দেই। প্রতিমা সঙ্গে সঙ্গে একটা পরিষ্কার রুমাল পকেটে রেখে দেয়। কিছুতেই মনে করতে পারলাম না, গতকাল প্রতিমা আমার পকেটে ফর্সা রুমাল রেখেছিল কিনা। আমি ভাবতে শুরু করলাম, গতকাল বাড়ি ফেরার পর কি কি ঘটনা ঘটেছিল।

গতকাল একটু তাড়াতাড়ি অফিস থেকে ফিরেছিলাম। বাড়িতে ঢোকামাত্র ধূপের গন্ধ পেলাম। চন্দন ধূপ। আমি ধূপের গন্ধ একদম সহ্য করতে পারি না। আমি চিৎকার চেঁচামেচি শুরু করে দিলাম। প্রতিমাকে জিজ্ঞেস করলাম, ধূপ জ্বেলেছ কেন?

প্রতিমা অনেকবার জানতে চেয়েছে, তোমাকে বলতেই হবে, কেন ধূপের গন্ধ সহ্য করতে পার না? প্রতিমার প্রশ্নের উত্তরে আমি কিছুই বলতাম না। কিছুই না বললে প্রতিমা আরও রেগে যায়। ঝগড়া শুরু করে দেয়। চেঁচামেচি শুরু করে দেয়। বলে, তোমার জন্য ঘরে ঠাকুরের কোন ফটো নেই। তোমার জন্য সন্ধেবেলা ধূপ জ্বালাতে পারি না। গতকালও প্রতিমা জানতে চেয়েছিল, তোমাকে বলতেই হবে, কেন ধূপের গন্ধ সহ্য হয় না!

প্রতিমাকে কখনই বলিনি, ধূপের গন্ধ পাওয়ামাত্র আমার বাবার কথা মনে পড়ে। বাবার মৃত মুখ চোখের সামনে ভেসে ওঠে। মুখটা চোখের সামনে আস্তে আস্তে স্পষ্ট হতে থাকে। স্পষ্ট হতে হতে এমন হয় যে মনে হয়, একেবারেই সাক্ষাতের মুখ। এভাবে বাবার মুখোমুখি হলে আমার খুব কষ্ট হয়। দুঃখ হয়। ভয় হয়। আরও অনেক কিছু হয়। বাবার দুটো চোখ কোটরের দিকে গেছে। গালের হাড় বেরিয়ে গেছে। মাথাটা শরীর থেকে ঝুলছে। বাবাকে এইভাবে দেখলে সত্যিই কষ্ট হয়। প্রতিমাকে এ-সব কথা কোনদিন বলিনি। কয়েকমাস আগে, আমার বাবার মৃত্যু হয়। হাসপাতাল থেকে শ্মশান পর্যন্ত যেতে যতক্ষণ লেগেছিল ঠিক ততক্ষণই ধূপ জ্বলেছিল। চন্দন ধূপ। শ্মশানে পৌঁছবার পরও ধূপ জ্বলেছিল। মুখাগ্নির সময় পর্যন্ত ধূপের গন্ধ পেয়েছিলাম। ধূপের গন্ধ পাওয়ামাত্র এখনও এখনও আমার চোখের সামনে ভেসে ওঠে, শববাহকেরা দ্রুত এগিয়ে চলেছে। আমরা বারবার পিছিয়ে পড়ছি। রাস্তায় খই ছড়িয়ে পড়ছে। পয়সা ছড়িয়ে পড়ছে। আরও অনেক কিছু ছড়িয়ে পড়ছে। এসব দৃশ্য চোখের সামনে ভেসে উঠলে আমি খুব কষ্ট পাই। প্রতিমাকে এসব কথা কোনদিন বলিনি। গতকাল প্রতিমাকে সব কথা বলতে বাধ্য হয়েছিলাম। গতকাল প্রতিমা খুব ঝাড়াবাড়ি শুরু করেছিল। রেগে গিয়ে কাঁদিয়ে আমার সঙ্গে তর্কাতর্কি শুরু করেছিল। তাই, ওকে সব বলেছিলাম। সব কথা শোনার পর ও ঝগড়াঝাটি বন্ধ করে দিল। অনেকক্ষণ চুপ করে রইল। আমিও অনেকক্ষণ চুপচাপ বসেছিলাম। ভাবতে লাগলাম, গতকাল আরও কি কি করে ছিলাম। কিন্তু, কিছুতেই মনে করতে পারলাম না, গতকাল প্রতিমা আমার পকেটে ফর্সা রুমাল রেখেছিল কিনা।

অফিস ছুটির পরও প্রতিমার কথা ভাবছিলাম। ঘড়ির কথা ভাবছিলাম। কলম, রুমাল ইত্যাদির কথা ভাবছিলাম। ভাবছিলাম, রাগারাগি করে বাড়ি থেকে বেরুলে আগে প্রতিমা দুপুরের দিকে আমাকে টেলিফোন করত। জানতে চাইত, আমি ঠিক সময়ে অফিসে পৌঁছতে পেরেছি কিনা, রাগ করেছি কিনা, টিফিনে কি কি খেয়েছি ইত্যাদি। বাড়ির কাছাকাছি পোস্ট অফিসটা। সেখান থেকে প্রতি[illegible] টেলিফোন করত। এখন রাগারাগি [illegible] বেরুলে প্রতিমা আর টেলিফোন করে [illegible] এখন মাতৃত্বের লক্ষণগুলো [illegible] এত স্পষ্ট যে যখন তখন বাড়ির বাই[রে] আসতে চায় না। প্রতিমার কথা ভাব[তে] ভাবতে বাড়ির কাছাকাছি পৌঁছে [illegible] বাড়ির কাছে পৌঁছে মনে হল, ঘড়ি, ক[লম] ও রুমাল বাড়িতেই ফেলে গিয়েছিলাম [illegible] কিছুই হারায়নি। মনে হল, বাড়িতে [illegible] জানতে পারব, আমার সঙ্গে ঝগড়া করে[ও] বলে সারাদিন প্রতিমার মন খারাপ [illegible] আমি ঘড়ি নিতে ভুলে গেছি বলে প্রতি[মার] মন খারাপ ছিল। যখন জানতে পারল [illegible] কলম, রুমাল ইত্যাদি নিতে ভুলে [illegible] তখন তার মন খুব [illegible] হয়ে গিয়েছি[ল] এত খারাপ যে সে ভাল করে চান [illegible] পারেনি। ভাল করে খেতে পারেনি। [illegible] চেষ্টা করেও দুপুরে ঘুমোতে পারেনি।

বাড়ির ভেতর গিয়ে দেখলাম [illegible] ধারণাই ঠিক। আমার ঘরে ঢুকে দেখ[লাম] ড্রেসিং টেবিলের এক কোণে পড়ে [illegible] আমার কলম, ঘড়ি ও ফর্সা রুমাল। [illegible] পারলাম, আমি আর যা-যা ধারণা [illegible] ছিলাম সবই সত্যি। আমি অবাক হয়ে [illegible] করলাম, আমার সামান্য চেষ্টাতেই প্রতি[মার] রাগ জল হয়ে গেল।

বিজয়া

কবিতা সিংহ

মা যে কবে আসেন ?

না, তারিখ শুধোলে বলতে পারব না। কাশ দেখলে বলতে পারব। সেই ছোট-বেলা থেকেই দেখছি যে। হঠাৎ একদিন পাশ্বুটে রোঁয়া ঝেড়ে আকাশটা ঝবিন করে ধুয়ে দেয় কেউ—হঠাৎ সন্ধ্যাবেলা ফেরার পথে শিউলির ফিকে গন্ধ ছুটে পোড়া ডিজেল ছাপিয়ে।

বুঝতে পারি, মা এবার মনে মনেই পৌঁছে গেছেন তাঁর বাপের বাড়ি। তারপর দেন নবপত্রিকায়, জোড়াবেল বাঁধা সবুজ ছুটি যেন তাঁর শরীরের প্রতীকটি। ষষ্ঠী যায়, সপ্তমী যায়, অষ্টমী যায়, নবমী যায়। কত পুরোনো দুঃখ নতুন হয়ে ওঠে, নতুন দুঃখ পুরোনো হয়ে যায়। কত ঘরে ফেরার আনন্দ, কত ঘরে না-ফেরার বেদনা, কত শেষ মুহূর্তে খেটে জোগাড় পুজোর ছুটি, কত, ছুটি জোগাড় শূন্য মনের মনোমালিন্য—মায়ের আগমনে অন্তরে-বাইরে নিজেকে খুশি করে, অন্যকে খুশি করার কি প্রাণপণ চেষ্টা : এমন টালমাটাল হৃদয়মন্থনে, এমন সবকে এক-তারে বাঁধা মনন, বছরের আর কোনো সময়েই বাঙালীকে এমন করে না। নাড়া দেয় না। তারপর আসে নবমীর পর দশমী।

মায়ের আসার তারিখটা যেমন বলতে পারিনে, যাওয়ার দিনক্ষণ ঠিক তেমনিই ঘড়িতে পারি ঘণ্টা পল মিলিয়ে। কিশোর বয়সে বিজয়ার দিন সকাল বেলায় হাতে বেঁধে দেওয়া হত অপরাজিতা লতার বালা। তাতে হলুদে ছোপানো পাতলা সুতো জড়ানো। মণ্ডপে মায়ের গালে ঘামতেল গর্জন তেলে। হঠাৎ যেন চোখের জল। তাঁর সামনে বিজয়ার সকালের ভোগ পান্তাভাত, অম্বল, মাছের ল্যাজা। মেয়ে সকাল সকাল ঘরে ফিরছে, তাই গরম রান্না হয়ে ওঠেনি। অবশ্য এ-নিয়ম ... উপরের হঠাৎ ঢাকির ঢাকে বেজে বিসর্জনের বাজনা। স্টেথিসকোপ দিয়ে দেখলে বুকের ভিতরে তার গুরু-গুরু শোনা যেত। তারপর দর্পণে মায়ের প্রতিবিম্বটি রেখে পিতলের পাত্রে গঙ্গোদকে প্রতিফলনের বিসর্জন

যাঃ, সব শেষ।

এখন ও-দেহ প্রাণহীন। যে-কেউ ছুঁতে পারে। এখন সিঁদুর খেলা।

গঙ্গার জেটির ওপর দাঁড়িয়ে বছরের পর বছর দেখেছি পেট্রোম্যাক্সের উজ্জ্বল আলোয়, মাঝগঙ্গায়, দু' নৌকো সরিয়ে নেওয়া হল, খাড়া অবস্থায় সোজা ডুবে গেলেন সম্পূর্ণ প্রতিমাখানি।

আমার মা, আমার বন্ধুদের অনেকের মা, নাকি আপনাদের সকলের মা—এঁরা সবাই এত এই দুর্গা-প্রতিমার মত কেন ?

এঁদের নরম পায়ে হাত ঠেকিয়ে কেবল পোষাকী নমস্কার করতে সাধ যায় না, মাথা লুটিয়ে, মুখ ঘষে, চুমো খেতে বাসনা জাগে। বিজয়া সেই অন্য দিন। মা হারানোর দিন, মা হারিয়ে শূন্য হয়ে যাবার দিন, আবার সেই শূন্যতাকে পূর্ণ করে তোলার জন্য আকুল কোলাকুলি বন্ধুত্ব, প্রীতি, ভ্রাতৃত্ব বিনিময়ের লুটোপুটির দিন। এই দিনে এমনকি সীমান্তের সীমানাও খুলে যায়, শত্রুর দরোজা উন্মুক্ত হয়। একটি প্রণামে, একটি আলিঙ্গনে মিটে যায় বাসী ঝগড়া, পুরোনো কোন্দল।

এমনি দিনের একটি স্মৃতির কাহিনী বলি।

একটি মেয়ে পরিবার থেকে বিচ্যুত হয়ে যৎসামান্য চাকরি করত কলকাতার কোনো নগণ্য স্কুলে। তার মা তখন ঘোর ক্যান্সারে হাসপাতালে। বিরূপ আত্মীয় পরিজন চলে গেলে মেয়েটি চোরের মত দেখতে আসত তার মাকে। এমনি মহা-পুজোর দু'মাস আগে একদিন সে মাকে দেখতে গেছে। মায়ের নাকে, হাতে শিরায়, নানান নল পরানো। আস্তে বালিশের তলা থেকে ভাঁজ-করা লুকোনো কয়েকটি নোট বের করে দিয়ে মেয়েকে বললেন—এখুনি একটা শাড়ি কিনে নিয়ে আসতে পারিস ?

—এখুনি কেন মা ? তোমার এমন অবস্থা। আজ থাক—

—না, থাকবে না। একজনকে দেব। এখুনি আন। মেয়েটি মনে মনে জানত শাড়ি কার জন্য। তার বেশি শাড়ি ছিল না। তাই সে একটির জায়গায় দুটি খেলো শাড়ি কিনে নিয়ে এলো কাছাকাছি কাটরা থেকে।

মা শাড়ি দুটি বালিশের পাশে রেখে কি যেন ভেবে নিয়ে, বড় নিশ্চিন্ত হয়ে চোখ বন্ধ করলেন।

একমাস বাদে মায়ের মৃত্যু হল।
আরো একমাস বাদে পুজো।

সেই মেয়েটির বাড়ি ছোট্ট একটি প্যাকেট এসে পৌঁছোল মহাষষ্ঠীর আগের দিন। সঙ্গে ক্ষুদ্র পত্র।

—'তোমার মা, তোমার জন্য পুজোর কাপড় রাখিয়া গিয়াছেন। তাঁর ইচ্ছা অনুযায়ী প্রেরণ করিলাম। ইতি—'

বিজয়ার দিন সেই মেয়েটিকে দেখা গেল জ্যালজেলে নতুন শাড়ি পরে তরুণ স্বামী ও কোলের শিশু নিয়ে কলকাতার ফুটপাতের পুলিশ কর্ডন-করা ভিড়ে অজস্র মানুষের মধ্যে মিশে দাঁড়িয়ে থাকতে। কখনোবা শূন্যদৃষ্টিতে, কখনো বা সব ভুলে গিয়ে শোভাযাত্রার রং চং দেখে মেতে ওঠার আনন্দে। তারা ভাসান দেখতে বেরিয়েছে।

সেই তার মায়ের দেওয়া নতুন শাড়ি পরার শেষ বছর। যে মা, অন্তিম শয্যায় শুয়েও মেয়েকে আগামী পুজোর দিনে নতুন শাড়ি পরাতে চেয়েছিলেন।....এমন মা আজও এই দেশের ঘরে ঘরে। এমন নিঃস্বার্থ নারীদের জন্য আজও আকাশে চন্দ্র-সূর্য !

বিজয়ার দিন তাই, মা-হারানোর ব্যথার দিন, আর ব্যথার মধ্যে দিয়ে মা যে কী, তা বোঝারও এক মহান্ মুহূর্ত।

আনন্দময়ীর আগমনে

উৎপলকুমার বসু

পুজো শুরুতে চলে গেল। একটু দেরীতে—কার্তিকের প্রথম দিকে—এবারও বাজনা বেজে উপস্থিত, তবে বিদায়ও অদী-দীন মধু ও বিধু এ-বছর দু-হাত তুলে নেচেছিল কিনা জানি না। বাজারে জিনিস-পত্রের যেরকম মূল্যবৃদ্ধি দেখা গেছে গত কয়েক মাসে—তাতে মনে হয় অনুরূপ আয়োজন একমাত্র ব্যবসায়ীদেরই মানাবে। বস্তুত, বহু পরিবারে এটা একটা সংকটকাল।

উৎসবের অন্তে পুরোনো সেই দিনের কথা মনে করে দু-এক ফোঁটা আনন্দাশ্রু বিসর্জন করা প্রথাসম্মত। গ্রামের বাড়িতে পুজো, নদীতে ভাসান, নিজের পুজো-মণ্ডপে মেয়েদের সঙ্গে সামান্য ফষ্টিনষ্টির স্মৃতি অনেকের কাছে অতিমূল্যবান। ইংরেজিতে যাকে বলে নস্টালজিয়া বা মোহাচ্ছন্ন অতীত—পাকা জনের মতো থেকে থেকে আমাদের মানসিকতাকে গ্রহণ করে নিয়ে যাচ্ছে। এখন সেই রোগের মরশুম।

আমি, দুঃখের সঙ্গে জানাই, কোনো-দিন এই উৎসবে যথেষ্ট আনন্দলাভ করিনি। ছেলেবেলায় আর দশজন বাঙালীর মতো আমিও একটি গ্রামে বড়ো হয়েছি। সেই গ্রামের অনতিদূরে ছিল ঐ অঞ্চলের প্রধান শহর। সে-শহরে এক রাজা ছিলেন। অর্থাৎ, আমরা ছিলাম প্রাক-স্বাধীনতা যুগে এক করদ রাজ্যের অধিবাসী। পুজোয় নতুন জামা ও নতুন জুতো কেনার মতো আর্থিক অবস্থা হয়ত আমাদের ছিল কিন্তু আমার স্কুলের অধিকাংশ ছাত্রই খালি পায়ে হেঁটে পড়াশোনা করতে আসতো। বলা উচিত, সহপাঠীরা ছিল অতি দরিদ্র এবং আমি ছিলাম মধ্যবিত্ত। যেদিন থেকে এই তফাৎ চোখে পড়ল—সেদিন থেকে পুরনো জামার আদরণীয় কোমলতা এবং ছেঁড়া চটির উদার সহনশীলতাকে যথেষ্ট গ্রহণ করতে শিখলাম। নটি-বয় শু নামক ভয়ঙ্কর জুতোজোড়া কোন্ কোম্পানী আবিষ্কার করেছিলেন জানি না। নতুন ঐ জুতো পরে বাল্যে আমাকেও খুঁড়িয়ে বেড়াতে হয়েছে দীর্ঘকাল। সময়ক্রমে পোকা মারা, পেরেক ঠোকা ইত্যাদি দৈনন্দিন কাজে তার যথোপযুক্ত প্রয়োজন হল। শীতের বিকেলে এস ডি ও-র ছেলেমেয়েরা যখন সাদা কেডস পরে কোয়ার্টারের সৌখিন বাগানে বল-লোফালুফি খেলতো, তখন আমাদের মতো হতশ্রী একদল বালকের চোখে তারাই ছিল প্রথম দেখা দেবদূত। নীল জালে ঘেরা ছিল ঐ স্বর্গের কানন। আমাদের পায়ে তখন কোনো জুতো ছিল না।

স্কুলে পুজোর অনেক আগেই ছুটি হয়ে যেত। শুরু হত নিঃসঙ্গতার দিন। বস্তুত, আমি স্কুলকে বড়োই ভালো-বাসতাম। নির্জন দুপুরে গিয়ে বসে থাকতাম তার বারান্দায়—লম্বা ঝুলঝাড়ু দিয়ে মুছিয়ে দিতাম তার মালিন্য ও অবহেলার ক্ষতগুলো। অপাংক্তেয় বালকদের দলে আমারও একটা সম্মানের আসন ছিল। কিন্তু ছুটির অবকাশে তারা ছিটিয়ে ছড়িয়ে পড়তো নানাদিকে। আমার অভিন্ন-হৃদয় বন্ধু ছুটির একমাস তার মামার কাছে নেপাল অবধি বেড়াতে চলে গিয়েছিল। সেবার রাজা মহিষবলির আয়োজন করে-ছিলেন।

কোনো ঐতিহাসিক কারণেই হয়ত রাজবাড়ির পুজোকে বলা হত দেবীপুজো। রাজারা ছিলেন ঘোর শাক্ত। অর্থাৎ তাঁদের পুজোমণ্ডপে নরবলি বাদে বাকি সর্বপ্রকার জীবহত্যা শাস্ত্রসম্মতভাবে অনুষ্ঠিত হত। যদিও শুনেছি দূর অতীতে নাকি ঐ প্রাসাদের নরনিধনযজ্ঞে সারা দেশ নেমন্তন্ন খেত। এমনই ছিল সে-সামন্ত-দের খ্যাতি ও নৃশংসতা। আমার ছেলে-বেলাতেও লক্ষ্য করেছি, দেবীপুজোর নামে হাটেবাজারে রীতিমতো চাঞ্চল্য ও উত্তেজনা। দিবারাত রক্তগঙ্গা বইতো উঠোনে। একপাশে ছিল নিরামিষ বলির আয়োজন। কদু লাউ ইত্যাদি টুকরো হত সেখানে। অন্যত্র ব্যবস্থা ছিল পশুপাখি উৎসর্গের। পুজোর প্রতি-দিন সর্বক্ষণ—ইংরেজিতে যাকে বলে রাউণ্ড দ্য ক্লক—এই নারকীয় দৃশ্য দেখার জন্য লোক ভেঙে পড়তো। ইতিহাসের বইতে পড়েছি, ফরাসী বিপ্লবের সময় এত নাগরিককে গিলোটিনে কাটা হয় যে, প্যারিসের অত্যুৎসাহী ব্যবসায়ীরা ছোটো ছোটো খেলনা গিলোটিন বিক্রি করে প্রচুর অর্থ উপার্জন করেছিলেন। আমার ছেলে-বেলায় দেখেছিলাম গ্রামের বৌ-মেয়েরা আঁচলে চাপা দিয়ে নিয়ে আসছে ঘুঘু বা কবুতর ঐ পুজোমণ্ডপে। সেদিনের জন-প্রিয় মহিষবলি আমি স্বচক্ষে দেখিনি, কেননা আমার রুচি ছিল ভিন্ন। কিন্তু তার চিত্রময় বর্ণনা শুনেছি। মহিষটিকে ঘণ্টার পর ঘণ্টা দৌড়ঝাঁপ করানো হত।

[illegible] গাড়ে মাখানো হয় এককালতি গব্য-ঘৃত যাকে আমাদের সংস্কৃত পণ্ডিত [illegible] বলতেন হৈয়ঙ্গবীন বা নবনীত। অস্ত্রাগারের দেয়াল থেকে খুলে নামানো হয় প্রাচীন খড়্গটি। এমনকি কলকাতা থেকে বহু খরচ করে এক বিখ্যাত [illegible]-শিল্পীকেও আনানো হয়। রাজার ছেলে বিলেতে মেমসাহেব বিয়ে করেছিলেন বলেই সে-বছর স্পেশাল উৎসবের আয়োজন করা হয়েছিল। দশ হাজার লোকের পাত পড়েছিল রাজপুরীতে।

সে রামও নেই, সে অযোধ্যাও নেই। কৃষিতান্ত্রিক আমাদের দেশ ক্রমে ক্রমে ধনতান্ত্রিক রূপ নিচ্ছে। এখন জমিদারকে কর দেওয়ার বদলে আমরা দোকানদারকে দিচ্ছি মুনাফা। রাজার বাড়িতে নিমন্ত্রণের বদলে পেয়েছি পুজো-বোনাস।

যাত্রাগানের উল্লেখ না করলে গ্রামের পুজো সম্বন্ধে কিছুই বলা হয় না। এই অনুষ্ঠানের আজকাল লোকসংস্কৃতি হিসেবে এক ধরনের মেকি সম্মান দেওয়া হয় বটে—কিন্তু আমার বাল্যকালে যাত্রাগান ছিল সর্বপ্রকার রক্ষণশীল ও প্রাচীনপন্থী মতবাদ প্রচার করার একটি জনপ্রিয় মাধ্যম। ছেলে বাবার কথা শুনে চলবে এবং বাবা জমিদারের আজ্ঞা মাথা পেতে নেবে—এমন একটি অদ্ভুত, অনুদার সমাজব্যবস্থার দালাল ছিল যাত্রার উদ্যোক্তারা। যথেষ্ট কুসংস্কারের বীজ রোপিত হয়েছিল সে আমলে তথা বাংলার গ্রামে গ্রামে। আজ মনে পড়ে—এই অভিনয়ে সবচেয়ে অপ্রিয় চরিত্র ছিল বিবেক—যে হা-হা শব্দে তান ধরলেই অপ্রাপ্তবয়স্করা বিড়ি ফুঁকতে উঠে যেত এবং বৌলোকেরা বাচ্চাদের মুখে স্তন তুলে দিতেন।

শরৎকালে মানুষের মন দেশভ্রমণের জন্য উৎসুক হয়ে ওঠে—এমন একটি দুর্লভ সংস্কৃত শ্লোক হামেশা শোনা যায়। এই সময় দেশভ্রমণের মতো অবিমৃষ্যকারিতা আর কী হতে পারে। পশ্চিমবঙ্গের রূপ এখন যথার্থই মনোরম। তাকে অগ্রাহ্য করে হিল্লি-দিল্লি যাওয়া অর্থহীন। উত্তরবাংলায় প্রথম শিশির পড়তে শুরু করেছে, অনুমান করি, দক্ষিণ বাংলায় নদীর চর কাশফুলের মেলা, ভোজনবিলাসীর জন্য হয়ত সদ্যধরা মাছটি অকল্পনীয় সস্তায় বিকোচ্ছে ঐ নদীতীরে। চা-বাগান থেকে নতুন ফসল আনারও সময় হল। সময় হল নতুন চাল বাজারে আসার।

আমাকেও বাধ্য হয়ে, শরৎকালীন পর্যটনধারায় নেমে পড়তে হয়েছিল। সেকালে যে-কোনো ভ্রমণই ছিল শরতে [illegible]। কিন্তু আমরা [illegible] [illegible] বিরক্ত হয়ে ফিরে আসতাম। হোটেল-ওয়ালাদের মনে হত গলাকাটা ডাকাত। টাঙাওয়ালাদের মনে হয়েছিল গাঁটকাটা চোর। ভ্রমণে আমাদের হৃদয়ের এমনই প্রসার হত। বাঙালীর প্রাদেশিকতার কারণ বুঝি বা অন্য প্রদেশবাসীদের সঙ্গে তার অসময়ে সাক্ষাৎ।

আসলে, আমাদের দেশভ্রমণের সঠিক কোনো অভিপ্রায় কখনো থাকতো না। বহু অনিশ্চিত ঘটনার উপর নির্ভর করতো দৈনন্দিন আয় ও তার উদ্বৃত্ত বন্টন। ধান কেমন হবে, বৃষ্টি কত হল, গৃহপালিত গরু-মহিষের কেনাবেচা সম্ভব কিনা, আদালতে মামলা-মোকদ্দমার হাল কী রকম ইত্যাদি নানাবিধ সামাজিক ও সাংসারিক দায়িত্ব কাঁধে সর্বদা মামদোর মতো চেপে থাকতো। এতদসত্ত্বেও, আমরা কম কিছু দেশ দেখিনি। চলে গেছি কাশ্মীরে, একদা দক্ষিণ ভারতে, সিংহল বেড়িয়ে আসার কথাও উঠেছিল সেবার। শেষ মুহূর্তে টিকিট কেনা, ঘুষ দেওয়া, টেলিগ্রাম করা—তারপর জামাকাপড়, বিছানা-বাক্স বেঁধে রণক্লান্ত আমরা যখন হাওড়া স্টেশনে দূরগামী নৈশ ট্রেনে চড়ে বসতাম, তখন কেবলই মনে হত ঐ বুঝি শেষ যাত্রা। এ কারণে নিতান্ত ট্রাংকে ভর্তি ধার-করা গরম জামাকাপড়, সপ্তাহের উপযুক্ত রেশন, এঁর পানের ডিবে, ওঁর তামাক খাবার সরঞ্জাম। বিদায়কালে যা চোখে পড়তো, তাই ভাবতাম অপরিহার্য। ফলে, এই ভ্রমণে কোনো মানসিক শান্তি ছিল না এবং ছিল না তার পরিপূরক আনন্দ উপভোগের মতো উদাসী বিশ্রাম। আশ্চর্যের কথা, প্রতিবার দেশে ফিরে এসে খবর পেতাম, যেখানে বেড়াতে গেছি, সেখানেই ঘটে গেছে কোনো-না-কোনো বিপর্যয় বা গোলমাল। অথচ, আমরা তার কিছুই দেখিনি। একবার সিমলা থেকে আগ্রা বেড়াতে গেলাম। পথে অপর লাইনে বিরাট একটি ট্রেন দুর্ঘটনা ঘটেছিল। কিন্তু রাতের অন্ধকারে আমাদের ঘুম ভাঙেনি। গেলাম পাঞ্জাবে, সেখানে নাকি দাঙ্গা চলছে। অথচ আমরা দিব্যি অক্ষত বেড়িয়ে এলাম। পুরীর ঐতিহাসিক ঝড় গায়ে লাগলো না, অথচ আমরা অতদিন কাটিয়ে এলাম সে-সমুদ্রতীরে। ফলে, গ্রামে ফিরে এসে, মুখরক্ষার জন্য বন্ধুদের কাছে বানিয়ে বানিয়ে যে চাঞ্চল্যকর প্রত্যক্ষদর্শী মিথ্যাগুলি বলেছিলাম, তার ভিতরেই ছিল, আজ সলজ্জে স্বীকার করি, আমার প্রথম সাহিত্য-প্রচেষ্টা।

সংকোচেরই বা কী আছে? আজো তো বাংলা সাহিত্যে দেখি [illegible] সমালোচককে আত্মরক্ষার জন্য সাজতে হয়েছে ভণ্ড বিদগ্ধ, প্রবীণ ঔপন্যাসিককে পরতে হয়েছে তথাকথিত আধুনিকতার ছদ্মবেশ এবং বিস্ময়বুদ্ধিসম্পন্ন কবিকে মিথ্যা চীৎকার করে বলতে হচ্ছে আমি উচ্ছৃঙ্খল।

খেলা

ভারতীয় ক্রিকেট দলের সফর

বিষেণ সিং বেদীর নেতৃত্বে ভারতীয় ক্রিকেট দল তিন মাসব্যাপী ক্রিকেট সফরের উদ্দেশ্যে অস্ট্রেলিয়ার মাটিতে পদার্পণ করেছে। দলের ষোলজন খেলোয়াড়ের মধ্যে একমাত্র ভরত রেড্ডি এখনও ভারতের পক্ষে কোন টেস্ট ম্যাচ খেলেন নি। বর্তমান দলে সব থেকে বেশী (৫৩টি) টেস্ট ম্যাচ খেলেছেন অধিনায়ক বিষেণ সিং বেদী। এর পর চন্দ্রশেখর ৪৫, প্রসন্নর ৪০ এবং বিশ্বনাথের ৩৮টি টেস্ট ম্যাচ খেলা উল্লেখযোগ্য। টেস্ট ক্রিকেটে ২০০০ রান পূর্ণ করেছেন এমন খেলোয়াড় বর্তমান দলে আছেন এই দুজন—গাভাস্কার (২৭৭৬ রান) এবং বিশ্বনাথ (২৬৮১ রান)। টেস্টে সেঞ্চুরী করেছেন মাত্র এই চারজন—গাভাস্কার (১০টি), বিশ্বনাথ (৫টি), এস অমরনাথ (১টি) এবং ব্রিজেশ প্যাটেল (১টি)। টেস্টের এক ইনিংসের খেলায় সর্বোচ্চ রান—সুনীল গাভাস্কারের ২২০ রান, বিশ্বনাথের ১৩৯ রান, সুরীন্দর অমরনাথের ১২৪ রান এবং ব্রিজেশ প্যাটেলের নট আউট ১১৫ রান। অস্ট্রেলিয়া সফরকারী বর্তমান ভারতীয় দলে আছেন বিশ্বের খ্যাতনামা এই চারজন স্পিন বোলার—বেদী, চন্দ্রশেখর, প্রসন্ন এবং ভেংকট-রাঘবন। এই চারজন মিলে টেস্ট খেলায় মোট উইকেট পেয়েছেন ৭০১টি—বেদী ২১৫ উইকেট চন্দ্রশেখর ১৯৪ উইকেট, প্রসন্ন ১৮১ উইকেট এবং ভেংকটরাঘবন ১১১ উইকেট। অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে আসন্ন টেস্ট খেলায় ভারতীয় দলের আক্রমণের প্রধান সহায়ক হবে তাদের বিশ্ববিখ্যাত স্পিন বোলিং। এখানে উল্লেখ্য, আন্তর্জাতিক টেস্ট খেলার আসরে ভারতের বিগত ৪৮টি টেস্ট খেলায় ফলাফল দাঁড়িয়েছে—ভারতের জয় ১৬ এবং পরাজয় ১৮। ভারতের এই যে ১৬টি খেলায় জয়, তার মধ্যে ১৫টি খেলায় ভারতকে জিতিয়ে দিয়েছেন স্পিন বোলাররা। বর্তমান ভারতীয় দলে অভিজ্ঞ মিডিয়াম ফাস্ট বোলার আছেন এই তিনজন—ঘাউড়ি, মদনলাল, এবং মহীন্দর অমরনাথ। টেস্ট খেলায় উইকেট পেয়েছেন—মদনলাল ২০টি, ঘাউড়ি ১৯টি এবং মহীন্দর অমরনাথ ১০টি।

অস্ট্রেলিয়া সফররত ভারতীয় ক্রিকেট খেলোয়াড়দের গড় বয়স ২৬। দলের বয়োজ্যেষ্ঠ প্রসন্নর বয়স ৩১ বছর।

তিন মাসের অস্ট্রেলিয়া সফরে ভারতীয় দলটি এইভাবে মোট ২০টি ম্যাচ খেলবে—৫টি পাঁচ দিনব্যাপী টেস্ট ম্যাচ, ৯টি চার দিনব্যাপী খেলা, ২টি তিন দিন-ব্যাপী খেলা, একটি দু দিনব্যাপী খেলা এবং ৬টি এক দিনব্যাপী খেলা। ২রা নভেম্বর এডিলেডের নিকটবর্তী পোর্ট লিনকোয়েনে এক দিনব্যাপী খেলা দিয়ে ভারতীয় ক্রিকেট দলের ১৯৭৭-৭৮ সালের অস্ট্রেলিয়া সফর শুরু হবে।

অস্ট্রেলিয়া সফরকারী বর্তমান ভারতীয় ক্রিকেট দলের এই চারজন খেলোয়াড় অস্ট্রেলিয়ার মাটিতে এবার তাঁদের জন্মদিন পালন করবেন — ভরত রেড্ডি (নভেম্বর ১২), ব্রিজেশ প্যাটেল (নভেম্বর ২৪), সুরীন্দর অমরনাথ (ডিসেম্বর ১২) এবং সৈয়দ কিরমাণি (ডিসেম্বর ২৯)।

ভারতের বিপক্ষে ১৯৭৭-৭৮ সালের টেস্ট সিরিজে অস্ট্রেলিয়া দলের নেতৃত্ব করবেন ববি সিম্পসন। দীর্ঘ ৯ বছর পর সিম্পসন অস্ট্রেলিয়ার টেস্ট দলে মনোনীত হলেন—শুধু খেলোয়াড় নয়, একেবারে দলের অধিনায়ক হিসাবে। সিম্পসন ৫২টি টেস্ট খেলারপর ১৯৬৮ সালে টেস্ট ক্রিকেট খেলা থেকে অবসর নিয়েছিলেন। তাঁর সময়ে বিশ্বের এক নম্বর ওপনিং ব্যাটসম্যান এবং স্লিপ ফিল্ডসম্যান হিসাবে সিম্পসনের বিশ্বজোড়া খ্যাতি ছিল। তিনি তাঁর ৫২টি টেস্ট খেলায় মোট ৪,১৩১ রান সংগ্রহ করে-ছিলেন এবং ক্যাচ ধরেছিলেন ৯৯টি।

অস্ট্রেলিয়ার গ্রেগ চ্যাপেলসহ বেশ কয়েকজন খ্যাতনামা খেলোয়াড় কেরি প্যাকারের সঙ্গে বিতর্কিত সুপার টেস্ট খেলতে চুক্তিবদ্ধ হওয়াতে অস্ট্রেলিয়ার ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ড শক্তিশালী দল গঠন করতে খুবই মুস্কিলে পড়েছেন। শেষ পর্যন্ত নবীন খেলোয়াড়দের দিয়ে দল গঠন করতে হবে। দেশের এই মহাসংকটের কথা বিবেচনা করে অস্ট্রেলিয়ার ক্রিকেট বোর্ড দেশের নবীন খেলোয়াড়দের অনু-প্রাণিত করার উদ্দেশ্যেই অভিজ্ঞ প্রাক্তন

ইডেনের নৈশ প্রহরী

অমর-ইডেন লীলাভূমি ইডেনে নয়, ক্রিকেট উদ্যান ইডেনে নিশীথ রাতে লাঠি হাতে ঘুরে বেড়ান দীর্ঘকায় একটি মানুষ। কিংসওয়ে থেকে আরম্ভ করে বাবুঘাটকে পিছনে ফেলে আকাশবাণী ভবনের পাশ দিয়ে মানুষটি হাঁটেন। মাঝে মাঝেই লাঠির ঠকঠক শব্দ করে বোঝাতে চান যে তিনি জেগে আছেন। বিটের পুলিশও এই মানুষটির জন্য নিশ্চিন্ত। দীর্ঘ সাড়ে আট বছর ধরে রাতদুপুরের ইডেনকে আগলাচ্ছেন এই ছ' ফুট লম্বা পুরুষটি। ইনি ইডেনের নৈশ প্রহরী অমর চ্যাটার্জি। কৈশোরকাল খেলাধুলোঅন্ত প্রাণ ছিল অমরবাবুর। এখন চাকরি জীবনেও কলকাতার একটি প্রধান ক্রীড়াকেন্দ্রের সম্পদ রক্ষা করার কাজ পেয়ে তিনি মহাখুশী। ইডেন ছেড়ে যেতে চান না অমরবাবু। সাড়ে আট বছরের মধ্যে ছুটি নিয়েছেন সর্বসাকুল্যে দেড় মাস। বললেন,—"ইডেন ছেড়ে আমি একদিন, দুদিনের বেশী কোথাও গিয়ে থাকতে পারি না, ইডেনের জন্য আমার মন কাঁদে, আসলে আমি বোধ হয় ক্রিকেটের এই নন্দনকাননের প্রেমে পড়ে গেছি।"

ইডেনকে যিনি এত ভালোবাসেন সেই 'অমর চ্যাটার্জি' কিন্তু আদতে একজন ফুটবলার। বালি, দক্ষিণপাড়া সম্মিলনী, হাওড়া প্রগতি সংঘের হয়ে ছোটবড় নানা ফুটবল টুর্নামেন্টে খেলতেন অমরবাবু। এ রকমই একটা আসরে খেলোয়াড় গড়ার কারিগর খিদিরপুরের ভূতনাথ বিশ্বাসের নজরে পড়লেন তিনি। ১৯৬৭ সালে ভূতনাথবাবু খিদিরপুরে নিয়ে এলেন অমরবাবুকে। ১৯৬৭ আর ৬৮ দুবছর খিদিরপুরের হয়ে প্রথম বিভাগে খেলে-ছিলেন অমর চ্যাটার্জি। রাইট হাফের পজিশানে তাঁর খেলা দর্শকদের দৃষ্টি আকর্ষণও করেছিল। '৬৯ সালে খেলার জন্যই রাজ্য সরকারের শিক্ষা (ক্রীড়া) দপ্তরে চাকরি পেলেন। প্রথম পোস্টিং ইডেনে। 'সিকিউরিটি গার্ড'। অমরবাবু ছাড়া ইডেনে আর একজন সরকারী প্রহরী আছেন শফিকল রহমান সরকার। কিন্তু দায়িত্বটা অমর-বাবুরই বেশী, কারণ শফিকল রাতে ইডেনে থাকেন না। ওঁর ডিউটি সকাল ছটা থেকে বিকেল পর্যন্ত। অমরবাবুর কোয়ার্টার ইডেনের গ্যালারির নিচে। স্ত্রী আর তিন মেয়েকে নিয়ে ওখানেই সংসার গুছিয়ে নিয়েছেন উনি। তাই অফিসিয়াল ডিউটি না থাকলেও চব্বিশ ঘন্টাই ডিউটি করেন অমরবাবু।

অমরবাবুর এখন একটি [illegible] চলছে। ফুটবল মাঠকে গুডবাই [illegible] ১৯৭০ সালে। ঐ বছরই ইস্টবেঙ্গলের জ্যোতিষ সেন-গুপ্ত অমরবাবুকে লাল-হলুদের দলে নিয়ে গিয়েছিলেন। পাওয়ার লীগে পুলিশের বিরুদ্ধে খেলায় পা ভাঙলো। ভাঙা পা-টাই কাল হল। অমরবাবু আর ফুটবল মাঠে ফিরতে পারলেন না। ফুটবলের সঙ্গে সঙ্গে ভলিবলেও হাত পাকিয়েছিলেন। চব্বিশ পরগণা জেলা দলের তো রেগুলার প্লেয়ার ছিলেন। কিন্তু সেই ভলিতেও বিদায় জানাতে হল ফুটবল মাঠের ঐ দুর্ঘটনার জন্য।

ইডেনের নৈশ প্রহরী অনেক রোমহর্ষক কাণ্ডকারখানার নায়ক। একবার গভীর রাতে একটি লরি বোঝাই করে সমাজবিরোধীরা লোহার [illegible], [illegible], হাইড্রেনের [illegible] প্রভৃতি [illegible] ইডেন থেকে। [illegible]

ক্রিকেট অধিনায়ক ববি সিম্পসনের ওপর দল পরিচালনার ভার দিয়েছেন। অস্ট্রেলিয়ার ক্রিকেট অনুরাগীরা ববি সিম্পসনের অধিনায়ক পদ লাভে রীতিমত অবাক হয়েছে। সুদীর্ঘ ৯ বছর আগে অবসরপ্রাপ্ত টেস্ট খেলোয়াড়কে যে জাতীয় মর্যাদা রক্ষার গুরুদায়িত্ব এইভাবে তুলে দিতে হবে এ কথা কেউ স্বপ্নেও ভাবেন নি। অস্ট্রেলিয়ার আজ কি দুর্দিন!

অস্ট্রেলিয়ার নবনিযুক্ত অধিনায়ক ববি সিম্পসনের মতে অস্ট্রেলিয়া সফরকারী ভারতীয় ক্রিকেট দলটি রীতিমত শক্তিশালী দল। অপর দিকে ভারতীয় ক্রিকেট দলের ম্যানেজার পলি উমরিগড় বলেছেন, কেরি প্যাকারের সঙ্গে চুক্তি করার ফলে অস্ট্রেলিয়ার টেস্ট দলে অনেক খ্যাতিমান খেলোয়াড়ের মুখ দেখা যাবে না ঠিকই, কিন্তু তাই বলে নবীন খেলোয়াড়পুষ্ট অস্ট্রেলিয়া টেস্ট দলকে দ্বিতীয় শ্রেণীর মনে করা খুবই ভুল হবে।

কিংস কাপ ফুটবল

ব্যাংককে দশম কিংস কাপ ফুটবল প্রতিযোগিতায় পাঞ্জাবের গুরুদেব সিংয়ের নেতৃত্বে ভারতীয় ফুটবল দল অংশ গ্রহণ করেছে। দলের সহ-অধিনায়ক পদ পেয়েছেন বাংলার প্রসূন ব্যানার্জি। বাংলা থেকে চারজন দলভুক্ত হয়েছেন—শ্যামল ঘোষ, বিদেশ বসু, সুরজিৎ সেনগুপ্ত এবং মহম্মদ আকবর। ভারতীয় দলের মোট খেলোয়াড় সংখ্যা ১৭।

প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহণ করেছে এই সাতটি দেশ—ভারত, দক্ষিণ কোরিয়া, থাইল্যাণ্ড, সিঙ্গাপুর, মালয়েশিয়া, ইন্দোনেশিয়া এবং ব্রুনেই।

ভারতের খেলার তালিকা: থাইল্যাণ্ডের বিপক্ষে অক্টোবর ৩০, ইন্দোনেশিয়ার বিপক্ষে নভেম্বর ২, দক্ষিণ কোরিয়ার বিপক্ষে নভেম্বর ৪, ব্রুনেইয়ের বিপক্ষে নভেম্বর ৬, সিঙ্গাপুরের বিপক্ষে নভেম্বর ৮ এবং মালয়েশিয়ার বিপক্ষে নভেম্বর ১০।

সরদেশাই বেনিফিট ম্যাচ

আমেদাবাদে বল্লভভাই প্যাটেল স্টেডিয়ামে ভারতীয় প্রাক্তন টেস্ট ক্রিকেট খেলোয়াড় দিলীপ সরদেশাইয়ের সাহায্যে আয়োজিত তিন দিনের খেলায় পতৌদির একাদশ দল ৭৮ রানে ভারতীয় দলকে পরাজিত করে। পতৌদির একাদশ দলে পাকিস্তানের সাদিক মহম্মদ, সফররাজ নওয়াজ এবং নিউজিল্যাণ্ডের গ্লেন টার্নারের যোগদান বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

প্রথম দিনের খেলায় পতৌদির একাদশ দল ৮ উইকেটে ৪১৫ রান তুলে প্রথম ইনিংসের খেলার সমাপ্তি ঘোষণা করে। দলের পক্ষে সর্বোচ্চ রান করেন গ্লেন টার্নার—৯২ রান। খেলার বাকী সময়ে ভারতীয় দল এক উইকেট খুইয়ে ২৪ রান করে।

দ্বিতীয় দিনে ভারতীয় দল প্রথম ইনিংসের ২৮৯ রানের মাথায় (৯ উইকেটে) খেলার সমাপ্তি ঘোষণা করে। সুরিন্দর অমরনাথ সেঞ্চুরী করেন (১০৪ রান)। তিনি ১২টা বাউণ্ডারী এবং চারটে ওভার বাউণ্ডারী করেছিলেন। দ্বিতীয় দিনের খেলার বাকী সময়ে পতৌদির একাদশ দল ২ উইকেট খুইয়ে ১২১ রান করেছিল। দ্বিতীয় দিনের খেলায় প্রায় ২৫ হাজার দর্শক সমাগম হয়।

শেষ তৃতীয় দিনে পতৌদির একাদশ দল তাদের দ্বিতীয় ইনিংসের ২২০ রানের মাথায় (৩ উইকেটে) খেলার সমাপ্তি ঘোষণা করে। অপর দিকে ভারতীয় দলের দ্বিতীয় ইনিংস ২৭১ রানের মাথায় শেষ হলে পতৌদির একাদশ দল ৭৮ রানে জিতে যায়।

সংক্ষিপ্ত স্কোর

পতৌদির একাদশ: ৪১৫ রান (৮ উইকেটে ডিক্লেয়ার্ড। গ্লেন টার্নার ৯২, দিলীপ সরদেশাই ৪০, এম এল জয়সীমা ৬৬, মনসুর আলী ৫০, সফররাজ নওয়াজ ৪৬ এবং মহেন্দ্র সিং নট আউট ৫১ রান। চন্দ্রশেখর ৩৯ রানে ৩ উইকেট)।
ও ২২০ রান (৩ উইকেটে ডিক্লেয়ার্ড। নওয়াজ ৪০ এবং সাদিক ১০০ নট-আউট)।

ভারতীয় দল: ২৮৯ রান (৯ উইকেটে ডিক্লেয়ার্ড। অংশুমান গাইকোয়াড় ৭৮ এবং সুরিন্দর অমরনাথ ১০৪ রান। নওয়াজ ৩৭ রানে ২, দুররানী ৭৩ রানে ২ এবং পরমলা ৫৬ রানে ২ উইকেট)।
ও ২৭১ রান (বিশ্বনাথ ৬৩ এবং ব্রিজেশ প্যাটেল ৭৯ রান। জয়সীমা ৭৪ রানে ৩ উইকেট)।

দর্শক

আসত। মালপত্র লোপাটে ওঠাবার সময় যাদুঘরটি দূর থেকে নজরে পড়তো অমরবাবুর। কিন্তু সংখ্যায় তো শুধুমাত্র একটা প্রাণ, কি করা যায়! চকিতে একটা বুদ্ধি খেলে গেল অমরবাবুর মাথায়। ইডেনের মালীদের ডেকে হই হই করতে করতে ছুটলেন ওদের দিকে। আকস্মিক এই আক্রমণের জন্য ওরা প্রস্তুত ছিল না। ফলে সেদিন পালালো সমাজবিরোধীদের দলটা। অমরবাবু সেই মালপত্র সমেত জমা দিলেন হেস্টিংস থানায়।

শুধু একবার নয়, প্রায় আট দশবার ঠেলা ভর্তি চোরাই মালপত্র উদ্ধার করেছেন অমরবাবু। চোরেরা আসতো অনায়াসে পাঁচ ফুট উঁচু পাঁচিল ডিঙিয়ে গেট টপকে। প্রাত্যহিক রোঁদে বেরিয়ে চোরেদের ঠেলা ভর্তি মাল দেখতে পান অমরবাবু। পুলিশের সাহায্যে দু একবার চোরও ধরেছেন তিনি।

এর জন্য জীবন বিপন্নও হয়েছে কয়েকবার। বাবুঘাটের "ল্যাণ্ডমাস্তান" হুমকি দিয়েছিল প্রাণনাশের। একবার তো তরওয়াল নিয়ে রাতে অমরবাবুর কোয়ার্টারেও চড়াও হয়েছিল। চেঁচামেচিতে ইডেনের মালিরা এসে যাওয়ায় সে যাত্রায় বিপদ কিছু হয় নি। আরো বেশী বিপদের আশংকা করে থানার সরকারের কাছে অমরবাবু একটি গুপ্তি এবং টর্চের জন্য আবেদন জানিয়েছেন। সেই আবেদন আজও মঞ্জুর হয় নি। সাড়ে আট বছরে প্রায় পঁচিশ-তিরিশ হাজার টাকার সরকারী সম্পত্তি চোরেদের হাত থেকে উদ্ধার করেছেন অমরবাবু। এর জন্য রাজ্য সরকার তাঁকে ১৯৭৬ সালের জানুয়ারী মাসে দুশো টাকার সম্মানসূচক একটি আর্থিক পুরস্কার দিয়েছেন। পুরস্কারের প্রসঙ্গ উঠতেই অমরবাবু তাঁর আর একটি দুঃসাহসিক কাজের কথা বললেন। এর জন্য তিনি ওয়েস্ট বেঙ্গল ফায়ার সার্ভিসের ডাইরেক্টর জেনারেল সুভাষ চ্যাটার্জির কাছ থেকে একশো পঞ্চাশ টাকার নগদ অর্থ পুরস্কার এবং মানপত্র পেয়েছিলেন। ঘটনাটি ১৯৬৩ সালের। আমহার্স্ট স্ট্রিটের শারদ সঙ্ঘের দুর্গাপূজো মণ্ডপে আগুন লেগেছিল। অমরবাবু তখন জীবনের ঝুঁকি নিয়ে আগুন নিভিয়েছিলেন। তাঁর চেষ্টাতেই রক্ষা পেয়েছিল একটি গোটা বস্তি।

ইডেনের খুঁটিনাটি সবকিছু অমরবাবুর নখদর্পণে। এমন কি আশেপাশের সমাজবিরোধীদের "চেনাশোনাও" তাঁর চেনা হয়ে গেছে। ইডেনকে চুরির হাত থেকে রক্ষা করাটা এখন অমরবাবুর কাছে একটা চ্যালেঞ্জের মত। বিহারের ক্রিকেটার দলজিত সিং অমরবাবুর সাহসের গল্প শুনে ওঁকে টাটায় চাকরি দিতে চেয়েছিলেন। শৈলেন মান্না নিয়ে যেতে চেয়েছিলেন জিওলজিক্যাল সার্ভেতে। অমরবাবু রাজী হননি। ইডেনের সঙ্গে যে তাঁর নাড়ীর টান। চাকরিটাকেই ভালোবেসে ফেলেছেন ইডেনের এই নৈশ প্রহরী। অমরবাবুর দুঃখ শুধু একটাই,—"জানেন, যখন টেস্ট ম্যাচ খেলা হয় তখন ইডেনের মধ্যে কোয়ার্টার হলেও খেলা দেখতে পারি না। ডিউটি থাকে। তখন তো চুরির সম্ভাবনাও বেশী থাকে। পুলিশ থাকলেও আমার ডিউটি তো আমাকেই করতে হবে।"

অমরবাবুর স্ত্রী আরতি দেবীও এই নৈশ প্রহরীর সঙ্গে থাকতে থাকতে সাহসী হয়ে উঠেছেন। ওঁদের তিন মেয়েও চোর-ডাকাতকে ভয় পায় না। ওরা পড়ছে রানী রাসমণি স্কুলে। ইডেনে গ্যালারির তলায় নৈশ প্রহরীর সংসারে সমৃদ্ধি না থাক, সুখ আছে। অমরবাবু পরিচিত জনদের এখন শুধু একটা কথাই বলেন,—"মরণের সঙ্গে খেলা করে আমি বেঁচে আছি, এ খেলার আনন্দ আছে, আমি এই খেলাকে ভালোবেসে ফেলেছি।"

জয়ন্ত চক্রবর্তী

আপে। আরেকটি দৃশ্যও অভিনব, যেখানে পার্শ্ব-নায়িকা আয়নায় নিজের মুখে বসন্তরোগের চিহ্ন কল্পনা করে ভয়ে চেঁচিয়ে উঠেছেন। এইরকম আরও কিছু আছে। যেমন ছায়া দেবীর গান গাইবার দৃশ্যের শট কমপোজিশন। ক্যামেরার সামনে থেকে গাড়ি চলে যাবার পর মিডলং শটে সন্ধ্যা রায়ের উচ্ছ্বাস।

তবে ছবিতে কিছু কাঁচা ব্যাপারও রয়ে গেছে। যেমন ছবি শুরু হয়েছে কালী বন্দ্যোপাধ্যায়কে ঘিরে। মাঝে রঞ্জিৎ মল্লিক অকারণ প্রমিনেন্স পেয়েছেন। আবার শেষে সবকিছু ছাপিয়ে উঠেছেন ছায়া দেবী। কোনো একটি দৃশ্যে চোরকে টাকাকড়ি, ঘড়ি, চাকরি দিয়ে নায়ক হঠাৎ মহাপুরুষ বনে গিয়েছেন। আর এক জায়গায় সুব্রত সেন ও ফ্যামিলির চারপাশে স্যুটিং দেখবার জন্য জনতা ভিড় করেছে। তবে চলতি বছরে বাংলা ছবির যা বহর, সেই তুলনায় এ-ছবি কিছুটা ভাল।

মূলগতভাবে অভিনয়ে প্রত্যেকেই কুশলী। তবু মান অনুসারে শিল্পীদের তিন ভাগে সাজান চলে। প্রথম ভাগে রয়েছেন একা অনবদ্য ছায়া দেবী। দ্বিতীয় ভাগে কালী বন্দ্যোপাধ্যায়, সন্তোষ দত্ত, সুমিত্রা, সিদ্ধা সেন ও অনুপকুমার। আর শেষের ভাগের শিল্পীরা হলেন—রঞ্জিৎ মল্লিক, বিপ্লব চ্যাটার্জি, তপতী ব্যানার্জি, বনানী, সুলেখা, সিপ্রা মিত্র এবং সন্ধ্যা রায়। রাজেন সরকারের সংগীত কিছু জায়গায় ভাল লেগেছে। যেমন জনৈকা বোর্ডারের বিদায় দৃশ্যের নেপথ্যে আহীর ভৈঁরোর সুর। ফটো দেখবার সময় হঠাৎ আবহ থেমে যাওয়া। 'আমি তোমার সঙ্গে' রবীন্দ্রসংগীতটির অভিনব ব্যবহার। বিশেষ করে পরের বারে (কণ্ঠ—হেমন্ত, সুচিত্রা ও সুমিত্রা)। এছাড়া আরতি মুখোপাধ্যায়ের ভজনটিও শুনতে বেশ ভাল লাগে।

চিত্রনাট্য ও সম্পাদনা আর একটু ভাল হলে ছবি আরও জমত।

অসিতবরণ মিত্র

প্রণয় বাসু চ্যাটার্জীর স্টাইলে

জনজীবন থেকে মুখ সরিয়ে যখন কোন শিল্পী মানবমানবীর শুধু জোলো প্রেমপর্ব নিয়েই ব্যস্ত হয়ে পড়েন, তখন তাঁকে 'পলায়নী' আখ্যা দিলে অন্যায় হবে না নিশ্চয়ই। উপরন্তু সেই শিল্পীর যদি শিল্প-মাধ্যমটির ওপর দখলী ক্ষমতা ঈর্ষাজনক হয়, তাহলে তাঁকে আজও কিছু বিশেষণে বিভূষিত করাও যেতে পারে।

রজনীগন্ধা, ছোটিসি বাত, চিতচোর—পূর্বেকার এই তিনটি ছবিতেই পরিচালক বাসু চ্যাটার্জি প্রমাণ করে দিয়েছেন, দর্শকের চোখ ভোলাতে তিনি পি সি সরকার, কিন্তু বোধ ও বুদ্ধির দরজায় যেতে অপারগ। সুতরাং তাঁর নতুন সৃষ্টি 'প্রিয়তমা' বাঞ্ছিত পথে একই সরলরেখায় এগিয়েছে। দর্শকের মস্তিষ্ককে বোধহয় তিনি এই আকালের বাজারে আর পীড়িত করতে চান না। ক্ষণিকের চোখ ভোলানো-তেই তিনি সন্তুষ্ট।

এবং সেজনাই তিনি জীতেন্দ্র-নীতু সিং-কে এক অস্বাভাবিক ও অসামাজিক মানসিক টানাপোড়েনে কাটাতে বাধ্য করেছেন। প্রেমের আরেক নাম আণ্ডারস্ট্যাণ্ডিং বলেই আমরা জানি। সেই প্রেম করে বিয়ে হবার পরও দুজনের মধ্যে এত মিসআণ্ডারস্ট্যাণ্ডিং কেন? তাও প্রায় বিনা অজুহাতে। বহিরঙ্গের ত্রুটিগুলোও সুপাচ্য নয়।

টি ভি-র প্রোডিউসার রবিকে কর্ম-ক্ষেত্রে প্রতিবারই কতগুলো ফাইল দেখা ছাড়া কোনো কাজ করতে দেখা গেল না। বারোশ টাকা মাইনের চাকুরের স্ত্রী যেসব অভ ডিজাইনের জামাকাপড় পরেছে, তা বোম্বাইয়ের মত শহরে কি করে সম্ভব বাসুবাবুই বলতে পারেন।

জীতেন্দ্র আর নীতুর মধ্যে যে ভুল বোঝাবুঝি, তার কারণটা এত অলৌকিক কেন? স্বাভাবিকভাবেই উৎপল দত্তের বুদ্ধি ও ব্যবস্থায় জীতেন্দ্র-নীতু শেষ মুহূর্তে অবশ্যই মিলিত হয়েছে, হতেই হবে। নইলে আর ছবি করা কেন। কিন্তু

নীলাম

১২ই সি. রাসেল স্ট্রীটে যখন পৌঁছই, ততক্ষণে নীলাম শুরু হয়ে গেছে। নীলাম-ঘর—মডার্ন একসচেঞ্জ। দিনটি রবিবার ১৪ই সেপ্টেম্বর। উঁচু প্ল্যাটফর্মে চেয়ার-টেবিল পেতে বসে আছেন নীলামদার। টেবিলে উঠেছে ধূসর রঙের একটা ট্রাভেলিং স্যুটকেস। বেশ ঝকঝকে। দেখে লোভ হয়। ডাক উঠে চলেছে। স্যামসংলাস বলে এক যুবক হাঁকলেন, একশো আশি। আর একজন সঙ্গে সঙ্গে দুশো। দুশো দশ, দুশো কুড়ি—এভাবে বাড়তেই ঐ যুবক 'দুশো পঞ্চাশ' হেঁকে হাঁফ ছাড়লেন। আশপাশে তাকিয়ে দেখলেন, সবাই চুপ। উনি উঠে গিয়ে স্যুটকেসটি নিজের জিনিসের মতোই হালকা হাতে নেড়ে দেখলেন।

চারিদিকে লোকজন বসে-দাঁড়িয়ে আছেন। মহিলারা রুমাল হাতে মাঝে মাঝে ঘাম মুছছেন। চুড়ি ও শাড়ির শব্দে, সিগারেটের ধোঁয়ায় বেশ একটা উত্তেজনার আভাস পাওয়া যায়। এর মাঝে একমাত্র নীলামদারই হাল্কা চালে কথা বলছেন; মাঝে মাঝে টুকরো রসিকতাও শোনা যায়।

বোর্ড ও রেগুলেটারসহ দুটি পুরোনো সিলিং ফ্যান যখন নীলামে উঠল, নীলামদার সকলের মুখ দেখে নিয়ে বললেন, 'কত বলবো, চল্লিশ?' পান চিবোতে চিবোতে এক রোগা অবাঙালী ফ্যানের বিবর্ণতা দেখে হেসে বললেন, 'বিশ।' নীলামদার, 'না, পাঁচ টাকা বেশী। পঁচিশ। বলুন, পঁচিশ। দুটি ফ্যান সঙ্গে রেগুলেটার। দামও বেশী। বলুন কেউ' বলে নীলাম শুরু করলেন। সেই ফ্যান দুটো অবাঙালী ভদ্রলোকটি পুরো চারশো পঞ্চাশ টাকায় কিনে খুশীর মতোই হাসলেন। ততক্ষণে স্ট্যান্ড তুলে অনেকবার আঙুল চলেছে। মাথা এলোমেলো।

কোম্পানির একজনের সঙ্গে কথা হল। সাতাশ বছরের পুরোনো এই দোকান। দুঃখ করে বললেন, সাহেবরা নেই, দেশীয় রাজা-জমিদারদের অবস্থাও খারাপ। কী করে চলে, বলুন? মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের জোরেই এই ব্যবসা এখন চলছে, কারো গায়ের জোরে নয়। তবে, আগেকার মতো দামী জিনিস এখন আর এ-বাজারে আসে না।

এইমাত্র বিক্রী হল একটা ডাইনিং টেবিলসহ ছ'টা চেয়ার। ডাক উঠেছিল, সাড়ে চারশো। এক বাঙালী ভদ্রলোক নিয়েছেন। খুব সিগারেট খাচ্ছেন তিনি। ওটা কতো নম্বর সিগারেট? একটা বিদেশী আয়নার ড্রেসিং টেবিলও উনি কিনলেন মাত্র দেড়শো টাকায়।

তারপর একটা তিন খণ্ডের সোফা সেট নীলামে উঠতেই ভাবলাম, উনিই কি নেবেন? নীলামদার ততক্ষণে পাল্টে গেছে। অন্য একজন এসে বসলেন প্ল্যাটফর্মের ওপর। গলা ছেড়ে শুরু করলেন, 'একেবারে নতুন, দুশো পঞ্চাশ, টু-ফিফটি, নতুন সোফা সেট।' আশ্চর্য, তিনিই ডাকলেন, দুশো সত্তর! একটা কিওরিও ক্যাবিনেটের পাশ থেকে এক মহিলা হাঁকলেন 'তিনশো।' তিনশো কুড়ি, চল্লিশ, সত্তর, চারশো, চারশো কুড়ি, এভাবে বেড়ে যাচ্ছিল। 'চারশো তিরিশ' বলে ভদ্রমহিলাটি মুখ ঘুরিয়ে নিলেন। সারা দোকান চুপচাপ। অনেকেই ঘন ঘন সিগারেট টানছেন। হঠাৎ বাঙালী ভদ্রলোকটি উঠে সোফা সেটটা খুঁটিয়ে দেখলেন। জোরে থাপ্পর মারলেন একবার। নীলামদার ওদিকে হাঁকছেন 'চারশো তিরিশ, এনি মোর?' ভদ্রলোক সোজা দাঁড়িয়ে বললেন 'ফোর ফিফটি।' ক্রেতাদের নিঃস্তব্ধতার মাঝখানে চারশো পঞ্চাশ টাকায় ওটা তাঁরই হয়ে গেল শেষ পর্যন্ত।

একরাম আলি

নৃত্যের আসরে

ভারতবর্ষের এক ছোট্ট অঙ্গরাজ্যের নাম মণিপুর। যেখানকার কালচার সুপ্রাচীন। যেখানে অন্যান্য রাজ্যে বিদেশী কালচারের অনুপ্রবেশ ঘটেছে—সেখানে মণিপুর রাজ্যের মানুষেরা বিদেশী কালচার প্রত্যাখ্যান করে তাদের আপন ঐতিহ্য সযত্নে লালন করেছেন। অন্যান্য রাজ্যের মানুষের মনের কাছে পৌঁছনোর চেষ্টা করেছেন। সৌন্দর্যপ্রধান এদের নৃত্যপদ্ধতিতে আকৃষ্ট হয়ে আমাদের রবীন্দ্রনাথ তাঁর চিত্রাঙ্গদা, ভানুসিংহের পদাবলীতে মণিপুরী স্টাইল এনেছিলেন। রবীন্দ্রনাথ মণিপুরের সংস্কৃতির দ্বারা প্রভাবিত হন। মণিপুরও আজ রবীন্দ্রনাথের দ্বারা প্রভাবিত।

সেখানে সমস্ত বিশ্বের কাছে রবীন্দ্রনাথ একটা বিস্ময়। সারা জীবন যিনি উপহার দিয়ে গেছেন তাঁর অসমান্য শিল্প-সাহিত্য। সেই রবীন্দ্রনাথ যাদের সংস্কৃতির দ্বারা প্রভাবিত—তাদের নৃত্যকে উপলব্ধি করতে গিয়েছিলাম সম্প্রতি রঙমহলে। 'মণিপুরী নর্তনালয়' এই অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছিলেন। মণিপুরের উৎসবের সময় যে নৃত্য তারা পরিবেশন করেন, সেই নৃত্য দিয়েই এই অনুষ্ঠান আরম্ভ হয়। শেষে ভানুসিংহের পদাবলী নৃত্যনাট্য পরিবেশিত হয়। গৌরী দত্তকে ধন্যবাদ: ছোটো ছোটো মেয়েদের এত সুন্দর করে তৈরী করে নেওয়ার জন্যে। গোষ্ঠলীলাতে, 'কৃষ্ণ' ও 'বলরামে'র ভূমিকায় অপর্ণা ও নাকীল নাথের নৃত্য অনেক দিন মনে থাকবে। 'ভানুসিংহের পদাবলী'তে প্রত্যেকেই নিজস্ব নৃত্যপটুতা দেখিয়েছেন। কলাবতী দেবী, দীপা সেনগুপ্ত, কৃষ্ণ মুখার্জী, সুজাতা মুখার্জী, মধুরা দাশগুপ্তের গান ভাল, বাদ্যযন্ত্রীরাও মন্দ নয়, আলোকসম্পাতের দিকে আরো নজর দেয়া উচিত ছিল। সব মিলিয়ে অনুষ্ঠানটি স্মরণযোগ্য অবশ্যই।

তরুণ চৌধুরী

শাপমোচন

গত ১২ অক্টোবর, রবীন্দ্র সরোবর প্রেক্ষাগৃহে সংস্কৃতি নিবেদিত কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'শাপমোচন' নৃত্যনাট্য পরিবেশিত হল। প্রতিষ্ঠানটি নবীন এবং সদস্যরাও অপেক্ষাকৃত অল্পবয়স্কা। কোন কোন শিল্পীর সঙ্গীত মাধুর্য এবং নৃত্য-কুশলতা সত্যই প্রশংসনীয়। প্রথমেই উল্লেখযোগ্য অরুণেশ্বরের ভূমিকায় ইন্দ্রাণী বন্দোপাধ্যায়ের নৃত্য পারদর্শিতা, কমলিকার ভূমিকায় সোমময়ী চক্রবর্তী ভাল অভিনয় করেছেন। সঙ্গীতাংশে কুমার ভঞ্জ ও ইন্দ্রাণী মুখোপাধ্যায়ের গান প্রশংসনীয়। মধুশ্রী ও সৌরসেনের ভূমিকায় যথাক্রমে ঈশানী সেন ও চন্দ্রাণী বন্দ্যোপাধ্যায় যথাযথ। উর্বশীর নৃত্যে তুহিনা মুখার্জী চলনসই। কমলিকার সখীদের নৃত্য অপেক্ষাকৃত নিম্নমানের। দে- ভূমিকায় সখাদের নাচ উপভোগ্য। সমগ্র অনুষ্ঠানটি বিশেষ করে শেষার্ধ বেশ আকর্ষণীয়। আমরা এই নবীন প্রতিষ্ঠানকে স্বাগত জানাই।

আমি কঙ্কাবতী বলছি

আমাদের পাঁচটি ইন্দ্রিয়ের মধ্যে সব চেয়ে যেটি মূল্যবান, সৌন্দর্যচিন্তায় তার স্থান কম নয়। কারণ, এই পৃথিবীর আলোক, এই খাদ, এই বহুবিধ রঙ, শরীরের যে জানালা দিয়ে আমরা পান করি, তা নিজেই আশ্চর্য সুন্দর একটি অঙ্গ। বলা বাহুল্য, আমি চোখের কথা বলছি। ব্যক্তিত্ব চোখে প্রতিফলিত হয়।

এবং বিপজ্জনকভাবে, আমাদের মনের কথা অজান্তেই ধরা পড়ে আমাদের দৃষ্টিতে। অপর ব্যক্তিটির হৃদয়ে কি খেলা করছে—বিরক্তি, না কি প্রেম, রাগ না দুঃখ না ঘৃণা, সামাজিক ভাষায় যেসব সূক্ষ্ম জিজ্ঞাসার উত্তর মেলে না, তার খাঁটি ও অবিকৃত উত্তর পাওয়া যায় চোখের ভাষায়। সেইজন্যই হয়তো নতুন মানুষের মুখমণ্ডলে সবচেয়ে আগে দৃষ্টি আকর্ষণ করে তার চোখ দুটি। চোখের স্বাস্থ্য তাই সৌন্দর্যচর্চার একটি প্রধান শর্ত।

বাঙালী মেয়েদের বাদামী ত্বক আর গাঢ় বাদামি চোখ বিশ্ব সৌন্দর্যের খাতায় নিশ্চয়ই তুলনাবিরল। কিন্তু চশমার দু টুকরো গোলাকার কাঁচের তলায় সেই শ্রী অন্তর্হিত হলে সৌন্দর্যের আলো বড় ম্লান হয়ে যায়। শুধু তাই নয়, চশমাচ্ছাদিত মুখশ্রীটি ঠেকে অতিরিক্ত কৃত্রিম। মেয়েলি দৃষ্টির যে রহস্যময়তা এতোদিন কবির চিত্ত হরে রেখেছে, সামান্য দুটি কাঁচের নিচে তা হারিয়ে যাওয়াটা দুঃসংবাদ নয় কি? চশমা বিষয়ে সুন্দরীদের সতর্ক হওয়া আবশ্যক। না কন্ট্যাক্ট লেন্স বিষয়ে কোনো ইঙ্গিত করছি না আমি। বলতে চাই চোখের স্বাভাবিক স্বাস্থ্যের কথা।

চশমা এড়াতে তো পারেনই, এমনকি বর্জনও করতে পারেন: এমন কথা বলেন ডাক্তার হ্যারল্ড পেপার্ড তাঁর 'সাইট উইদাউট গ্লাসেস' বই-এ। স্বচ্ছ দৃষ্টি বিষয়ে দীর্ঘ গবেষণা করেছেন তিনি। তাঁর মতে, যাদের দুর্বল দৃষ্টি শক্তি তাঁদের উচিত বার বার পলক ফেলা। সোজা বাংলায় যাকে বলে 'পিট পিট' করা, আরকি। এতে চোখ ধুয়ে যায়। আর ঝকঝকে হয় দৃষ্টি।

চোখে যে বিন্দুটি আসলে দেখবার কাজ করে চলেছে, তার আকার একটা আল পিনের ডগার চেয়ে বড় নয়। সুতরাং একসঙ্গে অনেকদূর অবধি দেখবার চেষ্টা করবেন না। দৃষ্টিকে একসঙ্গে অতিরিক্ত প্রসারিত করারচেষ্টা না করে (অর্থাৎ পারস্পেকটিভ না বাড়িয়ে) বস্তু বা দৃশ্যবিশেষের অংশের উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করুন। চোখের মণি যেন হয় সচল ও সহজ। কটমট করে তাকাবার বদ অভ্যেসটি পরিত্যাগ করতে হবে।

পড়ার সময়ে হাতের বইটি কিভাবে ধরা আপনার অভ্যাস? কতখানি আলোতে আপনি পড়েন, আলোটি কোথায় এবং কেমনভাবে অবস্থিত? বই ও চোখের সঠিক দূরত্ব হলো পনেরো ইঞ্চি। বইটি ধরতে হবে আলোর নিচে।

রাতে শুতে যাবার আগে সচেতনভাবে চোখকে আলগা, নরম করে এলিয়ে দিন। তা না হলে কিন্তু বন্ধ পাতার নীচে মণি দুটি প্যাট প্যাট করে তাকিয়েই থাকবে সারা রাত।

সূর্যের আলো চোখের পক্ষে অত্যন্ত পুষ্টিকর। রোদ্দুর চোখকে একইসঙ্গে 'রিল্যাক্স' ও 'স্টিমুলেট' করে। অন্ধকার প্রেক্ষাগৃহ থেকে দিনের ঝকঝকে রোদে বেরুলে আপনার চোখ বাড়ি খায় ঠিকই, তার মানে কিন্তু এই নয় যে, আপনার চোখ দুর্বল। চোখের দৃষ্টিবিন্দুটি আচমকা রোদে ছোটো হয়ে যায়। আকস্মিক আলোয় অভ্যস্ত হতে বেশ কিছুটা সময় লাগে এই বিন্দুটির। অনেক সময় প্রায় দু তিন মিনিট। অন্ধকার থেকে উজ্জ্বল আলোয় এসে প্রথম দু মিনিট, অর্থাৎ যতক্ষণ আপনার চোখের মণি তার সাইজ বদলাচ্ছে, ততোক্ষণ চোখের দৃষ্টি নিচু করে রাখলে বাড়িটা খেতে হয় না। চোখের পক্ষে এটা খুব ভালো।

আলো স্বাভাবিকভাবে সইয়ে নেবার বদলে আজকাল অনেকেই কালো চশমা ব্যবহার করেন। কালো চশমা চোখের পক্ষে অত্যন্ত ক্ষতিকর। চোখকে শক্তিশালী করার জন্য ডাক্তার হ্যারল্ড পেপার্ড একটি প্রক্রিয়া দিয়েছেন। এটি নিয়মিত অভ্যাস করলে হয়তো কালো চশমার দরকার হবে না:

আলতো করে চোখের পাতা বন্ধ করুন। সূর্যের দিকে মুখ ফেরান। চোখ বন্ধ অবস্থায় মাথা ধীরে এপাশ থেকে ওপাশে ফেরান। চার পাঁচবার মাথা এদিক ওদিক করতে হবে। এক মিনিট এই ব্যায়াম করে চোখে সূর্যের তাপ কিছুটা সয়ে যাবে। এবার মাথাটি একপাশে সরিয়ে রেখে এক মুহূর্তের জন্য চোখ খুলুন, সোজাসুজি সূর্যের দিকে না তাকিয়ে তাকান পাশ থেকে। কিছু দেখবার চেষ্টা করবেন না, চোখ খুলেই বন্ধ করতে হবে।

আত্মরক্ষার যত উপায় চোখে রয়েছে, তেমন আর কোনো ইন্দ্রিয়ে নেই। এইসব কলকব্জা ব্যবহার করতে যে শেখে একমাত্র সে—বালক রবীন্দ্রনাথের রবিচ্ছায়ার গানের নায়িকার মতো 'নয়ান সলিলে নয়ান তুলিয়া হাসিবে সুখের হাসি।'

অমৃত পাবলিশার্স প্রাইভেট লিঃ-এর পক্ষে শ্রীসুপ্রিয় সরকার কর্তৃক পত্রিকা প্রেস ১৪, আনন্দ চ্যাটার্জি লেন, কলিকাতা-৩ হইতে মুদ্রিত ও তৎকর্তৃক ১১।১, আনন্দ চ্যাটার্জি লেন, কলিকাতা-৩ হইতে প্রকাশিত।
ইণ্ডিয়ান অ্যাণ্ড ইস্টার্ণ নিউজ পেপার সোসাইটির সদস্য।
মূল্য ৭৫ পয়সা ॥ ত্রিপুরায় অতিরিক্ত বিমান মাশুল ১৫ পয়সা। ভারতের অন্যত্র অতিরিক্ত বিমান মাশুল ২০ পয়সা।

অমৃত
১৭ বর্ষ
২৭ সংখ্যা
২ অগ্রহায়ণ
১৩৮৪
18th Nov. 1977

আগামী সংখ্যায়

বঙ্কিমচন্দ্র রামকৃষ্ণকে দেখেন নি
লিখেছেন গোপালচন্দ্র রায়
সমীর রক্ষিত
এবং বরুণ চৌধুরীর গল্প
প্রচ্ছদ কাহিনী
বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়
লিখেছেন শচীন দাশ

এ সংখ্যার প্রচ্ছদ এঁকেছেন খগেন রায়
ভিতরের ছবি ও অলংকরণ করেছেন
সুবোধ দাশগুপ্ত এবং অসিতবরণ কুণ্ডু

জাতীয় গ্রন্থাগারে 'নেই'-এর রাজত্ব

জাতীয় গ্রন্থাগারের বাগান ঘেরা বাড়ির পরিবেশটি বড় শান্ত, কিন্তু ভেতরে যা ঘটছে তাকে শান্তিপূর্ণ বলা চলে না।
কেন্দ্রীয় সরকার '৭৬ সালের জুন মাসে একটি আইন পাশ করে গ্রন্থাগারটির জন্যে একজন ডিরেক্টারের পদ সৃষ্টি করেন। সেই অনুযায়ী এ বছর একজন ডিরেক্টার এসে কাজে যোগ দিয়েছেন। কিন্তু কেন্দ্রীয় আইনে আরো যেসব ব্যবস্থা ছিল তার রূপায়ণ ঘটেনি, কিম্বা অন্য কোনো যোগ্যতর ব্যবস্থারও আশা দেখা যাচ্ছে না। ফলে গ্রন্থাগারটির প্রায় এখন দ'এ মজার মতো অবস্থা।

অব্যবস্থার অভিযোগ শোনা যাচ্ছে এখন সব দিকেই। উঁচু থেকে নিচু প্রায় সমস্ত স্তরেই রীতিমত একটা ছত্রভঙ্গ অবস্থা, তাই দুর্নীতির সুযোগ এখানে এন্তার। স্বয়ং ডিরেক্টারের অভিযোগ থেকেই জানা যায়, বেশ কিছুকাল ধরে নাকি শখানেক লোক গ্রন্থাগারের মূল্যবান দলিল ও নথিপত্র নকল করে বাইরে পাচার করছিল, এবং এইভাবে দু পয়সা রোজগার করে নিচ্ছিল। না বললেও চলে, এই শেষোক্ত ব্যাপারে ভেতরের কোনো কোনো ব্যক্তিও নিশ্চয়ই বঞ্চিত থাকত না, নয়তো একাজ সম্ভবই হত না।

শুনতে অবাক লাগে, জাতীয় গ্রন্থাগারের মতো একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠানে গ্রন্থাগারিক নেই সাড়ে ছ' বছর ধরে। ভারতে প্রাথমিক শিক্ষার প্রসার সমাজের শেষ স্তর পর্যন্ত না পৌঁছালেও উচ্চশিক্ষার ব্যাপ্তি কিছু কম নয়। এহেন একটি দেশে এত দীর্ঘকাল ধরে এমন একটি পদের জন্যে যোগ্য লোক পাওয়া যায় নি তা বিশ্বাস করা শক্ত।

তাছাড়া সহকারী গ্রন্থাগারিক আছেন দুজন, অথচ পদ রয়েছে পাঁচজনের। অর্থাৎ এখানেও তিনজন যোগ্য ব্যক্তির অভাব ঘটেছে দেখা যাচ্ছে। কিন্তু এটাই শেষ নয়। এত বড় একটি গ্রন্থাগারের প্রশাসকের পদও শূন্য পড়ে রয়েছে এক বছর ধরে। প্রশাসনিক ব্যাপারে এই ধরনের অন্ধকারময় পরিস্থিতির পর বইপত্রের দিকে তাকালেও খুব যে একটা আলোর আভাস পাওয়া যায় এমন নয়।

জাতীয় গ্রন্থাগারের বইয়ের সংখ্যা ১ কোটি ৭০ লক্ষ। এর দাম ৫০ কোটি টাকা। বইগুলি ঠিকমতো বাঁধাইও করা হয় না। বছরে যেখানে ১০ হাজার বই বাঁধানো দরকার, বরাদ্দ আছে মাত্র এক হাজার বই বাঁধানোর। পত্র-পত্রিকাগুলি তো যত্রতত্র ছড়ানো-ছিটানো। সেগুলি ভালো করে বাঁধানো বা তালিকাভুক্ত করা হয় না। তাছাড়া মূল্যবান বইপত্রও ভালো করে সংরক্ষণের ব্যবস্থা নেই।

কেন্দ্রীয় সরকার যদি অবিলম্বে এদিকে দৃষ্টি না দেন, একদিন হয়তো দেখা যাবে সর্বব্যাপী এই 'নেই'-এর ছোঁয়াচে কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারও 'নেই' হয়ে গেছে।

নিশুতি রাতে বিকেলের দাগ

বয়স হয়ে গেছে—অনেককাল ঘুম ভেঙে যায় রাত তিনটেয়। তখন জানালা দিয়ে ওই পাকা ধানের হলুদ মাঠখানা জ্যোৎস্নায় ধরা পড়ে। হাত দিয়ে ঘুড়ি সাজাই। ধানখেতের টিয়ার ঝাঁক উড়ে গিয়ে পড়ে বসে। তখন বৈকুণ্ঠবাবু—আমার মনে হয়, সবে বিকেলবেলা। আসলে কিন্তু নিশুতিরাত। জ্যোৎস্নাকে বিরক্ত করার কেউ নেই। চার-চারটে কুকুর—ছাগলের বলদ আর গাইবাছুরে যে-যার মত গাছপালায় বাতাসের সরসর শব্দ শোনে। আমি তো কানে শুনতে পাই না। তাই ওদের মুখ দেখে মনে হয়—ওরা ওদের হারানো কথা ভাবছে। আপনি যেখানটায় বসে আছেন—ওখানে এক-একদিন সায়গল বসে গান গাইতেন। বাবা হাতে তালি দিতেন। পৃথ্বীরাজ কাপুর ডায়লগ শোনাতেন। বাবা বলতেন, না-না পৃথ্বি, ও-জায়গাটা এরকম হবে। বলেই বাবা নিজে সে-ডায়লগ রিপিট করতেন।

স্থান : কলকাতার বাইরে গাছপালায় ঢাকা বিশাল এক বাগানবাড়ি। কাল : এই নভেম্বরের একটি অলস দুপুর। পাত্র : একদা ভারতবিখ্যাত ছায়াছবির স্বর্গত সুদর্শন নায়কের এখন নায়ক পুত্র। শ্রোতা : বৈকুণ্ঠ। অন্যান্য উপস্থিত : দুটি অ্যালসেশিয়ান ও দুটি ল্যাব্রাডর কুকুর। একটি দুধেল গাই ও তার ইঞ্জেকশনের বাছুর। চারটি ছাগলের বলদ। পাঁচটি জামরুল গাছ। নয়টি রাজহাঁস ও দুই একর প্রমাণ একটি প্রাচীন পারিবারিক দীঘি।

দূরে পীচ রাস্তায় বাসের টায়ারে অলস বিরবির শব্দ। সামনে শীত। স্মৃতিভুক ঘাটের কাছাকাছি একজন মানুষের সামনে বসে আছি। জিজ্ঞাসা করেছিলাম, বিয়ে করেননি কেন?

আমাদের বাড়ে অনেকেই করেনি। আজ রাজপুতানা, কাল রেঙ্গুন—এই করে বেড়াতাম। আর মাঝে মাঝে বাবার সিনেমা দেখতাম। থিয়েটার দেখতাম। হরিশ্চন্দ্রে হরিশ্চন্দ্র। শ্মশানের সিনে মশালের আলো। বাবার সেকি ম্যাজেস্টিক দাঁড়ানো। পাণ্ডবগৌরবে বাবা সাজতেন মধ্যম পাণ্ডব। পি ডবলু ডি-তে মিস্টার সেন।

ওই মাদী কুকুরটার নাম রেখেছিলাম ক্লিওপেট্রা। সর্ট ডাকি ক্লিয়ো। কিন্তু ধান ভানতে এসে ভানকি মেয়েরা ওকে সরল করে ডাকে কিলো। বৈকুণ্ঠের সামনেই একজন ভানকি মেয়ে এসে বৃদ্ধ অ্যালসেশিয়ান রজার্সকে ডাকল—রজার খাবেন চলুন। আমরা খেতে বসে দেখলাম রজার্সদের শূন্য থালা পড়ে আছে। চারখানি কলাইয়ের বাঁগথালা। তাতে মোটা মোটা আই আর এইট ভাত। আর হাড়ের টুকরো।

চাষীবাড়ির একটি বালককে দেখলাম এই স্মৃতিভুক মানুষটির নয়নের মণি। পেছনে ধান শুকোতে দেওয়া রয়েছে। পাশেই গোবিন্দর। এককোণে একটি তরুণ কাঁঠালচাঁপা। বেলা তিনটে হবে। গাছে উঠে বালকটি ডাল নাড়াচ্ছিল। সম্পূর্ণ ভিন্ন জগতের এই মানুষটি তাকে সস্নেহ প্রশ্রয় দিচ্ছিলেন। আসলে অবিবাহিত পুরুষের বাৎসল্য ঝরে পড়ছিল।

কলকাতায় ওঁর সহোদরদের স্থায়ী ব্যবসা ও একাধিক পাকা বাড়ি। উনি নিজে ওখানে একটি চাষী বালকের দাদু হয়ে থাকতে ভালবাসছেন। বাতাসে ধান সেদ্ধর গন্ধ। নিজের হাতে নানা গাছের কলম বসিয়েছেন। ছোট পুকুরের বড় মাছকে এনে বড় পুকুরে দিচ্ছেন। বই খুলে গাঁয়ের লোকদের চিকিৎসাও করে থাকেন। খেজুর পাতার খোলপে পেতে জামরুলতলায় শুয়ে থাকেন। মাথার কাছে ও হেনরী আর সলবেলো—পাশেই নস্যির কৌটো। সামনে দাঁড়ানো গরুটার নাম দিয়েছেন মাঞ্চু। কারণ তার শিং জোড়া মাঞ্চুসম্রাটের গোঁফের মত বাঁকানো।

এই অবধি লিখে এখন থেমে আছি। এরকম একটি চরিত্রকে নিয়ে গল্প লিখে স্বচ্ছন্দে নাম দেওয়া যায়—রাজার বাগান। কিংবা বাগানের রাজা। বাৎসল্য, ঔদাসীন্য, অনাসক্তি, প্রকৃতি-প্রেম, শ্রদ্ধা—সব জিনিসেরই চিহ্ন এই মানুষটির ভেতর আছে। নিজের জীবন ব্যয় করে উনি মানুষকে, গাছপালাকে পশুপাখিকে ভালবাসতে গিয়েছেন। নিশুতি রাতে বিকেলবেলার চিহ্ন দেখতে পান।

ওঁকে নিয়ে প্রবন্ধ লেখা যায়। যায় গল্প লেখা। উপন্যাসও যায়। তার চেয়ে অনেক ভালো—ওঁর সঙ্গে সময় কাটানো।

বৈকুণ্ঠ পাঠক

সত্যজিৎ রায় লিখতে থাকুন

গত ১৫।৭ তারিখের অমৃত পত্রিকাতে প্রকাশিত দীপাবলী সেনের সত্যজিৎ রায়ের লেখা এই তথ্যসম্বলিত নিবন্ধ ভাল লাগলো।

চিত্রজগত থেকে চিত্রপরিচালক সত্যজিৎ রায় হঠাৎ সাহিত্যে তাঁর মনোযোগ

সত্যজিৎ রায় গুণী মানুষ। পশ্চিমবঙ্গের সিনেমা প্রদর্শন সাহিত্যে তাঁর অবদান অতুলনীয়।

দীপাবলী সেন সত্যজিৎ-এর কয়েকটি লেখা নিয়ে বলেছেন, অবশ্য আলোচনা প্রসঙ্গে সত্যজিৎ-এর সাহিত্যে পরিণত মূল্যায়ন আছে। দুঃখের সঙ্গে জানাতে বাধ্য হচ্ছি যে সত্যজিৎ-এর সব গল্প

। সায়েন্স ফিকশন্ উনি এত পড়েন ফলে তাঁর সাহিত্যে তাঁর নিজস্ব

তাঁর লেখা

গল্পগুলো পড়লেই মনে হয়

প্রফেসর শঙ্কুকে নিয়ে তাঁর যেসব পাগলাটে টুকরো সৃষ্টি হয়েছে, তাতে সত্যজিতের নিজস্ব সাহিত্যিক চরিত্র সংস্পর্শের সত্যজিৎ রায়ের লেখার মধ্যে, বিশেষ করে ছোটদের জন্য লেখাতে, জন্মগত প্রতিভার পরিচয়

বলছ, সুকুমার রায় এবং উপেন্দ্রকিশোরের লেখাকে ভুলভাবে অনুসরণ করেন। তিনি বেশ আত্মতৃপ্তির সাথে তাদেরকে

করেছেন। সাহিত্য সবার মধ্যে থাকে না। লিখলেই যদি সাহিত্যিক হোত, তাহলে পৃথিবীর সবাই একজন দিকপাল হোত।

প্রচারের প্রয়োজন হয় যখন কোন জিনিস নিম্নমান সবাই গ্রহণ করতে

জন্য। সত্যজিৎ রায় সিনেমা-শিল্প নিয়ে

তাঁর বোঝা উচিত যে রক্ত-মাংসেগড়া মানুষের মধ্যে বহুমুখী প্রতিভা সব ।

জন্যে সাধনা করতে হয়। যেমন, উপেন্দ্রকিশোর, সুকুমার, সুখলতা প্রভৃতিরা শিশু-সাহিত্যে সাধনা করেছিলেন।

এই লেখা না ছাপলেও দুঃখিত হবো না। কারণ, আমার কোন বক্তব্য অমৃত প্রকাশ করে না। সেটা তার দোষ নয়—কারণ, অমৃতকে প্রচুর চামচের আমদানি হয়েছে। বিতর্ক চাই না। সময় এলেই অমৃত সম্পাদক বুঝবেন। সত্যজিৎ রায় লিখতে থাকুন, কারণ, তাঁর

হবে লেখার মধ্য দিয়ে। দীপাবলী সেনকে বিনীত অনুরোধ জানাই যে তিনি যেন পুনর্বার সত্যজিৎ-এর লেখাগুলো আবার নতুন করে পড়েন। নিছক সময় কাটানোর জন্য নয়—লেখককে বুঝতে গেলে তাঁর লেখাগুলো বারবার পড়তে হয়। তাঁর বোঝা উচিত, সমালোচনা আর প্রচার এক নয়।

দিবাকর দত্ত

সমালোচনা

ছাপাখানা যখন এল : শ্রীপান্থ
প্রকাশক : বঙ্গ সংস্কৃতি সম্মেলন
দাম ১৮-০০

খৃস্টাব্দ ১৭৭৮। একটি অবিস্মরণীয় সাল। হেস্টিংস তখন গভর্ণর-জেনারেল। রাজকার্যের সুবিধের জন্যে নাথানিয়েল ব্র্যাসি হলহেড নামে এক সাহেব তখন একটি বই লিখলেন। বইটি ঐখানেই ছাপবার দায়িত্ব নিলেন আরেক সাহেব—সংস্কৃত পণ্ডিত এবং হলহেডের বন্ধু উইলকিনস্। সহকারী হিসেবে পেলেন পঞ্চানন কর্মকারের মত এক অসাধারণ কারিগর। এই দুই প্রতিভার মিলনে ঘটল যুগান্তকারী এক ঘটনা, হল এক অসাধ্য সাধন। হুগলি থেকে বেরুল প্রথম ছাপা বই—বাংলা ব্যাকরণ।

'যে দেশে ছাপার কর্ম চালিত না হইয়াছে সে দেশকে প্রকৃতরূপ সভ্য বলা যায় না।' এটি সেকালের খবরের কাগজ থেকে একটি উদ্ধৃতি। কথা কটির তাৎপর্য একটু খতিয়ে দেখা যাক।

ছাপার 'কল' আবিষ্কৃত হবার আগে বই, পুঁথিপত্র ইত্যাদি হাতে লেখা হত। স্বভাবতঃই সংখ্যায় হত মাত্র কয়েকটি—রাজারাজরা, বাদশাদের পাতে পড়ত। সাধারণ মানুষও দৈবাৎ ভাগ পেত। গুটেনবার্গ ১৪৫২ সালে চলমান হরফ-এর সাহায্যে যখন প্রথম বাইবেল ছাপলেন তখন তাঁর মুদ্রণ কলটি থেকে বেরুল অল্প সময়ে, একই সঙ্গে, একাধিক বই। ঘরে ঘরে পৌঁছল বাইবেল। এই আবিষ্কারের ফলে, কিছু-কালের মধ্যেই বেরুল অন্যান্য বিষয়ের বই—সাহিত্য, দর্শন, বিজ্ঞান, শিল্প, চিকিৎসা-বিদ্যা, ইতিহাস, ভূগোল—আরো কত কি! মুদ্রিত বই-এর মাধ্যমে শুধু ধর্মের প্রচারই হল না, হল মানুষের জ্ঞান, বিদ্যা-বুদ্ধির প্রসার। এক কথায়, সভ্যতার দ্রুত অগ্রগতি, হল মানসিক দিগন্তে এক নতুন সূর্যের উদয়। তার আলোয় কুসুমিত হল মানুষের অন্তরের গভীরতম গোপন কথা।

হুগলিতে ছাপা হলহেড সাহেবের ছাপা বইটি আমাদের, অর্থাৎ বাঙালীদের কাছে, গুটেনবার্গ বাইবেলের মতই, একটি বৈপ্লবিক ঘটনা। আমরা যখন খবরের কাগজ কিম্বা বইপত্র পড়ি, তখন একবারও কি ভাবি যে এটি কিভাবে 'তৈরী' হল? এবং ছাপাখানা না থাকলে আমাদের কি অসুবিধে হত? ভাবলে আতকে উঠতে হয়। জন্মাবধি ছাপা বই, পুঁথিপত্র সহজেই পেয়ে আসছি বলে আমরা ধরেই নিই যে, এ সব সাবান তেলের মত অনাদিঅনন্তকাল থেকে তৈরী হয়ে আসছে। কথাটি যে আদৌ সত্যি নয়, শ্রীপান্থ রচিত 'যখন ছাপাখানা এল' বইটি তার জাজ্বল্যমান প্রমাণ। এমন একটি বই-এর আবির্ভাবও একটা মহত্বপূর্ণ ঘটনা কারণ ইতিপূর্বে এই বাংলায় এমন বই প্রকাশিত হয় নি। যাক বইটির কথায় পরে আসছি।

ছাপার কথা

পূর্বোক্ত প্রশ্ন দুটির জের টেনে বলি যে, বই কিম্বা খবরের কগাজ কিভাবে ছাপা হয়, ছাপার অক্ষরগুলো কোত্থেকে এল, কে বানাল। লাইন ব্লক হাফটোন ব্লক, লাইনো, মোনো—এসবের মানে কি? লেটার প্রেস, অফসেট বললেই বা কি বোঝায়। শত-করা পাঁচজন লোকেদেরও এ সম্বন্ধে কোন ধারণা আছে কিনা, আমার ঘোরতর সন্দেহ আছে।

প্রতি বছর, আমার সুদীর্ঘ দিনের কর্মস্থল যাদবপুরের ইনস্টিটিউট অফ প্রিন্টিং টেকনোলজিতে ভর্তি হবার সময়, হাইস্কুল, ইন্টারমিডিয়েট এমন কি বি-এ, বি-এস-সি পাশ করা ছেলেদের এই সব প্রশ্ন করে দেখেছি। নিরানব্বুইজনেরই এ সব সম্বন্ধে বিন্দুমাত্র ধারণা নেই।

শ্রীপান্থ লিখিত যখন ছাপাখানা বইটিতে এ সবের সরাসরি কোন জবাব নেই। থাকবারও কথা নয়। কিন্তু যাঁরা মনোযোগ দিয়ে বইখানি পড়বেন তাঁরা, এ সব প্রশ্নের উত্তর পেতে যে নিতান্তই কৌতূহলী এবং আগ্রহী হবেন, সে বিষয়ে সন্দেহের অবকশ নেই।

বটতলার একটি রঙীন কাঠ খোদাই। ব্লকে ছবি ছাপার পর এতে [illegible] রঙ দেওয়া হয়েছে।

বোধপ্রকাশং শব্দশাস্ত্রং
ফিরিঙ্গিনামুপকারার্থং
ক্রিয়তে হালেদঙ্গ্রেজী

A GRAMMAR OF THE BENGAL LANGUAGE

BY

NATHANIEL BRASSEY HALHED.

ইন্দ্রাদয়োপি যস্যান্তং নযযুঃ শব্দবারিধেঃ।
প্রক্রিয়ান্তস্য কৃৎস্নস্য ক্ষমোবক্তুং নরঃ কথং॥

PRINTED AT HOOGLY IN BENGAL

M DCC LXXVIII.

হলহেডের ব্যাকরণের নামপত্র। প্রকাশ কাল ১৭৭৮—স্থান : হুগলী

যখন ছাপাখানা এল বইটি বাংলার মুদ্রণ শিল্পের চমৎকার একটি ইতিহাস। তার রোমাঞ্চকর বিবর্তনের কাহিনীটি পড়তে পড়তে মনে হয় যেন একটি সরস রূপকথার গল্প পড়ছি। যেমনি লেখার স্টাইল, তেমনি ঘটনা প্রবাহের নাটকীয় উন্মোচন। একটি তথ্য সম্বন্ধ এবং আপাতদৃষ্টিতে শুষ্ক বিষয়কে পাঠকদের সামনে এভাবে পরিবেশন করায় শ্রীপান্থের বাহাদুরী প্রথম সারির কাহিনী-কারদের চাইতে কম কিসের। নীচের উদ্ধৃতিটি পড়ে দেখুন।

....'শ্রীরামপুরের মিশনারীর কোলব্রুককে ধরে পড়লেন—আমরা পঞ্চাননকে চাই। দাবি নয়, কাতর আবেদন। আবেদনের পর আবেদন। কিন্তু কোলব্রুক অনড়। শ্রীরামপুর থেকে সাহেবরা তখন সরাসরি চিঠি লিখলেন পঞ্চাননের কাছে। চিঠির বক্তব্য— তোমাকে বেশী মাইনে দেব পালিয়ে এসো। কিন্তু [illegible] পঞ্চাননের কোনও উৎসাহ দেখা গেল না। কেরী বাধ্য হয়েই আবার কোলব্রুকের শরণাপন্ন হলেন। এবার তাঁর আবেদন—আমরা খুবই বিপদে পড়েছি। অনুগ্রহ করে অন্তত দিন কয়েকের জন্য পঞ্চাননকে ছাড়ুন। কোলব্রুক এবার আর প্রত্যাখ্যান করতে পারলেন না। তিনি পঞ্চাননকে কদিনের জন্যে ছুটি দিলেন। বললেন—একবার শ্রীরামপুর ঘুরে এস। সেই যাওয়াই অনন্ত যাত্রা। পঞ্চাননের আর ফেরা হল না শ্রীরামপুর থেকে। কোলব্রুক অনেক চেষ্টা করলেন তাঁকে মুক্ত করতে। তিনি ভারত সরকারের কাছে আর্জি পেশ করলেন। কিন্তু কেরীও ওদিকে নিজেরা সরকারকে নামিয়েছেন আসরে। আন্তর্জাতিক কূটনৈতিক লড়াই এক বাঙালী কারিগরকে নিয়ে। কেরীর সওয়াল ছিল নাকি—কলকাতার ইংরেজদের কোন অধিকার নেই এমন একজন কারিগরের ওপর একচেটিয়া অধিকার বহাল করেন। মনোপলি [illegible]

ছাপার চমৎকারিত্ব ত আছেই। তাছাড়া আছে কাব্যিক প্রতিমা—ইংরাজিতে আমরা যাকে বলি পোয়েটিক ইমেজারি। যেমন—'কেরী যে কাঠের ছাপাখানাটি নিয়ে বাংলা-দেশের স্তিমিত হৃদপিণ্ডে হঠাৎ সেদিন স্পন্দন বাড়িয়ে তুলেছিলেন।' কিম্বা 'এ বিষয়ে কোন বিতর্ক নেই যে, আমাদের মুদ্রণ এবং প্রকাশন শিল্পের ইতিহাসে শ্রীরামপুর এক আলোক মিনারের মত।' পাতায় পাতায় ছড়িয়ে আছে এসব লাইন।

বইটি দুটি অংশে বিভক্ত। প্রথমটিতে বাংলায় ছাপাখানা আসার ইতিহাস; দ্বিতীয়টিতে আছে প্রাসঙ্গিক আরো কিছু খবরাখবর। শেষোক্তটিতে এখানকার ছাপাখানার উদ্ভব সম্পর্কিত যাবতীয় তথ্যের প্রাচুর্য। গ্রন্থকার বই-এর শুরুতেই বলেছেন,....'যথার্থ গবেষক বলতে যা বোঝায়—আমি ঠিক তা নই। দ্বিতীয়ত এ বিষয়ে আমার যোগ্যতাও সীমাবদ্ধ।' দ্বিতীয় অধ্যায়টি পড়ে গ্রন্থকারের এ উক্তিটি মেনে নেওয়া কঠিন। সংখ্যার পৃষ্ঠা (১৩৬ পাতার টেক্সট) কম হলেও বহু দিনের অধ্যবসায়, মুদ্রণ শিল্পে প্রীতি এবং চিন্তার যোগফল।

তাছাড়াও বইটিতে আছে ৪৪ পাতার ছবি, আর্ট পেপারে ছাপা। বাংলা হরফের বিবর্তন থেকে নিয়ে সেকালের খবরের কাগজ, বই-এর পৃষ্ঠা এবং কাঠ ও মেটালে খোদিত পুরানো নানা বই-এর ব্লক। টেক্সট এবং ছবি—এ দু-এরই ছাপা পরিচ্ছন্ন এবং ঝকঝকে। পূর্ণেন্দু পত্রীকৃত মলাট, জ্যাকেট এবং সজ্জা বইটির চাকচিক্যমান বিশেষ ভাবে বর্ধিত করেছে। হলহেড ব্যাকরণের পর বাংলা মুদ্রণ শিল্প অবিকল ইউরোপ আমেরিকার সঙ্গে না হলেও, অনেকটাই যে এগিয়ে গেছে, শ্রীপান্থ রচিত যখন ছাপাখানা এল' তার একটি উৎকৃষ্ট নমুনা। বইটি প্রত্যেক শিক্ষিত বাঙালীর প্রণিধানযোগ্য। স্কুল-কলেজের লাইব্রেরীর পক্ষে অবশ্য সংগ্রহনীয়।

পরিতোষ সেন

অন্য হিলারী

Nothing Venture, Nothing Win — Edmund Hillary Corronet Books

Price Rs. 18.00

পুজোয় যখন আমরা কেউ রাঁচী বা কেউ পুরী বড়জোর দার্জিলিং বা দক্ষিণ ভারতে যাবার তোড়জোড় করছি হিলারি তখন পাড়ি দিলেন গঙ্গার উৎসমুখে—'সাগর থেকে স্বর্গ' অভিযানে। দুঃসাহসী হিলারি। এই আটান্নতেও কেমন আটাশের মত টগবগে, প্রাণোচ্ছল ও ক্লান্তিহীন। হিলারি মানেই যেন পাহাড়—উঁচু, তুষারবৃত, দুর্লঙ্ঘ; আবার হিলারি মানেই সাফল্য—স্থির, শ্রমসাধ্য ও সার্থক।

গত মাসখানেক ধরে সংবাদপত্রে [illegible]

তেনজিং আর হিলারি

সংবাদ যখন আমাদের সমাকৌতূহলী করে রেখেছে, তখন তাঁর আত্মজীবনীর পেপার-ব্যাক সংস্করণটির কলকাতার বাজারে আত্মপ্রকাশ আমার মত বয়স্কদের কাছে প্রায় হিমালয় অভিযানের মত উত্তেজক। এবং বলাই বাহুল্য যে বইটির লেখক যখন হিলারি তখন তা এক নিঃশ্বাসে পড়ে শেষ করতে হয়। ছোট্ট কয়েক লাইনের ভূমিকা থেকেই পরিচয় পাওয়া যায় এই বিশালায়তন নিউজিল্যাণ্ডবাসীর এক সাবলীল, বিনয়ী অথচ দৃঢ় চরিত্রের, যা বইটির বাকী তিনশো নব্বই পাতা জুড়ে তাঁর অজস্র কাজের অভিজ্ঞানের ও সাফল্যের মধ্যেও কখনো সামান্য আত্মতৃপ্তিতে ম্লান হয় নি: হিলারি সদাজাগ্রত, সদাপ্রস্তুত। সর্বদাই নতুন নতুন পরিকল্পনায় ব্যস্ত এবং সর্বদাই সচেতন এই ভেবে যে তিনি বোধহয় বড় বেশী বক্তৃতা দিয়ে বেড়াচ্ছেন বা পারিবারিক সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যে ডুবে যাচ্ছেন নিজেরই অজান্তে। বস্তুত প্রথম তিরিশ বছরের নানা বৈচিত্র্যময় অভিজ্ঞতা ও পরের পঁচিশ বছরের অবিরাম দুঃসাহসী অভিযান ও আশ্চর্য সব কাজকর্মের পরেও (যেমন অভিযানের জন্যে অর্থ সংগ্রহ করতে কখনো এক দিনে পাঁচশো মাইল ভ্রমণ করে চারটি পর্যন্ত জনসভায় বক্তৃতা দিতে হয়েছে) বই-এর শেষ বাক্যাংশ যখন

"Yes there is plenty left to do".

তখন আমরা বিমূঢ় না হয়ে পারি না।

কেমন ছিল হিলারির শৈশব বা কৈশোর? কেমন ছিল তাঁর যৌবন আর প্রেম? কি ছিল তাঁর প্রেরণা, কোথায় পেয়েছিলেন সেই আগুন যা তাঁকে এমনভাবে দৌড় করাল পাহাড় থেকে পাহাড়, কিছুতেই স্থির হতে দিল না তাঁর পরিবারে, তাঁর দেশ শান্ত নিউজিল্যাণ্ডে, যেখানে সাগরের উষ্ণ আলো, হাওয়া আর মৌমাছিদের মধ্যে কেটেছে তাঁর শৈশব? কি সেই দুর্মদ নেশা যা তাঁকে কদাচিৎ কখনো-পাওয়া পারিবারিক বিশ্রাম সুখ ত্যাগ করে আবার নিয়ে যায় নতুন নতুন বিপদের মুখে, এন্টার্টিকার তুষার ঝঞ্ঝার মধ্যে অথবা হিমালয়ের গভীরে ইয়েতির সন্ধানে? এই সবই অত্যন্ত সহজ, সরল ও আন্তরিক ভঙ্গীতে লিখেছেন হিলারি তাঁর আত্মজীবনীতে।

বইটি পড়তে পড়তে আমার আর একজন অতিসফল মানুষের কথা মনে হচ্ছিল। তিনি মহম্মদ আলি—ভূতপূর্ব ক্যাসিয়াস ক্লে। হিলারির মত ক্লে-র শৈশবও সুখের ছিল না; কিন্তু দুজনের অসুখের কারণ ছিল সম্পূর্ণ ভিন্ন। অসম্ভব লাজুক, দুর্বল ও আত্মসচেতন বালক হিলারি যখন তাঁর বাবা বা স্কুল-শিক্ষকের কাছে শারীরিক শাস্তি পেয়ে অপমানে লাল হয়ে উঠেছেন, ক্লে তখন আমেরিকার দক্ষিণ প্রান্তে স্বাধীনতার পৃষ্ঠপোষক শুভ্র মার্কিন সমাজের দ্বারা লাঞ্ছিত ও অপমানিত হচ্ছেন গাত্রবর্ণের অপরাধে। বালক হিলারির সমস্যা ছিল তাঁর ব্যক্তিগত সমস্যা, তাঁর আত্মকেন্দ্রিকতার সমস্যা, তাঁর নিজেকে প্রকাশ করতে না পারার সমস্যা। অন্যদিকে মহম্মদ আলীর সমস্যা ছিল আবহমান কালের সাদা-কালোর সমস্যা, সুবিচারের সমস্যা, মানুষের মত বাঁচার অধিকারের সমস্যা। তাই স্বভাবতই ক্লে হলেন উদ্ধত, গর্বিত ও বেপরোয়া এবং হিলারি হলেন দৃঢ়, বিনয়ী আর দুঃসাহসী। একজন বেছে নিলেন অন্য মানুষকে জয় করার জন্যে তাঁর বজ্রমুষ্টি অন্য জন প্রকৃতিকে বশ করলেন তাঁর দুর্জয় সাহস দিয়ে। আর উভয়ের যা সাধারণ বৈশিষ্ট্য তা হল অধ্যবসায়, দৃঢ় সংকল্প ও সাফল্য। সাফল্যই একজনকে গর্বিত করেছে অন্যজনকে নম্র। তাই ক্লের আত্মজীবনীর নাম 'দি গ্রেটেস্ট' আর হিলারি তাঁর আত্মজীবনীর নাম রেখেছেন 'নাথিং ভেনচার, নাথিং উইন।'

এক বোন আর এক ভাইয়ের মাঝখানে এডমণ্ডের জন্ম হয় অকল্যাণ্ডে, ২০শে জুলাই ১৯১৯ সালে। মায়ের পরিবার ক্লার্কসরা বেশ সঙ্গতিসম্পন্ন ছিলেন, বাবার পরিবার তেমন কিছু নয়। পিতামহ হিলারি ছিলেন বেশ দুঃসাহসিক ধরনের মানুষ তবে তাঁকে ঘিরে যে সব আজগুবি পারিবারিক গল্প গড়ে উঠেছিল এডমণ্ড তা সরল মনেই অবিশ্বাস করেছেন। কিন্তু এর প্রমাণ আছে যে তিনি ভারতবর্ষে এসে ঘড়ি তৈরীর ব্যবসায় বেশ পয়সা করে নিউজিল্যাণ্ডে ফিরে যান। যদিও সেই পয়সার সদ্ব্যবহার করতে না পারায় হিলারিদের অবস্থা কোনদিনই তেমন স্বচ্ছল ছিল না। অকল্যাণ্ড থেকে চল্লিশ মাইল দক্ষিণে তুয়াকাউতে ছিল হিলারিদের জায়গা-জমি সমেত বেশ বড়সড় একটি বাড়ি। বাবা ছিলেন পুরনো ধরনের মানুষ। কড়া, জেদী আর পরিশ্রমী। ছেলেদের মারধোর করায় বিশ্বাসী ছিলেন কিন্তু গল্প বলতে পারতেন অসাধারণ। সেই সব গল্প শিশু হিলারির মনে এমনভাবে গেঁথে যায় যে বড় হয়ে নিজের পালা যখন এল তখন তাঁর নিজের ছেলে-মেয়েদের সেই সব গল্প বলেই ভুলিয়ে রাখতেন। আর ছিলেন মৌমাছি পালন ও মৌমাছি সংক্রান্ত পত্রিকা সম্পাদনায় অত্যন্ত দক্ষ। মা ছিলেন বুদ্ধিমতী, গৃহকর্মনিপুণা ও স্নেহশীলা; গর্বিতাও কম ছিলেন না। হিলারি মায়ের কথা লিখেছেন গভীর মমতায়। এই রকম মা, বাবা, নিউজিল্যাণ্ডের আলো-হাওয়া ও মৌমাছিদের মধ্যে বই পড়ে আর স্বপ্ন দেখে কৈশোর কেটেছে হিলারির। নিঃসঙ্গ ছিলেন লাজুক ছিলেন যদিও যা এখনো তাঁর হাসিতে ধরা পড়ে। তাই বাড়ি থেকে ইস্কুলে যাবার রেলগাড়িই ছিল হিলারির জগৎ — তাঁর কৈশোরের স্বপ্ন ও বোহেমিয়া। বই ছিল নিত্য সঙ্গী। প্রথম দিকে নানা দুঃসাহসিক অভিযানের বই কলেজে উঠে রূপান্তরিত হল ধর্ম, দর্শন ও নৃতত্ত্বে। কলেজে একটা সময় হিলারি বেশ আধ্যাত্মিক হয়ে ওঠেন অবশ্য তা খুবই সাময়িক। কিন্তু কলেজে পড়া হল না বেশী দিন। মনে নানা দ্বন্দ্ব নিয়ে বন্ধুহীন নিঃসঙ্গ জীবন নির্ধারিত করলেন বাবার মৌমাছির ব্যবসায়। কি নির্ভার আর নিশ্চিন্ত জীবন ছিল তখন। পরিশ্রম, বই পড়া আর আলো-হাওয়া - মৌমাছি। হিলারি বারে বারে এই জীবনের কথা বলেছেন। বারে বারে ফিরে গেছেন। এমন কি পাহাড় অভিযানের পথে কোন শ্বাসরুদ্ধ-

[illegible] তুষারক্ষেত্রের থেকে তাঁর মন চলে [illegible] সেই মৌমাছি, মধু আর রোদের [illegible]। ফলে হিলারির জীবনে এসেছে এক [illegible] পরিপূর্ণতা। তিনি দুই অভি-যানের মাঝখানে যেমন বক্তৃতা দেন ভ্রমণ ও আধুনিক প্রচার মাধ্যমগুলির সঙ্গে সুসামঞ্জস্য যোগাযোগ রক্ষা করেন তেমনি অখণ্ডভাবে মনোযোগ দেন মৌমাছি ও সন্তান পালনে, গৃহ সংস্কারে এবং স্ত্রী। সর্বোপরি লুইসের জন্যে ভাবনা চিন্তা করে। হিলারির জীবনে লুইসের অবদান কিছু কম নয়। যদিও এভারেস্ট বিজয়ের পর রাতারাতি যখন হিলারি বিশ্ববিখ্যাত হন আত্মজীবনীতে তখনও এই মহিলা অনুপস্থিত পূর্ব পরিচয় থাকা সত্ত্বেও। হিলারি লাজুক স্বভাবেই সম্ভবত তাঁকে সরিয়ে রেখেছিলেন আমাদের কাছ থেকে। তাই এভারেস্ট জয় করে দেশে ফিরেই দ্রুত করে বিয়ে করার ঘটনাটি কয়েক লাইনে সেরে ফেলেছেন। এভারেস্ট জয়ের সঙ্গে রোমান্স মিশিয়ে যদিও তখনকার পৃথিবীর সংবাদ-পত্রগুলি বেশ গরম হয়ে উঠেছিল কিন্তু আত্মজীবনীতে তার কোন হদিস পাওয়া যায় না। প্রেম মিলনটি বিবাহোত্তর পর্বেই মনে হয় হিলারির জীবনে এল। বিয়ের পর মধুচন্দ্রিমা হিসেবে সারা ইউরোপ ও পরে আমেরিকা বক্তৃতা দিয়ে বেড়ালেন হিলারি এবং জনসংযোগের প্রাবল্যে চাপা পড়ল তাঁদের নিভৃত দাম্পত্য জীবন। এই সবই লুইস গ্রহণ করেছেন হাসি মুখে।

এন্টার্কটিকা অভিযানই (১৯৫৮) হিলারির জীবনে সবচেয়ে দীর্ঘ, শ্রমসাধ্য ও জটিল। সেই বরফে ঢাকা বিশাল ভূখণ্ডে ট্রাক্টর, স্লেজ, খাবার ও লোকজন জড়ো করে এক বিশাল কুকুর বাহিনী নিয়ে অভিযান পরিচালনা করার বিবরণটি এতই নিখুঁত, বস্তুনিষ্ঠ ও রোমহর্ষক যে [illegible] পাহাড় দখলের ঘটনা বলে মনেই হয় না। এভারেস্ট বিজয় নিঃসন্দেহে এই শতাব্দীর এক উল্লেখযোগ্য ঘটনা। কিন্তু তা এন্টার্কটিকার মত সর্ব অর্থেই ব্যাপক নয়। এভারেস্ট অভিযানের অংশটি শ্রম ও কৌশল, বন্ধুত্ব বিশ্বস্ততা আশা ও নিরাশার নিখুঁত অন্তর্গত বর্ণনায় সুলিখিত। ইদানীং একমাত্র ক্রিস বনিংটন ছাড়া পাহাড়ের ওপর এত ভাল লেখা আর চোখে পড়ে না।

এর পরেও আরো অভিযান, আরো ভ্রমণ, আরো বক্তৃতা ও বই লেখা। নিস্তরঙ্গ নিউজিল্যান্ডের সেই লাজুক নিঃসঙ্গ বালকটির এখন আর এক মুহূর্তও সময় নেই স্বপ্ন দেখার। আসলে যে স্বপ্ন সে সমস্ত বাল্য ও কৈশোর ধরে দেখেছে এখন তাদের বাস্তবে রূপ দেবার সময়। ফলে অক্লান্তভাবে কাজ করে যাচ্ছেন হিলারি। এই সব কাজের অন্যতম হল শেরপাদের জন্যে স্কুল ও হাসপাতাল তৈরী করা। যে শেরপারা তাঁকে এত সাহায্য করেছে, যাদের মধ্যে থেকে তিনি দিনের পর দিন এত আনন্দ পেয়েছেন, তার প্রতিদানে হিলারির মানবতা ঐ সব পাহাড়ী মানুষগুলির জন্যেও কিছু করতে চায়। তাই ১৯৬৬ সালে হিলারি শেরপাদের জন্যে একটি হাসপাতাল তৈরী করে। ছ সপ্তাহের উপভোগ্য শ্রমে হাসপাতালটি নির্মিত হল নিউজিল্যান্ডবাসীদের চাঁদায় ও ইণ্ডিয়ান এলুমিনিয়াম কোম্পানীর গৃহ নির্মাণ সামগ্রীর সাহায্যে। জনসাধারণের কাছ থেকে অর্থ সংগ্রহের ব্যাপারটিও আত্মজীবনীতে একাধিকবার রয়েছে। এবং হিলারির জীবনী যে অভিজ্ঞতা সর্বদা খুব সুখের হয় নি। এভারেস্ট জয়ের পর হিলারি যখন নিউজিল্যান্ডের সবচেয়ে সম্মানিত মানুষ তখন এক অভিযানের জন্যে অর্থ সংগ্রহ করতে গিয়ে হিলারি লেখেন

> **Fund-raising proved the toughest part of the whole expedition.**

একমাত্র বোধ হয় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ছাড়া অর্থ সংগ্রহ ব্যাপারটি সব দেশেই সমান দুরূহ। তা সত্ত্বেও সরকারের চেয়ে জন-সাধারণের ওপরই হিলারির আস্থা বেশী বলেই মনে হয়।

এই সুলিখিত বইটির প্রধান গুণ হল যে, পড়তে পড়তে হিলারিকে কখনোই অতিমানব বলে মনে হয় না। ফলে দুর্বল ও ঘরকুনোকেই সুউচ্চ হিমালয় বা সুদূর কুমেরুতে না হোক অন্তত একটা অভি-যানের নেশার আমেজ এনে দেয়। আর আমাদের জীবনের প্রাত্যহিক নানা হতাশা, দুঃখ ও বাধা-বিপত্তির সঙ্গে লড়াই করার জোর দেয়। আবার লেখার গুণেই হিলারি আমাদের বুঝতে দেন না কখন তিনি কৈশোর থেকে যৌবনে এসে পাহাড়কে ভালবেসে ফেলেছেন। মাঝে মাঝে খুব ইঙ্গিতময় সব রসিকতা বা কবিত্বের ছোঁয়া একটানা বর্ণনের মধ্যে হঠাৎ কোন পাহাড়ী অকমাল্যে ফুলের মত উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে। তেমনি তাঁর হৃদয়ের উষ্ণতা আমাদের মনে এসে লাগে যখন তিনি কৃতজ্ঞতায় স্মরণ করেন নানা দেশের বন্ধুদের অথবা তাদের ভালবাসার কথা। কিন্তু, তেনজিং-হিলারির এভারেস্ট বিজয় পর্বের গাঢ় সম্পর্কটির উল্লেখ পরে আর কোথাও পাওয়া যায় না। আত্মজীবনীর শেষের দিকে হিলারি আবার শংকিত হয়ে পড়েন আত্মতৃপ্তির আশংকায়। তাই তিনি কখনো বিশ্রাম চান না এবং আমাদের জানান—

> "Finding new adventures has never been a problem in my life—the big difficulty is finding time to do them".

এটা শুধু লেখার কথা নয়। তার প্রমাণ এই আটান্ন বছর বয়সেও হিলারির দুঃসাহসিক 'সাগর থেকে স্বর্গ' অভিযান। এই অভিযানের ওপর লেখা আরো একটি সুখপাঠ্য বই-এর অপেক্ষায় আমরা সবাই রইলাম।

[illegible]

কবিতা

মাও সে তুঙের কবিতা সংগ্রহ। মানব মিত্র বুক মার্ক, ৬ বঙ্কিম চাটুজ্জে স্ট্রীট, কলিকাতা—১২। দাম চার টাকা পঞ্চাশ পয়সা।

অনুবাদে কবিতার মূল রস প্রায়ই থাকে না। তার ওপর অনুবাদের অনুবাদ হলে তো কথাই নেই। কবিতা আর হেঁয়ালির ফারাক বোঝা মুস্কিল হয়।

এখনও পর্যন্ত প্রকাশিত মাও সে তুঙের কবিতার কোন বাংলা অনুবাদ গ্রন্থই মূলানুগ নয়। ইংরিজী থেকে ভাষান্তরিত। ফলে সাত নকলে আসল খাস্তা হয়েগেছে। বিষ্ণু দের অনুবাদও ব্যতিক্রম নয়।

আরো একটি সমস্যা আছে। কবিতার রস বোঝার জন্যে একটা বিশেষ ভূখণ্ডের ঐতিহ্য এবং সংস্কারের সঙ্গে পরিচয় থাকা দরকার। ভারতবর্ষের ইতিহাস-ভূগোল এবং সংস্কৃতির ধারণা না থাকলে বাল্মীকি থেকে রবীন্দ্রনাথ কেউই পাঠকের অনুভূতিতে আঁচড় কাটতে পারবেন না।

মাও সে তুঙের কবিতা পড়ার সময় এই অজ্ঞতার কষ্ট হাড়ে হাড়ে টের পাওয়া যায়। বিশাল চীন দেশ, সেখানকার আশী কোটি মানুষ, আড়াই লক্ষ বর্গমাইল আর হাজার বছরের ইতিহাস আত্মসাৎ করেই মাও বেঁচেছিলেন। সেই প্রখর অভিজ্ঞতা ও চেতনা তাঁর কবিতার প্রতিটি শব্দে ধরা আছে। চীনের মানুষ এবং পাঠকদের কাছে হয়তো সেগুলো প্রাঞ্জল, আকর্ষণীয়, কিন্তু বাঙালী পাঠক যে কতটা বুঝবেন এ ব্যাপারে সন্দেহ থেকে যায়।

মানব মিত্রের অনুবাদ সরল এবং সাবলীল। অনুবাদে পরিশ্রম এবং আন্ত-রিকতার ছাপ আছে। কবির টীকা এবং অনুবাদকের টীকা দিয়ে তিনি পাঠকের কষ্ট কমাতে চেয়েছেন। ছাপা, বাঁধাই ভাল। অলঙ্করণ আলো করবে।

শৈবাল মিত্র

মনশ্রী—ইন্দু দাঁ। প্রকাশিকা—শ্রীমতী মমতা দাঁ। ভদ্রকালী, হুগলী। আট টাকা।

সব কবিতা নয়, কিছু কিছু কবিতা, পুরোপুরি কবিতার মেজাজ বজায় রাখতে পেরেছে। কবির আসল এবং একমাত্র কৃতি-ত্বটি হল—যে তিনি সরল, কারণ সহজ সরলভাবে কথা বলতে পারেন তাঁর কবিতায়। এই সহজ সরল ভঙ্গীটি অনেক ক্ষেত্রেই তাঁর ভালোবাসার স্বতঃস্ফূর্ত ও স্পর্শকারী প্রকাশ ঘটিয়েছে। তবে 'আবারো' 'সোমবারের সকাল' 'বাঙালীর প্রতি ভারত-মাতার আবেদন'—এরকম বেশ কয়েকটি কবিতা হয় নি 'পদ্য' হয়েছে। মানে কাঁচা হয়েছে। এগুলো সংকলনে ঠাঁই না পেলেই ভাল হত।

[illegible]

চিঠিপত্র

গ্যালারী "এ"

১৯৭৫ সাল থেকে চৌরঙ্গী মনোহর দাস তড়াগের পাশে (ওয়াই এম সি এ-র উল্টো-দিকে) প্রাচীন গম্বুজে উন্মুক্ত চিত্রপ্রদর্শনী এবং কবিশিল্পী সাহিত্যিকদের কবি সভা বা আলোচনাসভা অনুষ্ঠিত হয়ে চলেছে। চলমান শিল্প আয়োজিত এই উন্মুক্ত প্রদর্শনীশালাকে চলমান শিল্পের পক্ষ থেকে নাম দেয়া হয়েছে গ্যালারী 'এ'। গত প্রায় তিন বছরে যে অসংখ্য শিল্পী চিত্রপ্রদর্শনী করেছেন তাঁদের মধ্যে আছেন রামকিঙ্কর বেইজ, পরিতোষ সেন, সুনীলমাধব সেন, রথীন মৈত্র ইত্যাদি। বাংলা সাহিত্যের বহু তরুণ প্রবীণ লেখকেরা এখানে পাঠকের সঙ্গে সরাসরি মেলামেশা করেন। দর্শকেরাও সহজভাবে এখানে এসে খোলামনে ছবি দেখতে পারেন। সাধারণ মানুষের মধ্যে শিল্পসংস্কৃতির প্রসার ও আধুনিকমনস্ক সমাজ গড়ে তোলার পথে চলমান শিল্পের গ্যালারী 'এ'র প্রচেষ্টা সমস্ত সাধারণ মানুষ ও সংবাদপত্রের উৎসাহ ও প্রশংসা লাভ করেছে। বর্তমানে ভূগর্ভ রেলের প্রকল্প অনুযায়ী ঐ গম্বুজ ঘিরে ফেলার আয়োজন হচ্ছে। যার ফলে লেখক ও শিল্পী-দের এই সম্মিলিত প্রচেষ্টা বর্তমান মাসের মধ্যে বন্ধ হয়ে যাওয়ার উপক্রম হয়েছে।

এই অবস্থায় কলকাতার সমস্ত রুচি-বান মানুষের পক্ষ থেকে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের কাছে আমাদের সনির্বন্ধ অনুরোধ, ঐ অঞ্চলে রাজপথের আশেপাশে এমন একটি স্থান চলমান শিল্পকে ব্যবহার করতে দেওয়া হোক, যেখানে প্রতি শনি ও রবিবার দুপুর দুটো থেকে সাতটা পর্যন্ত উন্মুক্ত প্রদর্শনী ও সাহিত্য পর্বের আসর নিয়মিত অনুষ্ঠিত হতে পারে।

বিনীত

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, শক্তি চট্টোপাধ্যায়, শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়, দিব্যেন্দু পালিত, শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়, পূর্ণেন্দু পত্রী, নবনীতা দেবসেন, অমিতাভ চৌধুরী, নিখিল সরকার, কৃষ্ণ ধর, প্রফুল্ল রায়, গৌরাঙ্গ ভৌমিক, পবিত্র মুখোপাধ্যায়, অতিভূষণ মল্লিক, শুদ্ধশীল বসু, শেখর বসু, সুব্রত সেন-গুপ্ত, অসিত পাল, রাজেশ্বর ভট্টাচার্য, চিত্ত ঘোষ, কল্লোল মজুমদার, নিরঞ্জন সেনগুপ্ত, অমলকুমার দাস, নিশীথরঞ্জন ঘোষ, সমীর ঘোষ, পার্থপ্রতিম গাঙ্গুলী, দীপঙ্কর দাশ, সমীর গুপ্ত, তপশ্রী সেনগুপ্ত, সংঘমিত্রা ঘোষ, পার্থপ্রতিম কাঞ্জিলাল, শম্ভু রক্ষিত, সুনীল মিত্র, সুতনুকা বাগচী।

আমরা কৃতজ্ঞ

আন্তরিক অভিনন্দন গ্রহণ করুন। সুন্দর পরিকল্পনা পরিচালনা করায়ে আপনার সুচিন্তিত অভিমত আগ্রহসহকারে পড়ে থাকি। আপনার একক চলক শতক, পাঠক সন্ধান যাঁকলা লেখা মনে রেখাপাত করে।

শ্রদ্ধেয় পাঠক মহাশয়, প্রথম সারির সাহিত্যিকদের সম্বন্ধে যা বলতে চেয়েছেন তা সর্বথা সমর্থনের যোগ্য। বঙ্কিমচন্দ্র, শরৎচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ প্রমুখ এবং পরবর্তী শৈলজানন্দ, তারাশংকর এঁরা পাঠক-সাধারণের হৃদয়ে স্থায়ী আসন পেতে রেখে-ছেন, নিঃসন্দেহে তাঁদের যোগ্যতার একথা অনস্বীকার্য, তবু যাঁরা অন্তরালে বসে লিখে চলেছেন অদম্য উৎসাহ নিয়ে, সেই সব শতকের আধুনিক লেখক যাঁরা তাঁদের একেবারে অবহেলা করলে তাঁদের প্রতি নিঃসন্দেহে অবিচার করা হয়, তাঁরাও তো আমাদের মত সাধারণ মানুষের হৃদয়বেদনা হাসি-কান্নার সমান অংশীদার হতে প্রাণপণ প্রচেষ্টায় লিখে যাচ্ছেন, আশা, যাতে সে লেখা প্রকাশ হয়—ও ক্ষণকালের জন্য হলেও পাঠকের মনে রেখাপাত করতে পারে। আধুনিক লেখকদের মধ্যে তারাদাস বন্দ্যো-পাধ্যায়ের লেখা ভাল লাগে, তাঁর লেখা তিতিরের গন্ধ ও পাখির গান, ইস্কাপনের বিবি, মৃগতৃষ্ণা, সহজ সরল ভাব ব্যঞ্জনা-ময়। পিতা সুখ্যাত সাহিত্যিক বিভূতি-ভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের যোগ্য পুত্র পরিচয়ে যে লেখনী হাতে তুলে নিয়েছেন আশা করি তার সম্মান অক্ষুণ্ণ রেখে সুনাম অর্জন করবেন। তিতিরের গন্ধ ও পাখির গান গল্পটি অতি অল্প কথায় বাস্তবধর্মী ও মনোগ্রাহী, ঠিক তেমনি পাশাপাশি আরও আধুনিক গল্প লিখিয়েদের গল্প অনেক সময় রুচির পীড়াদায়ক ও দুর্বোধ্য অগম্য বলে মনে হয়। যেমন ধরুন, ১৫ জুলাই, ১০ সংখ্যা অমৃতে কল্যাণ সেনের গল্প 'যখন' প্রচ্ছদপত্রে নাম দেখে যথেষ্ট আগ্রহ নিয়ে পড়লাম, দেখলাম কল্যাণের মা বোনের প্রবল আসুস্থতার অনুভূতি লেখক যত্নের সঙ্গে ফুটিয়ে তুলতে সচেষ্ট হয়ে-ছেন কিন্তু, একই কথার পুনরাবৃত্তি মনকে পীড়িত করে তোলে না কি?

সোমনাথ পড়ে গেলেন, তাঁর চেতনা লুপ্ত হল, কি তার কারণ, পাঁচতলার বাড়িটি অফিস না হসপিটাল কিম্বা আর কিছু, বেদীপদ কে? পথে নামলেন, আবার চেতনা হারাবার মত অনুভূতি, সমস্ত গল্প জুড়ে সেই এক কথা নিয়ে জল ঘোলা করেছে অথচ লেখকের ভাষাজ্ঞান স্বাদ সাজাবার ভঙ্গি স্বচ্ছন্দ—সামান্য চেষ্টায় গল্পটি ঠিক মত সাজিয়ে তুললে মনে হয় ভালই হত। যাই হোক ভবিষ্যতে তিনি আরও লিখবেন

মানুষ কেনা বেচার ইতিহাস

ব্রজমাধব ভট্টাচার্য

রোম-ইতিহাসে দাস-ব্যবস্থার ক্রম-বিন্যাসের স্তর তিনটি। প্রথম দিকে প্রতি পরিবারে দু-তিনটি 'দাস' থাকতো। জমিদার-বাড়ি বেগার বা চাকর-বাকর যেমন থাকে। তাদের হর্তা-কর্তা বাড়ির প্রধান যিনি, তিনিই। সর্বেসর্বা তিনিই। রোম্যানরা পরিবারে থাকবেন সাদাসিধে-ভাবে। কাজেই খাওয়ায়, ওঠায়, বসায় দাসদের সঙ্গে একত্রে পানাহারে ক্রীড়া-আমোদে কোনো বাধা ছিলো না। (ভারতে এটা বরাবরই ছিলো),। দাসরাও পরিবারের একজন হয়েই থাকতো। কাজেই 'অত্যাচার' বলতে যা হোতো, যদি কখনও হোতো, সেটা 'দাস' বলেই যে হোতো তা নয়। কড়া মেজাজের বাপের পাল্লায় ছেলে, পতির পাল্লায় স্ত্রী, শাশুড়ীর পাল্লায় পুত্রবধূ, শিক্ষকের পাল্লায় ছাত্ররা অনেক সময়েই অনুরূপ বা ততোধিক দুর্ব্যবহার

ফেলতো। আরই কী পারে না? পারিবারিক তত্ত্বে কি অর্থনৈতিক ক্ষমতারই একটা অঙ্গ নয়? যার উপার্জন, তার হুকুমৎ।

[illegible] বেশী [illegible] পুজো, [illegible] [illegible], [illegible] [illegible], যেমনি [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]। [illegible] [illegible]। একটি অর্থপূর্ণ [illegible]। [illegible] [illegible] [illegible], [illegible] [illegible], [illegible] [illegible] [illegible], [illegible] [illegible] [illegible], [illegible] [illegible]। [illegible] [illegible] স্যাটার্নেলিয়া, ল্যাতার্নেলিয়া। [illegible] [illegible] দাসেদের পর্বদিন। এদিনে সব দাস-দাসী মুক্ত, স্বেচ্ছাচার নাগরিক। কতো দীর্ঘ প্রতীক্ষার অন্তে কতো বিরহী-বিরহিণী পেয়ে যেতো এই মধু-মিলনের অবসর। ব্যভিচার বলা হোতো না এ-পর্বের কোনো মিলনকে। সব শয্যা কামশয্যা, সব ঘর অনঙ্গের দেউল, সব পুষ্পই উৎসব, আরতি নিবেদন। বাড়িতে গোলাপজামের মতো টসটসে দাসী মগরসে দাস থাকবে পরি-বারের অঙ্গ হয়ে, অথচ মন্মথ মনকে মধ্যে মধ্যে হালুয়া করে দেবে না—এ তো আর হয় না। ঘৃতকুম্ভ-তপ্তাঙ্গার সম্পর্কটাই প্রাকৃতিক সম্পর্ক। বাকি সব চাপা দেওয়া থাবা। বেড়াল ঘুর ঘুর করে ঘোরে বলেই চাপার দরকার।

তা বোলে হুল্লোড়বাজিকে বাড়াবাড়ি হতেও দেওয়া হোতো না। কড়া আইন ছিলো। সবার ওপরে ছিলো মর্যাদাবোধ। দাসেদের প্রতি ব্যবহারেও সেই রোমান মর্যাদাবোধ টসকাতে পেতো না।

অতিভোজন গরহজমী আনে। রোমানরা যেদিন পূর্বদিকে এগিয়ে গেলো, এশিয়ার ঝাল-মশলাদার খানার সঙ্গে ঝাল-মশলাদার মেয়েদের দাসী করে আনলো (দাসও এলো বহু) সেই সময় থেকে রোমান সমাজের 'মর্যাদা'র বাঁধনও খসে গেলো। রোম থেকে বহুদূরে সেইসব প্রাচ্য নগরীর প্রাচুর্য এবং ঐশ্বর্যের স্রোতে গা ভাসিয়ে দিলেন রোমক রাজ্যপালেরা। রোম-সমাজের ভোলই পাল্টে গেলো, তাদের আইন, নীতি, সংযমে ফাটল ধরলো। কারণ, সেই সুদূরে প্রসারিত সাম্রাজ্যের সীমা থেকে রোম বহুদূরে। মার্জার বহুদূরে, মূষিকদের বীরবিক্রম তা-তা-থৈথৈ মত্ত হোলো। এই বিবর্তন দ্রুত এগিয়ে নিয়ে এলো রোমে দাস-ইতিহাসের দ্বিতীয় পর্ব।

এই পর্বেই গ্ল্যাডিওটোরিঅস দ্বন্দ্ব-যুদ্ধের আসরের পত্তন। মোরগা, ষাঁড়, মেষ-এর লড়াই দেখে দেখে তখন রোমের স্নায়ু ক্লান্ত। কাজেই পশু ছেড়ে মানুষে ধরলো তারা। মানুষে মানুষে দ্বন্দ্ব আয়োজিত হতে থাকলো। এই দ্বন্দ্বের উত্তেজনা অবশেষে মানুষে-পশুতে দ্বন্দ্বে নেমে এলো। এইসব মানুষেরা 'দাস', প্রাণ-দণ্ড দণ্ডিত অপরাধী। প্রাণের মায়ায় সব ভুলে পাষণ্ড জেদে কোনো দাস যখন বাঘ, সিংহ বা ভালুকের সঙ্গে (প্রায়ই) খালি হাতে লড়াই করতো, তার ত্রস্ত বিভ্রম, তার প্রাণান্তিক আর্তনাদ, তার পলাতক পদ-

চোখের জ্বালাতো নিবারণ উত্তেজনা, যাদুকর অবস্থায়। সোহাগের গায়ে ঢলে-পড়া সোহাগিনীর, বিনোদের বাহুবেষ্টে আপ্লুত বিনোদিনীর পানপূর্ণ রক্ত-রঙিন রক্তকণিকার গ্লাসের বীভৎস আর্তনাদ, প্রচণ্ড মৃত্যু,—কল্পনা তুলে দিতো। কী মজা। কী মজা।। অহো উল্লাস।

অথবা বর্বর অনাচারের পর অনাচার ঘটতেই থাকতো। প্রখ্যাত কাহিনী আছে ফ্ল্যামিনিউস-এর সম্পর্কে। মাত্র একটি অতিথির সাময়িক মনোরঞ্জনের খ্যাতির খাতিরে ফ্ল্যামিনিউস একটি দাসকে মনোরম নির্যাতনে বিদ্ধ করে খণ্ড খণ্ড করে-ছিলো। ভিদিউস পিললো তার পোষা মাছদের আহার্য জোগাতো দাসেদের মাংস ছিঁড়ে ছিঁড়ে। মহামতি সম্রাট অগাস্টাসের কোনো দাস সম্রাটের প্রিয় তিতির পাখীর মাংস খেয়েছিলো এই অপরাধে তাকে ক্রুশে চড়িয়ে তিলে তিলে তিনি মেরেছিলেন। এ-সবই ঐতিহাসিক সত্য। কিন্তু জুভেনালও নিবেদন করেছেন যে এক রোম-কুমারীর হঠাৎ এক অবসর বিনোদনের ক্ষণে মনে হোলো একটা মানুষকে মজা করে মৃত্যুর মুখে ঠেলে দিলে তার মুখটা দেখাতে কেমন হয়? ব্যস, একটি দাসকে তৎক্ষুনি বিঁধে মারা হোলো। বিনোদিনী বিনোদ লাভ করলেন। এ অবশ্য জুভেনালের বর্ণিত কথা। কথাকারের কাহিনীও হতে পারে। রোম সাম্রাজ্যের সম্রাটদের ইতিহাসের শেষ অধ্যায়ে দাসেদের প্রতি জঘন্য, ঘৃণিত অমানুষিক দুর্ব্যবহারের ছবি পাই। দাসে-দের সঙ্গে বিবাহ আইনে অসিদ্ধ ছিলো। কাজেই বহুপতিত্ব, বহুপত্নীত্ব, ব্যভিচার, জ্ঞাতি বা সপিণ্ড গমনও ছিলো অবাধ, আইনে তা বাধতো না। নিষেধগুলোই অর্থহীন হয়ে গিয়েছিলো। আদালতে এ-ব্যাপারে সাক্ষ্যই পাওয়া যেতো না। তাই স্বীকারোক্তি আদায়ের একটিই পথ ছিলো—দৈহিক নির্যাতন। প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত দাসের মৃত্যু হোতো রোমহর্ষক নির্যাতনে। ....টাইবর নদীর একটি দ্বীপে বৃদ্ধ অক্ষম দাস ও দাসীদের ছেড়ে আসা হোতো। সেখানে ধীরে ধীরে ক্ষয়ে যেতো তারা। বাড়িতে দরোয়ান, মাঠে ক্ষেতী,—সবই দাসেরা করতো, কিন্তু শৃঙ্খলাবদ্ধ অবস্থায়। ওভিদ এবং জুভেনালকে প্রায়ই বলতে দেখা যায় যে, ক্রোধান্ধ রোমান সুন্দরী নখ দিয়ে বা কাঁটা দিয়ে ছিঁড়ে ফেলছে দাসের চোখ-মুখ। প্রভু যে-কোনো সময়ে দাসকে গ্ল্যাডিয়েটোরিয়াল দ্বন্দ্বে প্রাণ দেবার জন্য বেচে দিতে পারতো।' ('হিস্টি অব য়োরোপীয়ান মর্যালস—জনৈক ডব্লু ই এইচ লেকী, ওয়াট্স এণ্ড কোং ১৯৪৬, পৃঃ ১২৭-২৮)

হোক। কিন্তু পরে এই দাসেদের বিবাহও আইনগত হয়েছিলো। না হয়ে আর উপায় ছিলো না। এখন যেমন আমাদের সমাজে অসবর্ণ বিবাহ হয়েছে। বিবাহিত দাস পরিবারকে আর খণ্ডিত করা যেতো না। দাসেদের ব্যক্তিগত বিত্তাধিকারও সম্প্রসারিত হয়েছিলো। মৃত্যুর পর বহুদাস মুক্তি প্রভুকে অর্পাতো। কিন্তু প্রভু দাসকে নিজের উইল করে যেতেও পারতেন। দাসদের যেচে যেচে ভোটের অধিকারও দেওয়া হোতো।

সিসেরোর দাস ছিলো টাইরো। প্রাইভেট সেক্রেটারি বলতে সিসেরোর যাবতীয় কাগজপত্র চিঠিপত্রের মুসাবিদা দেখাশোনা সবই করতো টাইরো। প্লিনীকে দেখছি দাসের মৃত্যুতে চোখের জল ফেল-ছেন। এপিকটেটাস ছিলেন দাস, হয়ে গেলেন সম্রাটের পার্শ্বদ। গৃহযুদ্ধে স্বেচ্ছায় প্রভুর জীবন-বিত্ত রক্ষার জন্য দাস প্রাণপাত করেছে এমন উদাহরণ ভূরি ভূরি। বহু দাস মুক্তি পাবার পরেও প্রভুর বাড়ি ছেড়ে নড়েনি। শ্রেষ্ঠ ও সম্ভ্রান্ত পরিবার মাত্রেই গৌরব করার মতো একটি পরমাত্মীয় দাস বা দাসী থাকতোই।

গ্রীসে দাসেদের লেখাপড়া শেখানো হোতো। তারা সমাজে মান্যও ছিলো। কেবল সরকারি ব্যাপারে, ভোট অধিকারে তারা ছিলো বঞ্চিত। এইসব দাস-দাসী বা আরবের দাস-দাসী—বেশির ভাগই ছিলো বিজিত দেশের বাসিন্দা, যুদ্ধক্ষেত্রের বন্দী। অর্থ বিনিময়ে তাদের মুক্তিও সম্ভব ছিলো। এটা বিশেষ করে শ্বেতকায় কৃষ্ণকায়ের সমস্যা ছিলো না। এটা সেকালের বীরত্বের অধিকার, বীর মাত্রেই বন্দীকে, পরাজিতকে নিজের ব্যক্তিগত দাস এবং সম্পত্তি মনে করবে। এ হোলো হক, অধিকার। শিকার খেলতে গেলে মাংসে যা অধিকার। এটার বিনিময়ে মানুষ বাড়ির চাকর-চাকরানী থেকে নায়েব, তহশিলদার, দরোয়ান, বরকন্দাজের কাজ আদায় করতো। কিন্তু বেপরোয়া ঢালাও দাস কেনা-বেচার প্রথায় দাসকে পুরোদস্তুর বেনেতি পণ্য করে তোলাটা হোলো আরও পরের দুর্ঘটনা। এটা বিলকুল 'সভ্য' পশ্চিম য়োরোপের খাঁকতির পরিণাম।

কাজেই 'দাস' কথাটা নতুন নয়। 'দাস' প্রথাও নতুন নয়। কিন্তু যে 'দাস' প্রথায় আফ্রিকা ঘায়েল, তার রূপ, রং, ব্যঞ্জনা অন্য। নিগ্রো আফ্রিকাকে নিয়ে য়োরোপের বেনে আর আমেরিকার ঔপ-নিবেশিকরা যা করেছে, এবং আজও যা করছে, মানুষের ইতিহাসকে তা কলঙ্কিতই করেছে। কিন্তু যারা চায় ধন-সম্পত্তি-প্রভুত্ব, শক্তির দম্ভমঞ্চে বসে মানুষকে নিগৃহীত করাতেই যাদের বিপুল ক্ষুধার পরিতৃপ্তি, তাদের বোধ করি কলঙ্ক সম্বন্ধে কোনো তোয়াক্কাই নেই। পরি-তৃপ্তির তালাশ তাদের, পরিতৃপ্তি জোটে না। রক্তের গন্ধে ব্যাকুল হাঙরের মতো, পিরানহা মাছের মতো, জারপোকার মতো তারা ব্যাকুলতর, নির্মমতরই হতে থাকে। কলঙ্ক, পাপ, নৃশংসতা ইত্যাদি কথাগুলো তাদের বিলাসিত উন্মত্ত রঙ্গশালায় শোনায় ভিত্তি-হীন, অর্থহীন কতকগুলো ঠুনকো শব্দের ব্যর্থ গোঙানি।

তা হলে কথা ওঠে,—আজও যদি 'দাসপ্রথা' সামাজিক ব্যবস্থায় ন্যায্য বলে গণ্য হোতো, এবং আজও যদি সে প্রথা থাকে, দাস যদি পণ্য বা পারিতোষিক হিসেবে গণনীয় হতে পারে তা হলে আজ এ নিয়ে এতো আপত্তি কেন? সমাজে মানুষ মানুষকে 'দ্রব্য' হিসেবে, বাজারের সওদা হিসেবে ব্যবহারে এনেছে তো আজই নয়। এটা কিছু য়োরোপীয় সমাজেরই বৈচিত্র নয়। তবে দাস ব্যবসার বাবদে য়োরোপীয়দেরই এতো গালা-গাল কেন? কী বিশেষ বিষ এর মধ্যে য়োরোপ ঢোকালো? যারা এই ব্যবসায়ের লভ্যাংশ ঘরে তুলেছে তারা কী কেবল শাদা? কেবল গুণ্ডা? প্রাচীন পুঁথী-খাতা-দলিল দস্তাবেজ ঘেঁটে দেখেছি দাস-ব্যবসায়ের লক্ষপতি বণিকদের মধ্যে শাদা আছে, কালোও আছে। চোর, বোম্বেটে, ডাকুও আছে, রাজন্যবর্গ, সামন্ত-ভূপতি, জমিদার, সাধু, পাদ্রী সবাই আছে। ইংলণ্ডের রাজা, রাণী, মন্ত্রী,—ফ্রান্স, স্পেন, পর্তুগাল,—সবার সমাজের শিরো-মণি,—এই ব্যবসায়ের মুনাফায় লাল। আমেরিকার সেনেটে, শিল্প-সাম্রাজ্যে বসে যারা আজ দুনিয়ার কর্ণ ধরে আছেন সেসব দারুণ দারুণ ধনকুবেরদের মধ্যে অনেকের সম্পত্তিই দাস ব্যবসায়ের ফসল।

তবে উষ্মা কেন? বাদ দিই কাকে? শাদাদেরই বা এতো কথা কেন?

প্রথমতঃ, যদিও প্রাচীন দাসপ্রথা ছিলো একটা চালু প্রথাই, তবু দাস সম্পর্কে পুরা-কালের আইনও ছিলো সুচিন্তিত, সুনির্দিষ্ট। দাসেদের প্রতি অত্যাচার হোলে সেকালে শাস্তির ব্যবস্থা ছিলো। কোরাণ, বাইবেল, মনুই হোক,—গ্রীস, আর্য, রোম, মুর, আরবই হোক, দাস নিয়ে ছিনিমিনি কেউই আইনতঃ খেলতে পারতো না। দাস যারা ছিলো তারা মানুষই ছিলো। আইন তাদের মানুষ হিসেবেই দেখতো। তাদের জন্য বিশিষ্ট নির্দিষ্ট অধিকারও ছিলো। দাসের-পো, বা দাসীর-পো চড়ে বসেন নি সমাজে এমন কোনো তক্তপোষ বা সিংহাসন ছিলোনা।

কিন্তু যে দাস ব্যবসায় নিয়ে এই আলোচনা প্রস্তুত করা হচ্ছে এটি কিন্তু সফেদ য়োরোপের নিজস্ব মাল। এর ধরণ ধারণের, করণ-কারণের বার্তাই আজব, অদ্ভুত,— একমেবাদ্বিতীয়ম এক নম্বরের পেজুমী। পরম নচ্ছার, অমায়িক পাষণ্ড ছাড়া এ মোচ্ছবে কেউ গণ্ডায় আণ্ডা মেলাবে না। সারা এশিয়া-আফ্রিকায় এর দোসর মিলবে না। ভারতবর্ষ তো নয়ই। ভুললে চলবে না। যে দাস-কন্যার গর্ভজাত পুত্রেরই সন্তান বংশ আমাদের কৌরব-পাণ্ডব। এদেশে দাস অবশ্যই ছিলো। কিন্তু তার রূপই ছিলো আলাদা।

যে দাস-প্রথার কথা এ লিখনের বিষয়বস্তু, এ-পার ও-পার আফ্রিকায় সেই নির্যাতন য়োরোপেরই একটি কলঙ্কগাথা। বিশ্ব ইতিহাসে এর জুড়ি নেই। জুড়ি নেই তো বিশ্ব-মহাযুদ্ধেরও, এটমবোমার, সি আই-এ, মাফিয়া, প্রাকৃতিক দ্যুতৈষার

বিপর্যয়েরও। এ'রাই অ্যাংলো-সাক্সন জাতের ঐতিহাসিক উদ্গাতা। এতে সন্দেহ নেই।

দ্বিতীয়ত: কালো বলেই যে আফ্রিকানদের ওপরে অত্যাচার চালানো হতো তা নয়। আমরা দেখেছি যে যাঁরা এই ব্যবসায়ে চোরাকারবার চালিয়ে যেতেন তাঁদের উদ্দেশ্য ছিলো স্রেফ একটি। আজও বিশ্বের সমাজে যে ঘোর বিপর্যয় দেখা দিয়েছে তার কারণও সেই একটিই। রাতারাতি ধনী হওয়ার নেশাই হোলো সেই উদ্দেশ্য। সবার ধন "এক্কের," বা কিছুর ফলের পুরো সবাইকে বঞ্চ করে রাখার নেশাই চরম নেশা। বিপদের কথা এই যে এই নেশা পেয়ে বসে সবর্ণের সবখানে এ'টে, সংসারে ঢেকে; ভগবানের পোশাকের ছায়ায়, মা-বোন-মেয়ের সর্বনাশ সাধন করে। এটাই হোলো বিপদ। সমূহ বিপদ। বিপদ, এবং এ যুগের বিশেষত্ব। এটা সেকে শাদাদের আমদানী করা, এবং যন্ত্র-যুগের অপপ্রয়োগের জন্য এই "সদনুপ্রেরণা" সাধনে কোনো শাদা-কালোর বিচারই নেই। এটা যদি না বুঝি আমাদেরই লোকসান। শাদারা কেবল কালোদের ওপরই অত্যাচার করতো প্রবাদ অনৈতিহাসিক প্রসিদ্ধি মাত্র। আসল যাচাইয়ের খোপে টে'কে না। শাদাদের ওপর শাদাদের অত্যাচারেরও প্রচুর নিদর্শন আছে। শাদা-দাস, শাদা-কুলী, শাদা বন্দী নিয়ে বাণিজ্য-ব্যবসায়ে কোনো ঘাটতি ছিলো না। কেন থাকবে? ব্যাবসা তো ব্যাবসা। ওর মধ্যে আবার আত্ম-করুণা এসব কেন? যথাকালে আমরা দেখবো কে জাহাজে জাহাজে সফেদ খালাসীদের প্রতি সফেদ কাপ্তানদের অত্যাচার কখনও কখনও নিগ্রোদের ওপর অত্যাচারের সীমা ছাড়িয়ে যেতো। তার কারণও শাদা-কালো নয়। স্রেফ মুনাফা। জাহাজে নিগ্রো ঢোকালেই হয়ে যায় সদাগরের "মাল"। তার হেফাজৎ করা দরকার বলেই শাদা খালাসী, শাদা কর্মী। "মাল"এর চেয়ে চাকরকে কোন্ সদাগর বড়ো মনে করে? ফ্রান্সের হিউগিনট, হল্যাণ্ডের প্রটেস্টান্ট, আয়ার্ল্যাণ্ডের ক্যাথলিক, ডিউক-অব-মনমাথের দলের লোকেরা, জেফ্রীজের নির্যাতন থেকে পলাতক প্রেসবিটেরিয়ন-রা, প্রিন্স রুপার্টের দলের রয়্যালিস্টরা—বহু বহু প্রখ্যাত যোদ্ধা, নাবিক, নাগরিককে এই নিকৃষ্ট লোভের খপ্পরে পড়ে দাসানুদাস হয়ে থাকতে হয়েছে। ক্যারাবিয়ানের দ্বীপপুঞ্জে খোঁজ নিলে আজও গরীব শ্বেতকায়দের উপনিবেশ পাওয়া যায়। শাদা হলেও তারা দাস ছাড়া আর কী ছিলো? আজও তাদের সমাজের বিকৃত অসহায় চেহারা দেখলে সাধারণ মানুষ আতঙ্কে বিমনা হবে। তাদের তুলনায় কালোরা ঢের সুস্থ সবল স্বাবলম্বী।

আসলে এই যে দাস ব্যবসায় এটা চিরকালের সেই নিরীহের প্রতি শক্তের প্রভুত্বকামী; সরলের প্রতি ফিকিরবাজের মস্তানী; শিকার করে, লুঠ করে, গায়ের জোরে টাকা বাড়ানোর দারুণ লোভ। এটা ছিলো; আজও আছে। চেহারা বদলেছে,—অনুষ্ঠানের স্বর্গ বদলে কোনো ফেরফার নেই। তার জন্য আইনের ধারা বদলেছে। যাদের হাতে রাষ্ট্র, তাদের এবং আইনও তাদেরই হাতে। আইন এবং আরো যাদের হাতে তারাই আইনের মধ্যে থেকে ন্যায়সঙ্গতভাবেই রাহাজানি, উৎপাত, লুণ্ঠন-রাজ, গুণ্ডামী করার উপায় বাতলে দেন। আরও দিচ্ছেন। আইন হয়েছে হাতের পুতুল। পার্লামেন্টে সংখ্যা-গরিষ্ঠতার বলে হাত তোলো, আর আইন বানাও। আইন তোমার দাসানুদাস হয়ে কাজ করবে। দাস? দেশে দেশে, খনিতে, কারখানায়, বন্দরে, জাহাজে, যুদ্ধ ক্ষেত্রে,—জলে-স্থলে দাসস্য দাস হয়ে লক্ষ লক্ষ মানুষ আরও ধীরে ধীরে ক্ষয় থেকে ক্ষয়ে চলে যাচ্ছে। কেন যাচ্ছে? মাত্র কয়েকটি লোভী গোষ্ঠীর লোকজনকে আরও লোভনীয় করে তুলতে। বর্তমানের ইতিহাসে যুদ্ধই একটা ব্যবসা। আমরা যারা যুদ্ধ চাই না, অথচ যুদ্ধের কাঁধে কাঁধ জোগাই, আমরা হলাম প্রভুদের ইচ্ছায় দাসস্য দাস, অন্ধ ও বধির দাস। দেশের উন্নতি, শিল্পের উন্নতি ইত্যাদি বচনগুলো শুনতে বেশ চমৎ চমৎ শোনায়। কিন্তু এ উন্নতির লাভটা যাচ্ছে কোথায়? দেশের তহবিলে না ব্যক্তির তহবিলে? আর একটি ব্যর্থ ধারণা এই সম্পর্কে স্পষ্ট করে দিতে হয়।

আমাদের ধারণা যে দাস ব্যবসায়ে ইউরোপীয়রাই লিপ্ত ছিল। ও বাবদে যেন দায়ী কেবল স্পানিশ, পর্তুগীজ, ওলন্দাজ, ফরাসী, ইংরেজ। এটিও কিন্তু হকীকৎ নয়। এই পরম লাভজনক ব্যবসায় ধুরন্ধর বদান্য ইয়াংকীরাও ওতপ্রোতভাবে লিপ্ত ছিলেন। দাস প্রথা আইনত বন্ধ হয়ে যাবার পরেও দাস নিয়ে চোরা বাণিজ্য করার সর্দার ছিল আমেরিকা। আমেরিকা গোলার্ধে নি[illegible] দাস রপ্তানী করা হয়েছে তার [illegible] অংশই আমেরিকার বণিকদের ব্যবসায়, এবং এটা দাস ব্যবসায় বেআইনী হবার পর হয়েছে। আজও হচ্ছে, তবে তাদের দাস আর বলা হয় না। যারা দাস ব্যবসায় বন্ধ করার সংগ্রামে অত্যন্ত তৎপর ছিলেন পর পর তাঁদের অজান্তেই গুপ্তচর লাগিয়ে নিষ্ক্রিয় (খতম) করার ব্যাপারেও ঐ সবেতেই ইয়াংকী। এটাও স্পষ্ট করতে হবে। নৈলে কু ক্লাক্স ক্লান বা লিঞ্চের সম্পর্কে জ্ঞান অস্পষ্ট থেকে যাবে।

চতুর্থ ধারণা এই যে দাস-প্রথা সত্যি বন্ধ হয়েছে। মানুষ জেনে নিয়েছে আজ আর সত্য দুনিয়ায় দাস নেই। এটি কিন্তু একটি মারাত্মক ভোলভোলো ধারণা। যাঁরা মেয়ে-পাচার করার ব্যবসা সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল তাঁরা জানেন পৃথিবীতে মেয়ে-বাজারে মেয়েদের কেনা-বেচা পুরোদমে আজও চলছে, চলে, চলবে। এ বন্ধ হবার উপায়, একমাত্র উপায়,— ঐ কাস্ট্রো জানতেন। উনি কুবার হাভানার মত প্রখ্যাত মেয়ে-বাজার বন্ধ করে দেন। কিন্তু কাস্ট্রোর সেই উপায়কে ব্যবহার করার হিম্মৎ কজনার? ক্যারাবিয়ানের কতো রাষ্ট্রগুলো টুরিস্ট ডলারের ওপর নির্ভর করে আছে। প্রচার পত্রিকার ছাপে যাঁচ ভর্তি মেয়ে পাবে, সমর্থ হাসি-খুশী লোভন ভাইঞ্জার তোমার ভবিষ্যৎ খুশ করে দেবে। এসো। ফুর্তিতে গা ঢেলে দাও। হে পরিশ্রান্ত ব্যবসায়ী এখানে এসেই এই নম্বরে ফোন কর। সেক্রেটারীকে সেক্রেটারী, অবসরের সঙ্গীকে সঙ্গী যা চাও! —দাস প্রথা বন্ধ হয়েছে? কে বললে?

দাস প্রথা বন্ধ হয়েছে কী হয় নি এ বিষয়ে খুব ভাল বলতে পারবেন আমেরিকা মহাদেশের (উত্তর-দক্ষিণ) কৃষ্ণকায়েরা। এটাই আমার পঞ্চম বক্তব্য। আজ সারা আমেরিকা ভূখণ্ডে কৃষ্ণ সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে নিদারুণ সমস্যা। কিন্তু কিছু আগে পর্যন্ত আমেরিকান নিগ্রোরা হুঙ্কার তুলেছিল ফিরে চলো আফ্রিকায়। ম্যালকম একস, স্টোকলীকার মাইকেল, মাইকেল একস, প্যাডমোর, সি এল আর

[illegible] বাস্তবের [illegible] পর্ব [illegible]। আজও বন্ধ হতে পারছে না [illegible] কোটি মানুষের রোজগার ধরেছে। [illegible]।

১৬৪৯ খৃস্টাব্দে ইংলন্ডে এল মহা-বিপ্লব। তার আগে আগো অনেক বিপ্লব গেছে, ওয়াট টাইলারের চাষী বিপ্লব, অষ্টম হেনরীর সময়ে ধরার্ট আসক-এর বিপ্লব, ষষ্ঠ এডওয়ার্ডের সময়ে নরউইচের চাষী বিপ্লব। এলিজাবেথের সময়ে আয়ারল্যান্ডে চাষী বিপ্লব। বিপ্লব হয়েই চলছিল। অন্যত্র আসছিল নতুন ব্যবসা-বাণিজ্যের ধারার ফলে যারা বনেদী জমিদারদের পাশা-পাশি দাঁড়াবার চেষ্টায় ব্যস্ত ছিল। ১৭৮৯ খৃস্টাব্দে ফরাসী জনতা ক্ষেপলো। বলল, রুটি দাও, রুজি দাও, সমতা দাও। কিন্তু সে বিপ্লবও গিয়ে পড়ল মধ্যবিত্তদের বেড়া-জালে। তারাও বনেদী জমিদারদের সরিয়ে সেই জমিদারীই করতে চাইল। ১৯১৭তে রুশে যে বিপ্লব এল সেটা এল জনতার গৌরবে। কিন্তু ধীরে ধীরে সেই বৈপ্লবিক গতিবেগ অবরুদ্ধ। শাসক গোষ্ঠীর বেড়াজালের মধ্যে একটা বুনিয়াদী মনোভাব দানা বাঁধছে। ইউরোপের আদর্শে আমেরিকাও নেমে পড়ল বিপ্লবে। কিন্তু সেটা ছিল মূলত ব্যবসায়, ব্যবসায়ী, শুল্কদেনেওলা - লেনেওলার লড়াই। হবেই। এটা তো শ্রেণীতে শ্রেণীতে, জাতে জাতে লড়াই নয়। এ হল বেনের বেনের লড়াই। ফলে সে লড়াইয়ের লভ্যাংশ গিয়ে পড়ল মূলত সওদাগরী কবলে। আর সেই সদাগরী সংস্কৃতির বাইরে যারা তারা সেকে চাষী, মজদুর, দাস। বিপ্লব হল। আরও টাকা বানাবার ফিকির হল, সুযোগ হল। কিন্তু গরীবরা হা-হুতো হয়ে সংস্কৃতির বাইরেই রয়ে গেল। তবুও ইতি-হাস একে বিপ্লব বলে। মন্ত্রী-বদলকে বিপ্লব বলা ইতিহাসের একটা বিলাস।

এবার তারা ক্ষেপেছে। কৃষ্ণকায়েরা বলছে,—যে ধনে হইয়া ধনী, কালোরে ধরো মান নি, তাহারি খানিক দিতেই হবে। 'আমি আমেরিকান'। আমায় আমেরিকান বলে মান। কারণ তুমি যদি আমেরিকান হয়ে থাক বাইরে থেকে চড়াও হয়ে লাল-আপাচে আদি বাসীদের খেদিয়ে,—আমিও আমেরিকান, বাইরে থেকেই এসেছি, এলেও এ দেশের জমিকে উর্বরা, মধুরা, সুফলা, শিয়ারা করে তোলায় আমাদেরই ঘাম রক্ত সেঁচা হয়েছে। তোমরা যদি মানুষের ভিটেয় চড়ে তাদের উচ্ছেদে দিয়ে রক্তে ভেজানো মাটিতে গেড়ে বসে চড়াও হয়ে আমেরিকান হও, আমরা সে আমেরিকা গড়েছি, সাধিয়েছি। আমেরিকা আমাদের। তোমরাও আমাদের। মানো। নয়তো দেহি যুদ্ধং। এ দেশে যদি যুদ্ধ করার আপত্তি বা প্রভাব থাকে,—বেশ,—চলো ফিরে আফ্রিকায়। সেখানে গিয়ে সেখান থেকে যুদ্ধ করা যাবে। আফ্রিকায় শ্বেত আছে। এবং এদেশেও একদা আফ্রিকা চড়াও হতে পারবে। অস্ত্রে না হোক বাণিজ্যে, কাঁচা মালের সরবরাহে। সুতরাং দেহি যুদ্ধং। আমরা আর কাকতি-মিনতি করব না।

[illegible] হু-হুতো [illegible] না।

এ হল মানুষের বাণী। বিপ্লবের প্রাণই হল এই বাণী। জনতা যখনই এক আকুল বাণীর প্রেরণায় আর্তজনকে শপথ নিয়ে এগিয়ে যায়,—ইতিহাসে তা পরিণতি লাভ করে বিপ্লবে। বিপ্লবের দুই চরণ, দুই চোখ, দুই বাহু, দুই ফুসফুস : তার একটি হল জনগণের শপথ, দ্বিতীয়টি সেই জনমানসকে জাগিয়ে রাখার মত দীপ্ত কোনও আশ্চর্য শপথ,—ভবিষ্যতের অন্ধ-কারের মধ্য থেকেও যা জ্বল জ্বল করে চেয়ে থাকে। সে শপথ যেন অন্ধকারের সুপ্রভাত। সে শপথের দীপ্ত উদাত্ত বাণী ধ্বনিত হচ্ছে আড়ম্বরে মণ্ডিতা জ্যোতির্ময়ী লোকমাতৃকার অফুরন্ত প্রাচুর্যের মন্দিরে। সেই শক্তির মুক্তিই আগামী যৌবনের রক্তের ডাক, প্রাণের স্ফুরণ। এরই নাম আদর্শ। এই বাণী আজ এপার-ওপার আফ্রিকার সোচ্চার। বাণ ডেকেছে। সাড়া জেগেছে। কূলের তরী আকুল হয়ে ককিয়ে উঠেছে। আজ শ্বেত আমেরিকা সভীত খেদে কুঁকড়ে উঠেছে। কিন্তু সেই শংখচূড় পাল্টা শাদা ছোবল মারার জন্য দৃঢ় প্রতিজ্ঞ। এমনি ফণা তুলে সে ছুবলেছে একদিন আপাচে (রেড ইণ্ডিয়ান) আদিবাসীদের। সেদিন তার সেই গোপন ডাকাতির সাক্ষ্য কেউ ছিল না। রাত্রির অন্ধকারে হায়েনার মত তারা চুপি চুপি একটা গোটা বীর অথচ শান্ত জাতির অস্তিত্বকে চিবিয়ে চিবিয়ে খেয়েছে। একটা স্নিগ্ধ শান্ত জাতের কর্ম, নর্ম, মর্ম, এই পরকাল,—অমোঘ দুর্বার নিয়তির মত মাত্র চোয়ালের জোরে বিশ্বাস-ঘাতকতার আঘাতে ধুলোয় মিটিয়ে দিয়েছে। সেদিন ছিল না টেলিগ্রাফ, টেলিফোন, সংবাদপত্র, রেডিও, বিশ্ব জাতিসংঘ, পেট্রোল কাঁচামালের ক্ষুধা। —আজ এই সব শাখা-পল্লবিত জনগণ সম্পর্ক বিনাশে দিকে দিকে পরিব্যাপ্ত। নিষ্কৃতি নেই। নীরবে চুপ করে জাতকে জাত সাবড়ে দেবার দিন ছোট হয়ে আসছে। —রাত্রির অন্ধকারে আজ আর যথেষ্ট আড়াল পাওয়া যাচ্ছে না।

আজ শাদারা ভীত, সন্ত্রস্ত। তারা বুঝছে সংঘাত আসন্ন, দীর্ঘ এবং অবশ্যম্ভাবী। তারা সেকালে এক জায়গায় গোল হয়ে জড়ো হয়ে লড়েছে আপাচেদের [illegible] আক্রমণের বিরুদ্ধে। আজ তারাই নিগ্রোদের পুড়িয়ে মেরেছে, শহরে, গাঁয়ে। এবং চতুর্দিক থেকে তারাই আজ কেন্দ্রীভূত নিগ্রোদের ঠেসে ধরেছে। আজ তাদের ঘিরে সর্বদা করার থোকা তাক রাখছে। আমেরিকায় আজ রাস্তায় পর দাঙ্গা। রাষ্ট্রের ব্যতিব্যস্ত হয়ে কমিশন বসিয়েছে (১৯৬৭)। দাঙ্গা কেন? সরকারী কমিশনের রায় বেরিয়েছে। জাহির হয়ে গেছে এ দাঙ্গার কারণ শাদা-কালোর বর্ণ-সমস্যার বিকৃতি। আমেরিকায় মানুষ আর মানুষ নয়। রং-ই মানুষ। রং না থাকে,—নির্যাতিত হও। রং-সাজী সভ্যতা এ। রং থাকে বাঁচো, না থাকে নিপাত যাও।

কী ভয়ে যে ভীত এই বর্ণ-বিদ্বেষী শ্বেত সমাজ তার পাত্তা লাগাতে হবে এ কালীন কিছু ঘটনার ফিরিস্তি সামনে রাখলে।

১। রোডেশিয়ায় ইয়ান স্মিথ কর্তা হলেন। সঙ্গে সঙ্গে জাম্বিয়ার পাহাড়ে জঙ্গলে ছড়িয়ে পড়ল গেরিলা-বাহিনী। অথচ এদেরই দেশ। এরা শান্তি চায়।

আমেরিকায় আপাচেদের কী দশা! দক্ষিণ আফ্রিকায় নিগ্রোর কী দশা, প্রত্যক্ষ করার পর কোন সাহসে কী বিশ্বাসে নিগ্রো চুপ করে থাকবে শাদা শাসকদের নীতি-বোধের গান গেয়ে?

২। রোডেশিয়ায় নিগ্রোদের দেশেই নিগ্রোদের দলকে দল ফাঁসি কাঠে ঝুলিয়েছে (১৯৬৮) এবং গেরিলারাও ধ্বংসে লেগে গেছে ঠিক এর পরেই। জাইরে-র, জাম্বিয়ার মহাঅরণ্যে তারা মোক্ষম দুর্গ রচনা করেছে। ভিয়েৎনামে আমেরিকা যা পারে নি আফ্রিকার অরণ্যে [illegible] কী তা পারবে?

৩। দক্ষিণ আফ্রিকা এবং রোডে-শিয়ার মধ্যে সখ্য যত নিবিড়তর আফ্রিকার বিভিন্ন প্রান্তের গেরিলাদের সখ্য ততই শক্তিশালী হতে বাধ্য। এসকালেশন নামক খাঁড়াটি দু ধারেই কাটে।

(চলবে)

গাড়ির পেছনে ঘোড়া জুতছে

পবিত্র মুখোপাধ্যায়

বছর কয়েক আগে 'এক্ষণ' নামক পত্রিকায় শ্রীমযাভূষণ মজুমদারের একটি উপন্যাস বেরিয়েছিলো। পুরো পত্রিকাটি জুড়ে উপন্যাস। নাম 'ফ্যাইঞ্জে আইল্যান্ড'। বাংলা উপন্যাস, তার নাম ইংরেজীতে। স্বাভাবিক চমক কাটিয়ে সংখ্যাটি কিনে পড়লাম। পড়তে গিয়ে ঘেমে নেয়ে একাকার। এটা বাংলা ভাষায় লেখা, না অ্যাংলো-বেঙ্গলি বাক্যে নতুন কোনো টোল-পড়া ভাষা? —বুঝে উঠতে পারলাম না। আমার লেখক বন্ধুদের দশাও তা-ই। অতএব, সেলফে তুলে রাখতে হল। আমি সতীনাথের অচিন-রাগিনী পেড়ে নিলাম সেলফ থেকে। এর ভাষা আমার চেনা ভাষা, বাঙালীরা যে ভাষায় কথা বলে। আর লেখকের সঙ্গে আত্মীয়তা নিবিড় হতে লাগলো যতোই পড়ে যেতে লাগলাম। একজন বিহার-প্রবাসী বাঙালী লেখক কতোদিন আগে আমাদের পরিচিত জগতেই দ্বিতীয় পৃথিবী সৃষ্টি করে গেছেন। তাঁর আর আমার মধ্যে সময়, দেশকালের কোনো দেয়াল ওঠেনি আজও।

কিছুদিন আগে, দেবেশ রায় নামক গল্পলেখক কোন একটি পত্রিকায় যেন কমলকুমার মজুমদার মশাই'র পক্ষে যুদ্ধে নেমেছিলেন। দেবেশ রায় বামপন্থী লেখক বলে পরিচিত। এদের সঙ্গে দীর্ঘদিন মিলে-মিশে জেনেছি, সাহিত্য হবে জনসাধারণের জন্য এদের উপযুক্ত—এরকম সিদ্ধান্তে এরা পৌঁছেছেন। জনসাধারণ কারা? অগণিত সেই মানুষ যারা গ্রামে-গঞ্জে শহরে বন্দরে খেটে খায়? শিক্ষা পায়নি? স্বাস্থ্য নেই? এদের জন্য লেখা অবশ্যই উচিত। তবে দেবেশ রায় বা দীপেন বন্দ্যোপাধ্যায় যে ভাষায় লেখেন তা এরা কানেও শোনেনি। অন্তত বামপন্থী সাহিত্যের পাঠক ? পড়েন তারাই মধ্য সাহিত্য পাঠক, কোন্ বিচার না করেই সাহিত্যের স্বাদ নিতে এদের অসুবিধে হয় না।

কমলকুমার মজুমদার অনেকেরই কাছে কিংবদন্তীর নায়ক। লেখকের আদর্শ তাঁদের আদর্শ। জীবনযাপনের আদর্শ। তাঁর লেখা নিয়ে বিরূপ কথা বললে অ[illegible] শিক্ষিত লোক লগুড় হাতে তেড়ে আসবেন। ওকে নিয়ে দেবেশ রায় যেমন [illegible] তেমনি সন্দীপন চট্টোপাধ্যায়ও একদা আবেগ-মথিত হয়েছেন। সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় প্রচণ্ড শ্রদ্ধাশীল। কমলকুমারের লেখার বিষয়-বস্তু নিয়ে কথা বলছি না, ভাষা নিয়ে প্রশ্ন অনেকেরই আছে। ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার বা রামরাম বসুর ভাষা কমলবাবুর হাতে কিছু হেরফের হয়েছে মাত্র, মনেই হয় না, উনি বিশ শতকের লেখাপড়ার মানুষ। ভাষার নিয়ম কি সনাতন হওয়া না পেছু হটতে হটতে দুশ বছর পেছনে ফিরে যাওয়া?

"কলিকাতা একটি নয়নাভিরাম মায়াময় গভীর নগর...ক্রমাগত শ্মশান ও যে কোন বৈরাগ্য জননী ভাববিগ্রহকে গলাধঃকরণ করে, চিবায়ঃ অধুনা চারিদিকের রমণীসকল তাহারই শুভ্র উৎকৃষ্ট ঘোর দন্তপঙক্তি।"

অধুনা কান্নার শব্দ ও সুরম্য হরিধ্বনি ও গঙ্গার রমণীয় বায়ু সংমিশ্রণ তাহাকে মুহূর্তের মধ্যেই বর্ণবিরহিত করে, সে স্থির যে পুরুষোত্তমদাসকে কোন কথা প্রশ্ন করিবে না এবং সে ঘাট পরিত্যাগ নিমিত্ত সিঁড়ি বাহিয়া উপরে উঠিল; গ্যাসের আলোর দেওয়ালে পতিত অনেক ধর্মকথা শ্রবণ ব্যাপৃতদের কম্পমান ছায়ার অন্ধকার পার হইতেই শুনে সেই মহতী ঘোষণা যে, হে প্রবজ্ঞ, আমি তোমার হৃদয়ের শুভাশুভ সব জানি...হৃদিস্থঃ সর্বভূতানামাত্মা বেদ শুভাশুভম্। ইহা ভগবান রামচন্দ্র বলিয়া-ছিলেন।

কয়েকটি পংক্তি ও অনুচ্ছেদের অংশ পাঠক পড়ুন। এ কোন ভাষা যা আমাদের জীবনের সঙ্গে জড়িয়ে আছে? এর সঠিক অর্থানুবাদ করা খুব কঠিন কেন না বাংলা ভাষায় সহজ চাল এখানে নেই। কৃত্রিম আর অস্বচ্ছ।

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় উপন্যাস লেখেন। তিনি যে ভাষায় লেখেন তা শহুরে বাঙালীর কিছুসংখ্যক মানুষের ভাষা। ক্রিয়াপদের স্বাভাবিক পরিণতিকে আর পাঁচজনের মতন তিনিও মেনে নিয়েছেন। কমলকুমারের প্রশংসা তিনি কি ভেবে করেন বোঝা কঠিন। কমলকুমারের পাঠক যে অত্যন্ত সীমিত তা বলে দেবার বিষয় নয়। সহজভাবে গভীর কথাটা লিখলে পাঠক হয়তো পেতেন তিনি, তা তিনি চাননি। নিজেকে মানুষ থেকে সরিয়ে নিয়েছেন। তিনি যে সহজ হননি, পাঠকের রুচিকে মেনে নেননি, তাকে নিয়ে যে কমার্স করা যায় না এটা গুণ হিসেবেই আমরা জেনে এসেছি। অথচ পথের পাঁচালী বা পদ্মানদীর মাঝি যে বড়ো জাতের লেখা তাও জেনে গেছি আমরা। বিভূতিভূষণ বা মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় কি মুষ্টিমেয় অভিজাতগর্বী মানুষের বিস্ময় মাখানো শ্রদ্ধা চেয়েছিলেন, না বাঙালী জাতপাতহীন পাঠকের বুকের কাছে যেতে চেয়েছিলেন? সহজ ভাষায় গভীর দেখাটি দেখাতে পেরেছেন তাঁরা। বাঙালী তাঁদের বই কেনে। পড়ে। উপহার দেয়। এঁদের লেখা নিয়ে কমার্সও হয়। আভিজাত্যও থাকে। ছদ্ম পোষাকের আড়ালে সন্ত সাজতে হয়নি এঁদের।

একজন বামপন্থী আর অন্যজন স্বাধীন সাহিত্যপন্থী, দেবেশ রায় আর সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় কমলকুমারকে নিয়ে নানা মন্তব্য করেছেন তা প্রায়শই প্রশংসা-সূচক। আমরা তাঁদের নিন্দা করতে বলছি না, তবে দুজন লেখকের যে সাহিত্য-আদর্শের সঙ্গে আমরা পরিচিত তার সঙ্গে কমলবাবুর আদর্শ অসমানজমিন ফারাক। তবু এঁরা প্রশংসা করতে পেরেছেন। এই উদারতার কাছে শিক্ষা করবার অনেক কিছু আছে। সুনীলবাবু জানেন, কমলবাবু যা লেখেন, যেমনভাবে লেখেন তা নিয়ে তিনি কোনোদিন বাজারে প্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে উঠতে পারবেন না। অতএব প্রশংসা করলে কোনো ক্ষতিবৃদ্ধি নেই। দেবেশবাবুও হয়তো বুঝে গেছেন, কমলবাবু শংকর, নিমাই, বুদ্ধদেব গুহদের বিরুদ্ধে সংগ্রামের হাতিয়ার। কমলবাবুর আদর্শ জয়ী হলে ওরা হেরে যাবেন। অতএব ওকে প্রশংসা মানেই যুদ্ধে নেমে পড়া। আমরা, সাধারণ পাঠক একটু গোলোকধাঁধায় পড়ে যাই, এই যা।

ভাষা, চিন্তার অনুভূতির আবেগের যুক্তির বাহনমাত্র। লেখার কাজ, মানুষের সঙ্গে মানুষের হৃদয় বিনিময়, শুভেচ্ছা বিনিময়। নিজেকে অন্যের কাছে মেলে ধরতে হলে ভাষার স্বাচ্ছন্দ্য হতেই হবে। সেই লেখকই সার্থক যিনি এই কাজ বিনা ছলচাতুরির সাহায্যেই করে ফেলতে পারেন। তার ভালোবাসা, ঘৃণা, দ্বন্দ্ব, উল্লাস, নৈরাশ্য তিনি এমন সহজভাবে পাঠকের কাছে তুলে ধরবেন, যাতে পাঠক তার ডাকে সহজেই সাড়া দিতে পারে। বিশেষ করে গদ্যের ক্ষেত্রে। তার মানে এই নয়, খবরের কাগজের ভাষাই লেখার আদর্শ। তবে লেখাতো এক ধরনের সংবাদও বটে। পাঠকের সঙ্গে বিরোধ নয়, আত্মীয়তাই লেখকের কাম্য। তিনি কি চান, তার এতো শ্রম-স্বেদরক্তের ফসল শুধু সেলফ-শোভন হয়েই থাকুক। ব্যক্তিগত প্রয়োজনে মাঝে মাঝেই বইটি তাক থেকে নামিয়ে এনে পাঠক পড়বেন, এটা কি তিনি অবচেতনে চান না? যাদুকরের আলখাল্লা পরে জনপদ থেকে দূরে রহস্যবাড়ি আড়ালে আত্মগোপন কি লেখকের কাজ?

গদাধর থেকে শ্রীরামকৃষ্ণ

মনোরঞ্জন বসু

আবার ঠাকুর নিজেই নিজের সম্পর্কে বলেছেন—পূর্ব পূর্ব যুগে যিনি রাম ও কৃষ্ণাদি রূপে আবির্ভূত হয়েছিলেন তিনিই ইদানীং (নিজের দেহ দেখিয়ে) এই খোলটার ভিতর এসেছেন। তবে এবার লুপ্তভাবে আসা, রাজা যেমন ছদ্মবেশে নগর দেখতে আসেন।

নিত্য-শুদ্ধ-বুদ্ধ-মুক্ত স্বভাব, দেশ-কালাদি অপরিচ্ছিন্ন একমাত্র ব্রহ্মবস্তু সৎ, অন্য সব কিছুই ভ্রান্ত মায়া. নানা যুক্তি সহায়ে তোতাপুরী রামকৃষ্ণকে ঐ কথা মনন করতে নির্দেশ দিলেন এবং মনকে সর্বতোভাবে নির্বিকল্প করে আত্মধ্যানে নিমগ্ন হতে বললেন। রামকৃষ্ণ কিন্তু মনকে নির্বিকল্প করে নাম-রূপের ঊর্ধ্বে যেতে পারলেন না। অন্যান্য পার্থিব সব কিছু থেকে মনকে সরিয়ে আনতে পারলেও শ্রীশ্রীজগদম্বার মূর্তি তাঁর মনকে কিছুতেই নাম রূপের স্তর অতিক্রম করতে দিল না। তিন দিন চেষ্টা করেও রামকৃষ্ণ যখন নির্বিকল্প স্তরে উঠতে পারলেন না, তখন তিনি হতাশ হয়ে তাঁর গুরু, তোতাপুরীকে বললেন, "না কিছুতেই আত্ম-নিমগ্ন হতে পারলাম না।"

তোতাপুরী তখন ভীষণ উত্তেজিত হয়ে একখণ্ড কাচ দিয়ে রামকৃষ্ণের ভ্রূদ্বয়ের মধ্যস্থল সজোরে বিদ্ধ করলেন, এবং ঐ বিন্দুতে মন গুটিয়ে আনতে বললেন। দৃঢ় সংকল্প নিয়ে রামকৃষ্ণ এবার ধ্যানমগ্ন হলেন। শ্রীশ্রীজগদম্বার শ্রীমূর্তি আগের মত তাঁর মনে আসার সঙ্গে সঙ্গে জ্ঞানকে অসি কল্পনা করে ঐ মূর্তিকে দ্বিখণ্ডিত করলেন, এবং হু হু করে সমগ্র নাম-রূপের উপরে উঠে পূর্ণ সমাধিমগ্ন হলেন। তিনদিন তিন-রাত কেটে গেল, প্রশান্ত, গম্ভীর, প্রীতিপূর্ণ মুখে নিবাত, নিষ্কম্প, প্রদীপের মত রামকৃষ্ণের চিত্ত ব্রহ্মে লীন হয়ে রইল।

তোতাপুরী স্তম্ভিত হলেন। দীর্ঘ ৪০ বছর কঠোর সাধনা করে তিনি যা লাভ করেছেন মাত্র তিন দিনে সাধক রামকৃষ্ণ তা পুরোপুরি আয়ত্ত করে ফেললেন। এ কি, অদ্ভুতপূর্ব বিস্ময়! বৈদান্তিক তোতাপুরী তখনও জানেন না বাংলার শক্তি সাধনার দুর্জয় প্রভাব জগদম্বার লীলা সাধনরাজ্যে সাধককে কতদূর নিয়ে যেতে পারে।

স্থির ওম মন্দের সুগম্ভীর ধ্বনিতে পঞ্চবটীর চতুর্দিক পূর্ণ করে তোতাপুরী তাঁর প্রিয় শিষ্যকে সমাধি থেকে তুললেন। নির্বিকল্প সমাধিতে উত্তীর্ণ হয়ে সাধক রামকৃষ্ণ অদ্বৈত সাধনে সিদ্ধ হলেন। ঐ সময় বহু বেদান্ত-মার্গী সন্ন্যাসী রামকৃষ্ণ পরমহংসের কাছে এসেছিলেন এবং 'অস্তি ভাতি-প্রিয়', 'অয়মাত্মা ব্রহ্ম' প্রভৃতি বেদান্ত প্রসিদ্ধ তত্ত্বের বিচার-আলোচনায় তাঁর বাসস্থান মুখরিত থাকত। নির্বিকল্প সমাধিতে অবস্থান কালে ঠাকুরের এক বিচিত্র দর্শন ও উপলব্ধি হল, 'ভাবমুখে থাক'—এই আদেশ তিনি পেলেন। সাধনায় সিদ্ধি দ্ব-ভাবে থেকেই হয়।

অদ্বৈত ভাবের কথা জিগ্যেস করলে রামকৃষ্ণ বলতেন—"উহা শেষ কথার শেষ কথা. জানবি সকল মতেরই উহা শেষ কথা এবং 'যত মত, তত পথ'। অদ্বৈত মতে প্রতিষ্ঠিত হয়ে ঠাকুরের মন এত উদার ভাবাপন্ন হয়েছিল যে, তিনি সুফী সম্প্রদায়ের ফকির গোবিন্দ রায়ের কাছ থেকে ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হন এবং সাধনায় সিদ্ধি লাভ করেন।

সাধক রামকৃষ্ণের সাধনার শেষ পর্ব উপস্থিত হল। ষোড়শীপুজো তাঁর শেষ সাধনযজ্ঞ। ১২৮০-র জ্যৈষ্ঠ মাসের অমাবস্যায় ফলহারিণী কালীপুজোর পুণ্যতিথি। দক্ষিণেশ্বরের মন্দিরে সেদিন বিশেষ অনুষ্ঠান। কিন্তু পুজোর আয়োজন সেদিন মন্দিরে না হয়ে গুপ্তভাবে ঠাকুরের ঘরে হচ্ছে। রাত্রি ৯টা ষোড়শীপুজোর আয়োজন সম্পূর্ণ হল। মাতাঠাকুরাণীকে (শ্রীশ্রীসারদা মা) পুজোর সময় উপস্থিত থাকতে ঠাকুর রামকৃষ্ণ আগেই নির্দেশ দিয়েছিলেন।

যথা সময়ে ঠাকুর পুজোয় বসলেন। পুজোর জিনিসপত্র শোধন করলেন। আলপনা দেওয়া পীঠে ঠাকুর শ্রীশ্রীমাকে বসতে বললেন। পুজো দেখতে দেখতে মা আগেই অভিভূত হয়ে পড়েছিলেন। মন্ত্রমুগ্ধের মত তখন তিনি পূর্বদিকে উপবিষ্ট ঠাকুরের দক্ষিণ দিকে উত্তরাস্যা হয়ে বসলেন। শ্রীশ্রীমার শরীরে মন্ত্রাদির যথা বিধানে ন্যাস করে সাক্ষাৎ দেবীজ্ঞানে ঠাকুর তাঁকে ষোড়শোপচারে পুজো করলেন এবং ভোগ নিবেদন করে নিবেদিত ভোগের কিছুটা শ্রীশ্রীমায়ের মুখে দিলেন। মায়ের বাহ্যজ্ঞান লোপ পেল। তিনি সমাধিস্থ হলেন। আত্মসমাহিত পূজক সমাধিস্থা পূজ্যা দেবীর সঙ্গে পূর্ণভাবে মিলিত ও একীভূত হলেন। রাত্রি দ্বিতীয় প্রহরের পর ঠাকুরের ভিতর চেতনার উদয় হল। তখন তিনি দেবীকে আত্ম-নিবেদন করালেন এবং দেবীর পাদপদ্মে নিজেকে চিরকালের জন্য বিসর্জন দিয়ে যথারীতি মন্ত্রোচ্চারণ করতে করতে তাঁকে প্রণাম করলেন।

পুজো শেষ হল। ভারত তথা পৃথিবীর আধ্যাত্ম ইতিহাস রহস্য পুজোর এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত লেখা হল। নিজ বিবাহিত স্ত্রীকে

পুরীর চোখ উজ্জ্বল জ্যোতিতে ঝলসে উঠল —তিনি প্রত্যক্ষ করলেন অচিন্ত্য শক্তি-রূপিণী মাকে। তিনি দেখলেন জলে, স্থলে সর্বত্র মা; শরীর, মন, বুদ্ধির পারেও মা,—তুরিয়া, নির্গুণময়ী মা! এতদিন তোতা-পুরী যাকে ব্রহ্মজ্ঞানে উপাসনা করে এসে-ছেন, সেই মা! মায়াবাদী মাতৃশক্তির লীলা প্রত্যক্ষ করলেন।

গভীর রাত্রে তিনি মা জগদম্বার অচিন্ত্য, অব্যক্ত, বিরাট রূপের দর্শন করতে করতে মা, মা চীৎকারে চারিদিক মুখরিত করে তুললেন এবং মায়ের পায়ে নিজেকে সমর্পণ করে যেমন এসেছিলেন তেমনি ফিরে গেলেন। সমাধি-স্মৃতির অপূর্ব উল্লাসে তোতাপুরীর প্রাণ আজ উল্লসিত। ধীরে ধীরে তিনি পঞ্চবটীর তলায় ধুনির ধারে বসে সারা রাত জগদম্বার ধ্যানে কাটালেন।

সকালবেলা শ্রীরামকৃষ্ণ স্বামীজীর সংবাদ জানতে গিয়ে দেখেন তোতাপুরী যেন সে মানুষই নয়। মুখে সামান্যতম ক্লান্তির ছাপ নেই, মন খুশীতে ভরা। রামকৃষ্ণকে ইঙ্গিতে পাশে বসতে বললেন, এবং পূর্ব রাত্রির সব ঘটনা বললেন, মায়ের দর্শন পেয়ে তিনি রোগমুক্ত হয়েছেন, তাঁর মনের সব দ্বন্দ্ব কেটে গেছে। এতদিনে তিনি বুঝেছেন, তাঁর অদ্বৈত সাধনাকে পূর্ণতার স্তরে নিয়ে যাওয়ার জন্য মা তাকে এতদিন দক্ষিণেশ্বরে রেখে-ছিলেন। প্রভাতী সুরে নহবত ধ্বনি শুনে শিবরামের মত গুরু-শিষ্য মা ভবতারিণীর মন্দিরের দিকে এগিয়ে চললেন। প্রভাতের অরুণ আলোয় চারিদিক ঝলমল করে উঠেছে। মার মন্দিরের দরজা খুলে গেল। তোতাপুরী মা ভবতারিণীকে দেখলেন। অনাস্বাদিত আনন্দে তোতাপুরীর মন ভরে গেল। তিনি তৃপ্ত হলেন। জ্ঞানসাধক শক্তির মহিমা উপলব্ধি করলেন। তোতাপুরী-রামকৃষ্ণ গুরু-শিষ্যের অপূর্ব মিলনে দক্ষিণেশ্বরের আকাশ-বাতাস ঐ মুহূর্তে মুখর হয়ে উঠল। তোতাপুরী প্রত্যক্ষ করলেন সৃষ্টি রহস্যের আদি চৈতন্য শক্তি মা ভবতারিণীকে। শিব-শক্তির মিলনে ভারতের অধ্যাত্ম সাধনার ইতিহাসে এক নতুন অধ্যায় রচিত হল—তোতাপুরী মা-ভবতারিণীর কাছ থেকে বিদায় নিলেন। লোটা-কম্বল নিয়ে পশ্চিমের পথে যাত্রা করলেন। শোনা যায় তিনি আর দক্ষিণেশ্বরে ফেরেন নি। কিংবদন্তী আছে মহা-বৈদান্তিক পুরীর 'নাঙ্গা বাবা' ১৬২ বৎসরে যিনি দেহ রেখেছেন, তিনিই শ্রীরামকৃষ্ণের বেদান্ত সাধনার গুরু তোতাপুরী।

অনেক সময় প্রশ্ন করা হয়, শ্রীরামকৃষ্ণ কোন্ পথের সাধক ছিলেন। উত্তর, রামকৃষ্ণ কোন বাঁধা-ধরা পথ ধরে ধর্ম ও অধ্যাত্ম সাধন শুরু করেন নি। তিনি ছিলেন স্বভাব সাধক, আধ্যাত্মিক সাধনা নিয়েই তিনি জন্মেছিলেন। তাঁর সাধনার ধারা অনুসরণ করলে দেখা যায় ব্যক্তিগত অনুভব ও বিচিত্র অভিজ্ঞতা নিয়ে তিনি সাধন পথে যাত্রা শুরু করেন এবং যখনই যে ধারার সাধনার পক্ষে গুরুর প্রয়োজন হয়েছে তখনই যোগ্য গুরু এসে তাঁর কাছে হাজির হয়েছেন। জ্ঞান, কর্ম, ভক্তি, প্রেম—সবই তাঁর সাধনার অঙ্গীভূত হয়েছে, তবে সংক্ষেপে বলা যায়, শ্রীরামকৃষ্ণের সাধনার প্রতিষ্ঠা ভক্তিতে, সিদ্ধি ক্রিয়ায়, এবং উন্মেষ জ্ঞানে। বৈষ্ণব, তান্ত্রিক, জ্ঞানী, প্রেমিক, যে কোন সম্প্রদায়ের সাধক শ্রীরামকৃষ্ণের মধ্যে তাঁর দিকদর্শনের খোঁজ পাবে না—রামকৃষ্ণের সাধনার অনন্যতা সেখানেই।

স্বামী বিবেকানন্দ শক্তি-সাধক শ্রীরামকৃষ্ণের যোগ্য প্রতিনিধি কিনা এ বিষয়ে প্রশ্ন উঠতে পারে। উত্তরে বলা যায়, রামকৃষ্ণের প্রতিনিধি রামকৃষ্ণ নিজেই, তবে বিবেকানন্দের শিক্ষা শ্রীরামকৃষ্ণের সাধনার বিরোধী নয়। প্রচলিত মারণ, উচাটন, বশীকরণ, স্তম্ভন প্রভৃতি আভিচারিক ক্রিয়া, তন্ত্র সাধনা নয়। বিভূতিবাদ বা অষ্টসিদ্ধি লাভও তান্ত্রিক সাধনা নয়, ('সাধনার পথে সাধককে [illegible] করার জন্য ঐসব প্রলোভন আসে); অথবা পঞ্চ-মুণ্ডির আসনে বসে 'পঞ্চমকার' সাধনা বামাচারী সাধনার [illegible] উপজীব্য নয়। তন্ত্র সাধনা মূলতঃ প্রাণ ও চৈতন্য শক্তির জাগরণ, চৈতন্যের সর্বোচ্চ শিখরে উঠে লোকহিতায় মাটির পৃথিবীতে অবতরণ, ব্রহ্মলোক অতিক্রম করে পরশিব লোকে অবস্থান, মূলনী শক্তির স্বরূপ উপলব্ধি করে পূর্ণতা লাভ। অন্যদিকে বেদান্তের মহাবাক্যের প্রায়োগিক বা সাধনার দিক হল তন্ত্র, ফলে তন্ত্র ও বেদান্ত—সাধন-অভিজ্ঞতার দিক থেকে দুইয়ের মধ্যে কোন মৌল বিরোধ নেই। অতএব, বিবেকানন্দের 'শিবোঽহং' বা 'সোঽহং'বাদ রামকৃষ্ণ শিক্ষার প্রতিধ্বনি।

সাধক শ্রীরামকৃষ্ণ সম্পর্কে এখানে আর একটি প্রশ্ন, শ্রীরামকৃষ্ণের আধ্যাত্মি-কতার বৈশিষ্ট্য কোথায়? কোথায় ঐ সাধনার মৌলিকতা? ভারতবর্ষের অঞ্চল বিশেষ, অধ্যাত্ম সাধনার পীঠস্থান—গয়া, কাশী, কাঞ্চী, হরিদ্বার, কংখল, নর্মদার তীরবর্তী বিভিন্ন অঞ্চল, অধ্যাত্ম ভারতের সাধনার গৌরব গাঁথায় সমুজ্জ্বল। শৈব, শাক্ত, বৈষ্ণব, সৌর, গাণপত্য—পঞ্চোপাসক ছাড়াও আউল, বাউল, অভঘড়, অঘড়, হংস, পরমহংস, দণ্ডী, ব্রহ্মচারী, যোগী, অবধূত অঘোরী প্রভৃতি বিভিন্ন সম্প্রদায়ের [illegible] ভারতভূমি। তা ছাড়াও [illegible] শঙ্করাচার্য প্রবর্তিত গিরী, পুরী,

ভারতী, সরস্বতী প্রভৃতি দশনামী সম্প্রদায়ের যতিগণ অধ্যাত্ম ভারতের সাম্প্রদায়িক পরম্পরা আজও বহন করে চলেছে। শিখর, গাম্ভীর্য, মৌনী ভারতের অধ্যাত্মের স্পর্শ এনেছে আজও ভারতের অধ্যাত্ম বাণী শোনা যায়। গিরিকন্দরে, স্রোতস্বিনী নদীবক্ষ, গভীর অরণ্য, মঠ-মন্দিরে, ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলের তীর্থ ক্ষেত্রে। আধ্যাত্মিক প্রেরণায় এই ভারতেই রাজার ছেলে সর্বস্ব ত্যাগ করে সন্ন্যাসী হয়েছেন, ধনী ভিক্ষাপাত্র নিয়েছেন, রাজা ঋষিত্বে উন্নীত হয়ে রাজ কর্তব্য পালন করেছেন। সেই অধ্যাত্ম ভারতের মানচিত্রে শ্রীরামকৃষ্ণের স্থান কোথায়, কি বা কোথায় তাঁর সাধনার বৈশিষ্ট্য ?

শ্রীরামকৃষ্ণের সাধনার প্রকাশ অধ্যাত্ম চেতনায়, প্রতিষ্ঠা ভক্তিতে এবং সিদ্ধি-ক্রিয়ায়—এ কথা আমরা আগেই বলেছি। আমরা মাতৃজ্ঞানে শক্তিসাধনা, বৈদান্তিকের দণ্ড গ্রহণ, ও নির্বিকল্পক সমাধিতে উত্তরণ, দেশ কালের অলঙ্ঘ্য গণ্ডী অতিক্রম করে পূর্ণত্বে অধিষ্ঠান, পারশেষে রহস্য ভেদ করে মনসো চৈতন্যে জন্ম মৃত্যুরে বিচিত্র ইতিহাস তিনি উন্মোচিত করেছিলেন। পরিণামে অমৃতত্ব লাভ করে সাধনার সর্বোচ্চ স্তরে তিনি উঠেছিলেন। শক্তি চেতনার সূত্র ধরে তিনি অতিক্রম করলেন প্রাণ শক্তির গণ্ডী, সর্বব্যাপ্ত চৈতন্যশক্তির কেন্দ্র-বিন্দুকে তিনি আবিষ্কার করলেন আত্ম-স্বরূপ মহিমায়, উপলব্ধি করলেন এমন এক অবস্থা যেখানে রবি, শশী নক্ষত্র, সকল জগৎ অবলুপ্ত, ছায়াছবির মত সমগ্র বিশ্ব জগৎ অনন্ত আকাশে ঘুরে চলেছে। জীব-চেতনার সূক্ষ্মতম অভিমানরূপে সংস্কার যেখানে নির্লিপ্ত, কর্মবীজ দগ্ধ, সাক্ষীস্বরূপ চৈতন্যে বিধৃত হয়ে আছে ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য জগৎ সেখানে আপন বৃত্তাকারে। বিকল্পের প্রনক কাল সেখানে কৃতিকান্ত হয়েছে কালসংকর্ষিণী শক্তিতে, চৈতন্য শক্তির আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গে ঐ শক্তির রূপান্তর ঘটে, প্রথমে বিশ্ব তখন চিন্ময় হয়ে উঠে। সংহারের পরবর্তী স্তর তিরোধান শক্তির উদয়ের সঙ্গে সঙ্গে সমগ্র বিকল্প বিলুপ্ত হয়ে চিত্ত শান্ত, নিস্তরঙ্গ ভাব পায়; পরবর্তী ধাপে অনুগ্রহ শক্তির প্রকাশ নিস্তরঙ্গ মহাসমুদ্রে ঊর্মি বা তরঙ্গের অনুভব, শিবলোকে উত্তরণ। মহাশক্তি সাধক শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস সে শক্তির আভাস সাধক সমাজকে দিয়ে গেছেন।

ব্যবহার ক্ষেত্রে শ্রীরামকৃষ্ণ সাধনার বৈশিষ্ট্য দেখা যায় গ্রহণ, অনুভব, বিশ্লেষণ উত্তরণ ও বৈকল্পিক ন্যায়ের ধারায় বিবাদ-কারী বিভিন্ন ধর্মসম্প্রদায়ের বিরোধ মীমাংসার মধ্যে। সাম্প্রদায়িক দিক থেকে প্রশ্নের শেষ ধারাটি এভাবে তোলা যায়— একজন দিব্যাচারী তান্ত্রিক ও একজন বৈদান্তিক সন্ন্যাসী দুইয়ের মধ্যে সাধনাংশে বা উপলব্ধি স্তরে কি কোন বিরোধ থাকতে পারে ? বা একজন ভক্তি সাধক ও একজন শক্তি সাধক—দুইয়ের সাধনার মধ্যে শক্তি-চৈতন্যের দিক থেকে কি কোন অসঙ্গতি দেখা যায় ?

দুটি প্রশ্নের একই উত্তর 'না'। কারণ দিব্যাচারী তান্ত্রিক ও বৈদান্তিকের লক্ষ্য এক—উভয়ের মধ্যে পার্থক্য পদ্ধতিগত দিক থেকে, বৈদান্তিক এটা নয়, ওটা নয়, (নেতি, নেতি)-র সূত্র ধরে, মহাবাক্য শ্রবণ, মনন, নিদিধ্যাসনের মধ্যে দিয়ে এক ও অদ্বিতীয় ব্রহ্মতত্ত্বে পৌঁছান, আর একজন ইতির মহিমা শেষ করে, পূর্ণ আত্মসমর্পণের মধ্য দিয়ে এক ও অদ্বিতীয় মহাশক্তিকে উপলব্ধি করেন এবং তাঁর অপার করুণা লাভে সমর্থ হন। তন্ত্রমতে শক্তি ও শক্তিমান উভয়ের মধ্যে কোন পার্থক্য নেই, তাই সাধনার দিক থেকে তন্ত্রকে বেদান্তের প্রায়োগিক দিক বলা হয়। দ্বিতীয়—বৈষ্ণব ও তন্ত্রসাধক—সাধনার দিক থেকে দুইয়ের মধ্যে কোন পার্থক্য নেই, কারণ দুজনেই মূলত শক্তিসাধক, 'হ্লাদিনী'-শক্তি ও 'চিতি শক্তি'—দুইয়ের মধ্যে কোন গুণগত পার্থক্য নেই। ব্যবহার ভূমিতে যে পার্থক্য দেখা যায় তা আচরণগত দিক থেকে। বৈষ্ণব তন্ত্র সাধারণভাবে তন্ত্রের একটা উল্লেখযোগ্য দিক। শ্রীরামকৃষ্ণের মতে সাধন রাজ্যে কোন জাত-বিচার নেই।

ঈশ্বরলাভের পক্ষে গেরুয়া পরে সন্ন্যাসী হতে হবে, এ-কথা শ্রীরামকৃষ্ণের আচরণে দেখা যায় না। আজীবন শাদা কাপড় পরে তিনি সাধনা করে গেছেন এবং গেরুয়া না পরেই তিনি আধ্যাত্মিকভাবে সর্বোচ্চ শিখরে উঠেছিলেন। গার্হস্থ্য ধর্ম সঠিক পালন করে বা একজন আদর্শ গৃহী যে ঈশ্বর দর্শনের অধিকারী হতে পারেন সেটাই ছিল শ্রীরামকৃষ্ণের আচরণের অভিপ্রায়। শ্রীরামকৃষ্ণের ভক্তদের মধ্যে নাগ মহাশয়, শ্রীবলরাম বসু প্রভৃতি অনেক আদর্শ গৃহী উচ্চমার্গের সাধক ছিলেন।

কোন ধর্মমত বা পথ শ্রীরামকৃষ্ণ প্রথমেই বর্জন করতেন না। গ্রহণই তাঁর সাধনার প্রাথমিক শিক্ষা। অনুভবে পাওয়া সাধনার সিদ্ধান্তগুলি তিনি যাচাই করে নিতেন অতি সূক্ষ্ম বিশ্লেষণের মাধ্যমে, ফলে কোন আগন্তুক সংস্কার তাঁর সাধনাকে হালকা মানসিকতায় নামাতে পারত না। এইভাবে তিনি অধ্যাত্ম রাজ্যের একটির পর একটি স্তর অতিক্রম করে পূর্ণত্বের স্তরে উঠেছিলেন এবং সম্প্রদায়-গত ধর্মের ওপরে উঠে তিনি এমন এক সম্যক দৃষ্টি লাভ করেছিলেন যার ফলে তিনি যে কোন ধর্মমতের মূলে স্বচ্ছন্দে প্রবেশ করতে পারতেন। শ্রীরামকৃষ্ণ সাধক জীবনে যা কিছু পেয়েছেন সবই আচরণের মধ্য দিয়ে। 'আপনি আচরি ধর্ম, পরের শিখাও'—এই বাক্যটির সার্থক রূপায়ণে রামকৃষ্ণের সাধক জীবন।

(চলবে)

কাহারও উপর অত্যাচার করিবে না। পুলিশের লোকে আসামীর উপর বড় অত্যাচার করে। অনেকের বিশ্বাস যে, তা নহিলে কাজ চলে না। তাহা ভ্রান্তি। না চলে সেও ভাল। ইহা নিজে কখন করিবে না, বা অধীনস্থ কাহাকে করিতে দিবে না। ইহার কারাদণ্ড আছে।

সঞ্জীবচন্দ্রের ছেলে পুলিশে চাকরি পাওয়ায় বঙ্কিমচন্দ্র একটি চিঠিতে লিখেছিলেন।

শ্যামল রায়

আমি উঠে দাঁড়াই, কাছে এসে বলি, 'নিয়ে এল।'

'কে?'
'যশোদা।'
'ও কোথায়?'
'বাড়ি গেছে।'

'ও' বলে সন্দীপদা সরে দাঁড়ালেন। আঙুল তুলে একটি ছেলেকে কাছে ডাকলেন। রোগা লিকলিকে একটি ছেলে বড় একটা মাথা নিয়ে এগিয়ে এল। সন্দীপদা বললেন, 'মিঠো, ভাল করে দেখে রাখ একদিন তোর কাজে লাগবে।' ছেলেটি বসে পড়ে। বসার ভঙ্গি দেখে মনে হল যন্ত্রণা হচ্ছে কোথাও। ছেলেটি উঠে দাঁড়াতে চেষ্টা করে—উঠে দাঁড়ায়। আমার দিকে হাত বাড়িয়ে দিয়ে কী যেন বলে, আমি এগিয়ে এসে ওর হাত ধরি। ঠাণ্ডা শক্ত হাত কাছে টানে। আশপাশের সবাই এই দৃশ্য উপভোগ করছিল। আমি বললাম, 'আপনারা সবাই ভিজে গেছেন, কাপড় পালটে নিন—অসুখ করবে।' সবাই নির্বিকার থাকে। কে একজন বলল, 'আমাদের আর কাপড় নাই গো—ছাড়লি জম্মের জামা পইড়ে থাকতি হইবে।' সবাই হেসে ওঠে। আমি বিব্রত বোধ করি। সন্দীপদা বললেন, 'জলে ভিজলে এদের অসুখ করে না—রোদে ভিজলেও না। দেখিস সবাই কাল সুস্থ থাকবে।' আমি ম্লান হেসে বললাম, 'মিঠোকে পেলেন কী করে? ওকে তো...'

'ছেইড়ে দিল...আমরা যেতি না। গেতিই ছেইড়ে দিল।' কে একজন বলল, 'দেখামি, উয়ার ডর নাই...শালু...' একটা গুঞ্জন ওঠে। স্পষ্ট কোন কথা নয়, ছেঁড়া কথার জড়তা। হাত ছাড়িয়ে মিঠোকে আমি বসিয়ে দেই, মিঠো বসতে চেষ্টা করে। সন্দীপদা বললেন, 'ছেড়ে দে ও নিজেই বসতে পারবে।' মিঠো মাথা নাড়িয়ে আমাকে ছেড়ে দিতে বলে। আমি ওকে ছেড়ে দিয়ে উঠে দাঁড়াই। সবাই যে যার জায়গায় গিয়ে বসেছে। সন্দীপদাও এক কোণে গিয়ে বসেছে দেখে, আমিও সেদিকে এগিয়ে যাই। পাশে গিয়ে বসি।

'নগেন দাসের বাড়ি গিয়েছিলি।'
'হ্যাঁ!'
'কী হল?'
'কিছু নয়।'
'ঘর ভেঙেছে।'
'না।'

'ভাল করেছে। ভাঙলে আমাদের ক্ষতি হত।'

'কী ক্ষতি?'

'বিশাল পুলিশ বাহিনী আসতো, অনেককে ধরপাকড় করতো, বাড়ি-ঘর ভেঙে দিত—এই সব হত। আমরা কিছুই করতে পারতাম না।'

'কেন?'

'আমাদের পায়ের নীচে শক্ত মাটি নেই। শিকড় চালাতে পারিনি বেশী, মাটির নিচে। এখন একটু নড়াচড়া করলেই উপড়ে ফেলবে। আর কিছুদিন বুঝলি।'

'এক লোক এল বন্দুক তীর ধনুক নিয়ে...'

'সে আমরা। পুলিশের সঙ্গে লড়াই বাঁধলে দেখেছি হাজারে পাঁচজন থাকে।'

'কেন?'

'আমরা যা করছি তা গ্রামের মানুষ জীবন দিয়ে বুঝতে পারছে না। মন দিয়ে বুঝছে। এই দুই বোঝা তো সম্পূর্ণ আলাদা। দৈনন্দিন জীবনের সঙ্গে সংগ্রামকে জড়াতে না পারলে মানুষ সংগ্রামকে ভয় পাবে। মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়াতে ভয় পাবে। তুই যেমন অন্ধকারে পুকুরের জল দেখে ভয় পাস।'

আমি এ কথার কোন উত্তর দেই না। উত্তর নেই।

ঘরের ভেতর আলো জ্বলে উঠলো। দরজার ফাঁক-ফোকর দিয়ে তীরের মত আলো ছুটে আসছে বাইরে। বৃষ্টি ধরে এসেছে। যতিনদা আলো নিয়ে বাইরে এলেন। বললেন, 'শানু যাবানি।'

'যাবো—বৃষ্টিটা থামুক।'
'ফিরবা কোন দিন?'
'মঙ্গলবার।'
'রাত্তিরে?'
'হ্যাঁ!'

'খোকা আমার কাছে থাকুক। মঙ্গলে ফিরা দেইখবা জ্যান্ত আছে।'

সন্দীপদা হাসলেন। কিছু বললেন না। বৃষ্টি আবার জোরে তেড়ে এল। সবাই চুপ। কোন সাড়া শব্দ নেই। যতিনদা আলো নিয়ে ঘরের ভেতর চলে গেলেন। আলো নিভে গেল। অন্ধকার ঢেকে দিল সবাইকে। আমরা কেউ কাউকে দেখতে পাচ্ছিলাম না। নিজের হাত আমি মুখের কাছে নিয়ে আসি। দেখতে পাই না। হাত দিয়ে সন্দীপদাকে নাড়িয়ে দিয়ে বললাম, 'কয়টা বাজে।'

'ভোর হয়ে আসছে।'
'খাওয়া হবে না?'

সন্দীপদা কোন উত্তর দেন না। আমার একটা হাত চেপে ধরলেন। আশে-পাশে কত লোক আছে আমাদের। ঘরে যতিনদা। এই একটু দূরেই মিঠো, তার পাশে আরো কত কে? এখন কাউকে দেখতে পাচ্ছি না। আমি সন্দীপদার হাত ধরে বসে থাকি। বৃষ্টি পড়তে থাকে।

জলাশার আস্তরণ ছেঙে ছেঙে গাড়ি চলছে। ষণ্ডা মার্কা লোক দুটো আমার হাত ধরে বসে আছে। সামনে ড্রাইভার। ড্রাইভারের পাশে পুলিশ ভদ্রলোক।

বাড়ির কাচ সব তোলা। বাতাস আসছে না একটুও। খুব গরম আর বুক লাগছিল। ফুসফুস শুকিয়ে আসছে। চোখ জ্বালা করছে। খুব কষ্ট হচ্ছে আমার। খুব কষ্ট। সন্দীপদা তুমি এখন কোথায়? কতদিন দেখি না তোমাকে।

বললেম ডাক্তার। 'মানুষ মাত্রেই অসৎ—কাকে বিশ্বাস করবেন? মানুষ নিয়ে বিপ্লবের কাজ হবে না। গরু, ঘোড়া মানে পশু, পাখিদের নিয়ে চেষ্টা করে দেখুন। ওরা ঘাস খায় কিন্তু মানুষের চেয়ে শক্তিতে বেশী, বিশ্বাসে বলুন, আকারে বলুন, প্রকারে বলুন অনেক বেশী এফিসিয়েন্ট অনেস্ট। দূরে থেকে দেখুন আমাদের দেশের কমিউনিস্ট পার্টিগুলো কাজ করছে কোন দিক দিয়েই ওদের কোন প্রত্যাখ্যান নেই। ভাবা যায়। আপনি বলবেন, ওরা সব সংশোধনবাদী, কিন্তু সত্যি কি তাই—তা নয়। আসলে আমাদের দেশের মানুষের শরীরে একটা জিনিসের অভাব রয়েছে সেটি হচ্ছে এনিমেল প্রটিন। যা থাকে ঘাসের মধ্যে। আপনারা বিপ্লবের কথা না ভেবে ঘাসের কথা ভাবুন। এনিমেল প্রটিন চাই। এনিমেল প্রটিন ছাড়া বিপ্লব হবে না।'

আমি বললাম, 'ঠিকই বলেছেন, কিন্তু ঘাসটা খাওয়াবো কী করে?'

'কেন বস্তা করে। শাক, চচ্চড়ি যেভাবেই হোক খাওয়াতে হবে।'

আমি বললাম, 'আপনি আগে খেয়ে দেখবেন না, আপনার মধ্যে বিপ্লবের ভাব জাগে কিনা। যদি ভাল ফল পান আপনার সহকর্মীদেরও খেতে বলবেন। আপনাদের পুরো বাহিনীটা যদি বিপ্লবী হয়ে যায় তবে আমাদের তো আর ফৌজের কথা ভাবতে হবে না। আপনারাই হবেন গণফৌজ।'

গাড়ি একটা বাঁক নিল। প্রথমে ডানদিকে তারপর বাঁদিকে। ঘুরে সোজা লালবাজার। পুলিশ ভদ্রলোক প্রথমে নামলেন। দু হাত দিয়ে প্যান্ট টেনে উপরে তুললেন। তারপর হেসে উঠলেন, 'হি-হি, গণফৌজ। লাল ফৌজ। কত কী। নাম শালা, ফৌজ সাবাড়—নেমে আয়।' ছোকরা মার্কা লোক দুটো পাশ থেকে নেমে দাঁড়াল। তারপর আমি নামলাম। বুক ভরে নিশ্বাস নিলাম। মাথাটা ঝিমঝিম করছে। বৃষ্টি পড়ছে টিপটাপ। 'দাঁড়িয়ে কেন, চলে আসুন ওকে নিয়ে এস তোমরা উপরে।' বলে পুলিশ ভদ্রলোক লন পেরিয়ে অফিস ঘরের দিকে চলে গেলেন। লোক দুটো আমার হাত ধরল। আমরা হাঁটতে লাগলাম। এই জায়গার, বাড়ি ঘর নতুন নয় কিন্তু এখানকার লোকজনদের সব সময় নতুন বলে মনে হয়। মনে হয় আগে কখনো দেখিনি এদের—আগে কখনো ছিল না।

আমাকে ওরা একটা ঘরে নিয়ে এল। নতুন ঘর, আগে কখনো আসিনি। একটা আলমারি আছে ঘরে। দুটো চেয়ার একটা টেবিল। একটা চেয়ারে একজন লোক বসে আছে। ফর্সা নাদুস-নদুস চেহারা। অন্য চেয়ার খালি। টেবিলের ওপর কিছু কাগজ-পত্র। লোকটির পেছনে একটি জানালা। [illegible] দেওয়া। সবুজ একটা পর্দা ঝুলছে। আমি যেতেই তিনি চোখ তুলে বললেন, 'আপনার মামার বাড়িতে দোতালায় একটা ব্যাগ ছিল?'

'না।'

'নাকি মশাই—ঠিক করে বলুন।'

'ছিল তো ছিল না।'

'ছিল।'

'আমার ব্যাগ আমি জানি না—ছিল বললেই হল!'

'বললেই হবে কেন... আমরা নিয়ে এসেছি ব্যাগটা—দেখবেন?'

আমি চুপ করে থাকি।

'কী চুপ করে কেন?' বলে একজনকে বললেন, 'নিয়ে এসো তো ব্যাগটা।' 'আপনার ব্যাগ আপনি জানেন না, আশ্চর্য।—কী ছিল না?'

'ছিল হয়তো।'

'হয়তো কী, ছিল বললেম কেন ছিল না।'

'অনেক দিন আগে রেখেছিলাম, মনে ছিল না।'

'তাই বলুন—কি কি ছিল ব্যাগে?'

আমি চুপ করে থাকি।

'কি কি ছিল আমরা দেখেছি, তবে বলুন আপনি আপনার মুখ দিয়ে আমরা শুনতে চাই।'

'একটা [illegible] সি-পি-সিপ [illegible], কিছু কাগজপত্র এই আর কী।'

'আর কিছু নয়?'

'না।'

ভদ্রলোক এবার বেল বাজালেন। এক-জন লোক [illegible]। [illegible] [illegible] ভদ্রলোক বললেন 'নিয়ে এসো।' [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]—[illegible] [illegible] [illegible] [illegible]—কী [illegible] কী [illegible]।'

আমি চেয়ারে এসে বসি। [illegible] [illegible]। [illegible] [illegible]। [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]। [illegible] 'আসুন' বলে ভদ্র-লোক [illegible] [illegible] উঠে দাঁড়ালেন। [illegible] [illegible] ছোটমামা। আমি উঠে দাঁড়াই। ছোট-মামা বললেন [illegible] [illegible] কী ব্যাপার?'

'আপনার ঘরে দোতালায় ওর একটা ব্যাগ আছে—এঁরা [illegible] [illegible]।'

'দোতালায় তো ওর কোন ব্যাগ নেই।'

'আছে আছে [illegible] [illegible] একটা'

'না নেই। [illegible] না [illegible] [illegible] ... নেই।'

ভদ্রলোক [illegible] আমার দিকে তাকা-লেন। [illegible] 'কী নেই?'

বললাম, 'আছে।'

ছোটমামা অসহায় হয়ে বললেন, 'কোথায়?'

'খাটের নীচে।'

'আমি তো জানি না!'

'অনেক দিন আগে রেখেছি—মনে ছিল না।'

ভদ্রলোক চেয়ার নিয়ে বসলেন। 'এবার একটু দয়া করে ব্যাগটা পাঠিয়ে দিন.... আপনিই নিয়ে এলে ভালো হয়। ব্যাগটা আমাদের দরকার—জরুরী।' ছোটমামা নিঃশব্দে ঘর থেকে বেরিয়ে যান। আমি চেয়ারে এসে বসি।

'আর কিছু মনে পড়ল?'

'না।'

'দেখলেন তো, বাড়িতে একটা জিনিস আছে আপনারা কেউ জানেন না—আমরা জানি—কী করে?....আর কি কি আছে বলুন।'

'আর কিছু নেই।'

'ঠিক তো?'

'এলেই দেখতে পাবেন।'

ভদ্রলোক মনোযোগ দিয়ে কাজ করতে থাকেন। আমি চেয়ার, টেবিল কাগজপত্র দেখতে থাকি। কিছুক্ষণ পর। একজন অফিসার ঘরে ঢুকলেন। টেবিলের কাছে উপুর হয়ে ভদ্রলোকটিকে কি সব বললেন। তারপর আমাকে বললেন, 'আসুন।'

'যান, ও'র সঙ্গে যান—আপনার ব্যাগ এক্ষুনি এসে পড়বে, চিন্তা নেই।' বলে ভদ্রলোকটি হাসলেন। আমি একটু হেসে উঠে দাঁড়াই। 'চলুন', বলে অফিসারটির সঙ্গে ঘর থেকে বেরিয়ে আসি। অফিসারটি বললেন, 'আপনি আগে আগে [illegible], আমি পিছনে আছি। আমি একটু [illegible] বল-লাম, 'কোন দিকে?'

'চলুন বলছি—এখন [illegible] চলুন।'

একবার ডাইনে একবার বাঁয়ে করে অফিসার ভদ্রলোকটি আমাকে ডি-সির ঘরে নিয়ে এলেন। একটা ঝকঝকে সবুজ পর্দা সরিয়ে ডি-সির ঘরে ঢুকলাম। সেই আগের মত সাজানো ঘর। পরিপাটি মানুষটি। পরি-পাটি সব কিছু।

'বসুন,' ডি-সি আমাকে বসতে বললেন। সামনের একটা চেয়ার টেনে আমি বসলাম। অফিসারটি দাঁড়িয়ে ছিলেন, পর্দা একটু নড়ে উঠল উনি চলে গেলেন। ডি-সি হাত দুটো জোড়া করে কাচে ঢাকা টেবিলের ওপর রাখলেন। আমার মুখে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে কি সব দেখলেন। টেবিলে রাখা ঢাকা গ্লাস থেকে জল খেলেন।

'আপনার বাড়ি থেকে আকুপাংচারের যন্ত্রপাতিগুলো আনিয়েছি'—বলে ডানদিকের ড্রয়ার থেকে আকুপাংচারের সরঞ্জাম বার করলেন। 'দেখুন তো সব ঠিক আছে কি না।' আমি বাক্সটা কাছে টেনে নিই। খুলে ফেলি, দেখি।

'ঠিক আছে?'

'এবার আমার হাতটা দেখুন।' ওর হাত দেখি।

'আমাকে অ্যাকুপাংচার করলে কোথায় কোথায় সূচ দেবেন। কটা সূচ দেবেন।'

'পাঁচ-সাতটা।'
'কোথায় কোথায় দেবেন ?'

'ক্যাচু, তাচৈ, চিয়েন-ইউ, ছুজো খিয়ান চুং, নাও-শু...'

'এই সব নাম আমি বুঝবো না, শরীরের কোথায় কোথায় বলুন।'

'অক্সিপিটাল হাড়ের ঠিক নীচে, স্টারনোমাস্টয়েড ও ট্র্যাপেজিয়াম মাংস-পেশীর ফাঁকে, সার্ভাইকাল স্পাইন আর থোরাসিক....।'

'থাক, থাক, এই সব শরীরের কোথায় থাকে হাত দিয়ে দেখিয়ে দিন।'
আমি উঠে দাঁড়াই। উনি থাক থাক বলে, বসতে বললেন। 'আমাকে একটা সূঁচ ফুটিয়ে দেখান না।'
কোথায় ফোটাবো।'

'এখানে ফোঁটান।' বলে একটা হাত বাড়িয়ে দেন। আমি ওঁর হাত কাছে টেনে নিয়ে দ্বিতীয় মেটাকারপেল হাড়ের মধ্য-বিন্দুর বাইরে একটা সূঁচ ফুটিয়ে দিই। উনি 'আঁ', বলে হাত তুলে নেন। 'বেশ লাগে...খুলুন, খুলুন'—বলে, হাসতে থাকেন। আমি সূঁচ তুলে নিই।

'বুঝলেন, আকুপাংচারের ওপর আমার একটা বিশ্বাস আছে। আমি রীতিমত পড়া-শুনো শুরু করে দিয়েছি।....বিশ্বাস হচ্ছে না?' বলে বাঁ পাশের ড্রয়ার থেকে কী সব বার করতে চান। আমি বললাম, 'থাক। বিশ্বাস অবিশ্বাসের কি আছে।' উনি এবার নড়ে চড়ে বসলেন। দুটো হাত ঘাড়ের পিছনে দিয়ে বললেন, 'আপনাকে বিরক্ত করলাম, মনে কিছু করবেন না। চা খাবেন ?'
বললাম, 'না।'

'না কেন ? আচ্ছা, আমি যে আপনাকে নিয়ে এই সব করেছি—কাউকে বলবেন না যেন।'

আমি মাথা নাড়ি। 'এ-সব কী বলার কথা ?'

'সত্যি', উনি হাসলেন।
কে একজন লোক পর্দা সরিয়ে বলল, 'স্যার।' উনি বললেন, 'আসুন।' তারপর আমার দিকে ফিরে তাকালেন। 'এবার যে আপনাকে আসতে হবে।' আমি উঠে দাঁড়াই। উনি উঠে দাঁড়িয়ে হ্যান্ডসেক করলেন। আমি হাত ছাড়িয়ে ফিরে দাঁড়াই—হাঁটতে থাকি। অফিসারটি বাইরে দাঁড়িয়ে ছিলেন। আমাকে দেখে উনিও হাঁটতে লাগলেন।

'কথা হল!'
'হাঁ।'

'কী কথা।'
'ঘাড়ের মাথা।'

অফিসারটি চুপ করে থাকেন। আমরা হাঁটতে থাকি। চুপচাপ হাঁটতে থাকি। আশ-পাশ দিয়ে দালান কোঠা পেরিয়ে যায়। আগের ঘরে চলে আসি। ভদ্রলোকটি বসে আছেন। আমি সামনে গিয়ে দাঁড়াই। ভদ্র-লোক মুখ তুলে বললেন, 'কথা হল ?'

'হ্যাঁ।'

'কী কথা।'

আমি চুপ করে থাকি।

'আপনার মামা ব্যাগটা নিয়ে এখনো এলেন না!' আমি চুপ করে থাকি। দূরে ঢং ঢং করে ঘন্টা বাজে।

'দাঁড়িয়ে কেন বসুন...চা আনতে বলেছি।'

আমি চেয়ার টেনে টেবিলের ওপর মাথা রেখে বসে থাকি। বাইরে থেকে হাওয়া আসছে খুব। জানালার পর্দাটা মাঝে মাঝে সরে যাচ্ছে। বাইরেটা কেমন অন্ধকার অন্ধকার ভাব। কেমন শীত শীত করছে। সন্ধ্যা আসছে ধীরে। পাখপাখালিরা ঘরে ফিরছে। বাইরে লোকজন কথা বলছে, হাসছে, কাঁদছে। কত কিছু করার আছে মানুষের—কথা বলা, হাসা, কান্না—কত কী ; আমি টেবিল থেকে মাথা তুলে সোজা হয়ে বসি। সময় চলে যায়। দিন যায়।

(১৫)

ঘন্টা দুয়েক পরে ছোট মামা ফিরে এলেন। সঙ্গে করে নিয়ে এসেছেন সেই ব্যাগ। বড়বাবু ঘরেই ছিলেন। খুব অমায়িক ভঙ্গিতে ব্যাগটাকে টেবিলের ওপর রাখতে বললেন। আমাকে বললেন, 'এদিকে আসুন, খুলুন দেখি ব্যাগটা—কী আছে?' আমি উঠে গিয়ে ব্যাগ খুলি। বড়বাবুর দিকে এগিয়ে দিই। উনি প্রথমে উঁকিঝুঁকি দিয়ে দেখলেন। কয়েকবার ব্যাগের ওপর আঙুলের টোকা দিয়ে কী সব পরীক্ষা করলেন। তারপর বললেন, 'কী হল? হাত চালান, বার করুন—কী আছে দেখি। ছোট মামা একটু দূরে দাঁড়িয়ে আছেন। তাঁর পাশে দাঁড়িয়ে আছেন সেই ভদ্রলোক যিনি আমাকে ব্যাগের ব্যাপারে প্রশ্ন করেছিলেন। তিনি একটু এগিয়ে এলেন। ভাবটা এমন যে, আমি যা বলেছি তার সঙ্গে ব্যাগের ভেতরকার জিনিসপত্র মিলিয়ে দেখতে চান। আমি তার মুখের দিকে একবার তাকিয়ে ব্যাগের ভেতর হাত চালিয়ে দেই।

'করেন মশাই অ্যাকুপাংচার...এত বড় মেডিকেল ব্যাগ কেন?' বলে, ভদ্রলোক ব্যাগের মুখে ঝুঁকে পড়লেন। আমি একটা লাল ডাইরী তুলে আনতেই দেখেই তিনি বলে উঠলেন 'ওইতো...ওইতো'। আমি তুলে বাইরে আনি। বড়বাবু ডাইরীটা হাতে তুলে নিলেন। নাড়িয়ে চাড়িয়ে খুললেন। 'এ-তো ডাইরী...রেডবুক কৈ?'

আমি চুপ করে থাকি।

'কী হে! রেড বুক কৈ?'

আমি ব্যাগের নীচে হাত চালিয়ে আর একটা জিনিস তুলতে তুলতে বললাম, 'এটাই হবে....

'এটাই হবে মানে ?....এটাই হবে মানে কী ?'

'অনেকদিন আগে রেখেছিলাম...'

'সেই জন্য রেড বুকটা ডাইরী হয়ে গেছে ?

বললাম, 'না তা নয়। অনেকদিন আগের রাখা—দুটোই লাল। লাল একটা কিছু ছিল, মনে ছিল, তবে সেটা রেড বুক, না ডাইরী মনে ছিল না।

বড়বাবু একটু ফুলে উঠলেন, লাল ডাইরীর পাতা ওল্টাতে লাগলেন। বললেন, 'এসব করেছেন কী ?' ভদ্রলোকটি বললেন, 'কী স্যার।'

'কী আর, হাড়গোড়....মাথার খুলি, মেরুদণ্ড, হাতের থাবা।' ভদ্রলোক আমার দিকে তাকিয়ে রইলেন। সবে একটা বই তুলেছি। উনি দেখি দেখি বলে হাত তুলে নিলেন। 'সোভিয়েত কমিউনিস্ট পার্টির ইতিহাস।'

'এই বই পড়েছেন ?'
'আমি মাথা নাড়ি।'

'চীনা কমিউনিস্ট পার্টির ইতিহাস কই?'

'তা তো জানি না।'

'জানি না মানে ? আপনি বলেছিলেন, ব্যাগে সি পি সির হিস্ট্রী আছে।'

'বলেছি।'

'তবে ?'

'এটাই হবে।'

'মানে।'

'এইটির কথাই বলেছি হয়তো... ইতিহাস একটা ছিল মনে আছে কিন্তু কোন দেশের....'

'মনে নেই—তাই না।'

ছোটমামা দূরে দাঁড়িয়ে ছিলেন এবার কাছে সরে এলেন। বললেন, 'না জেনে বলিস কেন?....না জেনে....' বড়বাবু উঠে দাঁড়ালেন। 'না জেনে বলবে কেন-জেনেই বলেছে—আপনিই সরিয়ে দিয়েছেন বা জানিয়ে দিয়েছেন। সেদিন বাড়ি সার্চ করিনি, আজ আমার চাকরীটি যাবে, আপনারও চাকরিও যাবে।' ছোটমামা প্রতিবাদ করে বললেন, 'না, না যে অবস্থায় ছিল আমি সেই অবস্থায় নিয়ে এসেছি....এর মধ্যে... 'তা হলে সেই সব গেল কোথায়। আমরা সরিয়েছি ? ঠিক আছে। আপনি আসুন আমার সঙ্গে।' বলে বড়বাবু ছোটমামাকে নিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন।

আমি ব্যাগের ভেতর হাত ঢুকিয়ে খাচ্ছিলাম। ভদ্রলোকটি আমার হাত ধরে তুলে নিলেন। হাতটা ছেড়ে আমার দিকে ছুঁড়ে দিয়ে, ব্যাগটাকে খুব তুচ্ছভাবে অবহেলা করে তুললেন, তারপর ঘরের কোণায় ফেলে দিলেন। পড়ে গিয়ে ব্যাগটা কাত হয়ে শুয়ে রইল।

'চালাকি হচ্ছে আঁ...আলপিন গায়ে হাত দেইনি শুয়োর...আজ তোকে...'

আমি ঘুরে দাঁড়াই। 'কী করবেন?'

'দ্যাখ কী করি' বলে দূরে একটা চেয়ারে গিয়ে বসলেন। আমার দিকে তাকিয়ে ফিসফিসিয়ে কী সব বলতে লাগলেন। স্পষ্ট কিছু শোনা যায় না কিন্তু আমি সব শুনতে পাচ্ছিলাম। ঘরে আর কেউ নেই। আমি দাঁড়িয়ে থাকি। উনি মনে মনে কথা বলে যান, কথা বলে যান। আমার পা ব্যথা করছিল। বুকে একটা কষ্ট হচ্ছিল খুব। কাছেই একটা চেয়ার ছিল, আমি সেটা টেনে নিয়ে বসে পড়ি। ভদ্রলোক চেঁচিয়ে ওঠেন—'এই' বলে তর্জনী তুলে ইঙ্গিত করে বললেন, 'ওঠ ওঠ, ওটা কী বসার জায়গা—আঁ! তোকে কে বসতে বলেছে...ওঠ।'

আমি বসে থাকি। হাত দুটো জড়ো করে আঙুল মটকাই। চোখ তুলে দেয়াল দেখি লাইটের সুইচ দেখি।...ঘরে ফিরে ভদ্রলোকের দিকে তাকাই।

উনি কিছু বলেন না। চুপ করে বসে থাকেন। আমি জানি ওর কিছু বলার নেই। বলার থাকলে কিছু করতো।

বাইরে একটা হৈ হল্লা হচ্ছে। ভারি কিছু একটা ফেলেছে কেউ—অন্যান্য সব মজা করে হাসছে, চীৎকার করছে। আমি বাইরে তাকাই। অন্ধকার, নয় তেমন স্পষ্ট কিছু নয়। একটা গাড়ি শব্দ করে চলে গেল। বড়বাবু ব্যস্ত হয়ে ঘরে ঢুকলেন। চেয়ার টেনে বসতে বসতে কাগজপত্র ঘাঁটতে লাগলেন। বেল বাজালেন। দুটো লোক এলো। 'একে খোলাও।' লোক দুটো আমার কাছে এগিয়ে আসছিল। আমি উঠে দাঁড়াই। লোক দুটো আমার দু হাত চেপে ধরে। বড়বাবু আমার দিকে স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে বললেন,

'এখনো সময়—ব্যাগ থেকে সে সব জিনিস গেল কোথায়?'

'যাবে কোথায়, সেখানেই আছে।'

'ওখানে নয়—সেই সব জিনিস।'
'কোন সব?'

'যা আগে বলেছিস।'

'আগে ভুল বলেছি। এখন যা দেখলেন তাই ছিল।'

'ওই ছিল—ঠিক আছে তাই থাক।' বলে ঘড়ি দেখলেন। হাত তুলে ওদের ইঙ্গিত করলেন। ওরা আমার হাত তুচ্ছ জিনিসের মত ছেড়ে দিল। হঠাৎ হাত ঘসল।

ঘরের কোণে একটা চেয়ারে ভদ্রলোকটি যেভাবে বসেছিলেন, সেইভাবে বসে রইলেন। বড়বাবু ঘাড় ঘুরে ভদ্রলোকটিকে বললেন, 'একে নিয়ে যান। কাল পাঠিয়ে দিবেন। এর দ্বারা কিসসু হবে না—নিয়ে যান।'

'চলুন সয়র।' বলে ভদ্রলোক উঠে দাঁড়ালেন। আড়মোড়া ভাঙলেন। কোমড়, ঘাড় ঠিক করলেন। আমি একটু নড়ে উঠি। পা বাড়াই সামনের দিকে। ভদ্রলোক আমার পাশে এসে দাঁড়ালেন। লোক দুটোকে বললেন এগিয়ে যেতে। ওরা আগে আগে চলল, আমরা পিছু পিছু। বড়বাবু বললেন, 'দাঁড়ান।' আমরা ফিরে দাঁড়াই। 'আপনি বলেই ছাড়া পান না কেন, ছাড়া পেলেই আমার সঙ্গে দেখা করবেন।'

'কেন?'

'কেন কী? অ্যাকুপাংচারের বাকস নেবেন না?'

আমি মাথা ঝাঁকিয়ে বলি—'নেবো।'

'তবে! এখানেই থাকবে—কোন কিছুর ক্ষতি হবে না। চিন্তা নেই কিছু।'

আমি একটু হেসে ধন্যবাদ জানাই। উনি ফাইলের ওপর মুখ গুঁজে কী সব দেখতে থাকেন। আমরা ঘর থেকে বেরিয়ে আসি। বাইরে কোন লোকজন নেই। কেমন ছাড়া ছাড়া ছাড়া ছাড়া পরিবেশ। চারদিক অস্পষ্ট অন্ধকার। কুয়াশার মত কী সব জমে আছে আকাশে। দূরে থেকে একটা আলোর রেখা সামনে কাছে আসছিল। আমরা লন পেরিয়ে বাদাম গাছের নীচে চলে আসি। কোত্থেকে একটা গাড়ি নিঃশব্দে এসে আমাদের কাছে দাঁড়ায়। গাড়িটা বড় আর কালো। নাম জানি না। আমরা সবাই গাড়িতে উঠে বসি। গাড়ি ছেড়ে দেয়।

থানায় এসে যখন পৌঁছালাম রাত তখন সাড়ে নয়টা। ভদ্রলোক সারা রাস্তায় আমার সঙ্গে কোন কথা বলেননি। নিতান্ত নিস্তব্ধতার ভেতর দিয়ে আমরা চলে এসেছি। এইখানে—এই থানায়। সামনে একজন সিপাই দাঁড়িয়ে ছিল। হাতে রাইফেল, খোলা বেয়নেট। বুক টান, খালি পা। সে আমাদের দেখে স্যালুট দিল। কোন শব্দ হল না। আমরা থানার বাগানের ভেতর দিয়ে হাঁটতে থাকি। অন্ধকার বাগান, অন্ধকার হয়ে আছে।

'এখানে আজ রাতটা কষ্ট করে থাকুন কাল চলে যাবেন।'

'কোথায়?'

'যেখানে সবাই যায়—সেইখানে।'
বললাম 'যাবো।'

ভদ্রলোক আমার ঘাড়ে হাত রাখলেন। আমি ঘাড় থেকে ওঁর হাত ছাড়িয়ে বললাম, 'এসব আবার কেন?'

'এসব কী আর—এমনি।' বলে, ভদ্রলোক সিঁড়ির ওপরে পা রাখলেন। দূরে কে একজন দাঁড়িয়েছিল। সে হেঁটে এল। তারপর একটু সরে দাঁড়াল। আমরা ওর পাশ দিয়ে অফিস ঘরে চলে এলাম।

'নিয়ে এলাম এখানে...নতুন লোক একটু দেখে শুনে রাখবেন।' বলে ভদ্রলোকটি কাগজপত্র ও-সির টেবিলের ওপর রাখলেন। ও-সি বসে ছিলেন একা। ডাইনে-বাঁয়ে শূন্য চেয়ার। হাত বাড়িয়ে কাগজ ধরলেন। বললেন 'বসুন।'

'না এখন আর বসবো না—রাত হয়েছে চলি।'

ও-সি বললেন, 'ঠিক আছে—আসুন একদিন। আজকাল তো একদম এদিকে আসেনই না।'

'আসবো...আসবো।' বলে হাত তুলে ভদ্রলোক চলে গেলেন। ও-সি আমাকে চেয়ার দেখিয়ে বললেন, 'বসুন।' আমি সামনে এগিয়ে গিয়ে চেয়ার টেনে বসলাম। কোন কথা হল না।

ও-সি মাথা গুঁজে একমনে কাজ করতে থাকেন। কাজ করতে করতে উনি এক সময় বললেন, 'কতদিন ধরা পড়েছেন?'
বললাম, 'চৌদ্দ দিন।'

'মাত্র।' বলে ড্রয়ার খুলে কি একটা খুঁজলেন। না পেয়ে বেল বাজালেন। কনেস্টবল ঘরে ঢুকলো।

'একে লক-আপে দিয়ে এসো—যান ওর সঙ্গে।' বলে, আবার নিজের মনে কাজ করতে লাগলেন।

কনেস্টবলটি একটু দূরেই দাঁড়িয়ে ছিল। মুখ তুলে আমাকে দেখতে লাগল। আমি ওকে দেখতে দেখতে কাছাকাছি চলে আসি। ও হাঁটতে থাকে: আমি ওর সঙ্গে সঙ্গে হাঁটি। এই থানটা একটু পরিষ্কার। নতুন দালান। ঝকঝকে রং করা সব কিছু। আলো। খুব তেজী। সব কিছু স্পষ্ট দেখা যায়। বাগানটাকে কেন যে অন্ধকারে ফেলে রেখেছে আমার বুঝতে কষ্ট হচ্ছিল। মাঝখান দিয়ে সরু বারান্দা সোজা চলে গেছে দূরে। আশেপাশে ঘর। কোনটা বন্ধ কোনটা খোলা। আমি দেখতে দেখতে এগিয়ে যাচ্ছিলাম।

বারান্দার প্রায় শেষ প্রান্তে লক-আপ। একটা বালতি উল্টে পড়ে আছে পাশে। নীচের দিকে দু-একটা চায়ের ভাঁড় কাত হয়ে আছে। কনেস্টবলটি এক গোছা চাবি বার করে নম্বর মিলিয়ে মিলিয়ে লক-আপের তালা খুলল। শব্দ হল একটু। হাঁ করা লক্-আপের মুখের ভেতর দিয়ে আমি ভেতরে ঢুকে যাই। পেছন থেকে লক-আপ বন্ধ করার শব্দ হয়। একটা নির্জন হাহাকার আমাকে গ্রাস করতে থাকে।

(আগামীবারে সমাপ্ত)

লীলা মজুমদার

পাকদণ্ডী

সুন্দরকে নোটন নিজেও বড় ভালো-বাসত। নিজের সৌন্দর্য নিয়ে ওর ভারি একটা প্রসন্নতা ছিল। একবার আমাকে বলেছিল, 'ঠোঁটের তলার কোণে কুচকুচে কালো ছোট্ট গোল তিল থাকলে, মুখটা আরো সুন্দর দেখায়। ওকে বিউটি স্পট বলে।' আমি তখন পড়াশুনো করছিলাম, হাতে কুচকুচে কালো কাজল-কালি ভরা কলম ছিল। বললাম, 'আয়, তোর মুখে আমি বিউটি-স্পট বানিয়ে দিই। আমার মুখে তুই দে।' নোটন ভারি খুশী হয়ে আমার মুখে কলমে একটি কালো তিল বানিয়ে বলল, 'বাঃ, বেশ দেখাচ্ছে।' তখন আমি কলমটা নিয়ে ওর ঠোঁটের নিচে খুদে একটা মাকড়সা এঁকে দিলাম। যখন আটটা ঠ্যাং আঁকছি, ও একবার বলল, 'অত খোঁচা খোঁচা কি করছ ভাই? গোল হবে না?' আমি বললাম, 'হুঁ, হবে, কিন্তু এখানে তোর একটা টোল আছে কিনা, তাই অসুবিধা হচ্ছে।' ছোটবেলায় নোটনকে কখনো মিছে কথা বলতে শুনিনি। আর কেউ যে বলতে পারে ও স্বপ্নেও ভাবেনি: কাজেই মাকড়সা এঁকে আমি যখন তিলটার ভূরি-ভূরি প্রশংসা করতে লাগলাম, ও ভারি খুশী হয়ে বসে রইল। আয়নায় গিয়ে দেখল না পর্যন্ত। এমন সময় আমার মা এসে সব মাটি করে দিলেন। নোটনের মুখের দিকে তাকিয়ে ব্যস্ত হয়ে শূন্যে খামচা মারতে লাগলেন। নোটন বলল, 'ওরকম করছ কেন মাসিমা?' মা বললেন, 'ছোট একটা মাকড়সা রে।' মাকড়সা শুনে নোটন আঁৎকে উঠল, মাকড়সাতে তার বড় ভয়। তারপরেই মা বললেন, 'দাঁড়া দাঁড়া, এ যে আঁকা মাকড়সা দেখছি।' বলেই চোখ পাকিয়ে আমাকে বললেন, 'নিশ্চয় তোর কাজ?' নোটন এহেন বিশ্বাসঘাতকতায় ব্যথিত, মর্মাহত। কতক্ষণ ঐ মাকড়সার কুরূপের পাশে ওর মুখটা আরো সুন্দর দেখাচ্ছে তা কে জানে?

তবু সে আমাকে ক্ষমা করেছিল। এখানে ওখানে অদ্ভুত কথা বলে বলত, 'আমার লীলুদি বলেছে। তার চেয়ে তোমরা বেশি জান? সে ক্লাসে ফার্স্ট হয়।' এই নোটন তার মায়ের সঙ্গে হাসিমুখে আমাদের সঙ্গে ট্রেনে উঠে বসল। গাড়িটা আলো হয়ে রইল। মাসিমা অনেক চপ কাটলেট করে এনেছিলেন নৈশ ভোজের জন্য। আমরাও লুচি, আলুর দম, ফল মিষ্টি নিয়েছিলাম। বেশ জমেছিল। কিন্তু মাসিমার মনে সুখ ছিল না। সদাই নোটনকে নিয়ে ভাবনা। বাবাকে কেবলি বলছিলেন, 'দেখ, মুখটা একটু ফ্যাকাশে মনে হচ্ছে না?' বাবা বললেন, 'ফ্যাকাশে নয়, ফরসা।' মাসিমা বললেন, 'মোটে খিদে হয় না।' বাবা বললেন, 'বেশ তো খেল।' মাসিমা বললেন, 'কিন্তু খেলে আবার রাত্তে হাত-পা জ্বালা করে। কি করা যায় বল তো?' বাবার তো আর কখনো ধৈর্যের জন্য খ্যাতি ছিল না। এবার বললেন, 'কেটে ফেলে দে।' শৈশব থেকে চেনাশোনা, বাবা বড় শ্যালীকে তুই-তোকারি করতেন। মাসীমা ফোঁস করে এক দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলে চুপ করলেন। সকালে জলখাবারের সময় দেখা গেল আমাদের আলুর দমের গা থেকে গরমের চোটে লম্বা লম্বা শুঁয়ো মতো বেরিয়েছে, কিন্তু মাসিমার বাকি চপকাটলেট অক্ষত রয়েছে। মাসিমা আমাকে ঘরকন্নার পাঠ দিলেন, 'গরম জিনিস কখনো এঁটে বন্ধ করে রাখতে হয় না। ঠান্ডা হলে বন্ধ করলে টপ করে নষ্ট হয় না।' এই পাঠ যে পরে আমার কত কাজে লেগেছিল সে আর কি বলব।

হাজারিবাগে ছুটিটা খুব জমেছিল। সেখানে তখন উপেন্দ্রকিশোরের মেজ-জামাই অরুণনাথ চক্রবর্তী আর আমার মেজদি পুণ্যলতা ছিলেন। অরুণবাবু ওখানকার এস-ডি-ও। আমাদের জন্য সুন্দর বিলিতী কায়দায় তৈরি বাংলো ভাড়া করে দিয়েছিলেন। রোজ একসঙ্গে বেড়ানো, এদিকে ওদিকে দর্শনীয় স্থান দেখতে যাওয়া, রাম-গড়, ভেড়া নদী আর দামোদরের সঙ্গমস্থলে ছিন্নমস্তার ভয়াবহ মন্দির। বড় আনন্দে দিন কেটেছিল। আরেকটা কারণে আমার কাছে হাজারিবাগ যাওয়ার গুরুত্ব ছিল। সেখানে একজন বড় সুন্দর মানুষকে দেখলাম। তাঁর নাম কামিনী রায়। অনাত্মীয়া লেখিকা এই আমি প্রথম দেখলাম। চমরু-বাগ বলে ছোট্ট একটি বাড়িতে তাঁর পঙ্গু কিন্তু অতিশয় বুদ্ধি-মান এক ছেলেকে নিয়ে কিছুদিন থেকে বাস করছিলেন। বয়স হয়তো ষাটের কাছাকাছি। ঠিক বলতে পারছি না। চুল পেকেছে, থান পরা, কথায় বার্তায় বুদ্ধি ঝকমকাচ্ছে। দেখবা-মাত্র আমি আকৃষ্ট হয়েছিলাম। উনিও আমাকে খুব স্নেহ করতেন। ওঁর লেখা অসংখ্য কবিতা পড়ে শোনাতেন। বলতেন দুটি বই হয়ে কবিতাগুলি প্রকাশিত হবে, এখন কে লেখাগুলি বেছে দেয়। ওঁর ছেলে মনাদা তখনো বি-এ পড়ে, তার একার কর্ম নয়। আগ্রহের চোটে বললাম, 'আমি দেব।' দিয়েওছিলাম, তবে একা নয়। মনাদার ভারি সাহিত্যানুরাগ ছিল। যাকে নিয়ে তার ভারি গর্ব ছিল। দেখে ভালো লাগত। এর আগে আমাদের পাঠ্যপুস্তকে কামিনী রায়ের লেখা কবিতা পেয়েছিলাম। ইংরেজি কবিতার বাংলা রূপ। 'নাই কি রে সুখ? নাই কি রে সুখ? এ ধরা কি শুধু বিষাদময়।' সেটি হল লংফেলোর 'টেল মি নট ইন মোর্নফুল নাম্বার্স লাইফ ইজ বাট অ্যান এম্পটি ড্রীম' কবিতাটির বাংলা। সেই বয়স থেকেই আমি মৌলিক লেখার ভক্ত ছিলাম। অন্যের রচনা নিয়ে তাতে নিজের রঙ-ব্যাখ্যানা দিয়ে লেখা সম্বন্ধে আমার উৎসাহ ছিল না। তাই মনের মধ্যে কামিনী রায়কে বিশেষ স্থান দিই নি; এবার বুঝলাম তাঁর প্রতি অবিচার করে-ছিলাম। অপূর্ব সব মৌলিক রচনা আছে তাঁর। 'দীপ ও ধূপ' ইত্যাদি কাব্যগ্রন্থে আছে সেসব।

বিশেষ করে একটি কবিতার কথা মনে পড়ছে। কামিনী রায়ের তখনো বিবাহ হয়নি, সবাই তাঁকে কামিনী সেন বলে জানত। একদিন তাঁরা জগদীশ বসুর পরীক্ষাগারে গিয়ে অনুবীক্ষণ যন্ত্রে এক-ফোঁটা ময়লা জল দেখেছিলেন। তাতে প্রাণ-কণিকা ঝিকমিক করছে। তাই নিয়ে কবিতা। শুনে মুগ্ধ হয়ে গেছিলাম। অনেক পরে আবার ওটি পড়ে সমান ভালো লেগেছিল। খুব ইচ্ছা করত কবিতা লিখতে। কলেজের ম্যাগাজিনে ইংরিজিতে কিছু কিছু লিখে প্রশংসাও পেয়েছিলাম। কিন্তু নিজে জানতাম সেরকম কিছু হয়নি। এবার থেকে বাংলায় কবিতা লিখবার চেষ্টা করতাম। একটা খাতায়। সেটিকে ভরিয়ে ফেলে আরেকটা শুরু করেছিলাম। সুখের বিষয় ততদিনে মাস ছয় কেটে গেছিল এবং আমার জ্ঞান-চক্ষু ফুটে গেছিল। কাব্য আমার পন্থা নয়। মনকে এই বলে সান্ত্বনা দিতাম যে রস তো আর কবিতায় সীমাবদ্ধ নয়, অন্য পন্থাও আছে। কিন্তু আমি কখনো কবি হব না, একথা জেনে মনে বড় কষ্ট পেয়েছিলাম। এখন ভাবি অন্য লোকে সেকথা আবিষ্কার করবার আগে আমি নিজেই যে করেছিলাম সে আমার বহু ভাগ্য। তবে একেবারে যে কবিতা লিখি না তা নয়। মায় গান পর্যন্ত লিখেছি। তবে সেসবই আজ-গুবি, উদ্ভট, লোকে মজা করে লেখা। তাকে কাব্য বলে না।

(২২)

সতেরো বছর বয়স আমার। জীবনের মাধুর্যের দিকটা চোখের সামনে একটু একটু করে ফুটতে লাগল। সদাই উদগ্রীব হয়ে থাকতাম, এই বুঝি রোমাঞ্চময় কিছু ঘটবে।

ছোট জ্যাঠামশায়ের বড় মেয়ে, আমাদের বুলুদিও সে সময়ে হাজারিবাগে মেজোদির বাড়িতে ছিল। সেই ছিল রোমান্সের কেন্দ্রবিন্দু। তার মধ্যে ভারি একটা চমৎকারিত্বের সম্ভাবনা দেখতাম। আমার চাইতে সাত বছরের বড় উজ্জ্বল উচ্ছল স্বভাব। তার অনেক ভক্ত ছিল। তারা ওকে গোলাপফুল, চকোলেট, ফুল, রেনল্ডসের ইংরিজি উপন্যাস উপহার দিত। অন্তত ও আমাদের আগ্রহপূর্ণ উৎসুক কানে এইসব বলত। পরে এ নিয়ে বিশেষ সন্দেহ হত। ও নাকি তাদের মনে খুব আঘাত হানে। কখনো একটা ভালো কথা বলে না। উপহারগুলো ছুঁড়ে ফেলে দেয়। তাহলে নাকি ভক্তদের কাছে আদর বাড়ে।—এই অবধি শুনে আমরা প্রবল আপত্তি করেছিলাম। সে না হয় হল, কিন্তু অমন ভালো ভালো জিনিস ফেলে দেওয়ার মানে কি? বুলুদি আমাদের বুদ্ধির দৌড় দেখে কাষ্ঠ হেসে বলল, 'তোরা তো দেখছি ভারি বোকা! সত্যি কি আর ফেলে দিই? ওরা হতাশ হয়ে চলে গেলে পর পাড়ার ছেলেকে পাঠিয়ে জিনিসগুলো কুড়িয়ে এনে ফুলদানিতে সাজিয়ে রাখি, বইগুলো পড়ি, চকোলেটগুলো খেয়ে ফেলি।' আমি বললাম, 'সামনাসামনি নিলে কি হয়?' বুলুদি বলল, 'ছিঃ! বাইরের ছেলেদের দেওয়া উপহার কক্ষনো নিতে হয় না।'

কথাটা বোধ হয় ঠিক। কারণ মা-মাসিরও সেই মত। তবে দিদিকে আমাকে দেখে কারো ফুল চকোলেট দিতে বোধ হয় ইচ্ছা করত না। করলেও হয়তো বাবার ভয়ে কেউ দিতে সাহস পেত না। এক বুলাদা ছাড়া। এই মানুষটি যে আমাদের বাড়ি সুদ্ধ সকলের হৃদয়ের কতখানি জুড়ে ছিল, ৬৩ বছর বয়সে ওর মৃত্যুর পর পদে পদে সেকথা বুঝেছিলাম। ও ছিল বুলুদির সব ভক্তদের মধ্যে সব চাইতে নীরব। বুলাদার কথা বলতে গেলে অনেক কথা বলতে হয়, নইলে ওর ওপর অবিচার করা হবে। ওর ভালো নাম ছিল প্রফুল্লচন্দ্র মহলানবিশ। কবে থেকে যে ও আমাদের বাড়ির একজন হয়ে গেছিল মনে পড়ে না। ফ্যাকাশে, লম্বা মানুষটির চেহারার মধ্যে একটা আকর্ষণীয় কিছু ছিল। চমৎকার বাঁশী বাজাত; ভারি সুরেলা গলা ছিল, কিন্তু ভালো করে গানটান বড় একটা গাইত না, খালি গুন্‌ গুন্‌ করত। ছবি আঁকার হাত ছিল। সুন্দর গল্প লিখতে পারত, দু-একটা প্রবাসীতে বেরিয়েছিল। [illegible] মতো সুন্দর ছিল। লোকের সাহায্য করতে পারলেই কৃতার্থ। যার যত দায় ছিল, সব ও খুশী হয়ে এগিয়ে এসে নিজের ঘাড়ে তুলে নিত। আমি ওর মতো কাউকে দেখিনি। স্বনামধন্য প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশের ছোট ভাই। [illegible] ওদের [illegible] ও [illegible] দোকানটি ছিল [illegible] একটা সামাজিক মিলন স্থল। দোকানে বুলাদাই ছিল তার বাবার ডান হাত। ওর সঙ্গে কোথায় প্রথম দেখা হয়েছিল মনে নেই। সম্ভবত শিলং থেকে কলকাতায় এসেই, গড়পারের বাড়িতে।

প্রশান্তদা ছিলেন বড়দার বন্ধু, বুলাদা ছিল তাঁর ভক্ত। ভারি চমৎকার শিল্পী-মন ছিল তার। চেনা-জানা কারো বাড়িতে বিয়ে-থা হলে, ওকে ডেকে নিয়ে যেত ফুল সাজিয়ে দেবার জন্য। কোনো প্রশিক্ষণ পাওয়া শিল্পীরও এমন সৌন্দর্যবোধ ছিল না। আমার তখন হয়তো ১৩ বছর বয়স, বেঁটে, বেজায় রোগা, বড্ড কথা বলি—মোট কথা আমার মধ্যে আকর্ষণীয় কিছু ছিল বলে মনে হয় না। দিদি আমার চেয়ে বড় সাইজের ছিল, দেখতেও ভালো, কম কথাও বলত, কিন্তু ও-ও যে খুব আকর্ষণীয় ছিল মনে হয় না। তবু বুলাদা আমাদের রাশি রাশি আবদার সহ্য করত, ফাই-ফরমায়েস খেটে দিত। তখন আমরা রবীন্দ্রনাথের বেজায় ভক্ত। রবীন্দ্রনাথ কলকাতায় এলে বুলাদা তাঁকে এখানে-ওখানে নিয়ে যায়। রোজ দেখা হয়। আমি এক টাকা দিয়ে দু ইঞ্চি বাই তিন ইঞ্চি কালো চামড়া দিয়ে বাঁধানো একটা অটোগ্রাফ খাতা কিনে বুলাদাকে বললাম, 'রবীন্দ্রনাথকে দিয়ে কিছু লিখিয়ে আনো, পুরনো জিনিস না, নতুন কবিতা যেন হয়।' বুলাদা দু-তিন দিন বাদে খাতাটা দিয়ে গেল। তাতে রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন 'সাধের আখর কেন লিখিস আপন সকল কাজে? পারিস যদি প্রেমের আখর রাখিস জীবন মাঝে।'

যখন হাজারিবাগে গেছি তখন আমার বয়স সতেরো, বুলুদির চব্বিশ, বুলাদার সাতাশ। ততদিনে আমরা জেনে নিয়েছি যে বুলাদা হল বুলুদির ভক্ত, তাই আমাদের ওপর ওর অত টান। আসলে কিন্তু, নিঃস্ব-প্রেমিক যদি কেউ থেকে থাকে, সে হল বুলাদা। তাই বলে অবিশ্যি বুলুদির অন্য ভক্তদের ও খুব সুনজরে দেখত না। মুখে কিছু বলত না। বিশেষ করে ফর্সা, মোটা, পুলিশী ভালো চাকুরে এক পাণিপ্রার্থী ছিলেন, তাঁকে দেখলেই বুলাদার মুখ গম্ভীর হয়ে যেত। আমরা ছিলাম বুলাদার দলে। ওকে এই বলে আশ্বাস দিতে ইচ্ছা করত যে বুলুদি বলেছে সেই লোকটি পাঁউরুটির মতো দেখতে, কাজেই ওঁর কাছ থেকে কোনো আশঙ্কার কারণ নেই। দুঃখের বিষয় এত পক্ষপাতিত্ব সত্ত্বেও কিছু বলতে সাহস পাইনি কারণ ছোটবেলা থেকেই, আমাকে মুখ তুলতে দেখলেই বড়রা বলতেন, 'এই! মুখ বন্ধ!' সে যাই হক আমরা হাজারিবাগে থাকতে থাকতে বুলাদা বার দুই মোটর সাইকেলে করে ঘুরে গেছিল। আমাদের মনে হত সীতাদেবী শান্তাদেবীর কোনো রোমান্টিক উপন্যাসের ঠিক মাঝখানে বসেছি। বুলুদির মনের ভাব বোঝা দায় ছিল। এত বেশি কথা বলে, এত কম কথা প্রকাশ করতে আর কাউকে দেখিনি। এর মধ্যে আসলে একটু বেদনার ইতিহাসও ছিল। বুলুদির দাদা বুলাদার এক নিকট আত্মীয়াকে বিয়ে করবে বলে বিলেত গিয়ে মেম এনেছিল বলে বুলুদির মনে বোধহয় ভারি একটা অপরাধ বোধ ছিল। তাই বোধ হয় বুলাদাকে দেখলেই ওর মেজাজ বিগড়ে যেত। তাছাড়া সব উপন্যাসেই দেখতাম প্রেমের পথ খুব সহজ নয়। সে যাই হক, এর পরেই ইউ রায় অ্যান্ড সন্স লাটে উঠেছিল, বাড়ির বাসিন্দারা এদিকে-ওদিকে ছড়িয়ে পড়েছিল, মেজজ্যাঠাইমা সুন্দর জ্যাঠামশায়ের বাড়িতে উঠে, কয়েক মাসের মধ্যেই মারা গেলেন, এসব কথা আগেই অন্য প্রসঙ্গে বলেছি। বুলুদি আমাদের বাড়িতে এসেছিল। ১৯২৮ সালে বুলাদার সঙ্গে তার বিয়ে হয়। বলা বাহুল্য বুলুদির সমস্ত আত্মীয়স্বজনরা এতে আহ্লাদে আটখানা হয়েছিলেন। বিশেষ করে আমার মা বাবা। পরে আমার বিয়ের সময়ে বাবা যতখানি ক্ষুণ্ণ ক্ষুব্ধ হয়েছিলেন, বুলুদির বিয়েতে সেই রকম আনন্দিত হয়েছিলেন। এই আমার সান্ত্বনা।

হাজারিবাগে মাসিমা হঠাৎ বললেন, 'তোদের বাবার এত উন্নতি হল, নিজ গুণে ইম্পিরিয়েল সার্ভিস হয়ে গেল, কই তোরা তো কিছু বলছিস না।' শুনে আমরা অবাক! বাবার যে উন্নতি হয়েছে তা এই প্রথম শুনলাম। ঐ রকম ছিলেন আমার বাবা: নিজের কিংবা ছেলেমেয়েদের সাফল্যে এতটুকু উল্লাস প্রকাশ করতেন না। সময়কালে আমি যখন বিশ্ববিদ্যালয়ের শীর্ষস্থান অধিকার করেছিলাম, তখনো [illegible] সোনার গয়না দেওয়া বা ভোজের আয়োজন করা দূরে থাকুক, একবারও [illegible] বলেননি, 'আমি খুশী হয়েছি।' কিন্তু খুশী নিশ্চয়ই হতেন। অথচ অখুশীর বেলা সেকথা পঞ্চমুখে প্রকাশ করতেন। এখনো ভাবি ঐ দুটি কথা বললেই তো আমার মন ভরে যেত। কি এক কড়া স্বভাবের মানুষ ছিলেন বাবা যে কিছুতেই মুখে প্রসন্নতার কথা আনতেন না। এখনো ভাবলে দুঃখ হয়। তখন খুশী হলেন কিনা তাও বুঝতে পারতাম না। তবে বুলুদির বিয়েতে নিঃসন্দেহে খুশী হয়ে, দু হাতে টাকা-কড়ি খরচ করেছিলেন।

মাসিমার ও কথায় মাকে গিয়ে জিজ্ঞাসা করেছিলেন। বাবার ততদিনে ছুটি ফুরিয়ে গেছিল, উনি কলকাতায় ফিরে গেছিলেন। মা আরো বললেন যে কলকাতায় ফিরে আমরা আর ঐ ছোট ফ্ল্যাটে উঠব না; গড়পারের সংসার উঠে যাচ্ছে, মণিদা, নানকুদা, বুলুদি আমাদের বাড়িতে আসবে। ছোট জ্যাঠামশাই আর মেজজ্যাঠাইমা সুন্দর জ্যাঠার বাড়িতে যাবেন। মেজবৌদি, বড়বৌদি তখনকার মতো বাপের বাড়ি যাবেন। কি আর বলব, শুনে বুকটা দুরু-দুরু করে উঠেছিল। কত স্বপ্নের মত আমার ঐ ১০০ নং গড়পার রোডের বাড়ি। আজ পর্যন্ত প্রেসের ঝমঝম শব্দ কানে বাজে, ছাপার কালির গন্ধ নাকে আসে। কখনো কোনো ছাপাখানায়, প্রকাশালয়ে কিংবা বইয়ের দোকানে পা দিলেই মনের মধ্যে কে যেন বলে—এই আমি বাপের বাড়ি এলাম। ইচ্ছে করে নতুন ছাপা বইতে নাক ডুবিয়ে সারাদিন বসে থাকি।

শুনলাম-কিছুই মারা যাবে না। শুধু, মানিক নাবালক ছেলে সবে বাপের [illegible]

পাশে আর সামান্য একটা যাতায়াত। মায়ের কথায় চোখের সামনে স্বপ্নের প্রাসাদ ঝুরঝুর করে ভেঙে পড়ল। আমরা নাকি জাস্টিস চন্দ্রমাধব রোডে একটা বড় তিনতলা বাড়িতে উঠে যাব। সেখানে সকলের জায়গা হবে। বাবা এখন থেকে বাড়ি ভাড়া বাবদ মোটা টাকা পাবেন। আমরা রইলাম হাজারিবাগে। বাবাই বাড়ি ঠিক করে, আমাদের সামান্য যা আসবাব জিনিসপত্র ছিল সব নতুন বাড়িতে তুললেন। আপিসের চাপরাশি, চৌকিদার, বাড়ির চাকররা আর বাবার বন্ধুরা সাহায্য করলেন। মাকে কোনো মতামত প্রকাশ করতে শুনিনি। বাবা যা ব্যবস্থা করতেন, মা তাতেই খুশী থাকতেন।

এক্ষেত্রে কলকাতায় ফিরে দেখলাম রাস্তাটা ভালো, বাড়ির সামনে খুদে এক তে-কোণা ঘাস জমিতে মস্ত একটা কৃষ্ণচূড়ো গাছ লালে লাল হয়ে আছে। বড় বড় ঘর, বড় বড় জানালা, তিন পাশে একতলা বাড়ি, খোলামেলা, তিনতলায় আমাদের শোবার ঘরের পাশে জাল দিয়ে ঘেরা সুন্দর একটি বারান্দা। সেখান থেকে অর্ধেক ভবানীপুর দেখা যায়। ঐ বারান্দায় কয়েক বছর ধরে কত যে কবিতা পড়েছি, স্বপ্ন দেখেছি, পরীক্ষার পড়া তৈরি করেছি, পাঁচজনে মিলে কত গল্প করেছি, তার ঠিক নেই। তবু বসা রোডের ছোট ফ্ল্যাটের গাদাগাদি করে থাকা দিনগুলোর জন্য মন কেমন করত।

হাজারিবাগেও বড় আনন্দে ছিলাম। বাড়ির পেছনে একটা মাঠ। মাঠের ওপারে পোস্টাফিস, সেখানে জানালা দিয়ে রোজ বেলা এগারোটা থেকে চিঠিপত্র বিলি হত। পোস্টাপিসের পাশে বুথ সায়েবের বাড়ি। তাঁর দশটা মেয়ে, কেউই খুব কালো নয়, দেখতেও মন্দ নয়। পোস্টাপিসের সামনে পুলিশ সার্জেন্টদের প্রশিক্ষণ কেন্দ্র। শুনলাম কচি কচি সার্জেন্ট ধরে সায়েব এর আগেই নটা মেয়েকে পার করেছেন, এবার দশ নম্বরের মহড়া দেওয়া হচ্ছে। আমরা থাকতে থাকতেই পোস্টাপিস থেকে চিঠি আনতে গিয়ে কে যেন শুনে এল দশ নম্বরও বাগদত্তা হয়েছে। সার্জেন্টদের নিস্তার ছিল না।

মেজদি ভারি রসিক মানুষ ছিলেন আর যেমন রান্নায়, তেমনি কারু সেলাইতে দক্ষ। মেজ জ্যাঠাইমার হাতে যতগুলি মেয়ে মানুষ হয়েছিল, সব কটি বেজায় ভালো রাঁধিয়ে। শুধু ঘরোয়া রান্নায় সিদ্ধহস্ত নয়, পান্তুয়া রসগোল্লা, কেক পুডিং, রোস্ট থেকে শুরু করে পেশাদার ময়রার হাতের খাজার মতো খাজা পর্যন্ত। শেষেরটিতে আমার বড়দি, সুলেখিকা সুখলতা সব চাইতে পারদর্শী ছিলেন। সঙ্গে সঙ্গে এঁরা লেখাপড়া গান বাজনাও শিখেছিলেন। খালি মায়ের গলায় গান আসত না, দিদির আমারও যেমন আসে না। ছবি আঁকতেও সব ওস্তাদ আর এঁদের স্বামীসেবা দেখে অবাক হতাম। বড়দির একটু মেজাজ ছিল, মাকে কিংবা মেজদিকে কখনো প্রকাশ্যে স্বামীর সঙ্গে তর্ক করতেও শুনিনি। অবিশ্যি সে ব্যবস্থার আমি খুব প্রশংসা করতে পারছি না। কারণ কিঞ্চিৎ ন্যায্য কথা না শোনালে পুরুষদের বড্ড বাড় বেড়ে যায়।

যতই ফেরবার সময় কাছে আসে, আমাদের ভ্রমণের নেশা ততই বাড়ে। শহরের ভেতরটা দেখতে কিছু বাকি রাখা হয়নি, কানহারি পাহাড়, লেক, কলাম্বাস কলেজ ইত্যাদি দেখা হয়ে গেছিল। এর মধ্যে দাদা-মশায়ের এক শিষ্যবাড়ি থেকে কি করে আমাদের পরিচয় পেয়ে, নেমন্তন্ন করে নিয়ে গেল। কি ভালো লোক তাঁরা সে আর কি বলব। দাদামশাই ১৯০২ সনে কাশীতে মারা যান, আমি বলছি ১৯২৫ সালের কথা। ইতিমধ্যে তাঁর প্রকৃত শিষ্যরা সবাই স্বর্গলোকে গেছেন, তবে তাঁদের ছেলে-বৌরা আছেন। তাঁদের কেউ কেউ দাদামশাইকে চাক্ষুষ দেখেছিলেন। কিন্তু বইপত্র ছিল তাঁদের কাছে, কি নই তা আর খুলে দেখাননি। একটা আসন, তা সে বাঘ-ছাল না হরিণের চামড়া মনে করতে পারছি না; আর একটা মস্ত বড় চীনে মাটির পেয়ালা। তাতে করে দাদামশাই চা খেতেন। এত বড় পেয়ালা আজ পর্যন্ত আর দেখিনি। অবনীন্দ্রনাথের কোনো বইতে পড়েছি যে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরও মস্ত এক পেয়ালায় চা খেতেন। একবার কে যেন সে পেয়ালাটি ভেঙে ফেলাতে, মহর্ষির বড় নাতি দীপু ঠাকুর সমস্ত চীনা বাজার ঘুরে তবে একটি পেয়েছিলেন। তাও বোধ হয় বুড়ো ভদ্রলোকের খুব পছন্দ হয়নি। আমার সেদিন ঐ পেয়ালাতে হাত বোলাতে ইচ্ছা করছিল। কিন্তু ওঁরা এমন আলগোছে ধরে দেখাচ্ছিলেন যে ঠিক সাহস পাইনি। দাদা-মশায়ের ব্যবহার করা কোনো জিনিস আমি চোখে দেখিনি। মায়ের কাছে একখানি চিঠি পর্যন্ত ছিল না। দাদামশায়ের মৃত্যুর পর তাঁর সামান্য যা কিছু সংসার-জীবনের সম্পত্তি ছিল, ওঁর শিষ্যরা কেউ কেউ সেগুলি ওঁর প্রতিষ্ঠিত ছোট আশ্রমটির জন্য দাবি করেছিলেন। তখন বড় মাসিমার বিয়ে হয়ে গেছিল। মেসোমশাই অন্যান্য শালীদের সম্পত্তি যাতে অপরে না নেয় তাই মামলা করেছিলেন। ঐ মামলা বেশ মনোজ্ঞ। বিচারপতি রায় দিয়েছিলেন যে ঐ সম্পত্তির ওপর আশ্রমের কোনো দাবি থাকতে পারে না। যে মুহূর্তে নিজের শাস্ত্রমত করে কেউ সন্ন্যাসী হন, সেই মুহূর্তে সংসারের কাছে সে মৃত। মৃতের সম্পত্তি তখনি তার ন্যায্য ওয়ারিশদের হাতে যায়। সে সময় আশ্রমের অস্তিত্ব ছিল না, তাই ন্যায্য ওয়ারিশ হলেন দাদামশায়ের তিন মেয়ে।

মায়ের কাছে শুনেছি তাঁর মন এই ব্যাপারে এতই বিরূপ হয়ে উঠেছিল যে সেই ১৬-১৭ বছর বয়সেই তিনি তাঁর ভাগটি জ্যাঠামশাইকে বলে ব্রাহ্মসমাজের দরিদ্র ভাণ্ডারে আমার দিদিমার নামে দান করেছিলেন। দুঃখের বিষয় মা-মাসিদের পরিচয়ের প্রমাণস্বরূপ দাদামশায়ের লেখা যাবতীয় চিঠিপত্র আদালতে উপ-স্থাপিত করতে হয়েছিল। সেগুলি তাঁরা আর ফেরত পাননি। উকীল বলেছিলেন নাকি হারিয়ে গেছে। এই নিয়ে মাকে আক্ষেপ করতে শুনেছি। বিশেষত সবার শেষে লেখা চিঠিখানিতে দাদামশাই মাকে বলেছিলেন, মায়ের এণ্ট্রান্স পরীক্ষা হয়ে গেলে, মাকে কিছুদিনের জন্য তাঁর কাছে নিয়ে আসবেন। আমরা মাকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম 'দাদামশাই ডাকলে তুমি এঁদের ছেড়ে চলে যেতে?' মা অবাক হয়ে বলে-ছিলেন 'সেই মুহূর্তেই চলে যেতাম। যদিও এঁরা আমাকে মানুষ করেছিলেন।' ঐ পেয়ালার কথায় এত কথা মনে পড়ছে।

একটা আনন্দের বিষয় হল শ্রীউমাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের আগ্রহে আর প্রকাশক মিত্র ঘোষের চেষ্টায় 'সাহিত্য' পত্রিকায় ১৯০০-১৯০১ সালে 'হিমারণ্য' নামে দাদামশায়ের লেখা কৈলাস ও মানস সরোবর ভ্রমণের যে কাহিনী ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়েছিল, সেটি সংগৃহ হয়েছে। তাঁর সংক্ষিপ্ত জীবনী সহকারে মিত্র ঘোষ সেটি পুস্তকাকারে প্রকাশ করতে আগ্রহী। দাদামশায়ের সেই আসন আর পেয়ালা দেখে এসে, আমিই যে [illegible] তা নয়, মা মাসিরা [illegible] দেখেছিলাম। ও বই বেরুলে তাঁরা বড়ই খুশী হতেন।

কলকাতায় ফিরে আসার কিছুদিন আগে আমাদের ভগ্নীপতি অরুণনাথ চক্রবর্তী হঠাৎ এসে বললেন, 'কাল সারা দিনের জন্য কে কে [illegible] দেখতে যাবে? জায়গাটায় ভারি কুখ্যাতি। যারাই যায় তাদের একটা না একটা অ্যাক্সিডেন্ট হয়। কে কে যাবে বল।' মাসিমা বললেন, 'নোটন আর আমি যাব না। আমাদেরো যাবার কি দরকার আছে?' অরুণবাবু বললেন, 'আমাকে একটা তদন্তে যেতেই হবে। তিনটে গাড়ি আসবে, [illegible] যেতে পারে।' অমনি সবাই ঝুলে পড়ল, সবাই যাবে, নোটনও। শেষ পর্যন্ত [illegible] আর শীতের সর্দি-কাশির জন্য ওরা গেল না, মা তো সবে রোগ থেকে সেরে উঠেছেন, মা গেলেন না। মাসিমা গেলেন না। [illegible] জায়গা হল না। বাকিরা গাদাগাদি করে গাড়িতে চেপে বসলাম। আমরা ৫ ভাইবোন, অশোক, নোটন, অরুণবাবু, মানকুমা, ওদের বাড়ির পাঁচটা ছেলেমেয়ে। আর দুটি ড্রাইভার। আমরা কেউ-ই সাধারণত [illegible] খাদ্যাদি না নিয়ে এক পা নড়তাম না। কিন্তু অরুণবাবু বললেন, 'ওদের বাড়ি তারা প্রচুর খাওয়াবে, জল পর্যন্ত নেবার দরকার নেই।' ১৭ জন লোক জল কিংবা খাবার না নিয়ে অমনি রওনা হয়ে গেলাম।

(ক্রমশঃ)

গৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য

আশু কাকা আমার কাকা নয়, আসলে কেউ নয়। কিন্তু এই কথাটা নিজে ত ভাবতামই না, যদি কেউ ভাবাতে চাইত তাহলে মনে মনে খুব যন্ত্রণা অনুভব করতাম। কেন, তা জানি না। হয়ত আমাদের পরিবারে পর-পর ভাবার ব্যাপারটাই আমল পেত না বলে এরকমটা হত। সন্ধ্যের পর, বাইরের খোলা বারান্দায় বুকে আতা গাছের ছায়াটা চাঁদের আলোয় হেলে-দুলে হাওয়ার খবর দিত তখন সুশীলা কাকী গলি পথে দিয়ে টুক করে এসে উঠতো আর আমরা ছেঁকে ধরতাম 'কাকী একটা গপ্প বলো!' কাকীর গলাটা ভারি মিষ্টি, হয়ত বলার ধরনটাও—তাই বাচ্ছারা ওঁকে খুব ভালবাসত। কাকীও ছেলে-মেয়ে ভারি পছন্দ করত। লুকিয়ে-চুরিয়ে এটা-ওটা এনে খাওয়াতো। কানে-কানে সাবধান বাণী 'কত্তামাকে বলিস না যেন।' কত্তামা আমাদের ঠাকুমা, তাঁর আচারবিচারের দাপটে বাড়ির সবাই তটস্থ। কিন্তু সুশীলের গলা পেলে তিনিও সাড়া দিতেন—'কে সুশীলা এলি? বস'—এবং এসে বসতেন, তবে ছোঁয়া বাঁচিয়ে।

—সুশীলা—অ—সুশীলা—

আশু কাকা লণ্ঠন আর লাঠি হাতে রাস্তায় দাঁড়িয়ে হাঁক পাড়লেই সুশীলা কাকী ব্যস্ত হয়ে উঠে পড়ত। গল্পের রাজপুত্র তখন জঙ্গলে থাকলেও উদ্ধার করার উপায় নেই; যেপে ধরা আঁচলটা ছাড়িয়ে নিয়ে যেতে যেতেই কাকী বলত—বাকীটা আবার রাম রাত্তির পোহালে শুনো সোনা। মানুষটা তেতে-পুড়ে এতটা পথ হেঁটে এসেছে—

কাশিমবাজার রাজবাড়ির পাইক রাস-বিহারী দাস। কিন্তু ওই নামে কেউ তাকে ডাকে না, হয়ত ডাকলে আশু কাকার সাড়াই পাবে না। নিজেই ভুলে গিয়েছে। যারা অল্প পরিচিত তাদের কাছে রাসা বোরেগী আর পাড়ার সবাই ডাকে আশু বোরেগী। বৈরাগ্যের পরিচয় যদি তুলসীর মালা হয়, আশু আলবাৎ বৈরাগী। না, আরও আছে, আশু খুব ভাল খোলবাজ, গলায় সুর না থাকলেও তালের দিক দিয়ে পয়লা নম্বর সেয়ানা। আশুর ডাক পড়ে তাই বৈষ্ণবদের আখড়াতে, খুলোটের নগরপরিক্রমায়। শুনেছি মহারাজ মণীন্দ্রচন্দ্র যখন খুলোটে খালি পায়ে, খালি গায়ে শহরে হরিনামে বেরোতেন আশু কাকাও সে দলে থাকত। এই রকম বায়নাতে অনেক সময়ে কাকা রাতে বাড়ি ফিরতে পারত না। কাকী তখন হয় আমাদের বাড়ি মায়ের ঘরে মেঝেতে আস্তানা নিত, কাকী মায়ের ঝামাচি মেরে দিত। আঁচল বিছিয়ে রাতও কাটাত। নয়ত আমাদের সাধাসাধি করত ওর ঘরে থাকবার জন্য। এতেই আমাদের ভাই-বোনের উৎসাহ বেশি। ফুরু ওর বেড়াল নন্দদুলকে সঙ্গে নিয়ে যেত আর গল্পের মাঝখানেই ঘুমিয়ে পড়ত। কাকীর একটিই শর্ত—'হুঁ' দিতে হবে। 'হুঁ' না দিলে গল্প বন্ধ। যা-ই হোক, কাকী একা থাকতে পারত না।

মাঝে মাঝে কাকী বাপের বাড়ি যেত গরুর গাড়ি করে। গঙ্গার ওপারে পাড়া-গাঁয়ে বাপের বাড়ি। তখন গলিটা বড় শূন্য মনে হত। আশু কাকাকে তখন দিনের বেলা বড় একটা দেখতাম না। রাতে মাঝে মাঝে প্রাচীরের ওপার থেকে হুঁকো টানার শব্দ আর দা-কাটা তামাকের কড়া গন্ধে টের পাওয়া যেত কাকা ঘরে ফিরেছে। কখনও বা ভাঙা গলায় জিজ্ঞাসা করত—'বরুণ বাবাজী আছ নাকি?'

বরুণ বাবাজীর সঙ্গে যে কোন কাজের কথা আছে তা নয়, তবে ওই সুবাদে খোঁজ-খবর দেওয়া-নেওয়া আর সেটা বৌঠাকুরানের সঙ্গে। —'সুশীলা কবে আসবে?' মায়ের প্রশ্ন। এবং প্রশ্নটা জরুরী, কেন না, সুশীলার জন্যে মা মিশনহোমের নীরদ দিদির কাছে দরবার করে কিছু সেলাই-ফোঁড়াই জোগাড় করে রেখেছে। অবসর সময়ে যাতে গরীব বৌটা দু পয়সা আয় করতে পারে সেদিকে মায়ের নজর। শুধু সুশীলা কেন, পাড়ার অনেক বিধবা, সধবা, কুমারী মেয়েই মায়ের এই নামহীন ইনস্টি-টিউশনের অলিখিত সদস্য। গোরাবাজারের হোম থেকে প্রতি শনিবার দুপুরে ঘোড়ার গাড়ি এসে লাগে আমাদের বারবাড়ির দরজায়। কাঁধে সেফটিপিন আঁটা ধবধবে শাড়ি পরা নীরদা দিদি এবং তাঁর সঙ্গে আরও দু-একজন টীচার গাড়ি থেকে নামেন। খুব সাদাসিধে বেশবাসও যে পরিচ্ছন্নতার ফলে অসাধারণ হতে পারে তা এঁদের না দেখলে ছেলেবেলায় ধারণাই হত না। না, তার চেয়ে বরং বলা ভাল যে, ওঁদের দেখে সেই যে ধারণা হয়েছিল সাদাই হল শ্রেষ্ঠ রং সে ধারণা কোন দিনই বদলা

না। আমাদের মনে গেঁথে গিয়েছিল 'টীচার' আর কম্পাউন্ডার 'খৃস্টান।' বস্তুত দুই-এ মিলে দাঁড়াল ফিটফাট মানে টীচার আর টীচার বুঝি খৃস্টান ছাড়া দুনিয়ায় নেই!

যেদিন ওঁরা এসরাজ, বেহালা সঙ্গে আনতেন সেদিন আমরা সব কিছু ফেলে ভেতর বাড়ির বারান্দা থেকে ছাদের সিঁড়িতে গেড়ে বসে থাকতাম। প্রথমে কাজ আর কাজের কথা। কাকে কি সেলাই বরাত দেওয়া হয়েছিল, খাতা দেখে মিলিয়ে 'বুঝে' নেওয়া চলত—হিসেব করে মোট দক্ষিণার টাকা মায়ের হাতে দেওয়ার পর, নতুন কাজগুলো একে একে বুঝিয়ে দেওয়া হত। সাধারণ ঘরের মেয়েদের হাতের বেডকভারে এমব্রয়ডারির কাজ, ক্রুশের বোনা টেবল ক্লথ, রুমাল, খঞ্চিপোশ, পুঁতির ঝালর দেওয়া কত রকমারী সূচীশিল্প এই বৈঠকে দেখতাম তা আজ ভাবলে অবাক লাগে। কিছুই ত বুঝতাম না, শুধু ভাল লাগাতেই সব সমঝদারির শেষ। টীচাররাই কাপড়, সুতো, ছুঁচ, থিমবল, ফ্রেম সব সঙ্গে আনতেন। মায়ের কাজ ছিল ম্যাচিং সুতো আর তার পরিমাণ হিসেব করে গুছিয়ে নেওয়া। নীরদা দিদি সেলাই বেশ ভালই বুঝতেন তবে সাবিত্রী দির চয়েসের কাছে সর্বদাই নতি স্বীকার করতেন। মাকে উনি কখনো ওই নামে ডাকতেন, কখনো প্রিন্সিপাল বলতেন।

কথা হচ্ছিল আশু বোরেগীর সম্পর্কে তা থেকে আমরা কোথায় চলে এলাম! আপাতদৃষ্টিতে যোগসূত্র না দেখা গেলেও ব্যাপারটা মোটেই বিচ্ছিন্ন করে দেখান যাবে না। যে কিশোরটি নীরদা দিদিদের সাপ্তাহিক কর্মকান্ড চাক্ষুষ করেছে এবং এসরাজ, বেহালার সঙ্গে সুর মেলানো প্রার্থনা সঙ্গীত শুনেছে তার দৃষ্টির বাইরে আমরা যাই কি করে? অথবা তার সেই অপরিসীম কৌতূহল আর অতল বিস্ময় জড়ান মনের দরিয়ায় ভাসমান কোন স্মৃতিকেই বা অবান্তর বলে বাদ দেওয়া চলে তা কে নির্ণয় করবে? অতএব বিশল্যকরণীর বিশেষত্ব না জানা থাকলে গন্ধমাদন পর্বতটা বয়ে আনা ছাড়া উপায়ই বা কী! ভরসা এই যে, পাঠকের মত এমন সহৃদয় আর সহিষ্ণু সমাজে বিরল।

পাইক আশু বোরেগীকে বৈরাগ্য ব্যামোতে ধরে নি তার জলজ্যান্ত প্রমাণ মিলল যেদিন কৌশল্যা কাকী সংসার করতে এল। প্রথমে অবশ্য বাইরের লোকে কিছুই টের পায় নি। তবে মায়ের অজানা ছিল না কিছুই। সুশীলা কাকী অনেক আগেই খবর দিয়েছিল, আশু কাকা দইহাটার ওদিকে কোথায় এক মেছুনীর সঙ্গে কণ্ঠী বদল করেছে। একেবারে ঘর করতে আসার আগে দু-চার দিন এ পাড়াতে 'মাছ লিবাগো মুটা মাছ কেটে দিব, মাছ লিবা গো—।' হাঁক পেড়ে মাছ বেচে গিয়েছে কৌশল্যা। আমাদের বাড়িতে যেদিন মাছ দিয়ে গেল প্রথম সেদিন মা বলেছিলেন—মানুষটার খুব মুখ মিষ্টি আর দামও শস্তা নিল। পচা-ধচাও নয়—হয়ত বাজারে আমদানী বেশি তাই পাড়ায় ঘুরে কাটাতে চায়। তখন কাটা মাছের দর ছিল খুব বেশি হলে চার আনা সের! হ্যাঁ, সত্যিই তাই। না-ই বা হবে কেন, রসগোল্লা-ছানাবড়াও চার আনা, চড়লে পাঁচ আনা। দুধ টাকায় ষোল সের তাও মাসকাবারে পেমেন্ট। আর চাল—। বাড়ি বাড়ি মাথায় করে বস্তা বোঝাই চাল এনে ঢেলে ওজন করে দিত তমেজ মিয়া 'রাম-এ রাম-দুই-এ দুই—' করে টাকায় ষোল সের রামসাল। রাম দিয়ে শুরু করার রীতিতে হিন্দু-মুসলমান কোন ফারাক ছিল না। ধর্ম তখন পথেঘাটে ঘটা করে জাহিরের বস্তু ছিল না, ওটা ঘরে যত্ন করে রেখে যে-যার নিজের কাজ-কারবারে বেরুত। অন্তত সাধারণ মানুষেরা ত বটেই!

পরে যখন কৌশল্যাও কাকী হয়ে এল তখন সুশীলা কাকীর জন্যে মায়ের দরবার করে কিছু লাভ হল না। আশু কাকাকে জিজ্ঞাসাবাদ করলে হরির দোহাই পেড়ে বলে তাঁর দয়া হলে সেরে উঠবে তখন আসবে বই কি, এখানে পড়ে থাকলে দেখবে কে। সুশীলার কি অসুখ সেটা আশু কাকা বলে না।

এই অবস্থায় একদিন কৌশল্যা এল কাকার ঘরে—একেবারে ছেলে কোলে করে। ছেলেটা হামাগুড়ি দেয়, তার কোমরে রুপোর গোট। কালো কুচকুচে তেল পিছল নিটোল অঙ্গে রুপোর গোটের জৌলুস যেন অমাবস্যায় চাঁদের উদয়। ছেলেটা মায়ের রং পেয়েছে, বাপেরও বলা যায়। এমনিতে হতকুচ্ছিৎ নয় তবে নাকের তলা থেকে দাঁতের মাড়ি পর্যন্ত কে যেন ধারাল ছুরি দিয়ে কেটে নিয়েছে—সোজা নয়, তেরছা-ভাবে কাটা। ওর মা বলে—শংকরা আমাদের গোপাল। বোরেগীর বংশে বাতি দিতে কেউ থাকবে না তা বুঝি ঠাকুরের সইল না।

পাড়ার লোকে ব্যাপারটা সুনজরে দেখল না, কৌশল্যা সেটা জেনেই এসেছিল। তাই মাছের ঝুড়ি বঁটি মাথায় করে, ছেলেটাকে কাঁখালে নিয়ে বাড়ি-বাড়ি মাছ বেচতে শুরু করল। নিজেই সাফাই গায়—বোরেগীর কষ্ট দেখে মরা মানুষেরও চোখ ফেটে জল আসে! আর সবই সেই! কখনো বলে—এইবার সুশীলাকে আনতে হবে। ছেল্যা ত তারই, সে ত বোরেগী বিহ-তা করা ইস্তিরি। গণক ঠাকুর বাই বলেল সুশল্যা বাঁজা তাই—ছেল্যা দিয়া উয়ার কোলে আমি আপন ঝাড়ার হাত-পা হতে পারলে বাঁচি!

আশু কাকার কোন বিকার বৈলক্ষণ্য নেই। ছেলেটাকে একটু আদর করে বটে, তাছাড়া আর সবই গতানুগতিক। তবে একটা ব্যাপার আমরা ছোট হলেও টের পেলাম, কৌশল্যা কাকী গলাবাজি করে আশু কাকার ওপর হুকুম চালায়। এবং তার হুকুমেই আশু কাকা একদিন তেলপাকানো লাঠিখানা নিয়ে ফতুয়া গায়ে চড়িয়ে সুশীলা কাকীকে আনতে গেল রুকুনপুরে। যাবার আগে মায়ের কাছে একটু কান্নাকাটি করল—'বৌঠাকুরান, সুশল্যাকে ত আনতে যেছি। কাজটা ভাল হচ্ছে কিনা ঠাকুরই জানেন। তবে আপনার কাছে ব্যাগোত্তা বৌঠাকরান সতীনে-সতীনে ঝগড়া-কোঁদল হলে আপনাকে জগদ্ধাত্রীর মত আগলাতে হবে। হেই বৌঠাকরান আপনিই ভরসা—!'

মায়ের এক বিচিত্র হাসি আছে যে হাসি সত্যি ভরসা দেয়। সেই অনন্য হাসি হেসে তিনি বলেছিলেন — বোরেগী ঠাকুরপো এসো গিয়ে। ভগবান যা করেন মঙ্গলের জন্যে—। তাছাড়া সুশীলার বড় সাধ ছিল ছেলের।

শংকরা বড় হয়ে উঠল আমাদের চোখের সামনে। বয়সে ছোট হলেও ওর হাসিখুশি ডাকাবুকো চালচলনে আমাদের খেলার দলে দিব্যি খাপ খেয়ে যায়। যার বাড়ির উঠোন আর বারান্দা জুড়ে ডাকাও কানামাছি, কুমীর-কুমীর, চোর-পুলিশ খেলায় বিকেলটা কেটে যায়।

শংকরা শংকরা কোনখানে
পদ্ম বিলের মাঝখানে
সেখানে শংকরা কী-ই করে?
—কাদা ঘেঁটে ঘেঁটে মাছ ধরে—!

এই ধুয়োটা সবাই সুর করে গায়। শংকরা নিজেও বাদ যায় না। তবে, ওর গন্না-কাটা ঠোঁটের ওপর দিয়ে খংকরা কাদ খোঁকে খোঁকে উচ্চারণ হয়। তাতে সবাই হাসে, সে হাসিতে শংকরাও যোগ দেয়। চোর-পুলিশ খেলায় সে যখন চোর হয় তখন গোটা পুলিশ বাহিনী হিমসিম খেয়ে যায়, আতা গাছের ডালে ডালে কাঠবেড়ালীর মত স্বচ্ছন্দে চলাচল করে, কখনো বা পাঁচিল বেয়ে ওদের বাড়ির পিছনে জাম গাছে শংকরা বসে বসে ছড়া কাটে খংকরা খংকরা....।

সুশীলা ভালবাসে ব্যাটাকে—খুবই ভালবাসে। নাওয়ানো-খাওয়ানো সবই ম

ছাড়া হয় না বাটার। কিন্তু শত কায়েদা সত্ত্বেও বর্ণপরিচয় প্রথম ভাগ নিয়ে। সুশীলা মনে-প্রাণে চায় ছেলে মানুষ হয়ে উঠুক। তার জন্যে চেষ্টারও শেষ ছিল না। মুস্কিল এই যে, মায়ের চেষ্টা আগ্রহ যত বাড়তে থাকে ছেলের তরফের অনিচ্ছা তার দ্বিগুণ মাত্রায় বেড়ে চলে। সাতখানা বিদ্যাসাগরের ছবিওলা বই লুটি হয়ে খতম করেও অক্ষরের আক্রমণ পেরিয়ে আয়ে আমটি পেড়ে খাওয়া হল না। অবশেষে ছেলের নতুন জামা-কাপড় এল এবং তার ফলে একেবারে একবারেই ছুটে গিয়ে ওই ঔষধ পর্যন্ত পৌঁছল। এদিকে কৌশল্যার মাছ-কোটা পাটিতে টান পড়ল। দুই মা এবার সম্মুখ যুদ্ধে নামল। কৌশল্যাকে শংকরা দেখতে পারে না। ছোট হয়ে সুশীলা কিনা ছেলেকে পর করে দিচ্ছে! বড়মা বাড়িতে এলেই ছেলে বেরিয়ে যায় কিংবা মা-এর আঁচল ধরে ঘুরতে থাকে। ডাকলে কাছে আসে না। তোর গায়ে মেছুনীর গন্ধ! ব্যস কৌশল্যার কোপা ফোঁস—আরে আমার পরুতে ঠাকুরের বাচচা। বলি তোর কোন মায়ের পয়সায় এতো নবাবী হচ্চে শুনি? তোর মা কোন বাড়ি থেকে টাকা এনে বাবুগিরির কাড়ি জোগায় রে?

মোট কথা ছেলেকে নিয়ে বড়-মা আর মায়ের ঝগড়া-ঝাঁটি আশু বোরেগীর সংসার পাড়ার মধ্যে মেছোহাটা বসিয়ে দিল। সুশীলার কণ্ঠস্বর শোনা যায় না, তাতে আরও জ্বলে যায় কৌশল্যা। বলে তোমার শব্দুর নাই ভেবেছ? মুখ বুজে আমার শিলনোড়া দিয়ে আমারই দাঁতের গোড়া ভাঙবা তুমি। ওরে হারামজাদী! শুধু এক তরফাই চলে। বোরেগী বাড়িতে পা দিলে কৌশল্যার ঝাঁঝ আরও বাড়ে।

আশু নির্বিকার। মুখ বুজে শুনে যায়। তার আওয়াজের মধ্যে হুঁকো টানার শব্দ। বেশি বাড়াবাড়ি হলে মানুষটা গলা সপ্তমে চড়িয়ে বলে—দুই মাগীর জ্বালায় কি বন দেশ করব আমি। সিভা কি ভাল হবে? বল কৌশল্যা তোর মনের ইচ্ছা খোলসা করে। আমার কী, ঠাকুরের দয়ায় খোল বাজালে প্যাটের ভাবনা ভাবতে হবে না।

আশু কাকা বিবাগী হওয়ার সংকল্প, কৌশল্যার পেটের ছেলের কাছ থেকে অযাচিতভাবে আনুগত্য অনুরাগ আদায়ের চেষ্টা আর সুশীলার ছেলেকে মানুষের মত মানুষ গড়ে তোলার সাধ — প্রত্যেকটিই যেমন আন্তরিক এবং পরস্পর ওতঃপ্রোতভাবে অচ্ছেদ্য তেমনি চরিতার্থ না-হওয়ার মত আলেয়া।

এইভাবেই চলছিল আশু বৈরাগীর সংসার।

অথচ মাঝের গলিটার গায়ে প্রাচীরের এ-পারে আমাদের বাগানে কাপাস গাছের পত্তন হয়েছে ফুলের কেয়ারি ঘুচিয়ে। বাইরের বৈঠকখানার দালানে এক হাঁটু গর্ত করে একটা হ্যাণ্ডলুমে তাঁত-দাড়া তৈরি হয়েছে এক দিকে আর এক দিকে ফ্লাই শাটলের দুখানা তাঁত চলছে। বিপ্রদাস কাকা আর নরেনদা আসেন, তাঁদের কাছে দাদা, জ্যোতিদা তালিম নিয়ে নিজেরাই তাঁত চালান কখনো। আমাদের ছুটির দুপুর কাটে চরকা আর তকলিতে সুতো কাটার কাজে। এ বাড়ির আবহাওয়া পাল্টে গেছে দিলকুশ। যেমন শংকরাকে নিয়ে আশু কাকার সংসারে নিত্য কুরুক্ষেত্র। আশু কাকার বাড়ির হাওয়া বদলে দিয়েছে। আমাদের পরিবর্তনটা বাবা খুব সুনজরে দেখলেন না। উইকেণ্ডে কলকাতা থেকে বাড়ি এসে এই কাণ্ড দেখে দাদার কাছে কৈফিয়ৎ তলব—হ্যাঁ রে এসব কি হচ্ছে?

দাদা খুব সহজেই বুঝিয়ে দিলেন—ন্যাশনাল স্কুল উঠে গেল, পুরনো কাঠের দামে তাঁত, চরকা আরও অনেক জিনিস খুব শস্তায় পেয়ে কিনে ফেললাম। আমি ওখানকার পুরনো ছাত্র বলেই পেয়েছি। আর কেউ হলে তিন-চারশ লাগত। টাকাও জোগাড় হয়ে গেল। হরি ধার দিল। পঞ্চাশ টাকায় এত জিনিস পেয়েছি যে, কিছু কিছু বেচে দেনা শোধ করেও লাভ হয়েছে আর এগুলো ত উপরি! বেশ ভাল কাজ হচ্ছে বাবা। গামছা, কাপড় বুনে তাঁতীদের মজুরী মিটিয়েও আমাদের লাভ থাকচে।

বাবা আর কিছু বললেন না। দাদা যে আর লেখাপড়া করবেন না সেটা বুঝে গুমে মেরে রইলেন। বহরমপুরের হাওয়ায় স্বদেশী আন্দোলনের ঝড় উঠেচে তা তিনি জানেন। তবু বাবসাপাতি করে দাদা নিজের পায়ে দাঁড়াতে চেষ্টা করছে দেখে হয়ত একটু সান্ত্বনা পেয়ে থাকবেন। গোটা সংসারের দায় একা কলকাতায় থেকে সামলাবার জন্য পা বাড়াবার আগে, শুধু বললেন—ছোট ভাই-বোনগুলোর লেখাপড়ার দিকে নজর দিস, শুধু চরকা কাটা নিয়ে থাকলে ত চলবে না। পরকালে ঝরঝরে না হয় সবার।

দাদার অবশ্য সেদিকেও নজর খুব কড়া। আমাদের রুটিনের বাইরে একচুল এধার-ওধার হলে রক্ষে থাকত না। আরং ধোলাই!

সদরে ঘটা করে তাঁত-চরকা চলে তার আড়ালে আরও অনেক ব্যাপার আছে যা আমাদের জানার কোন উপায় নেই। দাদার বন্ধু জগা মামা, ফণীদা, বিশু মামা এমনি আরও সবাই আসে। তখন বৈঠকখানা ঘরে ঢোকার আগে অনুমতি চাইতে হয়—ভেতরে যাবো?

—কেন? কি চাই! কিম্বা একটু পরে আসিস। জবাব মেলে। ওর মধ্যে যে বিরাট রহস্য রয়েছে তারই টানে ছুতোনাতা করে ওই ঘরে একবার ঘুরে আসাটাই বড় কাজ।

তখন কি-বা বা বুঝি! মিশনের নীরোজা দিদিদের আসরে একদিন বুক ফুলিয়ে একটা জরুরী খবর পরিবেশন করলাম—এবার ত ইস্কুলে ইস্কুলে পিকেটিং হবে। তখন কে জানতো যে, "মদমারিকের সঙ্গে স্বদেশী আন্দোলনের সাপেনেটিক্‌ সম্পর্ক"। তা ছাড়া পিকেটিং ব্যাপারটা যে কি তাও স্পষ্ট ধারণা ছিল না। বড়রা বলাবলি করে, পিকেটিং হলে পড়াশুনো করতে হব না। নীরদা দিদি চশমার ফাঁক দিয়ে এক নজর আমাকে দেখে ছবিওয়ালা একখানা বই দিয়ে বলেছিলেন—বেশ ত ভালই হবে তখন এই বইখানা পড়ে ফেলো। কেমন।

পিকেটিং হ'ল না আমাদের হার্ডিঞ্জ স্কুলে। তবে অন্য কোথাও নাকি হচ্চে। সুনীল, চরণ, শিবু, গোলমরিচ, অমিয় সবাই গঙ্গার ধারে যায়, লুকিয়ে লুকিয়ে বিড়ি খায়—সবাই খায় না তবে যায়, দেখার মধ্যেও উত্তেজনা কম নেই। আমাকে প্রথম প্রথম ডাকতো কিন্তু অত সাহস আমার নেই, তা ছাড়া বিড়ি খাওয়া যে আদৌ দেখার মতো ব্যাপার সেটা মাথায় যায় নি, তার চেয়ে মারের ভয়টাই বড়। হারাধনবাবুর বেত। তার পর বাড়িতে দুরমুষও অনিবার্য—: সঙ্গে যাওয়া আর খাওয়াতে কোনো তফাৎ নেই বেত্রাঘাতে চরণ আর অমিয়র হাত ফেটে রক্ত বেরিয়ে প্রমাণিত হল একদিন। দিদির ভাসুরপো শিবু। আমাদের বাড়িতে থেকে লেখাপড়া শেখার উদ্দেশ্যে তার বিধবা মা পাঠিয়েছেন, লুকিয়ে ধূমপানের অপরাধে দাদা শাস্তি বিধান করলেন—একনাগাড়ে তেরঘণ্টা চরকায় সুতো কাটার। বড় হয়ে শুনেছি যে কোনও অপরাধ, এমন কি লুকিয়ে প্রেম-করার অপরাধেও দাদারা হয় চরকা নয় তকলি বিধান দিতেন এবং যাতে সেই সাজা ঠিকমত হাসিল হয় সেদিকেও প্রখর প্রহরা থাকত।

দাদাদের দলের হাতেই যেন পাড়ার লোকের সহবৎ শোধরানোর আদালত—ভয়ে হোক বা যে কারণেই হোক এটা মেনে নিয়েছিল সকলে।

কিন্তু আসল ক্ষমতার মালিকেরা যে এতে মোটেই স্বস্তি বোধ করছিলেন না তার প্রমাণ এক শীতের শেষ রাতে পাওয়া গেল। বাড়ির সামনের রাস্তা, পাশের গলি এবং যেখানে সম্ভব লাল পাগড়িতে ছেয়ে গেছে। ভারি বুটের শব্দে দাদার ঘুম ভেঙে গেল, জানলার ফুটো দিয়ে আশু কাকার বাড়ির দিকের গলিতে আয়োজন দেখে, তিনি, পাশে ঘুমন্ত জ্যোতিদাকে খুঁচিয়ে তুলে ইশারায় সব বুঝিয়ে দিলেন। জ্যোতিদার স্বাস্থ্য বেশ পালোয়ানী কিন্তু পুলিশে বাড়ি ঘিরে ফেলেছে বুঝে ঠক্ ঠক্ করে কাঁপতে কাঁপতে বললেন—কি হবে?

দাদা বালিশের তলা থেকে রিভলবার বার করে জ্যোতিদার হাতে দিয়ে বললেন—বাগানের ভেতর দিয়ে, গঙ্গার জলটা সাঁতরে পার হয়ে ছুতোর পাড়ায় পড়বি, তারপর জঙ্গলে জঙ্গলে লোকনাথ ভটচাযের বাড়ি, বুঝলি!

জ্যোতিদার হাতপা অবশ। গুঁতো খেয়ে তিনি সোজা হয়ে দাঁড়ালেন। দাদার ধমক পড়ল—যা বলছি। এক মিনিট দেরি করলে সর্বনাশ।

—তুই কি করবি?

—দেখতেই পাবি। তুই পার হয়ে মা মাল নিয়ে—

তারপর দাদা আর জ্যোতিদা পিছনের দরজা দিয়ে বাগানে। জ্যোতিদা চলে যাবার পর দাদা, বাগানের দিকের পাঁচিল টপকে ভেতর বাড়িতে গিয়ে মাকে ঘুম থেকে তুললেন—মা, আমি কি পালাবো ?

মা নিমেষে গোটা ব্যাপারটা বুঝে নিয়ে শান্তভাবে জবাব দিলেন—না বাবা, পালিয়ে কোথায় যাবি। ওদের রাজত্বে কি পালিয়ে বাঁচতে পারবি ? তার দরকার নেই। যেমন ছিলি বাইরের ঘরে গিয়ে শুয়ে থাক। আমি এদিকে তোদের প্রেসের টাইপগুলো গলিয়ে ফেলি, নইলে ওগুলো নিয়ে ফ্যাসাদে পড়তে হবে।

মায়ের কথায় দাদা নিশ্চিন্ত হয়ে বৈঠকখানায় চলে গেলেন।

তখনকার দিনে রাত দুপুরে বাড়ি ঘেরাও করলেও এখনকার মত পুলিশ চট করে ভোর হওয়ার আগে খানাতল্লাসী করত না। অন্ততঃ আমাদের বাড়িতে করে নি।

পুলিশ দলের নেতৃত্বে এসেছিলেন বড় সাহেব নিজে এবং তিনি আমাদেরই এক সম্পর্কে মামার আপন শ্বশুর। যথাসময়ে তিনি প্রবেশ করলেন এবং দাদা তাঁর বডি সার্চ করে নিলেন—দাদামশাই আপনি কিছু অস্ত্রশস্ত্র সঙ্গে এনে ফাঁসাবার তালে আছেন কি না সেটা আমার দেখে নিতে দিন তারপর ঢুকবেন।

দু-তরফেই সেয়ানে-সেয়ানে কোলা-কুলির লড়াই চলল। দাদামশাই প্রথমে ঘরে ঢুকেই একেবারে বালিশের তলায় হাত ঢুকিয়ে দিলেন—বাঃ, ম্যাজিক! সাপ, গো এখনো যে ছাপ রয়েছে কিন্তু মাল কোথায়? আর তোমার শয্যাসঙ্গিনীটিই বা কোথায়?

—দাদুর কি নেশার ঘোর কাটে নি। কি যাচ্ছে বকছেন ?

—তা বটে। দুটো বালিশে কি একাই শুচ্ছ ? বলি সে কোথায় ?

—রাতে যারা শরীর তাজা দেয় তাদের কি এক জায়গায় থাকলে চলে। অন্য কোথায় বেশ্যাগিরি করতে গিয়েছে।

বৈঠকখানার হাঁটকে হুটকে কিছু পেলেন না। বারান্দায় বসে একটু জিরোচ্ছেন তিনি। লোকজন কাজ করছে। বোধহয় সাহেবের কথাবার্তায় তারা একটু ভদ্রভাবেই দেখছিল। এমন সময়ে ছোট ঘরের দরজা খুলে মা মুখ বাড়িয়ে জিগোস করলেন—হ্যাঁ রে শম্ভু, কে এল এই ভোরে ? কার সঙ্গে কথা বলছিস ?

—দাদামশাই এসেছেন ?

—ও মা তাই নাকি। এতক্ষণ বলিস নি। ছি-ছি। বসুন তাহে মশাই। আমি আসছি।

দাদামশাই উঠে এলেন এবং মা তাঁকে প্রণাম করতেই তিনি বললেন—আমি একটা বিশেষ কাজে এসেছি মা। তুমি বুদ্ধিমতী এর বেশি বলা দরকার হবে না।

—আপনার কাজ নিশ্চয় করবেন তাহে মশাই। তবে আমার কাজও ত আমাকে করতে হবে। একটু চা খেলেই আমি খুশী হবো।

—আজ থাক।

—না, না, আবার কবে আপনার পায়ের ধুলো পড়বে তার ঠিক কি। আপনারা ভেতর বাড়ি তল্লাসী করতে করতে উনুন ধরে যাবে তাহে মশাই।

পুলিশের বড়সাহেব হাসতে হাসতেই বললেন, না মা, আমাদের ভেতর বাড়িতে যাবার দরকার হবে না। শালা আমার ওপর দিয়ে যায়। খুব ফাঁকি দিয়েছে মা। তা এত ভোরে উনুনে আঁচ ?

—ঠাকুর সেবা আছে। ছেলে-মেয়েদের ত জলখাবারও কিছু করতে হয়।

আমাদের বাড়িতে কিছু পাওয়া গেল না কিন্তু মাল বেরুল আশু কাকার ঘর থেকে। ভেতর বাড়ি সার্চ না করে আশু বোরেগীর বাড়িতে পুলিশ হানা দিয়ে একটা টিনের সুটকেশ বোঝাই নিষিদ্ধ বই বার করে ফেলল। বই ত নয় এক সুটকেশ গোখরো সাপ—এর যে কোন একটিই যেন দুর্বল ইংরেজ সরকারের মত গোবেচারি মানুষটির প্রাণ নাশ করার পক্ষে যথেষ্ট। অতএব বিদায় নেবার সময়ে পুলিশ সাহেব দাদামশাই বেশ হাসিখুশি।

আশু কাকাকে সুটকেশ সমেত থানায় নিয়ে গেল। অবশ্য থানা পর্যন্ত টানা-টানির দরকারই হত না। যদি এখানেই ভালয় ভালয় আশু কাকা কবুল করত সুটকেশের আসল মালিক বরুণ। তা না করাতেই ঝামেলা পোহাতে হল তাকে। থানার হাজতে যথাবিহিত মেথড প্রয়োগ করেও কোন লাভ হল না। আশু কাকাকে জেরা করে এইটুকু কবুল করাতে পেরে-ছিল পুলিশ—আজ্ঞে আমি মুখ্যু মানুষ লেখাপড়া জানি না এতো সত্যি কথা। গলায় কণ্ঠি আছে, ভগবানের দয়ায় আমরা সবাই বেঁচে আছি। তবে ইতাও সত্যি সুটকেশটা যখুন আমার ঘরে পেয়েছেন তখন উয়ার মালিক আমি। উয়াতে কি লেখা আছে জানি না বাবু। তবে উয়ার জন্যে যা সাজা হয়, জেহেল-ফাঁসি যা আপনাদের বিবে-চনায় বিচার হয় সেই সাজা বাহাল করুন। আমি মাথা পেতে তাই লিবো মেনে। বাস ফুরিয়ে গেল —

কিন্তু অত সহজে ফুরোতে দিতে পুলিশ কেন রাজি হবে। তারা ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে দাদাকে টানতে চায়। অমনি জিভ কেটে আশু কাকা মাথা নাড়ে—ওরে বাপরে, অমুন কথা মুখেও আনতে নাই। বরুণকে আমি সন্তানের চেয়ে বেশি ভাল-বাসি, দেবতার মত ভকতি করি। উয়ার তুল্য ছেল্যা ভুভারতে দেখি নাই। বুলছি ত বাবু মশাইরা আমার কথার লড়চড় করাতে পারবেন না। আমার ঘরের দুট্যা বৌ, এক ব্যাটা, খোল কত্তাল সবই যেমুন আমার দায় তেমনি এই সুটকেশও আমার। বই পড়তে প্যাল্যাম আর না-ই পাল্যাম তাথে আপনার কি দরকার। ফাঁসি দিবেন ত তাই দ্যান ক্যানে। কেহু বাঁচবে না মশাই, সবাইকেই একদিন না একদিন মরতে হবে।—হরি হে পার করো।

আশু কাকা নির্যাতন, পীড়ন সবই হজম করল এবং হাজত থেকে জেলেও দিন কয়েক কাটিয়ে এসেছিল।

ফিরে হাসতে হাসতেই গল্প করে-ছিল—বুঝল্যা বাবাজী। তাজ্জব জায়গা বটে এই জেহেল। সরকার বাহাদুরের জেহেলে না গেলে ত কিছুই জানতে পারত্যাম না বাবা। তা উয়াদেরও কীত্তন শুনাত্যাম। হাজার হোক শালোরা ত আসল পাতকী, কীত্তন বুঝি প্যাটে সইল না তাই বুললে—ওই বোষ্টমটাকে বিদায় করো, নইলে দশের রোগে ধরিয়ে দিবে। বললাম। অনেক কাল পরে হাঁক দিল—সুশীল্যা—তামুক সাজ।

আমরা চরকা থামিয়ে আশু কাকার জেলের গল্প শুনেছিলাম। স্বদেশী করার জন্য জেলখাটা মানুষ জীবনে সেই প্রথম দেখলাম।

শিল্পীর কাগজপত্র এবং চিঠি

সন্দীপ সরকার

কাজটা খুবই শক্ত। এই কোনো শিল্পীর কাগজপত্র এবং চিঠি সম্পাদনার কথা বলছি। মুশকিল হলো দীপক মণ্ডলকে আমি চিনতাম। তার সঙ্গে অবশ্য আমার বৈবাহিক কোনো সম্পর্ক ছিল না। দেখা গেছে এসব কাজ জামাইরা ভাল পারে। দীপক আমার সমবয়সী ছিল। সে আমার বন্ধু ছিল।

'বন্ধু' বা 'পরিচিত' এসব কথাগুলো বড় গোলমেলে। কারণ শেষ পর্যন্ত তো কাউকে চেনা হয় না। দীপকের মা জীবিত এই সাধারণ খবরটা আমার মতো ঘনিষ্ঠ বন্ধু—'ঘনিষ্ঠ' শব্দটা লক্ষ্য করুন—জানতাম না। তার একজন বোন আছে যার কথা সে মাঝে মাঝে বলতো। কিন্তু ঐ পর্যন্ত। খুঁটিনাটি কিছু বলা তার স্বভাবে ছিল না।

আমি তার নাম জানতাম। ছবির প্রদর্শনী দেখেছি। দু একবার কফি হাউস কি নয়া ইস্ক সোডা ফাউনটানে দেখেছি। আলাপ হয়নি। কারণ পাজামা পাঞ্জাবি পরা দাড়িওলা লম্বা চওড়া কালো শক্ত সমর্থ একটা লোকের সঙ্গে কুড়ি বাইশ বছর বয়সে পরিচিত হবার কোনো তাগিদ মনের ভেতরে অনুভব করতাম না। বিশেষত তখনও মনের ভেতরে একটা ধারণা ছিল আর্টিস্টরা মুখর হয়।

তারপর খাটালে দুধ আনতে গিয়ে উত্তেজিত স্টাডবুলের ছবি স্কেচ খাতায় আঁকতে দেখে আমার কৌতূহল হল। বিশেষত তার জোরালো নিশ্চিত রেখা আর আত্মবিশ্বাস দেখে আমার কেমন মনে হলো: দীপকের কব্জীর জোর আছে। যেচে আলাপ করলাম। গেলাম তার স্টুডিওতে। মেজানাইন ফ্লোরে একা থাকত। বাড়িতে খেত। ছাদে চিলেকোঠায় তার স্টুডিও ছিল।

কতদিন সে বলেছে হতাশ হয়ে, বুঝলি আমাদের কিসসু হবে না। প্রতীক বা চিত্রকল্প বা ছবির ভাষা নতুন করে খুঁজে পাচ্ছি না— ছবিতেও তো এদেশের জীবনের সঙ্গে খাপ খেতে হবে। অথচ ইলাস্ট্রেশন হলে চলবে না। আর [illegible]

ছবি নয়—আসল ছবি। অলংকরণ নয় ছবির ভেতরের ব্যাপারটা থাকা চাই।

মাঝে মাঝে ভেতরে ভেতরে ওর ভীষণ টানাপোড়েন চলত। বাইরে থেকে বেশ বোঝা যেতো সে ছটফট করছে। অস্থির অস্থির ভাব। হয়তো বলত, একটু মদ খাওয়াবি। কিংবা আয় চল না যাই—

কিন্তু দু দণ্ড স্থির হতে পারত না। মদ তবুও সে আনন্দ করে বরং খেতো—অনেকখানি খেতে পারত। কিন্তু অন্য ব্যাপারটাতে সে ঘর থেকে অনেকটা চাবুক খেয়ে বেরিয়ে আসত যেন, নিজেকে জানোয়ারের অধম মনে হয়।

আসলে দীপক মানুষটা ছিল সাত্ত্বিক। ওর ডায়েরী পড়তে পড়তে আমার বারবার মনে হয়েছে অন্তর্জাত সমস্যাটার মধ্যে বারুদ ছিল। শেষ পর্যন্ত ওর মধ্যে বিস্ফোরণ ঘটেছিল। যা সুপ্ত আগ্নেয়গিরি নড়েচড়ে উঠেছিল। ওর মনের খবরটা আমি ভাল বুঝিনি। বহু পরে ওর মায়ের কাছে শুনি যে দীপকের বাবা ছিলেন নিরীহ ভালোমানুষ। সুতরাং সংসার চালানো থেকে ছেলে শাসন পর্যন্ত উনি করতেন। দীপকের বাবা হয়তো কিছু পরিমাণে স্ত্রৈণ ছিলেন। হয়তো সেই কারণে দীপকের ছবিতে—ভাল ভাল ছবিতে—শেষের দিকের ছবিতে মেয়ে-মানুষের চেয়ে আগ্রাসী পুরুষমানুষ সৈনিক, নাবিক, খুনে, গুন্ডা, বদমায়েস বেশি। অর্থাৎ ওর বাবার উল্ট ধরনের লোক।

একটা কথা মনে হচ্ছে কারু মৃত্যুর পর—বিশেষ সে যদি শিল্পী হয়—তাহলে লেখা খুবই কঠিন।

কেন যে সে আত্মহত্যার পথ বেছে নিল সেটা ভেবে ওঠা যায় না। মাত্র তেত্রিশ বছর বয়স তো আর মৃত্যুর বয়স নয়।

চোখ বন্ধ করলেই সেই তামাটে লম্বা চেহারা আমার সামনে ভেসে ওঠে। একটা বুনো ঘোড়ার শক্তি ছিল তার দেহে; শক্ত মুঠিতে ব্রাশ চালাতো সে। আমি তার সঙ্গে অনেক সময় কাটিয়েছি। ছবি আঁকার সকল সমস্যা তা সে নন্দনতাত্ত্বিক হোক আর শৈলীগত হোক, আমার সঙ্গে প্রায় প্রতিদিন আলোচনা করতো। ব্যক্তিগত নানা প্রসঙ্গে আলোচনা সেই অনুপাতে ছিল না।

মুস্কিল হল যে কোনো মানুষের মৃত্যুর পর তার বলা প্রতিটি কথা তা যতো তুচ্ছ হোক, অন্য তাৎপর্য নিয়ে হাজির হয়।

কতো জায়গা ঘুরেছি তার সঙ্গে শনি রবিবারে পুজোর ছুটিতে। কলকাতায়। কলকাতার বাইরে। পোড়ামাটির মন্দির দেখতে গেছি ইলামবাজার, আটপুর, বীর-ভূমে। ঢোকরা শিল্পী আর পোটোদের বাড়িতে রাত কাটিয়েছি। ঘুরেছি গ্রামে গ্রামে মেলায় যাত্রার আসরে। সে সবাইয়ের সঙ্গে অতিসাধারণ হয়ে মিশে যেতো। কখনো উন্নাসিক হতো না। পয়সা না থাকলে মুড়ি-মুড়কী বাতাসা এক ঘটি জল দিয়ে খেয়ে নিতো।

আবার কলকাতার পাড়ায় পাড়ায় সে ঘুরতো। দরজী, গয়লা, ঠেলাওয়ালা, ভদ্রলোক, মাড়োয়ারী, মাদ্রাজী, ট্রাক ড্রাইভার, মিঠাইওয়ালা, ফড়ে, দোকানদার, বেশ্যা থেকে ক্যালকাটা ক্লাবের মেম্বার সবাইয়ের সঙ্গে সে মিশতো। মানুষ সম্বন্ধে তার কোনো মোহ ছিল না, আবার বিরাগও নয়। ভিখারীর সঙ্গেও সে সহজ সুরে কথা বলতে পারতো। মানুষ আর প্রকৃতির মতো শহর সম্বন্ধে তার সমান আগ্রহ ছিল। ভীষণ পরিশ্রমী ছিল। আঁকতো নিয়ম করে দিনে আট ঘন্টা। তাকে বাউন্ডুলে বলে লোকে চিনেছে। সে যে খাটতে পারতো একথা ক'জন জানে!

দীপক বলতো, লোকে মনে করে শিল্পী যেন অসামাজিক জীব। তার কাজ অপ্রয়োজনীয়। কি আশ্চর্য যন্ত্রণায় ভ্যান গঘ কান কেটে ফেলে কেউ বোঝে না। বেঁচে থাকার তীব্র অনুভূতিকে শানাবার জন্য শিল্প। আমার মনে হয় মানুষের মধ্যে শিল্পবোধ জেগে উঠলে, অনেক কাজ হবে। বোধ জেগে ওঠার পর একজন মানুষ যদি দেখে আরেকজন খেতে পাচ্ছে না বা শীতে কাঁপছে তাহলে তার অসহ্য মনে হবে।

অথচ শুধু ছবির বিষয়বস্তু নিয়ে নয়, সে সমানভাবে কাঠামো নির্মাণ, অবয়ব, রঙ লাগানো, রচনা, শৈলী, ছবির ভাষা—সব বিষয় নিরলসভাবে ভাবতো।

যে সব শিল্পী যুদ্ধকালীন পৃথিবীতে কৈশোর কাটিয়েছেন এবং স্বাধীনতার পর হয়েছেন যুবক, তাঁরা বুঝতে পারছিলেন যে অবনীন্দ্রনাথ থেকে যামিনী রায় পর্যন্ত চিত্রসৃষ্টির একটা কাল। রামকিংকর, বিনোদবিহারী তাঁদের মনে তীব্র আকাঙ্ক্ষা জাগিয়ে তুললেন। নীরোদ মজুমদার, পরিতোষ সেন এবং ভাস্কর্যে প্রদোষ দাশগুপ্ত পরীক্ষা-নিরীক্ষার নতুন পথ দেখালেন। শিল্পী বন্ধুদের সঙ্গে দীপকও ছবি সম্বন্ধে জটিল দ্বন্দ্বে পড়লো, ভাবল বিভিন্ন পরস্পর বিরোধী কথা। বস্তুত তার ছবিতে ইউরোপীয় প্রভাব প্রত্যক্ষ বা সরাসরি নয়। তার চারপাশের জীবনধারা থেকে সে ছবির মালমশলা নিয়েছে। লৌকিক কলাশিল্পের কাছে ঋণ করেছে অজস্রভাবে। শুধু আধুনিকতার ভাবনাগুলো সে পেয়েছে ইউরোপের কাছে। ঠিক সেই কারণে বিমূর্ততা সম্বন্ধে তার ছিল প্রচণ্ড অনীহা। আজকের দিনেও অবয়বিক কাজ করা অসম্ভব নয়, দীপক প্রমাণ করেছিল। অথচ দীপকের ছবি রিয়েলিস্টিক নয়। ধরা যাক তার একটি ছবির বিষয়বস্তু হলো রাস্তায় একটা ট্যাক্সী ড্রাইভারকে ঘিরে বহু অনেক মানুষ মারছে। ট্যাক্সির সামনে একজন পড়ে রয়েছে। আর ছবির এক কোণে তলোয়ার হাতে একজন শিখ দাঁড়িয়ে আছে। বা উন্মাদ ভিখারী মেয়ে গাছে হেলান দিয়ে বসে রয়েছে, মাথায় লাল রুমাল, গায়ে ছাপ্পা-মারা ব্লাউজ। কিংবা গ্রাম পুড়ছে, হাঁস মুরগী, মানুষ, মেয়েমানুষ, বাচ্চা পালাচ্ছে। সমস্ত ছবিগুলোর মধ্যে এক বদ্ধ উত্তেজনা। নির্বিবেকী হিংসা। দীপক যেন মানুষকে সতর্ক করে দিতে চাইছে: এক ধরনের ঘৃণা, ক্রোধ, কখনো বা হয়তো ব্যঙ্গ তার ছবিকে বিশেষত্ব দিয়েছে।

বৈদ্যনাথবাবু দীপকের এবং সেই সূত্রে আমারও, খুব ঘনিষ্ঠ বন্ধু। বয়সে আমাদের চেয়ে কিছু বড়। শেষকালটা তার বদান্যতা দীপককে বাঁচিয়েছিল। তিনি হাওড়ায় বেলিলিয়াস রোডে আঁখ মাড়াইয়ের কল তৈরীর কারখানা করে ধনী হয়েছিলেন। তাঁর অর্থানুকূল্য ছাড়া দীপকের ছবি এমন অফসেটে ছাপায় বই প্রকাশের দুঃসাহস কোনো প্রকাশকের হতো না।

দীপকের জীবন খুব জটিল বা ঘটনাবহুল নয়। তার চিঠিপত্র বিভিন্ন সময়ে ভিন্ন মেজাজে লেখা। কিন্তু তা থেকে তার জীবনের আদল অস্পষ্টভাবে হলেও ধরা পড়ে।

দীপক নিজেকে অসাধারণ ভাবতো না। সংবেদনশীল ছিল সে, সহানুভূতি ছিল তীব্র। তার এসব বোধ বুদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে সামগ্রিক ছবিও হয়েছে ধারালো। জটিল হয়েছে ছবির নির্মিতি। কঠিন আর দৃঢ় হয়েছে কাঠামো। রংয়ে এসেছে নানান ছায়া আর ক্যানভাসের বাকলে বিচিত্র অনুকৃতি। তার বোধ শিল্প আর জীবনের ধারা এক করেছে। আবার এর বিষ কণ্ঠে ধারণ করতে পারে নি বলে তার জীবনটাই হয়েছে নীল। কৈশোর যৌবনের সীমারেখা

দীপকের এই সময়কার চিঠিতে তেমন কোনো বিশেষত্ব নেই। লক্ষণীয় সে ছবি আঁকিয়ে হতে চেয়েছিল সেই ছেলেবেলা থেকে।

(১)

১লা ডিসেম্বর ১৯৪৭ ১

দেওঘর

শ্রীচরণকমলেষু,

মা,

প্রথমে আমার ভক্তিপূর্ণ প্রণাম গ্রহণ করিবে। আমি ভাল আছি। আশা

---

১ এই চিঠি দীপকের মাতৃদেবীর সৌজন্যে প্রাপ্ত। ১৯৪৭ সালের সেপ্টেম্বরে দীপকের টাইফয়েড হয়। সেরে উঠে তাকে তার মামা শ্রীজলেশ্বর বিশ্বাসের কাছে চেঞ্জে পাঠান হয়।

বাঁধ ভুলিব ভাল আছ। বন্ধুবর২ জন্য মন কেমন করে। এখানে এক রকম পাহাড়ী ফুল হইয়াছে—সে থাকিলে মজা করিয়া খাইত।

আমি খুব ছবি আঁকিতেছি। বড় হইলে আমি শিল্পী হইব। তা ছিলিস, মাইকেল এঞ্জেলো মত শিল্পী না হইলে বাঁচিয়া সুখ নাই। মামীমাও আমার ছবি বাঁধাইয়া বসিবার ঘরখানি সাজাইয়াছেন। মামা তো তোমার ভাই—তাঁহার মাথায় ছবি ঢোকে না, বড় বকাবকি করেন। তুমি বকো আর মারো—আমি ছবি আঁকিব, আঁকিব, আঁকিব—তিন সত্যি। ইতি

মনু৪

(২)

কলকাতা

১লা মার্চ, ১৯৫২

ভাই ফাল্গুনী ৫

গবর্ণমেন্ট আর্ট কলেজে ভর্তি হলাম। মা তো কিছুতেই রাজী নয়। আমার মনে হয় প্রতিভাবান পুরুষের unsympathetic mother -ই বোধহয় নিয়ম। সোপেনহাওয়ার এবং বাইরনের কথা ধরো না। মপাসাঁর মা-র কথা কোথায় পড়েছিলাম—তিনি বোধহয় ব্যতিক্রম। ছেলে এবং মার চিন্তাজগতের মধ্যে যদি সংযোগ-সেতু না থাকে তাহলে সেটা মর্মান্তিক। যার সমগ্র সত্তাকে কেন্দ্র করে মানুষ গড়ে ওঠে, বড় হয়। যার রক্ত-মাংসের মধ্যে সে বেড়ে ওঠে, তার গর্ভ থেকে বেরিয়ে আসার বিচ্ছেদটাই যদি স্থায়ী হয়, দিনের পর দিন যদি পরিবর্তিত হয়, তাহলে মানুষের আত্মা আশ্রয়হীন হয়ে পড়ে।

মা আমাকে ভালবাসে না, আপন মনে করে, তাই আমাকে বুঝতে পারার কোন তাগিদ তার নেই। মানুষ নিরাশ্রয় হয়ে পড়ে বলেই বিয়ে করে। বড়সড় হয়ে চুকে

---

২ বুলা-দীপান্বিতা মণ্ডল, দীপকের ছোট বোন।

৩ মামীমা—শ্রীমতী বাসন্তী বিশ্বাস। স্বল্প শিক্ষিতা হলেও দীপকের উপর এঁর প্রভাব অপরিসীম।

৪ মনু—দীপকের ডাকনাম।

৫ ফাল্গুনী বস দীপকের বাল্যসখা। ১৯৫৩ সালে আঠারো বছর বয়সে লেনেক্সাইটিসে কবিযশঃপ্রার্থী ফাল্গুনীর মৃত্যু দীপকের মনে আঘাত হেনেছিল। আমাকে সে বলেছিল, এত তাড়াতাড়ি যদি মরবে তাহলে কেনইবা ওর জন্ম!

পড়ে সে তার ছিন্ন-লাগা দেহকে অন্যের ভালবাসার উত্তাপে সেঁকে নেয়।

আমি আমার মনের কথা কিভাবে বোঝাব। অসহ্য এই নিঃসঙ্গতা। গরমের ছুটি শেষ হলে বম্বে থেকে ফিরে এলে সব কথা খুলে বলব। ভালবাসা নিস। ইতি

দীপক

(৩)

৩০ ডিসেম্বর, ১৯৫৩

ভাই বৈদ্যনাথ ৬

কলেজে পোষাল না। ছেড়ে দিলাম। অমন জেলখানার মত জায়গা আমার জন্য নয়। সাহিত্যিকদের জন্য তো আলাদা বিদ্যালয় নেই। আসল জিনিষটা না থাকলে হয় না। আমি বরং নিজে হাতড়ে হাতড়ে পথ খুঁজে নেব। জীবনের সবকিছু নিজের মত করে শিখে নিতে হয়। আমি কোথায় কিভাবে মানিয়ে নেব, অন্যে কি তা বলে দিতে পারে?

কাগজে বোধহয় ফুটপাতে আমার প্রদর্শনীর কথা পড়েছিস। প্রচুর লোক হয়েছিল। প্রশংসা-নিন্দা দুই হয়েছে।

মা আমাকে বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দিয়েছে। আমার একজন সুহৃদ আমিনুল রহমান সাহেব পার্ক সার্কাস ট্রাম ডিপোর কাছে, তাঁর ২ ব্রুটন স্ট্রীটের বাড়ির গ্যারাজের ওপরের ঘরে থাকতে দিয়েছেন। মামীমা তিরিশ টাকা পাঠান। চার আনার শিক কাবাব পরোটা খেয়ে তোফা দিন কাটিয়ে দিচ্ছি। রহমান সাহেব রঙ তুলি পট সব কিনে দেন।

মা ক্লাস নাইন পর্যন্ত পড়েছিল, অথচ আমাকে একদম বুঝতে পারে না। মামীমা গাঁয়ের মেয়ে কিন্তু খুব সহজে সব বুঝে ফেলে কলেজ ছেড়ে দিয়েছি বলে মা লংকাকাণ্ড বাধিয়ে দিল। প্রচলিত ধারার বাইরে কিছু ঘটলেই মার সব গুলিয়ে যায়। বাচ্চে-ভাই ভাবায় গালাগাল, মারধোর সব কপালে জুটেছে।

একটু ভালবাসার জন্য কী-না করতে পারি। মেয়েরা রূপ, অর্থ, নিরাপত্তা দেখে, আসল মানুষটাকে দেখে না। কোন মেয়ের সর্বনাশ হয়েছে জানলে খুশি হই। পক্ষী-রাজারোহী রাজপুত্তুরের পেছনে ছোট মা যাও! ইরা৭ আজকাল গণেশের৮ সঙ্গে

---

৬ বৈদ্যনাথ আজকের বিখ্যাত জাতব্য গোয়েন্দার দিকে রয়েছে।

৭ ইরা—নামটা কল্পিত। ম্যাডেক্স স্কোয়ারের দীপকদের বাড়ির পাশে এদের বাড়ি।

৮ গণেশ নামটা কল্পিত।

উড়ছে। ইরা জানে না সে আমার জীবনটাকে কতটা শূন্য করে দিয়েছে। সেই চিরন্তন রাতের প্রশ্ন তুলে আমাকে আঘাত দিল। তুই একদিন আসিস, অনেক কথা আছে। ভালবাসা জানিস। ইতি

দীপক

যৌবন

১৯৬০ সাল থেকে দীপকের ছবির মধ্যে পরিণতির আভাস পাওয়া যায়। চব্বিশ বছর বয়স থেকে সে যেন নিজেকে আরো বেশি খুঁজে পেতে থাকে। মৃদু মোলায়েম রঙে আঁকা নিসর্গচিত্রের পরিবর্তে কঠোর রূঢ় রঙের প্রতি সে মনোনিবেশ করে। গল্প নয়, ছবির মেজাজ তৈরী করার ঝোঁক। মনের ভেতর থেকে রেখা উঠে আসে, কর্কশ, প্রান্তর অথচ আশ্চর্য সেগুলোর জীবনীশক্তি। বুদ্ধিবৃত্তি দিয়ে নিয়ন্ত্রিত নয় বলে ছবিগুলোয় পেশী-বহুল শক্তির উল্লাস। একটা রুদ্ধ আগ্নেয়গিরি যেন আক্রোশে ফেটে পড়ছে। অথচ নির্মিতির প্রতি তার ঝোঁক। ছবি যেন এক বলিষ্ঠ কাঠামোর উপর দাঁড় করিয়েছে সে।

(৪)

৩রা আগস্ট, ১৯৬০

কলকাতা

স্নেহের বুলা,

আশা করি তুই ভাল আছিস। বৈদ্যনাথ আমাকে তোফা রেখেছে। মাসে দুটো করে ছবি ওকে দিই। ওর বিশ্বাস একদিন আমার ছবি বিক্রী করে বড়লোক হয়ে যাবে। আমার ভয় করে! যদি আমার মধ্যে প্রতিভা না থাকে। তাহলে আমি শুধু আত্মপ্রবঞ্চনা করছি না, ওকেও ঠকাচ্ছি। মাঝে মাঝে নিজের সম্বন্ধে সন্দেহ জাগে। বন্ধুবান্ধবদের সহানুভূতি, সাহচর্য—কিছুতেই যেন নিষ্কৃতি নেই। কাজ করতে করতে ক্লান্ত লাগে। তখন এই প্রশ্নটা বিপন্ন করে তোলে। আসলে খুব একা।

মা-র কাছে যাই। গুরুদেব, ঠাকুর-ঘর, এই সব নিয়ে ওঁর দিনগুলো বেশ কাটছে। তুইও নেই, আমিও নেই, সুতরাং মাথাব্যথা নেই। শুভ্র শুচিতার তলাকার ফাঁকটা নজরে পড়ে না কারো। লৌকিক-অলৌকিক ধর্মীয় ক্রিয়াকর্ম মানুষের মনকে ঘুম-পাড়িয়ে দিতে পারে।

তোর কাছে যাবার কথা লিখেছিস। সত্যি, আমার আশা থেকে তোদের পাড়া কতইবা দূরে। কিন্তু তোর দেওর-ননদ-রা যেভাবে আমাকে দেখে। আমি যেন চিড়িয়াখানার জন্তু। অতীনকে সঙ্গে করে তুই বরঞ্চ আমার স্টুডিওতে

আসিস। তোদের দুজনের জন্যে পাঠালাম আমার স্নেহাশীষ। ইতি

দাদা

(৫)

২২ রেড়ক্রশ অ্যাভেনিড়,
দিল্লি-৬
১৮-৬-৬১

ভাই বৈদ্যনাথ,

দিল্লি এসে ছবি মাউন্ট আর ফ্রেম করতে ব্যস্ত ছিলাম বলে তোকে চিঠি দিতে দেরী হলো। কিছু মনে করিস না। এখানকার গ্যালারীর আলোর ব্যবস্থা কলকাতা থেকে অনেক ভাল।

হানিফ[৯] প্রদর্শনীতে এসেছিলেন। এখানে একটি জিনিস ভাল লাগল, বয়স্ক, লব্ধপ্রতিষ্ঠ শিল্পীরা প্রদর্শনী দেখতে আসেন। তবে মহাধড়িবাজ। কার সঙ্গে দেখা হলে ছবি বিক্রী হবে, কি করলে পত্রিকায় আলোচনা বেরুবে বা বিদেশে যাওয়া যাবে, এসব নিয়ে মহাব্যস্ত। কিন্তু কাজ স্বতঃস্ফূর্ত নয়, প্রাণবন্ত নয়, খামোকা দিশী হবার চেষ্টা যাতে বিদেশীরা কেনে। কারো আবার মনের মধ্যে তাগিদ নেই, তাই বিমূর্ততার জন্য বিমূর্ততার প্রাচুর্য। ছবির টেকসচার সম্বন্ধে অহেতুক মাথা-ব্যথা। চোখ-ধাঁধান নৈপুণ্য, ভেতর কিছু নেই। বেশীর ভাগ পাশ্চাত্যের অন্ধ অনুকরণ।

প্রশংসা নিন্দা দুই পেয়েছি। হানিফ বললেন, Why are you so angry with the world?

বললাম জলটুঙ্গি ঘরে বাস করার প্রবৃত্তি আমার নেই। একদিন নেমন্তন্ন করে খাওয়ালেন। ছবি দেখালেন। আমি চুপ করে থাকলাম। উনি বললেন, বুঝতে পারছি ভাল লাগছে না। আমি কি যেন বলতে গেলাম। বললেন, আমার মন-যুগিয়ে কথা না-ই বা বললে। আমার মনটা খুব খারাপ হয়ে গেল।

তারপর দূতাবাস, রাজনৈতিক নেতা, বড় সরকারে চাকুরে, সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান—নেমন্তন্নের শেষ নেই। একটা পাঞ্জাবী মেয়ে, নাম ধরে নে কর লিলি কাউল। লাল টুসিটার গাড়ি করে ঘোরাল। রঙ-করা মুখে সিগারেট। যৌন-জীবন জলবৎ করে ফেলেছে। ছবি-টবি বোঝে না। তবে আমার দুটো ছবি কিনেছে।

লিলির ব্যবহার এমন সহজ যে আমি টেরা হয়েছি। পরে সব বলব।

দিল্লির সমাজে পাশ্চাত্যকরণ ঘটেছে উপরতলায়। তবে অন্যান্য শহরের চেয়ে অন্যান্য স্তরেও এর প্রভাব কম নয়। আসল সমস্যা হচ্ছে, আধুনিক হয়েও কিভাবে ভারতীয় থাকা যায়। ১৯ শতকে রামমোহন থেকে শুরু করে চিন্তাশীল ব্যক্তিমাত্র এর একটা কাজ-চলা গোছের সমাধান করে ফেলেছিলেন। কিন্তু পরিবর্তিত অবস্থার জন্যে তাঁদের ব্যবস্থা আমাদের কাজে আসছে না। ইউরোপ আমাদের মানস-জগত আলোড়িত করছে না, কল-কারখানা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে আমাদের দৈনন্দিন জীবনে সে এসে দাঁড়াচ্ছে। তবে বনেদটা ঔপনিবেশিক থাকার দরুণ, সমস্যাটা খুব জটিল। প্রাচীন গ্রামীণ মূল্যবোধ নিয়ে আধুনিক নাগরিক জীবনযাপন করা সম্ভব হচ্ছে না। বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে জগদীশচন্দ্র প্রাচী-প্রতীচ্যের যে-সমন্বয় ঘটিয়েছিলেন, চিত্রকলার ক্ষেত্রে অবনীন্দ্রনাথ যে-নির্বন্দ্ব অবস্থার সৃষ্টি করেছিলেন, তা আমাদের কালের পক্ষে যথেষ্ট নয়। নতুন প্রতীক খুঁজতে হবে। এমন প্রতীক যা সমসাময়িক যুগের দ্বন্দ্ব, সংঘাত এবং নৈরাশ্যকে অর্থপূর্ণভাবে প্রতিফলিত করতে পারে। অথচ মনের ভেতরে দোটানা। তাই সিদ্ধান্তে না-পৌঁছতে পারার যন্ত্রণা। তাই প্রতীচ্যের অন্ধ অনুকরণ।

আসলে ধনী-দরিদ্রের ব্যবধান তো কমছে না। শতকরা আশী ভাগ মানুষ যত গরীব হচ্ছে, উপরতলার সাহেবের সংখ্যা তত বাড়ছে। সুতরাং শিল্পবোধ-ফোধ আসলে প্রতারণা এমন একটা সন্দেহ জাগছে মনে। ইতি

দীপক

(৬)

নিউ দিল্লি
৩০-৬-৬১

ভাই বৈদ্যনাথ,

তুই আমাকে দোষ দিবি হয়তো। আমি চাকরি পেয়েও নিলাম না। আমার প্রায় মনে হয়, অদৃশ্যে আমার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র চলেছে। চলেছে বলছি না। তবে মনে হয়। এখানে মিসেস কৌশিক বলে এক ভদ্রমহিলার গ্যালারী আছে, তোকে বোধহয় বলেছি। তিনি আমাকে প্রলুব্ধ করার চেষ্টা করলেন, মাসে পাঁচশ টাকা করে দেবেন, পরিবর্তে একটা করে ছবি দিতে হবে। আমার কেমন যেন মনে হল ইনি আমাকে কিনে নিতে চাইছেন।

হরেনাম মিলে তিন দিন ধরে ইন্টারভ্যু দিলাম। টেকসটাইল ডিজাইনিং। হাউস-জার্নালের লে-আউট—সাত পাঁচ। ইন্টারভ্যু নিচ্ছিলেন মোদি বলে এক ভদ্রলোক। শেষ দিনে বললেন, তিনটের সময় আমার অফিসে কাজ নিয়ে দেখা করুন। তিনটের সময় ওর সেক্রেটারীর সঙ্গে দেখা করলাম। উনি আমাকে দেখিয়ে দিতে এক পাশের সুইংডোর ঠেলে ঢুকে পড়লাম। পরে জানতে পেরেছি ওর সঙ্গে ছিল ওর বস, মিস্টার ভ্যাস। মোদিকে বললাম, তিনটের সময় আসতে বলেছিলেন।

মোদি বলল, বাইরে গিয়ে বসুন।

ভ্যাস বলল, তুমি বাইরে গিয়ে বস। আমি এঁর সঙ্গে কথা বলব। মোদি চলে যেতে ভ্যাস আমার সব কথা শুনলেন। একটু চিন্তিতভাবে বললেন, আমাদের স্টুডিও যামিনী রায়দের জন্যে নয়। আপনি একদিন সময় নিন। যদি স্থির করেন চাকরি করবেন, তাহলে আমার সঙ্গে দেখা করুন। আমার কিন্তু মনে হয় এটা আপনার জায়গা নয়।

ভ্যাস আমাকে স্যান্ডউইচ আর কফি খাওয়াল। লোকটা কেমন যেন জোর দিয়ে বলল আমি চাকরি নিলে ভুল করব।

চাকরি নিই নি। ইতি

মনু

এই ছটা চিঠি ছাড়া দীপকের তেমন উল্লেখযোগ্য চিঠি পাইনি। চিঠিগুলি কালানুক্রমিক হলেও মাঝখানে এত সময়ের ব্যবধান থাকার জন্যেই হয়ত কিছুটা খাপছাড়া। এ ছাড়া আমরা ওর ডায়েরী পেয়েছি। বছরের পর বছর ও নিয়মিত ডায়েরী রেখেছে, কিন্তু তেমন কাজের কিছু এর মধ্যে নেই। ও হয়ত লিখেছে : হিমাদ্রির বাড়ি গেলাম। সৎপাল সিং কাট আমার একটা ছবি কিনেছে। একটা ক্যানভাসে রঙ চাপিয়েছি। ঈগলের ডানা নাম দিলে বোধহয় ভাল হয়। এই ধরনের দু-চার লাইন। এরই মধ্যে আবার কয়েক জায়গায় সে গুছিয়ে কিছু কথা লিখেছে। সেই অংশগুলো তুলে দেওয়া গেল।

১৭ই এপ্রিল, ১৯৬২

কলকাতার সবচেয়ে বড় অভাব আর্ট ডিলারের। ফলে শিল্পীদের নিতে হয় দোকানদারের ভূমিকা। ককটেল পার্টিতে যাও, কনসুলেটগুলো ঘোর। বিদেশীদের সঙ্গে বার্তাচিত বল। তাদের কাছে তোমাদের সওদা গছাও। যাদের চটালে ক্ষতি হবে, তাদের কাছে দেঁতো হাসি হাসো।

বিদেশীরা কলা শিল্পের প্রধান ক্রেতা। তারা চায় পুরোপুরি ভারতীয় চিত্রকলা। খাঁটি ভারতীয় চিত্রকলা বলতে কি বোঝায় জানি না। তন্ত্রের প্রতীক, ত্রিশূলে কমণ্ডলু বা কোণার্কের চক্রের ডিজাইন আঁকছে কেউ। ভারতীয় বলে যদি কিছু থাকে তবে সে তার মানুষ আর প্রকৃতি। বোঝা যাচ্ছে, চতুর ঠগরা বেশ ফলাও ব্যবসা জমিয়ে বসেছে।

---

৯ এ পি হানিফ—দেশে-বিদেশে পরিচিত ভারতবর্ষের সর্বাধিক বিতর্কিত শিল্পী।

স্বাধী পাগলামী বলতে যা আছে তা অত্যন্ত নিম্নমানের। ভাল ছবি না-দেখলে শিল্পী নিজের কাজ যাচাই করবে কেমন করে? নতুন দর্শক তৈরী হবে কি?

২রা ডিসেম্বর, ১৯৬২

আসলে আমি নানা রকম কমপ্লেক্সে ভুগি। আমি যখন ছোট তখন বাবার মৃত্যু হয়। মা-র সঙ্গে কোন হৃদ্য সম্পর্ক ছিল না। সুতরাং বাইরের মানুষকে আপন করে নিতে পারি না। আমার স্বভাবটা চড়া সুরে বাঁধা। আজ মনে হচ্ছে হাসিকে১০ আমার মাংসের অভিলাষ পূরণ করার জন্যে ব্যবহার করেছি। বাড়ের টেবিলের জানলা দিয়ে একটা নিঃশেষ সিগারেটের টুকরোর মত ফেলে দিয়েছি। সে হয়ত আমাকে সুখী করতে পারত। আমাকে বোধহয় বুঝত।

আমার মনের ভেতরটা একটা বিকার-গ্রস্ত রোগীর মত। চারিদিকে তার খাঁচা। খাঁচার শিক ধরে গজরাচ্ছে কে যেন। আমার এই একটা রূপ আছে। টগ-বগ করে যখন আমার রক্ত ফোটে, তখন আমি বিনত হই। লোকে বুঝতে পারে না। ভদ্র আর বিনয়ী বলে আমার খ্যাতি। অথচ আমি হাতুড়ী মেরে মাথা ফাটাতে চাই।

তাই আমার করুণ মুখটা যারা দেখেছে তারা আমার ছবি দেখে চমকায়। দাঙ্গা, পিশাচিকা বা হত্যার দৃশ্য আঁকায় আমার উল্লাস কেন? কেন বর্শা এবং তরোয়াল হাতে লোকগুলো আমার ক্যানভাস জুড়ে থাকে? কেন আমার আঁকা মানুষগুলো যন্ত্রণায় বিকৃত? দৈত্যের মত ষাঁড়? কেন গিরগিটি, ব্যাঙ আর পেঁচা অমন বীভৎস করে আঁকি?

বড় বেশী কথা বলি। কম কথা বলে, আঁকো বেশী।

২১শে জুলাই ১৯৬৫

তিন মাস আগে আমার প্রথম বার হয়। জেগে জেগে স্বপ্ন দেখা—দুঃস্বপ্ন। স্কটিশ চার্চ কলেজের পাশ দিয়ে হেঁটে চলেছি। দেখি কয়েকজন ফুটপাত বাসিন্দা। নোংরা কাপড় পরে জন কুড়ি মানুষ-মেয়েমানুষ। কয়েকটা ছেলে হামাগুড়ি দিচ্ছে। একজন ড্রেনের ধারে হাগতে বসেছে। একটা বুড়ির বুকে কাপড় নেই—শুকনো স্তন, কিসমিসের মত শুকনো বোঁটা। একজন যুবতী মেয়ে বিড়ি ফুঁকছে। ইঁট পেতে হাঁড়ি চাপিয়েছে দুজন। ওপাশে ডাস্টবিন, জঞ্জাল সাফ হয় নি ক'দিন। চারিদিকে নোংরা, মানুষের দুর্গন্ধ, অসহ্য দুর্গন্ধ। হঠাৎ মনে হল আমি যেন দেখতে পাচ্ছি সূর্য বন বন করে ঘুরছে। ইঁট কাঠ সব যেন ওজন হারিয়ে উল্কার মত ছুটছে। আর মানুষের চামড়া যেন ছেঁড়া কাপড়ের ফুটো, তার মধ্যে উঁকি মারছে কংকাল।

বাস-ট্রাম-ভিড় কিছুই আমাকে দুঃস্বপ্নের কাছ ছাড়া করতে পারল না। আমার তখন বাড়ি ফেরার তাড়া। মনে হচ্ছে কে যেন আমার ওপর ভর করেছে। তীব্র অস্বস্তি। উত্তেজনায় ঘামছি। তারপর ক্যানভাসের সামনে কুলায় তুষ-ঝাড়ার মত অন্য এক বাতাস আমাকে চালিত করল। পাক্কা সাত ঘণ্টা আমি যেন যুদ্ধ করলাম। ক্যানভাসে যখন লেপ্টে পড়ছি তখনও কে যেন আমাকে জোর করে কাজ করিয়ে নিচ্ছে।

ছবিটা শেষ করবার পর আমার নড়বার শক্তি ছিল না। মনে হচ্ছিল আঁক-মাড়াই কলের মধ্যে দিয়ে চালিয়ে রস পিষে বার করে নিয়েছে।

তারপর আবার দেখলাম। ঘন ঘন। ডিসান না-দেখে ছবি আঁকার পদ্ধতি ভুলে গেলাম। স্টুডিও ছেড়ে দূরে কোথাও যেতে পারি না। দূরে গিয়ে দর্শন দেখলে আমাকে ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটতে হয়।

কাল দাঁড়িয়ে আছি। দূর থেকে দেখলাম, মেঘটা রথ হয়ে গেল। ঘোড়া-গুলোর ঈগলের ডানা। মুখগুলো পেঁচার মত। রথের গায়ে লাল-নীল নানা পাথর—পাথর নয় চোখ। আর চাকাগুলো ঘুরলে আগুন ঠিকরাচ্ছে। বাড়ি-ঘর গুঁড়িয়ে ভেঙে চুরমার করে রথ চলেছে।

রবিবার

বেঁচে থাকা অসহ্য। আমি আর পারছি না। আজ দৈব দর্শন দেখে হয়রান। ছবি এঁকে এঁকে ক্লান্ত। আমার পৃথক কোন অস্তিত্ব যেন নেই। আমি যেন ক্রীতদাস। আমার ক্ষুধা, ঘুম, ভাল-লাগা মন্দ-লাগার কোন নিয়ম নেই। সময় অসময় নেই। অন্য এক শক্তি আমাকে চালাচ্ছে। সে আমাকে পুরোপুরি দখল করে নিয়েছে।

আমি এভাবে বেঁচে থাকতে চাই না। গাছ, ফুল, পাতা, মানুষ, পশু, পাখি—অন্যদের মত স্বাভাবিকভাবে দেখতে চাই। এটাকে কি ভূতে পাওয়া বলে?

আমাকে কে যেন ভেঙে ফেলছে। চুরমার করছে।

আমি উঠে দাঁড়াতে চাইছি।

কিন্তু কে যেন আমাকে....

---

১০ হাসি—একটি কল্পিত নাম।

১১ ১৯শে জুন ১৯৬৬। মৃত্যুর পাঁচ দিন আগে লেখা।

শব্দবৃক্ষ

কবিতা সিংহ
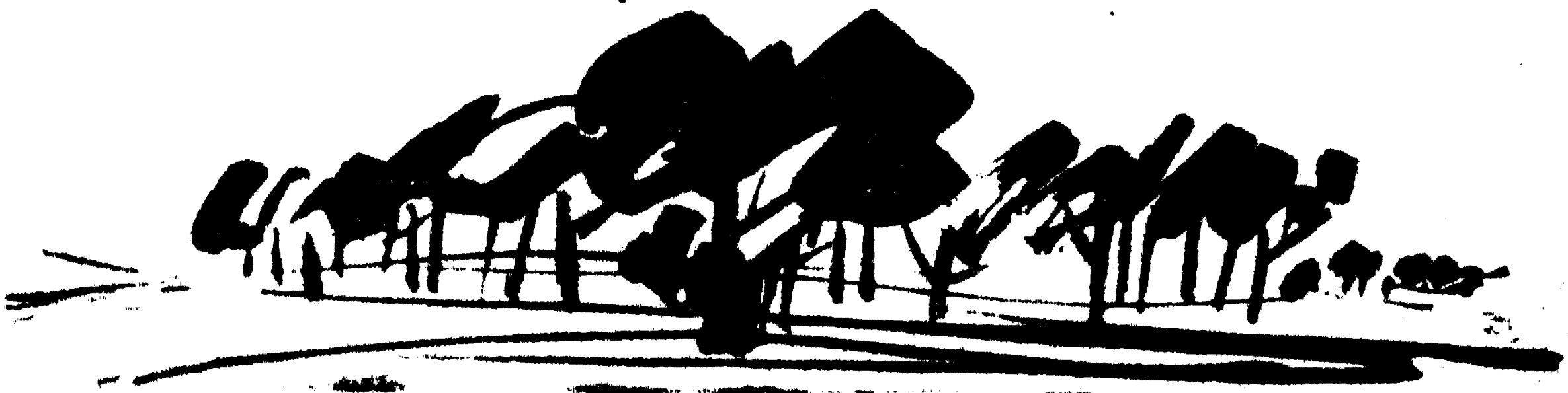
এ জন্মে শব্দ কারো কারো কাছে বৃক্ষ হয়ে যায়। আবার কারো কারো হাতে বজ্রাস্ত্র।

আমার জন্ম থেকেই উত্তরাধিকার-সূত্রে কিছু কিছু শব্দ পাই। শব্দের মধ্যে আমরা এমনভাবে বাঁচি যেন তা বাতাসের মত স্বাভাবিক। আমাদের মধ্যে কেউ কেউ পাওয়া শব্দের শব্দবীজ আবার পুঁতে দেন। তাই থেকে বেরোয় শব্দমূল, শব্দ-কাণ্ড, শব্দশাখা আর শব্দলতা। সেই শব্দ-বৃক্ষে শব্দফুল আর শব্দফলও ধরে বৈকি।

আবার কেউ কেউ কেবলই পুরাতন শব্দ-বীজ পুঁতেই ক্ষান্ত হন না, তাঁরা শব্দ-কলমও তৈরী করেন। শব্দে শব্দ মিলিয়ে মিশিয়ে। কিন্তু শব্দ কি কেবল ঠোঁটের সামগ্রী? কলমের ছবি?

শব্দের জন্য কি অন্য মাধ্যম নেই?

যেমন কানের জন্য এক বিশেষ শব্দ-লোক? সেই শব্দলোককে লেখার শব্দলোকের সঙ্গে মিশিয়ে দেখার একটা দিব্যি আলাদা মজা আছে। কানের মাধ্যমের জন্যও শব্দ সংগ্রহ করতে হয়। সে শব্দও সাহিত্যের শব্দের মত, কোন প্রকৃত বা বাস্তব-শব্দ নয়। এই শ্রুতিকর্মে প্রথমত বছরের পর বছর কান পাতা শিখতে হয় মনোমত শব্দ সংগ্রহের জন্য, এবং তা ঝাড়াই-বাছাই-এর জন্য। তারপর 'শব্দ-রূপের' নয় 'শব্দ-ধ্বনির' কলম তৈরী করতে হয়।

যে শিল্পী শব্দধ্বনির মাধ্যম দিয়ে মানুষের দরবারে পৌঁছাতে চায়, সে শ্রোতাকে ভাবে ধৃতরাষ্ট্র কিংবা গান্ধারী। আর সে নিজে যেন সেই আশ্চর্য সঞ্জয়। যাকে পৌঁছে দিতে হবে তার শোনা শব্দের সেই অবিকল ধ্বনি। শ্রোতাদের কানে শ্রেষ্ঠ ধ্বনি পৌঁছে দেবার জন্যে তার নিজের শব্দ ধরার কান ক্রমশ যেন উৎকর্ণ হয়ে ওঠে।

ঠিক সাহিত্যমাধ্যমের লেখকের মতই, শ্রুতিমাধ্যমের যিনি কারুকার মরমে পশা শব্দগুলোকেই বন্দী করে নেন ম্যাগনেটিক ফিতায়। একটি আন্তরিক কবিতার মত, একটি দরদী ছোট গল্পের মত, সেই শব্দ ধ্বনির সৃজনকেও, শব্দকারুকার পৌঁছে দিতে চান তাঁর শ্রোতাদের কাছে।

কোন লেখা, পাঠকদের কাছে পৌঁছে দেওয়ার অনুভূতি লেখকদের কাছে কেমন তা আজ আর পাঠকদের অজানা নয়। অনেক লেখকই সে উপলব্ধির কথা লিখে গেছেন। কিন্তু শব্দ-ধ্বনি সঞ্চয়ের অভিজ্ঞতা—অনুভূতির ধ্বনি, উপলব্ধির চমক—যেহেতু শব্দ-ধ্বনি-মাধ্যমটি অব্যবহিত নতুন, এবং যেহেতু এই পথে সতত চলা-ফেরা করার মানুষজন সংখ্যায় কিঞ্চিৎ কম, সেহেতু অনেকেরই তা অজানা।

তাই আজ শব্দের রূপ নিয়ে নয়—শব্দের-ধ্বনি নিয়ে যে জগৎ—তাই নিয়ে এই সামান্য গল্প-সল্প।

বাংলা সাহিত্যের একজন বিশিষ্ট মেধাবী প্রবীণ লেখিকা শ্রীমতী লীলা মজুমদার। আকাশবাণীতে প্রযোজিকা ছিলেন বেশ কয়েক বছর। তিনি একবার লিখেছিলেন যে ঝন ঝন করে একটি বড় আলোর ঝাড় ভেঙে পড়ায় তাঁর খুব আক্ষেপ হয়েছিল। কারণ তক্ষুনি তক্ষুনি টেপ রেকর্ডার ছিল না বলে শব্দটুকু ধরে রাখতে পারলেন না। মহাশূন্যে হারিয়েই গেল না রয়েই গেল শব্দটি কে জানে?

যাদের শব্দ সংগ্রহের বাতিক কিংবা শব্দ রচনার,—তারা যে কি দুর্দান্ত পাগলামি করতে পারে তা সচক্ষে না দেখলে যেন প্রত্যয় করাও সম্ভব নয়। মাটির অনেক নীচে, কোলিয়ারীর দুর্ঘটনায় বন্দী মানুষের কুড়ি দিন পরের প্রথম ভেসে আসা কণ্ঠস্বর? আহা বেঁচে থাকার দলিল রচনায় এই স্বরের কি কোন বিকল্প আছে?

পাতার পর পাতা বর্ণনা দিয়ে গেলেও কি ধরা যায় বাংলাদেশের যুদ্ধের সময় পিতৃহত্যা মাতৃহত্যা সচক্ষে দেখে সম্পূর্ণ ভেঙে যাওয়া দশ বছরের মেয়ে জারিনার কান্না? ভারত বনাম ইংল্যান্ড টেস্ট ম্যাচে জয়ের ঐতিহাসিক মুহূর্তের উল্লাস ধ্বনি? এর কোন বিকল্প শব্দরূপে দেওয়া সম্ভব কি? অথচ ধ্বনি-চিত্রে সেই উল্লাস মুহূর্তেই পৌঁছে দেওয়া যায়।

শব্দ সংগ্রহের পাগলামিতে কাজি-রাঙ্গা অরণ্যে, জলদাপাড়ায়, বীরভূম, মান-ভূম, ধলভূমের গ্রামীণ অঞ্চলে অঞ্চলে কত মধ্য রাত, কত উধাও দুপুর গিয়েছে আলো আঁধারিতে, শুকনো নদীর বালিয়াড়ী পেরিয়ে। গঙ্গাসাগর, আক্রান্ত বাংলাদেশের যশোর খুলনা কুষ্ঠিয়া, অজন্তা ইলোরা, রাজপুতানা, হৃষিকেশ দেবপ্রয়াগ, রুদ্র-প্রয়াগ—এবং নানান মেলা, গ্রামীণ হাট, আদিবাসী নৃত্যের আসরে আসরে যেমন ঘোরা—তেমনি এই শহর কলকাতার রেড-লাইট এরিয়া থেকে রেসের মাঠ খালাসী-টোলার মদের টেবিলের তলায় ঘুরেছে লুকোনো টেপ রেকর্ডার। ভিড়ে, গোলমালে, দুর্ঘটনায়, শোভাযাত্রায়, শোকযাত্রায়, আনন্দ উল্লাসে—কাঁধের ঝোলা ব্যাগে শুধু লুকিয়ে রাখা ক্ষুদে শব্দ-ছিপ—অর্থাৎ টেপ রেকর্ডার—বঁড়শি গেঁথে অজস্র অভাবনীয় শব্দ ক্রমে উঠে আসবে। সে সব শব্দের সত্যিই তুলনা নেই। সে সব শব্দ মণি-মাণিক্য।

অতর্কিতে পাওয়া সেই সব ধ্বনি, যেমন চোখ গেল পাখির কান্না, মহরমের বুক চাপড়ানোর আওয়াজ, মাটির বেহালার করুণ সুর, কালীঘাটের মন্দিরের গর্ভগৃহের ভক্তের সমর্পিত মা-মা ধ্বনি—ঢাকার সীমানায় যুদ্ধের গোলার বিস্ফোরণ এবং আরো যে কত কত অসম্ভব সব শব্দ উঠে এসেছে টেপ রেকর্ডারে তার ইয়ত্তা নেই। অনেক নামকরা মনীষী, সাহিত্যিক ও শিল্পীর অতর্কিত কিছু কথাও দিব্যি জমে যায় শব্দ-সঞ্চয়ের ভাণ্ডারে। মাথার মধ্যে বাজতে থাকে হার্ট অপারেশনের আগে বুকের স্টারনাম হাড় ফাঁড়ার, ভয়ংকর করাত কাটা আওয়াজ কিংবা হৃদয়ের কোমল লাপ-ডুপ। তবু সব কথার শেষ কথা হল শব্দ-ধ্বনির যে বিশেষ কারুকর্ম, তা ঠিক সাহিত্যের মতই মাত্রই বাস্তবানুগ নয়, দারুণভাবে সৃজনাত্মক। সাহিত্যিক যেমন রিপোর্টিং করেন না, বাস্তবকে যে অবস্থায় পেয়েছেন তেমনি হুবহু দেখান না, —সৃষ্টি করেন, গড়ে তোলেন, —শব্দ-ধ্বনির সৃষ্টিও ঠিক তেমনিভাবেই হয়। অনেক সময় বাস্তবিক শব্দকে শোনায় না বাস্তবিক। তখন বাস্তবিক করার জন্য কৃত্রিম শব্দ তৈরী করতে হয়। একটি উদাহরণ দিই।

কলকাতার এক ব্যস্ত চায়ের দোকানে টেপ-রেকর্ডার লুকিয়ে নিয়ে তোলা হল খদ্দেরের গ্যানজামের সঙ্গে মিশিয়ে লোহার ট্রেতে এক রাশ কাপ-প্লেট নিয়ে যাওয়ার থর থর শব্দ।

সেই শব্দ যখন নিজে কানে নেওয়া গেল, তখন দেখা গেল কোথায় কাপ-প্লেটের শব্দ? যে শব্দ উঠেছে তা অবিকল ঘন্টা বাজিয়ে যাওয়া ছুটন্ত দমকলের। তাই মোক্ষম বাস্তব ইমপ্যাক্ট আনার জন্যও অনেক সময় অন্য প্রক্রিয়ায় বাস্তবানুগ শব্দ তৈরী করতে হয়। যেমন প্রকৃত হৃদয়ের ধুকপুকের চেয়ে ইচ্ছামত ধুক ধুক বানান যায় টান করে রাখা ব্লেজার বা ফেল্টের কাপড়ের ওপর লাপ-ডুপের ছন্দে আঙুলের টোকা বাজিয়ে। আবার প্রতীকী শব্দ তৈরী করার জন্য ব্যবহার করা যায় সহমর্মী শব্দকে। অঝোর ঝরণ শ্রাবণ সন্ধ্যার শব্দ-মায়া রচনায়, বৃষ্টিধারার সঙ্গে সেতার থেকে ঝরিয়ে দেওয়া যায় মেঘ-মল্লারের ঝালা, সেই সঙ্গে দু-একটি একাকী ফোঁটার জন্য জলতরঙ্গের টুং টাং, মাঝে মাঝে মেঘমন্দ্র মৃদঙ্গ ধ্বনির সঙ্গে মেঘ গর্জনের শব্দ—আর তখনই কানের ভিতর দিয়ে মরমে প্রবেশ করতে থাকে,—বৃষ্টির ছবি, জলের গন্ধ, ভেজার আনন্দ, অপেক্ষার ব্যথা, অনুভবের অশ্রুমাখা সুস্বাদু। এভাবে এ জন্মের কারো কারো কাছে শব্দ ক্রমশ বৃক্ষ হয়ে ওঠে। এবং কারো কারো কাছে বজ্রাস্ত্রও।

চিৎপুরের যাত্রাপাড়া

যাত্রার জাত গেল

প্রভাতকুমার দাস

আসন্ন মরসুমের নির্বাচিত পালাগুলির বিজ্ঞাপনের দিকে তাকালে বোঝা যায় চিৎপুরের পেশাদার যাত্রা দলগুলি আজ এক কঠিন পরীক্ষার সম্মুখীন হয়েছে। নিকট গত কয়েকটি বছরের সাফল্য ও জনপ্রিয়তা শুধু যাত্রায় যে বিস্তারভূমি লাভ করেছিল, মঞ্চ বাণিজ্যের ক্ষেত্রে সেই প্রসারতা এখন একটু করে গুটিয়ে যাচ্ছে। মঞ্চ ও চলচ্চিত্রের নিষ্ফল অনুপ্রেরণায় সাজানো সামাজিক পালায় ক্লান্তিকর একঘেয়েমি খুব দ্রুত না কাটিয়ে উঠতে পারলে, যাত্রাশিল্পকে পিছিয়ে পড়তে হবে আবার।

পরস্পর প্রতিযোগী দলের সংখ্যা ক্রমশঃ বাড়ছে। সম্ভবত এই জন্যেই প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রে নিজের দলকে শুধুমাত্র বাণিজ্যিক কারণে উত্তীর্ণ করে দেওয়ার লক্ষ্যেই নিত্য-নতুন চমকের ঘোষণা দেখা যাচ্ছে বিজ্ঞাপনে। চলচ্চিত্রের বা মঞ্চের জনপ্রিয় অভিনেতা, এমন কি কলকাতা কাঁপানো ক্যাবারে নৃত্যের সংযোজন ছাড়াও, উট, ঘোড়া, থেকে শুরু করে 'সম্পূর্ণ রঙিন' কিংবা যাত্রার আসরে একই সঙ্গে পুতুল নাচ ও ইন্দ্রজাল দেখানোর প্রতিশ্রুতিতে ক্রমাগত চমকের তালিকা বাড়ছে। কিন্তু ব্যাপারটা লক্ষ করার মত, শুধু মাত্র বিজ্ঞাপন বা হৈ-চৈ দিয়ে আধুনিক যাত্রাগানকে জনপ্রিয় করার চেষ্টা করা হলেও যাত্রা গানের অসংখ্য পৃষ্ঠপোষক গ্রামীণ দর্শকদের অসন্তোষ ও অতৃপ্তির কারণ অনুসন্ধান করে নিজেদের ভুল পথটি সংশোধন করে নেবার সময় এসেছে আজ।

স্বদেশভাবনায় বিদ্ধ প্রবেশ, পৌরাণিক পালার নতুন সম্ভাবনা নিয়ে হাজির হয়েছিলেন স্বল্পায়ু ভোলানাথ কাব্যশাস্ত্রী। তিনি তাঁর সমকালে অত্যন্ত জনপ্রিয় পালাকার ছিলেন। সামাজিক মানুষ হিসেবে পালা রচনাকে তিনি একটি মহান দায়িত্ব বলেই গ্রহণ করেছিলেন। 'ভাষার ঝংকারে মুখরিত করবার জন্য নয়, ভাবের সম্পদে নাট্যজগতের কোন অভাব মোচনে নয়, প্রশংসাপত্রের প্রতীক্ষায় নয়, আমি জাহ্নবী প্রকাশ করিলাম—শুধু আর্য সন্তানগণকে জাগাইবার জন্য।' তাঁর একটি উল্লেখযোগ্য পালার ভূমিকায় এই উদ্দেশ্যের কথা জানিয়েছিলেন কাব্যশাস্ত্রী মহাশয়। চিত্ত-বিনোদনের ভেতর দিয়ে পুরাণ প্রচার করে গ্রামজীবনে জাগরণের গান নিয়ে তাঁরা হাজির হতেন।

যুগেরই প্রয়োজনে, দর্শকরুচির তারতম্যে, পরবর্তীকালে পালা গানের ভিতর থেকে অনেক পুরাতন বৈশিষ্ট্য সরিয়ে দেওয়া হলেও, পুরাণই ছিল সেই সব রচনার ভিত। ভোলানাথ বুঝতে পেরেছিলেন, শুধু বক্তৃতা আর গান দিয়ে মানুষের মনের ভিতরে সাড়া জাগানো সম্ভব নয়। চরিত্রসৃষ্টির মাধ্যমেই অনেক গভীর তত্ত্বকথা প্রচার করতে হবে। অথচ গল্পটিকে এমনভাবে সাজাতে হবে, তত্ত্বপ্রচারটাই যেন মুখ্য না হয়ে ওঠে। কেননা দেবতার নাম গানের সঙ্গে মাটির রঙ মিশিয়ে তাকে আরও সহজ ও সাধারণ করে তুলতে হবে। এমন কি, পরবর্তীকালে ইতিহাস ও পুরাণ দুরকমের বিষয় নিয়ে লেখা পালাকে জনপ্রিয় করে তোলার জন্য পালাকাররা শক্তিশালী গল্পের উপরই নির্ভর করতেন বেশী।

পুরাণ ও ইতিহাসের পুনরাবৃত্তিও এক সময় দর্শকদের

ক্রান্ত করে তুলল। ঠিক সেই সময় পালাসম্রাট ব্রজেন্দ্রকুমার কাল্পনিক পালার প্রবর্তন করলেন। পুরাণ ও ইতিহাসকে সামনে রেখেই, স্বকপোলকল্পিত কাহিনীর প্রচার ছিল এই ধরণের পালার বৈশিষ্ট্য। শুধু তাই নয় ব্রজেন্দ্রনাথের অভিজ্ঞতার সীমা বিস্তৃত ছিল বলেই, তিনি এই পথে ময়মনসিংহ গীতিকার অনেক প্রধান ও জনপ্রিয় কাহিনীকে যাত্রায় পরিবেশন করে যথেষ্ট খ্যাতি পেয়েছিলেন। আর দর্শক সাধারণ এই সব কাহিনীর ভেতরে নিজেদের সামাজিক জীবনকে আরও গভীরভাবে প্রতিফলিত দেখতে পেয়েছিলেন বলেই, পুরাণ আর ইতিহাসের কথা কিছু দিন ভুলে থাকতে পেরেছিলেন।

কিন্তু গত দশ বছরে নানাভাবে পরিবর্তিত হয়েছে যাত্রাগান। দীর্ঘদিন ধরে কলিয়ারীর শ্রমিক, চা বাগানের মালিক, যাঁরা নিজকাই প্রমোদের অভিপ্রায়ে যাত্রার আসর বসান, লোকশিক্ষা প্রচারের অভিপ্রায়কে সরিয়ে দলকর্তারা প্রধানত সেই সব দর্শকদের মনোরঞ্জনের আশায় পালা গাইতে সুরু করলেন। কিন্তু দর্শকরুচির বিবর্তন হল, গ্রাম আর শহরের শিক্ষাভিমানীরাও নতুনের স্বাদ পেলেন দীর্ঘদিন অবহেলিত যাত্রার আসরে এসে।

কাল্পনিক কাহিনীর সূত্র ধরেই সামাজিক পালার প্রবেশ ঘটল যাত্রার আসরে। এ ক্ষেত্রে দর্শকরা অভিনন্দন জানালেন, সুখদুঃখ আনন্দবিষাদময় একেবারে ঘরের কথাই স্থান পেল ঐ সব পালায়। সত্যপ্রকাশ দত্ত নির্মল মুখোপাধ্যায় আর ভৈরব গঙ্গোপাধ্যায়ের হাতে এই সামাজিক পালা রীতিমত বাণিজ্যিক সাফল্যের চূড়ান্ত পথ প্রস্তুত করল। সামাজিক পালার পাশাপাশি জীবনীমূলক পালারও একটি বাজার গড়ে উঠল। শুধুমাত্র বাণিজ্যিক উদ্দেশ্য নয়, পুরাণের মহাত্ম্য প্রচারের মতই মহামানবের জীবনের ভেতর দিয়েই আদর্শ উদ্বুদ্ধ করার প্রয়াস দেখা দিল যাত্রাগানে। জীবনীমূলক পালার অক্লান্ত রূপকার শম্ভুগোপাল বসু. অশ্বিনী (?) রাম রচিত 'হিটলার' প্রচার করলেন, বিশ্ব রাজনীতির একটি ভয়াবহ অধ্যায় স্থান পেল পালায়। একই বছরে, জনপ্রিয় অভিনেতা স্বপনকুমার 'মাইকেল মধুসূদন' পালাটি পরিবেশন করে ততোধিক জনপ্রিয় হলেন এই জন্যে যে, অভিনয় নৈপুণ্যে মহাকবির দুঃখদারিদ্র্যময় জীবনের শরীক করে নিলেন দর্শকদের। কিছুদিন পূর্বে, 'স্বামী বিবেকানন্দ' পালায় পরিচালক পূর্ণেন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় পরীক্ষামূলকভাবে আলো ব্যবহার করেছিলেন। সাড় বার দেওয়া হয়েছিল যাত্রাস্কোপ। যাত্রার দর্শক আর আসরকে মিলিয়ে দেওয়ার অভিপ্রায়ে তিনি দু একটি দৃশ্যে অভিনেতাদের ছড়িয়ে দিয়েছিলেন দর্শকদের আসনে।

ইতিমধ্যে যাত্রায় একটি নতুন জিনিস চালু হয়ে গিয়েছে—পুরুষ রাণীদের পরিবর্তে আসল মেয়েদের দিয়েই স্ত্রী ভূমিকাগুলি অভিনয় করানো। পুরাতন পুরুষরাণীদের অভিনয় এতদিন যে জনপ্রিয় ছিল শুধু তাই নয়, তাঁদের কণ্ঠের জোর এমন একটা গ্রামে বাঁধা থাকত, পরবর্তীকালে মহিলাশিল্পীদের অনেককেই সেই জনপ্রিয়তা ও কণ্ঠের জন্য রীতিমত কষ্ট করতে হয়েছে। স্বপনবাবু মাইকেলে ব্যবহার করলেন মাইক্রোফোন। পরিচালক অমর ঘোষ 'হিটলার' পালায় আলো-মাইক-টেপরেকর্ডার ব্যবহার করে আঙ্গিক ও প্রয়োগ ভাবনার সঙ্গে যাত্রাকে যুক্ত করেছিলেন। সম্ভবতঃ এক বছর পরে নিউ প্রভাস অপেরার 'পাগল

কীর্তি পালার একটি দৃশ্য [illegible]

ঠাকুর', ভক্তিরসাত্মক জীবনীমূলক পালা হিসেবে যে সাফল্য এনেছিল, বলা যেতে পারে তার মূলেও ঐ পরীক্ষামূলক প্রয়োগ ভাবনা।

জীবনীমূলক পালায় চরিত্র অনুসারী রূপসজ্জা একটা সমস্যার ব্যাপার। অন্য দিকে প্রয়োগ ও পোষাকের পেছনে প্রচুর অর্থ ব্যয় হয় বলে প্রায় ক্ষেত্রে রাজনৈতিক পালা একটা ঝুঁকি হয়ে উঠল। যেজন্য সামাজিক পালার সঙ্গে টেক্কা দিয়ে পিছিয়ে পড়তে হল তাকে।

দেখা গেছে, কোন বিশেষ একটি দলের সাফল্য, আর পাঁচটা দলকেও একই কেন্দ্রবিন্দুতে আকর্ষণ করে। যার ফলে পালা নির্বাচনের ক্ষেত্রে, অনেকটা জনতাগিদের উপর নির্ভর করে অপরাপর দলগুলিকে প্রস্তুত হতে হয়। মাঝে আঙ্গিক বা প্রকরণের এমন একটা হিড়িক এসেছিল যে আলো-মাইক-টেপরেকর্ডার ছাড়া দল বায়নাই হত না। এই তিনটি উপকরণের অনুপস্থিতিকে দর্শকরা নিম্নমানের প্রয়োজন বলে ভাবতে অভ্যস্ত হয়ে উঠলেন। সুতরাং বাধ্য হয়ে, অপ্রয়োজন ও অনিচ্ছা সত্ত্বেও আলো-মাইক-টেপ ব্যবহার করতে গিয়ে ঐতিহ্যের সুতোয় টান পড়ল।

চিৎপুরে যখন এই অবস্থা, তখন একজন নতুন কর্ণধার জোছন চট্টোপাধ্যায়, কয়েক বছর পূর্বে পৌরাণিক পালায় সাফল্য আনলেন অনায়াসে। পুরাতন কয়েকটি পালাকেই তিনি নির্বাচন করে, নতুনভাবে সম্পাদনা করালেন নটনাট্যকার আনন্দময়কে দিয়ে। তাতে পুরাতন অনেক কিছুকেই যেমন বাদ দিতে হয়েছিল, তেমন যুক্ত হয়েছিল এমন কয়েকটি বৈশিষ্ট্য, যাত্রাগানের আধুনিকতায় যা মানিয়ে যায়। একেবারে সাদামাঠা গদ্য সংলাপ, আলো বা টেপ-রেকর্ডের সাহায্যে কোন বাহুল্য প্রচেষ্টা নেই. শুধু অভিনয় দিয়েই পালাগুলিকে আগাগোড়া বেঁধে রাখা। আর অবশ্যই গানগুলি ছিল সে সব পালার একটা আকর্ষণ। যেজন্য 'হরপার্বতী' কিংবা 'সীতার বনবাস' বাণিজ্যিক দিক থেকে অনেক সাফল্য এনেছিল।

তবে পৌরাণিক পালার এই গদ্য সংলাপ নিয়ে সনাতন-পন্থীদের কয়েকজন আপত্তি করেন। বছর কয়েক পূর্বে অতুল ভট্টাচার্য যখন 'সম্রাট অন্ধকাসুর' পালাটি নির্বাচন করেছিলেন, রিহার্সাল চলাকালীন পরিচালক এবং নামভূমিকার অভিনেতা দিলীপ চট্টোপাধ্যায়কে একদিন প্রশ্ন করেছিলাম তাঁর পালার সংলাপ নিয়ে। অমিত্রাক্ষর ছন্দে লেখা, সুরে টানা, কিছুটা গমক প্রধান, সেই সব সংলাপ ক্ষেপনের পক্ষে তিনি যুক্তি দেখালেন, ভাষা ও ছন্দ পৌরাণিক চরিত্রকে অনেক জীবন্ত করে তোলে। আর, এই তো সেদিন প্রবীন অভিনেতা, অমিয় বসু উল্লেখ করলেন, ভাষা ও ছন্দের সঙ্গে রূপসজ্জা ও পোষাকের ব্যবহারটিও জরুরী। কোন বিশেষ চরিত্রের মহিমা কিংবা ভয়—দুটোই রূপসজ্জা ও পোষাকের তারতম্যে বিঘ্নিত হতে পারে। তাঁরই সহকর্মী বিমল লাহিড়ী কথা প্রসঙ্গে একটি গল্পও বললেন : জনৈক প্রখ্যাত চলচ্চিত্র শিল্পী একবার কৃষ্ণ সেজেছিলেন। চরিত্রটিকে আধুনিক করবার জন্য কোঁচানো ধুতি, কাজকরা পাঞ্জাবী, সাধারণ রূপসজ্জা নিয়ে যখন আসরে ঢুকলেন, তখন দর্শকরা 'বালিগঞ্জের কেষ্ট চাই না' বলে চিৎকার করে ফিরিয়ে দিলেন তাঁকে।

আসলে ততদিন পর্যন্ত স্বাভাবিক ছিল, যতদিন ভেতর থেকেই অনেকটা প্রয়োজনের তাগিদেই উঠে আসছিল সেই সব পরিবর্তন। যাত্রাজীবনেরই সঙ্গে দীর্ঘ দিন যুক্ত পালাকার-অভিনেতা বা পরিচালক, নিজেদের অভিজ্ঞতা দিয়ে অনুভব করতে পারতেন—দর্শকরা কি চায়। কোন উপায়ে পূরণ করা যেতে পারে সেই গণদর্শকের আকাঙ্ক্ষা। তাঁরা সেইভাবেই প্রস্তুত করতেন নিজেদের। কিন্তু পরবর্তী আধুনিক পর্বে, নিয়ন্ত্রণের সমস্ত দায়িত্বটাই গিয়ে পড়ল তাঁদের উপর, যাঁরা প্রধানত মঞ্চ কর্মী। মনে হয়, যাত্রার ঐতিহ্য নয়, মঞ্চ নাটকের অভিনবত্বই তাঁরা আরোপিত করতে চাইলেন। এমন কি দৃশ্যসজ্জা যাত্রা গানের ক্ষেত্রে যা বাহুল্য মাত্র—তারই পুঙ্খানুপুঙ্খ ব্যবহার দেখা দিল পালায়। বলা বাহুল্য, পরীক্ষামূলকভাবে মঞ্চ নাটকে যখন দৃশ্যসজ্জার দিকটি উপেক্ষা করা হচ্ছে, আধুনিকতার অজুহাতে যাত্রায় তা প্রযুক্ত হওয়ার সুযোগ পেল। প্রকরণ বা আঙ্গিকের দিকে ঝোঁক দিতে গিয়ে, অভিনেতাদের ভেতরের জোর কমতে সুরু করল। অথবা প্রবীণ পালাকার ব্রজ-গোপাল রায়চৌধুরীর মতামতও ভেবে দেখা যেতে পারে, 'পুরাতন রীতির শক্তিমান অভিনেতাদের অবলুপ্তির পথেই যাত্রা গানে প্রবেশ করল আঙ্গিক আর প্রয়োগ চর্চার প্রাচুর্য।' যেজন্য পুরাতন আর নবীনের সন্ধিস্থলে সমান জনপ্রিয়তা নিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন যে অভিনেতা, সেই পূর্ণেন্দুশেখর যখন বলেন, 'আজকের যাত্রাভিনেতা, পরিচালক অধীন পালা নাটকের কারাগারে বন্দী, কথাটা অত্যন্ত উপলব্ধ মনে হয়। তাঁর ধারণা এই যান্ত্রিক রীতিতে অভিনয় করতে করতে একজন অভিনেতার নিজস্বতা ধরা পড়ে না।' কিন্তু শিল্পীর ক্ষেত্রে নিজস্বতা একটা প্রয়োজনীয় ব্যাপার। এমন কি এই এক যুগ আগেও একই আসরে সিরাজদ্দৌলা পালায় অভিনয় করে ছোট ফণিবাবু এবং পূর্ণেন্দুবাবু অভিনয়ের দিক থেকে দুটি পৃথক রীতিতে চিহ্নিত হয়ে ছিলেন। যেমন বাঙালী পালায় বড় ফণিবাবু এবং পঞ্চু সেন দায়ুদ খাঁর অভিনয়ে, স্বাতন্ত্র্যের জন্যই অর্জন করে-ছিলেন সমান জনপ্রিয়তা।

আসলে চমক প্রবেশ করেছিল, অন্য কয়েকটি দুর্বলতা ঢাকতে। পূর্বে যেমন পালার গানগুলি দর্শকদের কাছে আকর্ষণীয় হত—কথা, সুর আর গায়কের নিজস্ব গায়ন পদ্ধতির সমন্বয়ে। এখনো যে প্রাচীন দিনের অবসরপ্রাপ্ত অভিনেতা বিজয়কৃষ্ণ মিত্র কিংবা বটকৃষ্ণ দত্তগুপ্ত তাঁদের অভিনয় জীবনের স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে একটা সাত ঘন্টার পালায় হুবহু মুখস্থ বলে যান অবলীলা-ক্রমে, তা আর কিছু নয়,—ঐ সুর, সুরের নিবিড় আত্মীয়তা। বিনোদ ধাড়া এবং তিনকড়ি ভট্টাচার্যের মত প্রতিভাবান বিবেক গায়কেরা, তাঁদের নিজেদের সময়ে অভিনয় এবং গানকে মিলিয়ে দিয়ে নতুন যুগের একটা বৈশিষ্ট্য প্রতিষ্ঠা করতে পেরেছিলেন। তাঁদেরই উত্তরসাধক গুরুদাস ধাড়া যে বর্তমানকালের অন্যতম গায়ক এবং নায়ক অভিনেতা, তাঁর কারণ, পূর্বসূরিদের অনুসরণকে তিনি যুগোপযুক্ত করে তুলেছেন নিজের স্বাতন্ত্র্যে। এমন কি দ্বিতীন রায়ের মত উদাত্তকণ্ঠ গায়কের চাহিদা এখনো এই আধুনিক যুগেও যে সমাদৃত হয়, তার কারণ তিনি নিজেকে প্রস্তুত করে [illegible]-ছিলেন পূর্ব যুগের দীক্ষায়।

কিন্তু কি ছিল সেই গানে, যে গান একনাগাড়ে, একজনের কিংবা কোরাসের কণ্ঠে একঘন্টা ধরে বসে বসে শুনতে দর্শকরা কোন রকম ক্লান্তি বোধ করত না। একটা পালায়, কম করে হলেও গোটা তিরিশেক গান থাকত পুরুষ আর নারী চরিত্রের কণ্ঠে। সাম্প্রতিক-কালে সেই গানের পরিমাণ একেবারেই কমে যাচ্ছিল, সংক্ষিপ্ত সময়ের অজুহাতে। এ অজুহাত অসঙ্গত মনে করা উচিত না, কিন্তু গান ছাড়া যে দর্শকদের মন সন্তুষ্ট হওয়ার নয়, তা কয়েক বছরের ভেতরেই প্রমাণিত হয়ে গেল। প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যেতে পারে, জ্যোৎস্না দত্ত, বীণা দাশগুপ্তা, তারারাণী পাল, সাহানা বসু প্রভৃতি শিল্পীরা গানের জন্যই সর্বাধিক জনপ্রিয়। এখন যে গান ছাড়া যাত্রার কথা ভাবা মুশকিল তাই নয়, নাচের দিকেও একটা বিশেষ চাহিদা পড়ে উঠছে। হয়তো এই নতুন চাহিদার ভেতরেই লক্ষ করা যাচ্ছে পুরাতন গীতাভিনয়ের বিবর্তন। সাম্প্রতিককালে একদিন রাতে,

হরিপদ চট্টোপাধ্যায়

মতি রায়

অঘোর কাব্যতীর্থ

লায়লা মজনু বা হাসির আড়ালে—নতুন রীতির পালাগুলিতে যে পরীক্ষা প্রযুক্ত হয়েছে, তা অনেকাংশে উত্তীর্ণ হতে পেরেছে এই জন্যে যে নাচগান অভিনয়কে তিনি এক সঙ্গে মিলিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করেছেন।

দর্শকরা চান বলেই যে কারণে অকারণে নাচগানের হুল্লোড় বইয়ে দিতে হবে তা নয়। দর্শকরা চান আনন্দ। সেই প্রার্থিত আনন্দকে, শিল্পের উপকরণে উপহার দিতে হবে পরিবেশকদের। বিশেষ কোন বক্তব্য প্যারের উদ্দেশ্য থাকতে পারে কোন কোন পালায়, কিন্তু দেখা দরকার প্রয়োগের চমক যেন ভারী করে না তোলে পালাভিনয়ের স্বাভাবিক স্বাচ্ছন্দ্যকে।

সামাজিক পালাগুলি যে একঘেঁয়ে হয়ে উঠেছিল, তার একটাই কারণ, পালাকাররা গল্পকে বাঁধতে গিয়ে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তৃতীয় শ্রেণীর চলচ্চিত্রের অনুকরণে নিজেদের হারিয়ে ফেলেছিলেন। না গ্রাম, না শহর—পালাগানের বিষয় হিসেবে তাঁরা যে সমাজকে আশ্রয় করেছিলেন তা যেন একটা জগাখিচুড়ি হয়ে যাচ্ছিল। সেজন্য নাট্যরস নির্মাণের চেয়ে, সস্তা সেন্টিমেন্ট বা অকারণ করুণ রসাত্মক করতে গিয়ে পালার চরিত্রগুলি হয়ে উঠেছে দুর্বল। পালাকারদের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা সীমিত হওয়ার জন্য, একটিই বৃত্তে ঘুরতে ঘুরতে কাহিনীগুলি ক্লান্তিকর একঘেঁয়েমিতে পরিণত হতে বাধ্য। কয়েক বছর পূর্বে কোন কোন পালাকার এই ক্লান্তি দূর করার প্রচেষ্টা করেছিলেন ঝুমুর, কবি গান, বাউল, তর্জা প্রভৃতি লোককলাকে সংযুক্ত করে। অথচ পালার বিষয়ের সঙ্গে প্রক্ষিপ্ত হওয়ায়, ঐ সব গান কোন কোন গায়কের কণ্ঠে জমলেও, পালার গতিকে শিথিল করে দিয়েছিল।

কাহিনী নির্বাচনের এই সমস্যা থেকেই হয়ত যাত্রায় সেক্সপীয়র কিংবা হোমারের আবির্ভাব। জোরালো গল্প, জমজমাট পোষাক, প্রয়োগের এলাহি ব্যাপার, সব মিলিয়ে একটা বাণিজ্যিক চমক আছে এই ধরণের নির্বাচনে। তাছাড়া এখনকার ব্যবসার বা বাজার, চিৎপুর থেকে নৈমিত্তিক চমকের ব্যাপারটি সরিয়ে দেওয়াও মুস্কিল। তরুণতম প্রযোজক পাহাড়ী ভট্টাচার্য এই কথাটাই সেদিন সবিনয়ে জানিয়েছিলেন, 'নিছক ব্যবসার দিকটি এড়িয়ে, আজকাল চিৎপুরে শিল্পসৃষ্টি করা অসম্ভব। আর প্রতিযোগিতার এখন বাজারে ব্যবসায়ে লক্ষ্মীর কৃপালাভের জন্য প্রস্তুত করে তুলতে হলে চাই চমক, চাই গ্ল্যামার।'

কিন্তু এই চমকের বিরুদ্ধেই যুদ্ধ করতে হবে যাত্রাকে, করতে হবে তার অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার দায়িত্বে। বলিষ্ঠ পালা, শক্তিমান অভিনেতা, সর্বজ্ঞ পরিচালক আর যাত্রাপ্রেমিক দলকর্তা—হয়তো সেই জন্যেই নিছক বিনোদন থেকে লোকশিক্ষার দিকে, বাণিজ্য থেকে বন্দনার দিকে ফিরে তাকানোর সময় এসেছে এবার। যাত্রাগানের নিজস্ব ধারাতেই যাত্রাগানকে প্রতিষ্ঠিত করতে পারবেন। বাইরের থেকে কোন চমক নয়, ভেতরের আধুনিকতাতেই জাগিয়ে তুলতে হবে যাত্রাগানের নতুন মহিমা।

ভুল প্রশংসা

বরিসালের ভোলা শহরে একটা সখের দল ছিল। উকিল-মোক্তাররা অভিনয় করতেন। মাঝে মাঝে তাঁদের দলে সুরেশ দত্ত মহাশয়ের ছোট্ট মেয়েটির ডাক পড়ত। নামকরা সঙ্গীত শিক্ষক ছিলেন কৃষ্ণ চন্দ্র নন্দী। তার কাছেই গান শিখত মেয়েটি।

হঠাৎ দেশ ভাগ হয়ে গেল। পাঁচ-ছ বছর বয়স, মা আর দু-দাদার সঙ্গে কলকাতায় চলে আসতে হল। শালিমারে থাকতেন যোগেশ দত্ত। তিনি তাঁর বাসায় সবাইকে নিয়ে যান। মিস্ত্রীগিরিতে কাজ করতেন বড়দা, সে সময় যাদবপুর ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে ট্রেনিং-এ ছিলেন। খবর পেয়ে সকলকে যাদবপুরে নিয়ে যান।

খুব কষ্টের সংসার। কোন রকমে সকলের গ্রাসাচ্ছাদন করে জীবন যাপন করতে হয়। পড়াশুনার ইচ্ছে থাকলেও, চালিয়ে যাওয়া মুশকিল। নাচ-গানটা ভেতরে থেকে গিয়েছিল। যাদবপুরের ঝিকে দল, 'মুক্তকেশী অপেরায়' কয়েকদিন নাচিয়ে হয়ে যাওয়ার সুযোগ হল। একটা আসরে বাঁশী বাজাতে এসেছিলেন যোগেশবাবুর আত্মীয় রামকৃষ্ণ নন্দী। তিনিই চণ্ডী অপেরায় আনেন মেয়েটিকে। সখীর দলের নাচিয়ে করে।

কলকাতার পেশাদার দল। নতুন জীবন শুরু হল মেয়েটির। তখন একটা দল মানে সব মিলিয়ে সত্তর-আশিজন। দলে বাচ্চা ছেলেদের নাচগান শেখানোর জন্য মাস্টার মশাই থাকতেন। তখনকার দিনের নামকরা মাস্টার হীরালাল গঙ্গোপাধ্যায়ের হাতে পড়ে মেয়েটির সম্ভাবনা আরও উজ্জ্বল হয়ে উঠল। বড় অভিনেতাদের চাহিদা অনুযায়ী, মাস্টার মশাই ছেলেদের প্রস্তুত করে দিতেন। ভাল একাসে ছেলে হতে পারলে, অধিকারী মশাই তার জন্য একটু আলাদা ব্যবস্থা করেন। মেয়েটির বড় ইচ্ছে সে একাসে হয়।

এখানে তখন ইতিমধ্যে পাঁচ-ছটি দলও তার খোলা হয়ে গেছে। যাত্রাদলে তখন পুরুষরাই মেয়ে সাজতেন। তাদের এক এক-জনের দাপট কি তখন। একটা সময় এলো যখন মেয়েটিকে নিয়ে

আর একালে কল্পনা করা যায় না। অথচ যাত্রায় স্ত্রী ভূমিকায় জন্য যে মেয়েটিকে আনানো হবে, সে সাহসও নেই অধিকারীদের। মেয়েটি তাই নিয়োগ পরেই দলশুদ্ধ, সকলের আত্মীয় হয়ে উঠেছিল। অভিনয়ের দিক থেকে কি, সুরে সুরে গানগুলো আগাগোড়া মধুবৎ।

নিয়ামতোলা রাজবাটিতে গান হবে সত্যম্বর অপেরার, রণজীর কেরল পালা। সুরের নায়িকা নন্দরাণীকে পাওয়া যাচ্ছেনা। খুব মজা হল মেয়েটির। আপোস করে শেফালির ভূমিকায় অভিনয় করে তাক লাগিয়ে দিল, প্রথম রাতেই প্রাইজ। অকস্মাৎ সম্ভাবনার আর একটা দরজা খুলে গেল। পরের বছর 'চিন্ময়ীর' পালায় নতুন পার্ট পেল মেয়েটি, কাঁকনবাঈ। কিন্তু মেয়েটি তাঁর স্বনামে পরিচিতা হল আরও পরে। সোনাই দীঘি পালায়- সোনাই করে, তেরো বছরের মেয়েটি সকলের মন কেড়ে নিল। নতুন যুগের সূচনা লগ্নের সঙ্গে যুক্ত হল একটি প্রতিভা। যাত্রায় দর্শকরা উপহার পেলেম একটি নতুন চরিত্র সোনাই, একজন নতুন নায়িকা জ্যোৎস্না দত্ত।

আগে এক এক আসরে সাধারণত সাত আট দিন গান হত। উনিশ দিন পর্যন্ত একই প্যান্ডেলে গান করেছি। একটা অন্যরকম পরিবেশ ছিল তখন। দলে পাঁচ ছজন করে বড় অভিনেতা থাকতেন। এখন তো ভাবাই যায় না। শিল্পীদের উদার মনোভাবের অভাবে সব নষ্ট করে দিচ্ছে। আজকাল একজন টপ, আর কাউকেই সহ্য করতে পারেন না। যদি যশ ভাগ হয়ে যায়। কত কষ্ট করে শেখাতেন সেই সব বড় অভিনেতারা। যাঁরা শিখতেন তাঁদের নিষ্ঠাও কম ছিল না। এক পক্ষের ভয়, অন্যপক্ষের স্নেহ, দুটো মিলিয়ে অভিনেতা গড়ে উঠত।

তবে কোন কোন ক্ষেত্রে এর ব্যতিক্রম ছিল বৈকি। কোন কোন বড় অভিনেতা নিজেদের সম্মানের দিকটাই বেশী দেখতেন। সাজঘরে বা খাওয়ার ঘরে শুধু নয়, আসরে পর্যন্ত। যেহেতু তিনি একজন বড় অভিনেতা, তার সহ অভিনেতারা কোন চরিত্রে অভিনয় করছেন সেটা বড় কথা নয়—অভিনয় চলাকালেও বাড়তি হিসেবে তাঁকে সম্মান দিতে হত। এখন বাইরের পরিচালকরা নির্দেশ দেন বলে, এ ক্ষেত্রে বড় হোক ছোট হোক অভিনেতাদের কিছু করার থাকে না। নির্দেশ মাফিক কাজ করতে হয়। পরিচালনার বাইরে কিছু করার নেই। এতে ক্ষতিও হয়। গত বছর একটি চরিত্রে অভিনয় করতে গিয়ে প্রায় প্রতি দৃশ্যেই উপস্থিত থাকতে হত। দর্শকরা একই চরিত্র বারবার দেখে নিশ্চয় ক্লান্ত হতেন। একটু বিশ্রাম নিয়ে পরবর্তী দৃশ্যের কোন বিশেষ অভিব্যক্তির জন্য প্রস্তুত হওয়া যাবে তার উপায় নেই। যন্ত্রের মত অভিনয় করে যেতে হল।

দল থেকে অভিনেতা তৈরী এখন সম্ভব কি? তাহলে তো আবার সেই আগের রূপ তৈরী করা দরকার। একবার এ-ব্যাপারে আলোচনাও হয়েছিল আমার বন্ধু-প্রযোজক ধীরেন নন্দীর সঙ্গে। হাসতে হাসতে বললেও, সে প্রায় ঠিকই বলেছিল, অতগুলো ছেলেকে বাসে বসাতে জায়গা দেব কোথায়। যাতায়াত একটা সমস্যা না। কিন্তু ঐ আগের রূপ থেকে দু-একজন অভিনেতা, ভাল নাচিয়ে, গায়ক গায়িকা নিশ্চয় তৈরী হতে পারত। অন্ততঃ প্রত্যেক দলে অভিজ্ঞ একজন শিক্ষক রাখা দরকার, যিনি নতুন গায়ক-গায়িকাদের নিয়মিত তালিম দেবেন।

আজকাল সব জায়গাতেই যাত্রা উৎসব হচ্ছে। প্রত্যেকটা দল একদিন করে নেওয়া হয়। পালার নাম আর পুরস্কারের দিকে তাকিয়ে নায়েকরা বায়না নেন। এক রাত্রির বেশী গান হয় না। ভেবে দেখুন, সব পালায় সকলের তো পার্ট সমান থাকে না, ফলে যাঁদের পার্ট অপেক্ষাকৃত ছোট, কিংবা কমজোরি—তাঁরা শক্তিমান অভিনেতা হওয়া সত্ত্বেও আলোচনার মধ্যে আসতে পারলেন না।

ভাল পালাকারের অভাব যাত্রাশিল্পের ক্ষেত্রে একটা সমস্যা। গল্প আর চরিত্র সৃষ্টির মৌলিক ক্ষমতা নেই বলেই সামাজিক পালা এত জনপ্রিয় হলেও কিরকম ধপ্ করে পড়ে যাচ্ছে। অভিনয়তো আর অমনিতে দাঁড়াতে পারে না। পৌরাণিক আর ঐতিহাসিক পালার চাহিদা দেখা দিচ্ছে অনেকটা এই কারণে বলা যেতে পারে। সব জিনিসটাই তো একটা চাকার মত ঘুরছে। সুতরাং পুরাণের দিকে কিংবা ইতিহাসের দিকে দর্শকের মন ঘুরবে, বিচিত্র কি।

আলো কিংবা মাইক—এখনকার যাত্রাগানে প্রয়োজনীয় হয়ে উঠেছে সত্য। আমার এই ছোট্ট চোখ দুটি, এর অভিব্যক্তি কি দেখতে পাবেন একেবারে পেছনের সারিতে বসে থাকা দর্শক! আলো সেক্ষেত্রে সাহায্য করে বৈকি। এমন কিছু কিছু সংলাপ আছে, খুব চেঁচিয়ে বললে মাধুর্য নষ্ট হয়ে যায় অথচ সব দর্শকেরই তো শোনা উচিত—মাইক্রোফোনের প্রয়োজন হওয়া স্বাভাবিক। তবে আজকাল অধিকাংশ ক্ষেত্রে প্রয়োগের অপব্যবহারে যাত্রার পতন ত্বরান্বিত করছে। বিশেষ করে আলোর পরিচালকের সতর্ক এবং সুপরিণত নিয়ন্ত্রণের নির্দেশ থাকা দরকার।

সমালোচনা? দর্শকরাই চিরকাল বড় সমালোচক। এক জায়গায় পাঁচ-সাত রাত গান হত। একদিন গান খারাপ করলে পরের দিনে অভিনেতারা বেরুতে পারতেন না। এখন তো সে-সবের বালাই নেই। তাছাড়া বর্তমান খবরের কাগজের সমালোচনা ব্যবসার ক্ষেত্রে খুব যে লাভজনক হয়, তাও নয়। দেখুন না পাতা খুললেই ভূয়সী প্রশংসা। খারাপ বলে কিছু নেই। দর্শকরা যে এ সমালোচনায় বিশ্বাস করেন, তাও বোধহয় নয়। আজকাল কাগজের সঙ্গে দলমালিকদের ব্যবসায়িক আপোসের ব্যাপারটা বেশীর ভাগ দর্শকই আঁচ করে নেন। এক্ষেত্রে ঢাকঢোলবাদিতা নয়, আসল এবং তীক্ষ্ণ সমালোচনার প্রবর্তন হওয়া দরকার। সঠিক সমালোচনার বদলে ভুল প্রশংসা যাত্রার ক্ষতি করছে।

পুরস্কার তো জীবনে অনেক পেলাম। পুরস্কার পেতে কার না ভাল লাগে? এমন পুরস্কার কি পেয়েছি, যা অর্জন করবার জন্য অনেক-অনেক ক্ষমতা বা যোগ্যতা দেখাতে হয়েছে আমাকে? যদি সেরকম কোন পুরস্কার আমার জন্য নির্ধারিত হয় তবে হয়ত বেশ কিছুকাল তৃপ্ত থাকতে পারব। আর দর্শকদের স্বতঃস্ফূর্ত অভিনন্দন, তাঁদের ভালবাসা, আনন্দ—এর চেয়ে সত্যি কি বড় পুরস্কার কিছু আছে?

এই তো সেদিন, কান্দুয়াতে বিনোদিনী পালা সবে শেষ হয়েছে। কিছু সময়ের মধ্যেই প্যান্ডেল শূন্য করে সবাই চলে গেছে। পর্দার আড়ালে মেক্‌আপ তুলছি আমি। সাজঘরে কমিটির কয়েকজন লোক নিজেদের হিসেবপত্র নিয়ে ব্যস্ত। মাঝে মাঝে শোনা যাচ্ছিল, 'এই ভাই কি করছ, সরে যাও না, মেয়েদের সাজঘর'—বারবার কাউকে যেন সাবধান করে দেওয়া হচ্ছিল। কিছুক্ষণ পরে হাতমুখ ধোবার জন্য বেরিয়ে দেখি, বাইরে দাঁড়িয়ে আছে একটি কিশোর। ছেঁড়া পা-জামা ময়লা সার্ট গায়ে। চোখাচোখি হতেই একটু লাজুক হাসি হাসল। তারপর আমার পা-ছুঁয়ে প্রণাম করে উঠে দাঁড়াল। আমি তো অবাক। ছেলেটি বলল, 'আমার বাবা নামকরা কীর্তন গাইয়ে। তাঁর কাছেই গান শিখেছি আমি। আমরা

মুকুন্দ দাস

সুরেন মুখার্জি

পাঞ্চু সেন

হয়েছেন, তাহলে পরের বছরের জন্য মাইনে ডবল চেয়ে বসেন। যেজন্য সত্বাধিকারী তাকে ছেড়ে দিতে বাধ্য হন। মাইনে বাড়ানোর এই নৈমিত্তিক খেলায়, অভিনেতার শেখার প্রবণতা নষ্ট হয়ে যায়।

একেবারে নতুন শিল্পীকে গড়েপিটে তৈরি করতে কষ্ট হয় অনেক। টেবিলের অন্য প্রান্তে বসেছিলেন দলের নায়িকা স্বপ্না কুমারী, তিনি তার অভিজ্ঞতার কথা তুললেন। সদপন বাবুর কাছে আসার পূর্বে, একদিনও যাত্রা দেখেন নি। এখনও না। অথচ সদপন বাবুর সহযোগিতা ও শিক্ষায় তাঁর যাত্রাভিনেত্রী হওয়া অনেক সহজ হয়েছে।

আসর, মঞ্চ, চলচ্চিত্র—তিনটেতেই অভিনয় করেছি। চলচ্চিত্রে অভিনয় দেখানোর সুযোগ অনেক বেশী। পেশাদারী মঞ্চের প্রতি আমার কোন দুর্বলতা নেই। আকর্ষণ বোধ করি না। তিন দিক খোলা, কি রকম আড়ষ্ট লাগে। যাত্রায় চোখের উপর চোখ রেখে—একাত্ম হয়ে পড়ায় সুযোগ অনেক বেশী। তবে ইদানিং আলো ও মাইকের ব্যাপারে যে সব অভিযোগ উঠছে, অস্বীকার করা যায়না বাড়াবাড়ি হচ্ছে। অচির কালেও মধ্যে হয়ত আলোর প্রয়োগ বন্ধ হয়ে যাবে। কিন্তু মাইকটা আজকাল জরুরী, আসবেও আবশ্যনই কারণ। নিয়মিত অভিনয় করতে গলা বসে প্রতিদিন চেঁচিয়ে অভিনয় করাও সম্ভব নয়।

হঠাৎ ঘড়ির দিকে নজর গেল। রাত দশটা। উঠে দাঁড়ালেন স্বপ্নাকুমারী। মাথে হাল্কা লাল ছোঁয়াতে, অন্তত পঁচিশ বছর কমে গিয়েছি তাঁর বয়স। তবু নিজের স্বাস্থ্য ও শক্তি সম্পর্কে সবসময় সচেতন তিনি,' যাত্রা এমন একটা মাধ্যম, এখানে ক্ষমতা না থাকলে নিজেকে টেকানো মুশকিল। আমি সম্মানের সঙ্গেই যাত্রা থেকে বিদায় নিতে চাই। যাত্রার দর্শক এখন আধুনিক, অনেক উন্নত—কোন দুর্বলতা তাঁরা ক্ষমা করবেন না।'

হোচিমিন পালার দৃশ্য

অধিকারীর দরবারে ফিল্মস্টার

যাত্রা আজ আর একমাত্র গ্রাম্য লোকের দর্শনীয় নয়, মহাজাতি রবীন্দ্র-সদন আজ যাত্রাপালায় মুখর। চারদিকের খোলা হাওয়া ছেড়ে শীততাপ নিয়ন্ত্রিত ঘরই এখন পছন্দ করে অধিকারীর দল। গাঁয়ে-গঞ্জে যে কামাস পাড়ি দেন তাঁরা তার চাইতে কম সময় কাটে না তাঁদের এই শহরে, কলকাতায়।

যাত্রা এখন তাই নাগরিক সংস্কৃতির প্রায় প্রথম সারিতে। মহাজাতি রবীন্দ্র-সদনের বাতানুকূল চেয়ারগুলিতে এখন আর গ্রাম্য লোকের দেখা পাওয়া ভার, দশ-পনেরো-কুড়ি টাকার টিকিট কেটে নিউ আলিপুর বালীগঞ্জের পশ্ এলাকার সুবেশা সুগন্ধী মহিলাদেরও দেখা যায়।

একটা সময়ে যাত্রা ছিল বাংলার লোক-সংস্কৃতির অঙ্গ। জায়গা বদল করে এখন শহরে এসেছে। শুধু জায়গা বদলই বা বলি কেন, চেহারাও বদলেছে, বদলেছে চরিত্র। খোল-নলচে সবই হারিয়েছে এখন যাত্রা। শুরুতে কনসার্ট আর মাঝখানে বিবেক চরিত্রটিই যাত্রার জাত বাঁচিয়ে রেখেছে। কর্পোরেশনের জল পেটে পড়ার গুণেই তো এটা।

হাট-মাঠ-ঘাটের সহজ সরল নিষ্পাপ এই গণমাধ্যম আজ শহুরে জৌলুষে রঙিন হচ্ছে, দাম বাড়ছে। বায়না উর্ধ্বমুখী।

এই স্ট্যাটাস বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে যাত্রার পালার, সঙ্গীত পরিচালক অধিকারীরও দর বেড়েছে। লেজ মোটা হয়েছে তাঁদের। আর বেড়েছে গ্ল্যামার। শুধু যাত্রারই নয়, যাত্রা শিল্পীদেরও, এঁদেরই রমরমা যেন সবচাইতে বেশী। ফুটবল খেলোয়াড়দের দল বদলের মত বছর বছর দল বদলাচ্ছেন শিল্পীরা, নীলামে দর উঠছে সেই মত।

চিৎপুরের সাত্য যাত্রার বছরের শুরুতেই তাই জাঁকিয়ে ওঠে কে কোন্ দলে যাবেন সেই গুঞ্জনে।

যাত্রার এই বর্ধমান জনপ্রিয়তা লক্ষ্য করেই অধিকারীরা শুরু করলেন ফাটকাবাজি। বছরখানিক আগেও উর্বর মস্তিষ্কগুলো থেকে আমদানী হতে লাগলো উদ্ভট কিছু পরিকল্পনা। ভালুক - উট - ঘোড়া - বাঁদর এলো শিল্পী হয়ে। শিল্পীরা আড়াল হলেন। চমক লাগানোর উৎসাহে যাত্রায় বারোটা বাজাবার দাখিল করলেন এঁরা।

সময় বদলেছে এখন। ধনিক মেকানিজে আর দর্শকদের ভোলানো যাচ্ছে না। সুতরাং আরম্ভ হলো নতুন চাল। শিল্পী তালিকায় ফিল্মের লোকদের সংগ্রহ করার বহড়া শুরু হলো। নাট্যকার-অভিনেতা সঙ্গীতকার সবাইকেই টেনে আনা শুধু হলো পালার মাঝখানে।

ফিল্মের লোকদের যাত্রার অনুপ্রবেশের কারণগুলো স্পষ্ট। যেমন— (ক) নগদ আর্থিক লাভ, (খ) বাংলা ছবির মন্দা বাজারের জন্য স্টুডিও পাড়ার কাজের অনিশ্চয়তা ও (গ) যাত্রায় ক্রমবর্ধমান জনপ্রিয়তা। আর এই কারণ গুলোর পেছনে আরও অনেক বহি-কারণও আছে।

ফিল্মের গ্ল্যামার ছেড়ে কে-ইবা আর সাধ করে গাঁয়ে-গঞ্জে সশরীরে পাড়ি দিতে চায়। ফিল্মের তেমন সাড়া না পেয়ে তাই বেশীর ভাগ তথা-কথিত এক্সট্রা ক্লাসের শিল্পীরাই ভিড় করেছেন যাত্রার আসরে।

ফিল্মের বাড়তি মুনাফ আঁচলে বেঁধেও মেয়েরা কিন্তু বিশেষ সুবিধে করতে পারছে না চিৎপুর পাড়ায়, অধিকারীর দল আরও আরও বড় নাম-গুলোকে পাবার আশায় চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন। এখনও তাই সেখানে পুতুল চক্রবর্তী, জ্যোৎস্না দত্ত, বর্ণালী ব্যানার্জি, স্বপ্নাকুমারীর জয়-জয়াকার। গাঁয়ে-গঞ্জের বায়নাদাররা ফিল্মের মেয়ের চাইতে আদি-অকৃত্রিম যাত্রার মেয়ে যে দলে আছে সেদিকে ঝোঁকেন।

মেয়েদের তুলনায় পুরুষদের অবস্থা আরও শোচনীয়। সম্ভবতঃ কমপ্লেক্স রোগাক্রান্ত হয়েই ফিল্মের এক্সট্রা ছোকরাগুলো চিৎপুরে যায়নি। অন্ততঃ এখনও। রবীন বন্দ্যোপাধ্যায় ও দ্বিজু ভাওয়াল ছাড়া আর তৃতীয় নামতো চোখে পড়ছে না।

উৎপল দত্ত এখন আর স্রোত-স্বিনীর মত কল কল ধারায় বইছেন না। লোকনাট্যকে মুক্তিদীক্ষা দিয়েই তিনি ক্ষান্ত। তানু ব্যানার্জির যাত্রায় আসার কারণ আমি জানি। কোন এক ঘটনায় ফিল্মে অভিনয় করব না, যাত্রা করব এমনি প্রতিজ্ঞা করেই তিনি শুরু করেছিলেন সুশীল নাট্য কোম্পানী। গোঁ-এর বশেই তাঁর পালার আসরে উপস্থিতি। আজ তিনি জমিয়ে বসেছেন। সুশীল নট কোম্পানী ছেড়ে তিনি এখন যুক্ত মঞ্চের কর্ণধার। ভৈরব মন্দ্র শ্রীযুক্ত আলিবাবার তানু স্বমূর্তিতে প্রতিষ্ঠিত। ইনিই বোধহয় একমাত্র শিল্পী যিনি যাত্রার আসরে নেমে ফিল্মের মোহ কাটিয়েছেন। মাঝ-খানে বছর দুই-তিন তাঁকে টালিগঞ্জ পাড়ায় দেখতে পাওয়া যায় নি। এখন কখনও সখনও আসছেন।

অধিকারীর খাতায় নাম লিখি-য়েছেন আরও অনেকেই। শেখর চ্যাটার্জি ভারতী অপেরার জন্য সম্রাট আলা-উদ্দীন পালা লিখে দিয়েছেন, অরুণেশ হাজারিকা, শ্যামল মিত্র আইন দিয়েছেন চিৎপুরে সুর দিবার জন্য। এঁদের তো ফিল্মে কাজের অভাব নেই, তবু কেন যাত্রায়?

যাত্রা এখন অনেকের উঠতি ফ্যাশান। যাত্রার জনপ্রিয়তা বোধহয় এঁদের কাছে তাই ঈর্ষার বিষয়। যাত্রায় কাজ না করলে আধুনিক হওয়া যায়তো না হয়তো এই মনোভাব কারও মনে কাজ করতে পারে। কেউ কেউ আবার হয়ত যাত্রার নামে দু-পয়সা কামাবার ফাউতে মনে মনে ভাবেন কোনো অধি-কারীর দরজায় হাজির হলে টাকার অংকটা বাড়তি পাবে।

শুধু ফিল্মের লোকদেরই বা দোষ দিই কেন, গ্রুপ থিয়েটারের একাধিক জাঁদরেল নাট্যকার পরিচালক অভি-নেতাও যাত্রার জনপ্রিয়তার শিকার হয়েছেন। যাঁকে এক সময় বিপ্লবধর্মী নাটক নিয়ে একাডেমী রঙ্গনায় বিদ্যুৎ ঝিলিকের মত জ্বলে উঠতে দেখেছি সেই অসিত বসু এখন সম্প্রতি আনারকলি ও রত্নাকর গিরিশচন্দ্র পালায় বিপ্লবের কোন মুদ্রা উড়োচ্ছেন জানতে ইচ্ছে করে। লোকায়নের অরুণ রায় বাঁশী লালবাই পরিচালনা করে কিঞ্চিৎ অর্থ প্রাপ্তি ছাড়া আর কিছু পেলেন কি? অন্ততঃ নিজের বিশ্বাসী আদর্শের কাছে সৎ রইলেন কি?

কোনো জলের মত যাত্রায় এভাবে সকলের অনুপ্রবেশ কেন? প্রশ্নটা আসত না যদি দেখতাম এতসব প্রগতি-শীল নাট্যবিদ শিল্পীদের উপস্থিতি বাংলার এই একান্ত গণ মাধ্যমটির উল্লেখযোগ্য, ঈর্ষণীয় কোন পরিবর্তন হয়েছে। তাতো হয়নি। হুজুগে জন-প্রিয়তাকে মদত দিয়ে দেশী বিদেশী রাজনৈতিক পটভূমিতে কিছু পালা রচনা হয়েছে মাত্র, আর কি। এই পরিবর্তনে উদ্বাহু হয়ে নৃত্য করার কোন কারণ নেই। অনুপ্রবেশের কারণ যেখানে মূলতঃ অর্থকেন্দ্রিক সেখানে অবশ্য কোনো পরিবর্তন আশা করাও অনুচিত।

বলি কি, আপনারা ফিল্ম থেকেই আসুন, বা যেখান থেকে, এমন কি গ্রুপের আড়ত্তদারের আনতে মানা নেই। আপনাদের উপস্থিতি যেন যাত্রার মর্যাদা বাড়িয়ে দেয়, কমায় না। এই গণসংস্কৃতি মাধ্যমটি আপনাদের ছোঁয়ায় নগরে প্রান্তরে নতুন জীবন নতুন আদর্শের বার্তা ছড়িয়ে দিক, নইলে আপনাদের আসার দরকার নেই। যে যাঁর জায়গায় থাকুন।

চিৎপুর আপন মনে বয়ে যাক, আপন মন নিয়ে থাকুক।

হরিপদ মল্লিক

তর্পণ

বীতশোক ভট্টাচার্য

স্বপ্নের ভিতর স্বপ্ন জেগে শুয়ে থাকে :
যাতে নিশ্বাসের বেশি কথা নেই।
কতো দর্শনের বই, আরো কতো থরে থরে কবিতার পাতা
পুড়িয়েছো ভুতুড়ে জ্যোৎস্নায়—
ঐ ধোঁয়া ওঠে, ঐ শেষ বিছানার একপাশে
ভারি কাঁধ, কাঁপে পিঠ, গোঁজা মুখ;
ঝিম ঝিম ঢাকা অন্ধকারে
এই নীল বাষ্প ক্ষমা করো।
ক্ষমা। কেন—

তোমার ঘুমের হাত অত ভারি যাতে তার বুক ভেঙে যাবে;
স্খলিত স্বপ্নের থেকে মুখের অতৃপ্তি তুলে এতো কেন বলো :
যেতে নেই, আসি।

মনে নেই, এও শুধু স্বপ্ন মনে পড়ে—
একটা অস্পৃশ্য চোখ, একটাই অশ্রুগর্ভ চোখের নির্মাণ
ভেঙে গেলো, তাই
পাতা ছায়া অন্ধকার গাছের শরীর ঠেলে অনর্গল চোখ :
কিছুটা পিছল ধুয়ে গেলো;
পিছল বুকের ডোল ধসেছে কিছুটা;
আছে স্রোত, জলপাত হ্রাসমান, স্নান পান কিছুই না আছে :
এই টাল খাওয়া থেকে তুলে
কোলে কাঁখে ধরে রাখা শিশু—
শেষ বিকেলের আলো মাংসল গেরুয়া আর আংশিক আঁধার
কিংবা জ্যোৎস্নার মতো তুলে ধরো তুমি :
ও কেন সম্পূর্ণ মৃত নয়।

আমার সুখ জানে সমস্ত পৃথিবী

ব্রততী বিশ্বাস

আমার সুখ জানে সমস্ত পৃথিবী
অভিজাত গোলাপ যেভাবে জানে
বিমুগ্ধ ফুলদানীর আশ্রয়
প্রাচীন দেবদারু চন্দনবনের সুগন্ধি ঝালর
বাতাসে আনে
যেমন অন্তঃপুরের আশ্বাস একান্ত বরাভয়
আমার সুখ জানে ড্রয়িংরুমের গালিচা
পুতুল বালিকার ছোঁওয়া ওষ্ঠে ফোটে
ডাকবাংলোর নরম রাতের শিশির পাহাড়ী কুয়াশা
অবিচ্ছেদ্য শিরোপা আমার
সুখ নিয়ে লুটোপুটি করে তুলোর বীজ
আকাশকুসুম, স্বাতী নক্ষত্রের জল বয়ে যায়
মৎস্যকন্যা তুলে আনে হাতের মুঠোয়
জ্যোৎস্নার প্রাসাদ
আমার সুখ বাতাসে রটে যায়
পৃথিবীর দূরতম নগরে

বৃষ্টিধারা ভালোবাসা

দিলীপ আচার্য

এতদিন কোথায় ছিলে জানি না, অপেক্ষায় ছিলে
আমারই জন্যে অপেক্ষায় ছিলে ?
মনে মনে দ্বিধা ছিল খুব,
সময় উত্তীর্ণ হলে আসো কিনা ?
অবিশ্বাস রক্তের ভিতর ঘুলিয়ে ওঠে, আমি সীমার প্রান্তে চলে আসি
দীর্ঘ দাহময় দিন শেষ হয় দিগন্ত রেখাতে,—
বরাভয় অন্ধকারে আমার শরীর স্পর্শ করো চুপি চুপি;
ফাটলে ফাটলে, অভেদ্য কন্দরে, যেখানে কেউ নামে নি কখনো
দুর্নিরীক্ষ্য মায়াময় ঊর্ণাজাল ছিঁড়ে ফেলে
আমার শিকড়ে শিকড়ে ঝরে পড়ো বৃষ্টিধারা, ভালোবাসা।

দিন যায়

আবদুশ শকুর খান

তোমার কথা ভাবতে ভাবতে দিন যায়, সমস্ত দিন যায়
ভাতভরা থালার কাছে হুমড়ি খেয়ে পড়ে থাকতে—
তোমার ভালোবাসার উপর লাফিয়ে পড়ছে চাঁদ, একটা
নিস্তব্ধ রাতের বেড়াল নখ ও পায়ের থাবা তুলে
তোমাকে খোঁজাচ্ছে নির্ভয়, কি চূড়ান্ত শান্ত দ্বিপ্রহর,
দিয়ে রেখেছে আমাদের দেহে থাকা, আর ওই কর্কট বেড়াল
তোমার হৃৎপিণ্ড নিয়ে খেলছে—ভয়ংকর খেলা, আমি চাই
এমনি এক খেলার মাঝে হারাক নজর তোমার পাশাপাশি থাক,
সব দুঃখ তাপ অনুভূতিগুলি লাফ দিয়ে উঠুক তোমার শরীরে।

জ্যোৎস্নার আকাশ নীচে চাঁদ নামে, তোমার বিষণ্ণ বুক কাঁপিয়ে—
অন্ধকার নামে, আর গাছের বাতাস থেকে
নেমে আসছে আমাদের বিষণ্ণতা, দুরন্ত ঝাঁঝালো বাতাস।

সুনীল দাশের ছবি

যদিও ইউরোপে অগুন্তি অপেশাদার চিত্রকরদের ঘোড়া আঁকা মুন্সিয়ানার পরিচিতি মাত্র। কিন্তু এদেশে তেমন ঘোড়া আঁকিয়ে দেখা যায় কম। অবশ্য এই ঘোড়াই যুগের হাতে মার। পৃথিবীর অন্যতম শিল্পকীর্তি বলে সমাদৃত হয়েছে। সুনীল দাস ঘোড়া এঁকে নাম করেছেন। তারপর নানাপথে ঘুরে এখনও নিশ্চিন্ত হননি তাঁর ধারণায়—কাকে কাকেই ঘোড়ার স্কেচ করতে হয় যদিও এখন পশুকে সামনে দেখতে হয় না। বর্তমান রেখাচিত্রটি তাঁর পরীক্ষা-নিরীক্ষার একটি নিদর্শন।

বিট্রিশরা বন্দী করে যখন কলকাতার প্রান্তস্থিত মেটিয়াবুরুজ নামক স্থানে নিয়ে আসে তখন গানটি বন্দী নবাব রচনা করেন। ভৈরবী ঠুমরীর মধ্যে আমার মনে হয় বাবুল মোরার সমতুল্য গান খুব কমই আছে। বহুদিন পূর্বে রচিত এই ঠুমরী গানটি এখনও উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের আসরে শুনলে মন আবেগে ভরে যায়। চোখের সামনে ভেসে ওঠে বন্দী নবাবের আর্তনাদের কথা। কাব্য যাই হোক না কেন, সুরের মধ্যে সেই আর্তনাদ আছে বলেই ভৈরবী ঠুমরীর এটি এক অপূর্ব সম্পদ। কথার অর্থ অতি সরল—অন্তর আমার নাইহার অর্থাৎ শ্বশুর বাড়ি ছুটে যায়। লক্ষ্ণৌর নবাবী পরিবেশ ত্যাগ করে মেটিয়াবুরুজের জেলখানাকে এইভাবে প্রকাশ করার অর্থ যা-ই থাক না কেন মুন্সিয়ানা তেমন নাই। কিন্তু গানটি সুরের সমারোহে এতোই উজ্জ্বল যে শুধু এই কারণেই সময়ের গণ্ডী পার হয়ে আজ অবধি তার আবেদন অবিকৃত আছে।

এতো কথা বলার উদ্দেশ্য হচ্ছে রাগরাগিনী আশ্রিত গান সময়ের গণ্ডী পার হওয়ার স্পর্ধা রাখে। খেয়াল গান, টপ্পা গান, ঠুমরী গান সব শ্রেণীর গানেরই আয়ু অনেক। ফৈয়াজ খাঁর শ্বশুর মেহবুব খাঁ দরকাপিয়া নাম দিয়ে যেসব গান রচনা করে গেছেন এবং আগ্রা-ঊলী ঘরানা হিসাবে যাকে গণ্য করা হয়, সেসব গান শুধু ফৈয়াজ খাঁ ছাড়া অন্যান্য সঙ্গীতজ্ঞদের মুখে আজ অবধি শোনা যায়। এসব গান স্বল্পায়ু নয়, কারণ রাগভিত্তিক গান এক মুখ থেকে যখন অন্য মুখে যায় তখন ব্যক্তিগত পরিবেশন রীতির মাধ্যমে খানিকটা সঞ্জীবনী শক্তি সঞ্চয় করে নেয় এবং এই ভাবে পরিবর্ধনের ফলে বহুদিন পর্যন্ত তার পথ চলার সামর্থ্য পাকা করে নেয়। এই সামর্থ্য তার কাব্য কেন্দ্রিক নয়, রাগকেন্দ্রিক।

কিন্তু বাংলা গানের ক্ষেত্র অন্যরূপ। এ বছরের গান আসছে বছরে চলে না। এমন কি এমাসের গান ওমাসে বাসি হয়ে যায়। বাংলা গান এতো স্বল্পায়ু কেন?

আজ যদি কেউ বাংলা গানের আসরে কে, মল্লিকের 'বাঁধ না তরী খানি আমারি নদীকূলে' গাইতে শুরু করেন শ্রোতৃমণ্ডলী তা কতটা আগ্রহের সঙ্গে গ্রহণ করবেন সে সম্বন্ধে গবেষণার প্রয়োজন নাই। ভ্রু-কুঞ্চন, স্তিমিত দৃষ্টি, স্থানত্যাগের জন্য অহেতুক তাগিদ দেখেই বোঝা যাবে গানটি তাদের মনঃপুত হয়নি। এই রকম একটি নয় বহু বাংলা গানই আছে যা আর এখন শ্রোতার মনোরঞ্জনে অসমর্থ। অথচ এসব বাংলা গানই এক কালে ঝড় তুলেছে। কে মল্লিক যে সময়ের লোক সে সময়ে রেকর্ড রেডিওর বাহার আজকের মতো ছিলো না। তদানীন্তন গ্রামোফোন রেকর্ড সঙ্গীতের তিনি ছিলেন মধ্যমণি। অনুরাগের কাঠামোতে ঘুণ ধরবার কোনও লক্ষণ তখন প্রকাশ পায়নি। কিন্তু আজ সেসব গান বিস্মৃতির অতলে। কালের হেস্টনী ভেদ করে গানের যে আয়ুষ্কাল উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের ক্ষেত্রে লক্ষ্য করা যায় বাংলা গানের ক্ষেত্রে তা নাই বললেই চলে। আজকের বাংলা গান কালকে অচল। নূতনত্বের তাগিদ বাংলা গানে এতোই বেশি যে তার আবর্তে পড়ে গানের অপমৃত্যু অহরহই ঘটছে এবং এই কারণেই পুরাতন বাংলা গান যা যাহোক কিছু একটা নাম দিয়ে সেগুলিকে পুনর্বহাল করবার চেষ্টা করতে হয়। ফল তাতে হয় কি না জানি না, কিন্তু তপশীল শ্রেণীভুক্ত গানের সংখ্যা বেড়েই যায়।

উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতে ঠিক তার উল্টো; একই গান দীর্ঘ দিন ধরে চলছে। শিল্পীর ব্যক্তিগত অনুভূতি, ভাবপ্রবণতা ও প্রয়োগশৈলীর দরুন হয় তো কিছু পরিবর্তন ঘটতে পারে, কিন্তু মূল সুরের আবেদন তাতে কমে যায় না। মূল সুরের কথা বলছি এইজন্য যে উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতে সুরকে চিহ্নিত করার জন্যই গান বা কবিতার প্রয়োজন হয়। নিছক সুর বা রাগ-রাগিনীর গতিভঙ্গি দিয়ে উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের ক্ষেত্রে রচিত হয়নি। কিন্তুসিন্ধ এসব গানের প্রধান অবলম্বন হচ্ছে সুর এবং এই সুরের ইমপ্রভাইজেসনের মধ্যেই আয়ুষ্কাল। সুরকে সঞ্চারিত করতে যতটুকু কথার প্রয়োজন তার বেশি চেষ্টা এক্ষেত্রে পরিলক্ষিত হয়নি এবং হওয়ার প্রয়োজনও বিশেষ অনুভূত হয়নি।

কিন্তু বাংলা গান কাব্য প্রধান। কবিতার কুঞ্জবনে বর্ধিত হয়ে এখন সে অসমান্যা রূপসী। সুর ও কথার যুক্ত বেদীমূলে তার আসন এবং এই সংযুক্তির মহিমাতেই সে মহিমান্বিত। কথা যেখানে সুর আশ্রয়ী এবং সুর যেখানে কথা আশ্রয়ী সেখানে কথা ও সুরের পৃথক অস্তিত্ব অনাবশ্যক এবং ইমপ্রভাইজেসনেরও অবকাশ কম। সুরকে বেশি আন্দোলিত করলে পাছে কথার বা কাব্যের মধ্যে কোনও বিভ্রান্তি উপস্থিত হয়, এই ভীতিই বাংলা গানের বিভিন্ন গীতিকারদের নিয়ন্ত্রিত করে এসেছে। এই কারণে একক সুরের মনধা বহু গানের বিকাশ হয়েছে। কবি গান, পাঁচালী ইত্যাদি বিচার করে দেখলে দেখা যায়, সুরের আঙ্গিক এক শ্রেণীর গানে এক, বিভিন্নতা শুধু কাব্যের। রামপ্রসাদী গান বহু থাকলেও সুর সর্বক্ষেত্রেই এক। এই সুরকে বিক্ষিপ্ত করে যদি কেউ অভিনবত্ব দেখাবার চেষ্টা করতে যান, শ্রোতাদের কাছে তা গৃহীত হবে না। কারণ শ্রেণীগত সুরের কাঠামোর মধ্যে যে ব্যক্তিত্ব আছে অথবা যে ব্যক্তিত্বের ফলে শ্রেণীগত সুর রূপ গ্রহণ করেছে তার পরিবর্তন সমীচীন নয়। 'মা আমায় ঘুরাবি কতো' রামপ্রসাদী গানটিতে যদি কেউ রাগরাগিনী প্রয়োগ করে গাইতে শুরু করেন তার ফলে বিক্ষোভ সৃষ্টি হবেই। এই প্রসঙ্গে একটি কাহিনীর কথা মনে আসে। সিরাজৌদ্দৌলা আমলের কাহিনী, ঐতিহাসিক সত্য তাতে কতটা আছে জানি না। তখন মুর্শিদাবাদ ছিলো বাংলার রাজধানী, রামপ্রসাদ সেই আমলের লোক। নবাব সিরাজদৌল্লা মাঝে মাঝে রাজকীয় বজরায় চড়ে নদী পথে কলকাতায় আসতেন। একদিন এই অবস্থার মধ্যেই তাঁর বজরা হালিশহরের কাছ দিয়ে চলেছে। হঠাৎ নবাবের কানে এলো কে যেন গান গাইছে। সঙ্গীতপ্রিয় নবাব বজরা বজরা ভিড়ালেন হালিশহরের ঘাটে। পাইকদের বললেন কে গান করছে খুঁজে আনতে। রামপ্রসাদ এলেন নবাবের বজরায়। নবাব আদেশ করলেন গান করতে। যবনালী শ্রোতার কাছে বাংলা গান গ্রহণযোগ্য হবে না জেনে রামপ্রসাদ প্রথমে হিন্দি গান ধরলেন। হিন্দি গান তিনি কিছু জানতেন। নবাব শুনে বললেন, না, না, এসব গান নয়, যে গান গাইছিলে তাই গাও। শুরু হলো রামপ্রসাদী গান। তাঁহাদের এগান নবাবের কতটা মনোরঞ্জন করেছিলো ইতিহাসে তার কোনও উল্লেখ নাই। কিন্তু নবাব ফরমাস করে যে রামপ্রসাদী গান শুনেছিলেন সে কথার প্রতিধ্বনি পাওয়া যায় কাহিনীটির মধ্যে। এক্ষেত্রে বলা যায়, রামপ্রসাদী গানের সুরের প্রতিই নবাব আকৃষ্ট হয়েছিলেন, কাব্যের কথা নয়।

কিন্তু সাধারণ ক্ষেত্রে দেখা যায়, সুরের কারুকার্যের চাইতে কথার তাৎপর্যের প্রতিই শ্রোতাদের আগ্রহ অধিক। এই কারণে কথার সঙ্গে সুরের সংযুক্তি বাংলা গানকে চিরকাল সমৃদ্ধ করে এসেছে। সুরের বিন্যাস এক্ষেত্রে কথার পরিবেশনকে অগ্রাহ্য করে গড়ে ওঠেনি। কথার অভিনবত্ব অথবা মনোহারিত্ব শ্রোতার মনকে সিক্ত করলে সুরের প্রয়োগ সম্বন্ধে সে অতো উৎসুক হয় না এবং সেই কারণেই বাংলা গানে কালোয়াতি ধরণের সুর বিন্যাস তেমন স্থান পায়নি। গান রচনার ক্ষেত্রে এই ধারা প্রথম থেকেই অনুসৃত হওয়ার ফলে মোটামুটি একটা বিধিগত আঙ্গিক সৃষ্টি হয়েছে যা শুধু বাংলা গানের ক্ষেত্রেই লক্ষ্য করা যায়। কবিতার প্রাধান্য এ-ধারার মূল কথা।

বাউল, ভাটিয়ালী প্রভৃতি গানেও সুরের একক গঠন লক্ষ্য করবার বিষয়। শ্যামা সঙ্গীতের ক্ষেত্রে খানিকটা স্বাধীনতা নেওয়া হয় বটে, কিন্তু তা-ও বিশেষ পরিব্যপ্ত নয়। বাগেশ্রী রাগই এক্ষেত্রে প্রাধান্য লাভ করেছে, অন্যান্য রাগরাগিনীর মধ্যে মনোরঞ্জনের রসদ থাকলেও ভক্তি সঙ্গীতের ক্ষেত্রে তার ব্যবহার সীমিত।

পরবর্তীকালে উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের সংস্পর্শে এসে বাংলা গীত-রীতির মধ্যে বহু পরিবর্তন এসেছে সত্য কিন্তু সে ক্ষেত্রেও নিছক সুরের আলাপনা শ্রোতার মনে অনুরাগ সৃষ্টি করেনি। সুরকে সে কবিতার পার্শ্বচর হিসাবেই গ্রহণ করার পক্ষপাতী। একটু লক্ষ্য করলেই বোঝা যায়, বাংলা গান শুনে আমরা যখন বাহবা দিয়ে থাকি তা সুরের চাইতে কথাকে উদ্দেশ্য করেই বেশি।

কথার আবেদনকেন্দ্রিক আবেদন সুরের তুলনায় অনেক কম। কারণ মন চায় সবসময়ে

মজুর কথা ; মজুর আবিষ্কারের উপকরণ। সুরকে স্বাভিমানের পর্যায়ে আনতে কোনও বাধা বা বিপত্তি সৃষ্টি হয় না। কিন্তু কথার মিলন না হলে মন ভরে না। হোলিকায় তোমার দেখাব বা ক্লোনপত্রীর তোমার বিবেক সে রসাস্বাদে অপ্রয়োজনীয়। অথচ এই সুর আরোপের বৈশিষ্ট্যকে আশ্রয় করেই উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের অফুরন্ত ঐশ্বর্য। আধুনিককালের বাংলা গানে নবচেতনার চাহিদা এতই বেশি যে আজকের রচনা কালকে অপাংক্তেয় হয়ে যায়। নিছক কবিতার ক্ষেত্রে যেমন নব আঙ্গিকের আমদানি অহরহই চলেছে, গানের ক্ষেত্রেও তা আজ অবশ্যম্ভাবী হয়ে পড়েছে। তাই ফলে আজকের রচনা কালকে আর সেই ভাবনাজনা সৃষ্টি করে না, গানের আয়ু যায় কমে।

এই অবস্থায় ভাবেনাপি করতে সংশ্লিষ্ট মহল যে পথ অবলম্বন করছেন তা আয়ুবৃদ্ধির পরিপোষক নয়। রাগসঙ্গীতকে বাদ দিয়ে যেমন-তেমন একটা সুরের কাঠামো সৃষ্টি করার মধ্যে বাহাদুরি আছে বলে মনে হয় না। সুর-আরোপের রথীদের রাগরাগিণী সম্বন্ধে বিশেষ ধারণা বা জ্ঞান নেই বলেই তাঁরা কণ্টকিত পথ অবলম্বন না করে মফঃস্বলী করেই আসর জমাচ্ছেন। এপথ পরিত্যাগ করার জন্য কোনও আইন নেই বলেই অপ্রতিহতভাবে চলেছে তাঁদের গান সৃষ্টির অপ্রাসঙ্গিক প্রয়াস। ভারতের রাগকেন্দ্রিক ধারা বর্জন করে তাই দেখা দিয়েছে এলোমেলো সুরের প্রয়োগ, যেন আমাদের সঙ্গীত ঐতিহ্যকে নিশ্চিহ্নকরণের দিকেই সুরকারদের লক্ষ্য। রাগসঙ্গীতের ধারা সুপ্রাচীন, তার মর্মার্থ করতে গেলে সময়ের প্রয়োজন। সে সময় সুরকারদের নাই। তাঁরা চান সুরের সৃষ্টি করে কিছু অর্থোপার্জন। বৈচিত্র্য আনতে গিয়ে তাই দেখা দিয়েছে অপ্রাসঙ্গিক ধারা এবং তা অভারতীয়ও বটে। বিদেশী সুরের নকল-নবিশিতে তাই ভরে উঠেছে বাংলা গানের প্রাঙ্গণ এবং ভারতের মূল সঙ্গীতসংস্কৃতির সঙ্গে তার কোনও সম্পর্ক নাই বলেই আধুনিক বাংলা গানের আয়ু আজ সীমিত। বিদেশী গ্রামোফোন রেকর্ডের তর্জমাকে যদি বাংলা গানের সমৃদ্ধির পরিচায়ক হিসাবে গ্রহণ করতে হয় তার চাইতে অপমানকর অবস্থা আর কি হতে পারে?

এই অবস্থার মধ্যে অচেতন হয়ে বসে থাকার অর্থ আন্তরিক অনুভবের অভাব। মাছের বা সরষে তেলের দাম বাড়লে আমরা সন্ত্রস্ত হই, কিন্তু সাংস্কৃতিক বিপর্যয় দেখা দিলে আমাদের মনে তেমন প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয় না কেন? এই প্রশ্নের সদুত্তর দিতে হলে পরিবেশের কথা ভাবতে হয়, যে পরিবেশ আমাদের সস্তা হুজুগে, যেন নষ্টম পার্টি, সস্তা আনন্দের দিকে চালিত করছে. সে-পরিবেশের মধ্যে জীবনধারণ করে আমরা শরীর দিয়ে চিন্তা করি, মস্তিষ্ক দিয়ে নয়। অতএব এমন একটা পোষাকী পরিবেশ সৃষ্টি হয় যে সঙ্গীতেও তার প্রভাব এসে পড়ে। শ্রোতার মান সঙ্গীতের মান নির্ধারণ করলে সঙ্গীতের দৈন্য প্রকাশ পাবেই। কারণ সঙ্গীতকে যেখানে হুকুম তামিল করতে হয় সেখানে বাইরের সস্তা চটক বাদ দেওয়া যায় না। সুর জিগিশন্টিক বাধিয়ে তার মনোহারিত্ব বাড়াতে হয়।

জনরুচি যে নিম্নগামী সেকথা বলাই বাহুল্য। তাহলেই প্রশ্ন ওঠে—সঙ্গীত বা গান জনরুচির পর্যায়ে নামবে, না জনরুচি উচ্চগ্রামে উঠে সঙ্গীতের স্থান গ্রহণ করবে? আর্টকে নিম্নগামী করার অর্থ বেসাতি এবং এর ফলে যে আকাঙ্ক্ষিত অবস্থা সৃষ্টি হয় তার নজির ইতিহাসে আছে। মহারাণী ত্রিপুরার অবস্থা সম্বন্ধে একটি বইয়ে দেখলাম, ৩ অগ্রহায়ণ ১২৮৭ সরকারের তরফ থেকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছিলো 'রাস্তায় রাত্রিতে কি দিবাতে যে কোন সময়ে কোন ব্যক্তি কি ব্যক্তিগণ বিদ্যাসুন্দর প্রভৃতি কোনও প্রকারের অশ্লীল গাহেন.. ইত্যাদি কথা প্রকাশ হইলে ঐ ব্যক্তি ১৫ দিবসের অনধিককাল শ্রম কি বিনাশ্রমে কোন একপ্রকার কয়েদ ও ১০্ দশ টাকার অনধিক 'জরিমানা' হইতে পারিবেক।'

যথা বাহুল্য কবি, পাচালি প্রভৃতি শ্রেণীবাচক বাংলা গান দিয়ে জনরুচির তাঁবেদারি করতে গিয়ে সংশ্লিষ্ট মহল যে অশ্লীলতাত্মক গানের অবতারণা করতে থাকেন তার ফলেই একদা সৃষ্টি হয়েছিলো বিদ্যাসুন্দর, খেউর প্রভৃতি গান। এসব গান যে অতি নিম্নরুচির পরিচায়ক এবং সমাজের পক্ষে অকল্যাণকর তা উপরোক্ত মহারাণী ত্রিপুরার রাজনির্দেশ থেকেই বোঝা যায়। এখানে বলা প্রয়োজন যে এই নিম্নগতি সুরে নয়, গানের ভাষায়।

সুরকে নিম্নগামী করার ব্যাপারটি লক্ষ্য করা যায় আধুনিক বাংলা গানে। রাগরাগিণী বিসর্জন দিয়ে এমন কতকগুলি আঙ্গিক বাংলা গানে এসে পড়ছে যার অর্থ খুঁজে পাই না (অবশ্য সব গানে নয়)।

শিল্পী ও শ্রোতা উভয়েরই অবচেতন মনে একটা গ্রহণ-বর্জনের অনুভূতি থাকে। এই অনুভূতির পৃষ্ঠপটে থাকে শিক্ষা, দীক্ষা এবং পরিবেশের প্রভাব। শিল্পী চায় তাঁর অনুভবের অনুরূপ গান শোনাতে, শ্রোতা চায় তার অনুভবের অনুরূপ গান শুনতে। এই দুই বিপরীতধর্মী টানের মধ্যে পড়ে বাংলা গানকে নিষ্পেষিত করা কখনই উচিত নয় এবং উচিতও নয় তাকে ঢাক পেরাকের ডাক দিয়ে মণ্ডিত করে জনরুচিত বাসভূ করা।

বারো টাকার গান লেখক আজকাল বহু হয়েছে। যেমন তেমন করে মনের সঙ্গে মনের মিল করে তারা চাহিদার যোগান দিয়ে চলেছেন। ভাবের ধার তাঁরা ধারেন না, শুধু কথার জুড়ি হলেই হলো। আজকালকার বেলাভূমবোধক গান শুনলেই বুঝতে পারবেন কতো ঠুনকো তাদের ভাববিন্যাস! চৌদ্দর মাথায়ে গান রচনা আজকালকার দিনে যেভাবে দেখা দিয়েছে তার পরিসমাপ্তি সে কোথায় বলা যায় না। কিন্তু স্বর্গীয় দিলীপ কান্তার অতুল পর্যায়ের গানের সঙ্গে আধুনিক বেলাভূমবোধক গানের তুলনা হয় কিনা তৌরিবরে পাঠকমাত্রেই আশা করি ভেবে দেখবেন। হবোহবলোর পর্যায়ে বাংলা গানকে টেনে। আনলে তেমন দেখানো থাকবেই হাট-বাজারের সর্বত্র অভিজ্ঞান আজকাল বাংলা গানে দেখা যাচ্ছে। আজকের চাহিদা কেবল কালকে থাকে না, গানের ক্ষেত্রেও সেই অবস্থা দেখা দিয়েছে। সংস্কৃতির ধুয়া ধরবার অভিপ্রায় তাই নিছক ব্যবসাগত প্রচেষ্টায় দাঁড়িয়েছে। বেশি কাল কাটানোর বৃত্তির পশ্চাতে তাই থাকে প্রচার অর্থাৎ চাহিদাবৃদ্ধির নিরঙ্কুশ অভিযান। প্রচারকে আমি খারাপ বলি না, সম্প্রসারণের ক্ষেত্রে তা অবশ্যম্ভাবী। কিন্তু ডেইলী প্যাসেঞ্জারেরা যখন হকারদের বাক্যবাণে কাবু হয়ে ধূপকাঠি কিনে বাড়ি গিয়ে যখন দেখেন গোলাপগন্ধের লেশমাত্র নাই তখন ভবিষ্যতের জন্য তাঁরা সাবধান হয়ে যান, প্রচারে আর তখন তাঁদের মন গলাতে পারে না।

আয়ুবৃদ্ধির ব্যাপারে বাংলা গানকে এখন রাগভিত্তিক হতে হবে। পাখি যুগলি শাবরায় তা কানিয়ে যেতে থাকলে চলবে না। রাগভিত্তিক অর্থে আমি খেয়াল ঠুংরীর কার্বন কপি হতে বলছি না। সপ্তসুরের মধ্যে যে রসভাণ্ডার সঞ্চিত রয়েছে তা মন্থন করে যেসব গান ভারতীয় সঙ্গীতকে যুগে যুগে সঞ্জীবিত করে রেখেছে তার কণামাত্র বাংলা গানে থাকলে হয়তো আয়ুবৃদ্ধি হত পারে। বাংলা গানে সুরের বৈচিত্র্য আছে সত্য কিন্তু তা এখন এমন খাতে প্রবাহিত হতে চলেছে যে কিছুদিন পর আর হয়তো বাংলা গানকে চেনা যাবে না, যেমন চেনা যায় না আজকালকার ছেলেমেয়েদের পিছন থেকে। সুরের প্রবাহে অভারতীয় স্রোত মিলে সব ঘোলাটে করে তুলেছে। সুরের মাধ্যমে শিল্পীর মনোগত ভাব রূপায়িত করার ব্যাপারে আমরা পরের স্বারস্থ হতে যাবো কেন? আমাদের কি কি কোনও সম্পদ নাই? স্বাতন্ত্র্য, সাবলীলতা বজায় রাখতে অভারতীয় ধারা অবলম্বন করার মধ্যে কোনও যুক্তি নাই। বৈচিত্র্য অবশ্যই দরকার। কারণ সঙ্গীত ... কুচকাওয়াজ নয় যে সকলে একতালে পা ফেলাবে! ব্যক্তিগত নৈপুণ্য ও ভাববিকাশের ধারা বজায় রেখে বাংলা গানের রাগরাগিনীভিত্তিক রূপায়ণ সম্ভব না প্রয়োজন কিনা সেদিকে দৃষ্টি দেওয়ার প্রয়োজন এসেছে। কথার সৃষ্টির পাশে সুরের সৃষ্টিকে প্রতিষ্ঠা না করলে একাজ সম্ভব নয়। বাংলা গানের আয়ুবৃদ্ধির ব্যাপারে একাজ অপ্রাসঙ্গিক নয়। সুর অর্থে খেয়াল, টপ্পা, ঠুংরী নয়, রাগরাগিনীভিত্তিক সামান্য কিছু নক্সা। যেমন ধরুন তিলক-কামোদের পানিসারেগমা, বেহাগের পামগাপামগা, মালকোষের পাসানি, বাগেশ্রীর সানিধানিসাধা ইত্যাদি বহু প্রকার ... সর্গতির কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। রাগরাগিনীর এসব স্বরসমষ্টি যখন যখন যখন জীবন্ত রয়েছে তখন সেগুলিকেই অলঙ্কার হিসাবে বাংলা গানের গলায় পরালে মনে হয় কিছু আয়ুবৃদ্ধি হতে পারে।

১০০ বছর আগে বানান সংস্কার

[অ]মিতাভ মুখোপাধ্যায়

'আনন্দ সন্ধ্যায়' শব্দ দুটিকে যদি 'আনংদ সংধ্যায়' এভাবে বানান করা যায় তাহলে পড়া ও লেখায় কোনও ব্যাঘাতের সম্ভাবনা (সংভাবনা) আছে কি? এ প্রশ্নের উত্তর দিতে আজও অনেকে অস্বস্তি বোধ করবেন, ইতস্তত ত করবেনই।

অথচ এমন সংস্কারের প্রস্তাব করার সাহস একশ বছর আগে হয়েছিল ......-এর। বঙ্গ দর্শন-পত্রে ১২৮৫ সনের পৌষ, মাঘ ও ফাল্গুন সংখ্যায় 'বাঙ্গালা বর্ণমালা সংস্কার' নামে এক দীর্ঘ প্রবন্ধ বেরিয়েছিল। তখন বঙ্গ দর্শনের ষষ্ঠ বর্ষ চলছে। বঙ্কিমচন্দ্র যদিও সম্পাদকের পদ থেকে অব্যাহতি নিয়েছেন, তবু প্রকাশন আছে পুরোমাত্রায়। সেকালের প্রথা অনুযায়ী প্রবন্ধকারের নামটি অনুল্লেখিত। তিন মাসে তিনটি কিস্তিতে প্রকাশিত প্রবন্ধের শুরুতে বা শেষে কোথাও যেমন লেখকের নাম মুদ্রিত হয় নি তেমনি ঐ বর্ষের অন্তিম সংখ্যায় সমগ্র বছরের সূচিপত্র নামসূচিতেও ঐ প্রবন্ধের লেখকের নাম নেই।

বাঙলা বর্ণমালা সংস্কারের উদ্দেশ্যে অনাবশ্যক বর্ণগুলি বর্জন করার যুক্তি দেখিয়ে ঐ প্রবন্ধ লেখক বলেছিলেন, 'যদি ঙ প্রভৃতি বর্গের পঞ্চমবর্ণ দ্বারা বর্গের সংযুক্ত বর্ণগুলিকে পূর্ববর্ণে অনুস্বার যোগ করিয়া লেখা হয়, তবে ঙ্ক, ঙ্খ, ঙ্গ, ঙ্ঘ, ঞ্চ, ঞ্ছ, ঞ্জ, ঞ্ঝ, ণ্ট, ণ্ঠ, ণ্ড, ণ্ঢ, ন্ত, ন্থ, ন্দ, ন্ধ, ম্প, ম্ফ, ম্ব, ম্ভ এই ষাটাধিকশত বর্ণ এবং তাদের স্বর ও ব্যঞ্জনযুক্ত ভেদ সকলকে অনায়াসে বিদায় দেওয়া যায়।' এই প্রসঙ্গে তিনি বৈদিক মন্ত্র, প্রাকৃত ও হিন্দির দৃষ্টান্ত উদ্ধার করে এই রীতি অনুসরণের পক্ষে প্রমাণও দাখিল করেছেন। সেই সঙ্গে আরও বলেছেন, 'কেহ আশঙ্কা করিতে পারেন দন্ত-কে দংত লম্ফ-কে লংফ ইত্যাদিরূপে লিখিলে উচ্চারণ ভেদ হইতে পারে। একথা আমরা স্বীকার করি, কিন্তু দংত এরূপ লিখিলে যেরূপ উচ্চারণ হয় মনুষ্যের প্রকৃত উচ্চারণ সেইরূপ, দন্ত এরূপ সংস্কৃত উচ্চারণ নয়।'

প্রায় একশ বছর আগে বঙ্গদর্শনে প্রকাশিত এই প্রবন্ধে বর্ণমালা সংস্কারের মূল উদ্দেশ্য বর্ণনা করে বলা হয়: '.... যাহার উচ্চারনের কোন হানি না হয় অথচ সংস্থাপনের সৌলভ্য হয় ইহাই আমাদের অভিপ্রেত।' বিদেশি ও এদেশি নবশিক্ষার্থী যাতে সহজে বর্ণপরিচয় করতে পারে সেদিকটাও বিবেচনা করা হয়েছে। তাই প্রতিশ্রুত সংস্কারের সঙ্গত প্রণয়ে বাঙ্গালার বর্তমান বর্ণমালার স্বরূপ নির্দেশ করা'ও হয়েছে। প্রবন্ধকার স্পষ্ট করে জানিয়েছেন, 'এস্থলে ইহাও বলা যাইতেছে আমরা যেসকল সংস্কার করিব তাহা কেবল বাঙ্গালা ভাষার নিমিত্ত। যাঁহারা সংস্কৃত ভাষা শিক্ষা করিবেন তাঁহাদিগের সংস্কৃত অক্ষর লিখিতে ও পড়িতে শিক্ষা করা উচিত। কারন তাঁহাদের সংখ্যা অতি অল্প সুতরাং তাঁহাদের জন্য অধিক লোকের ক্ষতি সহ্য করা উচিত হয় না।' একটু পরে আবার উল্লেখ করা হয়েছে: 'সংস্কৃত বর্ণমালা স্বতন্ত্র হওয়া উচিত। বাঙ্গালাকে সংস্কৃতানুরূপ করিলে অধিক লোকের বৃথা ক্ষতি সহ্য করিতে হয় মাত্র।'

বর্ণমালা সংস্কারে উদ্যত এই নামহীন প্রবন্ধকার যে যথেষ্ট যোগ্যতা সম্পন্ন এবং ভাষা ও ব্যাকরণে সম্যক ব্যুৎপন্ন তা এই দীর্ঘ লেখাটি পড়লে বুঝতে কোনও অসুবিধে হয় না। সেইসঙ্গে এটাও পরিষ্কার হয় যে তিনি সংস্কারমুক্ত মন নিয়ে এবং দূরকালের কথা মনে রেখে এইসব প্রস্তাব রচনা করেছিলেন। শতবর্ষের অবসরে আমরা তাঁর অনেক প্রস্তাব গ্রহন করেছি বটে, কিন্তু এখনও অনেকগুলি রয়েছে রূপায়নের অপেক্ষায়।

আলোচ্য প্রবন্ধটি বঙ্গদর্শনের ষষ্ঠবর্ষ (বাঙলা ১২৮৫ সন) নবম সংখ্যায় ৪১৩ থেকে ৪২৬ পৃষ্ঠা দশম সংখ্যায় ৪৪৯ থেকে ৪৫৮ পৃষ্ঠা এবং একাদশ সংখ্যায় ৪৯৩ থেকে ৪৯৭ পৃষ্ঠা জুড়ে প্রকাশিত হয়েছিল।

প্রবন্ধের সূচনায় বিভিন্ন ভারতীয় ভাষার 'বর্ণমালাগত বৈষম্য দূর করিবার নিমিত্ত' ইটন কলেজের সহকারী শিক্ষক ডব্ সাহেব 'রোমান বর্ণমালার ব্যবহার করা সম্পূর্ণ উচিত' বলে 'নিজ মত সমর্থনের জন্য যেসকল যুক্তির উপন্যাস' করেছেন তার বিচার করা হয়েছে। ডব্ সাহেবের আগে ১৭৮৫ খ্রীষ্টাব্দে স্যর উইলিয়ম জোনস 'ভারতবর্ষীয় বাক্যসকল রোমান অক্ষরে লিখিতে প্রবৃত্ত হন'। চার্লস ট্রিবিল্যান, ডফ সাহেব, টমাস সাহেব, প্রফেসর মনিয়র উইলিয়ম প্রমুখ ছিলেন এই মতের সমর্থক। প্রতিবাদীদের মধ্যে ছিলেন ডঃ লাইটনর, রেভারেণ্ড জেমস লং, পার্সন সাহেব প্রভৃতি। রাজেন্দ্রলাল মিত্রও ছিলেন এই পক্ষে। তিনি ১৮৬৪ খ্রীষ্টাব্দে এশিয়াটিক সোসায়েটির জার্নালে 'হিন্দী-ভাষার মূল নিরূপন' বিষয়ে ইংরেজী প্রবন্ধে প্রসঙ্গত যে অভিমত প্রকাশ করেন সেটি অবলম্বনে 'বাঙ্গালা বর্ণমালার সংস্কার' প্রবন্ধের শেষ কিস্তিটি রচিত। রাজেন্দ্রলাল মিত্রের সিদ্ধান্ত হল: একরূপ ভাষা ও একরূপ বর্ণমালা প্রচার করিবার প্রয়াস বিফল মাত্র।

প্রবন্ধকার বলেছেন, অতএব লাইটনরের বাক্য নিতান্ত অযৌক্তিক নয়। যদি আমাদের বর্ণমালার কোনরূপ সংস্কার করিলে উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়, তবে পরিবর্তন করিবার প্রয়োজন কি? অতএব প্রথমে বর্ণমালা সংস্কারের চেষ্টা করা উচিত।'

রোমান হরফে বাঙলা লেখার সমর্থন না করে বরং প্রচলিত বর্ণমালাকে সংস্কৃতের আনুগত্য থেকে মুক্ত করে যুক্তসঙ্গতভাবে বিন্যস্ত করলেই তা অনেক বেশি কার্যকর হয়ে উঠতে পারে—একথা প্রবন্ধকার যুক্তির সহকারে প্রমাণ করেছেন। তারপর অগ্রসর হয়েছেন বর্ণমালা সংস্কারের আলোচনায়। সংস্কারের প্রস্তাব দেওয়ার সময় তিনি বাঙলাভাষার বিশেষ প্রকৃতিটি অনুধাবন করবার চেষ্টা করেছেন।

বর্ণমালা সংস্কার বিষয়ে প্রস্তাবের মুখবন্ধ হিসেবে প্রবন্ধকার দীর্ঘ ভাষা-তাত্ত্বিক আলোচনা করেছেন। অক্ষর সৃষ্টি সম্বন্ধে মনুস্মৃতির বক্তব্য উদ্ধার করা হয়েছে। স্বর ও ব্যঞ্জনের মৌলিক সংখ্যা, স্বর-সংযোগে ব্যঞ্জনের ভেদ, দ্বিত্ব বিধান দ্বারা সংযুক্ত অক্ষর সৃষ্টি, সন্ধি, প্রত্যয়, আগম, চিহ্ন প্রভৃতি বিষয়ে সংস্কৃত ব্যাকরণের বিধানাবলী আলোচিত হয়েছে। তারপর দেখানো হয়েছে প্রাকৃতে ঋ ঌ ঐ ঔ এই চারটি স্বর নেই এবং ব্যঞ্জনের মধ্যে ঙ ঞ ন য শ ষ ও এগুলির সংযুক্তবর্ণ ব্যবহৃত হয় না। '...ইহা স্পষ্ট প্রতীয়মান হইতেছে প্রাকৃতের বর্ণসংখ্যা সংস্কৃত অপেক্ষা ন্যূন।' প্রাকৃত থেকেই বাংলা হিন্দি এ-সব ভাষার উৎপত্তির কথা উল্লেখ করে লেখক বলেছেন বাঙলাভাষার ক্ষেত্রে 'অনেক স্থলে প্রাকৃতের অনুযায়ী উচ্চারণ অবস্থান করিলেও লেখন পদ্ধতি প্রাকৃতকে ত্যাগ করিয়া সংস্কৃতানুরূপ রূপ ধারণ করিয়াছে।' 'আমরা যদিও উচ্চারণ করিবার সময় কাজ, দ্বার, বিদসাদ, কৃষ্ণ বা কৃষ্ন ইত্যাদি রূপ উচ্চারণ করি কিন্তু লিখিবার সময় কার্য, দ্বার, বিশ্বাস, কৃষ্ণ এইরূপ লিখি। এরূপ না লিখিলে সর্বশাস্ত্রবেত্তাও মূর্খ হন। সুতরাং এক্ষণে বাঙ্গালা বর্ণমালা প্রায় সংস্কৃতের ন্যায় বিস্তৃত হইয়া পড়িয়াছে।'

প্রবন্ধ লেখক একশ বছর আগেই বাঙলা স্বরবর্ণ থেকে ঋ, ঌ ৡ এই তিনটিকে বাদ দেওয়ার প্রস্তাব দিয়েছিলেন। বাঙলা বর্ণমালা থেকে ৠ ও ৡ দীর্ঘস্বর দুটি অপসৃত হলেও এখনও ঌ-কে বিদায় দেওয়ার সাহস আমরা দেখাতে পারি নি। বর্গীয় ও অন্তঃস্থ ব সম্পর্কে তাঁর অভিমত হল—বাঙলায় দুটো ব এক বর্ণ বটে, কিন্তু সংস্কৃতের মত এদের আকার ও উচ্চারণে ভিন্নতা রক্ষিত হয় না বলে

বর্ণমালা মতো যেমন একটি ব রাখলে আমরা কিছুই হানি দেখিতে পাই না। তবু আজ পর্যন্ত দুটি ব-ই বাঙলা বর্ণমালায় বহাল আছে।

বাঙলায় ঙ বর্ণটির 'পৃথকরূপে ব্যবহার নাই অর্থাৎ ইহাতে এরূপ একটি শব্দ নাই যাহাতে ঙ স্বতন্ত্ররূপে অবস্থান করে'—এই যুক্তি দেখিয়ে প্রবন্ধলেখক ঙ-র জায়গায় অনুস্বার ব্যবহারের প্রস্তাব দিয়েছিলেন। তাহলে 'পঞ্চমবর্গীয় বর্ণমালাকের বিষম ভঙ্গির স্থান বর্ণীদিগের মত বহুক উত্তরাধিকারী এই অক্ষরটিকে হাস্যমুখে বর্ণমালা হইতে বিদায় দিতে পারি'। এপ্রসঙ্গে আগেই বলা হয়েছে। বর্তমানে অবশ্য ং-এর ব্যবহার বিস্তৃত হলেও প্রবন্ধলেখকের প্রস্তাব সর্বৈবভাবে গৃহীত হয়নি।

প্রসঙ্গত ঞ বিষয়ে একটি সরস মন্তব্য উল্লেখযোগ্য : 'কিন্তু বাঙ্গালাভাষায় একটি শব্দ আছে যাহা ঞ দ্বারা সংযুক্ত। সে শব্দটি 'ঞাঙা' বাঙ্গালীদের একমাত্র ভরসা-স্থল। অম্লানমুখে দক্ষিণহস্ত প্রসারণ করিতে এমন আর কোন জাতিই নাই। সুতরাং ঞ-টিকে রাখিতে হইতেছে। 'ঞাঙা' উঠান অপেক্ষা বাঙ্গালাভাষার লোপ করাও সহজ।

প্রবন্ধকার লক্ষ্য করেছিলেন যে বাঙলায় অচসংযুক্ত কয়েকটি বর্ণের আকার কিন্তু অস্বাভাবিক। যেমন গ্+উ=গু, র্+উ=রু, শু, হু, ন্তু, রু, স্তু, শ্রু, ন্তু, স্তু, রূ এভাবে সংযোগের দ্বারা উদ্ভূত বর্ণগুলিকে চেনাই দুঃসাধ্য। এগুলিকে গু, রু, শু, হু....প্রভৃতি আকার দেওয়ার প্রস্তাব করে প্রবন্ধকার লিখেছেন : 'ইহাদিগকে স্বাভাবিকরূপে লিখিলে কোন হানি হয় না, বরং শিক্ষার সৌকর্য হয়।' লেখকের এই প্রস্তাব কার্যকর করার জন্য আমাদের চলতি শতকের অর্ধেকটা পার করে দিতে হয়েছে। লাইনো হরফ উদ্ভাবনের পর ঐসব কিম্ভূত অক্ষর আর ছাপায় দেখা যায় না : 'রু, হ, ন্ত, স্তু'-র জায়গায় 'রু, হু, ন্তু, স্তু' লেখার প্রস্তাবও তিনি দিয়েছিলেন। কিন্তু এর সবগুলি প্রচলনের সাহস এখনও আমাদের হয়নি। তাছাড়া পুরনো ছাঁদে লেখা ও ছাপা ত আজও চলেছে।

বাঙলা সংযুক্ত বর্ণের বর্গীকরণ করে প্রবন্ধকার দেখিয়েছেন যে বাঙলায় দশটি ল-সংযুক্ত (ক্ল, প্ল,....), এগারটি ন-সংযুক্ত, চব্বিশটি ম-সংযুক্ত, পাঁচটি ঙ-সংযুক্ত, ছটি ণ-সংযুক্ত, নটি ষ-সংযুক্ত, ছটি স-সংযুক্ত, পাঁচটি ক-সংযুক্ত, দুটি শ-সংযুক্ত, পাঁচটি দ-সংযুক্ত, দুটি প-সংযুক্ত, তিনটি ক-সংযুক্ত, দুটি চ-সংযুক্ত, তিনটি জ-সংযুক্ত, একটি ট-সংযুক্ত, একটি ত-সংযুক্ত, একটি থ-সংযুক্ত, একটি ড-সংযুক্ত বর্ণ আছে। এছাড়া য-ফলা ৩৬টি, ব-ফলা ১৬টি, র-ফলা ২৫টি ও রেফযুক্ত ১৭টি বর্ণভেদের হিসেব দেওয়া হয়েছে। সংযুক্তবর্ণগুলির জটিলাকৃতি উল্লেখ করে লেখক বলেছেন, 'বর্ণপরিচয়ের সংযুক্তবর্ণ বিষয়ক পাতাগুলি দেখিলে বোধহয় যেন কুস্তির আখড়া, একটার উপর আর একটা চড়াই করে বসেছে।'

সংযুক্তবর্ণের সংস্কারের ব্যাপারে লেখক চিন্তা করেছিলেন। তিনি বলেছেন, 'ব্যঞ্জনসংযুক্তবর্ণ স্থলে আমরা এইরূপ একটি সাধারণ নিয়ম করিতে চাই যে সংযুক্ত বর্ণদ্বয়কে একত্র না লিখিয়া তাহাদের মধ্যে অচহীন বর্ণের নীচে যদি হসন্ত দিয়া লেখা যায় তাহা হইলে কোন হানি হয় না বরং বর্ণপরিচয়ের অনেক সৌকর্য উৎপন্ন হয়। ষ, ষ্ণ ইত্যাদি বর্ণ যে কিসে কিসে সংযুক্ত [illegible] সহজে বুঝিতে পারি নাই। কিন্তু [illegible]দের মতে স্থানাপি স্থানব্যয় হইবে বটে [illegible]তু কোনরূপ ভ্রমের সম্ভাবনা থা[illegible] না। কারণ আমাদের মতে 'বুদ্ধি' ব 'বুদ্‌ধি' একই। আর সংযুক্তবর্ণ যে একত্র করিয়া লিখিতে হইবে তাহার কোন বিধি নাই। পাণিনি বলিয়াছেন অচ দ্বারা অব্যবহিত হল বর্ণকে সংযুক্ত বলা যায়।' একটু পরে এই প্রসঙ্গে আবার বলেছেন : 'সংযুক্তস্থলে অক্ষর না থাকিলে এখনও পূর্ববর্ণে হসন্ত যোগ করিয়া লেখা হয় সুতরাং ইহা একপ্রকার স্বীকৃত পদ্ধতি।' তৎসম শব্দের ক্ষেত্রে এই বিধান প্রচলনে যে দুঃসাহস আবশ্যক তা এই একশ বছরের আমরা সঞ্চয় করে উঠতে পারি নি। কেবল লাইনো হরফের কল্যাণে বেশির ভাগ সংযুক্তবর্ণের আকার সরল হওয়ায় বর্ণগুলিকে আলাদাভাবে চিনে নেওয়ার সুবিধে হয়েছে। কিন্তু জ্ঞ (=জ্+ঞ) আর ক্ষ (=ক্+ষ) আজও দুর্জ্ঞেয় অস্তিত্ব নিয়ে বিরাজিত। 'জ্ঞ' নিয়ে আলোচ্য প্রবন্ধের একটি পাদটীকা উদ্ধারযোগ্য : 'জ্ঞ এই অক্ষরটি জ-এর নীচে ঞ-র যোগে সম্পন্ন হইয়াছে বটে। কিন্তু এ তত্ত্ব আমরা সংস্কৃত ব্যাকরণ পড়ে জানি। বাঙ্গালায় ইহার আকার ও উচ্চারণে ইহাতে যে ঞ-র সম্পর্ক আছে তাহা ত বোধহয় না।'

রেফাক্রান্ত দ্বিত্ব শব্দের দ্বিত্ব শব্দের দ্বিত্ব বর্জনেরও প্রস্তাব প্রবন্ধলেখক করেছিলেন। '...ইহাও বক্তব্য যে রফলা-যুক্ত বর্ণ যে দ্বিত্ব করিয়া লেখা হয় সে কেবল সংস্কৃতের নিয়মানুসারে, সংস্কৃতেও তাদৃশ দ্বিবিধির নিত্যতা নাই। যাহা হোক ভাষায় ওরূপ দ্বিত্ব না লিখিয়া যদি একটি বর্ণের উপর রেফ দিয়া লেখা হয় অর্থাৎ 'কর্ম্ম' যদি 'কর্ম' এইরূপে লেখা হয় তাহা হইলে কিছুই হানি নাই।' এই প্রবন্ধ প্রকাশের পর পঞ্চাশ বছরেরও বেশি কেটে গেলে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্যোগে বাংলা বানানের যে নিয়ম বেঁধে দেওয়া হয় সেখানে সংস্কৃত ও অ-সংস্কৃত শব্দে রেফের পরে ব্যঞ্জনবর্ণের দ্বিত্ব বর্জনের বিধান অনুমোদিত হয়। গোড়ার দিকে এ নিয়ে খুব হইচই ও বিরোধিতা হলেও শেষপর্যন্ত এই বিধি স্বীকৃত হয়েছে এবং ব্যাপকভাবে অনুসৃত হচ্ছে। তবে রেফাক্রান্ত শব্দের দ্বিত্ব লোপের কৃতিত্বটা যদিও বৈধ-ভাবেই বিশ্ববিদ্যালয়ের বানান সংস্কার সমিতির প্রাপ্য তবু দূর অতীতে বঙ্গদর্শনের পৃষ্ঠায় যে সেই চিন্তার নিদর্শন রয়ে গেছে সেটাও স্বীকার্য ও স্মরণযোগ্য।

প্রবন্ধলেখক স্বরবর্ণের সংস্কারকল্পে যে প্রস্তাব দিয়েছিলেন তাকে বৈপ্লবিক বলা চলে। ' যদি ই ঈ উ ঊ ঋ এ ঐ ও ঔ ইহাদিগকে যথাক্রমে অি অী অু অূ অৃ অে অৈ অো অৌ এইরূপ করিয়া লেখা হয় তাহা হইলে আপাতত দেখিতে কিছু কেমন কেমন ঠেকে যায়, আসলে কিছুই হানি হয় না।.... মনোনিবেশপূর্ব্বক দেখিলে বরং ইহা জানিতে পারা যায় যে পূর্ব্বে 'ই' প্রভৃতির আকার 'অি' 'অী' ইত্যাদি রূপ ছিল কালবশে পরিবর্ত্তন লাভ করিয়া 'অি' ই এবং 'অী' ঈ হইয়াছে...। প্রস্তাবিত পদ্ধতি অবলম্বন করিলে আমাদের স্বরাকারের কেবল দশটি থাকে। যথা—অ, া, ি, ী, ু, ূ, ৃ, ে, ৈ, ো।' এর ফলে যে কম্পোজিটর ও ডিস্ট্রি-বিউটরদের বিশেষ সুবিধে হবে এবং কেস-বক্স অর্থাৎ অক্ষরাধারের প্রকোষ্ঠ কমানো যাবে সে কথাও লেখক উল্লেখ করেছেন। তাঁর এই মত অবশ্য পরবর্তীকালে আরও কেউ পুনরায় উত্থাপন করেছেন। এই শতকের মাঝামাঝি এ নিয়ে কিছু আলোচনাও হয়। কিন্তু পরিণামে ই ঈ ইত্যাদিকে অি অী ইত্যাদি রূপে লেখা গ্রহণযোগ্য বলে বিবেচিত হয়নি।

প্রবন্ধলেখক তাঁর সংস্কার পরিকল্পনা সবিস্তারে ব্যাখ্যা করে দেখিয়েছেন যে সবশুদ্ধ ৪২টি অক্ষরেই বাঙলা বর্ণমালার কাজ চালানো সম্ভব। তাঁর হিসেব অনুসারে: স্বরবর্ণ দশটি, ব্যঞ্জনবর্ণ একত্রিশটি (ক খ গ ঘ চ ছ জ ঝ ঞ ট ঠ ড ঢ ণ ত থ দ ধ ন প ফ ব ভ ম য র ল শ ষ স হ) এইসব ব্যঞ্জনের আরও একত্রিশটি অঙ্গাকার, হসন্ত অনুস্বার বিসর্গ চন্দ্রবিন্দু প্রভৃতি পাঁচটি ক্ষ ও জ্ঞ এই দুটি এবং পাঁচটি ফলা (ব, র, ম, য ও রেফ)। একশ বছর আগে এরকম প্রাগ্রসর চিন্তা সত্যিই বিস্ময়কর।

বাঙলা বর্ণমালার সংস্কারের প্রস্তাব করতে গিয়ে প্রবন্ধকার বাঙলা বানানের ক্ষেত্রে অনেক যুগান্তকারী সংস্কারের প্রস্তাবও দিয়েছিলেন। মৌলিক অথচ যুক্তি-শীলতালেশহীন ও দূরদৃষ্টিসম্পন্ন প্রস্তাব উত্থাপনের মধ্যে দিয়ে তাঁর বুদ্ধিমত্তা ও স্বচ্ছচিন্তা নির্ভুলভাবে প্রতিভাত হয়েছে। বঙ্কিমচন্দ্রও তাঁর পত্রিকায় (যদিও তখন বঙ্গদর্শন সম্পাদনার দায়িত্ব ন্যস্ত ছিল সঞ্জীবচন্দ্রের উপর) এই দীর্ঘ প্রবন্ধটি প্রকাশ করে লেখকের যুক্তির সারবত্তাকে প্রকারান্তরে স্বীকার দিয়েছিলেন। প্রবন্ধটি যখন পত্রস্থ হয় তখন রবীন্দ্রনাথের বয়স সতের-আঠার।

প্রবন্ধকারের প্রস্তাবিত সংস্কারগুলির মধ্যে ব্যঞ্জনবর্ণের দ্বিত্ব বর্জন এখন সম্পূর্ণাংশে গৃহীত বলা চলে। এই শতকের তিরিশের দশকে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের তত্ত্বাবধানে গঠিত বাঙলা বানান সংস্কার সমিতি রবীন্দ্রনাথের অনুমোদনপুষ্ট হয়ে যে অনেকগুলি কার্যকর সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন ব্যঞ্জনের দ্বিত্বলোপ তার অন্যতম। অনুস্বারের ব্যাপারেও ঐ সমিতি গুরুত্বপূর্ণ বিধান দিয়েছিলেন। তবে সেটি খুবই সীমাবদ্ধ ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। সংস্কৃতশব্দে সন্ধির সময় পরপদের গোড়ায় ক খ গ ঘ থাকলে পূর্বপদের অন্তস্থিত ম্-এর জায়গায় ঙ্ অথবা বিকল্পে ং লেখা চলে। তার মানে, 'অহঙ্কার সঙ্গীত' প্রভৃতির বদলে 'অহংকার সংগীত' লেখা চলতে পারে। কিন্তু আশংকা বা গংগা বিধেয় নয়। আর অ-সংস্কৃত শব্দের বেলায় 'বাঙলা রঙ' প্রভৃতির জায়গায় 'বাংলা রং' এরকম লেখাও চলবে। বানান সংস্কার সমিতির বিধানের ফলস্বরূপ অবশ্য বাংলা বানানে অনুস্বারের প্রয়োগ অনেক ব্যাপক হয়েছে। বিধান ভেঙে অনেক তথাকথিত ভুল বানানও লেখা হচ্ছে। কিন্তু বঙ্গদর্শনের প্রবন্ধটির প্রস্তাব অনুসরণ করলে অনুস্বার শুধু ঙ-র বিকল্পেই নয়, ঞ ণ ন ম-র বদলেও লেখা যাবে। হিন্দিতে 'পংডিত' 'সংচয়' লেখা হয়। প্রাকৃতে ত ছিলই।

যুক্তাক্ষর ভেঙে লেখার প্রস্তাবটি পুরোপুরিভাবে গৃহীত না হলেও বাঙলা বানানে এর দেখা মেলে একটু অন্যভাবে। রবীন্দ্রনাথ প্রথম দ্ব ও দ্য-কে ভেঙেছেন। তাঁর লেখায় 'উদ্বেগ উদ্যোগ' রূপ পেয়েছে 'উদ্‌বেগ উদ্‌যোগ'। 'আল্পনা ইস্কুল' ইত্যাদিকে অযুক্তাক্ষর বানান করা হয় 'আলপনা ইসকুল'। অতৎসম ও বিদেশি শব্দের ক্ষেত্রেই এটি চলে। কিন্তু সংস্কৃত শব্দে নির্বিচারে এই সংস্কার চালানোয় হয়ত একটু অসুবিধে হবে। কারণ তাহলে উচ্চারণ বিভ্রাট ঘটবার সম্ভাবনা দেখা দেবে। তৎসম শব্দের অক্ষর ও আকৃতি সংস্কৃতানুগ হলেও বাঙালির উচ্চারণে প্রায়শই সেগুলি অপভ্রংশ। তাই বিস্ময় আহ্বান চিহ্ন পক্ব এই সব শব্দের যুক্তাক্ষর হস্‌-চিহ্ন দিয়ে লিখলে অন্য রকম গোলমালে জড়িয়ে পড়তে হবে। আর ক্ষ ও জ্ঞ-র আদি উচ্চারণ বাঙালি ত্যাগ করেছে। ঐ দুটি যুক্তাক্ষর বজায় রাখার কথা ত প্রবন্ধকার নিজেই বলেছেন।

প্রবন্ধকারের অপর বৈপ্লবিক প্রস্তাব ই উ প্রভৃতিকে অি অু আকারে লেখা আর হয়ত হয়ে উঠবে না। তার কারণ ঐ প্রস্তাবের যৌক্তিকতার অভাব নয়। কারণ হল, ই উ এ প্রভৃতি স্বরবর্ণ এত দিনে সুপ্রতিষ্ঠিত হয়ে গেছে, এগুলিকে আজ আর লোপ করার উপায় নেই। তাছাড়া যখন কোনও বর্ণ বা বানান দীর্ঘকাল ধরে প্রচলিত থেকে স্থায়িত্ব অর্জন করে তখন সেগুলির আকস্মিক বিলোপসাধন সহজ-সাধ্য নয়। ঐ প্রস্তাবের পর শতবর্ষ অতি-ক্রান্ত হল বলে পরবর্তী শতবর্ষে যদি একান্ত প্রয়োজন অনুভূত হয় তবে তা গ্রাহ্য হবে বলে আশা করা যেতে পারে।

আলোচ্য প্রবন্ধটি নানা কারণে বেশ গুরুত্বপূর্ণ ও চিন্তা উদ্রেককারী। অথচ কেন জানি না, এটি নিয়ে কোনও আলোচনা হয়নি। এমন কি বঙ্গদর্শনে প্রকাশিত রচনা সম্পর্কে যাঁরা গবেষণা করেছেন তাঁরাও প্রবন্ধটির লেখকের নাম উদ্ধার করতে উৎসাহ বোধ করেন নি। প্রবন্ধকার যেমন ভাষা ও ব্যাকরণের ব্যাপারে গভীর জ্ঞানের পরিচয় দিয়েছেন তেমনি তাঁর লেখার ভঙ্গিও অতীব স্বচ্ছন্দ ও চিত্তাকর্ষক। এই রচনার ছত্রে ছত্রে যেন ঠাকুর-বাড়ির মনীষা ও প্রসাদগুণ ওতপ্রোত।

আজ গর্বিত। অন্যান্য বিষয়ের পাশাপাশি বাংলা ভাষা ও সাহিত্য এই বিশ্ববিদ্যালয়ে সমমর্যাদা পেয়েছে। কয়েক বছর যাবৎ এই বিশ্ববিদ্যালয় বাংলা ভাষা ও সাহিত্য নিয়ে গবেষণা করারও সুযোগ দিয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগারে গবেষক ও ছাত্রদের জন্য প্রচুর বাংলা বই রয়েছে।

কথাই আছে বাঙালী যেখানেই থাকুক তার সঙ্গে থাকবে সাহিত্য-সংস্কৃতি-চিত্রকলা ও একটি কালীবাড়ি। এখানেও তার প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। এই শহরের আনাচেকানাচে বাঙালীদের সাহিত্য-সংস্কৃতি-চিত্রকলাচর্চা পুরোদমে চলছে। নিয়মিত ও অনিয়মিতভাবে অনেক সাপ্তাহিক, মাসিক, পাক্ষিক ও ত্রৈমাসিক এখান থেকে প্রকাশ পাচ্ছে। এর মধ্যে একাল, অধুনা, পৃথিবী, কণ্ঠস্বর, যুগবাণী, দেশবাণী, ঝিলকী ইত্যাদির নাম করা যেতে পারে। নিঃ ভাঃ বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলনের শাখা অফিসে প্রতি বছর নিয়মিতভাবে সাহিত্যসভার আয়োজন করা হয়ে থাকে। রূপসাগর, মধুবন, মধুতীর্থ এই তিনটি নাট্যগোষ্ঠী সগৌরবে স্বক্ষেত্রে বাংলা নাট্যধারাকে বেগবান রেখেছে। চিত্রশিল্পে প্রদ্যোৎ চক্রবর্তী ও মাধনলাল সাহা ইতিমধ্যে চিত্রকলা জগতে নিজেদের স্থান করে নিয়েছেন। সঙ্গীত জগতেও অনেকে রবীন্দ্রসঙ্গীত ও নজরুলগীতি গেয়ে নাম করেছেন। আকাশবাণী গৌহাটী থেকে মাঝে মাঝে তাদের গান প্রচারিত হয়ে থাকে। (এছাড়া গৌহাটি তথা সারা আসামের বাঙালী শ্রোতাদের মনোরঞ্জনের জন্য গৌহাটী রেডিও প্রতি সোমবার ও বুধবার বাংলা আধুনিক ও রবীন্দ্রসংগীত প্রচার করে থাকে।) এখানকার বাঙালীর বিজ্ঞান-সাধনার অন্ত নেই। ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে বিজ্ঞান-চেতনা বাড়াবার জন্য বিজ্ঞান-উৎসাহী বাঙালীরা এখানে একটি সায়েন্স ক্লাব প্রতিষ্ঠা করেছেন। এর মূল প্রতিষ্ঠাতা হচ্ছেন অধ্যাপক ডঃ বিভাসদাস পুরকায়স্থ। তাঁরই আগ্রহে এই প্রতিষ্ঠান থেকে 'কিশোর বিজ্ঞান' নামে একটি বিজ্ঞান-পত্রিকা প্রকাশিত হচ্ছে। মৃৎশিল্প, স্বর্ণশিল্পে একমাত্র বাঙালীরাই এখানে আধিপত্য বিস্তার করেছে। বেশ কয়েকজন প্রভাবশালী বাঙালী শিল্পপতি ও ব্যবসায়ীও রয়েছেন এই শহরে।

অতএব কুল কুল বেগে যেমন লোহিত নির্ঝর বয়ে যেতে থাকবে চিরকাল তেমনি চিরকাল এইভাবে বাঙালী ভার অসমীয়া ভাইদের হাত ধরে এগিয়ে যাবে সমন্বয়ের পথ ধরে—এক উজ্জ্বল প্রান্তর দিকে— এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই।

[illegible]

বোম্বাই

শিউলি ফুলের গন্ধ মেখে শরৎ এলেই বাংলার ধমনীতে বোধনের বাজনা বেজে ওঠে। বাংলার বাইরে বাঙালী সব সময় হয়তো কাশ ফুলে ছাওয়া শরৎ ঋতুকে দেখতে পায় না, তবু তার ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় অনুভব করে শরৎকে। নীল আকাশে সাদা মেঘের পাল তার মনে মার আগমনীবার্তা ঘোষণা করে দেয়। তাই বাংলার বাইরেও নিষ্ঠা আর আন্তরিকতার সঙ্গে দুর্গাপূজো হয়।

বোম্বাই শহরে দুর্গাপুজোর (সর্বজনীন) বয়স প্রায় অর্ধ-শতাব্দী। কিছু বাঙালী একত্রিত হলেই যেমন দুর্গাপূজো বা কালিবাড়ির অভাব অনুভব করেন, সেইভাবেই এই পুজোরও সূত্রপাত ১৯৩০ সালে। প্রথম পুজোটি হয় তারদেও-তে। এরপর পুজোর সংখ্যা একটি-একটি করে বেড়ে চলছে। তারদেও-এর পুজো এরপর অন্য অন্য স্থানে হয়েছে। এই পুজোর তত্ত্বাবধান করেন বোম্বে দুর্গাবাড়ি সমিতি। ১৯৫৪ সালে এই পুজোর রৌপ্য-জয়ন্তী হয়। সেই উপলক্ষে প্রধান আচার্য ছিলেন ডাঃ গোপীনাথ শাস্ত্রী। বর্তমানে বোম্বে দুর্গাবাড়ি সমিতি তাঁদের পুজো করেন স্থানীয় তেজপাল হলে, কারণ, এঁদের নিজস্ব কোন ক্যাবঘর নেই।

আগেকার দিনে সাধারণতঃ দুর্গাপুজো হতো ধনী গৃহস্থের ঘরে। ক্রমে ক্রমে তা হলো সর্বজনীন। গৃহস্থের বাড়ি যখন পুজো হতো, তখন সেই পাড়ায় বা গ্রামে তিনদিন কারুর বাড়ি হাঁড়ি চড়ত না। সকলেই পুজোবাড়ি পাত পাততেন। পুজো সর্বজনীন হওয়ায় এবং দ্রব্যমূল্যের ঊর্ধ্বগতির জন্য সেই গ্রাম-ভোজ এখন প্রায় কিংবদন্তীতে পর্যবসিত হয়েছে। সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান বা মণ্ডপসজ্জার জৌলুস দিনদিনই উন্নতি লাভ করছে ঠিকই, কিন্তু সেই বসুধৈব কুটুম্বকের অনুভূতি বিগত প্রায়।

আনন্দের বিষয় এই যে, বোম্বাই শহরে দুর্গাপুজো দেখলে বিংশ শতাব্দীর প্রথম দশকের কিংবা তারও আগের বাড়ির পুজোর আমেজ অনুভব করা যায়। ভোর থেকে মেয়েরা পুজোমণ্ডপে এসে শুদ্ধাচারে পুজোর আয়োজন করেন। পঞ্জিকার নির্দেশ মেনে নির্দিষ্ট সময় পুজো, অঞ্জলি ইত্যাদি হয়, তারপর প্রসাদ বিতরণ। দ্বিপ্রহরে উত্তম ভোগের ব্যবস্থা যাতে খিচুড়ি, ভাজা, চাটনি, পায়েস বা বোঁদে, কিছুরই অভাব নেই। আহূত, অনাহূত সকলকে আত্মীয়ের আদরে ভোজে আপ্যায়ন করা হয়।

[illegible]

সংস্কৃতির উদাহরণ হিসাবে অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা থাকে। যাত্রা, নাটক, গান, বাংলা সিনেমা ইত্যাদি বিচিত্র সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। এইসব অনুষ্ঠানে শিশু থেকে বৃদ্ধেরা সমান আগ্রহ নিয়ে যোগ দেন।

প্রতিমা কোথাও কলকাতা থেকে কিনে আসে, কোথাও মৃৎশিল্পী আসেন কলকাতা থেকে। স্থানীয় শিল্পীও অনেক ক্ষেত্রে মূর্তি তৈরি করে থাকেন। এই উপলক্ষে কলকাতা থেকে আসেন পুরোহিত এবং ঢাকী। পুজোমণ্ডপগুলির মধ্যে স্টল বসে—তাঁতের শাড়ি, সিঁদুর-শাঁখার দোকান, বাংলা রেকর্ডের দোকান, বাংলা বই, বাঙালী মিষ্টি সবই থাকে। কলকাতার নামী প্রকাশক মিত্র ও ঘোষ এবং দে পাবলিশার্স আসেন বাংলা বই-এর ডালি নিয়ে।

দেখতে দেখতে পুজোর পাঁচদিন কেটে গিয়ে আসে বিজয়া দশমী। সন্ধ্যায় শান্তির জল, বিদায় সম্ভাষণের পর থাকে মিষ্টিমুখের ব্যবস্থা। পুজোপর্ব সমাধা হয়, বোম্বাই-এর বাঙালীরা তাকিয়ে থাকেন আগামী বছরের পুজোর দিকে।

দুর্গাপুজোয় শুধু বাঙালী নয়, যোগ দেন বহু অবাঙালী। পুজো, ভোগ বা সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ছাড়াও এই পুজোর বাঙালীদের আর একটি বিশেষ আকর্ষণ আছে, তা নিজেদের মধ্যে দেখাশোনা, মেলামেশা করার সুযোগ। বৃহৎ বোম্বাই শহরে বাঙালীর সংখ্যা কম নয় কিন্তু তাঁরা নির্দিষ্ট কোন স্থানে থাকেন না, ছড়িয়েছিটিয়ে থাকেন। দ্রুতগতি জীবনধারা আর দূরত্বের জন্য অনেক সময় ইচ্ছা থাকলেও অনেকের সঙ্গে দেখা করা হয়ে ওঠে না। পুজো উপলক্ষে যোগাযোগ হয়ে যায়। বলতে গেলে দুর্গাপুজো বাঙালীদের মিলন-অঙ্গন।

[illegible]

খেলা

আন্তঃ বিশ্ববিদ্যালয় ফুটবল

কুরুক্ষেত্রে আয়োজিত আন্তঃ বিশ্ববিদ্যালয় ফুটবল প্রতিযোগিতার দ্বিতীয় দিনের ফাইনালে কলকাতা ৫—৪ গোলে (টাইব্রেকার পদ্ধতিতে) গুরু নানক দেব বিশ্ববিদ্যালয়কে হারিয়ে স্যার আশুতোষ মুখার্জি শীল্ড জয়ী হয়েছে। প্রথম দিনের ফাইনাল খেলা ১—১ গোলে ড্র যায়। দ্বিতীয় দিনেও নির্ধারিত সময়ের মধ্যে জয়-পরাজয়ের মীমাংসা হয়নি। উভয় পক্ষই দুটি করে গোল করেছিল। শেষ পর্যন্ত টাইব্রেকার পদ্ধতির সাহায্যে খেলার নিষ্পত্তি হয়। এই নিয়ে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় আন্তঃ বিশ্ববিদ্যালয় ফুটবল প্রতিযোগিতায় ১৬ বার ফাইনালে খেলে ১৩ বার চ্যাম্পিয়ান হল। আন্তঃ বিশ্ববিদ্যালয় ফুটবল প্রতিযোগিতার ইতিহাসে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের এই দুটি রেকর্ড আজও অক্ষুণ্ণ আছে—সর্বাধিকবার খেতাব জয় (মোট ১৩ বার) এবং উপর্যুপরি সর্বাধিকবার চ্যাম্পিয়ান (মোট ৪ বার—১৯৬৪-৬৭)। আন্তঃ বিশ্ববিদ্যালয় ফুটবল প্রতিযোগিতায় পশ্চিমবাংলা থেকে এই তিনটি বিশ্ববিদ্যালয় স্যার আশুতোষ শীল্ড জয়ী হয়েছে—কলকাতা (১৩ বার), খড়গপুর (৩ বার) এবং বর্ধমান (১ বার)।

আলোচ্য বছরের মূল প্রতিযোগিতার সেমি-ফাইনালে কলকাতা ১—০ গোলে বোম্বাইকে এবং গুরু নানক দেব ৪—০ গোলে কালিকটকে হারিয়ে ফাইনালে উঠেছিল। তৃতীয় স্থান নির্ধারণের খেলায় কালিকট ৪—০ গোলে বোম্বাইকে পরাজিত করে।

এখানে উল্লেখ্য, এ-বছর আঞ্চলিক পর্যায়ের খেলায় পূর্বাঞ্চলে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় এবং উত্তরাঞ্চলে গুরু নানক দেব চ্যাম্পিয়ান হওয়ার সূত্রে মূল প্রতিযোগিতায় খেলবার যোগ্যতা লাভ করে শেষ পর্যন্ত ফাইনালে উঠেছিল।

আন্তঃ বিশ্ববিদ্যালয় ফুটবল প্রতিযোগিতায় কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ১৩ বার খেতাব পায়: ১৯৪১-৪২, ১৯৫০-৫১, ১৯৫৩-৫৪, ১৯৫৬-৫৭, ১৯৫৭-৫৮, ১৯৬০-৬১, ১৯৬১-৬২, ১৯৬৩-৬৪, ১৯৬৪-৬৫, ১৯৬৫-৬৬, ১৯৬৬-৬৭ (উপর্যুপরি চারবার—রেকর্ড), ১৯৭২-৭৩ এবং ১৯৭৬-৭৭। তারা রানার্স-আপ হয়েছে ৩ বার—১৯৫৫-৫৬, ১৯৫৯-৬০ এবং ১৯৭৩-৭৪।

জাতীয় জুনিয়র ফুটবল প্রতিযোগিতা

এ বছর ১০ম জাতীয় জুনিয়র ফুটবল প্রতিযোগিতা ফাইনাল পর্যায়ে পৌঁছে গেছে। ফাইনালে একদিক থেকে উঠেছে গত বছরের রানার্স-আপ বাংলা এবং অপরদিক থেকে ওড়িশা। গত বছরের চ্যাম্পিয়ান অন্ধ্রপ্রদেশ কোয়ার্টার ফাইনালে ০—১ গোলে ওড়িশার কাছে অপ্রত্যাশিতভাবে পরাজিত হয়।

আলোচ্য বছরের প্রতিযোগিতায় যোগদানকারী ১৬টি দল চারটি গ্রুপে সমান ভাগ হয়ে প্রথমে লীগ প্রথায় খেলেছিল। এবং প্রতি গ্রুপের চ্যাম্পিয়ান এবং রানার্স-আপ দল মূল প্রতিযোগিতার কোয়ার্টার ফাইনালে খেলবার যোগ্যতা লাভ করেছিল।

প্রাথমিক লীগ পর্যায়ের খেলায় চ্যাম্পিয়ান এবং রানার্স-আপ দল হিসাবে এই ৮টি দল কোয়ার্টার ফাইনালে উঠেছিল—'এ' গ্রুপ থেকে ওড়িশা ও বিহার, 'বি' গ্রুপ থেকে বাংলা ও ত্রিপুরা, 'সি' গ্রুপ থেকে কর্ণাটক ও অন্ধ্রপ্রদেশ এবং 'ডি' গ্রুপ থেকে আসাম ও মহারাষ্ট্র। কেরালা 'ডি' গ্রুপে চ্যাম্পিয়ান হলেও কোয়ার্টার ফাইনালে তাদের খেলবার যোগ্যতা বাতিল হয়। কারণ, তাদের ৮ জন খেলোয়াড়ের বয়সের সার্টিফিকেট ঠিক ছিল না।

কোয়ার্টার ফাইনালে ওড়িশা ১—০ গোলে অন্ধ্রপ্রদেশকে, কর্ণাটক ২—১ গোলে বিহারকে, বাংলা ৬—০ গোলে আসামকে এবং মহারাষ্ট্র ১—০ গোলে ত্রিপুরাকে পরাজিত করে সেমি-ফাইনালে উঠেছিল।

সেমি-ফাইনালে ওড়িশা ২—০ ও ২—২ গোলে কর্ণাটক এবং বাংলা ২—১ ও ৫—০ গোলে মহারাষ্ট্রকে হারিয়ে ফাইনালে উঠেছে।

জাতীয় সন্তরণ প্রতিযোগিতা

আমেদাবাদের সর্দার বল্লভভাই প্যাটেল স্টেডিয়ামে ৩৪তম জাতীয় সন্তরণ প্রতিযোগিতার পুরুষ বিভাগে সার্ভিসেস এবং মহিলা বিভাগে মহারাষ্ট্র দলগত খেতাব জয়ী হয়েছে। অনুষ্ঠানে মোট ১২টি জাতীয় রেকর্ড ভঙ্গ হয়।

চূড়ান্ত ফলাফল

পুরুষ বিভাগ : ১ম সার্ভিসেস (১০৭ পয়েন্ট), ২য় রেলওয়ে (৯৩ পয়েন্ট) এবং ৩য় দিল্লি (৯১ পয়েন্ট)

মহিলা বিভাগ : ১ম মহারাষ্ট্র (৯১ পয়েন্ট), ২য় কেরালা (৬৩ পয়েন্ট) এবং ৩য় দিল্লি (২১ পয়েন্ট)

ওয়াটার পোলো : ফাইনালে সার্ভিসেস ৮—৫ গোলে রেল দলকে পরাজিত করে।

আন্তঃ রাজ্য জুনিয়র ব্যাডমিণ্টন

গৌহাটিতে অনুষ্ঠিত দ্বিতীয় আন্তঃ রাজ্য জুনিয়র ব্যাডমিণ্টন প্রতিযোগিতার বালক বিভাগে কেরল পেয়েছে নারাং কাপ এবং বালিকা বিভাগে সম্মিলিত বিশ্ববিদ্যালয় জয়ী হয়েছে শফি কুরেশি কাপ।

বালক বিভাগে কেরল ৩—০ খেলায় মহারাষ্ট্রকে এবং বালিকা বিভাগের ফাইনালে সম্মিলিত বিশ্ববিদ্যালয় ৩—০ খেলায় মহারাষ্ট্রকে পরাজিত করে।

জাতীয় স্কুল গেমস

অমৃতসরে ২৩তম জাতীয় স্কুল গেমসের সাঁতারে পশ্চিমবাংলার ছাত্র-ছাত্রীরা বিরাট সাফল্যের পরিচয় দিয়েছে। সিনিয়র এবং জুনিয়র ছাত্র-ছাত্রী বিভাগে পশ্চিমবাংলা দলগত চ্যাম্পিয়ান হয়ে এক অসাধারণ নজির প্রতিষ্ঠা করেছে। সিনিয়র বালিকা বিভাগের মোট সাতটি ইভেণ্টেই ফাইনালে পশ্চিমবাংলা খেলোয়াড় জয়ী হয়।

সিনিয়র (বালক) **:** ১ম পশ্চিমবাংলা (৪৫ পয়েন্ট)

সিনিয়র (বালিকা) **:** ১ম পশ্চিমবাংলা (৪৯ পয়েন্ট)

জুনিয়র (বালক) **:** ১ম পশ্চিমবাংলা (২৩ পয়েন্ট)

জুনিয়র (বালিকা) **:** ১ম পশ্চিমবাংলা (২৭ পয়েন্ট)

এশীয় দেহসৌষ্ঠব প্রতিযোগিতা

কলকাতার নেতাজী ইনডোর স্টেডিয়ামে আয়োজিত ১৩শ এশীয় দেহসৌষ্ঠব প্রতিযোগিতায় ইরাক দলগত খেতাব জয় করে। অনুষ্ঠানে দ্বিতীয় স্থান লাভ করে সিঙ্গাপুর এবং তৃতীয় স্থান ইরাণ। প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহণ করেছিল ১১টি দেশ। ভারতের প্রতিনিধিরা মোটেই সুবিধা করতে পারেননি। প্রতিযোগিতায় ভারতের প্রতিযোগীদের ফলাফল এই রকম দাঁড়ায়: ব্যাণ্টমওয়েটে সুনীল পাত্র ৬ষ্ঠ স্থান, লাইটওয়েটে মলয় রায় ৬ষ্ঠ স্থান, মিডলওয়েটে কে বরগোহাইন ৫ম স্থান লাভ করেন।

দলগত খেতাব বিজয়ী ইরাক লাইটওয়েট বিভাগে প্রথম স্থান, এবং হেভীওয়েট বিভাগে প্রথম স্থান লাইটওয়েটে দ্বিতীয় স্থান এবং মিডলওয়েটে তৃতীয় স্থান লাভ করে।

প্রতিযোগিতায় খেতাব জয়ী হন ব্যাণ্টমওয়েটে মো টেক হিন (সিঙ্গাপুর), লাইটওয়েটে তালিব সেহাব (ইরাক), মিডলওয়েটে রহমৎ জুরাইমি (সিঙ্গাপুর) এবং হেভিওয়েটে এ আব্দুল করিম (ইরাক)।

চূড়ান্ত দলগত অবস্থা : ১ম ইরাক, ২য় সিঙ্গাপুর, ৩য় ইরাণ, ৪র্থ ইন্দোনেশিয়া, ৫ম হংকং এবং ৬ষ্ঠ ভারত।

জনকেন ভারতে তার একমাত্র গায়ক ছেলে খাঁর কাপুরের হাতে তুলে দিতে, কিন্তু কাঁটালের গন্ধে মাছি ভিড় করার মত ঐ কোমরকম্পকে ঘিরে মুটেছে ভিলেনের ভিড়। আর সেই সঙ্গে কাহিনীকারের মস্তকাবিতে এসেছে ষোড়শী নায়িকা কাজলকিরণ, সঞ্জীবকুমার, দীপঙ্কর দে'র মিক্‌স প্রোডাক্ট প্রেমিক তারিক। এবং এঁদের প্রাগৈতিহাসিক চরিত্রমাফিক কার্যকলাপ, উল্লম্ফন, দৌড়দৌড়, নাচা-গানা-লওয়ালী, কুমারী মেয়ের রং ঢং।

নাচে গানে (?) ভরপুর তারপর সে আর এক ধৈর্যের প্রতীক্ষা। প্রতীক্ষা শেষ হতে মনে হোল—'গাড' মার্কস্ নিয়েই পাশ করেছি আমরা। নইলে কোন্ যুক্তি আর সাহসে এমন ভয়ানক এক্সপেরিমেন্ট চালাতে পারেন নাসির হোসেন-শচীন ভৌমিক প্রমুখ উর্বর মস্তিষ্কগুলি। আমাদের রুচিকেও এ প্রসঙ্গে ধন্যবাদ দিতে হয়। কেননা হাউস-ফুল বোর্ডটা ঝুলিয়ে চলেছি আমরাই।

নির্মল ধর

জীবন-মুক্ত

কয়েকবছর আগে হিন্দী ছবিতে যে নবতরঙ্গ এসেছিল, এই ছবিটি সেই তরঙ্গ বেয়ে হাজির হয়েছে। পরিচালক সুখেন্দু রায় আমাদের পূর্বপরিচিত এবং বাঙালী। আমরা জানি; তিনি বেশ পরিচ্ছন্ন ছবি করতে উৎসাহী। সুখেন্দু রায় এই ছবির জন্য যে বিষয় পছন্দ করেছেন, তা একটু জটিল। মানুষের ব্যবহারিক সম্পর্ক, প্রেম, প্রেমের বিভিন্ন রূপ ও তার পারিপার্শ্বিক অবস্থা—এসবের ওপর তিনি আলো ফেলার জন্য সচেষ্ট হয়েছেন। জটিল হলে-ও এটা একটা সমস্যা।

অনিতা (লক্ষ্মী) এই ছবির চরিত্র। তার মা মারা যায়। প্রথম প্রেমিক তাকে আঘাত দিয়ে দূরে চলে যায়। এক যুবক দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে তার প্রতি অত্যাচার করে ও আত্মঘাতী হয়। আর এক ব্যক্তি ধর্ম ও বৈরাগ্যের মধ্যে তাকে নিয়ে যেতে চায়। এবং এমনকি প্রেমিকের পুত্রসন্তানের প্রতি অপার স্নেহ থেকে-ও সে আঘাত পায়। কেননা, অনিতার স্নেহ ঐ শিশুটিকে বাঁচাতে অক্ষম হয়েছিল।

এতোবড় একটা সমস্যা নিয়ে ছবি করতে আসার আগে যে চিন্তা-ভাবনার দরকার, মনে হয় পরিচালকের তা ছিল না। ফলে, ছবিটি বিশ্বাসযোগ্য হয়ে ওঠেনি। এখানে পুরুষ-চরিত্রগুলিকে চরিত্র বলে মনে হয় না; মনে হয়, তারা ঐ ধরনের চরিত্রের প্রতিনিধি। এই ব্যাপারটা মেনে নিলে ও আত্মঘাতী যুবকটির বাস্তবতা স্বীকার করে নিলে ছবিটি গ্রহণযোগ্য হয়ে ওঠে। অন্ততপক্ষে একটা মোটামুটি পরিষ্কার ছবি দেখতে পাওয়াও চাট্টিখানি কথা নয়।

গিরিশ কারনাডের চরিত্রটি বেশ সাহ-সের সঙ্গে তুলে ধরা হয়েছে। নপুংসক চরিত্রের অবতারণা ভারতীয় ছবিতে আগে হয়েছে কিনা জানি না। তবে, এখানে চরিত্রটি বিশ্বাসযোগ্য হয়ে উঠেছে।

ছবির টেকনিক্যাল কাজকর্ম বেশ উন্নত মানের। বিশেষ করে ক্যামেরা। বিশেষ করে, অনিতা যখন বিদেশ-ফেরৎ প্রেমিকের দেখা না-পেয়ে এক বান্ধবীর বাড়ি এল সান্ত্বনার জন্য, সেই খানে আলিঙ্গনের দৃশ্যটি বহুদিন মনে থাকবে।

সবচেয়ে প্রধান কথা, ছবিতে কোনো-কিছু নিয়েই খুব-একটা বাড়াবাড়ি নেই।

অনিতার চরিত্রে লক্ষ্মীর অভিনয় খুবই স্বতঃস্ফূর্ত ও যথাযথ। পরীক্ষিৎ সাহনী তাঁর চরিত্রে একটু বেমানান হলে-ও অভিনয় দিয়ে পুষিয়ে দিয়েছেন। আর গিরিশ কারনাডের অভিনয় একটু উঁচুপর্দায় হলো-ও একটা দৃশ্যে তাঁর অভিনয় ভোলা যায় না। যখন দুর্গম হিমালয়ের দিকে তীর্থের জন্য যেতে যেতে অনিতা থেকে পাহাড়, পাথুরে রাস্তায় তার পদশব্দ আর শোনা যায় না, তখন সেই নৈঃশব্দের মাঝে দাঁড়িয়ে গিরিশ কারনাড পেছন ফিরে অনিতাকে একবার দেখল। তারপর একটু হেসে একাই এগোতে শুরু করল। এই দৃশ্যটি গিরিশের অভি-নয়ের জন্যই মনে থাকে।

ছবির গানগুলি শ্রুতিমধুর। আর, ডি, বর্মনের, পরিচালনায় এর থেকে বেশী কিছু আশা করা অন্যায়। তবু অন্যান্য ছবির তুলনায় এখানের মিউজিক বেশ নিচু [illegible]।

জয় মা মঙ্গলচণ্ডী ছবিতে ইন্দ্রজিৎ এবং আঁখি দে

নাটক

কলকাতার হ্যামলেট

সরকারী চাপে বেশ কিছুদিন বন্ধ থাকার পর আবার 'কলকাতার হ্যামলেট'-এর অভিনয় শুরু হয়েছে।

একটা ছোট নাটকের দল, এই কলকাতা শহরে, টিঁকে থাকতে গিয়ে কি অসুবিধায় পড়ছে, নাটকটিতে তাই দেখানো হয়েছে। এবং শুধু তাই নয়, আরো কিছু। নাটকের দলের প্রত্যেক সদস্যই এখানে বেশ সৎ, একমাত্র সদস্যটি ছাড়া। এদের রিহার্সাল রুমে একটি উগ্রপন্থী ছেলে আশ্রয়ের জন্য ঢুকে পড়ে। এদের টাকা পয়সা অভিনয়ের মঞ্চ নেই। এদের বিরুদ্ধে আছে পাড়ার মস্তান, বাড়িওয়ালা। সরকারও এদের বিরুদ্ধে। ঐ উগ্রপন্থী ছেলেটি এঁদের ছেড়ে যাবার সময় যে সাদা গোলাপটি নিয়ে যায়, একটু পরেই তারই রক্তে সেটা ভিজে গেছে। তার আগে ছেলেটির মুখে আমরা শুনেছি, 'প্রেম ফুল খেলবার দিন নয় অদ্য।' এর-পর নানা চরিত্র এসেছে। এবং এসেছেন শতাব্দী অতিক্রমকারী হ্যামলেট। যাকে আমার কলকাতার হ্যামলেট বলে মনে হয়েছে, তিনি নাটকের দলের প্রধান পুরুষ—অভী।

ভারতের সমসাময়িক রাজনীতির [illegible] এই নাটকে আছে। এবং এই সময়টা হলো নকশাল আন্দোলনের দু-তিন বছর ও কংগ্রেসী আমলের পুনরাবির্ভাব। এই

দেখাতে গিয়ে নাট্যকার নিজের নাটকের ওপর সবটা নির্ভর করতে পারেননি। ফিল্মের (মৃণাল সেন) সাহায্যে কলকাতার হাল-হকিকৎ কিছুটা দেখিয়েছেন। এইখানেই নাট্যকারের অক্ষমতার শুরু। তারপর নানা-ভাবে সেটা দেখা গেছে।

যেখানে অভী চিৎকার করতে করতে পৃথিবীর শোষণের বিরুদ্ধে তলোয়ার ঘোরাচ্ছে, সেখানে বাঙালীর কলমপেশা হাত যে স্থির থাকতে পারবে না—এটা জেনেই পরমুহূর্তে অভীর মুখে নাট্যকার হাততালির বিরুদ্ধে কিছু সংলাপ জুগিয়েছেন। 'না না হাততালি নয়। কেন না এটা নাটক নয়....' এধরনের চমক সৃষ্টিকারী সংলাপে হাততালি বাড়ে না কমে? মিনার্ভা থিয়েটারে সেদিন ঐ অভিনেতার গলার সঙ্গে সঙ্গে দর্শকদের হাততালিও জমে উঠেছিল। কবি, ঔপন্যাসিক ও ছোট গল্প লেখক সুবোধ মুখোপাধ্যায়ের বাকভঙ্গিমা, হাঁটাচলা, মাথার পেছনে হাত রাখা সবই বিশেষ একজনের কথা মনে পড়ায়। সে সময় যদি কেউ নাট্যকার সম্পর্কে একটু কৌতূহল হয়ে পড়ে, তাকে কি দোষ দেওয়া যায়? তবে, ঐ চরিত্রটি ভালো ফুটিয়েছেন অলোক বিশ্বাস। এসবের ওপরে আবার নির্দেশ-নির্দেশে বেশ অনেকবার এসে পড়েছেন বাংলাভাষী হ্যামলেট। এবং এটাই দুঃখের যে স্বয়ং হ্যামলেট এসেও নাটকটি বাঁচাতে পারেননি।

নাট্যকারের আর দোষ কী? রবীন্দ্র-নাথের পর বাংলা নাটক যে এক পাও এগোয়নি, তা এখনকার যে কোনো নাটক দেখেই বলা যায়। এবং তারই শিকার হয়েছেন এই নাট্যকারও। গত পাঁচ-সাত বছরে কলকাতায় যত নাটক অভিনীত হয়েছে, তার মধ্যে বেশীর ভাগ নাটকের বিষয়বস্তু একই। এটা কোন কারণে এবং কিসের অভাবে হয়, তা এবার ভেবে দেখা উচিত নয় কি।

অভিনয় প্রসঙ্গে প্রথমে বলতে হয় অসিত বসুর কথা। অভী চরিত্রটির যে গাম্ভীর্য, যে স্থিরতা থাকা দরকার, অসিত বসুর অভিনয়ে তা বারবার নষ্ট হয়েছে। তিনি যে ব্যক্তিগত জীবনে অভিনেতা, তা তিনি মাঝে মাঝেই ভুলতে পারেননি। আবার কখনো বেশ স্বচ্ছন্দে তিনি অভীর ভেতর ঢুকতে পেরেছেন। বিমল দেব এক-কথায় অনবদ্য। তাঁর হাঁটাচলা, পান খাওয়া, বাচনভঙ্গী—এসবই লালমোহন-বাবুর ছাড়া আর কার। তাঁকে মনে না রেখে দর্শকদের উপায় নেই। এছাড়া রাধার ভূমিকায় ভদ্রা বসু চমৎকার অভিনয় করেছেন। তবে, প্রথমদিকে তাঁর অভিনয় একটু নিষ্প্রাণ মনে হচ্ছিল। অন্যান্য চরিত্রে সবাইকেই মোটামুটি মানিয়ে গিয়েছে। আলো (তাপস সেন) ও মঞ্চসজ্জা যথাযথ।

নাটকের শেষের দিকের দু-একটি দৃশ্য বাস্তবিকই ভালো। কিন্তু, সারা নাটকের বিশাল বিশাল ফাঁকগুলো তা দিয়ে ভরানো যায় না। তবু সরকারের হস্তক্ষেপে নাটকটি নিষিদ্ধ হয়েছিল। এবং এটাই মজার।

একরাম আলি

কলকাতায় মার্কিণ নাটক

কলকাতায় তখন অফিস-ফেরতা, পুজোবাজার-চষা শহরবাসীর মানুষের উদ্দীপন ভিড়; বৃষ্টি, কাদা; চৌরঙ্গি এস এন ব্যানার্জির মোড়ে দ্রব্যমূল্য রাখাতে, বেকার-ভাতার দাবিতে সভা, স্লোগান; পেরিয়ে আমি ইউএসআইএস অডিটোরিয়ামে ঢুকে পড়ি। শীতাতপনিয়ন্ত্রিত কক্ষে অমিতাভ রায় আমেরিকার আধুনিক নাটক ও নাট্যকার বিষয়ে কয়েকটি জরুরি ভাববার কথা ধরিয়ে দিচ্ছিলেন। তাঁর আলোচনা রসিক বিদগ্ধের, অথচ প্রাঞ্জল, বিষয়টিকে তিনি তন্ন-তন্ন করে নাড়াচাড়া করেছেন। হালের নাট্যকার, যেমন এডোয়ার্ড আলবি কি তাঁর পরবর্তী আর্থার কোপিটের নাটকে মার্কিন সমাজের সাকসেস মিথ, কি ফাঁপা পারিবারিক সম্পর্কের মুখোশ খুলে দেখানো তিনি যুক্তি ও দৃষ্টান্ত দিয়ে চমৎকার বুঝিয়ে দিলেন। "ভার্জিনিয়া উলফকে ভয় পায় কে?" কি "চিড়িয়াখানা বৃত্তান্ত" কলকাতায়ও সুপরিচিত, ফলে তাঁর উদ্ধৃতিগুলি তাঁর পাণ্ডিত্যকেও সরস রাখে। একালের নাটক আসলে মনস্তত্ত্বহীন, রাশভারি সমাজকে ব্যঙ্গ করে, আকর্ষীন দেয়, ফোলানো-ফাঁপানো ভুল বিলাসের বেলুনে পিন ফোটায়। মানুষকে সামগ্রী হিসেবে দেখা, সামগ্রীর মতোই তাকে দখল কি বিনিময় করার আধুনিক প্রবণতা একালের নাট্যকাররা কীভাবে খুলে দেখান বা তাকে আক্রমণ করেন অমিতাভ রায় সেইদিকে শ্রোতাদের নাট্যভাবনাকে উসকে দিতে পেরেছেন।

শমীক বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিষয় ছিলো কালো মানুষের চেতনা হিসেবে কালো নাটককে দেখা। তিরিশের যুগ থেকেই আমেরিকার নাটকে কালো মানুষের দুধরনের—হয় ভীরু দাস দাসত্বপ্রেমী, নয়তো বর্বর, হিংস্র—চিত্রণ প্রথমেই তিনি প্রায় গণিতশিক্ষকের মতো ব্ল্যাক বোর্ডে এঁকে ফেললেন। নিজে আগাগোড়া ব্ল্যাক বোর্ডে এঁকে প্রসঙ্গটির নানান জটিলতা খুলে দেখান তিনি। প্রয়োজনে, রেভোলিউশনারি থিয়েটার সম্পর্কে পণ্ডিতের পুঁথি থেকেও পড়ে শোনালেন। আমেরিকায় হালের কালো নাটক নিয়ে তিনি খুঁটিয়ে ভেবেছেন, তার নানা প্রবণতা, খুঁটিনাটি ও তার প্রতিপাদ্যকে শ্রোতাদের সামনে সংকলন করে দিয়েছেন। তাঁর আলোচনা যতো বিস্তৃত, তার চেয়ে বেশি গভীর।

দুজন বক্তাই বাঙালি, শ্রোতারাও তাই, আমার কেমন আশা হয়েছিল—উচ্ছেক্ষেতে বেগুন খোঁজার মতো আর কি—বাংলা নাটকের কথাও, তার বন্ধ্যাদশা, দুর্দশা, সেই সঙ্গে কিঞ্চিৎ দুঃসাহসের কথাও মাঝে-মধ্যে উঁকিঝুঁকি মারবে। বুদ্ধদেব বসু, উৎপল দত্ত, মোহিত চট্টোপাধ্যায় কলকাতার সাম্প্রতিক নাট্যপ্রযোজনার ল, সা, গু, এইসব। হঠাৎ ঝকঝকে ঘরে ঢুকে, আমেরিকার সাম্প্রতিক নাটক নিয়ে নিচ্ছিদ্র আলোচনা একটু আকস্মিক লাগে, একটু অপ্রাসঙ্গিক, এই কলকাতায়। অবশ্য নির্দিষ্ট ওই বিষয় নিয়েই আলোচনা। তা-ই হয়েছে। আয়োজন করেছিলেন কলকাতার ইউ এস আই এস, ৫ অকটোবর।

অমরেন্দ্র চক্রবর্তী

বিচিত্রা

অমূল্যধন মুখোপাধ্যায়

বুকে পেসমেকার বসানো। পঁচাত্তর বছর বয়স। টকটকে স্বর্ণ রং। অনেক ছ'ফুটের। চোখে চশমা। ভিড়ের ভেতরেও চেনা যায় ছান্দসিক আচার্য অমূল্যধন মুখোপাধ্যায়কে। হাজরা রোডে ওঁর ফ্ল্যাটের ছোট ঘরখানায় ফুল স্পীডে টেবিল ফ্যান চলছিল। বাইরের বৃষ্টি মাসের রোদের দিকে চেয়ে বললেন, 'রংপুর কলেজে আমার শৈশবের শিক্ষক রবীন্দ্রনাথের প্রথম যুগের শিষ্য গৌরগোবিন্দ গুপ্তের প্রেরণাতেই ছন্দ নিয়ে লেখার সূত্রপাত। সেটা উনিশশো আঠার। বলাকার ছন্দ নিয়ে কথা হতেই গৌরবাবু বললেন, বেশ ত লেখো না। শুধু বলাকা নয়, বাংলা সংস্কৃত কবিতার ছন্দ নিয়ে লেখালেখি করছি তখন।

'আপনার পি আর এস গবেষণার খাতাটা ত ইংরেজিতে?'

'হ্যাঁ, সে অনেক ইতিহাস।'

বলে আবার শুরু করলেন, হ্যাঁ। উনিশশো উনত্রিশ একত্রিশে ডিসেম্বর, বেশ মনে আছে। গৌরবাবু বললেন, কই হে অমূল্য কি করলে? সেই রাত্রেই লিখতে বসলাম। মাসছয়েকের মধ্যে থিসিস শেষ। অধ্যাপক মণীন্দ্র রুদ্র। আজ আর নেই। ওই টাইপ করে দিলে। স্টাডিজ ইন বেঙ্গলি প্রোসোডি। ভল্যুম ওয়ান। প্রিন্সিপ্লস্। তখন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলাভাষা সাহিত্যের বিভাগীয় প্রধান ছিলেন আচার্য দীনেশচন্দ্র সেন। সুনীতিবাবু ছিলেন একজন পরীক্ষক। উনিই পড়ে খুব অবাক হয়ে নিয়ে গেলেন শান্তিনিকেতনে রবীন্দ্রনাথের কাছে। তখন কবির ৭০ বছর পূর্তি উৎসব চলছে। সঙ্গে গেলেন রতীন হালদার আর কালিদাস নাগ। তিনদিন ছিলাম। রোজ দু'বেলা আলোচনা হত। বললাম, আপনি কবি, স্রষ্টা, আমি ছান্দসিক। কবি স্মিত হেসে বললেন, আমি যা পারিনি, বৈজ্ঞানিকভাবে তুমি তা করেছ। [illegible] থেকে কবি পড়তে লাগলেন। [illegible] যেভাবে স্ক্যান করেছিলাম, প্রশান্ত মহলানবীশ মিলিয়ে পড়ে বললেন, হ্যাঁ ঠিকই আছে। ধূর্জটিপ্রসাদও এক সময় দিলীপ রায়কে চিঠিতে জানান, আমার ছন্দোসূত্রই ঠিক।

'আচ্ছা স্যার, বাংলা ছন্দের মূল কথাটা কি?'

'বাংলা ছন্দ সাংগীতিক, মিউজিকাল। কবিতার লাইনকে পর্বে ভাগ করা হয়। পর্ব-পর্বাঙ্গের গোড়ার কথাটা ত আমার 'বাংলা ছন্দের মূল সূত্র' বইতে পড়েছ। কি জানো, হয়ত আমার মত অনেকে মানবেন না, কিন্তু বাংলা সংস্কৃত ছন্দ নিয়ে গবেষণা করতে করতে আমি যেভাবে এর বৈজ্ঞানিক দিকগুলি তুলে ধরেছি বলতে পারি, মহর্ষি পিঙ্গলও আমার মত করে সংস্কৃত কবিতার ছন্দকে বোঝেননি। ছন্দবোধ দার্শনিক ব্যাপার নয়—বৈজ্ঞানিক, এ বোঝবার মত ক'জন আছেন?'

রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে ছন্দ নিয়ে আপনার মতভেদ হয়নি?'

'হ্যাঁ, ৯ মাত্রার ছন্দ নিয়ে হয়েছিল—সেসব প্রসঙ্গ আমার বাংলা ছন্দ বইতে আছে। কবি শেষকালে আমার মত মেনে নিয়েছিলেন।'

'আপনার অন্যান্য সাহিত্যকর্ম নিয়ে কিছু বলুন?'

'অনেক লিখেছি। প্রবন্ধ পাঠ করেছি। বাংলা সাহিত্যে অবদান আমার কতটুকু জানি না, তবে এর জন্য বিশ্ববিদ্যালয় আমায় সরোজিনী মেডেল দিয়েছেন। আমার স্নেহভাজন আশুতোষ কলেজের বাংলার তিন অধ্যাপক আজ আর নেই। অনিল-অমিয়-বিভাস আমার লেখার খুব ভক্ত ছিল, এখানে ওখানে প্রকাশ করত। 'কবিগুরু' বইখানার খুব সমাদর করত অমিয়রতন। 'আধুনিক সাহিত্য জিজ্ঞাসা' পড়েছ ত?

'হ্যাঁ। সাহিত্যে রূপক ও প্রতীক, দ্বিজেন্দ্রলালের হাসির গান, রবীন্দ্র-সমস্যা তিনজন রবীন্দ্রনাথ, এসব লেখাগুলো আমাদের বেশ ভাল লেগেছে।' হেসে বললেন, হ্যাঁ, রবীন্দ্র-সমস্যা, তিনজন 'রবীন্দ্রনাথ সুকুমার সেনের খুব ভাল লেগেছিল। রামকৃষ্ণ মিশন ইনস্টিটিউট অব কালচারে গিরিশ ঘোষের নাটকের ওপর প্রবন্ধ শুনে শ্রীসুকুমারবাবু, বলেছিলেন, নাটক সম্পর্কে এযাবৎ এরকম আলোচনা বেরোয়নি।

'আচ্ছা স্যার, রূপক ও প্রতীক কি এক জিনিস?'

'না। ইংরেজিতে মেটাফর এলিগরি সিম্বলের ধারণা যেমন স্বচ্ছ, বাংলা সমালোচনায় রূপক সাংকেতিক প্রতীক ইত্যাদির ধারণা এখনও বেশ ধোঁয়াটে মনে হয়, আমি সেটা স্পষ্ট করার চেষ্টা করেছি।'

'এখন কি পড়ছেন, বা লিখছেন?'

'ভাল বই পেলেই পড়ি। একটু-আধটু লিখিও। প্রভাতকুমারের গল্প খুব ভাল লাগে। প্রভাত মুখোপাধ্যায়ের এক-একটা গল্প এমন বাস্তব জীবনধর্মী অথচ বাংলা সাহিত্যে প্রভাতবাবু কিছুটা অবহেলিত।'

'কলেজে বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াতে পড়াতে আপনার ক্লান্তি বা বিরক্তি আসেনি?'

'না। সাময়িকভাবে এক-আধদিন হয়ত—সে আলাদা, কত ছেলেমেয়ে আমার কাছে গবেষণা করেছে। থিসিসের পরীক্ষক হয়েছি। ভাল কাজ এখনও হচ্ছে। আশুতোষ কলেজে '৬৫ সাল পর্যন্ত। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে দশ বছর পার্ট-টাইম। তারপর যাদবপুরে বছর কয়েক ইউ-জি-সির অধ্যাপক তবে যাদবপুরে বড় ক্যাশেও পাঠাত, একটু কষ্ট হত তখন। উনিশশো একাত্তরে হার্ট এ্যাটাক হল, এখন ভাল আছি'

'এতবড় অসুখের পরও সংস্কৃত ছন্দ নিয়ে ইংরেজি বই লিখলেন?'

'ওসব ঈশ্বরের আশীর্বাদ। মজার ব্যাপার তবে বলি শোনো। এশিয়াটিক সোসাইটিতে সংস্কৃত ছন্দের ওপর একটি ইংরেজি প্রবন্ধ পড়ে সিঁড়ি দিয়ে নামছি। সুনীতিবাবু আলাপ করিয়ে দিলেন। ফিলাডেলফিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাচ্য বিদ্যাভবনের চেয়ারম্যান প্রোঃ লুডো রোশার। করমর্দন করে বললেন, 'অসমমাত্রিক সংস্কৃত ছন্দের বিষয়ে আপনার প্রবন্ধ খুব ভাল লাগল। অনেক কিছু শিখলুম।' —পরে অধ্যাপক মুখোপাধ্যায়কে রোশার এক চিঠিতে লিখেছিলেন, সংস্কৃত ছন্দের জ্ঞান আমাদের সীমিত। এশিয়াটিক সোসাইটিতে আপনার বক্তৃতা আমার

মনে আছে। আপনার মত গভীর অধ্যয়নের ফলে আপনার পদ্ধতি ও আবিষ্কার অনুসরণ করে এটি বুঝবার সুযোগ পাব।'

বৈজ্ঞানিক। কাব্যপাঠক সাহিত্য ছাত্র হিসাবে আমরা তাঁর রাস্তা ধরেই বাংলা কবিতার ছন্দকে পর্বমাত্রা উচ্চারণ রীতির বৈজ্ঞানিক নিয়ম অনুসারে চিনতে ও পড়তে শিখেছি। কেরিয়রের জন্য ছুটোছুটি করেননি অমূল্যধন মুখোপাধ্যায়। পড়াশুনো গবেষণা সক্রিয় সৃজনশীল সাহিত্য-চিন্তা। বললেন, 'যখন বেশ অসুস্থ তখনও তারাশংকরের ওপর একটা লেখা ডিকটেট করেছি, অনুপ লিখে নিয়েছে।' অক্লান্ত শিক্ষাব্রতী ছান্দসিক সাহিত্য-রসিক অমূল্যধনের স্বাস্থ্য ও শতায়ু কামনা করে প্রণাম সেরে বেরিয়ে এলাম।

কৃষ্ণলাল মুখোপাধ্যায়

নীলাম

আজকেও সুমনস্ এক্সচেঞ্জ বন্ধ ছিল। ঘুরতে ঘুরতে ঢুকে পড়লাম র‍্যাসেল এক্সচেঞ্জে। মাইকে নীলামদারের গলায় তখন, 'চারখানা গ্রামোফোন রেকর্ড, বেঙ্গলি। সাত টাকা, সাত।' গিয়ে দেখি, অনেকেই ঝুঁকে রেকর্ডগুলো দেখছেন। প্রথমটাতে ক্ষুদে ও বিবর্ণ অক্ষরে লেখা আছে 'ঘুম ভুলেছি নিঝুম এ নিশীথে।' শচীনদেবের দোলায়িত কণ্ঠস্বর মনে পড়ে গেল। বাকি তিনটি অজয় ভট্টাচার্যের—যিনি একসময় বেশ জনপ্রিয় ছিলেন। মাত্র দশ টাকায় এক তরুণ কিনে নিলেন রেকর্ড চারটি। এখানে আর নীলাম হল একটা টাইম-পিস একত্রিশ টাকায়, প্রজাপতি বসানো দেওয়ালঘড়ি উনপঞ্চাশ টাকায় ও একটি এভারেডি দু-সেল টর্চ সাত টাকায়। মাইকে যখন নীলামদার হাঁকছেন, 'এ ফ্যান্সি ডল, টোয়েন্টি রুপিজ', তখন বেরিয়ে এলাম।

আজ সবচেয়ে চড়া বাজার ছিল ডালহৌসি এক্সচেঞ্জের। দুটো মার্কিন-দেশীয় ঢাকনা-দেওয়া ডিশ যখন নীলামে উঠেছে, তখন এখানে এলাম। একশো থেকে ডাক শুরু হল। শেষ হল দুশো তিরিশে। কিনলেন এক বাঙালী ডাক্তার। হাওয়া অত্যন্ত গরম দেখে টুক্ করে কেটে পড়লাম একসময়। তবে, তিন-দুটো ছিল খাঁটি বিলিতি তৈরি।

ম্যাডার্ন এক্সচেঞ্জে ঢুকেই মনটা খারাপ হয়ে গেল। চমৎকার, প্রায়-ফুরফুরে একটা ব্যাগকোট, সম্ভবতঃ বিদেশী, টেবিলে পড়ে ঝুলছে প্রত্যেকেরই এরকম হতে পারে। এতো ভালো কম্বল সচরাচর দেখা যায় না। কিছুক্ষণ পরই ওটা নীলামে উঠল। দাম উঠতে উঠতে মাত্র দুশো টাকায় ওটা বিক্রি হয়ে গেল। জানা গেল, ওটা বিদেশীই। যিনি নিলেন, তাঁর ঠোঁটে সিগারেটের উত্তেজনাটুকু বেশ কিছুক্ষণ লেগে ছিল। এরপর যা হল, তা অভাবনীয়। কোত্থেকে একটা ব্যাগ নিয়ে এসে রাখলেন নীলাম-দার। বিস্কুট রঙের ঐ ব্যাগ কাঁধে সাধারণতঃ ক্যালিফোর্ণিয়ার লোকেরা ঘোরাঘুরি করে। এখানে এল কি করে? সকলে প্রায় হুমড়ি খেয়ে পড়লেন। ব্যাগটা হেসেখেলে মাত্র পঞ্চাশ টাকায় বিক্রি হয়ে গেল। তিনি নিলেন, ভিড়ে তাঁর মুখটা দেখা গেল না।

চৌরঙ্গী সেলস্ ব্যুরোতে, দেখি, একটা ছবি নীলামে উঠেছে। বড়সড় একটা পেইন্টিং। তুষার-ঢাকা বিদেশী গ্রাম। কাছে গিয়ে দেখি, এককোণে ইংরেজিতে লেখা আছে 'অশোক'। আশ্চর্য, ছবিটা চল্লিশ টাকায় নিলেন এক অবাঙালী ভদ্রলোক। নীলামের বাজারে অবশ্য মাঝে মাঝে ছবি আসতে দেখা যায়। সবই সস্তা ধরনের। তবে, দু-টা আছে। আমাদের কলকাতার পেইন্টাররা কিন্তু এ-ব্যাপারটা ভেবে দেখতে পারেন। ছবি এখানে পড়ে থাকে না। ত্রিশ, চল্লিশ টাকায় হেসে-খেলে বিক্রি হয়। যদি সত্যিই ভালো ছবি বাজারে আসে, তাহলে বেশি দাম উঠতেও পারে। কে বলবে, এখানেই ছবির বাজার গড়ে উঠবে না?

এনাম আলি

রান্না

ডালিয়ার মোহনভোগ আর পুডিং

ডালিয়া ঘরে জমে গেছে এক গাদা। ডালিয়ার ভাত খিচুড়ী, পোলাও খেয়ে কতদিন আর ভালো লাগে। সেদিন মণি-বৌদিকে বললাম, ডালিয়ার মোহনভোগ, পুডিং কী সব বলছিলে। তুমি থাকতে থাকতে করে দিয়ে যাও—খেয়ে দেখি। মণিবৌদি সেলাই করছিলেন মুখ না তুলেই বললেন, সে অনেক খরচ তোর সাধ্যির মধ্যে হবে না। বললাম, আহা এতে সাধ্যির কি আছে কোনটা বাকী রেখেছি বল, খাওনি কিছু? কিছু আটকেছে? খাবো না কেন। আটকাবে কী। তোর তো লেখার দরকার লিখে নে। সময় মত করে খাওয়াবো—আমাকে লোভ দেখাস নে। লোভ তোমাকে দেখিয়েছি বল। তুমি শুধু শুধু রাগ করছো। রাগ করবো কেন—বলছি লিখে নে—মোহনভোগ। ডালিয়া ঘণ্টা পাঁচ-ছয় ভিজিয়ে রেখে সিদ্ধ করবি। একটু নরম হলে জল শুকিয়ে ঢাকা দিয়ে রেখে দিবি। সেদ্ধ করার পর যতটা ডালিয়া হবে ঠিক সেই পরিমাণ সুজি ঘিতে লাল করে ভাজবি। সমান সমানও ভাজতে পারিস। সুজি ভাজা হয়ে গেলে ওর মধ্যে ডালিয়া দিয়ে আবার ভাজবি। একটু সুখ দরকার হবে। দুধে পরিমাণমত জল মিলিয়ে চিনি মিলিয়ে ওই ভাজার মধ্যে ঢেলে দিবি। কিছু কিসমিস দিবি। নাড়তে থাকবি। নেড়েচেড়ে শুকিয়ে গেলে একটু কাপে দিয়ে খেতে দিবি। খুব ভালো লাগবে খেতে। হজম হবে ভালো পুষ্টিকরও খুব।

এবার লিখে নে—ডালিয়ার পুডিং।

এই একই রকম ভিজিয়ে রাখবি সিদ্ধ করবি শুকিয়ে নিবি। তারপর ঠাণ্ডা ঘন দুধে বা কাঁচা দুধে আধ কাপ পরিমাণ ডালিয়া ফেলবি। পরিমাণ মত চিনি দিবি। ওর ভেতর হাঁসের ডিম ফাটিয়ে ফেলবি। তারপর ফেঁটে নিবি। তারপর ওটাকে বন্ধ একটা বাটিতে রেখে দিবি। রান্না হয়ে যাওয়ার পর উনুনের জ্বলন্ত কয়লা ফেলে দিয়ে সেই গরম উনুনে বন্ধ বাটিটা বসিয়ে দিয়ে চট দিয়ে ঢেকে দিবি। যখন ওটা ঠাণ্ডা হয়ে যাবে, ওখান থেকে বার করে দেখবি পুডিং হয়ে গেছে। এখানে আরো কতগুলো ব্যাপার আছে যেমন ধর, বন্ধ বাটিটা ফুটন্ত জলে বসিয়ে রাখলেও পুডিং জমে যায়। লক্ষ রাখতে হবে যাতে ভেতরে জল না ঢুকতে পারে। দুধের বদলে গুঁড়ো দুধ দিয়ে করতে পারিস। চিনির বদলে স্যাকারিণ দিয়েও এই পুডিং করতে পারিস। রোগীভোগী সবাই খেতে পারবে।

আত্রেয়ী সেনগুপ্তা

কেন এই পুরস্কার

প্রায় এক মাসের মধ্যে বঙ্গীয় চলচ্চিত্র পুরস্কার সমিতি ও চিত্রজগৎ নামে দুই সংস্থা রবীন্দ্র সদনে সিনেমা, যাত্রা, পেশাদারী মঞ্চ ইত্যাদির ওপর পুরস্কার বিতরণ করলেন। এই দুই সংস্থার নির্বাচনে এমন অনেক গোলমেলে ব্যাপার আছে যা নির্বাচকদের যোগ্যতাও রুচি সম্পর্কে প্রশ্ন আনে। আমরা কিন্তু এই বিতর্কে যাচ্ছি না। আমাদের কথা এই যে এই সব পুরস্কারে চলচ্চিত্রের কতটা কি লাভ হয়! রবীন্দ্র সদন ভাড়া করে ধারাবাহিক বক্তৃতা অটোগ্রাফ নেওয়ার জন্য বীভৎস ছোটাছুটি, সিটি সহযোগে হাততালি, ঝলমেলে শাড়ির এলাহিবিন্যাস, মানপত্র ইত্যাদির মধ্যে চলচ্চিত্রের কোন ভাল ব্যাপারটা থাকে?

কলকাতায় সারা বছরে একটা কি দুটো দেখার মতো ছবি হয়, ছবির সংখ্যা পর পর কমছে, প্রায় ছবি ফ্লপ করছে, টেকনিশিয়ানরা খেতে পাচ্ছে না, স্টুডিও-গুলো উঠে যাওয়ার অবস্থায়, মৌলিক বাংলা নাটক পাওয়া যাচ্ছে না, থিয়েটার হলের অভাব মাথার মুষ্টিমেয় কয়েকজনের হাতে টাকা জমছে ও সংখ্যাগরিষ্ঠ শ্রেণী ভুখা থাকছে...এই সব যে নানা সমস্যা—তার দিকে আগে লক্ষ্য দেওয়া উচিত নয় কি?

আমি কঙ্কাবর্তী বলছি

হোক তা ব্যাঙ, ব্যাঙের শরীর, কিম্বা শুকনো কাঠের টুকরো—প্রকৃতিতে এমন কিছু নেই যা দৃশ্যত অসুন্দর, এই সত্য গভীরভাবে বিশ্বাস করি। তাই চাই স্বচ্ছ, সুন্দর দৃষ্টি, যাতে জীবন ও প্রকৃতিতে যথার্থ আবেগের সঙ্গে পান করতে পারি। যাঁর চোখে প্রাণের স্পন্দন, তিনিই তো প্রকৃত সুনয়না, সুন্দরীতমা তিনিই। সৌন্দর্য প্রসঙ্গে এবার তাই চক্ষু-চর্চা বিষয়ক আলোচনা করবো।

মাথাধরা যে চোখ খারাপের লক্ষণ, এ-কথা আমরা সকলেই মানি। কিন্তু বিখ্যাত মার্কিন ডাক্তার শ্রীহ্যারল্ড পেপার্ড ভাবেন অন্যরকম। তাঁর বিশ্বাস, চোখের সঙ্গে মাথাধরার সম্পর্ক সামান্যই। একুশ রকম শারীরিক দুর্বলতা রয়েছে, যার কারণে মাথা ধরতে পারে। চোখের দুর্বলতা তার মধ্যে একটি মাত্র। এই একুশটি দুর্বলতার কোনটি যে আপনার মাথা ধরার কারণ, তা আন্দাজ করা খুবই কঠিন। এমনকি দক্ষতম ডাক্তারের পক্ষেও। সময়সাপেক্ষ, বুদ্ধি, শ্রম ও মনোযোগ সাপেক্ষ কাজ এটি। দুর্ভাগ্যের কথা যে বেশির ভাগ ডাক্তারই মাথা-ধরার আসল কারণ অনুসন্ধান করার পরিশ্রমটি বাঁচিয়ে ছেলে-মেয়েদের চশমা পরীক্ষা করে দেখতে বলেন। এই পরামর্শে সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত হয় শিশুরা। কারণ, বলা বাহুল্য, চশমা হলো চোখ এবং দৃষ্টি-শক্তির স্বাভাবিক বাড়ের প্রতিবন্ধক।

অসুস্থ চোখ নিশ্চয়ই মাথাধরার কারণ হতে পারে, তবে সর্বক্ষেত্রে নয়। অথচ মাথা ধরলেই আমরা অন্ধভাবে চোখকে দোষী সাব্যস্ত করি। যাঁরা চশমা পরেন, তাঁদেরও ঘন ঘন মাথা ধরে। চশমা নেওয়া সত্ত্বেও ব্যাগে, পকেটে অ্যানাসিন বড়ি মজুত রাখতে হয় অনেককেই, এ-কথা কিন্তু আমাদের নজর এড়িয়ে যায়।

চশমা নেবার আগে দু'বার ভাবুন, বলেন ডাক্তার পেপার্ড। নিম্নে বর্ণিত প্রক্রিয়াগুলি অভ্যাস করলে অবশ্যই উপকৃত হবেন।

(১) পাঁচ থেকে দশ ফিট দূরত্বে 'ক-খ-গ' লেখা শক্ত কাগজ দাঁড় করিয়ে রাখুন। এই কাগজটিতে লেখা থাকবে, বর্ণমালা, নম্বর, টুকিটাকি শব্দ ইত্যাদি। একটি করে অক্ষর পড়ুন ও চোখের পলক ফেলুন। এটা অন্তত পাঁচ মিনিট ধরে করতে হবে। তারপর ডান চোখ বন্ধ করে (হাত দিয়েই এমনভাবে চোখটি বন্ধ করতে হবে যাতে হাত চোখকে একটুও স্পর্শ না করে।) কার্ডটি পড়ুন। এবারে বাঁ চোখ বন্ধ করে ডান চোখ ব্যবহার করুন।

(২) দাঁড়িয়ে কার্ডটি পড়তে পড়তে ধীরে ও মসৃণভাবে প্রথমে ডানদিকে ও পরে বাঁ দিকে হেলুন। প্রতি অক্ষরের পর মুহূর্তের জন্য চোখ বন্ধ করতে হবে।

(৩) পা দু'টি ছ' ইঞ্চি দূরত্বে ফাঁক করে দাঁড়ান। এইভাবে দাঁড়িয়ে শরীর ডানদিকে ঘোরান। সেই সঙ্গে বাঁ পায়ের আঙুলের উপর বা গোড়ালি ভর করে তুলুন। ঘোরার সময় হাত, পা ও দৃষ্টি যেন হয় সাবলীল ও অনাড়ষ্ট। একটুও শক্ত হলে কিন্তু চলবে না। ঘোরার সময় ঘরে কোনো একটি জিনিসের প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ না রেখে, দৃষ্টি ছড়িয়ে দিন এইভাবে এক মিনিটে ষোলোবার ঘুরতে পারলে সবচেয়ে উপকৃত হবেন।

এবার চোখের প্রসাধন বিষয়ে দু'-একটি কথা :—

১। মুখের যে অংশটি সবচেয়ে দৃষ্টি আকর্ষণ করে, তা হলো চোখ।

২। ঠোঁটে-গালে রঙ মাখলে অনেক সময় উগ্র দেখায়। কিন্তু চোখ হলো মুখের একমাত্র অঙ্গ যার সৌন্দর্য প্রসাধনে সত্যিই খোলে। মনোযোগ দিয়ে লক্ষ্য করুন, কি আপনার চোখের আকার। ছোটো, বড়, কিম্বা মোটামুটি, আপনার চোখ দু'টি যেমনই হোক, বুদ্ধি ও নৈপুণ্যের সঙ্গে প্রয়োগ করলে প্রসাধন সব ত্রুটি ঢেকে দিতে পারে।

৩। চোখের নিচে তেলতেলে ভাবটা লুকোবার জন্য প্রসাধন করবার আগে শুধু চোখ দু'টি পাউডার দিয়ে মুছে নিন। সামান্য একটু পাউডার চোখের ঠিক নিচটায় মসৃণভাবে বুলিয়ে নিলে ভালো হয়।

৪। চোখের জন্য অপরিহার্য প্রসাধন-সামগ্রী হিসেবে সবসময়ে রাখতে হবে : কাজল, ভ্রূ আঁকবার পেন্সিল, চোখের পাতায় ছোঁয়াবার জন্য 'আইশেড' নামক রঙ (ল্যাকমের) চোখের জন্য বিশেষভাবে তৈরি দুটি তুলি (ল্যাকমে কিম্বা ম্যাকস ফ্যাক্টর কোম্পানীর) এবং এক শিশি কালো 'আইলাইনার' (ল্যাকমে ইত্যাদির)। কলকাতা শহরের যে-কোনো ভালো মনিহারী দোকানে এই ক'টি জিনিস পাবেন। মোট খরচ পড়বে সাড়ে উনিশ টাকা।

শহরের মেয়েরা আজকাল কাজল পরে না। পরিবর্তে ব্যবহার করেন 'আইলাইনার' চোখের জন্য বিশেষভাবে তৈরি এই তরল কালি আজকাল সর্বত্র পাওয়া যায়। অসংখ্য প্রসাধন ব্যবসায়ী নানান রকম শিশি-বোতলে এই দ্রব্য বাজারে ছেড়েছেন। কিন্তু, বলা বাহুল্য, সবগুলির উৎকর্ষ একরকম নয়। অতি আধুনিকা, সুরুচিসম্পন্না ও প্রসাধনে দক্ষ কয়েকজন মহিলাকে জিজ্ঞেস করে জানলাম যে, ল্যাকমে কোম্পানীর আইলাইনারই হলো সবচেয়ে ব্যবহারযোগ্য। আরও দু'-একটি ভালো আইলাইনার বাজারে পাওয়া যায়, পরীক্ষা করে দেখতে পারেন কোনটি আপনার পক্ষে সবচেয়ে সুবিধেজনক।

মাঝারি আকারের চোখ প্রসাধনের পক্ষে আদর্শ। বেশি বড় কিম্বা ছোটো চোখে উগ্র প্রসাধন না করাটাই ভালো। কি রকম প্রসাধন আপনার চোখে মানাবে, সেটা ভেবে দেখুন।

শুরু করতে হবে চোখের পাতা দিয়ে। সন্ধ্যাবেলা, বিশেষ করে শীতের সন্ধ্যা কিম্বা পড়ন্ত দুপুরে যদি হয়, 'আই-শ্যাডোর' সাহায্যে চোখের পাতায় হাল্কা সবুজ রঙের আভা ছোঁওয়াতে পারেন। বোঝা গিয়েও বোঝা যায় না, এমনি ফিকে হতে হবে এই আভা। তাই রঙ, হাল্কা নীল কিম্বা সোনালী, কোন রঙের আভা চোখে ছোঁওয়াবেন তা শাড়ি-জামার সঙ্গে মিলিয়ে বাছুন।

এবার আপনাকে আঁকতে হবে দুটি সূক্ষ্ম কালো রেখা। একটি চোখের নিচের পাতায়, ও একটি উপরে। এই দুটি সরু কালো রেখায় ঘেরা থাকবে আপনার চোখ দুটি। আইলাইনারের তুলি ডুবিয়ে রেখা দুটি খুব সরু ও সূক্ষ্ম করে টানতে হবে। এতো সূক্ষ্ম যে, দেখে মনে হবে কাজল। চোখের এক কোণা থেকে অন্য কোণ পর্যন্ত চোখের পলকগুলির একদম গায়ে গায়ে রেখাটি টানুন।

নিচের পাতায় তুলি টানতে প্রথম প্রথম অসুবিধে হবে। হাত কেঁপে যাবে, তুলিটি এবড়ো-খেবড়োভাবে এগুতে গিয়ে ঢুকে যাবে চোখের মধ্যে। এতে কিন্তু ঘাবড়াবেন না। হাতকে অভ্যস্ত হবার জন্য একটু সময় দিতে হবে তো।

এবারে চোখের দুই পাশে টানতে হবে ছোটো দুটি রেখা। এই রেখা দুটি কেমন করে টানলেন তার উপরই নির্ভর করছে আপনার চক্ষুসজ্জার বাহার। সুতরাং সবচেয়ে ভালো হয় যদি নিজে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে দেখতে পারেন কোনরকম চোখ আপনার সবচেয়ে পছন্দসই।

আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিঃ-এর পক্ষে শ্রীসুপ্রিয় সরকার কর্তৃক পত্রিকা প্রেস ১৪, আনন্দ চ্যাটার্জি লেন, কলিকাতা-৩ হইতে মুদ্রিত ও তৎকর্তৃক ১১।১, আনন্দ চ্যাটার্জি লেন কলিকাতা-৩ হইতে প্রকাশিত।
ইণ্ডিয়ান অ্যাণ্ড ইস্টার্ণ নিউজ পেপার সোসাইটির সদস্য।
মূল্য ৭৫ পয়সা ॥ ত্রিপুরায় অতিরিক্ত বিমান মাশুল ১৫ পয়সা। অন্যত্র অতিরিক্ত বিমান মাশুল ২০ পয়সা।

অমৃত
১৭ বর্ষ
২৯ সংখ্যা
১৬ অগ্রহায়ণ
১৩৮৪
2nd DEC. 1977

আগামী সংখ্যায়

জনরুচি ও সিনেমার পোস্টার

সিনেমার মতো সিনেমার পোস্টারও সেন্সার করা হবে শোনা যাচ্ছে। উদ্দেশ্য, অপরুচির অপসারণ।

একথা অবিশ্যি স্বীকার করতেই হবে, কোনো কোনো সিনেমার পোস্টারে যেসব বেশভূষা ও দেহভঙ্গি অংকিত হয় তা সুরুচিসঙ্গত নয়। এটাও ঠিক যে, পোস্টারে অংকিত ঐসব ছবি অনেক সময়ই হয়ে থাকে আসল সিনেমাটির বাইরের ব্যাপার। সম্ভবত সেন্সারের আশংকায় এই সব দৃশ্য সিনেমায় স্থান দেওয়া হয়নি। অথবা এমনও হতে পারে, দৃশ্যগুলি তোলার পর সেন্সারের ফলেই সেগুলো বাদ গেছে। কিন্তু বক্স অফিসের মুখ চেয়ে সেগুলো পোস্টারে ঠাঁই দিতে হয়েছে।

বিষয়টি অবৈধ তো বটেই, অনৈতিকও। কাজেই কুরুচিকর পোস্টারের প্রদর্শন বন্ধ করার ব্যবস্থাকে সুপ্রয়াসই বলতে হবে। কিন্তু,—

হ্যাঁ, 'কিন্তু' একটি থেকেই যাচ্ছে। সিনেমার পোস্টারে অর্ধনগ্ন বেশভূষা এবং কুৎসিত দেহভঙ্গি দেখলে জনরুচি বিকৃত হতে পারে ঠিকই, কিন্তু রুচিবিকারের কারণ কি ঐ একটিই?

গণতন্ত্রে নাগরিকের অনেক রকম অধিকার থাকে। তার মধ্যে ব্যক্তিগত স্বাধীনতা, মতপ্রকাশের স্বাধীনতা, ইত্যাদি যেমন রয়েছে তেমনি রয়েছে—চিত্তবিনোদনের অধিকার। আমাদের দেশে দ্রুত শিল্পোন্নয়নের ফলে শেষোক্ত ঐ অধিকারটির দাবি আরো প্রবল হয়ে উঠছে। অন্যদিকে রয়েছে পর্বতপ্রমাণ অশিক্ষা—দেশের শতকরা সত্তর ভাগ মানুষই তার শিকার। এই পরিস্থিতিতে সুস্থ রুচি টিঁকিয়ে রাখা খুবই শক্ত; বিকৃত রুচিকে সরিয়ে নতুন করে সুরুচি তৈরি করা আরো কঠিন।

সমস্যাটি জটিল তাতে সন্দেহ নেই। সমাধানের পদ্ধতিও সময়সাপেক্ষ হতে বাধ্য।

সুনীল দাশ

প্রচ্ছদের নেপথ্যে : ১৯৩৯ সালে কলকাতায় সুনীল দাশের জন্ম। ফরাসী সরকারের বৃত্তি নিয়ে একল ন্যাশন্যালে সুপিরিয়োরে দ্য বো আর্টস-এ ফাইন আর্টস এবং ফ্রেসকো শিক্ষা করেন ১৯৬১ সাল থেকে ১৯৬৩ সাল পর্যন্ত। এটালিয়ার ১৭-এ গ্রাফিক আর্টস শেখেন। ১৯৬৩তেই প্যারিসের সোসাইটি দেস্ আমিস দ্য মিউজে ন্যাশন্যাল দ্য মডার্ণ-এর সদস্য হন। ১৯৬০ সাল থেকে কলকাতার 'সোসাইটি অফ কনটেমপরারি আর্টিস্টস'এর প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক।

বলসয় থিয়েটারের মঞ্চে দু'শোর ওপর নাচিয়ে গাইয়ের ভেতর দিয়ে দু'জন অশ্বারোহী টগবগ করে ঘোড়া ছোটাতে পারে। জল-দৃশ্য দেখতে দু হাজারের ওপর দর্শকের [illegible]।

[illegible]-তুলনায় রবীন্দ্র সদনের মঞ্চে জায়গা অনেক কম। ২৮ নবেম্বর বলসয় ব্যালের [illegible] শো শুরু হওয়ার মাত্র ঘণ্টাখানেক আগে রবীন্দ্রসদনে দু'পংক্তি আসনের প্রবেশপত্র পেয়ে ছুটে গিয়েছিলাম।

এমনই নাচ—যার জন্যে ব্রিগেড মাঠে শুধু আর আলোর ব্যবস্থা থাকলে—শব্দ প্রক্ষেপের আয়োজন থাকলে পেলের মতো ভিড়ের সমান ভিড় হতে পারতো।

একফোঁটা আসনে পা ফেলার জায়গা ছিল না। মুখ্যসচিব শ্রীযুক্ত সেন আর সংস্কৃতি মন্ত্রী শ্রীভট্টাচার্য ঠাসাঠাসি করে বসেছেন।

ওদের ভাষা বুঝি না। বাজনা বুঝি না। নাচের তাল অন্যরকম। মাইকে নাচিয়ে বাজিয়েদের নাম বলা হচ্ছিল। বাঙালীর কানে সেসব নাম মনে রাখা কঠিন। সে চেষ্টাও এ-লেখায় করছি না। কিন্তু শরীরের ভঙ্গিমা, পিয়ানোর ঝংকার, বেহালায় [illegible] ছড়ের টান—পটভূমি কুয়াশাচ্ছন্ন নদী নিশীথ—হাজার দেড়েক বাঙালী দর্শককে অন্য জগতে নিয়ে গিয়েছিল। রুশী উপন্যাস বহুকাল হোল বাঙালী মননকে স্পর্শ করেছে। এবারে তাঁদের ধ্রুপদী নাচ, রূপকথার সারল্য, সেই বিশাল দেশের প্রাণের লাবণ্য আমাদের মনে স্থায়ী আসন পেল। কোন খোলা মাঠে অনেক বেশি মানুষকে বেশ কয়েকদিন ধরে এ-জিনিস দেখতে দিলে আমরা ওঁদের আরও বেশি করে অভিনন্দন জানাতে পারতাম। এত বাঙালীর প্রশংসায় ওঁরা নাচের ভেতর আরও বেশি অর্থ পেতেন। অবশ্য দুনিয়া জুড়েই ওঁরা অভিনন্দিত।

অনভ্যস্ত চোখে প্রথমেই মনে হবে—ডাল ছাড়ানো মুর্গি। তারপর সাদা ক্যানভাস নেটের পোশাক, ক্ষীণকটি, পায়ের আঙুলের ডগায় হাঁটাচলা দেখে মনে হবে—স্নিগ্ধ প্রকৃতির ভেতর কোন নিস্তব্ধ দিঘী থেকে একদল হাঁস উঠে এসে তীরে ধীরে সুস্থে গায়ের জল ঝেড়ে নিচ্ছে। সেই সঙ্গে রূপকথা। সমাজতান্ত্রিক দেশ থেকে যুবরাজ, রাজকুমারী, অপদেবতার কাহিনী আশ্রয় করে নাচ-বাজনা যে কী ভয়ংকর সুন্দরভাবে প্রাণের স্ফূর্তির, বিষাদের কথা বলতে পারে তা না দেখলে বোঝা যায় না।

উৎফুল্ল বসন্ত, [illegible] বিরহ কিংবা নিশ্চিত মৃত্যুর আগে স্পার্টাকাসের আলিঙ্গন—সবই নাচে, সঙ্গতে, মুখশ্রীতে ফুটে উঠেছিল।

ভুল জায়গায় হাততালি

বৈকুণ্ঠ পাঠক

[সবার আগে মায়া প্লিসেৎস্কায়া

যেন একটি লোকনৃত্যে রূপ পরিক্রমা কলকাতার মণিপুরী নাচের গুরু বিপিন সিংহের দলের নারায়ণ সিংহের নাচের কথা মনে করিয়ে দেবেই। মনে হবে—নারায়ণ সিংহের নাচ আরও কঠিন।

মঞ্চে পুরুষ নাচিয়েদের দৌড়, লাফ, শূন্যে দুপায়ের ঠোকাঠুকি করা—পাশ্চাত্য পুরুষের শৌর্য, স্ফূর্তি আর বিষাদকে স্পষ্ট করে। সে-তুলনায় আমাদের দুষ্মন্ত, কিংবা অর্জুনের আচরণ আমাদের ভারতীয় ধারণায় অনেক বেশি পরিণত। অবশ্য রূপী রূপকথার পুরুষদের মানসিক বয়স ভারতীয় পুরাণকাহিনীর চরিত্রের বয়স থেকে অনেক কম।

গঙ্গার বুকে চলন্ত লঞ্চের লেজে ঢেউ ভাঙা ফেনার মাথায় মাথায় কখনো কখনো অনন্ত সাদা পাখি পাখা মেলে নিজেদের ক্ষণিক আয়না বদলায়। সে এক দৃশ্য। মঞ্চে সেদিন সন্ধ্যার তাই হয়েছিল। সেই সঙ্গে বাজে ঝিলমিল দিয়ে বাজনা সুর তুলেছিল। এক জায়গায় দু'কলি রবীন্দ্রসঙ্গীত ছিল। লাইন মনে থাকে না বলে ধরে রাখতে পারিনি।

নাচ দেখার পরদিন সকালে তিনজন লোকের সঙ্গে দেখা হোল। ওঁরা তিনজনেই নাচ দেখেছেন। বলশয় ব্যালের নাচ ওঁরা নিউইয়র্ক, মস্কো, লণ্ডনে দেখেছেন।

১। শিল্পী পরিতোষ সেন, ২। মণিপুরী নাচের গুরু বিপিন সিং আর ৩। কলাবতী সিং।

পরিতোষবাবু বলশয় দলকে দেখেছেন নিউইয়র্ক, লণ্ডন আর এবারে কলকাতায়। কলাবতী সিং বলশয় থিয়েটারে ওদের নাচ দেখেছেন। গ্রীনরুমে ও'দের সঙ্গে কাটিয়েছেন। ও'দের রিহার্সেলে উপস্থিত থেকেছেন। ও'দের নেচে দেখিয়েছেন। মাত্রা প্রিসিস্কায়ার সঙ্গে নেচেছেন। কলাবতী দেবী লণ্ডনে নুরিয়েভ আর মার্গোট ফন্টেনের রোমিও জুলিয়েট দেখেছেন। বিপিন সিং দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের আগেকার বার্লিনে হিটলারকে নাচ দেখিয়েছেন মাদাম মেনকার সঙ্গে। আবার যুদ্ধোত্তর ইউরোপের মঞ্চে মঞ্চে নেচেছেন।

ও'দের মতে—

বলশয় এর চেয়েও ভালো নাচে। এদেশের মঞ্চ ছোট। সাজসরঞ্জাম ও'রা সব আনতে পারেননি। ন' বছর ধরে মহড়া দিয়ে হবে হাজার থেকে একটি ব্যালেরিনা বেছে

লন্ডনের [illegible] থিয়েটারে নাচের মহড়ায় কলাবতী

ভাষিংশের অমৃতে অনহিক্যু হয়ে লিখেছেন যে দেবারতি অ-কবিসুলভ কথা বলেছেন।

দেবারতি অ-কবিসুলভ কথা বলেছেন এ কথা ঠিক নয়। কারণ কবিতা জীবনবোধেরই ফসল।

এ-প্রসঙ্গে জীবন বড় না কবিতা বড় এ প্রশ্ন নিতান্ত নিরর্থক। কারণ কবিতা জীবনবিবিক্ত নয় অবশ্যই। কবিতা জীবনের অনীহুত সূক্ষ্মতম সুউচ্চতম প্রজ্ঞার ফসল। তাই কবিতা ব্যক্তিজীবন অতিক্রম করেও সমষ্টিজীবনের মধ্যে মধ্যে প্রবিষ্ট হয়ে কালের সীমা অতিক্রমের স্পর্ধা প্রকাশ করে।

পরিশেষে জানাই, অমৃত নবীন কবি-দের রচনা ও বক্তব্য প্রকাশের যে দায়িত্ব স্বেচ্ছায় নিয়েছে তাতে বাংলাসাহিত্য সমৃদ্ধ হবে এবং পাঠক সমাজের ধন্যবাদার্হ হয়ে উঠেছে ইতিমধ্যেই।

আশুতোষ বিশ্বাস
চৌবেড়িয়া, ২৪-পরগণা।

উত্তেজিত না হয়ে ভাবা দরকার

১৩ মে ১৯৭৭-র 'অমৃতে' চিঠিপত্র বিভাগে শ্রীযুক্ত রমাপ্রসাদ ঘোষাল ও শ্রীযুক্ত সমীরণ মজুমদারের চিঠি পড়লাম। তাঁরা উভয়েই 'তিনকবি'-র অন্যতমা দেবারতি মিত্রের বিরুদ্ধে অনেক কথা বলেছেন। আমি অতি সামান্য একজন মানুষ, তবু একটু বলতে চাই। দেবারতি মিত্র নাকি বলেছেন, 'জীবন কবিতার চেয়ে অনেক বড়'। 'তিনকবি'-তে দেবারতি দেবীর কথার মধ্যে তো আমি লক্ষ্য করলাম, তিনি এক জায়গায় বলেছেন যে জীবন ও জগতের সুখ-দুঃখ নানা ঘটনা থেকে কবিতার জন্ম হয় কবিমানসে এক রাসায়নিক ক্রিয়ার মধ্য দিয়ে। আমার তো মনে হয় ব্যাপারটা ঠিক তাই। অতএব জগৎ ও জীবনজাত কবিতার মহিমার ব্যাপ্তি যতই থাক না কেন, কবিতা জগৎ ও জীবন-ভিত্তিক বলে কবিতাকে জগৎ ও জীবনের মুখ চেয়ে থাকতেই হয়। আবার জীবন ব্যতিরেকে জগতেরই বা স্বীকৃতি কোথায়? অস্তিত্ব কোথায়? মূল্য কোথায়? তাই জগৎও জীবনের মুখাপেক্ষী। অতএব কবিতার চেয়ে জীবন অনেক বড়। তাছাড়া কবিকে চিরাচরিত কথাই বলতে হবে কেন? তিনি মানসিকতায় ও দৃষ্টিভঙ্গীতে স্বতন্ত্র হবেন বৈকি। তিনি যদি কিছু নতুন কথা শোনান তাহলে আমাদের উত্তেজিত না হয়ে বেশ ভাবা দরকার এবং তাঁকে প্রশ্রয় দেওয়া দরকার। তবেই তো আরও শুনতে পাবো আমরা। কিন্তু আমাদের মধ্যে গোঁড়ামিকে প্রশ্রয় দেবো কেন? আমার সমীরণবাবুর অভিযোগ, দেবারতি দেবী তৈরী না হয়ে সাহিত্যের উত্তর দিতে অসুবিধে বোধ করেছিলেন। সেহেতু সমীরণবাবু দেবারতি দেবীকে অ কবির সার্টিফিকেট দিয়েছেন। তবে আমার মনে হয় দেবারতি দেবী যে অসুবিধের পড়ার মত ভাব দেখিয়েছিলেন তা আদৌ প্রতিক্রিয়া নয়। আসলে তিনি মাননবাবুর সঙ্গে একটু রসিকতা করেছেন। অথবা ওটা মাননবাবুর প্রতি অত্যন্ত বিনয়।

অভিজিৎকুমার দাস,
কোতুলপুর, বাঁকুড়া।

ধন্যবাদ

তখনই আমাকে ২৯ এপ্রিল ৭৭ সংখ্যা 'অমৃত' থেকে 'তিনকবি' প্রসঙ্গ কাহিনী আমায় পড়তে হলো যন্ত্রণা ও কাঁদুনির মধ্যেও এবং কলম নিয়ে বসলাম যখন ১৩ মে সংখ্যায় তিনকবি প্রসঙ্গে পর পর দুটি চিঠি পড়ে (যথাক্রমে রমাপ্রসাদ ঘোষাল এবং সমীরণ মজুমদারের, উভয় পত্রদাতাই লিখছেন মেদিনীপুর থেকে) হতবাক বসে থাকলাম কিছুক্ষণ। শ্রীঘোষাল এবং শ্রীমজুমদারের চিঠি দুটির বক্তব্য মোটামুটি এরকম ১। তিনকবি পর্যায়ের দেবারতি মিত্রের মন্তব্য, 'জীবন কবিতার চেয়ে অনেক বড়'র প্রতিবাদ, ২। অমৃত 'সিনেমা পত্রিকার কায়দায়' কবিদের পরিচিতি প্রকাশ করে একটি ভীষণ আপত্তিকর কাজ করেছে।

শ্রীমজুমদার দেবারতির উপরোক্ত মন্তব্যের প্রতিবাদ করেছেন, পক্ষান্তরে তাঁর মতে 'জীবন কবিতার চেয়ে ছোট' এবং দেবারতি যা বলেছেন তা অকবিসুলভ। 'কবিসুলভ' ব্যাপারটি তিনি ব্যাখ্যা করেন নি, তাঁর ভাষায় 'অ-কবি' দেবারতির কটি কবিতা তিনি পাঠ করেছেন তাও না।।) এই বিভ্রান্তিকর কথাগুলির প্রতিবাদে আমার বক্তব্য—কবিতার (ও অন্যান্য শিল্পের) জন্ম শিল্পীর ব্যক্তিগত চিন্তাধারা, চেতনা, আন্তর্জাতিক জগৎ এবং অন্যান্য বিষয় সম্পর্কিত ধ্যানধারণাকে ভাষা-আশ্রয়ী (চিত্রকলা সঙ্গীত এবং চলচ্চিত্রেরও নিজস্ব ভাষা আছে) আঙ্গিক, চিত্রকল্প ইত্যাদির দ্যোতনা ও ব্যঞ্জনায় একটি সুসম সাযুজ্য-যুক্ত মাধ্যমে অপরের সাথে যোগসূত্র স্থাপনের প্রয়োজনে। শ্রীমজুমদার 'জীবনবোধ' শব্দটির উল্লেখ করেছেন, যদিও শব্দ-অভিধান উভয়েরই সুলভ, আমি বুঝতে পারলাম না জীবনবোধের সংজ্ঞা তাঁর কাছে কি রকম। যথার্থ এবং সর্বজনস্বীকৃত অর্থে কবিতা কি তা নিয়ে সমস্ত পৃথিবী জুড়ে আজ বিতর্ক কিন্তু একথা অনস্বীকার্য কবিতা যখন 'কবি' নামক একটি মানুষসৃষ্ট সুতরাং তা নিশ্চয়ই জীবনকে ছাড়িয়ে যেতে পারে না সে কবিতা যতই মহৎ হোক; শিল্প মানুষের জন্য, মানুষ শিল্পের জন্য নয়, একটি মহৎ কবিতা তখন সৃষ্ট হতে পারে যখন তা জীবনের মহত্ত্ব ও মূল্যের প্রতি অঙ্গীকারবদ্ধ থেকে অনুভূতি ও বোধকে উত্তরিত করে একটি বিমূর্ত জগতে (যেখানে 'জীবন' মূলকথা বলেই কবির অবশ্যই 'জীবনবোধ' থাকতে হয়) যা কোন এক ভাবে জীবনেরই চলচ্ছবি। স্বল্পপরিসর সুযোগে বিস্তৃত আলোচনা করতে পারছি না, তবে আমার বিশ্বাস শ্রীঘোষাল ও শ্রীমজুমদার দুজনে মহোদয়দ্বয় উল্লেখযোগ্য ব্যতিক্রম ছাড়া আর সবাই আমার সঙ্গে একমত হবেন।

'সিনেমা পত্রিকা' প্রসঙ্গে লিখি, (আপামর-নির্ভর মনোরঞ্জন উদ্দেশ্যে প্রকাশিত অধিকাংশে সিনেমা পত্রিকা, চলচ্চিত্র-শিল্প নির্ভর সিরিয়াস পত্রিকাগুলি নয়) তারা যদি বকল, আঁকল গরম করা ছবির বহু পরিচিত স্টারদের আরও ঘনিষ্ঠভাবে প্রতি-নিয়ত পাঠকের সঙ্গে পরিচিত করতে পারেন (যার মূলে উদ্দেশ্য ব্যবসা যায়) তবে একটি সাহিত্য-সাপ্তাহিক কবিদের সঙ্গে পাঠকের সরাসরি পরিচয় করে কি ভীষণ অন্যায় করে ফেললেন? নাকি এদেশে কবিরা অধিকাংশ পাঠকের খেউড় ছাড়া আর কোন উপহার লাভের অযোগ্য?

পরিশেষে, এই সুযোগে অমৃতকে অভিনন্দন জানিয়ে রাখি 'তিনকবি' প্রকাশের জন্য। তাস্করের বেশ কিছু কবিতা পড়েছি কিন্তু চিনতাম না, পঁচিশে বৈশাখ জোড়া-সাঁকোর সকালে হঠাৎ একটি সুখের সঙ্গে স্মৃতি থেকে অমৃতর একটি ছবি মিলিয়ে নিতে পারলাম।

পিনাকী ঠাকুর
বাঁশবেড়িয়া
হুগলী-৭১২৫০১

দেবারতি স্টান্ট দিয়ে কবি হন নি

গত ১৬ বৈশাখ সংখ্যায় 'অমৃতে' প্রকাশিত 'তিনকবি'র কবি দেবারতি মিত্রের বলা 'জীবন কবিতার চেয়ে অনেক বড়ো'র বিরুদ্ধে গত ৩০ বৈশাখ সংখ্যায় প্রকাশিত রমাপ্রসাদ ঘোষাল ও সমীরণ মজুমদারের অপরিণত মনের কয়েকটি অগভীর বক্তব্য পড়লাম। আমার মনে হয় এঁরা কবিতার প্রথম প্রেমে পড়ার স্তরের ভাবালুতা নিয়ে উক্ত কবির বিরুদ্ধে মন্তব্য করেছেন। যা কেবল একরকম মোহগ্রস্ত মনের উচ্চারণ ছাড়া আর কিছু নয়। আমি দেবারতি মিত্রের সমর্থনে বলি যে একটি মহাজীবনের কাছে কবিতা একটি খণ্ডাংশ মাত্র। জীবনের প্রগাঢ় বেদনার নিয়ত বহমান স্রোতধারার একটি ধারার প্রকাশই হল এক একটি কবিতা। জীবন অসীমের একটি সমুদ্র। তার গভীরের অন্তহীনতার মধ্যে থেকে এক একটি ছোট আকারের মুক্তোই হল এক একটি কবিতা। উৎসের কাছে আমরা ঋণী, কবিতায় উৎস জীবন, তাই জীবনের কাছে কবিতা সন্ধানী সেই, জীবন কবিতার চেয়ে অনেক বড়ো'।। অপরপক্ষে সমালোচকদ্বয় যথার্থ জীবন-বোধে জারিত না হয়েই তাঁর সম্পর্কে অগভীর বক্তব্য রেখেছেন। রমাপ্রসাদ ঘোষাল ও সমীরণ মজুমদারের বক্তব্যের শেষের কথাগুলি হাস্যকর মনে হয়েছে। তাঁদের জানাই কবি দেবারতি মিত্র কবি পরিচিতি নামক কোন স্টান্ট দিয়ে কবি বলে পরিচিত হননি। তাঁর লেখার পরিচয়েই তিনি একজন কবি এবং তাঁর লেখার গুণেই পাঠকেরা তাঁর পরিচয় নিতে ও সবার কাছে পৌঁছে দিতে আগ্রহী হয়েছেন। নিন্দুক সমালোচকের অকবি এই আখ্যার তোয়াক্কা

...র কারেই ভালো ছবি। তিনি তাঁর বন্ধুদের [illegible] আরও বড়ো রঙিনের অনুভূতিতে [illegible] দেওয়া রেখেছেন।

অনুরাধা অধ্যাপক;
[illegible], [illegible]।

আপশোস রয়ে গেল

অমৃতে স্বাধীনতা সংখ্যা পড়ে লেখকের স্বাধীনতা সম্পর্কে অনেক কিছুই জানতে পেলাম। সেই সঙ্গে ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশের প্রতিষ্ঠিত এবং প্রবীণ লেখকদের সঙ্গে আমরাও অনেকে মতবিনিময় করে নিলাম। কিন্তু আপশোস রয়ে গেল। লেখকদের আঞ্চলিক তথা সর্বভারতীয় পরিচয়টিকে আমরা আগাম-কুড়ির তরুণেরা জানতে পারলাম না। চেষ্টা করলেই লেখকদের একটা করে পরিচিতি ছবির সঙ্গে ছাপিয়ে দেওয়া যেত। তাহলে আমরা নতুন করে খুঁজে পেতাম লেখকদের এবং লেখাগুলোর হতো উচিত আকর্ষণীয়। স্বপন। [illegible] বক্সী, মোহনপুর, নদীয়া।

অভূতপূর্ব

অমৃত স্বাধীনতা ও সাহিত্য ৮৪ সংখ্যাটি পড়লাম—সুন্দর— অভূতপূর্ব। 'লেখক লেখা নিয়েই থাকবেন,' 'লেখকের মৃত্যুই শিল্পের মৃত্যু,' 'চার বছর আটক ছিলাম,' 'নিজেই নিজের হাতে,' 'স্বাধীনতা ছাড়া শিল্প বাঁচবে কি করে,' রচনাগুলো মনকে তোলপাড় করে দিল। আমাদের মতো নবীন সাহিত্যিকদের এই রচনাগুলো অবশ্যই পড়া উচিত। শ্যামল গাঙ্গুলীর সাক্ষাৎকার আর ... [illegible] এর মধ্যে মনুষ্যত্ব কিছু না আছেনও পড়তে ভাল লাগে। বছরা [illegible] রায়-এর মতো ব্যক্তিকে নিয়ে লেখাই। এছাড়া বিশ্বের পাঠকের লেখাটি [illegible]। অমৃত আরো নতুনদের লেখায় সমৃদ্ধ হয়ে আমাদের আকৃষ্ট করুক এটাই কামনা। কৃষ্ণেন্দু সাহা, ২নং বিজয়নগর, [illegible], ২৪-পরগণা।

ধন্যবাদ

অমৃত (১৭ বর্ষ, ৪ সংখ্যা) পড়লাম। এতে যে প্রচ্ছদ কাহিনী (আমাদের জঙ্গল) প্রকাশিত হয়েছে, পড়ে আমরা খুব আনন্দিত হয়েছি।—এ জন্য আপনাকে এবং লেখক অলোককুমার চক্রবর্তী ও [illegible] মণ্ডলকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি।—

এর আগেও (১৬ বর্ষ, ৪০ সংখ্যা) অমৃতে যে প্রচ্ছদ কাহিনী 'বাঘ [illegible] সংসার' প্রকাশিত হয়েছিল তা-ও আমাদের ভাল লেগেছে। [illegible] চট্টোপাধ্যায়কে ধন্যবাদ।

[illegible] ফরেস্ট ডিপার্টমেন্টের রেঞ্জ অফিসার। সেই কারণে আমরা ছোট বেলা থেকেই পরিবেশের মধ্যে জঙ্গলে [illegible]-খেলেছি। এই কারণেই জঙ্গলকে [illegible] ভালবেসে ফেলেছি।

[illegible] 'অরণ্যে আমরা চাই' বলতে [illegible] বড় করেছেন। তাঁরা লিখেছেন 'দার্জিলিং জেলায় দুটি অভয়ারণ্য— মহানন্দা আর সিঞ্চল।' এই মহানন্দা অভয়ারণ্য 'সুকনা থেকে তিনধারিয়া পর্যন্ত বিস্তৃত।' এখানে 'সুখনা' হবে না, 'সুকনা' হবে। আর, এখানে বাঘ, হাতি, হরিণ, অজগর ও ময়াল সাপ।

(এটি ছাপার ভুল নয় বলে মনে হয়, কারণ এই 'সুকনা' আমরা (১১ এপ্রিল, ১৯৭৫) বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ সংখ্যায় অমৃতে ২৯ পৃষ্ঠায় পেয়েছি।)

আশা করি, লেখকদ্বয় ভুল বুঝতে পারবেন। প্রণব [illegible] ও প্রবীর [illegible] সুকনা ফরেস্ট রেঞ্জ অফিস, সুকনা, দার্জিলিং।

শহরের সবুজ এখন প্রত্নতত্ত্বের বিষয়

গাছগাছালি যদিও মানবসমাজের পরম সুহৃদ তবুও মানুষের সঙ্গে গাছের সম্বন্ধের উন্নতি হল না। 'আমাদের জঙ্গল' প্রচ্ছদ কাহিনীতে এ বক্তব্য তুলে ধরার জন্য ধন্যবাদ। এককালে ব্রতচারীগণের অন্যতম শ্লোগান ছিল 'কেটে গাছের নিকেশ বন' সভ্যতা প্রসারে সহায়তা করা। আজকের দিনে 'দাও ফিরে সে অরণ্য' এটাই হওয়া উচিত দল-মত-নির্বিশেষের শ্লোগান। শহরের 'সবুজ' তো ক্রমশঃ প্রত্নতত্ত্বের বিষয় হয়ে দাঁড়াচ্ছে। গ্রামের দিকেও 'সবুজ' যা কিছু আছে তা ধ্বংসের জন্য এক অলিখিত প্রতিযোগিতা সুরু হয়ে গেছে। একদল [illegible] পূর্বপুরুষের সম্পত্তির মালিক হয়েই মাত্র কটা টাকার লোভে বিরাট মহীরুহগুলিকে কেটে বিক্রী করছে—অভাবে নয় স্বভাবে। আর একদল ব্যবসায়ী শহরে শাতকর্ণী, ফুলের তোড়া, অশত্থ-পাতা, দেবদারু পাতা, আমপল্লব প্রভৃতি সরবরাহের ও বিক্রয়ের জন্য গ্রামের এখনো জীবিত কটা গাছকে নিপাত করার জন্য উঠে-পড়ে লেগেছে। আজকাল গ্রামে একটা বট বা দেবদারু গাছ পাওয়া দুষ্কর হয়ে দাঁড়াচ্ছে। তৃতীয় একদল গ্রামেরই গরীব বাসিন্দা জ্বালানী সংগ্রহের জন্য কাঠ কুড়োবার নামে জ্যান্ত গাছের ডাল, বাকল, শেকড়, কাঁচা জীবন্ত গাছ নির্বিচারে কেটে ধ্বংস করে চলেছে। বড় রাস্তার দুধারে একদা রোপিত সরকারী গাছগুলির অনেকগুলিই কুঠারাঘাতে মৃত্যুপথযাত্রী। ক্ষত-বিক্ষত বৃক্ষকাণ্ডটির নীচের অংশ কেটে নেওয়ায় উল্টো ত্রিভুজের আকৃতি নিয়ে দিন গুনছে—সামান্য ঝড়ে ধরাশায়ী হবার অপেক্ষায়।

কলকাতায় পুলিশ একটা গাছ কাটলে দশ বছর জেল হয়। এদেশে? এদেশে 'বৃক্ষরোপণ' ও 'বনমহোৎসবের' নামে কিছু সরকারী পয়সার শ্রাদ্ধ হয় মাত্র। গাছ কাটা মানুষের (এদেশের) জন্মগত অধিকার। এদেশটা তো ইংলণ্ড নয় যে, 'রাস্তার দুধারে গাছ রুইবার জন্য সমিতি' হবে, 'পল্লীর সৌন্দর্য অক্ষুণ্ণ রাখবার জন্য আন্দোলন' চলবে, কিংবা ল্যাণ্ডস্কেপ সংরক্ষণ সমিতির সেক্রেটারী সচেতন বুদ্ধিসম্পন্ন নাগরিকদের কাছে আবেদন জানাবেন, 'আপনি কি জানেন আমাদের বনফুলগুলি একে একে লোপ পেয়ে যাচ্ছে? তাদের বাঁচিয়ে রাখবার জন্য এই সমিতির প্রয়াস ও উপায় উদ্ভাবনে আপনি যোগ দেবেন?' স্বপনকুমার গোস্বামী, বাগনান চৈতন্য বাটি, হুগলী।

প্রশংসনীয়

১০ জুনের অমৃততে বিচিত্রা বিভাগে একটি নতুনত্বের সন্ধান পেলাম 'ভিখারী গবেষণা সংস্থা'র কথা জেনে। এই সংস্থার প্রতিষ্ঠাতাকে সালিখার অধিবাসী হিসাবে জানি। তবে তিনি যে এত মহৎ একটি পরিকল্পনা করছেন ভিখারীদের জন্য তা সত্যিই সমর্থনযোগ্য এবং প্রশংসনীয়। দেশে এই জাতীয় প্রতিষ্ঠান থাকা উচিত ভিখারীদের সাহায্য করতে এবং ভিক্ষাবৃত্তি রোধ করতে। এই প্রবন্ধে জানতে পারলাম সংস্থার প্রতিষ্ঠাতা শ্যাম বন্দ্যোপাধ্যায় ভিখারীদের জীবন নিয়ে কিছু সাহিত্য রচনা করেছেন। এই রকম কিছু লেখা আপনাদের পত্রিকায় প্রকাশ হলে আমরা পড়ে এ বিষয়ে আরও জানতে পারব। আপনাদের যে প্রতিনিধি এই সাক্ষাৎকার নিয়ে তথ্যটি পরিবেশন করেছেন তাঁকে ধন্যবাদ এবং ধন্যবাদ পত্রিকাকেও। শ্যামাপ্রসাদ মহিন্দার, শ্রীরাম ঢ্যাং রোড, হাওড়া—৬

প্রতিবিধান প্রয়োজন

'বেগার রিসার্চ ব্যুরোর' প্রতিষ্ঠাতা শ্রীশ্যাম বন্দ্যোপাধ্যায়ের মানবিকতা বোধের জন্য ধন্যবাদ। একক প্রচেষ্টায়ও তিনি উদ্যোগী হয়ে ভিখারীদের পুনর্বাসনের জন্য কিছু ভেবেছেন, কিছু করেছেন। যা অন্যে করেননি। আমার বক্তব্য সম্পূর্ণ বিপরীতধর্মী। বন্যা রোধকল্পে আগে বাঁধ দিয়ে বন্যা ঠেকিয়ে তারপর অন্য চিন্তা যাতে বন্যা একেবারেই না হয়। ভিখারীর পুনর্বাসন চিন্তার সঙ্গে দেখা উচিত ভিখারী সম্প্রদায় যাতে নতুন করে গড়ে না ওঠে এবং সেই সঙ্গে ভিক্ষা ও ভিখারীবৃত্তির ধার্মিক পৃষ্ঠপোষকদেরও শাস্তির ব্যবস্থা থাকা দরকার। সকলেই জানেন একদল পুণ্যলোভী সমাজপতি আছেন যাঁরা নিজের গাঁটের কড়ি খরচ করে কুষ্ঠরোগী ও বিকলাঙ্গ প্রভৃতি ভিখারীদের কুম্ভমেলা, সাগরমেলা বা কেঁদুলী মেলায় পৌঁছে দেন। কারণ সাগরদ্বীপে দীর্ঘ জলপথ অতিক্রম করে বিত্তহীন বিকলাঙ্গের পক্ষে পৌঁছান দুরূহ। প্রথমে এই পুণ্যলোভীদের শাস্তির ব্যবস্থা করা দরকার। তারপর পুণ্য সঞ্চয়ার্থে ভিক্ষা না দেবার জন্য জনগণের মনোভাব গঠনে সহায়তা করা—ভিক্ষায়াম নৈব নৈব চ—এদেশেরই শাস্ত্রবাক্য। এই উদ্দেশ্যে কোন কোন রাজ্যে ভিক্ষাবৃত্তি নিরোধ আইন পাশও হয়েছে। এছাড়া যে প্রাথমিক কারণগুলি একজন নাগরিককে ভিখারীতে পরিণত করে সেইগুলির বিষয় সবিশেষ বিবেচনা করে তার প্রতিবিধান প্রয়োজন। স্বপনকুমার গোস্বামী, বাগনান, চৈতন্য বাটি, হুগলী।

রবীন্দ্রনাথের পেছনেও টিকটিকি/শিশির কর

যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে
তবে একলা চলো রে।
একলা চলো, একলা চলো, একলা চলো—
একলা চলো রে।
যদি আলো না ধরে, ওরে ওরে ও অভাগা,
যদি ঝড়-বাদলের আঁধার রাতে
দুয়ার দেয় ঘরে—
তবে বজ্রানলে
আপন বুকের পাঁজর জ্বালিয়ে নিয়ে
একলা চলো রে।

রবীন্দ্রনাথের এই সঙ্গীতটি কেবল আমাদের মুক্তি সংগ্রামের শ্রেষ্ঠ অহিংস যোদ্ধা মহাত্মা গান্ধীরই প্রিয় ছিল না, যাঁরা সশস্ত্র আন্দোলনে বিশ্বাস করতেন সেইসব অগ্নিগর্ভ বিপ্লবীদের উদ্বুদ্ধ করেছে, প্রেরণা দিয়েছে একলা চলার এই ডাক। রবীন্দ্রনাথের আরও অসংখ্য সঙ্গীত, কবিতা ও গদ্য রচনা আছে যা আমাদের মুক্তি সংগ্রামের দিনগুলিতে আমাদের অনুপ্রাণিত করেছে দেশমাতৃকার শৃংখল মোচনে। আমাদের অন্তরে জ্বালিয়েছে দেশাত্মবোধের আলোকবর্তিকা যা আমাদের ভগ্ন শুষ্ক বুকে এনেছে আশা। আর রবীন্দ্রনাথই বিশ্বের একমাত্র কবি, যার সঙ্গীত দুটি দেশের জাতীয় সঙ্গীতের মর্যাদা পেয়েছে। তবে একটা বিষয় লক্ষণীয় যে, রবীন্দ্রনাথের কোন লেখা নিষিদ্ধ বা বাজেয়াপ্ত হয় নি। অথচ দেশাত্মবোধক রচনার জন্য তাঁর সমসাময়িক এবং তাঁর আগের ও পরের অনেকের বই ব্রিটিশরা বাজেয়াপ্ত করে। তবে কি ইংরেজ সরকার রবীন্দ্রনাথকে নিতান্তই নিরীহ মনে করতেন? না। মোটেই তা নয়। তখনকার বিভিন্ন সরকারী নথিপত্রে দেখা যায় যে রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে ইংরেজদের আশংকা মোটেই কম ছিল না। সদা সতর্ক দৃষ্টি ছিল ব্রিটিশ গোয়েন্দাদের তাঁর প্রতি। রবীন্দ্রনাথের লেখা নিষিদ্ধ করা হলে প্রচণ্ড প্রতিক্রিয়া হতে পারে—এই আশংকাতেই হয়তো ইংরাজরা এ থেকে বিরত হয়েছে। কারণ দেখা যায়, গোয়েন্দারা রবীন্দ্রনাথের কোন কোন রচনাকে 'আপত্তিকর' বলে নোট দেয়। এ প্রসঙ্গে বিশেষ করে উল্লেখ্য, রাশিয়ার চিঠি।

সে যুগের একজন শ্রেষ্ঠ কবি ও সম্মানিত ব্যক্তি হওয়া সত্ত্বেও রবীন্দ্রনাথকে কম হেনস্থা করেনি ব্রিটিশ গোয়েন্দারা ও রাজপুরুষরা। যেমন, একবার তুচ্ছ কারণে সমন জারি হওয়ায় রবীন্দ্রনাথকে আদালতে আসতে হয়। 'ঝংকার' নামে একটি কবিতার বই রবীন্দ্রনাথকে উৎসর্গ করা হয়েছিল। রবীন্দ্রনাথ নিজেও তা জানতেন না। বইটি ব্রিটিশ সরকার নিষিদ্ধ করেন। সে সম্পর্কেই সাক্ষ্য। [illegible] রবীন্দ্রনাথের সাহায্য ও সহানুভূতি পান। তিনি শান্তিনিকেতনে শিক্ষকতার কাজ পান। পরে সেখানে টিকটিকির আনাগোনা হওয়ায় রবীন্দ্রনাথ তাঁকে তাঁর জমিদারি দেখার কাজে নিয়োগ করেন।
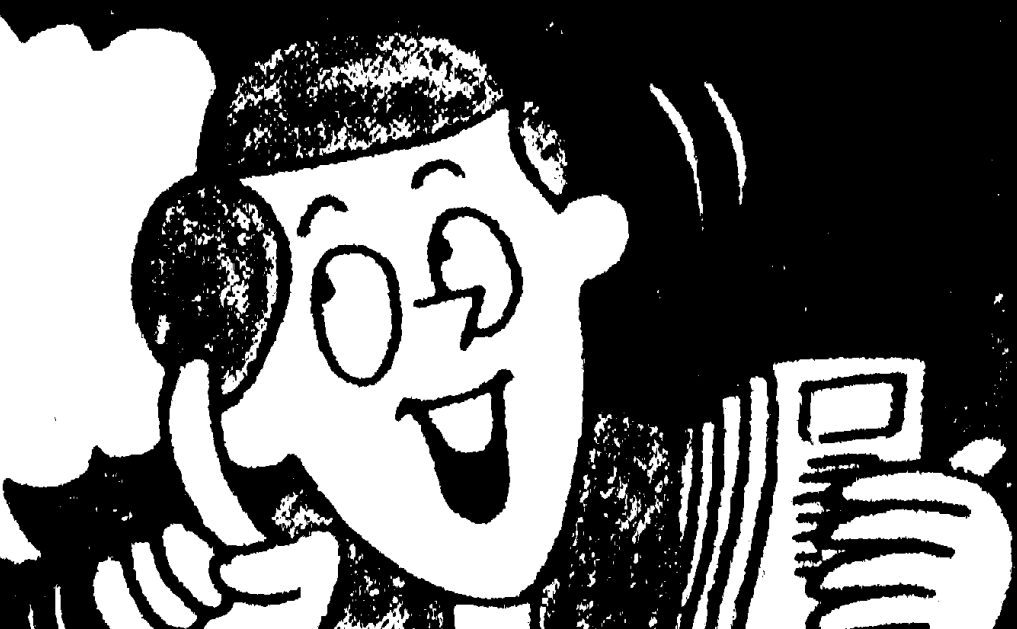
রবীন্দ্রনাথের শান্তিনিকেতনের উপরও এক সময় ইংরেজ শাসকদের বিষদৃষ্টি পড়েছিল। সরকারী কর্মীদের ছেলেমেয়ে-দের এখানে ভর্তি করা নিষিদ্ধ হয়েছিল। ওই নিষেধাজ্ঞা জারি করে যে সরকারী আদেশ জারি হয়, সরকারী নথিপত্রে এখনও আছে। ১৯১১ সালের অকটোবর মাসের সার্কুলারে বলা হয়েছে :

Dear Sir,

I am desired to refer to Eastern Bengal and Assam Government's demi-official letter No. 1636-52 N, dated the 24th Oct. 1911 regarding the Santiniketan and Brahmacharya Asram institution at Bolpur in the District of Birbhum. It was stated in that letter that the L. Governor of Eastern Bengal and Assam considered the institution altogether unsuitable as a place for the education of the sons of Government servants and desired that any well-dis-

posed Government servants who might be known or believed to have sons at the institution, or to be about to send sons to it might be warned to withdraw them, or not to send trem as the case may be, unless they were prepared to find their sons debarred from Government employment.

কয়েক মাস পরে অবশ্য ওই সার্কুলার প্রত্যাহার করে নেওয়া হয়।

স্বদেশী আন্দোলনের একজন অগ্রণী ছিলেন রবীন্দ্রনাথ। বিদেশী পণ্য দেশের বাজার হাতে গ্রাস না করে, সেদিকে দেশপ্রেমিক রবীন্দ্রনাথের সতর্ক দৃষ্টি ছিল। দেশি পণ্য বিক্রয়ে ও ব্যবহারে দেশের মানুষকে উৎসাহিত করতে তিনি উদ্যোগী হন। তিনি 'স্বদেশী ভাণ্ডার' গড়ে তোলেন। কিন্তু বিদেশী শাসক তা ভাল চোখে দেখে নি। এটা খুব স্বাভাবিক ব্যাপার। সেই সুদূরের দিনেও যে রবীন্দ্রনাথের উপর বৃটিশ গোয়েন্দার সতর্ক দৃষ্টি ছিল, তা বোঝা যায় এই রিপোর্টটি থেকে।

"In 1897, Rabindranath Tagore started 'Swadeshi Bhandar' at 82, Harrison Road, to encourage sale of country-made goods and to start schools far instruction in indigeneous Arts; but the effort met with little success."
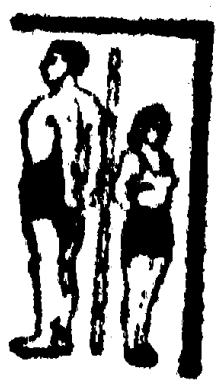
বৃটিশ গোয়েন্দা পরিতৃপ্তির সঙ্গে জানিয়েছে যে, স্বদেশী পণ্য বিক্রয়ে উৎসাহ দেবার জন্য রবীন্দ্রনাথের এই প্রয়াস ব্যর্থ হয়। শুধু কলকাতা বা শান্তিনিকেতনেই রবীন্দ্রনাথের কাজকর্মের প্রতি গোয়েন্দাদের সতর্ক দৃষ্টি ছিল না। সুদূর গ্রামাঞ্চলে রবীন্দ্রনাথ তাঁর জমিদারিতে কী করছেন, না-করছেন তাঁর প্রতিও সোনদৃষ্টি রেখেছিল ইংরেজের গোয়েন্দা। পূর্ববঙ্গের দুর্গম গ্রামেও রবীন্দ্রনাথ গ্রামবাসীদের দেশাত্মবোধে উদ্বুদ্ধ করতে ও দেশী পণ্য ব্যবহার করাতে চেয়েছিলেন। ব্রিটিশ গোয়েন্দারা তা ভাল চোখে দেখেন নি। তাই গোয়েন্দা রিপোর্টে এর প্রতি কটাক্ষ রয়েছে।

"Swadeshi in Rabi Tagore's Zamundary: Rabindranath Tagore reorganised his zamindari administration with the sub-division of Kusthia and appointed 4 Circle Inspectors and directed them to get supplies of country-made clothes and threads and sell them at the lower price to the tenants than the foreign made goods."

শরৎচন্দ্রের মত সক্রিয়ভাবে রাজনীতিতে যোগ না দিলেও দেশাত্মবোধের উদ্বোধনে ও স্বদেশী পণ্যের প্রতি দেশবাসীর অনুরাগ জন্মানোর জন্য তাঁর প্রয়াসের শেষ ছিল না। দেশের স্বাধীনতার জন্যও তাঁর চিন্তা ভাবনা কত প্রবল ছিল, শুধু তাঁর লেখা অসংখ্য কবিতা, গান ও প্রবন্ধই তা মূর্ত নয়। সমসাময়িক অসংখ্য ঘটনা তার সাক্ষ্য দেয়। মহাত্মা গান্ধী প্রমুখ অনেকে তাঁর কাছে ছুটে গিয়েছেন অনুপ্রেরণা পাবার জন্য। আর সুভাষচন্দ্রের প্রতি তাঁর গভীর দরদ ছিল, তা আমরা সকলেই জানি। দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে যাঁরা ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন, তাঁদের সকলের জন্যই ছিল তাঁর অন্তরের ভালবাসা, শ্রদ্ধা। নানাভাবে তিনি তাঁদের সমর্থন, সাহায্য ও সহানুভূতি দেখিয়েছেন। তাঁর শান্তিনিকেতনে তাঁদের কাউকে কাউকে তিনি শিক্ষকতার কাজ দিয়েছিলেন। সেজন্যই তো এক সময় শান্তিনিকেতনে সরকারী কর্মীদের ছেলেদের পড়ানো নিষিদ্ধ হয়েছিল। নিজের জমিদারী থেকেও এঁদের কাউকে কাউকে তিনি সাহায্য করে থাকতেন। এইসব স্বাধীনতা সংগ্রামীদের উৎসাহ দেওয়ার জন্য এই মহান কবি এগিয়ে এসেছিলেন। একবার তিনি একজনকে সোনার পদক দিয়ে উৎসাহিত করেন। ব্রিটিশ গোয়েন্দাদের নোটে সে কাহিনী লিপিবদ্ধ আছে।

'Swadeshi convicts awarded by Tagore'

শীর্ষক গোয়েন্দা রিপোর্টে বলা হয়েছে :

'It was announced that silver medals to be presented to those convicted in connection with Swadeshi movement in recognition to their services. Rabindranath Tagore had promised a golden foremost of Barisal salt-rate star to be presented to the man. The meeting was held at Grand Theatre on Harrison Road. Three thousand people attended, twenty-three persons received medals, greatest reception was awarded to a young student who was sentenced to fifteen stripes by the Calcutta Chief Presidency Magistrate for crying Bandemataram in the street."

শরৎচন্দ্রের 'পথের দাবি' উপন্যাসটি বাজেয়াপ্ত হবার পর তিনি রবীন্দ্রনাথের কাছে একটি চিঠি লিখেছিলেন যাতে রবীন্দ্রনাথ ঐ আদেশের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করেন। এর জবাবে রবীন্দ্রনাথ শরৎচন্দ্রকে যা লিখেছিলেন, তা থেকে অনেকেরই ধারণা হয় যে, রবীন্দ্রনাথ বৃটিশ ইংরেজদের খুব সুনজরে ছিলেন। ঘটনা কিন্তু তা নয়। এখনও আমাদের দেশের বিভিন্ন আর্কাইভস ও লণ্ডনের ইণ্ডিয়া অফিস লাইব্রেরীতে যেসব সরকারী দলিল, নথিপত্র, ফাইল রয়েছে, তা খুঁজলে দেখা যাবে, ইংরেজ গোয়েন্দারা রবীন্দ্রনাথের বিরুদ্ধে বার বার বিরূপ মন্তব্য করেছে। রবীন্দ্রনাথ মোটেই তাদের সুনজরে ছিলেন না। হয়তো অন্যদের মত এই বিশ্ববন্দিত কবিকে উত্যক্ত করার নৈতিক বল তাদের ছিল না।

রবীন্দ্রনাথের প্রতি যে সরকারী কর্মকর্তাদের সুনজর ছিল না, তার একটা বড় প্রমাণ হচ্ছে, নোবেল পুরস্কার পাওয়ার পর এই বিশ্ববন্দিত মনীষীকে যখন ভারত সরকার সম্মানিত করতে আগ্রহী হয়েছিলেন, তখন বাংলা সরকার আপত্তি তুলেছিলেন। কারণ গোয়েন্দাদের চোখে রবীন্দ্রনাথ তো আপত্তিজনক ব্যক্তিই ছিলেন।

তামাকও এসেছে—একটা হুঁকো আলোচনা আরম্ভ হওয়ার আগে থেকে হাতে হাতে ঘুরেছে।

বিড়ি তামাকের পয়সা রতনের মাকেই দিতে হয়েছে।

আজ সকালে রতনের মা হয়ে পাড়ার একজন বাড়ি বাড়ি বলে এসেছে—হরেন দাসের বৈঠকখানায় বিচার বসবে আজ রাতে, সবার সবার যাবে গো সব—সকলের যাবা চাই-ই। ছেলে বুড়ো, বৌ-ঝি কেউ বাদ যায়নি, পাড়া ঝেঁটিয়ে মানুষ এসেছে।

মেয়েদের ভিড়ের সামনে আছে রতনের মা। বৈঠকখানার মূল আসরে হরেন দাসের চারপাশে গ্রামের মুরুব্বিরা। অদূরে বৈঠকখানার দেয়ালে বসে গোষ্ঠ। তার মুখ ভালো করে দেখার উপায় নেই—তার মাথা হেঁট।

বাইরে বিদ্যুৎ চমকালো—আকাশে মেঘ ডাকল। সন্ধ্যা ঘনিয়ে আসার সঙ্গে সঙ্গে আকাশে মেঘ জমতে শুরু করেছিল—ঝড়-জল আসতে পারে যখন-তখন।

দাওয়ার ওদিক থেকে কে বলে উঠল—ব্যাপারটা কী ঘটেছিল আর একবার যদি বলা হয়—আমি বিলম্বে এসেছি গোড়া থেকে শুনিনি।

সঙ্গে সঙ্গে যারা একটু দেরিতে এসেছে এবং যারা অনেক আগে এসেছে, দুপক্ষের অনেকেই এক সুরে বলে উঠল— আমরাও শুনিনি।

মিথ্যা কথা, সবাই জানে। পরশু রাতের পর থেকে কাল সারাদিন, আজ সারাদিন—দুদিন ধরে একটা কথাই মুখে মুখে ঘুরছে। পথেঘাটে মাঠে দুটো মুখের দেখা হলে ওই একটাই কথা। কথাটাকে ফেনিয়ে ফাঁপিয়ে গ্রামের সীমানা পার করে আশেপাশের গ্রামে পৌঁছে দিয়েছে।

হরেন দাস সকলকে বোঝাবার চেষ্টা করেন—আগে দুবার বলা হয়ে গেছে।

—আর একবার হোক।

—হোক! হোক। উপস্থিত প্রায় সকলেই আগ্রহ দেখায়। —আরো একবার হোক।

রতনের মাকে আর একবার সামনে এসে দাঁড়াতে হয়। তৃতীয়বার, কিন্তু মনে হচ্ছে যেন এই প্রথম ঘটনাটা বিস্তারিতভাবে শোনাচ্ছে রতনের মা।

আমার সাদা সরল মন, কার মনের ভেতরে কী আছে আমি অত কি বুঝি। বউ বলে, মা গরমে আমি ঘুমতে পারিনি—আমি দাওয়ায় শোব। সেই থেকে দাওয়ার খোয়ের বিছানে হয়, আমি রতনের ঘর আগলাই। রতনের ঘরে ফেরার ঠিক নি, মন হলে সাতদিনে একদিন আসে, মাঝালে মাসের আদ্দেক দিন পার হয়ে যায় রতন আসে নে।

বউ রান্না করল, শাউড়ি বোয়ে রান্না-ঘরে বসে খেলুম। বোয়ের বিছানে পড়ল দাওয়ায়। আমি বসে আছি, বউ বলল—কেবাসিন পুড়িয়ে কী হবে। আমি বললুম—আমার মন বলচে আজ রতন আসবে। বউ বলল—আসবে নে। ভাবলুম রতন তাহলে বউকে বলে গেচে সে কবে আসবে। বউ মশারি ফেলে শুয়ে পড়ল। আমিও ঘরে গিয়ে শুলুম। শুলুম কিন্তুক চোকে ঘুম আসে নে, খালি ছেলেটার কতা মনে আসে। ছেলেটা ঘরের সুক বলে দিলিস পেল নি। বাইরে বাইরে পড়ে থাকে, নিজের হাত পুড়িয়ে খায়। খায় কি খায় নে। দু-দুটো ঠাকুর গড়ার বায়না নিয়েচে। পুজো যত এগিয়ে আসচে তার ঘরে আসা তত কমে আসচে। দুগ্গাপুজোর পর লক্ষ্মীপুজো তারপর কালীপুজো। যকন ঠাকুর গড়া থাকে নে, তখনও রতনের ঘরে মন টেঁকে নে—বলা কয়া নি কোতায় চলে যায়—। অমন পতিমার পেনা দেকাতে বউ আনলুম ঘরে তা সে বউ আমার রতনের মন বাঁদতে পারল নি। আমি আজ আচি কাল নি—বেশিদিন থাকব নি, আমার রতনের সংসার কে দেকবে। ভাবি, ভেবে কী করব, তকন চোকে তো দেকতে পাব নি। মন শোনে নে—চোকে ঘুম আসে নে। সকাল থেকে মন বলছিল আজ রতন আসবে। রাত কত হল—তবে আর সে এল নি। এমন সময় যেন রতনের গলায় আওয়াজ পেলুম। তাড়াতাড়ি উঠে দোর খুলে দেখি রতন। রাতেরবেলা রতন বরাবর কাজের জাগা থেকে খেয়ে আসে। অনেক রাত হয়েচে, বললুম, শুয়ে পড়। আমি দাওয়ায় বোয়ের বিছনের এসে শুলুম।

ঘুমিয়ে পড়েছিনু, আচমকা ঘুম ভেঙে গেল, মনে হল কে যেন গায় হাত দিল। অন্ধকারে ঠাওর করতে পারিনি ভালো করে, মনে হল মশারির ভেতরে কালো মত কী—অবিকল যেন মানুষ। বাবা গো কী বলব, কী ভয় করেছিল। গলা দে স্বর ফোটে নে—চেঁচাব কী। দেখি মশারি তুলে সে পালাচ্চে। আমার যেন তকন হুঁশ হল, অমনি দুহাতে জাপটে ধরলুম তাকে। ধস্তাধস্তিতে মশারিতে জড়িয়ে গেলুম, তাকেও জড়ালুম।

রতনের মা একটু থেমে আবার শুরু করল—যার ঘর সোমত্ত বউ ভগবান তাকে অমন মতি দিলে। আপনারা পাঁচজনে এর বিহিত কর—।

কে বলে উঠল—গোষ্ঠর বউ-এর ছেলে হবে—সেইজন্যই।

আর একজন বলল—এমন তো আর চিরকাল ছিল নি।

আর একজন বলে উঠল—শুধু যে অনেকদিন থেকে রতনের পরিবারের সঙ্গে গোষ্ঠর পিরিত।

তাই। তা রতন এসব জানত নি?

জানবে নে কেন—সব জানত।

তাহলে বউকে শাসন করেনি কেন?

এসব ব্যাপারে যত শাসন করবে তত বেড়ে যাবে।

তাই বলে এর কোন বিহিত নি?

রক্ত-মাংসের মেয়ে মানবের রূপ নিষ্প্রাণ হারিয়ে রতন ছাইতো মাটির পিতিমের অত মন দিয়েচে।

আজকের সভায় রতনের উপস্থিত থাকা উচিত ছিল।

থেকে কী করবে—নিজের পরিবারের পক্ষ হয়ে বলবে।

রতনের পরিবার তাহলে বলুক।

পদ্ম আসেনি।

পদ্ম আসেনি—অন্যায় কথা।

তার কি দোষ বল, রতনের মা বলে, সে কচি মেয়ে, কাদার পেনা মন, মন্দ লোকে তাকে মন্দ করেচে। বেচারা দুদিন দানা পানি খায় নি, সেই যে দোরে খিল দিয়েছে আর দোর খোলেনি।

অনেকেই সায় দেয়—না, না, পদ্মর কোন দোষ নি! পদ্মর কোন দোষ নি।

তাহলে গোষ্ঠ বলুক।

গোষ্ঠর ওপর আলো পড়ে।

এতক্ষণ গোষ্ঠর পাশে বসে ছিল যারা, তারা কেউ কেউ গোষ্ঠর গায়ে ঠেলা দিয়ে বলে, বল গোষ্ঠ, বল, বল না—বল না—:

গোষ্ঠ মুখ তোলে না।

মুখ তুলবে কি—মুখে যে চুনকালি।

কে—কে বলল কথাটা।

বাইরে জোর বাতাস উঠেছে। গাছের পাতায় ঝর্‌ঝর্‌, মর্‌মর্‌ শব্দ। তারপর হু-হু হাওয়া।

ঝড়-জল আসছে—তাড়াতাড়ি কর !—তাড়াতাড়ি কর।
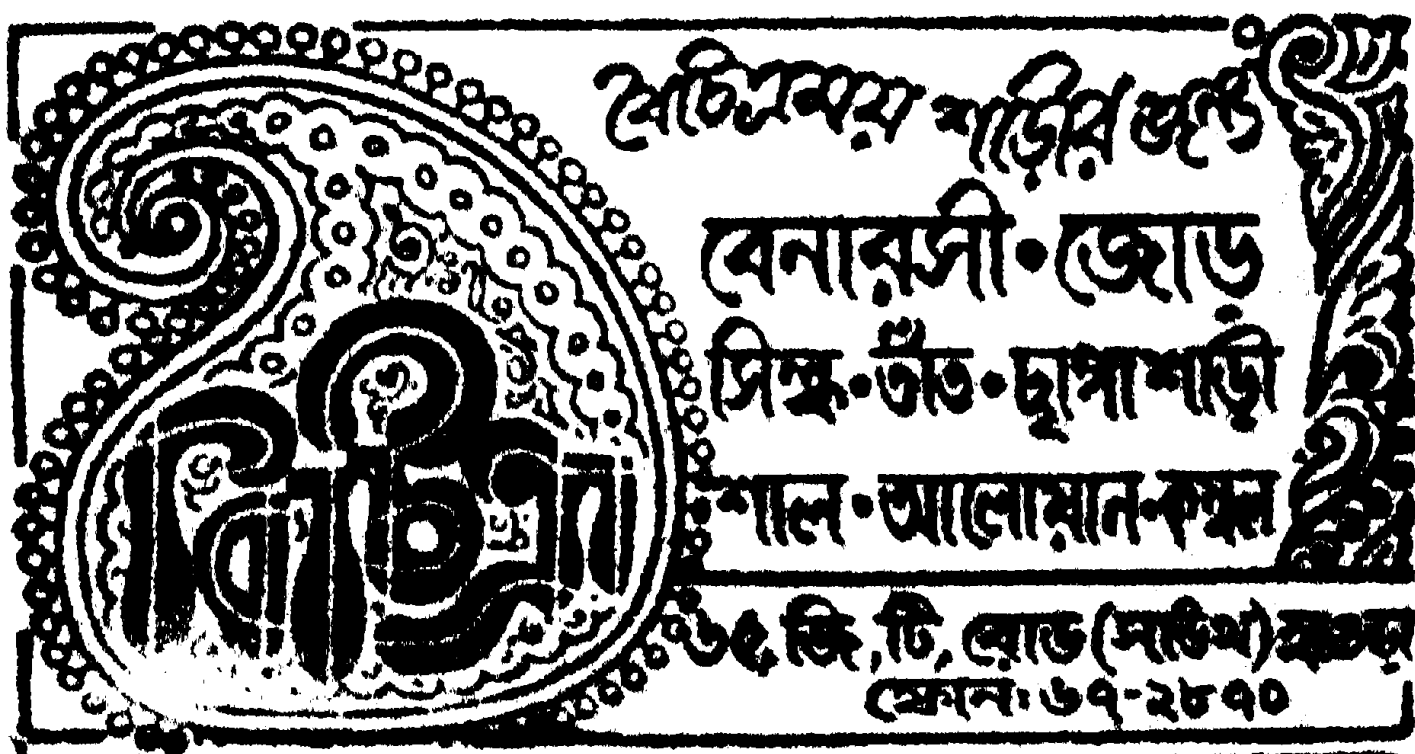
হরেন দাস বলেন বল গো সুধন্য, বল নগেন, শ্রীনিবাস,—তোমরা পঞ্চজনে যা বলবে তাই হবে।

আপনি বলেন !—আপনি বলেন !—আপনি বলেন ! আপনি সকলের মাথা !

হরেন দাস কেশে গলা সাফ করেন।
চুপ—চুপ সুর ! চুপ— !

আমি বলি, গোষ্ঠর অবস্থা তোমরা সকলে জানো, ভিটেটুকু ছাড়া ওর আর এক ছটাকও জমি নি, রোজগারপাতিও ভালো করে নে, জরিমানার টাকা ও দেবে কোথেকে। জরিমানা করে লাভ নি—।

তাই হোক ! তাই হোক ! তাই হোক !! সকলেই সায় দেয়—তাই হোক !

হা-হা রবে বাতাস ধেয়ে এল। পাতায় পাতায় হাহাকার উঠল। কোন পাখীর ডানায় ঝটপট আর করুণ আর্তি গোমা গেল খুব কাছে। গোষ্ঠর ছেলেবেলার সঙ্গী, বন্ধু তুলসী যাকে গোষ্ঠ হাতে ধরে হারমোনিয়াম বাজাতে শিখিয়েছিল একদিন, সেই তুলসী এগিয়ে এসে ভিড় সরিয়ে মাটিতে হাত রেখে কুড়ি হাত মাপল। তারপর নগেনের মা এসে বাঁপায়ের একটা আঙুল দিয়ে কিল হাত দাগ কেটে দিল মাটিতে।

মাটিতে বৃষ্টির টপ টপ ফোঁটা পড়তে শুরু করেছে।
কই গোষ্ঠ, আয়।

বৃষ্টির মধ্যেই একে একে অনেকে রাস্তায় নেমে পড়ল। দেখতে দেখতে বৈঠকখানা ফাঁকা হয়ে গেল।

সন্তবর্ণ আগেই বাড়ির ভিতর পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে। শেষ হ্যারিকেনটা হাতে নিয়ে হরেন দাস ঘরের দিকে পা বাড়ালেন, দেখেন গোষ্ঠ দাঁড়িয়ে আছে বৈঠকখানার দাওয়ায় খুঁটি ধরে। হরেন দাস কাছে গিয়ে আলো তুলে ধরলেন। গোষ্ঠর দুটো গাল ভেসে যাচ্ছে চোখের জলে।

ঘরে যা গোষ্ঠ, ঘরে যা।

গোষ্ঠ যায় না, অন্ধকারে দাঁড়িয়ে থাকে।

বাইরে বৃষ্টি ঝরছে অঝোরে। গোষ্ঠ চোখের জল মুছছে, আবার ভেসে যাচ্ছে চোখের জলে।

গোষ্ঠর মা যদি বেঁচে থাকত গোষ্ঠকে হাত ধরে ঘরে নিয়ে যেত। গোষ্ঠর নিজে থেকে ঘরে যেতে লজ্জা করে। সাধব যদি আসত, তাকে নিয়ে যেতে তবে তার আরো বেশী লজ্জা করতো, তবু তার ঘরে যাওয়া হত। মনে মনে তাই যেন চেয়েছিল সে. ভেবেছিল, সকলে চলে গেলে বৃষ্টি মাথায় করে সাধব আসবে। সবাই কখন চলে গেছে, সাধব আর কখন আসবে !

বাইরে বৃষ্টি আর খোড়ো বাতাস উথাল পাথাল। গোষ্ঠ ভেবে আকুল হয়, কোথায় যাবে। একবার ভাবে কোন দূর দেশে চলে যাবে যেখানে কেউ তাকে চেনে না। অচেনা দেশের অজানা পথে পথে ঘুরবে সারাজীবন, কোনদিন আর ফিরবে না। আজ যদি ঘরে ফিরতে না পারে তবে আর কোনদিনও তার ঘরে ফেরা হবে না। ঘরে ফেরা হবে না, হারমোনিয়াম বাজিয়ে কোন সন্ধ্যায় আর গান গাওয়া হবে না, ভাবতে

মন হু-হু করে গোষ্ঠর। এই গানের জন্যই সংসারে যত দুঃখ। কোনদিন পয়সা রোজ-গারে মন দিতে পারেনি, সব সময় মন পড়ে রয় খুঁজেছে। সন্ধ্যা হলেই রোজ হার-মোনিয়াম নিয়ে বসেছে। নিজে গান লিখেছে কত। নিজেই গানে সুর দিয়েছে। গাজনে গিয়ে হলো বরযাত্রী, কলেমাগীর দলে গোষ্ঠর নিমন্ত্রণ বাঁধা। কত আসরে সে গান গেয়েছে। তার গানের সুরে মুগ্ধ হয়েছে কতজন। এই গানের জন্যেই সাগর প্রেম হয়ে

খেলা। একদিন পদ্ম এমন সব গানের সুরে গাইত। সেই সব কথা আজ খুব মনে পড়ে গোষ্ঠর। মন চায় অনেক অনেক দূরে কোথাও চলে যায়, যেখানে গেলে এই সব স্মৃতি অনেক দূরে পড়ে থাকবে, কেউ তাকে ছুঁতে পারবে না। কেউ তাকে আর কোন দিন কোন কষ্ট দিতে পারবে না। মা। সাগর না পদ্ম না। ভাবতে ভাবতে অস্ফুট এক অভিমানে বুক ভেঙে যায় গোষ্ঠর। সে যত ভাবে পদ্মকে আর ভাববে না ততই পদ্মকে মনে পড়ে। তার মুখখানা মন থেকে আর মনে করবে না ততোই সেই মুখ এই ঘোর অন্ধকারে পদ্ম হয়ে ফুটে ওঠে তার চোখের মণিতে। গোষ্ঠ চোখের জলে ওই ফুল ভাসিয়ে দিতে চায়। সে চলেই যাবে এই গ্রাম ছেড়ে। এ জীবনে আর পদ্মর সঙ্গে তার দেখা হবে না—এই কথাটা মনে হলেই মন তার হাহাকার করে ওঠে। মনে হয়, কেন মনে হয় পদ্মকে দেখতে না পেলে সে মরে যাবে।

তবু সেই ভালো, এই মরণ তার ভালো। —বেঁচে থাকবে তবু পদ্মকে দেখতে পাবে না তার চেয়ে তার মরণ অনেক ভালো। জীবনে আর কোনদিন পদ্মর সামনে গিয়ে তো সে দাঁড়াতে পারবে না, মুখ তুলে কোনদিন চাইতে পারবে না তার মুখের দিকে। এ জীবনে আর কি কোনদিন পদ্ম তার মুখের দিকে চাইবে, তাকে আবার ভালোবাসবে।

পদ্ম আর তাকে ভালোবাসবে না, আর তার কথা ভাববে না, তাকে ভুলে যাবে—এসবই মেনে নিতে হবে। সে কিন্তু ভুলেও কোনদিন ভুলতে পারবে না পদ্মকে মরণের পরেও যদি মন থাকে তখনও তাকে মনে রাখবে। তাকে ভালোবেসেছিল পদ্ম, সেই স্মৃতি বুকে নিয়ে সুখে দুঃখে সংসারে বেঁচে থাকবে গোষ্ঠ। ও একজন সাধারণ সংসারী মানুষ হয়ে যাবে।

সংসারী তো একদিন তাকে হতেই হোত। ফিরতে তাকে হোতই কোনদিন। পদ্মকে ভালোবাসার পরিণাম কী ছিল। কোথায় ছিল সেই ভালোবাসার শেষ? কত রাত চোখে ঘুম নেই ভাবনায় ভোর হয়ে গেছে কত রাত—কোন আলো তবু দেখতে পায়নি। ভেবেছে যদি এমনি চলে চিরটাকাল—সেই কি ভালো? ভালো-মন্দর কথা মনে আসেনি, ভালোবাসায় শুধু

ভেসেছে, সুখের দ্বিগুণ দুঃখ পেয়েছে, দুঃখে জ্বলে পুড়ে খাক হয়ে গেছে, তবু ফেরা যায়নি, এমনি সে নিয়তি। দুজনের ঘর পুড়েছে দুজনেই তুষের আগুনে জ্বলেছে অহরহ, তবু মনে হত এই খেলা কোনদিন শেষ না হয় যেন। পদ্ম বলেছিল, যদি কোনদিন আমাকে ভুলে যাও সেদিন আমি ঠিক মরে যাব।

না, পদ্ম মরবে না। রক্ত-মাংসের মানুষ ভালোবাসার জন্যে কি মরে যায়! পদ্মর মধ্যেও রক্ত-মাংসের মানুষ আছে, সেও তো ভালোবাসতে পারে। এই ভালো হল। শাস্তি সে মুখ বুজে মেনে নিল সে তো পদ্মর ভালো হবে বলেই। তার লোকভয় যত অপমান সব দূর হবে, ঘরের মানুষ নিয়ে পদ্ম এবার সুখে ঘর করবে। যে শাস্তি দশজনে আজ তাকে দিল, সে তো বাইরের তুচ্ছ ঘটনা, সবাই তাকে সংসারের সত্য বলে দিল—এই ভালো হল, ভালোবাসার কষ্ট দূর হল, এবার নতুন করে বাঁচবে পদ্ম।

গোষ্ঠও নতুন করে বাঁচবে। হারমোনিয়াম সে বিক্রি করে দেবে। ব্যবসায় মন দেবে। ফি হাটে আনাজ নিয়ে যাবে। সন্ধেয় হাট থেকে ফিরে কাঁচা টাকা বেঁধে দেবে সাগরের আঁচলে। সাগর সুখী হবে। সেও সুখী হবে। সুখ তো শেষ কথা নয় সংসারে। সুখ-দুঃখে কী এসে যায়। শুধু বেঁচে থাকা।

রাত গভীর হয়েছে। বৃষ্টি ধরে গেছে। আকাশের সব মেঘ ধুয়ে গিয়ে পরিষ্কার আকাশে তারা ফুটেছে। আকাশ থেকে নীল আলো নেমেছে পথে। পথের ধারে বেড়ার গায়ে বনো লতায় সাদা রঙের কী ফুল ফুটে আছে, যেন চেয়ে আছে গোষ্ঠর দিকে।— আকাশের তারা, আকাশ, গোটা জগত-সংসার চেয়ে আছে গোষ্ঠর দিকে— দেখছে তার ঘরে ফেরা।

অন্ধকারে উঠোন পার হয়ে গোষ্ঠ দাওয়ায় উঠে আসে। ভেবেছিল দাওয়ায় আলো জ্বেলে সাগর তার পথ চেয়ে থাকবে। সে দেখে দাওয়া জুড়ে জমাট অন্ধকার। ভেবেছিল ঘরের দরজা খোলা থাকবে তার জন্যে। সে দেখে দরজা বন্ধ। তার পায়ের শব্দেও কেউ দরজা খুলে দেয় না। সাগর যে ঘুমোয়নি গোষ্ঠ জানে, গোষ্ঠ যে আসবে যেমন সাগর জানে। সাগর অভিমান করেছে।

গোষ্ঠ দরজায় হাত রাখে। সাগর কি শুনতে পায় না, দরজা খোলে না।

গোষ্ঠ হাত দিয়ে দরজায় শব্দ করে। কতবার কত শব্দ করে। শেষে ডাকে— সাগর-সাগর—। সাগর সাড়া দেয় না।

গোষ্ঠ আবার ডাকে—সাগর দোর খোল—সাগর দোর খোল।— দোর খোল সাগর।

দরজা খুলবে সেই আশায় দাঁড়িয়ে থাকে গোষ্ঠ। দরজা খোলে না। গোষ্ঠ তবু দাঁড়িয়ে থাকে যদি কখনো দরজা খোলে।

রাত আরো গভীর হয়। কোথায় পেঁচা ডাকে। বিদ্যুৎ চমকায়। আকাশে আবার মেঘ ঘনিয়েছে। গোষ্ঠর ভয় হয়। অজানা এক উৎকণ্ঠায় আকুল হয়ে ডাকে— সাগর-সাগর—। কোন সাড়া নেই। সাগর সাড়া দেয় না। এ শুধু অভিমান নয়, গোষ্ঠর মনে হয় স্থির বিশ্বাসে সে জেনে যায় ওই পাষাণ দরজা কোনদিন আর খোলবার নয়।

বাইরে হু-হু হা-হা অট্টহাসিতে মেতেছে হাওয়া। বড়ো আবেগে ঝড়ের বেগে উঠোন কাঁপিয়ে ঝড়ের মুখে গিয়ে পড়ে গোষ্ঠ। আকাশে মাতন মাটিতে মাতন, গোষ্ঠ নিজেকে ঝড়ের মুখে সঁপে দেয়। ঝড়ের টানে ছিন্নমূল গোষ্ঠ কোথায় ভেসে যায়।

রতনের কথা ভাবতে ভাবতে দু প্রহর রাতের পর রতনের মার দু চোখের পাতা সবে এক হয়েছে, তন্দ্রার মধ্যে মনে হল কে যেন উঠোন পেরিয়ে দাওয়ায় এসে উঠল—দোরে টোকা দিল—দোরে খিল খুলে গেল—।

রতনের মার ঘুম টুটে যায় কিন্তু চোখের পাতা খোলে কার সাধ্য। শুধু বলে—কে রে রতন এলি—।

দরজায় খিল তুলে দিতে দিতে ঘরের ভিতর থেকে পদ্ম উত্তর দিল— হ্যাঁ মা।

অন্য হাত // অমল আচার্য

ডাহুক পাখির কর্কশ বিরক্তিকর গলার শব্দে নগেনের ঘুম ভাঙতেই দেখল, কামিনীর একটা হাতে তার গলা সাপটানো। সারা রাত, সম্ভবত অনেকটা সময় ধরে হাতটা ওভাবে থাকার দরুন নগেনের মনে হয় তার গলায় ভার কিছু চেপে বসেছে যেন। অন্য রাত, অন্য সময় হলে সে নিজের হাতে একইভাবে কামিনীর গলা সাপটে ধরত, দুটো শরীরের দূরত্ব একটা রেখায় পৌঁছিয়ে নিত। কিন্তু এখন ডাহুক পাখির গলার নালিতে রাত পোহানোর গোঙানি, টিনের চালে ধরে আসা বৃষ্টির ক্লান্ত শব্দ, এবং পাশে শোওয়া বউ ও ছেলেকে বাঁচানোর কঠোর তাগিদ।

নগেন কামিনীর হাতটা আলতো করে তুলে দিয়ে বালিশে ভাঁজ করে রাখে। কামিনীর ঘুম ভাঙে না।

অন্ধকার ফুঁড়ে চোরের মত বিছানায় উঠে বসে নগেন। চোখ ভারি। ঘুম ছুটলেও ঝিমুনি যায় না। শরীরের আলিস্যি থেকেই যায়। গলার ভারটা কিছুতেই মিলাতে চায় না। নগেন নিঃশব্দে হাই তোলে।

ঘরের একদিকে চাল নেই। টিনের চাল্। ঝরে গেছে। ফুটো ফাটায় ঝাঁঝরা। বৃষ্টির জল সেই ফুটো দিয়ে মেঝেয় পড়ে। মাটির মেঝে। শব্দ হয়। সানকিতে শব্দ হয় থাম থাম। এ'টা সানকি একটাই। তার ছ' বছরের ছেলে বল্টু গড়ে দিয়ে [illegible], দুমড়োনো লাগে। চটে যাওয়া অন্য দুটো সানকি মাটির দেয়ালে ঠেকিয়ে-রাখা, ব্যবহারে লাগে নি। না হলে সে দুটোতেও জল পড়ে শব্দ হত। নিশ্চিত-ভাবেই ফাঁকির শব্দ।

নগেন মাচা থেকে নেমে প্রথমে লণ্ঠন জ্বালাল। ঘিয়ে রঙ আলো ফুটে গেল ঘরের কোণে। বার করে আনল ঘর থেকে ঘর, তার মানুষজন, ঘরগেরস্থালির জিনিসপত্তর।

দেয়ালে পেরেক পুঁতে দড়ি টাঙানো। তাতে কামিনীর শাড়ি, ছেলের ইজের, নগেনের গেঞ্জি। গেঞ্জি পরে নিল নগেন। পরাতে গিয়ে বগলের কাছটা ছিঁড়ে গেল ফাঁত করে। কিছু করার নেই।

নগেন ঘরের অন্য কোণে সরে এলো। সেখানে কামিনীর সংসার। ইঁটের পর কাঠের তক্তো পাতা। তক্তার পর একদিকে মাটির কলসী। কলসীর পর কলসী। তিনটে। নগেন হাত ঢোকাল। পেল না কিছু। পাশেই কয়েকটা শিশি। খালি, এমন কি তেলেরটা পর্যন্ত। কিছু ডাবরা কৌটো-কাটা। কৌটো-গুলো নাড়ালো নগেন, শব্দ হল না। একটা ছোট্ট মাটির হাঁড়ি ছিল। হাত দিতেই এক-মুঠো খেসারির ডাল উঠে এলো। ডাল মুখে পুরে নিল নগেন। চোখ বুজে চিবোতে লাগল পরম সুখে। দাঁতের ফাঁকে আটকে গেল ভেজা ভেজা। আঙুল ঢুকিয়ে ছাড়িয়ে নিল ভেজা দাঁতের খাঁজ চেঁচে। আবার চিবোল। চোয়াল ধরে এলেও চোয়াল থামে না। পেটে তীব্র জ্বালা, যা ঘুম ভাঙার পর থেকেই নগেন সয়ে নিচ্ছে তিল তিল। নগেন তেষ্টা অনুভব করে। এক ঘটি জল ঢক ঢক করে গিলে নেয় আকণ্ঠ।

মেরুদণ্ডের সঙ্গে সিটকে থাকা পেটের দিকে তাকিয়ে নগেনের মনে হল বল্টু অপুষ্টি রোগে ভুগছে দীর্ঘকাল, জন্ম ইস্তক। বল্টুর বয়েস ছয় ক্যালেণ্ডারের তারিখ মত। দেখে মনে হয় পাঁচ বা চার শরীরের গড়নে। হাত-পা সরু লিকলিকে, বুকের খাঁচায় জালি চামড়ার আবরণ মাত্র। জোরে ফুঁ দিলে যে কোনো মুহূর্তেই ফেঁসে যেতে পারে। দুটো হাড়ের মাঝখানে আঙুল দাবিয়ে জোরে চাপ দিলে ফুটো হয়ে যেতে কতক্ষণ। একটা মোটাসোটা [illegible] ছেলের শখ ছিল নগেনের।

ঘুমিয়ে থাকে কামিনী কাদা। তার শরীরের নিষ্পিষ্ট অঙ্গপ্রত্যঙ্গ অসাড় হয়ে যায়। শুধু শ্বাস প্রশ্বাসে বেঁচে থাকে কামিনী। নগেন কামিনীর মাথার কাছে সরে গেল। সরে গিয়ে কামিনীর আপাদমস্তক খুঁটে খুঁটে দেখে। কামিনীর বয়েস কত হল তেমনি করে হিসেবে আনতে। হিসেব ঠিক হলে, শরীর মেলায়। মেলে না। [illegible], মাংস থাকলে ওই বয়েসের মেয়েরা যুবতী থাকে, লালিত্য থাকলে সুশ্রী হয়, মাজা ঘষা বস্তু থাকলে পুরুষের চোখে ঘোর [illegible] —কামিনী সবটা থেকেই বঞ্চিত। তবু নগেন কামিনীতে সুখ পায়। কামিনীর শরীরের

বৃষ্টি পড়ে মাথায়, সর্বাঙ্গে অবিরাম। পৃথিবীর শীতল দেহ থেকে উঠে আসে ঠান্ডা নিশ্বাস। মাঝে মাঝে নগেনের শরীর ভীষণ কেঁপে ওঠে শীতে। রক্তে বুড়বুড়ি কাটে। নগেন দ্রুত পা চালায়।

মঙ্গলের ঘর পথের দশ গজ দূরে। বেড়ার ফাঁক গলে আলো কচুরপাতায় থল-থল। ছাইগাদা মাড়িয়ে উঠে যায় নগেন দাওয়ায়। ডাকে ঃ মঙ্গল ভাই—

ক্যাঁচ ক্যাঁচ শব্দে দরজা খুলে দাঁড়ায় অতসী, মঙ্গলের বউ। লালপেড়ে মোটা খাটো শাড়ি শরীরের ভাঁজে অগোছাল। নগেনকে দেখামাত্র অতসীর চোখে সুখ উপচায়। রক্ত উথলানো হাসি তার দাঁত ছুঁয়ে ঠোঁটে জড়ো হয়। চোখের তারায় ইসারা কাঁপে।

মঙ্গলের বউ দোরগোড়ায় আটকে থাকে।

—ভেতরে আসবে না ?

—মঙ্গল কোথায় ? ফুঁসানো রক্ত-স্রোত দাঁত চেপে ঠেকিয়ে বলে নগেন।

—মাঠে।

ঘরের ভেতর থেকে কাতরানি ভেসে আসে। অতসী সরে যায় শব্দের নিশানায়। মেঝের বিছানা। মঙ্গলের দুই ছেলে-মেয়ে শুয়ে। ছেলের কপালে হাত রাখে অতসী। গা পুড়ে যাচ্ছে।

—ছেলের কি হয়েছে ? নগেন ঘরের মধ্যে পা রাখে।

—তিনদিন ধরে জ্বর।

—ওষুধ দাওনি ?

—পীরসাহেব জলপড়া দিয়েছে, খাওয়াচ্ছি। ছেলের কপালে হাত বুলিয়ে দেয় অতসী। সেই ফাঁকে ঘর থেকে বেরিয়ে আসে নগেন।

নব্বুই বছরের বুড়ি রায়ঠাকরুণ খক খক কেশে চলে একটানা। হাঁপানির রুগী। সারা বর্ষা কাশতে কাশতে প্রাণান্ত হয়। বিরাট ধসে পড়া বাড়ির একমাত্র জ্যান্ত বাসিন্দা। ছেলে নাতিপুতি কলকাতায়। বুড়ি ভিটেমাটি ছেড়ে কলকাতা যায়নি, জোরাজুরি সত্ত্বেও। কি সেই অনিবার্য মোহ টেনে রেখেছে তাকে, নগেনের সাধ্য হয় জানতে। কাশতে কাশতে রায়ঠাকরুণ বেঁকে যায়, চোখ ঠিকরোতে চায় শিরা ছিঁড়ে, অসংখ্য মশা তার ঢিলেঢালা চামড়া ফুঁড়ে হুল বসিয়ে দেয়, এক গেলাস জলের জন্যে শীর্ণ হাত কেঁপে কেঁপে ঘোরে, ভাতের ফ্যান পড়ে কাঁখালে ফোসকা ওঠে টসটস, তবু রায়ঠাকরুণ স্বামীর ভিটে ছাড়ে না, কেন [illegible] না নগেন জিজ্ঞেস করবে কি এখন ?

না, তার সময় নেই। ঘরে হাড় জির-জিরে বলদ একখানা রুটি চিবিয়ে ঘুমিয়ে আছে, সকাল হলেই চেঁচাবে গিন্নি।

একটা শেয়াল বাঁ থেকে ডান দিকে ছুটে পালাল। নগেন স্তব্ধ হয়ে দেখে মুহূর্তেক।

দূর থেকে নগেন দেখল খালের ধারে বেশ কয়েকটা আলোর কোনোটা স্থির, কোনোটা গতিময়। নগেন বুঝে নেয় আজ দেরি হয়েছে, কিছুটা সময় হারিয়ে ফেলেছে সে। ওদিকটা গেলে সুবিধে নাও হতে পারে ভেবে নগেন উত্তরমুখো হল। উত্তরদিকে দুএকটা মাঠ পার হয়ে গেলে গুটিকতক ডোবা আছে। হয়ত অতদূরে এখনো কেউ গিয়ে পৌঁছয়নি, পৌঁছলেও সংখ্যায় কম।

নগেন বড় বড় পা ফেলে হাঁটে। বৃষ্টির জল জমা একটা নিচু জমি পাশ কাটাতে গিয়েই হ্যাজাকের আলোয় নগেন দেখে দুটো চকচকে চোখ। আল-এর পর স্থির বসে আছে মাথা উঁচিয়ে। নাদুসনুদুস প্রমাণ-সাইজের প্রাণী।

এরকম চারটেতেই কে-জি খানেক। টাকা দুই নগদা নগদ হাতে এসে যাবে। আটটা ধরলে চার টাকা। ষোলটা ধরলে আট টাকা। আরো ধরলে আরো টাকা, অনেক টাকা....।

ঘরের দড়িতে শাড়ি [illegible] ডবল ডবল হয়ে যায়। থালি কলসী শিশি কৌটো ভরে যায় চাল ডাল মশলায়, জিরজিরে হাত-পা মোটা হয়ে গিয়ে বলু [illegible] হয়ে ওঠে, কামিনীর ঢিলেঢালা শরীর ভরাট দেখায় সিনেমার মেয়েদের মত। চোখের সামনে এসব দেখে নগেন। আর দেখে, সে ডাক্তার ডেকে নিয়ে চলেছে মঙ্গলের বাড়ি, অতসীর ছেলের জন্য। এসব ভাবতে ভাবতে প্রসন্ন হয়ে ওঠে তার মন।

শিকার ধরাতে অনভ্যস্ত নগেন। কি ভাবে শুরু করবে ভেবে পায় না। হাত থেকে হ্যাজাকটা লম্বা লম্বা ঘাসে ঢাকা আল-এ নামিয়ে রাখল সে। আলোর বন্যা বইল। বৃষ্টিতে ভেজা ঘাস চকচক করে উঠল। আলতো করে থলি নামাল। শিকারটা এত কাছে যে ছিপের প্রয়োজন হয় না, হাতেই ধরা যায়। নগেন ছিপটাও সতর্কভাবে মাটিতে শোয়ালো। তীব্র আলোর ছটায় অন্ধ প্রাণীটা নিশ্চল, আসন্ন ভবিতব্য জেনেও।

নগেন এক-পা এক-পা এগিয়ে শিকার ধরার জন্যে সবে হাত বাড়াতে যাবে, আরেকটা অদ্ভুত বিরাকৃত প্রাণী লম্বা লম্বা ঘাসের ভেতর থেকে ফুঁসে উঠে দাঁড়িয়ে পড়ে সামনাসামনি। বিশাল ফণার নিচে সাদাকালো ডোরা দাগ। উজ্জ্বল কুটিল চোখ, জিভের লিকলিকানি বিদ্যুৎ ঝলকের মত শূন্যে কাঁপে।

নগেন হাত গুটিয়ে নেয়। একদিকে মানুষ, অন্যদিকে বিষধর সাপ। মাঝখানে সোনালী চামড়ার হৃষ্টপুষ্ট ভেক। আরেকটা প্রাণী—আপাতত খাদ্য, সাপের মানুষের। তাকে আয়ত্তে আনায় সতর্কতা দুজনেরই কঠোর।

চকিতে একটা ছায়া পড়ে সরে যায়। অমনি শব্দ করে ছোবলে যায় সাপের ফণা। সোনালী ভেক লাফ মেরে কিছুটা দূরে গিয়ে পড়ে। একসঙ্গে দুটো হাত দুদিক থেকে খামচে ধরে তাকে। নগেনের হাতের পর অন্যটা শক্ত হাত।

—খবরদার, এটা আমার।

নগেন চোখ তুলে তাকায়। মঙ্গলের [illegible] হিংস্র চোখ সাপের থেকেও ভয়ঙ্কর কুটিল লাগে।

[illegible] নাটকের একটি মুহূর্ত

থিয়েটার আমাদের আন্দোলন

শান্তিরঞ্জন চ্যাটার্জি

বিজন ভট্টাচার্য'র লেখা গণনাট্য সংঘের 'নবান্ন' নাটক থেকে যে নাট্যআন্দোলনের শুরু, আজকে সে আকাঙ্খিত সুষ্ঠু পরিণতির রূপ না পেলেও একথা অনস্বীকার্য যে, নাটকের ক্ষেত্রে এমন একটা কিছু অগ্রগতি ঘটেছে, যাকে সঠিক অর্থে সৎ বা ঠিক নাটকের পর্যায়ে ফেলা যায়। এবং সেই অর্থেই বলা যায় গত তিন দশক ধরে এই নাট্যআন্দোলনের মোটামুটি একটা রূপরেখাও গড়ে উঠতে পেরেছে। এর জন্যে বহু নাট্যগোষ্ঠী প্রচুর শ্রম ও ক্ষতি স্বীকারও করেছেন, যার ভিত্তিতে আজকের এই গ্রুপ থিয়েটার অথবা ঘুরিয়ে বলা যায় থিয়েটার গ্রুপগুলি অস্তিত্ব বজায় রেখে একটা পরিণতির কাছাকাছি এসে পৌঁছতে পেরেছে। যেটা একদিন অত্যন্ত কঠিন প্রচেষ্টা ছিল, আজকে তাকে আন্দোলন বলা যেতে পারছে।

কিন্তু সঠিক অর্থে সত্যি কি নাট্যআন্দোলন সেকাল থেকে একালে খুব একটা এগিয়েছে? নাকি ফর্ম, প্রয়োগ আর টেকনিকের মধ্যে এসে পথ গুলিয়ে ফেলেছে সেই নাট্যআন্দোলন নামক বাক্যটি। একালের কারুর কারুর মতে 'নবান্ন' বা 'রক্তকরবী'র চেয়ে এক পাও নাট্যআন্দোলন এগোয়নি। শুধু চতুরভাবে রূপ বদল করেছে মাত্র। সেই আন্দোলন যদি সত্যি সত্যি এগুতো তাহলে এখনও ব্যবসায়িক মঞ্চগুলি সমানে নাটক নিয়ে নিরংকুশ ব্যবসা করে যেতে পারতো না। সৎ নাটকই সৎ দর্শককে টানতো। তা না হয়ে বরং সৎ দর্শক একটা ধাঁধার মধ্যে পড়ে আছে। তবে এটা ঠিক, নাট্যআন্দোলনের ঘোড়া তেমনভাবে না ছুটলেও, নাটকের ক্ষেত্রে 'রক্তকরবী'র চেয়েও জোরদার কোন বক্তব্য না রাখতে পারলেও নাটকের ক্ষেত্রে যে পালা বদল ঘটেছে এটা স্পষ্টই বোঝা যায়। এখনকার নাটকের দর্শক যেমন বেড়েছে, তেমনি ফর্ম, টেকনিক ইত্যাদির সঙ্গে নাটকের কাহিনীর ক্ষেত্রেও একটা আন্তর্জাতিক এবং সচেতন সামাজিক চিন্তাধারার প্রতিফলন অনুভূত হচ্ছে। এটাও বড় কম কথা নয়। অগ্রগতি না হোক, নাটক যে দাঁড়িয়ে নেই, কি দাঁড়িয়ে পড়েনি, এটা তারই বড় প্রমাণ। প্রগতিশীল নাট্যদলগুলির কাছে সেটাই নাট্যআন্দোলনের হাতিয়ার এবং স্বীকৃতি।

থিয়েটার নিয়ে আন্দোলন এবং থিয়েটারের মাধ্যমে আন্দোলন, কথাটা যা-ই হোক না কেন, এর শরীক এখন অনেক। নাটক এবং নাটকের বক্তব্য নিয়েই যাঁরা পরীক্ষা-নিরীক্ষা এবং কৃচ্ছ্রসাধন করে যাচ্ছেন। অপর দিকে এর সুযোগ নিয়ে কিছু ঘোলা জলও ঢুকে পড়েছে, যাদের একমাত্র উদ্দেশ্য এই 'পবিত্র শর্ত'টি ভাঙিয়ে নিজেদের স্বার্থসিদ্ধি করা, এমন অনুযোগও শোনা যায়। কেউ কেউ আবার অস্তিত্ব রক্ষার জন্য, বেশী করে দর্শক আকর্ষণ করার জন্য, অর্থাৎ সোজা কথায় বলা যায়, টিকিট ঘরের দিকে তাকিয়ে, কমার্শিয়াল নাটকও করেন। বলা বাহুল্য যুক্তি দেখিয়েই।

তবু বলবো, যাঁরা সৎ নাটক, ঠিক নাটক করেন তাঁদের সেই প্রচেষ্টার নাম সঠিক অর্থে 'নাট্যআন্দোলন'ই।

অরুণ মুখোপাধ্যায় (চেতনা)

প্রথমত নাটক মঞ্চসফল হবে কি না আগে থেকেই একথাটা ভেবে নিয়ে নাটক করি না আর আমার মনে হয় কারুর পক্ষেই সেটা বলা সম্ভবও নয়। অন্তত আমাদের মত যাঁরা নাটকে পরীক্ষা-নিরীক্ষার কথাটা সবচেয়ে আগে স্থান দেন। তবে এটা ঠিক যে,

নাটক করা সার্থক হোক, নাটক মঞ্চসফল হোক, এটা আমরা সবাই এবং সব সময়ই চাই। তার কারণ আমাদের উদ্দেশ্য তো নাটককে বেশী লোকের কাছে পৌঁছে দেওয়া। সেই অর্থে যত বেশী লোক আমাদের নাটক দেখবে, ততই তাকে আমরা সার্থক ও মঞ্চসফল নাটক বলবো।

তবে 'প্রাক্তাকলন মারাতে ভয় কি করে না ? নিশ্চয়ই করে। শুধু নাটক দেখাই নয়, তাকে সঠিক এবং দর্শকগ্রাহ্য করে তাঁদের কাছে পৌঁছে দেবার মধ্যে যে দায়িত্ব, যে পরিশ্রম, অর্থব্যয়, সম্মিলিত প্রয়াস এবং সঠিকভাবে আমাদের বক্তব্যটি নাটকের মাধ্যমে উপস্থাপিত করতে পারলুম কিনা বলে যে উৎকণ্ঠা থাকে তারও তো মূল্য কম নয়। তাই ভয় বা দুর্ভাবনা একটা থেকেই যায়।

যেমন ধরুন, আমাদের প্রথম নাটক 'মারীচ সংবাদ'। এ নাটক মঞ্চস্থ করার সময় কি আমরা ভাবতে পেরেছিলুম যে, ঐ প্রথম নাটকই আমাদের যশ এবং সার্থকতা এনে দেবে ? সবিনয়ে এখানে একটা কথা বলে রাখি। সারা ভারতে 'চেতনা' গোষ্ঠীই বোধহয় প্রথম যাঁরা প্রথম নাটকেই সার্থক হয়েছিল এবং নাট্য জগতে সামান্য হলেও একটা হাওয়া বদল ঘটিয়েছিল। যোগ্যতার কথা আমি বলি না, কিন্তু এটা ব্যতিক্রম অবশ্যই। তবে 'মারীচ সংবাদ' আমাদের যে অনুপাতে খ্যাতি এনে দিয়েছে (মঞ্চে সাফল্যের দিক থেকে), সেই অনুপাতে পয়সা পাইনি। গ্রুপ থিয়েটারগুলিকে (এবং প্রথম দিকে আমাদেরও) ধার-দেনা করে করেই নাটককে জিইয়ে রাখবার প্রাণান্তকর প্রয়াস করতে হয়। কলকাতায় আমাদের মোটামুটি পঁচিশটা শো লাভ এনে দিয়েছে, পঞ্চাশটা শো-তে নো লাস নো গেন, বাকিগুলি লসই বলব, কারণ আমাদের টিকিটের দাম বেশী নয়। সেই লসটা আমরা পূরণ করি বাইরে 'কল-শো' করে। অন্যদের কথা অবশ্য জানি না।

তবে শুনলে অবাক হবেন, আমাদের দ্বিতীয় নাটক ব্রেশটের 'ভালো মানুষের পালা'র প্রথম দিন (কলামন্দিরে) কাউন্টার খোলার সঙ্গে সঙ্গেই লাইন পড়ে গিয়েছিল। অথচ সে নাটক আমাদের পরের শোতে তেমন অর্থ দেয়নি, তবে সেল বাড়ছিল, এটা ঠিক।

: সে নাটক বন্ধ করে দিলেন কেন ? লস হবার ভয়ে ?

: না। বলতে পারেন বন্ধ করে দিতে বাধ্য হলাম ভেতর ও বাইরের কিছু কিছু অসুবিধার জন্যে। তবে এটা ঠিক, 'ভালো মানুষের পালা' আমরা আবার করব, সেটা অর্থ না দিলেও। তার কারণ আমার মতে 'ভালো মানুষের পালা' সত্যিকারের একটি ভাল এবং সৎ নাট্য-প্রচেষ্টা।

: 'মারীচ সংবাদ' মঞ্চসফল হবার মূল কারণ কি আপনার মতে ?

: এর আঙ্গিকে এমন কিছু আকর্ষণ নেই, বক্তব্যেও তেমন বলিষ্ঠ কোন ভাবনা নেই, তবে গান এবং অভিনয় খ্যাতি অবশ্য আছে, তার চেয়েও বড় কথা, 'মারীচ সংবাদ'-এর সার্থকতার মূল চাবিকাঠিটি হল এর স্পন্টেনিটি বা স্বতস্ফূর্ততা। এ নাটকে এমন একটা স্বতস্ফূর্ত ভাব আছে, যা এর সম্পদ। যেটা তাকে স্বাতন্ত্র্য এনে দিয়েছে। অথচ দেখুন 'ভালো মানুষের পালা'য় ক্র্যাফ্টসম্যানশীপ অনেক বেশী, চরিত্র বিশ্লেষণ অসাধারণ এবং নতুন এমন একটা উদ্ভাবনী ক্ষমতা রয়েছে এ নাটকের মধ্যে যা ফুটিয়ে তোলা হয়তো এখনও বিয়ণ্ড আওয়ার ক্যাপাসিটি। সেই সব ব্যাপারের জন্যই বোধহয় আমরা তাকে সঠিক অর্থে দর্শকদের কাছে পৌঁছে দিতে পারিনি। নাটক করার পেছনে আমাদের যে শর্ত—সৎ, সুস্থ, মানবিক আবেদন সমৃদ্ধ এবং মানুষের উত্তরণের জন্য যে সংগ্রাম, তার প্রতি শ্রদ্ধাবান হওয়া—এই শর্তগুলি পূরণ করা যে নাটকের মাধ্যমে সম্ভব, আমরা তাকেই বলি ঠিক নাটক, এবং সর্বদাই সেটা বলি। আর একটা কথা, তার সঙ্গে সেই উপস্থাপিত চরিত্রগুলির অর্থনৈতিক দিকটাও দেখি। শিল্পক্ষেত্রে অর্থনৈতিক সংগ্রামকে আমরা কখনই ছোট করে দেখি না। তবে নাটক অবশ্যই শিল্পোত্তীর্ণ হতে হবে। এই ঠিক নাটক করা এবং তাকে মঞ্চসফল করা আমাদের আদর্শ। ঠিক নাটক নয় অথচ মঞ্চসাফল্যের সম্ভাবনা বেশী, তেমন নাটক আমরা কখনই করবো না, তবে ঠিক নাটককে মঞ্চসফল করার জন্যে কমার্শিয়াল প্রসিডিওর, অর্থাৎ তাকে জনপ্রিয় করার জন্যে যদি (অর্থাৎ টিকিট বিক্রি বাড়ানোর জন্যে) বিজ্ঞাপনকে পেশাদারী করতে বা ব্যবসায়িক কায়দা-কানুন প্রয়োগ করতে হয়, তাতে কখনই কার্পণ্য করব না। সেটা অবশ্যই ভেজাল দিয়ে নয়, আদর্শ বজায় রেখেই। তবে অর্থনৈতিক দিকটাও তো দেখতে হবে। তার ওপরেই আমাদের অস্তিত্ব নির্ভরশীল। আর এর বড় কারণ হল, এর কোন বিনিময় ব্যবস্থা নেই বলেই ঐ ব্যবস্থা নিতে হয়। বিনিময় ব্যবস্থা বলতে আমি বুঝি নিরাপত্তা। যদি শুধুমাত্র নাটক করাটাই আমাদের শুধুমাত্র কর্তব্য, সব দায়িত্ব অন্যে নেবে তাহলে এর কোন প্রয়োজনই হোতো না।

অরুণ মুখোপাধ্যায়

তাই বলে নিছক প্রচারধর্মী নাটক করাও আমাদের উদ্দেশ্য নয়। যদিও পৃথিবীর সব নাটকই প্রচারধর্মী। তবে সেটা অন্য অর্থে। একটা নাটককে তখনি আমরা প্রচারধর্মী বলি যখন সে সৎ শিল্পধর্মী আদর্শ থেকে বঞ্চিত। আর শুধু অর্থনৈতিক সমস্যাটা মিটলেই চলবে না, কারণ অর্থনৈতিক অবস্থার সঙ্গে মানসিক অবস্থারও সম্পর্ক আছে, তারও পরিবর্তন প্রয়োজন। সেটা কিভাবে আসবে আমি জানি না। তবে একটা পরিবর্তন হওয়া দরকার। যা সমাজের পরিবেশ সুস্থ ও মানবিক সম্পর্কের অনুকূল হবে।

সত্যিকথা বলতে কি, আমি-মধ্যবিত্ত সমাজকে যেমন গভীর-ভাবে চিনি, আমি যাদের নিয়ে নাটক লিখেছি (রাম যাত্রা), সেই কৃষক সমাজকে ততটা গভীরভাবে চিনি না। তাদের সম্বন্ধে আমার

ধারণা বলতে পারেন পড়াশুনা করে, শুনে—অর্থাৎ থিওরেটিক্যাল। কিন্তু আমি মনে করি তারাই সমাজের মূল কাঠামো। তাদের মাধ্যমেই একমাত্র সমাজ বিপ্লব সম্ভব। সেই অনুপ্রেরণারই আমি 'রামযাত্রা' লিখেছি। সাধারণ মানুষের জীবন নিয়ে, ছোট ছোট লোকদের নিয়ে নাটক লিখবো বলেই আমার 'রামযাত্রা' লেখা। রামযাত্রা প্রথমে ছিল ওয়ান এ্যাক্‌ট্‌। তখন নাম ছিল 'রঙ্গীন সংবাদ।'

চেতনার নতুন নাটক 'জগন্নাথ'। জগন্নাথ নাম একটি কৃষক চরিত্রের নাম। সে কৃষক চিরকাল বঞ্চিত এবং অবহেলিত, অথচ মানুষ হিসেবে আমাদের সমাজের নিচে তলায় যে যার থেকে থেকে বেঁচে আছে। আমি চীনের বিখ্যাত লেখক লু সুনের 'আর সত্য কাহিনী' গল্প পড়ে ইন্সপায়ার্ড হয়েই কিছু পাল্টে ভারতের পটভূমির সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে তাকে নাট্যরূপ দিয়েছি। বলতে পারেন সম্পূর্ণই পরীক্ষা-নিরীক্ষামূলক নাটক। তাই এ নাটক মঞ্চসফল হবে কিনা সন্দেহ আছে। তবু আমরা এ নাটক করছি, তার কারণ আমরা যাকে ঠিক নাটক বলি, অর্থাৎ সুস্থ সমাজ গঠনের পক্ষে অনুকূল, পরিচ্ছন্ন সৎ নাটকের শর্ত পালন করবো বলে। আমরা আশাবাদী এবং বিশ্বাস করি যে সৎ নাটকের প্রচেষ্টা কখনও মার খায় না। নাটক করার সার্থকতাই সেখানে। যাঁরা বলেন এ দেশে এখনও দর্শক তৈরী হয়নি, আমি তাঁদের সঙ্গে একমত নই। ভাল জিনিস দিলে দর্শক নিশ্চয়ই তা নেবে। এ-দেশের মানুষ নাটক দেখতে ভালবাসে। এবং সেটা বহুযুগ আগে থেকে ধারাবাহিকভাবেই। নাটক যদি পরিচ্ছন্ন এবং সৎ হয় তাহলে সে নাটক ভাল লাগবেই। জর্জ বার্নার্ড শ'র মত আমিও বিশ্বাস করি যে, ভাল নাটক খারাপ প্রযোজনা হলেও জমবে।

ঃ ইদানিং কালের কোন্ নাটক আপনার ভাল লেগেছে ?

থিয়েটার কমিউনের 'দামসাগর' আমাকে দারুণ উৎসাহিত এবং আশাবাদী করে তুলেছে। এই প্রসঙ্গে আর একটি সহজ সরল নাটকের কথা বলতে পারি। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের গল্পের নাট্যরূপ (আমারই দেওয়া) 'হারানের নাতজামাই'। সুস্থ মানবিক গল্প, বাঁচার সংগ্রাম, সহজ সরল নাট্যরূপের জন্যে ওটা আমার ভাল লেগেছে। দর্শকের ভাল লাগার শর্তও সেটাই বলে আমি বিশ্বাস করি। আসল কথা, নাটক সমাজের সুস্থ মানসিক সম্পর্কের অনুকূল হওয়া চাই। আর সেই শর্ত পূরণ করার জন্য যে কোন রকমের ঝুঁকি নিতে আমরা প্রস্তুত।

শিবকুমার ঝুনঝুনওয়ালা (সর্জনা)

অত্যন্ত মার্জিত চেহারা, বঙ্গালী, রুচিবান পুরুষের সঙ্গে কোথায় যেন মিল রয়ে গেছে, বেশ ভাল বাংলা বলেন, কথা বলার ধরনটি যেমন মিষ্টি তেমনি অন্তরঙ্গ, বিখ্যাত নাট্যকার বাদল সরকারের সম্পর্কে পঞ্চমুখ এই মানুষটি সম্প্রতি বাদল সরকারেরই যে বাংলা নাটকটি হিন্দী ও বাংলার মিশ্র ভাষাভাষী দর্শকদের উপহার দিয়েছেন, তার নাম 'সারা রাত্তির'। যার হিন্দী নাট্যরূপও তিনি উপহার দিয়েছেন। দুটি নাটকই তিনি পরিচালনাও করেছেন।

শুধু এই নাটকই নয়, অনামিকার তরফ থেকেও তিনি একাধিক নাটক পরিচালনা করেছেন।

নাট্যকার বাদল সরকার সম্পর্কে শিবকুমারবাবুর মন্তব্য ঃ এত বড় একজন নাট্যকার শুধু ভারতে কেন, পৃথিবীতেও কম আছে। তাই তাঁর খ্যাতি এখন বিদেশেও পৌঁছে গেছে। আর বাদলবাবুই একমাত্র নাট্যকার যিনি আজও কোন কিছুর সঙ্গে কমপ্রোমাইজ করেননি, নিজের আদর্শ বজায় রেখেছেন। তাঁর মত অত স্ট্রাগল আর কেউ করেন নি। তিনি এখনও যেভাবে নাটক নিয়ে

শিবকুমার ঝুনঝুনওয়ালা

হওয়া উচিত। সত্যি কথা বলতে কি, কম-বেশী সবাই তো কমপ্রোমাইজ করছে। যেমন ধরুন, যে বাংলা নাটক আমাদের পথ দেখিয়েছে, সেই বাংলা নাটকই এখন ক্রমশ কমার্শিয়াল হয়ে যাচ্ছে। দশ বারো বছর আগেও বাংলা নাটক নিয়ে এক্সপেরিমেন্ট হোতো, এখন সেই রকম প্রচেষ্টা কোথায় ? তাই বাংলা নাটক, লোকে যতই বলুক না কেন, এগুচ্ছে না। হঠাৎ যেন থমকে দাঁড়িয়ে পড়েছে। আসলে ফাইটিং স্পিরিটটাই এখন নেই।

আমার প্রশ্ন ঃ আপনি তো বাঙালী নন, এ দুঃসাহস করে বাংলা নাটক করলেন কেন ?

ঃ আমি বাংলাদেশের মানুষ। এখানেই আমাদের ঘরবাড়ি ব্যবসা-পত্তর ইত্যাদি। সেদিক থেকে এটা আমার কর্তব্য মনে করি। আর আমাদের ইচ্ছে আছে মাঝে মাঝেই বাংলা নাটক করে হিন্দী নাটকের দর্শকদের টেস্ট পাল্টানো। আমি হিন্দী বা বাংলাভাষী দর্শকদের মধ্যেকার বেড়া ভাঙতে চাই। এটার প্রয়োজনও আছে। আমাদের সর্জনা ইউনিট তৈরী হয় '৭২ সালে। প্রথম এটা ছিল ডান্স ও মিউজিকের একটা ইন্সটিটিউশন বা বিদ্যালয়। উদ্দেশ্য ছিল ক্লাসিক্যাল ডান্স ও মিউজিকের উন্নতি। সেই উদ্দেশ্যেই স্বর্গত সঙ্গীতকার কে কে ভার্মা এর সৃষ্টি করেন। তিনি গত বছর মারা গেছেন। নাটক করছি হালে। আমাদের সংস্থার একটা মূল উদ্দেশ্য হল বাংলাদেশের, তিনি যে ভাষাভাষীর বা জাতের লোকই হন না কেন, যে সব ট্যালেন্ট পৃষ্ঠপোষকতার অভাবে প্রতিভা স্ফুরণের সুযোগ পাচ্ছেন না, তাঁদের সুযোগ করে দেওয়া। যেমন ধরুন কিছুদিন আগে কথক ড্যান্সার চিত্রেশ দাসের (প্রহ্লাদ দাসের ছেলে) একটা অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করেছিলাম আমরা কলা-মন্দিরের বেসমেন্টে। ছেলেটি দারুণ নাচে, আমেরিকায় আলি আকবর মিউজিক কলেজে নাচ শেখায়, কিন্তু এখানে কেউ তাকে

ইংরেজী মৃচ্ছকটিকম্ নাটকের দৃশ্য

আগামীতে আমরা আরো একটি বাংলা নাটক করবো বলে ঠিক করেছি। তারআগে ইচ্ছে আছে 'মৃচ্ছকটিকম'-এর ইংরেজী মঞ্চস্থ করার। (তার সঙ্গে সঙ্গেই করছি 'যদি আর একবার'-এর হিন্দী। এর পরে ইচ্ছে আছে হিন্দী আর্টিস্ট দিয়েই বাংলা নাটক করাবো।) পরিচালক আমি নিজেই। নামিকাতে আমার পরিচালনার প্রথম বই 'চাটনী টমাটোর কী'। এছাড়া ওখানে 'বাকি ইতিহাস' (বাদল সরকারের নাটক), 'ইস আন্ধেরে মে'ও ডাইরেক্ট করেছি।

আমি অভিনয় করি অবশ্য একাত্তর সাল থেকেই (অনামিকায়)। আজ পর্যন্ত অনেক নাটকেই অভিনয় করেছি। এছাড়া টেলিভিসনেও হিন্দী নাটকে অভিনয় করেছি। নাটকের উন্নতির জন্যে তো বটেই, তাছাড়া অভিনয়টা আমার একটা নেশাও বলতে পারেন। অভিনয় করার সময় ভেতর থেকে যেন একটা আগুনের স্পর্শ পাই।

ঃ কি উদ্দেশে নাটক করেন ?

ঃ প্রধানত মানুষের মধ্যে মানবিকতাবোধ জাগিয়ে তোলার জন্যে। এটা আমার কর্তব্য মনে করি। তাছাড়া হিন্দী ও বাংলা নাটক করে বেড়া ভাঙতে চাই।

ঃ গ্রুপ থিয়েটার সম্পর্কে আপনার কি মত ?

ঃ ওটা একটা ভেগ টার্ম। সব নামেই গ্রুপ। আসলে সবই ওয়ান ম্যান শো। যেটা করা উচিত ইউনাইটেডলি, সেটা কি হয় ? একজনের ইচ্ছায়ই তো দলগুলি চলে।

ঃ আপনাদের দলে কি বাঙালী শিল্পী আছে

'সারা রাত্তির' নাটকের তিনজন শিল্পীই বাঙালী। আগামী হিন্দী নাটকেও (যদি আর একবার-এর হিন্দী) তিনজন বাঙালী আছে। এছাড়াও আমাদের দলে বহু বাঙালী শিল্পী আছে।

ঃ দর্শক কেমন এবং কোন্ শ্রেণীর ?

ঃ আমাদের নাটকের বাঙালী দর্শকও আছে। অবাঙালীদের মধ্যে মিডল ক্লাস, হায়ার মিডিল ক্লাস এবং সাধারণ শ্রেণীর লোকই বেশী।

ঃ নাটক করে সংগৃহীত অর্থ কি ভাবে অর্থাৎ কি প্রয়োজনে ব্যয় করেন।

ঃ নাটক হাউসফুল হলেও অর্থ উদ্বৃত্ত হবার কোন চান্সই নেই। কারণ আয়ের চেয়ে ব্যয় বেশী। তাই উল্টে ধারই হয়। সেই ঋণ শোধ করি বছরের শেষে মেম্বারদের মধ্যে থেকে চাঁদা তুলে। প্রোডাকসন কস্ট, হলভাড়া ইত্যাদি খরচ একটা নাটকের কখনই টিকিট বিক্রি থেকে ওঠে না। তবে আমার প্রিন্সিপালটা হোলো নাট্যকার, শিল্পী, পরিচালক সবাইকেই মর্যাদাসম্পন্ন এমাউন্ট টাকা দেবার জন্য ব্যবস্থা করব ভবিষ্যতে। এটা একদিকে যেমন তাঁদের প্রাপ্য স্বীকৃতি, তেমনি তাঁরা যাতে এই নাটক নিয়েই থাকতে পারেন, তার সিকিউরিটি। অর্থাৎ শিল্পীরা এটাকে যাতে পেশা হিসেবে নিতে পারে তার ব্যবস্থা করা। আমার আর একটা উদ্দেশ্য হল, ট্যালেন্টকে তুলে ধরা। অর্থাৎ প্রতিভা স্ফুরণের ব্যবস্থা বা তার আবহাওয়া সৃষ্টি করা। এই নাটক থেকে আমার কিছু চাই না। কারণ আপনাদের শুভেচ্ছায় আমার সে সঙ্গতি আছে।

ঃ শুধুমাত্র বাংলাদেশের নিজস্ব একটা নাট্যমঞ্চ গড়ে তোলার কোন প্রচেষ্টা হলে কি আপনারা তাতে অংশ গ্রহণ করবেন ?

ঃ নিশ্চয়ই থাকবো, এবং সেটা যে কোন শর্তেই। তবে তার পরিবেশটা মনের মত হওয়া চাই এবং আমার দলের স্বাধীনতা থাকা চাই সেখানে। আমি বিশ্বাস করি সবাই এক হলে ব্যাপারটা আদৌ অসম্ভব নয়। তবে একটা কথা, দায়িত্বটা আলটিমেটলি কারুর না কারুর ওপর ছাড়তেই হবে। আর আমার ব্যক্তিগত মত হল মুক্ত অঙ্গনের মত আর একটা মঞ্চ হলেই খুব ভাল হয়। যেখানে খুব কম খরচায় ছোট ছোট দলগুলি তাদের পরীক্ষামূলক নাটক মঞ্চস্থ করাতে পারবে। এই সঙ্গে আর একটা কথা স্পষ্ট করেই বলতে চাই। সেটা হল আমার নাটক নিয়ে যত কিছু পরীক্ষা-নিরীক্ষা সবই আমি এই কলকাতাতেই করতে চাই। কারণ আমি মনে প্রাণে বিশ্বাস করি যে আমি কলকাতারই মানুষ। আর এমন মর্যাদাসম্পন্ন জায়গা আর কোথাও নেই। বোম্বেতে নাটক লেখা হচ্ছে প্রচুর। কিন্তু এখানকার মত সঠিক প্লেরাইট সেখানে অবশ্যই নেই। কিন্তু দুঃখের বিষয় এখন আর তেমন নাটক নিয়ে এক্সপেরিমেন্ট হচ্ছে না এখানে।

ঃ বাদলদার ছাড়া আর কোন নাট্যকারের নাটক আপনাকে নাড়া দেয় ?

ঃ যেমন ধরুন মোহিত চট্টোপাধ্যায়। আর অভিনয় ও প্রোডাকশনের দিক থেকে শেখরবাবুর গ্রুপের নাটক আমার খুব ভাল লেগেছে। এছাড়া বাংলা অনেক নাটকই আমার ভাল লাগে।]

ঃ আপনারা কি কোন সরকারী অনুদান পান ?]

ঃ না। চাইও না। সরকারী সাহায্য পেয়ে অন্য দলগুলিই বা কি করছে ? আর সরকারী আওতায় গেলে সত্য কথা স্পষ্ট করে বলা যাবে না। তাই একাডেমী হেল্প অন্যরাই নিক, আমাদের প্রয়োজন নেই। বরং সেই টাকাটা কোন কালচারাল গ্রুপ পাক এটাই চাই। আর সেটা পাইয়ে দেবার জন্যে এমন কিছু সৎ লোক থাকা দরকার যাঁরা (অন্তত দশ বারো জনের একটা কমিটি) নিরপেক্ষ ভাবে সেইরকম কিছু দলের নাম বেছে সরকারকে তাদের সাহায্য করতে বলবে। অর্থাৎ আমি চাই ঐ টাকাটা সৎ ও প্রয়োজনীয় কাজে

তার যোক। আর সেই সঙ্গে নাটকের ওপর থেকে সরকারী ট্যাক্স অবিলম্বে উঠে যাওয়া উচিত।

ঃ বিদেশী নাটক করা সম্পর্কে আপনার কি মত ?

ঃ বিদেশী নাটক করার খুব একটা ইচ্ছে নেই। অন প্রিন্সিপ্যাল আমি প্রেফার করি না। কেন, এদেশে কি তেমন নাটক নেই কিংবা যোগ্য নাট্যকার নেই ?

ঃ জাতীয় নাট্যশালা সম্পর্কে আপনার কি মত ?

ঃ ওটা তো সরকারী প্রচেষ্টা ছাড়া সম্ভব নয়, যখন তার টনক নড়বে তখন সে করবে। হলে অবশ্য খুবই ভাল। অন্তত কমন একটা 'প্ল্যাটফর্ম' তো হবে।

ঃ ইদানিং প্রায়ই দেখা যাচ্ছে, পুরোনো দল ভেঙে নতুন দল হচ্ছে। কেন ?

ঃ মতভেদ বা ব্যক্তিগত ইন্টারেস্টে ঘা পড়লেই দল ভাঙে। তাছাড়া আর একটা কারণ আইডিয়া ফুলফিল করার টেণ্ডেন্সী। সেই দিক থেকে ওটা হেলদি নিশ্চয়ই।

বিভাস চক্রবর্তী (থিয়েটার ওয়ার্কসপ)

গণনাট্য, নবনাট্য, সৎ নাট্য, ঠিক নাটক, গ্রুপ থিয়েটার ইত্যাদি যে নামেই অপেশাদারী আধুনিক নাটককে অভিহিত করা হোক না কেন, শুরু থেকে আজ পর্যন্ত বিবর্তনের মধ্যে দিয়ে তার যে চেহারা এসে দাঁড়িয়েছে, তা মোটামুটি এই রকম ঃ মুষ্টিমেয় কিছু নাট্যপ্রেমী ব্যক্তি একজোট হয়ে নিজেদের বিষয়গত ও প্রয়োগগত ভাবনা-চিন্তা অনুযায়ী থিয়েটার করেন। সাধারণত এইসব নাট্য-কর্মীরা কোন পারিশ্রমিক পান না।

থিয়েটার ওয়ার্কশপ আজ পর্যন্ত আটটি পূর্ণাঙ্গ (রাজরক্ত, চাক ভাঙা মধুর'র পর আমাদের নতুন নাটক নরক গুলজার) এবং পাঁচটি একাংক নাটক প্রযোজনা করেছে। এক একটি নাটক মঞ্চস্থ করতে পাঁচ শো থেকে পাঁচ হাজার টাকা খরচ পড়ে। কখনও কম-বেশীও হয়। এটা হোলো প্রথম অভিনয়ের আগে প্রযোজনা ব্যয়। বর্তমানে প্রতি শো-তে অন্তত দু' হাজার কিংবা তার বেশীও খরচ হয়। তাই কোন শো-তেই এখনো লাভের মুখ দেখিনি। সুতরাং সৎ কাজের জন্য অর্থ সঞ্চয়ের কোন প্রশ্নই ওঠে না। কল শো অবশ্য আমরা চিরকালই ভাল করি। ইদানিং একটু কমেছে। নাটক ভেদে কল শো'র রেট ঠিক করা আছে। তবে কম টাকায় কল শো করার জন্য আমাদের থিয়েটার ওয়ার্কশপের সুনাম এবং দুর্নাম দুই-ই আছে।

আমাদের নাটকে রাজনীতি ও সমাজ সম্পর্কে আমাদের নিজস্ব ভাবনা-চিন্তার প্রতিফলন থাকে অবশ্যই। নিছক প্রমোদ বিতরণের জন্য আমরা থিয়েটার করি না। আমাদের দলের বেশীর ভাগই মধ্যবিত্ত—এদের মধ্যে চাকুরে, বেকার এবং রাজনৈতিক আদর্শে বিশ্বাসী লোকজন আছেন।

মক্ষিরানীরাই দায়ী

হেমন্তের শেষ বিকেল। গঙ্গার দিকে একটা অদ্ভুত লালচে আভা। ময়দানের ঘাস মাড়িয়ে দুজনে যেন কখন হাঁটতে আরম্ভ করেছিলুম আউটরামের দিকে। ওই-ই কথা বলছিল—তুই অনেক পাল্টেছিস ! বেশ মোটাসোটা চকচকে নুখেল গাইয়ের মত। উচ্ছ্বাস টুচ্ছ্বাস অনেক কমেছে।

বাধা দিলুম—তুই কিন্তু একই রকম।

হাঁটতে হাঁটতে সিগারেটটায় বেশ জোরে টান দিয়ে দার্শনিকের গলায় বলল—দূর পাগল, মানুষ কি চিরকালই একই রকম থাকে ? প্রতিদিনই আমাদের কত ছোট ছোট পরিবর্তন ঘটছে।

ওর মুখের দিকে তাকালুম। তীক্ষ্ণ নাকের ভাঁজে, চশমার আড়ালে ভাসা-ভাসা চোখে, একটু লালচে ধরনের মুখে কোথায় যেন একটা বিষাদের সুর ছড়িয়ে ছিল। যা আমি ঠিক ধরতে পারলুম না। নিজের মনেই ও বলে যাচ্ছিল—এই ত আবীর ব্যানার্জী আর আজকের এই আমি কি এক ? আগে মনে হত দেখে নোব এই শহরটাকে ! পাগলা করে দোব মানুষগুলোকে। এখন কি মনে হয় জানিস, তোরাই ঠিক। ভালো চাকরি, মিষ্টি বৌ, ফুটফুটে ছেলেমেয়ে, সুখী পরিবার !

কথায় কথায় আমরা গোয়ালিয়র মনুমেন্টের কাছে চলে এসেছিলুম। এক সময় আবীর বলল—চল ওখানটায় বসি !

এক সময় ওকে জিজ্ঞাসা করলুম—গ্রুপটা তুলে দিলি তাহলে ?

কথাটা শুনে একবার ও আমার দিকে তাকাল, তারপর একটু ম্লান হেসে বলল—কি হবে এসব করে ?

—সে কিরে, একদিন ত বলতিস থিয়েটারই তোর জীবন।

—কিন্তু জীবনটা বোধহয় থিয়েটার নয় ! মাঝে মাঝে মনে হয় ছত্রিশ বছর বয়সটা পর্যন্ত জীবনটাকে নিয়ে ইয়ার্কি মেরে গেলুম ! আর পাঁচজনের মত যদি কেরিয়ার টেরিয়ার নিয়ে মাথা ঘামাতুম—এদ্দিনে কি আর কোন মার্চেন্ট অফিসের মাঝারী একজিকিউটিভ হতে পারতুম না। সবটাই বরাত !

আবীর হঠাৎ চুপ করে গেল। এটা ওর স্বভাব। বরাবরের। আগেও দেখতুম, সেই কলেজ লাইফে, কফি হাউসে একাই অনেক বকবক করে, সবাইকে ক্ষেপিয়ে হঠাৎ কখন ও নিজের জগতে ডুব দিয়ে দিত।

থিয়েটার পাগল আবীর ব্যানার্জী। ছোট থেকে স্বপ্ন দেখত স্টেজে আর নাটকে একটা কিছু না করে ছাড়বে না। পাশটাশ করে আমরা ওর কাছাকাছি বন্ধুর দল যে যার ধান্দায় হারিয়ে গেলুম। কিন্তু আবীর লড়ে যেতে চাইল নাটক নিয়ে ! কলকাতার বাইরে থেকে কাগজে ওদের দলের নামটাম দেখতুম। ওরা রেগুলার শো-টো করে যাচ্ছে তাও শুনতে পেতুম। দলটা বেশ নামও করেছিল। হঠাৎ কেমন করে যেন ভাঙতে শুরু করল !

—হ্যাঁরে, অবনীশদার খবর কি ? কি করছে এখন ?

আবীর যেন ক্ষেপে গেল—জোচ্চোর, ঠগ ! আসলে ওদের ধান্দা কি জানিস, বোকা ছাগলের মাথায় পা রেখে কাম্যো জিতিয়ে যাওয়া। আমরা খাটি আর্টিস্ট বেচে মা-বোনেদের গয়না বন্ধক রেখে শো করার টাকা জোগাড় যায় আর এইসব সো কল্ড ডিরেক্টারগুলো নাইয়ের মজাটি নিয়ে বাসরে ছাঁক ঘুরিয়ে যাবে ! খাটব আমরা, নাম বাগাবে ওরা। খালি চান্স খুঁজবে কি করে নিজের আখের গোছানো যায় ! আর সব থেকে মারাত্মক কারা জানিস, ঐসব মক্ষিরানী।

—মক্ষিরানী ? সে আবার কে ?

—ঐ যে তোদের বিশুদ্ধ ভাষায় নায়িকা, হিরোইন। আসলে কি জানিস, যেমন পরিচালকরা সিঁড়িকরণ তেমনি এই মেয়েগুলো ধান্দাবাজ। নাটক করতে আসে, দল তৈরি করতে আসে। ওসব কিছু নয়, সেফ নিজেদের আখের তৈরি করার তাল। মনে আছে তোর বাবলির কথা।

—বাবলি ? মানে তোর সেই জোনাকী বসু ?

—অয়, অয় বাবলি ! জোনাকী ত ওর পোশাকী নাম। নিয়ে এলুম ভুবন-ডাঙার এঁদো বাড়ি থেকে। কোথাও পাত্ত পাচ্ছিল না ! গ্রুপে এসে অভিনয় শিখল ! স্টেজ চিনল ! ব্যাস তারপর দেখি কাটার মতলব। প্রায়ই রিহার্সালে এ্যাবসেন্ট। খোঁজ নিয়ে জানা গেল তিনি

না, দেশী বা বিদেশী নাটক বলে আমাদের কোন ছুঁৎমার্গ নেই। নাটক ভাল লাগলে এবং তা মঞ্চস্থ করার ক্ষমতা থাকলে, আমরা সেইসব নাটক করে থাকি। আমাদের নাটকগুলির মধ্যে মৌলিক বাংলা নাটক এবং বিদেশী নাটকের অনুবাদ বা রূপান্তর দুই-ই আছে।

আমাদের নাটক করার অভিজ্ঞতা? একাধারে তিক্ত ও আনন্দদায়ক, হতাশাজনক আবার উৎসাহব্যঞ্জকও। এক্সপেরিমেন্টাল নাটক বলতে বুঝি 'প্রাজ্ঞরকৃত'। অ্যাবসার্ড নাটক বুঝি না।

আজকাল থিয়েটারের প্রয়োজনার সঙ্গে পাল্লা দিতে পারে এমন নাটক, এমন সমালোচনা দুর্লভ। অন্যদিকে হল ভাড়া বেশী। কাগজে বিজ্ঞাপনের চার্জ অসম্ভব বেশী। আমাদের বক্তব্য, বেশী ভাড়ার ঢাউস হল দরকার নেই। কম ভাড়ায় ছোট হল চাই, বড় পত্রিকাগুলি যাতে আমাদের জন্যে শ্রেণীবদ্ধ বিজ্ঞাপন চালু করেন, তার ব্যবস্থা চাই। সঙ্গীত, চারুকলা, সাহিত্য প্রসঙ্গে সচরাচর কেউ মুখ খোলে না। কিন্তু থিয়েটারের সমালোচনায় সবাই মুখর। তাদের উপরোক্ত সমস্যাগুলি সম্পর্কে কি কোন দায়িত্ব নেই? তার ওপর আর এক শ্রেণীর মানুষ আছেন যাঁরা থিয়েটার সম্পর্কে কিছু না জেনেও বিচারক এবং সমালোচকের আসনে বসে পড়েন। তবে এদেশে চিরকাল এই রীতি চলে আসছে। তার ওপর আছেন 'হাত দেবার ডাক্তার নয় কিল দেবার গোঁসাই' সরকার, রাজনৈতিক দল ও তাদের ভাড়াটে লেখক বা গুণ্ডা।

অবশ্য কিছু লোকের কাছে নাটক করা নিছকই অভিনয় স্পৃহা মেটানো সন্দেহ নেই। তবে সবার কাছেই তা নয়। সংগঠনে অনেক ব্যক্তি আছেন, এমনকি এমন পরিচালকও থাকেন যাঁরা অভিনয় করেন না। থিয়েটার একটা শিল্পরীতি, যার মাধ্যমে কোন ব্যক্তি বা গোষ্ঠী নিজেকে প্রকাশ করতে চায়। কেউ কেউ এই নাট্যকর্মে মুখ্যমূলক ভূমিকা গ্রহণ করেন, আবার কেউ কেউ থাকেন শুধুমাত্র সাংগঠনিক দায়িত্বে। তাই নাটকের দলে কারুরই ব্যক্তিগত মালিকানা নেই। শিল্পীরাও পয়সা পান না। আর নিরাপদ হল তো কারুরই নেই। তাই আমাদের সঙ্গে ব্যবসায়িক মঞ্চগুলির আদর্শ, চিন্তা ও মূল্যগত তফাৎ দুস্তর।

যেমন শুক্লকরবীর সঙ্গে সেতুর, চাকভাঙা মধুর সঙ্গে বারবধূর, ম্যাকবেথের সঙ্গে ককেশাসের উইলের, মঞ্জরী আমের মঞ্জরীর সঙ্গে তুষার যুগ আসছেন, দান সাগরের সঙ্গে রক্ত নদীর ধারায় তফাৎই হোলো আমাদের সঙ্গে পাবলিক থিয়েটারের মৌলিক পার্থক্য।

না, সবগুলো দল মিলে কিছু করা অসম্ভব। ভিন্ন ভিন্ন দলের ভিন্ন ভিন্ন ভাবনা-চিন্তা। সুতরাং এটা আশা করাই অন্যায় যে, বিরোধী আদর্শে বিশ্বাসী কোন দলের সঙ্গে মিলে মিশে মঞ্চ তৈরী বা পত্রিকা প্রকাশ করবে। তার কারণ পারস্পরিক ঈর্ষা, ব্যক্তিত্বের লড়াই, সর্বোপরি থিয়েটারের ভাবনা-চিন্তা নিরক্ষিত বাইরের এক শ্রেণীর দালাল আছে যাদের কাজই হোলো নাট্যদল

তখন এ্যামেচার দলে খেপ মারতে ব্যস্ত।

আমি বাধা দিলুম—খেপ খাটছিস কেন? বাবলির বাড়ির অবস্থা ভাল নয়। বাইরে একটু রোজগারের চেষ্টা কি অন্যায়? তোরা আর কতই বা দিস?

—সেটা আমরাও বুঝি। তাই আপত্তিও করিনি। কিন্তু রেজেনশানে শো-এর দিনাজনেক আগে এসে যদি বলে এই শোটা ওকে ছুটি দিতে হবে—কোন ফিল্মে দু দিনের একটা কাজ পেয়েছে এটা না হলে ওর ফিল্ম কেরিয়ারটাই নাকি নষ্ট হয়ে যাবে—মেজাজটা তখন কোথায় থাকে বল্?

—তা অবনীশদা কি বলল?

—বলল্ম ত ওটা একটা ইমম্যাচিওরিটি। সব শুনে টুনে বলল, তা কি করা যাবে, ও যদি একটা কেরিয়ার পেয়ে যায় আমাদের ওকে আটকানো উচিত হবে না। এ শোটা নয় ক্যানসেল করে দাও। বোঝ ব্যাপারটা, ধার-দেনা করে হলের টাকা মিটিয়েছি, যে লোক বাপের জন্মে দর্শনীয় নাটক দেখেনি পার্থিপ দিয়ে একটা টাফ এক্সপেরিমেন্টাল নাটক নিতে শতাব্দীর টিকিট গছিয়েছি—তখন যদি বলি শো পোস্টপন্ড—পিটিয়ে পিঠের ছাল তুলে নেবে—আর কোন দিন তাদের কাছে মুখ দেখাতে পারব?

—কিন্তু এমনি করেই ত বাংলাদেশের দলগুলো বেঁচে আছে!

আবীর যেন খেঁকিয়ে উঠল—তোর মুণ্ডু—একে বেঁচে থাকা বলে? বল কোন রকমে টিঁকে আছে। মুখ থুবড়ে একদিন পড়বে, আর উঠবে না।

—কিন্তু এর জন্য ত একলা তোর মায়ার মক্ষিরানীরাই দায়ী নয়?

—আলবৎ দায়ী! এক হাতের চেটোতে অন্য হাতের ঘুষি থাবড়ে বলল, —কেন নয়?

দে আর নট অ্যাট অল লয়্যাল টু আওয়ার আর্ট!

—কিন্তু এই সব জেনে শুনেই ত' দল গড়তে এসেছিলি।

—হ্যাঁ এসেছিলুম। অনেক বাধা, অনেক ঝড় তাও জানতুম। জানতুম মাসের পর মাস ঘরের ভাড়া বাকী থাকবে—চায়ের দোকানের টাকা মেটানো যাবে না—ভালো নাটক পাওয়া যাবে না—ছেলেরা ঠিক মত রিহার্সালে আসবে না—এমনি হাজারো প্রবলেম—কিন্তু এগুলোর কি মানে বল? যেসব মেয়েগুলোকে নিয়ে আমরা কাঁচা মাটির বুক থেকে—তাদের শ্রতানিসম্ভাবনীক পড়ার—নাটক সম্বন্ধে সচেতন করে তুলব—অথচ এরা দল বুঝবে না। ছেলেদের মেহনতের কদর দেবে না—পদে পদে রাস্তার লোকের কাছে অপমান আর অসম্মানের জন্য এতটুকু সহমর্মী হবে না—কেবল নিজেদের আখের গোছানো ছাড়া! কেউ যাবে ফিল্মে কেরিয়ার করতে। কেউ দেবে অফিস ক্লাবে ধর্ণা, কেউ বা পাবলিক বোর্ডে হিরোইনের স্বপ্ন দেখবে।

বোধহয় ওর গলাটা শুকিয়ে এসেছিল। আর একটা সিগারেট ধরাল। কিন্তু গলার সুরে পুরনো জোরটা গেল না—কেউ বা বাবলির মত আরো মোক্ষম ঘা দেবে। চেকন চেহারার দোলনাটিতে কয়েকটা ছোকরার মাথা চিবোবে, আসলে কি জানিস, দে আর নট বিলিভ ইন সিনসিয়ারিটি। ভালো অফার পেলে একদল থেকে অন্য দলে পালাতে এদের বিবেকে বাধে না—

—বাবলি এখন কি করছে?

—অবনীশদার সঙ্গে প্রেম আর ফিল্মে চান্স খুঁজছে।

—বাবলি ত' শুনেছিলুম তোদের স্বপনকে বিয়ে করেছিল।

—দলটা ভাঙল ত' সেখানেই। একটা বইয়ে স্বপনের সঙ্গে ও হিরোইন করতে গিয়ে হল প্রেম—দুম করে একদিন বিয়ে করে ফেলল। তারপর যা হয়। কিছুদিন পর বিয়েটিয়ে শিকেয় তুলে দিয়ে অবনীশদার সঙ্গে ভিড়ে গেল। এই নিয়ে ঝগড়া, অশান্তি—শেষ পর্যন্ত হাতাহাতি। দলের অন্য সবাই ক্ষেপে গেল—শেষ কয়েকজন রেজিগনেশান দিল—দলের নৈতিক অধঃপতনের জন্য—

—বলিস কিরে, এসব এখনও হয়? একটা মেয়েকে নিয়ে দল ভাঙাভাঙি?

—একটা মেয়েকে নিয়েই ত' দুনিয়ার যত বড় বড় অঘটন। আর নারে আর না, জীবনটা জুয়োর আসরে নামিয়ে বড় ভুল করে ফেলেছি। নাটক নাটক করে মন দিয়ে কোনদিন চাকুরিটাও করা হয়ে উঠল না।

গৌতম রায়

ও নয়, আমাদের আলাদা বেঞ্চ এবং ব্ল্যাকবোর্ড-এর ব্যবস্থা করে অভিনয়ের ক্লাস নেবার কোন ব্যবস্থা নেই। তবে আমাদের থিয়েটারে কোন শিল্পী অভিনয় করতে গেলে কিছুটা পূর্বলব্ধ অভিজ্ঞতা, পরিচালকের নির্দেশ, দু'একটা বই আর বাকিটা নিজে ভেবেই শিক্ষিত হতে হয়।

কোন একটি বৃত্ত বা সীমারেখাকে চূড়ান্ত হিসেবে প্রতিষ্ঠিত না করে নতুনত্বের অন্বেষণ বা অন্বেষিতের বিকাশই এক্সপেরিমেন্টাল। তবে অবশ্যই তাকে যুক্তিগ্রাহ্য হতে হবে। আর এ্যাবসার্ড নাটক বলতে একটি ফর্মকে বুঝি আমরা। শিল্প সংস্কৃতির জগতে এই কথাটির জন্ম বিশেষ এক দেশের সামাজিক, অর্থনৈতিক বিন্যাসের পরিপ্রেক্ষিতে—আমাদের এখানে তাকে হঠাৎ উপস্থিত করলে স্বাভাবিকভাবেই মনে হবে দুর্বোধ্য নাটক মাত্রেই এ্যাবসার্ড অথবা এ্যাবসার্ড নাটকই দুর্বোধ্য।

গ্রুপ থিয়েটারের তো হাজারো সমস্যা। অর্থনৈতিক সমস্যা, ভাল নাটক পাওয়ার সমস্যা, নাটক করার জন্য হল পাওয়ার সমস্যা, মহিলা শিল্পীর সমস্যা, প্রচারের সমস্যা,—এর মধ্যে দিয়েই আমাদের লড়াই করে চলতে হয়।

ব্যবসায়িক মঞ্চের সঙ্গে আমাদের মূল পার্থক্য দৃষ্টিভঙ্গীর। এখনও ব্যবসায়িক মঞ্চে প্রয়োজনাটির যে বড় কথা প্রযোজিত অর্থের, সেই কারণেই তারা যে কোন গল্প কিছু নামী শিল্পী আর শরীর দর্শানো নৃত্য সহযোগে যে বস্তুটিকে মঞ্চে উপস্থাপিত করছে তা আর যাই হোক, প্রায়শই থিয়েটার হয় না। এই বিকৃতির বন্যায় কিছু মধ্যবিত্ত দর্শক নিয়মিত যাচ্ছেন এটাই দুঃখের। নতুবা শিল্পগত তুলনা অপ্রয়োজন।

স্থায়ী মঞ্চ? সেটা না হওয়ার সম্ভাবনাই বেশী। শিশির ভাদুড়ীর পরে এই কিছুদিন আগেও এ রকম একটা চেষ্টার উৎসাহব্যঞ্জক কথাবার্তা শোনা গেছে। কারও নিশ্চয়ই কিছুটা স্মরণে আছে। কিন্তু ঐ পর্যন্তই। এখন শুধু তার পরিণতিস্বরূপ একে অপরকে নির্দিষ্টভাবে বিরোধী প্রবক্তা হিসেবে আঙুল দেখানো চলছে। আসলে প্রাথমিক স্তরের সংহতি না থাকলে হঠাৎ উৎসাহে স্থায়ী মঞ্চ তৈরী হলেও কখনোই তাকে বাঁচানো যাবে না। আর একক বা গোষ্ঠীর ইচ্ছা বা চেষ্টায় কখনও কোন দেশেই জাতীয় নাট্যশালা তৈরী হতে পারে না। একটি প্রেক্ষাগৃহের পোশাকী নাম জাতীয় নাট্যশালা হতে পারে, আর কিছু নয়।

না, দেশী বা বিদেশী নাটক বলে কথা নয়, আমাদের আনুগত্য ভালো এবং সৎ নাটকের প্রতি। আমরা যেমন জোসেফ হেলারের নাটক করেছি তেমনি মোহিত চট্টোপাধ্যায় বা নীলকণ্ঠ সেনগুপ্তের মৌলিক নাটকও মঞ্চস্থ করেছি।

আর বাংলাদেশে নাট্য আন্দোলনের সূচনা আজ পর্যন্ত যে বিস্তার, তাতে সব সময়েই, বিভিন্ন আক্রমণের মধ্যেও, কোন না কোনভাবে গ্রুপ থিয়েটারের প্রতিষ্ঠা ও সাফল্য স্পষ্ট। তাই নিঃসন্দেহে বলা যায় বাংলা দেশে গ্রুপ থিয়েটার সামগ্রিকভাবে কখনই থেমে থাকেনি। এই আন্দোলনের সূচনা 'নবান্ন' নাটক থেকে। আর 'নবান্ন'কে কেন্দ্র করে যে আন্দোলনের সূচনা তা গণনাট্য আন্দোলন।

'জাতীয় নাট্যশালা' সম্পর্কে আমাদের আর একটি মত জানাই, সেটা গড়ে উঠতে পারে একমাত্র বিভিন্ন প্রাদেশিক ভাষা ও সংস্কৃতির সুস্থ যোগাযোগের মাধ্যমে। এবং এই কাজ সফল হতে পারে সরকারী চেষ্টায় (তা কি সম্ভব?) অথবা বর্তমান কাঠামো বদলের মাধ্যমে, এটাই আমাদের বিশ্বাস।

(প্রবক্তা : থিয়েটার কমিউন এর পক্ষে নিত্যেশ বন্দ্যোপাধ্যায় ও দেবাশিস মজুমদার)।

[illegible]র দৃশ্য

হীরেন্দ্রকুমার বসু

কিন্নর কিন্নরী

(১)

আত্মকেন্দ্রিক জীবনের ইতিহাসটুকু শোনাতে চাইলেও শোনার মত অবকাশ কার আছে বলুন। তাই যখন আমার জীবনের শিল্প আলেখ্য ও জীবন-পানশালের অতিথিদের সমাবেশের কথা পাঠকদের কাছে তুলে ধরেছিলাম তখন সে লেখনীর নামকরণ করেছিলাম 'জাতিস্মরের শিল্পলোক ও জাতিস্মরের পান্থশালা'... লেখক ছিল পঞ্চবর্ণী। আজ সেই পঞ্চবর্ণী পাঠক সমাজের কাছে তার নিজের ছদ্মনাম গোপনের ব্যর্থতা জেনে, আসল নামেই লিখতে বসেছে।

এসব লেখার বিপদ অনেক। প্রথমত লেখাকালীন 'আমি করেছি—আমি করেছি' বলে নিজের অহমিকা ফুটে বেরোয়, দ্বিতীয়ত স্মরণ বিস্মরণের পাকে পড়ে সামান্য রসিকতাও বেরসিক সমালোচকের টিপ্পনীতে জর্জরিত হয়।

সাত দশক জীবনে পার করে এসেছি প্রায়, অথচ ছন্নছাড়া জীবনে কোনো দিনই ডাইরী লেখার অপচেষ্টা করিনি। স্মৃতি থেকে রচনা করে প্রতিদিন মাস বছরের মাথা বলে যাওয়া যে দুঃসাধ্য ব্যাপার তা নিশ্চয়ই আপনারা উপলব্ধি করেন। তবে স্মৃতি-শক্তি আজও প্রখর বলে হয়ত প্রায়শই সঠিক বলে যাবো—খাঁটি দিন তারিখের কিছু হেরফের হতে পারে।

১৯২৩ সালের ৪ঠা জানুয়ারী পর্যন্ত আমার পিতা বর্তমান ছিলেন। তখন আমি কলেজে পড়ুয়া ছেলে—বয়স ১৯ বছর ৩ মাস। বাবার মৃত্যুর পরই বলা চলে, হয়ে গেলাম একটি পুরো বাউণ্ডুলে। আমি ছিলাম বাবার সর্বকনিষ্ঠ সন্তান। ওপরে তিন দাদা বর্তমান...তার মধ্যে দুই দাদা আমার মতই পড়ুয়া আর সবার বড় যিনি তিনি হঠাৎ ব্যবসায়ে বিপর্যস্ত হয়ে সংসার তরীটিকে তখন কর্ণধারবিহীন করে তুলেছেন। এই ডামাডোলের মাঝে পড়ে আমি লেখাপড়া ছেড়ে ঢুকে পড়লাম এক সরকারী অফিসে (এ জি সি আর) মাসিক বেতন তিন টাকা। খাজাঞ্চিখানায় টাকা হাতে পেয়ে কান্না পেলো...ছ'মাস কাজ করে চাকরীতে ইস্তফা দিয়ে ভাগ্য অন্বেষণে বার হয়ে পড়লাম। কি যে করি—কোন লাইন ধরি এইসব ভাবনার মাঝে পড়ে দিশেহারালাম। মূলধন বলতে আমার ছিল উদাত্ত গানের গলা। কিন্তু তখন আবার এখনকার মত গান বেচাকেনা হোতো না।

স্কুল কলেজ জীবনে গানের সমাদর বহুতর পেয়েছিলাম—যার সবিস্তারে বর্ণনা আমার জাতিস্মরের শিল্পলোকে দিয়ে গেছি। শুধু এইটুকু বলে রাখি ভাগ্য-দেবতার বিধ্বস্ত হয়ে নিজেকে ডুবিয়ে রাখতাম সঙ্গীতের জলসায়। মুরারী সম্মিলন, কানা শরৎ সম্মিলন, জোড়াচাঁদ সম্মিলন সবই ছিল আমার পরম প্রিয়... এবং তারই পরিপ্রেক্ষিতে বন্ধুদের নিয়ে বাড়ী বাড়ী মজলিস রচনা করে গান গেয়ে নিজেকে ডুবিয়ে রাখতাম।

এ ছাড়াও আমার ছিল সাহিত্য প্রীতি ...কারণ নিজেও দু'এক কলম লিখতে পারতাম তার সমাদরও কিছু কিছু প্রবাসী, অর্চনা, মানসী ও মর্মবাণী বিচিত্রা থেকে পেয়ে নতুন আস্বাদে পুলকিত হয়েছিলাম। 'মেসার্স' এ, টি দেবের বাড়ীর মেজছেলে শ্রীসুবোধ মজুমদার আমার সহপাঠী ছিল। তার বাড়ীতে প্রতি সন্ধ্যাতেই, তৎকালীন বড় বড় সাহিত্যিকদের সমাবেশ ঘটত—সে আসরেও নাক গলিয়ে বসে থাকতাম।

বন্ধু ডাঃ অমিতা গুপ্ত তখনকার কালে 'মুকুল' পত্রিকার ব্যবস্থাপক ছিল—সে আড্ডাতেও আমার যাতায়াত ছিল—ফলে সুনির্মল বসু, অখিল নিয়োগী, ক্ষিতিশ ভট্টাচার্য প্রভৃতিরাও আমার বন্ধু হয়ে পড়েছিলেন। ভারতবর্ষের সম্পাদক জলধর সেন মশাই-এর ছেলে শ্রীঅজিত আমার বন্ধু ছিলেন বলে কল্লোল গোষ্ঠীতেও আমার সমাদর ছিল। শনিবারের চিঠির সজনীদারও আমি স্নেহের পাত্র ছিলাম।

এ ছাড়াও আমাদের এক স্পেশ্যাল গোষ্ঠীর অধিবেশন হোতো ৭নং রামমোহন রায় রোডের ত্রিতলে। (৭নং রামমোহন রায় রোডের বাড়ীটি বাণী দাস ও দীনেশ মজুমদারের জন্যে পরে বিখ্যাত হয়েছিল)। 'হুট'—অর্থাৎ ডাঃ অমিয় বসু ছিল আমার অন্তরঙ্গ বন্ধু—ওর ওখানে অবনীন্দ্রনাথের শিষ্য সুধীর ধরচৌধুরী প্রভৃতিদের নিয়ে আড্ডা বসতো। ইউ-সায়েন্স কলেজে এম-এস-সির ছাত্র ছিল—সেই সুবাদে এ আড্ডা সাইয়েন্স কলেজের ছাতে পর্যন্ত বিস্তারিত হয়েছিল। সেই সুবাদে ডাঃ প্রফুল্লবাবু যিনি আচার্য পি, সি, রায়ের স্নেহধন্য ছাত্র ছিলেন তার সঙ্গেও অত্যন্ত হৃদ্যতা ঘটে... যাঁর কল্যাণে আমি আচার্য পি, সি, রায়কে আমার গানে বিমুগ্ধ করে প্রায়ই ও'র ঘরে বসে থাকতাম।

এইভাবে ১৯২৩ থেকে ১৯২৫ সালের শেষাবধি আমি বিভিন্ন সংস্থা বা আড্ডায় নিজেকে ঘুরিয়ে নিয়ে বেড়াতাম যাতে ভাগ্যক্রমে কোনো লাইনের হদিস পাই। হঠাৎ যেন হদিস পেলাম....১৯২৫ সালেই এক চমকপ্রদ ঘটনায় আমার গতানুগতিক জীবনকে মোড় ঘুরিয়ে এক নতুন ধারায় প্রবাহিত করতে শুরু করল। বসেছিলাম আচার্য রায়ের ঘরে, খাচ্ছিলাম মুড়ি নারকেল হঠাৎ ঝড়ের মত একদল ছেলে ঘরে ঢুকে বললে—'এখানে কে গাইতে জানেন—শীগগীর আসুন—ডাঃ মিত্র ডাকছেন। সবাই মিলে—এমন কি আচার্য রায় পর্যন্ত আমায় বলেন—'যা-যা-বেতারে গান গেয়ে আয়—খুব ভাল করে গাইবি।'

১৯২৫ সালে কলকাতা সাই-য়েন্স কলেজের ফিজিকস ডিপার্টমেন্ট থেকে এক প্রগতি সন্ধ্যায় বেতারযোগে গান আবৃত্তি প্রচারের আয়োজন ঘটালেন ডাঃ শিশির মিত্র মহাশয়। সারা কলকাতায় শ্রোতারা অভাবনীয় ঘটনায় অভিভূত হয়ে পড়েন।

সেদিনের প্রথম আসরে প্রথম গান গেয়েছিলাম 'ঐ মহাসিন্ধু ওপার থেকে কি সঙ্গীত ভেসে আসে'....মনে হয়েছিল আজকের প্রথম আসরে এই গানখানিই একমাত্র উপযোগী গান।

ডাঃ পি, কে, বোস ডি, এস, সি, এফ, এন, এ যিনি বোস ইনস্টিটিউট-এর একজন প্রাক্তন ডিরেক্টর....তাঁর বন্ধুদের সঙ্গে এক টেলিফোনিক আলোচনায়—তাঁর এক বিশিষ্ট বন্ধুকে বেতার প্রচেষ্টা সম্বন্ধে লিখিতভাবে জানিয়েছিলেন ১৯৭০ সালের ১৯শে এপ্রিল....চিঠিখানি নীচে তুলে ধরলাম।

ডাঃ শিশিরকুমার মিত্র ১৯২৩ সালে বিজ্ঞান কলেজের পদার্থবিদ্যার একজন অধ্যাপক নিযুক্ত হন। সেই সময় আমি রসায়নশাস্ত্রে গবেষণা করি ঐ বিজ্ঞান কলেজের অন্যদিকে—আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের গবেষণাগারে।

অনুপম ঘটক, হীরেন্দ্রকুমার বসু এবং রাইচাঁদ বড়াল

ডাঃ মিত্র ঐ সময় হইতে বেতার সম্বন্ধে গবেষণা ও পরীক্ষা নিরীক্ষা আরম্ভ করেন (বোধহয় ১৯২৫ সালে)। পদার্থ বিজ্ঞানের একটি ছোট ঘরে তিনি বেতার প্রেরণ যন্ত্র স্থাপন করেন। তাঁহার একজন সহযোগীর সাহায্যে মাঝে মাঝে বেতারে কথোপকথন, গান, আবৃত্তি পাঠাইতেন। যাঁরা এইসব গ্রহণ করিতেন তাঁরা রিপোর্ট দিতেন।

আমি সন্ধ্যার সময় মাঝে মাঝে ঐ বেতার প্রচার ঘরে যাইতাম। কোন কোনদিন পরিচিত ২।১ জন সঙ্গে থাকিতেন। এই প্রসঙ্গে শ্রীহীরেন বসুর নাম বিশেষ করে মনে পড়ে, কেননা যেদিন ডাঃ মিত্র প্রথম বেতার প্রেরণ করেন সেদিন সেই আসরের প্রথম গাইয়ে ছিলেন শ্রীহীরেন বসু। তারপরও তিনি মাঝে মাঝে নিজের গাওয়া গান অনুষ্ঠানসূচীর মাধ্যমে প্রচার করিতেন।

তখন বেতার শ্রোতাদের কানে হেড-ফোন লাগিয়ে বেতারের বার্তা বা গান বা সঙ্গীত শুনতে হোতো....সেট-গুলির নাম ছিল ক্রিস্টাল সেট। যে কজন চেনা পরিচয়ের মাঝে এই সেট ছিল তাদের কাছে আমার গানের ভূয়সী প্রশংসাভিনন্দন পেলাম—বিশেষ করে এইচ বোস (যাঁর দিলখোস বা কুন্তলীন ছিল) তাঁর বড় ছেলে শহিতেন বসু ও তাঁর বন্ধু স্বর্গত সুকুমার রায় আমায় ডেকে উৎসাহিত করেন। এঁদের সঙ্গে আমার পরিচয় হয়েছিল ফুটবল খেলার মাঠে, ডেফ অ্যান্ড ডাম স্কুলে আমাদের সিক্স-এ-সাইড ম্যাচে এঁরা দুজনেই আমাদের রেফারি হতেন। কিছুটা আশার আলোর আভাস পেলাম। ১৯২৬ সালের প্রথমেই আমার লেখা 'ধূপ-ধুনো' (পদ্যের বই) মেসার্স গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এন্ড সন্স প্রকাশিত করলেন। ধূপ-ধুনো লেখা ৪০টি বিচ্ছিন্ন কবিতা হলেও তার প্রত্যেকটির সঙ্গে এমনি এক যোগসূত্র ছিল যা ওমার খৈয়াম দর্শনকে হিন্দুদর্শনে রূপান্তরিত করা মনে হয়। ধূপধুনো প্রকাশের পূর্বে আমি আমার ম্যানস্ক্রিপ্ট কপিটা আমার শ্রদ্ধেয় কবি নরেন দেব—এককথায় নরেনদার হাতে তুলে দিয়েছিলাম কিছুটা দেখে দেবার জন্যে। তিনি কবিতা-গুলির প্রভূত প্রশংসা করে দুই একটি ছন্দের কিছুটা রূপান্তর করে আমায় প্রকাশ করতে উৎসাহিত করেন। রেডিওর গান ও পদ্যের বই-এর দমাসরইকুই আমার পথ দেখিয়ে আমার ভবিষ্যৎ জীবন গঠনের দীক্ষা দেয়। এই সময় আমার ভাগ্যদেবতা দুহাত বিস্তার করে আমায় যেন দুদিকে ডাক দিলেন। একদিকে হিজ্ মাস্টার ভয়েস কোম্পানীর অধিকর্তারা অপরদিকে শুনলাম ব্রিটিশ ব্রডকাস্টিং কোম্পানী, ভারতে ব্রডকাস্টিং-এর ব্যবসায়িক সুযোগ নির্ধারণে টেম্পল চেম্বার (হাইকোর্টের সামনের বাড়ী) বাড়ীর তিতলে একটি বেতার প্রেরণ কেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত করে গুণী শিল্পীদের আমন্ত্রণ জানাচ্ছেন। ব্রিটিশ ব্রডকাস্টিং কোম্পানীর প্রতিভূ ছিলেন মিঃ সি. সি. ওয়ালিক। এখান থেকে তিনি প্রখ্যাত মঞ্চশিল্পীদের আবৃত্তি, নাটকীয় দৃশ্যাবলী, বিভিন্ন যন্ত্রীদের বাজনা বেতারে প্রেরণ করছেন এবং পাথেয়স্বরূপ শিল্পীদের হাতে কিছু কিছু দক্ষিণাও দিচ্ছেন। তৎকালীন প্রখ্যাত প্রচার সচিব সুধীরেন্দ্রনাথ সান্যাল মশাইও এ যজ্ঞে নিমন্ত্রিত হয়েছেন তাঁর হাস্য-রসাত্মক নাটিকা 'দেবতাদের মর্ত্যে আগমন' বইখানিকে অভিনীয় প্রয়োগ করতে। সুধীরদার বই-এর সুরকার হয়ে আমি রিহার্সালে গিয়ে মিঃ ওয়ালিকের সম্মুখীন হই—ফলে আমার কাজ দেখে তিনিও আমাকে ওখানে গাইবার জন্য আমন্ত্রণ জানান। উক্ত প্রতিষ্ঠানে আমি প্রায় ৩।৪ দিন গান করার সুযোগ পাই। এইচ্ এম্ ভিতে যোগদানের ইতিহাস আমি জাতিস্মরের শিল্পলোকে প্রকাশ করেছি।

এইখানে, এইচ-এম-ভি রেকর্ডিং এর পূর্বতন আয়োজন সম্বন্ধে কিছুটা বলি। তখনকার দিনে শিল্পীকে একটি টিনের চোঙার সামনে বসে উচ্চস্বরে গান গাইতে হোতো। তখন মাইক্রোফোন থাকতো না—চোঙার মধ্য দিয়ে গান গিয়ে একটি ঘূর্ণায়মান মোমের চাকতির ওপর পিনের সাহায্যে স্ক্র্যাপ করে দিত—সেই স্ক্রেপিং ভাইব্রেশনেই গান বাঁধা থাকতো। মোমের চাকতির থেকে সেগুলিকে তামার চাকতিতে ছাপ তোলা হোতো এগুলিকে ম্যাট্রিক্স বলতো এবং এই তামার চাকতি থেকে আবার গালা, ইবোনাইট মিশ্রিত নরম চাকতিতে সেই-গুলিকে ছেপে তুলতে হোতো। চাকতি শক্ত হবার সময় লেবেল লাগিয়ে রেকর্ড করে ছাড়া হোতো। তখন এইচ-এম-ভির রেকর্ডিং স্টুডিও ফ্যাক্ট... ছিল না—ছিল বেলেঘাটায়। ... এর জন্যে গানের রিহার্সাল হোতো ... র গরাণ-হাটার মোড়ের বাড়ী 'বিষ্ণু ভবনে'।.... এখনকার মত সব সময় রেকর্ডিং সুযোগ-সুবিধে তখন ছিল না। বিলাত থেকে রেকর্ডিস্ট আসতো বছরে দুবার—অর্থাৎ বছরে দুবার সেশন হোতো। সমস্ত শিল্পীবৃন্দকে গান শিখিয়ে রিহার্সাল দিয়ে তৈরি হয়ে সেশনের জন্য অপেক্ষা করতে হোতো। কাজেই যদিও আমি ১৯২৬ সালেই এইচ-এম-ভির শিল্পী হয়েছিলাম, রেকর্ডিং সেশন হোতে প্রায় ডিসেম্বর হয়ে গেছিল।

২৬ সালের ভাগ্যাকাশ উজ্জ্বল দেখে আমি একটি প্রেস শুরু করেছিলাম জুন মাসে। মুকুল পত্রিকার সারা দলটিকে নিয়ে আমি একটি ছেলেদের মাসিক পত্রিকাও শুরু করি। 'আলপনা' পত্রিকার নামকরণ করেছিলেন 'অচিন্ত্যকুমার সেন, সম্পাদকের আসন নিলেন 'সুনির্মল বসু, প্রচ্ছদপট এঁকে দিলেন প্রখ্যাত যতীন সেন, ভিতরের ছবি অলংকৃত করলেন শ্রীচারু রায়, প্রতুল বন্দ্যোপাধ্যায়, ফণী গুপ্ত, পূর্ণচন্দ্র চক্রবর্তী। লেখক হিসাবে সবাই যোগ দিলেন—অবনীন্দ্রনাথ থেকে শুরু করে সব্বাই। কেবল লেখা পাইনি গুরুদেবের কারণ তিনি তখন ভারতের বাইরে। এই সূত্রে বহু বিখ্যাত চিত্রশিল্পী, কথাশিল্পী, কবি কুমুদরঞ্জন মল্লিক, লেখিকা সুখলতা রাও, সবারই সঙ্গে হৃদ্যতা গড়ে উঠলো।

এদিকে আবার ২৬শে অগাস্ট ১৯২৬ সালে ১নং গারস্টিন প্লেসে মিঃ ওয়ালিক নতুন করে গড়ে তুললেন ইন্ডিয়ান ব্রড-কাস্টিং কোম্পানী। ইংরাজী প্রোগ্রাম ডাইরেক্টর ও স্টেশন ডিরেক্টর ছিলেন ওয়ালিক সাহেব—তাঁর সহকারী ছিলেন মিঃ চ্যাপম্যান। মিঃ ওয়ালিক এইচ-এম-ভির অধিকর্তা মিঃ কুপার সাহেবের পরামর্শে ভারতীয় প্রোগ্রাম ডাইরেক্টর হিসাবে ও তাঁর সহকারী হিসাবে নিয়োগ করলেন যথাক্রমে শ্রীনৃপেন্দ্রনাথ মজুমদার

...রেডিও'র মহলকে। মিঃ কোয়েল ...েন মহাপরিচালক লাইট্ন্ড্ এঞ্জিনিয়ার।

১৯২৬ থেকে ১৯২৭ সালের মেয়াদ ...ইন ব্রডকাস্টিং স্টেশনে বিভিন্ন ...দের পত্তনী করে মিঃ ওয়ালিক বি, বি, ...তে ফিরে গেলেন এবং তাঁরই স্থানে ...রে গেলেন মিঃ স্টেপলটন সাহেবকে ...র স্টেশন ইঞ্জিনিয়ারের আসনে বসালেন ...সুধীন রায়কে। সুধীন রায় মশাই ছিলেন ... শিশির মিত্রেরই কৃতী-ছাত্র।

নৃপেনবাবু একজন গুণী শিল্পী—...দ্ভুত সুরেলা কেয়ারিওনেট বাজাতে ...তেন। নাট্যাচার্য শিশিরকুমার ভাদুড়ী ...শনের থিয়েটারে 'সীতা' বইতে তিনি ...হু গানে সুরসংযোজনা করেছিলেন আর ...রেছিলেন আবহসঙ্গীত রচনা। সীতা ...টকের প্রস্তাবনায় 'কথাকও' ও 'ধরিত্রীর ...ন' 'ধরার মেয়ে' এই দুইখানি গানে ...তিনিই সুরসংযোজনা করেন। শিশিরবাবুর ...ম্প্রদায় পরিষদের যে গুণী সমন্বয়, তাঁদের ...হচর্য ও নৃপেনবাবু বেতারে পেয়ে ...লেন। যেমন সু-সাহিত্যিক প্রেমাঙ্কুর ...আতর্থীর সম্পাদনায় বেতার জগত পত্রিকা ...রু করলেন—মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়কে ...য়ে কথিকার আসর বসালেন হাইকোর্টের ...ড্ভোকেট যোগেশ বসুকে এনে বসালেন ...ম্পদাদুর' আসরে—বিখ্যাত ফুটবল ...লয়ার রাজেন সেনকে (মোহনবাগানের ...ন্ত খেলার হাফব্যাক) বসালেন বেতার ...র্চা প্রচারের আসনে—এমনিতর।

তাঁর সুদক্ষ সহকারী রাইচাঁদ ...লও সে সময়ে কম নাম করেননি গুণী ...বে। ১৯২৬ সালেই তিনি অল ইণ্ডিয়া ...উজিক কম্পিটিশনে তবলায় প্রথম স্থান ...ধিকার করেছিলেন। তাছাড়া ওঁর পিতা ...চাঁদ বড়ালের স্মৃতি সম্মিলনে ...তের কোন বড় গুণী না আসতেন? ...ই শিল্পী সম্বন্ধে রাইবাবু ...লন অদ্বিতীয়। সেই জন্যে ...ও তার শৈশব বাল্যতেই জমিয়ে ...লছিলেন। ঠিক এই সময় আমি ...ওয়াম ব্রডকাস্টিং কোম্পানীতে পাকা- ...ভাবে যোগদান করি। ...সুপারিশ ...ত আমার ছিল—আমি এইচ এম ভির ...ক...আমার পূর্বতন ব্রডকাস্টিং ...জ্জ্বতা আছে...তাছাড়া রাইচাঁদ আমার ...বন্ধু...স্কুল ফাংশনে আমার গান ...সমাদৃত ছিল তিনি তা জানতেন তাই ...ক পর্যাবপর্যবসিত হয়েও আমি অচিরেই ...ভকার সুরকার এবং নৃপেনবাবুর ...মতনু চিন্তাধারার রূপকার হয়ে ...লাম। নিজের গান গাওয়া ব্যতিরেকে ...কি তখন করতে হোতো, আমি তারই ...ণ সার্টিফিকেট থেকে কতকাংশে তুলে ...ই :

"I have much pleasure to certify, Mr. Hiren Bose whom I know since 1927 His merit in music, composition of Musical Verses and Dramatic talents charmed me during his services in All India Radio In Radio he was the incharge of Drama Section and from his own conception he established acoustic Music Dept. He was a songster, Music composer, Playwriter, composer of verses Dramatist and Actor. His talents in so many subjects at the sametime was really a singular mistance in my office. Apart from these qualification his original and creation. Genius always helped me in the construction of variety Musical Bioins, features, Music training class, Morning Programme in Radio for which the listners of India are indebted him etc etc."

১৯২৬ সালের শেষাশেষের পাকাপুরি রিহার্সাল শেষ হলেও স্থগিত হয়ে রইল ১৯২৭-এর আশাপথ চেয়ে; কারণ এইচ-এম-ভির পুরাতন পদ্ধতির রেকর্ডিং বর্জন করে বসাচ্ছেন ইলেকট্রিক্যাল রেকর্ডিং মেশিন; অর্থাৎ এর সব কাজই ইলেকট্রিক জাইভে ঘটবে। এর জন্যে বিলাত থেকে একসপার্ট রেকর্ডিস্টকে আনিয়েছেন মিঃ কুপার... মিঃ কোয়াম সাহেব গত কয়েক মাস ধরে মেশিন ইনস্টলেশনে ব্যস্ত ছিলেন, এবার তৈরী হয়ে আমাদের আহ্বান জানালেন।

ইলেকট্রিক্যাল রেকর্ডের উদ্বোধনী হবে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথকে দিয়ে। সেই আয়োজনে বেলেঘাটায় আমাদের রিহার্সাল-ঘর থেকে ডাক পড়েছে ধীরেন দাসকে এবং গায়ক-গায়িকা হিসাবে আমাকে আর মিস হরিমতীকে। এবারের দ্বৈত ভজন 'সংসার মায়া ও আসল মন ফাঁকিয়ে পান দুটি টেস্ট রেকর্ডিং হবে এই নতুন ধারায়, কৃতী হলে উদ্বোধনী উৎসব শুরু হবে।

বেলা সাড়ে দশটায় কবিগুরু এসে গেছেন, সঙ্গে আছেন শ্রীপ্রশান্ত মহলানবীশ। এঁদের নিয়ে মিঃ কুপার ডিপার্টমেন্ট ঘুরে ওদের সব দেখিয়ে শুনিয়ে বুঝিয়ে বেড়াচ্ছেন। এই ফাঁকে মিঃ কোয়াম আমাদের দ্বৈত ভজন নিয়ে রেকর্ডিং টেস্ট শুরু করে দিয়েছেন। গান দুখানি বি-প্লে করে সন্তুষ্ট হয়ে কবির অপেক্ষায় আমরা বসে থাকি।

উদ্বোধনীতে কবিগুরু আবৃত্তি করবেন। যতদূর মনে আছে, উনি বোধকরি সেদিন 'আজি হতে শত বর্ষ পরে' কবিতা দিয়েই উদ্বোধনী শুরু করেছিলেন।

এই প্রসঙ্গে সেদিনের রেকর্ডিং আসরে যেটুকু রসাল ঘটনাটুকু ঘটেছিল সেটুকু না বললে উদ্বোধনী উৎসব অসম্পূর্ণ থেকে যাবে।

মাটির উপর পুরু গালিচার ওপর কার্পেটের আসন বিছানো ছিল। ঘরের একপাশের দেয়ালের দিকে খান চারেক চেয়ার রক্ষিত ছিল। মিঃ কুপার কবিগুরু ও প্রশান্তবাবুকে রেকর্ডিং রুমে পৌঁছে দিয়ে অন্তর্হিত হলেন। ভগবতী ভট্টাচার্য মশাই কবিকে কার্পেটের আসনে সমাদরে বসালেন। প্রশান্তবাবু বসলেন পাশের একটি চেয়ারে; আমরা একপাশে দাঁড়িয়ে।

ভগবতীবাবু কবিগুরুকে অল্প কথায় রেকর্ডিং নিয়মাবলী জানালেন অর্থাৎ লাল আলো জ্বললেই আর কথা নয়, একেবারে

প্রেমাঙ্কুর আতর্থী

আবৃত্তি শুরু হয়ে যাওয়া চাই। তথাস্তু। যথাসময় লালবাতি জ্বলে উঠলো। ভট্টাচার্য মশায় ইশারায় কবিগুরুকে শুরু করতে বললেন। কবিগুরু বললেন—'প্রশান্ত তুমি অমন দূরে বসে রইলে কেন; আমার পাশে এসে বসো'......

প্রথম প্লেট ব্যর্থ হলো। প্রশান্তবাবু এসে কবির পাশে বসলেন। আবার লালবাতি জ্বলে উঠলো। কবি আবৃত্তি শুরু না করে বলে উঠেন—শুরু করার আগে এক গেলাস জল খেলে হোত না প্রশান্ত!

বলে ফেলেই নিজেই হেসে উঠে বলেন, 'এই যা এবারও নষ্ট হলো তো....সবাই হেসে ফেলি।

কিছুটা সময়ক্ষেপ করে আবার জ্বলে ওঠে লাল আলো....এবার কবি কিন্তু ভুল করলেন না। অনবদ্যভাবেই আবৃত্তি করে চলেন।

মাঝে বোধহয় একটু গলা ঝেড়ে নিয়েছিলেন অতি সাবধানে মিঃ কোয়াম বলেন, দ্যাটস্ ন্যাচারাল!

এরপর মিষ্টান্ন বিতরণের পালা। ইতরজনেরাও ভাগবাটরায় বঞ্চিত হলেন না।

এইচ-এম-ভি ১৯২৭ সালের রেকর্ডিং-এর ফলাফল ১৯২৭ সালের প্রথমেই পাওয়া গেল। আমার গাওয়া সোলো গান 'বেলা-বেলি চল পথিক ঘরে' ও 'মোর গানের সকল বাধা' শ্রোতৃসমাজে সমাদৃত হয়েছে আর উচ্ছ্বসিত প্রশংসা অর্জন করলো আমার ও হরিমতীর গাওয়া ডুয়েট ভজন 'সংসার মায়া ছাড়িয়ে কৃষ্ণনাম জপ মন' আর 'মন আসল ফাঁকিয়ে'। গান দুখানি যা ছিল ইলেকট্রিক রেকর্ডের প্রথম নিদর্শন। ফলে এইচ-এম-ভির কর্ণধার মিঃ কুপার-এর আমি সুনজরে পড়ে গেলাম। তিনি আমায় তাঁর অফিসে ডেকে বললেন—মিঃ বোস তুমি প্রোটোটাইপ রেকর্ড সঙ্গীত ছেড়ে

...াটে তখন নতুনত্ব যোগিয়েছো, ...নে নতুন পরিকল্পনায় ১৯২৬ ...াম বিন্দু রেকর্ড করে যাও। তাঁর ...ব হয়ে আমি তাঁকে কথা দিয়ে ...সিজন-এ আমারই প্রথম আগমনী ...তে হিন্দু গজলের রূপ প্রকাশিত ...ল্পী কে মল্লিককে দিয়ে। ' কাশিতায় বুলবুলি তুই' ও ...ী মন উদাসী' গান দুখানি। হঠাৎ ...া কোম্পানীর জয়-জয়কার ছড়িয়ে ... তখনকার দিনে রবীন্দ্রসঙ্গীত ...হরেন দত্ত মহাশয়। তাঁর কণ্ঠ ...সুরেলীত ছিল....দুর্ভাগ্য বশতঃ ...তো মারা গেলেন। ঠিক সেই সময় ... চাকরা থেকে কলকাতায় ফিরে ...সব গানের সত্ব শান্তি নিকেতনকে ...লেন।' ফলে শান্তিনিকেতনের ...র হরেনবাবুর গাওয়া রেকর্ডগুলি ...লা। কারণ দর্শালেন সুর ঠিক ...খানে বর্জন রাখি রেডিওতে তখন ...ার নিজের লেখা গান গাইতাম না। ...বীন্দ্রনাথ, অতুলপ্রসাদ, ডি এল ...কান্তের গানগুলি।' কিন্তু হরেন-...বা পত্নীর শত অনুরোধেও প্রথম ...ত্তম হরেনবাবুর গাওয়া একখানি ...াখতে দিলেন না—সেই দিন থেকে ...খে আমি ছেড়ে দিয়েছিলাম সবার ... গাওয়া। সেই দিনই থেকেই ...ছিলাম আমার নিজের লেখা ও ... গাইতে।

...ওর কর্মতৎপরতা ও এইচ-এম-...কর্ডিং-এর চাপে পড়ে আমার ...পত্রিকা 'আলপনা' ও 'প্রেস' বন্ধ ...। এর পেছনে অর্থ সমস্যাটাও ...য়ে দাঁড়িয়েছিল।' অথচ শিশু-...প্রীতি আমার নিজের এক নিবিড় ...।

...অবলায় শিশুদের উপ-...হালকা সুরে গান রেকর্ড করে ...াড়লে কেমন হয়! মিঃ কুপারের ...মর্শ করে আমি ২৮ সালেই সর্ব-...দীর রেকর্ড (আট ইঞ্চি) বার ...ঁবিমল দাসগুপ্ত ও 'কমল দাস-...ছোটবোন 'সুধীরা দাসগুপ্তাকে ... গাওয়ান হয়—'ওলো বকুল ফুল ...ল ও শেফালি'। রেকর্ডটি শিশু-...ত্ফান তুলেছিল। ১৯২৮-এর ...েব সোলো গান (আমার বুকে ...োলে) ছাড়াও নতুনত্বের প্রোগ্রাম ...দলের গান ও কালবৈশাখীর গান ...উনিট), 'মন্দির আরতী সঙ্গীত' ও ... আশ্রম দৃশ্য (কলকাতা ইউনিট) ...তুয়েট' বাংলা ভজন'....গানগুলির ... ছিল একাউস্টিক এফেক্ট বার ...ভিনয়ত্বের চূড়ান্ত রূপ নিয়েছিল। ...দলের গানে অম্বর মাঝে ডম্বরু ...ছল সেতারের আলাপ সঙ্গে বৃষ্টির ...ও মেঘ গর্জন। কালবৈশাখীর গানে ...ঝড়ো সাইরেন — প্রতিধ্বনিযুক্ত ...গান ('ঐ আসে ধেয়ে কালবোশেখ ...মন্দিরারতীর গেয়েছিলেন মিস্

...ন্দুবালা (যেমনো আমি আরতী দীপ ... জ্বলা করো') এর সঙ্গে ছিল কাঁসরের ঘন্টা ...ঝাঁঝর কাড়ানাকাড়া শিঙা ইত্যাদি... প্রভাতে আশ্রমদৃশ্যে ছিল ভোরের আগমনী সুরে নহবৎ এবং তার সঙ্গে আশ্রমবাসীদের স্তোত্র-মন্ত্র। রেকর্ডগুলি যখন বাজারে বার হলো তখন সত্যিই নতুনত্বের এক নতুন যুগ সৃষ্টি করলো এইচ-এম-ভি।

এই প্রসঙ্গে বলতে ভুলেছি যে কল-কাতার শিল্পীগোষ্ঠী ব্যতীত ঢাকার শিল্পী-গোষ্ঠীর রেকর্ডিং একসঙ্গেই হোতো। কল-কাতার ইউনিটের বড়বাবু ছিলেন 'ভগবতী ভট্টাচার্য' এবং ঢাকা ইউনিটের কর্তা ছিলেন হেমচন্দ্র গুহ। এই দুই ইউনিটেই আমার ছিল অবারিত দ্বার। কারণ হরিমতী ঢাকা ইউনিটের শিল্পী, তার সঙ্গে ডুয়েট দিতে কবার আমি হেমবাবুরও প্রিয়পাত্র হয়ে-ছিলাম।

ভাবছেন এত যার রেকর্ড রয়েলটি, রেডিওর বাধা মহিমা, তার আবার আর্থিক সংকট কি? সত্যি বলছি তখন যা আমাদের দক্ষিণা ছিল তা বলতেও লজ্জা আসে। রয়েলটি তো ছিলই না, উপরন্তু গান লেখা সুর করা শেখানো রেকর্ডিং করিয়ে দিয়ে আমাদের হাতে গান পিছু পাঁচটি করে রৌপ্যমুদ্রা মূল্যস্বরূপ আসতো। ভাবুন কি পেতাম। শুধু সৃষ্টিমূলক কাজে প্রকৃত শিল্পীরা চিরদিনই পাগল। তাই এটা, পেশার চেয়ে নেশা হয়ে পড়েছিল বেশী। যার ফলে বাড়ি ভাবতেন সরকারি চাকরী ছেড়ে ছেলে আমার কী টাকাটাই না রোজ-গার করছে! অর্থাৎ এসব কাজ মানে যথামীর নামান্তর মাত্র—তাই এই বাউণ্ডুলেদের না দিত বাড়ীরা উৎসাহ, না দিত তখনকার সমাজ এঁদের ইজ্জত।

১৯২৭ সালের শেষ কি ২৮ সালের প্রথম, ঠিক মনে নেই, বেতারে কীর্তন, কালীকীর্তন, ভাগবৎ পাঠ প্রভৃতির বাইরের দলকে নিমন্ত্রণ করে নৃপেনবাবু তাঁদের গাইবার সুযোগ করে দেন। এমনি সময় চিত্রাসংসদ নামে একটি সংস্থা পরশুরাম রচিত 'চিকিৎসা সংকট' নাটিকা নিয়ে রেডিওতে এসে উপস্থিত হন। এঁদের সদস্য-দের মধ্যে ছিলেন বিশেষ করে বাণী কুমার (বৈদ্যনাথ ভট্টাচার্য), বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্র, পংকজকুমার মল্লিক, সত্য দত্ত (পরে যিনি বেতার নাট্যকে দলে অভিনয় করতেন) বিজন বসু প্রভৃতি মহোদয়গণ। এঁদের অভিনয়-কুশলতায় প্রীত হয়ে নৃপেনবাবু এই সংসদের কয়েকজন কৃতী সভ্যকে বেতার-ভুক্ত করে নেন।

তখন মহিলা মজলিস চালানো হোতো বাইরের বিশিষ্ট খ্যাতনামাদের আনিয়ে.... তাঁদের অনুপস্থিতিতে সময় সময় আমাকেও এর পরিচালনা করতে হোতো। বীরেন ভদ্র মহাশয়কে পেয়ে নৃপেনবাবু মহিলা মজ-লিসের সম্পূর্ণ ভার অর্পণ করলেন। বীরেনবাবু তখন ই আই আর রেলের কর্মী, ...অসুবিধা হলেও তিনি সাগ্রহে এ ভার নিয়েছিলেন 'বিরূপাক্ষ' ছদ্মনামে। পংকজ-বাবুকে গাইয়ে হিসাবে নেওয়া হোলো কারণ

...বাবুর তখন পুরোই সময় ছিল।' বিশেষ ...ছিল অর্কেস্ট্রেশানে। গীতিকার ও সুরকার, ...গল্প লেখক হিসাবে বাণীকুমার নিয়োজিত হন। বিজন বসু শ্রীকৃষ্ণ রাজেন ...দের সাহায্যার্থে সংবাদ পরিবেশনে নিযুক্ত হন। কিছুটা অবকাশ পেয়ে আমার ওপর ভার পড়লো বেতারের নিয়মিত ক্ষীশিল্পী-দের গান শেখানোর। তাছাড়া প্রাইভেট প্রতিষ্ঠিত করের মেয়েদের দিয়ে রবিবার সকালের মেয়েদের আসর আসরের পরি-চালনায় ভার।

১৯২৮ সালের শেষে আমার নিজের বাড়ীতে এক বিপর্যয় ঘটলো। আমার মেজদা হেমেন্দ্রকুমার হঠাৎ মারা গেলেন। বাবার মৃত্যুর পর ইনিই সর্বপ্রথম প্রতিষ্ঠিত হন। মেজদা ছিলেন স্যার বি এন মিত্রের ভাই তৎকালীন পোস্টমাস্টার জেনারেল কপী মিত্র মশাই-এর জামাই। এম-এ, ল' পাশ করে তিনি সুপারিনটেণ্ডেন্ট অফ পোস্টঅফিসের পোস্টে সবে ঢুকেছিলেন। হঠাৎ তাঁর বিয়োগে বাড়ীর ভারসাম্য হারিয়ে গেল। বড়দা নৃপেন্দ্রকুমারের ব্যবসা আগেই বন্ধ হয়েছিল, ছোড়দা ডাঃ নীরেন্দ্রকুমার তখনও মেডিক্যাল কলেজের ছাত্র, কাজেই সাংসারিক ভারসাম্য সামলাতে আমাকেই অগ্রণী হতে হোলো। ১৯২৮ সালের গ্রামোফোন সেশনের ফলাফল ২৯শের গোড়াতেই বার হলো যার সাফল্য আমাকে অনেকটা প্রতিষ্ঠিত করে দিল এবং ২৯ সালেই কতগুলি নতুন যোগাযোগের সুযোগ সুবিধা অঘটন পটীয়সী ভগবান জুটিয়ে দিলেন।

'২৯ সালের প্রথমেই বার হলো আমার 'মধুসূদন দাদা' পালা—যা একমাত্র পালা সে-যুগে বাংলার ঘরে ঘরে শিশুদের মনোরঞ্জন করতে পেরেছিল। কারণ সর্ব-স্তরের শিশুর মুখে তখন উচ্চারিত হোতো 'এসো এসো মধুদাদা। আমার সোলো গান 'আরতিদীপ কে জ্বালিল—যমুনায় তীরে সাঁঝ কাজল মাখা নীরেও যথেষ্ট প্রসিদ্ধি লাভ করল। তাছাড়া সেবারের ভজন ডুয়েট ছিল 'শ্রীগোবিন্দ মুখ চন্দ ও মায়ার মন্দির খোলে' ভুলিয়ে—যা তার পরেও আসনকে দৃঢ়-ভাবেই ধরে রাখতে পেরেছিল।

(চলবে)

বুকের আগুন

পবিত্র মুখোপাধ্যায়

বাংলা সাহিত্যে সবচাইতে বেশী লেখা হয় কবিতা, সবচেয়ে বেশী বাজে লেখা হয় কবিতা। অথচ বাঙালীর মধ্যে এমন প্রবীণ বা বৃদ্ধ খুঁজে পাওয়া কঠিন যিনি ছেলে-বেলায় বা যৌবনে একবারও কবিতা লেখার চেষ্টা করেন নি। হয়তো উদ্দেশ্য স্পষ্ট ছিলো না, লেখক হতে গেলে যে ধরনের নিষ্ঠা থাকা দরকার তা তাঁরা সামাজিক প্রতিষ্ঠায় ব্যয় করেছিলেন; হয়তো যথেষ্ট বুদ্ধিমত্তারই পরিচয় দিয়েছিলেন, কিন্তু এটা ঠিক; হয়তো সুদূর মফস্বলে চাকরী নিয়ে আছেন; কাছাকাছি শহরে লেখক এসেছেন জানতে পেরে অফিস কামাই করে ছুটে আসবেন। উদ্দেশ্য—একটু আলাপ করা। পুরনো দিনগুলোকে ভুলতে পারছেন না, ঘর ভর্তি ছেলেমেয়ে, গৃহিণী যথেষ্ট ভালো রান্না করেন, ছেলেমেয়েরা পড়াশুনো গানবাজনায় মফস্বল শহরে যথেষ্ট নাম-ডাকে আছে, তিনি কিন্তু খুশী নন তাতে, কিংবা খুশীই—তবে কোথায় যেনো কি ভুল না মনে হয়; ছুটে আসেন, আলাপ করেন, মতামত জানাবার চাইতে জানতে আগ্রহ বেশী দেখান।

বাঙালীদের স্বভাবের মধ্যে কোথাও একটা অতৃপ্তি লক্ষ্য করি; তা গাড়ি-বাড়ি হলো না বলে নয়, 'এসেছিল যখন একটা দাগ রেখে যা—' তার জন্য। এটা ভাবেন না, তৃতীয় চতুর্থ শ্রেণীর লেখক হবার চাইতে অনেক বেশী জরুরী একজন ভালো সংসারী হওয়া; এর তো কোনো গ্যারান্টী নেই, লেখক হিসেবে তৃতীয় শ্রেণীর লেখক মরণোত্তর বিস্মৃতি এড়াতে পারবেন; বেঁচে থাকতেই লোকে তাকে আদর করে না; তবু তো লেখক একজন আলাদা মানুষ—এই ভেবে তৃপ্তি পান লেখক; অথচ এর চাইতে অনেক বেশী সুখের—ছেলেমেয়েরা জীবনে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে; মাথা গুঁজবার মতন একটি কোঠাবাড়ি করেছেন নিজের চেষ্টায়, অবসর জীবনটা জমানো টাকা আর পেন্সনের টাকায় মাথা উঁচু রেখেই কাটাতে পারবেন, মাঝে মাঝে এখানে ওখানে ছুটি কাটাতে যাওয়া। না এতে সুখী নন বাঙালী; কৈশোর আর যৌবনের স্বপ্নগুলো ফিরে ফিরে আসে; তাই সাহিত্য সভার সমিতিতে ছুটে আসা।

শেষ পর্যন্ত লেখক হওয়া কতো কঠিন, বুঝতে পারেন যখন—সময় অনেকটা চলে গেছে; নতুন করে জীবন শুরু করবার সময় নেই। তাই অভ্যাসটা না ছেড়ে লেখা নিয়ে সময় কাটানো—ওটাও অভ্যাস হয়ে যায়। তবে বাঙালী স্বভাবে কবি হওয়ার স্বপ্ন ছাড়তে কেউ রাজি নয়। সে যে বয়সেরই হোক; লিখে যাবেন নিয়মিত, পকেটে নিয়ে পত্রিকার অফিসে ঘোরাঘুরিও চলবে; কিন্তু আত্মসমালোচনা? তা কে করে। 'বেশ লিখছি, এরকমই তো সবাই লিখছে এখন' এই সন্তোষ পেয়ে বসে; যদি সঙ্গে সঙ্গে কৃতি কবিদের রচনা কেন শ্রেষ্ঠ, গুণাগুণ কি বা কালের খোপে টিকিয়ে রেখেছে তাঁদের—তা আন্তরিকতার সঙ্গে বিচার করতে শেখে তবে নিজেদের অক্ষমতা কোথায় ধরা পড়ে। তা করতে নারাজ। বাঙালী মধ্যবিত্তদের বাবামায়ের স্বপ্ন যেমন ছেলে বড়ো হয়ে ডাক্তার হবে, ইঞ্জিনিয়ার হবে, তেমনি তরুণ লেখকদের প্রথম স্বপ্ন কবি হবার। যদি প্রশ্ন করা যায় একশো তরুণ লেখককে ডেকে, নাটক লেখো না কেন, উপন্যাস, গল্প? অস্পষ্ট উত্তর দেবে; আমি এখনো এমন ছেলে দেখিনি, যার সঙ্গে পরিচয় হতে সে তাকে 'নাট্যকার' বলে পরিচয় দিচ্ছে। 'ঔপন্যাসিক' হলো—তা শুনি কদাচিৎ; তবে গল্প লেখক হবার স্বপ্ন দেখে তেমন তরুণ দু-চার জন চোখে পড়ে। শুরুটা কবিতা দিয়ে করে শেষ পর্যন্ত গল্পে উপন্যাসে চলে গেছেন, তার উদাহরণ আমাদের পূর্বসুরীদের মধ্যে আছে; ইদানিং কবিতা লেখার সহজ কাজটাই বেশীর ভাগ তরুণ বেছে নিয়েছে। তা কি সময় কম লাগে বলে? ছাপাতে সুবিধে হয় বলে? সহজে কিছুটা নাম হয় পরিচিত সমাজে, তার জন্য? হয়তো এইসব প্রশ্নগুলো অবান্তর নয় মোটেই। এটা মনে রাখে না অনেকেই, সব শিল্পের সৃষ্টিপ্রক্রিয়াই কঠিন, অনেকটা সহজাত প্রতিভা থাকা চাই, অনেকটা অনুশীলন। এসব থাকা সত্ত্বেও একজন প্রথম শ্রেণীর কবি নাও হতে পারে। ঠিক তেমনি গল্প লেখক, ঔপন্যাসিক, নাট্যকার—যা কিছু হতে [illegible] লেখা থাক না কেনো, প্রতিভা ও পরিশ্রম তারও সাফল্যের মূলে। অনেক দিতে হয়, অনেক জানতে হয়, অনেক ভাঙতে হয়—আমরা আমাদের ভাষার শ্রেষ্ঠ লেখকদের সেই সব স্তরের সাধনা দেখেছি। আমরা অনেকেই ওই দিকটায় তাকিয়ে দেখবার সময় পাই না কিংবা ইচ্ছেও নেই। বেশ লিখছি, নাম হচ্ছে না কেন, যেমন ওর হয়েছে—এইসব অভিযোগ নিয়ে যতোটা মাথা ঘামাই, নিজের লেখা কি করে মানুষের মন ছুঁয়ে দিতে পারে তার জন্য চেষ্টা করি না। এক-একটা দশক শুরু হয়, কতো কবি, কতো পত্রপত্রিকা, কতো জেহাদ। এসবই স্বাস্থ্যের লক্ষণ; কিন্তু দু'এক বছর যেতে না যেতেই ভীড় পাতলা হতে থাকে; সেইসব উদ্ভাসিত তরুণের মুখ আর দেখা যায় না। দু-চারজন বুদ্ধক্ষেত্রকে যুদ্ধক্ষেত্র মনে করে আঁকড়ে পড়ে থাকে। এটাও স্বাস্থ্যকর। এটাই নিয়ম। যারা জীবনের অন্য ক্ষেত্রের সার্থকতার টানে চলে গেলো তারা সেসব ক্ষেত্রে অনেকেই বিজয়ী হবে; তবু শেষ বয়সে পৌঁছে ওই কান্নাটুকু তার কাঁদতেই হয়—এই হ'ল বাঙালীর স্বভাব। যাদের এরকম দেখিনি তাদের সংখ্যা খুব বেশী নয়।

এদেশে যতো সংখ্যক লোক কবিতা লেখে তার তুলনায় গল্প উপন্যাস নাটক লেখকের সংখ্যা অনেক কম, প্রায় তুলনাই হয় না। ধরে নিই যদি, কবিতা লেখার প্রতি গভীর টান রয়েছে বাঙালীর, লিখছেও অনেকে, তবে ক'জন সার্থক কবি আমাদের দেশে জন্মেছেন, যাদের রচনার কাছে সুখ-দুঃখে দাঁড়াতে হয় মাথা নত করে? যাঁর কবিতার কোনো না কোনো স্তবক বা পংক্তি প্রবাদের মতন স্মৃতিতে বেঁচে আছে দীর্ঘ দিন? কিন্তু গল্প লেখকমাত্রই কিছু না এমন গল্প লিখেছেন যা না পড়লে সাহিত্য-পাঠ আংশিক হতে বাধ্য। দু-চারটে অসাধারণ গল্প মোটামুটি গোছের লেখকও লিখেছেন; উপন্যাসের কথায় তা বলবো না, নাটকেও না। কিন্তু অসংখ্য কবিতা লেখকের মধ্য থেকে এমন কজন কবি আমরা পেয়েছি যাদের রচনার মধ্যে বোধ, মন ও মনন, অনুভূতি ও রচনাশৈলী পরিণতি পেয়েছে দু-চারটে কবিতাতেও। যেহেতু কবিতা লেখাটার পিছনে আমাদের স্বভাবের তাগিদ যতোটা থাকে, স্বাভাবিক প্রেরণা ততোটা নয়; তাই মোটামুটি চলতিকালের মাপের একটা ছাপারযোগ্য লেখা লিখে ফেলেই আমরা খুশী। এই জন্য অগণন লেখা হচ্ছে পাঠ্য, স্মরণযোগ্য সামান্যই; স্মরণীয় কবি দু-চার জন। প্রথম শ্রেণীর কবির তুলনায় বেশ কিছু অসামান্য গল্প লিখেছেন এরকম লেখকের সংখ্যা আমাদের ভাষায় অনেক বেশী। এই রূঢ় সত্য আমাদের অনেকেরই জানা নেই।

সুবোধ দাসগুপ্তের ছবি

ক্যামেরায় চোখ লাগিয়ে ক্যামেরাম্যান দফ্‌তি, পাশে রোসিফ

ওড়িশায় ফরাসী টিভি দলের সঙ্গে

নারায়ন মুখোপাধ্যায়

১

পাঠকের এজলাসে লেখকের একটি ধর্ম শপথ আছে, 'যে সত্য বলিব...' —রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। আপনাদের কাছে আমার ধর্ম শপথটি হল, ঘটনা বলব! একটু বুঝিয়ে বলি, পৃথিবী সূর্যের চারদিকে ঘোরে, এটি হল সত্য, আর সূর্য পূর্বদিকে ওঠে আর পশ্চিমে অস্ত যায়, এটি হল ঘটনা। এমনি একটি ঘটনা আপনাদের বলব।

ঘটনাটি সাধারণ, তবে পূর্বদিকে সূর্যোদয়ের মতো দৈনন্দিন নয়, তাই হয়ত বা এর মধ্যে কিছু মজা বা সত্যের দু-একটি কণাও পেতে পারেন।—ঘটনাটা খুব অসাধারণ বলে মনে হচ্ছে তাই না? পাঠক; ভুল করছেন; যেহেতু এটা ঘটনা, তাই আবার মনে করিয়ে দিচ্ছি, এতে অস্বাভাবিকত্ব কিছুই নেই; যেটা আছে সেটা হল এই যে এমন ঘটনা রোজ ঘটে না।

আপনি রোজ কাজে যান, আপনি হেঁটে যেতে পারেন, অবশ্য যদি আপনার কর্মস্থল আপনার বাসস্থান থেকে খুব দূরে না হয়। আপনি বাসে করে কাজে যেতে পারেন, ট্রেন ও বাস বা ট্রেন ও ট্যাক্সিতে যেতে—আপনি গাড়ি করেও কাজে যেতে পারেন; এগুলি সেহেতু দৈনন্দিন ঘটনা, কিন্তু যদি আপনাকে একদিন, কোন কারণে [illegible] থেকে ছটায় বিনয়-বাদল-দীনেশ বাগে কাজে যেতে হয় তাহলে, সেটাকে একটু অস্বাভাবিক অথচ সাধারণ ঘটনা হিসাবে চিহ্নিত করা যেতে পারে। অধিকন্তু, সেদিন যদি [illegible] হল প্রবল ঝড়-বৃষ্টি, কলকাতার জনজীবন হল [illegible] এবং [illegible] কর্তাব্যক্তিরা যেন নিজে [illegible] শাপ [illegible] দেন, তাঁদের প্রতি কোন কটাক্ষ করছি না। [illegible] প্রথমে ট্রাম, তারপর ট্যাক্সি, তারপর মিনি বাস এবং সর্বশেষে হেঁটে ও প্রাইভেটে কাজ সম্পন্ন হল এবং রাত আটটা পর্যন্ত একটানা প্রবল বর্ষণ; তখন কি [illegible] আটটা আগাম ঝিকঝিকে ধুতিতে মাথায় রুমাল বেঁধে হাতে জুতো নিয়ে 'জয় মা' বলে গৃহাভিমুখে রওনা হবেন না? পাঠক, এখন কি আপনাকে বলে দিতে হবে যে স্বাভাবিক আর অস্বাভাবিকের মধ্যে ফারাকটা অত্যন্তই অল্প। কাজেই যে-ঘটনাকে আমার মনে হচ্ছে অসাধারণ বা অস্বাভাবিক সেটা শোনবার পর আপনি হয়ত বা হাই তুলে বলবেন—দূর মশাই এটা ত' খুবই সাধারণ ঘটনা, এটা নিয়ে এত ভ্যাজর ভ্যাজর করছেন কেন?—আসলে ব্যাপারটা কি জানেন। আমরা সবাই নিজেকে বিরাট একটা কিছু বলে মনে করি, তাই যেই একটা নতুন কোন ঘটনা ঘটে অমনি সেটা পাঁচজনকে বলতে ইচ্ছে করে; হাতে কলমে আর সামনে কাগজ থাকলে লিখে পাঁচজনের জায়গায় দশজনকে বলতে ইচ্ছে করে। অবশ্য সম্পাদক মহাশয় যদি অনুমতি দেন। এই লিখে বলবার আরও একটা কারণ আছে জানেন, আসলে আমরা বড্ড [illegible] কারণ আমরা বড়ো পাকা আর এই পাকামী করতে গেলে আত্মীয় বড়োদের কাছে কানমলা খেতে হয়, কাজেই কান তখন মান বাঁচাতে পেনের লেখা ছাড়া উপায় নেই, কারণ আপনারা ত আর আমাকে চেনেন না, আর চিনলেও 'ও' ত ছোট লিখেছে' এই কথা মনে করে কানমলা দেবেন না।—পাঠক বুঝতেই পারছি আপনার ধৈর্যচ্যুতি ঘটছে, এইবার হাতের কাছে অস্ত্রের মতো [illegible] পেলে আপনি হয়ত এ পত্রিকাটাই ছিঁড়ে ফেলবেন। দয়া করুন, একটু ধৈর্য ধরুন, আসলে আমার ইচ্ছে এই যে ঘটনাটা, যেটা বলব বলে আপনাদের কাছে অঙ্গীকার করেছি, এইটাকে ছুতো করে আপনাদের সঙ্গে একটু আড্ডা মারব,—রাজী ত?—দয়া করে প্রত্যাখ্যান করবেন না— বড্ডো কষ্ট পাবো, মাইরি বলছি কেঁদে ফেলব।—আচ্ছা, এইবার শুরু করছি, কিন্তু তার আগে নিজের পরিচয়টা দিয়ে রাখি; অধম মাঝে মাঝে দু-দশ দিনের জন্য দোভাষীর কাজ করে থাকে। বুঝতেই পারছি আপনার প্রশ্নটা—'কোন ভাষায়'—ভাষাটা একদিকে হল ফরাসী অন্যদিকে ইংরাজী, বাংলা বা বাজারের হিন্দী এবং প্রয়োজন হলে একটু আধটু ভাঙা উড়িয়াও বটে।

—আপনি কি করেন সে কথা ত আমরা শুনতে ইচ্ছুক নয়, যে ঘটনাটা বলবেন বলে শুরু করেছিলেন সেটা কোথায় গেল?

—বলছি, আমার কাজের ফিরিস্তিটা ঘটনাটার সঙ্গে এমন ওতপ্রোতভাবে জড়িত যে ওটা বাদ দিয়ে ঘটনাটা বলা যাবে না; বলতে পারেন, ওটা হল গৌরচন্দ্রিকা।

বিশ্বাস করুন এই ফেব্রুয়ারি মাসের ২৬ তারিখ শনিবার সকালেও আমি জানতাম না যে ২৮শে সোমবার রাতে আমি পুরীতে ঘুমোবো।—কেমন করে?

—বলছি, শনিবার দুপুরে খেয়ে-দেয়ে একটু বিশ্রাম করছি এমন সময় বেলা ৩টে নাগাদ ভারতীয় টুরিস্ট ব্যুরো থেকে লোক এসে হাজির; বিশ্ববিখ্যাত তথ্য-চিত্র নির্মাতা ফ্রেদেরিক রোসিফ ফোনে জানিয়েছেন যে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব আমি যেন প্লেনে করে পুরী পৌঁছই, দোভাষীর কাজ করতে হবে। কলকাতার কাজকর্ম গুছিয়ে নেবার জন্য সোমবার সকালটা চাইলাম; মঞ্জুর হল; সোমবার বিকেলের প্লেনে ভুবনেশ্বর পৌঁছলাম; উড়িষ্যার টুরিস্ট ব্যুরোর লোক বিমানবন্দরে অপেক্ষা করছিলেন, তাঁর সঙ্গে গাড়িতে করে রাত আটটা নাগাদ পৌঁছলাম পুরীর রেলওয়ে হোটেলে।

[illegible] জাঁ-মার্ক ব্যুত্তোনী আলাপ করিয়ে দিলেন রোসিফ সাহেবের সঙ্গে। লম্বা, একটু সামনের দিকে ঝুঁকে গেছেন, চওড়া কাঁধ, চাপড়ানো বুক, [illegible] চুল ও

পাকা চুল, চোখ দুটো টানা ও তীক্ষ্ণ, অত্যন্ত ভদ্রভাবে হাত বাড়িয়ে দিলেন ও হাভানা চুরোট খাওয়ালেন। ভদ্রলোকের জন্ম ফ্রান্সে নয়, জন্মেছেন যুগোস্লাভিয়ার মন্টে-নিগ্রোতে ১৯২২ সালে। যুদ্ধের সময় প্যারীতে পালিয়ে আসেন; তারপর থেকে প্যারীর বাসিন্দা ও ফ্রান্সের নাগরিক।

১৯৫১-৫২ সালে জঁ ককতোর সর্ট ফিল্ম 'সান্তো সোসপির'এ অ্যাসিস্টেন্টের কাজ করেন। ১৯৬১ সালে তাঁর বিখ্যাত তথ্যচিত্র মুরির আমাদরিদ প্রকাশিত হল, ছবিটি গোড়ায় ফরাসী সরকার বেরোতে দেন নি পরে আঁদ্রে মালরোর চেষ্টায় প্রকাশিত হয়। ব্যক্তিগত ভাবে রোসিফ হেমিংওয়ে ও আঁদ্রে মালরোর বন্ধু ছিলেন।

'মুরির আ মাদরিদ' বেরোবার সঙ্গে সঙ্গেই রোসিফ বিখ্যাত হয়ে উঠলেন এবং তথ্য-চিত্রকার হিসাবে হলিউডের অসকার পেলেন। ফ্রেদেরিক রোসিফের তথ্য-চিত্রে একটি থিম বা বস্তু থাকে; গত কয়েক বছর ধরে তিনি পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে তথ্য-চিত্র তুলেছেন এবং সামগ্রীকভাবে এগুলির নাম 'ওপেরা সোভাজ' (প্রকৃতির ওপেরা) তাঁর উড়িষ্যার ওপর তথ্য-চিত্রটিও এই ওপেরা সোভাজের ওপরেও একটি 'ওপেরা সোভাজ' তৈরী করেছেন।—তৈরী করেছেন বলা ভুল হল, কারণ এখানে শুধুই শ্যুটিং করলেন, প্রধান কাজটি, অর্থাৎ এডিটিং করবেন ফ্রান্সে।

—তাত বুঝলাম, কিন্তু কি শ্যুটিং করলেন? কোথায় শ্যুটিং করলেন? এসব কথা ত কিছুই বলছেন না।

—বলছি-বলছি সব বলব অতো অধৈর্য হলে কি করে বলি?—দাঁড়ান একটা সিগারেট ধরিয়ে নি। একটু গুছিয়ে বলতে হবে ত। যেন কোন কথা বাদ না পড়ে বা কোন কথা বেড়ে না যায়। কি ভাবে বলব, একটু ভেবে নিতে দিন।—

—'ওপেরা সোভাজ' বলতে কি বোঝায়?

—ওপেরা সোভাজ মানে জঙ্গলের ছবি নয়, ওপেরা সোভাজ মানে যা কিছু প্রকৃতিতে আছে তার মধ্যে যে নাটক সদা উপস্থিত অর্থাৎ প্রকৃতিতে আছে প্রাণী ও মানুষ; আমাদের মতো প্রকৃতির সঙ্গে সরল সম্পর্ক বিবর্জিত মানুষ নয়, যে মানুষ প্রকৃতির বুকে প্রকৃতিকে মেনে নিয়ে বাঁচছে; যে মানুষ লাঙল হাতে জমি চষে, জাল হাতে কাঠের নৌকা বেয়ে সমুদ্রে মাছ ধরে—সেই মানুষ, তাদের কাজ কর্ম, পুজা-পার্বণে তাদের নাচ-গান, এই সমস্তই ওপেরা সোভাজের অঙ্গ। এইবার শ্যুটিং-এর কথা বলি তাহলে ব্যাপারটা আরও ভালো করে বুঝতে পারবেন।

২৮শে ফেব্রুয়ারি রাতে সমুদ্রের গর্জন শুনতে শুনতে ঘুমিয়ে পড়লাম। পয়লা মার্চ ভোর ৬টায় শ্যুটিং আরম্ভ হল, পুরীর বালুকা-বেলায়, জেলেদের গ্রামের সামনে, যেখানে তারা দড়ি দিয়ে বাঁধা কাঠের নৌকা ভাসিয়ে সমুদ্রে মাছ ধরতে যায়। শুরু হল শ্যুটিং, পুলিশ এল শান্তি বজায় রাখবার

গোপালপুরের ব্যাক ওয়াটারের তীরে শ্যুটিং। ক্যামেরায় চোখ লাগিয়ে ফ্রেদেরিক রোসিফ সঙ্গে এসিসট্যান্ট ক্যামেরাম্যান দানিয়েল, ব্রঁ শার্ল এবং লেখক

জন্য, যাতে লোকে ক্যামেরার সামনে এসে কাজে অসুবিধা না করে। ক্যামেরাতে চোখ লাগিয়ে ফ্রান্সের বিখ্যাত ক্যামেরাম্যান ক্ল বর্ফিত, তাঁর একপাশে তাঁর অ্যাসিস্টেন্ট দানিয়েল অন্য পাশে পরিচালক সাহেব; তিনি মাঝে মাঝে ক্যামেরায় চোখ লাগাচ্ছেন, ক্যামেরার স্থান পরিবর্তন করতে বলছেন, কোনটা নিতে হবে তা বলে দিচ্ছেন; আর ক্ল বর্ফিত কখনও উত্তেজিত কখনও শান্ত আবার কখনও বা উল্লসিত হয়ে ক্যামেরা চালিয়ে যাচ্ছেন; মাঝে মাঝে উৎসাহিত হয়ে পরিচালককে ডাকছেন ও হুকুম পেলে ছবি তুলছেন। আমার স্থান হল পরিচালকের ঠিক পিছনে এবং যেহেতু আসতে আমি মহাপাকা, তাই সুযোগ পেলেই পরিচালক সাহেবকে প্রশ্ন করছি। কাজের ফাঁকে ফাঁকেই তিনি আমায় বোঝালেন যে দূর থেকে জুম ব্যবহার করে ক্লোজ-আপ নেবার সুবিধা হল এই যে তাতে 'কম্পোজিশন' করা অনেক সুবিধা আর তাছাড়া যাদের ছবি তোলা হচ্ছে তারা বুঝতে পারবে না ফলে ব্যাপারটা অনেক বেশী স্বাভাবিক হয়; ব্যাপারটা বোঝাবার জন্য দু-একবার ক্যামেরায় চোখ লাগাতেও দিলেন। দলের অন্যেরা, অর্থাৎ স্টিল ফটোগ্রাফার বেরনার ও শব্দ-গ্রাহক পাত্রিক তাদের যন্ত্রপাতি নিয়ে আশে পাশে ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে; দলের ব্যবস্থাপক ব্রঁ-শার্ল জিনিসপত্র দেখা-শোনা করছে এবং সময় পেলেই হয় ক্যামেরার আশে-পাশে অহেতুক উত্তেজিত ভাবে ঘোরাফেরা করছে না হয় সবাইকে জিজ্ঞাসা করছে পানিয়ের প্রয়োজন আছে কিনা। সমুদ্র তীরের খাড়া রোদে দাঁড়িয়ে কাজ করছি বা করছি না, তাতে কিছুই যায় আসে না। কিন্তু রোদে দাঁড়িয়ে ত আছি; ফলে—'তৃষ্ণার্ত হইয়া চাহিলাম জল; তাড়াতাড়ি এনে দিলে' এক বোতল বিয়ার। বললাম জল খাব। ব্রঁ-শার্ল শান্ত গলায় বললে 'জল পাবে না, বিয়ার যদি পছন্দ না হয় ত কোকা-কোলা বা লিমকা পেতে পারো'—বর্ফিত

দূরে দাঁড়িয়ে বলল 'হ্যা ওসব মানুষে খায়?' নে নে তাড়াতাড়ি চুমুক মেরে বাকি বিয়ারটা দিয়ে দে বড্ডো তেষ্টা পেয়েছে'—বুঝতেই পারছেন, ফরাসীদের সঙ্গে কাজ করতে যাওয়ার সুবিধা বা অসুবিধা, তেষ্টা পেলে জল পাবেন না, পাবেন বিয়ার বা কোকা-কোলা, আমি অবশ্য এ ক্ষেত্রে বিয়ারই পছন্দ করি কারণ জলের বদলে কোকা কোলার চেয়ে বিয়ার ভালো, আর তাছাড়া আমি ত 'জেতেতে বাঙালী' তাই পরের পয়সায় পাই ত ...

ব্রঁ-শার্ল, ক্যামেরার আশে-পাশে ঘোরা-ফেরা করছে, মাঝে মাঝে কুলীদের হুকুম করবার জন্য আমার শরণাপন্ন হচ্ছে—এইভাবে কাজ চলছে, বেলাও বেড়েই চলেছে, তার সঙ্গে ব্যবস্থাপক ব্রঁ-শার্লের ছুটোছুটি, বর্ফিত ঘন ঘন বিয়ার চাইছে, বেরনার চায় কোকা-কোলা এবং পরিচালক সাহেব চান বরফ দিয়ে ঠাণ্ডা করা চা; এদিকে ব্রঁ-শার্ল উত্তেজিত হয়ে ক্যামেরার আশে-পাশে ঘোরা-ঘুরি করছে। বেলা এগারোটা নাগাদ জেলে ডিঙিগুলো ফিরতে আরম্ভ করল। সমুদ্রের তীরে শুরু হল মানুষের কোলাহল, ঝগড়া, কর্মব্যস্ততা এর ওপরে আছে চিল, তারা এই হট্টগোলের মাঝে ছোঁ মেরে মাছ চুরি করতে চেষ্টা করতে লাগল জেলেদের কাকদের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে। রোসিফ সাহেব মহা উৎসাহে ছবি তুলতে লাগলেন আমারও কাজ বাড়ল। হঠাৎ পরিচালক সাহেব ব্রঁ-শার্লের খোঁজ করলেন, দেখতে না পেয়ে আমায় জিজ্ঞাসা করলেন, আমিও এদিক-ওদিক চেয়ে দেখলাম ব্রঁ-শার্লের টিকিও দেখতে পেলাম না।

—সাহেবরা ত টিকি রাখে না।

—আরে আর মানে, লোকটা বেমালুম লোপাট।—অগত্যা গেলাম তার খোঁজে।

—কোথায় পেলেন?

—যাতে মাছ নামছে আপনাদের যেখানে পাওয়া যেত সেখানেই পেলাম।

যোশিপুরে শ্যুটিং চলছে।

—কোন জায়গায়।

—সেটা কি বলে দিতে হবে? আপনারা ত বাঙালী, বুঝে নিন।

—বানে যেখানে মাছ মারছে সেখানে, ভিড়ের মধ্যে ?

—ঠিক ধরেছেন। —গিয়ে দেখলাম বস্ ডাকছে। মুখটা ব্যাজার করে ভিড় ঠেলে বেরিয়ে এল এবং দলের প্রয়োজনটা মিটিয়েই আবার তীর বেগে ভিড়ের মধ্যে ঢুকে গেল; তারপর হঠাৎ হন্তদন্ত হয়ে আমার কাছে ছুটে ছুটে এসে আমায় প্রায় পাঁজাকোলা করে টেনে নিয়ে যেতে শুরু করল। বললাম 'আরে বস হয়ত ডাকবে'—খিঁচিয়ে উত্তর দিল —'দিকুটী করেছে, তাড়াতাড়ি চল, নইলে হাতছাড়া হয়ে যাবে।' —হ্যাবাচ্যাকা খেয়ে পড়ি কি মরি করে ছুটলাম, গিয়ে দেখি, একটা জোয়ান তিনটে বড়ো গলদা চিংড়ি নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে—গলদা চিংড়ি বলছি কিন্তু সেগুলো মোটেই বাজার গলদা নয়, সমুদ্রের লালচে ধুমসো চিংড়ি—তাই ঝঁ-শার্ল কিনবে, তা দেখলে আর কাকে বলে? পাঁচিশ টাকা দিয়ে কিনলো, তারপর ক্যাঁচে হিসেব করে দলের সবাইকে দেখিয়ে বলতে লাগল—'কি দারুণ সস্তা তাই না?'—দলের সবাই মাথা নেড়ে সায় দিল।—পরিচালক মহাশয়ের হুকুম হ'ল রাতে ওগুলো খাওয়া হবে। —রাতে, ডিনারে সেই সেদ্ধ ধুমসো চিংড়ির একটা টুকরো খেয়ে পুরীর ঠান্ডা সমুদ্রের হাওয়ায় বাজার গলদা চিংড়ির কথা ভেবে আমি ফেললাম আমার দীর্ঘশ্বাস, আর দলের বাকি সবাই অত্যন্ত খুশী হয়ে ঝঁ-শার্লকে আশির্বাদ করল। খাবার পরে হুইস্কি সহযোগে আড্ডা তারপর নিদ্রা।

পরদিন ভোরে গাড়ি করে ভুবনেশ্বরের পথে পাড়ি দিলাম, সোজা ভুবনেশ্বরে না গিয়ে, সেখান থেকে আট কিলোমিটার দূরে স্বাভাবিক পরিবেশের পশুশালা নন্দনকাননে যাওয়া হল; কারণ বাঘের শ্যুটিং হবে। সিনেমার ভেল্কী বাজীটা বুঝুন—পশুশালার প্রাকৃতিক পরিবেশ মানে সিমেন্ট বাঁধানো চৌবাচ্চার ওপরে বিশে দু বিঘতে জুটে। বড়ো বড়ো রয়্যাল বেঙ্গল টাইগার সেখানে বাঁশ ঝাড় ও আগাছা—আর মধ্যে বিচরমান রয়্যাল বেঙ্গল টাইগার যারা টাটকা ভেড়া বা শুয়োর খানে পেয়ে শীকার ধরতে প্রায় ভুলেই গেছে; ডাকলে ডাক শোনে এমন বাঘ ক্যামেরায় কায়দায় হয়ে উঠবে হিংস্র বন্য বাঘ আর তার ছবি টেলি-ভিশানে দেখে ইউরোপ ভূখণ্ডের আবাল বৃদ্ধ বনিতা রোমাঞ্চিত হবে এবং ভারতে বাঘ বাস করে বর্তমান এই কথা বুঝে, বাঘ প্রকল্পকে জানাবে ধন্যবাদ। গোল বাধবে তখনই, যখন এদের মধ্যে দু একজন রোমাঞ্চকর অনুভূতি-প্রেমিক-গাঁটের কড়ি খরচা করে উড়িষ্যায় এসে অনেক কষ্ট সহ্য করে যোশিপুর থেকে চল্লিশ কিলোমিটার দূরে গিয়ে পোষা ন্যাকা বাঘিনী খৈরীকে দেখে হয় গাল দেবে না হয় রোমাঞ্চিত হবে। —

—বাঘিনী কি করে ন্যাকা হয়?

—বাঘিনী ন্যাকা হতে পারে না বুঝি? —তা হলে বলি। —অনেক দূর জীপে করে গিয়ে দেখলেন একটা গোছানো মাটির বাংলো, শ্রীসরোজ রাজ চৌধুরী বাঘ একজন অতি উচ্চপদস্থ কর্মচারীর বাস-স্থান; সেখানে গিয়ে আপনি গুছিয়ে বসে ভদ্রলোককে আপনি প্রশ্ন বাণে জর্জরিত করছেন এমন সময় হঠাৎ দেখেন আপনার সামনে এক বিরাট বাঘ—থুড়ি বাঘিনী—আপনার নাকের কাছে বিরাট মুখব্যাদান করছে; আপনার আত্মারাম যখন খাঁচা ছাড়া হবার জোগাড় তখন শ্রীরাজ চৌধুরী মহাশয় বললেন—'ও খৈরী আপনাকে অভ্যর্থনা করেছে; ওর গায়ে হাত বোলান কিছুটি বলবে না।' ভয়ে ভয়ে আপনি তার গায়ে হাত বোলালেন, বাঘিনী উল্লসে উঠলেন এক ধরনের গর-গর আওয়াজ করে আরও কাছে একেবারে ঘাড়ে পড়লেন—পেছনে শ্রীরাজ চৌধুরীর আশ্বাস বাণী 'আপনাকে ওর পছন্দ হয়েছে।' —বলুন, তখন কি মনে হয়?—এই বেঘো আতিথ্যে আপনার পিত্তি জ্বলবে কি না?—মনে মনে ভয়ও করছে, এই পছন্দের ফলে বাঘিনীর মনেই হতে পারে—আহা এমন খাসা লোকটা একে একেবারে আমার হৃদয়ে ঠাঁই দি'—কিন্তু ভদ্রতার খাতিরে মুখে একটা বোকা বোকা হাসি বাঁধিয়ে রেখে মনে মনে দুর্গা নাম জপ করতে হবে। তারপর তিনি আপনার হাত ও মুখ একটু চেটে প্রথমবারের মতো আপনার রেহাই দেবেন।—বলুন, এমন বাঘিনীকে ন্যাকা বলব না ত কি বলব ?—যাক ও কথা; আমার দৃঢ় বিশ্বাস যে বাঘ কুলে এই বাঘিনীর নিন্দার শেষ নেই। যাকগে কি যেন বলছিলাম?—ও হ্যাঁ ভুবনেশ্বরের নন্দন-কাননে বাঘের শ্যুটিং এর কথা—কোথায় ভুবনেশ্বর আর কোথায় যোশিপুর—এই হল আড্ডার দোষ যা শুরু। অবশ্য এটা একেবারেই অপ্রাসঙ্গিক নয়; কেননা খৈরীও রোসিক সাহেবের ছবিতে ঠাঁই পেয়েছে।

যাই হোক ভুবনেশ্বরের খাঁচায় বাঘ—না না, প্রাকৃতিক পরিবেশের মধ্যে, পশুশালার বাঘিনীর জন্য (কারণ পশুশালার অধ্যক্ষ বলেছিলেন যে ওটা বাঘিনী) একটা বাঁশের ডগায় মাংসের চাঙড় বেঁধে তার কাছে এগিয়ে দিতেই ভয় পেয়ে বাঘিনী ঝম্প ঝম্প শুরু করল—ব্যাপারটা রোসিক সাহেব আন্দাজ করতে পারেন নি—ফলে একই উপায়ে বাঘিনীটিকে আবার ঝম্প-ঝম্প করানো হ'ল।' অবশ্য বিলাতে ছেলে বুড়ো সবাই দেখবে জঙ্গলে বাঘিনীর ঝম্প-ঝম্প; ভয় পেয়েই হোক বা যেভাবেই হোক বাঘিনীর ঝম্প-ঝম্প ত; তার ব্যাপারটাই আলাদা—আবার টেলীলেন্স দিয়ে ক্লোজ-আপে নেওয়া হল; না হলে সিমেন্ট বাঁধানো চৌবাচ্চার পাড়টা দেখা যাবে যে!'

—এই যে এত সব ঘটছে এর মধ্যে আপনার কাজটা কি ?

—আমার কাজটা হল ভীড় হটানো, আর মাঝে মাঝে পশুশালার অধ্যক্ষকে প্রশ্ন করা ও তাঁর উত্তরটা রোসিক সাহেবকে তর্জমা করে দেওয়া। —হ্যাঁ ভীষণ তেষ্টা পাচ্ছিল, কারণ পুরীতে সমুদ্রের ঠান্ডা হাওয়াটা ছিল আর নন্দনকাননে, তার নাম নন্দন-কানন হলেও, রোদে পাথর তাতবেই আর ফলে গরম হবেই। —ও আচ্ছা বলতে ভুলে গেছি, নন্দন-কাননটা তৈরি হয়েছে একটা পাহাড় আর একটা হ্রদের মাঝে দু-তিন কিলোমিটার জায়গা জুড়ে।—বুঝতেই পারছেন, বেলা দশটার পর থেকে কি গরম হয়, সেই গরমে ঠুঁটো জগন্নাথ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকলে তেষ্টার কি দোষ ? আর যতবারই জল চাই পাই বিয়ার, বুঝুন কষ্টটা, মনে মনে প্রতিজ্ঞা করলাম রাতে, হোটেলে সবার সামনে বিয়ার ফেলে জল খাবই।

বেলা বারোটা নাগাদ সকালের শ্যুটিং শেষ হল তারপর আধঘন্টাটাক বিশ্রাম তার-পরে নন্দন-কাননের গায়েই একটা জলায় অনেক জংলী পাখি চরছিলো, ঠিক হল তার শ্যুটিং হবে। জলায় এত বন আর বড়ো ঘাস যে মনে হয় ওটা বুঝি একটা মাঠ, তার ওপর পাখিগুলোও ঐ ঘাসের ওপরেই ঘুরে বেড়াচ্ছে, ফলে বোঝবার কোন উপায়ই নেই যে ওটা জলা। রোসিক, ফর্তি আর দানিয়েল ক্যামেরা নিয়ে জলার ধারে আড্ডা গাড়ল, ঝঁ-শার্ল যথারীতি ন্যস্ত-সমস্ত-ভাবে ক্যামেরায় আসে-পাশে ঘোরাঘুরি

করতে লাগল, আর আমি সাউন্ড ইঞ্জিনীয়ার পাটিকের সঙ্গে একটা গাছের ছায়ায় বসে খেতে লাগলাম। আমরা পরিচালক সাহেবের যত বশংবদই হই না কেন পাখিরা তাঁর কথা কানেও তোলে না, ফলে, মুরুন চাষাকে যোগাড় করা হল, তারা পাখি-গুলোকে তাড়িয়ে একটা জায়গায় নিয়ে যাবে বলে তারা মোটা বকশিসের লোভে কসরৎ করল এবং তা পেলোও। এবার পরিচালক সাহেবের ইচ্ছা হল যে পাখিগুলো উড়ুক-পাখিগুলো ছিল আমাদের উল্টো দিকে বেশ খানিকটা দূরে পরিচালক সাহেব তাঁর ইচ্ছাটি প্রকাশ করবার সঙ্গে সঙ্গেই মঁ-শার্ল ছুটলো তার কর্তব্য পালন করতে, অর্থাৎ পাখিগুলোকে ওড়াতে। জলাটা বেশ বড়ো, আমাদের উল্টো দিকে পৌঁছতে মঁ-শার্লের অনেক সময় লাগবে। মঁ-শার্ল সেখানে পৌঁছক তারপর বলব শুরু হল।

—ইতিমধ্যে হঠাৎ দেখিয়ে ক্যামেরায় চোখ রেখে ক্যামেরাটা একটু ঘুরিয়ে বর্ফীত নিজের মনেই হাসতে লাগল আর মাঝে মাঝে শালা পড়েছে ফলে, কি দরকার ছিলো ? ফেলে দে না। ইত্যাদি অদ্ভুত সব উক্তি করতে লাগল. তারপর আমার ডেকে বলল, 'দেখ দেখ মজা দেখ।' ক্যামেরায় চোখ লাগিয়ে দেখি উঁচু গাছের ডালে একটা মাছরাঙা গোছের পাখি নিজের ঠোঁটের চেয়ে বড়ো একটা মাছ ধরেছে, মাছটা তখনও জ্যান্ত কাজেই কিছুতেই সেটাকে বাগাতে পারছে না, কিন্তু ফেলতেও রাজী নয়, অতএব বিভিন্ন কায়দায় সেটাকে ম্যানেজ করবার চেষ্টা করছে কিন্তু পারছে না। অনেকটা আমার মতো অবস্থা। তাই না ? —ইচ্ছেটা আপনাদের সঙ্গে আড্ডা মারা এবং আপনাদের মজা দেওয়া, কিন্তু ঠিক জুত হচ্ছে না।—আমার মুখ শুকিয়ে যাচ্ছে। আপনারা মজা হয়ত পাচ্ছেন না কিন্তু, আমিও নাছোড়, চান্স যখন পেয়েছি বকে যাবই। যাই হোক কি যেন বলছিলাম ?

—ও হ্যাঁ মঁ-শার্ল।— সে এতক্ষণে জলাটার অপর পাড়ে পৌঁছে গেছে এবং পরিচালক সাহেবের হুকুম পাওয়া মাত্রই জলায় নেমে পড়ল, আস্তে আস্তে সাবধানে এগোচ্ছে, যেন পাখিরা সেই দিকেই ওড়ে, সেদিকে পরিচালক সাহেব চান। কিন্তু এ কি ? মঁ-শার্ল বেপাত্তা।, হ্যাঁ। তাকে আবার দেখা যাচ্ছে তার টাকের ওপর একটা কিছু, দূর থেকে মনে হচ্ছে কচুরীপানা বা ঐ গোছের একটা কিছু। পাখিরা কিন্তু উড়ল না মঁ-শার্লের অবস্থা দেখে বা অন্য কোন কোন কারণে পরিচালক সাহেবের মত বদলালো, মঁ-শার্লকে ফিরে আসতে ইঙ্গিত করছেন—মঁ-শার্ল ফিরছে।

—এই দেখুন ঘটনাটা তখন এত জোর লাগছিল যে হেসে পেট ফাটিয়ে ফেলেছিলাম—আপনাদের বললাম, আপনারা হাসলেন না। কি করি বলুন, আমার অক্ষমতা, কিন্তু থামা দেবো না—ঐ পাখিটার কাছ থেকে শিখেছি—শেষে কিন্তু পাখিটা মাছটাকে গিলেছিলো।

ভরতপুরে, লোকেশন শুটিং-এ

রাতে ভুবনেশ্বরের গেস্ট হাউসে ফিরে প্রতিজ্ঞা অনুযায়ী আবার টেবিলে বেয়ারার কাছে জল চেয়ে খেলাম। সবাই বড়ো বড়ো চোখ করে দেখল, কেউ কিন্তু বিশেষ কিছু বলল না, শুধু বর্ফীত বলল বা ভালো ঝুঁকিস কর। কপাল মন্দ হলে কি না হয় ? সেই রাতেই পেট ছাড়ল। পরের দিন সকালে প্রাতরাশের টেবিলে কিছু বলবার আগেই মঁ-শার্ল জিজ্ঞাসা করল কিরে রাতে ঘুম হয়নি নাকি ? ব্যাজার মুখে উত্তর দিলাম পেট ছেড়েছে। আর যাই কোথায় ? দলের সবাই আমার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল, আর মঁ-শার্ল ছুটলো ওষুধ আনতে, কেন জল খেতে গেলি ? বর্ফীতর বক্তব্যটা হল 'বলেছিলাম শুনলি না, এমন ভাব করলি যেন বিয়ার বাড়ন্ত, এখন বোঝ, যা বলছি শোন, মঁ-শার্লের ঐ সব ওষুধ-বিষুধ-গুলো গেল, আর আজ থেকে জল একেবারে বন্ধ কর, বিয়ার ছাড়া আর কিছুটি ছুঁবি না আর রাতে আমরা দুজনে গুছিয়ে বসে স্কচ খাবো তা হলেই দেখবি তোর পেটের সব পোকা মরে গেছে।' ভাবখানা যেন পেটের ইনফেকশান বিয়ার আর হুইস্কি খেলেই সেরে যাবে। হট্টগোলের চোটে পরিচালক মহাশয় এসে প্রশ্ন করলেন, সবাই বোঝালো যে কাল রাতে বিয়ারের বদলে জল খেয়ে আমার পেট পেট ছেড়েছে, পরিচালক সাহেব মাথা নেড়ে রায় দিলেন সত্যিই কাল রাতে জল খাওয়াটা অন্যায় হয়েছে। মনে মনে বললাম নিকুচি করেছে, আর গতকাল জু-গার্ডেনের বাঘকে সে বনের বাঘ বলে চালালে সেটা বুঝি খুব ন্যায় সঙ্গত ?

যাই হোক প্রাতরাশের পর একেবারে সব কিছু গুছিয়ে নিয়ে গাড়িতে চড়লাম সারা সকাল নন্দন-কাননে শুটিং করে বেলা বারোটা নাগাদ রম্ভা অভিমুখে যাত্রা ও সেখানে দ্বিপ্রাহরিক আহার সেরে সন্ধ্যায় গোপালপুর-অন-সীতে আস্তানা গাড়া। প্রাতরাশটা কিন্তু সারা হয়েছে তোর ছুটায়।

—এটা বলবার মানে ?

—মানে আছে, সাড়ে ছটা নাগাদ বেরিয়ে নন্দন-কাননের পথে যেতে যেতে দেখা গেল, একপাল হনুমান ক্ষেতে নেমেছে। পরিচালক সাহেবের হুকুমে দাঁড়ান হল, ক্ষেতের শস্য হনুমানদের ছবি তোলা হল, তারপর ক্ষেতের মালিককে বিশ টাকা ঘুষ দিয়ে নির্দিষ্ট দলেদের জন্য হনুমানদের ক্ষেত নষ্ট করতে দেওয়া হল, তারপর হনুমানদের নির্দিষ্ট দিকে তাড়া দেবার জন্য ক্ষেতের মালিককে আরও দশ টাকা দেওয়া হল। হনুমানের দল আমাদের সাহায্য করল, অর্থাৎ যেদিক দিয়ে তারা পালালে পরিচালক মহাশয় খুশি হন সেদিক দিয়েই পালালো। যাবার সময় ক্ষেতের মালিক তার লাল চুণে করে খাওয়া দাঁত বার করে হেসে আবার আসতে বলল ভাবখানা হল ভাগ্যিস ক্ষেতে হনুমান নেমে-ছিল তাই তিরিশটা টাকা কালতু পেয়ে গেলাম।

নন্দন-কাননে পৌঁছে একই খেলা, এবারে বাঘ নয় সম্বর হরিণ, রোদে ঠায় দাঁড়িয়ে মাঝে মাঝে বিয়ার দিয়ে গলা ভেজানো, মাঝে মাঝে বর্ফীতও পরিচালক সাহেব দয়া করে ক্যামেরার মধ্য দিয়ে দেখতে দিচ্ছেন। এইভাবে বেলা বারোটা পর্যন্ত রোদে পুড়ে গাড়িতে উঠলাম, গন্তব্য রম্ভা।

রম্ভা হল চিল্কার ধারে একটা গঞ্জ-শহর। এখানে উড়িষ্যা ট্যুরিস্ট ব্যুরোর একটা ট্যুরিস্ট লজ আছে, সত্যিই এটা অপূর্ব, বিরাট বাগান আর বাগান পার হলে চিল্কা। ইচ্ছে করছিল একটা দিন কাটিয়ে যাই, কিন্তু উপায় নেই। ঘন্টা দুয়েক থেকে মধ্যাহ্ন-ভোজ সেরে আবার গাড়িতে উঠে যাত্রা করলাম। সন্ধ্যা ছটা নাগাদ গোপালপুর-অন-সী পৌঁছলাম। ওবেরয় পামবিচ হোটেলে ঘর বুক করা ছিল ক্লান্ত দেহে যে যার ঘরে ঢুকলাম। তারপর হাত মুখ ধুয়ে রাতের খাবার খেতে গেলাম। খেয়ে উঠে ঘরে শুতে যাবার কথা ভাবছি বর্ফীত ধরল : তোর পেট কেমন আছে ?

—খারাপ।

—তা হলে চ তোর পেট সারিয়ে

হয়। সাঁতাই কাজের সময় তাজা খোরাই যায় না যে বর্ণিত একটা কেউ-কেটা।—এই দেখুন বার্ড আইল্যাণ্ডে শ্যুটিং এর কথা বলতে বলতে কোথায় এসে গেলাম প্রকৃতির কথা বন্ধ করলাম।

সন্ধ্যায় গোপালপুরে ফিরে এলাম। পরদিন ভোরে ছত্রপুর বলে একটা শহরে গেলাম দোল খেলার শ্যুটিং করতে পুলিশ এল আমাদের তথা ক্যামেরার সংরক্ষণের জন্য, যাতে লোকে আমাদের ও তার সঙ্গে ক্যামেরাকে রংয়ে না চোবায়। শহরের বড় রাস্তায় সকাল আটটার মধ্যে ক্যামেরা দাঁড়িয়ে আমরা তৈরি আস্তে আস্তে একটি দুটি লোক আসতে শুরু করল, রং খেলা শুরু হল, পুলিশের দয়ায় বেলা নটা পর্যন্ত আমাদের কারোর গায়ে আঁচড়টি পর্যন্ত পড়ল না। দলের সবাই সাহেব, শুধু আমিই কালা আদমি ফলে অনিচ্ছা সত্ত্বেও দৃষ্টি আকর্ষণ করলাম, ফলে আমিই হয়ে উঠলাম বাচ্চাদের লক্ষ্য, ফাঁক পেলেই ভীড়ের ভেতর থেকে বাচ্চাগুলো কখনও দূর থেকে কখনও পুলিশের পায়ের ফাঁক দিয়ে গালে এসে আমার ওপর গেরিলা আক্রমণ চালালো, আর আমি গাম্ভীর্য নিয়ে তাদের তাড়া দিতে লাগলাম, একবার একটাকে ধরেও ফেললাম কিন্তু তার মুখের দিকে তাকিয়ে হেসে ফেললাম। ক্রমে শয়তানগুলো টের পেয়ে গেল যে আসলে আমি রাগ করছি না, আর যাই কোথা গেরিলা আক্রমণ দ্বিগুণ বেগে শুরু হল। এমনিভাবে চলল বেলা এগারটা পর্যন্ত তারপর ফেরবার পালা। গাড়িতে উঠেই রোসিফ সাহেব বললেন, তাঁদের মানসিক ছিলো তাই বাচ্চাগুলোকে এমন মজার সুযোগ পেলাম। মনে বড়ো ব্যথা পেলাম, আমার নতুন সাদা পাঞ্জাবিটা এমন বিচিত্র রংয়ে রঙিন হয়ে গেল তার জন্য দুঃখ প্রকাশ ত নয়ই বরং আনন্দ।—ভগবান আমার দুঃখটা বুঝেছিলেন, মিনিট পনেরোর মধ্যেই প্রমাণ পেলাম, একটা পুকুরের পাশ দিয়ে গাড়িটা যাচ্ছিলো এবং দোলের সময় সারা ভারতে যা হয়, তবে জিনিষটা ছিলো মেহাৎই রং আর কিছুই নয়, কিন্তু তাতেই রোসিফ সাহেব বিচিত্র অঙ্গভঙ্গি দিয়ে তাঁর ক্রোধের যেপ্রকাশটি করলেন তাতে বেশ আশ্চর্য লাগল। পরের দিন, নুলিয়া পাড়ার মোড়ল টীনির সাহায্যে গোপালপুরের ব্যাক-ওয়াটারের তীরে উড়িষ্যার লোক নৃত্য ও গীতের শ্যুটিং-এর ব্যবস্থা হল।

এই টীনির সঙ্গে আমার প্রথম আলাপ হয় ১৯৬১ সালে। তখন গোপালপুর-অন-সীতে একটা ইউথ হস্টেল তৈরী হচ্ছিল, আমরা কলকাতার কিছু চ্যাংড়া ঐ ইউথ হস্টেল তৈরীর কাজে স্বেচ্ছাসেবক হিসাবে গিয়েছিলাম। সবে তখন ফার্স্ট ইয়ার বি-এ ছাত্র কাজেই নিজেদের চ্যাংড়া আখ্যা দিতে লজ্জিত বোধ করছি না, তখন যদি কেউ আমাদের ঐ নামে চিহ্নিত করত তাহলে রাগ করতাম, যেমন এখন কেউ যদি আমার সম্পর্কে ঐ কথাটা বলে তাহলে অপমানিত বোধ করি। অথচ হয়ত দশ বছর বাদে এখনকার আমাকে আমিনিজেই চ্যাংড়া বলব। এমনই হয়। সময় এমনই মজার বস্তু।—যাকগে, আমি জ্ঞানী নয় কাজেই এমনসব বড়ো বড়ো কথা আমার মুখে মানায় না—তাই না? হুঁ, যা বলছিলাম, টীনি। আমরা তখন টীনিকে দেখতাম, কালো, ছিপছিপে, লম্বা তখন ওর বয়স পঁচিশ কি ছাব্বিশ, একটা লাল সুইমিং ট্রাংক পরে সর্বদা একদল বিদেশিনী পরিবৃত হয়ে রাজার মতো চলাফেরা করত, দেখে, স্বাভাবিকভাবেই রাগ হত, আসলে হিংসা হত, আমরাও ত সমুদ্রে সাঁতার কাটতাম এবং ভালোই কাটতাম কিন্তু কই আমাদের দিকে ত কেউ অমন করে তাকাতো না।—এখন বুঝি, ঐ গোপালপুরে টীনির জন্ম, ঐ সমুদ্রের কোলেই ও মানুষ, তার ওপরে ওর রূপ, এইসব নিয়ে টীন ছিলো ওখানকার রাজা—আর আমরা ছিলাম কলকাতার শহুরে পাকা ছোঁড়া, ফাঁপা গর্বে ভরা, নিজেদের সম্পর্কে বিরাট ধারণা—অনেক কিছু জানি বলে, কিন্তু সবই বইয়েতে পড়া, জীবনের সঙ্গে সম্পর্ক বিবর্জিত। এই দেখুন, আবার বড়ো বড়ো কথা বলতে শুরু করেছি, ভাবখানা যেন আমি জ্ঞানী আর্টিস্ট-টল। সেই ১৯৬১ সালের টীনির সঙ্গে দেখা হল। এখন ওর বয়স চল্লিশের ওপর, পাকা গৃহস্থ, পনেরোটা নৌকার মালিক। আজকের

খেও। যদি স্ত্রী ফিরে এলে তখন আমি আবার খেতে বেলো। আমার অঙ্কুশ খাওয়া সম্বন্ধে যার হয়তো 'লজ্জা' ছিলো না, (আমার তো ছিলোই না) কিন্তু 'ভয়' ছিলো। 'নজর' লাগার ভয়, আবার কেউ না হাবাতের ঘরের ছেলে বলে। থিয়েটার দেখার নেশা, সিনেমার নেশা, ভালো গন্ধের নেশা, সুন্দরীকে দেখার নেশা,—নেশা মাত্রেই অসামাজিক 'অসম্মান'—ভয় দেখায়। কেন না ব্যক্তিত্বের পূর্ণ-প্রকাশে নেশা এনে দেয় আত্মজ্ঞানহীনতা। নেশাড়ী মন যেন কাৎ হয়ে থাকা ছবি। কাৎ হয়ে যাওয়া মই, ঘড়া বা গ্রামোফোন রেকর্ড। প্রত্যেকটাই সুস্থ পূর্ণতার প্রকাশে বাধা। বিপজ্জনকও বটে। অসাম্যই বিপ্লবের স্রষ্টা। প্রত্যেক প্রকাশ (সৃষ্টি মাত্রেই তো প্রকাশ) একটা আত্মমর্যাদার মান নিয়ে সৃষ্ট। —মানুষও সৃষ্টি। মানুষের আত্মমর্যাদার মান আছে। সে মান মানানসই হয় চৌকশ হলে। চক্ষু-কর্ণ-নাসিকা ইত্যাদি ইন্দ্রিয়ের কৃপায় ও মাধ্যমেই আমরা রূপ-রস-গন্ধের জগতে প্রবেশ করতে পারি। এই জগতটার সঙ্গেই আমার সম্পর্ক। সম্পর্কটা গভীর হওয়াই বাঞ্ছনীয়। সেই সম্পর্কটির মর্যাদায় আনন্দ, অমর্যাদায় শোক বিষাদ। মর্যাদার পূর্ণতায় আনন্দের পূর্ণতা, আনন্দ পূর্ণ তো আমি পূর্ণ। মর্যাদার অপূর্ণতায় আমার অপূর্ণতা, আনন্দ অপূর্ণ তো আমি অপূর্ণ। সেই কারণেই আবার আমি বিষণ্ণ, শোকগ্রস্ত। অপূর্ণতা মানেই আমি 'কাৎ' হয়ে আছি। ভারসাম্য খুঁজে পাচ্ছি না। তোৎলা যেমন চুপ করে থেকে তোৎলামী ঢাকে, কানে খাটো যেমন সহজে কানের যন্ত্র ব্যবহার করতে চায় না, পেটুক যেমন সভার মধ্যে খেতে চায় না,—তেমনি 'অবৈধ' প্রণয়ের প্রণয়ীকে সমাজের অগোচরে রাখার প্রয়াসের আর অন্ত নেই আমাদের। দেহের কোনো কোনো অবয়বকে ঢেকে রাখাও যেমন যৌন অসাম্যের বিকৃত পরিচয়—আবার তাকে ঢাকার বদলে লাল ঢেঁড়া টেনে প্রকট-প্রচার করার প্রচেষ্টাও অসাম্যের বিকার বলেই মনে করতে হবে। আবার ঐ ধরনের প্রকাশ বা অপ্রকাশের ধাঁধায় মাৎ হয়ে যখন মানুষ ল্যা-প্যা করে হন্যে হয়ে পড়ে আর হুমড়ী খেয়ে মর্যাদা, সম্ভ্রম কাৎ করে থুবড়ে থাকে,—তাও এক বিচিত্র, অসাম্য, অশান্ত ব্যাপার। অপ্রীতিকর।

কাজেই দেহের যৌন এলাকাগুলো নিয়ে ছিনিমিনি খেলা গুণেরই বিকার। 'ঢাকো ঢাকো' বলে যারা চিল্লায়, তারাও যেমন বিকৃত, 'খোলো খোলো' বলে যারা 'হল্লা-য়' তারাও তেমনিই বিকৃত। হারেম গড়ে দ্যাল তুলে ঘোমটায় ফাঁসিয়ে যাঁরা 'লজ্জা' বজায় রাখেন তারাও যেমন মর্যাদা-হানির অপরাধে লিপ্ত, বীচ-পার্টি, সুইমিং পুল, ক্যাবারে-সুইং, জ্যাজ-হটপ্যান্ট-টুইস্টের প্যাঁচে ফেঁসে যাঁরা 'লজ্জা' জলাঞ্জলী দেন তাঁরাও তেমনিই মর্যাদা

জিরা-বাউলরা করে গেছেন। ওরে মন সহজ হবি সহজ হবি।

এই সহজেরই সন্ধানে বনেচররা। এস্কিমোও বনেচর। কিন্তু ন্যাংটা হতে পারে না, চায় না, হয় না। উত্তর আমেরিকার 'আপাচে'রা উলঙ্গ হয় না। আবার আমেরিণ্ডিয়ানরা হয়। উলঙ্গতাই তাদের স্বধর্ম। বেদুইনরা, টোডারা আপাদমস্তক ঢাকা। কিন্তু নিগ্রোরা উলঙ্গ। আফ্রিকার উত্তরের নিগ্রোরা, মুরেরা, আপাদমস্তক ঢাকা। এরা সবাই বনেচর আদিবাসী। উলঙ্গ কি উলঙ্গ নয় এটা তাদের মোটেই বিব্রত করে না—বিব্রত করে ১২০ ডিগ্রীতে, বর্ষায়, রোদে ভোপসানো, মশা জোঁক-পোকা-মাকড়ে আচ্ছন্ন দুনিয়ায় কাপড়ের ভাঁজের বাইরে বেরিয়ে আসাটাই সুস্থ মনের, এবং সুস্থতার যুক্তির পরিচয় কিনা। সমুদ্রের সঙ্গে লড়াই করে নদীর তলায় ডুব মেরেই যদি খাদ্য সংগ্রহ করতে হয়—জোব্বা-জমজম, শাড়ি-লাহাঙ্গা পরি কখন?

ওরা প্রকৃতির সঙ্গে তাল রেখেই প্রকৃতির বাচ্চা। কাপড় না-পরাকে আমাদের মতো লজ্জা, তার ঢের বেশী ওদের লজ্জা যে আমরা কিসের জন্য অতো ঢাকতে চাই। কী ঢাকতে চাই? যে ঢাকা মাত্র কিছু-ক্ষণের জন্য তার নামে এতো খরচ-খরচা হাথড়াই কেন? ওরা বুঝতেই পারে না। যখন বুঝতে পারে তখন জিভ কাটে, ছি, ছি করে, ভাবে এই পোলাপানগুলো সেয়ানা হবে কবে। কী অসভ্যরে বাবা!!

বুঝতে ওরা পারে না কারণ ওদের যৌন জীবনে আনন্দ আছে। গোষ্ঠীর মেলবন্ধনে যৌথ আনন্দও যেমন, দুজনের বিজনে মেল বন্ধনেও ততো। যৌন সাধনা, যৌন আরাধনা ওদের কাছে, ওদের বাইবেলে তো চুরির ফল নয়। তাই সেটা ওদের কাছে এতো প্রিয়।

ওদের যৌন-জীবন ও যৌন আনন্দে পুরুষের চেয়ে মাতব্বরী এবং মুন্সিয়ানার অবকাশ, সে তুলনায় মেয়েদের ঢের বেশী। কারণ তিনটি। এক মেয়েদের ঘেরার কোনো মেয়ে যদি নিজের বা পুরুষের পুরোপুরি তাগিদ না মেটাতে জানে, না চায়, পুরুষের জীবনে সে মেয়ে হয়তো অপরিহার্য নয়। কিন্তু মেয়ের জীবনে ঐ হিংস্র জগতে পুরুষের বলিষ্ঠ সাহচর্য যে অপরিহার্য। তাই তাকে খুশী রাখতেই হবে। তবেই শিকারের সময় সে ঠাণ্ডা মাথায় তীর বিঁধতে পারবে। নিজের কথা কম ভাবতে শেখে এ বনেচরী। দ্বিতীয়তঃ, জীবন থেকে জীবনকে কেঁদে ভুলতে গেলে আনন্দের পর্বটা যতই গভীর হোক না কেন, তার পরের পর্বে অসংযত হলে ভূমিষ্ঠ জীবনটিকে সমাজের তীরে টেনে এনে শক্তিমান করে গড়ে তুলতে পারা যাবে না। এ ছাড়াও আছে বহু পতিতকের পতিতাদের মধ্যে কম্পিটিশান। যে মানুষটা কাছে এসেছে, আবার কবে আসবে কে জানে,—তাকে কান্নায়, নালিশে, তাগাদায় বিব্রত করে তুলতে অবসর পেলেও, ইচ্ছা হলেও, সাহস হবে কেন? ইশারা পাবে কেন? বাঁধতে জানাও একটা শিক্ষা। বাঁধার মধ্যেও গুণ থাকা দরকার। সেও সাধনা, সেও ব্রত। কাজেই যৌন লীলা সাধনও সাধন। যৌন সাধনার ব্যাপারে নিগ্রোদের বর্ষীয়সীরা প্রখর ও সচেষ্ট। সে শিক্ষা পুরোপুরি কন্যাকাল থেকেই দেওয়া হয়। পুরুষদের শিক্ষা 'দল' থেকে আসে। ভীত যারা তারা বীর নয়। বীর যারা নয়, সাহসী তারা নয়। সাহসহীন পুরুষ নারীর ভুজবন্ধনে লবণহীন পান্তাভাত।—সাহস, বলিষ্ঠতা—এ দুটি গুণই নিগ্রোতার চোখের দুই তারা। (৫)

(চলবে)

(৫) এই তথ্যগুলির জন্য ঋণী জেমো কেনিয়াটার আত্মচরিতের কাছে।

হেলেনিক মন ও সুনীতিকুমার

অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত

মৃত্যুর আগে বুদ্ধদেব বসুকে ধরে রেখেছিল গ্রীক নাটক আর মহাভারত, সুনীতিকুমারকে গ্রীক নাটক আর রামায়ণ। এঁরা দুজনেই নিঃশর্ত আত্মসমর্পণ করেছিলেন হেলেনিক মানসের সমগ্রতার কাছে। ইয়েট্সের ধারণা, এই সমগ্রতার তুলনায় শেক্সপীয়রের নাটকগুলিও যে কিছু উচ্ছৃঙ্খল অসংলগ্নতা, দুজনেই সমর্থন করতেন। মজার ব্যাপার, এই সাংস্কৃত অথচ নিতান্ত তাৎপর্যময় পর্যায়ে সুনীতিকুমার তাঁর ব্যক্তিগত সংস্কার ডিঙিয়ে বুদ্ধদেব-চর্চিত বিশ্বসাহিত্য। তুলনামূলক সাহিত্যকে 'অ্যাকাডেমিক' এলাকার অন্তর্গত করতে শিখেছিলেন। ছাত্রের মতো, কখনো-বা পণ্ডিত নম্রতায় আনুই বা বেলেট্রি নামে। বানান ও উচ্চারণ আয়ত্ত করে নেওয়ার আগ্রহে তাঁর ছাত্রেরও ছাত্রের কাছে জ্ঞাপন করতে দ্বিধা বোধ করতেন না।

আমার পরম সৌভাগ্য, বুদ্ধদেব আমাকে দিয়ে সোফোক্লেসের 'আন্তিগোনে' অনুবাদ করিয়ে নিয়েছিলেন, আর তার এক দশকেরও পরে 'ভাষাচার্য' সেই ভাষান্তর অনুমোদন করেছিলেন। নান্দীকার আয়োজিত 'আন্তিগোনে' দেখবার পর তাঁর মনে যে মিশ্র প্রতিক্রিয়া জেগেছিল, সে সম্পর্কে আমাকে একটি চিঠি লিখেছিলেন। এই সঙ্গে সেটি উদ্ধৃত করা হয়েছে। ঐ সময় কখনো কখনো আমাকে তিনি ডেকে পাঠাতেন, আমি তাঁর কাছ থেকে নানা বিষয়ে পাঠ নিতাম, তিনি বাংলা সাহিত্যে হেলেনিক চেতনা আরো সম্প্রসারিত করা যায় কিনা সেই মর্মে আমাকে উদ্বেলিত করতেন। এরকম কয়েকটি অধিবেশনের কথোপকথনের কয়েকটি টুকরো এখানে সাজিয়ে দিলুম; তবে কাল্পনিকতার ঘটনাক্রম কোনো কালানুক্রমের মর্যাদা মানেনি। চারদিকে নানা বিপাসারা আমাদের এড়িয়ে গিয়ে তখন 'ট্রেন' অথবা 'হায়ামানজন'!

(২)

সু: তুমি তোমার অনুবাদের ভূমিকায় মোহিতমোহন মুখোপাধ্যায়ের কথা Stychomythia এক-এক লাইনে ছিন্ন কথা-কাটাকাটি, প্রতিভাস নিয়ে আলোচনা করেছ। এই গ্রীক কথা-কাটাকাটির এই উদাহরণ আমার ভালো লেগেছে:

প্রহরী: আমি কি এখন যাবো? অনুমতি করুন দেয়া যাই।

ক্রেয়োন: তোমার প্রত্যেক শব্দ কাঁটা হয়ে বিঁধছে আমাকে।

প্রহরী: হৃদয়ে, কোথায় বিঁধছে, মাথায়, না কানে, কোনখানে?

ক্রেয়োন: ব্যথার ঠিকানা নেবে বিদূষক নাকি বেয়াদব?

প্রহরী: ফেরারি আসামী তবে বুকবাধা, আমি কর্ণমূল।

ক্রেয়োন: এ কোন লাগাম ছাড়া মুখ-আলগা অবাধ বাচাল!

প্রহরী: এটেই শিখেছি, কিন্তু সেই ছাড়া কখনো করিনি।

ক্রেয়োন: করোনি? তোমার প্রাণটা অর্থমূল্যে বিকিয়ে দাও নি?

[এই আট লাইন সুনীতিকুমার স্মৃতি থেকেই তুলে দিয়ে আমাকে বিস্মিত করলেন—]

তোমার বন্ধুদের মধ্যে আর কেউ কি গ্রীক নাটক তর্জমা করেছেন?

অ: আমার একজন তরুণতর সতীর্থ, দেবনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, ঈসকাইলাস ও শেলির প্রোমেথেউসের অনুবাদ করেছেন। ঈসকাইলাস থেকে তাঁর করা কথা-কাটাকাটির একটি অংশ এরকম:

ইও: তার শক্তি কেড়ে নেবে কে এমন আছে শক্তিমান?

প্রোমেথেউস: নিজেরই দুর্বুদ্ধি তাঁর নিজেকে মারবে শক্তিবাণ।

ইও: কিন্তু কেমন করে ক্ষতি যদি না থাকে বলুন।

প্রোমেথেউস: অবৈধ প্রণয়ের পরিতাপ হবে না করুণ।

ইও: দেবী না মানবী সে কে? বলুন বলার যদি হয়।

প্রোমেথেউস: বলব না তার নাম এত কৌতূহল ভালো নয়।

SUNITI KUMAR CHATTERJI

CALCUTTA

১৮.৮.৭৫

কল্যাণীয়েষু

... Academy of Fine Arts ...

... Jean ... grand tragedy ...

হেও : তাঁকে সিংহাসনচ্যুত করবে যে তারই দীক্ষা ?

প্রোমেথেউস : না তার যে বংশধর তার কাছে হারবে দেবাঁপিতা।

স : শুনতে বেশ লাগছে। তুমি আরো অনুবাদ করো। তোমার বন্ধুদের দিয়েও করাও। গ্রীক কোরাসে অনেক জায়গায় বেশ ভালো লীরিকের ব্যাপার আছে। আলাদা করে সেগুলো নিয়ে একটা সংকলন হলে ভালো হয় খুব।

[এমন সময় তাঁর ছোট্ট নাতি পরীক্ষা দিতে যাবার মুখে দাদুকে প্রণাম করতে এল। বেচারাকে তিনি, তার হাতে একফোঁটা সময় না থাকা সত্ত্বেও পিণ্ডার থেকে বারোটি লাইন আবৃত্তি করে আমাকে শোনাতে বললেন। সে কাঁচুমাচু হয়ে চটপট শুনিয়েই, আমাকে হতবাক অবস্থায় ফেলে, একছুটে পালাল]

অ : আমার বন্ধু জগন্নাথ চক্রবর্তী কোরাসের এরকম কিছু অংশ সুন্দর অনুবাদ করেছেন :

সালামিসে ফেনায় উচ্ছেল
সমুদ্র-ঢেউ, মৌমাছি-মর্মর
তেলামনের ভ্রমণ করে শেষ
শান্ত-সমুদ্র সিংহাসনের পর।

অথবা

গুহায় নিজে লুকানো যদি যেত
সুখহীন, অথবা গিরিচূড়ে,
অথবা মেঘে আবাস বাঁধা যেত
পাখিরা যথা আকাশনীল নীড়ে।
(হিপ্পলিতস)

অথবা

প্রাচীন জীবধাত্রী ধরিত্রী
মাঠে মাঠে ছড়ায় আনন্দ

স : বাঃ, মনে হয় যেন রবীন্দ্রনাথ শুনছি। আসলে তিনিই তো আমাদের সবচেয়ে বড়ো আশ্রয়। দুঃখ হয় তিনি গ্রীক কোরাসের কোনো তর্জমা করলেন না।

অ : তা ঠিক, কিন্তু গ্রীক নাটকের কয়েকটি তত্ত্ব মালিনী নাটকে তিনি লীরিকের অন্তঃশরীরে আনতে পেরেছিলেন।

স : এ বিষয়ে একটু খুলে বলো।

অ : Peripeteia বা অবস্থা-বিপর্যয় ঘটেছে সেই জায়গায় যেখানে সুপ্রিয়র সমস্ত আনন্দ ও সম্ভাবনা যখন হঠাৎ করে চুরমার হয়ে গেল, অ-দৃষ্টপূর্ব হস্তক্ষেপে যখন তার আসন্ন নীড় ভেঙে পড়ল, সেইখানটাতে। আবার এইখানেও :

আমি কি দেখি নি ওরে ?
আমিও কি ভাবি নাই মুহূর্তের ঘোরে

[বাকি অংশ সুনীতিকুমার নিজেই মন্ত্রা-খিষ্টের মতো আবৃত্তি করলেন—]

স : এসেছে অনাদিধর্ম নারীমূর্তি ধরে
কঠিন পুরুষমন কেড়ে নিয়ে যেতে
স্বর্গপারে ? ক্ষণতরে মুগ্ধ হয়েছেকে
স্বপ্নে দি কি স্বপ্নাবেশ ?

অপূর্ব সঙ্গীতে
বক্ষের পিঞ্জর মোর লাগিল কাঁদিতে
সহসা বংশীর মতো—সর্ব সফলতা
জীবনের যৌবনের আশা কল্পলতা
জড়ায়ে জড়ায়ে মোর অন্তরে অন্তরে
মঞ্জরী উঠিল যেন পল্লবস্তবকরে
এক নিমেষের তরে—

অ : ক্ষেমংকরের এই হঠাৎ-স্বীকৃতির মধ্যে যে-রহস্য আবিষ্কারের চমক আছে তা Anagnorisis -এরই লক্ষণান্বিত। ক্ষেমংকরের প্রেমের এই উদ্ঘাটন ঐ তত্ত্বেরই ছায়াবহ বললে বোধহয় অন্যায় হয় না। সবশেষে, মালিনীর 'মহারাজা, ক্ষমো ক্ষেমংকরে' উক্তিটির মধ্যে Sophrosyne বা শুদ্ধ প্রজ্ঞাই প্রকাশ পেয়েছে।

স : 'মুক্তধারা'তেও আছে গ্রীক নাটকের Nemesis -এর জগৎ। আছে 'রক্তকরবী'তেও। ভেবে দ্যাখো, এই নাটক রামায়ণেরই নতুন ভাষ্য।

অ : আমার আরেকটি অনুমান আপনাকে সংগোপনে জানাই। রক্তকরবী জুড়ে কাজ করছে শস্য-বোনা, বীজের মৃত্যু আর অংকুরের পুনর্জন্মের আবহাওয়া। রঞ্জন যেন Osiris —তার মৃত্যুর মধ্যেই পুনরুত্থান, পুনর্জন্মের সংকেত। তার মৃত্যুর সঙ্গে-সঙ্গেই নন্দিনীর আঁচল পাকা ফসলে ভরে উঠল। এভাবেই রঞ্জন পরিণত হলো পুরাণে। এখানে প্রাচ্য পুরাণেরই সার্থক প্রয়োগ হয়েছে বলে কি আপনার মনে হয় না ?

স : ঠিকই বলেছো তুমি। তাঁর নাটকে কী করে ভারতপুরাণ মিশরপুরাণ তথা বিশ্বপুরাণের অনুষঙ্গ মিশে গেছে সে-বিষয়ে একটা বই লিখবার ইচ্ছে আছে। কিন্তু রামায়ণ সম্পর্কে কিছু কথা বলেই তো লোকজনকে চটিয়ে দিয়েছি। এরপর আর কোনো বড় কাজ হাতে নেওয়া সম্ভব হবে বলে মনে হয় না তো।

[বিষণ্ণতার ছায়া একটু সময়ের জন্য তাঁর সর্বজয়ী মুখের উপর কাঁপল। কিন্তু তা ঐ স্বল্পকালের জন্যেই। তারপর আবার

[illegible] Grand Tragedy [illegible] (Prometheus Desmotes) [illegible] Persai, [illegible] Oedipous Tyrannos [illegible] Electra, [illegible] Bakkhai, Hippolytos, [illegible] Troai।

[illegible] Khoros [illegible] Chorus [illegible] Strophe [illegible] Antistrophe [illegible]

[illegible] Grand Tragedy [illegible] Homer [illegible] Hesiod [illegible] grand style [illegible]

[illegible]

[illegible]
[illegible signature]

মতে, কিন্তু এ বিয়েও রেজিস্টার হল না। বাবা কোন উচ্চবাচ্যও করলেন না, গেলেনও না, আমাদের যাওয়াতে কোন আপত্তিও করলেন না। প্রশান্ত মহলানবিশ তখন কিছু দিনের জন্য আলিপুরের হাওয়া-আপিসের অধ্যক্ষের কাজ করছিলেন। চাঁদনি রাত। ফাল্গুন মাস। শোনা গেল বাগানে বিয়ের সভা বসবে, মাথার ওপর চাঁদোয়া থাকবে না, ফুল দিয়ে বেদী সাজান হবে—বলাবাহুল্য বুলাদা সাজাবে—কিন্তু কোন আলোর ব্যবস্থা থাকবে না, কারণ কৃত্রিম আলোর এমন বদভ্যাস আমাদের যে প্রকৃতির দেওয়া চাঁদের আলো উপভোগ করতে ভুলে গেছি। মন্তব্যটা যে প্রশান্তদার সে বিষয়ে আমার মনে কোন সন্দেহ ছিল না। যাই হোক, বিয়েতে পৌরোহিত্য করলেন রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়, তা তিনি বিবাহস্থলে এসেই বললেন, আমি লিখিত পদ্ধতি অনুসারে পৌরোহিত্য করব, আলো না হলে আমার চলবে না।

তখন আলোর ব্যবস্থা করার সময় নেই, কয়েকটি মটর গাড়ি অকুস্থলে এনে, তাদের হেড লাইটের আলোতে বিয়ে হল। এমন বিয়ে কখনো কোথাও হয়েছে বলে শুনি নি। বিয়ের পর উৎকৃষ্ট জলযোগের সময় রোগা লম্বা একটা অচেনা ছেলে এসে আমাকে আসন্ন ইংরিজি পরীক্ষার দুটো প্রশ্ন বলে দিয়ে গেল। এবং পরে দেখলাম ঠিক তাই না হলেও, সেই বিষয়েই দুটি প্রশ্ন এল! যদি প্রশান্তদা ভেবে থাকেন যে ঐভাবে হিন্দু বিবাহানুষ্ঠানের মত ব্রাহ্ম বিয়ে থেকেও রেজিস্টারি অমর্যাদা তুলে দেবেন, তিনি নিশ্চয় হতাশ হয়েছিলেন। কারণ সেটা হওয়া দূরে থাকুক, উল্টে এখন হিন্দু বিয়েও রেজিস্টারি হচ্ছে বলে শুনতে পাই।

পরীক্ষা হয়ে গেল। যথাসময়ে ফলও বেরুল। প্রেসিডেন্সী কলেজের সুনীতিকুমার ইন্দু প্রথম এবং আমি দ্বিতীয় হয়েছি। আশ্চর্যের বিষয় ম্যাট্রিকে যারা প্রথম দশ-জনের মধ্যে হয়েছিল, তাদের প্রায় কারো নামই দেখতে পেলাম না। এই প্রসঙ্গে আমার অনেক সময় মনে হয়, একটা পরীক্ষায় কে দৈবাৎ প্রথম কে বা দ্বিতীয় কি তৃতীয় কি নবম বা দশম হল, তাই দিয়ে তাদের যোগ্যতা বিচার করার নিয়মে অনেক খুঁৎ আছে। সাধারণত দেখা যায় দুজন পরীক্ষার্থীর মধ্যে মাত্র ১, কি ২ বা ৩ নম্বরে তফাৎ হয়, তাও সামগ্রিক সংখ্যায়। পরীক্ষকও একজন নন। একজনের কাছে যে ছাত্র ১০ পেল, আরেকজনের কাছে সে-ই হয়ত ৭ পেত, বা ১৫ পেত। তাহলে আর যোগ্যতা বিচার থাকে কোথায়? এ বিষয়ে একটা গল্প না বলে পারছি না।

আমার ছোট জ্যাঠামশাই কুলদারঞ্জন ম্যাট্রিকের বাংলা পরীক্ষক ছিলেন, সে-কথা আগেও বলেছি। এ-ও তাঁর কাছেই শোনা। তখন আশুতোষ মুখোপাধ্যায় ছিলেন উপা-চার্য। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়কে একরকম তাঁর সৃষ্টি বলা যেত, কাজেই প্রবেশিকা পরীক্ষার ওপরেও যে তাঁর সবত্ন দৃষ্টি থাকবে, তাতে আর আশ্চর্য কি? উপরে আমি যে মন্তব্যগুলি করেছি, তিনিও সেই ধরনের যুক্তি প্রয়োগ করে, পরীক্ষকদের সবাইকে ডেকে একটা প্রশ্নপত্রের উত্তরে তাঁদের বিচারমতো নম্বর দিতে বললেন। নম্বর অবশ্য উত্তরের গায়ে লেখা হবে না। শেষে দেখা গেল ঐ পেপারে কেউ দিয়েছেন একশোতে ৭০, কেউ বা দিয়েছেন ৪০! তাহলে ন্যায্য বিচার কোথায় হল? অবিশ্যি এ-কথাও সত্যি যে ভালো ছাত্রছাত্রীরা সাধারণতঃ ভালো নম্বরই পেয়ে থাকে; অপ্রত্যাশিত রকম বেশি বা সামান্য কম হতে পারে, কিন্তু খুব তফাৎ কদাচিৎ হয়। এক যদি না পরীক্ষার্থী কোনো গোলমাল করে ফেলে থাকে। সেকালে যে-বছর ২০ হাজার পরীক্ষার্থী বসত, সবাই বলত, বাবা! এত ছেলের মধ্যে সুবিচার হওয়া শক্ত! তাও সে-সময় সমস্ত পশ্চিমবাংলা এবং এখন যাকে বাংলাদেশ বলা হয় সে জায়গা, এই বিস্তীর্ণ এলাকা থেকে পরীক্ষার্থী আসত। জনসংখ্যার সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষারও কত বিস্তার ঘটেছে বলতে হবে। কাজেই গুণ বিচারের কাজও আরো কত জটিল হয়ে উঠেছে, সেকথা সহজেই অনুমান করা যায়।

এই সব কারণে পরীক্ষার ফলকে আমি খুব বেশি প্রাধান্য দিই না। আরেকটা কথাও আছে। কতবার দেখেছি পরীক্ষায় যারা উচ্চ সম্মানের সঙ্গে উত্তীর্ণ হয়, পরে কর্মক্ষেত্রে তারা ততখানি দক্ষতা দেখাতে পারল না। আবার কত কর্মী সাধারণভাবে পরীক্ষায় পাস করে, কর্মজীবনে আশ্চর্য গুণ দেখিয়ে-ছেন। আসলে কতকগুলো অন্য লোকের-চিন্তায়-ভরা বই গিলে, কাগজে সেগুলি উদ্গীরণ করা ছাড়া আরো কিছু সামর্থ্যের দরকার থাকে। অনেকে তো স্রেফ উচ্চাকাঙ্ক্ষার জোরেই অনেক দূর এগিয়ে যায়।

আই এ পড়বার সময় আমরা তিনটি গুণী বন্ধু লাভ হয়েছিল। ওদের সঙ্গে কলেজে চার বছর পড়েছিলাম। আই এ পরীক্ষায় ওদের মধ্যেও দুজন বৃত্তি পেয়ে ইংরিজিতে অনার্স নিয়ে আমার সঙ্গে পড়তে লাগল। ওদের তিনজনের মধ্যে ভারি ভাব ছিল। দুঃখের বিষয় কেউ বেশি দিন বাঁচেনি। একজনের নাম সুধা ঘোষ, বিধান-চন্দ্র রায়ের কি রকম ভাগ্নী, একজন নীরা মুখার্জি, ডঃ পি কে রায়ের নাতনি, দেশ-কর্মী রেণুকা রায়ের ছোট বোন; একজনের নাম লিলি সেন, আশ্চর্য রকম গুণী মেয়ে ছিল সে। এখন ভেবে দুঃখ হয় এদের আনন্দী জীবন এবং অকাল মৃত্যুতে কত গুণ বৃথা নষ্ট হয়ে গেল। যাই হক, তখন আমাদের ফুর্তি দেখে কে! ছাত্রীজীবন যে কত মধুর হতে পারে, ভেবে ভালো লাগে।

এখন মনে হয় কলেজের ঐ প্রথম দুটি বছর বড় ভালো ছিল। বড় হওয়ার বছর। আপনা থেকে সাবালিকা হবার বয়স। ১৮তে আই এ পাস করলাম। তার আগে কলকাতার অতুলনীয় সাংস্কৃতিক জীবনের একটা দিকের আস্বাদ পেলাম। দেখলাম সাহিত্য উপভোগের একটা সামাজিক দিকও আছে। শুধু বই পড়ে যে-আনন্দ পাওয়া যায়, সেটাই সব নয়। পাঁচজন সাহিত্যিক আর সাহিত্যা-নুরাগীর সঙ্গে মিশে আরেক রকম রস পাওয়া যায়। তাতে এক দিকে যেমন আমার সাবা-লকত্ব পাওয়ার ভারি সুবিধে হয়েছিল, অন্য দিকে নিজের চিন্তাগুলোকে একটু যাচাই করার অভ্যাসও অল্প অল্প রপ্ত হয়ে-ছিল। অন্ততঃ শুরু হয়েছিল। দুটি মানুষের সংস্পর্শে এসে এটি সম্ভব হয়ে-ছিল। তাঁরা হলেন ইন্দিরা দেবী চৌধুরাণী আর তাঁর স্বামী প্রমথনাথ চৌধুরী। এঁদের নতুন করে পরিচয় দেবার দরকার না থাকলেও, আমার জীবনে যখন তাঁরা নবা-গত হয়ে প্রবেশ করলেন, মনের মধ্যে নতুন একটা সাড়া জেগেছিল। একটা সচেতনতা, নিজেকে প্রকাশ করার একটা ইচ্ছা, একটা পরিচ্ছন্নতার প্রয়াস। এমন মানুষ আমি আগে দেখিনি। কোথাও এতটুকু ছেলে-মানুষি ছিল না তাঁদের। সারা জীবন যে স্বাভাবিক স্বতঃস্ফূর্ত নির্মল রসের মধ্যে ডুবে থেকেছি, এ তার থেকে আলাদা। এর জন্য মনে হত অনেক দিন ধরে নিজেদের তৈরি করতে হয়েছিল, হয়ত ক্ষমতা-গুলোকে কঠোর শাসনে রাখতে হয়েছিল; ভারি একটা সুশ্রী শালীন সীমার মধ্যে নিজেদের বেঁধে রাখতে হয়েছিল। ফলে যা লাভ হয়েছিল, তাতে সৌন্দর্য ছিল, সুরুচি ছিল, আত্মসচেতন বিদগ্ধতা ছিল, তীক্ষ্ণ মেধা ছিল; সঙ্গে সঙ্গে এক রকম আড়ষ্টতাও ছিল, নিজেকে সম্পূর্ণ রূপে প্রকাশ করে ফেলার একটা ভীতি ছিল। শেষ পর্যন্ত দুজনার মধ্যে কেউ একবারের জন্যও মনের ঘোড়ার বল্গা ছেড়ে দেননি। অবসরে সুন্দর গান, গল্প, সুর স্বরলিপি তৈরি হয়েছিল।

(চলবে)

বাংলার বাইরে বাঙালী

ছবিঃ [illegible]

দিল্লী

বাড়ি ফিরতে সেদিন রাত হয়ে গেল। কৈলাসে এক বন্ধুর বাড়িতে ছুটির সন্ধ্যাটা কাটিয়ে ফিরছিলাম। বড় রাস্তায় পৌঁছুতে প্রায় আধ কিলোমিটার রাস্তা। আশেপাশে থ্রি-হুইলার (স্কুটার) মিলল না। দূরে দূরে ল্যাম্পপোস্টের নিওন আলোয় একটা মায়াবী নির্জনতা। রাস্তার দুপাশে সুন্দর বাড়ি। বাড়িগুলোতে আলোর মৃদু কারুকাজ। কোথাও কোথাও লাল ইঁটের ঘর-কাটা। নতুন বাড়ি তৈরি হচ্ছে। সেখানে অন্ধকার পোড়োবাড়ির মত একেবারে নতুন এইসব বাড়িতে লণ্ঠনের মৃদু আলো। কলকাতার বন্ধ দোকানগুলোর ফাঁকে ইঁটে সাজানো উনোনের মতো সেখানেও তেমনি আয়োজন। উনোনের চারপাশে ওই একই রকম মানুষের মুখ।

এমনি এক বাড়ির পাশ দিয়ে হাঁটছিলাম। হঠাৎ পাশের কাঁটাঝোপের অন্ধকার থেকে একটি কচি মেয়ের গলা নির্জনতা ভাঙল : বাবা ; ওধারে কাছে নাই ! চমকে ওঠার আগেই আমার পাশ থেকে গোঁফ আর উঁচু-করে-পরা লুঙ্গিঅলা মাঝবয়সী একটা লোক উত্তর দিল : ঠিক আছে। তুই যা ! ঈষৎ অন্ধকারে হোক বা অন্যমনস্কতায়, লোকটাকে খেয়াল করতে পারিনি। পাশের রাস্তাটা ধরে লোকটা হন হন করে চলে গেল।

লক্ষ্য করলাম, মেয়েটা পোড়োবাড়ির মত নতুন বাড়িটাতে 'মা মা' বলে ডাকতে ডাকতে ঢুকল। নতুন বাড়ি উঠছে। দরজা-জানালা নেই। তাই আব্রুর বালাই নেই। বাড়িটার ভিতরটা লণ্ঠনের আলোয় বেশ চোখে পড়ছিল। আমার দেখতে সাধ হল।

রাস্তার ওপরে ল্যাম্পপোস্টটার সবুজ আল-স্টপ কুড়োচ্ছে। জানি, এত রাতে এপথে বাস যায় না। তবু সিগেটটা ধরিয়ে তার দিকে দাঁড়ালাম।

উনোন জ্বলছে। তার কাঁপা আলোয় ভিতরটা প্রায়দিকে দেখা যাচ্ছে। নির্জনতার কারণে ওদের কথা আমি স্পষ্ট শুনতে পাচ্ছি। পূর্ববঙ্গের মানুষ এখানেও জোরে কথা বলে। মেয়েটার বয়স বছর দশ-বারো। একটা বছর আটেকের ছেলে, খোঁড়া পায়ে। ন্যাংটো। ঘরের গায়ে হেলিয়ে ঘরের এককোণে কী দেখছে। মহিলা বোধ হয় ওদের মা। খুব ধীরে ধীরে খুন্তি নাড়ছে। কড়াই ভোকাই আবলাভা। পাশে তেলের শিশি। খালি নয়।

বুঝতে পারছিলাম না, মেয়েটা 'ওপারে' কাছে কী আনতে গিয়েছিল। তেলের দাম এখন প্রায় চোদ্দ টাকা, তার অভাব নেই। লোকটাই বা হনহনিয়ে কী আনতে ছুটল ? কারও অসুখ, এমনটাও মনে হচ্ছে না।

এসব বাড়িতে রাতে যারা থাকে, তাদের চৌকিদার বলে। কনট্রাক্টরের লোক এরা। দিনে গতর খাটে, রাতে পাহারা দেয়। বাড়ির মালিকরা যে অর্থে পাহারা দেয়, ঠিক সেই অর্থে। কনট্রাক্টর যদি চালু বিজনেসম্যান হন, তবে এদের বাসার অভাব হয় না। বাড়ি হাত-বদলের দিন অবধি এরা থাকে। রাজধানীর মতো দামী শহরে বাসা-ভাড়ার কথা এদের ভাবতে হয় না। এই ফাঁকে সংশ্লিষ্ট এলাকার ফাঁকে ফোঁকরে ওরা কাজও করে। তবে টেম্পোরারি। বাড়ির ইঁটের কাঠামোটা দাঁড়িয়ে গেলে কাজ পড়ে ছুতোর আর কামারের। চুনকামের কাজ আরও পরে, তাই মাঝখানে এদের সময় মেলে। রাস্তার বাজারে দু-চারটে মুলো, শালগম কিংবা আলু নিয়ে বসে যায়। দিল্লির সবাই বাজার বসে সন্ধ্যায়। তাই কাজের সঙ্গে ব্যবসার সময় নিয়ে বিরোধও হয় না।

মেয়েটা ঘর ঝাঁট দিচ্ছে। ধুলোয় একাকার হয়ে গেল ঘরটা। ধোঁয়ার মতো সেই ধুলো বাইরে আসছে। মহিলা ক্ষিপ্ত হয়ে উঠল : ওরে কেডা কাম করতে কইল। তর বাবা গ্যালো [illegible] ? মেয়েটা নাক-মুখ মুছতে মুছতে কিছু বলল, শুনতে পেলাম না।

ছেলেটা ঘুমিয়ে পড়েছে। তাকে মেঝেয় শুইয়ে দিয়ে মা আবার রান্নায় লেগে গেল। লণ্ঠন উঁচিয়ে কড়াই দেখল।

লোকটা বেশ ছুটে ছুটেই আসছে। গেট পেরিয়ে ঢুকতেই স্ত্রী খাঁকিয়ে উঠল, তোমার সব কামেই বাড়াবাড়ি। পোলাডা ঘুমায় গ্যালো। হুঁস নাই।

লোকটা কিছু বলল না। ঘরের অন্ধকারে অদৃশ্য হয়ে গেলো। মেয়ে আর স্ত্রী ঘরের একটি কোণে কী দেখছে। বোধহয় লোকটা সেখানে দাঁড়িয়ে। আমি একটু সরে এসে জানালা দিয়ে দেখার চেষ্টা করলাম। দেখা যাচ্ছে না। লোকটা করছে কি ?

হঠাৎ ঝলমল করে উঠল ঘরটা। বিজলী আলোয় সারা ঘর আলোকিত হয়ে উঠল। সমস্ত ঘরটা নজরে পড়ছে। কোথাও কিছু নেই। এবড়ো খেবড়ো। এলোমেলো ইঁটের সাজ। কলকাতার নিমতলার শ্মশানের বিশ্রামাগারটার মতো আবরণহীন। সবার মুখে একটা হাসি নজরে পড়ল। লোকটা বেশ গর্বের সঙ্গে বাইরে এসে একটা ইঁটের ওপর বসল।

আমি চলতে শুরু করলাম। শোনা যাচ্ছিল লোকটার স্বর : এরপর যদি বল কাইটা যায়, আমি কিন্তুক আর যাইতে পারুম না।

সত্যব্রত

বোম্বাইয়ে শরৎ-নাট্যোৎসব

বম্বের দাদার শিবাজী পার্ক দুর্গাপূজো প্রাঙ্গণে এ বছর চার দিন ব্যাপী অমর কথা-শিল্পী শরৎচন্দ্রের পুর্ণাঙ্গ নাটকের প্রতিযোগিতায় স্থানীয় কয়েকটি নাট্যসংস্থা অভিনয় পরিবেশন করেন। এর মধ্যে অম্বরনাথ বাঙালী সংঘ কর্তৃক আয়োজিত 'পণ্ডিতমশাই' নাটকটি শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করে। এই কাহিনীর নাট্যরূপ দিয়েছেন শ্রীবসন্ত ভট্টাচার্য। বৃন্দাবন [illegible] পরিচালক স্বয়ং [illegible] গঙ্গোপাধ্যায়, সমবেত দর্শক ও [illegible] দৃষ্টি বিশেষভাবে আকর্ষণ করেন [illegible] অভিনয় ও সুন্দর প্রয়োগ [illegible] মাধ্যমে। বিভিন্ন চরিত্রে কুসুমের ভূমিকায় শ্রীমতী দীপ বাসুরায়, [illegible]—শ্রীমতী মমতা কুণ্ডু, মা—শ্রীমতী গীতা সামন্ত, বৃন্দেশ্বরী—শ্রীমতী ইভা ভট্টাচার্য সুন্দর অভিনয় করেন। এছাড়া সর্বশ্রী দেবব্রত সিন্হা, বিনয় রায়চৌধুরী, অরুণ সরকার, কুমারী মৌসুমী [illegible], [illegible] ঘোষ, অরুণ মুখার্জি, হরিশংকর [illegible], স্বদেশ মিত্র, শিশির দাস, জগৎসিং [illegible] ও সমরেন্দু ভট্টাচার্য সকলেই সুঅভিনয় করেন। নাটকটির দলগত অভিনয় ও পরিবেশনার ভঙ্গী খুবই প্রশংসনীয়।

খেলা

ভারত বনাম অস্ট্রেলিয়া

অস্ট্রেলিয়াতে ভারতীয় ক্রিকেট দলের প্রথম সফর লালা অমরনাথের নেতৃত্বে ১৯৪৭-৪৮ সালে এবং দ্বিতীয় সফর মনসুর আলীর নেতৃত্বে ১৯৬৭-৬৮ সালে। বর্তমানে (১৯৭৭-৭৮) বিষেণ সিং বেদীর নেতৃত্বে ভারতীয় ক্রিকেট দল তৃতীয়বারের অস্ট্রেলিয়া সফরে গেছে। অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে ভারত প্রথম টেস্ট ক্রিকেট ম্যাচ খেলতে নামে ব্রিসবেন মাঠে, ১৯৪৭ সালের ২৮শে নভেম্বর। এ পর্যন্ত ভারত এবং অস্ট্রেলিয়ার মধ্যে যে ২৫টি সরকারী টেস্ট ক্রিকেট খেলা হয়েছে তার ফলাফল দাঁড়িয়েছে : অস্ট্রেলিয়ার জয় ১৬, ভারতের জয় ৩ এবং খেলা ড্র ৬। এখানে উল্লেখ্য, অস্ট্রেলিয়ার মাটিতে ভারত কোন টেস্ট ক্রিকেট খেলায় অস্ট্রেলিয়াকে আজও হারাতে পারেনি। অস্ট্রেলিয়া এবং ভারতের মধ্যে এ পর্যন্ত যে ৬টা টেস্ট ক্রিকেট সিরিজ খেলা হয়েছে তার ফলাফল : অস্ট্রেলিয়ার 'রাবার' জয় ৫, ভারতের 'রাবার' জয় ০ এবং সিরিজ অমীমাংসিত ১। সুতরাং ভারতের এখনও দুটি বড় কাজ বাকি—অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে 'রাবার' জয় এবং অস্ট্রেলিয়ার মাটিতে টেস্ট খেলা জয়।

আগামী ডিসেম্বর ২ তারিখে ব্রিসবেনে ভারত বনাম অস্ট্রেলিয়ার ১৯৭৭-৭৮ সালের টেস্ট সিরিজের প্রথম টেস্ট ক্রিকেট খেলা সুরু হবে। এই উপলক্ষে ভারত বনাম অস্ট্রেলিয়ার বিগত ২৫টি টেস্ট খেলায় প্রতিষ্ঠিত নিম্নলিখিত উল্লেখযোগ্য বিবিধ রেকর্ডগুলি ক্রিকেট অনুরাগীদের বিশেষ আগ্রহ সৃষ্টি করবে।

এক ইনিংসে দলগত সর্বাধিক রান

অস্ট্রেলিয়ার মাটিতে

ভারতবর্ষ : ৩৮১, এডিলেড ১৯৪৭-৪৮
অস্ট্রেলিয়া : ৬৭৪, এডিলেড ১৯৪৭-৪৮

ভারতের মাটিতে

ভারতবর্ষ : ৩৪১, বোম্বাই, ১৯৬৪
অস্ট্রেলিয়া : ৫২৩ (৭ উঃ ডিঃ), বোম্বাই ১৯৫৬-৫৭

এক ইনিংসে দলগত সর্বনিম্ন রান

(পুরো ইনিংসের খেলায়)

অস্ট্রেলিয়ার মাটিতে

ভারতবর্ষ : ৫৮, ব্রিসবেন, ১৯৪৭-৪৮
অস্ট্রেলিয়া : ১০৭, সিডনি, ১৯৪৭-৪৮

ভারতের মাটিতে

ভারতবর্ষ : ১৩৫, দিল্লী, ১৯৫৯-৬০
অস্ট্রেলিয়া : ১০৫, কানপুর, ১৯৫৯-৬০

একটি খেলায় সর্বাধিক রান

(দুই দলের রানের সমষ্টি)

অস্ট্রেলিয়াতে : ১৩৩২ (৩০ উইকেটে) এডিলেড, ১৯৪৭-৪৮; অস্ট্রেলিয়া ৬৭৪ এবং ভারত ৩৮১ ও ২৭৭
ভারতে : ১১১১ (৩৮ উইকেটে), বোম্বাই ১৯৬৪; অস্ট্রেলিয়া ৩২০ ও ২৭৪; ভারত ৩৪১ ও ২৫৬ (৮ উইকেটে)

এক ইনিংসে ব্যক্তিগত সর্বোচ্চ রান

অস্ট্রেলিয়ার মাটিতে

ভারত : ১৪৫ ভি এস হাজারে, এডিলেড, ১৯৪৭-৪৮
অস্ট্রেলিয়া : ২০১ ডি জি ব্র্যাডম্যান, এডিলেড, ১৯৪৭-৪৮

ভারতের মাটিতে

ভারতবর্ষ : ১৩৭ জি আর বিশ্বনাথ, কানপুর, ১৯৬৯
অস্ট্রেলিয়া : ১৬৩ এন সি ও'নীল, বোম্বাই, ১৯৫৯-৬০

এক সিরিজে সর্বাধিক মোট রান

(ব্যক্তিগত)

অস্ট্রেলিয়ার মাটিতে

ভারতবর্ষ : ৪২৯ (গড় ৪৭-৬৬) ভি এস হাজারে, ১৯৪৭-৪৮
অস্ট্রেলিয়া : ৭১৫ (গড় ১৭৮-৭৫) ডি জি ব্র্যাডম্যান, ১৯৪৭-৪৮

ভারতের মাটিতে

ভারতবর্ষ : ৪৩৮ (গড় ৪৩-৮০) এন জে কন্ট্রাক্টর, ১৯৫৯-৬০
অস্ট্রেলিয়া : ৩৭৬ (গড় ৬২-৬৬) এন সি ও'নীল, ১৯৫৯-৬০

সর্বাধিক ব্যক্তিগত মোট রান

ভারতের পক্ষে

মনসুর আলী : খেলা ১১, ইনিংস ২০, নটআউট ১, মোট রান ৮২৮, এক ইনিংসে সর্বোচ্চ রান ১২৮ নটআউট, গড় ৪৩-৬৩ এবং সেঞ্চুরী ১

অস্ট্রেলিয়ার পক্ষে

ডবলিউ এম লরী : খেলা ১২, ইনিংস ২৩, নটআউট ৪, মোট রান ৮৯২, এক ইনিংসে সর্বোচ্চ রান ১০০, গড় ৪৬-৯৫ এবং সেঞ্চুরী ১

সেঞ্চুরী

ভারতবর্ষ : ১০টি—ভারতে ৪ ও অস্ট্রেলিয়াতে ৬

অস্ট্রেলিয়া : ২৫টি—ভারতে ১১ ও অস্ট্রেলিয়াতে ১৪

একটি খেলার উভয় ইনিংসে সেঞ্চুরী

অস্ট্রেলিয়া : ১৩২ ও ১২৭*—ডন ব্র্যাডম্যান, মেলবোর্ন, ১৯৪৭-৪৮
ভারতবর্ষ : ১১৬ ও ১৪৫ বিজয় হাজারে, এডিলেড, ১৯৪৭-৪৮

এক সিরিজে সর্বাধিক সেঞ্চুরী

অস্ট্রেলিয়া : ৪টি—ডন ব্র্যাডম্যান, ১৯৪৭-৪৮
ভারতবর্ষ : ২টি বিজয় হাজারে, ১৯৪৭-৪৮; ২টি ভিনু মানকাদ, ১৯৪৭-৪৮

টেস্টের উভয় ইনিংসে গোল্লা

ভারতবর্ষ : রামকান্ত দেশাই, দিল্লী, ১৯৫৯-৬০ (উভয় ইনিংসেই বেনোর বলে গোল্লা করে আউট)
অস্ট্রেলিয়া : ইয়ান ম্যাককিফ, কানপুর, ১৯৫৯-৬০

একই খেলায় গোল্লা ও সেঞ্চুরী

০ ও ১৩৭ জি আর বিশ্বনাথ, কানপুর ১৯৬৯; ভারত বনাম অস্ট্রেলিয়ার টেস্ট খেলার আসরে উক্ত খেলায় প্রথম একমাত্র বিশ্বনাথই জীবনের প্রথম টেস্ট খেলতে নেমে সেঞ্চুরী করেছেন। তাছাড়া জীবনের প্রথম টেস্ট ক্রিকেট ম্যাচ খেলতে নেমে একাধারে গোল্লা এবং সেঞ্চুরী করার নজির আন্তর্জাতিক টেস্ট ক্রিকেট খেলার ইতিহাসে বিশ্বনাথের ছাড়া অপর কোন খেলোয়াড়ের নেই।

একমাত্র নজির

১৯৬৯ সালে দিল্লীর তৃতীয় টেস্টে অস্ট্রেলিয়ার ওপেনিং ব্যাটসম্যান বিল লরী দ্বিতীয় ইনিংসের পুরো খেলায় ৪৯ রান করে শেষ পর্যন্ত অপরাজিত থেকে যান। ভারত বনাম অস্ট্রেলিয়ার টেস্ট ক্রিকেট আসরে ওপেনিং ব্যাটসম্যানের পক্ষে পুরো ইনিংসের খেলায় নটআউট থাকার আর কোন নজির নেই।

এক ইনিংসে উল্লেখযোগ্য বোলিং

অস্ট্রেলিয়ার মাটিতে

ভারতবর্ষ : ৬ উইকেট (৫৫ রানে) এস আবিদ আলী, এডিলেড ১৯৬৭-৬৮
অস্ট্রেলিয়া : ৭ উইকেট (৩৮ রানে) আর লিণ্ডওয়াল, এডিলেড, ১৯৪৭-৪৮

ভারতের মাটিতে

ভারতবর্ষ : ৯ উইকেট (৬৯ রানে) জেসু প্যাটেল কানপুর, ১৯৫৯-৬০

অস্ট্রেলিয়া : ৭ উইকেট (৪৩ রানে) আর লিণ্ডওয়াল, মাদ্রাজ, ১৯৫৬; ৭ উইকেট (৭২ রানে) রিচি বেনো, মাদ্রাজ, ১৯৫৬; ৭ উইকেট (৯৩ রানে) এ কে ডেভিডসন, কানপুর, ১৯৫৯-৬০ এবং ৭ উইকেট (৬৬ রানে) জি ডি ম্যাকেঞ্জি, মেলবোর্ন, ১৯৬৭-৬৮

একটি খেলায় উল্লেখযোগ্য বোলিং

অস্ট্রেলিয়ার মাটিতে

ভারতবর্ষ : ৮ উইকেট (২১৮ রানে) এরাপল্লী প্রসন্ন, ব্রিসবেন, ১৯৬৭-৬৮
অস্ট্রেলিয়া : ১১ উইকেট (৩১ রানে) ই আর এইচ টোসাক, ব্রিসবেন, ১৯৪৭-৪৮

ভারতের মাটিতে

ভারতবর্ষ : ১৪ উইকেট (১২৪ রানে) জেসু প্যাটেল, কানপুর, ১৯৫৯-৬০

অস্ট্রেলিয়া : ১২ উইকেট (১২৪ রানে) এ কে ডেভিডসন, কানপুর, ১৯৫৯-৬০

দর্শক

নাটক

আজকের গ্রুপ থিয়েটার

"নাটককে যদি শিল্প, সাহিত্যের এক জরুরী অংশ বলে স্বীকার করি, তাহলে অন্যান্য শাখার তুলনায় এই মাধ্যমটি এখনো উষর রয়েছে, কি তারও আগের যুগে বাস করছে।"—এই মন্তব্যটি এক গ্রুপ থিয়েটারের মুখপত্রের। বাংলা নাটক কেন পিছিয়ে, এব্যাপারে অনেকেই অনেক কারণ দেখিয়েছেন কিন্তু তা মূল কারণে না গিয়ে। আমার মতে মৌলিক নাটকের এই অনুন্নতির জন্য দায়ী প্রধানভাবে গ্রুপ থিয়েটারগুলো। একটা পরিসংখ্যান নিলে দেখা যাবে, পশ্চিমবাংলায় স্বীকৃত থিয়েটার গ্রুপের সংখ্যা কম করেও ৪০০। সারা রাজ্যে প্রতি সন্ধ্যায় অন্ততঃ ৫০।৬০ কি তারও বেশী নাটক অভিনীত হয়। অথচ প্রকৃত নাটক বলতে যা বুঝি তা নেই।

ছোট গ্রুপগুলোকে যেসব নাটক করতে দেখা যায়, তার বেশীরভাগই বড় বড় কথায় ভর্তি, সমাজ কে বদলে ভালো ভাবীয় ভালো ভাবাবেগে পূর্ণ। ওখানে যে সমাজ ব্যবস্থার কথা বলা হয়, তা কোন সমাজ এবং কোন্ সমাজ বদলে কোন সমাজ আসবে, কারা কিভাবে আনবে, তার জন্য কার কি করা উচিৎ, যে শ্রেণীবিভাগ দেখানো হয়, তা কোন শ্রেণী—শ্রেণীর ক্লাসিফিকেশানই বা কি—এইসব ব্যাপারগুলোর অনেক কিছুই তাঁদের অজ্ঞাত। আসলে কিছু পচা সেণ্টিমেণ্ট, ধনী দরিদ্র সংঘর্ষ, প্রেম, বাকো-বিলাস, এ্যাবসার্ড-এ্যাবস্ট্রাক্ট নামে আবোল তাবোল কথা—এসব নিয়েই হচ্ছে। আর এঁদের এই অজ্ঞানতার সুযোগে বেশ কিছু সুযোগ-সন্ধানী লোক কথার পর কথা বসিয়ে নাট্যকার হয়ে গেছেন। লেখার ক্ষমতা তো দূরের কথা, নিজেদের সমাজ, সময়, পরিবেশ ইত্যাদি সম্পর্কে স্বচ্ছ কোন ধারণাও তাঁদের নেই।

এর বাইরে যেসব নাট্যকার কিছু করার চেষ্টা করছেন, তাঁদের সেই চেষ্টাও ঠিকমতো কাজে লাগে না উপযুক্ত উৎসাহের অভাবে। বিজন ভট্টাচার্য, মোহিত চট্টোপাধ্যায়, বাদল সরকার, চিত্তরঞ্জন ঘোষ, মনোজ মিত্রদের লেখা তো দূরের কথা নামও অনেকে শোনেন নি। অন্যদিকে এইসব নাট্যকারেরা তাঁদের নাটকের বিনিময়ে উপযুক্ত পারিশ্রমিকও পান না। গ্রুপগুলো এ্যাকট্রেসকে টাকা দিতে পারে, সাউণ্ড রেকর্ডিস্টকে টাকা দিতে পারে কিন্তু যাঁর নাটক নিয়ে এইসব তাঁর বেলায় 'আমাদের ছোট গ্রুপ বুঝতেই তো পারছেন, ধারধোর করে নাটক করছি...' ইত্যাদি কথাগুলো এসে যায়। এই ব্যাপারটা কিন্তু বড়-ছোট সব গ্রুপেই সমান প্রতিষ্ঠিত।

আজ প্রতি পাড়াতেই একটা না একটা গ্রুপ থিয়েটার আছে। প্রশ্ন হল নাটক করার পেছনে ওঁদের উদ্দেশ্য কি? কথাটা জিজ্ঞেস করলে ওঁরা বিপ্লব, সমাজ, আদর্শ, সাহিত্য, থিয়েটার ইত্যাদি নানা বুলি কপচে যাবেন। মোদ্দা ব্যাপারটা কিন্তু অন্যর। শীতের দুপুরে আমাদের গলিতে প্রায়ই ভাংগুলি খেলা হয়, গ্রীষ্মের বিকেলে ফুট টেনিস। ওদের কিছু করার নেই, তাই এইসব নিয়েই ওরা মেতে আছে। ছোটখাটো গ্রুপগুলোর অবস্থাও এরই মতো। সন্ধ্যায় যাদের একেবারেই কিছু করার থাকে না, অথচ সস্তায় নাম কেনার একটা ইচ্ছে থাকে, তারাই এর সহজ নাটকে ব্যাপারটা বেছে নেয়। অন্ততঃ পাড়ার মেয়েরা তো জানবে, অমুক ছেলে সে নাটক করেছে। অবশ্য এর মধ্যেও প্রতি গ্রুপেই দু'একজন নাটক পাগল ছেলে আছে, তারা নাটক ভালবাসে, তাদের আদর্শ, জীবনযাপন ইত্যাদির সঙ্গে তারা নাটককে জড়িয়ে ফেলেছে। আস্ থিয়েটার গ্রুপের টাস্কু, বহুরূপীর গোপাল, তিলপুরের সন্দীপ সেবকের শ্যামলেরা তাদের গ্রুপ নিয়ে প্রচণ্ড কিছু করতে চেয়েছেন। কিন্তু সংখ্যাগরিষ্ঠের অনীহায় তাঁরা ব্যর্থ। তাঁরা জানেন, যা করছেন, তা আর যাইহোক নাটক নয়। তবু কিছুতো একটা করতে হবে, এই ভেবে বাধ্য হয়ে করছেন। খারাপ কিছু করার চেয়ে না করাটাই ভাল এই সিদ্ধান্তে কজনই বা আসতে পারে।

এবার বড় গ্রুপগুলোর দিকে তাকানো এরা নিজেরা বেশী করে ব্যক্তিগত খোয়া-খুয়িতে মত্ত। এবং এই নিতান্ত ব্যক্তিগত ব্যাপারটা তাঁরা চাপা দিয়েছেন আদর্শের খোলসে। তাঁরা প্রত্যেকেই চান দৈনিকের বিজ্ঞাপনে তাঁর নামটাই বেশ বড় করে থাকে। আর বিশেষ একারণেই অনেকগুলি গ্রুপগুলো ভাঙে, নতুন গ্রুপ জন্ম নেয়। অবশ্য এই আলাদাভাবে আমাদের সমর্থন বা আপত্তি কোনটাই নেই। প্রশ্ন হল বাংলা নাটকের জন্য এইসব গ্রুপের কর্তাব্যক্তিদের অবদান কি? কাগজে কাগজে ওঁরা লেখাতে নাটক বিষয়ে তাঁদের আদর্শ, ধর্ম, নীতি ইত্যাদি প্রচার করেন, তাতে মনে হওয়া স্বাভাবিক যে নাটকের জন্য তাঁরা সব কিছুই করতে প্রস্তুত। একজন তো পশ্চিম বাংলায় জনগণের নাটক করে, সংগ্রামী-প্রোলেতারিয়েত নাটক করে অপসংস্কৃতির বিরুদ্ধে লড়ে এইটা সাড়া ফেলেদিয়েছেন। আবার সেই তিনিই বোম্বাইয়ের 'এ' মার্কা হিন্দী সিনেমায় একটা নাচের কোরাস করে এ করছে এখানে একটা ফ্ল্যাট কিনে বসেছেন। আরেক-জন জরুরী অবস্থার পুরো সময়টা শাসক গোষ্ঠীর পেছনে ঘুরে, কথায় কথায় প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রীর গুনগান করে এই '৭৭ এর মধ্য ভাগে একটি পত্রিকায় বড়াই করে লেখেন তিনি কতটা শাসক বিরোধী ছিলেন, জরুরী অবস্থায় তাঁর বাড়ীতে কবার পুলিশ গেছিল। আরেকজন তো নাটকে কম্যুনিজম ইত্যাদি আউড়ে ঢুকে করে সরকারের প্রচার-দপ্তরে একটা হাজারী মনসব জোগাড় করে ফেলেছেন। এই আজকের গ্রুপ থিয়েটারের পিতাদের আদর্শ। বললে আরো অনেক উদাহরণ এসে যাবে। এসব কথা এই জন্যে যে কেউ যদি তাঁর নিজস্ব কাজে সৎ না হন, তাহলে তাঁর সৃষ্টিকর্মও সৎ হতে পারে না। ওখানে ফাঁকি থাকলে এখানেও ফাঁকি এসে যায়।

ক্যারল রীডের ছবি ফলো মী

বিচিত্রা

এলিজি ঃ উদয়শঙ্কর

উদ্দেশ্য ছিল এবারে একটু ভিন্ন। শংকর ফাউণ্ডেশন ফর ক্রিয়েটিভ আর্টস্ গতবারে উপস্থিত করেছিলেন পণ্ডিত রবিশংকর-কে নেতাজী ইণ্ডোর স্টেডিয়ামে বারো হাজার শ্রোতার সামনে। সেবারের বাজনা শুনে হয়তো অনেক শ্রোতাই সন্তুষ্ট হন নি তাঁর হাল্কা মেজাজের বাজনা শুনে। কিন্তু এবারে মঞ্চের একেবারে মাথায় ছিল হলুদ-আলোয় মাখা উদয়শংকরের হাসি-মুখভরা ছবি। মঞ্চের একপাশে কিছু ধূপ পুড়ে যাচ্ছিল। বেদগান আর রবীন্দ্র-সঙ্গীতের সম্মেলক পরিবেশনা হতে চেয়েছিল সঙ্গীতনিমগ্ন পরলোকগত নৃত্যশিল্পী-র প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে। তবু প্রায় বারো হাজার দর্শক অনেক চেষ্টা করেও গানের কথা-কে ভালভাবে বুঝতেই পারেন নি গায়কদের সম্মিলিতভাবের উচ্চগ্রামতায়। এর চেয়ে পরিচালিকা সুচিত্রা মিত্র যদি একা গাইতেন, তাহলে হয়তো অনুষ্ঠানের মূল সুরটাকে প্রথমেই ধরা যেত।

এরপরে ছিল দ্বিতীয় অনুষ্ঠান—'গুরুবন্দনা'। সম্মিলিত গান এবং অর্কেস্ট্রার সমন্বয়ে গড়ে তোলা স্বয়ং রবিশংকর বিরচিত তাঁর অগ্রজ নটরাজপ্রতিম উদয়শংকরের প্রতি নিবেদিত আন্তরিক সুরাঞ্জলি। আমাদের দুর্ভাগ্য, শঙ্করা রাগের ভিত্তিতে রচিত এই অনুষ্ঠানটি মাইক্রবিভ্রাটে সব শ্রোতার কাছে পৌঁছতে পারে নি। তার থেকেও বেদনাদায়ক এই যে কাছাকাছি থেকে যাঁরা এই লক্ষ্য করেছেন, অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করবার সময় যে বেদনার চিহ্ন পণ্ডিতজীর চোখেমুখে ছিল, তার এক ভগ্নাংশও সমবেত গায়কদের গলায় উদ্দীপ্ত হয়ে ওঠে নি। জাইলোফোনের ব্যবহারে মন্দিরের আরতি করবার যে ইমেজটুকু আনতে চেয়েছিলেন, সমবেত কলরব সে দেবতা-কে কোথাও-ই প্রতিষ্ঠিত হতে দেয় নি।

রবিশংকর

বিরতির পরে আসরে এলেন স্বয়ং রবিশংকর আল্লারাখা-কে সঙ্গে নিয়ে। উদয়শঙ্করের উদ্দেশ্যে নিবেদিত এই অনুষ্ঠানে তিনি কিন্তু অগ্রজের উদ্দেশ্যে নূতন কোন রাগসৃষ্টি করেন নি। বরং বেছে নিয়েছেন প্রাচীন রাগ শ্রী-কে একদম প্রথমে। চল্লিশ মিনিটের আলাপ আস্তে আস্তে রূপ পেয়েছে বিলম্বিত, মধ্য ও দ্রুত-জোড়-ঝাঁপতালের গৎ-এ। মন্দ্র সপ্তকে বীণার মতো গভীর সুরেলা কান্না আস্তে আস্তে আমাদের গভীর থেকে গভীর-এ নিয়ে গিয়েছে মনে হয়েছে গুরুবন্দনায় তাঁর যে অতৃপ্তি রয়ে গিয়েছিল—তা যেন তিনি আবার ফিরে পেতে চাইছিলেন তাঁর আলাপের মধ্যে। এটুকু বলা যায় যে শ্রোতাদের মনোরঞ্জন করবার চেয়েও বড়ো কোন তাগিদ তাঁর ছিল।

তারপরে ইমন-মনজ্। এই রাগবিস্তারে যদিও অপেক্ষাকৃত হাল্কা, তবু আগোগোড়া অদ্ভুত একটা সুরের মহু তাঁকে ঘিরে রেখেছিল। সহজভাবে পর্দাকে ছুঁয়ে ছুঁয়ে গেছেন। মাঝে মাঝে ঠুংরীর চলন চিরাচরিতভাবে এনেও আবার ফিরে গেছেন সেই জায়গায়। আর সেই সঙ্গে আশ্চর্য লেগেছে আল্লারাখা-র ব্যবহার। আগাগোড়া অনুষ্ঠানে কোথাও কোন চমক ছিল না। ছিল না সওয়াল জবাব করবার কোন প্রচেষ্টা। ছিল না বারো হাজার দর্শক-কে আলগাভাবে বেঁধে রাখবার কোন ইচ্ছে। অনুষ্ঠান হয়তো এখানেই শেষ হতো। তবু শ্রোতাদের অনুরোধ বাংলা গানের গানের সুর-কে মুখ হিসেবে বেঁধে নিয়ে শোনালেন ধুন। শৈশবে শোনা রজনী-কান্তের গান ('পাতকী বলিয়া কি—বাজাবার আগে বলে নিয়েছিলেন)-কে কুড়ি মিনিট ধরে। আড়ি ছন্দে মাঝে মাঝে কীর্তনের আকুলতা আর বেহাগের গাম্ভীর্য মিলে কান্না-হাসির পরিবেশ করলেন তিনি।

সোজা দুই ঘণ্টা ধরে অগ্রজের প্রতি স্মৃতি-নিবেদন করতে গিয়ে তিনি যে পরিবেশ চেয়েছিলেন তা পেয়েছিলেন কী! তা নইলে উদয়শংকরের স্মৃতিবাসরে ধুনের চটুলতা শোনবার জন্যে এতো ব্যস্ত হওয়ার কী কারণ থাকতে পারে যখন স্বয়ং রবিশংকর সুরের এলিজি রচনা করতে চেয়েছেন!

আমরা বোধহয় মূল সুর-কে ধরতে আরও শিখি নি।

তথাগত চক্রবর্তী

আমার দেশের আজব কথা, সুরে-তালে

ছোটোদের মন্ত্রমুগ্ধ করে রাখতে ইলেকট্রনিক একালে, এই মহাকাশ পাড়ির যুগেও আজব দেশের আজব কথার দাম কিছুমাত্র কমেনি। বিজ্ঞান যতোই রহস্য ফাঁস করতে-করতে গ্রহ থেকে গ্রহে এগিয়ে যাক, আজগুবি কল্পকথার প্রাণভোমরা মানুষের মনের লুকোনো সোনার কৌটোয় ঠিকই বেঁচে থাকে। বিশেষত শিশুমনে।

'উইজার্ড অব ওজ' অবলম্বনে 'আজব দেশ মে মিনু' নৃত্যনাট্যে এই রূপকথা পিয়াসী শিশুমনের একেবারে ভূরিভোজের আয়োজন করেছিলেন জামশেদপুরের টেগোর সোসাইটি। ৯ অকটোবর রবীন্দ্রসদনে শিল্পনগরীর এই সাংস্কৃতিক সংস্থাটির ছাত্রীরা নৃত্যে-

আজব দেশ মে মিনু

অনুভব হন লেখক। সাজা কথা সহ্য করতে পারেন না সম্পাদক। লেখক, লেখার বিষয় জানান। একাকীত্ব, নিঃসঙ্গতাকে বিষয় হিসেবে বাছেন।

প্রবাল মুখোপাধ্যায়, দেবীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়, ও অরুণ চক্রবর্তীর অভিনয় ভালো লাগে। গৌতম মুখোপাধ্যায় বড়ো আড়ষ্ট অভিনয় করেছেন। স্বর্গের উর্বশীকে মানায়নি। নাটকটি দুঃখ তোলায় না, দুঃখ দেয়। আবেগ হৃদয়ের শিরা বেয়ে চোখে পৌঁছায় না। নির্মলেন্দু ঘোষাল

সুরসভার অনুষ্ঠান

সুরসভা শেষ বর্ষণের পালা উদযাপন করলেন রবীন্দ্র সদনে ২৩ সেপ্টেম্বর। তার আগে রথীন চৌধুরীর পরিচালনায় আনন্দ-লোক-এর সমবেত গান রবিতীর্থের শিশু শিল্পিবৃন্দের 'আনন্দেরি সাগর হতে' সুষমা ঘোষ ও লক্ষ্মী গুপ্তের কণ্ঠে ও তারক সাহার সমস্ত হিমাংশু গীতি এবং উল্লেখ-যোগ্য নৈপুণ্যে সুচন্দ্রা বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'নম নম বাংলাদেশ মম' গানটির সুরে গীটার ও অজয় ঘোষের তবলা সহযোগিতা ইত্যাদি। সুচন্দ্রার আঙুলে ছোঁয়া তারের অনুরণনে নিভৃত সুরের আস্ফালন। সচরাচর গীটার বেহালায় গান শুনি না কেন না মনে মনে কথাগুলি গাঁথবার মত করে যন্ত্রকে কথা বলানো হয় না। সুচন্দ্রা সেদিকে সতর্ক ছিলেন। একক সঙ্গীতে সুচিত্রার এদিনে প্রথম দিকের দু-একটি গানে কণ্ঠের ক্লান্তি থাকলেও 'যে কাঁদনে হিয়া কাঁদিছে' 'জীর্ণ পাতা' প্রভৃতি গানগুলিতে তিনি আমাদের মনে সুর বাণীর দাগ কেটে বসিয়ে দিয়েছিলেন। বিরতির পর নৃত্য ও গানের দোলায় উপচে উঠল মঞ্চ। শেষ বর্ষণের আঠারোটি গানের মধ্যে হেমন্ত ও সুচিত্রাও ছিলেন। হেমন্তবাবুর 'মন মোর মেঘের সঙ্গী।' ভাল লাগল না। সুরভঙ্গ ঘটছিল এবং দমের অসুবিধা টের পাচ্ছিলাম মাইক্রোফোনে। রেকর্ডে ওর গলায় এই গানটি স্মৃতির হংসবলাকায় আমাদের মনের সাথী। পলি গুহর নাচের সঙ্গে অবশ্য মোট আবেদনটা তেমন মার খায়নি। শুধু গানে ভরাতে হেমন্তবাবু অনেকটা সংশোধিত। নাচে ইন্দ্রা ও ভারতী একেবারে সমবেশিনী সখার সোনালী ধানী। কায়া-ছায়া বিম্ব-প্রতিবিম্ব। 'তারা-ভরা নিঃসীম অন্ধকারে' এই অতীন্দ্রিয় আবেদন ফেটানোর জন্যে নৃত্যের আলোক সম্পাত ও সহযোগী সঙ্গীতের একটু-আধটু সাজেসশন ছিল না বলে শরতের কাঁচ-কাঁচা-তারুণ্যের ভাবটাই ছিল নাচিয়েদের বেশভূষায় রূপে রসে। নৃত্য অংশে পলি গুহ মধুমিতা ভট্টাচার্য শুক্লার 'শাওন গগনে' ও সংঘমিত্রা দলের কেলা বসে বাদল শেষের সঙ্গে অনবদ্য নেচেছেন। বিশেষ পলির চোখ হাত ও মুখের আর্টিস্টের ভঙ্গি আবাক আবেদনের অনুলেখন সাবলীল ও গানের সুর কথার সমানুপ। হেমন্তবাবুর পাশাপাশি দ্বিজেন মুখোপাধ্যায় রবীন 'সে নিরুপম' থেকে গানেরই রেশ এ দুটি গানেই রীতিমত কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন। তিনি মধুমিতা শুক্লাদির রেখা এদের নাচের আবেদনের ঠিক ঠিক জায়গায়—সুরের ওঠা-নামা ও ভাবনাটের প্রকাশ ঘটিয়েছেন। বেশী অনেকের বেলায় ঘটেনি। রবীন্দ্রনাথের নাচ সুরেলা নাচ রবীন্দ্রনাথের গান আবার নাচের মত ছন্দায়িত। রবীনের গলা মিষ্টি পরিষ্কার এবং রবীন্দ্র সঙ্গীতানুসারী পরিশীলিত। এবারের মত বর্ষার পালা শেষ। এটা আবহাওয়া অফিস জানাতে ভরসা পান না কিন্তু রবীন্দ্রনাথের বর্ষায়—গানে আকস্মিক নিম্নচাপ সৃষ্টি হয় না। সুরসভা এটি ঘোষণা করে 'আমরা বেঁধেছি কাশের গুচ্ছ' দিয়ে শরৎকে দিলেন ডাক। 'কালো মেঘের আর কি আছে—দিন।'

শুভব্রত মুখোপাধ্যায়

রেস্তোরাঁ

দুটো টেবিল জুড়ে মহাজনরা বসে আছে। উল্টোদিকের টেবিলের উপর আর একটা বেঞ্চ জুড়ে বসে আছে পাড়ার ছেলেরা। দুটো সিগারেট ঘুরে বেড়াচ্ছে ছটা ছেলের মধ্যে। এরা নিয়মিত এখানে আড্ডা মারে। বন্ধুদের কাছে এদের ঠিকানা কেয়ার-অফ পণ্ডিতের চায়ের দোকান। সকাল সাতটা থেকে একটা এবং বিকেল পাঁচটা থেকে দশটা এখানে ওদের পাওয়া যাবে।

উত্তরপ্রদেশের ব্রাহ্মণ এই রেস্তোরাঁর মালিক। প্রায় পঁচিশ বছর এই ব্যবসার সঙ্গে যুক্ত। একে একে কয়লার, বিস্কুটের, দুটো পাঁউরুটির মহাজনকে দেনা মেটাচ্ছে। চায়ের ভাঁড়ের মহাজনকে দেখলাম আঁচল ঠিক করে নিয়ে টাকা গুনছে। দেড় টাকা শ' ভাঁড়। এক সপ্তাহের সাড়ে দশ টাকা গুনে, গোঁফে নীল হাফ-হাতা গেঞ্জি-গায়ে চায়ের ভাঁড়ের মালিক। ক্যালেণ্ডারের মহাদেবকে নমস্কার করে বিদায় হলো।

খদ্দের খুব একটা নেই। রাত সাড়ে আটটায় তিন কেজি মটরের ঘুগনি, তিন কেজি আলুরদম আর পাঁচ ডজন কোয়ার্টার পাউন্ড রুটি শেষ। এখন নিজেদের রান্না চাপে। এই রেস্তোরাঁর মালিক এখানেই একলা থাকে একটা ঘর ভাড়া করে। তিরিশ টাকা। জল আলাদা, ইলেকট্রিক বিল আলাদা।

বাকি একটা টেবিলে আমি এখন একা। বাইরে কোয়ার্টারের সামান্য কিছু লোকজন। ভেতরে ওরা ছজন, রেস্তোরাঁর মালিক, একটা সুন্দরবনের ছোট ছেলে আর একজন বয়স্ক বিহারের মানুষ। শুয়োরের মাংসের গন্ধ ভাসছে বাতাসে। এটা ওদের। কি একটা ব্যাপারে বাজিতে জেতার জন্যে এই মাংস।

রেস্টুরেন্ট এটাকে ঠিক বলা যায় না। কেননা রেস্টুরেন্ট বলতে চপ-কাটলেটের গন্ধই বেকাবে মুখে, উড়ে বেড়ায়। এটা কি তবুও কেবল না হলেও রেস্টুরেন্ট। ৬৫ পয়সায় ডিমের চপ, ২৫ পয়সা ভেজিটেবল চপ বিক্রেতার দিকে খুবই সাধারণ কেটির হয়। দিনের বেলায় চলে রুটি, ঘুগনি, আলুরদম, বিস্কুট, চা, মৌরী।

এখানকার খদ্দের প্রধানত কাছের ওপার-এপার মিলিয়ে মিস্ত্রি কারখানার শ্রমিক। পুরোনো লোহার রড, টিন, এ্যাল-মোনিয়াম, কিংবা বস্তা-জায়গায় গাড়ী দিয়ে বিক্রি কিংবা অর্ডার দিতে যারা আসে তারাই এখানকার বেশির ভাগ খদ্দের।

বছরে ছটা লাইসেন্স, এখনো তের টাকা দোকান ভাড়া, লাইট, পাখা, দুটো লোকের খাওয়া-দাওয়া, জল খাবার, আর সত্তর টাকা মাইনে, বছরান্তে একবার জামা-কাপড় দিয়ে দিয়ে খুব বেশি আর জমাতে পারে না।

তিরিশ পয়সা করে ঘুগনি, আলুরদম, কুড়ি পয়সায় চা, পাঁউরুটি পাঁচিশ আছে পনেরো আছে আর আছে সামনের টেবিলে সাজানো বিস্কুট, কেক, পাশে ঘুগনি, আলুরদমের ডেকচি।

দক্ষিণ কলকাতার দীপ্তির মোড় এখন আর কারোর কাছে অচেনা নয়। ডানদিকে চলে গেছে তারাতলা, বেহালা, ডায়মণ্ড হারবার রোড, মোড় থেকে চলে গেছে সোজা কুদঘাট কিংবা গড়িয়া। এই মোড়ের গা ঘেঁষে সি আই টির নতুন ফ্ল্যাট আর সুপার মার্কেট হয়েছে। ফ্ল্যাটে এখনও লোক আসেনি। মার্কেটেও সব দোকানদার এখনও আসেনি। কিছু কিছু দোকানদার এসেছে। খুব একটা জমেনি এখনও বাজারটা। এই সুপার মার্কেটেই এই রেস্তোরাঁ। চলে না দোকান ভাড়া আর সব কিছু দিয়ে মাসান্তে কিছু আর জমা খুবই কষ্টসাধ্য। তবু ওদের এত কষ্টেও মুখের হাসিটুকু ফুরোয় নি।

রান্না

ডিম চিংড়ির পাটিসাপটা

সেদিন মণিপুরী বৌদি বললেন, মাংসের পরটা কেমন খেলে? বললাম, দারুণ। মণিপুরী বৌদি এক গাল হেসে বললেন, কাল সকালে একটা নতুন জিনিস বানাবো। খেলে চৌঁয়ে যাবি। চায়ের সাথে দারুণ জমবে। বললাম, সাধ্যের মধ্যে হবে তো? তোমার যা আয়োজন। উনি চটে গেলেন, আয়োজনের কি? আড়াইশো গ্রাম ময়দা, একশো পঞ্চাশ গ্রাম টাটকা কুচো চিংড়ি, একশ গ্রাম আলু, আদা পঁচিশ গ্রাম, পেঁয়াজ পঞ্চাশ গ্রাম, দুটো হাঁসের ডিম, একটু ডালডা বা ঘি, একটু ভিনিগার, কাঁচা হলুদ, চিনি নুন—ব্যস। তুমি তো বললে, ব্যস! বাজার দর জানো? ময়দার কেজি দু-টাকা, টাটকা কুচো চিংড়ি পাঁচ টাকা, আলু দেড় টাকা, আদা তিন টাকা,

পেঁয়াজ আড়াই টাক, কাটা হাঁসের ডিম বড় বড়টা এক টাকা, আদাহ হলুদ, লংকা, চিনি নুনের দাম তো আছেই। বাঁশবেড়ির বললেন, জল খেতে গেলে, একটু খরচা তো হবেই—এতো এমন কিছু নয়। ইচ্ছে হলে শিখে নিতে পারিস। বললাম, বল, কি আর করা যাবে।

তাঁর বলতে লাগলেন, প্রথমে ডিম ভেঙে ময়দার সাথে পরিমাণমত জল দিয়ে গুলে নিতে হবে। তাতে ভাল, চিনি পরিমাণ মত মিশিয়ে দিয়ে কিছুক্ষণ রেখে দিতে হবে। তারপর চিংড়ি মাছের খোসা ছাড়িয়ে ভাল করে বেটে নিয়ে আলু সেদ্ধ করে আলুর সাথে মাছ বাটা ভাল করে মিশিয়ে নিতে হবে। তারপর কড়াইয়ের মধ্যে পেঁয়াজবাটা আদাবাটা, লংকাবাটা, সামান্য হলুদ দিয়ে একটু তেলে নাড়াচাড়া করে তার ভেতর আলুমাখা চিংড়িমাছ, একটু চিনি ও নুন দিয়ে ভাল করে কষিয়ে নিতে হবে। পাটি-সাপটা যে ভাবে করে, সেইভাবে চাটুর ওপর একটু ঘি বা ডালডা দিয়ে, ডিম ও ময়দা গোলা অল্প অল্প ছেড়ে ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে ডিমের অমলেটের মত করে তাতে, আলুমাখা চিংড়ি মাছের কয় পুর দিয়ে গুটিয়ে নিয়ে নামিয়ে ফেলতে হবে। চায়ের সাথে গরম গরম খেতে কেমন লাগবে বলতো ?

আত্রেয়ী সেনগুপ্ত

আমি কঙ্কাবতী বলছি

সকল ঋতুর মত শীতকালেরও আছে দু-একটি বিশেষ উপভোগ্য। যেমন ধরুন, কার্তিকের পড়ন্ত বেলায় সেই লালকে সোনালী আলো বা ক্ষণিকের জন্য সোনালী করে দেয় মেয়েদের চুল, গাছের পাতার সবুজ। কিম্বা, কুয়াশা বিজড়িত শীতের ভোরে প্রথম পেয়ালা চা। শীতকালে লেকের ফাঁকা জলাশয়ে একলা সন্তরণ। শীত-কালে ভ্রমণ। শীতের রোদ। শীতে আলস্য। আর, গৃহস্থ কিম্বা যাযাবর, সবাইকে সমানভাবে আকর্ষণ করবে যা, তা হল শীতকালের ফলমূলে তরকারীর বাজার। একসঙ্গে এত তীব্র রঙ কদাচিৎ চোখে পড়ে, রক্তের মত লাল টোমাটো, সবুজ কড়াইশুঁটি, গাঢ় সবুজ শাক, আগুনে রঙা কমলা লেবু — একান্তই শীতকালের বিলাস এইসব।

প্রকৃতি দেবী অসামান্যা, যে ঋতুতে যেমন খাদ্যগুণ প্রয়োজন সেই রকম ফলমূল দান করেন তিনি। শীত-কালে সর্দি হয়। তাই প্রয়োজন ভিটামিন সিতে উপচে-পড়া টোমাটো ও কমলা লেবু। শারীরিক দুর্বলতা, সর্দি-জ্বর, সাইনাস ইত্যাদির জন্য ভিটামিন সি অপরিহার্য। একটি মাঝারী আকারের টোমাটোতে আছে পঁয়ত্রিশ মিলিগ্রাম ভিটামিন সি এবং আড়াই হাজার ইউনিট ভিটামিন এ। ফলের রসের মত বিলাসীতা মধ্যবিত্ত ঘরে চলে না, কিন্তু শীতকালে টোমাটোর রস তেমন ব্যয়-সাপেক্ষ নয়। প্রকৃত সুস্বাদু রসের জন্য টোমাটোগুলো সেদ্ধ করে নিন, রসের সঙ্গে মেশান নুন কিম্বা চিনি, অথবা দুটোই, আর প্রয়োজন মত জল। এই পানীয় পাশ্চাত্যে বিশেষ জনপ্রিয়।

শীতের আরেকটি প্রিয় সব্জি হল কপি। এক কাপ পরিমাণ সেদ্ধ ফুল-কপিতে পাবেন চৌত্রিশ মিলিগ্রাম ভিটামিন সি ও ১০০ ইউনিট ভিটামিন এ, সামান্য আয়রণ, সোডিয়াম, ২৬ মিলিগ্রাম ক্যালসিয়াম ও ৮৪ মিলি-গ্রাম ফসফোরাস। সমপরিমাণ বাঁধা-কপিতে রয়েছে ৫৩ মিলিগ্রাম ভিটামিন সি, ১৫০ ইউনিট ভিটামিন এ, আয়রণ, ক্যালসিয়াম, ফসফোরাস, পোটাসিয়াম ও সোডিয়াম। এক কাপ সেদ্ধ কড়াই-শুঁটিতে আছে ২৪ মিলিগ্রাম ভিটামিন সি ও ৯৬০ ইউনিট ভিটামিন এ।

বলা বাহুল্য, যে কোন সবুজ তরকারি সেদ্ধ খাওয়াটাই সবচেয়ে বাঞ্ছনীয়। একথা বলা যতটা সহজ, রাখাটা অবশ্য তত নয়, কারণ, প্রচুর তেল-মশলাসহযোগে রাঁধা বাংলাদেশের তরকারী রান্নার আকর্ষণ অগ্রাহ্য করা বড় কঠিন। বাংলাদেশের দর্শনতুল্য রন্ধন শিল্পের সঙ্গে বর্বর সেদ্ধর তুলনা কখনই করা চলে না, এ সত্য মেনে নিয়েও প্রতিদিন প্রাতঃরাশে তরকারি সেদ্ধ খেতে বাধা নেই।

দুর্বল শরীরের প্রয়োজন অধিক প্রোটিন, ভিটামিন এ, বি সি ও প্যান্টো-থেটিক অ্যাসিড। এগুলির পরিমাণ অবশ্য বদলায় ব্যক্তিবিশেষে। শরীর যখন অতিরিক্ত দুর্বল, প্রতিবার খাবারের সঙ্গে খেতে হবে ৫০০ মিলি-গ্রাম ভিটামিন সি, ১০০ মিলিগ্রাম প্যান্টোথেটিক অ্যাসিড ও ২ মিলিগ্রাম ভিটামিন বি২ এবং বি৬। ভিটামিনের এই সব বড়িগুলি পাওয়া যাবে যে কোন ওষুধের দোকানে।

খাদ্যের মধ্যে বিশেষ প্রয়োজনীয় হল দই, মেটে, দুধ এবং শাক। মেটেতে আছে প্রচুর পরিমাণে ভিটামিন এ, যার ভূমিকা হল বীজাণুর সঙ্গে যুদ্ধ শাকের মধ্যে পালং ও কলমি শাক সমাদারিত। কিন্তু, যদিও বাংলাদেশের খাদ্যরসিক সর্ষে শাককে বড় একটা আমল দেন না, সর্ষে শাকেই আছে সবচেয়ে বেশি পরিমাণ ভিটামিন এ। এই শাক বেশি ব্যবহার করেন পাঞ্জাবী বধুরা—বঙ্গদেশের বৈশিষ্ট্য হল পালং। তাই বর্ণনা করছি পাঞ্জাবের প্রিয় একটি রন্ধন প্রণালী।

এই রান্নার জন্য চাই : ৫০০ গ্রাম সর্ষে শাক, ৫০০ গ্রাম পালং শাক, ৩ চামচ তেল, নুন, দুটি পেঁয়াজ, ৫০০ গ্রাম মেটে, দুটি টোমাটো।

মশলার মধ্যে দরকার : ১ চায়ের চামচ লংকা গুঁড়ো, ১ বড় চামচ ধনে গুঁড়ো (ব্যবস্থা থাকলে বাটা) ১ চায়ের চামচ হলুদ, ১ বড় চামচ সর্ষে ২ চায়ের চামচ জিরে, দেড় ইঞ্চি মাপের এক টুকরো আদা, ৬টি রসুনের কোয়া, গরম মশলা, ৫টি গোলমরিচ।

মশলা বেটে মিশিয়ে নিন পেঁয়াজ কুচি গরম তেলে বাদামী করে ভাজুন। এবারে মশলা ছাড়ুন। মেটের টুকরো-গুলি মশলার সঙ্গে কষে নিন। এবারে এককাপ জল দিন। সমস্ত জলটা মাংসের গায়ে শুকলে দিন টোমাটো আর শাক। শাক হয়ে গেলে নামান।

আটার তন্দুরী রুটির সঙ্গে বধুরা এই রান্না পরিবেশন করেন।

অমৃত পাবলিশার্স প্রাইভেট লিঃ-এর পক্ষে শ্রীসুপ্রিয় সরকার কর্তৃক পত্রিকা প্রেস ১৪, আনন্দ চ্যাটার্জি লেন, কলিকাতা-৩ হইতে মুদ্রিত ও তৎকর্তৃক ১১।১, আনন্দ চ্যাটার্জি লেন, কলিকাতা-৩ হইতে প্রকাশিত।
ইণ্ডিয়ান অ্যান্ড ইস্টার্ণ নিউজ পেপার সোসাইটির সদস্য।
মূল্য ৭৫ পয়সা ॥ ত্রিপুরায় অতিরিক্ত বিমান মাশুল ১৫ পয়সা। ভারতের অন্যত্র অতিরিক্ত বিমান মাশুল ২০ পয়সা।

অমৃত
১৭ বর্ষ
৩৩ সংখ্যা
২৩ অগ্রহায়ণ
১৩৮৪
9th DEC. 1977

প্রচ্ছদ কাহিনী

আগামী সংখ্যায়

প্রচ্ছদ কাহিনী
বাঙালী গান শিখবেই
লিখেছেন রেখা বড়ুয়া
গল্প লিখেছেন
প্রলয় শূর ও প্রভাত চৌধুরী
পুণা ফিল্ম ইনস্টিটিউট নিয়ে
লিখেছেন বিকাশ রানা

যাত্রার জয়যাত্রা

সংস্কৃতির ব্যাপারে বাঙালিদের আগ্রহ এখন প্রায় কিংবদন্তীর মত হয়ে দাঁড়িয়েছে।

ইদানীং যাত্রার জনপ্রিয়তাও দেখা যাচ্ছে সর্বভারতীয় স্তরে উন্নীত হবার পথে। একথা বলার কারণ একাধিক।

প্রথমত, যাত্রায় এখন যে ধরনের লেখক ও অভিনেতারা উৎসাহী হয়েছেন, তাঁরা অনেকেই রীতিমত উচ্চশিক্ষিত এবং উচ্চভাবনায় ভাবিত। যাত্রাশিল্পে যে নবজাগরণের তরঙ্গ বয়ে চলেছে তাও এরই ফলশ্রুতি।

তাছাড়া সকলেই জানেন, ভারতের চলচ্চিত্রকে পৃথিবীর সামনে তুলে ধরার কৃতিত্ব বঙ্গদেশেরই। এবং ভারতীয় চলচ্চিত্রে নতুন যুগের নায়কত্বও বাংলার পরিচালকদের হাতে রয়েছে বলা যায়।

মঞ্চাভিনয়ের বেলাতেও একই ঘটনা দেখা গেছে। চল্লিশের দশকে কলকাতায় নতুন ধরনের থিয়েটার দেখা দেয়। পঞ্চাশের দশক থেকে তা নতুন এক আন্দোলনের আকারে ছড়িয়ে পড়ে সারা বঙ্গদেশে। তার প্রভাবেই ভারতের অন্য রাজ্যগুলিতেও দেখা দিয়েছে নতুন ধরনের থিয়েটার।

এখন মনে হচ্ছে, যাত্রাশিল্পও হয়তো এক নতুন যুগের দরজা খুলে দেবে ভারতে। নানা পুরাণ কাহিনী অবলম্বনে ভারতের অন্য অনেক রাজ্যেও যাত্রা বা যাত্রার মতো মুক্তাঙ্গন অভিনয়ের প্রচলন আছে। তাছাড়া রামলীলার জনপ্রিয়তা তো সর্বজনবিদিত। কাজেই মনে করা যেতে পারে, অনুকূল প্রচারের মারফৎ পশ্চিমবঙ্গের এই যাত্রাশিল্পকে ভারতের অন্য ভাষাভাষীর মধ্যেও জনপ্রিয় করে তোলা যেতে পারে। এবং সেই পথে স্থানীয়ভাবেও হয়তো সেসব রাজ্যে যাত্রাভিনয়ের নতুন যুগ শুরু হবে।

মহামতি গোখলে যে বলছিলেন, বঙ্গদেশ আজ যা ভাবে, সেইটেই ভারত ভাববে আগামীকাল—সেকথা জীবনের অন্য অনেক দিকে আজ আর সত্য না থাকলেও, সংস্কৃতির ব্যাপারে সেটা আজও খাটে।

যাত্রার সেই সুদিনের জন্যে আগাম অভিনন্দন জানিয়ে রাখি।

প্রচ্ছদের নেপথ্যে : ১৯৩৭ সালে বীরভূম জেলার সিউড়িতে লালুপ্রসাদের জন্ম। স্নাতক হয়েছেন কলকাতার সরকারী আর্ট কলেজ থেকে। এখন সেখানেই অধ্যাপনা করেন। সোসাইটি অফ কনটেমপোরারী আর্টিস্টস গ্রুপের সদস্য। ঊনিশশো একাত্তরে শ্রীলালুপ্রসাদ সাউ গ্রাফিক আর্টে জাতীয় পুরস্কার সহ বহু পুরস্কার পেয়েছেন, প্রশংসা অর্জন করেছেন। ইংল্যান্ড, আমেরিকা, যুগো-শ্লাভিয়া, জাপান, ইটালি, পূর্ব ও পশ্চিম জার্মানী সহ বহু দেশের আন্ত-র্জাতিক গ্রাফিক আর্টের প্রদর্শনীতে অংশ নিয়েছেন। প্যারিস ও যুগোশ্লাভিয়ার লুবলিয়ানার দ্বিবার্ষিক চিত্রপ্রদর্শনী ও পূর্ব জার্মানীর আন্তর্জাতিক গ্রাফিক আর্ট কংগ্রেসে ভারতের প্রতিনিধিত্ব করেছেন।

সাহিত্য

উল্কাপাত

মাঠ ফুঁড়ে রাস্তা চলে গেছে হরি-গোপাল খালের ওপর দিয়ে। সেখানে একটা কাঠের পুল পাড়ে। তার দু-ধারে তাল-পাতার ঘর। লোকে বলে কুঁপি। সেখান থেকে ট্রেন লাইন দেখা যায়। এখানে ইলেকট্রিক গাড়ি। ফাঁকা মাঠ, গাছের সবুজ, আলকাতরা মাখানো কালো রঙের খালপোল আর শাদা রঙের গরুর পাল। মেঘ এলে রাখাল ছেলেরা মাথা তুলে দেখে। সময়মত ট্রেন এসে এই ছবির ভেতর ঢোকে। ঝমঝম করে। মিলিয়ে যায় ঘম ঘম শব্দ তুলে।

পালান সর্দার ওই কুঁপিতে বসে সারা-দিন মাছ ধরে। মাছ ধরার তোড়জোড় করে। সদা সর্বদা। রোজ দুবেলায়। আটল পাতে। শাঁড়াশি বসায়। তাতে গাঁথা ব্যাং কিংবা পুঁটি মাছের টোপ। বাবলা গাছে হলুদ ফুল। তাকে ঘিরে প্রজাপতি। পালান সর্দারের সঙ্গী তার নাংটো ছেলেটা। পালান নিজেও প্রায় উলঙ্গ। পরনে সামান্য এক কৌপিন। দিনে দিনে জেলে গিয়ে কুঁপির আলোর কেরাসিন, হোমিওপ্যাথ শিশির এক শিশি সর্ষে তেল, এক ঠোঙা নুন কিনে আনে স্টেশন বাজার থেকে। যাতায়াত তিন ঘন্টা। একটা আট বছরের ছেলের বড্ড সময় লাগে আর কি। যেতে যেতে সে গাছপালার সঙ্গে কথা বলে। তাদের গায়ে লাঠির বাড়ি মেরে শাস্তি দেয়।

পালান তখন ছিপ পাকায়। একটা পাকাল মাছ সসকে গেছে বলে আফসোস তার মনে। ছেলেটা বাজার থেকে ফেরেনি। ফিরলে রান্না বসাবে। এখন কাঠের আঁচে সে বকেলটা চিংড়ি কাঁকড়া সেঁকে নিয়ে খাবে।

খালপোলের গায়ে দুটি তাল গাছ। একটিতে সে হাঁড়ি বসায়। তাতে খানিক রস হয়। নিত্য সে-রস গেঁজিয়ে নিয়ে পালান খায়। সবটাই ঝাঁকা থাকে। এখানকার রোদ্দুর সে চেনে। এখানকার ছায়া নেমে এলে সে তার গন্ধ পায়। চারদিক আলো করে দিয়ে এখানে একটা চাঁদ ওঠে। একটু জালজেলে মত। বড় সাইজের। ভোর হলে জেগে জল করে পাখিরা ডেকে ওঠে।

পালান মাটির চামড়া তুলে সে আর ছেলে মিলে এ-ঘরের ভিত তুলেছে। পাশের ঘরটায় মাছ ধরার যন্ত্রপাতি রাখে। সেখানে একটা পুরনো লাঙল আছে। পালান যখন চাষী ছিল—তখনকার। সে-সময়কার একটা বউ ছিল। ভগচাষী পালান গাছের মতদাম শাক চাষ করত। ধান বুনে দিয়ে সে বাপ ... কলকাতায়। শিয়ালদায় লাইন দিতে যেত মাঝে মাঝে।

কাজ করতে গিয়ে যাদবপুরে এক বাবুর বাড়ি থেকে গেছে তার বউ। আর ফেরেনি। ফেরানো যায়নি। এখন পালান মাছ ধরে। কাঁকড়া ভাজে। তাল গাছের মোচ কেটে হাঁড়ি বসায়। একটা গাছ মন্দ। তাতেও সে কলসী ঝোলায়। যা পাওয়া যায়। আর মজার মাঝে নিজেরাই ঘরের ভিতের দিকে। শুকনো খড়খড়ে মাটিতে ক্ষেতের থেকে ইঁদুর ও-বছর গর্ত খুঁড়ে ধান লুকিয়েছিল। সে-গর্ত থেকে ইঁদুরদের তাড়িয়ে দুটি মোটা মত সাপ বাসা বেঁধেছে। তারা খুব সাবধানী। জোড় বেঁধে ঘোরে। জলে বসানো আটলে ঢুকে খালের কুচো মাছ খায়। একটাকে একদিন পালান প্রায় হাতেনাতে ধরে ফেলেছিল। জাতে কি। গায়ের রং কালো। অন্ধকার সন্ধ্যাবেলা। দিব্যি কালো জলে মিশে গেল। নরতো।

রাতে এখানকার আকাশ দিয়ে লাল সবুজ আলো জ্বেলে উড়োজাহাজ যায়। সকালে দুখানা উড়োজাহাজ রেল লাইনের ওপর দিয়ে উড়ে যায়। ফিরে আসে এক-খানা। বিকেলে।

মাছ, তাড়ি, কাঁকড়া, কেরাসিনের কুঁপি, আটল, হাতজাল—এইসব নিয়েই পালান সর্দারের জগৎ। সাপ দুটোর একটা একবার খোলস বদলালো। সেটা নিয়ে পালানের ছেলে খেলে বেড়াতে লাগলো।

জলের নিচে মাছগুলো তখন খেলছিল। বিছিন্ন পোকা ঘাসের ভেতর দিয়ে হেঁটে যাচ্ছে। প্রজাপতিরা হলুদ ফুলের চারদিকে। সাপ দুটোর খবর কেউ জানে না। ট্রেন এসে এই ছবির ভেতর ঢুকে এক সময় চলেও গেল। উড়োজাহাজ চলে গেল ছবির ওপর দিয়ে। পালান সর্দার কলসী পেড়ে গাছ থেকে নামলো।

ঠিক এই সময় তার বউ এসে হাজির। অনেক দিন পরে। তিনটে দুর্গাপুজো চলে গেছে এর ভেতর। ছেলে মাকে চেনে না। পালান লজ্জা পেল। সে এখন প্রায় উলঙ্গ। তালগাছে গাছি ওই বেশেই ওঠে।

বউয়ের বাবু তিনদিনের জন্যে দেশের বাড়ি সংসার সামলাতে গেছে। সেই ফাঁকে সেরিভী পুরনো টানে এখানে এসে পড়েছে। এখন তার গলায় শহুরে কাঁঝ। সকাল বিকেল চা খায়। আসল সোনার চুড়ি—দু-হাতে চারগাছা করে। শাদা ব্লাউজ পরে। পায়ে স্যান্ডেল। কোমরে চাবির গোছা। একদম বাবুর বাড়ির বউ।

এখন কি কি ঘটতে পারে ?

প্রিয় পাঠক। আপনি আমায় লিখে জানাবেন। নইলে এই পৃথিবীতে ঘটনাটি সামান্য। দিনের বেলায় উল্কাপাত চোখেও পড়ে না।

বৈকুণ্ঠ পাঠক

হায় খলশে !

২১ অকটোবর বৈকুণ্ঠ পাঠকের 'একজন লেখক চাই' পড়ে মনে হল যে বিষয়গুলি তিনি অবতারণা করেছেন, সত্যিই তো, সেগুলি নিয়ে আজও কোন মহৎ সাহিত্য সৃষ্টি হয়নি। বঙ্গ বিভাগের বলি-স্বরূপে কয়েক লক্ষ কিংবা তারও অধিক মানুষ এপারে চলে এসেছেন। তাঁদের নিয়ে অনায়াসে সৎ সাহিত্য রচিত হতে পারত। এমন আরও অনেক বিষয়বস্তু আছে যা পাঠক মহাশয় তাঁর লেখায় ধরিয়ে দিয়েছেন।

তিনি খলশে মাছের উল্লেখ করেছেন। অনেক সময় আমাদের মনেও এ প্রশ্ন জাগে। আগের দিনে খলশে মাছ বাজারে পর্যাপ্ত পরিমাণে পাওয়া যেত, কিন্তু এখন তা আর চোখে পড়ে না। অন্নপূর্ণা, সাঁত্রাগাছি, হাওড়া-১।

এটা কি মুদ্রণ প্রমাদ ?

২১ অকটোবর অমৃতে বিচিত্রা বিভাগে শ্রীসুধীর বন্দ্যোপাধ্যায় প্রয়াত সুরশ্রী কেসর বাঈ (কেসর ?) সম্পর্কে লিখেছেন। নিবন্ধটিতে কয়েকটি অসঙ্গতি রয়েছে বলে মনে হয়।

প্রথমেই শিল্পীর নামের বানান প্রসঙ্গে শ্রীবসন্তগোবিন্দ পোদ্দারের ভাষায় বলি—'সুনীল-এর সুনীল বানানটা যেমন ভুল তেমনি কেসর এর কেশর।'

শ্রী বন্দ্যোপাধ্যায় কেসর বাঈ এর জন্ম স্থানটির নাম লিখেছেন ...টা, কিন্তু শ্রী পোদ্দার লিখেছেন, অন্যত্র কটি সাপ্তাহিকে—কেরি। এটা কি মুদ্রণ প্রমাদ ?

খাঁ সাহেব বারকতউল্লা। (কেসর বাঈ এর তৃতীয় গুরু)'র পর শ্রী বন্দ্যোপাধ্যায় আলাদিয়া খাঁর নাম করেছেন। অথচ শ্রী পোদ্দার চতুর্থ গুরু হিসাবে পণ্ডিত ভাস্কর বুয়ার নাম উল্লেখ করেছেন। শ্রী পোদ্দারের রচনাটিতে দেখি কেসর বাঈ ভাস্কর বুয়ার কাছে সাড়ে চার মাস তালিম নেন। কিন্তু আলোচ্য রচনাটিতে এই সময়-কাল দশ মাস।

কেসর বাঈ বোম্বাইয়ে আলাদিয়া খাঁর কাছে নিজে উপস্থিত হয়েছিলেন বলে শ্রী পোদ্দারের রচনায় উল্লেখ নেই। খাঁ সাহেব নিজের কথায়—'১৯১৮ থেকে আমি নিজের সুপারিশ করার জন্য অনেক লোককে খাঁ-সাহেবের কাছে পাঠালুম....।' (অন্য একটি সাপ্তাহিকে)

আলাদিয়া খাঁর কাছে কেসর বাঈ ১২ বছর সঙ্গীত শিক্ষা করেন বলে শ্রী বন্দ্যো-পাধ্যায় লিখেছেন। কিন্তু শ্রী পোদ্দার লিখেছেন ১৫ বছর (১৯২১ সালের জানু-য়ারী থেকে ১৯৩৫ সাল) এই তথ্যটাই সঠিক বলে মনে হয়।

বাংলার শ্রেষ্ঠ দুই সাপ্তাহিকের এই পরস্পর বিরোধী তথ্য থেকে সঠিক তথ্যটি খুঁজে নেয়া সাধারণ পাঠকের পক্ষে সম্ভব নয়। এটি বিভ্রান্তিকরও বটে। আশা করি শ্রী বন্দ্যোপাধ্যায় সত্য উদ্ঘাটন করবেন। শ্যামলকুমার বিশ্বাস, শ্যামনগর।

সমালোচনা

পাঁচখানি গদ্যগ্রন্থ বিষয়ে

অদীক্ষিত পাঠকের দীক্ষা....জীবনের সত্য কথনো চাপা থাকে না....অনেকে বলেন ঈশ্বরপ্রতিম—অনেকে বলেন চালিয়াত....চিত্তের প্রসাদে মায়াকাননের ফুল....চারপাশের মানুষের গল্প

পবিত্র মুখোপাধ্যায়, অতীক রায়, সঞ্জয় মুখোপাধ্যায়, বাণীকণ্ঠ ভারতী, বোধন গঙ্গোপাধ্যায়ের মতামত।

জ্যোতিরিন্দ্র

মলাটের উপর ফুটিফাটা মাটির ছবি, কিংবা বিষণ্ণ হলুদ কাচের ভাঙাচোরা পরিণাম, যেন উপন্যাসটির অন্তর্জগতের ইঙ্গিত, অন্তত বইটি শেষ করে তা মনে হল। লেখক জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী। উপন্যাস—শেষ বিচার। জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর সৃষ্ট চরিত্র ও পরিবেশ খুব চেনা, আমাদের প্রতিদিনের জীবনের স্বাদ জড়ান। অন্তর্ভেদী দৃষ্টি, এরকম—চল্লিশ দশকের অন্য কোন লেখকের মধ্যে দেখা যায় না। স্বাদ গন্ধ রঙের লেখক তিনি।

'শেষ বিচারে' সময়কে তিনি ধরতে চেয়েছেন। একজন অবসর প্রাপ্ত জজসাহেবের জীবনযাত্রা গড়ে উঠেছিল ইংরেজ আমলের রাজভক্ত অভিজাতের মতন করে। তার মনে কোন প্রশ্ন ছিল না, একটি বাড়ি তিনি অভিজাত পাড়াতেই করেছেন। ছেলেদের শিক্ষা দিয়েছেন জীবনে প্রতিষ্ঠিত হতে পারে, তেমনিভাবে। ছোটবেলার বন্ধু সতীশ কোর্ট কাছারি ছেড়ে চরকা কাটতে বসে গেল, তবে অর্থ তিনি জানেন না। সুতো কেটে ভারত স্বাধীন করবে এ অসম্ভব স্বপ্ন। ভাবেন সতীশ কি মূর্খ, কি মূর্খ।

ঢেউ-এর আঘাত থেকে ময়ূরপঙ্খী বাঁচাতে আপ্রাণ চেষ্টা করে শেষ পর্যন্ত দেখা গেল, তা পারলেন না। পারা যায় না।

উপন্যাসটির মধ্যে চরিত্র খুব বেশী নেই। চরিত্রগুলির ব্যক্তিগত সমস্যা আছে। আর আছে জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর সেই বিশেষ দৃষ্টি, স্বপ্নশীল মেয়েকে তন্ন তন্ন করে দেখা ব্যক্তিজীবনের রহস্যটি কি।—কান্না বেদনার উৎস কোনখানে। অর্থ, গৌরব, মানুষকে সুখী করে না, এসব থাকা সত্ত্বেও মানুষ অন্য কিছু চায়, যা তার নেই। কি নেই, নিজেও ভাল করে বুঝে উঠতে পারে না। খুকুই এরকমই একটি চরিত্র। তার থেকে বয়সে অনেক ছোট অ্যাপোলোপ্রতিম রঞ্জুকে যে সে তার নিজস্ব শারীরিক সম্পদ উজাড় করে দিতে চায়, তা কেন—কার্যকারণ দেখান লেখক। বয়সে অনেক বড়, বিত্তবান স্বামীর কাছ থেকে যা পায় তাতে তার মন খুশী নয়। পরিস্থিতি রচনা এতটাই স্বাভাবিক, যে খুকুই-এর রক্ত-মাংসের জান্তব উপস্থিতি অস্বীকার করা কঠিন।

অবিশ্বাস্য ঘটনা তিনি ঘটান, শেষ বিচার বই-এ তা আছে। রঞ্জুর রিক্তভাব চুরি বিশ্বাস্য হত যদি তার মানসিক প্রস্তুতি দেখাতেন। রঞ্জুর বাবার, ছেলের প্রেমিকার প্রতি যৌন আকর্ষণ অবিশ্বাস্য হত না, যদি পরিবেশ রচিত হত। তবু, অবচেতনাই যে আসল মানুষটিকে বাইরে টেনে তুলতে সক্ষম বাইরে যে জোব্বা পরে হাঁটে, তা আড়াল করে রাখে প্রকৃত সত্তাকে, জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী এই অবচেতনলোকের সাহসী নিপুণ শিল্পী। অসামান্য ক্ষমতাবান এই উপন্যাসিক শুধু কাহিনীকার নন বলেই অদীক্ষিত পাঠকের সার্বজনীন প্রীতি কুড়োতে পারেন নি।

শেষ বিচার। জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী। রবীন্দ্র লাইব্রেরী। ১৮ টাকা।

সমরেশ

সমরেশ বসুর নতুন উপন্যাস 'পরের জীবনের সত্য কথনো চাপা থাকে না'; ঘরে আপন বাসা'র এই হচ্ছে মূল বক্তব্য।

চার ভাইয়ের মধ্যে একমাত্র ছন্নছাড়া উড়নচণ্ডী হচ্ছে ছোট ভাই কমলকান্তি। তাকে কেন্দ্র করেই সংসারে যত অশান্তির উদ্ভব। নইলে এমনিতে বেশ পরিপাটি একান্নবর্তী পরিবার। সৎ, শিক্ষিত। কিন্তু যত গোলমাল পাকাল ছোট ভাই, বদসঙ্গে কুসঙ্গে মিশে উল্টোপাল্টা জীবন কাটিয়ে সে কেড়ে নিল সকলের চোখের ঘুম। এমন কি উপন্যাসের রঙ্গমঞ্চে ঠেলে দিল এক নিষ্প্রাণ সুন্দরী তরুণী শর্মিষ্ঠাকে। শর্মিষ্ঠা আর টুসি। ছোট ফুটফুটে একটি মেয়ে। কমলকান্তির বিয়ে না করা বৌ শর্মিষ্ঠা। টুসি তারই গর্ভজাত সন্তান। আসলে শর্মিষ্ঠা কলংকহীন। কিন্তু অবস্থার ফেরে কলংকের বোঝা এসে প্রায় চাপতে বসেছিল তার ঘাড়ে। কিন্তু এক্ষেত্রে লেখক নিজেই ত্রাণকর্তার ভূমিকা নিয়েছেন। ঠিক সময়মত কমলকান্তিকে হাজির করে এবং সব রহস্য উন্মোচন করে শর্মিষ্ঠার মান রক্ষা করেছেন। অবশ্য এ সবের মূলে টুসি। সেই ছোট্ট ফুটফুটে মেয়েটি। সংসারের কর্তা বিমলকান্তির পিতৃহৃদয় হাহাকার করে উঠছে টুসির জন্য। শেষ অবধি যা হবার তাই হল। শুরু থেকেই লেখকের ঝোঁক ছিল বিমলকান্তিকে মহানুভবতার আসনে বসাবার দিকে। করালেনও তাই। বিমলকান্তিকে যথারীতি সিংহাসনে বসিয়ে ছাড়লেন। সুন্দর মুখের জয় সর্বত্র। শিশু মুখেরও জয় সর্বত্র। পাপ এক্ষেত্রে অচিরেই স্খালন হবে, অন্ধকার কেটে গিয়ে আবার আলোয় ঝলমল করবে সারা সংসার, একথা বলাই বাহুল্য।

পরের ঘরে আপন বাসা নাটক, রসিকতা, ভাগ্যের পরিহাস এবং চুম্বন আছে। আছে 'মহৎ' কথাবার্তা। টুকরো টুকরো নাটক। উত্তেজনা। পড়তে বেশ লাগে।

পরের ঘরে আপন বাসা : সমরেশ বসু। সমকাল প্রকাশনী, ৮।২এ গোয়াবাগান টুলি লেন, কলকাতা-৭০০০১৩। দশ টাকা।

কমলকুমার

কমলবাবুর বইয়ের সংস্করণপ্রাপ্তি প্রায় অবিশ্বাস্য ঘটনা। তিনি অশেষগুণান্বিত। মোটেই জনারণ্যে সম্বর্ধিত নন। তবু স্বীকৃত ও সর্বজনপরিচিত লেখকরা পর্যন্ত তাঁর নাম শ্রদ্ধার সঙ্গে উচ্চারণ করেন। বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে তাঁকে ঘিরে বিতর্কের অন্ত নেই। অনেকে তাঁকে বলেন ঈশ্বরপ্রতিম, অনেকে চালিয়াত। কেউ যেমন ভদ্রলোককে বঙ্কিমচন্দ্রের পরবর্তীকালে শুদ্ধতম ভাষাশিল্পী মনে করেন, অনেকে আবার মনে করেন অপ্রয়োজনীয় ও দুর্বোধ্য। আধুনিক জীবন যাপনের প্রশ্নে সঙ্গতিহীন।

আমি খুবে খোলা ও স্বচ্ছ গলায় বলতে চাই এই মুহূর্তের বাংলা গদ্যে তিনি একজন প্রধান ব্যক্তিত্ব। যদিও এই বইতে 'গোলাপ সুন্দরী'র মত উল্লেখযোগ্য গল্প নেই তবু সংকলনভুক্ত এগারটি গল্প পড়বার পরে আমরা নত হওয়ার মত স্বস্তি খুঁজে পাই।

কমল মজুমদারের লেখা যে সাধারণ পাঠকের কাছে অপরিচিত থেকে গেছে তার কারণ কিন্তু রচনার বিষয় নয়। গল্প বা উপন্যাসে তিনি ইতিহাসের কোন দূরে কল্পনাবিলাসকে প্রশ্রয় দেন নি। বরং এক গভীর ও মর্মান্তিক বাঙালীয়ানা জড়িয়ে রেখেছে তাঁকে। আমরা তাঁর রচনা থেকে বারে বারেই লক্ষ্য করি গ্রাম্য নিরক্ষর সরলতাকে, ক্ষুধা ও মমতা যাকে ধর্মবিরহিত করেছে অথবা জ্যোতির সরলতা কিংবা রূপান্তরিতা প্রীতিলতা ও আত্মহননকামী বুদ্ধিজীবীকুমারকে।

বেশ কয়েক বছর তাঁর রচনার একজন মনোযোগী পাঠক হওয়ার অভিজ্ঞতা থেকে বলব একটি তীব্র ও সত্যাশ্রয় অভিমান কমলবাবুর মধ্যে সক্রিয়। এই অভিমানই তাঁর যাবতীয় সাফল্য ও ব্যর্থতার উৎস। অন্ধ টেকনোক্র্যাসি, বিকলাঙ্গ ও বিপন্ন সভ্যতা তাঁকে ক্ষুব্ধ করে। তিনি ফিরে তাকান বিদ্যাসাগর-বঙ্কিম থেকে শুরু করে মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায় পর্যন্ত প্রসারিত উত্তরাধিকারের প্রতি। মনে হয় যন্ত্রসভ্যতার দাঁতাল দানব যেন নষ্ট করে দিচ্ছে সব কিছু। ফলে তিনি উনিশ শতকীয় ঐতিহ্য ফিরে পাওয়ার তপস্যায় রত হন। যা হয়ত অনেকের কাছে উন্নাসিকতা, সেই সুচিন্তিত তপস্যা তাঁকে আত্মনিগ্রহ দেয়। আত্মনিগ্রহ থেকে অভিমান।

আমি মনোভঙ্গীর কথা বলছি। এ থেকে যদি কেউ সিদ্ধান্ত করেন কমল মজুমদারের কোন সামাজিক চেতনা নেই তিনি ভুল বুঝবেন। সামাজিক চেতনা না থাকলে নিম অন্নপূর্ণার মত গল্প লেখা যায় না। প্রীতিলতার রূপান্তর কিন্তু সেই বিখ্যাত বিদেশী লেখক রচিত গল্পের সামসার চাইতে কম কিছু? বরং দেশজ পরিপ্রেক্ষিতের ছোঁয়াচ পেয়ে আমাদের কাছে কাফকার মেটামরফসিসের চাইতে কমলবাবুর গল্প অনেক মূল্যবান ও জ্বালাবহ। কিংবা মতিলাল পাদরির গল্প সুভদ্রতার দিকে মতিলালের বিপর্যস্ত উত্থান।

প্রথম গল্পটিতে কমল মজুমদার নিজেকে চিনতে পারেন নি, কিন্তু বাকী দশটি গল্প নিঃসন্দেহে আমাদের ঈর্ষা ও গৌরবের বিষয়।

গল্প-সংগ্রহ। কমলকুমার মজুমদার। দশ টাকা। সুবর্ণরেখা। ৭৩ মহাত্মা গান্ধী রোড, কলকাতা-৯।

সুনীল

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় অনায়াসে শব্দের শরীরে মিশিয়ে দিতে পারেন তাঁর মনের মাধুরী। সহজ স্বাদু তাঁর ভাষা। সে-কোন রকম মায়াময় পরিবেশ নির্মাণে তিনি দক্ষ। তাঁর চিত্তের প্রসাদে মায়াকাননের ফুল ফোটে। সুনীল সম্পর্কে আমার উচ্ছ্বাসের হেতুও এখানেই। আমি এইমাত্র তার 'মায়াকাননের ফুল' উপন্যাসখানি শেষ করেছি। সুন্দর সুমুদ্রিত চারু প্রচ্ছদ। বইখানি আমি তর তর করে পড়ে গেছি।

মহৎ কোন বিষয় নিয়ে মনীষীবিদগ্ধ কোন জটিল কঠিনকে উন্মোচন নয় নিতান্তই সাধামাঠা জীবন নিয়ে এক যৌবনের দুরন্ত চিত্ত-বৃত্তির ওপরে হীরের আলো বিকিরণ। সুনীল আপন বোধের নিকটে এত অকপট যে, মনের কথা অবাধে বলতে বিন্দুমাত্র দ্বিধা করেন না। এই নিঃসংকোচবোধতাড়িত বলেই সুনীলের রচনা সর্বদাই মর্মমুখী এবং সর্বত্রই পাঠকের সঙ্গে একাত্ম। এ-বইকে প্রিয়তর করবে তাঁর আর একটি বাকশৈলী—তিনি বাক্যবিন্যাস ইচ্ছা করেই অসমাপ্ত রেখেছেন। উদ্দেশ্য 'লেখক ও পাঠক মিলেমিশে বাক্যগুলি তৈরি করবেন।' এইভাবে একটি উপন্যাসের মধ্যে লেখক ও পাঠকের সরাসরি যোগাযোগ' হবে। বলা-বাহুল্য সুনীলের ভাষার প্রসাদগুণে সেই যোগাযোগ সার্থকভাবে সম্পন্ন করতে পেরেছে।

মায়াকাননের ফুল। সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়। বিশ্ববাণী প্রকাশনী। কলকাতা-৯। দাম ছ টাকা।

প্রলয় সেন

বাংলা সাহিত্যের ছোট গল্পের ধারাটি চিরকালই পুষ্ট। এই পুষ্টি জুগিয়েছেন রবীন্দ্রনাথ থেকে শুরু করে তারাশংকর, বিভূতিভূষণ। এবং অন্য এক রীতিতে মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায়। পরবর্তী যুগেও ছোট গল্পের রীতিটি বাংলায় সবচেয়ে বেশী আদৃত বেশী পুষ্ট।

ষাটের দশকে ছোট গল্পকার হিসেবে যাঁরা সম্মান পেয়েছেন, প্রলয় সেন তাঁদের একজন নিঃসন্দেহে। তাঁরই ঝরঝরে এগারটি ছোট গল্পের সংকলন বর্তমান বইটি।

গল্পগুলির বিভিন্ন পটভূমিকা—বিচ্ছিন্ন সময় কিন্তু একটি সূত্রে বাঁধা। আমাদের চারপাশের মধ্যবিত্ত-নিম্নমধ্যবিত্তদের কাহিনী। তাদের সুখ-দুঃখ অনুভূতি মূল্যবোধের জটিলতার গল্প। সুন্দা চারুশীলা অথবা যুবক নিত্য কিংবা রমেন শোভন, মল্লিনাথ এরা আমার-আপনার চারপাশের ঘূর্ণায়মান চরিত্র। তাদেরই অবিশিষ্ট জীবন লেখকের কলমে হঠাৎ বিশিষ্ট হয়ে উঠেছে। পড়াশেষে আপনি হঠাৎই আবিষ্কার করবেন সে কথা এবং কখনও কখনও নিজেকে।

এগারটি গল্পই মোটামুটিভাবে কোন-না-কোন দিক দিয়ে মনে দাগ কাটার ক্ষমতা রাখে। গল্পগুলির গতি স্তিমিত হয়ে পড়ে নি। চলতে চলতে থমকে দাঁড়ায় নি। কিন্তু লেখকের বাঁধুনীর অভাব আর অতিকথন বেশ কয়েকবার নজরে পড়বে। কখনও কখনও ভাষার চেয়ে নীরবতা যে কার্যকর একথা অনস্বীকার্য।

তবে এসব কিছুর উর্ধে লেখকের ভালবাসা ভরা মনটি সর্বদাই উপস্থিত। 'সকাল-সন্ধ্যা' ভিখারী বুড়োটির সঙ্গে অথবা চারুশীলা যখন আবিষ্কার করবেন তাঁর ছেলে আর বেঁচে নেই, পাঠক মাতৃস্নেহের সঙ্গে একাত্ম হবেন। নিঃসন্দেহে কিংবা পোট্‌ লালিতমোহনের জীবনে মূল্যবোধের জটিলতা আর আপসাম্মিদের সংঘর্ষের কাহিনী পড়তে পড়তে আপনার মধ্যবিত্ত জীবনের ধ্বসে-যাওয়া মূল্যবোধে মানবিকতার অভাব অনুভব করবেন।

এই গল্পগুলির কাছ থেকে সেটুকুই পাঠকের উপরি পাওনা।

পটভূমি: প্রলয় সেন। বিশ্বরঞ্জন। ৯।৩ টেমার লেন, কলকাতা-৯।

সজলের কবিতা

সজল বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর সমবয়সী কবিদের তুলনায় বেশ মিতবাক। ১৯৬৬তে তাঁর প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'তৃষ্ণা, আমার তরী' প্রকাশিত হওয়ার পর এই তো কিছুদিন আগে বেরোল তাঁর নতুন কবিতার বই 'স্বপ্নে উপকূলে'। এর মাঝখানে বেশ একটা-সময় জুড়ে একদম লেখেন নি সজল। হয়তো নিজের ভাবনাগুলোকে খানিকটা থিতোতে দিচ্ছিলেন।

এখানে সংখ্যায় অনেক এবং প্রায়ই বেশ ছোটো ছোটো কবিতা লিখেছেন সজল। দীর্ঘকাল 'এই দশক' গল্পকারদের কাব্যিক সহযাত্রী ছিলেন তিনি, আজকে তার ছাপ এখনো বেশ জায়গা নিয়ে আছে। গভীর তাৎপর্য দানের জন্যই কি পংক্তিগুলোকে বিচ্ছিন্ন করে টোটাল এফেক্ট আনার চেষ্টা করেন সজল? হয়তো—এবং এই প্রয়াস মাঝে মাঝে সফলও হয়ে ওঠে। এর একটা সুন্দর দৃষ্টান্ত খুঁজে পাওয়া যেতে পারে তাঁর 'দরজা খুলে দাও' কবিতাটিতে।

সজল কিছু পরিমাণে শৈশব-সারল্যের সাধক। পড়ুন তাঁর 'চাঁদের আলোয়' বা 'আমার গল্প' নামের কবিতাদুটো, অথবা 'তখন বৃষ্টি পড়ছিল'—আমার উক্তির প্রমাণ মিলবে। তাঁর প্রেমের কবিতাগুলোয় দুরন্ত নয়, সেগুলির সারা শরীরে নরম মায়া ও কুহেলি জড়িয়ে আছে।

গদ্য-কবিতাগুলো টানা লিখে গেছেন তিনি। খানিকটা নতুন ধরনের লাগে পড়তে। ফরাসি মেজাজের গন্ধ পাওয়া যায়।

সবচেয়ে যা ভালো তা হল সজল নিজের ঢঙে লিখতে চেষ্টা করেন।

অমিতাভ দাশগুপ্ত

স্বপ্নে উপকূলে। সজল বন্দ্যোপাধ্যায়। আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমি-টেড, কলকাতা-৯। প্রচ্ছদ [illegible]।

চিঠিপত্র

বরেণ্য উপন্যাস

বরেন গঙ্গোপাধ্যায়ের 'বনবিবির উপন্যাস' পড়লাম।

বর্তমানে শহরকেন্দ্রিক জীবন-জটিলতার অধিক সংখ্যক উপন্যাসের মুখ্য বিষয়বস্তু। এ সময় বরেনবাবু 'বনবিবির উপন্যাস' এক ভিন্ন রুচি ও ভিন্ন স্বাদের উপন্যাস।

শহর থেকে দূরে বঙ্গোপসাগর স্নাতনার হিংস্র জলচরপূর্ণ গভীর নদী-বেষ্টিত শ্বাপদসংকুল সুনিবিড় বৃহৎ শ্যামল অরণ্য সুন্দরী সুন্দরবন এই উপন্যাসের পটভূমি, দিগন্তব্যাপ্ত এই ভয়ংকর প্রকৃতি নিজেই এই উপন্যাসের প্রাণবায়ু ও অন্যতম চরিত্র।

উপন্যাসের মূল বিষয়বস্তুতে তিনটি প্রধান কাহিনী লক্ষ্য করা যায়।

প্রথম। সুন্দরবনের দুর্ভেদ্য বন কেটে আবাদ করার প্রয়াসে একদল জীবনতুচ্ছকারী দরিদ্র শ্রমজীবী মানুষের কাহিনী।

দ্বিতীয়। সেইপ্রাকৃতজনের কুসংস্কার ধর্মীয় অন্ধবিশ্বাস এবং যুক্তিহীন ভয় ও সন্দেহের কাহিনী।

তৃতীয়। ঊনবিংশ শতাব্দীর কলকাতার জমিদার শ্রেণীর প্রমোদ রীতি, সৌখিন বিলাসিতা এবং প্রভুসুলভ মানসিকতার কাহিনী।

এই তিন কাহিনী ঊনত্রিশটি পরিচ্ছেদে। আর এই গ্রন্থনার প্রদারূপ— 'বনবিবির উপন্যাস।'

একই সঙ্গে দুটি ঘটনা পাশাপাশি রেখে উপন্যাসের শুরু।

১। হিংস্র শ্বাপদের কবল থেকে মুক্ত রাখার জন্য সারারাত লেলিহান অগ্নিকুণ্ড জ্বালিয়ে রেখে একদল মানুষের অদ্ভুত রাত্রি যাপন।

২। রাত্রি-শেষে ভোরের রহস্যময় কুয়াশার ভেতর দিয়ে মৃত্যুপথযাত্রী এক মুমূর্ষু রোগিনীকে বহন করে আনা একটি অপরিচিত নৌকার তীরে আটকানো।

প্রথমটি কঠিন বাঁচার প্রয়াস। দ্বিতীয়টি আকস্মিক ঘটনামাত্র।

এই আকস্মিক ঘটনা নিঃসন্দেহে কৌতূহলী। যে কৌতূহল থেকে বন কাটা মানুষদের কুসংস্কারাচ্ছন্ন মনে এসেছে ধর্মীয় ভয় ও অন্ধবিশ্বাস। নিম্নশ্রেণী শ্রমজীবী অশিক্ষিত মানুষের সংস্কারাচ্ছন্ন মনে ধর্মীয় ভয় ও অন্ধবিশ্বাসের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকার কথা অস্বীকার করার নয় মোটেই। কিন্তু শুধু তাদের সেই কুসংস্কারাচ্ছন্ন মনের অবোধ গতি-প্রকৃতিতেই উপন্যাস ভরে উঠল কেন? বরেনবাবু সেই মুমূর্ষু রোগিনীকে 'বনবিবি' করে মূল জীবন সমস্যা থেকে নিরর্থক ধর্মীয় সমস্যায় সরে এসেছেন। যদিও এই 'বনবিবি'কে ঈশ্বরী থেকে মানবীতে ফিরিয়ে আনতে তিনি সচেষ্ট হয়েছিলেন, কিন্তু উপন্যাসের শেষে তাকেই আবার দুর্জ্ঞেয় ঐশ্বরিক জটিলতার কঠিন নির্মোকে ঢেকে ফেলেছেন।

স্বজন-পরিজন দূরে রেখে একদল শ্রমজীবী মানুষের সেই ভয়াল পরিবেশে মৃত্যুর কাছে জীবন পণ রেখে যে আয়াস-সাধ্য জীবন ধারণ উপন্যাসে সে কাহিনী মুখ্য হল না। অভাবী মানুষের শুধুমাত্র পেটের তাগিদে অজানা জায়গায় অচেনা পরিবেশে জীবন সংগ্রামের দুঃখ ও যন্ত্রণা, নিরাশা ও বেদনার সংঘবদ্ধ সঙ্গীতের গদ্যময় সুর প্রাধান্য পেল না। সুরের আভাস হয়ত কিছু আছে, কিন্তু সে সুর ধ্বনিময় মূর্ছনায় উৎকীর্ণ নয়। কাহিনী আশ্রয় নিয়েছে তাঁদের কুসংস্কার ও ধর্মীয় বিশ্বাসের অন্ধ শামিয়ানার নীচে। কিন্তু কেন? নিরক্ষর মানুষের অজ্ঞ, ধর্মবোধ প্রখর হলেও, উপন্যাসে সেটাই মস্তিষ্ক হয়ে উঠল কেন?

অষ্টাদশ শতাব্দীর শহর কলকাতার জমিদারবাবুর সুন্দরবনের বিস্তৃত নদীবক্ষে সুসজ্জিত সৌখিন তরীতে যৌনবিলাস কি উপন্যাসের প্রয়োজনে? অথচ সেই অংশেই নৌকো থেকে ঘুমন্ত কোন একজনকে বাঘে তুলে নিয়ে গেল, উপন্যাসে সেটা নিছক কয়েকটি পংক্তির বুদ্বুদ হয়ে মিলিয়ে গেল কেন? জমিদার মন স্বতন্ত্র। তিনি প্রমোদ তরীর মনোরম কক্ষের গবাক্ষপথে 'ঈশ্বরের খেটে খাওয়া মানুষদের' দিকে শুধু চোখের কারুণ্যই ছুঁড়ে দেন। কিন্তু সহকর্মীর এই রকম ভয়াবহ অকাল-মৃত্যুতে তাঁদের মনের প্রতিক্রিয়া এতই তরল কেন?

উপন্যাসে লক্ষ্মণের মৃত্যুটি বড় ভয়ংকর বাস্তব। এই পর্বে সব মানুষের মিলিত ক্রোধের এমন প্রচণ্ড বিস্ফোরণ তাদেরই প্রতিশোধ স্পৃহা তাজা রক্তের সত্যকার রূপ। বরেনবাবু এজন্য বলাবাহুল্য, প্রশংসনীয়। তপতী মোদক। ১১, শিবপুর রোড, শিবপুর হাওড়া।

ছন্দের বারান্দায়

২রা অগ্রহায়ণ, ১৩৮৪, তারিখের অমৃত পত্রিকার 'বিচিত্রা' বিভাগে কৃষ্ণলাল মুখোপাধ্যায় গৃহীত ছান্দসিক অমূল্যধন মুখোপাধ্যায়ের সাক্ষাৎকারটি পাঠ করে গভীর আনন্দ পেলাম। অমৃত পত্রিকার অন্যান্য অভিনব সাংস্কৃতিক-সংযোজনের সঙ্গে মনীষী ব্যক্তিত্বের অন্তরঙ্গ সাক্ষাৎকার তুলে ধরার প্রয়াসও আমার মত আরও অনেকেরই নিশ্চয়ই ভাল লেগেছে। শ্রীযুক্ত অমূল্যধন ছান্দসিকই নন, — বাংলা তথা ভারতীয় সংস্কৃতি জগতের ঐতিহ্যবাহী বহুমুখী প্রতিভাবান পুরুষ এবং আজকের যুগে সর্বোত্ত এক অদ্ভুত মানুষ। তাই বয়স এবং কর্মের চাপকে উপেক্ষা করে তিনি অবারিত গতিতে যে কোন জানা বা অচেনা মানুষেরও ছন্দ এবং অন্যান্য নানা বিষয়ে কৌতূহলের নিরসন করেন। চিঠি লিখলে তৎক্ষণাৎ উত্তর পাওয়া যায়। বেশ কয়েক বছর আগে ডিগ্রী পরীক্ষার প্রশ্নপত্রে ছন্দোলিপিঘটিত একটি প্রশ্নে রবীন্দ্রনাথের একটি ছড়ার অংশবিশেষের ছন্দোবিশ্লেষণ-প্রসঙ্গে আলোচনায় আমি এবং আমার কয়েক-জন তরুণ শিক্ষকবন্ধু গদ্যাংশটি ছন্দের জাতি বিচারে একমত হতে পারি নি,—এবং আমার ধারণার কথা জানিয়ে আনুষঙ্গিক সমস্যার উল্লেখ করে শ্রীযুক্ত মুখোপাধ্যায়কে একটি চিঠি দিই। তাঁর সঙ্গে পত্রযোগে বা সাক্ষাতে আমার কোন পরিচয় ছিল না। সপ্তাহ কালের মধ্যেই তাঁর মুক্তোর মত হস্তাক্ষরে নিম্নলিখিত চিঠিখানি পেয়েছিলাম।

১২৮।২০ হাজরা রোড,
কলিকাতা-২৬

প্রীতিভাজনেষু,

নানাভাবে ব্যস্ত থাকায় তোমার ৩।৪।৬৭ তারিখের পত্রের উত্তর দিতে বিলম্ব হইল। তোমার সিদ্ধান্তই যথার্থ। কবিতাটি ৮+৭ এই সূত্রে লিখিত।

চিনে বাজারের থেকে।
এনো তো [illegible]—৮+৭
কাঁকড়ার ডিম চাই।
চাই যে [illegible]—৮+৭
না হয় খরচা হবে।
মাথা হবে হেঁট কি ?—৮+৭
অল্পেতে খুশি হবে।
দামোদর শেঠ কি ?—৮+৭

চতুর্থ পংক্তিতে অল্প দীর্ঘ। এরূপ দীর্ঘায়নের অনেক দৃষ্টান্ত বাংলা ছন্দের মূল সূত্রে আছে।

ছড়া মাত্রেই ছড়ার ছন্দে লিখিত হয় না। আবার, ছড়া ছাড়া অন্য জাতীয় কাব্যও ছড়ার ছন্দে লেখা যায়। উদাহরণ—খেয়া, পলাতকা ইত্যাদি।

ইতি [illegible]।
শুভার্থী
শ্রীঅমূল্যধন মুখোপাধ্যায়

অপরিসীম ব্যস্ততার মধ্যেও যিনি দূরের সম্পূর্ণ অপরিচিত একজন ছন্দো-শিক্ষার্থীর মনকে এইভাবে আলোকিত করে তুলতে চান, তিনি কেবল বাংলা ছন্দের মূল সূত্রের বিজ্ঞানমনস্ক ব্যাখ্যাতাই নন, সর্বাঙ্গীণ মনুষ্যত্ববোধেরও একজন শ্রেষ্ঠ রূপকার। কমলেশ চট্টোপাধ্যায়, নতুনপল্লী, বর্ধমান।

ধন্যবাদ অমলবাবু

কবিতা সহৃদয় হৃদয় সংবেদ্য—বলা হয়। সহৃদয় বলাতে বদান্য নয় নিশ্চয়। পাঠক মন মানুক বা না মানুক কবিতাকে ভাল বলবেন ভয় পেয়ে—এর কোন মানে নেই। রবীন্দ্রনাথ আর অন্য যে কেউ-এর পার্থক্য প্রতিভাগত, ইনটুইশান-গত, একথা বলে বোঝান অসম্ভব। মনে হয় অমলবাবু

মুখোপাধ্যায় এসব ভেবেই মেজাজ খারাপ হয়ে যাওয়াতে মৌচাকে খোঁচা মেরেছেন। তা না হলে এমন চিঠিবাজী শুরু হবে কেন? কবিরাই সব জানেন, পাঠক-সমালোচক কিছুই না এ কথা কে বলেছে? বা মানতে রাজী। ব্যাকরণ ভাঙবার আগে অধিকারী হতে হয়—রবীন্দ্রনাথ কল্যাণী বা গোঠ শব্দের যখন তাৎক্ষণিক পাল্টে দেন, তখন ব্যাকরণের প্রশ্ন অবান্তর; জীবনানন্দ ধান-সিঁড়ি, জলসিঁড়ি যখন লেখেন তখন অভিধান দেখার দরকার পড়ে না—এঁরা তা করতে পারেন—অধিকারী বলেই, আর যতি মুখোপাধ্যায় যখন লেখেন থনক ছিল সবার হাতে.. সাথে সাথেই মেজাজ খিঁচড়ে যায়। অমলবাবুকে ধন্যবাদ। অচিন্ত্য বিশ্বাস, বর্ধমান, গোলাপবাগ, রবীন্দ্র ছাত্রাবাস।

কবিতা কে বোঝে ?

অমৃত পত্রিকার ২৬ আগস্ট সংখ্যায় আমি দুটি কবিতার বইয়ের সমালোচনা করেছিলাম। সেই সমালোচনার বিপক্ষে গত ১৯ নভেম্বর সংখ্যায় যে চিঠিগুলি প্রকাশ করেছেন, সেই জন্য আপনাকে অশেষ ধন্যবাদ। এই প্রসঙ্গে আমার দুটি কতক বক্তব্য যদি প্রকাশ করেন, বাধিত হব।

পত্র লেখকদের জবাবটা একটা প্রশ্ন দিয়েই শুরু করা যাক। প্রশ্নটা হল : কবিতা কে বোঝে? প্রকাশিত পত্রের লেখকরা অবশ্য প্রত্যক্ষে ও প্রকারান্তরে মন্তব্য করেছেন, আমি বুঝি না এবং ওঁরা নিশ্চয় বোঝেন। আবার অন্য একজন পত্রলেখক বিপরীত রকম দাবী করতে পারে। বলা এবং দাবী করার উপর যখন উনিশ, নেই—আর এক-জন বলে বসতে পারেন, তুমি শব্দের লেখাপড়া শেখ নি—তুমি কিছুই বোঝ না—আমি রসিক ও পণ্ডিত—এটা আমার বিষয়, কবিতা আমি বুঝি—তাহলে পাঠক মানবে কেন? এই ধরনের দাবী ও প্রতিদাবী কবিতা বিচারের ক্ষেত্রে অনেককাল চলে আসছে। এর মীমাংসা খুবই দুঃসাধ্য।

তবে বর্তমান ক্ষেত্রে, ভরসা এই, একটা মীমাংসা আগেই হয়ে আছে। সেটা আপনার দেওয়া মীমাংসা। অর্থাৎ আপনি আমাকে দুটি কবিতার বই আলোচনা করতে দিয়ে সচেতন বা অসচেতনভাবে এই স্বীকৃতি দিয়েছেন যে, হয়তো আমি কবিতাটি বুঝি। এখন অবশ্য, ভুলটা বুঝে, আপনি আমার ওপর থেকে অর্পিত সম্মান প্রত্যাহার করে নিতে পারেন। আবার নতুন করে কবিতার বই পাঠিয়ে (সমালোচনার জন্য) সম্মানও জানাতে পারেন। সে আপনার বিচার। কিন্তু আমার বিচারে না পাঠানোই ভাল।

এবার আমি পাঠকদের চিঠি না আলোচনার জবাব দেবার চেষ্টা করছি। (১) 'সরল বর্গীয় বৃক্ষ' কথাটির মানে হল 'যে গাছ সোজা উঠে যায়' সেই জাতীয় গাছ। কিন্তু শব্দটির ব্যবহারগত অনুষঙ্গ একটু অন্য রকমের। এই শব্দগুচ্ছ উদ্ভিদের একটি বহু ব্যবহৃত পারিভাষিক শব্দ। 'সরল বর্গীয় বৃক্ষ'-এর প্রান্তর বোঝাতে বৃক্ষের শব্দ বিচারণের জন্য অভিধেয় বোঝায়।

আমার আপত্তি ছিল কাব্যগ্রন্থের অর্থহীন একটি নামে। নামটি লক্ষ করুন। 'সরল বর্গীয় স্বচ্ছ উদ্ভিদ।' মানে করলে দাঁড়ায় 'সরল জাতীয় সরল বৃক্ষ।' না, ঠিক তাও না; উদ্ভিদ বললে তো শুধুমাত্র বৃক্ষকে বোঝায় না—তৃণ, লতা, বল্লী, গুল্ম — সবগুলোকে বোঝাবে। আর প্রকৃতিতে তৃণ ছাড়া আর কোনটাকেই সরল, সোজা বা অবক্র বলা যায় না। তাহলে মানে দাঁড়াল কি? সরল জাতীয় সরল বৃক্ষ লতা গুল্ম বল্লী ও তৃণ। অর্থাৎ নামের মধ্যে না আছে কবিত্ব না আছে অর্থ।

এই প্রসঙ্গে একজন পাঠিকা আমার সঙ্গে শব্দার্থ বিষয়ে ভিন্নমত পোষণ করেছেন। তিনি বলেছেন, স্বচ্ছ মানে নাকি 'সুন্দর।' কোন অভিধানে পেয়েছেন জানি না, দায়িত্ব নিয়ে বলছি, সেই অভিধানের ওই অংশ ভুল আছে। এই ভুল অর্থ ব্যবহার করেও কিন্তু ভদ্র মহিলা কাব্যগ্রন্থের নামটি যথার্থ সমালোচকের হাত থেকে বাঁচাতে পারছেন না। ধরে নিলাম তাঁর বিশ্লেষিত অর্থটাই ঠিক। তিনি কি বলছেন? তিনি বলছেন কাব্যগ্রন্থের নামটির মানে হল, 'সোজা সজাতীয় সুন্দর উদ্ভিদ।' কিছু বুঝতে পারলেন? পারলে, জানবেন আমি ভুল করেছি। না-পারলে জানবেন পদ্মবনে মত্ত হস্তী ঢুকে পড়েছে।

(২) সামসুল হকের কবিতার লাইনটির প্রথমাংশে ছিল, 'বঁধে যা ফুলের স্বেদ স্বপ্ন ক্ষেতে।' এই একটা জায়গায় সত্যি আমি আমার অক্ষমতা প্রকাশ করছি। ফুলের যে ঘাম হয় ইতিপূর্বে আমি তা জানতাম না। একজন পত্রলেখক সাহায্য করাতে এখন জলের মত বুঝতে পারছি। কবি ফুলের ঘামকে স্বপ্নের ক্ষেত দিয়ে বয়ে যেতে বলেছেন এবং ঐ একটি পংক্তিতে 'স্বেদ-জল' দিয়ে 'সমাজ বপন' করতে চেয়েছেন। এমন সমাজ, পরের পংক্তিতে বলেছেন, যে সমাজের প্রহরায় থাকবে 'কিশোরীর ভুল-ভাল, কবিতার ভুল ছন্দ।' এর পর আমার আর কিছু বলবার নেই।

(৩) একজন কবি আদৌ কবি কিনা—সেই আলোচনায় জীবনানন্দ দাসকে টেনে আনা হয়েছে দেখে বড় দুঃখ পেলাম। আবার সুখ পেলাম এই কৌতুকের কথা মনে করে যে, ঐ জীবনানন্দ দাসই আমাদের শিখিয়ে গিয়েছেন, সকলেই কবি নয়, কেউ কেউ কবি। জীবনানন্দ যেখানে 'বুড়ি চাঁদ' বলেছেন সেখানে পূর্বাপর প্রস্তুতি আছে। তাছাড়া আরও সহজ ব্যাখ্যা তো আছেই। চাঁদের মধ্যে এক বুড়ি বসে আছে। সে অনেক কাল ধরে চরকায় সুতো কেটে চলেছে। এটা বাংলাদেশের ক্যাপ টু-র ছেলেরাও জানে। চাঁদের এই বুড়ির সঙ্গে চাঁদকে অভিন্ন কল্পনা করলে, কল্পনার সঙ্গতির কোন হানি হয় না—আর সেই সুবাদে 'বুড়ি চাঁদ' বললে লিঙ্গ দোষও ঘটে না।

কল্পনায় অসঙ্গতির দৃষ্টান্ত দিতে গিয়ে সুকান্ত ভট্টাচার্যের 'পূর্ণিমা চাঁদ' যেন ঝলসানো রুটি' প্রসঙ্গ একজন তুলেছেন। আমি হলফ করে বলতে পারি যে, সাধারণ ধর্মের দিক থেকে এমন নির্দোষ উপমা বিশ্বসাহিত্যে খুব কম আছে।

এর পাশে সামসুল হকের 'স্বেদের হ্রদ' অর্থাৎ টপ টপ করে ঘাম জমে একটা হ্রদ তৈরী হয়ে গেল—এটা ভাবতে আমার গা শিউরে উঠছে।

শ্রীমতী লোপামুদ্রা করের মন্তব্যের মধ্যে অতিপ্রাথমিক স্তরের 'ফেল্লাসি'-গত ভুল আছে। ভাষাতত্ত্ববিদ বা বৈয়াকরণ হলেই যে ভাল সমালোচক হবে তা নয়। কিন্তু ভাল সমালোচক হতে হলে তাকে ভাষা ও ব্যাকরণের ব্যাপারটা জানতেই হবে। অর্থাৎ শব্দ, শব্দের অর্থ, শব্দের ব্যবহার, শব্দ সৃষ্টির রহস্য—যা কিনা সম্পূর্ণত ব্যাকরণ শাস্ত্রের অন্তর্গত। আর ভাষা ব্যাপারটা তো কারও নিজস্ব সম্পত্তি নয় যে তা নিয়ে যা খুশী তাই করবেন। যেহেতু ভাষা জাতীয় সম্পত্তি তার ব্যবহারের নিয়ম-কানুন মেনে অনুশীলন ও চর্চা করতে হবে। তবে হ্যাঁ, যদি কোন লেখক এই অনুশীলন ও চর্চাব্যপদেশে ভাষার প্রাণের মানুষ হয়ে ওঠেন—একমাত্র তখনই তিনি কিছু স্বাধীনতা নিলে মানুষ তা মেনে নেয়। যেমন মধুসূদন, রবীন্দ্রনাথ, জীবনানন্দের ক্ষেত্রে হয়েছে। তাই বলে রাম শ্যাম যদু মধু—মধুসূদন রবীন্দ্রনাথ ও জীবনানন্দের দৃষ্টান্ত দিয়ে যা-খুশী তাই করে যাবে—তা তো হতে পারে না। এখন সময়টা খুব খারাপ পড়েছে, তাই অনেক কিছু হয়ে যাচ্ছে।

একজন পত্রলেখকের নরম হৃদয় আমার কবিতা ব্যাখ্যার না-বালকত্ব দেখে যেখানে হায় হায় করে উঠেছে সেখানে উনি একটা কারচুপি করেছেন। সামসুল হকের প্রথম কবিতাটিতে, সভ্যতার বিকাশে মানুষের শ্রম ও মেধার সঙ্গে স্বপ্ন ও স্মৃতির কোন বিরোধিতা তিনি দেখতে পান নি। আমিও দেখি না। কিন্তু কারচুপি কোথায় জানেন? যে ডানা ঝটপট 'দেবদূত'-এর পিঠে চাপিয়ে সামসুল স্বপ্ন ও স্মৃতিকে মর্তে এনেছেন তাদের কথা বেমালুম চেপে গেছেন।

হ্যাঁ, আমিও স্বীকার করছি, সভ্যতার বিবর্তনে মানুষের শ্রম থেকে মেধার বিকাশ ঘটেছে—স্বপ্ন সেই মেধা ও শ্রমকে গতি দিয়েছে—আর স্মৃতি করেছে উদ্বেলিত এগিয়ে যেতে। তারই ফলশ্রুতিতে সভ্যতা আজ এখানে এসে পৌঁছেছে। মানুষ আজ শুধুই সৃষ্টির মহত্তম প্রাণী নয়—সৃষ্টির বৃহত্তম বিস্ময়। এটুকুই মানুষের অহংকার। এর মধ্যে দেবদূত-ফেবদূত এলেই একেবারে মাটি। যাকে বলে হিন্দী সিনেমা। অমল মুখোপাধ্যায়।

অচেনা সুভাষ

১৯৩২ সালের অকটোবর মাস।

জব্বলপুর জেলে বন্দী অবস্থায় গুরুতর অসুস্থ হয়ে — , তদানীন্তন ইংরাজ রাজশক্তি সুভাষচন্দ্র বসুকে চিকিৎসার জন্য পাঠিয়ে দিল উত্তর-প্রদেশের ভাওয়ালীস্থ 'কিং এডোয়ার্ড স্যানাটোরিয়ামে'। তাঁর স্বাস্থ্যের গতি ক্রমশই অবনতির দিকে। আত্মীয়-স্বজন এবং অগণিত দেশবাসীর উদ্বেগ ও উৎকণ্ঠা দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। এমনই সময়ে, উচ্চ-শিক্ষার্থে ইউরোপ গমনদ্যোত জনৈক ছাত্রকে লেখা দীর্ঘ এক চিঠির এক স্থানে সুভাষচন্দ্র লিখেছিলেন :

'সকল ভারতীয়ের সঙ্গে তোমারও অবশ্যই স্মরণ রাখা কর্তব্য যে বিদেশে অবস্থানকালে প্রত্যেক ভারতবাসী হচ্ছে সে দেশে ভারতবর্ষের বে-সরকারী দূত। একজন ভারতীয় বিদেশীদের মনে যেমনটি ছাপ রাখতে পারবেন, তা দিয়েই কিন্তু বিদেশীরা গোটা ভারত ও ভারতবাসীকে বিচার করবে।'

(২৭-১০-১৯৩২)

হাল্-আমলের পাঠকরা জানেন, আমাদের দেশে, বয়ো-জ্যেষ্ঠ, গুরুজন আর নেতৃবৃন্দ উপদেশ (জ্ঞান ?) দেবার সুযোগ পেলে ভাল ভাল কথা বলতে এতটুকু কার্পণ্য করেন না। অতএব, একথা মনে করা স্বাভাবিক যে সুভাষচন্দ্র নিছক কথার কথা হিসাবেই উপরোক্ত পংক্তি ক'টি লিখেছিলেন। কিন্তু সুভাষ-চন্দ্রের ১৯৩৩-৩৭ সালের ইউরোপের প্রবাস-জীবনের বিস্তৃত ঘটনাবলী প্রমাণ করে, ঐ পত্রে যে কথা বলা হয়েছিল বিদেশে থাকার সময় নিজের জীবনে তার প্রতিটি কথা সুভাষচন্দ্র অক্ষরে অক্ষরে পালনে ব্রতী ছিলেন।

১৯৩৩ সালের মার্চ মাসে রীতিমত অসুস্থ অবস্থায় তিনি ইওরোপে পৌঁছলেন। বিশেষজ্ঞ এবং চিকিৎসকদের সঙ্গে যোগাযোগ, পরামর্শ, স্বাস্থ্য-পরীক্ষা করান এবং উপযুক্ত চিকিৎসার ব্যাপারে ব্যস্ত থাকলেও দেশ ও জাতির মুক্তি সংগ্রামের পক্ষে প্রচার এবং বিভিন্ন ইওরোপীয় রাষ্ট্র, রাষ্ট্রনায়ক, রাজনৈতিক দল ও নেতৃবৃন্দের সহানুভূতি ও সমর্থন পাবার চেষ্টায় তিনি অক্লান্ত পরিশ্রম করে চলেন। চিকিৎসকদের পরামর্শ ও আপত্তি উপেক্ষা করে তিনি পরিভ্রমণ করতে থাকেন মহাদেশের এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত।

সুভাষচন্দ্রের বয়স তখন মাত্র ছত্রিশ। ভারতবর্ষ কেন, জাতীয় কংগ্রেস দলেরও প্রথম সারির নেতা হিসাবে তখনও কিন্তু স্বীকৃতি লাভ করেন নি। তবুও পরাধীন ভারতের বে-সরকারী দূতের দায়িত্ব নিজ কাঁধে তুলে নিয়ে সুভাষচন্দ্র আলাপ-আলোচনায় বসেছিলেন ইটালীর তদানীন্তন কর্ণধার, মুসোলিনী, আয়ারল্যাণ্ডের রাষ্ট্রপ্রধান ডি ভ্যালেরা, চেকোশ্লোভাকিয়ার পররাষ্ট্রমন্ত্রী বেনেস্, জার্মানীর অর্থনীতি বিষয়ক মন্ত্রী স্পীত্ত প্রমুখ অন্যান্য সমসাময়িক ইওরোপীয় রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বের সঙ্গে। তিনি সাক্ষাৎ করেছিলেন ফরাসী মনীষী রম্যাঁ রোলাঁ, চেকোশ্লোভাকিয়ার পণ্ডিতপ্রবর অধ্যাপক লেসনী, ইটালীর অধ্যাপক তুচ্চি প্রভৃতির সঙ্গে। পরিদর্শন করেছিলেন অস্ট্রিয়া, জার্মানী, পোল্যাণ্ড, চেকোশ্লোভাকিয়া, বুলগেরিয়া, ইটালী প্রভৃতির বড় বড় শিল্প কারখানা। কথা বলেছিলেন ভারতীয় ছাত্র-যুবকদের কারিগরী ট্রেনিং দেবার বিষয়ে। আর, দেশের দুঃখ-দুর্দশা, বিদেশী শাসকদের অত্যাচারের কাহিনী এবং ভারতের চিরন্তন-বাণী প্রচার করেছিলেন বিভিন্ন সভা, সমিতি ও সংবাদপত্রের মাধ্যমে।

স্বাস্থ্যভঙ্গ ও অকল্পনীয় ব্যস্ততার দৈনন্দিন কর্মসূচীর মধ্যেও কিন্তু বে-সরকারী দূতের আরও যে দুটি ব্যাপারে অত্যন্ত সজাগ দৃষ্টি থাকতো, তা হলো (এক) ভারত বা ভারতবাসী সম্পর্কে বিদেশে কারা, কোথায় বা কোন্ কাগজে কি বলছে এবং (দুই) বিদেশে স্বদেশবাসী কেউ কোন বিপদ বা অসুবিধার মধ্যে পড়লো কিনা। প্রথমক্ষেত্রে, কাগজে প্রকাশিত সংবাদ প্রভৃতি যতদূর সম্ভব তিনি সংগ্রহ করতেন এবং প্রয়োজনে প্রতিবাদের চেষ্টা করতেন।

দ্বিতীয় ক্ষেত্রে, স্বদেশবাসীকে সাহায্য করতে এগিয়ে আসতেন নিজের সর্বকিছু বাধা-বিপত্তি, এমন কি শারীরিক অক্ষমতাকে পর্যন্ত উপেক্ষা করে। অথচ এমন কাজ বা ব্যবহার, স্বাধীন ভারতের এক-একটি রাষ্ট্রীয় বা সরকারী দূত দূরে থাকুন, দূতাবাসের ভারপ্রাপ্ত কর্মচারীদের কাছ থেকে আজ আমরা আশা করতে পারি কি?

আলোচ্য প্রসঙ্গ আপাততঃ শেষ করা যাক, ১৯৩৩ সালের ৫ই এপ্রিল (অর্থাৎ ভিয়েনা পৌঁছবার ২৮ দিনের মধ্যেই) জার্মানীর মিউনিখ শহরে তাঁর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতুষ্পুত্র শ্রীঅশোকনাথ বসুকে লেখা এক পত্রের কিছু অংশ উদ্ধৃত করে :

নাৎসিদের একটা কাগজ এখান থেকে প্রকাশিত হয়। আমি একটা চিঠি ওদের কাগজে ১।২ দিনের মধ্যে পাঠাব মনে করছি। তাতে আমি এই কথা লিখবো—যে ইংরাজী খবরের কাগজ ও ইংরাজ সাংবাদিকেরা জার্মানীর অবস্থা নিয়ে খুব হৈ চৈ করছে কিন্তু ইংরাজ গভর্নমেন্ট যখন ভারতবর্ষে অত্যাচার করে তখন তো তারা কিছু বলে না। আমি জানি না তারা ছাপবে কিনা। তুমি কি কোন লোককে জান যিনি ঐ কাগজের লোকেদের বলে দিতে পারেন ছাপবার জন্য? যদি জান—তাদের বলে রাখতে পার। আমি ২।৩ দিনের মধ্যে জার্মান ভাষায় চিঠি লিখে পাঠাব

শক্তিব্রত ঘোষ

তথাগত চক্রবর্তী

বাবা আলাউদ্দিন

এক

[illegible] বয়সকে যেও সে রাস্তা দিয়ে চলতে চলতে। শিবমন্দিরের কীর্তন শুনতে গিয়ে যে পাঠশালায় কোনদিন যাওয়াই হত না। বাবার হাতে মার খেয়ে মাত্র আট বছর বয়সে গানের টানে মায়ের বাকস ভেঙে পালিয়ে গিয়েছিল বাড়ী থেকে। গানের টানে সে এসেছিল শেষ পর্যন্ত কোলকাতায়। কোলকাতা শহরের কলের জল আর এক-বেলা দানসত্রের ভাত খেয়ে পাথুরে রাস্তার বুক বেয়ে টলোমলো পায়ে বালক আলম পৌঁছে গিয়েছিল বিডন স্ট্রীটের ক্ষেত্র ডাক্তার এর বারান্দায়। সেই শুরু। জীবনের উপান্তে পৌঁছিয়ে সেই আলম যখন মহাসাধক আলাউদ্দিনে রূপান্তরিত, চোখের জলের ধারা সেঁকনও হয়ে গেছে অঝোরধারে গভীর বেদনায় বুকের থেকে শুধু কথা বেরিয়ে এসেছে— 'কতো চেষ্টা করলেম, সারা জীবন সাধনা করলেম, কিন্তু কই সুর-কে তো পেলেম না?

আশ্চর্য আর সাধনা দিয়ে গড়া সে মহাসাধকের সিদ্ধি কত হয়েছিল তা জানি না, তবে শিষ্যের মধ্য দিয়ে যদি গুরুর সিদ্ধি, তবে তা হয়তো তাঁর জীবনে ঘটে গেছে। একটি শতাব্দীর সাক্ষী, সুরলোকের পূজারী আলাউদ্দিনের পূর্ণাঙ্গ জীবনকাহিনী রচনা করা দুরূহ। বিভিন্ন সময় বিভিন্নজনকে আত্মজীবনের কাহিনী বলতে গিয়ে নানান কথা বলেছেন তার কতক বা হদিশ পাওয়া যায়—কিছু থেকে যায় অজ্ঞাত।

অনেকদিন আগে —সে চল্লিশ দশকের গোড়ায়, আলাউদ্দিন একবার জীবনকাহিনী বলতে শুরু করেন। সেই আত্মকথনের গোড়ার দিকের কিছু লিপিবদ্ধ অংশ পাওয়া গেছে। এই লেখায় অধুনা প্রচলিত অনেক ধারণা বা তথ্যের সঙ্গে তার মিল নাও থাকতে পারে। তবে এই অংশটি সরাসরি সঙ্গীতাচার্যের মুখ থেকে অনুলিখিত এবং দুঃখজনকভাবে অসমাপ্ত। অনুলেখক ছিলেন—তাঁর এক নাতি—দুর্গাপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়। এই দুর্গাপ্রসাদের সঙ্গে—আলাউদ্দিনের অন্তরঙ্গতা সম্পর্কে এই নিবন্ধ পরে উল্লেখ করছি। তার আগে আলাউদ্দিনের আত্মজীবনীর প্রথম অংশ যেটুকু উদ্ধার করা গেছে, তা নিবেদন করছি।

মাইহারে থাকাকালীন আলাউদ্দিন— ৬ ফেব্রুয়ারী ১৯৫২ সালে এই আত্মকথন শুরু করেন। (উল্লেখ্য এই আত্মকথনের প্রথমাংশ—প্রথমপুরুষে লেখা এবং কিছু পরে উত্তমপুরুষে লিপিবদ্ধ আছে।

—দীননাথ দেব— সংসারের পর সাধু হন—জমিদারী অত্যাচার (এবং) প্রজাপীড়নাদি দেখে ত্রিপুরার গভীর জঙ্গলে স্বামী আশ্রমে করে সাধনা করতে শুরু করেন। পাহাড়ীরা তাঁর কাছে আসত এবং আসতে আসতে তাঁর কাছে দীক্ষা নেয়। শিষ্য সামন্তদের দারিদ্র্য তাঁকে তাদের প্রতিপালন করবার কথা ভাবায়। উপায় ঠিক করিয়া (তিনি তাঁর) বলবান শিষ্যদের বলেন—'প্রজাপীড়ন জমিদারদের নষ্ট করে। সম্পদে গরীবদের দান কর ও তোমরাও প্রতিপালিত হও। কন্যাদায় [গ্রস্ত] ও বুভুক্ষুদের অন্নদান ও ঐ লুটের পয়সায় করতে থাকেন। সাহায্যপুষ্ট গরীবরা তাঁহাকে দেবতার ন্যায় জ্ঞান করিত এবং খোদা বলিয়া তাঁহার নিকট দীক্ষা নিত। হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে তাঁর শিষ্য ছিল। ইংরাজ অধিকারের পর শ্রীহট্টে এক ভীষণ কৃপণের (ব্রাহ্মণ- বাড়ি লুট করিতে যান। আগে চিঠি দেন ও পরে যান। চিঠিতে ৫০,০০০ টাকার দাবী অনাথায় লুটের হুমকী ছিল। তাঁরা গিয়ে দেখেন যে ঐ বাড়িতে কেউ নেই। কেবল একটি ছোট মেয়ে আছে। এই [ব্রাহ্মণ কন্যাকে নিয়ে তিনি] ফিরে আসেন ও পালন করেন। সুন্দর শিক্ষা-দীক্ষা প্রাপ্ত করে (সংস্কৃত-বাংলা) মন্দিরের সমস্ত পূজাদি কার্যে তিনি সাহায্য করতে থাকেন। [দীননাথ] দেবের একটি ছেলে (২— এই ছেলের সাথে এই ব্রাহ্মণকন্যার বিবাহ হয়—তারপরে তিনি আদেশ দেন যে তোমরা মুসলমান হয়ে সংসার কর—ডাকাতি ছেড়ে দাও। ইংরাজদের সঙ্গে তোমরা পারিয়া উঠিবে না। মোলগাম-শিবপুরের কাছে তাঁরা বাস করতে শুরু করেন। তাঁর দুই (৩) ছেলে আলি ও শাহী মহম্মদ এবং সিরাজ। শাহী মহম্মদ এর প্রপিতামহ। এঁর ছেলে মাদার হোসেন। মাদার হোসেন-এর সঙ্গে এই ব্রাহ্মণকন্যার বিবাহ [দেওয়া হয়]। পরে গভর্ণমেন্ট খোঁজ করে তাঁকে ডাকাতের সন্তান সাব্যস্ত করে জেল দেন। তাঁর কারাবাসের সময় জেল থেকে ছুটি

লেখকের নিবেদন

[আকস্মিক যোগাযোগে ওস্তাদ আলাউদ্দিন খানের হাতে লেখা কয়েকটি চিঠি এবং আত্মজীবনীর কিছু অংশ উদ্ধার করি। আত্মজীবনী-র অনুলেখক দুর্গাপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় এই মহাসাধকের (নাতি) সান্নিধ্যে দীর্ঘ ছয় মাস মাইহারে ছিলেন এবং সেই সময় আলাউদ্দীন নিজের জীবন-কাহিনী বলতে শুরু করেন। দুর্গাপ্রসাদের মুখ থেকে শোনা নানান ঘটনা, চিঠিপত্র, ছবি এবং জীবনী-র জন্য তাঁর কাছে বিশেষ ঋণী। সংকলক হিসাবে এ নিবন্ধের দায়ভার আমার নিজের।

মাটিতে বসে—একদম ডানদিকে সরোদশিল্পী হুলোদ সেন। চেয়ারে বসে—বাঁদিক থেকে পণ্ডিত রবিশংকর, হীরেন্দ্রকুমার গঙ্গোপাধ্যায়, ওস্তাদ আলাউদ্দিন খান এবং ওস্তাদ আলি আকবর খান। উপরে দাঁড়িয়ে—বাঁদিক থেকে তৃতীয় দুর্গাপ্রসাদের পিতৃদেব, চতুর্থ বেহালাশিল্পী কেরকার এবং গোকুল ভট্টাচার্য।

নিয়ে মাসে এক সপ্তাহ বাড়িতে থাকতে পারতেন। জেল হওয়ার সময় এরা ঠাকুর্দা যখন জেলখানায় তখন একটি পুত্র সন্তান প্রসব করিয়া মারা যান। ইহার পূর্বে তাঁহার দুটি কন্যা হয়—তখন ইঁহারা শিবপুরে থাকতেন। সেখান হইতে ইহার পিতা, শ্রীসদর বড় হওয়ার (৪।৫ বৎসরের) পর দাক্ষিণাগ্রাম বীরঘরে একজন, সদু মিঞা তাঁকে প্রতিপালন করেন। ইনি অতি সঙ্গতিসম্পন্ন। লেখাপড়া ও সঙ্গীত (তবলা, সারেঙ্গী, সেতার, বেহালা) শিক্ষা দেন (ওস্তাদ রেখে) সদুর তিন মেয়ে। বড় মেয়ের সাথে শ্রীসদরের বিবাহ হয়। ইঁহার মাতার নাম সুন্দরী। বিবাহের পর তিনি শিবপুর চলিয়া আসেন। ইঁহারা পাঁচ ভাই ও দুই বোন। বড় বোন শ্রীমতী মধু, দাদা সমীরুদ্দিন, আপ্তাবুদ্দিন আলাউদ্দিন, কাবেজান, নায়েব আলি ও হায়েৎ আলি। পিতার সম্পত্তিসমূহকে ডাকাতি অর্জিত বলে ঘৃণা করতেন।

'— তিনি ত্রিপুরার মহারাজ বীরেন্দ্র মাণিক্য বাহাদুরের গুরু কাশিম আলি খাঁ (মদীয় ওস্তাদ উজীর খাঁ সাহেবের মামা) তিনি ভারতের শ্রেষ্ঠ রবাবী ছিলেন। তাঁর নিকটে আমার পিতা শুধু তাঁহার বাদন শুনিতেন, শিখিতেন না। মা কোনক্রমে আমাদের প্রতিপালন করিতেন। একদিন কাশী আলি বাবাকে জিজ্ঞাসা করেন তুমি সঙ্গীত কিছু জান কি যে তুমি শোন। তিনি উত্তর দেন—কিছু জানি। কিন্তু আপনার বাজনা আমায় মুগ্ধ করে, আমি পাগল হইয়া যাই। ইচ্ছা হয় সদাই আপনার কাছে থাকি।'

'—তুমি আমার কাছে শিক্ষা কর। তুমি কি শিখিয়াছ?'

'—সেতার?'

—'সেতারই শিক্ষা কর।'

'তাঁর কাছে [বাবা] কিছু গৎ শিক্ষা করিয়াছিলেন। বাবা বাড়ি আসিয়া আমার দাদা আপ্তাবুদ্দিনকে [শেখাবার জন্য] (৪) ওস্তাদ রামকানাই শীলকে রাখিয়া মৃদঙ্গ তবলা এসরাজ গান শিক্ষা দিতে আরম্ভ করেন। আমার বয়স দেড় বা দুই—গান শুনে আমি মার বুকেই শুয়েতে তবলার ঠেকা বাজাইতাম—তারপর কিছু বড় হয়ে বাবার (৪'৫) [চার পাঁচ বৎসর বয়সে] গৎ—দাদার তবলার, মৃদঙ্গের বুলি আমার কণ্ঠস্থ হইয়া যায়। দেশে পাঠশালা ছিল, রোজ পড়িতে যাইতাম কিন্তু পড়াতে মন লাগিত [না] বলিয়া গান-বাজনার কথা চিন্তা করিতাম। পাড়াগাঁয়ে যেখানে গান-বাজনা হত পাঠশালা যাওয়া বন্ধ করে শুনতাম। মাস্টারমহাশয় বাড়ি আসিয়া বলিয়া দিলেন, 'তোমার ছেলে পাঠশালায় যায় না কোথায় যায়?' মা বলিলেন—সে তো রোজই যায়। তখন আমায় ডাকাইয়া প্রশ্ন করিলেন যে 'কোথায় থাক?' আমি সত্য বলিলাম। সেকথা শুনিয়া আমাকে অতিশয় শাসন করিলেন। বলিলেন, 'তোমার জ্ঞান কিরূপে হইবে? তোমাকে [ইস্কুলে] যাইতে দেওয়া হবে না। তখন এই সমস্ত কথা শুনিয়া ভাবিলাম 'সঙ্গীতই আমার প্রাণ অন্য সমস্ত তুচ্ছ। কাঁহাতক মার খাওয়া যায়। তখন ১৯ টাকা লইয়া স্টীমার গোয়ালন্দ [পার হইয়া]] কলিকাতায় আসি।'

হ্যারিসন রোড—অবাক— হাওড়া [ব্রীজ?] পর্যন্ত।

সন্ধ্যা। দুই-চার পয়সার পুরী কিনে খেলেন।

'—বারো টাকার দরুণ মাত্র দশ টাকা হাতে ছিল। গঙ্গার জলে মুন খাটেই শুলাম ছত্র নীচে।' ঘুম ভেঙে উঠে দেখলেন টাকা নেই। পুলিশকে বললেম। পুলিশ কিছু করলেন না। কাঁদতে কাঁদতে পৌঁছে গেলেন নিমতলা। এক সাধুর সাথে দেখা হল। সাধু কাঁদতে দেখে জিজ্ঞাসা করল—'কাঁদছ কেন, ভগবানকে বল।'

'—খাব কি?'

'—গঙ্গাজল। ভিক্ষা কর।' স্নান করে নিমতলায় ডাঃ কেদারনাথের [বাড়ির সামনে]—এক সোনার বেনের বাড়ি। দেবতা স্থাপিত আছেন সেখানে বাঙালী ভোজন করাত। এদের বাড়িতে খুব গান-বাজনা হত—থিয়েটারের গান। ডাক্তারবাবু দোকান বন্ধ করার সময় রকে বসে থাকতে দেখে ও প্রশ্ন করে। গান-বাজনা শিখতে এসেছি শুনে বলেন, বেরিয়ে যাও, তুমি

রুবসান—অনেক জাকৃতিমিনতি করতে রেখে থাকতে দিলে। এক মাস কাটল। সকাল সন্ধ্যা গঙ্গাজল আর দুপুরে কাঙালীর সাথে খাওয়া। ছেলেরা যারা আসত, শুনে কেউ কেউ দয়া করে দুই-এক পয়সা দিত। একটি ছেলের গানের সখ ছিল। জিজ্ঞাসা করত—তুমি কোথায় শিখবে, কার কাছে ? আমি [উত্তর করতাম] 'কোলকাতার শ্রেষ্ঠ গাইয়ের কাছে।' ছেলেটি এসে যতীন্দ্র বাহাদুর-এর দরবারে নুলো গোপালের কাছে নিয়ে গেল। দেখে শুনে সন্তুষ্ট হয়ে [নুলো গোপাল] বললেন যে বারো বৎসর সুর সাধতে হবে।' রাতে ওখানে থাকতাম। দুপুরে কাঙালীর সাথে (খাওয়া) সাত বৎসর কাটল। এঁর কাছে নন্দীবাবু বলে মৃদঙ্গ বাজিয়ে আসতেন। তাঁর কাছে মৃদঙ্গ শিক্ষা করতুম ১৪ বৎসর বয়স। একটি ধ্রুপদ নুলো গোপাল শেখান। এই এর আগে কেদারনাথ ডাক্তার বলেন, তুমি তো মুসলমান। তুমি হিন্দু বলে পরিচয় দিও না হলে শেখাবে না। তাই আপ্তাবুদ্দিন, এই সময় পিতামাতা বিশেষ কাতর হওয়ায় তাঁর শ্বশুরের সঙ্গে খুঁজে (আমায়) বার করলে। গুরুদেবের সঙ্গে এক মাসের করারে নিয়ে গেল। এই সময় বিবাহ দিলে পলাইবে না মনে করে রায়পুরায় (জজ) লইয়া গিয়া পরদিনই বিবাহ (দেন)। বসির খাঁর মেয়ে মদনমঞ্জরী (ঢাকা থেকে স্টীমারে পাঠিয়ে দেব বলে নিয়ে গিয়ে) [র সাথে তাঁর বিবাহ হয়]। বিয়েতে প্রণামী পেয়েছিলাম (আমি ৪০+স্ত্রী ৪০- ফুলশয্যার রাতে আঁচল থেকে খুলে—নরসিংদি স্টীমারে ঢাকায় আবদুল গফুরের কাছে ছয় মাস কর্ণেট শিক্ষা করলাম। বেহালা আর কর্ণেট ঐ টাকায় কিনলাম। কোলকাতায় এসে শুনলাম ওস্তাদ মারা গেছেন। কর্ণওয়ালিশ স্ট্রীটে মহেশচন্দ্র ভট্টাচার্যের ডিস-পেনসারীতে দু মাস থাকবার পরে মেসে ভর্তি করে দেন। তাদের ... শুধু থাকতুম। খোঁজ করতে করতে ...বু দত্তের নাম শুনে ৮ শেঠেরবাগান এর বেশ্যার বাড়ি উপস্থিত হলাম—একটি ছেলে (হাবু দত্তের কাছে) নিয়ে গেল। স্বরগ্রাম শুনে বললেন—'গান ছাড়লে কেন ?' আমি বললাম, 'ওস্তাদ মারা গেছেন—গান আর কারুর কাছে শিখব না।' নাড়া বাঁধলেন দু টাকার মিষ্টি নিয়ে। মাথা দেখে বলেন, যে তুমি একজন হবে অদ্বিতীয়—খুব প্রশংসা করতেন— হেদুয়াতে এসে করনেট বাজাতাম—সেতারের সঙ্গে বাজাবার মত মিষ্ট করলাম। রাতে বেহালা— মাস ছয়েক এঁর যে কনসার্ট পার্টির যতো গৎ সব শিক্ষা করলাম। তারপর টাকার অভাবে মিনার্ভায় গিরিশবাবু (গিরিশচন্দ্র ঘোষ) হাবুবাবুর সুপারিশে চাকরি দিলেন। দশ টাকা বেতন। তবলা ও থিয়েটার। সকালে শিখতে যেতাম। গিরিশবাবু বলতেন—তুই বাঙাল তো তোকে খাওয়ার জন্যে দশ টাকা দিই। বেশী টাকা দিলেই সরাপ ও বেশ্যা-সক্ত হবে। খুব সাবধানে শিখবি। তোর

দীক্ষা গ্রহণ করে গোপনে শিখতে শুরু করলেন। অনেক যন্ত্রের রাগ-রাগিণী এঁর কাছে শিক্ষা করেন।

সকাল ১টা থেকে তিনটে পর্যন্ত শিখতাম। বেতনেরও অর্ধেক দিতাম। (... শিখতেন) শুরু তেমন কিছু দেখাতেন না। মুস্তাক হোসেনের গুরুরা আমার কাছে যেতেন। ঐ কুড়ি টাকার মধ্যে তাঁদের তামাক, চা দিতাম। রাত নয়টায় পর সরোদ নিয়ে এসে কেউ গান আলাপ আরম্ভ করলে তাঁদের সঙ্গে বাজাতাম। কিছু ভাল জিনিষ পেলেই লিখতে বলত। এর মধ্যে রাজা হোসেন বললেন যে, 'আমার বাড়িতে থাক। তোমাকে যন্ত্রের শিক্ষা দেব ? এক বৎসর শিক্ষা দিলেন। তাঁদের ওখানে খেতাম। বা টাকা পাঁচেক দিতাম। আড়াই বছর পরে আর (তৌজিসত্ত্বেও) এল ..., দ্বিতীয় স্ত্রী মারা গেছে। (৭) দেখে তাঁর (উজীর খাঁ,) চৈতন্য হল ও তাপ হল যে, ওতোকেতে আছে তবু আমি তাকে শেখাই না (উজীর খাঁর বড় ছেলে- প্যারী মিঞা-কে দিয়ে আমায় ডাকালেন। আসতে প্রণাম করতে নতুন সম্বোধনে (ডাকলেন), 'বেটা ইধার আও'—বস। বল্লেন, 'সত্য বল, আমি তোমার কে ?'

'আমার খোদা, পিতা'

'—তোবা খোদা বলতে নেই। যা জিজ্ঞাসা করি সত্য বল। তোমরা কে কে আছ ?

—'পাঁচ ভাই দুই বোন'।

—কি কর, গানবাজনা কর কি না;

'গানবাজনা বাঙালীর সখ'

'—হিন্দু কি মুসলমান'

—'বাবা আপনার মামার কাছে শিখেছিলেন'।

'—তুমি বিয়ে করেছ ? তুমি বিয়ে করলে কেন ?

—'পিতামাতার আদেশে'।

'—বিবাহ করে পালালে কেন ?'

(এই কথা)

—সঙ্গীতের জন্যে

—শুনে কাঁদতে কাঁদতে বল্লেন তুমি আমার আর এক ছেলে। আমার ছেলের সঙ্গে ঠেকা দেবে। অন্য বাজিয়ের সঙ্গে এদের আমি গাইতে দিই না।'

তাইখানা থেকে সেই খানে তিনি গান (করেন আর) আমি 'নোটেশন' করে নি। শিক্ষা পাঁচ মিনিট। তাঁর জিনিষ পরিষ্কার করে দিতাম। ছেলেদের আমার সামনেই দেখতে আরম্ভ করতেন। তিনটে পর্যন্ত হত। বন্ধ যখন হোত তখন এক মাস হত। তখন সমস্ত ওস্তাদের কাছে শিক্ষা করা বন্ধ হল। ওস্তাদ বললেন, কারুর সামনে বাজিও না।' পরে জানতে পেরেছিলেন যে, ও'দের (ছেলেদের) কাছে শিক্ষা করতাম। (তিনি ছেলেদের বলে-ছিলেন) [illegible]—'

বাস। এই পর্যন্ত। আচার্য কর্তৃক এই আত্মজীবনীর এই অংশটুকু-ই পাওয়া গেছে। এর পরের অংশ লেখা হয় নি, হয়ত লেখা হলেও হারিয়ে গেছে। আলাউদ্দিন তাঁর জীবনের বাকী পর্বটুকু এইভাবে বলেছেন কি না। দুর্গাপ্রসাদ জানেন না।

সবাই জানে, শেষ পর্যন্ত তিনি স্থিত হয়েছিলেন মধ্যপ্রদেশের মাইহারে। এই মাইহারে থাকাকালীনই উজীর খাঁ তাঁকে আবার ডেকে পাঠান তাঁর পুত্র প্যারী খানের আকস্মিক মৃত্যুর পরে। তিনি শিক্ষাও দিয়েছিলেন কিছু দিন। আশীর্বাদ করেছিলেন, 'যেখান থেকে সূর্য ওঠে আর যেখানে অস্ত যায়, এই সমস্ত জায়গায় তোমার নাম ছড়িয়ে পড়বে—তুমহারা নাম ফ্যালা যায়গা।' গুরুর সে আশীর্বাদ বলা বাহুল্য বিফলে যায় নি। জীবনের উপান্তে পৌঁছিয়ে বিনম্রচিত্তে স্মরণ করেছেন তাঁর তাবৎ জ্ঞানীগুণী গুরুকে। অভিজ্ঞতার সিঁড়ি বেয়ে শিব-পুর গ্রামের সে কিশোর কখন হয়ে উঠেছেন মহাসাধক সুধু আলাউদ্দিন—পুত্র-কন্যা-শিষ্য-শিষ্যার-র জগৎজোড়া নামের মধ্য দিয়ে বারবার ধ্বনিত হয়েছে—'তুমহারা নাম ফেলা জায়গা'—তবুও তিনি একা—এক সম্পূর্ণ একা মানুষ। শিল্পীজীবনের অব্যক্ত বেদনায় বার বার গুমরে উঠেছে সেই সুরযক্ষকে না পাবার আকুলতা।

অথচ অন্যদিকে এই মহাযোগী আশ্চর্যভাবে পার্থিব ব্যথা-বেদনায় চঞ্চল। শিশুর মতো অভিমানী এই মহাতাপসের আর একদিক ধরা পড়ে তাঁর চিঠিতে—যেখানে তিনি নেহাতই সংসারী। ছেলের চাকরী, নাতির অসুখ, খুনসুটি করা, নাতির বিয়ের জন্যে ব্যস্ত হওয়া—এমনিতরো নানান ঘটনার দোলায় দোলে ওঠেন এক জীবন্ত স্নেহশীল মানুষ—হারিয়ে যায় তাঁর তেজী ব্যক্তিত্ব, হারিয়ে যায় তাঁর দুরন্ত ... মানসিকতা।

তাঁর অসমাপ্ত জীবনকাহিনীর অনু-লেখক উত্তরপাড়ার এই সুদর্শন যুবক দুর্গাপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়কে লেখা কয়েকটি পারম্পর্যবিহীন ব্যক্তিগত চিঠি এবং স্মৃতিগত লিখবো আমা কিছু অতীতের কাহিনীর স্মৃতিচারণা হয়তো এই মহা-সাধকের পূর্ণাঙ্গ জীবনধারাকে ব্যক্ত করতে পারবে না, তবু কোনদিন যদি কখনও আলাউদ্দিন খানের পূর্ণাঙ্গ জীবনী লেখা হয়, তবে এই সকল ঘটনা আর চিঠিগুলো হয়তো কোন দিকদর্শন ঘটাতে পারে।

যাই হোক, আরও একটু পেছিয়ে যাওয়া যাক। দিনের কথা......

[দুই]

২২নং কর্ণ্বয়ালিস রোড। দিল্লী। ত্রিশের দশকের প্রথম দিক। ভারতবিখ্যাত শিল্প-পতি শ্রীরাম-এর বাড়ীতে ওস্তাদ আলাউদ্দিন খান তখন আছেন। বিখ্যাত তবলিয়া হীরেন্দ্রকুমার গঙ্গোপাধ্যায় তখন কোলকাতায়। তিনি তাঁর এক সম্পর্কীত ভাগ্নে এবং শিষ্য দুর্গাপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় (গোরা)-কে চিঠি লেখেন যে, সে যেন তাঁর বাবা অর্থাৎ ওস্তাদ আলাউদ্দিন খান-এর সংগে দেখা করে। দুর্গাপ্রসাদ তখন দিল্লীতে। তিনি তখন ছাত্র। এর আগেই অর্থাৎ দ্বিতীয় দশকের শেষে তৈমুর খান-এর সঙ্গে সঙ্গত করতে গিয়ে হীরুবাবু আলাউদ্দিনের স্নেহসান্নিধ্য লাভ করেন। পরে তিনি নিজে ঐ আসরে হীরুবাবুর সঙ্গে বাজান। 'হীরুবাবা' বলে সম্বোধন করতেন তাঁকে। দুর্গাপ্রসাদ গেলেন শ্রীরাম-

আরুজ (যেন আরোগ্য) করেন। আমাকেই এরা চায় আসিবার জন্য, কিন্তু আমি কি আসি। চার মাস ছুটি নিয়েছি, এখন কি করে ছুটি চাহিব, স্টেটের নিয়মের বাহিরে। কিছুদিন কর্ম হলে (কাটলে) চেষ্টা করে দেখিব। তুমি দাদাজিকে বুঝিয়ে বলিবে। শ্রীযুক্ত বাবু, তবে যাহারা যদি মহারাজাকে আমার জন্য লিখেন, মহারাজা আদেশ করিলে আসিতে পারি। শ্রীমান রবিশঙ্করকে পাঠাতে পারি, আর কোন পথ নেই এ ভাবা (ভাড়া)। এদেরে (এদেরকে) আমার আন্তরিক শ্রদ্ধা ও নমস্কার জানাবে ও হাতের আরুজ (আরোগ্য) সংবাদ জানিয়ে চিন্তা দূর (দূর) করিবে। তুমার মামার চাকরী লক্ষ্ণৌ রেডিওতে ১৫০ টাকা বেতনে হয়ে গেছে, এখন সে ঐখানেই আছে। ডিসেম্বরের পহেলা থেকে চাকরি আরম্ভ করিবে। ভাড়াটিয়া (ভাড়াটে) বাটির জন্য চেষ্টা করিতেছে। তুমার যেন মাসী ভাই সকলে ভাল আছে, তুমার দিদি ভাল আছে তার আশির্বাদ গ্রহণ করিবে। তুমার বিবাহের জন্য জিজ্ঞাসা করিলেন তুমার দিদি, বিবাহ হল কিনা জানাইতে তাকে যা হয় লিখে জানাবে। দিদির শ্রীচরণে প্রণাম জানাবে, বাবা ও মা, বোন এরা কেমন আছেন জানিয়ে তুষ্ট করিবে। একবার আছি তুমার কুশল জানিয়ে সন্তী (শান্তি) দান করিবে ইতি

তোমার দাদু

লক্ষ্ণৌ মরিস কলেজের পরীক্ষক হয়ে ফিরে এসে তিনি দুর্গাপ্রসাদের লেখা চিঠি পান। এই চিঠিতে দাদাজি অর্থাৎ শ্রীরামের পুত্রবধূ এবং রাজ ভবতরামের স্ত্রী শ্রীমতী শীলা ভবতরামের হাতের ব্যথার জন্য সহানুভূতি জানিয়েছেন। শীলাদেবী কিছুদিন আলাউদ্দিনের কাছে সেতার শেখেন। কিন্তু রেওয়াজ করতে গিয়ে হাতের আঙুলে ব্যথা লাগে। দাদাজির অসুখে তিনি কী পরিমাণে অস্থির হয়ে পড়েছিলেন, চিঠিটা পড়লেই বোঝা যায়।

প্রথমতঃ, রবিশংকর তখন তাঁর শিষ্য এবং জামাতা। আলাউদ্দিন তখন দাদাজির রেওয়াজের জন্য রবিশংকরকে শিক্ষক হিসাবে পাঠাতে চাইছেন। তাঁর বয়স তখন মাত্র বাইশ।

দ্বিতীয়তঃ, ওস্তাদ আলি আকবর খান তখন লক্ষ্ণৌ রেডিওতে ১৫০ টাকা মাইনের চাকরী পেয়েছেন। তাঁর বয়স তখন প্রায় ২০।

সর্বশেষাত এই দুই শিষ্যের জীবনের গোড়ার ইতিহাসের জন্য এই চিঠি এক উজ্জ্বল সাক্ষ্য।

(৩)

এই চিঠিটি তারিখবিহীন। তবে চিঠিটি আগের উপরুক্ত পত্রটির পরে লেখা। কারণ রবিশংকর তখন দিল্লীতে আছেন। এবং সেই সময় আলাউদ্দিন দিল্লীতে রবিশংকরকে চিঠি লিখছেন এবং প্রত্যেক পত্রেই দুর্গাপ্রসাদের খোঁজ করছেন। প্রতিটি ছত্রে দুর্গাপ্রসাদের প্রতি স্নেহধারা অবিরলভাবে ঝরে পড়ছে।

কল্যাণবর,

স্নেহের দাদু শ্রীমান দুর্গা তুমি কেমন আছ পত্রপাঠ জানাবে। দাদুর উপরে কি অভিমান করেছ, রবুর প্রত্যেক পত্রে তুমার কথা লিখে থাকি একটি ছত্র লিখে আমাকে জানাও না এজন্য দুঃখিত জানিবে।

দাদুর যদি কোন রূপ ত্রুটি হয়ে থাকে দাদু বলে ক্ষমা করিও। তুমার নিকট চিরঋণী আমি তুমার স্নেহের ঋণ এ জীবনে শোধ করিতে পারিবে না। তুমার দিদি প্রায়ই জিজ্ঞাসা করে তুমার পত্র পাই কিনা, তুমার দিদির সঙ্গে তুমার যেমন স্নেহভালবাসা তুমরাই জান তার আকুলে পিপাসা দূর করিবে। আমার সঙ্গে অভিমান করিলেও দিদির হৃদয়গাথা তুমি। পত্র উত্তর দিও, না দিলে মান করিবে একপ্রকার আছি। তুমার কুশল জানিয়ে সুখি করিবে ইতি

বৃদ্ধ আলম

(৪)

প্রাণের দাদু তুমার পত্র পেয়ে সব বিষয় অবগত হয়ে সুখি হলেম। শ্রীমান রবুকে ডেকে এনে তার মতামত জানিলেম, সে আসিতে প্রস্তুত (প্রস্তুত)। শ্রীমতী মা শীলাজিকে জানাবে, শীলাজির আদেশপত্র পেলেই তাহাদিগকে পাঠাইব। শ্রীমান রবুর প্রোগ্রাম ডিসেম্বর ২৯-৩০শে দুই দিন আছে প্রোগ্রাম বাতিয়ে আসিতে পারিবে। শীলাজির অভিমত জেনে জানাবে, সেই অনুসারে তুমার মাসিমাসহ তাহাদিগকে পাঠাইব। তুমার মামার পত্র পাইলাম ভাল আছে পহেলা ডিসেম্বর থেকে কার্য আরম্ভ করেছে, লক্ষ্ণৌ রেডিওতে শ্রীমান রবুকে রাখিবার জন্য পত্র লিখেছে শীলাজির অভিমত না জানা পর্যন্ত সেখানে কোনও জবাব দেওয়া হবে না পত্রের অপেক্ষায় রহিলাম। তুমার ভাইদের প্রণাম গ্রহণ করিবে। এবং শ্রীমান অজয়ের অন্নপ্রাশন হল আশির্বাদ করিবে তার দীর্ঘজীবনের জন্য। বিশেষ কিছু করি নাই কয়টি গরীব ও আমি একজন এর মধ্যে সকলে মিলে আনন্দ করিলেম তুমার প্রধান অসম্পূর্ন কারণ..... মনপ্রান দিয়ে কোন প্রকারে নিয়ম পালন করিলেম মাত্র। এখানের মাদ্রাসার ছাত্ররা এসে কুরান (কোরাণ) পাঠ করেছে—এক খ্যায়োর (খাবার) আনন্দ পেয়েছি আশির্বাদ করিবে। তুমার দিদির আশির্বাদ গ্রহণ করিবে তুমার বিয়ের লাড্ডু খাওয়ার আসা (আশা) পরিত্যাগ করে নাই পূর্ণ আসা নিয়ে বসে আছে। ছাত্রটি এখানেই আছে ভাল আছে। বাবা মা বোনদের পত্র

পেয়েছি সকলে ভাল আছেন। শ্রীমতী সতী লিখেছে স্নেহের দিদি হাতী, আমি লিখে- ছিলাম দাদু উট, তার জবাব পেলেম। এক- প্রকার আছি তুমার কুশল লিখে সুখি করিবে। এই মাসের ১১-১৪ আমার প্রগ্রাম আছে লক্ষ্ণৌ, আমার স্নেহের বোন দাদু সকলে মিলে দাদুর প্রগ্রাম শুনে দাদুকে স্মরণ (স্মরণ) করিবে

ইতি দাদু—

এই চিঠিটি যদিও তারিখবিহীন, তবুও চিঠিটা পড়লে বোঝা যায় যে এই চিঠিটা ১৯৩২ সালেই চারনং চিঠিটির পরে পরেই লেখা। চিঠিতে যে সব তারিখের উল্লেখ আছে, তাতে মনে হয় ১লা অকটোবরের পরে এবং ১০ তারিখের মধ্যে লেখা। এছাড়া শাকিল আকবর যে লক্ষ্ণৌ রেডিওতে ১৫০ টাকা মাইনের চাকরী নিয়েছেন ১লা ডিসেম্বর ১৯৩২ সাল থেকে তা-ও জানা যাচ্ছে।

পত্রের শেষের এর সবচেয়ে মধুর অংশ, বৃদ্ধের নাতি-নাতনিকে ঠাট্টার পর্ব। সতী অর্থাৎ দুর্গাপ্রসাদের ছোট বোন যিনি অসাধারণ প্রতিভাময়ী ছিলেন—মাত্র বারো বছর বয়সে নতুন নতুন রাগ তৈরী করতে পারতেন। মাত্র ষোল বছর বয়সে তাঁর মৃত্যু হয়। আলাউদ্দিন তাঁকে খুব ভালো বাসতেন। সেই সতী মদনমঞ্জরীকে ঠাট্টা করে লিখেছিলেন 'দিদি হাতী' বলে। আলাউ- দ্দিন নিজেকে 'দাদু উট' বলে চিঠি স্বাক্ষর করেছিলেন, তারই উত্তর দিয়েছিলেন সতী। স্নেহের এই ধারায় তিনি আশ্চর্যজনকভাবে পার্থিব।

(৫)

কল্যাণবর,

স্নেহের দাদু তুমার পত্রের উত্তর দেরি হল বলে মনে কিছু করিবে না। দু মাস যাবৎ বড়ই উদাভীঘ্ন (উদ্বিগ্ন) অবস্তায় সময় কাটিয়েছি আমাকেই আমি জানিতে পারি নাই, এন্য রাজ্যের মনে হত, গরমের চুরন্ত অবস্তায় বাগানে দুই বেলা জল উঠিয়ে শিচন করিতেম, চাকর সব ভেগে গিয়েছে মাত্র কালুকে নিয়ে করিতেম, অনেক গাছ মরে গেছে, যা কিছু আছে তাদের সেবা করে এতদিন কাটিয়েছি, সামান্য বৃষ্টি হয়েছে কারণ প্রকৃতি অবস্তায় এসে পৌহুছিয়াছি বসে পত্রের উত্তর লিখলেম। আমার দুটি হাত দর্শন করিলেই বুঝিতে পারিবে। আক্টে' মাসে ১১ তারিখ দিল্লী পৌহুছিব বুঝিতে পারিবে। এখন কাজের কথা বলি, শুন, আমার মা ও বোন কেমন আছে সত্তর পত্রপাঠ জানাবে, এদের জন্য তোমার দিদি মহাচিন্তিত জানিবে শিঘ্র জানিয়ে আমাদের চিন্তা দূর করিবে।

তুমি এখন কুন দেসে আছ জানিতে ইচ্ছা, যদি পাঞ্জাবে বাস কর তবে কয়দিনের জন্যে তুমার নিকটেই কাটাতে ইচ্ছা করি। শ্রীমতী লক্ষ্মীকে জানাবে এবার সুরশ্রীকে নিয়ে আসিতেছি, আমার জায়গা ঠিক করে রাখিলে ভাল হয় মনে করি। শৈলাজিকে

জানাবে তুমার স্নেহাশীষ, শুভ্র শান্তির জন্ম হলে ৫-৭ দিন হয় তারপরে কঠিন রোগ দেখা হয়েছে, এখনো জ্বর ও কাশি, তার সেবায় দিনরাত কাটাচ্ছে, খুব চিন্তা আছে আশি-র্বাদ করিবে তার আরোগ্যর জন্য। আশীষ, ধ্যানীষ, শ্রী, আলাউদ্দিনের (প্রদীপ) এরা ভালো আছে। এদের নিয়ে তুমার দিদি ব্যস্ত আছে, আমি এখন যেখানে আছি সেখানে কাজ কার্যটি নিজে করিলে সুখি হব একপ্রকার আছি তুমাদের কুশল কামনা করি ইতি

দাদু

এই চিঠিটাও তারিখবিহীন; তবুও চিঠিটা পড়লে বোঝা যায় যে এই চিঠিটাও আগের চিঠির সমসাময়িক। বাগানের শখ ছিল খুব। বাগান করতে গিয়ে হাতের ব্যথায় কষ্ট পাচ্ছেন। পূর্বোল্লিখিত, হাতের ব্যথা দেখা যাচ্ছে এখনও সারে নি। এছাড়া পারিবারিক খবরও আদানপ্রদান করেছেন।

(৬)

আলমোড়া কালচার সেন্টার থেকে এই চিঠিটির দুই পৃষ্ঠায় একদিকে দুর্গাপ্রসাদকে এবং অন্যদিকে পিঠে দুর্গাপ্রসাদের বাবাকে লেখা। একই খামে তাঁর ছোট বোন গীতা-দেবীকেও লেখা এই চিঠি দুটিই যে কী নিবিড় মমতাময় তা বোধহয় বলবার কোন প্রয়োজন নেই।

নমঃ নারায়ণ

পরম শ্রদ্ধেয়,

বাবা আমার বিজয়া দশমীর ভক্তি-পূর্ণ প্রণাম ও প্রেমালিঙ্গন জানিবেন ও আমার মাকে শ্রদ্ধা আশির্বাদ জানাবেন, ভাই বোন সকলকে আশির্বাদ দিবেন।

আপনার দুইখানা পত্র পেয়েছি উত্তর দিতে দেরী হল বলে মনে কিছু করিবেন না। আমার মায়ের অসুখ জেনে দুঃখিত ও চিন্তিত হলাম, ভগবান তিনির রুগে আরুগ্য (তাঁর রোগ আরোগ্য) করে দিন এই প্রার্থনা করি, দয়া করে মায়ের আরুগ্য সংবাদ দানে সুখি করিবেন। দাদুর পত্র পেয়ে বড় সুখি হলেম ভগবান ভাই বোনকে দীর্ঘজিবী করুন প্রার্থনা করি।

শ্রীমান আলি আকবর এসে আপনাদের শ্রীচরণ দর্শন করে গিয়েছে জেনে অতিসয় সুখি হলেম, তার প্রতি বাবা ও মা আপনিরা কৃপা দৃষ্টি রাখিবেন, আপনাদের সেবা করিয়া দাস বলে তাকে শ্রীচরণে স্থান দিবেন, আপনিরা তাকে আশির্বাদ করিবেন মানোষ (মানুষ) যেমন হতে পারে, দীর্ঘজীবন লাভ করে এই আশির্বাদ করিবেন। আসা করি ফেব্রুয়ারি মাসে এসে বাবা ও মা ভাই বোন সকলকে দর্শন করে সুখি হব এই কামনা করি। আমারও শরীর বিসেস ভাল নাই, হাতে হাত-পা ব্যথা সদাসর্ব্বদা করে, ঔষধ সেবন ও মহানারায়ণ তৈল মালিস করিতেছি এসবে কিছুই উপকার পাইতেছি না এখন ভগবানের ইচ্ছা তিনি যা করেন মঙ্গলের জন্য, তিনি মঙ্গলময়, দয়াময় তিনির ইচ্ছা। একপ্রকার আছি। আপনাদের কুশলদানে সুখি করিবেন ইতি আপনার বড় ছেলে

শ্রীআলাউদ্দিন
আলমোড়া

কালচার সেন্টার
২৮শে আশ্বিন

কল্যাণবর,

দাদু তুমার পত্র পেয়ে সুখি হলেম, বিজয়া দশমীর স্নেহালিঙ্গন গ্রহণ করিবে, জোনাকিকে স্নেহ আশির্বাদ দিবে। তুমার মামা ও ছেলেকে এসেছিলে জেনে সুখি হলেম; তাকে জানাবে, যে সময় ছুটি সময় থাকে সে সময় এসে যেন তার দাদা ও দিদির চরণ দর্শন করেও তুমাদের সঙ্গে এসে দেখাশুনা করে একান্ত ইচ্ছা আসার, তুমাদিগকে আপন মনে করে, এই আমার বাসনা। দাদু তুমার ঠিকানা আমার নিকটে নেই এ জন্যই তুমাকে পৃথক পত্র দেই নাই, মনে কিছু করিও না, প্রার্থনা করি পরিক্ষাতে পাস কর, প্রভু তুমার মন কামনা পূর্ণ করুন এই আশির্বাদ করি।

একপ্রকার আছি তুমাদের কুশল জানিয়ে সুখি করিবে ইতি তুমার দাদু

(৬খ)

কল্যাণীয়বর,

স্নেহের শ্রীমতী গীতা দিদি, আমার অতি সাধের বেগম সাহেবা, বোড় (বড়) দাদুর বিজয়ার স্নেহ আশির্বাদ গ্রহণ করিও। আশির্বাদ করি মা ভগবতি তুমাকে চিরসুখে চিরজিবি করে রাখুন। তুমাদিগকে দেখিবার অতি সাধ করি করে দেখা হবে মা জানেন, একপ্রকার আছি তুমাদের কুশল কামনা করি ইতি

দাদু

(৭)

এই পত্রটি ঠিক পরের বছরের বিজয়ার আশীর্বাদপত্র। লক্ষণীয়, একদিকে দুর্গা-প্রসাদের নতুন চাকুরী সম্পর্কে কৌতূহল আর একদিকে নানা অশান্তির চাপে মান-সিকভাবে তিনি বিপর্যস্ত। আগের বছরের চিঠিটি পারিবারিক। এই চিঠিটি কেবল দুর্গাপ্রসাদকে লেখা—

মাইহার স্টেট
৮-১০-৪৩

কল্যাণবর

স্নেহের দাদু বিজয়ার আলিঙ্গন আশির্বাদ গ্রহণ করিও, মা ভগবতী তুমাকে চিরজিবী, নিরুগী (নিরোগ), সান্তী (শান্তি) দান, পিতামাতার শ্রীচরণে অটল-ভক্তী রাখুন এই প্রার্থনা করি।

তুমার পত্র পেয়েছি উত্তর দিতে দেরী হল বলে মনে কিছু করিবে না। নানা রকম অশান্তির চাপ পরে বলে সব ভুলে যাই, চঞ্চল হয়ে পরি। আসা করি ভগবত কৃপায়, বাবা মা বোন সকলে ভাল আছে, আবার কবে দেখা হবে আসাপথ চেয়ে আছি, তুমি নতুন চাকরী করে কিভাবে আছ [illegible] পাও কিনা সব জানিয়ে সুখি করিবে। [illegible] দিদি ছেলের নিকটে যাইবার জন্য [illegible] ছেলের অসুখ জেনে, আশা করি [illegible] গেছে।

খবর মুখে সব জানিবে, তুমার মাসিমা ভাই সকল ভাল আছে, আমার [illegible] খাবরায় কিছুই ভাল লাগে না, মন [illegible] করিতে পারি না। শ্রীমতী মা শান্তিজি [illegible] বাবু ভরতরামজিকে বিজয়ার নমস্কার জানাবে। একপ্রকার আছি তুমার কুশল জানিয়ে সুখি করিবে ইতি দাদু

(৮)

এই চিঠির ঠিক ষোলো দিন [illegible] মাইহার থেকে লেখা এই চিঠিটি [illegible] গুরুত্বপূর্ণ। প্রথমতঃ কাশ্মীর সম্প[illegible] তাঁর বিশেষ আগ্রহ, দ্বিতীয়তঃ [illegible] অসুখের জন্য চিন্তা এবং [illegible] সাধনার খবর।

মাইহার [illegible]
২৬-[illegible]

কল্যাণবর,

স্নেহের দাদু শ্রীমান তুমার পত্র পেয়ে সুখি হলেম, তুমার কাশ্মীর [illegible] সুফল হক এই কামনা, সেখানের [illegible] সব বিষয় জেনে জানাবে সুখি হব [illegible] খবু এরা মঙ্গলমত পৌঁছিয়াছে, [illegible] দেখে খুব আনন্দ পেয়েছি, তুমার মাস[illegible] শরীরের অবস্থা দেখে বড়ই চিন্তিত [illegible] অনুভব করিতেছি পূর্ব্বের সাস্থ [illegible] থেকেও খারাপ, সব আমার অদৃষ্টের পরে কি হয় ভগবান জানেন।

শ্রীমতী মা শান্তিজিকে স্নেহ জানাবে শ্রীযুক্ত বাবু ভরতরামজীকে [illegible] নমস্কার ভালবাসা জানাবে। তুমার স্নেহাশীষ গ্রহণ করিও, শ্রীমান আশ[illegible] ও শ্রীমান শুভ প্রণাম গ্রহণ করিও। [illegible] খবুর শিক্ষা খুব সুন্দর হইতেছে খুব [illegible] করিতেছে।

মা শান্তিজিকে রিয়াজ করিতে [illegible] যা শিক্ষা করেছে তাহা যেন না ভুলে। [illegible] একপ্রকার আছি [illegible]দের কুশল [illegible] সুখি করিবে ইতি

দাদু
শ্রীআলাউদ্দিন

(৯)

পরবর্তী পত্রটি আলাউদ্দিনের [illegible] ধারণা কিছু ছোঁয়া আমরা পাই। [illegible] দিক থেকে এই পত্রটির গুরুত্ব রয়ে ১৯৪৯ সালে লেখা এই পত্রটির [illegible] কয়েকটি ঘটনা আছে।

প্রথমতঃ, আলাউদ্দিন সেই সময় সাধুদর্শনে কিছুদিন বাইরে যান। উদ্দি[illegible] হয়ে দুর্গাপ্রসাদ যে চিঠি দিয়েছিল[illegible] এ তারই উত্তর। সুরসাধক তিমিরবরণ[illegible] পাধ্যায় তখন হঠাৎ পণ্ডিচেরী চলে গে[illegible] গান ছেড়ে দিয়ে। শুধু তাই নয়, সুরস

শ্রীযুক্ত দিলীপকুমার রায় তৎকালীন একটি কাগজে উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত সম্পর্কে একটি প্রবন্ধ লেখেন। এই প্রবন্ধটি পড়ে আলাউদ্দিন অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হন। সেই প্রসঙ্গে দুর্গা-প্রসাদকে লেখা এই চিঠিতে তাঁর অন্তরের ক্ষোভ এবং দুঃখ ফেটে পড়েছে॥ তাঁর লেখা এই চিঠিতে কিন্তু এক মুহূর্তে পেয়ে যাই আলাউদ্দিনের সমস্ত ধ্যানধারণা।

মাইহার ষ্টেট
সি আই ই
৫-১-৪৯

কল্যাণবর,

শ্রীমান স্নেহের দাদু তুমার পত্র পেয়ে সুখি হলেম তুমার দিদিমার প্রতি হামদর্দি জেনে বেচে থাক। তুমার দাদু সুরবক্ষার পুজারি, জবন ছায়া নিরামিষ উপাসক নয়, অমৃত সুরের উপাসক তুমার ভয় পাইবার কিছু নেই। তুমার দিদিমাকে ছেরে গৃহ-ত্যাগি ভেকধারী সাধক হব না নিশ্চিন্ত থাকিবে। বহুদিনের বাসনা ছিল মহা-পুরুষের দর্শন কামনা তাই গিয়ে ছিলেম, দর্শন করে এসেছি। আমি শ্রীমান জীবনেব নই যে স্ত্রীপুত্র ছেড়ে পণ্ডিচেরী গিয়ে উন্মত্ত হয়ে আসিব॥

শ্রীযুক্ত দীলিপকুমার রায় মহাবিদ্বান জ্ঞানি, সঙ্গীৎ বি(দ্যা)র ভ্রম, উচ্চ সঙ্গীতকে যে ঘৃণা করে ঠুমরীকে যে উচ্চ সঙ্গীত হতে শ্রেষ্ঠ মনে করেন, সেইরূপ মহাপণ্ডিত আমি হতে পারি নাই এই জন্য তুমার দিদিমার আচল ধরেই থাকিব, জিবন কাটাব আমার জন্য চিন্তা করিবে না ভেকধারি মৌলবী হব না, আমার জনগণ সেবাই জিবনের আধার জানিবে. আমি বঙ্গমাতার কুসন্তান তিনি আমাকে, যে পথ ধরিয়েছেন সেই পথ আর ভ্রষ্ট হব না, ও মা করাবেন না নিশ্চিন্ত থাকিবে।

তুমাব চরণ তলে ঠাই দিও প্রভু ঠাই দিও এই অনাথ অবোধ ভ্রান্তে, এই হল আমার প্রাণের আধার, সুরের মুর্চ্ছনার দ্ব্যারায় যেন তাকে আকুল প্রাণে যেমন ডাকিতে পারি এই আমার জিবনের ও কর্ম্ম পুজা এই আমার জপ, তপ। আর কিছু চাহি না সুরে যেন তাকে ডাকিতে পারি, এখন বিদায় দাদু নিলেম। একপ্রকার আছি আছি তুমার কুশল কামনা করি ইতি

দাদু

(১০)

৬-১১-৫৫ তারিখে এই পত্রটি দুর্গা-প্রসাদ ও তাঁর স্ত্রী বিজয়াদেবীকে যুগ্ম-ভাবে লেখা 'বিজয়ার আশীর্বাদপত্র'। এখানেও সেই নাতির সঙ্গে খুনসুটি করা! সদ্য-বিবাহিত নাতিকে ঠাট্টা করে লিখেছেন যে 'দিদি' অর্থাৎ মদনমঞ্জরী দেবীর সঙ্গে দুর্গা-প্রসাদ গোপনে দেখা করে ভাবভালবাসার লেনদেন করছেন, তাহলে তিনি নিরুপায়। চিঠির মাঝামাঝিতে তিনি মদনমঞ্জরীকে দুর্গাপ্রসাদের 'নায়িকা' বলে কৌতুক করে-ছেন। আগাগোড়া কৌতুকে ভরা এ চিঠি সম্পর্কে মন্তব্য নিষ্প্রয়োজন॥

মাইহার
বিন্ধ্যপ্রদেশ
৬-১১-৫৫

কল্যাণবর,

স্নেহের দাদু ও স্নেহের দিদি তুমরা উভয়ে আমরা উভয়ের বিজয়া স্নেহ আসির্ব্বাদ গ্রহণ করিবে॥ আমার স্নেহের বাবা মা সকলকে আমাদের স্নেহ আসির্ব্বাদ দেবে। দাদু তুমি লিখেছ তুমার দিদিমা তুমার সরন (স্মরণ) আছে কিনা, আমি কি করে জানব তাই তুমরা গুপনে যদি ভাবসাব করে থাক ও দেখা সাক্ষাৎ করে থাক— তুমরাই জান এ জন্যই জরে আস নাই কি জানি আমি যদি দুই জনের হাবভাব ধরে ফেলি। কথা দিয়েছিলে দিদিমার সঙ্গে দেখা করবার জন্য, মনে হয় আমার ভয়ে আস নাই। ২০-২৫ দিন যাবত সর্দ্দি-কাশী জ্বরে দুই জনাই ভুগে উঠেছি উভয়েই পথ্য পেয়েছি চিন্তার কারণ নাই তুমার নাইকা (নায়িকা) ভাল আছে। আমি দুর্ব্বল হয়ে পরেছি, প্রাণের অমরেষ এদের জ্বর হয়েছে প্রানেষ পথ্য পেয়েছে, ছুট নাতি অমরেষ সষ্যাগত (শয্যাগত) ঘুসঘুসে জ্বর হয় এখনও পথ্য পায় নাই এজন্য বেস (বেশ) চিন্তিত হয়ে পরেছি, তুমরা আসির্ব্বাদ করিবে এর কুশলের জন্য। একান্তমনে তুমাদের কুশল কামনা করি ইতি

দাদু আলাউদ্দিন

সময়ের হিসেবে-এর পরের চিঠিটি দুই বছর পরে। আর কোনও চিঠি পাওয়া যায়নি দুর্গাপ্রসাদের কাছে॥ এই চিঠিটি দুর্গাপ্রসাদের মাকে লেখা। নিচের স্বাক্ষর 'শ্বশুরবাবা' বলে। এই চিঠিটি নেহাতই পারিবারিক॥

মাইহার
১৩-৫-৫৭

কল্যাণীয়াষে

স্নেহের মা তুমার পত্র পাঠ করে চিন্তিত হলেম শ্রীমান দুর্গাচরনের আবার কি হল, দুর্ব্বল স্বাস্থ্যের ব্যারাম হতে পারে, ভগবানের নিকট প্রার্থনা করি দাদুর মঙ্গলের জন্য তাহার শুস্ত শরির (সুস্থ শরীর) লাভ হক। ডাক্তার মৈত্র মাইহারে থাকে না, কাটনিতে বাড়ি করে সেখানেই বাস করেন (ইনির ঠিকানা) ডাঃ মৈত্র সইবপিত্ত কাটনি॥

স্নেহের দিদি শ্রীমতী গীতাদেবীর পরিক্ষা হয়েছে জেনে সুখি হলেম ভগবানে

[illegible] করুন পরিক্ষাতে পাস হও, এই আশীর্বাদ করি। তুমার মায়ের আশির্বাদ [illegible] গ্রহণ করিবে, শ্রীমতী গীতা দিদিকে আমার স্নেহ আশির্বাদ জানাবে।
[illegible] তুমাদের কুশল কামনা করি ইতি

তব বাবা

আলাউদ্দিন

দুর্গাপ্রসাদের কাছ থেকে পাওয়া, আলাউদ্দিনের হাতে লেখা কয়েক শত চিঠির মাত্র এই তেরোটা পাওয়া গেছে। একেবারে শয্যাশায়ী হয়ে পড়বার আগে পর্যন্ত দুর্গাপ্রসাদের সঙ্গে তাঁর চিঠিপত্রের যোগাযোগ ছিল। কিন্তু ব্যক্তিগত কারণে সেই চিঠিগুলি পাওয়া যায় নি। কালের কালাপাহাড় ধ্বংস করে দেয় অনেক কিছুই—তবু স্মৃতিকে ঘাঁটিয়েই মানুষ পা বাড়ায় ভবিষ্যতে। আর সেই কারণেই এই একান্ত ব্যক্তিগত পারিবারিক চিঠিগুলো আমাদের চিনিয়ে দেয় মানুষ—আলাউদ্দিনের কয়েকটি গভীর গোপন অথচ অনন্য দিক।

স্মৃতির উজান ঠেলে যেটুকু যেখান থেকে উদ্ধার করা গেছে আর যেটুকু পাওয়া গেছে কাগজ আর চিঠি থেকে সেটুকু তুলে ধরতে গিয়ে একটা কথাই বারবার মনে হয়েছে যে এই ক্রোধী শিক্ষকসত্তার ভেতর থেকে কোন মন্ত্রবলে এই স্নেহধারা বেরিয়ে এসেছে। আর শুধু তাই নয়, তাঁর এতো ছাত্র-ছাত্রী থাকা সত্ত্বেও হঠাৎ কেন দুর্গাপ্রসাদকে এতো আপন করে নিলেন। দুর্গাপ্রসাদ নিজেও হয়তো তার উত্তর পাননি। শুধু তিনি ধন্য। আলাউদ্দিনের স্নেহস্নাত পবিত্রতায় তিনি পরিপূর্ণ।

(চার)

এইভাবেই সুদূর মাইহার থেকে উত্তরপাড়ার সেই বালককে পরম আপনজন করে নিয়ে তার সঙ্গে নানান খেলা খেলেছেন বৃদ্ধ আলাউদ্দিন—কখনও স্নেহভরা দুরন্ত অভিমানের, কখনও নিষ্পাপ ঠাট্টার।

অশান্তির চাপে বিহ্বল হলেও কিন্তু তাঁর এই পাতান নাতিটিকে অপার স্নেহধারায় সিক্ত করে পরমপ্রসাদ লাভ করেছেন। সেখানে শিল্পীর কোন ক্লান্ত নেই—বয়সের কোন বেড়া নেই।

দুর্গাপ্রসাদও পেয়েছেন তাঁর কৈশোরেই অপ্রত্যাশিতভাবে এক আশ্চর্য সঙ্গীতসাধক মানুষকে। তাঁর কাছে থেকে, ঘনিষ্ঠভাবে মিশে খুঁজে পেয়েছেন এক মহাসাধক শিল্পীর সাধনার ধারাকে, জেনেছেন কঠিন শিক্ষকের আড়ালে স্নেহের অন্তঃশীলায় পরম সবোধ শিল্পীজীবনের অন্তঃধারায় গোপন অভিব্যক্তি। একই সঙ্গে জেনেছেন এক ক্রোধী শিক্ষক আর এক স্নেহশীল মানুষকে। দেখেছেন খেয়ালী আলাউদ্দিনকে আবার পরমুহূর্তেই লক্ষ করেছেন এক আশ্চর্য স্থির সদালাপী সঙ্গীতগুরুকে। এমনিভাবেই পরস্পর বিপরীত গুণের অধিকারী ভারতীয় রাগসঙ্গীতের এক নতুন দিগন্তের উন্মোচক আজকের সঙ্গীত জগতের ভীষ্মপিতামহ ওস্তাদ আলাউদ্দিন খান উন্মোচিত হয়েছেন দৌহিত্রপ্রতিম দুর্গাপ্রসাদের কাছে।

স্মৃতির অ্যালবামে আজ অনেক ছবিই ধূসর। তবু তার মধ্য থেকে মাঝে মাঝে বেরিয়ে পড়ে নানান ছোটখাটো ঘটনার টুকরো। মুহূর্তে খুলে যায় তাঁর চরিত্রের এক একটি বিশাল দিক।

এক রাত্রে ঘুম ভেঙে যায় দুর্গাপ্রসাদের। মাইহারে তখন মধ্যরাত্রি। আলাউদ্দিন গান গাইছেন। তাড়াতাড়ি উঠতে যাচ্ছেন—মাসীমা অর্থাৎ অন্নপূর্ণা দেবী বাধা দিলেন দুর্গাপ্রসাদকে শুয়ে পড়ো, শুয়ে পড়ো, বাবা গান গাইছেন। দুর্গাপ্রসাদের বিশ্বাস হোল না। বাইরের বারান্দায় বেরিয়ে এলেন। গরমকাল। উঠোনে খাটিয়া পাতা। আলাউদ্দিন ঘুমোচ্ছেন। ঘুমের ঘোরে গেয়ে চলেছেন। তিনি তখন কখনোও বা ছাত্রদের বকুনি দিচ্ছেন—কখনো বা আবার গান গেয়ে চলেছেন ধ্রুপদ, ধামার। এমনি ছিল তাঁর ধ্যান জ্ঞান।

তেমনি ছিল খেয়াল। লক্ষ্ণৌ রেডিও থেকে আলাউদ্দিনের নামে বেতারে বাজাবার আমন্ত্রণ এসেছে। উনি সম্মত দিলেন। কনট্রাক্ট সই করে পাঠিয়েও দিলেন দুর্গাপ্রসাদ। মাইহার থেকে তিনি তখন লক্ষ্ণৌতে যাবেন বাজাতে। পরের দিন বাজনা। তখন রিডিওতে সবই সরাসরি প্রচার করা হোত। হঠাৎ কী মনে হোল, দুর্গাপ্রসাদকে ডাকলেন, এই—লিখে দাও, আমি কাল বাজাব না, শরীর খারাপ।' দুর্গাপ্রসাদ বললেন, সে কী করে হবে! তোমার তো জেলে দেবে যদি না যাও। তুমি তো সই করে দিয়েছ।' নাতির সঙ্গে এরকম কথাবার্তা হোত। আলাউদ্দিন বললেন, এ'ম জেলে দেবে?' আর আপত্তি করলেন না।

একবার দিল্লীতে, রেডিওতে বাজাবেন আলাউদ্দিন। সঙ্গে সঙ্গত করবেন ওস্তাদ আহমেদজান থেরকুয়া। দুর্গাপ্রসাদ তখন নবীন। হঠাৎ তাঁর কী ইচ্ছা হোল, নিজেই স্বীকার করেছেন এটা তাঁর ধৃষ্টতা, আলাউদ্দিনকে থেরকু খাঁ সাহেবের বিরুদ্ধে একটু উত্তেজিত করে দিলেন দুর্গাপ্রসাদ। বাজাবার সময় কী খেয়াল হোল, উনি রূপক তালে বাজনা শুরু করলেন। থিরকু খাঁ সাহেব বুঝতে পারলেন না কী হোয়ে গেল। তিনি বাজিয়ে গেলেন কিন্তু, কিছুতেই হদিশ করতে পারলেন না। বাজনা শেষ হোল। মাইক বন্ধ করতেই থিরকু সাহেব বললেন, "আরে আলাউদ্দিন হামকো পহেলসে বাতা দেতে—তেতালাই বাজাতে।" আলাউদ্দিন বাজনার আগেই বলেছিলেন, আপ নিজা নিজিয়ে (আমাকে সঙ্গে করে নিয়ে চলুন); থিরকু সাহেবের কথায় বিনীতভাবে জবাব করলেন, "আরে খাঁ সাহাব, তেতালা তো আপকো জরুতালক বাজা সকতে।" তখনও রূপক তাল যন্ত্রে বাজে না—সাধারণতঃ গানে গাওয়া হয়।

খেয়াল ছিল সত্যিই অদ্ভুত। আলাউদ্দিন তখন কোলকাতায়। আছেন এন্টালীতে দক্ষিণারঞ্জন চক্রবর্তীর বাড়ীতে। বয়স তখন তাঁর প্রায় অষ্টআশি। হঠাৎ একদিন ভোর চারটের সময় উঠে সোজা হাঁটতে হাঁটতে চলে গেলেন উত্তরপাড়ায় জয়কৃষ্ণ স্ট্রীটের বাড়ীতে। ঢুকেই বললেন, হঠাৎ ইচ্ছে হোল মা-কে দেখতে এলাম। মা অর্থাৎ তাঁর ধর্মকন্যা, দুর্গাপ্রসাদের মা। বললেন, খিচুড়ি খাব। আর ইলিশ মাছ।' এমনিতে খুব বেশী মাছ খেতেন না। হঠাৎ কী খেয়াল হোল। মাছ খেলেন। সারাদিন গল্পগুজব করে রাত্রি বেলায় [illegible] এন্টালীতে।

এমনি সব ছিল খেয়াল [illegible]গীতে গন্ধর্ব মহাবিদ্যালয়ের সমাবর্তন উৎসব। আলাউদ্দিনকে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। উদ্যোক্তারা ঠিক করেছেন—চতুরলাল তাঁর সঙ্গে সঙ্গত করবেন। হীরুবাবুও সেই আসরে উপস্থিত আছেন শ্রোতা হিসেবে। হঠাৎ নজর গেল তাঁর 'হীরাবাবা'র প্রতি। সামনে উপবিষ্ট পুত্রপ্রতিম হীরেন্দ্রকুমার। উদ্যোক্তাদের ডেকে বললেন—আমি হীরার সাথে বাজাব। ও মস্ত বড় ওস্তাদ—গুণী লোক। নেমন্তন্ন করে নিয়ে এস না হলে ও বাজাবে না, ও সৌখীন।' উদ্যোক্তারা এসে হীরুবাবুকে বললেন। হীরুবাবু সানন্দেই রাজী হয়ে গেলেন। ও'কে ডেকে আলাউদ্দিন বললেন—'আগে ওর সাথে বাজিয়ে নিই। তার পরে বাপ-ব্যাটায় বাজাব।' কিছুক্ষণ চতুরলালের সঙ্গে বাজিয়ে নিয়ে তারপরে হীরার সাথে বাজালেন।।

এমনিভাবেই অপার স্নেহধারায় সিঞ্চিত হয়েছেন তাঁর পরিচিত, অর্ধপরিচিত অনেকে। যাঁরা তাঁর কাছে গেছেন শিখতে তাদের তিনি উজাড় করে দিয়েছেন। এতো উজাড় করে দিয়েছেন যে তাঁরা তাঁদের ক্ষুদ্র সামর্থ্য নিয়ে সবকিছু নিতে পারেননি। কতদিন পরে তাদের বলেছেন, 'তুমি চলে যাও, তোমার হবে না'...ইত্যাদি ইত্যাদি। এমনি করে তিনি যেখানেই গেছেন, যে লোকই তাঁর সংস্পর্শে এসেছে, তাকেই দিয়েছেন উজ্জ্বল অভিজ্ঞতাময় মুহূর্ত।

দুর্গাপ্রসাদ তাঁদেরই মধ্যে একজন। এতো কাছে থেকে, এতো নিবিড় ভালবাসায় যিনি সিক্ত হয়েছেন, তাঁরই কয়েকটি মুহূর্ত শুধু উল্লেখ করা গেল। চোখের জলে ভেসে গেছে যখন তাঁর বুক, বালক দুর্গাপ্রসাদ তখন তার একমাত্র নীরব সাক্ষী। সেসব ঘটনা কজনই বা জানে।

দুর্গাপ্রসাদের কথাতেই বলি।

—অনেকদিন আগের কথা। লক্ষ্ণৌতে মৌরিসতে সাম্বৎসরিক উৎসব হচ্ছে। সকলেই সেখানে গেছেন। মামা অর্থাৎ আলি আকবর খান সেখানে বাজাবেন। বাজাবার আগে পিতা তথা গুরুকে প্রণাম করতে যাচ্ছেন, হঠাৎ কী মনে হল, এ ওস্তাদ হয়ে গেছে। সকলের সামনে বলে উঠলেন—'আরে তোমার আর প্রণাম কী দরকার, তুমি তো ওস্তাদ হয়ে গেছ। আরে কী...তুমি যা খুশী তাই করো।' মামা তাতে ব্যথা পেলেন। ব্যথা পেয়ে মামা পরদিন মাইহারে ফিরলেন না। আগে বোম্বাই মেলে মাইহারে ট্রেন দাঁড়াত না। একমাত্র ফার্স্ট ক্লাস টিকিট কাটলে মাইহারে স্টপেজ দিত। আমি তখন মাইহারে। দাদুর সঙ্গে লক্ষ্ণৌ থেকে ফিরে এসেছি। বিকেল চারটে নাগাদ ট্রেনটা লক্ষ্ণৌ থেকে মাইহারে এসে পৌঁছয়। বিকেলবেলা দাদু দেখি বাগানে পায়চারী করছেন। আমি বললুম, 'দাদু, কী করছ?' দাদু অপ্রতিভভাবে বললেন, 'এই—গরু—বাগানে—দরজা খোলা আছে।' আমি বললুম 'তুমি শালা মিথ্যেবাদী।' মাঝে মাঝে নাতি আদর করে দাদুকে শালা বলতেন—উনিও করছে। আমি বললুম, 'দাদু, কী করছ? না?' মামা এলেন না। দাদু কাঁদ কাঁদ স্বরে বললেন—'হ্যাঁ দাদু, ছেলেটা রাগ করলে?' তখন আমি বুঝলুম যে একমাত্র পুত্রের প্রতি বুকভরা স্নেহে এই কথা কটি বেরিয়ে এল। চোখ ভরা জল। 'দাদু, মামা আসবে না তোমার?' বললুম 'আসবে নিশ্চয়ই, বলে গেছে যখন।' সারা ঘটনাই কিন্তু মামার মনে হবে ব্যথা লাগলেও মামা হয়তো আসতেন, কিন্তু ট্রেনে ঘুমিয়ে পড়েছিলেন। রাত জাগবার জব্বলপুর চলে গিয়েছিল। সেই রাতে আমি জানলুম যে দাদু নিজে কেঁদে পরকে কাঁদাবার যে বিদ্যা আমাকে, সারঙ্গী বা বেহালাকে দিয়েছেন সেই প্রথম কান্নার উৎস কোথায়।' রোদ্দুরের আলোয় পাহাড়ের বরফ একটু একটু করে গলে যায়—বুক বেয়ে নেমে আসে স্রোতস্বিনী।

—দাদুর প্রতীক্ষা যখন নিরাশায় পরিণত হতে চলেছে তখন আমি জানলুম আজ তখন দাদু বাজিয়ে নিশ্চয়ই বাজাবেন। আমার ঘরটা দাদুর বাগানের লাগোয়া। পেছনের পাঁচিল ডিঙিয়ে পেছনের দরজা দিয়ে আসা যায়। ওঁর দুমহলা বাড়ী ছিল তখন। বাইরের ঘর, তাঁর রেওয়াজের ঘর, শোবার ঘর তার পাশে বৈঠকখানা। তার পেছনে একটা দালান। সেই দালানের মধ্য দিয়ে আসতুম আমরা। আর ওপরে মামা, মামীমা আর বর্দীদ। আর ভেতর বাড়ীটায় থাকতেন দিদি অর্থাৎ আলাউদ্দিনের স্ত্রী মদনমঞ্জরী।

গভীর রাত হয়ে গেছে। আমি ঘরে সরোদের টুং টাং আওয়াজ পেয়েই আস্তে আস্তে গেলুম। আমায় দেখতে পেয়েই কান্নাভেজা গলায় আস্তে আস্তে বললেন, 'কে দাদু!' অত স্নেহশীল, অত স্নেহসিক্ত কান্নায় পরিপূর্ণ কয়েকটি কথা—'কে দাদু, মামা তো এলো না।' আমি বললুম—'আসবে। তুমি ভয় পেয়ো না।' তারপরেই দাদু ডুবে গেলেন বাজনায়। প্রথমে তুলে নিলেন সুরশৃঙ্গার। সুরশৃঙ্গার রেখে দিয়ে তুলে নিলেন সরোদ। তন্ময় হয়ে গেলেন। আমি দাদুর বাজনা অনেক শুনেছি। কিন্তু সে রাতে যে সুরেলা সরোদ শুনেছি, তার হাতে আমি আর তেমন কখনোও শুনিনি। আমার সুরের কান খুলে দিয়েছিল এতো বাজনা সুর, এতো কান্না রূপান্তরিত হচ্ছে সুরেতে। আমার সন্ধানী তীক্ষ্ণ কান খুলে দিয়েছিল সে কথা।

পরের দিন মামা ফিরে এলেন। সব বললাম। শুনে মামা কিছুক্ষণ চুপ করে থাকলেন। বাবার এই হচ্ছে স্নেহের রূপ। মামার প্রতি প্রাণঢালা ভালবাসার রূপ।' চিরদিন যে আলি আকবর বাবার সামনে মাথা তুলে কথা বলতে পারেন নি, শিখবার সময় হাত জোড় করে ভীত ও সন্ত্রস্তভাবে দাঁড়িয়ে থাকতেন, শেখাবার সময় এমনি রুদ্রস্বরে শিক্ষা দিতেন, সেই আলি আকবরকে শিক্ষা দেওয়ার মধ্যে দিয়ে যে এমনি দুরন্ত অভিমানী স্নেহ, চোখের জলের ধারা অন্তঃসলিলা, কে জানবে, কে বুঝবে তার খবর।

অশ্রু আর সাধনা দিয়ে গড়ে ওঠা সেই জীবনধারার মূল কোথায়! চিরঅতৃপ্তির সাধক ওস্তাদ আলাউদ্দিন খানের প্রতি বিস্মিত জগদ্বাসীর এই প্রশ্নই বোধহয় শাশ্বত—নদী, তুমি কোথা হইতে আসিয়াছ?'

লোকাল ট্রেন চলন্ত পৃথিবী

তারাদাস বন্দ্যোপাধ্যায়

হৃৎপিণ্ড যেমন সমস্ত শরীরের রক্ত আকর্ষণ করে নেয় নিজের অভ্যন্তরে, আবার পরক্ষণেই কপাট উন্মুক্ত করে প্রতিটি কণিকাকে পাঠিয়ে দেয় শরীরের দূরতম প্রান্তে, তেমনই কোলকাতা মহানগরী সকালবেলা আমন্ত্রণ করে হাজার হাজার মানুষকে, আবার সন্ধ্যেবেলা নীরব নির্দেশেই দেখিয়ে দেয় তাদের ফেরার পথ।

এ দুটো দৃশ্যে কিন্তু একটা বড় রকমের তফাৎ রয়েছে। যদি নিজেকে সব কাজ থেকে বিচ্ছিন্ন করে একদিন বসে থাকেন এই জনতাবহুল নগরীসেতুর তীরে, তাহলে সে-তফাৎ আপনার চোখে পড়বে। সকালে যারা প্রবেশ করছে শহরে, তাদের দেহ সুস্নাত, সকালবেলার একটা সহজ উৎফুল্লভাব তাদের অবয়বে। এখুনি গিয়ে শুরু করতে হবে কাজ। বিকেলে দেখবেন সেই একই মানুষ ফিরে চলেছে ঘরের পথে, জনতার জোয়ার ফুলে ফুলে উঠছে নগরীর প্রধান প্রবেশ ও প্রস্থানের দরজা শেয়ালদা ইস্টিশনে। কিন্তু এখন তারা ঘর্মাক্তকলেবর, দেহে পুরো একটা দিন শহর-বাসের গ্লানি, কুঞ্চিত কপালে স্পষ্ট হয়ে আছে বিরক্তি। এখন জানালা একটু বসবার জায়গা পাবার জন্য তারা সহযাত্রীর সঙ্গে তর্ক করছে, কারও বিশেষ জায়গা পাবে না। দোষ নেই কারো—শুধু ঐ [illegible] আর কি।

শেয়ালদার নর্থ মেইন ও সাউথ স্টেশন সারাদিন এমন কত মানুষকে জন্য নিয়মিত কাজ করে চলেছে। পলকে পলকে লাইনে এসে দাঁড়াচ্ছে ট্রেন—আবার ছেড়ে চলে যাচ্ছে। ফার্স্ট ক্লাস থেকে নামছেন ভদ্রবেশধারী বাবুমশায়, হাতে ভি. আই. পি এটাচি, গলায় ঝুলানো [illegible] নেকটাই, পায়ে আরাম-জুতোর [illegible]। থার্ড ক্লাস থেকে নামছেন সাধারণ মানুষ-জন। জনতার মধ্যে আলাদা করে চেনা শক্ত [illegible]—অনেক সময় চাকরি করে [illegible]। তারা কেউ পরে আছে ধুতির উপরে শার্ট, [illegible] পরেছেন কারখানার শার্ট, কেউ বা পেন্টালুন। কারো হাতে চৌকো অ্যালুমিনিয়মের টিফিন বাকস, না খুললেও বলে দেওয়া যায় তাতে রয়েছে হাতে গড়া রুটি আর পেঁপের তরকারী। কারো হাতে সস্তা বাংলা উপন্যাস। কেউ বা এ বাবদে নিজেকে কিঞ্চিৎ উচ্চমার্গীয় বলে মনে করেন। তাঁর হাতে থাকে গ্রেস মেটা-লিয়াসের বেস্টসেলার বা লিঁয় উরিসের এক্সোডাস। ভেণ্ডার কামরা থেকে বিড়িতে শেষ টান দিয়ে লাফিয়ে নামে ব্যাপারীর দল হৈ হৈ করে টেনে নামায় দড়ির জালে মোড়া তরকারীর ঝাঁকা, দুদিকে বাঁক থেকে ঝোলানো জলভর্তি হাঁড়িতে দুই হাত ডুবিয়ে ছপ্-ছপ্ শব্দ করতে করতে গেটের দিকে এগিয়ে যায় মেছোরা।

এ তো শুধু শেয়ালদা স্টেশনের ছবি। লালগোলা, শান্তিপুর, ব্যাণ্ডেল, বানপুর, ডায়মণ্ডহারবার, ক্যানিং, লক্ষ্মীকান্তপুর—এসব লাইনে নিয়ত ধাবমান লোকাল ট্রেনের কামরায় রোজ [illegible] চলেছে এক আশ্চর্য বাস্তব নাটকের অভিনয়। কত রকমের মানুষ জুটেছে কতরকমের কাজে। এর মধ্যে অধ্যাপক আছে, আইনজীবি আছে, আছে ছাত্র ব্যবসায়ী, নিষ্কর্মা, পকেটকাটা, ভবঘুরে ও ভিখারির।

সব মিলিয়ে লোকাল ট্রেনের কামরা যেন একটা চলন্ত পৃথিবী। দুনিয়ার লোকের মত সব পাওয়া যাবে তাতে। মহৎ সাহিত্যিকেরা একেই বোধকরি 'হিউম্যান কমেডি' বলেছেন।

নানান কিসিমের মানুষ যাতায়াত করে বলে অনেক অদ্ভুত ঘটনা দেখা যায়, যা এমনিতে সহজ নয়।

যাচ্ছিলাম কৃষ্ণনগর। ভিড় থাকবার কথা, কারণ লোকাল ট্রেনের মধ্যে এ ট্রেন দূরপাল্লার। শেয়ালদা থেকে একশো কিলোমিটারের পথ। কিন্তু কপাল মাঝে মাঝে ভাল হয় পড়ে, [illegible] ব্যারাকপুর থেকে [illegible] এক ভদ্রলোক জানালার ধারের সিট ছেড়ে নামবার জন্য আমাকে দিয়ে গেছেন, আমি সেই

পেয়েনো ওভারহেডটি ওপারের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করছে, সেই খাঁচার ওপরে একটি মোটা বস্তা পেতে একটি উদ্বাস্তু বাচ্চাকে নিয়ে বসে ভিক্ষে চায়। এটা তাদের বাঁধা জায়গা।

একদিন ট্রেন থেকে নেমে লাফিয়ে খাঁচায় উঠছি, কারণ এক্ষুনি খাঁচায় ঠেলাঠেলি আরম্ভ হয়ে যাবে, একটা আশ্চর্য দৃশ্য চোখে পড়লো। দেখলাম মেয়েটি বসে বসে ঝিমোচ্ছে, সে টের পায়নি গাড়ি এসে দাঁড়িয়েছে প্ল্যাটফর্মে। শিশুটিও ঘুমোচ্ছে পাশে। আমার পায়ের শব্দে চমকে উঠে সে দিকে তাকিয়ে দেখলো, তখন ওভারহেডের বেয়ে যাত্রীরা উঠে আসতে শুরু করেছে। ক্ষিপ্র হাতে সে বাচ্চাটাকে তুলে থাবড়িয়ে দিতে লাগলো। আমি একটু আড়ালে সরে এসে দেখছি ব্যাপারখানা। বাচ্চাটা হঠাৎ জেগে উঠে কেমন দিশাহারা হয়ে গিয়েছে, ফ্যালফ্যাল করে তাকাচ্ছে এদিক-ওদিক। মেয়েটি আর কোনো উপায় না দেখে বাচ্চাটার মাথা বেশ জোরে ঠুকে দিল ওভারহেডের কাঠে। সঙ্গে সঙ্গে আর্তস্বরে কেঁদে উঠলো বাচ্চাটা। ততক্ষণে যাত্রীরাও উঠে এসেছে ওপরে। তাদের দিকে হাত বাড়িয়ে একটানা প্রফেশনাল সুরে মেয়েটির আবেদন—ছোট ভাই বাবু, সারাদিন খায়নি বাবু। খিদেয় কাঁদছে। একটা পয়সা—

কিসে যে কাঁদছে তা আমি একটু আগেই দেখেছি। কিন্তু মেয়েটির ওপরে কিছুতেই রাগ করতে পারলাম না। খিদে বড় খারাপ জিনিস—বড় অবুঝ। শরীরও এমনি একটা অবাধ্য যন্ত্র যে, দু-বেলা না খেলে কিছুতেই সেটা আর কাজ করতে চায় না। রাগ করবো কার ওপরে? অবিচার ঈশ্বরের, তিনি খিদে দিয়েছেন, খাদ্য দেননি।

সকালের দিকে যেসব গাড়িতে অফিসের যাত্রী বোঝাই থাকে, তার যে কোনো কামরাতে উঠলেই দেখতে পাবেন তাদের আড্ডা। ভিড়ের চাপে কামরার অলিগলি সব ভর্তি, তারই মধ্যে কিছুটা জায়গা চুরি করে চলেছে বিজ্র খেলা। আগেকার দিনে একজন তাঁর কোঁচাটি বিছিয়ে দিতেন সামনের সহযাত্রীর কোলে—তার ওপরে তাস খেলা চলতো। কিন্তু আজকালকার দিনে ধুতি পেতে বস মানুষই, কাজেই এখন অন্য নিয়ম চালু হয়েছে। আজকাল যার হাত ডামি হয়েছে সে হাত পেতে পিঠ দেয়, যেন আরামসে হয়ে খেলতে পারে এরা। খুব ভিড়ের ট্রেনেও স্বার্থপরের মতো অনেকখানি জায়গা আটকে রেখে খেলা চলে। শেয়ালদার গাড়ি পৌঁছে গেলেই যে তড়াক করে লাফিয়ে উঠে গেটের দিকে দৌড়োয়, তা নয়। হয়তো শেষ ডিলটার মাঝামাঝি চলছে, যে যার তাস হাতে নিয়ে ধীরে-সুস্থে গাড়ি থেকে নামে। ডামি হাত বাড়িয়ে রেখেই সঙ্গে সঙ্গে হাঁটতে থাকে। ওইভাবেই খেলা চলে। গেট দিয়ে বেরুতে বেরুতে শেষ তাসগুলো পড়তে থাকে ডামির হাতে। নেশা এমনি জিনিস।

খেলা নিয়ে আবার ঝগড়াও বাধে প্রায়ই। এ প্রসঙ্গে আমার কলেজ-জীবনে দেখা একটা ঘটনা মনে পড়ে গেল।

সকালের ট্রেন। অফিসযাত্রীতে আকণ্ঠ বোঝাই। একদিকে সরবে চলেছে অকশান ব্রিজ। চারজন খেলছে, আটজন দিচ্ছে মন্তব্য। তাসুড়েদের পাশেই একজন বুড়ো লোক বসে। তার পরনে আধময়লা ধুতি ও পাঞ্জাবী। চুল সবই প্রায় পাকা, চোখে মোটা কাঁচের নিকেল ফ্রেমের চশমা। ভারী নিরীহ তার ভঙ্গি। অফিসের ভিড়ে লোকটিকে কেমন বেমানান লাগছে। ঠিক খাপ খাচ্ছে না। দুপুরের অলস প্রহরের খালি গাড়ি হলে একে মানাতো।

একটা ডিল শেষ হতেই ঝগড়া বেধে উঠলো হঠাৎ। একজন তার পার্টনারের ওপর ক্ষেপে গিয়ে বলে উঠলো—আপনি খামোকা নো-ট্রাম্প কল করতে গেলেন কেন তা বুঝি না! এ হাতে কোন মতেই জাউন যায় না, শুধু আপনার জন্যে—

পার্টনার চটে বললে—এই বুদ্ধি নিয়ে খেলেন! ওটা লাইকার কল মশাই, ওটাকে স্ট্যান্ড করালেন কেন?

ঝগড়া জমে উঠলো। খেলা বন্ধ আছে। এখন মনে হয় সেদিন ওই দুজন পার্টনারের মধ্যে বোধহয় আগের কোনো ব্যক্তিগত রাগ ছিল। খেলা নিয়ে কেউ এত বাড়াবাড়ি করে না। মৌখিক থেকে পুরো ব্যাপারটা প্রায় দৈহিক পর্যায়ে পৌঁছে যাওয়ার উপক্রম।

বোৎদা রেগে গিয়ে বললেন, চুপ কর শালা, রঞ্জন। তুই আমার ছোট ভাই। কিছু মনে করিস না। চুপ কর! বেটা এসব আলোচনায় দরকার কি। যে কদিন বাঁচবি মাল খেয়ে যা!

তুমি দাদা চুপ কর—বলল রঞ্জন মালই সব! দেখছ না, নিত্য লোড শেডিং—কিন্তু ইলেকট্রিক বিল বাড়ছে। বাজারে তরকারির দাম বাড়ছে। স্টেশনটায় ভিখিরি দেখেছ। দু-চারশ নয়, হাজারে হাজারে। ভাব কিছু। দেশের মধ্যে একটা অস্থির অবস্থা। যদি মাল না পাওয়া যায়, তখন কি হবে। হ্যাঁ শালা, মালকমর্দন।

বোৎদা চেঁচিয়ে উঠল, মাল না পাওয়া যায় তোর বাবা পাওয়া যাবে!

বাবা, বাবা এল কি করতে, বাবার সঙ্গে মালের সম্পর্ক কোথায়। রঞ্জন দুঃখ করে বলল। ওর চোখ দিয়ে যেন জল বেরিয়ে এল।

বোৎদা ততক্ষণে আগুন, দেখ শালা রঞ্জন, তুই আমার বউকে নিয়ে খিস্তি মেরেছিস। তুই আমার ছোট ভাই। নইলে তোকে মেরেই ফেলতাম। বলেই রঞ্জনের গালে এক থাপ্পড়। ওর চশমাটা খুলে পড়ে গেল। রঞ্জন চশমা তুলে নিল।

গাড়ি শুদ্ধ লোক অবাক। এদের ওরা চেনে। প্রতিদিন দেখে। এই ভদ্র ঘরের তিনটি বর্ষীয়ান মানুষ অফিস ফেরার পথে উদোম মাতাল হয়ে যায়। ওদের ঘরবাড়ি, সংসার, আপনজন সব মুছে যায়। ওদের অশান্ত খিস্তি, আর উৎকট গন্ধ সকলেরই পরিচিত। কিন্তু আজকের এই ঘটনা চোখে পড়ে নি।

রঞ্জন সোজা হয়ে দাঁড়াল। বোৎদা, তুমি আমায় মারলে। তা তুমি মারতে পার। দেখ, তুমি আমার দাদা। আমাকে মারার রাইট রয়েছে তোমার। তোমাকে কিছু বলব না। বলতে পারি না। তুমি আমার দাদা। রঞ্জনের ঠোঁটের কোণে চোখ দুটোয় জল। একটা প্রচণ্ড অভিমান।

বোৎদা আত্মস্থ। পাথরের মত শীতল।

নির্মলদা কিন্তু সাতে-পাঁচে কোন দিন থাকেও না। আজও না।

ওদের নামার সময় হল। নেমে গেল বোৎদার হাত ধরে রঞ্জন প্রতিদিনের মত।

অন্য যাত্রীরা আমার সঙ্গে ওদের বন্ধুত্বকে মেনে নিয়েছে। একসাথে সকলের মন্তব্য শুনলাম। মাতাল-গুলোকে ট্রেনে উঠতে না দেওয়াই উচিত। ওদের চোখ তখন আমার দিকে।

কমল চৌধুরী

[illegible] জানলার লোকের মধ্যে দিয়ে [illegible] এসে পৌঁছেছিল। [illegible] হাত বাড়িয়ে [illegible] দেওয়ায় [illegible] [illegible]।

কিছুই না হয়তো, খুবই সামান্য সাধারণ কথা। কিন্তু তারা একজন এমন ছেলে বাদামবোদ করছিল যে, দেখলে মনে হয়, এই ভিজটা ছেড়ার ওপরে তাদের জীবনের যাবতীয় সুখদুঃখ, [illegible] উন্নতি, কন্যার বিবাহ—সবকিছু নির্ভর করছে, তারা হঠাৎ কেমন থতমত খেয়ে সুতোর দিকে তাকালো। নিজের অসমস্ত ব্যবহার এতদিনতে ধরা পড়ে না, বাইরে থেকে কেউ দেখিয়ে দিলে তা নিদারুণ স্পষ্ট হয়ে ওঠে। আশ্চর্যভাবে সেদিনের ঝগড়া থেমে গিয়েছিল। একটু চুপ করে থেকে একজন হাসবার চেষ্টা করে বলল, হ্যাঁ, খেলাই তো, খেলা ছাড়া আবার কি? দিন, তাস বাঁটুন।

একরকম সুতো আর নেই? আরো যে অনেক দরকার।

একবার ভেন্ডার কামরায় একজন ব্যাপারীর অনেক ক্ষতি করে দিয়েছিলাম, সে হাসিমুখে মেনে নিয়েছিলো। এমন ঘটনা ঘটলে মানুষের ওপর নতুন করে বিশ্বাস ফিরে আসে। কিন্তু দুঃখের কথা, এমন ঘটনা ঘটে বড় কম।

ট্রেন ছেড়ে দিয়েছে, পেছন থেকে দৌড়ে এসে উঠে পড়েছি ভেন্ডার কামরায়। ইলেকট্রিক ট্রেন, হুস্ করে গতি বাড়িয়ে ফেলেছে। এদিকে আমার বড় বিপদ। কোনোমতে সুতোর হ্যান্ডেলটা আঁকড়ে রেখেছি দুই বিশালকায় ঝুড়ির মাঝখানে, কামরার ভেতরে ঝুড়িতে আর বস্তায় পাহাড় হয়ে আছে। ভেন্ডার কামরায় আবার দরজার মাঝখানের মোটা হ্যান্ডেলখানা থাকে না। মাথার ওপরে দরজার প্যানেল আঁকড়ে ঝুলে আছি যা হোক করে। ভেতরে যেতে হলে সামনের টোমাটো ভর্তি ঝুড়িটা মাড়িয়ে যাওয়া ছাড়া কোনো উপায় নেই। টের পাচ্ছি হাত এবং পা ধরে আসছে। পড়ে যাবো যে! কি করি?

হঠাৎ ভেতর থেকে একজন ব্যাপারী বলল—বাবু, কি করছেন, পড়ে যাবেন যে! পোস্টের সঙ্গে ধাক্কা লাগবে। ভেতরে আসুন—

—কি করে যাবো ভাই, এই ঝুড়িটা—

—ওর ওপরে পা দিয়ে চলে আসুন। ভয় নেই, ওটা আমার ঝুড়ি—কেউ কিছু বলবে না।

তখন আর কথা বাড়াবার ক্ষমতা ছিল না। সেই টোমাটোর ঝুড়িতে পা দিয়েই ভেতরে এলাম। পায়ের নিচে থেঁতলে গেল অজস্র টোমাটো। লজ্জিতমুখে বললাম—তোমার অনেক ক্ষতি হয়ে গেল ভাই! কিন্তু না এলে আমি সত্যি পড়ে যেতাম—

—আমি তা বুঝতে পেরেছিলাম আপনাকে দেখে।

—যদি এর দাম হিসেবে কিছু—

সে হেসে উড়িয়ে দিলো। বলল—পাগল! একটা মানুষের [illegible] [illegible] চেয়ে কি ক'টা টোমাটোর দাম বড় হল! [illegible] [illegible] [illegible]—[illegible] [illegible] [illegible] বিক্রিত [illegible] [illegible] [illegible]। [illegible] [illegible] [illegible]—

[illegible] আমি [illegible] সে পয়সা নেয়নি কিছুতেই, কেবল আমার দেওয়া একটা সিগারেট বিনীত হেসে নিয়েছিল।

ট্রেন চলে। তার সঙ্গে জীবন। এককালে যার মুখ ট্রেনের জানালায় এক প্রাত্যহিক দৃশ্য ছিল—হঠাৎই একদিন তাকে আর দেখা যায় না। কিন্তু ট্রেনের ছুটি নেই। সে নতুনকে নিয়ে আসছে, আবার পুরনোকে পৌঁছে দিচ্ছে গন্তব্যে। সদ্য চাকরি পাওয়া তরুণ ছোকরাকে দেখেছি, কোঁচকানো প্যান্ট আর কাঁধছেঁড়া শার্ট পরে প্রথম অফিসে চলেছে। কাল অবধি বেকার ছিলো, সামনের মাসে জীবনে প্রথম মাইনে পেয়ে নতুন জামা কিনবে। সামনে অনেকগুলো বছর, ওপার চোখে পড়ে না।

আবার এই লোকাল ট্রেনেই দেখেছি রায়বাবুকে। ধুতির ওপর কালো কোট পরে আস্তে আস্তে ট্রেনে উঠছেন। বেশ বয়েস হয়েছে। শরীর ঝুঁকে পড়েছে সামনের দিকে। কে একজন ডেকে বলল—রায়বাবু যে! মুখ অমন শুকনো কেন? কি হয়েছে?

ঈষৎ হেসে রায়বাবু বললেন—আজ আমার চাকরির শেষদিন ভাই, কাল রিটায়ার করছি। মনটা ভাল নেই ভাই। অনেক দিন ডেলি প্যাসেঞ্জারী করছি, কাল থেকে আর আসবো না।

জানালার পাশে বিমর্ষ রায়বাবু বসে থাকেন। নৈর্ব্যক্তিক ট্রেন কোলকাতার দিকে এগিয়ে যায়। আজ তিনি বিশেষ করে কিছুই লক্ষ করেন না। কামরার সহযাত্রীরা নিজেদের মধ্যে নানা হেঁদো রসিকতা করে, অফিসের পলিটিকস্ নিয়ে জোর আলোচনা হয়। তিনি উৎসাহ বোধ করেন না। এসব তিনি ছাড়িয়ে এসেছেন। জানালার ধারে বসে থাকা তাঁর চুল এলোমেলো করে দেয় হু-হু বাতাস।

এভাবেই চিরবাহিনী নদীর মতো যাতায়াত করে লোকাল ট্রেন, চিরকাল তার কামরায় কামরায় দাঁতের মাজন, হাতকাটা তেল, ইঁদুরমারা বিষ বিক্রি করে ক্যানভাসারের দল। অনভিজ্ঞ কিশোর ধূপকাঠির বান্ডিল নিয়ে সলজ্জ ভঙ্গিতে সবাইকে অনুনয় করে। টাকায় দুটো করে বিকিয়ে যায় সস্তার কলম, টাকায় চারটে করে সরস্বতী লেবু। বাচ্চাদের সামনে নকল প্লাস্টিকের দাঁত পরে বিজ্ঞাপন দেয় চালাক খেলনাওয়ালা।

এসব ঐতিহ্যের ধারা নিরবচ্ছিন্ন বয়ে চলে। তার মধ্যে দিয়ে বদলে যান রায়বাবুরা, তাঁদের বয়েস বেড়ে যায়, চুল যায় পেকে। একদিন রিটায়ারের সময় হয়ে আসে।

সবাই রায়বাবুর মতো। একদিন প্রত্যেককেই শেষ ট্রেনে চাপতে হবে—এবং পরের দিন আর কোনো যাতায়াত থাকবে না।

সেদিনও ফিরি হবে হাতকাটা তেল, সস্তার কলকালেন্ডার, আমার প্রিয় ঝাঁট-গরম চানাচুর। পাশের নিত্যযাত্রীর হাত থেকে খবরের কাগজের একটা পৃষ্ঠা চেয়ে নেবেন কোনো অফিসবাবু। রেলের চাকায় চাকায় বাজবে জন্মমৃত্যুর বন্দীধ্বনি—দিয়ে যাই, নিয়ে যাই—দিয়ে যাই, নিয়ে যাই।

কেবল আমাদের তখন যাতায়াত ফুরিয়ে গিয়েছে।

কিন্নর কিন্নরী

হীরেন্দ্রকুমার বসু

: কুপারের কাছে আবার আমার ডাক
তিনি বললেন—মিঃ বোস,
র ভারতীয় গানে অর্কেস্ট্রা ব্যবহার
কেন ? ইংরেজী 'পেগান মিউজিক'-
ইখানি রেকর্ড হাতে তুলে দিয়ে
দ্যাখ দেখি এটার কিছু রূপান্তর
ার কিনা ?

ন্টা করব বলে বেরিয়ে এসেছিলাম।
এসে রেকর্ডটি শুনে ইংরেজী প্রত্যেক
রই বিশ্লেষণ করতে পারলাম,
ারলাম না একটি যন্ত্রের। পরের দিন
সাহেবের কাছে গিয়ে আবেদন
। তিনি হেসে বললেন—'ওই
নাম 'হাউইন গীটার'—জানি না,
চ এ যন্ত্র পাবেন কিনা !'

হু চেষ্টায় সন্ধান পেলাম মেসার্স
কোম্পানীতে। তাঁরা বলেন—এ
চাহিদা ইণ্ডিয়াতে নেই বলে রাখি
ন এর একটি লেশন বই তোমায়
রি... চেষ্টা করে দেখো যদি চোরা-
কেউ যদি বেচে দিয়ে থাকে।
বের চোরবাজারে সত্যিই এ যন্ত্রটিকে
আমার সঙ্গে আছেন শ্রীযুত তারক
রাজকে বংশীবাদক শ্রীঅলোক দের
তারক বেহালাবাদক কিন্তু নতুন
রূপায়ণে খুবই উদ্যোগী। তারক
'কিনে তো নি—তোর কাছে
এর বইও আছে..যা হোক করা

নতে ভুলেছি শিয়ালদহের কাছে
ক্লাব নামে একটি ক্লাব ছিল
ডিওতে এসে মাঝে মাঝে বাজাতো।
দঙ্গে তাদের সম্প্রীতি ছিল খুব।
দবার নাম আজ আর আমার স্মরণে
তবে 'তারক দে' তারক দের ভাই
'সুরেন পাল' (পটল) 'শান্তি
নাম আজও ভুলিনি। ....তারক দে
ারের গীটার কিনে আমার দেওয়া
ুক নিয়ে অক্লান্ত পরিশ্রমে গীটার
য় চেষ্টায় ব্রতী হলেন। কিন্তু
আমি অর্কেস্ট্রা সম্বলিত—ম্যায়
মেত দুখানি গান তৈরী করে
ল ফেলে দিলাম...তবে তাতে
পরিপূরক ম্যাণ্ডোলিন ছিল। এইক-
। ১৯২৯ সালের শ্রেষ্ঠ অবদান হলো

ভারতের সর্বপ্রথম অর্কেস্ট্রাসম্বলিত গান 'শেফালি তোমার আঁচলখানি বিছাও শারদ প্রাতে ও চৈতী হাওয়ায় কে দিলরে দোল'। গান দুখানি মিস লাইট (তারকবালা গেয়েছিলেন)....মধুসূদনদাদা পালায় ইনি মধুদাদার পার্ট করেছিলেন। এ ছাড়া ম্যাণ্ডলিনযোগে মিস্ বীণাপাণির গাওয়া 'ফাল্গুনে নিশি জাগে ও বাঁশরী বেজে যায় বনে বনে'....বাজার জয় করেছিল। গ্রামোফোন সেলস্ ডিপার্টমেণ্ট থেকে আমায় ধন্যবাদ জানিয়ে বলেছিল 'শেফালি তোমার' গানখানি এতদিনের রেকর্ড-সেল ভঙ্গ করে তিন মাসে পঁচাত্তর হাজার কপি বিকিয়ে গেল।

সাত নম্বর রামমোহন রায় রোডের ত্রিতল অধিবাসী ডাঃ অমিয় বসু ওরফে ই-উ-র আড্ডায় আমার আলাপ হয়েছিল একটি গুণী চিত্র-শিল্পীর সঙ্গে যিনি অবনীন্দ্রনাথের ছাত্র। তাঁর আঁকা ছবি যেমন আমাকে মুগ্ধ করেছিল তেমনি করেছিল তাঁর বাচনভঙ্গী। নাম তাঁর সুধীর ধরচৌধুরী। ১৯২৮ এর শেষে তিনি এক নির্বাক চিত্র প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলবার চেষ্টা করেন। যতদূর স্মরণ হয় তাঁদের কোম্পানীর নামকরণ হয়েছিল 'এসিয়াটিক ফিল্মস' এমনিতর। অফিস ছিল ইণ্ডিয়ান মিরার স্ট্রীটে। সুধীর ধর তাঁর অফিসে

সুনির্মল বসু

একদিন আমাকে নিমন্ত্রণ জানান। প্রতি সন্ধ্যায় আমার রেডিও আছে কাজেই বেলা ওটা নাগাদ তাঁর আস্তানায় গিয়ে পৌঁছলাম। তাঁর অফিসে তিনি উপস্থিত ছিলেন না—উপস্থিত ছিলেন তাঁর শ্যালক শ্রীপ্রমোদ দাসগুপ্ত। আমার নাম পরিচয় পেয়ে তিনি নিজেই আমার সঙ্গে বন্ধুত্ব করে ফেললেন। বললেন, সুধীরবাবু তাঁর কোম্পানীর ডিরেক্টরদের নিয়ে এখনি এসে পড়বেন কারণ আজ তাঁদের বোর্ডের মিটিং।

সত্যিই পাঁচ সাত মিনিট বসার পর সুধীর ধর এসে উপস্থিত হলেন—সঙ্গে তাঁর চার পাঁচজন ভদ্রলোক। আমার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিলেন—সবাই ধনী বা ধনীর পুত্র। তাঁরা আমার সঙ্গীত পরিচয়ে পরিচিত হয়ে খুবই খুশী হলেন। এঁদের মধ্যে সবচেয়ে আকৃষ্ট হলেন শ্রীসুধীরচন্দ্র তবে পদবীতে তিনি নান। বৌবাজারে বি, সি, নান কোম্পানীর মালিক। শুনলাম তিনি ও তাঁর পত্নী আমার গানের ভক্ত ....রেডিও ছাড়াও আমার গাওয়া ও প্রযোজনার সব রেকর্ডই তাঁর বাড়ীতে আছে।

কথায় কথায় বেলা পড়ে গেল—আমি রেডিও স্টেশনে চলে গেলাম।

এই সময় রেডিও স্টেশনে নিজেদের একটি নাটক বিভাগ খোলার কথা চলছিল এবং এর একটি লিখিত এস্টিমেটও মিঃ স্টেপলটন সাহেবের কাছে পেশ করা হয়েছিল। আজ রেডিও স্টেশনে পৌঁছেই নৃপেনদার কাছে খবর পেলাম যে মিঃ স্টেপলটন সাহেব আমাদের স্কিম অনুমোদন করেছেন এবং ইতিমধ্যে নৃপেনবাবু আমাকেই ওই বিভাগ চালনার ভার অর্পণ করা ধার্য করেছেন। কাজেই ১৯২৯ সালেই বেতার নাট্যকে দলের প্রথম পত্তনী ঘটে। বেতার নাট্যকে দলের প্রথম নাটকের উদ্বোধন হলো আমারই লেখা গীতি-নাট্য 'মানভঞ্জন' দিয়ে। প্রথম প্রয়াসের প্রায় অংশের বোঝা আমাকেই বইতে হয়েছিল এমন কি নায়কের ভূমিকায় আমাকেই অবতরণ করতে হয়। অবশ্য সঙ্গে ছিলেন ধীরেন দাস—মিস বীণাপাণি বেতারের অন্যান্য শিল্পীবৃন্দ।

১৯২৯ থেকে ১৯৩৪ সালের শেষ পর্যন্ত আমিই ছিলাম বেতার নাট্যকে দলের অধিনায়ক। ব্যবস্থাপনা ও সঙ্গীতাংশের দেখাশুনা করতে সময়াভাবে আমি বীরেন-বাবুকে এনে নাটকের আংশিক শিক্ষার ভার অর্পণ করি—বীরেনবাবুর এই গুণটি বরাবরই প্রকট ছিল ও শিক্ষাও দিতেন সুন্দর করে। এই সালেই শ্রীপ্রেমাঙ্কুর আতর্থী বেতারগোষ্ঠী ছেড়ে ফিল্ম লাইনে যোগদান করেন এবং বেতার জগতের সম্পাদকের আসনে এলেন শ্রীনলিনীকান্ত সরকার।

১৯২৯ সালে রেডিও গতানুগতিক কাজ ব্যতিরেকে নতুন বিভাগের ভার দিয়ে আমার কর্ম-গণ্ডী এতদূর বেড়ে গেলো যে এইচ-এম-ভির ৩০ সালের ইস্যুতে নতুনত্বে কিছুটা ভাটা পড়ে। তবুও সে

নিয়মে কমলা ঝরিয়ার গাওয়া মীরার ভজন, আঙ্গুরবালা গাইত 'মন ওঠে না স্বারকাতে', ধীরেন দাস গাইত আগমনীর দুখানি গান 'মধ্যে মধ্যে মঙ্গল গাও আর আজ আগমনীর আবাহনে' মিস বীণাপাণির বাংলা ভজন 'শ্রীরাধা মায়ের বাঁশরী ও হরি বৃন্দাবন কুঞ্জ মাঝে' গানগুলি সঙ্গীত জগতে ল্যান্ডমার্ক সৃষ্টি করলো। ৩০ সালে এইচ-এম-ভি শিল্পীগোষ্ঠীর অন্তরে এক বিরোধ মনোভাব সৃষ্টি হয়—রয়েলটির প্রশ্ন নিয়ে। আমাদের এই মুভমেন্টের লিডার ছিলেন স্বয়ং কাজীদা। এ সম্বন্ধে পরে বলছি....

১৯২৯ এর শেষ বরাবর একদিন সকালে সুধীর ধরের ম্যানেজার প্রমোদ দাশগুপ্ত আমার বাড়ীতে এসে হাজির হলেন। ভাবলাম বুঝি সুধীর ধর আমাকে ডেকে পাঠিয়েছেন, কিন্তু কথায় কথায় প্রকাশ পেলো যে সুধীরের প্রতিষ্ঠানটি কার্যকরী হবে বলে তাঁর মনে হচ্ছে না। আমার সাহচর্যের জন্য তাই তাঁর আমার বাড়ীতে আগমন। ভদ্রলোক প্রায় ঘণ্টাখানেক বসে আমার সঙ্গে গল্প করেছিলেন তাতে মনে হয়েছিল ফিল্মী জগতে তিনি একজন প্রতিষ্ঠাবান পর্যালোচক। তৎকালে হলিউড আর্টিস্টরা বা ডিরেক্টররা কি দিয়ে খান—কি পরেন—কি কি করে বেড়ান—কার জন্যে কত টাকায় চুক্তিবদ্ধ করা আছে—তাঁর যেন কণ্ঠস্থ। তাঁর চমকপ্রদ বক্তৃতায় আমার মনে হয়েছিল সুধীর ধর এতবড় 'ফিল্মী এক্সপার্ট' ম্যানেজার নিয়ে কেন আজ পর্যন্ত কাজে লাগায় নি।

ওঠার সময় প্রমোদবাবু বললেন—'সকালের দিকে তো আপনার বিশেষ কাজ-কর্ম থাকে না—চলুন না খাওয়া দাওয়া সেরে আপনাকে কিছু ফিল্মী ব্যবসায়ীদের অফিসে ঘুরিয়ে আনি—তাহলেই বুঝতে পারবেন আজকের ফিল্মজগতের চেহারা কি।

সে সময় ফিল্ম স্টুডিও বলতে কিছু ছিল না। ছবি তোলা হোতো বড়লোকদের বাগান বাড়ীতে বা কারো ছাদের ওপর খোলা রোদ্দুরে—ছোটখাট ২।৩ ফ্ল্যাটের সেট তৈরী করে। বাড়ীর মধ্যে স্যুটিং হলে সূর্যালোককে আয়নায় প্রতিফলিত করে—জোড়া লাগানো কাঠের তক্তার উপর ফেলা হতো—আবার সেই আলোকিত তক্তায় আলো শিল্পীদের মুখে বা ঘরের আসবাবপত্রে ফেলে আলোকিত করা হতো। ক্যামেরা ঘুরতে হাত দিয়ে হ্যান্ডেল ঘুরিয়ে। কাজেই ফিল্মী জগত আবদ্ধ ছিল তৎকালীন ফিল্ম ব্যবসায়ীদের অফিসে।

প্রমোদবাবু আমাকে নিয়ে প্রথমদিন গেলেন ধর্মতলায় শ্রীধীরেন গাঙ্গুলী মহাশয়ের ব্রিটিশ ডোমিনিয়নের অফিস ও স্টুডিওতে। সেখানে ছবি হয়েছিল ফ্লেমস অফ ফ্লেমস' (পদ্মিনী)। পদ্মিনীর পার্টে অভিনয় করছিলেন মিস্ প্যাসপার। ধীরেন বাবু তাঁর ফিল্মী নাম করেছিলেন 'সবিতা দেবী'। আর একজন সুন্দরী দূরে বসে-ছিলেন তাঁকে দেখিয়ে প্রমোদবাবু আমায় কানে কানে বলেন—'উনি হচ্ছেন মিসেস গাঙ্গুলী। উনিই হচ্ছেন ঠাকুরবাড়ীর মেয়ে উনিও এই ফিল্মে সেকেন্ড হিরোইন হয়েছেন। প্রথমটা কিছুতেই রাজী হন নি—শেষে অনেক বুঝিয়ে সুঝিয়ে ধীরেন-বাবু বলেন—'আমি নিজে পুরুষের ভূমিকায় না নামলে কোন ভদ্রঘরের মেয়ে ফিল্মে আসতে চান না'....স্বামীর কথায় অবশেষে রাজী হয়েছেন, প্রথমে বলেছিলেন—নামতে পারি যদি তুমি আমার হিরোর রোল করো।' ধীরেনবাবু বলেন—সে কি করে হয়—আমি যে কমেডিয়ান বরং তোমার পছন্দ মত অন্য কারোর নাম করো। মিসেস গাঙ্গুলী অনেক ভেবে বলেন—তাহলে মাস্টারমশাই-এর সঙ্গে পারি। মাস্টারমশাই মিসেস গাঙ্গুলীকে ইংরেজী পড়াতেন। ধীরেনবাবু তাই মেনে নিয়ে মাস্টারমশাইকে শ্রীমতীর হিরোর রোলে নামাতে রাজী করলেন। এই মাস্টারমশাই হচ্ছেন পরবর্তী দিনের প্রখ্যাত ডিরেক্টর প্রোডিউসার শ্রীদেবকীকুমার বসু। ধীরেনবাবুকে সবাই ডি, জি, বলেই ডাকতেন— ওঁর কোম্পানীতেই হাতেখড়ি দিয়েছেন মিঃ পি, সি, বড়ুয়া, কল্লোল পত্রিকার সম্পাদক শ্রীদীনেশ দাস আরও অনেক বিখ্যাত শিল্পীবৃন্দ ও ডাইরেক্টরস্।

তারপরের দিনও প্রমোদবাবু বেলা ১২টা নাগাদ এসে উপস্থিত হলেন। আমার সঙ্গে নিয়ে হাজির হলেন এক নতুন চিত্রোদ্যোগীর আস্তানায়—নাম 'জয়গোপাল পিকচাস।' এঁরা তুলছিলেন 'উনকার-নেশন।' সারা রাজপুতানা ঘুরে এঁদের ছবির স্যুটিং হয়েছিল। এ ছবির নায়ক ছিলেন শ্রীকেদার চট্টোপাধ্যায় — প্রবাসী সম্পাদক ও সত্ত্বাধিকারী শ্রীযুক্ত রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের সুযোগ্য পুত্র। হিরোইন ছিলেন একটি এ্যাংলো ইন্ডিয়ান মেয়ে। শুনে প্রমোদবাবুকে জিজ্ঞাসা করলাম... কোন বাঙালী ভদ্র পরিবারের মেয়ে কি ফিল্মে নামতে চান না। প্রমোদবাবু বললেন...সবে শুরু করেছে...যেমন কাল ডিজির স্ত্রীকে দেখলেন। ইয়োরোপীয় শিক্ষায় অগ্রণীর দল থেকে কেউ কেউ এগিয়ে আসছেন...নইলে থিয়েটারের অভি-নেত্রীরাই হিরোইন হন।

অফিস ঘরের দরজা পার হয়ে হলে পদার্পণ করে দেখলাম....চারুদা ও বুড়ো-দাকে। দুজনেই একসঙ্গে বলে ওঠেন—আরে হীরেন যে, এখানে কি খবর। আমি একটু আড়ষ্ট হয়ে উত্তর দি....এই দেখতে এলাম। বুড়োদা মানে প্রেমাংকুর আতর্থী মশাই আর চারুদা হচ্ছেন চিত্রশিল্পী শ্রীচারু রায়। ওঁরা দুজনেই আমার চেনা....খুব যত্ন করে বসালেন, চা খাওয়ালেন....পরে শ্রীনীতেন বসু ক্যামেরাম্যানের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিয়ে বুড়োদা বলেন—দেখ তো নীতিন.... এর চেহারাটা ফোটোজেনিক কিনা ? নীতিন-বাবু হেসে বলেন....নেমে পড়ুন না ভালই তো। আমি কেমন থ' মেরে চুপ করে থাকি...প্রমোদবাবুকে এঁদের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিলাম—বললাম, এঁর ক্যারেক্টার এক্টার হবার খুব সখ। সবাই চুপ করে রইল—বুঝলাম হয়ত মনে ধরল না এঁকে।

এরই দু দিন পরে প্রমোদবাবু আমার সঙ্গে দেখা করতে এলেন। ওঁর বড় ইচ্ছে একবার বাগমারীতে পাড়ি জমান। ওখানে ঘনশ্যামদাস চৌখানী স্টুডিও খুলেছেন। ডিরেক্টর হচ্ছেন শ্রীযুক্ত কালীপ্রসাদ ঘোষ।

আমি বলি, কালীবাবু আমার আলাপী লোক। উনি কে জানো ? উনি হচ্ছেন মিনার্ভা থিয়েটারের প্রোপাইটর উপেন মিত্র মহাশয়ের আপন ভাগ্নে। মিনার্ভা থিয়েটারে 'আত্মদর্শন' বইখানা মঞ্চস্থ করার সময় উনি পড়াশুনা ছেড়ে মামার থিয়েটারে যোগদান করেন। উনি ছিলেন মেডিক্যাল কলেজের থার্ড ইয়ার স্টুডেন্ট। থিয়েটারের নেশায় ওর পড়াশুনা সব ইতি হয়ে গেছে। ওঁদের থিয়েটারের প্রোগ্রাম তো আমারই প্রেসে ছাপা হত।

প্রমোদবাবু বলেন .... রেণুবালাকে উনিই তো সুখের ভূমিকায় প্রতিষ্ঠা করিয়ে ছিলেন....তাকে নিয়েই চৌখানী সাহেবকে দিয়ে এই প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলে-ছেন। ওদের ছবি হচ্ছে—শংকরাচার্য। শ্রীনির্মলেন্দু লাহিড়ী শংকরাচার্যের রোল অভিনয় করছেন। শুনেছি ওখানে এখনও দু-চারটা ক্যারেকটার রোল করবার লোকের দরকার, তাই ভেবেছিলাম একবার ঘুরে আসব।

আমি বলি—বেশ আমি কালীপ্রসাদ-বাবুকে চিঠি লিখে দিচ্ছি, আপনি নিজেই একবার চলে যান। এছাড়া নির্বাক শ্রীকান্ত হচ্ছে শুনেছি..আমার এক বন্ধু চিত্রশিল্পী শ্রীকান্তিচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় শ্রীকান্তের ভূমিকায় অভিনয় করছেন। আমাদের বড়দা অর্থাৎ শিশির ভাদুড়ীর ভাই তারাদা করছেন ইন্দ্রনাথের রোল—ওখানেও একটু চেষ্টা করতে পারেন।

দু জায়গাতেই চিঠি দিয়ে পাঠিয়ে-ছিলাম প্রমোদবাবুকে কিন্তু কার্যকরী কিছুই হয় নি। শেষে আমার বাদুড়-বাগানের বাড়ীর পিছনে লক্ষ্মীবিলাস হাউসে মিঃ মিত্রের কাছে প্রমোদবাবুকে পাঠালাম। আমাদের চিরদিনের নগেনদার তত্ত্বাবধানে ওরা তুলছিলেন দেবদাস পার্বতীর ভূমিকায় আমাদের রেকর্ডের গায়িকা মিস লাইট নেমেছিলেন। প্রমোদবাবু ওখানেও ঘুরে এসে বললেন—ওঁদের বই শেষ।

১৯২৯-৩০ সালের প্রথমেই নৃপেন-বাবু বললেন—তোমার রেকর্ডে প্রভাতে আশ্রম দৃশ্য আমার খুবই ভাল লেগেছে—অমনিতর একটি প্রোগ্রাম এখানে রচনা করো।....আমি বললাম প্রভাতীদৃশ্য করতে গেলে প্রভাতী প্রোগ্রাম করতে হবে অর্থাৎ ভোর চারটের সময় থেকে প্রোগ্রাম শুরু হওয়া চাই। তখনকার দিনে টেপ রেকর্ডিং-এর আবিষ্কার হয় নি....রাত ৪টার প্রোগ্রাম করতে হলে শিল্পীদের রাত তিনটের সময় তুলে রেডিও স্টেশনে উপস্থিত করতে হবে। সব শোনার পরও নৃপেনবাবু আমায় এ প্রোগ্রামের জন্যে তৈরী হতে বললেন।

কাজেই 'প্রভাতে আপনার বন্দনা' নাম দিয়েই প্রভাতী প্রোগ্রাম শুরু হলো ১৯৩০-এর প্রথমাংশেই।

ভোরে কনসার্টের জন্য সাউন্ড-বক্স দিয়ে মাইকটা জানলা দিয়ে বার করে পথের চার্চের বড় বটগাছের দিকে এগিয়ে দেওয়া হলো। একাউস্টিক শব্দে ঝর্ণার ঝর ঝর জল ঝরা শব্দের সৃষ্টি করা হলো—মনে উঠলো এক নতুন যন্ত্রের সুর। পেছনে উচ্চ টানে বেহালা।

নতুন যন্ত্র বলতে কি ব্যবহৃত হয়েছিল তা একটু বুঝিয়ে বলি। আপনারা নিশ্চয়ই বাচ্চাদের মিউজিক্যাল বক্স দেখেছেন যা থেকে টুং টাং ডিং ডাং করে সুললিত সুর বাজে। আমাদের যন্ত্রটি ছিল এর বড় সংস্করণ। টাকার জমিদার বাড়ীতে এই যন্ত্রটাকে ফ্রান্স থেকে আমদানী করেন এবং স্টিল প্লেটে ভারতীয় রাগ সুরালী সংযোজিত প্লেট করিয়ে আনিয়েছিলেন। রাগের স্বরলিপি অনুযায়ী তাঁরা প্লেট করে দিয়েছিলেন। ফলে তাঁর ভোরের সুরের মধ্যে রামকেলি-গুর্জরী টোড়ীর প্লেট ছিল। এই যন্ত্রটি আমি আবিষ্কৃত করে ওঁদের বাড়ী থেকে চেয়ে এনে ভোরের প্রোগ্রামে গুর্জরী টোড়ীর রেকর্ড চালিয়ে-ছিলাম। ঝর্ণাধ্বনিকাকলী ও সুর সংযোগে এক অনবদ্য সঙ্গীত লহরী ঘরে ঘরে প্রচারিত হতে থাকে। পাখির ডাক, স্বরলহরী ভায়োলিনে তার প্রতিধ্বনিত সঙ্গীত মিলে এক অভূতপূর্ব পরিস্থিতির মাঝে উঠতে থাকে সংস্কৃত স্তোত্রমালা। উদাত্ত সুরে বীরেনবাবুর পাঠ ও তার সঙ্গে সুললিত কণ্ঠে স্ত্রী কণ্ঠে গান। মিস আভাবতীর কণ্ঠমাধুরী সবাইকে ছাড়িয়ে শ্রোতাদের কানে এক পারলৌকিক অনুভূতি এনেছিল। এই মনোরম অনুষ্ঠানে শ্রোতাদের বহু অনুরোধপত্রে ১৯৩১ সালে বাণীকুমারকে দিয়ে অনুরূপ রচনা করান হয়—যার নাম ছিল 'বসন্তেশ্বরী'। যার ছখানি রাগে সুর সংযোগ করেন শ্রীযুত হরিশচন্দ্র বালি এবং বাকী গানের সুর করেন শ্রীপংকজকুমার মল্লিক। এই অনুষ্ঠানটিই 'মহিষাসুর মর্দিনী' পরিকল্পনার উৎস বলা চলে। মহিষাসুরমর্দিনীর প্রভাতী প্রোগ্রাম শুরু হয় ১৯৩২ সালে।

এর আগেই ১৯২৯ সালের শেষাংশেই আমার কর্মসূচীর পরিবর্তন বিচিত্রভাবে ঘটতে থাকে। এ টি সেনের পুত্র শ্রীসুবোধ মজুমদার আমাকে অনুরোধ জানান যে, তাঁর ভাইপো মধুসূদনকে গান শেখাতে। মধুসূদন দৃষ্টিহীন ছিলেন, তার আবেদন তাই অগ্রাহ্য করতে পারি নি। তাকে গান শেখানো শুরু করতেই আমার মাথায় খেলে গেল যদি দৃষ্টিহীন শুধু শ্রবণগ্রাহ্য সঙ্গীত দিয়ে নিজেকে সঙ্গীতজ্ঞ করতে পারে, তবে অন্যকে মাইকের মাধ্যমে গান শেখান কেন সম্ভব হবে না? আমি এই কথাটি রেডিওতে এসে নৃপেনদাকে বলি। তিনি বলেন—শিক্ষার্থীদের জিজ্ঞাসা কিভাবে পূরণ করা হবে? আমি বলি—কেন চিঠির মাধ্যমে। নৃপেনবাবুর কথাটা এখনই মনো-নীত হয়ে গেল—বলে মিউজিক টেনিং ক্লাস খোলার জন্যে আমাকে আয়োজন করতে বলেন। ১৯৩০ সনেই আমি সঙ্গীত শিক্ষা আসরের উদ্বোধন করি। উদ্বোধন করা হল এ আসরের অন্ধ গায়ক শ্রীকৃষ্ণ-চন্দ্র দেকে দিয়ে। কৃষ্ণচন্দ্র তাঁর শিক্ষার আসরে শাস্ত্রীয় সঙ্গীত দিতে শুরু করেন কিন্তু শিক্ষার্থীদের এ সঙ্গীত মনোমত হচ্ছিল না। তাই দেখে আমি নৃপেন-বাবুকে অনুরোধ করি—মিউজিক টেনিং ক্লাসটা রবীন্দ্র সঙ্গীতের শিক্ষার আসরেই পরিণত করতে—কারণ রবীন্দ্র সঙ্গীতের প্রভাব তখন খুবই বেড়ে উঠেছিল। তাই শ্রীপংকজকুমার মল্লিককে ওই আসরে বসাতে আমি ও বীরেনবাবু নৃপেনবাবুকে অনুরোধ জানাই. সেই অবধিই পংকজবাবু সঙ্গীত শিক্ষার আসর পরিচালনা করে আস-ছিলেন।

১৯২৯ সালে রেডিওর যেমন বিভাগ রচনার কাজ বেড়ে গেছিল তেমনি আমার সঙ্গীত ও একাউন্টিক মুখর নাটিকার লেখা ও সংযোজনা বেড়ে চলেছিল—এ আসরে প্রথমে শব্দবিন্যাসযোগে নাটিকা অভিনীত হল আগমনী—প্রধান ভূমিকায় বীরেন ভদ্র। ফাওয়া—মিস বীণাপাণি, আভাবতী, প্রফুল্লবালা—ধীরেন দাস, আমি ও নায়কের ভূমিকায় বীরেনবাবু। এর পর হল 'ওমর খৈয়ামের নাট্যরূপ'। ওমর খৈয়াম সর্বজন আদৃত হয়ে রেডিওতে ৬ই নভেম্বর ১৯২৯ সালে অভিনীত হয়। রচনা-গীতিকার ছিলাম আমি—প্রযোজক ছিলেন নৃপেনবাবু ও রাইবাবু। ওমরের ভূমিকায় বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্র, সাকী মিস প্রফুল্লবালা, ছন্দ মিস আভাবতী, গুলপিয়ার মিস বীণাপাণি। অর্কেস্ট্রা অরসিক ক্যাম এবং বিশিষ্ট বেহালা বাদক শ্রীঅবনী মুখো-পাধ্যায়। পরে ১৯৩০ সালের কাজলালের সপ্তম সংখ্যায় কার্তিক ১৩৩৬ সালে এটি প্রকাশিত হয়। অবনীবাবু চিত্রসংসদের আরও একজন গুণী যিনি অপূর্ব বেহালা বাজাতেন।

১৯৩০ আগস্ত প্রায়। ইতিমধ্যে দেবদার নাট্যকে দলের নাম শ্রোতাদের মনে দাঁড়িয়ে পড়েছে। তাকে আরও বড়িয়ে তোলার জন্য ঠিক হয়েছে যে সামনের বছর থেকে দল অভিনেতা-অভিনেত্রীদের আহ্বান জানান হবে। এই সূত্রে শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্তীকে (হাবুলদা..যিনি পাবলিক থিয়েটারের প্রমটার ছিলেন) আমার সহকারীর পদে নেওয়া হল। হাবুলদাকে দিয়ে আমি মনে মনে ঘুরে অভিনেত্রী ও অভিনেতাদের সঙ্গে সংযোগ স্থাপন করছি যাতে করে বছরে আমরা ৭২ খানি করে বই অভিনয় করতে পারি..তার মধ্যে তাদের বড়টি রচনার গীতিবহুল নাট্য এবং চারটি পুরোনো ও ঘণ্টাব্যাপী পূর্ণ নাটক করা সম্ভব হয়।

বোধন শুরুতেই, বললাম মাঝে সাইকেলযোগে রেডিও স্টেশনে চলেছি, পিছু হতে হঠাৎ ডাক এলো—হীরেনবাবু ও হীরেনবাবু।

ফিরে দেখলাম শ্রীযুত মুরলীধর মহাশয় তাঁর বহুবাজার স্ট্রীটের দোকানের সামনে দাঁড়িয়ে ডাকছেন। নমস্কার! বলে পাশে গিয়ে দাঁড়াতেই তিনি প্রশ্ন করলেন—ফিল্মের কতদূর কি হল?

আমি তো অবাক! বললাম—সে কি মশাই—কোম্পানী করছেন আপনারা আর আমি জানব ফিল্মের কতদূর?

উনি হেসে বলেন—'আমাদের ও কোম্পানী হবে না—নানা মুনীর নানা মত, তাছাড়া যাক সে কথা। কত টাকা হলে একটা ফিল্ম তোলা যায় বলুন দেখি?'

কিছুই না জেনে উত্তর দিলাম—'আট-দশ হাজার টাকা হলেই হল বোধ-হয় সেই রকমই তো সব শুনি।'

অবশ্য এ অংকটা প্রায়ই পমোদ আমার কানের কাছে ঘ্যান ঘ্যান করে বলত।

(চলবে)

অশোক সাহার ছবি

ভাবে নি, কেউ ভাবতে কিংবা মানতে চায় নি।

আমি কচি খুকী ছিলাম না; স্নেহ-পরায়ণ অভিজ্ঞতাপ্রবীণ পিতা-মাতার যুক্তিমালার অখণ্ডনীয়তা হৃদয়ঙ্গম করা আমার বুদ্ধির অতীত ছিল না; ধর্ম আলাদা, সংস্কৃতি ভিন্ন, ভেলেপিলে হবে শংকর....সবই বুঝল মন, বুঝল না অন্ত-রাত্মা।

প্রেম নাকি অন্ধ! এক দৃষ্টিতেই নাকি মানুষের (কিংবা মেয়েদের?) প্রেমে পড়ার নিদর্শন বিরল নয়। আমার বেলায় কিন্তু তা হয় নি। তবে অশোক জার্মানী ফিরে যাওয়ার পরে চিঠিতে যোগা-যোগ বজায় ছিল বটে। বড়দার কোর্সটা তখন শেষ, অশোক একা। কথা ছিল, তরুণী শিক্ষয়িত্রী আর তার বাঙালী ছাত্র ইতালীয় ভাষায় পত্র বিনিময় করবে। নব-দীক্ষিত অশোকের অনুশীলনের খাতিরে। তা কিন্তু হল না। চুলোয় যাক প্র্যাকটিস! অপরিচিত বুলিতে মন প্রকাশ করা যায় না। জার্মান জবানেই লিপিকার লেনদেন চলতে থাকল।

অশোক লিখত বাবা-মায়ের আর ছোট বোনটির কথা, কলকাতার কথা, বর্ষাকালের কথা, রবীন্দ্রনাথের কথা—আর কবিতা : 'আমি একা চলেছিনু সংসারের কণ্টকাকীর্ণ গিরিসংকটে..' আমি লিখতাম বাবা-মায়ের আর ভাই-বোনদের কথা, আমাদের গ্রামের কথা, গরু-বাছুরের কথা, মহাকবি দান্তের কথা—আর কবিতা : 'খেয়া যদি পার হতে হয় এই ভুবন-সাগরে, পার হব দুজনে, পরস্পরের পাণি ধারণ করে...'।

গল্পটি বাড়িয়ে লাভ? অশোককে আনুষ্ঠানিক 'পাণি গ্রহণে' রাজি করিয়ে বাড়ি ছাড়লাম শেষ পর্যন্ত। না, লুকিয়ে নয়, সবাইকে জানিয়ে, পিতা-মাতার কণ্ঠা-ক্লিষ্ট আশীর্বাদ কুড়িয়ে।

বড় ইচ্ছা ছিল, বিয়েটা গির্জাতেই সম্পন্ন হোক; অশোকের আপত্তি ছিল না, সমর্থন ছিল। এক পাদ্রির গোঁড়ামির জন্য তা সম্ভব হল না। রেগে-মেগে অশোক তড়পেছিল : 'আপনাদের গির্জার চৌকাঠ জীবনেও, ভুল করেও, মাড়াব না আর।' বাক্যটা অবশ্য জার্মান ভাষায় আরও ভয়ানক শোনায়।

আমার জীবনের ট্র্যাজেডি এই যে, আমাদের সরকারী বিবাহ আইনগতভাবে একান্ত সিদ্ধ হলেও খ্রীস্টমণ্ডলীর টেকনি-ক্যাল দৃষ্টিতে আমি অশোকের রক্ষিতা বই আর কেউ নই—আর আমাদের ভবিতব্য ছেলে-মেয়েরা অবৈধ। না, আমার প্রতি খ্রীস্টমণ্ডলীর অবিচার কিন্তু নেই : এখনও অনায়াসে পাঁচ মিনিটের এক অনুষ্ঠানে সব ঠিকঠাক হয়ে যেতে পারে—বাধা শুধু অশোকের সেই কঠোর শপথটা। জার্মান পাদ্রির সঙ্গে ওর ঐতিহাসিক ঝগড়ার দিন থেকে আমিও আর কোন গির্জার চৌকাঠ মাড়াই নি, কোন দেশেও না—জার্মানীতেও না, ইতালিতেও না, ভারতেও না। প্রাণ কাঁদে... চুপি চুপি প্রাণ কাঁদে ...আর তবু স্বামীকে পীড়াপীড়ি আমি করব না; নিজ থেকেই যেদিন ওর শপথ ভাঙবে, সেদিনই আমি ওকে নিয়ে গির্জায় যাব।

আমাদের এক খোকা হল। ছেলেটি ফর্সাই—ওর বাপও ভারতীয় বিচারে গৌরবর্ণ যে! পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে অশোক ইতিমধ্যে জার্মানিতেই চাকরি পেয়েছে। ছোট ফ্ল্যাটে আমরা থাকি, রোববারে ছোট গাড়িতে ঘুরতে যাই, ফিজে এক সপ্তাহের বাজার আছে, বিল্ডিং-এর গিন্নীদের সঙ্গে আমার ভাব হয়েছে, ছুটি কাটাতে যাই ইতালিতে, বাপের বাড়িতে। শ্বশুর-শাশুড়ির প্রতি অশোকের দুর্বলতা, অত্যুক্ত না হলেও, অকৃত্রিম, দাদু-দিদা নাতি বলতে অজ্ঞান.... স্বর্গসুখ আর কাকে বলে?

সুখস্বর্গ একদিন টলে উঠল বজ্র-ঘাতে। কারখানার মালিকেরা—সরকারের আদেশে বোধ হয়—ভদ্রভাবে জানিয়ে দিলেন যে, উন্নয়িমান দেশের ছাত্র অশোক যে জনপানির কল্যাণে জর্মানিতে ট্রেনিং নেওয়ার সুযোগ পেয়েছে, তার এক শর্ত এই যে, নিজের দেশের উন্নতির জন্য, নিজের দেশে ফিরে নিজের দেশে সে কাজ করবে। কথাটা মিথ্যা নয়, তবে ওর ব্যতি-ক্রমেরও নিদর্শন মেলে। দরখাস্তের পর দরখাস্ত লেখা হল। সবই বৃথা; আমাদের 'ব্যতিক্রম' হতে দেওয়া হল না, ছ'মাসের মধ্যে আমাদের জার্মানি ছাড়তে হবে। তবে কর্তৃপক্ষেরা অমানুষ নন, কলকাতায় অবস্থিত এক জার্মানসহযোগিতাপুষ্ট ফার্মে অশোকের হয়ে তাঁরা সুপারিশ করবেন বলে প্রতিশ্রুতি দিলেন।

বলেছিলাম, ইতালিতে বরং চাকরি খোঁজা হোক! কিন্তু যেখানে দেশের মানুষ পর্যন্ত দেশ ছাড়ে কাজের সন্ধানে, সেখানে বিদেশীদের স্কোপ কতটুকু? আর সুযোগ পাবেই বা ওরা কেন? অবশেষে আমরা স্থির করলাম, ইতালির পাশ্চাত্ত্য ঐশ্বর্যের মধ্যে দিন এনে দিন খাওয়ার চেয়ে কলকাতার হাজার অসুবিধা সত্ত্বেও সেখানে দেড়হাজারী মাইনের চাকরি নেওয়া অধিকতর সঙ্গত।

মানসিক প্রস্তুতি হিসেবে দেখেছিলাম 'পথের পাঁচালি' (এত দারিদ্র্যের দৃশ্যে শিউরে উঠেছিলাম; এমন দেশেও কি মানুষ বাঁচে?....), পড়েছিলাম ইতালীয় অনুবাদে 'শ্রীকান্ত' (টুরিস্টদের আকর্ষণ করতে হলে অন্য ধরনের মাল বাজারে ছাড়ার প্রয়োজন আছে।) প্রত্যাগত পর্যটকদের মুখে শুনে-ছিলাম, মহানগরীর রাস্তায় রাস্তায় বলদ ঘোরে, সাপ বেরোয়, মানুষ মরে....। অশোক আমার স্তূপীকৃত ভয় ও আশঙ্কা নির্বাসিত করে বলেছিল : 'বাবামা আছেন, বোন আছে : তোমার আদরের অভাব হবে না। কলকাতার রাস্তায় বলদ, সাপ আর মড়াদের সঙ্গে বোঝাপড়া করতে বলছি না; শ্বশুর-বাড়িতে নিজেকে খাপ খাওয়াতে পারলেই হল। সত্যজিতের সাবটাইটেল-ওয়ালা ছবি, শরৎচন্দ্রের তর্জমা করা গল্প আপাতত

[..]তে যাও; বাংলা শেখ!' একটু আবদ্ধ [..] বাংলা হরফ শিখতে শুরু করেছিলাম।

[..] ছেলে যে বিদেশ থেকে বিয়ে করেছে, [..] মারাঠিবর্গী কন্যাটি যে বিদেশিনী, [..] খবর পেয়ে অশোকের বাবা-মা আহ্লাদে আটখানা হন নি। হওয়ার কথাও ছিল না। [..] তাঁরা মূর্খ নন, অধিকন্তু হারিয়েছেন [..] ছেলেটা হারাতে যাবেন কোন্ দুঃখে? [..] অসন্তোষ তাঁরা প্রকাশ করলেন না, [..] লিখলেন, বৌমাকে অভ্যর্থনা জানাতে তাঁরা উদ্‌গ্রীব, অশোক কবে ফিরছে?... [..] অত্যন্ত ভয়, বৌমার প্রতি তাঁরা [..] হলে ছেলে পাছে জার্মানির স্থায়ী বাসিন্দা হয়ে থেকে যায়! বাবা-মা-র মনোভাব—আর কূটনীতি — বুঝতে অশোকের বাকি রইল না, বাড়ি ফিরল বটে, তবে ভালোবাসার তাগিদে ততটা নয় যতটা [..] তাগিদে, পেটের তাড়নায়।...

দমদমের বিমান-বন্দরে অশোকের বাবা-মা'র মতো—আর তারই অনুকরণে—শ্বশুর-শাশুড়ীর পদধূলি গ্রহণ করলাম। [..], তাতে পারিবারিক চুম্বন-বিনিময় ছিল, আর তবু বিদেশিনী আমি [..] ননদকে দেখে আত্মসংবরণ করতে পারলাম না, উষ্ণ আলিঙ্গনে জড়িয়ে ধরলাম।

বালিগঞ্জ-প্লেসের পৈতৃক বাড়িতে পৌঁছবার আগেই কিছু কিছু বুঝে নিলাম, এক, ননদটি সহানুভূতিশীল; দুই, পারিবারিক সমস্যাগুলি উপলব্ধি করার মতো বুদ্ধি ও [..] শ্বশুরের আছে; তিন, শ্বশুরবাড়ির [..] উপচারিণী। সমীক্ষণের [..] এক-আধটা এই বুদ্ধিমান উক্তগুলোর পর বুড়োর বুদ্ধি ও বয়সের প্রভাব ওটুকু।

উত্তর : হ্যাঁ, জানতুম। শুনেছিলাম, বাঙালী ছেলে নাকি বিয়ে করতে যাওয়ার আগে মাকে বলে যায়, 'তোমার জন্য দাসী আনতে চললুম!' এতটুকু মর্যাদা পর্যন্ত আমি পেলাম না : দাসীদের সঙ্গে তবু মিষ্টি কথা বলে, শাশুড়ি তা-ও করলেন না। সংসারে আমাকে কোনো কাজ করতে দিলেন না, কোনো কিছুতে হাত দিতে দিলেন না, আমাকে উপেক্ষা করে চললেন।

না, ভাষা নিয়ে তেমন অসুবিধে হল না। দম্ভ করতে চাই না, তবে ইংরেজি না শিখলেও অল্পদিনের মধ্যে দৈনন্দিন জীবনের আটপৌরে বাংলা এমন আয়ত্ত করে ফেললাম যে, নিজেই আশ্চর্যবোধ করলাম। ব্যাকরণ অবশ্য পুরোপুরি শুদ্ধ নয়, উচ্চারণটাও রীতিমতো মেমসাহেবী; তাতে কি, ননদের সঙ্গে ছুটির দিনে ঘণ্টার পর ঘণ্টা দিব্যি আড্ডা দিয়ে থাকি। কাজের দিনে কিন্তু সোম থেকে শনিবারে, স্বামী শ্বশুর আর ননদ যখন যথাক্রমে কারখানা, অফিস আর কলেজে প্রস্থিত, তখন আমার সারাদিনের নির্জন কারাবাস চলে : শাশুড়ি-ঠাকরুণের সঙ্গে চোখাচোখি পর্যন্ত হয় না; তিনি শুধু দূর থেকে আড়চোখে আমাকে লক্ষ্য করে চলেন। তবু আমার খোকা তো আছে। আছে কি? খোকা আজ আমার সন্তান তত নয়, যতটা শাশুড়ীর নাতি। তিলে তিলে তিনি মিষ্টি ও খেলনার সুপরিকল্পিত উৎকোচে খোকাকে আমার কাছ থেকে কেড়ে নিতে চেষ্টা করেন।

আমি সহ্য করে যাই, স্বামীর কাছে নালিশ না করে—আর নিজের ব্যক্তিত্ব না হারিয়ে। শাশুড়ী নাকি চান, আমি বাঙালী বৌ সাজব। আমি কিন্তু বাঙালী বৌ নই, হতে চাই নি কোনো জন্মে। মানুষ অশোককে আমি বিয়ে করেছি, বাঙালী অশোককে নয়। বিয়ের সময়ে 'বাঙালী' কথাটা আমার অচেনা ছিল না, তার তাৎপর্য কিন্তু বুঝতাম না। বিবাহব্রতের উচ্চারণে স্বামীর দেশ কিংবা সংস্কৃতি কিংবা কুসংস্কার—কিংবা মাকেও—বিয়ে করব বলে প্রতিজ্ঞা করি নি। শাশুড়ী চান আমি শাড়ী পরব। জিগ্যেস করি : পরব কেন? শাশুড়ী আমাদের দেশে থাকতে গেলে আমার বাবা মা কি তাঁকে ফ্রক পরতে অনুরোধ করতেন? স্বামীর সঙ্গে বেরুব যখন, স্বামীকে সন্তুষ্ট করতে শুধু শাড়ি কেন, বোরখা পর্যন্ত আমি পরতে প্রস্তুত—শাশুড়ীর হুকুমে নয়। শাশুড়ী চান যে, সিঁথিতে সিঁদুর, কপালে টিপ, পায়ে আলতা পরে আমি ঘোরাফেরা করি। আবার বলি : স্বামী যেদিন ঐ ধরনের অনুরূপ ইচ্ছা প্রকাশ করবেন, সেদিন শুধু সীমন্তে, ললাটে কিংবা পদযুগলে কেন, সারা গায়ে আমি রং মাখব দোলের দিনের মতো। শাশুড়ী চান, খাওয়ার আগে আমি হাত ধোব....এবং আমি চাই, হাত ধোব আমি প্রয়োজনবোধে....আর যেহেতু কাঁটা-চামচ দিয়ে খাই, ভোজনের পূর্বে এমন প্রয়োজন বোধ করি না।

ছুটির দিনে, মায়ের আপত্তি না মেনে, অশোক আমাকে আর খোকাকে নিয়ে বেরিয়ে পড়ে, গ্রাম-বাংলার হাওয়ায় নিঃশ্বাস নিতে যায়, ঐ ধরনের চড়ুই-ভাতিতে আনন্দ পাই খুব। মাঝে মাঝে ভাবি : ননদকে নিয়ে গেলে কেমন হয়। মেয়েকে কিন্তু মা ছাড়েন না।

ভিতরে ভিতরে শুকিয়ে যাচ্ছিলাম, খিদে—আর ওজনও—কমতে লাগল। অশোক জিগ্যেস করত, 'তোমার হয়েছেটা কি?' বলতাম, 'কিছু না....অভ্যাসের অভাব মানিয়ে নেব।' অশোক একদিন বলল, 'পুজোর ছুটিতে তোমাদের পুরীতে নিয়ে যাব।'

অশোকের এক বন্ধুর বৌয়ের সঙ্গে আমার ভাব হয়েছে। মেয়েটি বলেছিল একদিন আমাদের বাড়িতে আসবে, আমি কবে ফ্রী থাকব; উত্তর দিয়েছিলাম, রোজই আছি, সারাদিন আছি। মেয়েটি এসেছিল এক অপরাহ্ণে : শাশুড়ী তখন চিরাচরিত প্রথা মতো সমস্ত মীটসেফ-কাবার্ড-আলমারি তালাবন্ধ করে দিবানিদ্রায় মগ্ন। তাঁকে জাগাতে না চেয়ে দেওয়ালে-ঝোলানো তাঁর চাবির গোছাটি পেড়ে নিয়ে কাবার্ড খুলে বান্ধবীকে আমি চা আর চপ খাইয়ে-ছিলাম। ব্যস! এতেই নাকি মহাভারত অশুদ্ধ হয়ে গেল! তাঁর চাবির গোছা ছুঁয়েছি বলে শাশুড়ী যে-রণমূর্তি ধারণ করেছিলেন, উপেন্দ্রকিশোরের বইগুলির রাক্ষসীর ছবিও এত ভয়াবহ নয়। ভাগ্যবশত অপমানিত ও লাঞ্ছিত হতে আমি এতদিনে অভ্যস্ত হয়ে উঠেছি।

সেদিনও স্বামীকে কিছু বললাম না। শাশুড়ী নিজে করে নালিশ করেছিলেন কি না, জানি না, তার কোনো ইঙ্গিত অশোক দেয় নি। যা হোক, আমি সম্পূর্ণ নিঃসঙ্গ ছিলাম, মায়ের প্রতি অশোক যতই ভক্তি-পরায়ণ হোক না কেন, প্রয়োজন হলে আমার পক্ষ সে নেবেই। পরে জানতে পেরেছি,

যে দিন থেকেই ফ্ল্যাটের খোঁজে বেরিয়েছিল সে, শুধু আমাকে মিথ্যে আশা দেওয়ার ভয়ে কিছু বলে নি।

শ্বশুর ছিলেন ভালোমানুষ খুব, আর পত্নীপরবশ বটে। তাঁর মনোভাব অনেকটা এই ধরনের : আমাদের বিয়েতে যার বিন্দুমাত্র দায়িত্ব ছিল না যখন, তখন আমার সাংসারিক সুখের জন্য গিন্নীর সঙ্গে ঝগড়া বাঁধাতে যাবেন তিনি কোন্ দুঃখে ? ওঁর রক্তের চাপ নেই, বুঝি ? মা কি ওঁর মানসিক শান্তির মূল্য নেই ?.... তবু তো অনুকম্পার অভাব ছিল না তাঁর, প্রকাশ করার সুযোগ ছিল অল্প। কাজের দিনে বুড়ীর স্নানের সময়ে বুড়ো ঘরে থাকতেন না, ছুটির দিনে কিন্তু গিন্নীর গাত্র-প্রক্ষালনের সুযোগটি তিনি নিতেন। শাশুড়ী নিচের তলায় কলঘরের দরজা বন্ধ করা মাত্র আমাদের ঘরে তিনি এসে বসতেন, আমার—কিংবা আমাদের—সঙ্গে ঐ কুড়িটি মিনিট কাটাতেন, সন্ত্রস্ত শশকের মতো উৎকর্ণ হয়ে কি জানি, মা-চন্ডী যদি হঠাৎ বাত-বেদনা বৃদ্ধির জন্য কাক-স্নান করেই বেরিয়ে আসেন। আমার সঙ্গে সাগ্রহেই তিনি গল্প করতেন, বাবামায়ের আর ভাই-বোনদের খবর নিতেন, ছবির অ্যালবাম দেখতেন... সদ্যঃস্নাতা গৃহিণী তার আলুলায়িত কেশ শুকোতে শুকোতে উপরতলায় উঠে দেখতে পেতেন, তাঁর গোবেচারী পতিদেবতা নিজের আরাম-কেদারায় অর্ধ-শায়িত হয়ে তাঁর অভ্যাসমতো বই পড়ে চলেছেন।

উপসংহার এখন সন্নিকট। একদিন শাশুড়ীর জিম্মায় খোকাকে রেখে দন্ত-চিকিৎসকের ডাক্তারখানায় এক আক্কেল-দাঁত তুলতে গিয়েছিলাম। বাড়ি ফিরে দেখি, ও মা! শাশুড়ী খোকার মাথাটা গঙ্গার নুড়ির মতো নেড়া করে দিয়েছেন! ছেলেটি রাগে ও লজ্জায় ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে। রাগ আমারও কি কম হল ? খোকাকে আমরা সবেমাত্র স্কুলে ভর্তি করিয়েছি : পরের সপ্তাহে ওর যোগ দেওয়ার কথা ছিল। তবে কি ছেলেটি যাতে স্কুলে না যায়, তারই জন্য বুড়ীর এই নোংরা ষড়যন্ত্র ? বহু কষ্টে নিজেকে সংবরণ করে খোকাকে কোলে তুলে বললাম, 'আয় বাবু, বাবার কাছে আমরা নালিশ করব।' বুড়ী তখন প্রমাদ গুনলেন : সে কি বৌমা। তুমি না বলেছিলে খোকাকে নেড়া করার কথা, ওর উকুন হয়েছে বলে' ...একেক সময়, জান তোমার বাংলা বুঝতে আমার যা বেগ পেতে হয়।' শুষ্ক কণ্ঠে উত্তর দিলাম, 'আর ভাবনা কি ? এবার থেকে আপনার যা বোঝার, আপনার ছেলেই আপনাকে বোঝাবে।' বলে আমি অশোকের প্রত্যাগমনের অপেক্ষায় বারান্দায় পায়চারি করে চললাম। এদিকে মাথা ধরেছে ভান করে শাশুড়ী শুয়ে পড়লেন।

স্বামী এলে শান্তস্বরে আমি ঘোষণা করলাম, 'এ বাড়িতে আমি আর একদিনও থাকতে প্রস্তুত নই।' অশোক চিন্তাকুল ভাবল, তারপর হঠাৎ বলল, 'টাকা কিছু জমানো আছে : যতদিন ফ্ল্যাট না পাই ততদিন আমরা তিনজনে এক হোটেলে গিয়ে থাকি।'

মাতৃদেবীর শিরঃপীড়াকে অগ্রাহ্য করে অশোক তাঁর শিয়রে দাঁড়িয়ে গৃহ-ত্যাগের প্রস্তাব পাড়ল। শাশুড়ী হতভম্ব, হতবুদ্ধি, হতবাক হয়ে গেলেন। পুত্রের এতটা ঔদ্ধত্য—কিংবা স্ত্রৈণতা—তিনি বোধ হয় আশঙ্কা করেন নি। পরে একটু প্রকৃতিস্থ হয়ে বললেন, 'বৌমার কথা বাদ দাও। যেদিন তুমি আমার বাড়ি ছাড়বে, চিরদিনের মতো ছাড়বে।' অশোক শুধু বলল, 'মনে রাখব।' স্বামীর জন্য আমি গির্জা ছেড়েছিলাম, বৌয়ের জন্য অশোক গৃহত্যাগ করল।

পরের দিন অশোক আমাদের যৎসামান্য আসবাব এক ঠেলাগাড়িতে চাপিয়ে এক বন্ধুর বাড়িতে পাঠিয়ে দিল। আর আমরা এসে উঠলাম সদর স্ট্রীটের এক হোটেলে। অশোক বলল, 'দু-সপ্তাহের ছুটি নেব স্থির করেছি : এই হোটেলেই আমাদের বিলম্বিত মধুচন্দ্রিকা কাটবে।' তা-ই তো, মধুচন্দ্রিকা আমাদের এতদিন হয়নি, জার্মানিতেও না, ইতালিতেও না।

কি অপূর্ব সুখ। রোজই খোকার নেড়া মাথাটাকে রেশমের স্কার্ফ দিয়ে ঢেকে ওকে নিয়ে আমরা নিউ মার্কেটে ঘুরতে যাই, ময়দানে খেলাধুলো লাফালাফি করে আসি.... ট্রামে উঠি, বাসে উঠি নির্ঝঞ্ঝাটে....কেউ পাশে দাঁড়িয়ে বলবে না, শাড়ি পড়, সিঁদুর পর, খাওয়ার আগে হাত ধুয়ে এস.......দিনে দিনে বুঝলাম, স্বাস্থ্য ফিরে আসছে। ইলেক-ট্রিক উনুন কিনেছি; মনের মতো রান্না করি—আমার আর অশোকের প্রিয় ডিশ। বন্ধুদের বাড়িতে যাই, ওরা আমাদের হোটেলে আসে।

আড়াই মাসের মধ্যে মোটা সেলামির কল্যাণে লেক টাউনের এক নবনির্মিত অট্টালিকার দু-ঘরের একটা ফ্ল্যাট পেলাম। ভাড়া দিলাম একটা টেবিল, দুটি খাট, চারটে চেয়ার, একটা ফ্রিজ....। অশোক একটা স্কুটার কিনেছে : খোকাকে রোজই স্কুলে পৌঁছিয়ে দেয়। বেচারী খোকা। ওর বাপ বাঙ্গালী, মা ইতালিবাসিনী, নিজেদের মধ্যে জার্মানেই কথা বলেন....আর ও [illegible] ইংরেজী স্কুলে পড়তে যায়।

আমাদের নতুন পাড়া স্বাস্থ্যকর। খোকার দু-একজন বন্ধু হয়েছে। অশোক স্থানীয় ফুটবল ক্লাবে যোগ দিয়েছে। আমার কপালে কিন্তু পছন্দসই কোনো বান্ধবী জুটল না। শুধু মনে হয় : এই মহানগরীর এমন এক এলাকায় যদি থাকতে পারতাম, অ্যাংলো-ইন্ডিয়ান আর পাশ্চাত্যপন্থী-গোয়ান মানুষেরা যেখানে বাস করে। মাঝে-মাঝে—বিশেষ ক্রিসমাসের সময়ে—একাকিত্ব বোধ দুঃসহ হয়ে ওঠে যখন, নিজের দেশের রেকর্ড শুনি।

ইতালীয়ভাষী কাউকেই কি কলকাতায় পাওয়া যায় না ? যায়, তবে তাঁরা সবাই সিস্টার। তাঁদের আমার ভয় করে : দেখা হলে সঙ্গে সঙ্গেই যদি জিগ্যেস করেন, তোমাদের কোথায় বিয়ে হয়েছে, কোন গির্জায় যাও, তোমার স্বামী ও ছেলে খ্রীস্টান কি না ?........
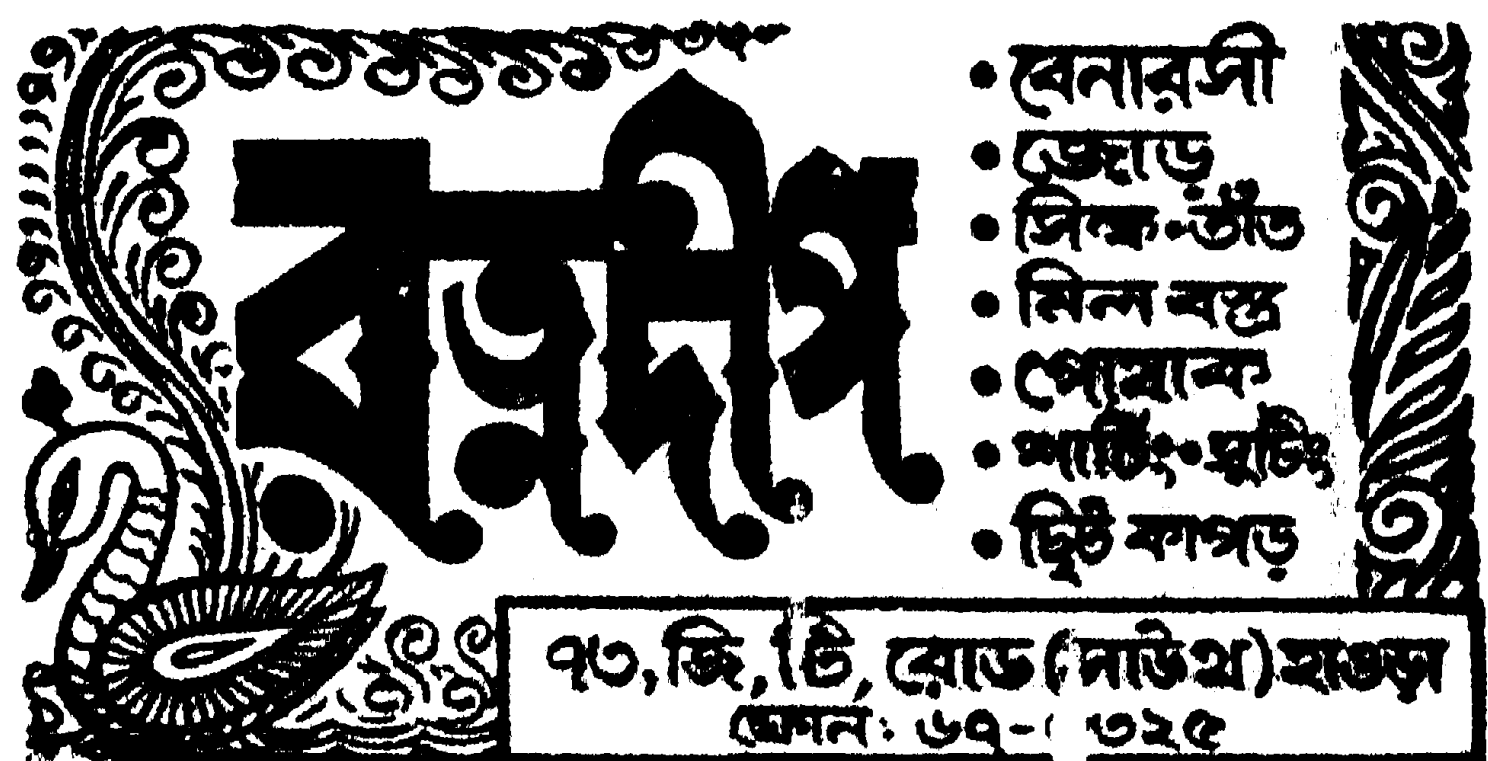
একদিন রান্নাঘরে মশলা বাটছিলাম, দরজায় ধাক্কা পড়ল। খুলে দেখি : শ্বশুরমহাশয়! আমার অন্তর লাফিয়ে উঠল আনন্দে। আমি বললাম, 'আপনার ছেলে যে কাজে বেরিয়েছে, আর খোকাও তো ইস্কুলে....'

অপরাধীর সুরে তিনি বললেন, 'এই বাসায় গিন্নীর সঙ্গে আমার কারবার! অশোকের আর খোকার সঙ্গে দুয়েকবার রাস্তায় দেখা হয়েছে........কিন্তু জান কি, বৌমা, তোমার জন্যও—আর তোমাদের এই এখানকার জন্য—আমার মন কেমন করে....... জানতে এসেছি আমি যদি মধ্যে মধ্যে কাজের ফাঁকে তোমাদের সংসারে উঁকি মারতে আসি, তোমার কি আপত্তি আছে?'

শ্বশুরের নিজেরই ভাষায় বলে উঠতে ইচ্ছে করল : মধুসূদন........আমাকে, আমার স্বামীকে, আমার খোকাকে ভালোবেসে আমার বাড়িতে আসবেন আমার পতির পিতা তাতে আমার আবার আপত্তি! প্রশ্নটা এড়িয়ে গিয়ে বললাম, 'এই নিন অশোকের তোয়ালে, স্নান করে আসুন, আপনাকে আমি অভুক্ত ছাড়ব না।'

'কিন্তু বাড়িতে আমার ভাত যে বাড়া আছে.... না খেতে পারলে গিন্নীকে কি কৈফিয়ৎ দেব ?'

'বলবেন, আপনার পেট-ব্যথা করেছে।'

আন্দুটীর তো বলল তখন— প্রয়োজনবোধে—কূটনৈতিক কথা-বার্তা হয়! আর অনুষ্ঠানের মুখ্য আকর্ষণের সেট-বাজা হতে সেটা।"

সৌরিন থেকে অতি অনিবার্যভাবে— তবে মাসে দু'তিনবারের বড় নয়— তবে মাসে দু'তিনবারের কম নয়— খবরাখবরের আসতে লাগলেন। আমি তাঁর প্রিয় খাবারগুলি রেখে দিতাম। যদি আসেন, খেতে বসবেন।

প্রতিবার তিনি খোকার জন্য নিয়ে আসতেন সন্দেশ কিংবা চকোলেট— আর আমার জন্য এক গোলাপের তোড়া। খোকার জন্মদিনে (না, জন্মদিনের পরের সপ্তাহে, জন্মদিনে নয়) তিনি একটা বড়ীর সন্দেশ আর এক জামা নিয়ে এলেন। জামাটা তিন সাইজ বড়। নিজের ভুল বুঝে কৈফিয়তের সুরে তিনি বললেন, 'সাইজটা ভুল বটে বৌমা, তবে প্রিন্টটা বেশ ভালো। দোকান থেকে কিনে আনা।'

একদিন মদন এল, ওর এক বান্ধবীকে নিয়ে। অবাক হয়ে জিগ্যেস করলাম, 'মায়ের চোখে ধুলো দিয়ে...'! ও বলল, 'আমার এই বান্ধবীটি ভারি লক্ষ্মী, ওর সঙ্গে, শুধু ওরই সঙ্গে, মা আমাকে ছাড়েন। উনি জানেন, আমরা দুজনে সিনেমায় গিয়েছি বেশিক্ষণ থাকতে পারব না, বৌদি, শো-টা শেষ হলেই ফিরব বলে কথা দিয়েছি... এই নাও নারকেলের নাড়ু.... মায়ের নিজের হাতে তোমার জন্য বানিয়েছি।'

মদনের একান্ত ইচ্ছা— আর আমারও একান্ত আশা— থাকলে কি হবে, মদন একবারের বেশি ও আসতে পারত না, তবে পোস্ট-কার্ড পাঠাত— তাও লুকিয়ে চুরিয়ে।

বাপ জানেন না, মেয়ে আসে, মেয়ে জানে না, বাপ আসেন। খোকাকে বোঝানো হয়েছে, ঠাকুরদার কথা পিসীকে বলতে নেই, আর খবরদার পিসীর কথাটাও ঠাকুরদা যেন জানতে না পান। নিষেধের কারণটা না বুঝলেও লুকোচুরির খেলাটায় খোকার মজা লাগে।

একদিন শ্বশুর আমার সদ্য ভাজা মাছের কচুরি সন্তর্পণভাবে চাখতে বসেছেন, হঠাৎ মদনও এসে হাজির! দুজনেই থ...বাপ-মেয়ে আমাদের তিনজনের দিকে তাকালো! বিস্মিত দৃষ্টিতে যেন নীরব প্রশ্নচিহ্ন আঁকা: বাবাও আসেন তাহলে?....মেয়েও তাহলে মাকে ফাঁকি দিয়ে পালিয়ে আসে?

স্মিতহাসি হেসে বাপ বললেন, 'যাক গে, আসলে কিন্তু আমি মোহনবাগানের মাঠে।' উচ্চহাসি হেসে মেয়ে বলল, 'আসলে কিন্তু আমিও কলেজের নাটকের মহড়ায়।'

মনের খোকাকে পুরোপুরি উপবাসী আমি রইলাম না আর। কিন্তু শরীর আবার বাদ সাধতে লাগল। একদিন শয্যা ত্যাগ করতে পারলুম না। ডাক্তার এসে রায় দিলেন, ভিতরে কিছুটা ভেঙে গিয়েছে, জলবায়ুর জলদি বদল চাই।

একদিকে খোকাও অস্থির হয়ে উঠেছে, জিগ্যেস করতে ছাড়ে না, আমরা কবে জার্মানিতে ফিরব? সেও তাহলে একেবারে যথার্থ নাগরিক হতে পারত না।

য়ুরোপের বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন সম্ভাবনা আছে, তবে কোনোটাই বিশেষ উজ্জ্বল নয়। অশোক বলল, খোকার প্রকৃত মঙ্গলের কথা ভাবতে হলে, জার্মানির কথা বাদ দিতে হয়, একমাত্র ইতালিতে মামার বাড়ির শীতল ছায়াতলে বড় শিকড় গজাতে পারবে।

আমাদের সংকল্প জেনে বড়দা চিঠিতে জানিয়েছে, আমাদের শহরের প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ছুটির পরে একটি পদ খালি হবে, চাকরিটা আমি চাইলে ...

অশোক বলল, 'তাই হোক। ঐ সামান্য মাইনেতেও বাপের বাড়িতে থেকে তুমি নিজেকে আর খোকাকে খাওয়াতে পরাতে পারবে। ইতিমধ্যে ভাষা শিখে আমি নিকটবর্তী শহরগুলিতে ঘুরব কাজের সন্ধানে....দেশে পৌঁছে কিন্তু গিয়ে আমাদের বিয়েটা ঠিক করে নিতে হবে।'

আনন্দে আমার বুক উঠল দুলে। কিছু বলতে যাচ্ছিলাম, কিন্তু তার আগেই অশোক আবার বলল, 'যাবার আগে একবারটি গিয়ে মাকে প্রণাম করবে?'

'করব।'

লীলা মজুমদার
পাকদণ্ডী

জারি যত্নে লালিত, অত্যন্ত পরিপাটি পরিচ্ছন্ন সৃষ্টি সব; কিন্তু বড় বেশি প্রশিক্ষণ পাওয়া, সভ্য-ভব্য। তার মধ্যে অসামাজিক কিছুর প্রবেশ করা অসম্ভব ছিল; এক যদি না কতকগুলো চতুর সরস বাক্যবিন্যাসের ফাঁকে ফাঁকে, নীল-লোহিতের কিম্বা চার ইয়ারের বাক্যবাণের সঙ্গে সঙ্গে, তার একটুখানি ঝলকানি ঢুকে পড়ত। এসব হল গিয়ে আমার অনেক বছরের চেনা-জানার পরের কথা, এখানে প্রসঙ্গক্রমে বলা হলেও, নিতান্ত নিষ্প্রয়োজন। তবে একেবারে অবান্তর নয়। শিল্পসৃষ্টি করতে হলে এই সচেতনতা আর সযত্ন প্রয়াসেরো দরকার আছে। শুধু খচ্‌-খচ্‌ করে যা মনে এল তাই লিখে গেলেই যথেষ্ট হল না। মনকেও সাবালক হতে হয়। সাবালকদের জন্য যারা গল্প লেখে, তাদের মনকেও। কাঁচা মন দিয়ে খুব বেশি কাজ হয় না। ঐ দুটি মানুষের কাছাকাছি এসে এই শিক্ষা আমার হয়েছিল। তবে দাঁড়-দড়া বেঁধে দিলে আমি এক লাইনও লিখতে পারি না। ওঁদের যখন প্রথম দেখেছিলাম, তখন আমার ১৭ বছর বয়স। স্কুলের দুটি অন্তরঙ্গ বন্ধুর কারণে। তারা ছিল দুই বোন, অলকা চৌধুরী ও পূর্ণিমা চৌধুরী, আমার আজীবনের বন্ধু। পরে অলকার মামার সঙ্গে আমার বিয়ে হওয়াতে সম্বন্ধটা আরো গভীর হয়েছিল, সে সময়ে ওরা ছিল নিতান্ত স্কুলের বন্ধু, যাকে বলে বেস্ট ফ্রেন্ড। একটা সুবিধা হয়ে গেল যে কথাচ্ছলে বেরিয়ে পড়ল অলকার মা বিখ্যাত হোমিওপ্যাথ ডাক্তার প্রতাপচন্দ্র মজুমদারের মেয়ে। শুনে মা ভারি খুসি, অলকার মা তাঁর কলেজের সহপাঠিনী, দুই বাড়িতে যাওয়া-আসাও ছিল। কাজেই অলকাদের বাড়িতে দিদির আমার অবাধ যাওয়া-আসার অনুমতি হল। সেকালের সামাজিক জীবনের এই সতর্কতার দিকটার হয়তো দরকার ছিল, কারণ মেয়েদের স্বাধীনতার তখনো তেমন প্রচলন হয়নি। স্কুলের বন্ধুদের মা-বাবাদের কাউকে আমাদের মা-বাবা বা মাসি-পিসি না চিনলে, তাদের বাড়িতে যাওয়ার অসুবিধা ছিল। পূর্ণিমা অলকার খুড়তুতো বোন।

অলকার বাবা বিখ্যাত ব্যারিস্টার ও বাঘ শিকারী কুমুদনাথ চৌধুরী, প্রমথ চৌধুরীর বড় ভাই এবং যে-কথা অনেকেই জানে না, নিজেও কম গুণী লেখক ছিলেন না। সম্প্রতি নাথ পাবলিশিং হাউস তাঁর ইংরিজিতে লেখা 'স্পোর্ট ইন ঝিল অ্যান্ড জাংগল'এর বাংলা অনুবাদ প্রকাশ করেছেন। আমার বন্ধু অলকাই তার বাবার বইয়ের অনুবাদ করে দিয়েছে। আমি যে-সময়ের কথা বলছি, তখন প্রমথ চৌধুরী আর ইন্দিরা দেবীও মে-ফেয়ারের অলকাদের চমৎকার করে সাজানো, যদিও বড্ড বেশি মরা জন্তুর দেহাংশে ভরা, বাগান দিয়ে ঘেরা বাড়িতে, কিছু দিন ছিলেন। সেইখানে আমার সঙ্গে পরিচয়। অবিশ্যি সবুজপত্রের সম্পাদক প্রমথ চৌধুরীকে সে সময়ে কে না জানত? আমরা তাঁর লেখার ভক্ত ছিলাম। তাঁর গল্পে ভারি একটা মজা-ভরা রোমাঞ্চ ছিল আর তাঁর ঝরঝরে মধুর 'বাঙালী' বাংলার প্রবল আকর্ষণ কে অস্বীকার করতে পারত? ভাবতাম আমিও ঐ রকম বাংলা লিখতে চাই। লিখিনি অবিশ্যি। এখন মনে হয় চমৎকার ভাষা বটে, তবু এত বেশি আত্ম-সচেতন যে একটুখানি কৃত্রিমতার ভাব এসে গেছে। কেউ ও-ভাবে চিন্তাও করে না, কথাও কয় না।

তবু বলব এমন মানুষের জুড়ি দেখিনি; এত গুণী, এমন গুণগ্রাহী। অন্য লোকের মধ্যে এতটুকু গুণ দেখলে আহ্লাদে আটখানা হয়ে, তাকে পাঁচজনের কাছে পরিচিত করার চেষ্টা করতেন। তাঁদের আয়োজিত পূর্ণিমা সম্মেলনের কথা পরে বলব। মুশকিল হল ওঁদের অন্য একটা দিক নিয়ে; বিশেষ করে ইন্দিরা দেবীর। সঙ্গীত ছিল ওঁদের প্রাণ, ওঁদের বুকের শিরায় শিরায় রক্ত। ইন্দিরা দেবীর সঙ্গীতে পারদর্শিতার কথা অনেকেই জানে; রবীন্দ্রসঙ্গীতের তিনি একজন কর্ণধার এবং শ্রেষ্ঠ কর্ণধার। তাঁর কাকা একরকম তাঁকে হাতে করে তৈরি করেছিলেন। রবীন্দ্রনাথকে তিনি যতখানি বুঝতেন, তেমন আর কেউ বুঝত বলে মনে হয় না। ভারতের প্রথম সিভিলিয়ান রবীন্দ্রনাথের মেজদাদা সত্যেন্দ্রনাথের একমাত্র মেয়ে, সুরেন ঠাকুরের ছোট বোন; অল্প বয়সে বিলেত ঘুরে এসেছেন; লোরেটো স্কুলে কলেজে পড়েছেন; ইংরিজি বাংলা ফরাসী, তিন ভাষায় পারদর্শী। এ সবই জেনে নিতে পেরেছিলাম। ইচ্ছে হল যখন তখন অর্গ্যানের সামনে বসে, আমাদের কাছে সম্পূর্ণ অচেনা একটা সুর ধরে বলতেন 'গাও দিকিনি!' আমাদের তো চক্ষুস্থির। অথচ অলকা পূর্ণিমা তাঁর প্রভাবে মানুষ, সঙ্গে সঙ্গে তারা গান ধরত শ্রদ্ধা-ভক্তিতে মন ভরে যেত।

এই প্রসঙ্গে কুমুদনাথের কাছে শোনা একটা গল্প না বলে পারছি না। প্রমথনাথ তাঁর চাইতে মাত্র ১ বছরের ছোট; ইন্দিরা দেবী আরো ৩-৪ বছরের ছোট হবেন; তবে ঠিক কত বছর তা বলতে পারছি না। তাঁদের বিয়ের বেশ কয়েক বছর পরে, যখন সকলে কুমুদনাথের বিয়ের আশা ছেড়েই দিয়েছিল, তখন তিনি নিজের চেয়ে প্রায় [illegible] বছরের ছোট আমার পরমাসুন্দরী জাঠতুতো ননদ রাধারাণীকে বিয়ে করেন। মোট কথা প্রমথ চৌধুরীর বিয়ের পরেও অনেক দিন কুমুদনাথ ব্যাচেলার। একবার কোথাও পাশাপাশি দুই ঘরে দুজনের বাস। রাতে শুয়ে অবধি কুমুদনাথ মাঝখানের দরজা ভেদ করে শুনতে পাচ্ছিলেন ভাই ভাদ্দরবৌয়ের মধ্যে আলাপ চলছে। একটু পরে মনে হল প্রেমালাপের পক্ষে গলা দুটি যেন বড্ড চড়া এবং উষ্ম। আর থাকতে না পেরে, দরজায় কান দিয়ে শুনলেন প্রেমালাপ নয়, বাখ্‌ আর বেঠোফেনের তুলনামূলক সমালোচনা হচ্ছে; দুই বক্তাই বেশ গরম।

তারপর হয়তো কুমুদনাথ ঘুমিয়ে পড়ে থাকবেন। ভোরে ঘুম ভাঙতেই অবাক হয়ে শুনলেন তখনো পাশের ঘরে আলাপ চলছে। আবার দরজায় কান লাগিয়ে শুনলেন তখনো বাখ্‌ আর বেঠোফেনের তুলনামূলক সমালোচনা চলেছে; বক্তারা যেন আগের চেয়ে গরম। তবে মাঝখানে ঘুমের বিরতি নেওয়া হয়েছিল কিনা বোঝা গেল না।

(চলবে)

ইনার লাইন পেরিয়ে

সুভাষ রায়চৌধুরী

গোলের খেলার ধারাবিবরণী শোনা অসমাপ্ত রেখেই বেরিয়ে পড়তে হল কামরূপ একসপ্রেস ট্রেন ধরার জন্য। ২৫ সেপ্টেম্বর রঙ্গিয়া স্টেশনে গাড়ি পাল্টে তেজপুর যাবার পথে হাতে বেশ সময় ছিল। বেরিয়ে পড়লাম বাজার ঘুরতে। আসামের ছোট্ট শহর রঙ্গিয়া। একটা সিনেমা হল। শোলে চলছে। বাজারে চালের দর ১-৭৫ টাকা। নতুন আলু দেখলাম এক টাকা কেজিতে বিকোচ্ছে। বড় কই মাছ ছয় টাকা কেজি। দোকানগুলোতে আসাম ট্রিবিউন আর যুগান্তরের ছড়াছড়ি। স্টেশনের বুক স্টলে ৩০ খানা পুজো সংখ্যা অমৃত বিক্রি হয়েছে। আরো আসবে। নিচু এলাকায় কচুরিপানার উৎপাত বড্ড বেশি।

২৬ তারিখ ভোর হতে না হতেই গাড়ি পৌঁছল তেজপুরে। সুপারি গাছের সারির মধ্যে বাড়িগুলো খুলনার কথা মনে করিয়ে দেয়। ব্রহ্মপুত্র নদের পাড়েই স্টেশন। সহযাত্রী বরুণকুমারকে নিয়ে নেফা অফিসের খোঁজে বেরোলাম। পাহাড়ে ঘেরা তেজপুর শহরের মধ্যে লেকের ধারে পার্কটি মনোরম।

নেফা অফিসে কথা হল অরুণাচলের ডেপুটি কমিশনার আই এ এস অফিসার শ্রীদেউরির সঙ্গে। আমাদের তাওয়াঙ যাবার পারমিট তিনিই দিলেন। গাড়ির ব্যবস্থা করলেন তাওয়াঙের হার্টিকালচারাল ইনস্পেকটর শ্রীজহর দত্তরায়। তিনিই হলেন আমাদের গাইড। দরকারী কাজে শিলং গিয়েছিলেন। বাড়িও শিলং-এ। গৌহাটি থেকে বি এস-সি (এজি) পাশ করেছেন। ৩৫-৩৬ বছর বয়স। অবিবাহিত। গান ভালবাসেন। ভূপেন হাজারিকা, প্রতিমা বড়ুয়া আমাদেরও প্রিয় শুনে খুশি হলেন।

২৮ তারিখ তেজপুর থেকে রওনা হলাম তাওয়াঙের উদ্দেশে। আসামের এলাকা শেষ হল ৫৯ কিলোমিটার দূরে ভালুকপঙে। চেক পোস্টে একদফা পরীক্ষা হল। পারমিট দেখাতে হল উপযুক্ত কর্তৃপক্ষকে। এক কাপ করে কফি খেয়ে গাড়ি ছুটল পাহাড়ি রাস্তায়। হাতির এলাকা ধরে গাড়ি চলছে। শীতের আমেজ। কয়েকদিন আগে বাঘে একজন সি আর পিকে ধরে নিয়ে গেছে যেখানে, সেখানটা আমাদের সারথী দেখালেন। পুলিশকেও তাহলে বাঘে খায়।

আস্তে আস্তে কামেং নদীর পাড় বেয়ে পাহাড়ি চড়াইয়ে গাড়ি ছুটে চলেছে। ঘন সবুজ বন-জঙ্গলে ঘেরা পাহাড়গুলি। জানা অজানা ফুলে ছেয়ে আছে। অসংখ্য বুনো কলা গাছে ভরা। কলার কাঁদি কেউ ছোঁয় না। অথচ সাইজ খুব ছোট নয়। বিচে কলা। খুলনায় বলত দয়াকলা। বেত আর বাঁশের ছড়াছড়ি। বস্তি বা বাড়ি খুব কম।

সন্ধ্যা হয়ে এসেছে। গাড়ির আলো ছাড়া আর কিছুই নজরে পড়ে না। গা ছমছম করা পথে দত্তরায়ের গল্প শুনতে শুনতে আমরা তিনজন চলেছি। আমি, বরুণ মাইতি আর মনোজ ধর। মনোজ বয়সে তরুণ। চুপচাপ থাকতে ভালবাসেন।

অরুণাচলের পাঁচটি জেলার মধ্যে কামেং একটি। বমডিলা কামেং জেলার সদর শহর। আমরা রাতে সেখানেই থাকব। তেজপুর থেকে বমডিলা ১৬০ কিলোমিটার দূরে। ৮-৯ হাজার ফুট উঁচুতে। বেশ ভাল শহর। তবে দার্জিলিঙের মতো মেঘে ঢাকা। রুদ্দুরের মুখ বড় একটা চোখে পড়ে না। সাধারণ সরকারি প্রশাসন ছাড়া বাকি মিলিটারীতে ভর্তি।

বমডিলায় রাত কাটিয়ে ২৯ তারিখ সকাল ৮টায় গাড়ি চলল তাওয়াঙের দিকে। বমডিলা থেকে তাওয়াঙ ১৮০ কিলোমিটার। কখনও চড়াইয়ে উঠে, কখনও উৎরাইয়ে নেমে গাড়ি চলছে। ৪৪ কিলোমিটার দূরের শহর দিরাঙ দেখার মতো। চীনারা বমডিলা দখলের পর দিরাঙে প্রেম দত্তকে ধরেছিল। প্রেম দত্ত জিপ চালকের কাজ করেছিলেন চীনাদের হাতে বন্দী হবার পর। লাসাতে নিয়ে গিয়েছিল। পরে ছাড়া পান। বেশ হাসিখুশি মানুষটি। এখন আপার ডিভিশন ক্লার্ক।

গাড়ি চলেছে সেলা পাস দিয়ে। ১ হাজার ফুট উঁচুতে এই পথ প্রথম তৈরি করেন মেরেক লামা। চারশ বছর আগেকার কথা। এখন আমাদের জওয়ানরা এই রাস্তা তদারকিতে আছেন। বড় বড় পাহাড়ের গাছপালা প্রায় শেষ করা হয়েছে। এটা ভাল না মন্দ, বিচার করার অধিকার আমার নেই। তবে, তাওয়াঙের ডেপুটি কমিশনার হিসাবে থাকাকালে পাঞ্জাবী তরুণী কুমারী মিস নন্দা নাকি বনবিভাগের কাজে সন্তুষ্ট হতে পারেননি।

লোকসংখ্যা কম। বনবিভাগ তা করেননি অথচ রাস্তার পাশে অজস্র ঝরনা ছুটে এক বিচিত্র মোহময় পরিবেশ সৃষ্টি করেছে। খাদের দিকে তাকালে চক্ষু চড়কগাছ হয় যেমন, তেমনি নাম-না-জানা ফুলের সৌন্দর্য উপভোগ করতে করতে জং-এ পৌঁছে গেলাম। জং থেকে দশ কিলোমিটার দূরে হেলেন পয়েন্ট।

এই ছেলেন পয়েন্টের মতো বিপজ্জনক পাহাড় এ পর্যন্ত নজরে পড়েনি। সব সময়ই ভেঙে পড়ছে। জোয়ান চালিয়ে রাস্তা সাফ করা হচ্ছে সব সময়। শীতকালে অবশ্য বমডিলা থেকে তাওয়াঙ পর্যন্ত রাস্তায় বরফ সরাতে প্রচুর জোয়ান লাগাতে হয়। না হলে যাতায়াত বন্ধ।

শীতকালেই বেশ কয়েকবার আগু-পিছু করে আমাদের সারথী ঐ রাস্তা পার হলেন। পথে আরো কয়েকবার জওয়ানদের পাল্লায় পড়েছি। তবে, গাড়িচালকেরা ঐ পথে খুব সতর্কতার সঙ্গে সে সব বিপদ এড়িয়ে যেতে পারেন বলে মনে হল।

তাওয়াঙকে মহকুমা শহর বলা হলেও ওটা জেলা শহরের মর্যাদা পাচ্ছে। তাওয়াঙচু আর নিয়ামজাংচু দুটো পাহাড়ি নদী। গ্রামের সংখ্যা ১১৩। ২০৮৫ বর্গ কিলোমিটার এলাকার লোকসংখ্যা মাত্র ১৮৭৫৪। সবচেয়ে উঁচু পর্বতের নাম গোরিচেন। ২৩,৫০০ ফুট। ৮০০০ ফুট পর্যন্ত ধান চাষ হয়। অনেক জমিতে ধানের পরে গম চাষ করা শুরু হয়েছে। থনলুন্দু জাতের ধান ফলে ভালো। ভুট্টা মিলেট। প্রচুর ভুট্টার চাষ হচ্ছে। পপকর্ন বা ভুট্টার খৈ স্থানীয় অধিবাসীদের প্রিয়। ভুট্টার সঙ্গে সয়াবীন চাষ করার প্রথা অনেক দিনের।

তাওয়াঙের অধিবাসীরা মোম্পা। ভাষাও মোম্পা। লেখা হয় তিব্বতী হরফে। ১৯৬২ সালের পর অনেক স্কুল খোলা হয়েছে। সবই আবাসিক। ছাত্র ছাত্রীর পোশাক বই খাতা মায় হস্টেলের খরচ পর্যন্ত সরকার থেকে দেয়। এঁরা বৌদ্ধ ধর্মে বিশ্বাসী। তাওয়াঙের বৌদ্ধ গুম্ফাটি এশিয়াতে দ্বিতীয়। ১৬৮০ সালে মেরা বা মেরেক লামা তৈরি করান।

দশ হাজার ফুট উঁচুতে তাওয়াঙ শহরে পৌঁছানর পথে প্রচুর আপেল বাগিচা নজরে পড়ল। ঢালে বেশ লাইন করে বসান। সরকারের ডিপার্টমেন্টের কাজ। তদারকির দায়িত্বেও তাঁরা। তিনি কিন্তু একথা স্বীকার করেন না। তাঁর বক্তব্য হল : জেলা কৃষি অফিসার শ্রীসুভাষরঞ্জন ঘোষের নির্দেশেই এসব কাজ করা হয়েছে। সার্কিট হাউসে যখন পৌঁছলাম তখন সবে সন্ধ্যা।

পরের দিন সকালে উঠে তাওয়াঙ শহরের রূপটা নজরে পড়ল। ঠিক যেন বিলেতের কোন গাঁয়ে বসে আছি। টুপি মাথায় মানুষগুলো কাজে বেরিয়েছেন। প্যান্ট-কোট ধরনের পোশাক। স্থানীয় পুরুষ ও মহিলা কর্মীরা 'সুন' মাথায় দেন। চমরি গাইয়ের লেজের লোম দিয়ে তৈরি। যাতায়াতের পথে চমরি গাই আর ঘোড়া নজরে পড়ে বেশি।

কিমনি গ্রামের একটি মোম্পা পরিবার।

সার্কিট হাউস থেকে আরো হাজার ফুট উঁচুতে দূরে বৌদ্ধ গুম্ফাটি দেখায় যেন দুর্গের মতো। ১৬৮০ সনে তৈরি করার পর ওখান থেকেই তাওয়াঙের প্রশাসন চালাতেন বৌদ্ধ লামারা। বলা হয়ে থাকে যে ১৮৪৪ সনে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর সঙ্গে তাওয়াঙ মঠের প্রধানের এক চুক্তি বলে ঐ এলাকা ইংরাজদের অধীনতা স্বীকার করে নেয়। কিন্তু কার্যত ১৯৫১ সন পর্যন্ত ঐ অঞ্চলের অধিবাসীরা তিব্বতকেই তাঁদের খাজনা ইত্যাদি দিতেন। ঐ বছরই মেজর খাটিং সর্বপ্রথম তাওয়াঙের শাসন ভার গ্রহণ করেন। তিনি নেফার সহকারী পলিটিক্যাল অফিসার ছিলেন। পরে শাসন কাজের সুবিধার জন্য তাওয়াঙকে ভেঙে তাওয়াঙ এবং কামেঙ দুটো মহকুমা করা হয়।

এই তাওয়াঙের ডেপুটি কমিশনার হিসাবে কুমারী নিরু নন্দা যথেষ্ট সুনাম অর্জন করেছেন। সম্প্রতি তিনি দিল্লীতে বদলি হয়েছেন। চার্জে আছেন শ্রীকুমার। বোম্বাইতে বাড়ি করেছেন। ছেলেমেয়েরা সেখানে থাকে। বি ডি ও হিসাবে অরুণ রাও যথেষ্ট অভিজ্ঞতার অধিকারী। মার্কেটিং অফিসার শ্রীবাগচি কলকাতার ছেলে। জেলা কৃষি অফিসার সুভাষবাবুর আদি বাড়ি ঢাকায় ছিল। এখন শিলঙয়ে। মা আছেন। সুভাষ ঘোষ মশাইও অবিবাহিত। এঁরা কয়েকজন মিলে মেস করে আছেন। এঁদের সকলেই অবিবাহিত। একজন অবশ্য ব্যতিক্রম আছেন। শ্রী টি পি সিং। ইউ পির লোক। কৃষি বিভাগে যুক্ত আছেন। রয় বা মজুমদার সকলেই পশ্চিমবঙ্গের। বেশ সুখে আছেন এঁরা। ওখানকার পরিচয় পদবীতে। নামে নয়।

তাওয়াঙ নিয়ে ওদের কত কথা। সকলে মিলে দুর্গা পুজো করেন। স্থানীয় অধিবাসীরাও অংশ নেন। চাঁদা দেন। এবার কালী পুজোও হচ্ছে। শ্রীঘোষ ওখানে ১১ বছর রয়েছেন। প্রচুর অভিজ্ঞতা। গাঁয়ের চাষীবাসীর আপনজন। মোম্পা ভাষা জানেন। বাংলা, অসমীয়া, হিন্দী ও ইংরাজীতে চোস্ত। সুন্দর চেহারা। লাল গাল। আপেলের মতো। সারাদিনে কাজের চাপ। সময় পান না। রাতে প্রায়ই একসঙ্গে বসা হত। পানপাত্র হাতে নিয়ে শুনতাম তাওয়াঙের কথা। আমার অভ্যাস কম। তাই দু পেগ রাম হলেই যথেষ্ট। কিন্তু গণেশ

বিজ্ঞান

বাঁচো এবং বাঁচাও

সভ্য মানুষ ঠিক মূর্খ কালিদাস। যে ডালে সে বসে আছে, কুড়ুল মারছে তারই গোড়ায়। যে জৈব এবং অজৈব পরিবেশে তার অবস্থান সে সেই পরিবেশকেই সমূলে ধ্বংস করবার জন্য উঠে পড়ে লেগেছে। পরিবেশের বিপর্যয়ে পুরো মানুষ জাতটাই যে একেবারে লোপাট হয়ে যাবে সে বোধই তার নেই। এদিকে সেই মহাপ্রলয়ের দিনটাও এগিয়ে আসছে খুব তাড়াতাড়ি।

প্রকৃতি নিজে বড় হিসেবী। তার সমস্ত সৃষ্টির মধ্যে সে সব সময় বজায় রাখছে একটি সার্থক শৃংখলা। শৃংখলা রক্ষার একটি বিশেষ পদ্ধতিতে। গোটা জীবজগতটা দাঁড়িয়ে জড় জগতের উপর। জল, মাটি, বাতাস, আলো না হলে ব্যাকটিরিয়া থেকে মানুষ অবধি কোন জীবই টিঁকতে পারে না। জীব যেখানে বাস করে, তার আশপাশের জল, মাটি, বাতাস, আলো এদের ভৌত ও রাসায়নিক অবস্থাই তার জড় পরিবেশ। অন্যান্য জীব গোষ্ঠী তার জৈব পরিবেশ। জড় ও জৈব দুরকম পরিবেশ নিয়েই জীবের বসতি, ইংরাজীতে যার নাম হ্যাবিটেশন। গ্রীকরা বলত 'ওইকস' তা থেকেই জার্মান প্রাণিবিজ্ঞানী আর্নেস্ট হেকেল নাম দেন 'ইকোলজি' পরিবেশ সম্বন্ধে জ্ঞান, 'বসতি বিজ্ঞান'।

পৃথিবীতে এমন কোন জায়গা নেই যেটা জীবশূন্য। আকাশের বায়ুমণ্ডল, সমুদ্রের গভীরতম অংশে, ভূপৃষ্ঠের সমস্ত অংশটা জুড়ে জীব-বসতি। পৃথিবীর যে অংশে যে বিশেষ জীবটির বাস, সেই অংশের অন্যান্য জীবের সঙ্গে থাকে তার প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ সম্পর্ক। আর নিবিড় সম্পর্ক থাকে সেই স্থানের ভৌত ও রাসায়নিক প্রকৃতির সঙ্গে। তাদের প্রভাব অনবরত এসে পড়ে সেই অংশের অধিবাসী জীবগোষ্ঠীর উপর। একেই বিজ্ঞানীরা এক কথায় সংজ্ঞা দিয়েছেন, ইকোলজি, বসতি বিজ্ঞান। প্রকৃতিতে জীবগোষ্ঠীগুলির মধ্যে একের সঙ্গে অপরের প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ সম্পর্ক; এবং জীবগোষ্ঠীগুলির সঙ্গে জড় জগতের ভৌত ও রাসায়নিক পদার্থের সম্পর্ক। যে ক্রিয়া পদ্ধতিতে বজায় থাকে তার নাম ইকো সিস্টেম বসতি পদ্ধতি। এই পদ্ধতিতেই বজায় থাকছে প্রাকৃতিক শৃংখলা। প্রকৃতির নিজস্ব এই শৃংখলার মধ্যে বিশৃংখলতা এনে ফেলেছে সভ্য মানুষ। সভ্য মানুষ প্রকৃতির ছন্নছাড়া জীব। মানুষ যতদিন সভ্য ছিল না, ততদিন সে ছিল অসংখ্য প্রাণিকুলের একটি প্রকৃতির একটি অংশমাত্র স্বতন্ত্র মনীষিহীন মানবগোষ্ঠী তার চারপাশের জড় প্রকৃতি ও জৈব প্রকৃতির সঙ্গে চমৎকার সমঝোতা রেখে চলত। এখনও তার প্রমাণ মেলে সেই সব আদিবাসীদের মধ্যে, যারা জমি চষে ফসল ফলায় না। তাদের অবস্থা রয়ে গেছে সেই আদিম পর্যায়েই। তাদের বেঁচে থাকার উপায় গাছের ফল আর বুনো জন্তুর মাংস। কঙ্গোর পিগমীরা আজও টিঁকে আছে হ্রদ-নদী-বিলের মাছ আর জঙ্গলের পশু-পাখীর মাংস খেয়ে। তারা জঙ্গলের যে অংশে থাকে সেখানে পশু-পাখীর সংখ্যা, কি জলে মাছের সংখ্যা, কম হলেই তারা চলে যায় আর এক অঞ্চলে। এতে আগের অঞ্চলের পশু-পাখী কি মাছেরা বংশবৃদ্ধি করে আবার ফিরে আসে পূর্বের অবস্থায়। এতে বসতি পদ্ধতির কোন হানি হয় না। ক্ষতি যা হয় তা ঠিক ঠিক পূরণ হয়ে বসতিতে একটা সুসমঞ্জস ভারসাম্য বজায় থাকে। এটা প্রকৃতির একটা স্বাস্থ্যকর ব্যবস্থা। এই ব্যবস্থাটাই প্রকৃতিতে চালু ছিল লক্ষ-কোটি বছর ধরে। এই লক্ষ-কোটি বছরে জীবজগতে দারুণ দাপটের সঙ্গে কাজ করেছে জৈব-অভিব্যক্তি। এদিক ওদিক কখন সখনও একটু একটু কম-বেশী যে হয়নি এমন নয়। প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে কোন প্রজাতি হয়ত ধ্বংস হয়ে যেতে বসেছে। কিম্বা বিশেষ কোন প্রজাতির আকস্মিক কোন সুবিধার জন্যে বংশবৃদ্ধি হয়েছে দারুণভাবে। এসব সত্ত্বেও জীবগোষ্ঠীতে একের সঙ্গে অপরের আপোষ-বনিবনার অভাব কোনদিনই হয়নি। দাঁড়িপাল্লার ঝুল কখনই একদিকে খুব বেশী ঝুঁকতি নিয়ে বানচাল হয়নি। কিন্তু এখন তা হতে বসেছে।

গণ্ডগোল বেঁধেছে মানুষ যেদিন হাল তৈরি করে জমি চষতে সুরু করল সেইদিন থেকে। সেই যে সভ্যতার সুরু, তখন থেকেই মানুষ হঠাৎ হঠাৎ একটা করে এমন পরিবর্তন আনছে যাকে এককথায় বলা যায় প্রকৃতির বিরুদ্ধে জেহাদ। গত কয়েক শতাব্দীতে ওই হঠাৎ পরিবর্তনগুলো এমন দারুণভাবে বেড়ে গেছে, যে এখন প্রকৃতির পক্ষে 'বসতি-পদ্ধতি' সুষ্ঠুভাবে বজায় রাখা আর সম্ভব হচ্ছে না।

আসামের কাজিরঙার জঙ্গল একটা বড় উদাহরণ। যখন সেখানে সভ্য মানুষের যাতায়াত ছিল না, তখন জঙ্গলের গাছের পাতাগুলো ঝরে পড়ে, বৃষ্টির জলে পচে হত মাটির সার। সেই সারে পড়ত গাছের বীজ আপনা থেকে। নতুন গাছ গজিয়ে জঙ্গলে গাছের সংখ্যা, শুকিয়ে মরে যাওয়া, বাজপড়া, জন্তুতে খাওয়া গাছের সংখ্যার সঙ্গে সমতা রক্ষা করে চলত। শাকভোজী প্রাণীদের—বিশেষ করে হাতী আর গণ্ডারদের খাবারের কোন অভাবই ছিল না। বংশবৃদ্ধি করে তারা তাদের জনসংখ্যা বজায় রাখত ঠিক ঠিক। হঠাৎ সভ্য মানুষ আবিষ্কার করল ঐ অঞ্চলে ভাল চায়ের চাষ হয়। সঙ্গে সঙ্গে বন হল হাঁসিল। গাছের সংখ্যা গেল ভয়াবহভাবে কমে। তার ফলে মূলে ঘা পড়ল বসতি পদ্ধতির। গাছের সংখ্যা কমে যেতে বৃষ্টিপাতের হার কমে গেল। কমে গেল জমির সারাংশ। সঙ্গে সঙ্গে গাছের বৃদ্ধির হারও কমতে সুরু করল। টান পড়ল শাকভোজী জন্তুদের খাবারে। তাদের পুষ্টিতে হল ঘাটতি। অপুষ্টি থেকে ব্যাধি। ফল মড়ক। তাদের সংখ্যা লাগল কমতে। এর উপর এল আরও বড় আঘাত। চা বাগানের কাজের জন্য এল প্রচুর শ্রমিক। তাদের খাবারের জন্য আরও বেশী জঙ্গল সাফ করে সুরু হল চাষ আবাদ। জমির স্বাভাবিক উর্বরতা আরও বেশী করে নষ্ট হতে লাগল ওই চাষ আবাদের ফলে। জঙ্গলের বিলে যেসব মাছ আপনা-আপনি জন্মাত, তাদের খেয়ে বাঁচত ভোঁদড়, শেয়ালরা। চিল, নিস্করেস, কর্মোর‍্যাণ, এ্যাডজুটেন্ট সারস, মাছ খেকো ঈগল ইত্যাদি পাখীরা। পেলিক্যানরা দূরে দেশ থেকে উড়ে এসে বসত বিলগুলোতে। ডিম পাড়ত, বাচ্চা ফুটোত। এসব আস্তে আস্তে বন্ধ হয়ে যেতে লাগল মাছের অভাবে। কারণ মাছ এখন চলে যাচ্ছে মানুষের পেটে।

এর পরে এসে জুটল নানান ধরনের অসাধু ব্যবসায়ীর দল। যাদের ব[illegible] হল গণ্ডার মেরে তার শিং বিদেশে [illegible] করা। একে খাদ্যের অভাব, তার ও[illegible] মানুষের [illegible] মার। আসামের এ[illegible] গণ্ডার বংশ ক্রমশ লোপ পাবার [illegible] বসে দাঁড়িয়েছিল। আপাতত সংরক্ষণ নীতির ফলে গণ্ডার এবং সেই সঙ্গে অন্যান্য প্রাণীও কাজিরঙায় অবলুপ্তির থেকে বেঁচে গেল।

নগরতান্ত্রিক সভ্যতায় এখন মানুষ নিজেই নিজের সৃষ্ট জঞ্জালের স্তূপে চাপা পড়ে মরবার উপক্রম। নানারকমের শিল্প থেকে উৎপন্ন রাসায়নিক বিষে বাতাবরণ এখন কলুষিত। তার চরম পরিণতি হচ্ছে মারাত্মক ব্যাধি ক্যানসারে। বাতাস, খাদ্য, জল, সব কিছু দূষিত হয়ে উঠছে মানুষের সভ্যতা বজায় রাখতে। গাছ-পালা, জন্তু-জানোয়ার নিঃশেষ হতে চলেছে পৃথিবী থেকে। মানুষের নির্বিচার হননে আর তার তৈরি বিষাক্ত পদার্থে।

মানুষ জানে না ওই বিষেই সে নিজেও একদিন শেষ হবে। সেদিন খুব নিকটেই।

রবীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য

বাংলার বাইরে বাঙালী

পুরী

রেলপথে হাওড়া থেকে পুরীর দূরত্ব প্রায় সাড়ে পাঁচশো কিলোমিটার। সময় লাগে তের ঘন্টার মত। মহাপ্রভু শ্রীশ্রীজগন্নাথ এবং নীল সফেন সমুদ্র এই দুয়ে মিলে হল পুরী, যার অপর নাম শ্রীক্ষেত্র। শুধু আজ থেকেই নয়, সেই বহুকাল আগে শ্রীগুরু না চৈতন্যদেবের যুগ থেকেই পুরী বাঙালীদের চুম্বকের মত আকর্ষণ করছে। বাঙালী উপেক্ষা করতে পারে নি মহাপ্রভু জগন্নাথের ডাক এবং সমুদ্রের হাতছানিকে। শোনা যায়, শ্রীচৈতন্য তাঁর শেষজীবন পুরীতে অতিবাহিত করেছিলেন। তাই পরিসংখ্যানে দেখা যায় ওড়িশায় কটক শহর বাদ দিলে পুরীতেই বসবাসকারী বাঙালীর সংখ্যা সর্বাধিক। পুরী একদিকে যেমন ভারতের তীর্থক্ষেত্র অপরদিকে স্বাস্থ্য-নিবাসও বটে। সমুদ্রসৈকতে অবস্থিত স্বর্গদ্বার এলাকার শতকরা আশি ভাগ বাড়ীর মালিক। ছিলেন এককালে বাঙালী পুরনো কালের বাংলার জমিদাররা পুরীতে আসতেন শুধু তীর্থের মোহেই নয় স্বাস্থ্যোদ্ধারের কারণেও। তাই এখানে তারা একটি করে স্থায়ী আস্তানা তৈরি করে রাখতেন। বর্তমানে রক্ষণাবেক্ষণের অভাবে সেইসব বাড়ীর ভগ্ন, জীর্ণদশা চোখে পড়ে। ইতিমধ্যে অনেক বাড়ী বিক্রিও হয়ে গেছে। পুরীর সমুদ্রসৈকতে গেলে প্রথমেই চোখে পড়বে সুদৃশ্য সারিবদ্ধ হোটেল। এই হোটেল ব্যবসারও প্রথম পত্তন হয় বাঙালীর হাতে। সমুদ্রসৈকতে অবস্থিত বিখ্যাত পুরী হোটেলের মালিক হালদাররা পুরীতে হোটেল ব্যবসার পত্তন করে দ্বিতীয় মহা-যুদ্ধেরও আগে। এখন তারা স্থায়ী বাসিন্দা। পুরীতে এসে হোটেল ব্যবসাকে পেশা করলেও হালদাররা বাঙালীর কৃষ্টি ও সংস্কৃতিকে আঁকড়ে থাকতে ভোলেন নি। হোটেল প্রাঙ্গণে তাই তারা দোল, দুর্গোৎসব, বিজয়া সম্মিলনী এবং রবীন্দ্র জন্মবার্ষিকী সাড়ম্বরে পালন করেন এবং এতে অংশ নেন স্থানীয় এবং টুরিস্ট বাঙালী নির্বিশেষে।

পুরীর আর এক অভিজাত ও বনেদি বাঙালী পরিবার হলেন ঘোষ পরিবার। এরা জমিদার। পুরীর আশেপাশে এদের বিস্তর ভূসম্পত্তি। সর্বপ্রকার জনহিতকর কার্যের অগ্রণী ও পৃষ্ঠপোষক রথযাত্রার সময় এরা পঃ বাংলা থেকে আগত বহু তীর্থযাত্রীদের বাসস্থানের ব্যবস্থা করে দেন। এদের বাড়ীর অনেকেই পুরীর বহু জনকল্যাণ মূলক প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে জড়িত। এদের পরিবারের বধূ ডক্টর গৌরীরাণী ঘোষ বটানীর পি-এইচ-ডি। বর্তমানে আমেরিকাতে আছেন। দুঃস্থা নিঃসন্তান বিধবারা চিরকালই পরিবারের বোঝা। বাঙালী প্রতিষ্ঠিত ও পরিচালিত পুরীর বিধবা আশ্রম এদের দায়িত্বভার গ্রহণ করে থাকেন। নানারকম সূচিশিল্প, বস্ত্রবয়ন ও কার্পেন্টারির কার্যে তালিম দিয়ে এই দুঃস্থাদের স্বনির্ভর করে তোলার মহান ব্রত নিয়েছেন এই আশ্রম বহুকাল থেকেই। এক সময়ে এই আশ্রমের অভিভাবিকা ছিলেন রবীন্দ্রনাথের ভ্রাতুষ্পুত্রী হেমলতা-দেবী ওরফে বড়মা। পুরীতেই তিনি স্থায়ীভাবে বসবাস করতেন।

বছর কয়েক হল তিনি গত হয়েছেন। হেমলতা দেবী ছিলেন পুরীর সর্বজনীন বড়মা। বিধবা আশ্রমের তৈরি জিনিষের চাহিদা পুরীতে বেশ ভালো। বাংলা সাহিত্যে পুরীর সমুদ্রসৈকত উপেক্ষিত নয়। সুসাহিত্যিক সমরেশ বসুর নির্জন সৈকতের পটভূমি পুরীর সমুদ্র সৈকত। সুখ্যাত সাহিত্যিক তারাশংকর বন্দ্যো-পাধ্যায় তার গন্তব্যহীন উপন্যাসের নায়িকার সন্ধান পেয়েছিলেন এই পুরীর সমুদ্র-কূলে। তাছাড়া বহু বাংলা ছবির পরিচালক প্রায়ই পুরীতে আসেন ছবির সুটিং করতে। অধিকাংশ বাংলা ছবিতে দেখা যায় নায়ক-নায়িকার প্রেমের প্রথম পাঠ শুরু হয় এই মনোরম সমুদ্র সৈকতের বালুকায়। পুরীতে সবচেয়ে আগ্রহ হল এর ধর্মীয় পরিবেশ। ভারতের প্রায় অধিকাংশ ধর্মগুরুরই একটি করে মঠ পুরীতে অবস্থিত। তাই পুরী হোল অবসরপ্রাপ্ত বাঙালীর বার্ধক্যের বারাণসী। ওড়িশায় বসবাসকারী অধিকাংশ বাঙালীরই কর্মজীবনের অবসানে পুরীতে বসবাসের আগ্রহ দেখা যায় প্রবল। সময় কাটাবার জন্যে এরা তাই প্রতিষ্ঠা করেছেন রিটায়ার্ড মেনস রিক্রিয়েশন ক্লাব।

প্রমথেশ ভট্টাচার্য

কানপুর

কানপুর এখন স্তব্ধ, নির্বাক। কোন কথা বলছে না, যেন কত অবোলা শিশু। কিন্তু ঠিক তা নয়। শীতের প্রথম দরজায় পা দিয়ে হু হু করে নেমে আসবে জিরো ডিগ্রীতে। তারপর যা হবার হবে। অথচ এই কদিন আগেও কত সুন্দর আবহাওয়া ছিল—ধুমধাম করে দুর্গাপুজো, লক্ষ্মীপুজো, কালীপুজো হয়ে গেল। এক সঙ্গে একজোন বাঙালীকে একই মণ্ডপে ভাব বিনিময়ের আদান-প্রদান, যেন তাঁরা কত নিকট আত্মীয়।

কলকাতা মহানগরীর নিত্যনৈমিত্তিক বৈচিত্র্য জীবন ছেড়ে যাঁরা এই শিল্পনগরীতে আসেন, প্রথমদিকে তাঁরা ডাঙায় তোলা জলের মাছ ভাবায় তোলার মত। মনের সঙ্গে যাঁরা মানিয়ে নিতে পারেন, তাঁরা থেকে যায়, আর বাকীরা বিয়াল্লিশ টাকা পঞ্চাশ পয়সার টিকিট কেটে দুটো পঁয়ত্রিশের কালকা মেল ধরে সোজা হাওড়া।

এখানকার শিল্প সাহিত্য এবং সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানগুলো বাঙালীর কৃতিত্বকে বজায় রেখে সমান তালে তাল মিলিয়ে শহরের পার্কে, ময়দানে, অলি-গলিতে অনুষ্ঠান করে চলেছে দিনের পর দিন, বছরের পর বছর। 'বঙ্গীয় পরিষদ' শুধু কানপুরে নাটক করে ক্ষান্ত থাকেনি, দীর্ঘ আট বছর ধরে বাংলা একাংক নাটক প্রতিযোগিতায় অংশ নিয়ে একাধিকবার পুরস্কার নিয়ে এসেছে বিভিন্ন জায়গা থেকে। 'বঙ্গীয় সাহিত্য সমাজ' কানপুরের সবচেয়ে পুরোনো প্রতিষ্ঠান, সবচেয়ে বড় গ্রন্থাগার গ্রন্থাগারে প্রবেশ করলে রুচিশীল নৈপুণ্য-তার পরিচয় পরিলক্ষিত হয় সারাটা ঘরে।

জি, টি, রোড ধরে সোজা পাণ্ডুনগরের দিকে গেলে ডানপাশে রকমারী দোকানের সাজ-সরঞ্জাম বাঁ-পাশে জে, কে, মন্দির। শ্বেত পাথরের মেঝেতে পা-রাখতে যে কেউ কুণ্ঠাবোধ করবে। বিশাল এলাকা। বাউ-ন্ডারি সারাটা মন্দিরকে ঘিরে রেখেছে। মন্দিরের সামনে ছোটবড় ফোয়ারার দৃশ্যাবলী মনকে জয় করে নেয়। কালপি রোড ধরে পালকি মন্দিরে গেলে প্রাণটা জুড়িয়ে যায়। প্রতি মঙ্গলবার এই মন্দিরে পুজো হয়। যে কোন সময় মন্দিরে প্রবেশ করলে অনেক বাঙালী মহিলাদের তাঁদের একনিষ্ঠ পুজো-আচ্চা করতে দেখা যায়।

পাণ্ডুনগর থেকে হর্ষনগরের দিকে এগিয়ে গেলে বাঙালীদের কথা আমার মনে করিয়ে দেয়। হর্ষনগরের 'সমাহার' নাট্যগোষ্ঠী পুজোর কয়েকদিন একাধিক নাটক করে রীতিমতো আলোড়ন তুলেছে। প্রায় তিরিশ জনকে নিয়ে গঠিত এই সংস্থাটি কালীপুজো উপলক্ষে 'নটী বিনোদিনী' নাটকটি মঞ্চস্থ করে কানপুরের বুকে প্রচুর অবদান রেখে গেলেন।

শহরের কেন্দ্রবিন্দুতে দাঁড়িয়ে আছে 'ফুলবাগ'। দু'মাইলের এই এলাকাকে ঘিরে আম, জাম, শিশু বৃক্ষের যেমন অভাব নেই তেমনি চামেলি, গোলাপ, ডালিয়ার ভীড়ে শীতের মরসুমকে জয় করে নেয়। সামনে বিরাট চৌরাস্তা—চৌরাস্তাকে ঘিরে রয়েছে বড় বড় অফিস এবং এর ঠিক কাছাকাছি 'সেন বালিকা বিদ্যালয়'। কিছুদূর এগিয়ে গেলে এ, বি, বিদ্যালয়। দুটো বিদ্যালয়ই বাঙালীদের অবদান। স্বর্গীয় অতুলপ্রসাদ সেনের নামানুসারে সেন বালিকা বিদ্যালয়ের নামকরণ করা হয়। অত্যন্ত দুঃখের সঙ্গে জানাতে হচ্ছে—দুটো বিদ্যালয়ে বাংলা ভাষায় পড়ানো হয় না।

সময়ে অসময়ে নেতাজী ক্লাব বিভ্রান্ত নাট্যসংস্থা বিভিন্ন অনুষ্ঠানের মাধ্যমে বাঙালীদের একান্তভাবে কাছের মানুষ হতে চাইছে। সরস্বতী পুজোর আর বেশী দেরী নেই। এই উপলক্ষে কে কোন ভূমিকা নিয়ে অবতরণ করবে তার প্রতীক্ষায় বসে আছে এখানকার বাঙালীরা।

অমল দেব

পাওয়ার, স্কিল ও আধুনিক ফুটবল

সুকুমার সমাজপতি

আমরা বাঙালীরা বোধহয় একটু বেশী প্রাণচঞ্চল। তাই যাতেই আমরা পাই আনন্দের খোরাক তা নিয়ে মেতে উঠতে আমরা বিন্দুমাত্র দ্বিধাবোধ করি না। আর ঠিক সেই কারণেই ফুটবল অচিরেই তার চিরস্থায়ী আসন করে নিয়েছে বাঙালীর অন্তরে। প্রকৃতপক্ষে নগেন্দ্র সর্বাধিকারীর সেই আমল থেকে আজ অবধি ফুটবলের প্রতি বাঙালীর পৃষ্ঠপোষকতা ও অনুরাগ উত্তরোত্তর বেড়েই চলেছে। তাই এই কলকাতাকে ভারতীয় ফুটবলের পীঠস্থানে পরিণত হতে খুব বেশী সময়ও লাগে নি। আর হবে নাই বা কেন? আর কি এমন খেলা আছে যা দেড় ঘন্টার জন্যে মানুষকে পার্থিব সব কিছু ভুলিয়ে দিয়ে উত্তেজনার চরমে পৌঁছে দিয়ে দিতে পারে এমন অনাবিল আনন্দ? তাই তো দেখি তামাম দুনিয়ায় এই ফুটবলেরই জয়জয়কার।

যে ফুটবলকে কেন্দ্র করে উন্মাদের এত মাতামাতি সেই ফুটবল নিজেও কিন্তু থেমে নেই। জয়ের আকাঙ্ক্ষায় প্রতিদ্বন্দ্বী দলেরা নিত্যই নতুন নতুন পদ্ধতি আবিষ্কার করছে—প্রতিনিয়ত চলছে সেই-সব পদ্ধতি নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা আর এরই ফলস্বরূপ আমরা দেখতে পাচ্ছি ফুটবল হয়ে পড়ছে ক্রমশঃ রক্ষণাত্মক। সকলেরই উদ্দেশ্য সেই এক—'আগে নিজের ঘর সামলাও, পরে অন্যের ঘরে আগুন লাগাও।' তাই দু ব্যাক থেকে তিন ব্যাক, তিন থেকে চার ব্যাক, চার ব্যাক থেকে ৪-৩-৩, তার থেকে সুইপার সিস্টেম প্রভৃতি বিভিন্ন পদ্ধতির হয়েছে প্রচলন। অথচ এতে ফুটবলের যে আসল উদ্দেশ্য গোল করা, দর্শকদের তৃপ্তিদায়ক গোলের প্রদর্শন—তার সম্ভাবনা হয়ে পড়তে লাগল অনেক সীমিত। শিল্পের ছোঁয়া হারিয়ে ফুটবল যেন হয়ে উঠতে লাগল মুষ্টিযুদ্ধের প্রতিদ্বন্দ্বিতা। অথচ আশ্চর্য এই যে শক্তিশালী প্রতিপক্ষকে ঠেকাবার জন্যেই কিন্তু হয়েছিল রক্ষণাত্মক ফুটবলের সূচনা। শক্তিশালীর অর্থ কিন্তু এখানে শুধুমাত্র দৈহিক শক্তি বা সামর্থ্য নয়, তার সঙ্গে নৈপুণ্যেরও সমন্বয়। নৈপুণ্যের দিক থেকে শ্রেষ্ঠতর দলকেই সাধারণতঃ আমরা শক্তিশালী দল বলে আখ্যা দিয়ে থাকি। সুতরাং দেখা যায় যে অপেক্ষাকৃত নিপুণ খেলোয়াড়ের সমন্বয়ে গঠিত দলের বিজয় অভিযানকে ব্যাহত করার জন্যেই প্রধানতঃ প্রয়োজন হয়ে হয়েছিল রক্ষণাত্মক ফুটবলকে আঁকড়ে ধরার। সম্ভবতঃ এরই নাম দেওয়া হয়েছিল 'পাওয়ার' ফুটবল। আর এরই বলি হতে দেখা গেল ফুটবলের অপ্রতিদ্বন্দ্বী নায়ক পেলেকে লন্ডনে অনুষ্ঠিত ১৯৬৬র বিশ্বকাপের আসরে। কিন্তু শিল্পের এমন অবক্ষয় দর্শকদের কাছে স্বভাবতঃই বিরক্তির কারণ হয়ে দাঁড়াল। পৃথিবীর তাবৎ কোচ ও ফুটবল-বিশারদরাও হয়ত বোধ করতে লাগলেন খানিকটা অস্বস্তি। কিন্তু এটাও ভুলে গেলে চলবে না যে পরিবর্তন আসে অনেক ভাঙচুরের মধ্যে দিয়ে। তাই মনে হয় 'পাওয়ার' ফুটবলের ঐ সময়টা ছিল হয়ত 'ট্রানজিশন পিরিয়ড'। এর পরে যেদিকে মোড় ঘুরল তা হল 'টোটাল' ফুটবল। টোটাল ফুটবলে পাওয়ারকেও কিন্তু একঘরে করা হল না। কেন না ফুটবল তো মূলতঃ শক্তি ও তারুণ্যের খেলা। তাই 'পাওয়ার' ফুটবল আর 'স্কিলড' ফুটবলের মধ্যে একটা চমৎকার সমন্বয়-সাধন করা হল। 'টোটাল' ফুটবল কথাটা কিন্তু খুব অর্থবহ। নৈপুণ্যের দিক থেকে ব্যক্তিগতভাবে

খেলা

অস্ট্রেলিয়াতে ভারতীয় দল

১৯৭৭-৭৮ সালের অস্ট্রেলিয়া সফরে ভারতীয় ক্রিকেট দলটি এযাবৎ ৭টি খেলায় এইভাবে জিতেছে : (১) সাউথ অস্ট্রেলিয়ান কান্ট্রি দলের বিপক্ষে এক দিনের খেলায় ৭ উইকেটে, (২) সাউথ অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে ৪ দিনের খেলায় ৬ উইকেটে, (৩) ভিকটোরিয়ান কান্ট্রি দলের বিপক্ষে একদিনের খেলায় ৫ উইকেটে, (৪) ভিকটোরিয়া দলের বিপক্ষে ৪ দিনের খেলায় ৬ উইকেটে, (৫) নিউ সাউথ ওয়েলস কান্ট্রি দলের বিপক্ষে একদিনের খেলায় ৭ উইকেটে, (৬) নিউ সাউথ ওয়েলসের বিপক্ষে চার দিনের খেলায় ৬ উইকেটে এবং (৭) কুইন্সল্যান্ড কান্ট্রি দলের বিপক্ষে এক দিনের খেলায় ১ উইকেটে।

শেফিল্ড শীল্ডের গত বছরের রানার্স-আপ ভিকটোরিয়ার বিপক্ষে ৪ দিনের খেলায় ভারতীয় ক্রিকেট দলের ৬ উইকেটে জয়লাভ বিশেষ উল্লেখযোগ্য। কারণ ১৯৬২ সালে এম সি সি কাছে পরাজয়ের পর অস্ট্রেলিয়া সফরকারী বিদেশী ক্রিকেট দলের কাছে ভিকটোরিয়া দলের এই প্রথম পরাজয়।

প্রথম দিনের খেলায় ভিকটোরিয়া প্রথম ইনিংসের ৮ উইকেট খুইয়ে ২৪৬ রান সংগ্রহ করে। দ্বিতীয় দিনে ভিকটোরিয়া ব্যাট না করে প্রথম দিনের ঐ ২৪৬ রানের ওপরই (৮ উইকেটে প্রথম ইনিংসের সমাপ্তি ঘোষণা করে। ভিকটোরিয়ার পল হিবার্ট সেঞ্চুরী (১০০ রান) এবং অধিনায়ক গ্রাহাম ইয়ালপ ৬১ রান করেন। দ্বিতীয় দিনের খেলায় ভারতীয় দল প্রথম ইনিংসের ৫টা উইকেট খুইয়ে ১৯২ রান সংগ্রহ করেছিল। দিলীপ বেঙ্গসরকার ৫৪ রান করেন। চেতন চৌহান দৃঢ়তার সঙ্গে খেলে ৯১ রানে অপরাজিত থাকেন। তৃতীয় দিনে ভারতীয় দল তাদের প্রথম ইনিংসের ৩৮৭ রানের (৯ উইকেটে) মাথায় খেলার সমাপ্তি ঘোষণা করে। চেতন চৌহান ৫১৬ মিনিট খেলে ১৫৭ রান করেন। মদনলাল করেন ৮৮ রান। ৬ষ্ঠ উইকেটের জুটিতে মদনলাল এবং চৌহান ১৯২ মিনিটে ১৮৯ সংগ্রহ করেছিলেন। তৃতীয় দিনের বাকী সময়ের খেলায় ভিকটোরিয়া দ্বিতীয় ইনিংসের ৪ উইকেটের বিনিময়ে ১৩০ রান করেছিল।

শেষ অর্থাৎ চতুর্থ দিনে ভিকটোরিয়ার দ্বিতীয় ইনিংস ২৭০ রানের মাথায় শেষ হলে ভারতীয় দল জয়লাভের প্রয়োজনীয় ১৩০ রান তুলতে দ্বিতীয় ইনিংস খেলতে নামে। খেলা ভাঙার নির্দিষ্ট সময়ের মাত্র ১৩ মিনিট আগে ভারতীয় দল দ্বিতীয় ইনিংসের ৪ উইকেটের বিনিময়ে ১৩০ রান তুলে ৬ উইকেটে জয়ী হয়।

সংক্ষিপ্ত স্কোর

ভিকটোরিয়া : ২৪৬ রান (৮ উইকেটে ডিক্লেয়ার্ড। পল হিবার্ট ১০০ এবং গ্রাহাম ইয়ালপ ৬১ রান। প্রসন্ন [illegible] রানে ২, ভেংকট ৬৫ রানে ২ [illegible] চন্দ্রশেখর ৯৬ রানে ২)।

ও ২৭০ রান (লাফলিন নট আউট ৮৮ [illegible] ভেংকট ১৫ রানে ৪, প্রসন্ন ৭৪ রানে ৪ এবং চন্দ্রশেখর ৬৬ রানে ১ উইকেট)।

ভারতীয় দল : ৩৮৭ রান (৯ উইকেটে ডিক্লেয়ার্ড। চেতন চৌহান ১৫৭, মদনলাল ৮৮, এবং বেঙ্গসরকার ৫৪ রান। হিগস ১০১ রানে ৬ উইকেট)।

ও ১৩০ রান (৪ উইকেটে। চৌহান ৫৭ রান। হার্স্ট ৩৬ রানে ২ উইকেট)।

সিডনিতে নিউ সাউথ ওয়েলসের বিপক্ষে ৪ দিনের খেলায় ভারতীয় দল স্বচ্ছন্দে ৬ উইকেটে জয়ী হয়। ভারতীয় দলের প্রথম ইনিংসে মহিন্দার অমরনাথ সেঞ্চুরী করেন (১৩৭ রান)। নিউ সাউথ ওয়েলস দলের দ্বিতীয় ইনিংসে অধিনায়ক ববি সিম্পসন ৬ রানের জন্যে সেঞ্চুরী থেকে বঞ্চিত হন।

প্রথম দিনে নিউ সাউথ ওয়েলস প্রথম ইনিংসের ২ উইকেটে ১৮ রান করেছিল। বৃষ্টির জন্যে পুরো সময় খেলা হয় নি।

লোয়াড়ের সামগ্রিকতা, আবার প্রতিটি লোয়াড়ের অবদানে গড়ে ওঠা সমষ্টিগত-র দলের সামগ্রিকতা। আর খেলোয়াড়ের সম্পূর্ণতা আনতে গেলে যে তিনটি নসের প্রয়োজনীয়তা সব থেকে বেশী তা ফুটবলেরই গোড়ার কথা—'স্পীড', ন্থ' ও 'স্ট্যামিনা' অর্থাৎ গতি, শক্তি অফুরন্ত দম। এর পরে আসে খেলো-ড়র সেই শিল্পনৈপুণ্য—যা হাজার লোয়াড়ের মাঝেও মানুষকে স্পষ্ট করে নয়ে দিতে এতটুকু ভুল করে না। কে ল, কে ইউসেবিও আর কেই বা ডি জানো। কিন্তু খেলোয়াড় যতই নিপুণ ন ফুটবলের গোড়ায় ঐ তিনটি 'এস' থাকলে কোনোমতেই তাঁর পক্ষে সম্ভব না তাঁর স্বভাবসুলভ শিল্পনৈপুণ্যের প্রাপন।

আন্তর্জাতিক ফুটবলের এই চিত্রের প্রেক্ষিতে যদি আমরা ভারতীয় ফুট-র আলোচনা শুরু করি তাহলে অন্ততঃ না কোথায় দাঁড়িয়ে আছি তা টাওর ত পারব। এই কথাটা অবশ্য অনেকের ই হাস্যকর মনে হতে পারে। অনেকেই ভাববেন সাহস ত কম নয়। যে দেশ য়ার কটা দেশের মধ্যেও ঠাঁই পায় না, নিয়ে আবার আন্তর্জাতিক ফুটবলের য়র আলোচনার মাথা কি দরকার।

কিন্তু একথাও ত ভুলে গেলে চলবে না যে এই দেশই ১৯৬২তে জাকার্তার এশিয়ান গেমসের আসরে চ্যাম্পিয়নশিপের গৌরব অর্জন করেছিল। এই ভারতীয় দলই ১৯৬০ সালে রোমে অনুষ্ঠিত অলিম্পিক প্রতি-যোগিতায় শক্তিশালী হাঙ্গেরী দলের সঙ্গে গোলের ব্যবধান ২-১ গোলে সীমিত রেখেছিল। আর সেটা কি করে সম্ভব হয়ে-ছিল তার বিশ্লেষণ করতে গেলে আমরা দেখতে পাব সেই একই সত্য উদ্ঘাটিত হবে —তা হচ্ছে স্কিলের বিকল্প ফুটবলে আর কিছুই নেই। তখনকার সেই ভারতীয় দলে ছিলেন চুনী গোস্বামী, বলরাম, পি কে ব্যানার্জি, অরুণ ঘোষ, কেম্পিয়া প্রভৃতি দিকপাল খেলোয়াড়ের দল যাঁদের ভারতীয় ফুটবলের পটভূমির থেকে বিদায়ের সঙ্গে সঙ্গেই ইন্ডিভিজ্যুয়াল স্কিল বা ব্যক্তিগত নৈপুণ্য ক্রমশঃ পাততাড়ি গুটিয়ে ফেলে। আর ঠিক সেই কারণেই আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে ভারতীয় ফুটবল আস্তে আস্তে তলিয়ে যেতে লাগল অন্ধকারের অতলে।

অথচ একথা কিন্তু ঠিকই যে কিছু-দিন আগে পর্যন্তও স্কিলের ক্ষেত্রে আমরা ভারতীয়রা খুব বেশী পিছিয়ে ছিলাম না—এশিয়ার অন্যান্য দেশের তুলনায় ত নয়ই। অতীতে নজীর কম নেই যখন আমরা আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে শক্তিশালী প্রতিপক্ষের সঙ্গে হয়ত সত্তর মিনিট অবধি সমানে সমানে লড়েছি তারপরেই শেষ কুড়ি মিনিটে হয়ত দু-তিন গোল খেয়ে গেছি। এর থেকে সহজেই প্রমাণিত হয় আমরা ভারতীয়রা প্রধানতঃ শারীরিক সামর্থ্যের দিক থেকেই মার খাচ্ছি। সুতরাং এটা বোঝা গেল যে অনতিবিলম্বেই আমাদের খেলোয়াড়দের শারীরিক পটুতা ও সামর্থ্য বাড়াতে পারলেই আমরা আন্তর্জাতিক খেলার আসরে সমানে সমানে যুঝতে পারব। সব থেকে মজার কথা এই উপলব্ধিই কিন্তু ডেকে নিয়ে আসল আমাদের সমূহ ক্ষতি। শারীরিক পটুতা বাড়াতে গিয়ে আমাদের খেলোয়াড়েরা হারিয়ে ফেলতে লাগলেন বলের ওপরে দখল। যে স্কিল ছিল ভারতীয় খেলো-য়াড়দের সহজাত তা হয়ে পড়তে লাগল সুদূরপরাহত। এর জন্য অবশ্যই দায়ী আমাদের ফুটবলের কর্ণধারেরা এবং কোচিংয়ে নিযুক্ত কিছু ব্যক্তি যাঁরা ভেবে বসলেন পাওয়ার বা শক্তি দিয়ে আমাদের ঘাটতি পুষিয়ে দিতে হবে। ভুলে গেলেন তাঁরা যে স্কিলকে বজায় রেখেই খেলো-য়াড়দের শক্তি বা সামর্থ্য বাড়াবার চেষ্টা করা উচিত। আসলে ফুটবলের কলকব্জো

ীয় দিনে নিউ সাউথ ওয়েলস প্রথম সের ২৫৮ রানের মাথায় (৫ উইকেটে) র সমাপ্তি ঘোষণা করে। দ্বিতীয় দিনে ীয় দল প্রথম ইনিংসের ২টো উইকেটে র ১৩৯ রান সংগ্রহ করেছিল। তৃতীয় ভারতীয় দল প্রথম ইনিংসের ৩৪৬ র মাথায় (৫ উইকেটে) খেলার সমাপ্তি না করলে নিউ সাউথ ওয়েলস দ্বিতীয় স-এর ২টো উইকেট খুইয়ে ৮৫ রান শেষ অর্থাৎ চতুর্থ দিনে নিউ সাউথ লসের দ্বিতীয় ইনিংস ২৮৭ রানের র শেষ হয়। ভারতীয় দল দ্বিতীয় সের খেলায় ৪ উইকেটে জয়লাভের জনীয় ১৬০ রান তুলে ৬ উইকেটে যায়।

সংক্ষিপ্ত স্কোর

সাউথ ওয়েলস : ২৫৮ রান (৫ উই-কেটে ডিক্লেয়ার্ড। ডাইসন ৬৫, তুহে ৬৪ এবং ববি সিম্পসন ৫৮ রান। বাউরি ৯২ রানে ২ এবং মদনলাল ৩৮ রানে ২ উইকেট)।

৮৭ রান (সিম্পসন ৯৫ রান। ভেংকট ১০৩ রানে ৩ এবং বেদী ৮৭ রানে ৫ উইকেট)।

ীয় দল : ৩৪৬ রান (৫ উইকেটে ডিক্লেয়ার্ড। মহিন্দার অমরনাথ ১৩৭ বিশ্বনাথ ৫৬, প্যাটেল ৫২ এবং বেঙ্গসরকার ৫০ রান। বার্নার্ড ৫২ রানে ২ উইকেট)।

ও ১৬০ রান (৪ উইকেটে। এর অমরনাথ ৪৭ এবং বিশ্বনাথ ৪০ রান। কুলি ৫৭ রানে ৩ উইকেট)।

সুব্রত কাপ ফুটবল

সর্বভারতীয় সুব্রত মুখার্জি কাপ স্কুল ফুটবল প্রতিযোগিতার ফাইনালে বারাণসীর আদর্শ সেবা বিদ্যালয় ১-০ গোলে কার-নিকোবরের গভর্নমেন্ট হায়ার সেকেন্ডারী স্কুলকে পরাজিত করেছে। আদর্শ সেবা বিদ্যালয়ের পক্ষে এই প্রথম সুব্রত কাপ জয়। অপর দিকে কার-নিকোবরের গভর্নমেন্ট হায়ার সেকেন্ডারী স্কুল এ পর্যন্ত তিনবার সুব্রত কাপ জয়ী হয়েছে—১৯৬৬, ১৯৬৭ এবং ১৯৬৯ সালে গুর্খা একাডেমীর সঙ্গে যুগ্মভাবে।

ফাইনালে প্রথমার্ধের ১৭ মিনিটের মাথায় আদর্শ সেবা বিদ্যালয়ের স্ট্রাইকার আখতার আলি জয়সূচক গোলটি দেয়। কার-নিকোবর স্কুল গোল শোধ করার জন্য আপ্রাণ খেটেছিল। তাদের দুর্ভাগ্য তারা অল্পের জন্যে গোল শোধ দিতে পারে নি।

প্রথম সেমি-ফাইনালে কার-নিকোবর গভর্নমেন্ট হায়ার সেকেন্ডারী স্কুল ২-১ গোলে শিলংয়ের সেন্ট এন্টনী হাইস্কুলকে এবং দ্বিতীয় সেমি-ফাইনালে আদর্শ সেবা বিদ্যালয় ১-০ গোলে গত বছরের সুব্রত কাপ বিজয়ী পশ্চিম বাংলার আগড়পাড়া নেতাজী শিক্ষায়তনকে হারিয়ে ফাইনালে উঠেছিল।

জাতীয় জুনিয়র সাইক্লিং

পাতিয়ালায় আয়োজিত একাদশ জাতীয় জুনিয়র সাইক্লিং প্রতিযোগিতায় পাঞ্জাব ১০৪ পয়েন্ট সংগ্রহের সূত্রে দলগত চ্যাম্পিয়ান হয়েছে। পুরুষ বিভাগে অবতার সিং (বিহার); মহিলা বিভাগে মিনতি মহাপাত্র (ওড়িশা); বালক বিভাগে দুর্জিত সিং এবং বালিকা বিভাগে অমৃত গেওয়াল ব্যক্তিগত শ্রেষ্ঠত্বের পরিচয় দেন। বালিকা বিভাগে অমৃত গেওয়াল একাই ৫টি নতুন রেকর্ড করেন। প্রতিযোগিতায় ৭টি নতুন জাতীয় রেকর্ড প্রতিষ্ঠিত হয়।

আঞ্চলিক মহিলা ক্রিকেট

গোয়ালিয়রে আয়োজিত আন্তঃ আঞ্চলিক মহিলা ক্রিকেট প্রতিযোগিতায় পশ্চিমাঞ্চল চ্যাম্পিয়ান হওয়ার সূত্রে রানী ঝাঁসী ট্রফি জয়ী হয়েছে। প্রতিযোগিতায় দ্বিতীয় স্থান লাভ করেছে পূর্বাঞ্চল।

নেহরু হকি

দিল্লীতে অনুষ্ঠিত জওহরলাল নেহরু জুনিয়ার হকি প্রতিযোগিতার ফাইনালে রাঁচির সার্লিসডাইডাস স্কুল (বিহার) ১-০ গোলে পূর্ব জার্মানীর জাতীয় স্কুলকে পরাজিত করে উপর্যুপরি দ্বিতীয়বার এই প্রতিযোগিতায় চ্যাম্পিয়ান হওয়ার গৌরব লাভ করেছে।

দর্শক

[illegible] জিনিস নষ্ট করতে পারলে খেলোয়াড়ের উৎকর্ষতা অনেক বেড়ে যায়। যেমন ফিনিশিং, টার্নিং, শুটিং, ড্রিবলিং, হেডিং, ট্যাকলিং প্রভৃতি। কেননা এই [illegible] থেকে [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] (অর্থাৎ যেখানে যেমন প্রয়োজন যেমনভাবে [illegible] খেলোয়াড়ের থেকে সকলের তাড়াতাড়ি যাওয়া) এই দুটি জিনিস আনুপাতিক হারে তবেই সমানে [illegible] যাবে বিপক্ষ খেলোয়াড়দের। আর ব্যক্তিগত [illegible] খেলোয়াড়দের [illegible] যে এই একটি ব্যাপারে তাঁদের নৈপুণ্য আর সব কিছুকে ছাপিয়ে যায়। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে [illegible] যে দুটো জিনিসে আমাদের [illegible] স্পীড ও স্ট্যামিনা [illegible] এ দুটোই কিন্তু [illegible] এর জন্যে চাই [illegible] পরিশ্রম ও নিয়মিত অনুশীলন। আমাদের ফুটবলারদের এইসব [illegible] কৌশলী খেলোয়াড়ের পক্ষে দেখানো সম্ভব—যখন সে অমিত শক্তি ও অফুরন্ত দমের অধিকারী। আর ঠিক সেই জন্যেই দরকার পাওয়ার বা শক্তির অনুশীলন। সুতরাং দেখাই যাচ্ছে যে পাওয়ার ও স্কিল—এ দুটি জিনিসের সাধনাই হওয়া উচিত যুগপৎ, কারণ একে অন্যের সহায়ক।

তবে এই সহজ সত্যটা আমরা এখনও পুরোপুরি বুঝে উঠতে পেরেছি কিনা, সে বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ আছে। কোচিংয়ে নিযুক্ত কিছু কিছু ব্যক্তির দৃষ্টিভঙ্গী দেখেই এ কথাটা আরও বেশী করে মনে হয়। খেলোয়াড়ের মধ্যে স্কিলের স্ফুরণের থেকে শক্তির বিকাশ ঘটানোকেই তাঁরা অধিকতর শ্রেয়ঃ মনে করেন। দোষ অবশ্য তাঁদেরও পুরোপুরি নয়। আসলে আন্তর্জাতিক ফুটবলের ঢেউ আমাদের দেশে এসে পৌঁছয় অনেক পরে। তাই কোনো নতুন পদ্ধতির সঙ্গে যখন আমাদের পরিচয় ঘটে বিদেশের মাটিতে তার অনেক আগেই হয়ত তা বাতিল হয়ে গেছে। কারণ আমাদের সব জানাশোনাই নির্ভরশীল পুঁথিগত বিদ্যা বা শোনা কথার ওপরে। আর এ কথা ত ঠিকই যে সব পুঁথিগত অধীত বিদ্যাই 'সেকেণ্ডহ্যাণ্ড ইনফরমেশন'— কারণ ঘটে যাওয়া ঘটনার লিপিবদ্ধকরণের নামই বই। তাই বলছিলাম সময় এসেছে আমাদের আন্তর্জাতিক ফুটবলের যুগোপযোগী ধ্যানধারণাকে, তাকে বোঝবার। তবেই না বুঝতে পারবে আমাদের তরুণেরা তাদের কি করা উচিত। অথচ কি আশ্চর্য আমাদের চিন্তাধারা। প্রস্তুতি ছাড়াই আমাদের দেশের ছেলেরা আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে প্রতিযোগিতায় পরাজয়ের গ্লানি বয়ে নিয়ে আসলে আমরাই হয়ে উঠি সব থেকে ধিক্কারে সোচ্চার। তার কারণ কিন্তু আমরা তলিয়ে দেখতে চাই না। দেখেও দেখি না যে আন্তর্জাতিক সেই আসরে যোগদানের আগে থেকেও ছিল না সত্যিকারের কোনো প্রস্তুতিপর্ব। আর যাও বা ছিল তাতে দলে নির্বাচিত খেলোয়াড়দের অধিকাংশই যোগদান করতে পারেন নি, কারণ আমরা তখন মশগুল ছিলাম দেশের মধ্যেই বিভিন্ন স্থানে লীগ খেলা নিয়ে। নামী ও নিপুণ খেলোয়াড়দের প্রস্তুতি ক্যাম্পে পাঠালে নাকি কমে যেত এই সমস্ত স্থানীয় লীগ ফুটবলের আকর্ষণ। আসলে আমাদের কাছে দেশের থেকে প্রদেশ বড়, প্রদেশের থেকে বড় নিজ নিজ প্রিয় দল। তাই ঐ সমস্ত আন্তর্জাতিক খেলার পরে আমরা আমাদের একমাত্র করণীয় কাজই করি—তা হল খেলোয়াড়দের নিন্দায় মুখর হওয়া। এ যেন সেই গাছের গোড়া কেটে আগায় জল দেওয়ার মত। তাছাড়া আন্তর্জাতিক আসরে আমাদের পরাজয়ের পরে দেশের ফুটবল কর্ণধারদের বেশ কিছু কিছু অদ্ভুত সিদ্ধান্তও নিতে দেখা গেছে। কিছুদিন আগে তাঁরা হঠাৎই ঠিক করে বসেছিলেন যে পরাজয়ের গ্লানি এড়াবার জন্যে আমাদের জাতীয় দলকে আন্তর্জাতিক পর্যায়ের কোনো খেলায় আর পাঠান হবে না। যদি তাঁদের এই সিদ্ধান্তে ভবিষ্যতের কোনো শুভংকর বীজ নিহিত থাকত—অর্থাৎ আত্মসমীক্ষায় অনুপ্রাণিত হয়ে তাঁরা যদি আমাদের খেলোয়াড়দের সুসংবদ্ধ কোচিংয়ের মাধ্যমে দেশের খেলার মান উন্নয়নের চেষ্টা করতেন এবং সেই উদ্দেশ্যসাধনের পরেই আবার আন্তর্জাতিক আসরে যোগদানের কথা ভাবতেন তাহলে কিছুই বলার থাকত না। বোঝা যেত কোনো এক মহৎ উদ্দেশ্যের অনুপ্রেরণাতেই আমরা সাময়িকভাবে নিজেদের গুটিয়ে নিয়েছিলাম আন্তর্জাতিক আসর থেকে। [illegible] উচ্চকল্পনা করেছিলেন গত অলিম্পিকের আসরে পূর্ব জার্মানীর ক্রীড়াবিদরা। কিন্তু তা তো নয়। এটা ত স্রেফ হয়েছিল মেজাজই দেখানোর জন্যে। ব্যাপার স্যাপার দেখে মনে হয়েছিল যেন খেলোয়াড়দের ওপর মানসিক চাপ সৃষ্টিই এর একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল। যেন তাঁদের শাস্তিবিধান করতে পারলেই আমাদের খেলার মান উন্নয়নের পথ হয়ে যেত প্রশস্ত। আর এরই অবশ্যম্ভাবী ফল হিসেবে আমরা আন্তর্জাতিক ফুটবল থেকে হয়ে পড়েছিলাম সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন। তাই বিভিন্ন নতুন পদ্ধতি সম্বন্ধে আমাদের অনেকের মনেই যে ধারণা জন্মেছিল তার অনেকটাই ছিল বাস্তবের সঙ্গে কল্পনার রঙ মেশানো। তাই হয়তো 'টোটাল' ফুটবলে স্কিলের ভূমিকা নগণ্য বলে ধরে নেওয়া হয়েছিল। আর এই ধারণার বশবর্তী বেশ কিছু ফুটবল বিশারদকে মাঝে মাঝে এমন সব দুঃসাহসিক মন্তব্য করতে শুনেছি যে তাঁদের ফুটবল ময়দানে অবাধ বিচরণে ভারতীয় ফুটবলের ভবিষ্যৎ ভেবে শিউরে না উঠে পারি নি। এমন কথাও শুনেছি যে আজকের এই ম্যান-টু-ম্যান খেলার অতীতের অমুক অমুক নামী খেলোয়াড় কিছুই করতে পারতেন না। এই প্রসঙ্গে কাল্পনিক একটা পরিস্থিতি অবতারণার লোভ সংবরণ করতে পারছি না। ধরা যাক অতীতের—আর শুধু অতীতই বা বলি কেন—সর্বকালের ভারতীয় ফুটবলের অপ্রতিদ্বন্দ্বী নায়ক—[illegible] যদি আজকের ফুটবলে অংশ নিতেন তাহলে পারতেন না কি তাঁর সেই [illegible] বর্তমান [illegible] ফুটবলরক্ষকদের সামনে? আমার তো মনে হয় আজকের দিনে তাঁর সেই ক্রীড়াকৃতি দর্শকদের মনে দাগ কাটতো আরো বেশী করে। কারণ, তাঁর সেই স্থিরলক্ষ্যের সট আর প্রতিটি আচরণে তীক্ষ্ণ সেই বুদ্ধির ছাপ যে আজকের কলকাতার ফুটবল বড় [illegible] করে ফিরে পেতে চায় সভয়বিস্ময়ে। তাই না দেখি এখনও যখন তিনি পঞ্চান্ন-ছাপ্পান্ন এই বয়সে স্থূল ঐ দেহ নিয়ে এখনকার তরতাজা তরুণদের সঙ্গে খেলতে নামেন তখন প্রৌঢ় ঐ খেলোয়াড়কেই আটকাতে তাদের কি প্রাণান্তকর অবস্থা। 'পাওয়ার' ফুটবলের শিক্ষায় শিক্ষণপ্রাপ্ত ঐ তরুণেরা তাদের ভাণ্ডারের সব পাওয়ার উজাড় করে দিয়েও কিন্তু প্রৌঢ় ঐ খেলোয়াড়ের কোনো কৌশলকেই বেচাল করে দিতে পারে না। তাই বলছিলাম বর্তমান ফুটবলের কোনো পদ্ধতিতেই নেই স্কিলের মরণ। আর যদি কখনও সত্যিই আমাদের তাই মনে হয়ে থাকে তবে তা বিভিন্ন পদ্ধতি সম্পর্কে আমাদেরই ত্রুটিপূর্ণ অনুধাবনের প্রত্যক্ষ ফল।

পরিশেষে বলি, আজকের এই টোটাল ফুটবলে স্কিলের প্রয়োজনীয়তা হয়ত সব থেকে বেশী। কেননা যে কোনো নতুন পদ্ধতিতেই যোগদানকারী প্রতিটি খেলোয়াড়ের ওপরেই বর্তায় আজ সমান দায়িত্ব। কোনো বিশেষ খেলোয়াড়ই এখন আর শুধুমাত্র গোল করবার জন্যে নির্দিষ্ট হয়ে থাকে না, অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে কখনও সে আক্রমণের নায়ক, আবার কখনও রক্ষণের কাণ্ডারী। আর তারই হয়ত জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত রেখে গেলেন এই কলকাতারই বুকে বিশ্ববন্দিত স্ট্রাইকার কারলস এ্যালবার্টো 'কসমস' দলের হয়ে খেলে তাঁর প্রথম গোলের মাধ্যমে প্রতিপক্ষ মোহনবাগানের প্রতিটি খেলোয়াড়কে কিংকর্তব্যবিমূঢ় করে দিয়ে।

বাথাদাকে স্মরণ করি

স্কুলের প্রথম থেকে টাক লেগে খেলতে শুরু করেছিল সমরেশকে সাব-স্টিউ করে রাখার জন্য। তিন চারটে ম্যাচের মধ্যে পড়ে সমরেশ ম্যাড়া হয়ে গেল।'

২৮শে সেপ্টেম্বর '৭৭-এর শীল্ড ফাইনালের খেলা নিয়ে ওপারের কথা ছাটির ওপর সমরেশ ওরফে পিন্টু চৌধুরীকে মন্তব্য করতে বলেছিলাম।

ইউ বি আই-এর হেড অফিসের তেতো তলার ডেসপ্যাচ ডিপার্টমেন্টে সমরেশকে পাওয়া গেল। বেলা তখন একটা হবে। সকালে প্র্যাকটিস ছিল। মাঠ থেকেই অফিসে চলে এসেছেন সমরেশ।

শান্ত ধীর লম্বা, এখন-ও পুরোপুরি তৈরী হয়নি কথা থেকে, সমরেশ বললেন,— হ্যাঁ, হয়ত এটাই ওর (হাবিবের) প্রি-প্ল্যান্ড এপ্রোচ ছিল। আমিও ফাঁদে জড়িয়ে গিয়েছিলাম। যখন টের পেলাম তখন গেম ওভার লস্ট।

পিন্টু চৌধুরী আজ প্রায় এক দশক ধরে কলকাতার গড়ের মাঠে ফুটবল অনুরাগীদের চোখে মনমাতান আইডল হয়ে উঠেছেন তাঁর দক্ষতায় এবং সৌজন্যতায়। ১৯৬৭ থেকে ৬৯ খেলেছেন উয়াড়িতে। তারপর থেকে গায়ে লাল-হলুদ জার্সি উঠেছে। মাঝে ১৯৭৬-এ একবার জার্সির রং বদলেছিল সবুজ-মেরুনে। রং বদলিয়ে সমরেশ সে বছরও সফল। মোহনবাগানের হয়ে লীগ জয় করে নিয়েছিল। সেজন্যই সমরেশ নামটির সঙ্গে যেন লীগ জয়ের কোন গোপন যোগসূত্র আছে। এই ৭৭-এ মুলত তরুণ মুখে ভরা ইস্টবেঙ্গলে ফিরে আসার সঙ্গে সঙ্গে এক বছরের জন্য হাতছাড়া লীগ বিজয়ের সম্মান ঐ দল কেড়ে নিল তারকাখচিত মোহনবাগানের হাত থেকে। সেই প্রসঙ্গে সমরেশকে প্রশ্ন করেছিলাম— আপনিত চূড়ান্ত প্লেয়ার। ১৯৭০ থেকে ৭৭ কলকাতার লীগ জয়ের সাথে আপনার নাম জড়িয়ে রইল। সমরেশ মৃদু হেসে জবাব দিলেন,— এটা কোন ব্যাপার নয়। আমি কিছু বলব না।

তবে আপনার সম্পর্কে কিছু বলুন। আপনার অনুরাগীরা আপনাকে জানতে চায়।

আমার প্রশ্ন শুনে সমরেশ ক্ষণিক কি যেন ভেবে নিলেন। তারপর বলে চললেন,— 'অশোকনগরে বয়েজ সেকেণ্ডারী স্কুলে একেবারে নিচু ক্লাসে পড়ার সময় থেকেই ফুটবল আমার টেনেছিল। তবে সঠিক অর্থে খেলা শুরু করেছি ১৯৬৩-৬৪-এর সময় থেকে। তখন আমি ক্লাশ এইটের ছাত্র। পায়ে বুট উঠেছে। দৌড়ে দৌড়ে বুটপড়া পায়ের রুক্ষতা ঘুচিয়ে নিয়েছি। ফুটবল খেলাটাও ততদিনে আমার কাছে তার চৌটাল কিলায় নিয়ে হাজির হয়েছে।

'এই সময়ের কথা বলতে গেলে বড্ড বেশি মনে পড়ে আমাদের স্কুলের গেমটিচার সজীব রায়চৌধুরী এবং সুকুমার দাসের কথা। ঠিক বলতে পারব না অনু প্রেরণা কাকে বলে। তবু মনে হয় আমার ফুটবল জীবনের প্রাথমিক পর্বে এদের ঋণ স্বীকার না করলে সময়ের কাছে আমায় অকৃতজ্ঞ হতে হবে।'

'জন্ম থেকেই অসচ্ছলতার মধ্যে বেড়ে উঠেছি। বাবা শ্রীনিরঞ্জন চৌধুরী এবং মা শ্রীমতী রেণুপ্রভা চৌধুরী। জানি না ঐ অসচ্ছলতার ভেতর তাঁরা দুজন, বিশেষ করে মা,— কেমন করে কি ভাবে আমাকে এগিয়ে দিয়েছেন ফুটবলের দিকে লেখা-পড়ার ক্ষতি হবে জেনেও। নিম্নবিত্ত বাঙালী ঘরের ছেলের জীবনমঞ্চে আসন নেবার একমাত্র ছাড়পত্র ত কোন রকমে গ্র্যাজুয়েট হয়ে একটা কেরাণীর পদ অর্জন। এই বৃত্তের বাইরে বাবার মত নিজের ছেলেকে বৃত্ত ভেঙে এগিয়ে দেবার মত মনোবল তাঁরা কেমন করে যেন জোগাড় করে নিয়েছিলেন।'

সত্যিকারের ফুটবলের বড় আসরে হাজির হবার সুযোগ ঘটল ১৯৬৭-তে। কলকাতার উয়াড়ী ক্লাবে নাম লেখানোর পর থেকে। বলতে কি, সেদিন থেকেই শুরু হল আমার বাস্তবিক ফুটবলারের জীবন। এবং এই সময়ে আমি এক পুরুষের সংস্পর্শে এলাম,— যিনি বিগত কয়েক দশক ধরে কলকাতা তথা বাংলার ফুটবলের আসরে এক কিংবদন্তীতে রূপান্তরিত হয়েছেন। হ্যাঁ ঠিক ধরেছেন—তিনি বাঘাদা। (তেজেস সোম)। যথার্থ অর্থে তিনি আমার শিক্ষাগুরু। কিংবা শিক্ষাগুরু নয় — আরো কিছু। বাঘাদা আমার ফুটবলারের জীবনে ঈশ্বরের ভূমিকায় উত্তীর্ণ হয়েছেন। পরবর্তীকালে আরো অনেক কীর্তিখ্যাত কোচের সংস্পর্শে আসার সৌভাগ্য হয়েছে আমার। তাঁদের সকলের কাছে আমি কোন না কোন দিক দিয়ে ঋণী। কিন্তু বাঘাদার ঋণ আমি শোধ করতে পারব না। আমাদের খেলোয়াড়দের মধ্যে যেকোন খেলার আরম্ভে প্রেয়ার-এর একটি রেওয়াজ আছে। আমি সেই 'প্রেয়ারে' দাঁড়িয়ে আজো আমার জনক-জননীর সাথে বাঘাদার নাম স্মরণ করি।

খেলোয়াড় মেশিন নয়। তারও মনপ্রাণ আর দশটা সামাজিক মানুষের মত সুখে-দুঃখে, ক্লান্তিতে বিষাদে আন্দোলিত হয়। সবদিন সব খেলা আমি হয়ত সমানভাবে খেলতে পারি নি। কোন দিন কোন সময়ে দর্শক হয়ত আমার ওপর তুষ্ট হন নি। তাঁরাও আমার প্রিয় দর্শক। যে কোন খেলোয়াড়ের জীবনে কোন না কোন খেলা স্মরণীয় হয়ে থাকে। কোন খেলা হয়ে থাকে

সমরেশ চৌধুরী

গ্যারাণ্টি মানি

১,৬৯,০০০

অস্ট্রেলিয়ার টেলিভিশন ব্যবসায়ী ধনকুবের কেরী প্যাকার সম্প্রতি টাকা ছড়িয়ে কিনে নিয়েছেন বিশ্বের প্রথম সারির অধিকাংশ তাবড়-তাবড় ক্রিকেটারকে। প্যাকারের উদ্দেশ্য এই সমস্ত খেলোয়াড়দের নিয়ে আন্তর্জাতিক টেস্ট সিরিজের প্রচলন করা। ইতিমধ্যেই প্যাকার চুক্তিতে আবদ্ধ খেলোয়াড়রা অস্ট্রেলিয়ায় মেলবোর্ন ও অ্যাডিলেডে দুটি নির্বাচনী খেলায় অংশ গ্রহণও করেছেন। দুটি ম্যাচের খেলোয়াড় তালিকা দেখেই মন খারাপ হয়ে যায়.. 'ক্রিকেটের প্রায় সব হিরোই প্যাকারের দিকে।'

আন্তর্জাতিক ক্রিকেট সম্মেলন (ইন্টারন্যাশন্যাল ক্রিকেট কনফারেন্স) যার সদস্য বিশ্বের প্রায় সব ক্রিকেট অনুরাগী দেশগুলিই, যদিও প্যাকার আয়োজিত এই তথাকথিত সুপার টেস্টকে স্বীকৃতি দেন নি, তবুও তারকা খেলোয়াড়রা কিন্তু সকলেই লক্ষ্মী-নারায়ণের টানে প্যাকারের সোনার হরিণের পিছনে ছুটেছেন। বিভিন্ন দেশের ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ড প্যাকারের সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ খেলোয়াড়দের বয়কটের ভয় দেখিয়ে নিজেদের দিকে রাখতে চেয়েছেন। তাতেও কিছু হয় নি। খেলোয়াড়রা দেশের স্বার্থ' শিকেয় তুলে রেখে নিজেদের আখের গোছাতেই প্যাকারের ঘর আলো করেছেন। লোভনীয় সর্ত, আকাশ ছোঁয়া অর্থ – এ

বেদনার আধার। আমার জীবনে এখনও পর্যন্ত সেরা খেলা ১৯৭২-এ ইস্টবেঙ্গলের হয়ে ডি সি এম ফাইনাল খেলাটি। কোরিয়ার ডক-রোগন্ড দলটি কেমন শক্তিধর আপনারা জানেন। সেই দলের বিরুদ্ধে আমি দুদিনই চমৎকার খেলেছিলাম বলে আমি মনে করি আমি ভুলতে চাই ১৯৭৪-এ ডুরাণ্ডের সেমিফাইনালে মোহন বাগানের সাথে খেলাটিকে। সেই খেলায় আমাদের দল ইস্টবেঙ্গল পরাজিত হয়েছিল বলে নয়,— সেদিন আমি একেবারে গুছিয়ে খেলতে পারি নি।'

চারবার বাংলার হয়ে জাতীয় চাম্পিয়ানশীপ (সন্তোষ ট্রফি) খেলেছি। তিনবার ট্রফি জয় করেছি। একবার হেরে গেলাম রেলের কাছে,—সেমিফাইনালে। ১৯৭১-এ, অরুণদার (অরুণ ঘোষ) নেতৃত্বে রাশিয়া সফরে গিয়েছিলাম। '৭২-এ বার্মায় গেলাম প্রি-অলিম্পিক খেলতে, ভারতীয় দলের হয়ে। ১৯৭৪-এ মারডেকায় যাবার ডাক পেলাম। কিন্তু সে সময় আমি আমার প্রথম সন্তান প্রত্যাশা করছি। বাবাদাও বললেন, 'খেলা অনেকবার আসবে। কিন্তু এই সময়ে আমার স্ত্রীর পাশে অনুপস্থিতি হয়ত সারা জীবনের অনুশোচনার কারণ হয়ে থাকতে পারে।' হ্যাঁ, এই সময় আমি এক কন্যা লাভ করি।

আপনি জিজ্ঞেস করছেন বয়সের ভারে আমি ক্লান্ত কিনা? উত্তরে বলব, আমি জানি না, আমার ক্লান্তির ছাপ কোথায় পড়ছে? এ কথা ঠিক, আমি তিরিশে পা রেখেছি। কিন্তু বয়সটাই কি সব? এই '৭৭ সালটায় আমায় কি কম পরিশ্রম করতে হয়েছে? আমি ক্লান্ত নই মোটেই। বরং আগামী বছরগুলিতে আমার নিজের খেলা আরো কত পরিণত হয়ে উঠতে পারে, সেদিকেই এখন আমার মনযোগ এবং উৎসাহ নিয়োজিত হচ্ছে।

আমি ঈশ্বরের কাছে কৃতজ্ঞ। গত দশ-এগার বছর ধরে ফুটবলের বড় আসরে খেলে আসছি। কি ঘরোয়া লীগে, কি রাজ্যের বাইরে ডুরাণ্ড, রোভার্স কিংবা ডি সি এম-এ এমন কি দেশের বাইরেও আমাকে অনেক শক্ত এবং টাফ প্রতিদ্বন্দ্বীর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে খেলতে হয়েছে। কিন্তু কোন দিন বড়-সড় কোন শারীরিক চোট-আঘাত লাগেনি আমার।

ঠিক এই মুহূর্তে আমি গৌতম সরকারকে ভারতের এক নম্বর লিংকম্যানের স্থানে দাঁড় করাব। তারপর বলব প্রসূন আর কর্ণাটকের কুমারের নাম। না, দেবরাজের খেলায় আমি তেমন কোন পারদর্শিতার ছাপ পাইনি,—যা দিয়ে আমি তাকে এদের ওপরে স্থান দিতে পারি। অবশ্য মতামতটা সম্পূর্ণ আমার বিচারের ওপর।

দীপঙ্কর দাস

সমস্ত সাধারণ টেস্টে কোথায়? অতএব গুটি গুটি পায়ে প্যাকারের সঙ্গী হওয়াই ওঁদের কাছে শ্রেয় বলে মনে হয়েছে।

না, 'ক্রিকেট দস্যু', কেরী প্যাকারের সঙ্গে এখনও পর্যন্ত কোন ভারতীয় খেলোয়াড় হাত মেলান নি। বরং এই মুহূর্তে প্যাকারের চ্যালেঞ্জের সামনে দাঁড়িয়ে ভারতীয় দল খোদ ক্রিকেট দস্যুর দেশেই সফর করছে। কিন্তু হলে কি হবে? ভারতীয় ক্রিকেট নিয়ামক সংস্থার কর্তাব্যক্তিরা জুজুর ভয়ে ভীত। তাঁদের ধারণা এই বুঝি কেরী প্যাকার নামক মানুষটি যে কোন ভারতীয় খেলোয়াড়কে শিকার করে নেন। তাই অস্ট্রেলিয়ায় দল পাঠানোর আগে-ভাগেই তাঁরা যথেষ্ট সাবধানতা নিয়ে নিয়েছেন। সাজিয়ে-গুছিয়ে, পকেটে বেশ কিছু টাকা গুঁজে দিয়ে তাঁরা ভারতীয় ছেলেদের বিদেশে পাঠিয়েছেন। অবশ্য দেশে থাকতে থাকতেই সুনীল গাভাসকারের নেতৃত্বে টেস্ট ক্রিকেটারদের ট্রেড ইউনিয়ন 'প্লেয়ার্স অ্যাসোসিয়েশন' ভারতীয় ক্রিকেটারদের ভাতা বাড়াবার জন্য ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ডের সঙ্গে আলোচনা চালাচ্ছেন। ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ড গত বছর ইংলণ্ড দলের ভারত সফরের সময় ভারতীয় ক্রিকেটারদের জন্য টেস্ট পিছু ভাতা বাড়িয়েছিলেন। কিন্ত তাঁদের অন্যান্য দাবি-দাওয়া সম্পর্কে নির্দিষ্ট কোন সিদ্ধান্ত নেন নি। এরই মধ্যে আরম্ভ হলো কেরী প্যাকারের সার্কাস। সচেতন হলেন ভারতীয় ক্রিকেট নিয়ামক সংস্থা। তাঁরা বুঝলেন রাশ টানতে দরাজ হওয়া ছাড়া উপায় নেই। তাই ভারতীয় ক্রিকেট দলের অস্ট্রেলিয়া সফরে খেলোয়াড়রা না চাইতেই পেয়ে গেলেন অনেক কিছু। যদিও কেরী প্যাকারের খেলোয়াড়রা যা পাচ্ছেন এবং ভারতীয় খেলোয়াড়রা যা নিয়ে অস্ট্রেলিয়া যাচ্ছেন তার মধ্যে আশমান-জমিন ফারাক, তবু দেখা যাক ভারতীয়দের প্রাপ্তির তালিকাটা কেমন?

অস্ট্রেলিয়া সফরে নির্বাচিত প্রতি ভারতীয় খেলোয়াড় পারিশ্রমিক বাবদে পাচ্ছেন মোট দশ হাজার টাকা। এর মধ্যে পাঁচ হাজার ওঁদের দেশে থাকতে থাকতেই দিয়ে দেওয়া হয়েছে। বাকী পাঁচ হাজার দেওয়া হবে সফর শেষে ম্যানেজারের পূর্ণাঙ্গ 'রিপোর্ট' পাবার পর। অর্থাৎ অস্ট্রেলিয়ায় কোন খেলোয়াড় দুষ্টুমি-দুষ্টুমি করলে ঐ পাঁচ হাজার থেকে ফাইন বাবদ টাকা কাটা যেতে পারে। এছাড়াও প্রতিটি টেস্টে প্রতি খেলোয়াড়ের জন্য বেনোভেলেন্ট ফাণ্ড অ্যাকাউন্টে জমা পড়বে চার হাজার করে টাকা। এই টাকা অবশ্য পাবেন প্রতিটি টেস্টের এগারোজন করে খেলোয়াড়। অস্ট্রেলিয়ায় তো আবার হাত খরচ দরকার। এদিক-ওদিক ঘোরাফেরা-কেনাকাটার জন্য অস্ট্রেলীয় ডলার প্রয়োজন। তাও পাচ্ছেন ওঁরা। শুধু খেলোয়াড়রা নয়, দলের ম্যানেজার এবং সেকেণ্ড অফিসিয়ালও। এই বাবদে দেওয়া হচ্ছে প্রতিদিন পাঁচ অস্ট্রেলীয় ডলার। বলা হয়েছে এটি হল ডেলী অ্যালাওয়েন্স। খাওয়া-দাওয়া অর্থাৎ ডিনার লাঞ্চের জন্য ওঁরা পাবেন প্রতিদিন দশ ডলার করে। শুধু খেয়েদেয়ে, কেনাকাটা করে স্ফূর্তি মেরে দিন কাটালেই তো চলবে না রীতিমত ঝকঝকে-চকচকে হয়ে থাকতে হবে। ভগবানের দানে সচরাচর ক্রিকেটারদের চেহারাপত্র ভালই হয়, একটু পরিষ্কার চকচকে জামা-কাপড় পরলে তো একেবারে সিনেমার হিরো। ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ড সে ব্যবস্থাও রেখেছেন। প্রতিদিন ধোলাই খরচ বা লণ্ড্রি চার্জ হিসেবে ওঁরা পাচ্ছেন দেড় ডলার।

টাকা-পয়সার ব্যাপার তো মিটল। এবার একটু ওয়ার্ডরোব খোলা যাক। প্রতি খেলোয়াড় দুটি করে ব্লেজার পেয়েছেন ভারতীয় ক্রিকেট মনোগ্রামসহ। একটি ব্লেজারের রঙ গাঢ় নীল, অন্যটি হাল্কা নীল। দুসব রঙের ট্রাউজারের ব্যাপারে বোর্ড কৃপণতা। কেন করলেন জানি না, একটি করেই ট্রাউজার ওঁরা দিয়েছেন। তবে ব্যাপারটা পুষিয়ে দেওয়া হয়েছে ক্রিকেট ট্রাউজারের ক্ষেত্রে। প্রতি খেলোয়াড় চারটি করে টেরিউলেন ট্রাউজার পেয়েছেন, সঙ্গে চারটি করে মানানসই সাদা সার্ট। কিন্তু ক্রিকেটের সার্ট পরে তো আর পার্টি ফার্টিতে যাওয়া যায় না। সে আক্ষেপও বোর্ড রাখেন নি। প্রতি খেলোয়াড়কে পছন্দ মাফিক দুটি করে রঙীন সার্ট উপহার দেওয়া হয়েছে। রঙের ক্ষেত্রে সম্ভবত খেলোয়াড়দের নির্বাচনই অগ্রাধিকার পেয়েছে। কেউ পছন্দ করেছেন সবুজ রঙের সার্ট, কারও আবার ফেভারিট চকরা-বকরা বুশ সার্ট। খেলার সময় ব্যবহারের জন্য সাদা মোজা ওঁরা পেয়েছেন ছয় জোড়া। পাওয়ার তালিকায় আছে দুটি ক্রিকেট পুলওভারও, একটি ফুলস্লিভ এবং অন্যটি স্লিভলেস। এ ছাড়াও আছে একটি ট্র্যাক-স্যুট, দুটি করে টাই, ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ডের টাই দুটি এবং ক্রিকেট ক্যাপ একটি করে।

এ ত গেল ভারতীয় খেলোয়াড়দের পাওনা-গণ্ডার হিসেব। ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ড গ্যারান্টি মানি বাবদ কত পাচ্ছেন অস্ট্রেলিয়ার কাছ থেকে? ১,৬৯,০০০ অস্ট্রেলীয় ডলার। টাকার অঙ্কটা কেমন মনে হচ্ছে? এই টাকা থেকেই তো ভারতীয় ছেলেদের বিদেশ পাঠানোর খরচ তোলা হচ্ছে।

জয়ন্ত চক্রবর্তী

লবেন্ন এতদিন তো কমজায়। এবার
ন্যদের করতে দাও। আমার বিশ্বাস শুধু-
ত্র এইটাই একমাত্র কথা নয়। আসলে
বিনের শত্রু থেকে হলে হলো যাযাবরের
তা স্টেজ বয়ে তিনি এখন ক্লান্ত,
র‍ক্ত। পেছনের দিকে তাকিয়ে ভাবেন,
দিন যা করেছেন তাতে হয়েছেটা কি।
নি কি কোন গভীর দাগ আরো গভীরে
দশ করাতে পেরেছেন? অনেকে বলবেন
দের স্মৃতিতে তিনি সব সময়েই
বেন। কিন্তু ঐ মানুষেরা যখন মরে
ন তখন? তাছাড়া শুধুমাত্র স্মৃতিতেই
ত কি কোন প্রকৃত স্রষ্টা চান? তিনি
বেন তাঁর কাজ আরো বিস্তৃত করতে।

আমি কোন দিন শিশির কুমার-
ড়ীর অভিনয় দেখিনি, দেখিনি উদয়-
রের নৃত্য। শুনে ও পড়ে জেনেছি
া মহান শিল্পী। কিন্তু কেমন অভি-
করতেন বা নাচতেন জানি না। যদি
ার একটা ইনস্টিটিউট থাকত, এবং
ন তাঁদের প্রথায় শিক্ষিত হত আজকের
মেয়েরা, যদি তাঁদের নিয়ে কোন তথ্য-
নির্মিত হত, তাহলে জানতে পারতাম
কেমন ছিলেন। আমাদের আর শুধু
কল্পনার ওপর নির্ভর করতে হত না।
ী ও শংকর প্রভৃতি শিল্পীদের নিয়ে
যেভাবে অসহায় কল্পনা করি,
র পরবর্তী জেনারেশনও হয়তো
: শিল্পীকে নিয়ে সেই একই কল্পনা
। শিশিরকুমার, উদয়শংকরদের ক্ষেত্রে
ন হয়েছে সেই একই ভুল কি তাঁর
হবে? সরকারের কাছে একটুকরো
কথা বলে বলে এখন তিনি ক্লান্ত
ছেন, সরকার বারবার ভরসা দিয়ে শেষ
কিছু না করে অপমানের চূড়ান্ত
. আর আমরাও হয়তো যতো তাড়া-
ড়ি তাঁকে মন থেকে মুছে দেওয়ার
রেছি।

ন্তু এখনো সময় আছে। যেহেতু
তিনি কর্মক্ষেত্রে ক্লান্তিহীন।
তিনি আমাদের অনেক কিছু দিতে
আমাদের কর্তব্য শুধু সেই পরি-
রচনা করা। তাঁকে তাঁর স্বেচ্ছা
থেকে এই মুহূর্তে ফিরিয়ে আনার
বস্থা হোক। তা না হলে আগামী
কাছে আমরা অপরাধী থেকে যাবো।
দি জায়গার না ব্যবস্থা করেন, তাঁর
গুলো সিলায়েডে ধরে রাখার
া করেন তাহলে এ ব্যাপারে নাট্য-
ানুরাগেরাই এগিয়ে আসতে হবে।
ীমিত সাধ্য নিয়ে এই মুহূর্তে
শ দাঁড়ানো উচিৎ, যাতে তিনি

পারেন। সত্যি বলতে কি তাতে লাভবান
হবো আমরাই।

নাকি শিশিরকুমার ও উদয়শংকরের
সময় যে ভুল হয়েছে, তার পুনরাবর্তন
হতেই থাকবে?

বিজন গুহ

অনেকদিন পরে আবার

শম্ভু মিত্র

কোলকাতার নাটক প্রিয় মানুষেরা
আবার মঞ্চে দেখতে পাবেন প্রখ্যাত
নাট্যশিল্পী শম্ভু মিত্রকে। ৫ ডিসেম্বর
রবীন্দ্র সদন মঞ্চে সন্ধ্যা সাড়ে ছটায়
বহুরূপী গোষ্ঠী অভিনয় করবে দশচক্র।
প্রধান ভূমিকায় থাকছেন শম্ভু মিত্র। তাঁর
সঙ্গে বহুরূপীর অন্যান্য যেসব বিখ্যাত
অভিনেতা অভিনেত্রীরা অংশ নেবেন, তাঁদের
মধ্যে আছেন তৃপ্তি মিত্র, কুমার রায় অমর
গাঙ্গুলি, দেবতোষ ঘোষ, শাঁওলী মিত্র এবং
আরো অনেকে। দশচক্র হল ইবসেনের নাটক
'অ্যান এনিমি অফ দি পিপল-এর বাংলা
রূপান্তর।

এই বিশেষ অভিনয়ের ব্যবস্থা করেছেন
ইনস্টিটিউট অফ সাইকোলজিক্যাল বা
এডুকেশনাল রিসার্চ।

হিন্দী ছবিতে শরৎচন্দ্র

'সারা আকাশে'র কথা নিশ্চয়ই ভুলে
যাবো, যখন দেখছি, বাসু চট্টোপাধ্যায় যে
ছবিটি করেছেন তার কাহিনীসূত্র আছে
শরৎচন্দ্রের 'স্বামী' আখ্যানে।। ছবি
অবশ্য আখ্যায়িকা মেনে চললে, চোদ্দ রিল
পর্যন্ত পৌঁছোতো না। সৌদামিনী ওরফে
শাবানা আজমীর বিবাহপর্ব তার ইন্টার-
ভ্যাল অবধি টানা হয়েছে।

কাহিনীতে আরো ছিলো নায়িকার
পূর্বপ্রণয়ীর সঙ্গে রীতিমত ইলোপমেন্ট।
এ ছবিতে শেষ পর্যন্ত সেটা দাঁড়িয়েছে
কুদ্ধ শাবানার বিক্রমকে প্রায় স্টেশনে
পৌঁছে দিতে আসায়। স্টেশন অবধি আসা
গিরিশ কারনারডের পক্ষেও তাই খুবই
সহজসাধ্য। হিন্দীভাষী বৃহত্তমের পরি-

বাসু চ্যাটার্জি পরিচালিত স্বামী

বারিক সংস্কারে যাতে আঘাত না পড়ে—
পরিচালক সেদিকে যত্নবান ছিলেন। মূল
গল্প মেনে চললে, আঘাত আসতো।

কে কে মহাজনের ক্যামেরায় দৃশ্য-
লাবণ্য ছাড়া, ছবিটির অন্য কোনো
বৈচিত্র্য নেই। পরিচালনা এক্ষেত্রে মোটা
দাগের যে নায়িকার মামার মৃত্যুদৃশ্যে সেই
ধূপ জ্বালার ঘটনাটিও সবিস্তারে দেখানো
হয়েছে। অবশ্য কান্নাকাটি কম।

এই ধরণের ছবিকে সাধারণতঃ আমরা
'পারিবারিক চিত্র' বলে থাকি। জানি না,
যেভাবে আমরা বেঁচে আছি, তার সঙ্গে
এর কোনো ন্যূনতম সংযোগ আছে কিনা।
তাহলে, এই 'স্বামী' নিশ্চয়ই বক্স-
অফিসের দিকে তাকিয়ে। সেদিক থেকে,
কিছুটা যোগ্যতা এর আছে। ছবিতে রঙ
ধরেছে চমৎকার। শাড়ি-পরা শাবানাকে
আগাগোড়া ভালো লাগে—প্রথমার্ধে তাঁর
কিছু বক্তৃতা ছাড়া। তাঁর প্রণয়ী
ভূমিকায় বিক্রম 'মৃণাল'র বিক্রমের থেকে
সহনীয়।

রাজেশ রোশনের সুরারোপ এতো অনুল্লেখ্য
যে, লতা-আশারাও সুবিধে করতে
পারেননি।

আলোচ্য চিত্র : স্বামী, পরিচালনা :
বাসু চ্যাটার্জি : পার্শ্বপ্রতিম কাঞ্জিলাল

সানাই বেসুরে বাজে

এক একজন আছেন যাঁরা অনেক কিছু বলতে চেষ্টা করেন। কিন্তু মন্ত্র করে বলতে পারেন না। তার ওপর বক্তব্যের হেতু আরো কোনো মজা নেই, সেইসঙ্গে নেই কোনো কৌতূহলজন, শুধু ফেনিয়ে ফেনিয়ে বলে চলেন। ফল হয় বিরক্তিকর; শোনাও যায় না ওঠাও যায় না সোজাসুজি। আলোচ্য ছবির পরিচালক-কাহিনীকার এইরকমই মনে হয়েছে।

কাহিনীতে নতুন নেই। চিত্রনাট্যে ভাল নেই। সম্পাদনায় দম নেই। আশা করা গিয়েছিল, ক্যামেরা যখন দীনেনবাবুর হাতে তখন আর যাই হোক অন্তত কিছু অলংকরণের দেখা মিলবে। কিন্তু না, তাও নেই।

তবে কিছু আছে বৈ কী। পনেরো রীল তো একেবারে বেকার যেতে পারে না। আছে দারুন দারুন সব আলোর কাজ। একজায়গায় সমিতের ডানদিকে মোমবাতি। শুধু ডান গাল অন্ধকার। যত আলো সব তার বাঁ গালে। আর সে কি জোরালো। এছাড়া রয়েছে আলোর জন্য লোডশেডিং। আর সম্পাদনা? লায়লা বা কুন্দন যখন কোনো কিছু বলেন তখন বুঝে নিতে হয় যে সেগুলো নাটকীয়। এমনই আরো কত কীর্তি। এ সবের ওপর রয়েছে ধৈর্যের পরীক্ষা। পেশেন্স খেলাকেও যা হার মানিয়েছে। শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত যিনি এ ছবি সুস্থ অবস্থায় দেখতে পেরেছেন, তাঁকে দেখে ববি ফিশারও লজ্জা পাবেন।

দীনেন গুপ্ত পরিচালিত সানাই

একটা ব্যাপার বোধহয় সবকিছুকে ছাপিয়ে গেছে। এতকাল কেবল আউটডোরেই শুটিং দেখা জনতাকে চোখে পড়ত। এ-ছবিতে একজায়গায় ঘরের আয়নায় কাদের যেন সোফায় বসে শুটিং দেখতে দেখা গেছে।

শিল্পীদের মধ্যে আছেন সুন্দরী সোনালী গুপ্ত, এখনও সুন্দরী কাজল গুপ্ত, সুদর্শনা লায়লা বসু, উৎপল দত্ত, দীপংকর দে এবং অনুপকুমার। বাকী সব নেই বললেই চলে। আর আছেন সংগীত পরিচালক হেমন্ত মুখোপাধ্যায়। ছবির তুলনায় যিনি অনেক ভাল কাজ করেছেন।

যাই হোক, দীনেনবাবু এক সানাই বাজিয়ে চার চারটে বিয়ে দিতে পেরেছেন। সমিত-সোনালী, দীপংকর-কুন্দন, ইন্দ্রজিৎ-লায়লা আর দিলীপ-কাজল, একসঙ্গে এই আটজনের। সবই প্রেমঘটিত। এঁদের সাহায্য করেছেন মামা উৎপল দত্ত এবং চাকর-সাজা বন্ধু অনুপকুমার। বিবাহে ওঁরা সবাই খুশী। তবে শুধু ওঁরাই।

আলোচ্য চিত্র : সানাই। পরিচালক : দীনেন গুপ্ত।

আসিতবরণ মিত্র

স্টুডিও থেকে

টালিগঞ্জের স্টুডিও পাড়া এখন অনাগত দুর্যোগের আশংকায় নীরব, স্থির। মাইলখানেক দূরের হলগুলোতে এক একটি বাংলা ছবির মুক্তি ও স্বেচ্ছামৃত্যুর দৃশ্য দেখতে দেখতে হৃদয় বিষণ্ণ, ক্লান্ত।

প্রযোজকরা পকেটের টাকা বার করতে দ্বিধা করছেন, পরিচালক মনে মনে শাপান্ত করছেন দর্শকদের। কিন্তু দু দলের কেউই নিজেদের ত্রুটি নিয়ে এক মুহূর্তও চিন্তা করছেন কি?

বোধ হয় না। অন্ততঃ তেমন কোন লক্ষণ বোঝা যাচ্ছে না। অযোগ্য, নির্বোধ—[illegible] ব্যক্তিত্ব ছাড়া সৃষ্টিশীল কোন চিন্তার ব্যক্তিত্বকে চোখে পড়ছে না। উপরন্তু বাণিজ্যিক ছবি করার মতো দক্ষতাও এঁদের নেই। শিব গড়তে গিয়ে বাঁদরও গড়তে পারছেন না।

সুতরাং ফ্লোরগুলো এখন শোকাচ্ছন্ন, ফাঁকা। দু-চারটে ফ্লোরে কাজ হচ্ছে না এমন নয়, কিন্তু সেগুলো অর্ধেক কাজ হওয়া ছবিগুলোর বাকি কাজ। নতুন কোন ছবির কাজ এখন বন্ধ।

টালিগঞ্জের যখন এরকম হৃদয় কাঁপানো অবস্থা, সত্যজিৎ-মৃণাল-তপন সিংহ তখনও প্রায় নীরব। অবশ্য কারণও আছে। 'শতরঞ্জ কি খিলাড়ি' এখন মুক্তির প্রতীক্ষায়। ঐ ছবির রিলিজ না হওয়া পর্যন্ত সত্যজিৎ রায় কি করবেন তা জানা যাচ্ছে না। মৃণাল সেনের কাছে তাঁর সঙ্গে বাংলা ছবি করার প্রস্তাব নিয়ে এখনও কেউ গি[illegible]ছেন বলে শুনিনি। তার চাই[illegible] বোধ হয় প্রযোজকরা ভাবছেন মা[illegible]ঝে নির্বোধ প্রেমের ছবি আরও বেশ[illegible] নির্বোধকে দিয়ে করালে লাভের [illegible] বেশী। বেচারীরা এখনও নিজেদের ভুল বুঝতে পারছেন না।

সুতরাং মৃণালবাবুর নতুন ছবিটি হবে মালয়ালাম ও কানাড়া ভাষায়। গল্পের নাম 'চিরস্মরণী'। বৃটিশ শাসনে এক চাষীর আন্দোলনকে ঘিরে গল্প। এখন মৃণালবাবু পেপার-ওয়ার্কে ব্যস্ত।

তপন সিংহের নীরবতার কারণ অবশ্য শারীরিক অসুস্থতা। ওঁর 'সফেদ হাতী' (হিন্দী) শেষ, খুব শিগগির মুক্তি পাবে শুনছি। পরের ছবি বাংলায় করবেন এখবরও কানে এসেছে। তবে কনফার্ম নিউজ নয়।

বাকি যাঁরা বাংলা ছবির 'স্তম্ভ' তাঁরা প্রায় এখন ভূলুণ্ঠিত। একমাত্র [illegible] মাটি এখনও পরীক্ষা

[illegible]

[illegible] স্বীকৃত হয়েছিল। দীর্ঘদিন তারা অবহেলিত।

এবার আসছেন অগ্রগামী 'স্বাতী' ছবি নিয়ে, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিখ্যাত গল্প 'বেৰী' অবলম্বনে কাঠামো।

মাঝে মাঝে প্রেম নয়, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের কলমে সে রকম কালি ছিল না কোনদিন। অগ্রগামী এই গল্প নিয়ে যখন ছবি করছেন, তখন চারিদিকের হাহাকার আর নিরাশার মধ্যেও মনুষ্যত্বের উঁকিঝুঁকি আশা করা যেতে পারে। এই ছবি দিয়েই হবে তাদের অগ্নিপরীক্ষা। অন্ততঃ যেখানে দাঁড়িয়ে আছেন অগ্রগামী সেখানেই থাকুন। পদস্খলন আশা করি না। নইলে বাংলা ছবির আর প্রাণবায়ুটুকুও থাকবে কি? যদিও অগ্রগামীই টালিগঞ্জের শেষ দেয়াল নয়, কয়েক সারি দেয়াল এখনও বাকি, কিন্তু অনেক দেয়াল ইতিমধ্যে ভূলুণ্ঠিত। সেই সঙ্গে বাংলা ছবির সম্মানও। হৃত সম্মান ফিরিয়ে না আনতে পারলে মুখের ভাতেও যে টান পড়বে।

ডঃ প্রতাপচন্দ্র চন্দ্রের উপন্যাস 'জব চার্নকের বিবি' নিয়ে ছবি প্রায় শেষ হওয়ার মুখে। করছেন তরুণ পরিচালক জয়ন্ত ভট্টাচার্য। এটাই তাঁর প্রথম স্বাধীন ছবি।

সুতরাং বক্স অফিসের অনিশ্চিত দরজা খোলার কথা ভেবেই সম্ভবতঃ তাঁকে সৌমিত্র চ্যাটার্জি, আরতি ভট্টাচার্য, যাত্রার শান্তিগোপালের সাহায্য নিতে হয়েছে। কানাঘুষোয় শোনা যাচ্ছে শান্তিগোপাল আর্থিক সাহায্যও নাকি করছেন। উপরন্তু ছায়াবাণী ছবিখানির পরিবেশনার গুরুভার কাঁধে তুলে নিয়েছেন। নিশ্চয়ই অকারণে নয়।

কথা হলো জব চার্নকের এদেশীয় কোন বিবি সত্যিই ছিল কিনা তা নিয়ে। এ বিষয় যথেষ্ট বিতর্কের। ঔপন্যাসিকের কল্পনাকে সব সময় যুক্তি তর্কের বেড়াজালে আটকানো যায় না জানি, কিন্তু একটি ঐতিহাসিক জীবন্ত চরিত্র নিয়ে সত্য ঘটনাকে বিকৃত করাতো মাফ করা যায় না। উপরন্তু বিষয়টি যখন বিতর্কিত। —নির্মল ধর

অপেশাদার ভাবনা কাজী

আজ থেকে ২০ বছর আগের একটি দিন। বলাগড় রাজবাড়ীতে বিরাট অপেশাদার যাত্রা প্রতিযোগিতা। পালা সোনাই দীঘি। উৎসাহী কিছু তরুণ সাজঘরের পর্দা সরিয়ে উঁকি দিল। দিলীপবাবু এসে গেছেন? ভাবনা কাজী? ভাবনা কাজীর মেকআপ নিতে ব্যস্ত অভিনেতাকে দেখিয়ে সাজঘরের একজন বললেন, ঐতো দিলীপবাবু আপনাদের ভাবনা কাজী। খুশী মনে আসরে ফিরে গেল তরুণের দল। বিব্রত অভিনেতাটি কিছু বলারই সুযোগ পেলেন না। মৃদু তিরস্কার করলেন সহ-অভিনেতাটিকে মিথ্যা ভাষণের জন্য। এগারো দিনের প্রতিযোগিতার শেষে বিশিষ্ট নাট্যকার ও সাহিত্যিক সমন্বিত বিচারকগোষ্ঠী ঘোষণা করলেন—শ্রেষ্ঠ অভিনেতা ভাবনা কাজীর ভূমিকাভিনেতা কানাই চৌধুরী। মৃদু গুঞ্জন উঠল দর্শকদের একাংশের মধ্যে। বিচারকদের নাম ঘোষণায় ভুল হয়নি তো? কে এই কানাই চৌধুরী? সেদিন স্বাভাবিক ছিল সাধারণ দর্শকদের এই সংশয়। কারণ, তখনকার দিনগুলোতে গ্রামে-শহরে কেউ ভাবনা কাজী আর দিলীপ চ্যাটার্জিকে আলাদা করে ভাবতে পারতো না। যাত্রা পেশাকে যথাযোগ্য মর্যাদা দিতে আজকের গন্ধর্ব দিলীপ চ্যাটার্জি তখন আসরের পর আসর মাতিয়ে তুলছেন। কিন্তু বলাগড়ের সেই আসরের পর পাশাপাশি ঠাঁই পেল আরেকটা নাম—কানাই চৌধুরী। প্রতিটি আসরেই দর্শক সাধারণের কাছে সর্বোচ্চ স্বীকৃতি মিলেছে অপেশাদার ভাবনা কাজী রূপে।

শুধু ভাবনা কাজী নয় অসংখ্য পালায়, অজস্র চরিত্রে নেমেছেন কানাইবাবু। কেবলমাত্র যাত্রাকে ভালোবেসেই কানাইবাবু ৫২ বছর বয়সে এখনো দাপিয়ে বেড়াচ্ছেন গ্রামে-শহরের অপেশাদার আসরগুলো। মাঝে কিছুদিন চৌৎপুরের পেশাদার দল সত্যনারায়ণ অপেরার ডাকে সাড়া দেন, আর্থিক তাগিদে। বরাবর নায়কের ভূমিকায় অভিনয় করা সত্ত্বেও পেশাদারী গণ্ডিতে হাঁপিয়ে ওঠেন কানাইবাবু। তাই আবার সৌখীন আসরে ফিরে আসা।

মধ্য কোলকাতার একটি প্রতিষ্ঠিত বোর্ডিং হাউসের ম্যানেজার সিদ্ধেশ্বর চৌধুরী ওরফে কানাইবাবুর অভিনয় জীবন শুরু আজ থেকে ৪০ বছর আগে। মেদিনীপুরের এক ছোট্ট গাঁয়ে সখীর দলের সঙ্গে ভিড়ে আসরের মাঝে হাজির হয়েছিল ১০

[illegible]

নাচানো গাওয়ানো, কাঁদানো। আজ ৩৫ বছর কানাইবাবু যাত্রা আন্দোলনের সাথী। ব্যক্তিগত কীর্তি স্বীকার করেও তিনি যাত্রাকে ছাড়েন নি। যেহেতু যাত্রা তাঁর জীবনের সঙ্গে জড়িয়ে আছে। প্রথম জীবনে দেখেছেন যাত্রার করুণ অবস্থা। অভিনয় শেষে শিল্পীদের রাতের ঠাঁই মিলতো গাঁয়ের কোন গোয়ালঘরে আর বিছানা হিসেবে জুটতো খড় পুরোনো মাদুর।

নানা ত্রুটি-বিচ্যুতি থাকে সৌখীন দলগুলির। অতি উৎসাহের ফলে টীম-ওয়ার্ক গড়ে ওঠার আগেই আসরস্থ হয় পালা। আধুনিক আঙ্গিক বজায় রাখতে গিয়ে খরচের ধাক্কায় হতে হয় জেরবার। তবু কানাই চৌধুরীরা থেমে নেই। সুযোগের অভাব, যোগাযোগের অভাব। হয়তো খোঁজ করলে পাওয়া যাবে আরো অনেক কানাই চৌধুরীকে। যাঁদের অভিনয়ের দীপ্তিতে চীৎপুরের আকাশের অনেক তারকাই নিষ্প্রভ হয়ে যাবে। টাকার টানে যে ফসল প্রতি বছর উঠে আসছে কোলকাতার রবীন্দ্র সরণির গলিতে গলিতে, এই সব অপেশাদার শিল্পীরা অতৃপ্ত থেকেও শুধুমাত্র প্রাণের টানে সে ফসলের বীজ বপন করে যাচ্ছেন।

—উৎপল রায়

বিচিত্রা

কানাই দত্ত নেই

মনেই হয় না বয়স বাহান্ন। বড় ছেলে সুবীর ডুকরে কেঁদে উঠল।

আজ মাস দুএক ধরে কানাই দত্তর অসুস্থতার খবর পাচ্ছিলাম। নানারকম চিকিৎসা চলছিল। মনে ক্ষীণ আশা ছিল, কানাইদা হয়ত ভাল হয়ে উঠবেন। সামনে অনেকগুলো কনফারেন্স নিশ্চয়ই কোনোটাতে আবার তাঁর সেই অপূর্ব সঙ্গত বোলবাণী চকাদার শুনতে পাব।

যখনই সময় পেতাম কানাইদার সঙ্গে একটু গল্প করে আসতুম। আলাপে বয়স মানতেন না। দেশে বিদেশে কোন গানের আসরে কোথায় কি মজা হয়েছিল প্রাণ খোলা হাসিতে একেবারে ছেলে মানুষের মত গল্প করতেন।

এমন রেওয়াজ, নিখুঁত হিসেব আর রস বোধ এ যুগে কম দেখা যায়। জ্ঞান প্রকাশ ঘোষ মহাশয়ের শিক্ষায় যে কটি বাঙালী তবলিয়া গত বিশ বছর ধরে ভারতীয় খ্যাতি পেয়েছিলেন এবং আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে বাংলার প্রতিভাকে বহন করে নিয়ে গেছেন কানাই দত্তই তাঁদের অগ্রণী। ১৯৫৬ সালে ওঁকারনাথের সঙ্গে সঙ্গত করে অনেক বিরূপ সাংবাদিক মন্তব্য জয় করে উনি এগিয়ে আসেন। অবশ্য খুব অল্প বয়স থেকেই রেওয়াজ ও শিক্ষার শুরু। ওঁর গুরু হেমন্ত ভট্টাচার্য হীরুবাবুর বাবার ছাত্র। রায়বাহাদুর কেশব বন্দ্যোপাধ্যায়—ঢাকার বিখ্যাত তবলিয়া—এখন বয়স ছিয়াশি। যোগিনী ম্যানশনের চার তলার ফ্ল্যাটের দরজা খুলে আমাকে দেখেই কাঁদো কাঁদো হয়ে বললেন, কানাই শ্যামল শঙ্কর এদের আমি পাশ করিয়েছিলাম। উনিশশো ছেচল্লিশের ঝঙ্কার মিউজিক কম্পিটিশনে। আমি আর নাটুবাবু ছিলাম। কানাই চলে গেল। কীই বা বয়েস!

আহা ওরকম বোলবাণী রেলা কায়দা আর চক্রধার-এর মধুর পারফরম্যান্স! মানো মাঝে মাঝে ফোন করত, আমিও করতাম। আজ্ঞে হ্যাঁ, বলুন, এভাবে কথা বলত। বলেছিল নতুন কিছু শোনাবে, আমি শোনাব, বসব দুজনে কথা ছিল, দেওয়া নেওয়া হল না, আগেই চলে গেল। ভবানীপুর সঙ্গীত সম্মেলন থেকে একটা অভিনন্দন দেবার প্রস্তাব হয়েছিল। সে সুযোগও হল না। ওটা ওর সেলিমপুরের বাড়িতে ছেলেমেয়েদের কাছে পাঠিয়ে দেবো। তানসেন মিউজিক কলেজে সন্ধ্যায় ক্লাশ নেবেন। দারুন বৃষ্টি। এক হাঁটু জল। শৈলেনবাবু বললেন, কানাইয়ের ফোন এল। দাদা কতজন ছাত্র এসেছে? চারজন? আচ্ছা আমি এখনই আসছি। নিজের জীবনটা অনেক দুঃখকষ্ট সংগ্রামের মধ্যে কেটেছিল। তাই সাধনার মর্ম বুঝত। কণ্ঠসঙ্গীতের সমস্ত বৈশিষ্ট্যকে তবলায় ফুটিয়ে তোলবার আশ্চর্য দক্ষতা ছিল তার, এ আর হবে না।

আজ প্রায় কুড়ি বাইশ বছর ধরে কত আসরে শুনেছি কানাই দত্তর। পালুশঙ্কর গোলাম আলি, আলি আকবর পটবর্ধন, রবিশংকর, সুনন্দা, নিখিল ব্যানার্জি আমজাদ প্রভৃতি যেন কথা বলার মত অনায়াস আঙুলের চাপ দিয়ে প্রীতি জানাবার মত মধুর। ট্যাক্সিতে যেতে যেতে দেখেছি নিখিলদার গলা জড়িয়ে গল্প, এক কাঠির আগুন নিয়ে সিগারেটের মৌজ টান। সৎ মানুষ জাত শিল্পী।

—কুঞ্জলাল মুখোপাধ্যায়

গীতাঞ্জলিতে প্রভাসচন্দ্র

১২ নভেম্বর মহাজাতি সদনে, নৃত্যগুরু উদয়শংকরের অমর আত্মার প্রতি শ্রদ্ধা জানালেন—নৃত্যশিল্পী প্রভাসচন্দ্র, সম্প্রতি উনি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে বিভিন্ন অনুষ্ঠানে ভারতীয় নৃত্যের উৎকর্ষতা বজায় রেখে, দর্শক মন জয় করেছেন। প্রভাসচন্দ্র, অর্জুনের লক্ষ্যভেদ নৃত্যানুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে শুরু করলেন, শেষ হলো গ্রাম্য হোলি নাচ দিয়ে।

সমগ্র অনুষ্ঠানটির রচনাশৈলী ও কাব্যিক ধরন এবং বিভিন্ন মুদ্রার প্রয়োগ—প্রভাসচন্দ্রের শ্রেষ্ঠতা নির্দেশ করে।

অর্জুনের লক্ষ্যভেদ ও নাগা নৃত্য এবং হোলি নাচ সবার দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। নৃত্যের বৈচিত্র্য ও কয়েকটি বিশেষ দৃশ্য মনে রাখার মতো। এই স্বল্প সময়ের অনুষ্ঠানটির সবচেয়ে বড় আকর্ষণ, আলোকসম্পাত ও মঞ্চসজ্জা। স্লাইড ও স্যাডো সহযোগে পশ্চাৎপট সৃষ্টি সত্যি অপূর্ব।

—শংকর গঙ্গোপাধ্যায়

শুভা প্রসন্নর সময় ও ভ্রান্তি-বিষয়ক ছবি

ক্যালকাটা পেইন্টার্স গ্রুপের অন্যতম শক্তিমান শিল্পী শুভাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য সাধারণত আত্মপরিচয় দেবার সময় পদবী বর্জন করে থাকেন।

কেন?

কারণ ব্যাখ্যা করেন না শুভাপ্রসন্ন। করেন না বলেই অনুমানের পথ প্রশস্ত। আমরা অনুমান করে নিতে পারি, সামাজিক দায়-দায়িত্বের হাত থেকে অব্যাহতি চান শুভাপ্রসন্ন। একেবারে নিজের মতো হয়ে উঠতে চান। স্বাবলম্বী। পদবী-বর্জিত শুভাপ্রসন্ন সামাজিক ও পারিবারিক সুফল-কুফলের উত্তরাধিকারমুক্ত, স্বতন্ত্র মানুষ।

তাঁর আগেকার ছবি আমি দেখেছি। সব নয়, অনেকগুলো। দেখে মনে হয়েছে, সুনির্দিষ্ট কোন সময়ের চেয়ে অনির্দিষ্ট নিঃসময়কে চিত্রভাষা দিতে চান তিনি। দৃশ্যমান বাস্তবের চেয়ে বস্তুত অন্তর্নিহিত উপলব্ধির চিত্রণে অধিকতর আগ্রহী। স্বভাবত ইঙ্গিত ও প্রতীকের ব্যবহার তাঁর ছবিতে বেশি। মেজাজে সুররিয়ালিস্ট শুভাপ্রসন্ন। চিরায়ত। গাছের পাতা, ফুল, ফল, মধু প্রভৃতি বিষয়কে বিকশিত করেন। উপলব্ধির বহুসাময়িকতা তাঁর রঙে, রেখায়, কম্পোজিশনে। আমাকে চিন্তিত ও ভাবিত করে। উদ্বিগ্ন। আমাকে কবিতার কাছাকাছি টেনে নিয়ে যায়।

আর তখনই মনে পড়ে, দ্বিজাতির

শুভা প্রসন্নর ছবি
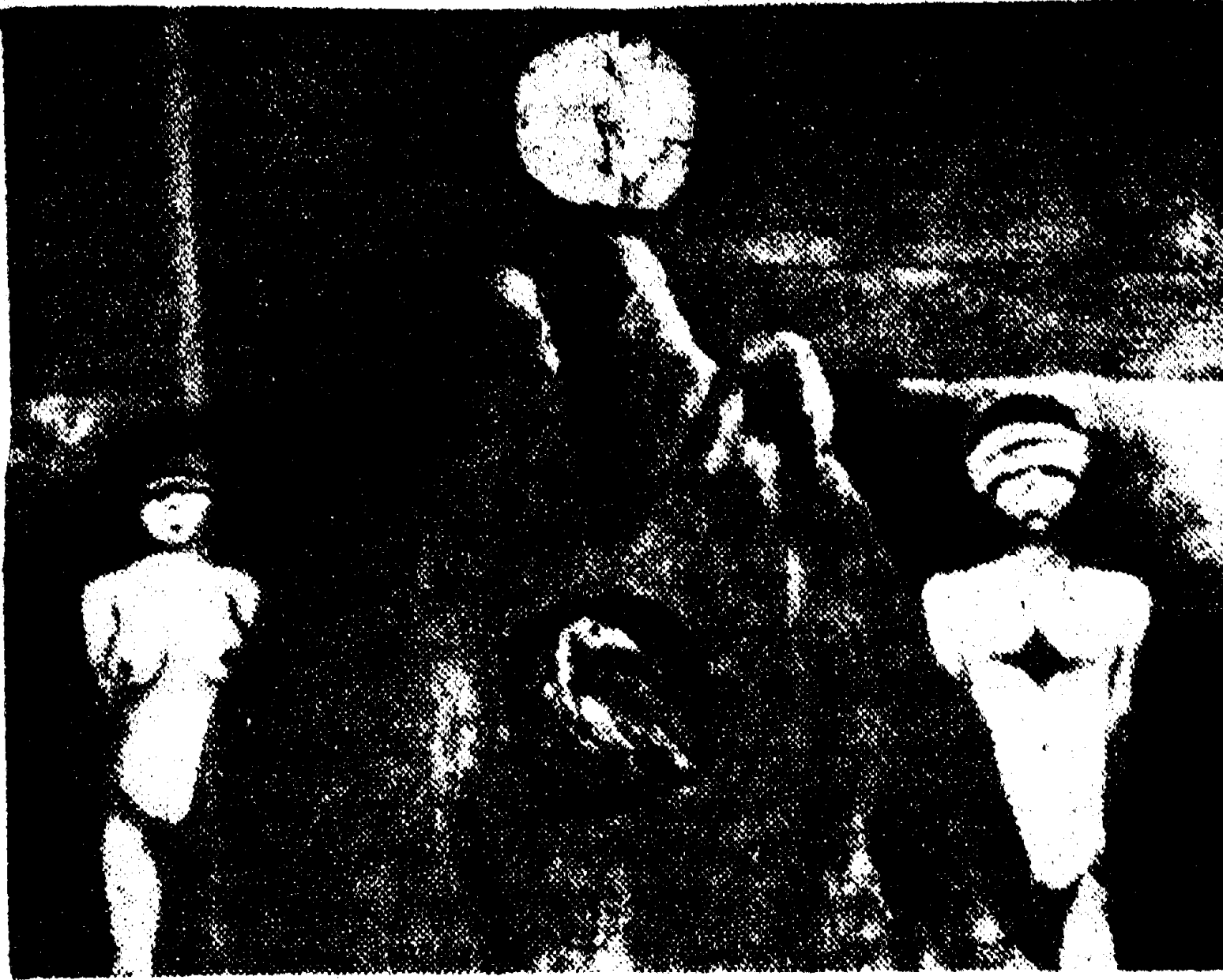
একটি কবিতা-সংকলন সম্পাদনা করেছিলেন তিনি শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গে—'নীলিমা ও নৈরাজ্য' নামে। ইংরেজিতে 'এনার্কি অ্যান্ড দি ব্লু।' কবিতার সঙ্গে ছিল ছবি। শুভাপ্রসন্ন কবিতা লেখেন রঙে রেখায়। কলমে নয়, তুলিতে।

সম্প্রতি তাঁর ধরণ পালটেছে। প্রত্যক্ষ ও বস্তুমুখী হয়ে উঠেছেন শুভা-প্রসন্ন। মেজাজ পাল্টায় নি। ভেতরের ইঙ্গিতময়তা অক্ষুন্ন রেখেছেন। সেপ্টেম্বরের শেষার্ধে ব্রিটিশ পেইন্টসের ভেকর স্যার্ভিসের সৌজন্যে প্রদর্শিত তিরিশটিরও বেশি ছবিতে সময়ের রূপকল্পসমূহ বিকশিত হয়েছে নানা রকমের বস্তুকে আশ্রয় করে। এই সব ছবিতে তাঁর অভিজ্ঞতা সংঘর্ষহীন নয়, তীক্ষ্ণ। যথা-সম্ভব ব্যক্তিগত ইমেজ বর্জিত।

প্রদর্শিত ছবিগুলি দুটি সিরিজে বিভক্ত—'টাইম' আর 'ইলিউশান।' সময় আর ভ্রান্তি। 'টাইম' সিরিজের ছবিতে হাতঘড়ি আর দেয়ালঘড়ির ছোট-বড় কাঁটা নানাভাবে ব্যবহৃত।

প্রথম ছবিটি আয়তনে বিশাল। তেল রঙের। পেছনে হাত বাঁধা দুই নগ্ন নারী পুরুষ। পরস্পর থেকে বিচ্ছিন্ন। চোখ বাঁধা। মাঝখানে পাহাড়ী বিভাজিকা ও প্রাচীন পাখি। মাথার ওপরে সময়মাপক যন্ত্র। সব মিলিয়ে ছবিটি সমকালীন সভ্যতা জীবনের পারস্পরিক বিচ্ছিন্নতার দিক ইঙ্গিত করে। ঠিক অনুরূপ ভাবনায় রবীন মণ্ডলের 'রাজা-রাণী' সিরিজের ছবিগুলি রচিত। কিন্তু মেজাজে শুভাপ্রসন্নর বিপরীত। রবীন মণ্ডলের 'রাজা-রাণী' রেখার জবাবে রেখা দিয়ে অংকিত। জটিল। পোষাকসর্বস্ব সভ্যতার প্রতীক।

আমার কাছে, এতটা তৃপ্ত মনে হয় না শুভাপ্রসন্নকে। না রেখায়, না রঙের ব্যবহারে। সন্দেহ নেই, তিনি নাগরিক। তবু নম্র। লিরিক্যাল। সময় সিরিজের নবম ছবিতে আমি লক্ষ করেছি ভাসমান এক শিশুকে। অনাদি সময় প্রবাহিত হয়ে চলেছে ক্ষয়ের ও নিঃশব্দ রক্তপাতের ভেতর দিয়ে। ছবিতে অস্থিসার একটি মাছকে ত্যাগ করে যাচ্ছে একটি বক। তার মেদ মাংস সে আত্মসাৎ করেছে।

১২ সংখ্যক ছবিটি (ইলিউশান) আমাকে নাড়া দিয়েছে ভেতর থেকে বৈষয়িক ভাবনার গুণে। প্রদর্শিত ছবিগুলির কোন-টিতেই অবশ্য শুভাপ্রসন্ন নির্বিষয় নন। এ ছবিতে রয়েছে একটা বিবতল বাড়ি ও একটা মই। মাথার ওপরে ঘড়ির ডায়াল ও ঘণ্টা-মিনিটের কাঁটা—মনে হয় যেন একটা উপগ্রহ—নাকি নক্ষত্র? নক্ষত্রের কোন সময় নেই, দিন-রাত্রি নেই। শুভাপ্রসন্নর সময় বার বার প্রকৃতি ও মানুষের সম্পর্ককে নির্ধারণ করার জন্যেই সঞ্চারিত হয়েছে নানা পরিবেশ ও পরিস্থিতির ভেতর। ফলে, ছোট সময়ের চিহ্ন ও অনুষঙ্গ ছড়িয়ে আছে নানা-ভাবে। আর সবশেষে সময়হীনতার দিকে ধাবমান আভাস।

গৌতম ভৌমিক

নীলাম

রাসেল স্ট্রিটে ঘুরতে ঘুরতে দেখি, একমাত্র রাসেল এক্সচেঞ্জটাই খোলা। বাদ-বাকি সব নীলামদারই পুজোর জন্য দোকান বন্ধ রেখেছে। ওখানে ঢুকে জানা গেল, নীলাম আজ বন্ধ। তবে, এমনি কেনাকাটা চলছে। লোকজন ঘুরেফিরে জিনিষপত্র দেখছে। একটু দাঁড়িয়ে বেরিয়ে পড়লাম। তারিখটা ২৩শে অক্টোবর। রবিবার। স্টেইনার এ্যান্ড কোং-ও বন্ধ। অবশেষে চৌরঙ্গী সেলস্ ব্যুরো। পার্কস্ট্রিটের একমাত্র এখানেই নীলাম আজ চলছে। ভিড়-ও বেশ ভালোই ছিল।

যখন ঢুকলাম, একটা লেডিস্ ফোল্ডিং ছাতা তখন নীলাম হচ্ছে। জিনিষটা প্রায় নতুন। ডাক উঠেছে বাইশ টাকা। নীলাম-দার হেঁকে যাচ্ছেন। দোকানের ওপ্রান্ত থেকে এক মহিলা সাঁইত্রিশ টাকায় ওটা ডেকে নিলেন। ছাতার প্রিন্টটাও বেশ চমৎকার। এছাড়া-ও আরও ছাতা আজ নীলাম হল। একটা জেন্টস্ ছাতা, স্প্রিঙের, যথেষ্ট নির্ভরযোগ্য, বিক্রি হয়েছে পঁচাত্তর টাকায়। তারপরই একটা লেডিজ ছাতা। নীলামদার বললেন, 'এ নিউ ফোল্ডিং আমব্রেলা, লেডিজকা ওয়াস্তে বোলিয়ে।' হুট্ করে বিয়াল্লিশ টাকায় ওটা বিক্রি হয়ে গেল।

এরপর একটা সেফারস্ ফাউন্টেন পেন নীলামে উঠল। এবং দরুত একান্ন টাকায় এক তরুণ কিনে ফেললেন।

অতোক্ষণ লক্ষ করিনি ব্যাপারটা। আমার সামনেই এক প্রৌঢ় পাঞ্জাবী ভদ্রলোক নীলামের ক্যাটালগ হাতে বসেছিলেন। তাঁর ডান হাতে কলম। প্রতিটি জিনিষই তিনি এক-দুবার ডাকছেন। কিন্তু কমপ্লিট করছেন না। একটা হালিনা রোলস্ পঁয়ত্রিশ মি মিটারের ক্যামেরা হাতে নীলামদার বললেন, 'বলুন, এটা কত দিয়ে ডাক শুরু করা যায়।'

পাঞ্জাবী ভদ্রলোকটি নিশ্চিধায় বললেন 'ফর্টি'।' নীলামদার একটু হাসলেন। বললেন, 'ফোর হান্ড্রেড। বলুন চারশো রুপেয়া। আরে, সাহাব, এটা ক্যামেরা।' কিন্তু, চারশো থেকে ডাক শুরু হলেও শেষ হল চারশো দশে। আর একটা পঁয়ত্রিশ মি মিটারের কোডাক রেটিনা ক্যামেরা (টেলি লেন্সসহ) আজ নীলামে উঠেছিল। ডাক শুরু হয় দুশো থেকে। বাড়তে বাড়তে শেষ হয় এগারোশো চল্লিশে। তবুও অনেক সস্তা। যিনি নিলেন, তাঁকে ভাগ্যবান বলা যেতে পারে।

তারপরই ক্যাটালগে লেখা আছে এ-ক্যারোটা-ও তাঁর হাতে পড়ে ফ্ল্যাশ গানের উজ্জ্বল আলো মাঝে মাঝেই সকলকে চমকে দিচ্ছিল।

একরাম আলি

[illegible] বিরুজোম

[illegible] আর পাঁউরুটি [illegible] দেখেছিল। [illegible] রান্নার [illegible] একটু [illegible] সুরে বাঁধা। তা হলে হবে কী, কথা [illegible] কাজ করলে খেয়ে সুখ আছে। [illegible] বিরুজোমের একটা ব্যবস্থা কর। [illegible] আগে এসে দেখ, টুঁ-টাঁ করবো না। [illegible] আড়চোখে একবার দেখে নিয়ে [illegible] সিদ্ধ করা সরু জালিয়া একসের, [illegible] খোলা একসের, ঘি এক পোয়া, কিশমিশ গুঁড়ো আধপোয়া, [illegible] এলাচির গুঁড়ো জাফরানের গুঁড়ো, সবে দুইয়ের জোগাড় করতে পারবি ; আমি অনেক দিন [illegible] তা কেন ? কিন্তু [illegible] পাবো কোথায় ? আর কী এখন পাওয়া যায় ? যখন পাবি তখন খাবি। তা হলে আর বিরুজোম কেন ? আর কিছু না,—এবে দিচ্ছি। ভাতের মত আর কোন ভাতের জল দিয়ে দেখতে পারিস—খারাপ হবে না। [illegible] আর আমি তোমার কাছে [illegible]। এতো তোমার [illegible] মত, [illegible]। আর [illegible] হয়ে যাবে। তবে লিখে নে, [illegible] আগে [illegible] দিয়ে [illegible] রাখবি। তার সঙ্গে ঘি গরম করে কিশমিশ ভেজে রাখবি। তারপর ওর ভেতর তেজপাতা দারুচিনি, এলাচ লবঙ্গ ফোড়ন দিয়ে সিদ্ধ সরু জালিয়াগুলো ভাজবি। জালিয়া ভাজবার সময় একটু লবণ আর আদার রস দিবি। জালিয়া ভাজা হয়ে গেলে জল দিবে আর মিষ্টির দিকে [illegible] করবি। জালিয়াটা নরম হলে [illegible] আর কিশমিশ দিয়ে দিবি। [illegible] নেড়ে-চেড়ে পোলাওয়ের মত [illegible] করলেই বিরুজোম হয়ে গেল। সবশেষে এর ওপর জাফরান আর এলাচের গুঁড়ো দিয়ে ঢেকে রাখবি। এই বিরুজোমে একটু বেশি লবণ দিতে পারিস। প্রথমদিকে বিরুজোম রাঁধার সময় পোলাওয়ের মত ঝর ঝরে হয় না। অনেকটা খিচুড়ী বা পায়েসের মত হয়। এতে খারাপ লাগে না। বিরুজোম রাঁধা অভ্যাস হয়ে গেলে দেখবি কেমন ঝর ঝরে হয়। তোর [illegible] হবে না। তোর তো এই প্রথম, এই শেষ। জালিয়ার বদলে আতপ চাল দিয়েও করতে পারিস। করে দেখিস চমৎকার লাগবে খেতে।

আত্রেয়ী সেনগুপ্তা

আমি কঙ্কাবতী বলছি

বাঙালী বধূর চিরবন্দিত সেই মসৃণ টুকটুকে পদযুগল আর চোখে পড়ে না। কিন্তু যত্নে কি না হয় ?

আমাদের পায়ের তলায় অসংখ্য রোমকূপ আছে। আবর্জনা ক্রমাগত এগুলির মধ্যে দিয়ে শরীরে বীজাণু বহন করে আনছে। তাই প্রতিদিন একবার গরম জলে পা ধোবেন। বালতিতে ঠাণ্ডা আর ফুটন্ত জলে আরামদায়ক তাপে মিশিয়ে সামান্য নুন, আর তিন ফোঁটা অ্যান্টিসেপ্টিক ডেটল জলে পা ডোবান। কোনো মৃদু সাবান দিয়ে ভালো করে পরিষ্কার করুন নোখ, আঙুল, গোড়ালি। আঙুলের মাঝের ফাঁকগুলি পরিষ্কার করার জন্য একটি নরম টুথব্রাশ রাখুন।

শীতে পা ফাটা রোধ করার জন্য গ্লিসারিন ব্যবহার বহুদিন প্রচলিত। একটি প্রলেপ শুকিয়ে গেলে মাখুন আরও দুবার।

পায়ের শক্ত চামড়ার আরেকটি ওষুধ, হলো মধু। দেড় চামচ মধু, এক চামচ পাতি লেবুর রস, আর সমান পরিমাণ ল্যানোলিন একত্রে ফাঁকিয়ে নিন। ভালো করে দু পায়ে মাখুন।

যদি খাঁটি তেল পায়ের জন্য ব্যবহার করেন, প্রথম প্রলেপটি লাগিয়ে এক টুকরো পাতি লেবু দিয়ে পা ঘষুন। ন্যাকড়া দিয়ে মুছে নিন। তারপর লাগান দ্বিতীয় প্রলেপ।

পা মসৃণ রাখতে কিন্তু দুধ আর ময়দার মিশ্রণ শ্রেষ্ঠ। ময়দার সঙ্গে খাঁটি দুধের সর থকথকে করে মেখে নিন। পায়ে ঘষলেই ময়দার সঙ্গে সব ময়লা উঠে আসবে।

বড় নোখ হাতে মানায়। কিন্তু পায়ের নোখ নেল কাটার (নোখ কাটার যন্ত্র) দিয়ে ছোটো, গোল করে কাটুন। (নেল কাটার যে কোনো বড় মনোহারী দোকানে পাবেন।)

গরম জলে পা ডুবোলে নোখ সাময়িকভাবে নরম হয়ে যায়। নোখ কাটার সবচেয়ে সুবিধে তখন। নোখ ভেজা থাকতে থাকতে পছন্দ মতো আকারে ছেঁটে নিন। তারপর কোণাগুলো নোখের ফাইল দিয়ে ঘষে মসৃণ করুন।

ভেজা ন্যাকড়া দিয়ে নোখ মুছে কোনো গাঢ় কালচে রঙের নেল পালিশ (নখের রঙ) দিয়ে নোখ রঙ করতে পারেন। প্রথম প্রলেপটি শুকিয়ে গেলে তবেই লাগান দ্বিতীয় প্রলেপ। (যদি অতিরিক্ত চকচকে রঙ পছন্দ হয়, গাঢ় রঙের প্রলেপ দুটি শুকিয়ে গেলে তার ওপরে 'ন্যাচেরাল' রঙের পালিশ লাগান।)

শাড়ি জামার তুলনায় জুতো অবহেলিত। কিন্তু সঠিক জুতো বাছতে না পারলে সজ্জা নিতান্তই অসম্পূর্ণ থেকে যায়। পোশাকের রঙের সঙ্গে মিলিয়ে যে জুতো পরতে হবে, এমন কথা বলছি না। তবে জামা কাপড়ের তুলনায় জুতো যেন কখনই ম্লান না হয়।

বলা বাহুল্য, এই ধুলো ধূসরিত রাস্তাঘাটে ঢাকা জুতো পরাটাই হবে কাজের কাজ। কিন্তু সেটা সব সময় সম্ভব নয়। শাড়ির সঙ্গে মানায় ছিমছাম চটি কিম্বা স্ট্র্যাপের জুতো।

আপনার মালিকানায় চার জোড়া জুতো রাখুন : একটি পা ঢাকা বড় হিলের জুতো (এটির রঙ হোক কালো), একটি মজবুত কোলাপুরী চটি (যা যে কোনো রঙের সঙ্গেই মানায়), একটি রঙীন চটি কিংবা স্ট্র্যাপের জুতো, এবং ঘরে ব্যবহার করার জন্য এক জোড়া ভালো হাওয়াই চপ্পল।

অমৃত পাবলিশার্স প্রাইভেট লিঃ-এর পক্ষে শ্রীসুপ্রিয় সরকার কর্তৃক পত্রিকা প্রেস ১৪, আনন্দ চ্যাটার্জি লেন, কলিকাতা-৩ হইতে মুদ্রিত ও তৎকর্তৃক ১১।১, আনন্দ চ্যাটার্জি লেন, কলিকাতা-৩ হইতে প্রকাশিত।

ইণ্ডিয়ান অ্যাণ্ড ইস্টার্ণ নিউজ পেপার সোসাইটির সদস্য।

মূল্য ৭৫ পয়সা ; ত্রিপুরায় অতিরিক্ত বিমান মাশুল ১৫ পয়সা। ভারতের অন্যত্র অতিরিক্ত বিমান মাশুল ২০ পয়সা।

বিখ্যাত জ্যোতিষী
কালপুরুষ-এর
একটি অসাধারণ বই

কাল পুরুষের ডায়েরী ১৫,

কালপুরুষ কে—সে সম্বন্ধে আপাতত আমরা কোন তথ্য সরবরাহ করতে অক্ষম—তবে তিনি তাঁর জ্যোতিষ-জীবনে যে সব বিচিত্র অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছেন, জাতি সমাজের বিভিন্ন স্তর থেকে বয়স নির্বিশেষে নারী-পুরুষ কি ভাবে ভাগ্যতাড়িত দিশাহারা হয়ে তাঁর কাছে ছুটে এসেছে ও প্রতিকার পেয়েছে তারই বিচিত্র রোমাঞ্চকর বিবরণ আমরা সংগ্রহ করেছি এই গ্রন্থে। কালপুরুষের অসংখ্য অনুরাগীর কাছে বইটি একটি অমূল্য সম্পদ বিবেচিত হবে এ বিষয়ে নিঃসন্দেহ।

চারখানি শ্রেষ্ঠ পেপারব্যাক ক্ল্যাসিকস্

বিমল মিত্রের

সাহেব বিবি গোলাম ১২॥

প্রমথনাথ বিশীর

লালকেল্লা ১২॥

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের

গণদেবতা ৭॥

গজেন্দ্রকুমার মিত্রের

আমি কাণ পেতে রই ১২॥

সবকটি একসঙ্গে নিলে মাত্র ৪০ টাকা

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের

চিরকালীন উপন্যাস

দেবযান

নতুন নবম মুদ্রণ প্রকাশিত হয়েছে
॥ পনেরো টাকা ॥
আরও দুখানি উল্লেখযোগ্য উপন্যাস

আরণ্যক ১৫, অথৈজল ৯,

নিমাই ভট্টাচার্যের

ভাগ্যং-ফলতি সর্বত্র ৬,

বিমল করের

কালের নায়ক ১১,

নীহাররঞ্জন গুপ্তের

মধুমতী থেকে ভাগীরথী ১৬,

শংকর-এর

স্থানীয় সংবাদ ১০,

নারায়ণ সান্যালের

হংসেশ্বরী ১০,

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের

সরাইখানা ৮,

মন্মথনাথ ঘোষের

সুদূরের পিয়াসী ৮,

আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের

আবার কর্ণফুলী আবার সমুদ্র ৮,

উমাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের

কৈলাস ও মানস সরোবর ২০,

কালিকারঞ্জন কানুনগো-র

রাজস্থান-কাহিনী ১৬,

জ্যোতিষ সম্রাট ভৃগু জাতকের

১৯৭৮ কেমন যাবে ও ভৃগুজাতক পাঞ্জিকা

চার টাকা

মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ
১০, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা-৭৩ ৩৪৮৭৯১
৮৬।১, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা-৯ ৩৪-৩৪৯১

পাত্রপাত্রী না চাকুরী ?
জমিজমা না মোটর লরি ?
ব্যক্তিগত বা ব্যবসা বাণিজ্য ?

বক্তব্য যে কোনও বিষয়েই
হোক না কেন

যুগান্তর এ

শ্রেণীবদ্ধ বিজ্ঞাপন ছাপালে
অনেক বেশি উত্তর পাবেন
কম সময়ে আর সবচেয়ে কম খরচে

কারণ অনেকগুলো :

- যুগান্তরের জনপ্রিয়তার ক্রমবৃদ্ধি। গত ছ'মাসে দৈনিক প্রচার বেড়েছে ৮০০০০ এরও বেশি। তাছাড়া রবিবাসরীয় কাটতি এখন ৩,১০,০০০ এরও উপর।
- পাঠক সংখ্যাও নিয়মিত তিন গুণ বেড়ে চলেছে। লোকে অন্যের হাত থেকে টেনে নিয়ে যুগান্তর পড়ে থাকেন। আপনার বক্তব্য এই অগণিত পাঠক পাঠিকাদের নজর এড়াবে না।
- ছোটখাটো শ্রেণীবদ্ধ বিজ্ঞাপন সুপরিকল্পিতভাবে সাজানো হয়, ভিড়ে হারিয়ে যায় না।

যুগান্তর

শ্রেণীবদ্ধ বিজ্ঞাপনের সুযোগ নিন
[illegible] কাজ পাবেনই

অমৃত

১৭ বর্ষ
৩১ সংখ্যা
৩০ অগ্রহায়ণ
১৩৮৪
16th DEC. 1977

আগামী সংখ্যা

বিনোদন

প্রাথমিক শিক্ষার প্রাথমিক দায়িত্ব

আগামী পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় সর্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষাই সব থেকে বেশি গুরুত্ব পাবে বলে জানিয়েছেন কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী। সমস্ত শুভবুদ্ধির মানুষই আশ্বস্ত বোধ করবেন একথা শুনে। কিন্তু কেন্দ্রীয় নীতিকে রূপায়িত করার ভার যেহেতু রাজ্য সরকারগুলির ওপর, সেজন্যে তাঁদের সচেতনতাই এক্ষেত্রে বিশেষভাবে লক্ষ্য করার বিষয়।

আমাদের এই পশ্চিমবঙ্গে অন্তত তেমন কোনো দায়িত্ববোধের পরিচয় পাওয়া যায় নি অতীতে। রাজ্যের অর্থমন্ত্রী নিজেই জানিয়েছেন, এখনও এখানে শতকরা ৭০ ভাগ, এমন কি আরও বেশি, নিরক্ষর রয়ে গেছে। এবং সরকারী তালিকায় ৪৫ হাজার প্রাথমিক স্কুল আছে বলে ঘোষিত হওয়া সত্ত্বেও বহু গ্রামই এখনও সে সৌভাগ্য থেকে বঞ্চিত রয়েছে।

কাজেই স্বাধীনতার ৩০ বছর পরও একেবারে গোড়া থেকে শুরু করতে হবে দেখা যাচ্ছে। সংবিধানে ১৯৬০ সালের মধ্যে ১৪ বছর বয়সের সমস্ত ছাত্রছাত্রীদের জন্যে বিনা বেতনে শিক্ষা দেবার কথা বলা হয়েছিল। ভারতীয় নাগরিকদের সেই সাংবিধানিক অধিকার গত ১৭ বছর ধরেই অপূর্ণ রয়ে গেছে। এবং পশ্চিমবঙ্গের মতো কোনো কোনো রাজ্যে নিরক্ষরের সংখ্যা কমা তো দূরের কথা বেড়ে গেছে বলেই আশংকা হয়। অথচ পশ্চিমবঙ্গ খুবই একটি সংস্কৃতিসম্পন্ন রাজ্য বলে পরিচিত। পরিহাস আর কাকে বলে।

যাই হোক দেরিতে হলেও বর্তমান সরকার প্রাথমিক শিক্ষার বিষয়ে অগ্রাধিকার দেবার কথা ঘোষণা করেছেন। জানা গেছে ১৯৭৮ সালের জানুয়ারি থেকে ৬ষ্ঠ শ্রেণী পর্যন্ত বিনা বেতনে শিক্ষার ব্যবস্থা চালু করা হবে, এবং ঐ বছরের মধ্যে রাজ্যের প্রতিটি গ্রামে যাতে একটি অন্তত প্রাথমিক স্কুল থাকে তার ব্যবস্থা হবে। খুবই ভাল কথা। তবে ঐখানেই যেন শেষ না হয়। আমাদের উদ্দেশ্য কিন্তু শতকরা একশজনকে সাক্ষর করা।

প্রচ্ছদের নেপথ্যে : ১৯২৪ সালে অমিতাভ বন্দ্যোপাধ্যায়ের জন্ম। কলকাতার গভর্নমেন্ট কলেজ অফ আর্টস থেকে স্নাতক হয়েছেন। একক প্রদর্শনী হয়েছে। জাতীয় প্রদর্শনীসহ ভারতের বিভিন্ন শহরে অনুষ্ঠিত প্রধান প্রধান প্রদর্শনীগুলিতে অংশ নিয়েছেন। আমেরিকাতে শ্রী বন্দ্যোপাধ্যায়ের দুটি একক প্রদর্শনী হয়েছে। ইংল্যান্ড এবং অস্ট্রেলিয়ায় দুটি আন্তর্জাতিক প্রদর্শনীতে ভারতের প্রতিনিধিত্ব করেছেন। গ্রাফিক আর্ট-এর জন্য তিনটি সর্বভারতীয় প্রদর্শনী থেকে তিনটি পুরস্কার পেয়েছেন অমিতাভবাবু। কলকাতার 'দি সোসাইটি অফ কনটেমপোরারী আর্টিস্ট'-এর সদস্য রয়েছেন।

সমালোচনা

যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত বাংলা সাহিত্যের একজন প্রধান কবি ...কমল চক্রবর্তীর কবিতা, বাংলা কবিতার মতোই, অত্যন্ত সরল ও নরম...প্রেম আর প্রকৃতি নিয়ে কবিতা লেখার ব্যাপারে স্নেহলতার কবিত্বের জোর আছে...শান্তি লাহিড়ী এমন শব্দ খোঁজেন যা 'নিরাবরণ অলংকারহীন সহজ, যা বাতাস লঘু করে'....

একজন কবি এবং তিনটি কাব্যগ্রন্থ

অমল মুখোপাধ্যায়, একরাম আলী, দাউদ হায়দার, তরুণ চৌধুরীর মতামত

যতীন্দ্রনাথ

যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত বাংলা সাহিত্যের একজন প্রধান কবি। শুধু তাই নয় সুস্পষ্টতম বক্তব্য সম্পন্ন কবি। কিন্তু সেই তুলনায় প্রায় অনালোচিত তিনি। ডঃ অমরেন্দ্র গণাইকে ধন্যবাদ। ডিগ্রি লাভের উদ্দেশ্যেও তিনি যে যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্তের কবিকৃতিকে বেছে নিয়েছেন—তাতে অনেক রসিকেরই তিনি কৃতজ্ঞতাভাজন হবেন। ডঃ শশিভূষণ দাশগুপ্তের 'কবি যতীন্দ্রনাথ ও আধুনিক কবিতার প্রথম পর্যায়' গ্রন্থটি সম্ভবত যতীন্দ্রনাথের উপর প্রথম পূর্ণাঙ্গ আলোচনা গ্রন্থ। এ কাজ বিচক্ষণভাবে এধার ওধার কিছু আলোচনা হতে পারে, কিন্তু অনেক কবির ভিড় থেকে—আশ্চর্যভাবে 'বিশেষ' সুর ও কথার অধিকারী, এই কবিকে, রসিকের সঙ্গে পরিচিত করানোর তেমন কোন চেষ্টা চোখে পড়েনি। যা পড়েছে, পরীক্ষা বৈতরণী পার হতে ছাত্রদের সাহায্যকারী কিছু কিছু আলোচনা।

ডঃ অমরেন্দ্র গণাই এই গ্রন্থে সং কাজ যেটি করেছেন তা হল যতীন্দ্রনাথের ব্যক্তিগত জীবনের পূর্ণাঙ্গ পরিচয় রচনা। তার ফলে যতীন্দ্রনাথের প্রবণতাটি পরিষ্কার হয়ে ফুটে উঠেছে। ব্যক্তিগত জীবনে সততা ও নিষ্ঠা যে মহৎ সৃষ্টির পূর্ব শর্ত—যতীন্দ্রনাথ সম্ভবত তা [illegible] জানতেন। তাই ইঞ্জিনিয়ারের কাজ করেও আর্থিক সচ্ছলতার মুখ কোনোদিন দেখতে পাননি। মানুষ যতীন্দ্রনাথ ছিলেন সরল স্বল্পবাক, নিরহংকারী কর্তব্যনিষ্ঠ ও আত্মমর্যাদাসম্পন্ন। সম্ভবত এই চারিত্রিক দৃঢ়তাই রবীন্দ্রপ্রভাবের মধ্যাহ্নে যতীন্দ্রনাথকে এক সম্পূর্ণ নিজস্ব এবং বিদ্রোহী সুরে কথা বলতে সাহায্য করেছে।

দ্বিতীয় অধ্যায়ে লেখক সমকালের রাজনৈতিক সমাজনৈতিক ও আন্তর্জাতিক পটভূমি বিচার করে দেখিয়েছেন। কালের বিধানকে উপেক্ষা করে তিনি কাব্য রচনা করেন নি। কথাটা সত্য। কিন্তু যতীন্দ্রনাথের ঐতিহ্য সূত্র দেখাতে গিয়ে গবেষক যা বলতে চেয়েছেন তা সম্পূর্ণ সত্য নয়। মধুসূদনের বিদ্রোহ ও দ্বিজেন্দ্রলালের তির্যকতা থেকে যতীন্দ্রনাথের জিজ্ঞাসা অনেক বেশী মৌলিক ও জীবনবোধের গভীরে প্রোথিত। কতকটা বলা চলে, দার্শনিকের জিজ্ঞাসাই যতীন্দ্রনাথের কাব্যে বাধা পড়েছে। 'ও ভাই কর্মকার আমাকে পুড়িয়া পিটানো ছাড়া কি নাহিক কর্ম আর' অথবা 'চেরাপুঞ্জি থেকে একখানা মেঘ ধার দিতে পার গোবি সাহারার বুকে'—শুধু মাত্র বিদ্রোহী কবির পাঞ্চজন্য নিনাদ নয়—এর মধ্যে জীবনের একটি অতি মৌলিক জিজ্ঞাসা উদ্যত হয়ে আছে। ধন বণ্টনের অসাম্য ধনীর সীমাহীন লোভ, শ্রেণী স্বার্থ, মানুষের বেঁচে থাকার সংগ্রাম দেশে দেশে কালে কালে অনেক কবিকেই কাব্য সৃষ্টিতে উদ্বুদ্ধ করেছে। কিন্তু যতীন্দ্রনাথের কাব্যের উৎস আরো অনেকটা গভীরে।

জীবনের দুঃখ, কষ্ট ও ব্যথা-বেদনার জমিতে পা-রেখে যতীন্দ্রনাথ যখনই প্রাকৃতিক ও সামাজিক জীবনে সংগতি খোঁজার চেষ্টা করেছেন—তখনই অসংগতির মেঘ তাঁর আকাশ ঢেকে দিয়েছে। রক্তে যতকাল উত্তাপ ছিল অন্তত ততকাল প্রমিথিউসের মত চীৎকার করে বলেছেন, 'ভিখারিণী কথা রাখ। বিমনা হয়ে থাক। যতদিন অন্ধ নহি মোরা।' বলেছেন, 'ওগো অক্ষয় বট। যত বেড়ে যাও আপনি ছড়াও শত দুঃখের জট।'

অন্যান্য অধ্যায়গুলিতে ডঃ গণাই প্রভৃত পরিশ্রম সহকারে যতীন্দ্রনাথের কাব্যে প্রেম, প্রকৃতি ও পুরাণের পরিচয় দিয়েছেন সবিস্তারে। রুটিন আলোচনা করেছেন সমকালীন কবিগোষ্ঠী ও রবীন্দ্রোত্তর কবিগোষ্ঠী সম্পর্কে। দশম অধ্যায়ের আলোচনাটি এই গ্রন্থের সর্বশ্রেষ্ঠ আলোচনা। যতীন্দ্রনাথ প্রসঙ্গে দুজন পাশ্চাত্য মনীষীর কথা প্রায়শই উল্লেখিত হয়ে থাকে। একজন দার্শনিক সোপেন হাওয়ার অন্যজন কবি টমাস হার্ডি। লেখক এই আলোচনাটি অত্যন্ত মুন্সিয়ানার সঙ্গে করেছেন—সন্দেহ নেই। সমস্তটা মিলে 'যতীন্দ্রনাথের কবিকৃতি' সংগ্রহে রাখার মত একখানা বই। বইয়ের কাগজ, ছাপা বাঁধাই ও অন্যান্য অঙ্গসৌষ্ঠব রুচিসম্মত।

যতীন্দ্রনাথের কবিকৃতি। ডঃ অমরেন্দ্র গণাই। ইউ এন ধর এ্যান্ড সন্স। ১৫, বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রীট, কলকাতা-১২। দাম পনের টাকা।

কমল চক্রবর্তী

সমস্ত বইটি তন্নতন্ন করে পড়ে—ডুবাং, কেন্দু, ডুলুং, মুরমু ও ওঁরাও যুবতী, শাল-জঙ্গল, জ্যাম-পাউরুটি ও লোহাজালি ফুল পেরিয়ে—আমি পাই 'কবির কথা', 'জামশেদপুরে বর্ষা', 'এই পথে', 'ক্রোধ নয় শুধু স্পর্ধিত অভিমান', 'সেও চিমনী', 'নষ্ট', 'কমপোজিশন, কেঁদু, ব্যক্তিগত, অসংলগ্ন ও উদাসীন সকাল নামক কয়েকটি কবিতা। এছাড়াও আরও প্রচুর কবিতা বইটিতে রয়েছে। এবং কমল চক্রবর্তীর এমন একটি কবিতা, সত্যিই, খুঁজে পাওয়া অসম্ভব, যার অন্তত একটা লাইন পাঠকের প্রিয় বলে মনে হয় না। আসলে, আমার আলোচনার সুবিধার জন্য ঐ কবিতাগুলি আমাকে বেছে নিতে হয়েছে। এখন ধরা যাক, নষ্ট কবিতায় আমরা কী দেখতে পাচ্ছি। একটি দুঃসাহসী সে ব্যাপারে উদাসীন চরিত্রের

'শুধু কথা, যে বলছে, কিছুই স্বীকারোক্তির মতো, 'আমি তার ছন্নছাড়া হয়েছি যখন। তখনই হয়েছি নষ্ট। বস্তি-বাড়ির বাঁশঝাড়ে কুঁড়ি ফুটে সকালে কুসুম।' এখানে কোনো গ্লানি নেই, কোনো পাপবোধ নেই—একথা লিখেই মনে পড়ে গেল, 'তোকে আর খোয়াই ভয়াই।' মনে হল, ভুল লিখেছি; একেবারেই ভুল। একজন মানুষ যখন 'খোয়াই ভয়াই' বলে ফেলে, তখন সে কৃতকর্মের জন্য নিরুপায় ও সেই কারণেই কিছু পরিমাণে দুঃসাহসী না হলে তার উপায় কোথায়। যাই হোক, 'কুঁড়ি ফুটে সকালে কুসুম' যদি লেখা যায়, তবে তাতে যতখানি ব্যক্তিগতই থাকুক, আমরা মেনে নেব। তবু কবিতার শেষ লাইনটি পরিষ্কার নয়। কোথায় যেন আটকে রয়েছে বা হোঁচট খাচ্ছি। একটি ছোট ও নিখুঁত কবিতা 'উদাসীন সকাল'। 'রাস্তায় বিক্ষোভ কাঁটা। হেতালের দাঁড়। দুঃখী মানুষের কণ্ঠ শরীরে থাকে না রে। থাকে অঘ্রানের ঘাসে।' এতো সহজ ও মর্মস্পর্শী লাইন এবং এতো সহজে মনে থাকে যে এখন আর এসবে আমাদের বিশ্বাস হয় না। গাছ দেখে আমাদের মনে পড়ে রিজার্ভ ফরেস্ট ও নদী দেখলে মাইথন বাঁধ। পাহাড়ের চূড়ায় চূড়ায় চলে গেছে রোপ ওয়ে। তা যদি হয়, তবে 'হেতালের দাঁড়' পড়েই কেন মনে পড়ল চাঁদ সদাগরের কথা। জানি, তার সঙ্গে এ লেখার কোনো মিল নেই। তবু মনে পড়ল কেন? এরকম গণ্ডগোলে পড়েও শেষ পর্যন্ত উপরের লাইনগুলি আমার মনে থাকে। এবং তার পরবর্তী লাইনের কথা আমি কিছুই জানি না। আসলে কবিতার শেষ চার লাইনে কমল আমাকে নিতে পারেন নি। উপরের চার লাইনে এক অবিশ্বাসীর এলোমেলো দৃষ্টি পড়ে আছে এবং, তা আমারই। সত্যিই কি অঘ্রানের ঘাসে? সত্যিই কি? কিন্তু, যখনই তিনি বলেন যে, 'থাকে না রে', আমি চমকে যাই। 'রে' সম্বোধনটির চমৎকার ব্যবহারে কমল চক্রবর্তীর এপার ওপার ঝলমল করে ওঠে।

আসলে, কমল যতই বারবার ইস্পাত-নগরীর দিকে যাক না কেন, তাঁর 'বস্তির মধ্যে কেউ কেঁদে ওঠে, বস্তির মধ্যে পরিচিত আষাঢ় গগন।' তাঁর স্মার্টনেস ও চাতুর্য যেন তাঁর নয়, জোর করে আনা এক বিদেশী বোতল। প্রকৃত প্রস্তাবে রোমান্টিক এই কমল চক্রবর্তী লেখেন, 'যদি ঝরে প্রাচীন বকুল এই পথে। তবে তুমি নারী নও ঈশ্বরের প্রত্যক্ষ বদনসি।' এখানে 'তবে' শব্দটি লক্ষ্য করার। 'প্রাচীন বকুল' যদি পথে ঝরে যায়, তবে সে নারী নয়। কেন? আবার ঐ এই পথে কবিতাটিতেই রাক্ষস গন্ধে কথা যায় কার চেয়ে কে বড় হাঙরে।'

কমল চক্রবর্তীর কবিতা, বাংলা কবিতার মতোই, স্বভাবে সরল ও নরম। তাঁর প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'চার নম্বর ফার্নেস চার্জ' থেকে তিনি এতোই সরে এসেছেন যে দ্বিতীয় বই-এর নাম দিয়েছেন তিনি 'জল'। অর্থাৎ, নিজেই বুঝতে পেরেছেন, তিনি কে। 'জল'—এই সরল, অকপট, নিরলঙ্কার মানুষের আবেগ আমার কাছে একমাত্র। কিন্তু, যে কোনো কবিতা পড়লেই মনে হয়, কবিতা লেখায় কমলের কথা একটু কম। একটু অপরিচ্ছন্ন, এলোমেলো মনে হয়। বই পড়া শেষ হলে, তবুও, 'পাতিহাঁস ঝিঁঝিরা খায় বসে থাকে জল।'

আরও কথা হচ্ছে এই যে, কমলের লেখায় মর্মস্পর্শী ও সরল কিছু পংক্তি আছে। যেমন, 'এমন দিনেই শুধু বন্ধুর মৃত্যুর কাঁটা দাঁতে করে তুলে ফেলা যায়।' অনেকে এ লাইনটি মুখস্থ রাখতে পারেন। তাতে কিছু এসে যায় না: এ লাইনে কবিতা কোথায়? আর, এই ধরনের লাইনগুলিতে পুরনো ও দুঃখ, ব্যবহৃত ও কারো কারো কিনে রাখা শব্দাবলি কেন দেখা যাবে? এ ব্যাপারে কমল একটু সচেতন হতে পারেন।

জল—কৌরব প্রকাশনী। ৩৯৪ ওয়েস্ট সোনারী। জামসেদপুর-১ দাম পাঁচ টাকা।

স্নেহলতা চট্টোপাধ্যায়

স্নেহলতার স্পষ্টবাদিতা, স্নেহলতার ছাড়া আর কারোর হতে পারে না। সত্যশব্দ উচ্চারণ উপদেশের ঢঙে না বললে, ঠিক বলা হলো না—এই বিশ্বাসের জন্যে অনেক সময়েই কবিতা থেকে কবিতা সরে গেছে নিঃশব্দে।

৪০টি কবিতার এই সংকলনের অনেক কবিতার অংশই মনে রাখার মতো। একা একা বার বার পড়ার মতো বেশ কিছু লাইন ছড়িয়ে আছে সারা বইটাতে। প্রেম আর প্রকৃতি নিয়ে কবিতা লেখার ব্যাপারে স্নেহলতার কলমের জোর আছে। অনেক অংশই পড়ার পর পাঠকের 'আমারই কথা কবি বলেছেন' বলে মনে হতে পারে। আশা করি এই বই পাঠ করে পাঠক পাঠিকারা আনন্দ পাবেন।

সত্যশব্দ উচ্চারণ। স্নেহলতা চট্টোপাধ্যায়. পুস্তক বিপণির কবিতার বই। দাম : চার টাকা।

শান্তি লাহিড়ী

শান্তি লাহিড়ীর সাম্প্রতিকতম কাব্যগ্রন্থ 'ইন্দ্রের অসুখ', বিশেষ কয়েকটি দৃষ্টিকোণ থেকে নিঃসন্দেহে পাঠকদের আনন্দ দেবে তাঁর কবিতার প্রাথমিক এবং মৌল আবেদন নিহিত আছে সরল এবং গভীর পংক্তির মধ্যে।

শান্তি লাহিড়ীকে খুব সফল মনে হয় তখনই যখন তিনি আমাদের আধুনিক ভাবনাকে শব্দ দিয়ে কিছুমাত্র বিকৃত না করতে চেয়ে সরল চিত্রকল্প ব্যবহার করে চলে যান। যেমন তিনি বলছেন, 'পারবনা তোমাকে ছুঁতে শৌনকা, একান্ত দূরো। সরো সরো বলছি, নইলে পুড়িবে জাতক আমিষায়'। কিংবা তিনি লেখেন একটি আতুরকণ্ঠে পৌরুষহীন স্বামী—'বুকের মধ্যে যার একটা চাকরের সংসার'। তোমার শরীরে উচ্ছিষ্ট চাটতে চাটতে যার দিকে জল আসে। তিনি এমন শব্দ খোঁজেন, যা 'নিরাবরণ অলংকারহীন সন্ধ্যা, যা আত্মশ লক্ষ্য করে',—সেই থামতে বলেনি, তবু খেয়ে যাই যেখানে-সেখানে। বুকের মধ্যে গোপনে বলে ফেলি আর পারছিনে। কবির এই আত্ম-অন্বেষণ, তাঁর নির্বাচিত কাব থেকেই উন্মোচিত হচ্ছে এক একটি কবিতার নিমগ্ন মাটি তাঁর আত্মার স্বরে। আবার কোথাও বলছেন 'কে তুমি? শরীর? আমি তোমায় কিছুই জানি না'। আমারি মধ্যে থাকো? আমাকে দিনে ও রাতে তুমিই সামলাচ্ছ কোলে নিয়ে। শরীর তুমিই সেই যে আমাকে। আমরা দিয়ে ফুলিয়ে রেখেছে। যতই মৃত্যুর দিকে চলে যাচ্ছি। অর্থ যশ কাম থেকে মাথাকাটি রাক্ষস লালায়।

চতুর্দশপদী কবিতাগুলো অমন নিয়মবেষ্টিত লাইনসমষ্টির মধ্যে কবি কোন কোন মুহূর্তের জন্য আলুথালু বা বিক্ষিপ্ত হন নি। ও সকল চতুর্দশপদীটি নিছক গীতি-কবিতা শব্দগুণান্বিত—যা কিছুক্ষণের জন্য আমাদের মোহাবিষ্ট করে রাখে কিন্তু খুব গভীরে নিয়ে যায় না। দু একটি কবিতায় অনাবশ্যকে সেন্টিমেন্টালিজম এসে পড়েছে, যা স্বাদগ্রাহ্য রোমান্টিক পংক্তিগুলোকে পঙ্গু করেছে। উদাহরণস্বরূপ 'পাখী আমার' কবিতাটি ধরা যেতে পারে।

শান্তি লাহিড়ীকে ধন্যবাদ, বহুদিন পরে বাংলা কাব্য জগতে এমন মিষ্টি একটি সরল উপহার দেবার জন্য।

ইন্দ্রের অসুখ। শান্তি লাহিড়ী, শান্তম পাবলিশিং হাউস, ৫৮।১, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা-৯। মূল্য : পাঁচ টাকা।

চিঠিপত্র

ভুল মন্তব্য

নিয়মিত 'অমৃতে'র পাতা পড়তে গিয়ে গত ২০।২১ (১৭ বর্ষ) সংখ্যাটির 'স্বাদ সাহিত্যের পাশাপাশি শাড়ি' অমরেন্দ্র চক্রবর্তীর লেখা পড়ে মূল্যবান দিকের পাশাপাশি বেশ কিছু ভুল মন্তব্য চোখে পড়েছে।

২৩ সেপ্টেম্বর, '৭৭ অমূল্যবাবুর (তন্তুজীবি উন্নয়ন সমিতি) মন্তব্য উল্লেখ অত্যন্ত মূল্যবান এবং যুক্তি-যুক্ত। সারা পশ্চিমবাংলার তাঁতিদের এ কথাটা নিশ্চয়ই প্রাসঙ্গিক, তাই সরকারের কাছে সর্বভারতীয়ভাবে সুতোর সমমূল্য এবং কল্যাণী মিলের উৎকৃষ্ট মানের সুতোর ন্যায্য মূল্যে সহজ সরবরাহ-এর ব্যবস্থা নিশ্চয়ই প্রয়োজন। অমরেন্দ্রবাবুর এ উল্লেখ সত্যিই স্বাগত কিন্তু ৩০ সেপ্টেম্বর, '৭৭ এর সংখ্যায় কিভাবে বললেন—'সুতোর দাম খুব যে চড়া, তা নয়।'। (?)

আপনি কি অবহিত নন গত ১৯৬৮ সালের পরেও ১৯৭৪ সাল থেকে সুতোর মূল্য বৃদ্ধির জন্য তাঁতিদের কোন অন্ধকারের দিকে ক্রমান্বয়ে এগিয়ে যেতে হচ্ছে?—'বাংলার তাঁতের শাড়ি যতো যোগ্য, যতো সুন্দর, ততো সুলভ নয় কেন?....বিত্তবানদের কথা মনে রেখে।'

শেষের মন্তব্যটুকু বিবেচনাহীন। কারণগুলো জানাতে গিয়ে যা জানবার দরকার তা হয়ত ভালভাবে জানতে চাননি। তাই 'সুতোর দাম চড়া নয়'—এধরনের মন্তব্যে বিস্মিত হবারই কথা এবং প্রতিবাদ সূচক বক্তব্য রাখতে বাধ্য। আপনি একটা মোটামুটি ধারণা নিয়ে দেখবেন, সামান্য ১৯৭৩-৭৪ সাল থেকে ১৯৭৬-৭৭ সাল পর্যন্ত কি হারে প্রতিটি কাউন্টের সুতোর মূল্য বৃদ্ধি পেয়েছে এবং তাঁতিরা বস্ত্র-ব্যবসায়িদের হাতে কিভাবে খেলনার মত ব্যবহার পান। ১৯৭৪ সালে সুতোর কৃত্রিম অভাব ও মূল্য বৃদ্ধির গতিতে দুস্থ তাঁতিদের ভিক্ষের ঝুলিও হাতে করতে হয়েছিল এবং সরকারী রিলিফের ব্যবস্থাও নিতে হয়।

তন্তুজীবী সমিতি, তন্তু সমবায় প্রভৃতির ওপর গ্রামের মহাজনেরা কি কূটকৌশল চক্রান্ত করে তা কি জানবার ও জানাবার নয়। হয়ত জানাবেন আশা করি।

বিত্তবানদের কথা মনে রেখে ঐ মহাজনেরাই তাদের নির্দিষ্ট ইচ্ছায় কাপড় বোনাবার ব্যবস্থা করেন।

কেন?—এ প্রশ্ন করবেন। কিন্তু উত্তরের সীমানা চিঠিতে সম্ভব নয়। বাস্তব অনুসন্ধান এবং আলোচনাযোগ্য।

সাধারণ তাঁতি কোন সময়েই চান না তাঁদের শাড়ির বাজারে চাহিদা কমে যাক। কিন্তু অযৌক্তিক ব্যবসায়িদের কারণেই সৃষ্টি হয়েছে আজকের এই অবস্থা। 'এ দেশের কজন শাড়ি কিনতে পারেন?'—হ্যাঁ, এই চাহিদা কমে যাওয়াটাই তো তাঁতিদের মুখ্য সমস্যা। আর এ কারণে ধীরে ধীরে অসহায় তাঁতিরা সার্বজনীন ক্ষেত্র থেকে গুটিয়ে মহাজনের কুক্ষিগত কিম্বা সংসারকে বাঁচানোর জন্য চড়াহারে সুদের খাতায় ঋণগ্রস্থ হয়ে পড়ছেন—হয় ব্যাংকের কাছে নয়ত কোন মহাজনের মাধ্যমে।

এছাড়া আমি অভিনন্দন জানাই আপনার অনুকম্পিত চিন্তার জন্য যে, যখন লিখেছেন 'শিল্পী এবং ব্যবহারকারী ক্রেতা ফাঁকে মার খাচ্ছেন।' নিশ্চয়ই তার জন্য আপনার প্রস্তাবকেও ধন্যবাদ জানাই যদি সরকার ন্যায্যমূল্যে শাড়ি ক্রয় করেন। এছাড়াও প্রস্তাব রাখা দরকার যে, তাঁতিদের কাঁচামাল সুতোর উপযুক্ত মূল্যে সর-বরাহ একান্ত আবশ্যক। নতুবা যে সব কৌশলের জালে তাঁরা জড়িয়ে আছেন—তার থেকে বাংলার গৌরব তাঁত শিল্পকে অসুস্থ অবস্থায় বেশীদিন বাঁচিয়ে রাখা হয়ত সম্ভব হবে না।

কারণ, আপনার হিসাবেই বলতে হয় সাকুল্যে তাঁরা সস্ত্রীক দুদিনে চোদ্দ টাকা উপায় করেন। আজকের সর্বনিম্ন জীবন-ধারণে সাত টাকা উপায়ের দিনে তাঁতিদের দিশাহারা হতে হয়ত বেশীদিন আর লাগবে না, তাই নয় কি?—অশোককুমার দাস, খরমবাই, হুগলী।

বস্তাপচা জোলো গল্প

২২ জুলাই অমৃতে প্রকাশিত শৈবাল মিত্রের 'দিন নেই রাত নাই' পড়ে শুধু অবাকই না হতবাক এবং হতাশ হয়েছি, গৌরবময় যুব আন্দোলনের পটভূমিকাকে (খুব সম্ভবতঃ নকশাল আন্দোলন) মূল-ধন করে সংস্কৃতির নামে অপসংস্কৃতির প্যাকেটে মুড়ে উনি আমাদের উপহার দিলেন 'বটতলা মার্কা' বস্তাপচা ঢাউস একখানা জোলো বড় গল্প।

তিনি নির্মম বাস্তবের—তা অতীত এবং বর্তমান সমাজ সম্পর্কে—এক বস্তু-নিষ্ঠ ময়না তদন্ত করেছিলেন যার রিপোর্ট পেয়েছিলাম সম্প্রতি অন্য এক জনপ্রিয় পত্রিকায় প্রকাশিত 'পোস্ট মর্টেম'-এ। অপ-সংস্কৃতির অবক্ষয়ে বাঙ্গালী সমাজ যখন হাবুডুবু খাচ্ছে, ইতিহাসকে বিকৃত করে কায়েমী স্বার্থান্বেষীরা যখন সবাইকে আফিমের নেশায় ঘুম পাড়াতে ব্যস্ত, তখন আপনার পোস্ট মর্টেম বিক্ষুব্ধ সমুদ্রে পথহারা নাবিককে আশার আলো দেখিয়েছিল। কিন্তু হায়! সেটা যে নিতান্তই একটা বুদ বুদ তা বোঝাতে আপনি আর বেশী দেরী করালেন না। 'দিন নেই রাত নেই' আরম্ভ করলেন বিপ্লবী পরিবেশ নিয়ে আর পরি-বেশন করলেন বটতলা মার্কা যৌন-সম্পর্কের এক আষাঢ়ে গল্প যার নমুনা 'বেস্টুরেন্টের অন্ধকার কামরায় চুমু খেলাম প্রথম হপ্তায়। দ্বিতীয় মাসে ছুঁয়ে দেখলুম, ওর শরীরের চড়াই-উৎরাই। তৃতীয় মাসে জড়িয়ে ধরলুম।' '....আদিম জন্তুদের মতো নিষ্ঠুর হাতে আমি মঞ্জরীর শরীরে বেপরোয়া দামামা বাজাতে থাকি। মঞ্জরী আমার ঠোঁটে ওর ঠোঁট ছোঁয়ায়। মিষ্টি, ঘন, নরম স্পর্শ।' এই কি কোন বিপ্লবী কমিউনিস্ট চরিত্র? এর থেকে বোঝা যায় নাকি যে লেফট ওরিয়েন্টেড পশ্চিম বাংলার বিপ্লবী কমিউনিস্ট আন্দোলনকে পুঁজি করে লেখক সস্তায় বাজার মাৎ করতে চাইছেন?

মানুষ মাত্রেই ইন্দ্রিয়ের দাস। সময় বিশেষে মানুষের আদিম প্রকৃতির বন্য ডাক দুর্বার হয়ে ওঠে। মতাদর্শগত সংগ্রামের মধ্য দিয়ে তাকে জয় করতে পারলে তবেই তো আদর্শ কমিউনিস্ট বিপ্লবী হওয়া যায়। আপনি আত্ম-সমালোচনা করেছেন ঠিকই কিন্তু সে খুবই দুর্বল, প্রচণ্ড মেকী। বিপ্লবী আদর্শ এবং ন্যাকা প্রেমের গল্প—এ দুয়ের মধ্যে দ্বিতীয়টিকেই আপনি বড় করে তুলেছেন।

অমৃত-সম্পাদককে আমরা আন্তরিক অভিনন্দন জানাই। তাঁর পত্রিকায় শ্যামল রায়ের বলিষ্ঠ লেখা মিসা-১৯৭৩ আমরা নিয়মিতভাবে পাচ্ছি। আশাকরি আমার এ চিঠি হাজার হাজার দায়িত্বশীল পাঠকের কাছে পৌঁছে যাবে অমৃতের মাধ্যমে। প্রমথ ভট্টাচার্য, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়, কলকাতা।

এ কিসের শব সাধনা?

'অমৃতে' সাহিত্য ও স্বাধীনতা সংখ্যা বেরোবার আগে বিজ্ঞাপন ছিল: পরবর্তী সংখ্যার আকর্ষণ: গল্প: শৈবাল মিত্র: পটভূমি: লকআপ। স্বাভাবিক কারণেই কৌতূহলের মাত্রা বেড়ে গিয়েছিল। কিন্তু যখন সংখ্যাটি হাতে এলো, পাতা উলটিয়ে বের করি শৈবালবাবুর গল্প 'শব সাধনা' এবং বুঝতেই পারছেন, গো-গ্রাসে এক টানা সবটা পড়ে ফেললাম। পড়ার পর বুকের ভেতরটা টন টন করে উঠলো. মনে হলো, গল্পের বাজার সত্যিই [illegible] (বৈকুণ্ঠ পাঠক!) আপনাকে স্মরণ করতে বাধ্য হচ্ছি: 'একটি গল্প দও গো-ও-ও)।

১। মনে হয়, শৈবালবাবু মনে করে-ছিলেন, মিসা, বন্দী মুক্তি, বামফ্রন্ট ইত্যাদি ইত্যাদির হুটকেকের মতো একটা কিছু মশলা তৈরী করলেই অর্বাচীন পাঠক সমাজ অচৈতন্য হয়ে পড়বে।

২। যেহেতু আমরা পুলিশ সমন্ধে একটি বিশেষ ধারণাতেই অভ্যস্ত, তিনি ইন্সপেকটারকে ঐ একইভাবে তাড়াতাড়ি পালিশ করেছেন। এবং ইন্সপেকটারের ঐ ধরনের ক্রুরতার পটভূমি হিসেবে যেসব কথা—(ক) অথচ নিজে হপ্তায় সাতদিন মাল টেনে টইটম্বুর হয়ে থাকতো।... (খ) ওর বাবাও নিজেকে বলতো তন্ত্রসাধক, কাপালিক।'... বাবার পাঁঠাবলির দৃশ্যটা ওর মনে আছে।—এসব ভীষণ জোলো।

যদি শিরোনামের নিচে বন্ধনী দিয়ে লিখে দেওয়া হতো কাল্পনিক—তাহলে হয়তো গল্পটা অল্পের জন্যও—খাদ্যে—

হাঁ, তারপর, কিছুই বুঝলাম না। সুমনের লেখাটা কি ধরনের, বা তাকে বামার আখ্যা হলো কেন, বা কোন অপরাধের কারণ (যদি সুমনের দোষ থেকেই থাকে তবে) যুবতীকে ঐভাবে সিনেমাটিক ধরনে যুবতীর মতো ঝুলিয়ে রাখা—কিছুই বুঝলাম না। যদি তর্কের খাতিরে ধরেই নেওয়া হয়, ...ইত্যাদি ইত্যাদি সমাজবিরোধী কিম্বা গুপ্ত কোন রাজনৈতিক কারণে 'রেড টেপ মার্কা' কোন বাঙালীর ফলে ঐরকম শাস্তি, তবে না হয়—চললেও চলতে পারে।

সবটাই কেমন যেন ধোঁয়াটে ব্যাপার। জোরযাত্রীর মতো। যেন বিয়ে বাড়ী নিমন্ত্রণে নিমন্ত্রিতকে বলা হলো 'খেয়ে যাও', নিমন্ত্রিত তেমনই সুবোধ বালকের মতো....ইত্যাদি।

আসলে শৈবালবাবুর লেখাটা একটা স্টান্ট ছাড়া কিছুই নয়।

সম্পাদক. দুঃখ হয়, এই অমৃতেই 'কুয়ো', 'গজুহাটীর বাণপ্রস্থ'—ইত্যাদির মতো ভালো গল্প পড়েছি। কিন্তু এখন কি না! প্রবীর ভট্টাচার্য, কুলটি।

ধান ভানতে শিবের গীত

গত ২৬ আগস্টের 'অমৃত'-এ বর্ণজিৎ দেবের প্রবন্ধ 'কোচবিহার জেলার দেবদেউল' পড়লাম। আপাতদৃষ্টিতে প্রবন্ধটির নাম বড় গালভরা, বাস্তবে বস্তুনিষ্ঠা কিংবা রচনা শৈলী কোনো দিক দিয়েই এ রচনাকে উল্লেখযোগ্য মনে করার তেমন কারণ নেই। অমৃতের জন্মক্ষণ থেকেই যদিও আমরা এর পৃষ্ঠপোষকতা করছি—আত্মশ্লাঘা বোধ করার সঙ্গত কারণ না থাকলেও বলতে বাধ্য হচ্ছি—দিনে দিনে এর মান যে পর্যায়ে নামছে তাতে মাঝে মাঝে বেশ মর্মপীড়া অনুভব করি। সদিচ্ছা থাকলে অনায়াসে পত্রিকার অবক্ষয় রোধ করা যায়। ধৃষ্টতা মার্জনা করবেন। ভালো লেখাও অনেক পাই।

বর্ণনাত্মক কিংবা বিশ্লেষণাত্মক কোনো দিক দিয়েই কোচবিহার জেলার দেবদেউল এ পত্রিকায় স্থান পাবার যোগ্য নয়। লেখকের কাছে কয়েকটি বিনীত প্রশ্ন রাখতে চাই। প্রথমত, কোচবিহার নামের বানান সম্পর্কে তিনি কি অবহিত? এ প্রবন্ধে কোচবিহার নামের বানান (কোচবিহার কুচবিহার) দু'রকমের ছাপা—সেটা কি মুদ্রাকর প্রমাদ? দ্বিতীয়ত, 'বাংলা সংস্কৃতি' (পৃঃ ৩৪, প্রথম অনুচ্ছেদ) বলতে তিনি কি বোঝাতে চেয়েছেন—বাঙালীর না বাংলা দেশের? তার কোনো ব্যাখ্যা প্রবন্ধকার দেবেন? তৃতীয়ত, বলা হয়েছে উত্তর বঙ্গের পার্বত্যময় (?) অঞ্চলের একটি জেলা কোচবিহার। কথাটা কতটুকু সত্য? চতুর্থত, দেবদেউল সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে ধান ভানতে শিবের গীত গাওয়া হয়েছে। পিতৃতান্ত্রিক-মাতৃতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থার ভুল ব্যাখ্যা দিয়ে পাঠক সাধারণকে বিভ্রান্ত করা হয়েছে। সাঁওতালরা কি সমতলভূমির এবং পিতৃতান্ত্রিক? পঞ্চমত, তিনি বলেছেন—'প্রাগৈতিহাসিক সভ্যতার নানাবিধ নিদর্শন' এখানে ছড়িয়ে আছে। অন্ধকারে ঢিল ছুঁড়েছেন অথচ কোনো প্রমাণ তিনি উল্লেখ করেন নি। ষষ্ঠত, 'কোচবিহার জেলার পুরাকীর্তি' বই থেকে বিশেষ বিশেষ লাইন তুলে সযত্নে বসানো হয়েছে অথচ কৃতজ্ঞতা স্বীকারের নামটি নেই। 'কুচবিহারের মতো পশ্চিম বঙ্গের আর কোনও জেলায় মন্দিরের উপরে মসজিদের অনুকরণে গম্বুজ স্থাপিত হয় নি'—বাক্যটি হুবহু এই প্রবন্ধে সংযোজিত। 'পুরাকীর্তি' বই থেকে আরো পংক্তি অনায়াসে উদ্ধৃত করা চলে। একস্থানে বলা হয়েছে—'চারচালা মন্দিরের নির্মাণরীতির সঙ্গে ১৭শ খৃষ্টাব্দের মুঘল প্রভাবেরই ফল?' এর দ্বারা লেখক কি বোঝাতে চেয়েছেন? এক ধরনের প্রভাব? শব্দবিন্যাস রীতি কি যথার্থ? আরো অনেক উদাহরণ দেওয়া সম্ভব। সত্যকিঙ্কর দাশ, কোচবিহার।

ভালো লাগল

আমি অমৃতের নিয়মিত পাঠক। প্রবাসে এসে বাংলার অনেক কথাই ভুলে গিয়েছি কিন্তু কিছুতেই ভুলতে পারি না সাহিত্য ও সংস্কৃতিকে। তাই সাহিত্য পত্র-পত্রিকা পড়ার নেশা এখনও ছাড়তে পারিনি। ২৬ আগস্ট অমৃতে প্রকাশিত বর্ণজিৎ দেবের কোচবিহার জেলার দেবদেউল' রচনাটি পড়ে ভীষণ ভালো লাগলো। আকর্ষণীয় ফটো সহ এই রচনাটি কোচবিহার নামকরণ থেকে শুরু করে ধর্ম সংস্কৃতি ও দেবদেউলের প্রতি রাজবংশীদের বিশ্বাস অটুট আছে। লেখক তা নিপুণভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন। তাছাড়া এই কোচবিহার জেলায় নরকাসুর, বাণাসুর, ভগদত্ত থেকে শুরু করে নীলাধ্বজ, চক্রধ্বজ, নীলাম্বর রাজত্ব করেন এ কথাই বা কজন জানেন? এবং ১২০৩ খৃষ্টাব্দে মহম্মদ বখতিয়ার খিলজীর প্রথম আক্রমণ থেকে শুরু করে ১৭৩৬ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত এই কোচবিহার রাজ্য প্রায় পাঁচিশবার আক্রান্ত হয় বিভিন্ন মুসলমান বাদশা কর্তৃক। এতবার আক্রমণের পরেও কোচবিহার তার আদি ইতিহাস অক্ষুণ্ণ রেখেছে তারই একটি চিত্র সুস্পষ্টভাবে তুলে ধরেছেন লেখক। বাংলা সাহিত্যের গবেষকদের প্রচুর কাজে লাগবে এরকম প্রবন্ধ একথা নিঃসন্দেহে বলা যায়।

সম্পাদক মহাশয়কে ধন্যবাদ জানিয়ে আমি অনুরোধ করব, আরো এরকম রচনা প্রকাশ করার জন্য। স্বপনকুমার মুখার্জি, ২৭৮, ডিফেন্স কলোনী, জবলপুর-৭।

আনন্দিত ..

আপনাদের ১২ আগস্ট (১৯৭৭) অমৃতে, লেখক লেখা দিয়েই থাকবেন। এবং স্বাধীনতা ছাড়া শিল্প বাঁচবে কি করে!! এই দুটি সাক্ষাৎকার পড়ে খুব আনন্দিত হলাম এবং এই ধরনের পরিকল্পনা যদি আরও করেন তাহলে আরও আনন্দিত হব। দিলীপ চক্রবর্তী, চৌবাগা, কলিকাতা-৩৯

মুগ্ধ হয়েছি

আমি একজন অমৃত পত্রিকার নিয়মিত পাঠক। ১২ আগস্ট-এর 'সাহিত্য ও স্বাধীনতা' সংখ্যায় ভারতের প্রধান ভাষার তেরজন লেখকের স্বাধীনতা ও সাহিত্য সম্পর্কিত লেখাগুলি সত্যই প্রাণবন্ত ও উজ্জ্বল। আমাকে এই সংখ্যা অনেকখানি খোরাক দিয়েছে বিশেষ করে শ্রীমতী ইসমত চুগতাই ও কালিন্দীচরণ পাণিগ্রাহীর চিন্তাধারা।

দেহগত জীবনের শেষ আছে। মানুষ বুদ্ধির আছে বিনাশ, কিন্তু সাহিত্যের মৃত্যু নেই।

সাহিত্যের ভেতর দিয়ে মানুষ অমরত্ব লাভ করে, পায় সৌন্দর্যলোকের সন্ধান তার সঙ্গে থাকে একটি নিবিড় সম্পর্ক স্বাধীনতার।

আমি মুগ্ধ হয়েছি প্রতিভাবান লেখক লেখিকাদের সাহিত্যের সঙ্গে স্বাধীনতার সম্পর্কের যুক্তি দেখে। ধন্যবাদ জানাই তেরজন প্রধান ভাষার সাহিত্যিকদেরও অমৃত পত্রিকার সম্পাদককে। দেবব্রত বাগচী, আলিপুরদুয়ার, দেবীনগর জলপাইগুড়ি।

বাঁচলেম

পবিত্র মুখোপাধ্যায়

কলেজ স্ট্রীটের পুরোনো বই-এর দোকান থেকে একটি কবিতার বই কিনে ফেললাম। কবির নাম উহ্য থাক।

এ সেই সময় যখন নিত্য নতুন কবির নাম আবিষ্কার করি। গভীর শ্রদ্ধা নিয়ে পড়ি। ভালো না লাগলে নিজের জ্ঞান-বুদ্ধিকেই দোষ দিই।

বইটি বাড়ি এসে খুলে বসলাম। শ্রদ্ধা, প্রীতি উৎসাহ সব কিছু নিয়ে এই সদ্য নতুন পাঠক বইটি গিলতে বসলাম। কিন্তু কিছুতেই ভালো লাগছে না।

একটা স্তবক, এমনকি একটা পংক্তিও আমাকে মুগ্ধ করতে পারছে না। অথচ আমি তখন রবীন্দ্রদ্রোহী কল্লোলী কবিদের অনেকেরই মুগ্ধ-পাঠক। অনেক পংক্তি অজান্তে নিজের মনে আবৃত্তি করি। বইটি তবুও শেষ করলাম।

'বই-এর শেষ' যেখানে সেখানেই আমারই মতন কোনো মর্মাহত রসজ্ঞ পাঠক লিখেছেন বাধ্য হয়ে, 'বাঁচলেম'। আমারও মনে হল, সমস্ত বইটি পড়ে ওঁর দুঃসাধ্য শ্রমের কোনো মূল্যই কবি দিলেন না আমাকে। বেঁচে গেলাম। ওটি শেষ করতে পেরেছি ভেবে, বেঁচে গেলাম—ওই বই আর কখনো পড়তে হবে না ভেবে।

ঘটনাটি আমার মনে পড়ছে, বইটিও হাতের কাছে রয়েছে। পরে, অপেক্ষাকৃত পাকা পাঠক হয়ে দু-একবার চেষ্টা করেছি আমারই কোনো ঘাটতির ফলেই কবিতাগুলো পড়ে ওরকম প্রতিক্রিয়া হয়েছিলো কিনা তা জানার। কিন্তু পরে পড়েও ওই একই অভিজ্ঞতা। সম্ভবত, ঐ কবির জন্ম সম্পর্কে, কবিত্ব সম্পর্কে নানা কারণে শ্রদ্ধা পোষণ করেও প্রথম পর্বের বিরূপতা আর ক্লান্তি। জানি, কোনো সৎ পাঠকের পক্ষে এটা অন্যায়। কিন্তু পাঠের ক্ষেত্রে যুক্তি-তর্কের দাবি অনেক সময়ই টেঁকে না।

কবি কতোটা শিক্ষিত, কতো ভাষা জানেন তিনি, নিয়মিত লেখার পিছনে তার সময় অনুশীলন কতোখানি, শব্দকে কতোভাবে বাজাতে পারেন, ছন্দে তার হাত কেমন পাকা, কতো গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের দিকে তার নজর—ভালো কবিতার বিচারে এসব আংশিক শর্ত; মূলত কবিতাকে কবিতা হয়ে উঠতে হবে; তার পাঠ মাত্রই এমন একটা সম্পর্ক স্থাপিত হতে থাকবে যা তাকে অন্য একটি অভিজ্ঞতার দরজায় নিয়ে যাবে। কি কি মশলা মেশানো রয়েছে তা দেখার কাজ কি নিমন্ত্রিতের? তার ভালো লাগছে খেতে, এই বোধই তাকে আরো আরো খাবার পেতে অনুপ্রেরণা যোগাবে। আমরা কুশলী রাঁধুনির কাছে কি পেলাম তাই বড়ো কথা। কবিতা পাঠের ক্ষেত্রেও তাই।

আমি অধিকাংশ কবিতা পাঠকের সঙ্গেই একমত, কোনো পূর্ব শর্ত ছাড়াই কবিতা আমাকে নাড়া দেবে। হয়তো একটি পুরো কবিতা, হয়তো একটি স্তবক, একটি পংক্তি নিদেন পক্ষে একটি শব্দ। কবিতা পাঠকের মনের ঘুমন্ত বোধকে উসকে দেবে, কখনো করবে আলোড়িত, কখনো তছনছ। একটু মৃদু কম্পনও সৃষ্টি করে নিঃশেষ হতে পারে, তবে তার প্রতিধ্বনি বা স্পন্দন চলবে আজীবন। এ সব কিছুই যদি না হয় তবে তার কাছে কবিতাটি ব্যর্থ। সেই পাঠক আর ওই কবির সঙ্গে শুভেচ্ছা বিনিময় করবে না।

আমি ইচ্ছে করেই কবিতা-পাঠক কথাটি বসিয়েছি। আমার ধারণা কবিতার পাঠক এক বিশেষ জাতের মানুষ (যাদের সংখ্যা এদেশে স্বাভাবিকভাবেই নগণ্য) যারা ছবির (চিত্রশিল্প) প্রদর্শনী দেখেন মাঝে মাঝে। যারা সিনেমা দেখেন না, 'ফিলম' দেখতে ভালোবাসেন, যে কোনো একটা পোশাক পরে তিনি হাসিমুখে বন্ধুর সঙ্গে করমর্দন করতে পারেন, স্ত্রীকে না জানিয়ে বাৎসরিক ইনক্রিমেন্টের টাকায় বই কেনেন। বাড়ি এসে বলেন, দিয়েছে। কয়েক কাপ চা কফি একসঙ্গে খেয়ে ওঠেন আড্ডায় বসে। নিজের পয়সায় সিগারেট কেনেন, তাঁর পকেট থেকে বিনা অনুমতিতে যে কেউ সিগারেট তুলে নিলেও তিনি সুরুচিবশত ভ্রূ কোঁচকান না। অফিস কামাই করে গোআবা চলে যান....ইত্যাদি।

কবিতা পড়েন কবিরাই—এ ধরনের মন্তব্য পথেঘাটে সবাই শুনেছেন, অনেকের ধারণা। অনেকের বিশ্বাস। তবে ওই মন্তব্যের মধ্যে সত্য আছে। যিনি নিজে না লিখেও কবিতার নিয়মিত পাঠক তিনি আংশিকভাবে কবিই। অনেক অনেক সহজ আনন্দ তিনি অতি সহজে ছেড়ে দিয়েছেন একটি আপাতদুরূহ শিল্পের জন্য; এই ত্যাগ সাম্রাজ্য বিলিয়ে দিয়ে ফকির হবার চেয়ে কম নয়। আমাদের আজকে জীবনের চার-দিকে কিশোরকুমারের উত্তেজক কণ্ঠনিনাদ, হিন্দী ছবির নায়ক-নায়িকার অসম্ভবকে সম্ভব করে তোলার অতি সহজ ক্রিয়াকাণ্ড যৌন উত্তেজক নাচের নামে নষ্টামি, হাজার রকমের নেশায় বুঁদ হয়ে থাকার আনন্দ,—আরো আরো—অসংখ্য স্বাস্থ্য সুখ বিলোনোর আয়োজনকে উপেক্ষা করে কবিতার মতন শান্ত, উত্তেজনাহীন আড়ম্বর-শূন্য নিঃশব্দ ভাষাশিল্পের কাছে সময় খোয়ানো—এ তো কোনো হিসেবেই মেলে না। তবে ঘটা করে এদেশে রবীন্দ্র জয়ন্তী হবে যতোদিন ততোদিন কবিরা আর কিছু না পাক, কিছুটা সম্মান পাবেন, পাচ্ছেনও। পাঠক শূন্যে ঠেকলেও কিছু যায় আসে না।

সঙ্গে আলোচনা করেন, তাঁদের মন্তব্যকে গুরুত্ব দেন।

ওখানে প্রতিটি বিভাগে থিয়োরিটিক্যাল ও প্র্যাকটিক্যাল দু-ভাবেই পরীক্ষা হয়। থিয়োরিটিক্যাল (লিখিত) পরীক্ষার মাধ্যম ইংরেজী। ধরা যাক একটি ছেলে, তিনি হয়তো ইংরেজী ভাল জানেন না, কিন্তু চলচ্চিত্র মাধ্যমে দক্ষ। ডিপ্লোমা কোর্সে তাঁর ফিল্মের জন্য যেখানে ১০০ মার্কের মধ্যে ৭০ পেলেন সেখানে ইংরেজী ভাষায় অনভিজ্ঞতার জন্য থিয়োরিতে পেলেন ৩০। অন্যদিকে আরেকটি ছেলে যিনি ইংরেজীতে দারুণ অভিজ্ঞ, অথচ চলচ্চিত্র নির্মাণে পারদর্শী নয়। পরীক্ষায় তাঁর খাতা থেকে ৭০ ও ফিল্ম থেকে ৩০। তাহলে প্রকৃত ভাল ছাত্র কে? এ বিষয়ে মধ্যে সেই শুরু থেকেই বিরোধ, যার মীমাংসা এখনো হয়নি।

ওখানে কাজ শেখানোর ধরন নাটক বিভাগের মতো। লেকচার, ডিবেট, ফিল্ম দেখা এসব থিয়োরিটিক্যাল দিক ছাড়াও হাতে কলমে কাজ শেখার জন্য কাঁচা ফিল্ম, ক্যামেরা থেকে শুরু করে প্রয়োজনীয় সমস্ত কিছু কর্তৃপক্ষ সরবরাহ করেন। ছাত্রদের প্রথমে যে মধ্যে আনা হয়, তার নাম ফিল্ম অ্যাপ্রিসিয়েশান কোর্স। বিশ্বের সেরা ছবিগুলো দেখা ও সেগুলো নিয়ে আলোচনা কোর্সের মুখ্য উদ্দেশ্য। আমার ধারণায় এটা ছাত্রদের ভালর চেয়ে খারাপ বেশী। ওখানে সাধারণতঃ যাঁরা যান তাঁদের বেশীরভাগের বয়স সতের থেকে চব্বিশের ভেতর। তাঁরা অনেকেই 'ফিল্ম সেন্স' 'ফিল্ম ফর্ম' 'ফিল্ম এডিটিং' প্রভৃতি চলচ্চিত্র বিষয়ক 'বর্ণ' পরিচয় প্রথম ভাগের', সঙ্গে পরিচিত নন। অনেকের কাছে সত্যজিৎ রায়ই অপরিচিত। অনেকে শুধুমাত্র পথের পাঁচালীর নামটাই শুনেছেন। ফিল্ম সম্বন্ধে কোন বিশেষ জ্ঞান তাঁদের নেই। তাঁদের অনেকে বক্স ক্যামেরাও ছুঁয়েছেন কি না সন্দেহ। ছবি বলতে বোঝেন ক্যালেণ্ডারের ছবি, পেইন্টিংস ব্যাপারটাই অনেকের কাছে

এখন প্রশ্ন হতে পারে এসব না জেনে ওঁরা প্রবেশাধিকার পেলেন কি করে। উত্তর, যেহেতু যোগ্য বিবেচিত হয়েছেন। ভারতীয় আইনানুসারে পেছন দরজা দিয়ে প্রবেশাধিকার থাকলেও বেশীরভাগ ছাত্র কিন্তু যোগ্য বলে এসেছেন। সে যোগ্যতার মাপকাঠি দুটো পরীক্ষা। ১৯৭৪-৭৫ অব্দি ইংরেজী ও সাধারণ জ্ঞান এই বিষয়ে পরীক্ষা হত (এখন নাকি পরীক্ষা পদ্ধতির সামান্য বদল হয়েছে।) দু-একটি প্রশ্ন ছাড়া তার মধ্যে ফিল্ম বিষয়ক কোন প্রশ্ন থাকত না। সাধারণতঃ পাবলিক সার্ভিস কমিশনের স্টাইলে এই পরীক্ষা। এখন ফিল্ম সম্বন্ধে অ আ ক খ না জেনেই শুধুমাত্র ইংরেজী ও সাধারণ জ্ঞানের ওপর নির্ভর করে যাঁরা প্রবেশাধিকার পেলেন, তাঁদের সামনে যদি গোদার, ফেলিনি, আন্তোনিওনিরা এসে পড়েন, তাহলে স্বাভাবিকভাবেই তাঁদের দিশেহারা হয়ে পড়ার কথা। প্রথম প্রথম ঐ সব ছবিগুলো তাঁরা বুঝতে পারেন না। বাইরের কোন হল হলে হয়তো উঠে আসতেন, কিন্তু যেহেতু এটা ফিল্ম ইনস্টিটিউট এবং যেহেতু তাঁরা এখানকার ছাত্র, তাই এমন ভাব দেখান যেন কতই না বুঝেছেন। উফ্ কি দারুণ ফিল্ম। তারপর শিক্ষকরা ঐ সব ছবিগুলোকে যথার্থ ছবি বলে যখন তার গুণাগুণ আলোচনা করেন ছাত্ররা তখন মুখস্থ করেন ঐসব পরিচালক ও তাঁদের ছবিগুলোর নাম। যাতে বাইরে ছুটিতে গেলে বন্ধু বান্ধবদের অন্ততঃ বলতে পারেন, 'আলফ্রেড হিচককের একটা ছবি দেখলাম, উফ্ কি তার ট্রিটমেণ্ট।' কিন্তু এঁরাই যে ফিল্ম ইনস্টিটিউটের সব তা নয়। বেশ কিছু ছাত্র সবসময়েই থাকেন যাঁরা শুধুমাত্র ক্যামেরা নয়, চলচ্চিত্র মাধ্যমটা প্রকৃত আয়ত্ত করতে এখানে আসেন। এখানে ঢোকার আগেই ফিল্ম সম্বন্ধে প্রাথমিক জ্ঞান তাঁদের ছিল। দেখেছেন, ছবি করা দেখেছেন, ক্যামেরা কাঁধে ঘুরে বেড়িয়েছেন, তাই অ্যাপ্রিসিয়েশান কোর্স তাঁদেরই প্রকৃত সাহায্যে আসে।
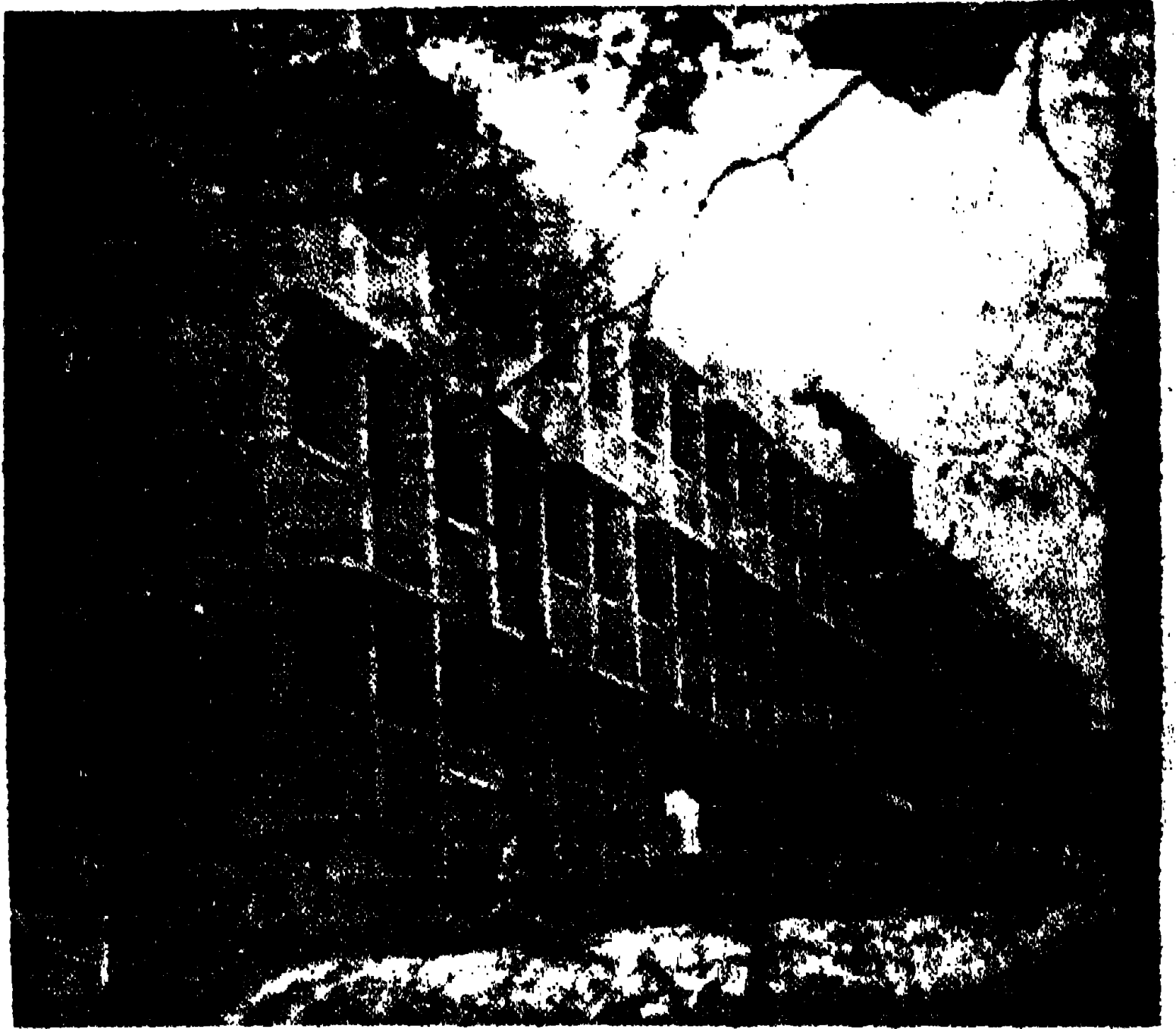
অবশ্য কয়েক মাসের পরে একটা ব্যাপারে কিন্তু প্রত্যেকের মধ্যেই মিল এসে যায়। ঐ ফিল্ম, সিনিয়রদের চালচলন দেখতে দেখতে তাঁরা সকলেই নিজেদের কিছু ভাবতে শুরু করে দেন। প্রত্যেক ছাত্রই তখন বড় ইনটেলেকচুয়াল। এমন ভাব করেন যে একবার সুযোগ পেলেই তাঁরা চলচ্চিত্রে এক বিরাট বিপ্লব ঘটিয়ে দেবেন। একটা নাক উঁচু ভাব গড়ে ওঠে। এ বিভাগের বিভাগের ছাত্রদের অবহেলা করে—'দূর ওরা কি জানে।' এই মনোভাব গড়ে ওঠে প্রধানত বিভাগীয় শিক্ষকদের জন্য।

প্রত্যেক বিভাগীয় ছাত্রদের শিক্ষার বৈশিষ্ট্য, চলচ্চিত্র বিষয়ী ধারণা ইত্যাদির মধ্যে বৈপরীত্য দেখা যায়। যেমন পরিচালনা বিভাগ যেখানে বলছেন সাইলেন্স, ক্যামেরা ইত্যাদি জাতীয় ছবিই ছবি, এর বাইরে যা তা ছবি নয়, সেখানে অভিনয় শাখা বলছে ফিল্ম মানেই বোম্বের ফিল্ম। এবং এ্যাকটিং এর অর্থ তাঁদের কাছে ফিল্ম এ্যাকটিং, বিশেষ করে বোম্বের ফিল্ম এ্যাকটিং। এর শিল্পীরা যেভাবে মোতেক'দে অভিনয় করেন, এ কোর্সের কাছে সেটাই আদর্শ সম্পূর্ণ না হলেও অনেকাংশে। যা সত্যিকারের নতুন কোন অভিনয়রীতি তাঁদের শেখানো হয় না। ইনস্টিটিউটের অভিনয় শাখার জন্য বাইরে থেকে অনেক অতিথি শিক্ষক আসেন। তাঁরা হলেন রাজকাপুর, শর্মিলা, ওয়াহিদা রহমান, শর্মিলা সামন্ত, মোহন সায়গল এরা আরো অনেকে। অভিনয়

রাজকাপুর, মেয়েলীপনা ইত্যাদি অন্তরালেই থেকে গেল। কিন্তু তাঁর ছবির বৈশিষ্ট্য, কাজ করার পদ্ধতি, চিন্তা-ভাবনা তেমন কেউ আয়ত্ত করতে পারলেন না।

আমরা আগেই আলোচনা করেছি যে অভিনয় শাখা ও অন্যান্য শাখা, বিশেষ করে পরিচালনা শাখার মধ্যে ফিল্ম সেন্স বিষয়ে মনোভাব অনেকাংশে ভিন্ন। অভিনয় শাখা যেখানে ফিল্ম বলতে বোঝেন রাজকাপুর, ত্রিশ দিশী বা বড়জোর হৃষিকেশ মুখার্জি পরিচালনা শাখা সেখানে বোঝেন সত্যজিৎ রায়, ডিসকোভিড, ডিসিকাদের ছবি। এ প্রসঙ্গে একটা কথা বলে রাখা ভাল যে, চলচ্চিত্রকে এই ইনস্টিটিউট কখনো কোন শ্রেণীগত দিক দিয়ে বিচার করেন না। ঋত্বিক ঘটক বার বার বলেছেন যে প্রতিবাদ করা শিল্পীর ধর্ম, সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের পক্ষে কথা বলা শিল্পীর দায়িত্ব। এবং যখনই মানুষের কথা আসে তার সঙ্গে সঙ্গে চলে আসে রাজনীতি, কেননা রাজনীতি জীবনের বাইরে নয়। ঋত্বিকের এই মন্তব্য, এই বিশ্বাস তাঁর এক সময়ের পরিচালিত শিক্ষায়তনের মধ্যে একেবারেই নেই। চলচ্চিত্রকে তাঁরা দু ভাগে বিচার করেন। কমার্শিয়াল ও আর্ট ফিল্ম। এই আর্ট ফিল্মও দু প্রকারের। কোন কম্প্রোমাইজ না করে একেবারে নিজের মত করে এক্সপেরিমেন্ট অন্য দিকে দর্শকের কথা ভেবে এবং শৈল্পিক চেতনা রেখে ছবি নির্মাণ।

এ নিয়ে গোলমাল বাধে ডিপ্লোমা ফিল্ম নির্মাণের সময়। অভিনয় শাখা চান তাঁদের পছন্দমত ছবি করতে, যাতে তাঁরা ভবিষ্যতে বোম্বাই বা মাদ্রাজের বাজার দখল করতে পারেন। অন্য দিকে পরিচালন শাখা চান তাঁদের রুচিমত ছবি। তারা জানেন বাইরে ছবি করতে গেলে এ রকম স্বাধীনতা থাকবে না। তাই এখানে তাদের ইচ্ছেমত এক্সপেরিমেন্ট করতে চান। এবং তাদের ছবির জন্য যাদের প্রয়োজন মনে করেন সেই সব ছাত্রছাত্রীদেরই ডাকেন। অনেক সময় ক্যামেরাম্যান, এডিটর ইত্যাদি নেওয়ার স্বাধীনতা পরিচালকদের থাকে। ফলে অনেক ছাত্রছাত্রী যেমন একাধিক ছবিতে কাজ করার সুযোগ পান, অনেকে তেমনি একেবারেই পান না। তাদের জন্য ইনস্টিটিউট থেকে শুরু হয় আলাদা ফিল্ম। এ নিয়ে বেশ একটা মজার ঘটনা ঘটেছিল। একবার ইনস্টিটিউট পরিকল্পনা নেন, যারা কাজের সুযোগ পান নি, তাদের নিয়ে একটা ছবি হবে। শুরু হল 'পিয়া কা ঘর।' এক ঘন্টার এই ছবিটির পরিচালক হলেন চারজন সিনিয়র ছাত্র। ছবিটিকে চার ভাগ করে এক এক অংশের দায়িত্ব এক-একজন পরিচালকের ওপর দেওয়া হল। তাঁরাও নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গীমত শিল্পীদের নির্দেশ দিলেন। এবং সেই নির্দেশনা হল চারজনের চার রকম। ফলে শিল্পীরা পড়লেন সমস্যায়। কিন্তু পরের বছর এক সঙ্গে অনেকের ওপর দায়িত্ব না দিয়ে একজনই দায়িত্ব নিলেন। তিনি পরিচালন বিভাগীয় শিক্ষক ধীরেশ ঘোষ। সমরেশ বসুর 'ছেঁড়া তমসুক' নিয়ে ধীরেশ ঘোষ করলেন 'বিজলী'। এক ঘন্টার এই ছবিটি এক অসাধারণ সৃষ্টি। কি সুকৌশলে তার যোজনা। এর চিত্রগ্রহণ, সম্পাদনা, চিত্রকল্পের ব্যবহার, শব্দ অভিনয় সর্বোপরি পরিচালনার মুন্সীয়ানা—সব মিলিয়ে ছবিটিকে এক বিশেষ মর্যাদা দেয়। আপনারা যাঁরা বাংলা 'ছেঁড়া তমসুক' দেখেছেন তাঁরা পারলে 'বিজলী'ও দেখুন। দুটো ছবি পাশাপাশি রাখলে বুঝতে পারবেন চিত্রনাট্য ও পরিচালনা ব্যাপারটা কি।

এখানেই ফিল্ম ইনস্টিটিউটের সার্থকতা। এই ইনস্টিটিউটের অনেক সমস্যা আছে, আভ্যন্তরীণ গোলমাল আছে, আছে ছাত্রছাত্রীদের বিক্ষোভ। তবু এ সবের মধ্যেও এই ইনস্টিটিউট [illegible] কিছু ছবি দিয়েছে [illegible] তাঁরাই বার [illegible] যেতে পারে। [illegible] দুর্বল ছবি যে নেই, তা নয়। সে [illegible] সব জায়গাতেই থাকে। আমাদের এই কলকাতায় প্রতি বছর যে ২০।৩০টি ছবি হয়, তার মধ্যে প্রকৃত ছবি [illegible] কি আড়াইটে। [illegible] ফিল্ম ইনস্টিটিউট অনেক বেশী উন্নত। [illegible] এর ছাত্রছাত্রীরা আজও অপি ঐ ইনস্টি-

ইনস্টিটিউটে [illegible]

টিউটে কোন পূর্ণ দৈর্ঘ্যের ছবি করেন নি। অভিনয় শাখার জন্য বাইরের পরিচালক দিয়ে দুটো কমার্শিয়াল ফিল্ম ছাড়া যা করেছেন সবই শর্ট ফিল্ম। ডিপ্লোমা কোর্সে সম্ভবত পূর্ণ দৈর্ঘ্যের ছবি করার কোন নিয়ম নেই। ইনস্টিটিউট প্রথম ছবি নির্মাণ করেন ১৯৬৩ কি ৬৪তে। শিক্ষক ও সিনিয়র ছাত্রদের মিলিত প্রচেষ্টায় 'ওয়ান ডে' নামে ২০ মিনিটের একটি শর্ট ফিল্ম তৈরী হয়, যা সানফ্রান্সিসকো ফিল্ম ফেস্টিভ্যালে গোল্ডেন গেট অ্যাওয়ার্ড লাভ করেছিল।

...-শুরু থেকে ৭৬ এই পনের বছরে ইনস্টিটিউট অনেক দক্ষ পরিচালক উপহার দিয়েছেন। এঁদের মধ্যে বাঁদের নাম মনে আসছে তাঁরা কুমার সাহনী, মণি কাউল, এম. এস. সথ্যু, সুনীল ঘোষ, গিরিজেশ ঘোষ, ডি কোত্তয়াম, মাঙ্কাড়, জোনবেরী, সুভাষ ঘাই, এস চোধুরী এবং এ রকম আরো অনেকেই আছেন, যাঁরা চলচ্চিত্র নির্মাণে ডিপ্লোমা কোর্সে কুশলতার পরিচয় রেখেছেন। এস চৌধুরীর 'মিলাপ' ছবিটি শর্ট ফিল্ম হিসেবে ১৯৭২-এ তেহেরান ফিল্ম ফেস্টিভালে গ্রাঁ প্রি পেয়েছিল। কিন্তু দুঃখের বিষয় আমরা সিনেমার দর্শকেরা এঁদের প্রায় কারুর কাজের সঙ্গে পরিচিত নই। সুনীল ঘোষ বা সুভাষ ঘাই (যিনি 'কালীচরণ' পরিচালনা করেছেন) কেও হয়ত অনেকেই চেনেন। কিন্তু এঁদের ছবিতে কি ইনস্টিটিউটলব্ধ শিক্ষার কিছুমাত্র ছায়া থাকে? অন্যদিকে কুমার সাহানী, মণি কাউলরা এক এক সময় প্রযোজনায় ছবি করেছেন। কিন্তু তা এখনও সাধারণ দর্শকের কাছে পৌঁছয় নি। এঁরা প্রচলিত ফিল্ম ফর্ম ভেঙে যে ফর্ম এনেছেন, তা সত্যিই আশ্চর্যের। এঁদের সাহস অধ্যবসায় এখনো ব্যবসায়িক ছবির সঙ্গে কোম্প্রোমাইজ করতে দেয় নি। এই মন্তব্য এ কারণে যে বোম্বাইতে ইনস্টিটিউটের ডিপ্লোমাধারী কয়েকজন পরিচালক কাজ করছেন যাঁরা ইনস্টিটিউটে থাকাকালীন বোম্বে ছবির বাপান্ত করতেন, অথচ এখন বড় ব্যানারে হুল্লোড়ী ছবি করতে তাঁদের আটকায় না। না, ওঁদের দোষ দেওয়ার কিছু নেই। তবু তো ওঁরা টিঁকে আছেন। এই কয়েকজন ছাড়া বেশীর ভাগ ছাত্র যাঁরা সুযোগ পেলে ভারতীয় চলচ্চিত্রকে আঁতুড় ঘর থেকে বের করতে পারতেন, তাঁরা আজ পেটের জন্য ফিল্ম ডিভিশানে, টেলিভিশানে তাঁদের সেই ক্ষমতা নষ্ট করছেন। এ ছাড়া উপায় কি? বাঁচতে হবে তো। শুধু পরিচালনা শাখাই নয়, সম্পাদনা, চিত্রগ্রহণ, শব্দ সংযোজন বিভাগগুলোরও এই একই অবস্থা। গুরুহা, অজয়জিৎ, ধ্রুবজ্যোতি বসু, কমল নায়েক, কল্যাণ রায়, আর এস চৌহান, হেমন্ত বসু ('উসকী রোটি'র সম্পাদক ও 'মাটির মনিষে'র সহকারী পরিচালক), অর্ধেন্দু বসু, বিজয় সিংহ, অমর আচার্য, রাজচন্দন, পারভেজেরা

বোম্বাই, কলকাতা, মাদ্রাজ সর্বত্র কাজের খোঁজে ঘুরে বেড়াচ্ছেন। ওঁরা এক বিরাট আশা নিয়ে ইনস্টিটিউটে গিয়েছিলেন, বেরিয়েছিলেন প্রচুর সম্ভাবনা নিয়ে। তবুও কাজের সুযোগ পাচ্ছেন না (একমাত্র কে কে মহাজন, ধ্রুবজ্যোতিরা যা হোক সামান্য কিছু করছেন)।

অবশ্য কলকাতার তুলনায় বোম্বাই ও মাদ্রাজের ছাত্ররা মোটামুটি সুযোগ পেয়েছেন। কেননা কলকাতার চেয়ে সেখানকার ফিল্ম ইণ্ডাস্ট্রি অনেক বড়। তাছাড়া বোম্বে চায় কাজ, কলকাতা চায় মোসাহেবী। নায়েকের 'সৈনিক' ও ধ্রুবজ্যোতির 'বিলেত ফেরৎ' দেখে মনে হয়েছে কলকাতার পেশাদারী ক্যামেরামানদের চেয়ে ইনস্টিটিউটের ছাত্ররা অনেক বেশী দক্ষ। কল্যাণ রায় বা হেমন্ত বসুরা সম্পাদক বা পরিচালক হিসেবে যোগ্যতা প্রমাণের ক্ষমতা রাখেন। তবু এঁদের দিয়ে কাজ করান হয় না। প্রথম প্রথম এক বাজে গুজব ছড়ান হত যে, এঁরা শুধুই থিয়োরী জানেন, প্রাকটিক্যাল কাজের কোন অভিজ্ঞতা নেই। আসলে স্টুডিওগুলোতে সেই আদিকাল থেকে যে সমস্ত মৌচাক গড়ে উঠেছে, তা যাতে না ভাঙে তার জন্য ইনস্টিটিউটের ছেলেদের প্রায় একঘরে করে রাখা হয়েছে। এখানে যে সব পরিচালক ও কলাকুশলীরা কাজ করেন, তাঁরা এক বিশেষ থিয়োরীতে বিশ্বাসী। তার বাইরে যে কিছু হতে পারে তা তাঁরা মানতে আগ্রহী নন। তিন আর তিন যোগ করলে ছয় হয়, কিন্তু চার আর দুই যোগ করলে যে সেই একই সংখ্যা থাকে তা তাঁদের মাথায় আসে না। এই ইণ্ডাস্ট্রিতে সত্যজিৎ রায়, মৃণাল সেন, ঋত্বিক ঘটক ছবি করেও এ বদলাতে পারেন নি। এখানে অনেকে চিত্রনাট্য না জেনেই পরিচালক, ফিল্টারের প্রয়োগ না জেনেই ক্যামেরাম্যান। পাছে এ সব ধরা পড়ে যায়, তাই যতটা সম্ভব ইনস্টিটিউটের ছাত্রদের ইণ্ডাস্ট্রিতে ঢুকতে না দেওয়ার চেষ্টা চলে। এ তো গেল একটা দিক। অন্যদিকে যে সব ক্যামেরাম্যান, এডিটর বা সাউণ্ড-রেকর্ডিস্ট যাঁরা দীর্ঘকাল এই শিল্পের সঙ্গে যুক্ত, তাঁদের হটিয়ে নতুনদের নেওয়ার অসুবিধে থাকা স্বাভাবিক। দ্বিতীয়ত পুণা ফেরৎ কলাকুশলীগণ অনেকেই কম্প্রোমাইজ করতে পারেন না, এ্যাডজাস্টমেন্ট করতে পারেন না; অনেক সময় পরিচালকের কোন কাজে সমর্থন করাও ওঁদের পক্ষে সম্ভব হয় না। তার পর আছে ইণ্ডাস্ট্রি, তার ছবি ও কলাকুশলীদের সম্পর্কে তাঁদের ভাবনা-ধারণা। যা ইণ্ডাস্ট্রির সঙ্গে সম্পূর্ণ একাত্ম হতে সাহায্য করে না।

ইনস্টিটিউটের একমাত্র অভিনয় শাখাই শর্ট কোর্স অভিজ্ঞতা। কুন্দন কুমার সিনহা, নবীন নিশ্চল, জয়া ভাদুড়ী, শাওয়ান, রাকেশ পাণ্ডে, বিজয় অরোরা, রেহানা, রেখা, কল্যাণ চ্যাটার্জি, অমল চৌধুরী, অনেকেই এখন বাণিজ্যিক পর্দায় ঘুরে বেড়ান। কিন্তু দুঃখের বিষয় অভিনয়ে ওঁরা নতুন কিছু দিতে পারেন নি। সেই গতানুগতিক স্রোত-কল্পতে গা ভাসিয়েছেন মাত্র।

তাহলে এত টাকা ব্যয়ে এই ইনস্টিটিউট আমাদের দিলটা কি? শুধুমাত্র টেলিভিশান বা ফিল্ম ডিভিশানে নিয়ম মাফিক কাজ করার জন্যই কি ওঁরা এত বছর পরিশ্রম করেছেন?

আপাত দৃষ্টিতে বিচার করলে এই ইনস্টিটিউটের কোন প্রভাব ভারতীয় ফিল্মে প্রতিভাত হয় নি। কিন্তু প্রত্যক্ষ না হলেও পরোক্ষ একটা প্রভাব আছে বই কি। ইনস্টিটিউট নির্মিত ও পরিবেশিত ছবিগুলোর প্রভাবে আমরা অংকুর নিশান্ত, অনুভব, রজনী গন্ধা, পিয়া কা ঘর, ছোটিসি বাত, দস্তক, চেতনা, আনন্দ প্রভৃতি অনেক ছবি পেয়েছি।

অথচ এসব ছবির কোনটিই ইনস্টিটিউটের ছাত্রদের পরিচালিত নয়। পেশাদারী প্রযোজকেরা ওঁদের দায়িত্ব দিতে চান না, যেহেতু তাঁরা কোন রকম ঝুঁকির মধ্যে নেই। চলচ্চিত্র নিয়ে কোন নিরীক্ষার তাঁরা বিন্দুমাত্র উৎসাহী নন, একমাত্র উৎসাহ লাভের অংক বুঝতে।

সরকারেরই এ ব্যাপারে আন্তরিকভাবে এগিয়ে আসা প্রয়োজন। যেহেতু এই ইনস্টিটিউট সরকার কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত, এবং যেহেতু এক মহান সম্ভাবনা নিয়ে এই ইনস্টিটিউট স্থাপিত হয়েছিল, সেজন্য আজ ১৬ বছর পরে তার কাজের পর্যালোচনা হওয়া প্রয়োজন। বছরে ১৫।২০ লক্ষ টাকা ব্যয় করে এই ইনস্টিটিউট কি শুধু ফিল্ম ডিভিশানগুলোতে কলাকুশলী সাপ্লায়ার হয়ে থাকবে না চলচ্চিত্রের নতুন দিক নির্ণয়ে সাহায্য করবে? তাই সরকারের উচিত ছাত্রছাত্রীদের ডিপ্লোমা ছবির গুণাগুণ বিচার করে তাঁদের স্বাধীনভাবে ছবি করার সুযোগ করে দেওয়া এবং সেই ছবি সাধারণ দর্শকদের দেখানোর ব্যবস্থা করা। কেননা ইনস্টিটিউটের ছাত্রদের দৃঢ় বিশ্বাস একটা ছবি করার সুযোগ পেলে ওঁদের যোগ্যতা প্রতিষ্ঠিত করতে পারবেনই। ওঁরা শুধু চান কাজ করার সম্পূর্ণ স্বাধীনতা। আমরা ছাত্রদের এই বিশ্বাসের সঙ্গে ঐকমত্য পোষণ করতে বলছি না। আমরা শুধু ওঁদের যোগ্যতা যাচাই করতে বলছি। সেটুকু সুযোগ ওঁদের দিতেই হবে। সরকারের এখন প্রধান দায়িত্ব ওঁদের সৃজনমূলক কাজে প্রত্যক্ষ সহযোগিতা করা। তা না হলে ইনস্টিটিউটের সার্থকতা সম্বন্ধে যেমন প্রশ্ন আসবে, তেমনি ইনস্টিটিউটের মূল উদ্দেশ্যও ব্যর্থ হবে। এবং ভারতীয় চলচ্চিত্র হয়ত বা এক বিরাট বিবর্তনের সুযোগ হারাবে।

শীতাংশুর ভয় নেই

প্রলয় শূর

রাজভবনের মাথার ওপর তখনো রয়েছে চাঁদ।

ভোরের কোলকাতা। বাসের ভেতর সব কটা আলো জ্বলছে। হাওড়ার দিকে ছুটে যাওয়া পাঁচ নম্বর বাসের দোতলায় একা বসে আছে শীতাংশু। ছটা দশে ইস্পাত এক্সপ্রেস। গতকাল সারা রাত্তিরে ঘুম না হওয়া মানুষটাকে দিনের প্রথম বাসে উঠে পড়তে হয়েছে। দুধের গুমটিতে ঝটাং ঝটাং শব্দ করে দুধ ভর্তি বোতল নামছে, খালি বোতল উঠে যাচ্ছে। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের দুগ্ধ সরবরাহ কেন্দ্রের ভ্যান চলে গেলে শীতাংশু বেরিয়ে পড়ে। গত-কাল রাত্তিরে ঘণ্টা খানেকের জন্যে ঘুম এসেছিল। এই সময়টা সে সারাক্ষণ স্বপ্ন দেখেছে। একটা লোক পার্কার পেনের একটা সোনার নিব দিয়ে তার গলা ফুটো করে রক্ত বার করে নিচ্ছে। একটা বাচ্চা মেয়ে ছুটে এসে নিবটা তার দাঁতে কামড়ে নিয়ে চলে যায়। মেয়েটি চলে যাবার সঙ্গে সঙ্গে আদি গঙ্গার পাড় থেকে একটা শকুন তার দিকে ছুটে আসে। শীতাংশু পালাতে থাকে। আলিপুরে রেসগ্রাউন্ডের ফুলকপির বাগানের পাশে ছুটতে ছুটতে এসে পৌঁছয়। মেয়েটি দাঁড়িয়ে আছে। শীতাংশু তার সামনে এসে দাঁড়ায়। মেয়েটির একটাও দাঁত নেই, সব কটা দাঁত সোনার নিব হয়ে তার মুখের মধ্যে জ্বলছে।

সাবওয়ের সিঁড়ি ভেঙে উঠে যায় শীতাংশু। এই সময় সাবওয়েতে খুব অল্প লোক। একজন বিবাহিতা মহিলা খবরের কাগজ হাতে এগিয়ে আসে। শীতাংশু কেনে না। বারো নম্বর প্ল্যাটফর্মে একা এগিয়ে আসে। এতবড় স্টেশনে একটা সিগারেট ধরাবার কাঠি সে কোথাও খুঁজে পায় না। সিগারেটটা প্যাকেটে ঢুকিয়ে রেখে দেয়। সহকর্মীদের কারো সঙ্গে এখন দেখা হোক সে চায় না। আজ বেশ ফাঁকা ট্রেনে জায়গা পেয়ে বসে পড়ে শীতাংশু।

আজ থেকে ঠিক দুবছর আগে একদিন সন্ধ্যেবেলা স্টীল এক্সপ্রেসে সে তার প্রথম চাকরিতে জয়েন করতে যাচ্ছে। সাত আটদিন

তার চেঁশে থেকে আমার কথা, অন্ধকার ঘর-বাড়ী এক স্টেশনে সেদিন সে নেমেছিল রাত্রির আটটায়। তার নিজের হাতে ঘড়ি ছিল না। যে লোকটার সঙ্গে ট্রেনে আলাপ হয়েছিল সেই সুধীরবাবু টর্চ জেলে ঘড়ি দেখেছিলেন। সুধীরবাবু বলেছিলেন, 'এত রাতে হোটেল টোটেল তো সব বন্ধ। চলুন, আমার বাড়িতেই রাতটা কোনোরকমে কাটিয়ে দেবেন।' সদ্য পরিচিত হওয়া লোকটার বাড়িতে রাতটা কাটানো ঠিক হবে কিনা ভাবার, কোনো অবসর পায়নি শীতাংশু। তার চারপাশে তখন দিগবিদিক অন্ধকার। বৃষ্টিটা ধরে এসেছে। তখনও টিপটিপ জলের শব্দ হোচ্ছে। 'প্ল্যাটফর্ম' ছেড়ে তারা বেরিয়ে আসে। একটা রিক্সা কোথাও নেই। কোথাও কোনো আলো নেই। সুধীরবাবু টর্চের আলো ফেলে ফেলে শীতাংশুকে পথ দেখায়। মিনিট দশেক হাঁটার পর তারা একটা সাইকেলের দোকানের সামনে এসে পৌঁছয়। তিন চারটি লোক মাটির ভাঁড়ে করে কি খাচ্ছে যেন। সুধীরবাবু তাদের মধ্যে একজনকে ডেকে বলেন, 'বঙ্কিম, একটু কষ্ট করতে হবে ভায়া।'

'একটু ঘিরোচ্ছিলাম বাবু।'

'অনেক ঘিরিয়েছিস, এখন আমাদের একটু পৌঁছে দিবি চল্।'

একটা লোক সুধীরবাবুর দিকে একটা ভাঁড় এগিয়ে দেয়, সুধীরবাবু এক চুমুকে সেটা শেষ করে দেন। তারপর তারা বঙ্কিমের রিক্সায় ওঠে। সুধীরবাবু বঙ্কিমের মুখে টর্চের আলো জ্বালিয়ে তার মুখটা শীতাংশুকে দেখান। 'একে দেখে রাখুন। বঙ্কিম গড়াঁড়িয়া।'

রিক্সা চলতে থাকে অন্ধকারে। টিমটিম করে যে বাতিটা জ্বলছে তাতে কিছু দেখা যায় না। সুধীরবাবু মাঝে মধ্যে টর্চ জ্বালিয়ে পথ দেখাচ্ছেন। 'শালা, একে কানা, তায় রাতকানা, কিন্তু পথ ভুল হয়না দেখেছেন। শীতাংশু কি করে জানবে এই পথ ঠিক না ভুল। এই প্রথম সে এত অন্ধকার দেখছে। এখন সে বুঝতে পারছে কোলকাতার লোড্-শেডিং-কে অন্ধকার বলে না। কিন্তু এ কি, রিক্সা চলেছে তো চলেইছে, রাস্তা তো আর শেষ হয় না। এতক্ষণে শীতাংশু কথা বলে, 'আর কদ্দুর সুধীরবাবু?'

'এই তো এসে গেছি। আর মিনিট দশেক'

'আরো দশের মিনিট!'

'এ কি আপনার কোলকাতা মশাই!'

'রাস্তায় আলো থাকে না?'

'থাকে। নিবে থাকে।'

শীতাংশুর বাড়ির কথা মনে পড়ে। মা বাবা, ছোটোবোন কেবু। আর সারাদিন ওদের খুব মন খারাপ। শীতু, জলটা ফুটিয়ে খাস্। পৌঁছে একটা টেলিগ্রাম করে দিস্। ট্রেন থেকে হুড়মুড় করে নামিস না। স্যান্ডেল পরে ঘুরিস না, ওখানে ভীষণ সাপ আছে। কিছু টাকা ব্যাগ থেকে নিয়ে ভেতরের পকেটে রেখে দে। ঠাকুরের ফটোটা সুটকেসের মধ্যে আছে, রোজ প্রণাম করে নিস্। রোজ চিঠি লিখবি। কলারি টানাতে পারবি তো?' আবার যদি বাথা ওঠে অ্যারালগন-টা গোটাই খেয়ে নিস। কুয়ো থেকে জল তোলার সময় সাবধানে তুলিস, বেশি ঝুঁকিস না। ট্রেনে দরজার কাছে দাঁড়াস না।

ধীরে ধীরে টিকিয়াপাড়া, দাশনগর, রামরাজাতলা, সাঁতরাগাছি পার হোয়ে ট্রেনের গতি বাড়তে থাকে।

শীতাংশুবাবু, এই আমার মেয়ে বিজু।'

এই প্রথম হ্যারিকেনের আলোতে একটা মেয়ের মুখ দেখছে শীতাংশু। দুজন দুজনকে দেখে। মেয়েটির স্বভাবতঃ এ সময় মুখ নামিয়ে নেবার কথা। কিন্তু সে চেয়ে থাকে। শীতাংশুই মুখ নামিয়ে নেয়। মেয়েটি ভেতরে চলে যায়। শীতাংশু এদিক ওদিক চেয়ে দেখে। ঘরে একটা খাট ছাড়া কিছু নেই। এ ঘরটা বোধহয় এমনিই পড়ে থাকে। সুধীরবাবুর অবস্থা বিশেষ ভালো মনে হয় না। বিজু তার বাবা আর অতিথিকে খেতে দেয়। পাউরুটি আর দুধ। বিজু ভিতরের ঘরে স্টোভ জ্বালিয়ে দুধ গরম করছে, বাইরের এই ঘর থেকে স্টোভ নেবানোর পর শীতাংশু গন্ধ পেয়েছিল। এত রাতে মেয়েটিকে কষ্ট দিয়ে বড় খারাপ লাগছিল তার।

বিজু এসে বিছানা পেতে দেয়। তার মাথার কাছে হ্যারিকেনটা নিবিয়ে দিয়ে, বালিশের পাশে টর্চটা রেখে দেয়। বিজু চলে যায়। সে দরজার খিল আটকে শুয়ে পড়ে। ঘুম আসে না। আর এক গ্লাস জল খেতে পারলে ভালো হোতো। কিন্তু এখন আবার দরজা খুলে জল চাওয়া ঠিক হবেনা। অকারণে টর্চটা জ্বালিয়ে সে দেয়ালগুলো দেখতে থাকে। আলোটা গিয়ে পড়ে একটা মাটির গণেশ মূর্তির ওপর। এই ঘরে এখন এই গণেশ আর শীতাংশু ছাড়া আর কেউ নেই। গণেশ মূর্তির সামনে একটা কাঁসার গেলাস। গেলাসটা দেখে শীতাংশুর পিপাসা বেড়ে যায়। সে বিছানা ছেড়ে উঠে পড়ে। গেলাসটা ভর্তি জল। জলটা ঢকঢক করে খেয়ে প্লাস্টিকের ঢাকনা দিয়ে আবার গ্লাসটা ঢেকে রাখে।

কে তুমি, কেন এলে? কে তোমাকে ভালোবাসে বিজু কেউ তোমাকে ভালোবাসে না। তুমি এতদিন অপেক্ষা করে ছিলে আমারই জন্যে। এখন আমি তো পৌঁছে গেছি তোমার কাছে। আর তোমার কোনো দুঃখ থাকবে না। আমি তোমাকে খুব ভালোবাসবো, যেমন ভালোবাসা এর আগে আর কোনো মেয়ে কখনো পায়নি। তোমার বিশ্বাস হোচ্ছে না? ভাবছো তোমার সঙ্গে তো এখনো একটা কথাও হয়নি আমার। প্রথম দর্শনে প্রেম, ওসব শুধু গল্প উপন্যাসে পড়া যায়। জীবনে কোথাও কখনো ওসব ঘটেনা। কি কথা তুমি বলবে? আমিই বা কি বলবো বলো? প্রথম দর্শনে প্রেম, তোমার আমার শেষ দর্শনের দিনও ঠিক এমনি থাকবে প্রেম। তুমি তো চেয়েইছিলে। চেয়ে চেয়ে কি দেখছিলে তুমি? যা তুমি চেয়েছিলে তাই তোমাকে দেবো বিজু। চাও, তুমি শুধু চাও। আমি তো দিতেই এসেছি আজ। এমন কখনো কি শুনেছো? আজও বিকেলে কোলকাতার আকাশ ঠিক তেমনিই ছিল, যেমন বিকেল আমি বহুকাল ধরে চিনি। আর সন্ধ্যেবেলা যখন কোলকাতার আকাশকে বিদায় জানিয়ে চলে আসছি, তখনো তো জানি না আজ মধ্যরাতে গণেশের মূর্তির সামনে একলা ঘরে আমাকে রেখে তুমি চলে যাবে ভেতরের ঘরটায়। তোমার ওই ঘর আর আমার এই ঘর, সমুদ্রের এপার ওপারে রাখে আমাদের। এরকম থাকবে না বিজু। যেমন তুমি আছো তেমন থাকবে না দেখো। সব সব বদলে যাবে একদিন। কেন এই ভালোবাসার কথা বলছি জানো, এর আগে এমন করে আর কোনো মেয়েকে আমি কখনো দেখিনি। আমার যা কিছু আছে সব তোমাকে দিলাম, এই কথা বলেই আমার মনে পড়ে কিছুই তো আমার নেই বিজু, তবু আমি তো আছি। তোমাকে আমার চাই, আমাকেও যে তোমার চিরকালের জন্যে চাই। তুমি ভাবছো, কাল দিনের আলোয় এসব স্বপ্নের মতো মনে হবে, না, তা হবে না, দিনের আলোয় তোমাকে ভুলবো না, তুমিও কি ভুলতে পারবে?

পরদিনই শীতাংশু একটা হোটেলে চলে আসে, তার বেডিং সুটকেস সব সুধীরবাবু তুলে দেন বঙ্কিমের রিক্সায়। বিকেল চারটে তখন। বেশ রোদ ছিল, চারপাশের সবুজের ওপর ঝিলমিল করছিল বিকেলের আলো। ইতস্তত ছোট ছোট মাটির বাড়ি, ধানক্ষেত। ভারী সুন্দর এই জায়গাটা, কিন্তু শহর থেকে বিচ্ছিন্ন এই অঞ্চল। দরজার গোড়ায় দাঁড়িয়েছিল বিজু। কাল রাত থেকে আজ এই বিকেল পর্যন্ত একটি কথাও বিজু তার সঙ্গে বলেনি। রিক্সায় বসে ছিল শীতাংশু। হঠাৎ বিজু ভিতরে গিয়ে দ্রুত ফিরে আসে। ফিরে এসে শীতাংশুর হাতে তার কলমটা দিয়ে দেয়। সুধীরবাবুই কথা বলেন, 'আর কিছু পড়ে টড়ে নেই তো?' মেয়েটি মাথা নেড়ে জানায় আর কিছু পড়ে নেই। কিছু একটা কথা বলতে শীতাংশুর ইচ্ছে করে। বলা হয় না। সুধীরবাবু আবার বলেন 'আমি কালই হোটেলে গিয়ে দেখা করব।' শীতাংশু ছোট করে বলে, 'আচ্ছা।'

এমন তো নয় যে বিজু বোবা। তাহোলে? কাল রাত থেকে আজ বিকেলের মধ্যে অনেকবার তো সুযোগ পেয়েছিল সেকথা বলার। তবে? বলল না কেন? হয়তো যা বলার কাল রাতে প্রথম দর্শনেই সে বলে দিয়েছে। তাহোক। একবার তো বলতে পারতো, 'আবার আসবেন।' শীতাংশুকে দেখে কি তার পছন্দ হয়নি? না হওয়ার তো কথা নয়। শীতাংশুর চেহারা তো সুন্দর। সে তো এমন কিছু বলেনি যাতে বিজুর কোনো অভিমান হোতে পারে।

তারপর শুরু হয় তার চাকরি।

শীতাংশুর প্রথম চাকরি। কোলকাতা থেকে দূরে একটা অপরিচিত মহকুমা শহরে তার দিন কাটতে থাকে। ইস্টিশন, পোস্টাপিস, হোটেল, দু'-একটি দোতলা বাংলো, বালিকা বিদ্যালয়, বাজার, কোর্ট, ট্রেজারীতে ... দোকান, ...

[illegible]ালের বন, কামরাঙ্গার কল, আমের বাগান, কাজু বাদামের জঙ্গল—এইসবের চারপাশে তার জিপ মোটরগাড়ি কেটে যায়। দেখতে দেখতে পুজোর ছুটি শেষ হোয়ে যায়, বছর শেষ হোয়ে আসে, শীত পড়ে, বড্ড শীত এখানে। পাতা ঝরার দিন এগিয়ে এলো। ইতিমধ্যে দু চারজন বন্ধুবান্ধব হোয়েছে শীতাংশুর। তারা ওর হোটেলে আসে। একসঙ্গে কিছুদূর হাঁটে। বি ডি ওর কোয়া-টার্সের সামনে খোলা মাঠটাতে এসে বসে। মরমর করে পাতার শব্দ হয়। একজন পাতা-গুলো সব এক জায়গায় পা দিয়ে দিয়ে জড়ো করে। পকেট থেকে লাইটার বার করে পাতায় আগুন ধরিয়ে দেয়। দাউ দাউ আগুন ছড়িয়ে পড়ে। ভারী সুন্দর লাগে দেখতে। এস. ডি, ওর বিরাট বাংলোর মুখোমুখি হাসপাতাল। তারই ধার ঘেঁষে শুকনো পাতা ঝরে পড়ে, তারা সেখানে পাতার স্তূপে আগুন ধরিয়ে বাড়ি ফেরার পথে বারবার পেছন ফিরে দেখে, ভারী ভালো লাগে তাদের। সমস্ত দিনটা বামনের মতো পিঠের ওপর চেপে বসে থাকে। সন্ধ্যে হোলে যে যার মুখ দেখার জন্যে এক জায়গায় জড়ো হয়। হাসি ঠাট্টা গল্প গুজবে পৌনে নটা বাজে, যে যার বাড়ি ফিরে যায়। শীতাংশু ফিরে আসে হোটেলে। খেয়ে দেয়ে তার ঘরে উঠে আসে তিনতলায়। দোতলায় ব্যাঙ্কের লোকরা তাস খেলার ফাঁকে ফাঁকে প্রচন্ড জোরে জোরে হেসে ওঠে। দরজা আটকে সবুজ ডিসটেম্পার করা ঘরের দেয়ালে টিউবটা নিবিয়ে দেয় শীতাংশু।

কতোদিন দেখিনি তোমাকে। বিজু তুমি কি করো সারাদিন? আমার কথা মনে পড়ে না? একবারও ইচ্ছে করে না ফোন নিয়ে যাও তোমার গণেশের মূর্তি রাখা ঘরে? এই যে এত বন্ধুবান্ধব তারা কতো জিজ্ঞেস করে, 'কোলকাতায় কেউ তোমার জন্যে অপেক্ষা করে না শীতাংশু?' ভাবটা এমন, যতো প্রেম যতো ভালোবাসা সব কোলকাতায়। এরা কেউ জানে না বহুদূর থেকে আসা এক পুরুষের সামনে হারিকেনের আলোয় একটা মেয়ের মুখ কী আশ্চর্য সুন্দর হোয়ে উঠতে পারে। কি পড়ো তুমি? তুমি কি গান গাও? এত দূরে থাকো কেন? এখানে তো সবাইকে রাস্তায় ঘাটে দোকান-পাটে সর্বত্র দেখতে পাই। কই তোমাকে তো কখনো দেখি না। তোমার কোনো বন্ধু নেই? তুমি সিনেমা দেখো না? তুমি বাজারে আসো না?

ইষ্টিশনের ওভারব্রিজে দাঁড়াও না কখনো? টীকা নাওনা? কেউ কি চেনে না তোমাকে? এই মহকুমা শহরটার তুমিই যে সবচেয়ে সুন্দরী কেউ একথা জানে না।

লেভেলক্রসিংতে গাড়িটা অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকে। গাড়ির চাকায় কোথায় আগুন লেগেছে। অনেক সময় লাগবে। যে যার গাড়ি থেকে নেমে পড়ে। বেশ লম্বা ইষ্টিশন। চমৎকার ঘাসের জমি। রাতের শিশির ভেজা ঘাসের ওপর বসে পড়ে শীতাংশু। গতকাল রাত্রে স্বপ্নের মধ্যে দেখা মেয়েটার মুখটা মনে পড়ে। মেয়েটার প্রত্যেকটা দাঁত এক একটা মোক্তার দিব। ভোর রাতে স্বপ্ন দেখে শীতাংশু। 'কিন্তু কাল রাতে যে মুখটা সে দেখেছে সেটা কার মুখ? সে তো কখনো তার বাড়ি যায় নি। তাহোলে? মেয়েটা কে?

একদিন সন্ধ্যার মুখে সে রিকসায় উঠে বসে। সুধীরবাবু যেখানে থাকেন সেই অঞ্চলটার নাম করতেই রিক্সাওলা যেন একটু অবাক হয়ে যায়। অবাক হোচ্ছো কেন, ওখানে কেউ যায় না নাকি?

'না বাবু, যাবে না কেন, এমননিই বল-ছিলাম। অনেক দূর তো।'

তারপর রিক্সাওলা জায়গাটা সম্পর্কে বিস্তৃত পরিচয় দেয়, শীতাংশু শুনে যায়। একটা সময় সুধীরবাবুর বাড়ির কাছে পৌঁছে সে ভাড়া দিতে গেলে রিক্সাওয়ালা বলে, এখন ফিরবেন না বাবু? শীতাংশু বলে ফিরব কিন্তু দেরী হবে। রিকসাওয়ালা তাকে সাবধান করে দেয় ফেরার পথে রিকসা পাবেন না বাবু। শীতাংশু ভাড়া মিটিয়ে দেয়। কড়া নাড়ে। দরজা খুলে যায়। বিজু। কোনো কথা বলে না। শীতাংশু নিজেই জিজ্ঞেস করে, 'আসবো?' সে মাথা নেড়ে জানায়, আসুন। আজ ভেতরের ঘরে। একটা চেয়ার টেনে দেয়। শীতাংশু বসে।

'সুধীরবাবু নেই?'

'না।'

'কখন ফিরবেন?'

'জানি না।'

'এক গ্লাস জল খাওয়াবে?'

'আনছি।'

বিজু জল নিয়ে আসে। কিন্তু সামনের ঘর থেকে। গ্লাসটা হাতে নিয়েই সে বুঝতে পারল এই সেই গ্লাস, গণেশের মূর্তির সামনে রাখা গ্লাসটা। কারণ, গ্লাসটিকের ঢাকনাটা তখনো বিজুর হাতে।

'বিজু, তোমাকে কয়েকটা কথা বলব?'

'বলুন।'

'আমার সম্পর্কে তুমি কিছু জানো?'

'জানি।'

'কি করে জানলে?'

'বাবা বলেছে।'

'তুমি আমার সঙ্গে কথা বলো না কেন?'

'কথা বলার তো কোনো সুযোগ হয়নি।'

'যেদিন আমি প্রথম তোমাদের বাড়ি এসেছিলাম?'

'আমার ভয় করছিল।'

'কিসের ভয়?'

'আমি জানি না, আমাকে এত কথা জিজ্ঞেস করবেন না।'

'আজ দরজা খুলেই তুমি আমাকে চিনতে পেরেছিলে?'

'হ্যাঁ।'

'তার মানে তুমি আমাকে ভোলোনি?'

'না, ভুলিনি।'

'এর মধ্যে আমাকে দেখার কোনো ইচ্ছে হয়নি তোমার?'

'[illegible]। কিন্তু আমি চাইনি আপনি [illegible] আসুন।'

'[illegible]।'

'[illegible] তো এত 'কেন'র জবাব আমি দিতে পারবো না।'

'বিজু, আমি তোমাকে বিয়ে করতে চাই।'

'[illegible]।'

'তুমি কাউকে ভালোবাসো ?'

'না।'

'এটাই তোমার শেষ কথা ?'

'আর একটা কথা আছে, আপনি আর কখনো আমাদের বাড়ি আসবেন না।'

সেন্ট্রাল ইস্টিশন থেকে আবার ছাড়ে ইস্পাত এক্সপ্রেস।

সেদিন বিজু তাকে ওদের বাড়িতে আসতে নিষেধ করার সঙ্গে সঙ্গে চেয়ার ছেড়ে উঠে পড়েছিল শীতাংশু, তৎক্ষনি দড়াম করে বন্ধ দরজা ঠেলে ঘরে ঢুকেছিলেন সুধীরবাবু। সুধীরবাবু দাঁড়াতে পারছেন না, চোলাই মদ খেয়ে ঘরে ফিরেছেন। শীতাংশু বেরিয়ে আসার জন্যে দরজার গোড়ায় আসতেই সুধীরবাবু পেছন থেকে ডেকেছেন, 'আবার আসবেন শীতাংশুবাবু, গুডনাইট, আমার মেয়েটা বড় সুইট।' বহুদূর হেঁটে আসার পর সে রিকসা পেয়েছে। হোটেলে ফিরে যায় যায় শুধু মনে হয়েছে, কাল সকালে সুধীরবাবু যদি সবাইকে বলে দেয়। পরক্ষণেই তার মনে হয়েছে, দিক্। জানুক, সবাই জানুক বিজুকে না হলে তার চলবে না। কিন্তু সুধীরবাবু কাউকে বলেন না। একদিন এসে হোটেলে হাজির হন। একশোটা টাকা তাঁর দরকার, তিনদিন পরেই ফেরৎ দিয়ে দেবেন। দিয়েওছিলেন। তারপর আবার আসেন সুধীরবাবু। শ'দুয়েক টাকার বড় দরকার। সঙ্গে সঙ্গে দিয়ে দেয় শীতাংশু। কেন দেয় ? শীতাংশু ততোদিনে ভেবে নিয়েছে সুধীরবাবুকে যেমন করে হোক হাত করতে হবে, লোকটাকে বেঁধে ফেলতে হবে। সুধীরবাবু রোজ মদ খায়, মদ না খেয়ে লোকটা থাকতে পারে না, অথচ রোজগার খুব সামান্য। শুধু কন্টেসিন্টে অন্ন জোটার কথা। শ'পাঁচেক টাকা চাই। 'কলেজের কাছে একটা বিরাট পেপার মিল হয়েছে। একটা বড় অর্ডার পেয়েছি। কাজটা চুকে গেলে একসঙ্গে বেশ কিছু টাকা পাওয়া যাবে।' হয়তো সত্যি, হয়তো মিথ্যে। টাকাটা পেয়েও লাভ নেই, উড়ে যাবে শীতাংশু জানে। তবু সে এক কথায় পাঁচশো টাকা দিয়ে দেয়।

'সুধীরবাবু ঐ বাড়িটা আপনাকে ছাড়তে হবে।'

'খালি বাড়ি কোথাও নেই শীতাংশুবাবু।'

'আছে।'

'কোথায় ?'

'সিনেমা হলের কাছে।'

'সে-বাড়ির কথা আমিও জানি।'

'তাহলে?'

'বাড়িওয়ালা দেড় হাজার টাকা এ্যাডভান্স চেয়েছে।'

'আপনার নেই দেড় হাজার টাকা ?'

'একটা পয়সাও নেই শীতাংশুবাবু, কেউ বিশ্বাস করে না।'

'সব টাকা মদ খেয়ে উড়িয়ে দেন ?'

'শুধু মদ না ডাক্তারবাবু, মদ ছাড়াও খরচ আছে।'

'মেয়েছেলে ?'

'এখানে ওদের জন্যে খুব খরচ হয় না শীতাংশুবাবু।'

'তবে ?'

'আছে, আমার রোজগারও আছে, খরচও আছে।'

'ওই একটিই তো আপনার মেয়ে।'

সুধীরবাবু দুই হাতে তাঁর চোখমুখ ঢেকে ফেলেন। শীতাংশুও চুপচাপ নিঃশব্দে বসে থাকে দুজন। 'মেড্ ইন হাঙ্গেরি' ঘড়িটা শুধু টিক্-টিক্ শব্দ করে সময় পার করে দেয়।

'আমি আপনার দেড় হাজার টাকা দিলে আপনি বাড়িটা পাল্টাবেন ?'

'আপনি ? আপনি কেন অতো টাকা দিতে যাবেন ?'

'দেবো। আমার আছে। আপনি শোধ দিয়ে দেবেন।'

ঐ টাকা দেবার পর এক মাস সুধীরবাবুর সঙ্গে শীতাংশুর দেখা হয়নি। যেদিন দেখা হয়েছে, সেদিন সুধীরবাবু ভয়ে কুঁকড়ে গিয়ে বলেছেন, 'টাকাটা খরচ হয়ে গেছে শীতাংশুবাবু। কিন্তু মদ খেয়ে টাকাটা আমি ওড়াইনি। এমন একটা কাজে খরচ হয়েছে আপনাকে বলতে পারবো না।'

'কি এমন কাজে খরচ করেছেন যে আমাকে বলা যাবে না।'

'একদিন সব বলব।'

'আর আমি আপনাকে বিশ্বাস করি না। আর কোনদিন একটা পয়সাও আপনাকে দেবো না।'

'ঐ দেড় হাজার টাকা তো আমি আপনাকে দিতে বলিনি।' রাগে শীতাংশুর সমস্ত শরীর কাঁপতে থাকে।

'তবে টাকাটা পেয়ে বড় [illegible] শীতাংশুবাবু।' বড় [illegible] শোনায় সুধীরবাবুর গলা।

শীতাংশু ঠিক [illegible] না, ফিরে [illegible]।

তুমি [illegible] নিষেধ করেছিলে, তাই আমি যাইনি [illegible]। তোমার বাবাকে কতো টাকা দিয়েছি [illegible] তোমার জন্যে, তোমাকে পাবার জন্যেই দিয়েছি বিজু। আমাদেরও অবস্থা ভালো নয়। আমার বাবা খুব সামান্য চাকরি করেন। কোনোরকমে আমাদের দিন কাটে। একসঙ্গে তিন মাসের মাইনে পেয়েছিলাম। পুরো টাকাটাই তোমার বাবাকে দিয়েছিলাম তোমাদের বাড়ি বদলের জন্যে। তোমার বাবা আমার কাছে মিথ্যে কথা বলেছেন, আমি জানি। বাড়িতে মাকে বলেছি, মাইনে পাইনি। কোত্থেকে এই টাকা আমি এখন পাবো বলো তো? তুমি তো এসবের কোনো খোঁজই রাখো না, তোমার রাখারও কথা নয়। তুমি স্পষ্টই জানিয়ে দিয়েছিলে, আমাকে বিবাহ করা তোমার পক্ষে অসম্ভব। কিন্তু আমার চেয়ে ভালো ছেলে যে তুমি কখনো পাবে না, সে তো তুমি জানো না। আমার চেয়ে যোগ্য কোনো ছেলে যদি তোমাকে প্রতিশ্রুতি দিয়ে থাকে সে তোমাকে বিয়ে করবে, সে লোকটা তোমাকে প্রতারণা করছে। একদিন তোমাকে সে সর্বস্বান্ত করে চলে যাবে। বিজু এখনো সময় আছে, একবার দেখা দাও, একবার এসো। অসম্ভব এক দুরাশা আমাকে পেয়ে বসেছে বিজু। আমি চেয়েছিলাম তোমার ঐ অঞ্চল থেকে উঠে আসো। আমার কাছাকাছি থাকো সেজন্য নয়। কোনো সুস্থ মানুষ ওখানে থাকা উচিত নয়। তোমার বাবার মতো একটা অসুস্থ লোকই কেবল ওখানে থাকতে পারে। না কি অন্য কোনো কারণ আছে ? তোমাদের বাড়ির ঠিক কাছাকাছি তো কোনো বাড়ি দেখা গেল না। প্রথম দিন যে ছোট ছোট বাড়িগুলো দেখেছিলাম সেগুলো আসলে বেশ দূরে দূরে। তবু, তবু আমি চেয়েছিলাম তোমরা চলে আসো। তোমার বাবা আমাকে ঠকিয়েছেন সেটা এমন কিছু নয়। আমি শুধু ভাবি তুমি কেন কোনোদিন জানতেও চাইলে না, কে এই মানুষটা, হঠাৎ এক রাত্তির আলাপ হওয়া একটা মেয়েকে সে বিয়ে করার প্রস্তাব দিয়ে বসল। বহু বছরেও একজন মানুষ যতো ভালোবাসা দিতে পারে না, এক রাত্তিরে আমি সেই ভালোবাসা তোমাকে দিয়েছি[illegible] বিজু।

আর নয়। আমি জানি আবার সুধীরবাবু আমার কাছে আসবেন। আবার এসে হাত পাতবেন। এবং এতদিন যা করেন নি, এবার তাই করবেন, তোমার নাম করে টাকা চাইবেন। এবার তোমার নাম করে টাকা চাইলেও টাকা আমি দেবো না। লোকটা শয়তান, মিথ্যেবাদী, মাতাল, একটা দিনও এসে বলেনি, বিজু কেমন আছে। ভুলেও কখনো মেয়েটার নাম কোনোদিন উল্লেখ [illegible]।

[illegible] থাকতে হবে শীতাংশু, [illegible] দিন কাটাতে হবে [illegible] একটা মেয়েকে তুমি ভালো-বেসেছিলে সে তোমার [illegible] চায়নি। এমন তো কতোই ঘটে। [illegible] মেয়েটির বাবা তোমার কাছ থেকে [illegible] টাকা নিয়ে যাবে? [illegible] কোনো বুদ্ধিমান ছেলে এরকম করে তো শুনিনি। তাও যদি

প্রজাপতির মৃত্যু

প্রভাত চৌধুরী

সূর্য যখন পেছনের ওই বিলটায় জল খেতে নেমেছে সবে, ঠিক তখনই কালা দেখে একটা লোক বেল গাছটার নিচে শুয়ে আছে।

কালা তার গোরুগুলোকে ফিরিয়ে নিয়ে যাবার আগে রোজই বড় বিলে জল দেখায়। শুধু কালা নয়, নেপা, হুলো, গনা সকলেই।

কালা শায়িত লোকটার কাছে যায়। ঠিক চিনতে পারে না। আশে পাশের কেউ নয়। অথচ এই ভর সন্ধ্যায় বেলতলায় শুয়ে আছে খামোকা। বাড়ি যাবে না? বাড়ি কোথায়? ইলামবাজারের দিকে হলে উপায় নেই। শেষ বাস চলে গেছে বহুক্ষণ। তখন কালারা উত্তরের জঙ্গলে গোরু চরাচ্ছিল। গুস্করা যাবার একটা বাস অবশ্য ছিল। আজ আর সেটা আসবে না। পাঁড়ুকের ডাঙায় ডিগবাজি খেয়েছে। আর রামনগর কিংবা পাঁড়ুকের দিকে যাবার হলে লোকটা এভাবে এখন ঘুমোত না।

কালা ভাবে লোকটাকে জাগিয়ে দেওয়া উচিত। অথচ ঘুম ভাঙালে লোকটা অসন্তুষ্ট হতে পারে তা ভেবে লোকটাকে ডাকে না। বা জাগায় না।

নেপা, হুলো বা গনার কাছে ছুটে যায়।

—একটা লোক, হুই বাবলাগাছটার নিচে শুই আছে। নেপা, হুলো এবং গনা এক-সাথে ছুটে যায় বেলতলায়। লোকটাকে ডাকবে কিনা তা নিয়ে কিঞ্চিত আলোচনা করে নেয়।

হুলো জানায়, লোকটাকে সে দুপুরের বাসে নামতে দেখেছিল। হ্যাঁ, তার পরণে এই নীল চেক শার্টটাই ছিল। আর হাতে এই পুঁটলিটা। লাল গামছায় বাঁধা। লোকটা নেমে রামনগরের দিকে হাঁটা শুরু করেছিল। হাঁটায় কিছুটা তাড়াতাড়ি ছিল। অর্থাৎ জরুরি কোনো খবর জানাতে যেভাবে পা চালাতে হয়।

হুলোর এই সাক্ষ্য এটাই প্রমাণ করে লোকটি ছিলেন জরুরি কোনো সংবাদ বহন করে এনেছিল। অথচ এই গা-সন্ধের ঘুমোচ্ছে। বিন্দুমাত্র তাগাদা নেই।

লোকটা জানে না, ইলামবাজারের শেষ বাস চলে গেছে। গুস্করা যাবার বাস আজ আর আসবে না। আশে পাশে কোনো লোকালয় নেই। অর্থাৎ গ্রামগুলো থেকে এ জায়গাটার একটা দূরত্ব আছে।

জায়গাটার নাম মোট-বাঁধা। অদ্ভুত ধরনের নাম। হয়ত অতীতে মোট অর্থাৎ ঝুলি-ঝোলা খুলে খাওয়াদাওয়ার জন্য বিশ্রাম করত এই তেমাথামুকত জায়গাটায়। সুবিধা ছিল ওই বড় বিলটা। যার জল বারোমাসই কাণায় কাণায় থাকে। আর ঠিক জঙ্গল মহলের বাইরেই এর অবস্থান। জঙ্গলে তো আর আহার-বিহার সম্ভব নয়। তাই এখানেই মোট খুলে আবার মোট বাঁধার ব্যাপার ঘটতো। তাই থেকে মোট বাঁধা।

লোকটার গামছার পুঁটলিটা খোলা। অর্থাৎ এই লোকটিও মোট খুলেছিল। বাঁধার কাজটা এখনও বাকি। তার আগেই ঘুমিয়ে পড়েছে।

কালা, নেপা, হুলো আর গনা লোকটাকে বৃত্তাকারে ঘিরে থাকে। তখন চরাচর থেকে সূর্য লুকিয়ে যাবার ব্যাপারে ভীষণ ব্যস্ত। এবং নির্জনতার ভেতর কয়েকটা গোরু বাড়ি ফেরার জন্য ডাকতে থাকে। রাতে গোরুরা কি বাইরে থাকতে ভয় পায়। না, তা নয়। গোয়ালে তার বাছুর বাঁধা আছে। হয়ত সন্তানের সান্নিধ্য লাভের তাগাদার জন্যই এই ডাক।

কালারা বুঝতে পারে এভাবে বেশী-ক্ষণ ঘুমন্ত লোকটার পাশে দাঁড়িয়ে থাকা সম্ভব নয়। এখনই যা হোক একটা কিছু করতে হবে। হয় লোকটাকে জাগিয়ে দিতে হবে। বলে দিতে হবে রাত হয়ে যাচ্ছে, বাড়ি যাবে না। নয়ত এভাবেই অর্থাৎ ঘুমন্ত লোকটাকে ফেলে রেখে চলে যেতে হবে। লোকটা ঘুমিয়ে থাকবে। একা। এই লোকালয়বিহীন বেলতলায়।

হঠাৎ নেপা দেখতে পায় লোকটার গামছার ওপর একটা শিশি। শিশিটা তার চেনা মনে হয়। জমিতে ধানের পোকা মারার জন্য দেওয়া হয়। ফলিডল। ওষুধটা খুব বিষাক্ত। জলে গুলে ধান গাছে ছিটিয়ে দিলে সব পোকা মরে যায়। জলে ভাসতে থাকে সব। সাদা সাদা প্রজাপতির মতো অসংখ্য পোকায় জলের ওপরটা তখন সাদা দেখায়।

নেপার মনে হয় ঘুমন্ত লোকটা একটা মরা প্রজাপতি ধান জমির জলে ভাসছে। লোকটার শরীর ঢেকে রেখেছে রত্না ধানের মোটা মোটা গোছা। ঘন সবুজ ক্ষেত। চওড়া চওড়া পাতা। এক এক গোছায় বারো থেকে পনের গণ্ডা শিস।

নেপা চিৎকার করে ওঠে—'মরা প্রজাপতি!'

কালা, হুলো আর গনা একই সঙ্গে বলে ওঠে—'কোথায়'? নেপা বিড় বিড় করে—লোকটা, ফলিডল।

বাকি তিনজন একই সঙ্গে দেখে ফলি-ডলের শিশিটা। ওদের বুঝতে বিন্দুমাত্র অসুবিধা হয় না, লোকটা তাদের আসার আগেই ফলিডলের শিশিটাকে ফাঁকা করে রেখেছে। এবং লোকটা মৃত।

এখন চারজনই অনেকখানি কাছা-কাছি এসে ঝুঁকে পড়েছে লোকটার দিকে। বেশ ঘন অবস্থান ওদের। ওদের এখনো মনে হচ্ছে মরা প্রজাপতিটা যে কোনো মুহূর্তে ওদেরই কারো কাঁধের পাশ দিয়ে উড়ে যাবে রামনগরের দিকে। যেখানে দুপুরের দিকে নীল শার্টের কাঁধে লাল গামছা ঝুলিয়ে সে গিয়েছিল। গিয়ে ফিরে এসেছিল কিছুক্ষণ পরেই। এখনও হয়ত সব কাজ শেষ হয়নি। অথবা যা বলার ছিল তা বলা হয়নি বা বলা শেষ হয়নি।

প্রিয় পাঠক, কালা হুলো নেপা আর গনা এই মৃতদেহটাকে কিছুক্ষণ আগলে রাখুক। যদিও ওদের ভয় করতে পারে। এবং গোরুগুলোকে ফিরিয়ে নিয়ে যাবার ব্যাপার যদিও অসমাপ্ত থেকে যাবে। কিন্তু যেহেতু গল্পটার নায়ক কালা হুলো নেপা কিংবা গনা নয়। ওরা উপলক্ষ মাত্র। নায়ক

ওই জন্য লোকটি। যে কিছুক্ষণ আগে ফাঁসকল খেয়ে আত্মহত্যা করেছে। এবং চারটি কিশোর তা সবুন্মত্ত আবিষ্কার করেছে। আত্মহত্যার সঙ্গে ওদের বিন্দুমাত্র যোগাযোগ নেই। কাজেই ওদের অপেক্ষা করাতে আপনাদের আপত্তি থাকার কথা নয়। তার থেকে বরং আমি আপনাদের মৃত প্রজাপতিটির জীবনকালীন ঘটনায় ফিরে নিয়ে যাই। হ্যাঁ, দেখা না কে যেন লোকটাকে মরা প্রজাপতি ভেবে ফেলেছিল। এর কাবনাটা আমার বেশ পছন্দ হয়েছে। আর সত্যি সত্যিই তো লোকটার নাম প্রজাপতি হতে পারে না। শ্রীপতি, গণপতি, নরপতি যা হোক একটা কিছু হতে পারে। প্রজাপতির সংগে সাযুজ্য রেখে লোকটার নাম দিলাম শ্রীপতি।

শ্রীপতির বাড়ি ঠিক কোথায় তা এখনি জানার কোনো তাগাদা নেই নিশ্চয়। আর তাগাদা থাকলে ধৈর্য ধরুন। সব জানতে পারবেন।

প্রথমেই জানিয়ে রাখি লোকটা এই মোটবাঁধা মোড়ে প্রথম কবে এসেছিল। লোকটা নয়। শ্রীপতি। শ্রীপতি তার জনা তিনেক বন্ধুকে নিয়ে মেয়ে দেখতে এসেছিল। রামনগরের আশেপাশের একটা গ্রামে। গ্রামের নামটা নাইবা জানলেন। তবে গ্রামগুলোর নাম জেনে রাখুন। দীননাথপুর, উল্লাসপুর, দেরিয়াপুর, বালিঝাড়া, গোপালপুর মল্লিকপুর, পুরার, পাঁড়ুক, গোঁসাইখন্ড। রামনগর, আটমগর তো আছেই। এগুলো সব মোটবাঁধা থেকে ভেদিয়া যাবার বাসরাস্তার দুদিকে পড়ে। মাইল দুই-এর মধ্যেই।

শ্রীপতিরা মোটবাঁধার মোড়ে নেমেছিল। সকালের দিকে। নেমে এগিয়ে গিয়েছিল চায়ের দোকানটার দিকে। সামনে বেঞ্চ। উঁচুমতো দাওয়া। পাশেই উনুন। উনুনের ওপর কেটলি। কেটলিতে জল ফোটে বাসের সময়। দোকানের মালিক ফার্স্ট বাসের আগেই উনুনে আঁচ দেয়। লোকজন বা বাসের প্যাসেঞ্জার জোটার আগেই গরম হয়ে যায় চায়ের জল। তারপর কেটলি থেকে কাপে কাপে। সেইসব কাপ জলযাত্রীদের হাতে।

দোকানীর বাড়ি এখানে নয়। জঙ্গলের ভেতরের একটা গ্রামে। বিষ্টুপুরে। শেষ বাস চলে গেলে সে সাইকেলে বিষ্টুপুরে ফিরে যায়। দোকানপত্র গুটিয়ে রেখে।

শ্রীপতিরা ওই বেঞ্চিতে বসে চা খেয়েছিল। তারপর একটা করে পান। সবশেষে এক প্যাকেট সিগারেট কিনে তিনজনে তিনটে নিয়েছিল। বাকিগুলো ছিল শ্রীপতির পকেটে। শ্রীপতির পকেটে থাকার কারণ একটাই। যেহেতু তার সঙ্গে বিয়ে হতে পারে এমন একটি মেয়েকে তারা নির্বাচন করতে যাচ্ছে। তারা নির্বাচন করে দিলেই চলবে। অর্থাৎ বিয়ের ব্যাপারে তাদের মতামতই চূড়ান্ত। শ্রীপতির মা নেই। বাবা দ্বিতীয়পক্ষের বিয়ে করেছে বছর তিনেক আগে। শ্রীপতির মা মারা যাবার পর। কাজেই তার এখন ছেলের বিয়ে দেবার সময় কোথায়।

সিগারেট টানতে টানতে তারা এগিয়ে গিয়েছিল বাঁ হাতের রাস্তাটা ধরে। বেশ ফুর্তি ছিল মনে। শ্রীপতি কিছুদিন আগে শোনা কাজলা মজনু লোলার একটা গান গাইছিল গুন গুন করে। তার বন্ধুরাও বেশ খুশী। নব-সম্বন্ধের বাড়িতে খাওয়া-দাওয়াটা নেহাত খারাপ হয় না। রোজকার বাড়িতে কচুকুমড়ো-র ঝাল। আজ কপাল ভালো। মাছ তো হবেই। ভাগ্য থাকলে হাঁস বা মুরগির মাংসও জুটতে পারে। বন্ধুরাও শ্রীপতির সঙ্গে গলা মিলিয়েছিল তারস্বরে।

ফাল্গুনের জমি দেশটা তাই ফাঁকা। মাঝে মাঝে গমের সোনালি শিষ হাওয়ায় দুলছে। তখন বসন্ত। বাতাসের রোদের কোনো তেজ নেই। স্নিগ্ধতা একটা আছে। গমগুলোর মাথাও সোনালিকা।

একটা স্বর্ণ খনির দিকে শ্রীপতিরা এগিয়ে যাচ্ছিল। কেননা তাদের দৃষ্টির শেষ সীমানায় ছিল বেশ অনেকগুলো জমিতে গমের চাষ। তারপর গ্রামের কয়েকটা দালান। কিছু খড়ের চাল। তাল গাছ আর আম কিংবা নিম।

শ্রীপতিরা ঘরের উঠোনে পা দিয়েই বুঝতে পেরেছিল কন্যাপক্ষ প্রস্তুত। আয়োজনও নেহাত খারাপ নয়। বাতাসে মাংসের গন্ধ। রান্নাঘর থেকে ছড়িয়ে পড়েছে উঠোনে।

হাত-পা ধুয়ে জল খেয়েছিল তারা। সঙ্গে দুটো করে দানাদার। দোকানের কেনা মিষ্টি। তারা জলখাবার খেয়েই মেয়ে দেখতে চেয়েছিল। মেয়ে অবশ্য তখনই দেখা হয়নি। হাঁসের মাংস দিয়ে ভাত খেতে খেতেই তারা মেয়েটিকে দেখেছিল। কালো, পাতলা চেহারা। শ্রীপতির পছন্দ হয়নি। পছন্দ হবার কথাও নয়। হাঁসের মাংসের প্রয়োজন তাই বেশী। গরীবের বাড়িতে এভাবেই হাঁসের মাংস হয় শ্রীপতিদের তা অজানা নয়।

ওরা খাওয়াদাওয়ার পর চিঠি দেবো জানিয়ে বেরিয়ে এসেছিল ওই বাড়ি থেকে।

রাস্তার ওপর থেকেই ভাগ্যবতীদের বাড়ির লোক এসে ধরেছিল তাদের। আর একটি মেয়ে দেখে যাবার অনুরোধ এসেছিল। শ্রীপতিদের আপত্তি করার কোনো ব্যাপার ছিল না। কেননা আগের মেয়েটিকে তাদের কারোরই পছন্দ হয়নি। কাজেই অন্য আর একটি মেয়ে দেখা যেতে পারে। এভাবেই তারা এসে উপস্থিত হয়েছিল ভাগ্যবতীদের বাড়ি।

ভাগ্যবতী তখন পুকুর ঘাট থেকে বাসন মেজে বাড়ি ঢুকছিল। তাদের উঠোনে অচেনা এতগুলো লোকের সমাগমে সে কিছুটা বিব্রত। কি করবে করার থেকেও লোকগুলোর হঠাৎ আগমনের কারণ খুঁজতে চেষ্টা করেছিল সে। তার বাবা নেই। মা পরের বাড়িতে মুড়ি ভাজে। সে আর মা কোনো মতে চালিয়ে নেয়। দু-চার বিঘে জমি আছে যদিও। হাল-কিনে চাষ করায় তার মা। তার কোনো ভাই বা বোন নেই।

শ্রীপতিরা উঠোনে দাঁড়িয়েই দেখেছিল ভাগ্যবতীকে। বিশেষ করে শ্রীপতি। কেননা ওদের যে এখানে নিয়ে এসেছিল তার মুখে অর্থাৎ ভাগ্যবতীর কাকার মুখেই শুনেছিল সব বৃত্তান্ত। মা মুড়ি ভাজে। এক মেয়ে। দু-চার বিঘে ধান জমি। বিয়ে করলে সবই তার। অর্থাৎ ভাগ্যবতীর সঙ্গে সঙ্গে বাড়তি জমিও।

শ্রীপতির বুঝতে কিছুমাত্র বিলম্ব হয়নি যে পুকুর ঘাট থেকে বাসন মেজে ফিরে আসা মেয়েটিই ভাগ্যবতী। অন্য কেউ নয়। কেন না এ বাড়িতে আর কোনো মেয়ে নেই। থাকা সম্ভব নয়।

ভাগ্যবতীর কাকা তখন হাঁক ডাক করে মাদুর পাততে বলেছিল তাকে। ভাগ্যবতী কাজটা পেরে হাঁফ ছেড়ে বেঁচেছিল।

শ্রীপতিরা বসার পরই ভাগ্যবতীর কাকা বলেছিল, এই আমার ভাইঝি। কাজেকর্মে কোনো খুঁত পাবে না বাবারা। ঘর দোর তকতকে করে রাখে। পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। সামনের আষাঢ়ে সতেরোতে পড়বে। ওর বাবা মারা যাবার পর একদম জলে পড়ে আছে। সে সবই তো তোমাদের বলেছি বাবারা। এখন ওর মাকে কন্যাদায় থেকে উদ্ধার না করলে উপায় নেই। ভগবান যখন তোমাদের সন্ধান দিয়েছেন তখন—। যাচ্ছি গোপালপুরের মাঠে কাঠা চারেক গম দিয়েছি। কবে কাটতে হবে দেখতে। যখনই শুনলাম মোড়ল বাড়িতে তোমরা পুঁটিকে দেখতে এসেছ তখন থেকেই দাঁড়িয়ে আছি। কখন তোমরা বেরোবে। আর বেরোলেই—

ভাগ্যবতীর কাকা যখন একটানা বলে যাচ্ছিল কথাগুলো ভাগ্যবতী তখন কাঠের খুঁটিতে স্থির। এত বড় ঘটনার কথা সে কিছুই বুঝতে পারেনি এতক্ষণ। সে স্থির দাঁড়িয়ে কাকা না বললে সরে ঘরের ভেতর ঢুকতেও ভরসা পাচ্ছে না। আর তার মা ঘরের দরজার পাশে স্থির। সেও নির্বাক। সবে ঘোষেদের বড় তরফের বাড়ি থেকে তিন খোলা মুড়ি ভেজে এসেছে।

শ্রীপতি প্রথমে ভাগ্যবতীকে পরে তার মাকে দেখেছিল। বেশ মুখোমুখি। সামনা-সামনি দেখা।

রঙ যদিও কালো। স্বাস্থ্য কিন্তু অটুট। গোল-গাল। চেহারা দেখে মনে হয় বেশ খাটতে পারবে। তাদের বাড়িতে এটুকু হলেই যথেষ্ট। গতরটাই নগদ। যা ভাঙিয়ে খেতে হয়। গতর না থাকলে সাজিয়ে রাখার জন্য বিয়ে করা তাদের পোষায় না। সে সব বাবুবাড়িতে মানায়।

কিছুক্ষণ নিস্তব্ধতা। কেউ কোনো কথা বলেনি। শুধু চোখগুলো এদিক, ওদিক ঘোরাফেরা করছিল। —ঠিক আছে, হবে। শ্রীপতিই প্রথম সেই নিস্তব্ধতাকে ভেঙেছিল।

ঠিক তখনই ভাগ্যবতী একছুটে ঘরের ভেতর। তাকে আর বলে দিতে হয়নি। সে বুঝেছিল যা জেনে গিয়েছিল কন্যাজন। ঘরে এসে আঁচলের খুঁট দিয়ে মুখ মুছেছিল। বুকের ওপরের দিকের অর্থাৎ গলার নিচের জমে থাকা ঘামও মুছেছিল সে। এতক্ষণ

পাঁজিতে দাঁড়িয়ে জন্মের পর তার মুখের মিষ্টিহাসি থেকে গিয়েছিল হঠাৎ।

তারপর সাত্তিকভাবে সে রাতেই বিয়ের পিঁড়েতে বসেছিল শ্রীপতি। শুভক্ষণ পাঁজিতে কথাটা হয়ত শুধুমাত্র এ ঘটনাটা ঘটবে বলেই তৈরি হয়েছিল। বিয়ের আসরে জোগাড়। উলুধ্বনি। হৈ-চৈ। নিজেকে বেশ ভাগ্যবান মনে হয়েছিল শ্রীপতির। তার বাবার বিয়েতে সে বরযাত্রী যায়নি। রাগ করে। যাবা অবশ্য নিয়ে যেতে চেয়েছিল। এতবড় ছেলে তার বাবার বিয়ে সবাই কি ভাববে তা মনে করেই সে যায়নি। তার বাবাও তার বিয়েতে থাকতে পারলো না। বেশ হল। কিছুটা প্রতিশোধও নেওয়া হল। একেবারে বৌকে সঙ্গে নিয়ে উঠবে। বাবার তখন কিইবা করার থাকবে। বড়জোর আপসোস করে বলবে—একটা খবরও দিতে পারলি না। আমি কি আপত্তি করতাম?

শ্রীপতি জানে তার বাবা এখন তার বিয়ের ব্যাপারে আদৌ ব্যস্ত নয়। তার মা বেঁচে থাকলে কত খুশী হত। সে মাকে গিয়ে বলতো—মা, বৌ এনেছি দেখো। কেমন পছন্দ। খাটতে পারে খুব।

বিয়ের পর বাসরঘরে গান গাইতে বাধ্য হয়েছিল শ্রীপতি। সেই লায়লা-মজনু পালার গান। তখন আর গুন গুন করে নয়। কিছুটা গলা ছেড়ে। গানের গলা শ্রীপতির বরাবরই ভালো। কেষ্ট যাত্রায় গাইতে হয় তাকে ছেলেবেলা থেকেই। এক সময় তো সে ঠিক করেই ফেলেছিল যাত্রার দলে গাইতে যাবে। কলকাতার দলে। তার বাবার বিয়ের ঠিক পরেই। খবর-কাগজের বিজ্ঞাপন থেকে সে অনেকগুলো দলের ঠিকানাও লিখে রেখেছিল। তার নতুন মা-ই তাকে যেতে দেয়নি।

বলেছিল, বাবার বিয়ের পর বিবাগী হতে চাইছ। তার থেকে নিজেই বিয়ে কর না। বলেই খিল্ খিল্ করে হেসে উঠেছিল। হাসিটা শ্রীপতির সারা শরীরে কি একটা নেশা ধরিয়ে দিয়েছিল। কলকাতার যাত্রা-দলে যাওয়া হয়নি তার। যাবার কথা ভুলেও গিয়েছিল। বাসর ঘরে তখন ভাগ্যবতীকে গান গাওয়াবার চেষ্টা করছিল তার বন্ধুরা। ভাগ্যবতী কিছুতেই গাইতে রাজি হয়নি। তখন তার এক বন্ধু একটা গান ধরেছিল। বায়োস্কোপের গান। রেকর্ডে প্রায়ই শোনা যায়। *এসব পুরোনো গান গাওয়ার মধ্যে বাহাদুরি কি আছে বোঝে না শ্রীপতি। রেকর্ডের গলা থেকে মেয়েটির গলা অনেক খারাপ। সুরেরও ঠিক নেই। মাঝে মাঝেই ভুল করে ফেলছিল মেয়েটি। শ্রীপতির ইচ্ছা হয়েছিল গানটাকে সে নিজেই ঠিক করে একবার গেয়ে শুনিয়ে দেবে। মেয়েটা লজ্জা পেতে পারে এই ভেবে সে চুপচাপ* থেকে যায়।

ভাগ্যবতীকে বাড়ি নিয়ে গেলে তার নতুন মা খুব খুশী হবে নিশ্চয়। তাকে একা বাড়ির সব কাজ করতে হয় এখন। এরপর থেকে ভাগাভাগি করে দুজনে করে নেবে। কারো ওপর চাপ পড়বে না। এখন তার নতুন মার বড় কষ্ট। রান্না, মুড়ি ভাজা বাসন পরিষ্কার সবই একহাতে।

শ্রীপতি অবশ্য মাঝে মাঝে সাহায্য করতে চেয়েছে। আর তখনই ধমক খেয়েছে—যাও, বাইরে যাও। মেয়েমানুষের পেছনে ঘুরতে নেই। আমার কাজ আমাকে করতে দাও। আর যদি আমাকে দেখতে ভালো লাগে তা হলে বসে বসে দেখো। কাজ করতে হবে না। আগুন দিচ্ছি। বিড়ি ধরিয়ে প্রাণ ভরে দেখো। সঙ্গে সেই শরীরে জ্বালা ধরিয়ে দেওয়া হাসি।

যার পর শ্রীপতির সাধ্য নেই পালিয়ে যাওয়া। বিড়ি টানতে টানতে তাকে দেখতে হয় ভাতের ফেন গালা কিংবা ডালে সম্বর দেওয়া। শেষে শিশিতে তেল আর কাঁধে গামছা ধরিয়ে দিয়ে নতুন মা বলে—এবার যাও, পুকুরে গা ডুবিয়ে শরীরটা ঠাণ্ডা করে এসো। ভালো লাগবে।

নতুন মা-র আদেশে পুকুরে যাবার আগে শ্রীপতির নিজেকে দারুণ অসহায় মনে হয়। অথচ কিছুই করার নেই। সে যেন নতুন মা-র খেলার পুতুল কিংবা আজ্ঞা-বাহক এক মানুষ।

বাসরঘরের গানের পর্ব শেষ হয়। অনেকেই বাড়ি ফিরে যায়। তার বন্ধুরা উঠোনে পাতা বিছানায় গিয়ে শুয়ে পড়ে। ঘরে শুধু সে আর ভাগ্যবতী।

সে সিগারেট ধরায় একটা। ভাগ্যবতী বলে—তোমার গানের গলা আছে।

—যাত্রা দলে গাইতে যাবার কথা হয়েছিল। নতুন মা যেতে দেয়নি। শ্রীপতির উত্তরের মধ্যে একটা গর্বিত মেজাজ ছিল। তার বৌও তার গলার প্রশংসা করলো। গর্বিত না হলে খেলো হয়ে যাবে।

নতুন মাও প্রথমে তার গানে অবাক হয়ে গিয়েছিল—। ছেলের আমার গলা নয়তো কোকিলকণ্ঠ।

নতুনমা-র কথা বলার মধ্যে একটা দোলা আছে। যা দুলিয়ে দেয়। কই ভাগ্যবতীও বলতে পারতো কোকিলকণ্ঠ। এটা একটা নতুন কথা নয়। তবু বলতে পারে কজন। ঠিক সময়ে ঠিক কথা নতুন মা-র মতো আর কেউ বলতে পারে না।

—নতুন মা কে?

—বাবার দ্বিতীয় পক্ষের বৌ।

—এ মা, তোমার সৎ মা আছে বুঝি। *সৎ-শাশুড়ি। খুব দজ্জাল। মুখ করবে সব সময়।' ভাগ্যবতীকে বেশ চিন্তিত দেখায়। সে তার শ্বশুরবাড়ি সম্পর্কে কিছুই জানে না। জানা সম্ভবও হয়নি। তাকে দেখতে এসেই বিয়ে।*

—দজ্জাল কেন হবে। প্রায় তোমার মতোই বয়সি। খুব ভালো মেয়ে। আমাকে তো খুব আদরযত্ন করে। তোমাকেও আদর করবে। দেখো।

ভাগ্যবতী বিস্ময়ে ভাবতে থাকে তাকে তারই সমবয়সী শাশুড়ির সঙ্গে ঘর করতে হবে। ননদ-জা সমবয়সী হতে পারে। শাশুড়ি যে সমবয়সী হতে পারে এটা তার জানা ছিল না।

—আমার মতো বয়স!

—হ্যাঁ, মা মারা যাবার পর বাবা আবার বিয়ে করলে তো। এই তো তিন বছর আগে। তোমার তো সতের, আর নতুন মার উনিশ। ষোল বছরে আমাদের বাড়িতে এসেছিল। আমার তখন কুড়ি।

ভাগ্যবতী সমস্ত রাত আর ঘুমোতে পারে না। শ্রীপতি শেষ রাতে ঘুমিয়ে পড়ে। ভাগ্যবতী ভাবে তার স্বামীর নতুন মা প্রায় তার সমবয়সী। সে আবার এতই স্বামীকে আদরযত্ন করে এসেছে। এখন বা এরপর ভাগ্যবতীকেই সে দায়িত্ব নিতে হবে। অর্থাৎ নিজের স্বামীর সেবাযত্নের দিকটা তো তাকেই পুরোপুরি দেখতে হবে। তখন যদি তার স্বামীর নতুন মা রাজি না হয়। বলে, এতদিন তুমি কোথায় ছিলে? আমি আগে যা করতাম এখনও করতে পারবো। তুমি বরং গোরু-বাছুরগুলোকে যত্ন কর।

সেকি তার স্বামীকে ফেলে গোরু-বাছুরকে যত্ন করতে পারবে। আর তার স্বামীকে সেবাযত্ন করবে তার স্বামীর নতুন মা। অর্থাৎ তার শ্বশুরের দ্বিতীয় পক্ষের বৌ। তারই শাশুড়ি। এর থেকে শাশুড়িটা দজ্জাল বা খাণ্ডারনী হলেও ভালো হতো। কোমর বেঁধে ঝগড়া করা যেতো। এ তো ঝগড়া করার ব্যাপার নয়। অধিকারের ব্যাপার।

কে অধিকার দখল করবে ভাগ্যবতী বুঝতে পারে না। বাইরে একটা পেঁচা হঠাৎই ডেকে ওঠে।

পেঁচার ডাকটাকে ভাগ্যবতীর খুব অশুভ মনে হয়। সে ভয় পেয়ে যায়। ভয়ে ঘুমন্ত শ্রীপতির বুকের ওপর মাথা রাখে। না, সে ছেড়ে দেবে না। শ্রীপতি বা এই লোকটা তার স্বামী। তারই অধিকার বেশী। একটা মেয়ে তার সৎ-ছেলেকে অধিকার করতে চাইবে—তা হতে পারে না। হওয়া সম্ভব নয়। তাহলে শ্বশুর কিংবা পাড়ার লোকেদের ডেকে জানিয়ে দেবে—আমার সৎ-শাশুড়ি আমার স্বামীকে অধিকার করতে চাইছে। তোমরা বলে দাও—অধিকার কার বেশী?'

শ্রীপতি ঘুমিয়ে স্বপ্ন দেখে তার নতুন মা তাকে ডেকে বলছে—ছেলে, তোমার ঘুম পাচ্ছে না। এসো আমার কোলে এসো। তোমাকে ঘুম পাড়িয়ে দিই। সঙ্গে সেই হাসি।

শ্রীপতি ঘুমের মধ্যেই ভাগ্যবতীকে জড়িয়ে ধরে।

॥ দুই ॥

শ্রীপতি তার বৌকে নিয়ে পৌঁছা-বার অনেক আগেই তার বিয়ের খবর পৌঁছে গিয়েছিল। তার বাবা অনেকটাই খুশী হয়েছিল। ছেলের আমার তাগদ আছে। একা একাই বিয়ে করে ফেলেছে। শুধু মনের মধ্যে একটা দুঃখ হচ্ছিল। সে যদি বিয়ের বাসরে উপস্থিত থাকতে পারতো। তাহলে খুব ভালো হ'ত। একটা খবর পেলে নিশ্চয় পৌঁছে যেতো। আর তা ছাড়া তার ছেলে। সে ছেলের বাবা।

তার অনুমতি নেবার জন্য অনেকক্ষণ অপেক্ষা করা উচিত ছিল। এদিকটা কনে-পক্ষের অন্যায় হয়েছে।

সবাই শুনেছে শ্রীপতির বাবা। মেয়েটার বাবা নেই। মা কষ্টে সংসার চালায়। বেটা আমার সৎ কাজই করেছে।

—গৌরী, তোমার ছেলের কাণ্ড শুনেছ? হাঁকডাক শুরু করে শ্রীপতির বাবা।

গৌরী অর্থাৎ শ্রীপতির নতুন মা অনেক আগেই খবর পেয়েছে। শ্রীপতির নির্দেশ ছিল খবরটা আগে যেন নতুন মাকে দেওয়া হয়। তারপর অন্য সকলকে। সেই-মতোই কাজ হয়েছে।

গৌরী কিছুটা গম্ভীর। তার ইচ্ছা ছিল সে নিজে দেখে শুনে শ্রীপতির বিয়ে দেবে। মেয়ে পছন্দ করবে সে নিজেই। শ্রীপতিটা মেয়েদের বোঝেই বা কি? কি দেখতে কি দেখেছে।

—কাণ্ড শুনেছ?

—হ্যাঁ শুনেছি। বাপ বিয়ে করতে পারে আর বেটা পারবে না? এই না হ'লে বাপ কা বেটা, সিপাই কা ঘোড়া।

গৌরী কিন্তু আগেই ঘরদোর পরিষ্কার করে রেখেছে। শ্রীপতির ঘরে খাটের ওপর নতুন চাদর পেতে দিয়েছে। তার নিজের বিয়ের চাদর। এতদিন বাক্সে ছিল। দুটো বালিশ দিয়েছে। বালিশের ওয়াড়গুলো সাবানে কাচা। এতদিন শ্রীপতির খাটে একটা বালিশ ছিল। ছেলের আমার বৌ আসবে। বৌটা এখন কেমন হয়। কে জানে।

সন্ধ্যার মুখে মুখে শ্রীপতি তার বৌকে অর্থাৎ ভাগ্যবতীকে নিয়ে এসে পৌঁছয়।

গৌরী এগিয়ে এসে ভাগ্যবতীর গলায় পরিয়ে দেয় নিজের গলার চেন-হারটা।

ভাগ্যবতী ভালো করে দেখতে থাকে গৌরীকে। ফরসা সুন্দর দেখতে এই মেয়েটিই তার স্বামীর নতুন মা। প্রতিমার মতো মুখের গড়ন। টানাটানা চোখ। বয়সে তার থেকে দু-চার আঙুল উঁচুই হবে বোধহয়। ঘর আলো-করা রূপ। নিজেকে কেমন অসহায় মনে হয় তার।

—প্রণাম কর, নতুন মা।

ভাগ্যবতী কলের পুতুলের মতো শ্রীপতির আদেশ পালন করে। প্রথম লড়াই-এ সে তো হেরে গেছে। নতুন মা অনেক সুন্দরী।

গৌরী তৎক্ষণে বিয়ের বরণ ডালা সাজিয়ে নিয়ে বসে আছে। আশীর্বাদ করার লোকজনও হাজির। হঠাৎ খবর পেয়ে উৎসুক হয়ে বেশী লোক হাজির হয়েছে। অনেকটা সঙ দেখার মতো।

ঘণ্টা দুয়েক হৈ-চৈ-এর মধ্যেই কেটে যায়। হঠাৎ রান্না ঘর থেকে ডাক আসে—ছেলের আমার মুখ শুকিয়ে গেছে। তোমরা এখন যাও তো বাপু। কাল এসো।

শ্রীপতি রান্না ঘরের দিকে এগোয়। গৌরী বাইরে এসে ভাগ্যবতীর হাত ধরে রান্না ঘরে নিয়ে আসে।

—কি শ্বশুর বাড়িতে খেতে দেয়নি বুঝি? ছেলের আমার খিদেটা বেশী কেউ জানে না বোধ হয়।

ভাগ্যবতী বা শ্রীপতি কিছু না বলে খেতে থাকে। গরম ভাত। ডাল। মাছের টক।

শোবার ঘরে ঢুকে ভাগ্যবতী চমকে ওঠে। সুন্দর চাদর বিছানো খাট। বড় বড় বালিশ। শ্রীপতিরও চমক লাগে। এসব কোথা থেকে এলো। নতুন মা নিশ্চয়ই কিনে এনেছে।

শ্রীপতি খাটে এসে শোবার পর ভাগ্যবতী মশারির চারদিকটা ভালো করে গুঁজে দেয়। এতটা নিপুণভাবে কাজটা না করলেও চলতো। তবুও তার এ-বাড়ির প্রথম নিজস্ব কাজে নিপুণতা দেখালো। বা দেখাতে চাইলো।

অথচ যাকে দেখানোর চেষ্টা বা ইচ্ছা সে ওসব কিছুই না দেখে বলে বসে—নতুন মাকে কেমন দেখলে?

ততক্ষণে ভাগ্যবতী বাইরে থেকে ভেতরে এসে পড়েছে। খাটের ওপর।

—আমার বাপের বাড়ির নিন্দা করলো কেন?

—নিন্দা করলো কোথায়?

—আমরা তোমায় ভালো করে খেতে দিইনি। তোমার মুখ তাই শুকিয়ে গেছে।

—ও, এতেই। আমার একটু [illegible] পেয়েছে। তাতে তোমার বাপের বাড়ির নিন্দা করা হ'ল?

নিন্দায় নিন্দা। নিন্দাকে নিন্দা বলতে দোষ কোথায়। আমরা কি করে জানবো নতুন জামাই [illegible] মতো খেতে পারে।

—তা জানবে কি ক'রে? [illegible]

—তোমার উচিত ছিল নতুন মাকে নিয়ে যাওয়া। বিয়েয় জামাইকে খাইয়ে দিতো।

—তুমি রেগে গেছ। তোমাদেরও [illegible] করেছে। [illegible] দিয়েছে।

—তুমি শুধু মাকেই দেখলে।

ভাগ্যবতী পাশ ফিরে শোয়।

শ্রীপতির ওপর সারাদিনের যা ধকল গেছে তাতে বেশীক্ষণ কথাবার্তা চালিয়ে যাওয়া সম্ভব হয় না। বিশেষত অপর পক্ষের মেজাজ যখন ঠিক নেই। মেজাজ ভালো হলে দেখা যাবে।

শ্রীপতির মনের মধ্যে একটা সন্দেহ ছিল। তার বাবা কিংবা নতুন মা এই হঠাৎ বিয়েটাকে কিভাবে গ্রহণ করবে। সকলেই খুশী হয়েছে দেখে তার সন্দেহটা দূর হয়ে গেছে। বিশেষত নতুন মা যেভাবে তার বৌকে গ্রহণ করেছে, যা তার খাটে নতুন চাদর পেতে দুটো বালিশ রেখে দিয়েছে বড় বড়, তা দেখে আনন্দে সে উতলে উঠেছিল। অথচ সেই আনন্দ মাটি করে দিল তার নিজের বৌ। মেয়েটা শুধু শুধুই তার বাপের বাড়ির নিন্দা করা দেখলো। নতুন মা তার নিজের গলার হার খুলে যে তার গলায় পরিয়ে দিল সেটা তো দেখলো না। বললো না। কথাটা ভালো হলে, তবে নিজের গলার হার খুলে অপরের গলায় পরিয়ে দিতে পারে। শ্রীপতি ঘুমিয়ে পড়ে তাড়াতাড়ি।

ভাগ্যবতী আগামীকাল থেকেই নিজের হাতে রান্না করে খাওয়াবে সবাইকে। দেখিয়ে দেবে কেমন খাটতে পারে। কম যাবে [illegible]।

কিন্তু তা সম্ভব হয় না। গৌরী [illegible] বৌ [illegible] ঢুকবে তা হতে পারে না।

দুই

শ্রীপতি ফুঁসে উঠল—তোমারও তো একটু বিশ্রাম চাই। ও রান্নাতে [illegible], জানুক না।

—না, আমি যতদিন এ বাড়িতে আছি ততদিন আমার বিশ্রাম চাই না। তাছাড়া নতুন বৌ এলেই হাঁড়ি ঠেললে লোকে বলবে কি? ধবধবে শাশুড়ি পায়ের ওপর পা তুলে আছে। আর বৌটার খেটে খেটে হাড় কালি হয়ে গেল। তাছাড়া আমি তো বুড়ি নয়। কি বল তুমি। বলেই শরীরে ঢেউ খেলানো হাসি। প্রশ্নটা তাকে ঠিক বোঝা গেল না। ভাগবতীকে না শ্রীপতিকে?

ভাগবতী কিছু না বলে রান্নাঘর থেকে বেরিয়ে গিয়েছিল।

পরে আর সেই রান্নাঘরে ঢোকেনি সে। গত রাত্রের রান্না করার বাসনা না সংকল্প থেকে সরে এসেছিল। না সরে আসতে বাধ্য হয়েছিল। রান্না না করার ফলে খেতে দেবার কথাও উঠতে পারে না। হয়ত শুনতে হবে—তুমি পারবে না বাছা। সরে যাও। আমি দিয়ে দিচ্ছি।

ভাগবতী আশ্চর্য হয়ে গিয়েছিল তার আগেই। তেল আর গামছা নিয়ে এসে স্নান পুকুরে যাবার তাগাদা দিয়েছিল গৌরী। তখন নাকি সে শ্রীপতিকে অনেকটা সহজ করে দিতে চেষ্টা করছে। ভুলতে চাইছে রান্না করতে না পারার বেদনা।

স্নানের ডাকের পর শ্রীপতি সঙ্গে সঙ্গে কাঁধে ফেলেছিল গৌরীর দেওয়া গামছাটা। তারপর হাতে তেলের শিশি নিয়ে সোজা পুকুরের দিকে পা বাড়িয়েছিল। তাকে বলে যাবারও প্রয়োজন মনে করেনি।

কাজেই খাবার সময় আর রান্নাঘরে যায়নি ভাগবতী। ইচ্ছে করেই।

অবশ্য গৌরী এসে তাকে ডেকে নিয়ে গিয়েছিল। আসলে গৌরীর ইচ্ছা হয়ত তার সামনে বা তাকে বুঝিয়ে দেওয়া তুমি যতই বৌ হও না কেন আমার হাত থেকে বিন্দুমাত্র অধিকার পাবে না তোমার স্বামীর। আমি যতটুকু দেবো সেটুকু নিয়েই সন্তুষ্ট থাকার চেষ্টা কর। বেশী চাইলে দুঃখ পাবে। মনে কষ্ট হবে। এমনই মনে হয়েছিল ভাগবতীর।

সন্ধ্যের সময় গৌরী এসে বলেছিল—বৌকে গান শোনাবে না? আমাকে তো প্রথম প্রথম ধরে ধরে গান শোনাতো। আমি গান শুনতে না চাইলেও।

শ্রীপতি লজ্জা পেয়েছিল। আর নতুন মা এটা মিথ্যা কথা বলেছে। সেই বরং গান শুনতে চাইতো। শ্রীপতির গান গাওয়ার ইচ্ছা না থাকলেও গাইতে হোত। একটানা একটা গান। শুধু প্রথম কলিটা মনে করিয়ে দিত নতুন মা। আর সে গেয়ে যেতো।

শ্রীপতি আজকের কথাটার সোজা প্রতিবাদ করে না। প্রতিবাদ করার জোর [illegible]ও নেই। [illegible]—[illegible] [illegible]। [illegible] শুনেছে।

—বাসরে তো অনেক কিছুর মধ্যে প্রথম একা একা শোনাও না এই গানটা। জানো সে তা যতই কালো হোক, আমি দেখেছি তার কালো হরিণ চোখ। তুমি গাও আর বৌ একা একা শুনুক। আমি যাচ্ছি চললাম।

ভাগবতীর সমস্ত মুখে থমথমে অন্ধকার নেমে আসে। প্রথমত শ্রীপতি তার নতুন মাকে দেখে গান শোনাতো। আর তাকে একবারও গান শোনাতে চায়নি। দ্বিতীয়ত সে কালো বলেই শ্রীপতিকে ওই গানটা গাইতে বলে গেল গৌরী।

গৌরী বাড়ি থেকে বেরিয়ে যাবার সঙ্গে সঙ্গে সে বিছানায় এসে শুয়ে পড়ে। তার খুব কান্না পায়। সে একা। ভয়ানক-ভাবে একা।

এভাবেই কেটে যায় কয়েকটা দিন। দিনের সাথে সাথেই চারটে মাস। এই চার মাসের মধ্যেই ভাগবতী জেনে গেছে তার নিশ্চিত পরাজয়ের সংবাদ। শ্রীপতির ওপর বিন্দুমাত্র অধিকার তার নেই। ইতিমধ্যে সে গর্ভবতী হয়েছে। শ্রীপতির সন্তান তার পেটে।

এ পর্বের শেষ সংলাপ ভাগবতীর গলা দিয়েই বেরিয়েছিল—নতুন মাই যদি তোমার সব তাহলে আমাকে বিয়ে করতে গিয়েছিলে কেন? নতুন মাকে বিয়ে করলেই পারতে।'

শ্রীপতি আর নিজেকে ঠিক রাখতে পারেনি—'কি বললে, তোমার জিভ খসে যাবে। ছিঃ, ছিঃ' বলেই একটা চড় মেরেছিল ভাগবতীকে। বেশ জোরেই।

ভাগবতী বিন্দুমাত্র কাঁদেনি। ভোর-রাতে হাঁটাপথ ধরে কিছুটা এগিয়ে এসে বাস ধরেছিল। বাপের বাড়িতে এসেও শান্তি পায়নি ভাগবতী। প্রতি সপ্তাহে এসেছে শ্রীপতি। তাকে নিয়ে যেতে চেয়েছে। চড় মারার জন্য ক্ষমা চেয়েছে। ভাগবতী বিন্দুমাত্র টলেনি। তার নিজের জায়গাতেই দাঁড়িয়ে থেকেছে। অবশ্য নতুন মার প্রসঙ্গ তোলেনি সে।

শ্রীপতি প্রতিবারই বলেছে—'তুমি আমার সাথে যুদ্ধ করছো কেন? তুমি নিজের সাথে নিজেই লড়ে যাচ্ছো। বুঝতে চেষ্টা করছো না ব্যাপারটা আসলে কি।'

শ্রীপতি এসেছে আর ফিরে গেছে। নতুন মা প্রতিবারই বৌ-এর আগমনের প্রত্যাশায় ঘরদোর সাজিয়ে রেখেছে। ব্যর্থ হয়ে ফিরে গিয়ে সে আর নতুন মা-র মুখোমুখি দাঁড়াতে পারেনি। নতুন মা তো জানে না, শ্রীপতি কেন চড় মেরেছিল। ভাগবতী কী এমন অন্যায় করেছিল যার জন্য চড় মারতে সে বাধ্য হয়েছিল।...

শ্রীপতি মরে গেলেও বলতে পারবে না নতুন মাকে—'বৌ বলেছিল ওকে না বিয়ে করে তোমাকেই বিয়ে করতে।' কি করে একথা মুখে আনবে শ্রীপতি। না, পারবে না।

শেষের দিন সে তৈরি হয়েই বেরিয়েছিল। ভাগবতীদের বাড়ি পৌঁছে সোজাসুজিই বলেছিল, 'আজ যদি তুমি না যাও তাহলে আমাকে আত্মঘাতী হতে হবে।'

ভাগবতী তখনও অনড়। কোনো কথা বলেনি। শ্রীপতি তখন তার পেটে হাত বুলিয়েছিল। আর তার চোখ থেকে টপ্ টপ্ করে জল ঝরেছিল।

—'আমার ছেলের জন্যও তুমি ফিরে চল। পেটের ছেলে ভূমিষ্ঠ হয়ে বড় কষ্ট পাবে তার বাবাকে না দেখলে।' ভাগবতী শ্রীপতির কাছ থেকে সরে উঠে গিয়েছিল।

—'ছেলের আর বাপকে দেখা হল না। বেটা হে, তোর বাপ মরতে চললো, তুমি শুনে রাখ। তোর মাটা তোর বাপকে চিরদিনই ভুলই বুঝে গেল। জানতে চাইলো না সত্যটা কি। তুই বাপ আমাকে ভুল বুঝিস না।'

ভাগবতীর গর্ভের সন্তানকে শুনিয়ে এসবই শুনিয়েছিল শ্রীপতি। এ গুলোই সম্ভবত তার সর্বশেষ কথা। মৃত্যুকালীন জবানবন্দীর মতোই [illegible]।

এরপর হাঁটতে [illegible]তে শ্রীপতি এসে পড়েছিল মোটবাঁধায়। মোড়ের চায়ের দোকানটা কি কারণে যেন বন্ধ ছিল। হয়ত এটাও ভবিতব্য। দোকানটা বন্ধ না হলে এখানে তাকে মরতে হত না। অন্য কোথাও মরার জন্য স্থান নির্বাচন করতে হত। হয়ত মনোমতো বা পছন্দসই জায়গা না থাকায় আত্মহত্যার সিদ্ধান্তটাও সে পাল্টে নিতে পারতো। এসবই হয়তোর ব্যাপার। হয়ত গুলো হয়নি। যা নিয়তি তাই হয়েছে। এটা ধরে নিলে অনেক প্রশ্ন থেকে নিজেকে সরিয়ে রাখা যায়।

প্রিয় পাঠক, আপনাদের নিশ্চয়ই স্মরণে আছে কালা হুলো নেপা আর গদা অনেকক্ষণ ধরে মৃত প্রজাপতিটাকে ঘিরে দাঁড়িয়ে আছে। গোরুগুলো এতক্ষণে নিজেরাই বাড়ি পৌঁছে গেছে।

এবার আপনি কালাদের কাছে ফিরে আসুন। এখন আকাশে অন্ধকার দানা বেঁধে এসেছে। অন্ধকারের ওপর অসংখ্য নক্ষত্র জোনাকির মতো জ্বলে আছে। মৃতের মুখে সেই নক্ষত্রের আলো এসে পড়েনি যদিও। চাঁদের আলোয় আবছা মোহময় চরাচর।

এক সময় একে একে অথবা একই সঙ্গে চারজন অনুভব করে মৃত প্রজাপতিটা ঠিক তারই কাঁধের পাশ দিয়ে উড়ে গেল রামনগরের দিকে। কাজেই তাদের আর অপেক্ষা করার প্রয়োজন নেই। ওরা বাড়ির পথ ধরে। নির্বাক। কারো মুখে কোনো কথা নেই। এরই মধ্যে কে যেন বলে বসে—লোকটা আত্মঘাতী হোল কেন রে?

হীরেন্দ্রকুমার বসু

কিন্নর কিন্নরী

নানমশাই বলেন—'কাল সকালে বাড়ি থাকবেন ?'

বলি—'হ্যাঁ।'

নানমশাই বলেন—'কাল সকালে আমি আসছি..ধরুন সাড়ে সাতটা-আটটার মধ্যে.. দশটায় আবার অফিস আছে তো।'

মাথা নেড়ে সায় দিয়ে সাইকেলে পা রাখি, উনি বলেন, নতুন ফিল্ম কোম্পানীর একটা নাম ঠিক করে রাখবেন।

আমি হেসে এগিয়ে চলি—

সাইকেলে যেতে যেত সুধীর নান-মশাইয়ের কথাগুলো ধীরে ধীরে আবার স্মরণ করি..ভদ্রলোক কাল সকালে বাড়িতে দেখা করবেন কথাটা সহজবোধ্য কিন্তু চলার পথে ওঁর শেষোক্তিটা যেন আমার যেন আমার সব গুলিয়ে দিল। ভদ্রলোক কি সত্যিই নিজে একটা কোম্পানী গড়ে তুলে তবে ছাড়বেন....কথাগুলো যেন সুধীর ধরের কোম্পানীকে একটা চ্যালেঞ্জ। সঙ্গে আমার সম্বন্ধ কি, কি বা করণীয় ? সঙ্গে আমারে সম্বন্ধ কি বা করণীয় ? আমি তো ফিল্মের ফ-ও বুঝি না..থাকা যাক সকালে এসে কি বলেন।

রেডিও পেঁছে দেখি বুড়োদা এসে-ছেন। বুড়োদা তাঁর ফিল্ম কাজের অবকাশে রেডিওতে মাঝে মাঝে আড্ডা বসাতে আসতেন। বুড়োদাকে দেখে বললাম—কাল সকালে বুড়োদা কি বাড়ি থাকছেন

বুড়োদা হেসে বলেন—কেন, ফের কি কোন নতুন পত্রিকা বার করছ নাকি ? খবরদার, খবরদার অমন কাজও কর না। যা ঘটেছে তার থেকে মানে মানে যে বেরুতে পেরেছ, সেইটাই বড় কথা। নইলে দেউলে করে ছেড়ে দিত।

আমি যখন 'আলপনা' চালাতাম তখন বুড়োদা ও গিরিজা বসু (কবি) চালাতেন 'বাদুঘর'—আমার পত্রিকা যেমন গঙ্গাপ্রাপ্ত হয়েছে ওঁদেরটাও তাই ঘটেছিল। বুড়োদা সেই উপলক্ষেই কথাগুলো বললেন।

আমি বলি—না ওসব নয়, অন্য একটা পরামর্শ আছে।

বেতার নাট্যকে কালের নাটক এখানি শুরু হবে। নাটকখানি 'অলীকবাবু', প্রধান ভূমিকায় সুপেনদা নিজেই নামবেন, 'পা চালেয়ে নিশি আগুয়ান' ও 'পা তোলায়ে নিশি অবসান' গান দুখানি গাইবেন বকুবাবু। আমার আর ধীরেনের আজ কিছুটা অবকাশ আছে। তাই স্টুডিওর স্বিতলে দক্ষিণের খোলা ছাতে দাঁড়িয়ে ধীরেনকে বললাম—ধীরেন। ধর যদি কোন একটা চিত্র-অনুষ্ঠান গড়ে তুলতে পারি—তোর মত কি ?

ও বলে, টাকা ?

আমি বলি—ধর সে ব্যবস্থা যদি সম্ভব হয়।

ও বলে—খুব ভাল হয়, দেখ না চেষ্টা করে, আমরা সবাই সহযোগিতা করব। দুশ্যান্তরের অবকাশে হাবুলদাকে কথাটা বলতে সে উৎসাহিত হয়ে বলে, তোমার যা যা আর্টিস্ট লাগবে আমায় বল, ব্যবস্থা হয়ে যাবে।

কিছু অভিমত জেনে নিয়ে নিজের মানস চোখে স্বপ্ন রচনায় রাত কাটাই। শুয়ে শুয়ে নতুন কোম্পানীর একটা নাম-করণও করে ফেললাম, 'ইউনিক পিকচার্স কর্পোরেশন'—বেশ গালভরা নাম।

ভোর আটটার মধ্যেই নানমশাই এসে উপস্থিত হলেন, তাঁর যথাযত আতিথ্য প্রকাশের শেষে তিনিই কথা শুরু করলেন—'দেখুন আমি ব্যবসা করে খাই তাই—ব্যবসাটা যে আপনি বোঝেন না জেনেই আপনাকে নিয়েই আমি ফিল্ম ব্যবসা শুরু করব। আপনি শিল্পী, শিল্প সৃষ্টির মর্যাদা বোঝেন, আপনার লেখা ও সুরের বহু নাটিকাই আমি রেডিও মাধ্যমে শুনেছি, বিশেষ করে কদিন আগের 'ওমর খৈয়াম' নাটিকাটি, তাই আমি বিশ্বাস রাখি এ ব্যবসায় আমরা গড়ে তুলতে পারব, যদি আপনি নিজে নায়কের ভূমিকায় অভিনয় করেন এবং আপনার সঙ্গে থাকে কিছু নাম-করা অভিনেতা-অভিনেত্রী। যেমন মিস নিভাননী, মিস রেণুবালা (দুধ), মিস লাইট আর কিছু রেডিওর নামকরা শিল্পী।

আমি চুপ করে থেকে বলি—তা হয়ত পারব।

উনি উঠে দাঁড়িয়ে বলে ওঠেন বাস, ছবির জন্যে আট হাজার টাকার চেক—আজই ব্যাংকে জমা করে দিচ্ছি—সই হবে দুজনার। খালি বলুন — কিছু নামটার ভেবেছেন কি ?

আমি বলি — ইউনিক পিকচার্স কর্পোরেশন নামটা আপনার কেমন লাগে ?

উনি বলেন—মন্দ কি, তাই হবে। তারপর বলেন—তাহলে আপনি দশটার আগেই স্নান খাওয়া সেরে তৈরী থাকুন, আমি এসে তুলে নিয়ে যাব।

সময়ক্ষেপ না করে উনি উঠে বসেন ওঁর মোটরে....

ঘটনাটা এতই তাড়িৎ-খাড়িৎ ঘটে গেল যে চিন্তার অবকাশ পর্যন্ত আমায় দিলেন না সুধীরবাবু। আমি স্নান খাওয়া সারতে সারতে ভাবি—ভাগ্যচক্রের গতি এখন কোনদিকে ?..এ যেন আলাউদ্দিনের আশ্চর্য প্রদীপের ভেল্কিবাজি।

প্রায় পৌনে দশটার মধ্যেই গাড়ি নিয়ে ফিরে এলেন. তৈরী ছিলাম, গাড়িতে উঠে বসলাম। পথে একটা কথাও হল না। দশটার মধ্যেই বহুবাজারের একটি রবার স্ট্যাম্প কোম্পানীর সামনে গাড়ি দাঁড়াল ... সুধীরবাবু দোকানের মালিককে ডেকে বললেন—এই লেখাটি অনুযায়ী একটি রবার স্ট্যাম্প করে বেলা এগারটার মধ্যেই দোকানে পৌঁছে দেবেন..যেন দেরি না হয়.. আজ আবার শনিবার—১২টায় ব্যাংক বন্ধ হয়ে যায়। লোকটির জবাবের অপেক্ষা না করেই গাড়ি স্টার্ট দিল এবং ১০-১৫র মধ্যেই তাঁর অফিসে এসে উপস্থিত হলাম। ঠিক এগারটার মধ্যেই রবার স্ট্যাম্প তৈরী হয়ে ওঁর টেবিলে পৌঁছল এবং সঙ্গে সঙ্গেই আমায় নিয়ে ব্যাংকে উপস্থিত হলেন।

ব্যাংকে আট হাজার টাকায় একাউন্ট খোলা হল ইউনিক পিকচার্স কর্পো-রেশনের নামে এবং চেকে রবার স্ট্যাম্পের ওপর সই করে (পাঁচ সাতখানিতে অবশ্য) আমার হাতে দিয়ে বললেন—যখন ইস্যু করবেন আমার সই-এর পাশে আপনিও সই করবেন।

বেলা ১টার মধ্যেই আমার ছুটি হয়ে গেল। সুধীরবাবু বললেন — আপনি দৌড়াদৌড়ি শুরু করে দিন..সামনের রবিবার সকালে আমি আসব আপনার বাড়িতে।

চেক বই পকেটে পুরে রাস্তা চলতে শুরু করি..এক নেশাগ্রস্ত লোকের মত। এ আমার আনন্দ না, মাথায় বজ্রাঘাত। ওঁর

আমির বিশ্বাসের প্রতিজ্ঞান আমি যে কিভাবে দেখ সেই দুর্ভাবনায় জড়জরত অবস্থায় ফিরে এলাম।

এক গেলাস জল খেয়ে ভাবতে বসি, কিভাবে কি করলে কার কার সাহায্য নিলে কাজ এগুনো যাবে। এই বিষয় আমি এতই অজ্ঞ যে, এর গঠন পদ্ধতির ধারাবাহিক প্রণালীটাই জানি না। কদিন প্রমোদের সঙ্গে ফিল্ম প্রতিষ্ঠান দেখতে গিয়ে যা ধারণা হয়েছিল তা মোটেই গঠনমূলক নয় বরং কি করে আর্টিস্ট হয়ে অন্য প্রতিষ্ঠানে কাজ জোগাড় করা যায় তারই করেছি অপচেষ্টা।

অপচেষ্টা বলছি এই জন্যে—বৃহস্পতি-বার অর্থাৎ গত পরশু দিন প্রমোদ আমায় নিয়ে ডালহাউসিতে এক প্রতিষ্ঠানে গিয়েছিল। কোম্পানীর নাম 'সারদা ফিল্মস'। পথে প্রমোদ জানিয়েছিল ওরা নাকি একশ টাকার শেয়ার কিনলে অভিনয়ের সুযোগ দেবে। প্রমোদ বললো—ওদের একজন হিরোও দরকার যদি তুমি একশ টাকা খরচ কর তাহলে তুমি হিরোর আসন অনায়াসে কেড়ে নিতে পারবে—কারণ তোমার ফটো জেনিকফেস আছে আর আমার জন্যে যদি একশ টাকা দিতে পারো আমিও পেয়ে যাবো একটি ক্যারেকটার রোল। একবার সুযোগ পেলে দেখবে কি রকম চার্লির মত মেকআপ করে....অভিনয় কাকে বলে।

ওদের অফিসের রিহার্সাল হলে দেখলাম বেশ ভিড়....তারই মাঝে অদূরে এক আপটুডেট সুন্দরী খুব স্টাইল করে হাত মুখ চোখ নেড়ে কথা বলছেন....ভদ্রমহিলা রূপসী ও সুন্দরী এবং দেখে মনে হয় ইনি কোন এরিস্টক্রেট ফ্যামিলিরই মেয়ে। প্রমোদকে জিজ্ঞেস করায় বললো—কেন ? কাগজে পড়ো নি বাংলাদেশের রয়েল ফ্যামিলির একজন শিক্ষিতা মেয়ে ফিল্মে কাষিতই যোগদান করবে ? ইনিই সেই মহিলা....এঁদের ভাবী হিরোইন।

একজন পার্শি ভদ্রলোক স্বগোষ্ঠী সহ সভায় এসে ঢুকলেন....হলের সবাই দাঁড়িয়ে উঠে তাঁকে সম্মান জানান—এমনকি সুন্দরীশ্রেষ্ঠা পর্যন্ত। প্রমোদ কানে কানে বললো—ইনিই মিঃ সারদা...এই কোম্পানীর ম্যানেজিং ডাইরেকটর। ভদ্র-লোকের ডান পাশে একটি কোটপ্যান্ট পরিহিত ফুটফুটে তরুণ দাঁড়িয়েছিলেন—মিঃ সারদা তাঁকে দেখিয়ে সবাইকে...বিশেষ করে হিরোইনের দিকে চেয়ে বলেন... এঁকেই হিরো ঠিক করলাম—শ্রীকানাই ঘোষাল। আজ আনন্দে এনাউন্স করছি আমাদের শিল্পী চয়ন শেষ হয়েছে—এইবার শীঘ্রই স্যুটিং শুরু করা হবে।

শোনা মাত্রই প্রমোদের মুখে কে যেন কালি লেপে দিল...আমার মুখও হয়ত তাই....কারণ মনের অবচেতন অধ্যায়ে নিজেকে কখন হিরোর আসনে বসিয়েছিলাম তা নিজেই জানি না... তাই প্রমোদের মতন আমার মনও হতাশায় ভরে গেল। নিমেষেই প্রমোদকে নিয়ে ওদের অফিস ছেড়ে রাস্তায় এসে দাঁড়ালাম। প্রমোদ কথা বলেনি আমি শুধু বললাম—দেড়িও চলি...তুমি পারো তো শনিবার একবার এসো, শুক্রবার প্রমোদের নাটক ডে, ব্যস্ত থাকবো।

বৃহস্পতিবারের বারবেলায় যে অবহেলা আমাদের কপালে লেখা ছিল সেই লেখা শুক্রবারের বিকেলেই কী করে সাদর আবাহনে উল্টে গেলো সেই কথাটাই ভাবছিলাম এমন সময় চাকর চা দিয়ে গেল অর্থাৎ ছিমটে থেকে গ্যাছে....চা মুখে দিতে যাবো এমন সময় প্রমোদ এসে উপস্থিত হলো। আমি যেন হাতে স্বর্গ পেলাম। বললাম—দুদিন ডুব মেরেছিলে কেন ?

প্রমোদ বললো—দুদিন ? তুমি তো কাল তোমার থিয়েটার ডে বলে আসতে মানা করেছিলে....আজকেই তো সময় দিয়েছিলে।

আমি বলি—এদিকে কালই ঘটে গেল চিচিং ফাঁক।

প্রমোদ বলে, চিচিং ফাঁক—সে আবার কি ?

উত্তর দি হেসে হেসে—হ্যাঁ চিচিং ফাঁক—হীরে জহরৎ-এর দরজা খুলে গেছে, যত ইচ্ছে ততো নাও...কেবল কাসিম মিঞার মত বেরোবার মন্ত্রটা ভুল না।

হতচকিৎ হয়ে প্রমোদ আমার দিকে চেয়ে থাকে। আমি বলি ফিল্ম কোম্পানী খুলে দিয়েছি কালই...ইউনিক পিকচার করপোরেশন...ব্যাংকে টাকা ডিপজিট হয়ে গেছে এখন চাই গল্প-আর্টিস্ট-ক্যামেরা-ম্যান-ফিল্ম।

প্রমোদকে ধীরে ধীরে কালকের ও আজ সকালের ব্যাপার বললাম। সব শুনে প্রমোদ বললো—অংকটা কিছু বাড়িয়ে বললে না কেন ? থাক—তা কম পড়লে পরে ম্যানেজ করা যাবে।

আমি বললাম—যা বলেছি তার মধ্যেই করতে হবে—তবু কথার খেলাপ করব না। তারপর গল্প কি হবে বল ? মাথায় কিছু আসছে ?

ভাবগম্ভীরভাবে প্রমোদ বলে—গল্প রেডি—এখন তোমাদের পছন্দ হলেই হয়।

চাপানের সাথে সাথেই প্রমোদ গল্প বলতে শুরু করলো। আমার বেশ পছন্দ হোলো। গল্পের হিরোকে হিরোইন এক অদ্ভুত পরিস্থিতিতে গভীর রাত্রে চোর বলে সাব্যস্ত করে 'চোর-চোর' চীৎকার করে ওঠে ... জনতার হাত থেকে বাঁচবার জন্যে হিরো হিরোইনের মুখে হাত চেপে দিয়ে বলে উঠেছিল—এই 'হাস—চুপ!' আবার গল্পের পরিসমাপ্তিতেও—এই হাস্! চুপ! ! -এর চাপা আওয়াজের প্রয়োজন হয়... তাই বই-এর নামকরণ করলাম হাস্ ! চুপ ! !

বললাম, গল্প আমার পছন্দ হয়েছে.... এখন সুধীরবাবুকে শোনাতে হবে—তুমি আজই রাত থেকে লিখতে বসে যাও।.... কাল সকালে আমার কাজ আছে..... তুমি ৩।৪টার সময় এসো.... আশাকরি এ সময়ের মধ্যেই গল্প লেখা শেষ করতে পারবে?

প্রমোদ বললো—হয়ে যাবে।

আমি বলি—তাহলে ৪টার পরে আমি সুধীরবাবুকে গল্প শোনার নিমন্ত্রণ করি কাল—কি বল?

প্রমোদ বলে—তা পারো।

আমি উঠে পড়ি—বলি, আজ আবার শনিবার—থিয়েটারে যাবার আছে—হাবুলদা আমার জন্যে অপেক্ষা করবে।

প্রমোদ বলে—দু'চারটে টাকা হবে?

আমি বলি—কেন?

প্রমোদ উত্তর দেয়—ভাবছি ফেরবার মুখে একবার থ্যাকার্স' বা স্মিথে দেখবো ফিল্ম টেকনিক সম্বন্ধে কী কী বই সংগ্রহ করতে পারি।

কথাটা তাৎপর্যপূর্ণ তাই.... পকেট থেকে বার করে প্রমোদের হাতে দশটা টাকা দিলাম।

৫

রবিবার সকাল ৯টা নাগাদ বুড়োদার বাড়ি গিয়ে উপস্থিত হলাম। বুড়োদা অর্থাৎ প্রেমাঙ্কুর আতর্থী থাকতেন কর্নওয়ালিশ স্ট্রীটে সঙ্গীত সমাজের উপর তলায়—আমার বাড়ির খুব কাছে। ঘরে ঢুকতেই বুড়োদা বলেন—হ্যাঁহে—তুমি নাকি ফিল্ম করছো?

বলি—কার কাছে শুনলেন

বললেন—সেদিন রেডিও[illegible]কে যেন বলছিল। কিন্তু সাবধান ভারি [illegible] লাইন। কোনো লোককে বিশ্বাস করবে না—কারণ—কেউ কিছু জানে না—স্রেফ ব্লাফে চালাচ্ছে।

আমি জিজ্ঞাসা করি—আচ্ছা বুড়োদা—নীতিন বসুকে ক্যামেরায় পাওয়া যায় না?

বুড়োদা ভুরু কুঁচকে বলেন—নীতিন ? তবেই হয়েছে.... ওর সময় কখন। মনে করো 'ইনকারনেশন' এখনও বাকী .... দেবদাসের টাইটেল তুলতে বাকী। তাছাড়া হরেন ঘোষের 'বুকের বোঝা' .... আমাদের ইস্টার নাশনাল ফিল্ম ক্র্যাফটের 'চাষার মেয়ে'। .... ওর সময় কখন—ও সব বড় বড় কথা ছাড়। অন্য ক্যামেরাম্যানের কথা ভাবো।

প্রসঙ্গে বলে রাখি বিখ্যাত ইমপ্রেসারিও হরেন ঘোষ মশাই-এর তত্ত্বাবধানে তখন 'বুকের বোঝা' ছবি উঠছিল। এদেরই সাহায্য করতে গিয়ে মিঃ বি এন সরকার মশাই ফিল্ম লাইনে ইন্টারেস্টেড হয়ে—ইস্টার নাশনাল ফিল্ম ক্র্যাফট কোম্পানী খুলেছেন—তাঁদের শ্রী চারু রায় মহাশয়ের 'চোরকাটা' ও শ্রীপ্রেমাঙ্কুর আতর্থীর—'চাষার মেয়ে' ছবি তুলছিলেন। নীতিন বসু এই কোম্পানীতে পাকাপাকি-ভাবে যোগ দেওয়া মনস্থ করেছিলেন।

বুড়োদার কথা শুনে খুব দমে গিয়ে—ধীরে ধীরে বলি,—অন্য কে কে আছেন—এক আধটা নাম তো বলে দিন?

উনি মাথা চুলকে বলেন—কাজের লোক বলতে আছে কৈ? .... হ্যাঁ—হ্যাঁ ভালকথা তুমি সুবোধের কাছে যাও না—ও লোকটি ভাল।

বলি —কে সুবোধবাবু?

উনি বলেন—'ঐ যে হে ঝামাপুকুরে —এ [illegible] দেবেদের বাড়িতে [illegible] [illegible]

জোগা রঙ বেঁটে মত, মাথার কাঁকড়া কাঁকড়া বাহার চুল।'

বলি—ওঁর পুরো নামটি কি—

বলেন—সেটা ঠিক মনে নেই—গাঙ্গুলী না বাঁড়ুজ্যে.... ওই লোকটার একেবারে আছে ... হাতে নাতে কিছু কাজ শিখাই আসে। তাছাড়া ওঁর বাবা ছিলেন বায়স্কোপের এক-জন পাওনিয়ার। তোমার ঐ ধরনের একজন লোকেরই দরকার কারণ তুমি নিজে তো কিছুই জান না। সুবোধ থাকলে তোমাকে সে সবদিক থেকেই সাহায্য করতে পারবে।

চায়ের কাপটা শেষ করেই উঠে পড়ি— বলি, দেখি একবার না হয় ওখানেই চলে যাই ....

বড়োদা বলেন—টাকা কড়ির ব্যবস্থা হয়েছে তো?

আমি বলি—হ্যাঁ—মামেরা আমার পেছনে আছেন।

বড়োদা উৎসাহ দিয়ে বলেন—তবে এগিয়ে পড়ো—যাও—যাও—সুবোধের কাছে এখনি চলে যাও ...বেলা ১টা দেড়টার সময় ও বাড়িতেই থাকে।

সুবোধ মজুমদারের বাড়ির ভাড়াটে বলে আমার সুবোধবাবুর পদবি সংগ্রহ করতে দেরি হলো না। সুবোধ মজুমদার বললেন—ওই যা না আমাদের বাড়ির দরজার ডান পাশের দরজা দিয়ে ঢুকে উঠান পার হয়ে ভেতর বাড়িতে চলে যাবি ওখানেই থাকেন উনি।

বাইরের উঠান পার হয়ে ভিতর বাড়ির খালি উঠানের সামনেই একটি দালান তার সংলগ্ন ২।৩খানি ঘর পর পর। ডাকলাম—সুবোধবাবু—সুবোধবাবু সুবোধবাবু বাড়ি আছেন?

সাড়া শব্দ নেই .... দালানে ওঠে দাঁড়ালাম ... রাশি রাশি আবর্জনা অর্থাৎ বইপত্র ছড়ানো। আবার ডাকলাম—সুবোধ-বাবু আছেন ?

—হঠাৎ উত্তর এলো—কে? ...ওইখানে তক্তাপোশে বসুন ঘরে ঢুকলেন না। অদৃশ্য কণ্ঠের ধরন দেখে বুকটার মধ্যে কেঁপে উঠলো.........

তক্তাপোশে একরাশ কালো সুতোর বিড়ি ছড়ানো ... মাঝখানটাতে খালো হাতি—তারই এক কোণে স্থির হয়ে বসে .. অদৃশ্য বক্তার আগমনের পথ চেয়ে থাকি। এমন সময় খালি গায়ে একটি ধপ্‌ ধপে ফরসা বেঁটে ভদ্রলোক দালানের শেষ প্রান্তের ঘরটি থেকে বার হয়ে এলেন—হাতে তাঁর একটি মেথিলেটেড স্পিরিটের স্টোভ। কানে পৈতে গোঁজা ও সাপড় পড়ার ধরনে বুঝলাম বেলা ১০টার সময় প্রাতঃকৃত্য সারছেন। আমার দিকে ভ্রু কুঁচকে একবার চাইলেন—বলেন, ঘরের মধ্যে যাননি তো ?

আমি বলি—না

উনি অন্তত বার পাঁচেক ভাল বাস হওয়া ঘরের মধ্যে ঢুকলেন এবং বেরোলেন— [illegible]রেই হাতে[illegible] ধুয়ে এই রকম বেড়ুলেন। তারপর হাত ধোয়ার পালা—১বার ২বার-৩বার-৪বার—খুব হাত ধোয়া শেষ করে—গলায় মলমলটা গায়ে জড়িয়ে আমার দিকে এগিয়ে এসে বলেন—এইখানেই বসুন —আমি ঘর থেকে আসছি।

আমি ভদ্রলোকের আবশাতিক দেখে নিশ্চয় জেনেছি ভদ্রলোক খুবই শিটপিটে এবং সাবধানী।

একটা বেনিয়ান গায়ে দিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে—তক্তপোশের পাশের একটি ডেক-চেয়ারে বসে বললেন—কি চাই ?—

বলি— বড়োদা— মানে প্রেমাঙ্কুরদা আপনার কাছে আমায় পাঠিয়েছেন—আমি একটা ছবি তুলতে চাই।

শুনে উনি বলেন—ফটো? তা আমার তো স্টুডিও নেই যে আপনার ছবি তুলে দেবো—আপনি বরং ডি-রতন কোম্পানীতে চলে যান। ওদের স্টুডিও বেশ ইকুইপড্।

আমি বাধা দিয়ে বলি—না—আমি একটা ফিল্ম তুলতে চাই—তাই আপনার কাছে এসেছি।

আমার আপাদমস্তক বেশ খানিক দেখে নিয়ে বলেন—আপনার মত অনেক জ্যাঠা ছোকরারা আমার কাছে রোজ রোজ ফিল্ম তুলতে আসে—তারপরএটা-ওটা-সেটা জিজ্ঞেস করে সেই যে ভেগে পড়ে আর চুলের টিকি দেখি না। আপনি বড়োদার কাছ থেকে আসছেন—আপনাকে আর কি বলবো—মিথ্যে মিথ্যে আমায় বকাবেন না। আমার অনেক কাজ।

প্রতিবাদ জানিয়ে আমি বলি—না—না —আমি সত্যিই একটা ফিল্ম তুলতে চাই তাই একজন ক্যামেরাম্যানের আশায় বড়োদা আপনার কাছেই পাঠিয়ে দিলেন। তাছাড়া আমি ফিল্ম বিষয় একেবারে অজ্ঞ, বড়োদা বললেন সুবোধের কাছে যাও—সে সব বিষয়ই তোমায় পথ দেখাতে পারবে।

সুবোধদার তীক্ষ্ণ দৃষ্টিটা দেখলাম নমিত হয়ে এলো... মৃদু হেসে বললেন— এই প্রথম দেখলাম যে আপনার বয়সী নবীন যুবক এমনতর সত্য করে তার অজ্ঞতাটুকু স্বীকার করে।

আমি বলি—আপনাকে আমি সুবোধদা বলবো—আপনিই হোন আমার ফিল্ম শিক্ষার গুরু।

এরপর সুবোধদা বলেন—তবে বসো। ' এই বলে কাগজপত্র ফাইল খুলে লেখাপড়া করতে থাকেন—হিসেবের অঙ্ক কষেন। প্রায় আধ ঘণ্টা পরে বলেন—মোট চার হাজার টাকা লাগবে তোমার—তাতে ফিল্ম, ক্যামেরা। লেবরেটারী—পজেটিভ হয়ে যাবে। তবে আজকালের মধ্যে কনট্রাক্ট হলে এই রেট, নইলে দেরিতে বদলে যেতে পারে।

আমি বললাম—আমি আজকালের মধ্যেই কনট্রাক্ট করবো—তবে আমার এক পার্টনার আছেন। তাঁর নাম শ্রীসুধীরচন্দ্র বাবু— বি মিত্র বাবু ব্যানার্জির প্রোপ্রাইটার। বলেন তো তাঁর সঙ্গে আপনার আলাপ করিয়ে দি....তাহলে আমাদের কনট্রাক্ট হয়ে যাওয়া সহজসাধ্য হবে।

তিনি বলেন—কোথায় তাঁর বাড়ি আমি বলি—তাঁর বাড়ি বেহালা রোডে। তবে আজ বেলা ৪টা আপনি আসবেন আমার বাড়িতে—অর্থাৎ বাগবাজারেই কথাবার্তা প্রকাশ হতে পারবে।

উনি রাজী হয়ে গেলেন। আমি কথা না বাড়িয়ে ওখান থেকে সটান বেহালা রোডে চলে গিয়ে—যখন বাড়ি ফিরলাম তখন বেলা দেড়টা বেজে গেছে।

ঠিক চারটের সময় সুধীরবাবু এসে হাজির হলেন এবং এর পাঁচ-সাত মিনিটের মধ্যেই সুবোধদা এলেন। সুবোধদা সুধীর বাবুকে তাঁর সমস্ত এস্টিমেটটা বুঝিয়ে দিলেন। সুধীরবাবু এক কথাতেই রাজী হয়ে গেলেন। তারপরদিন মিঃ ওসি গাঙ্গুলী এটর্নী মশাই-এর অফিসে কনট্রাক্ট ডিড্ আমাদের সম্পন্ন হোলো।

ইতিমধ্যে প্রমোদ এসে গেছে। সুবোধ-বাবু চলে যাবার পরই সে ছবির গল্পাংশ পড়ে শোনাতে শুরু করলেন। সুধীরবাবু বললেন—পড়াশুনার দরকার নেই ও আপনি ধীরেন বসুকে শোনাবেন—শুধু মুখে মুখে গল্পটা বলুন।

গল্প শুনে সুধীরবাবু রাজী হয়ে গেলেন। ছবির নামকরণও তাঁর পছন্দ হয়ে গেল। সুধীরবাবু ৫টার মধ্যেই বাড়ি চলে গেলেন। রইলাম আমি আর প্রমোদ।

প্রমোদ বললে—কি ক্যামেরাম্যান ঠিক হয়ে গেল ? আমি বলি, হ্যাঁ প্রায়। কালই কনট্রাক্ট হবে। এখন গল্পের সিনারিও সম্বন্ধে কি হবে ?

প্রমোদ পকেট থেকে একখানা চটি বই বার করে বললে—থ্যাকার্স—না কিছুই কোথাও পেলাম না একখানা সিনেমা টেকনিকের বই। থ্যাকার্স থেকে এই বইটা দুটাকা দিয়ে নিয়ে এসেছি—দ্যাখো।

বইখানার ওপর লেখা—হাউ টু রাইট সিনেরিও।

আনন্দে ডগমগ হয়ে বই খুলে পড়তে শুরু করি। সারা বই এতে ডি-এস-এল-এস, এম-এস-সি-ইউ লেখা যার এক বর্ণও আমার বোধগম্য হোলো না। বললাম এসব কি কোড ল্যাঙ্গুয়েজ ? ?

প্রমোদ বললে—ওগুলোর কথা প্রিফেসে দেওয়া আছে—ওগুলো মানে ডিস্ট্যান্ট সট, লং সট, মিড সট ক্লোজ-আপ—কিন্তু আইরিশ ইন—আইরিশ আউট এগুলো বুঝছি না।

আমি বলি কালই কাগজে একটা এডভারটাইজমেন্ট দিয়ে দাও কে সিনারিও লিখতে জানো দেখা করো। দেখা যাক কি ফল পাওয়া যায়—নইলে সুবোধদার কাছেই বুঝে নিতে হবে।

(চলবে)

লীলা মজুমদার

পাকদণ্ডী

২৯

১৯২৬-২৭ সাল; দেশ স্বাধীন হতে তখনো ২০ বছর বাকি। এখনকার ছেলেমেয়েরা পরাধীনতার গ্লানি কাকে বলে তাও জানে না, আবার স্বাধীনতা-সংগ্রামের গৌরব কাকে বলে তাও জানে না। 'ফরেন' সাবান, এসেন্স, পেন্টেলুনের কাপড় কিনে দেমাক করে বেড়ায়। আমার যখন ১৭-১৮ বছর বয়স, তখন বাঙালী ছেলে-মেয়েদের কারো যদি বিদেশী কিছু থাকত তো হয় সেগুলো ফেলে দিত, নয়তো বিলিয়ে দিত, নয়ত লুকিয়ে রাখত। মোট কথা গায়ে দিত না। এসব কথা আগেও বলেছি। খদ্দর সকলে না পরলেও, দেশের মিলের মোটা কাপড় পরত। বিদেশী সুতো ব্যবহার করা হয় বলে তাঁতের কাপড়-ও অনেকে পরত না। এতদিন পর্যন্ত বাইরে থেকে এইটুকুই দেখা যেত। ভিতরে ভিতরে যে আগুন জ্বলত বাইরে থেকে তার সামান্যই বোঝা যেত। আবার উল্টো ফল-ও ছিল। তারা বলত এত বড় দেশ শাসন করবার ক্ষমতা আমাদের নেই, এখন স্বাধীনতা পেলেও আমরা রাখতে পারব না; শুধু খদ্দর পরে গরম গরম বক্তৃতা করে আর পুলিসের লাঠি খেয়ে দেশ শাসন করবার ক্ষমতা গজায় না। আমার একজন নিকট আত্মীয়াকে এতদূর বলতে শুনেছিলাম যে ব্রিটিশরা এ দেশ ছেড়ে চলে গেলে, আমরাও সঙ্গে সঙ্গে চলে যাব। আমাদের বয়সী অনেকেই এমন কথা শুনলে চটে যেত; কিন্তু আজ ৫০ বছর পরে, ত্রিশ বছর স্বাধীনতা উপভোগ করে, মাঝে মাঝেই মনে হয় আজ পর্যন্ত কি আমাদের সে বুদ্ধি গজিয়েছে? আর শুধু আমরাই না, গোটা পৃথিবীসুদ্ধ সব দেশ দিনে দিনে ক্রমে সাবালকত্ব প্রাপ্ত হচ্ছে না তো? সে যাই হক, তখনো চোখে আদর্শবাদের ঘোর লেগে ছিল, ভাবতাম একবার দেশটা স্বাধীন হলেই সকলের সব দুঃখ দূর হয়ে যাবে। এসব বিষয়ে আমাদের সেই ভাইপো অশোক, যাকে মা-বাবা মানুষ করেছিলেন, সে আমাদের মস্ত সহায় ছিল। খদ্দরের রুমালে ফুল তোলা হবে, তাকে দিয়ে রং মিলিয়ে সুতো কিনতে বলা হলে, সে বলে বসল, 'ঐসব এম্ব্রয়ডারি সুতো বিদেশ থেকে আসে, ও আমি কিনতে পারব না।' কি মুশকিল! তাকে যত বলা হয় এগুলো ইংল্যান্ডের জিনিস নয়, এসব ফ্রান্স থেকে আসে, অশোক ততই বলে, 'ঐ একই হল। সব সায়েব-ই এক রকম।' এই বলে ম্যাড়-ম্যাড়ে রঙের দিশী সুতো কোত্থেকে এনে দিল। তা সে ছুঁচে পরিয়ে ফোঁড় তুলতে গেলে সুতো ফেঁসে যায়। অশোক কিছুতেই বিদেশী সুতো আনবে না, তাতে নাকি খদ্দরের অপমান হয়। সেই সময় মুগার আর গরদের এম্ব্রয়ডারী সুতো ওঠাতে সমস্যা ভঞ্জন হল।

তবে মজার ব্যাপার-ও হত। ভারি গুণী এক বাঙালী মেয়ে, আই-সি-এসের কন্যা, বিলেত থেকে পাস্-টাস্ করে দেশে ফিরে খদ্দর পরা ধরল, কংগ্রেসের সভায় বক্তৃতা দিতে শুরু করল। একজন আই-সি-এস পাত্রের সঙ্গে তার বিয়েও স্থির হল; অশোক আই সি এসদের যেমন ঘৃণা করত —বলত সায়েবদের শেয়াল—খদ্দরধারীদের তেমনি ভক্তি করত। এবার সে দো-টানায় পড়ে গেল। তার ওপর কে যেন বলে গেল ঐ বিয়েতে দিশী মতে অনুষ্ঠান ছাড়াও একদিন আগে কি পরে ফ্যাশানেবল বন্ধুদের জন্য— তাদের মধ্যে প্রচুর সায়েব থাকবে—কক্‌টেল পার্টির ব্যবস্থা হয়েছে; বলা বাহুল্য তাতে বিলিতী পানীয় পরিবেশন করা হবে। অবিশ্যি ইচ্ছা থাকলেও দিশী কড়া পানীয় দিতে পারত না? কারণ তাড়ি আর ধেনো ইত্যাদি ছাড়া পাওয়া যেত না। অশোক তখন এইরকম। খদ্দরধারী কক্‌টেল-আমোদীদের প্রতি তিক্ত শ্লেষ-বাক্য প্রয়োজ করতে লাগল। আমিও যে একটু হকচাকিয়ে যাইনি তা নয়। পরে এ-রকম বহু তথা-কথিত দেশকর্মীদের মধ্যে এই অ-সংগতি লক্ষ্য করেছিলাম। কিন্তু সত্যের খাতিরে একথা বলতে বাধ্য হলাম যে ঐ দুটি মানুষ, ঐ মহিলা ও তার আই সি এস স্বামী সারা জীবন অক্লান্তভাবে ব্যক্তিগত বিলাসিতা ত্যাগ করে দেশের জন্য কাজ করে বুড়ো হয়ে গেছেন। দেশ-সেবা আসলে কক্‌টেল পার্টির চাইতে অনেক বড় জিনিস।

ততদিনে বি-এ ক্লাস শুরু হয়ে গেছে। ইংরাজিতে অনার্স নিয়েছি—নইলে বাংলা লিখব কি করে? আর অংক ইকনমিক্‌স নিয়েছি। ফাঁকি দিয়ে নম্বর তুলব ভেবেছিলাম। কিন্তু আবার সেই ফাঁদে পড়ে গেলাম। অংক দেখলে আর না কষে থাকতে পারতাম না। ছ'টা বইয়ের সব অংক করেছিলাম। অবিশ্যি তার জন্য প্রায়ই ব্যথায় আক্রান্ত হতে হয়েছিল। এই একটা রহস্যের আজ পর্যন্ত মীমাংসা করতে পারলাম না। সত্যি বলছি অংক কষতে আমার ভালো লাগত না, অথচ না কষেও থাকতে পারতাম না। যখন কাল্পনিক সংখ্যার পর্যায় উঠলাম, অ্যাস্ট্রনমি পড়তে গিয়ে অসীমের মোকাবিলা করতে হল, তখন কেবলি মনে হত এইবার সৃষ্টির রহস্য বুঝি আমার হাতের মুঠোর মধ্যে ধরা দেবে, কিন্তু কেবলি সে আমার উৎসুক দৃষ্টি এড়িয়ে যেত। দিদিকে ব্যাপারটা বলবার চেষ্টা করতেই, সে অবাক হয়ে বলল, 'দূর! তা কেন' রইল ঐ পর্যন্ত। ভালো নম্বর পেয়ে বি-এ পাস করবার পর আর একবারো অ্যাস্ট্রনমির বই খুলিনি।

ইকনমিকস ছিল অন্য ব্যাপার। আধবুড়ি মেম মিস্ রাইট আমাদের পলিটিকেল ফিলসফি পড়াতেন, তখনো এটি একটা আলাদা বিষয় হয়নি। বেজায় ভালো লাগত। আর জেনারেল ইকনমিক্‌স আর ইণ্ডিয়ান ইকনমিক্‌স পড়াতেন জ্যোতীশচন্দ্র ঘটক। তিনি ছিলেন সুলেখক সতীশচন্দ্র ঘটকের ছোট ভাই। কালো, মোটা, হেঁড়ে গলা, রস-রসিক। ডবল এম-এ, ভারি বিদ্বান, কিন্তু রস-রসিক। মাঝে মাঝে ওঁর তৃতীয় বার্ষিক শ্রেণীর সংস্কৃত ছাত্রীরা মূল সংস্কৃত শ্লোকের ওঁর মুখ-প্রক্ষালন ব্যাখ্যানা শুনে মুখটুখ লাল করে বলত, 'জলের মতো করে বুঝিয়ে দিলেন বটে, কিন্তু ভাই লোকটা ভারি অসভ্য।'

তবে ইকনমিকস ক্লাশে সে-সবের সুযোগ ছিল না। প্রথম দিনই ইকনমিকসের বিষয়-বস্তুর ব্যাখ্যা করে বললেন যে ম্যাডাম স্মিথের মতো ইকনমিকস হল প্রাত্যহিক কাজ-কর্মে রত মানুষের অনুশীলন। আর ঐ প্রাত্যহিক কাজকর্মটি হল নাকি বেচা-কেনা। সস্তায় কিনে, বেশি দামে বেচা। শুনে আমি আর আমার সহ-পাঠী বন্ধু লিলি সেন রেগে টং। দুজনেই ইংরিজি সাহিত্যের ছাত্রী, এ-সব কথা মানবে কেন? তৃতীয় ছাত্রী ছিলেন মিস্ ন্যাজারাস্ বলে একজন দক্ষিণ ভারতীয় মহিলা। আমাদের চাইতে অনেক বড়। অনেক বছর স্কুলে পড়িয়ে টাকা জমিয়ে, চাকরির উন্নতি-কল্পে বি-এ পড়তে এসেছেন। কারো সঙ্গে মিশতেন না। তবে আমি চেষ্টা-চরিত্তির করে ভাব করে ফেললাম। ওঁকে 'লেজু' বলে ডাকতাম। লিলি বলেছিল রেগে যাবেন, কিন্তু 'লেজু' দেখলাম খুসি হলেন। চমৎকার মানুষ। পাস্ করে আর যোগাযোগ রাখিনি বলে দুঃখ হয়।

সে যাই হক। সপ্তাহে পাঁচ দিন কলেজ বসত, শনি রবি বন্ধ থাকত। ঐ পাঁচ দিনের মধ্যে তিন দিন ইকনমিক্‌স লেকচার থাকত, একদিন অধীত বিষয় নিয়ে লিখতে হত। প্রশ্ন আগেই বলা থাকত, তৈরি করে

হাজির হই। পাঁচিল দিয়ে ঘেরা অনেকটা জায়গার ওপর এ্যাশ এবং সুরকী রঙের দোতলা বাড়ী। লোহার গেট। গেটের বাঁ দিকের পিলারটি মাধবীলতার আড়ালে। নিচে চিঠির বাক্স-র ওপরে শ্বেত পাথরের ট্যাবলেটে জ্বলজ্বলে কালো অক্ষরে লেখা, 'কল্লোল।'

রাস্তা থেকে দেখতে পেলাম, দোতলায়, বাইরের দিকে গ্রীল দেওয়া প্যাসেজে উনি বসে আছেন। গেটে শব্দ করে দৃষ্টি আকর্ষণ করতেই, গম্ভীর গলায় জিজ্ঞাসা করলেন, 'কি চাই?'

'আমার আসবার কথা ছিল। অমৃত পত্রিকা থেকে—' বলতেই বললেন, 'আসুন।'

গেট ঠেলে ভেতরে ঢুকলাম। পাঁচিলের গা দিয়ে গাছের সারি এবং একটি পথ সোজা নাকবরাবর চলে গেছে গ্যারেজে।

গেটের বাঁদিকে কিছু গাছগাছালি। কাঠগোলাপ, জবা, পাম ইত্যাদি নিয়ে একটি ছোটো খাটো বাগানমত। সারি সারি টবে গাঁদা ফুলের গাছ। বেশ বড় বড় ফুল ফুটে আছে। একটি রবারের জলের পাইপ পড়ে আছে।

বাড়ীর ভেতরের গেট দিয়ে ঢুকে ঈষৎ বাঁদিকে, কোনাকুনি। নিচু ধাপের সিঁড়ি ভেঙে চৌকাঠ পেরোলেই প্যাসেজ। মাঝখানে অতি মূল্যবান সোফা সেট, এককোণে একটি পিয়ানো। দুপাশে ঘর। বাঁদিকের একটি ঘরে দেখলাম দেয়ালের নিচ থেকে ওপর পর্যন্ত অজস্র বই।

প্যাসেজ পেরোলেই ওপরে যাওয়ার সিঁড়ি। সিঁড়ির নিচে পাথরের মূর্তির মত দণ্ডায়মান একজন পরিচারিকা। উৎপলবাবু আমাকে ওপরে যাওয়ার অনুমতি দিয়েছেন কিনা জেনে, চটি খুলে ওপরে যেতে বললেন। সিঁড়ি দিয়ে ওপরে উঠতেও প্রতিটি পদক্ষেপে থমকে যেতে হয়। সিঁড়িতেই চোখে পড়ে সম্ভবত চীনা শিল্পীর আঁকা একখানি ছবি।

ওপরে উঠেই প্যাসেজ। মাঝখানে দামী বসবার জায়গা। বাঁদিকে ঘর। ডানদিকে বিরাট সুসজ্জিত ড্রইংরুম। দেয়ালে ছবি। কোচ। একদিকে সানমাইকা দেওয়া একটি ঈষৎ ত্রিভুজাকৃতি কাউণ্টার টেবিল। তার গা ঘেঁষে গদি মোড়া সুদৃশ্য ছোট ছোট এক স্ট্যাণ্ডের টুল। অতি সহজেই বিদেশী টেকসাস ছবির পানশালার কথা মনে পড়ে যায়।

এই ড্রইংরুমেই শ্রীমতী শোভা সেন আমাকে নিয়ে যাচ্ছিলেন। কিন্তু প্যাসেজের অপর প্রান্ত থেকে উৎপলবাবু ডাকলেন, 'এখানে আসুন।'

গেলাম। গ্রীলের গা ঘেঁষে লোহার ওপর প্লাস্টিকের রঙীন ফিতে জড়ানো গার্ডেন সেট। এককোণে পিতলের ওপর কারুকার্য করা বড় টব। উৎপলবাবুর বাঁদিকের নিচু টেবিলে টেলিফোন, শেড দেওয়া টেবিল ল্যাম্প, নোটবুক, পেন্সিল, প্যাড এবং টেলিফোন ডিরেকটরী।

দামী স্লিপিং স্যুটের ওপর ড্রেসিং গাউন। পায়ে চওড়া কালো ফিতের হাইহিল চটি। সামনের টি টেবিলে সকালের কাগজ, সদ্য শেষ করা চায়ের কাপ, উপজাতিদের তৈরী পিতলের এ্যাশট্রে। ডান হাতে ছুরি দিয়ে বাঁ হাতে ধরে থাকা বইয়ের জোড়া পাতাগুলো কাটছিলেন। আমাকে বসতে বলে, বইটি নামিয়ে রাখলেন টেবিলে। মনসামঙ্গল।

'দেখি মহিলা কি লিখেছেন—' বলে হাত বাড়ালেন। আমি নির্দিষ্ট পাতাটি বের করে গত ১৪ অকটোবরের অমৃত পত্রিকা দিলাম। ইতিমধ্যে পায়ে পায়ে শোভাদেবী পাশে এসে দাঁড়িয়েছেন। গায়ে হাউস কোট। মুখে হাসি। চোখে কৌতূহল।

উৎপলবাবু কৌতূহলাবিষ্ট চোখে চিঠিটি পড়তে লাগলেন। শব্দ দিয়ে সাজানো প্রতিটি লাইনের সঙ্গে তাঁর উজ্জ্বল চোখ অতিদ্রুত ওঠানামা করতে লাগল। মুখটি মুহূর্তের জন্য যেন ফ্যাকাশে হয়ে গেল। তারপর চোয়ালে চোয়াল বসল।

নিজেকে শক্ত হয়ে যেতে পত্রিকা রেখে বললেন, 'হুম্। আমাকে কি করতে হবে।'

বিনীত হয়ে বললাম, 'এই চিঠিটি থেকেই আমি দু-একটি প্রশ্ন করতে চাই।'

'আমি কিছু বলবো না। এটা তো গালাগাল—' বলে মনসামঙ্গল তুলে নিলেন।

আমি হাল না ছেড়ে পত্রিকা টেনে নিয়ে বললাম, 'এই যে মহিলা লিখেছেন, 'তাঁর মত আদর্শবাদী মানুষ তাহলে বোম্বাই ফিল্ম ব্যবসার অংশীদার হন কি করে? যে ব্যবসা তাঁরেই ভাষায়, মুর্কতিসম্পন্ন রচনা অপরাধ এক ধরনের শিল্প। এই ব্যবসায়ীদের সঙ্গে তাঁর আদর্শগত কোনো মিল নেই (আলাকরি) তবে কি শুধু পয়সা উপার্জনের জন্যে তিনি ব্যবসার শরীক হন'—আমার-ও এই একই প্রশ্ন, বিরূপ মন্তব্য করা সত্ত্বেও কেন আপনি তৃতীয় শ্রেণীর হিন্দী ছবিতেও অভিনয় করেন?' বলে পত্রিকাটি টেবিলে রেখে দিলাম।

উত্তরের জন্য অধীর আগ্রহে তাঁর দিকে চেয়ে আছি। কি উত্তর দেওয়া যায়, তিনি ভাবছিলেন হয়ত। এমন সময় পাশ থেকে অতর্কিতে শোভাদেবী তীক্ষ্ম গলায় আমাকে পাল্টা প্রশ্ন করলেন, 'বাংলা ছবিতে অভিনয় করতে পারলে হিন্দী ছবিতে পারবে না কেন?'

হিন্দী ছবিতে অভিনয় করার স্বপক্ষে এই অদ্ভুত যুক্তি শুনে আমি হতভম্ব। উৎপলবাবু স্ত্রীর সঙ্গে চোখাচুখি করে অতিদ্রুত বললেন, 'না, কোনো ছবিতেই অভিনয় করা উচিত নয়।'

''তবু করছেন কেন—' এই প্রশ্ন করার আগেই শোভাদেবী বললেন, "খাওয়া পরার চিন্তা না থাকলে করতো-না" বলে তিনি এটিতি ছোঁ মেরে টেবিল থেকে পত্রিকাটি তুলে নিলেন এবং প্রকাশিত চিঠিটির পৃষ্ঠা খুঁজতে লাগলেন। তাই দেখে উৎপলবাবু হাতের কাজ বন্ধ রেখে শান্ত স্বরে বললেন, পড়ো না ও চিঠি। দ্যাট লেটার মাস্ট নট বি টাচড্। কিন্তু শোভাদেবী পড়লেন। এবং কিছুটা সরে গিয়ে 'এই শোনো' বলে উৎপলবাবুকে ডাকলেন। অতঃপর নিচুস্বরে উত্তেজিত আলোচনা। কথা কাটাকাটি। শোভাদেবী একটি প্রতিবাদপত্র পাঠাতে চান। উৎপলবাবু রাজী নন।

মিনিট দুই তিন পরে ফিরে এসে ভৃত্যকে হুকুম করলেন, 'ঠাণ্ডা পানী পিলানা এক গ্লাস—'

ইতিমধ্যে ওঁদের সম্প্রদায়ের এক ভদ্রলোক এসে গেছেন। তিনি চিঠি

পড়ে বললেন, 'লোত্তাখি এই চিঠি পড়ে আপনার কি অ্যাকশান হল ?'

শোভাদেবী গম্ভীর গলায় বললেন, 'শুধু ছবিতে অভিনয় করা নিয়ে তো অনেক হয়ে গেছে।'

—'আরে মহিলা কিছু জানেন না।' উৎপলবাবু বললেন, 'থাকেন তো বম্বেতে, বান্দ্রায়, কোনো খোঁজ খবর রাখেন না। আসলে উৎপল দত্তকে নিয়ে আলোচনার স্টেজেই উনি আসেন নি। উৎপল দত্ত শুধু ছবিতে অভিনয় করছে কি হিন্দী ছবিতে অভিনয় করছে, দেশের মানুষ এই নিয়ে ভাবছে না। দেশের মানুষ ভাবছে উৎপল দত্তের নাটকের বিপ্লবের প্রেরণা নিয়ে।'

জল খেয়ে ভৃত্যের হাতে গেলাস ফিরিয়ে দিয়ে বললেন, 'মহিলা যে সোভিয়েট দেশের মঞ্চের প্রসঙ্গ এনেছেন, উনি তো বুঝতেই পারেন নি সরকার নিয়ন্ত্রিত কথাটার মানে কি। 'সরকার নিয়ন্ত্রিত' মানে শিল্পীদের, থিয়েটারের কর্মীদের নিরাপত্তা। যাতে তারা থিয়েটার নিয়েই থাকতে পারেন। টি ভি বা ফিল্মে যেন যেতে না হয়। 'সরকার নিয়ন্ত্রিত মানে এই নয় যে, সরকার যেসব নাটক নির্বাচন করে দেবেন, আর সেগুলোই করতে হবে, কি কোনোরকম বিরুদ্ধাচরণ করা চলবে না।'

ফোন করতে করতে শোভাদেবী বললেন, 'আমরা তো দেখে এসেছি—।'

উৎপলবাবু বলে চললেন, '১৯২৬ সালে মস্কো আর্ট থিয়েটার 'দ্য ডেজ অফ দ্য টুরবিনস' নামে একটি নাটক প্রোডিউস করে। পরিচালক কনস্তান্তিন স্তানিস্লাভস্কি। পুরো নাটকটায় জার-এর প্রতি মমত্ব প্রকাশ করা হয়েছে। এই নাটকের বিরুদ্ধে পার্টি কঠোর ব্যবস্থা অবলম্বন করতে চায়।

ভীষণরকম ক্ষেপে গিয়েছেন ট্রটস্কি। কিন্তু রুখে দাঁড়ালেন কমরেড স্তালিন। ঐ নাটকটি তিনি পনেরবার দেখেছিলেন। তিনি বললেন, এ নাটক বন্ধ করা চলবে না। থিয়েটারের গায়ে যাতে কোনোরকম হাত না পড়ে সেজন্য তিনি ট্রটস্কির বিরুদ্ধে কঠোর সংগ্রাম করলেন। তাঁর যুক্তি, মত প্রকাশের স্বাধীনতা সকলের আছে। দেশের মানুষ কোথায় কি ভাবছে না ভাবছে, সেটা জানা না গেলে এগোবো কি করে—'

—'ঠিক এই যুক্তিতেই স্যার চার্লস মেটকাফে ১৮৩৫ সালে ভারতবর্ষে মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতা দেন।'

'হ্যাঁ। যাইহোক এই স্তানিস্লাভস্কিকে ১৯৪১ সালে স্টেজের অর্ডার অব লেনিন দেওয়া হয়।'

একটু থেমে বলে চললেন, '১৯২৬ সালে জামিলাতিন 'উই' নামে একটি নাটক লিখে গ্রেপ্তার হন। এবং কমরেড স্তালিনের একান্ত প্রচেষ্টায় মুক্তি পান। দেশ ছেড়ে চলে যাবেন স্থির করলেন।' চলেও গেলেন ইউ, এস এ-তে। তারপর আর কখনো এ্যান্টি-সোভিয়েট নাটক লেখেন নি।

ট্রটস্কিবাদীরা একসময় 'প্রলেট কুলট' অর্থাৎ প্রলেতারিয়েত কালচার আন্দোলন শুরু করে। এদের বক্তব্য এবং দাবী পুরোনো সব সাহিত্য-নাটক বর্জন করতে হবে। এবারেও রুখে দাঁড়ালেন কমরেড স্তালিন। বললেন, 'না। বর্জন করা চলবে না। তোমরা সেসব পড়েছ। কিন্তু দেশের অধিকাংশ মানুষ এখনো পড়েনি, তাদের পড়তে দাও। পড়ুক, পড়ে ঠিক করুক, কোনটা থাকবে, আর কোনটা থাকবে না। বলাবাহুল্য 'প্রলেট কুলট' আন্দোলন টেকেনি।'

আমরা তো দেখে এসেছি কি সব নাটক হচ্ছে ওদেশে। কেউ কেউ তো মার্কসবাদের মূলকেই চ্যালেঞ্জ করে বসছে। জনগণ-ই যদি শক্তির উৎস হয়, তাহলে হিটলার ওঠে কি করে ?' নাটকীয় ভঙ্গীতে বললেন,

'শত শত রজনী চলেছে সেইসব নাটক।'

একটানা বলে তিনি সযত্নে হাতের কাজে মন দিলেন।

আমি প্রশ্ন করলাম, 'সোভিয়েট দেশে তাহলে সরকার শিল্প সাহিত্যে নাটকে হাত দেয় না ?'

কিছুটা ইতস্তত করে বললেন, 'হাত দেয় না মানে, সেখানে 'ও ক্যালকাটা'র মত নাটক হলে নিশ্চয়ই হাত দেবে।'

পাশ থেকে গ্রুপের ভদ্রলোক পাকাকরে আমার এবং উৎপলবাবুর দিকে চেয়ে বললেন, 'বারবধূ' হলেও হাত দেবে। আমাদের দেশে বারবধূকে চলতে দেওয়া হয়, কিন্তু দুঃস্বপ্নের নগরীকে বন্ধ করা হয়।' বলে বিদায় চেয়ে ভদ্রলোক চলে গেলেন।

উৎপলবাবু তার দিকে চেয়ে প্রসন্নের হাসি হেসে, আমাকে বললেন,

'ভাবতেই কেমন লাগে শেকসপীয়রের দেশে 'ও ক্যালকাটা'র মত নাটক হচ্ছে। শেকসপীয়রের নাটক দেখতে হলে যেতে হবে স্ট্যাটফোর্ডে। অথচ সোভিয়েট দেশে,—একই সঙ্গে আট জায়গায় শেকসপীয়র অভিনয় হচ্ছে।

শেকসপীয়র দেখতে হলে ইংলণ্ডে গেলেই হবে না, যেতে হবে সোভিয়েট দেশে। কী দুর্ধর্ষ সব প্রোডাকসন।'

'আচ্ছা, সোভিয়েট দেশে শিল্প-সাহিত্যের ক্ষেত্রে বাক-স্বাধীনতা যদি থেকেই থাকে, তাহলে সোলঝেনিৎসিনকে তাড়ানো হল কেন ?

'গুলাগ আর্কি' পেলাগো' নিশ্চয়ই 'ও ক্যালকাটা'র সমগোত্রীয় নয়।'

কিছুটা দাপটের গলায় উনি বললেন, 'সোলঝেনিৎসিন একটি থার্ড গ্রেডের লোক। আমার তো ভাবতেই কেমন লাগছে, টুর্গেনিভ, টলস্টয়ের দেশে ওর মত একটি মানুষ জন্মেছে। তাছাড়া ওকেতো সাহিত্যের জন্যে নোবেল দেওয়া হয়নি। এ্যান্টি সোভিয়েট হিসেবে দেওয়া হয়েছে।' বলে গ্রীলের ফাঁক দিয়ে বাইরে রাস্তার দিকে তাকালেন এবং অতি পরিচিত কোনো সম্মানীয় অতিথিকে দেখে উঠে দাঁড়িয়ে, 'আইয়ে, আইয়ে তরসীফ রাখিয়ে—' বলতে বলতে অভ্যর্থনা জানাবার জন্য সিঁড়ির কাছে গেলেন।

আমার পিছনদিকে সিঁড়ি। এবং পিছন ফিরে 'কারা এলেন' দেখাটা অশোভন।

একা একা বসে থাকলাম। ড্রইংরুমে অতিথির সমাগম।

আমার মনে পড়ে গেল, শিশিরকুমার এবং 'বাংলা নাট্যমঞ্চ প্রতিষ্ঠা সমিতি' কে। কী দুর্দান্তভাবে এঁরা একটি জাতীয় নাট্যশালা চেয়েছিলেন। ভীষণ কষ্ট বোধ হতে লাগল, সমসাময়িক এবং নাটকের মানুষ হয়েও উৎপলবাবু এঁদের শরীক হন নি। কারণ আদর্শগত অমিল। অথচ আদর্শ এবং মতের চূড়ান্ত অমিল থাকা সত্ত্বেও, হিন্দী ছবিতে উনি দিনের পর দিন অভিনয় করে চলেছেন।

সেই মানুষটিকে মনে পড়ে না, যিনি আদর্শের জন্য কোনোরকম কমপ্রোমাইজকে প্রশ্রয় না দিয়ে, জীবনের শেষ প্রান্তে রক্ত বমি করতে করতে 'তিতাস একটি নদীর নাম' এর মত অবিস্মরণীয় একটি ছবি ক[illegible] গেছেন ?

বেশ কিছুক্ষণ পর উনি ফিরে এলে আমি জিজ্ঞাসা করলাম, 'আচ্ছা, আদর্শগত অমিল থাকা সত্ত্বেও আপনি হিন্দী ছবিতে অভিনয় করেন, অথচ নাট্যশালার জন্য বাংলা নাট্যমঞ্চ প্রতিষ্ঠা—'

আমার কথা কেটে দিয়ে উনি বললেন, 'আমি এখন ভীষণ ব্যস্ত।' অগত্যা।

উঠে দাঁড়িয়ে পত্রিকাটি দেখিয়ে বললাম, 'এটা রেখে যাব ?'

না, দরকার নেই—বলে ড্রইংরুমে চলে গেলেন, শোভাদেবী যেখানে ছিলেন। বললাম, 'আসছি।'

তিনি হাত তুলে নমস্কার জানালেন।

নির্মলকুমার দাস

মানুষ কেনা বেচার ইতিহাস

ব্রজমাধব ভট্টাচার্য

কিন্তু এই সব কিংবদন্তী সত্ত্বেও ভৌগোলিকরা জানতেন (১৪শ শতাব্দীর আগে নয় অবশ্য) সেনেগাম্বিয়া, আপার গিনী এবং লোয়ার গিনী দাস-ধরার পক্ষে দারুণ জায়গা। এই সব দেশের আদিবাসী এবং অধিবাসীদের সম্পর্কে এদের অজ্ঞ ধারণা ছিলো। মানুষের জ্ঞান মাপার একটিই মাপকাঠি: যে ব্যক্তি 'দাস' হবার যোগ্য নিগ্রো বাছাই করতে জানে সেই জ্ঞানী। তার জ্ঞানই জ্ঞান। দাস হিসাবে কারা পোক্তো শক্ত, বাধ্য অবাধ্য, কর্মী, অকর্মণ্য এইটি যে বলতে পারতো তার মূল্য বোম্বেটে মহলে খুব উঁচুদরের। ফুলা, উলোফ, সেরের, ফিলাপ, মান্দোজো—জাতগুলোর যে বর্ণনা পাওয়া যায় তা থেকে আদৌ মনে হয় না যে এরা অসভ্য বা অশিক্ষিত ছিলো। এদের দুর্বলতা যে এরা সেদিন বুঝতে পারেনি, এই য়োরোপীয় ডাকাতগুলোর মধ্যে কী দারুণ নীচতা বিস্তৃতা ছিলো। এদের মানুষ বলে ভুল করার ফলেই এদের জগতে যে ভয়ংকর কালো বিপদ ঘনিয়েছিলো, আজও সেই বিশ্বাসঘাতকতার জের চলছে। ইউ এন এ-তেও চলছে।

গোল্ড কোস্টের দাসেদের নাম হোতো চড়া। এদের আসল নাম ফান্তী এবং আফান্তি হলেও ক্যারাবিয়ানের বাজারে এদের নাম ছিলো কোর্মান্তী। অনেক সময়ে দেখা গেছে যে আত্মসম্মানে ঘা লাগার ফলে এরা এমন কি আত্মহত্যাও করেছে। দাস-বিদ্রোহে বার বার কোর্মান্তীরাই নায়ক হয়েছে। জ্যামাইকার কোর্মান্তীদের তেজস্বিতা ও বিদ্রোহের জ্বালায় জ্যামাইকা সরকার নিয়ম করেছিলেন যে প্রতি কোর্মান্তী দাসের জন্য ব্যবসায়ীকে মাথা পিছু দশ-পাউন্ড শুল্ক দিতে হবে। কোর্মান্তীদের শৌর্য, সাহস, সহিষ্ণুতা সাহেবদের অভিভূত করে দিয়েছে। লাল জ্বলন্ত লোহা দিয়ে দাসেদের যখন দাগা হোতো তখন সাধারণ আইবো-রা আর্তনাদ করে উঠতো। কিন্তু তাদের চিৎকার শুনে কোর্মান্তী বাচ্চারাও হেসে উঠতো। এবং সেই বাচ্চাদেরই যখন দাগা হোতো তখন তারা দাঁতে দাঁত চেপে জ্বালা সহ্য করতো। টুঁ শব্দ করতো না। এই সব পাষণ্ড ক্রমেই যখন শত্রু হয়ে মোকাবেলা করার জন্য রুখে দাঁড়ায় তখন তাকে ভয় কে আর না করবে? কোর্মান্তীদের বরাবর সায়েবরা ভয় পেয়েছে।

আফ্রিকার ম্যাপে শস্য-উপকূল আর দাস-উপকূল চিহ্নিতই ছিলো ঐ নামে কারণ দাস বোঝাই জাহাজ গ্রেন-কোস্ট থেকে খাদ্য আর লঙ্কা নিতো। এই লঙ্কা নাকি জাহাজের নানা রোগ থেকে দাসদের বাঁচিয়ে রাখতো। কিন্তু দাস-ধরা তীর আর খাদ্য ভরা তীর মোটামুটি আলাদা করে দেখা হোতো।

কিন্তু বীরাফ্রার উপকূলকে সকলে ভয় পেতো—যেন সত্য সত্য যমের মুখ। ম্যালেরিয়া, জ্বর, অসম্ভব বৃষ্টি,—এখানে জাহাজ নিয়ে যাওয়া আত্মহত্যার সামিল!! তবু যেতে হোতো। লোভ মানুষকে সব করায়।

এর দক্ষিণে ক্যামারুণ, গাবুন, লোয়াঙ্গো, কঙ্গো। এখানে দাস পাওয়া যেতো 'জলের দরে'। কিন্তু হতভাগারা বাঁচতে চাইতো না। ধরা পড়ার শোকেই মরে যেতো। এমন অসভ্য!! কড়চার এক সাহেব লিখছেন—

"The debility of their constitution was astonishing (১৩)

এঙ্গোলায় কিন্তু দাস ছিলো সস্তা। এই কারণে এঙ্গোলায় দাসের বাজারে ভিড়। বছরে ৫০,০০০ দাস কেবল এঙ্গোলা থেকেই রপ্তানী হোতো। এঙ্গোলা একটি স্বভাব-সমৃদ্ধ দেশ। চাষবাসের ঝঞ্ঝাট কম। কাজেই আমেরিকার তুলোর ক্ষেতে, আখের ক্ষেতে কাজ করতে গিয়ে এরা এলিয়ে পড়তো। এবং এদের সক্ষম করে তুলতে অনেক কাঠখড় পোড়াতে হোতো। তবু সস্তায় এঙ্গোলায় দাস পাওয়া যেতো বলে এদের চাহিদা কমতো না। দাস-ব্যবসায় বাড়তেই থাকতো।' ১৭৯৮ খ্রীষ্টাব্দ নাগাদ বছরে কেবল ইংরাজ জাহাজই যেতো ১৫০, এবং প্রত্যেকটিই দাস-জাহাজ।

---

(13) Davidell Basil - Black Mother
Roth H. L. The Great Benin.

আটলান্টিক দ্বীপপুঞ্জ ১৪৮২ খৃঃ মানচিত্র

১৬শ শতকে নব পৃথিবীতে (আমেরিকায়) নিগ্রোদাস। দি-ব্রীমের চিত্র।
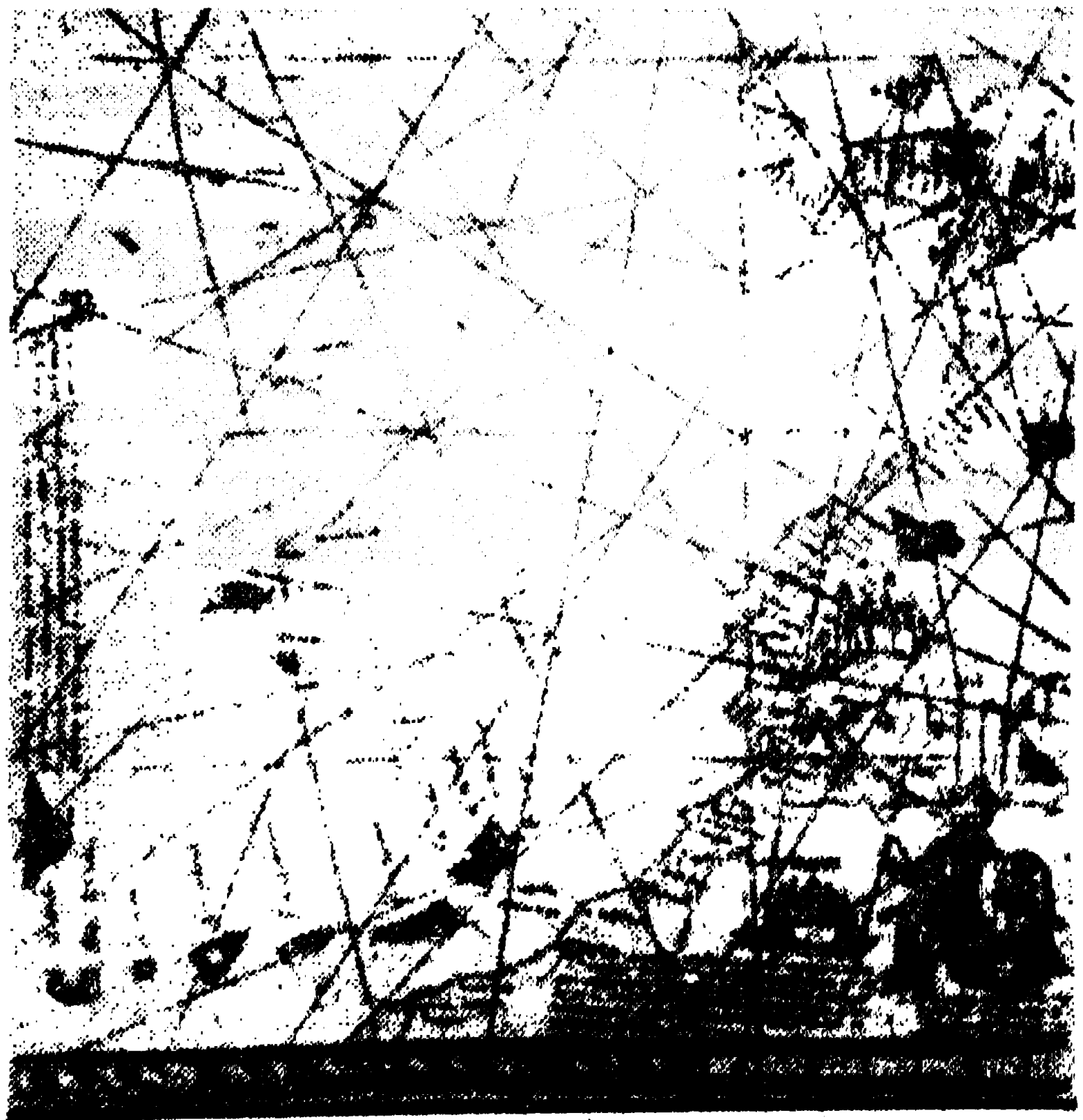
যেমন দাস তেমনি জাহাজী কাপ্তেনরা। য়োরোপের এমন কোনো দেশ ছিলো না যারা জাহাজ এনে দাস পাচার করেনি। করেনি শুধু মুসলমান দেশেরা। বরাবরই ওদের দাস রাখার ছিলো প্রথাও। আজও নেই তা নয়। কিন্তু তার ধারা, ধরন আলাদা। আমাদের দেশে বেগার আজও আছে, খানদামী চাকর চাকরানী আজও আছে; ধার নিয়ে ধার শোধ করার জন্য বাড়ির খাটুনী অনেকে করে। কিন্তু দাস-ব্যবসায়ের ব্যাপারই আলাদা। ঊনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সমাজচিত্র দিয়েছেন টোমাস হার্ডি। তাঁর ফার ফ্রম দ ম্যাডিং ক্রাউড' উপন্যাসে দেখছি গ্রামের মেলায় জন-মজুর যাচাই করে চাষী-মালিক মুচলেকা করে নিচ্ছে।

শিরোমণি দাস-কাপ্তেনদের মধ্যে মাত্র দুজনার কথা একটু বলা ভালো এই কারণে যে কাপ্তেনদের চরিত্তির দেখলে, বুঝলে সভ্যজাতের পিছনের খবর মালুম হবে। সভ্য-সে-সভ্য ইংরেজ; তার সভ্য-সে-সভ্য মহারাণী রাজ্ঞী এলিজাবেথ। তাঁর কাপ্তেন জন হকিন্স। ইংরেজ কাপ্তেনদের প্রথম ও শিরোমণি। কেন ? তিনি অশেষতম যোগ্যতাতে ইংরেজ এলিজাবেথের পূর্ণ সমর্থন বাগিয়ে তাঁকেই দাস-ব্যবসায়ের খবরা দিয়েছিলেন।

জন হকিন্সের জন্মো প্লিমাউথে (১৫৩২)। বাপের কাছে সমুদ্দুরের গল্প তিনি দোলনায় শুয়ে শুনেছেন। বাপ গিনিতে সওদাগরি জাহাজ নিয়ে যেতেন। ছেলেকে শোনাতেন অদ্ভুত বিচিত্র আফ্রিকার অদ্ভুত বিচিত্র জীব-জন্তু, মানুষের গল্প। আর শোনাতেন হতভাগা বদমায়েস স্পেনের রাজা কেমন মজাসে নিগ্রো বেচে বেচে লাল হয়ে গেলো কারণ পোপ স্বয়ং তাকে নয়া দুনিয়ার মালেক করে দিয়েছিলেন। নৈলে ঐ সব দেশে যদি ইংরেজও যেতে পারতো দাস ব্যবসায় করেই ইংরেজ লাল হয়ে যেতো। সে বাবদে হকিন্সের বাপের আর আপসোসের অন্ত ছিলো না।

১৫৬২-তে হকিন্স প্রথম গিনিকোস্টে এলেন জাহাজ নিয়ে। জাহাজ আসবে জাতের পতাকা নিয়ে রাজার লাইসেন্স নিয়ে। হকিন্সের জাহাজে এ সবের বালাই নেই, দস্যু-জাহাজ নাকি ? হকিন্স বলে না ঠিক তা নয়, তবে আমার জাহাজ। প্রাইভেট বলতে পারা যায়! এই জাহাজ নিয়েই হকিন্স ঝাঁপিয়ে পড়ে গিনীকোস্টে।

বলা নেই, কওয়া নেই,— গ্রামের পর গ্রামে আগুন লাগিয়ে যখন জাহাজ সে ছাড়লো তখন জাহাজে তিন শো নিরীহ বেচারা নিগ্রো ছেলে, মেয়ে, বুড়ো, বুড়ী। সংসার করছিলো তারা; তাদের শান্ত পরিবেশে শান্ত জীবনযাত্রায় নেচে-গেয়ে, ঘুমিয়ে-জিরিয়ে কাল কাটাচ্ছিলো। হঠাৎএকদিন দেখলো তারা পশু, জানোয়ারের মত ছেকলে বাঁধা সওগাত। বাজারে বিক্রী হোলো মা কোথায়, মেয়ে কোথায়, ভাই কোথায়, স্বামী কোথায়,—এ এক এমন সর্বনাশ, এমন ঘটনা, যার আগাপাশতলার হদিস তারা সেদিন পায়নি, আজও পায় না। পেতে গেলে বলতে হয়—ঐ এক কথা—যা বলা চলে না আর, ইন্টেলেকচুয়াল বুদ্ধিতে বাধে। বলতে হয় শাদাদের নষ্টামী। শাদা বললেই নাকি ডিসক্রিমিনেশন হয়, হয় রেজিজম। সেটা বলা বাধে। কিন্তু বরাবর হলে বলাই বা কী যায় ? নিগ্রো সমাজ কী বলবে ? তারা এ ব্যবহার মুর আরব, হিন্দু, চীন এদের কারুর কাছ থেকে পায়নি। এশিয়ায় কী ক্যাপিটালিজম ছিলো না ? এশিয়ায় কী সবাই সাধু ? তা নয়। ঐ যে রোমক সাম্রাজ্য এবং তারপরে রোম সমাজের চরিত্রের অধঃপতন, ঐ যে রোম সমাজের মধ্যে নারী ও নেশা নিয়ে হুল্লোড় (গিবন-এর 'ডিক্লাইন এন্ড ফল অব দি রোম্যান এম্পায়ার') এরই মধ্যে নেশা চড়ে গিয়েছিলো হঠাৎ বড়োমানুষীর। ভেনেশ দের ভ্যান্ডালসদের ভাইকিংদের—অত্যাচার, একটার পর একটা দুর্বিপাক। ফলে সেই নৃশংসতার স্বেচ্ছাচারের একটা ধারা। য়োরোপের চরিত্রের মধ্যে সেই উচ্ছৃঙ্খল প্রকৃতি এমনভাবে রন্ধ্রে রন্ধ্রে অনুপ্রবিষ্ট যে জ্ঞান-বিজ্ঞানের সেরা সেরা অবদানগুলোকেও তারা কি করে খুঁজে বুদ্ধির বলে সঙ্গে সঙ্গে লুঠতরাজের মার-পিটের মারণ যন্ত্রে রূপায়িত করে নেয়। নেবেই। কারণ বুদ্ধিটাই লোভের বুদ্ধি। গ্রাসের বুদ্ধি।

দুটি উদাহরণ দিই। এক, চীনের বাজি পোড়ানো তামাশার জন্য আবিষ্কৃত বারুদ। চীনই তার মূল আবিষ্কারক। ব্যবহার করতো আনন্দের জন্য, ছেলে-খেলায়। য়োরোপ সেটি পেয়েই বন্দুক, মারণ, কামান, ধ্বংস—এই ভাবে পালটে নিলো। তার পরে ডিনামাইট তার পরে এ্যাটম বম, তারও পরে হাইড্রোজেন বম। অন্ত নেই। কতো তাড়াতাড়ি কতো বেশী প্রাণ হত্যা করা যায়, জ্ঞান-বিজ্ঞানের এটাই যেন চর্চা। কতো তাড়াতাড়ি কতো বেশী দেশের দৌলত রাতারাতি হড়প করে ফেলে পরা যায়!

দ্বিতীয়টি রতিরঙ্গ, কামসায়নী। এ বিষয়ে আরবদের গোলাপের বাগান, হিন্দু-দের বাৎস্যায়ন অনঙ্গরঙ্গ ইত্যাদি একাধিক শাস্ত্র আছে। চিত্রে ভাস্কর্যেও এ বিলাসের চিত্র আছে। কিন্তু য়োরোপে কাম, রতি হয়ে গেছে মস্ত ব্যবসায়। এ নিয়ে, এবং এর সঙ্গে নেশাকে জড়িয়ে কোটি কোটি টাকার ব্যবসায়ে য়োরোপ তো লাল বটেই য়োরোপের চার্চগুলোতেও সে টাকা আসছে হুড়-হুড় করে। কেবল রতি বিনোদের ব্যাপারেই য়োরোপে এতো রকম শিল্প-বাণিজ্য চালু যে তার সমগ্রতার রূপ [illegible]

গান, তামাশা, শিল্প, সমাজ, পার্টি প্রতি সবই বিকৃতিতে ভরে গেছে। (১৪)

এ বিকার য়োরোপের একচেটিয়া হয়তো নয়, কিন্তু এর ফলে অসুস্থতা, বিকার, মানসিক রোগ, উন্মত্ততা, বায়ুরোগ, স্নায়ুবিকার, খুন, আত্মহত্যা, অবৈধ-জনন, ভ্রূণহত্যা ইত্যাদি সামাজিক প্রশ্নের তুলনামূলক পরিসংখ্যানের ফলে এটিই ধারণা স্পষ্ট হয়ে ওঠে। য়োরোপের জলে, মাটিতে, বাতাসে টাকার লোভের পাতালে মানবতাকে জলাঞ্জলী দেবার উদ্দাম খেয়াল অপ্রতিহত অপ্রতিরোধ্য।

নৈলে হকিন্স এ কাজ করবে কেন? ঐ তিনশো দাস বিক্রী করে পেলো বিপুল টাকা। সেই টাকা দিয়ে সে কিনলো ক্যারিবিয়ান বন্দরের পণ্য সস্তা দরে—[illegible], চিনি, চামড়া, মুক্তো য়োরোপের দৈনন্দিন জীবনযাত্রার পক্ষে মহার্ঘ বস্তু। হকিন্সের এমন বুকের পাটা যে সেই চোরাই মাল সে ইংরেজ হয়েই স্পেনেই বেচতে গেলো। স্পেন তো খাপ্পা। স্পেনের এলাকায় হামলা করে নিগ্রো পাচার করার ফলে যে পণ্য এনেছো তা স্পেনকেই বেচতে এসেছো। দে-মার দে-মার করে হকিন্সকে তেড়ে এলো স্পেন। পালালো হকিন্স, কিন্তু টাকার দিক থেকে বেশ কিছু লাভই হোলো। বুঝলো ভার্নিপটে হতে পারলে লক্ষ্মীকেও ঘায়েল করা যায়। একটু মার-ধোরই নয় হয়েছে। অর্থকাম তো হাসিল হয়েছে। টাকা হলেই হোলো।

ব্যাপার শুনে মহাধার্মিকা নারীকুলের মহাতিলকা সতীলক্ষ্মী এলিজাবেথ খাপ্পা। ধরো। পাকড়ো। বোম্বেটেটাকে ধরো। [illegible] ব্যবসায়ে টাকা রোজগার মটোক [illegible] হকিন্স বলে, ধীরে রজনী, ধীরে। থামো লক্ষ্মীখুকী। আগে শোনো তো বিত্তান্তো। তারপর ঘাড়-গর্দান তো আছেই, থাকবেই। কাগজপত্রে হিসেব দেখিয়ে যখন রানীকে যুবক হকিন্স বুঝিয়ে দিলো লাভের অংকটা কেন্তা মোটা—রানী তো হাঁ। সেই না হাঁ, সঙ্গে সঙ্গে তুখোড় হকিন্স গুঁজে দিলো হাঁ-এর ভেতরে 'শেয়ার'—তাবলে ঘুস নয়। ছিঃ! রানী নিজেই হকিন্সের জাহাজের ব্যবসার অংশীদার হয়ে গেলেন। ভার্নিপটের দোরে লক্ষ্মী বাঁধা।

হকিন্স পেয়ে গেলো সনদ। লোটো। পোড়াও, ধরো, বাঁধো, বেচো—শুধু রানীকে 'শেয়ার' দাও। পর্তুগীজরা হকিন্সের নামে ক্ষেপা। তারা আফ্রিকায় কোথাও হকিন্সের জাহাজকে ঢুকতেই দেয় না। কাজেই হকিন্স যখন যেখানে পায় রাতের অন্ধকারে জবর-দস্তি ঢোকে, গাঁ পোড়ায়, পলাতকদের ধরে, নিয়ে ভাগে।

একটা দ্বীপে একবার হকিন্স এসে আড্ডা গাড়লো। দ্বীপের অধিবাসীরা ছিলো সাম্বোজ নামক একটা জাতের দাস। সাম্বোজদের হকিন্স ধরলো দ্বীপের আদি-বাসী 'স্যাপী'দের সাহায্যে এবং পরে অবশ্য সেই স্যাপীদেরও নিয়ে যাওয়া দিলো। এমনি বিয়াম্বা নামক একটা জাতকে একবার সে আক্রমণ করলো। বিয়াম্বারা যেন মহাভীরু। পালকে পাল ধরা দিয়ে চললো। যখন সমুদ্রের কাছাকাছি, তখন অন্য দল বিয়াম্বা করলো হঠাৎ আক্রমণ। তখন বন্দী বিয়াম্বারাও পেটাতে আরম্ভ করলো। হকিন্স তো হতভম্ব। তার সাতজন নাবিকের প্রাণ হারিয়ে মাত্র দশজন দাস নিয়ে পালাতে পেরেছিলো। এ-দফায় তার আক্কেল গুড়ুমই হোলো।

একবার ভেনেজুয়েলায় হকিন্স গেলো দাস বেচতে। গবর্ণর তো খাপ্পা। দাস কিনবে তাও অংরেজ-কুত্তা হারামীবাচ্চা হকিন্সের কাছে? খেদাও ওকে, ভাগাও। ভাগবারই পাত্তোর সে। নামতে না দিলে জোর করেই নামতে হয়। নেমে পড়লো বন্দরে। জ্বলন্ত মশাল নিয়ে নেমে পড়লো হকিন্সের দল। হকিন্সের হুকুম সোজা আগুন লাগাও। কোই পরোয়া কোরো না। শুধু আগুন, শুধু মার। একেবারে লংকায় হনুমানজী। গবর্ণর সেবার সব দাস কিনে নেবার ব্যবস্থা করে দেন।

হকিন্স যখন দেখলো নিগ্রোরা শুধু ক্রমশঃ যে সাবধান হচ্ছে তাই নয়, রীতি-মত বিষাক্ত তীর নিয়ে লড়াই করে বিপদ সৃষ্টি করছে, তখন তিনজন নিগ্রো সর্দারের মধ্যে বাধিয়ে দিলো লড়াই। সেই লড়াইয়ের ফলে তারাই দাস ধরে এনে বেচে দিতো। ফলে হকিন্সের অনেক হাঙ্গামা বেঁচে যেতো। কিন্তু স্পেনকে ঠকিয়ে এ-ব্যবসা বেশী দিন চলা সম্ভবও ছিলো না। ভেরা ক্রুজে হকিন্সের নৌবহর শেষ পর্যন্ত ধরা পড়ে যায়। শুধু একটি জাহাজ সেদিন পালাতে পেরেছিলো। তার কাপ্তেন ছিলো একটি যুবক—ফ্রান্সিস ড্রেক, পরে যে হয়েছিলো দুর্দর্ষ কাপ্তেন। আরমাডায় সে-ই স্প্যানিশ জাহাজের দাঁত খাট্টা করে দিয়েছিলো। সেই ভেরা ক্রুজেই হকিন্সের সমস্ত খালাসীদের ফাঁসিতে লটকে মরতে হয়েছিলো। হকিন্সও বাদ যাযনি। (১৩)

আন্ড্রু বাত্তেল ছিলো আর এক নিগ্রো-ধরা জলদস্যু। তার ঘটনা আরও ভয়ংকর এবং আমাদের ইতিহাসের পক্ষে জাজ্জ্বল্য এক উদাহরণ। বেচারী একবার দাস-ধরা জাহাজে নাম লেখালো চটপট টা[illegible]

১৩ হকলুৎ—ভয়েজেস—এন্ড্রিমনস লন্ডন।

পাইস বানিয়ে ঘরের ছেলে ঘরে ফিরে আসবে। জাহাজ ধরলো দক্ষিণ আমেরিকার উপকূলে। একদল তীরে নামলো আমেরি-ন্ডিয়ানদের ধরার জন্যে। এর মধ্যে জাহাজে ভীষণ আক্রমণ। যারা তীরে ছিলো, রইলো। কাপ্তেন জাহাজ দিলো ছেড়ে। আমেরিন্ডিয়ানরা বন্দীদের বেচে দিলো রায়ো-দ্য-জেনেরোর বাজারে। গবর্ণরের চোখে লেগে গেলো বাত্তেল তাদের জাহাজ যাচ্ছিলো আফ্রিকায় নিগ্রো ধরতে। বাত্তেলকে আটকালো সেই জাহাজে এদের সাহায্য করার জন্য। বাত্তেল দেখলো দাসত্ব থেকে মুক্তি পাবার মোকা এই। প্রথম সুযোগ পেতেই এক ডাচ্ জাহাজে সে পালিয়ে এলো। কিন্তু কপাল মন্দ। ডাচ্ জাহাজখানা ধরা পড়লো পর্তুগীজদের হাতে। তারা আবার পালানো বন্দীকে ফিরে পেয়ে দারুণ কড়া পাহারায় রাখে। ইতিমধ্যে যে-দেশে বাত্তেল বন্দী, সে-দেশে লাগলো বিদ্রোহ। নিগ্রোরা ক্ষেপে গেছে। তখন তো সব শাদাদেরই বিপদ। বাত্তেলকেও ছাড়া হোলো। লড়ো। বিদ্রোহী নিপাত করো। বাত্তেল দু-বছর ফৌজদের সঙ্গে থেকে আবার চম্পট দিলো এক দাস-জাহাজে। এলো আঙ্গোলায়। সেখানে দুই নিগ্রোদলে লড়াই। এক দল কবুল করলো, শাদারা তাদের সাহায্য করুক। জয়ের পর তারা যতো নিগ্রো বন্দী করতে পারবে, সবাইকে দিয়ে দিবে শাদাদের। কিন্তু জাহাজ-ভর্তি দাস পেয়েও বিজয়ী নিগ্রোরা শাদাদের জাহাজ ছাড়তে দেয় না। তখন নতুন দাবি, তারা বরাবর থাকুক এদের রক্ষা করার জন্য। কাপ্তেন বললো, বেশ বাত্তেলকে রেখে যাচ্ছি। দাসগুলো বেচে ফিরে আসছি। সেই বাত্তেল হয়ে গেল প্রতিভূ।

হাড়ির হাল বাত্তেলের। ক্রমশঃ বাত্তেল টের পেলো যে, এ-নিগ্রোরা মানুষ-খেকো। সেই ভয়ে একদিন সে পালালো। জঙ্গলের মধ্যে পেয়ে গেলো এক দল সাথী তারা যাচ্ছিলো অন্য পথ ধরে সমুদ্রের দিকে। সেখানে পৌঁছে ভাগ্যক্রমে পেয়ে গেলো এক জাহাজ, সঙ্গে সঙ্গে ইংলণ্ডে রওনা দিলো। (১৫)

(১৫) জন পিনকারটন : এ জেনারেল কালেকশান অফ দি মোস্ট ইন্টারেস্টিং ভয়েজেস্ অ্যান্ড ট্র্যাভেলস্ (লণ্ডন, ১৮১৪)।

(14) Bloch-Iwan : Sexual Life of Our Time 411-12 (1908 ed, N. York).

বাঙালী গান শিখবেই

রেখা বড়ুয়া

ডিসেম্বরের কানপুর, প্রচণ্ড শীতে জমে যাচ্ছে যেন মানুষ। গায়ে জড়ানো আলোয়ান, তার নীচে মোটা শেরওয়ানীর বোতাম খুলে সার্টের পকেট থেকে সযত্নে ভাঁজ করা হলদে খামখানা বের করলেন ইশতিয়াক হোসেন খাঁ। ভারি খুশি গলায় বললেন, দেখো দেখো বেটা, আগেয়া—

—কব ? জানী উৎসুক।

—ইসি মাহিনে, তিস তারিখ কো।

—আপ বহুত খুশ, হাঁয় না ?

—বেশক। জানী বাঙালী, তাই তার কাছে মন খুলতে দ্বিধা আসেনি। অনেক দিনের আকাঙ্ক্ষা ওঁর অল ইণ্ডিয়া রেডিওর কলকাতা স্টেশন থেকে গান গাওয়ার। দিল্লিতে যাওয়ার যথেষ্ট সুযোগ রয়েছে, লক্ষ্ণৌ তো হাতের মুঠোয়, তবু কলকাতা, কলকাতাই। ওখানে না গেলে পুরো হয় না, মনে হয় একটা ফাঁক থেকে গেল যেন। সবাই যায়, আব্বাজান ভি গয়ে থে—

তা গেয়েছিলেন। রামপুরের মুস্তাক হোসেন খাঁ গেয়েছিলেন কলেজ অনেক আগে, গান শুনিয়ে গেছেন রসিক শ্রোতাদের। আর শুধু তিনিই বা কেন, এসেছেন আরও বহু, ঘরানার বহু গাইয়ে বাজিয়ে, বাংলা দেশের মানুষের কাছে উজাড় করে দিয়ে গেছেন গানের ঝুলি।

বলতে গেলে এ দেশে আসার তোড়জোড় প্রবল ভাবে শুরু হয়ে ছিল অনেক কাল আগে সেই ঊনিশ শতকের মাঝামাঝি যখন নবাব ওয়াজিদ আলি শাহ নির্বাসিত হয়ে এসে ডেরা বাঁধলেন মেটিয়া-বুরুজে। রাজপাট ত্যাগ করলেও আজীবন সঙ্গী সঙ্গীতকে ত্যাগ করেন নি তিনি। বারো লক্ষ টাকা বার্ষিক বৃত্তি, নবাবী মেজাজ নিজামতী অবিশিষ্ট, তবু ওরই মধ্যে তাঁর মজলিস জমায় সঙ্গীত বাজাতেন সেরা সানাই ওয়ালারা, গুণীরা শিরোপা পেতেন, সাহায্য পেতেন, অহোরাত্র জেগে থাকত গানের মহফিল, নবাবী হীন নবাবের খিদমতে হাজির থাকতেন বাছাই করা গুণী শিল্পীরা। ওয়াজেদ আলি নিজে ছিলেন একাধারে কবি, সুরকার এবং মরমী শিল্পী তাই যদুভট্ট, অঘোরনাথ চক্রবর্তীর মত গায়কদের গানের সমাদর করেছেন তিনি, সাহায্য করেছেন প্রয়োজনে, ধর্ম বা জাতের প্রশ্ন সেখানে বাধা সৃষ্টি করেনি কোনও। শিল্পীর কুশলতাই ছিল প্রধান বিচার্য।

কিন্তু ওয়াজিদ আলি শাহ যে সুরলোক সৃষ্টি করেছিলেন তাঁর মৃত্যুর পর তো তা ভেঙেচুরে তছনছ হয়ে যাওয়ার কথা, তল্পিতল্পা গুটিয়ে কলাবৎদের ফিরে যাওয়ার কথা অযোধ্যা আগে দিল্লী লক্ষ্ণৌ। আর কিছু না হোক অন্ততঃ নতুন আগমনে তো ভাটা পড়বে। কিন্তু আসল বেলায় ঠিক ততটা ঘটলো না। কারণ বাঙলার রাজা জমিদাররা তখন নতুন বস্তুর স্বাদ পেয়েছেন পুরো-পুরি। এতদিন দূর থেকে শোনা ছিল, এবার শুনলেন ঘরে, তাই তাঁরাও পৃষ্ঠপোষক হাত বাড়াচ্ছেন নানাদিকে, নিজেদের সভা মজলিশ অলংকৃত করছেন বিভিন্ন ঘরানার শিল্পীদের দিয়ে।

কিন্তু সব গায়ক বাদকদের কপালেই তো রাজপ্রসাদ জোটেনি, চিরকাল। তবু এদেশেই রয়ে গেছেন অনেকে, দেশের বসতবাড়ীতে চাবি বন্ধ করে। আবার যাঁরা আসতে পারেন নি, অদম্য আকাঙ্ক্ষা বুকে চেপে তাঁরা অপেক্ষা করেছেন সুযোগের। বাংলা দেশের মানুষ মাথায় খাটো, দুবলা, মছলিখোর, কিন্তু সমঝদার বটে। আর ওইটিই হলো একজন শিল্পীর কাছে সবচেয়ে মূল্যবান খবর। কালোয়াতী গান নাই বা জানলো, তবু উপভোগ করতে জানলে তাকে তো শুনিয়েও সুখ। সে নিজে শিল্পী না হলেও ঈশ্বর জ্ঞানে মাথায় করে রাখবে তোমায়।

তাই ধীরে ধীরে আসতে লাগলেন তাঁরা কলকাতা, মুর্শিদাবাদ, কৃষ্ণনগর, ঢাকা, মৈমনসিং আর আগরতলায় সর্বত্র ছড়িয়ে পড়লো তাঁদের উত্তর এবং পশ্চিম ভারতের খাঁচের গান বাজনার সুর।

কিন্তু এই প্রসঙ্গে স্বাভাবিক ভাবে একটা প্রশ্ন জাগে। তা হলো বাঙালী কি তবে কেবল সমঝদার হয়েই কাটিয়েছে এতকাল? তার কি নিজের কিছুই ছিল না

ছিল। যা ছিল সেটুকু গৌরবের। নবাবী শাসনের কাল থেকে বাংলায় বাইরের বস্তুর কিছু কিছু অনুপ্রবেশ ঘটলেও দীর্ঘকাল ধরে বাংলা তার নিজের ঐতিহ্যকে বাঁচিয়ে রেখেছে অনেক যত্নে। মুর্শিদাবাদের রেশম, ঢাকার সাড়ী, খাগড়ার কাঁসার বাসনের মত তার নিজস্ব সঙ্গীতের ঘরাণাও বর্তমান ছিল।

শোনা যায় রাজা দ্বিতীয় রঘুনাথের সময় বিষ্ণুপুরে এই ঘরাণার পত্তন হয়। তানসেনের পুত্র, মতান্তরে শিষ্য বংশীয় বাহাদুর খাঁ প্রথম বিষ্ণুপুরের শিল্পীদের হিন্দুস্থানী ধ্রুপদে শিক্ষিত করে তোলেন। সেই গান বাজনার ওপর নিজের দেশের মাধুর্য এবং লালিত্যের প্রলেপ দিয়ে বাঙালী গায়ক এবং বাজিয়েরা কণ্ঠ এবং বীণা সুরবাহার ইত্যাদি নানা যন্ত্রে তাঁদের নিজস্ব ঘরানে সঙ্গীত সাধনা করে গেছেন দীর্ঘকাল ধরে। অপেক্ষাকৃত আধুনিক কালে এ ঘরাণার গায়ক বাদকদের মধ্যে রামশঙ্কর ভট্টাচার্যের নাম স্থান পেয়েছে। এঁর শিষ্যদের মধ্যে যদুভট্ট রাধিকা গোস্বামী, গোপেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়, রমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় এবং জীবিত শিল্পী সত্যকিঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় অকৃত্রিম চেষ্টা চালিয়ে গেছেন এই ধারাটিকে বাঁচিয়ে রাখার। শেষের দিকে ধ্রুপদের সঙ্গে খেয়াল এবং টপ্পারও প্রবর্তন করেছেন এঁরা। ঠাকুর বাড়ীর সঙ্গে দেওয়া নেওয়ার সম্পর্ক থাকার ফলে রবীন্দ্রনাথের উচ্চাঙ্গের গানে এঁদের ধ্রুপদের বিশেষ প্রভাব পড়েছিল। রামশঙ্করের আর এক শিষ্য ক্ষেত্রমোহন গোস্বামী অঙ্কর মাত্রিক স্বরলিপি সৃষ্টি এবং প্রায় সোয়া শো বছর আগে ঐকতান বাদনের পথ দেখিয়ে ছিলেন বাংলার শিল্পীদের।

কিন্তু এত সত্ত্বেও নিতান্ত কালের ধর্মে বাইরের স্রোত ঠেকে থাকে নি চিরকাল। এত বড় বিশাল বিচিত্র এই দেশে কেউই পারে নি দীর্ঘকাল নিজেকে সম্পূর্ণ পৃথক করে দূরে সরিয়ে রাখতে। বাংলাও পারে নি। এই শতাব্দীর আরম্ভে, অথবা গত উনিশ শতকের শেষেই বলা ভালো, হিন্দুস্থানী ধাঁচের গান বাজনার ঢেউ প্রবলভাবে আছড়ে পড়লো গঙ্গা, পদ্মা, মেঘনা, আড়িয়াল খাঁর কূলে কূলে। সাড়া উঠলো চতুর্দিকে।

গৌরীপুরের রাজবাড়ীতে এসেছেন সেতারী এনায়েৎ খাঁ। সেখান থেকে কথা ছড়িয়ে পড়েছে কলকাতার বিভিন্ন মহলে। কি হাত, আহা। যারা দেখেনি আগে তারাও দেখলো। পাতলা চুল, কানের দুপাশে পাক দিয়ে উঠেছে, গায়ে বেগমের নিজের হাতের ছুঁচের কাজ মিহি কুর্তা। খেয়ালী মানুষটি শেখাচ্ছেন বেশ ভালোভাবে, মনোযোগী হলে ভালো, নইলে হঠাৎ বিরক্ত হয়ে উঠে চলে যাবেন আসর ছেড়ে। তাই যারা শিখতে চায় তারা সন্ত্রস্ত।

মসিদ খাঁ রয়েছেন লালচাঁদ বড়ালের বাড়ীতে। ওঁর ছেলে রাইচাঁদ তবলা শেখে খাঁ সাহেবের কাছে। চুড়িদার, ফিনফিনে গিলে করা আদ্দির পাঞ্জাবী এমনিতে তেমন তেমন মজলিশ হলে অনে ওঠে রামপুরী কায়দার জরিদার লেসওয়ালা, মাথায় উঠতো পাগ।

মৌজ হয়ে বসেন এসে আসরে। নাহা বেটা কেরামৎ তখন ঘোরে আশে পাশে। কখনও বা পাশের কখনও শিষ্য রাইচাঁদের। আর এসেছিলেন বাদল খাঁ। দিল্লী, আগ্রা, গোয়ালিয়র রামপুরের কোনও মোহই বেঁধে রাখতে পারেনি তাঁকে। সঙ্গীতই ছিল তাঁর জীবন, মন, প্রাণ। কণ্ঠে সিদ্ধ তিনি, আর তাছাড়া সারেঙ্গী বাজিয়েছেন দীর্ঘকাল। সেই সূত্রে সঞ্চয় হয়েছে অনেক, এখন তা যোগ্য পাত্রে অর্পণ করতে না পারলে তো মুক্তি নেই শিল্পীর।

কলকাতায় এসে বাদল খাঁ পেলেন সাদর সম্বর্ধনা। সেকালের বহু গায়ক তখন এঁর কাছ থেকে নতুন নতুন গানের বন্দিশ সংগ্রহ করেছেন এবং রাগের তালিম নিয়েছেন। শেষের দিকে এঁর মন টেনেছিল একটি কিশোর, নাম ভীষ্মদেব চট্টোপাধ্যায়, ডাক-নাম কালো। নগেন দত্ত ছিলেন বাদল খাঁর শিষ্য, তাঁরই শিষ্য এই ছেলে। খাঁ সাহেব আদর করে ডাকতেন, কালু—কালুয়া—

কলকাতার মানুষ তখন জানতো মসজিদের পেছনের গলিতে থাকেন এক গান পাগলা ওস্তাদ, রোজ রিকসা চেপে তিনি যাবেনই বলরাম দে স্ট্রীটের সেই বাড়ীটির সামনে রিকসা থেকে নেমে টুকটুক করে এগিয়ে যাবেন, দরজা ঠেলে প্রথমেই ডাকবেন

রাতির ডালাটি।) যাস, সসম্ভ্রমে উঠে দাঁড়াবে ঘরের সব মানুষ, বলবে, আইয়ে ওস্তাদজী, তশরিফ লাইয়ে—

সেই গান পাগল বৃদ্ধ তাঁর দিন রাত সব সমর্পণ করেছিলেন শিষ্যকে। মাঝরাতে যখন শহর কলকাতা ঘুমে অচেতন, তখন হয়তো উদ্‌ভ্রান্ত হয়ে ছুটে এসেছেন, দরজা ঠেলেছেন অস্থির হাতে, ডেকেছেন, এ কালুয়া, উঠ বেটে, শিখ লে, বহুত বহুত কম হ্যায় (?) রে—

মধ্যরাতের আধো ঘুম আধো জাগরণে দেখা দিয়েছে চল্লিশ বছর আগে হারিয়ে যাওয়া গানের মুখড়া শিখে নেবে, নইলে আবার হারিয়ে যাবে—

এমনি করে সংগ্রহ হয়েছে বিভিন্ন প্রদেশের প্রাচীন সম্পদ, খানদানী চিজ। শিষ্যদেরও পণ ছিল, প্রাণ মন দিয়ে যা করে হোক আয়ত্ত করবেই একে, যেমন করে হোক।

ওদিকে ছিলেন আর এক গোষ্ঠী— জোহরা বাঈ, মালকাজান, আগ্রাওয়ালী আর গহরজানেরা। নির্দিষ্ট পাড়ায় বাস করেও এক অনিন্দ্যসুন্দরের পরিমণ্ডল গড়ে তুলতেন তাঁরা, যা মানুষকে ভুলিয়ে দিতে পারত নীতি নিয়মের কড়া শাসনকে।

এতো গেল একটা দিক। যদিও এই সময়টায় দেশে উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের খুব কদর হয়েছিল তবুও একথা ভাবলে ভুল হবে যে বাংলার তাবৎ মানুষেই তখন কালোয়াতী গানে দিব্যি পাকাপোক্ত হয়ে উঠেছিল। তা হয় না, এবং গোড়াতেও কখনই তা ছিল না। কোন উচ্চাঙ্গের আর্ট কখনই সার্বজনীন বস্তু হয়ে উঠতে পারে না এটা স্বতঃসিদ্ধ। তাই এখানেও তার ব্যতিক্রম হয় নি। তবু গান বাংলার আকাশে বাতাসে সর্বত্রই ভেসে চলেছে চিরকাল। মায়ের কোলে ঘুমপাড়ানী ছড়া থেকে চির বিদায়ের হরিধ্বনি, সবের মধ্যেই বাঙালী চেয়েছে সুরের স্পর্শ, ছন্দের দোলা। তাই এখানে যেমন চর্চা হয়েছে উচ্চাঙ্গের কীর্তনের, তেমনি বাউল, ভাটিয়ালী, গম্ভীরা, টুসু কিছুই বাদ যায় নি। যার যেমন মন চেয়েছে তেমনি পথ খুঁজে নিয়েছে সে, ব্যক্ত করেছে প্রাণের আবেগকে।

আবার অন্য গানও ছিল। দাশরথি রায়ের পাঁচালী,

সঙ্গীত এবং পিপাসা

আকাশ ভেঙে বর্ষা নেমেছিল সেদিন। সঙ্গে ঝোড়োহাওয়া। আর তাতেই দোল খাচ্ছিল আকাশে ঠেলে ওঠা গাছের মাথাগুলো। যেন সাড়া দিচ্ছিল। নাকি ক্ষেপাবাজ মাতাচ্ছিল নবীন মেঘের সুরের এমন বিশাল সমারোহকে। আকাশের এ মুড়ো থেকে ও মুড়ো বিদ্যুতের আলপনা আঁকা হচ্ছিল থেকে থেকে। সঙ্গে বাজছিল বাদল মেঘের মাদল। প্ল্যাটফর্মের একটি আলোও সেদিন চোখ মেলেনি। আশেপাশেও কোথাও আলো ছিল না। মেদিনীপুর স্টেশনের গেট বাজার থেকে প্ল্যাটফর্মের শেষ মাথা অব্দি হু হু অন্ধকার। বুকিং ক্লার্ক মুখার্জীবাবুর রেল কোয়ার্টারের সামনে কৃষ্ণচূড়া গাছটাও অন্ধকারে সিল্যুয়েট হয়ে দাঁড়িয়ে শুধু কোয়ার্টারের জাফরির ফাঁকফোকর দিয়ে খানিক আবছা যা আলো ঠিকরোচ্ছিল। আর সেই আলোতেই দেখা গেল বর্ষাতি মুড়ে সাইকেল ঠেলে বুকিং ক্লার্ক দুলাই মুখার্জির কোয়ার্টারের দরজায় দাঁড়ালেন নির্মলবাবু। নির্মল সামন্ত। সাইকেলের ঘণ্টা বাজলো বারকয়েক। জাফরির দরজা খুলে গেল। আবার সেই নিঃসীম অন্ধকার। লাইনের ওপারে স্তূপাকার কাঠ ওয়াগন বন্দীর অপেক্ষায় পড়ে। দূরান্তে সাঁওতাল পল্লীতে কোথায় মাদল বেজে চলেছে। বাদলা রাতের খ্যাপা হাওয়ায় ভেসে আসছে সেই সুর।

এমনিতেই নির্ভেজাল বাঙালী মনটা আমার বর্ষার ধারাপাতে প্রায় টইটম্বুর। এমন সময় গান এলো কানে। অন্ধকারে মুখ গুঁজে থাকা সারি সারি রেল কোয়ার্টারের জাফরি ঠেলে ভেসে আসছে গান 'এমন দিনে তারে বলা যায়....'। সমস্ত চেতনার মধ্যে যেন পাগলা মেঘের মাদল বেজে উঠল অন্ধকার প্ল্যাটফর্ম, ঝোড়ো হাওয়ার মাতামাতি। বৃষ্টি পতনের শব্দ আকাশে বিদ্যুতের ঝিলিক সব মিলিয়ে এক গভীর আত্মগত নির্জনতার সে গান আমাকে মুহূর্তে যেন বহু যুগের ওপারে নিয়ে গেল যেখানে 'সমাজ সংসার মিছে সব। মিছে এ জীবনের কলরব।' সুর সাধক পঙ্কজ মল্লিকের গলায় এ গান শুনেছি। তাঁর গাওয়া রেকর্ডও আমার আছে। সে গাওয়ার সঙ্গে তুলনা করার ঔদ্ধত্য আমার নেই। কারণ তাঁর গাওয়া সে গান সুরে স্বরলিপি ছাপিয়ে এক দুর্লভ অনুভূতির মোড়ে এক অলৌকিক পরিবেশনা হয়ে উঠেছে। তবু বলতে দ্বিধা নেই বাদলার সেই রাতে একাকী প্ল্যাটফর্মের অন্ধকারে দাঁড়িয়ে রেল কোয়ার্টারের জাফরি ঠেলে আসা গানের সে সুর আমাকে আবিষ্ট করেছিল।

বোঝা গেল। বৃষ্টি মাথায় করে আসা বর্ষাতি মোড়া গানের মাস্টার নির্মল সামন্ত গান ধরেছেন। এতক্ষণে সম্ভবত ছাত্রীর ভাইবোন মা দিদি ওঁকে ঘিরে বসে পড়েছে। আজ এই বাদলার পরিবেশে আর ছাত্রীর যেন শেখা নয়, মাস্টার মশায়ের গলায় গান শোনাই ওঁরা ঠিক করেছেন। তারই ফাঁকে ফাঁকে কখন এসে গেছে বড় কাঁসার বাটিতে মুড়ি, বাটিতে ভাজা বেগুনি আর প্রমাণ সাইজের কাপে এক কাপ চা। সিঙ্গল রীডের হারমোনিয়মে বেলো করে নির্মল সামন্ত গেয়ে চলেছেন অবিরাম। একটার পর একটা। বর্ষণমন্দ্রিত অন্ধকারে, বাদল দিনের প্রথম কদম ফুল, সঘন গহন রাত্রি ঝরিছে শ্রাবণ ধারা— আরও কত। শেষটায় বোধকরি বুড়ী দিদিমার অনুরোধে নির্মলবাবু ধরেছেন শ্রীরাধার বিরহ যন্ত্রণার একটা পদ। এতক্ষণে হয়ত বুড়ী দিদিমার চোখেও শ্রাবণের ধারা। নাতি নাতনীদের চাপা-ঠোঁটে হাসি। ঘরের [illegible] দুলাইবাবু, সম্ভবত ডিউটিতে। ঘরে থাকলে তিনিও বসে যান গান শুনতে। রজনীকান্তের 'তুমি নির্মল কর মঙ্গল করে' গানখানা তাঁর ভারি প্রিয়।

রেল কোয়ার্টারে কোয়ার্টারে সাঁঝের বাতি জ্বললেই যখন শাঁখ বাজে তারই খানিক পরে গান শুরু হয়। কোয়ার্টারের জানলায় পর্দা দৈবাৎ হাওয়ায় উড়ে গেলে দেখা যায় একটি কিশোরী মেয়ে সিঙ্গল রীডের একটি হারমোনিয়মকে কোলকুঁজো করে গলা সাধছে, সুর ধরে (?) তুলছে

আমার সোনার হরিণ চাই। প্রায় কোয়ার্টারেই এক ছবি। গান শেখার প্রচলন মেয়েদেরই বেশি। গলায় সুর

এনায়েৎ খাঁ

যাত্রামণ্ডপে চিকের আড়ালে অথবা শহরে 'থিয়েটারে' দোতলায় বসে ছেলের ঝিনুক বাটি কাঁথা সামলাতে সামলাতে কেঁদে বুক ভাসিয়েছে ধ্রুব প্রহ্লাদ অথবা বেহুলার গান শুনে, কিন্তু নিজে গাইবার কথা ভাবতে পারেনি। যারা ভেবেছে, এদিক ওদিক থেকে যে দু' একজন বেরিয়ে আসতে চেয়েছে, তাদের সমাজ ক্ষমা করেনি, নির্মম হয়ে খেদিয়ে দিয়েছে চৌহদ্দির বাইরে। আজীবন নানাভাবে সেই অপরাধের প্রায়শ্চিত্ত করতে হয়েছে তাদের।

কিন্তু কোন বাঁধই চিরকালের নয়, তাই সময়ের সঙ্গে ধীরে ধীরে খসে পড়তে লাগল সহস্র পাকের দড়াদড়ি। তবে এটা একদিনে ঘটে নি, এর জন্যে লোকচোখের আড়ালে চারদেয়ালের ইঁটে মাথা কুটতে হয়েছে কত কিশোরীকে, কত তরুণীকে।

বাংলার মেয়েদের এই সাংস্কৃতিক মুক্তির লড়াইএ বোধ হয় বেশ বড় সহায়তা এসেছিল সেকালের ব্রাহ্ম সমাজের কাছ থেকে। ইংরিজি, বাংলা, ইতিহাস, ভূগোল সেলাই ফোঁড়াই শেখার চল হলেও গানের প্রতি কিছুটা অনীহার ভাব তখনও সাধারণ পরিবারে বর্তমান, তবু এরই মধ্যে নব্য ভাবাপন্ন ব্রাহ্ম সমাজের বিশিষ্ট অনেক পরিবার প্রার্থনা সঙ্গীতে যোগ দেওয়ার অধিকার দিলেন মহিলাদের। তাঁরা এলো খোঁপা বেঁধে, পুরোহাতা লেস বসানো ব্লাউজ পরে শাড়ীর কাঁধে সোনা রুপো অথবা হাতির দাঁতের কাজ করা ব্রোচ এঁটে শান্ত সমাহিতভাবে গাইলেন, গাওহে তাঁহারি নাম—

এতো গেল প্রার্থনা সঙ্গীতের কথা। গ্রামে গঞ্জে ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠানে হিন্দু সমাজেও মহিলাদের সমবেত সঙ্গীত গাওয়ার প্রথা চালু হয়েছিল ধীরে ধীরে। তাঁরা মানসী, ভাঙা কীর্তন, পাঁচালী জাতীয় গান গাইতেন, তাতে তত দোষ দেখত না কেউ। তবে মেয়েছেলে গান শিখবে, গাইবে পরপুরুষের সামনে?, এমন অসম্ভব কথা ভাবায় বা চিন্তা করার সাহস ছিল না তত শতাব্দীর শেষেও কোনও সাধারণ ঘরের মেয়ের।

তবু পাথর চাপা থাকলেও কখনও বা চুঁইয়ে পড়ত ক্ষীণ জলের ধারাটুকু, সবার অলক্ষ্যে। ভেতরে জমে থাকা আবেগটুকু নিজেকে প্রকাশ করার জন্য ঠেলাঠেলি করত। নির্জন ঘরের কোণে হয়তো নিজের অজান্তে গুণ গুণ করে উঠত একটি দুটি বাতাসে পাওয়া শোনা সুর—মালিনী তোর রঙ দেখে অঙ্গ জ্বলে যায়, অথবা প্রেমে সই মানা কি মানে। দৈবাৎ পুরুষ অভিভাবকের কানে সে সুর গেলে রক্ষা থাকত না। প্রত্যক্ষে শাসন করার সম্বন্ধ নয়, তবু মাঝ উঠোনে দাঁড়িয়ে সশব্দে গলা খাঁকারি দিয়ে তাঁরা স্বর তুলে হয়তো বলতেন, খেমটাওয়ালীর মেয়ে গছিয়ে দিয়ে গেছে নাকি লুকিয়ে? ব্যাটা হরু ঘটক আসুক একবার এদিকে—বুকের কাঁপুনী থামত না তরুণী বধূর। স্বামীর কানে গেলে কি হবে—ভাবতে হিম হয়ে আসত ভেতরটা।

তবু দিন বদলাচ্ছিল দ্রুত গতিতে। কিশোরী মেয়েরাও ধীরে ধীরে বইখাতা বুকে চেপে ইস্কুলে যেতে শিখেছে, ঘোড়ার গাড়ী ছেড়ে বাস আসছে দোর গোড়ায়। অবশ্য মাঝের দু ছটাক জমি পায়ে হেঁটে পেরুতে হতো হেঁটমুড়ে। ইস্কুলে গিয়ে আবার সেই মেয়ে বয়স্ক মাস্টার মশাইএর কাছে গান শিখছে গানের পিরিয়ডে। এসরাজ বাজিয়ে তিনি শেখাচ্ছেন, তোমারি গেহে পালিছ স্নেহে অথবা, শুনো গো এই রাগিণী, খাম্বাজ অতি মনোহারিণী, এমনি সব গান। তবে শিক্ষা সেই ওই দু চারটি বছর তারপরেই তো সে পরগোত্রীয়, ঘরের বউ। বাপের বাড়ীতে দক্ষিণের ঘুলঘুলিটা দিয়ে যে প্রশ্রয়ের হাওয়াটুকু, বইতো, শ্বশুরালয়ে সেটি সতর্ক হাতে ঢেকেঢুকে দেওয়া হতো অবিলম্বে। তা সেই বউয়ের বয়েস হোক না তেরো বা পনেরো। বউ বলে কথা।

এমনি সময়ে কবে যেন একটা অদ্ভুদ কাণ্ড ঘটে গেছিল সেকালের কলকাতায় লালচাঁদ বড়াল ছিলেন একজন বিশিষ্ট সঙ্গীতরসিক মানুষ এবং গায়ক। তাঁকে ঘিরে গড়ে উঠেছিল একটি সঙ্গীতের পরিবেশ এবং তাঁরই ছেলে রাইচাঁদ আরও দু-একজনের সহায়তায় গানের একটা কোম্পানী করে ফেললেন। হ্যাঁ গানের কোম্পানী যার নাম নাকি ইণ্ডিয়ান ব্রডকাস্টিং কোম্পানী। সেখানে গাইয়ে বাজিয়েরা গান বাজায় আর ঘরে বসে মানুষে তা শোনে ঠিক ওই সাহেবদের মত যন্তর দিয়ে। তাজ্জব কাণ্ড। সেখানে আবার রবিবারে শুধু ভালো ভালো ঘরের মেয়েরাই গান গাইতে আসে ছেলেদের তো কথাই নেই। তারা তো আছেই।

সেই গান কানে এলো, সাধারণ মানুষ আশ্চর্য হয়ে দেখত শুনত। যা ছাড়া কলের গানের বড় বড় চাকার মত সব রেকর্ড বেরোচ্ছে নিত্য। অর্থাৎ গানের মজাটা তখন সবাই পেতে শুরু করেছে। একটু গোপন ইচ্ছা জাগতে চাইছে মনে হচ্ছে আহা আমার মেয়েটাও যদি পারতো অমন।

তার ব্যবস্থা হলো। প্রথমে ধর্মতলায়, পরে, পার্ক স্ট্রীটে ব্রাহ্ম মহিলা প্রমদা চৌধুরীর বাড়ীতে স্কুল বসল। নাম তার সঙ্গীত সম্মিলনী। কিন্তু ভাবা আর কাজে করা এক কথা নয় তাই গান শেখার ছাত্রী যোগাড় হওয়াটা শক্ত ব্যাপার হয়ে উঠল ঘরের মেয়ে শিখবে খেয়াল ঠুমরী বাঈজীদের মত তবলচীর সঙ্গে কার এত বুকের পাটা যে ওখানে পাঠাবে মেয়েকে।

কিন্তু কার্যক্ষেত্রে দেখা গেল তেমন লোক বেশী না হলেও কলকাতা শহরেই রয়েছেন দু চারজন, তাঁরা পাঠালেন মেয়েদের। এলো ইভা, স্টেটসম্যানের পি, এন, গুহর মেয়ে কেশবচন্দ্র সেনের নাতনী নীলিমা আর গীতা দাস, অরুণকুমার দাসের মেয়ে।

গান শেখাবেন গিরিজাশংকর চক্রবর্তী। এই একটি মানুষ কি দুঃসাহস বুকে নিয়ে এগিয়ে এসেছিলেন, কি প্রচেষ্টা চালিয়ে ছিলেন তা আজ এই চল্লিশ পঞ্চাশ বছর পরে আন্দাজ করা সহজ নয়। জীবনের প্রথম দিকে চিত্রকলার দিকে ঝোঁক পড়েছিল

গিরিজাশংকরের, তেল, রং জল রং-এর ছবি এঁকেছিলেন অনেক, কিন্তু আসল সময় ত্যাগ করলেন সব কিছু। আঁকড়ে ধরলেন গানকে। নিজের শিক্ষা প্রথমে জন্মস্থান বহরমপুরে রাধিকা গোস্বামীর কাছে তারপর প্রচণ্ড আকাংখা বুকে নিয়ে ঘুরলেন দরজায় দরজায়। ভৈয়া সাহেব, এনায়েৎ হোসেন, বাদল খাঁ, গণপৎ রাও কার কাছে নয়। দীর্ঘ অনেক বছরের অক্লান্ত পরিশ্রমের পর ভরা ঝুলি ভরা ধন নিয়ে এলেন কলকাতায়। উদ্দেশ্য, বাংলার সঙ্গীত শিক্ষার্থীদের মধ্যে ছড়িয়ে দেওয়া নিজের আহরণ করা অমূল্য সম্পদ। ওরা শিখুক, শিখে তৈরী হোক—এই চিন্তা মনে নিয়ে শিক্ষকের ভূমিকা নিলেন তিনি।

ছেলেরা তো এসেছিলই। নাকু, যামিনী, সুধীর, সুখেন—উজ্জ্বল এক একটি রত্ন। ওরা মুক্ত, ওদের কোনও বাধা নেই তাই আসাটা সহজ হয়েছিল। কিন্তু ইন্দ্রা, গীতা কত চোখের জল ফেলে তবে ছাড়পত্র পেয়েছিল। তাও সবটুকু নয়। গান শেখো, তবে রেকর্ড রেডিও ? সে ভেবে দেখা যাবে পরে।

ওদের সাহস দিলেন, উৎসাহ দিলেন গিরিজাশংকর, খেয়াল শোনালেন, শোনালেন ঠুমরীর বন্দিশ—

পি কী বোলি না বোল, পাপিহারা—

মুগ্ধমুখে মেয়েরা আকুল হয়ে উঠল শিখবেই ওরা, শেখান গুরুজী।

তবলা ? না হলে চলবে না ? ওইখানেই তো বড় আপত্তি ছিল এত দিন। তবলার সঙ্গে খেয়াল ঠুমরী গাইব বাঈজীদের মত ?

কিন্তু শেষ পর্যন্ত অটল রইলেন গুরু এবং শিখল মেয়েরা আটচল্লিশ মাত্রার বিলম্বিত বন্দিশের খেয়াল, ঠুমরী, তৈরী হল পরীক্ষার জন্য। পরীক্ষক এলেন লক্ষ্ণৌ থেকে রতনজনকর। যথাসময়ে পাশ করে উপাধি পেল তারা 'গীতশ্রী'। স্বয়ং কবিগুরু নাম দিয়েছিলেন এই উপাধির। তারপর এই মেয়েরা গেছিল এলাহাবাদ, আলমোড় কনফারেন্সে। সেখানেও যশ অর্জন করে ফিরে এলো ওরা। অর্থের কথা উঠতো না সেকালে, কারণ মেয়েরা তো উপায় করতে আসরে নামেনি।

সে চিন্তা ছিল ছেলেদের। সবারই অঢেল টাকা ছিল না, জমিদারীর আয়ও না। তবে সংসার চলবে কি করে ? এবং বলতে গেলে গানের জগতে বাউণ্ডুলে ঘরপালানো ছেলের আনাগোনাই ছিল বেশী। তারাপদ চক্রবর্তী এসেছিলেন ফরিদপুর থেকে একবস্ত্রে। জোগাড়টা যত্নবত্ত জুটতো না, তবে শয়নটা ছিল বটু-মন্দিরেই। তখন তাঁর নাম ছিল নাকু। গুরুর শিক্ষা আর দীর্ঘ নিরলস সাধনা তাঁকে পৌঁছে দিয়েছিল যশের চূড়ায়, উত্তীর্ণ করেছিল এক অতীন্দ্রিয় আনন্দের জগতে।

যামিনী গঙ্গোপাধ্যায় অধীরলাল ছিলেন গুরুর কাছেই। সুখেন্দু গোস্বামী বিপ্লবী জীবনের অন্তে অবতীর্ণ হয়েছিলেন জীবনযুদ্ধে। আট টাকা মাইনের গানের টিউশনি করেছেন প্রতিদিন গিয়ে, তারপর শিক্ষা এবং সাধনার জোরে প্রতিষ্ঠিত করেছেন নিজেকে এক সম্মানের আসনে।

এমনি আরও কত গায়ক এবং বাদকের জীবনের সবচেয়ে উজ্জ্বল অধ্যায় গেছে গত পঁচিশ তিরিশ বছর সময়ের মধ্যে বলতে গেলে বাংলা তখন পৌঁছেছিল তার সাফল্যের চূড়ায়। কারণ একজন শিল্পীর জীবনের সবচেয়ে সফল সময় বোধ হয় তার যৌবন আর প্রৌঢ়ত্বের মাঝামাঝি কালটা। উৎসাহ উদ্দীপনা আর কল্পনাশক্তি তিনের যোগাযোগে তিনি সবচেয়ে শক্তিমান হয়ে ওঠেন তখন। তারপর আসে অন্তর্মুখীতা, তখন বাইরের অনুরক্তে আনন্দ দেওয়ার চেয়ে নিজের অন্তরের গভীরে ডুব দিয়ে আত্ম-

গোপেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়

নিমগ্ন হয়ে যাওয়ার দিকে ঝোঁকটা পড়ে বেশী। শ্রোতা বা ছাত্রদের কাছে এটা খুব সুসময় নয়। শিল্পী বা আচার্য তখন হয়ে যান দূরের মানুষ, নিজের চারপাশে একটা অদৃশ্য আবরণ সৃষ্টি হয়ে যায় তাঁর। অবশ্য ব্যতিক্রম তো সর্বদাই রয়েছে।

বাংলার মেয়েদের গানের জগতেও যেন এক ঢল নেমেছিল তখন। দীপালি নাগ, বিজন ঘোষ দস্তিদার, মীরা চট্টোপাধ্যায়ের মত সফল শিল্পীরা তখন পূর্ণ প্রতিষ্ঠিত। ওদিকে তাদেরও আগে রয়েছেন রবীন্দ্রসঙ্গীতে কনক দাস, অন্য গানে যুথিকা রায়, রেণুকা সেনগুপ্ত। অনেক ত্যাগ, অনেক দেবার, অনেক অশ্রু ঝরিয়ে তবে সাফল্য এসেছে তাঁদের জীবনের। আজকের দিনে তা মনে হবে গল্পের মত।

তবে সেকালটাই ছিল অন্য রকমের, মানুষের সুখের আর সার্থকতার ধারণাটা ছিল একাল থেকে অনেকটা আলাদা। তাছাড়া সুখের জন্যে পাগলামীটাও যেন কম ছিল। অবশ্য সুখ চাইলেই তো মেলে না শুধু হাতে, তার জন্য চাই উপকরণ। সেখানেই ছিল ঘাটতি। স্বাধীনতার আগে পর্যন্ত দেশের মানুষের কাছে ভালো কাজ, বিশেষ করে সরকারী উঁচু পদের চাকরীগুলো প্রায় দুর্লভ ছিল। ওগুলো সংরক্ষিত থাকতো সাদা চামড়ার শাসক শ্রেণীর জন্যে। তাই বাঙালীর ছেলে মানুষ হতো মোটা ভাত মোটা কাপড়ে। ছাড়িয়ে ছিটিয়ে বিলাসিতায় খরচ করার মত পয়সা তখন হাতে থাকতো কম জনেরই। তবু এরই মধ্যে ছিল গান। এই কলকাতা শহরের গলি তস্য গলির মধ্যে দিয়ে চলতে গেলে অন্ততঃ পাঁচটি বাড়ী থেকে ভেসে আসতো সুর আর ছন্দোবদ্ধ ধ্বনি। ভোরে আর সন্ধ্যায় উনোনে আগুন পড়লে ধোঁয়া বেরোতো রান্নাঘরের ঘুলঘুলি দিয়ে আর ঠিক সেই সঙ্গে যেন তাল রেখে সিঙ্গল রীডের হারমোনিয়মের সঙ্গে ভেসে আসতো দু-তিনটে মেয়ের গলায় ঐকতান, সাজেনা, রেখায়া, পাধাপা—

আবাহনীর সুরেরা হয়তো ওই একটি বাড়ীতে বড় মুখের তোলের মত, পাখ উঠে গাওয়া তবলার বাদনীর [illegible]

ছোট্ট ছেলেটি বোল সাধছে, তেরে কেটে তাক তাক, তাক তেরে কেটে তাক—বাড়ীর লোক বাতিব্যস্ত হয়ে বলে, ওরে থাম, ওরে থাম—তাই সে গিয়ে উঠেছে চিলে কোঠায় বাঁয়া তবলা নিয়ে।

এমনি ছিল। মুখে যাই বললেও মা-বাপের প্রশ্রয় ছিল, আহা করুক, খারাপ কাজ তো নয়, তবে পড়াশোনাটা কামাই হলে থেতে পাবি না। অবশ্য পড়াশোনাটা যার করার সে ঠিকই করেছে এই সঙ্গে তবে গান বাজনাটা সবার চোখের আড়ালে কখন যেন তার মাথায় ভূতের মত চেপে বসেছে। সব ছাড়া যায় কেবল ওইটি বাদে।

তা সেই ছেলে মেয়েদের কাকুতিতে মন ভিজেছে বাপ মায়েরও। কিছু না হোক দুধের মাপটা কমিয়ে অথবা তেলটা একটু টেনে খরচ করে আট-দশটা টাকা বাঁচিয়ে রেখেছেন এই বাবদ, মেয়ে গান শিখবে অথবা ছেলে সেতার। ক্রমে তারা ভূপালীর দ্রুত ত্রিতালের পাঠ ছাড়িয়ে রাগের পর রাগকে টপকে কবে যেন পৌঁছে গেছে বিলম্বিত বন্দিশে, তান বিস্তার রেয়াজ করেছে দিনে পাঁচ ছ ঘণ্টা, তারপর গুরুকে মা-বাবাকে প্রণাম করে গিয়ে দাঁড়িয়েছে অল ইণ্ডিয়া রেডিওর গার্স্টিন প্লেসের সেই বাড়ীটিতে অথবা ইডেন গার্ডেনস-এর নতুন ইমারৎ-এর কাছে।

ঘরে ঘরে তখন রেডিও এসে গেছে, তার মধ্যে যোরালেই শোনা যায় বড় বড় শিল্পীর গান বাজনা, তাঁদের ছাত্রছাত্রীরাও তৈরী হয়ে ঢুকে যাচ্ছে মাথা উঁচু করে। কত কিছু শেখা যায় মন দিয়ে এই রেডিও শুনলে। শেখার বড় সুযোগ আসে শীতকালে যখন কনফারেন্স হয়। ভূপেন ঘোষ, রাইচাঁদ বড়াল, লালাবাবু সে পথ খুলে দিয়েছেন আগেই। বাইরের ওস্তাদদের নিয়ে এসে তাদেরও গানের যজ্ঞ শুরু করে দিতেন তাঁরা। তবে সে গান গিয়ে সিটে বসে শোনার সুযোগ আর কজনের হতো। কমপক্ষে দশ টাকা টিকিটের দাম, অত দেবে কে? উদ্যোক্তারাও যে একথা বুঝতেন না তা নয়, তাই বাইরে লাউডস্পীকার লাগিয়ে দিতেন দু-একটা। হয়তো লালাবাবু কনফারেন্স ডেকেছেন পূরবী সিনেমার হল-এ মির্জাপুর স্ট্রীট আমহার্স্ট স্ট্রীট দিয়ে চললে তখন দেখা যেত সারি সারি ছেলে মেয়ে, বয়স্ক মানুষ খবরের কাগজ বিছিয়ে বসে গেছে শ্রদ্ধানন্দ পার্কে। শেষ রাতে ওঙ্কারনাথ অথবা কেশর বাঈএর গানের সময় দেখা যেত হয়তো একখানা সুতীর চাদরেই আপাদমস্তক মুড়ে তারা বসে রয়েছে হলএর বারান্দায় অথবা সিঁড়িতে। মানমর্যাদা বা শারীরিক কষ্টের চিন্তাগুলো অন্তত সেই সময়টায় মাথায় থাকতো না ওদের। একটুখানি খালি চাহিদা ছিল, তা হল চায়ের। দু'পয়সা খুরির চাওয়ালা এই সুযোগে কামিয়ে নিত বেশ কিছু।

কনফারেন্স শেষ হওয়ার পরও তার ঘোরটা কাটতো না কতদিন। আনখেলালের হাতে 'খেয়ে খেয়ে' নিয়ে আপ্রাণ লড়াই চালাতো ছেলেরা গরবা ম্যায় সঙ্গ লাগেরা দোলা. আয়েনা বালম-এর মোচড় কত রাতের ঘুম কেড়ে নিতো কত চোখের।

সেকালটা এমনি ছিল। শুধু উচ্চাঙ্গের গানে নয়, তিরিশ দশকের শেষ থেকে বাংলায় সঙ্গীতের জগতেই যেন এসেছিল এক নতুন জাগরণের কাল। দিন তারিখের হিসেবে চিহ্নিত করতে না পারলেও সময়টা এরই আশেপাশে।

উচ্চাঙ্গসঙ্গীতটা সবার জন্য নয়। সবার জন্য ছিল অন্য জিনিস এবং নিজের নিজের জোরে তা উঠেছিল উৎকর্ষের শিখরে। তার ছিল রবীন্দ্রসঙ্গীত।

বাংলা গানের জগতে রবীন্দ্রনাথের আবির্ভাব এর অনেক আগের ব্যাপার। শিক্ষিত বিদগ্ধসমাজে তার যথেষ্ট চল ইতিমধ্যেই হয়েছে। তবে তার সার্বজনীন প্রচার মানুষকে পূর্ণমাত্রায় প্রভাবিত করেছিল এই দশক একথা বলতে দ্বিধার কিছু নেই।

কথাটার একটু অর্থ আছে। রবীন্দ্রসঙ্গীতের বাণীর আবেদন শিক্ষিত মানুষকে নাড়া দিলেও সাধারণ মানুষের মনে একটু সন্দেহের ভাব যেন লেগে থাকতো। আর কিছু না হোক অন্তত। মেয়েদের বেলায় তিরিশ পঁয়ত্রিশ সালেও, আমার মাথা নত করে দাও হে তোমার চরণ ধুলার পরে, অথবা আমার সকল দুখের প্রদীপ, এই সব গানই খোলা মনের অনুমোদন পেতো।

আজ ঝড়ের রাতে তোমার অভিসার/ পরাণ সখা বন্ধু হে আমার, এ গান নিশ্চিন্ত ভাবী শ্বশুরের সামনে মেয়েকে গাইতে দেওয়া সাহসের কাজ ছিল। বাড়ীর কলেজে পড়া তরুণ ছেলেটি হয়তো তর্ক তুলতো, বলতো, এ তো ভগবানকে উদ্দেশ্য করে বলা, তবে দোষ কিসের। তবু বাবা জ্যাঠারা তার মত অর্বাচীনের কথায় তেমন কান দিতেন না। বলতেন, কেন, ওসব পরাণ সখা টখা ছাড়া কি গান নেই, কেত্তন টেত্তন গাক না একটা।

এর পরে সময় পালটালো দ্রুত, সেই সঙ্গে মানুষের মতও। নইলে তিরিশ দশকে নজরুলকেও তো রেখে ঢেকে গাওয়া হতো। বলরে জবা বল, বা কানন গিরি সিন্ধুপার এমন সব ধরনের গান গাইতে মানা ছিল না, কিন্তু নতুন নেশার আমার এ মদ, ছাড়ো ছাড়ো কাঁচল, এসব গান? মেয়েরা দূরের কথা ছেলেরাও কি গলা তুলে গাইতে পারতো গুরুজনদের সামনে? দ্বিজেন্দ্রলাল অতুল প্রসাদের গানও এই ভাবে ঝাড়াই বাছাই হতো, নইলে অস্বস্তির কারণ ঘটতো গায়ক এবং শ্রোতা দুয়েরই।

কিন্তু এ অবস্থা বেশী দিন চললো না। মানুষের মত রুচি সবই বদলালো। রেডিওতে তখন পঙ্কজ মল্লিক সঙ্গীত শিক্ষার আসর বসিয়েছেন, সিনেমায় সায়গল কাননদেবী গাইছেন রবীন্দ্রনাথের গান, যাদের ঘরে গ্রামোফোন রয়েছে তারা নিত্য নতুন রেকর্ড কিনছে লাল খয়েরী, নীলচে হলদে নানা রং এর লেবেল লাগানো, কত নতুন গান, কত কবি কত সুরকার, কত গায়কের প্রতিভার নিত্য পরিচয় পাচ্ছে শ্রোতারা।

ওদিকে ইতিমধ্যে সবার অলক্ষ্যে চলছিল আর এক নতুন প্রস্তুতি। সুদূর ত্রিপুরার রাজ পরিবারের একটি কিশোর বড় হয়ে উঠেছিল গানের আবেগ বুকে নিয়ে। পৈত্রিক সম্পত্তি, চাকরীর লোভ সব কিছু ত্যাগ করে সে একদিন পথে বেরিয়ে পড়ল, এসে মিশে গেল কলকাতার জনারণ্যে। কলকাতায় তখন কৃষ্ণচন্দ্র দে, ধীরেন দাস, আঙুরবালা, ইন্দুবালা, হরিমতী গাইছেন নতুন নতুন বাংলা গান। কীর্তনাঙ্গের, বাউল, ভাটিয়ালী, শ্যামাসঙ্গীত এমন কি ইসলামী, মুর্শিদ করো নামাজ পড়ো'র মত গান পর্যন্ত। এই গায়ককুলের তালিকায় যুক্ত হল একটি নতুন নাম কুমার শচীন দেববর্মন।

প্রাণের প্রভু মরনা প্রাণে, আলোছায়া দোলা, তুমি যে গিয়াছ বকুল বিছানো পথে, প্রেমের সমাধি তীরে, এমনি শতশত মনভোলানো প্রাণ উচাটন করা সুর আকুল করে তুলল গানপাগল মানুষদের।

মফস্বল ছোট্ট শহরে, বাড়ীর কর্তা গেছেন কলকাতায় অফিসের কাজে, ফিরলেন ভোর চারটের ঢাকা মেল-এ। সেই পাখি না ডাকা ভোরে জেগে উঠলো বাড়ীর মানুষ। গরম চায়ের কাপ হাতে হেরিকেনের আলো জ্বালিয়ে চলল গানের আসর। কলকাতা থেকে এসেছে নতুন রেকর্ড। সুজিতনাথের গীটার, কমলা ঝরিয়ার কীর্তন আর শচীনদেব বর্মনের নতুন গান। না হোক তিনবার করে শোনা হয়ে গেল। তিন দুগুণে ছ'খানি গান বেলা সাড়ে ছটার আগে।

দু' টাকা আড়াই টাকায় রেকর্ড পাওয়া যেত তখন। দুপিঠে দুখানি গান বা বাজনা।

এই গানের আবেগ বুকে নিয়ে সেদিন কত তরুণ টিউশনি সম্বল করে সংসারের মায়া ছাড়লো, কত মেয়ে অনুনয় করলো, আমার বিয়ে দিও না মা, তাহলে গান থাকবে না।

জীবনে অনেক কিছু ত্যাগ করে তাঁরা তানপুরো, হারমোনিয়ম, সেতার আঁকড়ে পড়ে রইলেন শেষ পর্যন্ত। বয়েস বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে মনোবলও বাড়লে, সাফল্যও এলো ভাগ্য অনুকূল হলে। রেডিও রেকর্ড এমন কি প্রৌঢ় বয়েসে টেলিভিশনের পর্দায় নিজের চেহারা দেখে রোমাঞ্চিত হলেন অনেকে। আর্থিক সাচ্ছল্য ? তাও এলো কারণ একালে দশ টাকা কেন আরও বহু টাকা অবহেলায় মাস্টারের হাতে ধরিয়ে দিতে পারেন বাপমায়েরা। কিন্তু সত্যকিঙ্কর বন্দোপাধ্যায়, সুখেন্দু গোস্বামী, যে নিষ্ঠা, যে দৈহিক শ্রম দিয়েও গুরুর সেবা করেছেন, চিন্ময় লাহিড়ী, ধীরেন্দ্রচন্দ্র মিত্র, যূথিকা রায়, ছবি বন্দ্যোপাধ্যায় যে একাগ্রতা, যে ত্যাগ, যে পরিশ্রম দিয়ে একটু একটু করে গড়ে তুলেছেন তাঁদের শিল্পীজীবন, তা যেন অতীতের কিংবদন্তীর মত মনে হয় আজ। পাদপ্রদীপের সামনে যাঁরা এসেছেন শুধু তাঁদের কথাই বা ধরি কেন, আরও কতজন যে হতাশায় ভেঙে পড়েছেন, খুইয়েছেন জীবনের শান্তি, তাঁদের সংখ্যা কে জানে। তবু তাঁরা সাধনা করেছেন যতকাল সম্ভব। সঙ্গীতকে জীবন থেকে অবশেষে হয়তো বিদায় দিতে হয়েছে, কিন্তু তবু তার প্রতি ভালোবাসা আজও যায়নি।

আমার তো হলো না, মেয়েটা গান শিখুক অথবা ছেলেটা বাঁশী এমনি ভেবেছেন কতজনে। কিন্তু সে আশাও পূরণ হয়নি। অন্যদের কথা কেন কত গায়ক গায়িকার ছেলেমেয়েও হয়তো কোনদিন যন্ত্রটাকে ছুঁয়ে দেখেনি, সারে গামা, স্বরগুলি পর্যন্ত সাধেনি গলায়।

ওদের জিজ্ঞাসা করলে বলবে, এই কমপিটিশনের বাজারে কি হবে ওতে ? তার চেয়ে পাশ করে চাকরীর খোঁজ করা ভালো। না হলে ব্যবসা ছোটোখাটো। ভাগ্য ভালো থাকলে লেগে যাবে। মাবাপের পয়সা থাকলে ওরা ছবি আঁকা শিখে এগ্রিকালচারের ব্যবস্থা করে নেবে, ল্যান্ডুয়েজ ক্লাস করবে, চাই কি ওরই ল্যাজ ধরে একবার বাইরে ঘুরে আসাটাও হয়ে যাবে তেমন কপাল থাকলে। কি হবে দিনের মধ্যে দশ ঘন্টা। রেওয়াজ করে তানপুরা নিয়ে টুংটাং করে গলা সেধে রেডিওতে টি ভিতে যাবে ? অবশ্য টি ভিতে হলে মন্দ হয় না, তবে সেখানেও তো লাইন পড়েছে। তার চেয়ে আনন্দস্ফূর্তিতে জলাঞ্জলি দিয়ে ঘরের কোনে বসে সারাদিন সাধো, অত বান্দা হয় না একালে। ও যখন হতো তখন হতো।

তবু তারা আগে শিখতো কতকটা যেন অভ্যাসবশে হয়েই। মা মোটা টুইলের হাফসার্ট ধুতি বা চেককাটা হাওড়াহাটের তাঁতের শাড়ী পরে নয়, বিদেশী টেরিলিনের ট্রাউজার্স, সিল্ক শাড়ী অথবা ম্যাক্সী পরে, ভূমিকা বিনয়ে অবনত কুণ্ঠিত পায়ে নয়, মাথা উঁচু করে, টাকাটা পায়ের কাছে না রেখে সিধা হাতেই ধরিয়ে দেয় গুরুকে, কমফাংশনেও যার মধ্যে সবাইতো টিকিট কিনে। সবাই করে, শুধু করে না রেওয়াজ আর শোনে না রেডিও। অত সময় নেই কোমলতা, মিড়, হাবলু কিংবা গুণীজনের।

কিন্তু তবু জোর এই এক চিন্তাতে বাংলা গাঁয়ে দেশ টিকতে গান আজও রয়েছে আর থাকবেও আরও হাজার বছর, শুধু বর্তমান একজনের মধ্যে একজনও জেদী নমিতা বা কাবেরী, অথবা পাগলাটে মন্টু বা সুজন থাকবে। সবার চোখ এড়িয়ে চুপি চুপি তানপুরাটা নিয়ে চলে যাবে চিলেকোঠায়, অথবা শরীর খারাপের অজুহাত তুলে নাকচ করে দেবে ডিনারের নেমন্তন্ন তার পর সেতারটা তুলে নিয়ে পা মুড়ে বসে যাবে কার্পেটের ওপর। ধন্দুদের ঠাট্টা, বাইরের হাজার প্রলোভন এদের টলাতে পারবে না, নিবিষ্ট চিত্তে এরা ডুবে যাবে সুরের গভীরে, দুলবে ছন্দের দোলায়।

না কল্পনা নয়। এমন ছেলেমেয়ে আজও রয়েছে পটুয়াটোলা লেন অথবা পার্ক স্ট্রীটে আর এইটুকুই বাঙালী সঙ্গীত প্রেমীদের কাছে সবচেয়ে বড় সান্ত্বনা। এই নমিতা বা মন্টুরা তো আমাকে বলেনি, গান শেখা ? কি হবে ওতে, অথবা বলেনি, ও—ইট ইজ জাস্ট সিম্পল ওয়েস্ট অফ টাইম অ্যান্ড মানি। তাহলে এখনি হতাশ হওয়ার কি আছে ? চারপাশে দুর্বার গতি, জীবনে মূল্যবোধও বদলাচ্ছে প্রতিদিন সকাল সন্ধ্যায়। এর মাঝখানে ওদের দিকে তাকিয়েই তো মনে আশা রাখা যায় যে বাঙালীর হৃদয়ের সুরের ধারাটি কোনদিনই একেবারে শুকিয়ে যাবে না, কোথাও না কোথাও একটুখানি সরসতা তার থাকবেই সবরকম প্রতিকূলতার মধ্যেও।

দ্বিজত্ব ও দেবত্ব

জানকী মুখোপাধ্যায়
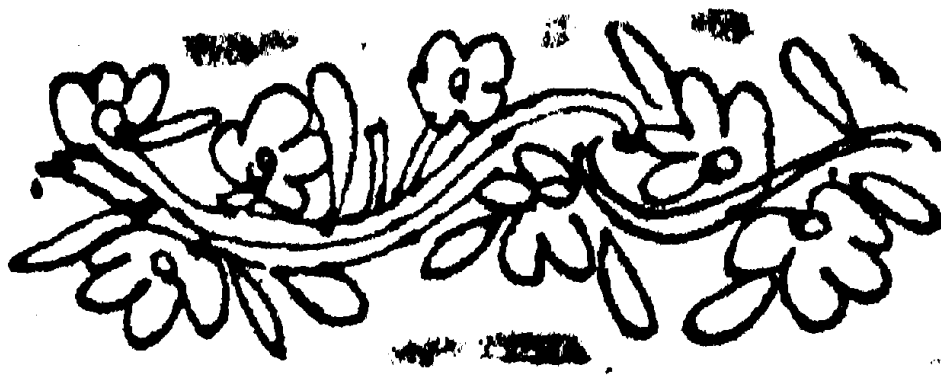
আচার্য হাজারীপ্রসাদ দ্বিবেদী স্বনামধন্য ব্যক্তি। এমন বিদগ্ধমনা, অনলসকর্মী, নিরহংকার চরিত্রের মানুষ দুর্লভ বলা যায়। দ্বিবেদীজী কাশী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে কৃতবিদ্য হয়ে ১৯৩১ খৃঃ হিন্দী শিক্ষকরূপে শান্তিনিকেতনে যোগদান করেছিলেন এবং দীর্ঘ বিশ বছর সেখানে ছিলেন। আধুনিক হিন্দী কাব্যের ভক্ত শ্রীরামদুলারে বাজপেয়ীর সংস্পর্শে এসে আধুনিক হিন্দী সাহিত্যের প্রতি অনুরক্ত হয়ে উঠলেও, শান্তিনিকেতনে থাকাকালে এঁর ....সাহিত্যপ্রতিভার স্ফুরণ হয় এবং ওখানেই বহু গ্রন্থ রচনা করেছিলেন। দ্বিবেদীজীর লেখা গ্রন্থের সংখ্যা চল্লিশেরও অধিক এবং তার মধ্যে যেমন উপন্যাস আছে, তেমনি গবেষণামূলক উচ্চমানের গ্রন্থও আছে। 'মৃত্যুঞ্জয় রবীন্দ্রনাথ' নামে একটি পুস্তক আছে যাতে রবীন্দ্র-প্রতিভার বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা করেছেন। বইটি এক কথায় অপূর্ব।

সাহিত্যকর্মের জন্য বহু সম্মান ও পুরস্কার লাভ করেছেন। হিন্দী সাহিত্য সংস্থা থেকে 'সাহিত্য বাচস্পতি' এবং লখনৌ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে 'ডি লিট' সম্মানে ভূষিত করা হয়েছে। সাহিত্য একাডেমী পুরস্কার এবং রবীন্দ্র পুরস্কারও লাভ করেছেন। ভারত সরকার এঁকে পদ্মবিভূষণে ভূষিত করেছেন।

দ্বিবেদীজী বহু সম্মানজনক পদও অলংকৃত করেছেন। যেমন—পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রফেসর, টেগোর প্রফেসর বেনারস হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ে হিন্দী বিভাগের প্রধানাচার্য এবং পরে ওখানেই রেক্টর ছিলেন। বর্তমানে ইনি বোর্ড অফ গভর্নর উত্তরপ্রদেশের হিন্দী গ্রন্থ একাডেমীর চেয়ারম্যান এবং ডাইরেক্টর—হিন্দী ভবন।

'শান্তিনিকেতনে পৌঁছবার পর আমার যথার্থ দ্বিজত্বপ্রাপ্তি ঘটেছে।' বললেন হাজারীপ্রসাদ দ্বিবেদীজী। 'গলায় একগোছা পৈতে ধারণ করলেই কারুর দ্বিজত্ব লাভ হল—এ আমি বিশ্বাস করি না। দ্বিজত্ব মানে সত্যিই দ্বিতীয় জন্ম, নবজন্ম, নিজেকে অভিজ্ঞতার আলোয় নতুন করে আবিষ্কার করাই হল দ্বিজত্ব। শান্তিনিকেতনের আলোয় আমি নিজেকে নতুন করে দেখলুম, নিজের অন্তরকে নতুন করে আবিষ্কার করলুম। ওখানে যাবার পর মনে হল আমারো কিছু করবার যা দেবার আছে। এই জন্য শান্তিনিকেতনে যে-দিনটিতে পৌঁছই, ৭ই নভেম্বর, ১৯৩১ সাল আমার জীবনে একটি বিশেষ স্মরণীয় দিন।

দ্বিবেদীজীর বসার ঘরে কয়েকটি পারিবারিক ছবি ব্যতীত যে-ছবিটি চোখে পড়ে তা রবীন্দ্রনাথের। ওটি ওঁর এক শিষ্য ওঁকে শ্রদ্ধাসহকারে দিয়েছিলেন। আমার দৃষ্টি অনুসরণ করে বললেন, 'গুরুদেবের মুখের ভাব ঠিক ঠিক ফোটাতে পারেনি।' রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে ওঁর মুখে 'গুরুদেব' ব্যতীত অন্য শব্দ ব্যবহার করতে শুনিনি।

শান্তিনিকেতনে ওঁর জীবন সম্বন্ধে প্রশ্ন করলে হেসে বললেন, সে কি একআধদিনের কথা, দীর্ঘ বিশ বছর ওখানে কাটিয়েছি। গুরুদেব দেহরক্ষার পরও আট বছর ছিলুম। কত ঘটনা কত কথা, গুরুদেবের সঙ্গ, তাঁর মধুর ব্যবহার, রঙ্গরসিকতা........আমি যখন শান্তিনিকেতনে যাই, গুরুদেব তখন ওখানে ছিলেন না। মনে হয় ইরানে নিমন্ত্রিত হয়ে গিয়েছিলেন।

শান্তিনিকেতনের সঙ্গে আমার প্রথম পরিচয়ের সেতু আশাদিদি। উনি তখন শান্তিনিকেতনের শিক্ষাভবনে রেক্টর। হিন্দী শিক্ষকের পদে আমার নাম উনিই সুপারিশ করেছিলেন।

আমি যখন আশাদিদির ঘরে পৌঁছলুম উনি তখন পড়াতে চলে গিয়েছেন। ভৃত্য ছিল। সে-ই তর্জনী তুলে দেখাল, ঐ দেখুন দিদি ওখানে পড়াচ্ছেন। দেখলুম, মাঠের মাঝখানে গাছের ছায়ায় ছাত্রছাত্রীরা ছোট ছোট আসনে বসে পড়ছে। এমনি অনেকে পড়ছে ও পড়াচ্ছেন।

আশাদিদি একটু পরে এলেন। আমায় শান্তিনিকেতন ঘুরিয়ে দেখালেন। শান্তিনিকেতন সম্বন্ধে আমার কৌতূহল ছিল। ঘুরে দেখার পর সে-কৌতূহল আরো বৃদ্ধি হল। আশ্রমের প্রতিটি গাছ বা কুঞ্জের ইতিহাস আছে। আশ্রমবাসীদের সঙ্গে ওদের যেন আত্মীয়তার সম্পর্ক। কোথায় দীনবন্ধু এণ্ডরুজ থাকতেন, কোথায় সিলভাঁ লেভী পড়াতেন, স্টেন কোনো কোথায় ভাষাবিজ্ঞানের চর্চা করতেন এবং সবশেষে সপ্তপর্ণীর ঘনছায়াচ্ছন্ন নিকুঞ্জ দেখালেন যাকে আশ্রমের পীঠস্থান বলা হয়। এইখানে বসে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ গুরুদেবকে উপনিষদ ও হাফিজ অধ্যয়ন করাতেন। এই বৃক্ষকে কেন্দ্র করে শান্তিনিকেতন গড়ে উঠেছে এবং পরে গুরুদেব বোলপুরে ব্রহ্মচর্যাশ্রম স্থাপন করেন যা আজকাল বিশ্বভারতীরূপে বিশ্বে বিদিত।

শান্তিনিকেতনে সব কাজ ঘণ্টাধ্বনি দ্বারা জানান হত। যেমন ধরুন, একবার ঘণ্টাধ্বনি মানে খাবার আহ্বান, দুবার ঘণ্টাধ্বনি মানে শোবার ইঙ্গিত। একদিন দুপুরে দেখি কয়েকবার ঘণ্টাধ্বনি হবার পরই সকলে ক্লাশ ছেড়ে যে-যেখানে ছিল সব একটি বিশেষ জায়গায় দৌড়ে চলে গেলেন। আমি কিছুই বুঝতে না পেরে ঘরে চলে এলুম।

পরে আশাদিদি এসে আমায় ঘরে দেখে অবাক! আপনি এখানে রয়েছেন! গুরুদেবকে দর্শন করতে গেলেন না!

তখুনি আমায় নিয়ে চললেন গুরুদেবের সঙ্গে সাক্ষাৎ করাতে। আমি সংকোচের সঙ্গে তাঁকে অনুসরণ করলুম। গুরুদেব বিরাট ধনী পরিবার থেকে এসেছেন, নোবেল প্রাইজ পেয়েছেন, বিশ্বজোড়া তাঁর নাম। তাঁর সম্বন্ধে আমার ধারণা অন্য রকম ছিল। কিন্তু তাঁর সামনে উপস্থিত হয়ে মনে হল আমি যেন নির্মল গঙ্গাজলের ধারার সামনে পৌঁছে গেছি। তাঁর চোখে যখন স্নেহের ভাব ফুটে উঠত, সে-ভাবের মধ্যে কোন কৃত্রিমতা থাকত না। আর সে কী অপূর্ব স্নেহবিগলিত দৃষ্টি! আমায় প্রথম কথা জিজ্ঞাসা করেছিলেন, 'পণ্ডিতজী ক্যায়সা হ্যায়?' আশাদিদির কাছে আমি কিছু বাংলা জানি ও কিছু কিছু বলতে পারি শুনে গুরুদেব আর কখনো আমার সঙ্গে হিন্দীতে কথা বলেননি বরং আমার সামনে অন্যের সঙ্গেও হিন্দীতে কথা বলতেন না। একবার যমুনাদাস বাজাজ এসেছিলেন। সেখানে আমিও উপস্থিত ছিলুম। গুরুদেব তাঁর সঙ্গে কথা বলার আগে আমাকে সে-স্থান থেকে সরে যেতে ইঙ্গিত করেছিলেন।

আমি শান্তিনিকেতনে এসে ভালভাবে বাংলা শিখি ও অন্যান্য ভাষাও শিখে ফেলি। কিন্তু প্রথম প্রথম বাংলা ভাল বলতে পারতুম না। গুরুদেবের সঙ্গে সাক্ষাতের আশায় আমার কাছে কেউ এলে আমি আগে গুরুদেবের কাছে গিয়ে তাঁকে জানাতুম, এক ভদ্রলোক আপনার দর্শনের জন্য এসেছেন। তারপর থেকে গুরুদেবের কাছে অসময়ে গেলেই উনি আমায় প্রশ্ন করতেন, 'কি, দর্শনার্থী এসেছে?'

গুরুদেবের কথা বলার ধরণ অতি সহজ ছিল, ছোট ছোট কথায় আবহাওয়া আমোদিত করে তুলতেন। সেবার কোলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে সমাবর্তন উৎসবে গুরুদেবের ভাষণ ছিল। বাংলায় অপূর্ব ভাষণ দিয়েছিলেন। তারপর শান্তিনিকেতনে ফিরে এলেন। আমরা সকলে তাঁকে ঘিরে দাঁড়াতেই গম্ভীরভাবে বললেন, 'যাক এতদিন পরে আমার একটি কলংক ঘুচল। শুনে আমরা অবাক হয়ে মুখ চাওয়াচাওয়ি করি। তিনিও একবার আমাদের ওপর চোখ বুলিয়ে নিলেন। তারপর বললেন, 'লোকে বলে যে, রবিবাবু কখনো কলেজের দরজা ডিঙোতে পারেননি। আজ একেবারে বিশ্ববিদ্যালয়ের দরজা ডিঙিয়ে এলুম।'

তেমনি একবার মহাত্মা গান্ধীর জেলে অনশন করলে গুরুদেব সেখানে তাঁকে দেখতে যান। ফিরে এসে মন্তব্য করলেন, 'এরপর আর কেউ এ-অপবাদ দিতে

শুনে যা বুঝি, রবীন্দ্রনাথ কখনো ভোলেন নি।'

তাঁর ভক্ত মহাদেবকে নিয়ে তিনি খুব ঠাট্টা করতেন। একদিন সখেদে মন্তব্য করলেন, 'ভগবানের কী বিচার দেখ। তিনি গান্ধীজীকেও মহাদেব (মহাদেব দেশাই) দিয়েছেন আর আমাকেও। কিন্তু দুই মহাদেবের মধ্যে কী তফাৎ, ভাব।'

গুরুদেবের সঙ্গে প্রতিদিন কত লোক দেখা করতে আসতেন তার ইয়ত্তা নেই। কেউ এসে দেখা করে চলে যেতেন, কেউ বিরক্ত করতেন, কারুর ব্যবহার অত্যাচারের মত হয়ে উঠত। গুরুদেব প্রতিবাদ করতে পারতেন না, অসহায় বোধ করতেন। সুধাকান্তবাবু এসে তাঁকে সামলাতেন।

একবার রামলোচন পাণ্ডে নামে এক ব্যক্তি উড়িয়া ও হিন্দী ভাষায় কবিতা লিখে এসে গুরুদেবকে পড়িয়ে শোনাতে চান। গুরুদেবের তখন বিশ্রামের সময়। সুধাকান্তবাবু রামলোচনকে শান্ত করতে অপারগ হয়ে জানান যে, গুরুদেব এখন অসুস্থ। কিন্তু, রামলোচন মানবার পাত্র নন। তিনি জোর করে ঘরে প্রবেশ করে গুরুদেবের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন এবং তাঁকে কবিতা পড়িয়ে শোনান। একঘণ্টা পরে চলে যাবার সময় গুরুদেবকে বলেছিলেন, মহাদেবকে যেমন ভূতপ্রেত ঘিরে থাকে তেমনি দেখছি আপনাকেও। সুধাকান্তবাবুকে পিশাচ বলে উল্লেখ করেছিলেন।

পরে গুরুদেব রহস্য করে সুধাকান্তবাবুকে বলেছিলেন, 'দ্যাখ, তোরা তো সামলাতে পারিস না, ফলে সকলকে ভূতপ্রেত পিশাচ হতে হয়।'

শান্তিনিকেতনে একটি গাছের নিচের চা-চক্র ছিল। যুবকেরা এখানে চা-পানের জন্য যেতই, বড়রাও আসর জমাতে এখানে উপস্থিত হতেন। আমি নিজেকে বড়দের দলভুক্ত করে নিয়েছিলুম। এই দলে আমার গুরু ক্ষিতিমোহন সেনশাস্ত্রী, বিধুশেখর শাস্ত্রী, নন্দলাল বসু ইত্যাদি ছিলেন। গুরুদেবও মাঝে মাঝে এসে এই চা-চক্রে যোগ দিতেন। এই চা-চক্র প্রবর্তন উপলক্ষে গুরুদেব একটি সুন্দর কবিতা 'সুসীম চা-চক্র'০ নামে রচনা করেছিলেন, যেমন :—

হায় হায় হায়
দিন চলি যায়।
চা-স্পৃহ চঞ্চল
চাতকদল চল
চল চল হে!
টগবগ উচ্ছল
কাথলিতল জল
কল কল হে
এলো চীন-গগন হতে
পূর্ব পবনস্রোতে
শ্যামল রসধরপুঞ্জ,
শ্রাবণ বাসরে
রস ঝরঝর ঝরে
ভুঞ্জ হে ভুঞ্জ
দলবল হে।

এসো পুঁথিপরিচারক
তদ্ধিতকারক
তারক তুমি কাণ্ডারী, ১
এসো গণিত-ধুরন্ধর
কাব্য-পুরন্দর
ভূমিবিবরণ ভাণ্ডারী। ২
এসো বিশ্বভার-নত
শুষ্ক-রুটিনপথ
মরুপরিচারণ ক্লান্ত।৩
এসো হিসাব'পত্তর' ত্রস্ত
তহবিল-মিল-ভুলগ্রস্ত
লোচনপ্রান্ত
ছল ছল হে।×
এসো গীতিবীথিচর
তম্বুরকরধর
তানতাল তলমগ্ন, ৪
এসো চিত্রী চটপট
ফেলি তুলিকপট
রেখাবর্ণবিলগ্ন। ৫
এসো কন্সটিটিউশন
নিয়ম-বিভূষণ
তর্কে অপরিশ্রান্ত, ৬
এসো কমিটি পলাতক
বিধানঘাতক
এসো দিগ্‌ভ্রান্ত
টলমল হে। ××

০ রবীন্দ্ররচনাবলী, ত্রয়োবিংশ খণ্ড, গ্রন্থ-পরিচয়, ৫৩৬ পৃঃ।
১ বিধুশেখর শাস্ত্রী মহাশয়।
২ জগদানন্দবাবু।
৩ ক্ষিতিমোহন সেনশাস্ত্রী।
৪ দীনেন্দ্রনাথ ঠাকুর।
৫ নন্দলাল বসু, আচার্য।
৬ শ্রীসুরেন্দ্রমোহন ঘোষ।
×× এ-দুজনের নাম দ্বিবেদীজী মনে করতে পারেননি।

গুরুদেব কারুর কাছে শুনেছিলেন যে, আমি লেখার চর্চা করি। শুনে উনি আমার লেখা পড়তে চাইলে একটি লেখা নকল করে ওঁকে পড়তে দিয়েছিলুম। লেখার এক স্থানে 'মৌলিক' কথাটি ছিল। গুরুদেব তা কেটে দিয়ে লিখে দিয়েছিলেন, 'সকীয়তা'।

গুরুদেব একবার বড়দের দলের সামনে 'ছন্দ' সম্বন্ধে পড়ে শুনিয়েছিলেন। বড়দের দলে থাকার আমারো শোনার সৌভাগ্য হয়েছিল। তাঁর ছন্দ সম্বন্ধে বক্তব্য সবাই বুঝলেন, আমি বুঝতে পারলুম না। আসলে আমিই গোড়াতে ভুল করলুম। বাংলা উচ্চারণের জন্য তার মাত্রা হিন্দী মাত্রার থেকে ভিন্নরূপ। গুরুদেব শুনে বললেন, 'কেন, না বোঝার কি আছে। আচ্ছা তুমি কাল এসো, আমি তোমায় আবার বোঝাব।'

পরের দিন যথাসময়ে গুরুদেবের কাছে গেলুম। আমি অবাক হয়ে গেলুম দেখে যে, গুরুদেব ইতিমধ্যে একটি সংস্কৃত কবিতাকে বাংলায় অনুবাদ করেছেন এবং প্রায় একঘণ্টা ছন্দ নিয়ে আমাকে বোঝালেন। যাঁর কাছে সময় অমূল্য, এক মিনিট অপব্যয় করতে পারেন না, তিনি আমার জন্য কী সময় অপব্যয় করলেন। আসলে কেউ কিছু সৎ বিষয় নিয়ে চর্চা করছে বা কেউ কিছু জানার জন্য আগ্রহান্বিত দেখলে তিনি অত্যন্ত খুশি হতেন। যাই হোক শেষ পর্যন্ত হিন্দী ও বাংলা উচ্চারণের তফাৎ মনে হতেই বিষয়টি সরল হয়ে গেল।

শান্তিনিকেতনে জন্মোৎসব, বৃক্ষরোপণ ইত্যাদি কাজে বেদমন্ত্র বাংলায় অনুবাদ করে পাঠ করার নিয়ম ছিল। এ-কাজের ভার ছিল ক্ষিতিমোহনবাবুর ওপর। একবার ক্ষিতিমোহনবাবু কোন কাজে অন্যত্র গিয়েছিলেন। রথীবাবুর জন্মদিন আসন্ন।
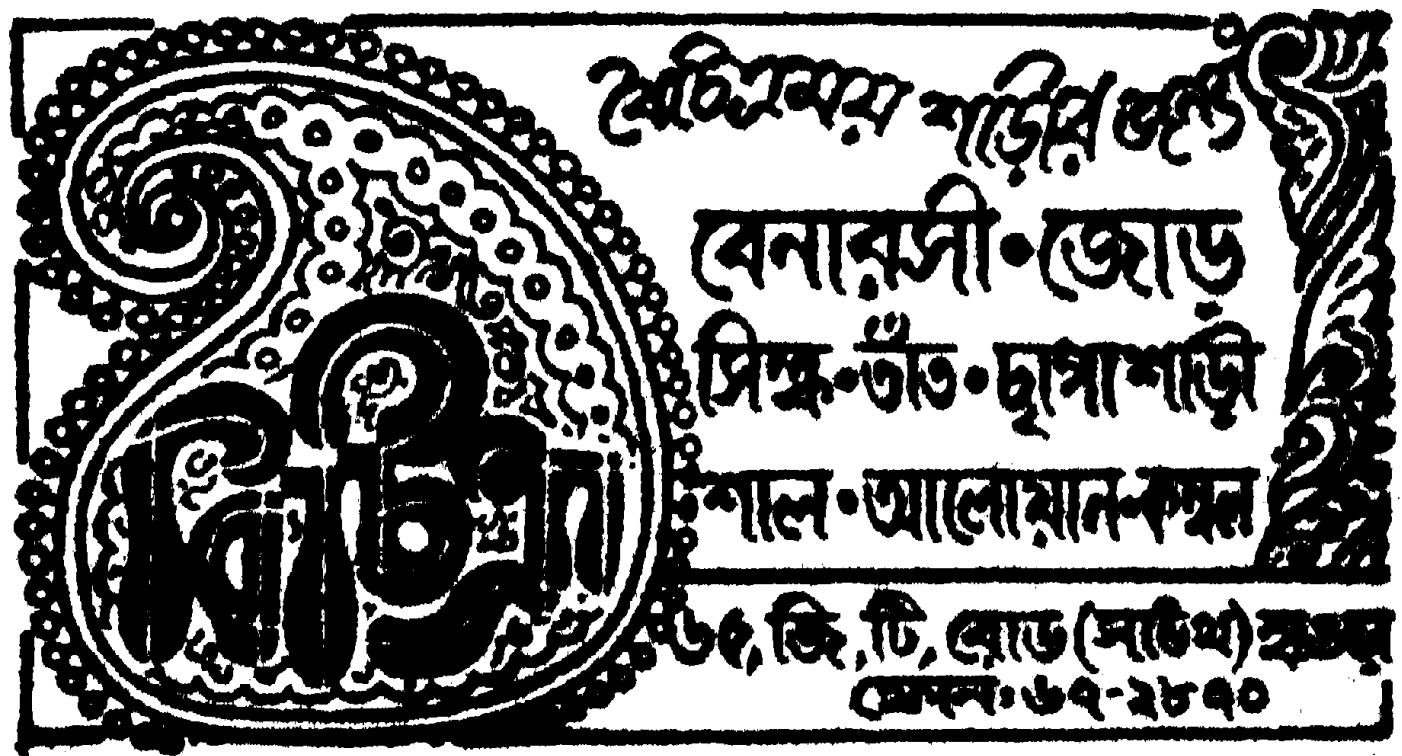
গুরুদেব আমায় ডেকে বললেন, 'এবার রথীর জন্মদিনে তুমি কার্ড নিবয়ে বৈদিক কিছু মন্ত্র ঠিক কর। তোমাকেই তা পড়তে হবে।'

বুঝলুম আমার পরীক্ষা নেবেন।

গ্রন্থের ওপর কিছু বৈদিক মন্ত্র, যেভাবে ক্ষিতিমোহনবাবুকে নির্বাচন করতে দেখেছি, গুরুর চেলা হিসাবে আমিও সেইভাবে, সংগ্রহ করে ও বাংলায় লিখে গুরুদেবকে দেখবার জন্য দিয়ে এলুম।

পরে চা-চক্রে কৃষ্ণ কৃপালনীর সঙ্গে গেলে সেখানে নন্দলালবাবুর সঙ্গে সাক্ষাৎ হল। তিনি আমায় ডেকে জানালেন, গুরুদেব আমার বাংলা অনুবাদের সুখ্যাতি করেছেন। আমি নাকি বৈদিক মন্ত্রগুলির অনুবাদ খুব শুদ্ধভাবে করেছি।

আমি তো শুনে অবাক। পরে দেখি যে, আমার লেখা সম্পূর্ণ পরিবর্তিত হয়েছে, ভাষাও তাঁর, কিন্তু উৎসাহ দেবার জন্য সকলের কাছে আমার গুণগান করেছেন। এমন কাজ শুধু তাঁর পক্ষেই সম্ভব ছিল।

গান্ধীজীর কাছ থেকে যেবার ফিরে এসে গুরুদেব বললেন, 'হরিজনদের জন্য কিছু করতে পার?'

আমার পুরনো কিছু সংস্কার এবং বাছবিচারও ছিল। শান্তিনিকেতনে থাকতে প্রথমে অনেক দিন নিজে রান্না করে খেয়েছি। এজন্য আমায় কেউ কিছুই বলত না বরং যাতে আমি নির্বিঘ্নে নিজে রান্না করে খেতে পারি তার জন্য সকলে আমায় সাহায্য করত।

আমি গুরুদেবকে আমার সংস্কারের কথা জানালাম। বললুম, 'এ আমি সমর্থন না করলেও, উপেক্ষা করতে পারি না। আপনি এমন কাজ বলুন যা আমি করতে পারি।'

হরিজন সংস্কার সমিতির সভা ডাকা হল। সে-সভায় অনেকে উপস্থিত ছিলেন, গুরুদেব তো ছিলেনই। হরিজনদের আহ্বান জানান হল। তাদের উদ্দেশ করে গুরুদেব এবং অন্যান্যরা কিছু কিছু বললেন। গুরুদেব আমাকে বললেন, 'তুমিও কিছু গল্প পুরাণটুরাণ থেকে শোনাও যা ওদের ভাল লাগবে।' আমি ওদের গুহক চণ্ডাল ও জটায়ু পক্ষীর গল্প শোনালুম।

তারপর হরিজনরা সরবৎ বিতরণ করল। দেখলুম, গুরুদেব সে-সরবৎ নিয়ে পান করলেন। বিধুশেখরবাবু খেলেন না। আমার এক পাশে বিধুশেখরবাবু ও এক-পাশে ক্ষিতিমোহনবাবু। আমিও হরিজনদের কাছ থেকে সরবৎ নিয়ে খেলুম। বিধুশেখরবাবু শুধু আড়চোখে একবার দেখলেন।

রাত্তিরে হরিজনরা খিচুড়ি রান্না করে খাইয়েছিল। অনেকে খেয়েছিলেন। আমি খাইনি। পরের দিন গুরুদেবের সঙ্গে দেখা হলে জিজ্ঞাসা করলেন, 'তুমি খিচুড়ি খেলে না কিন্তু সরবৎ খেয়েছ। এ-কাজে তোমার মনে সায় ছিল?'

জানালুম, 'সরবৎ খাওয়াতে মনে সায় পেয়েছিলুম তাই খেয়েছি।'

গুরুদেব আবার প্রশ্ন করলেন, 'এ-কাজ তুমি তোমার আত্মীয়স্বজনের ও বন্ধুর সামনে প্রয়োজন হলে আবার করতে পারবে?' উত্তর দিলুম, পারব। বললেন, 'তাহলে ঠিক আছে। যে-কাজ সবার সামনে সাহস করে করতে পারবে না, সে-কাজ লুকিয়ে কখনো কর না।'

ধর্ম সম্বন্ধে গুরুদেব আড়ম্বর পছন্দ করতেন না। আমারো তাই মত। সেজন্য পরে বেনারসে বিশ্বনাথ মন্দিরে হরিজন নিয়ে প্রবেশের সময় আমার বন্ধু ও পরিজনরা ডাকলেও আমি যাইনি। সরবৎ খাওয়ার পর থেকে নিজে রান্না করে আর খাইনি।

অসহায়, মূক জীবজন্তু সবার প্রতি গুরুদেবের মমতা ছিল। একদিন সকালে গুরুদেবের কাছে উপস্থিত ছিলুম। তখন একটি খোঁড়া ময়না লাফিয়ে লাফিয়ে চলছিল। গুরুদেব বললেন, 'দেখছ এ যূথভ্রষ্ট। রোজ ঠিক এখানে এসে লাফালাফি করে। এর চালচলনে আমি এক করুণ ভাব দেখতে পাই।'

গুরুদেব তখন শ্রীনিকেতনে পুরনো তিমঞ্জিলে সবার ওপর তলায় কিছু দিন ছিলেন। একদিন আমি সপরিবারে তাঁকে দর্শন করতে গেলুম। তখন সূর্যাস্তের সময়। গুরুদেব আরাম চেয়ারে বসেছিলেন। আমায় দেখে কুশল প্রশ্নাদি করলেন, আমার বাচ্চাদের সঙ্গে খানিক ছেলেমানুষি কথা-বার্তা বলে অস্তগামী সূর্যের দিকে চুপচাপ তাকিয়ে রইলেন।

ঠিক এই সময়ে তাঁর কুকুর ল্যাজ নাড়তে নাড়তে এসে তাঁর পায়ের কাছে দাঁড়াল। গুরুদেব কুকুরের পিঠে হাত বুলাতে লাগলেন। সে নিমীলিত চোখে নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে আনন্দ অনুভব করতে লাগল। গুরুদেব আমাকে বললেন, 'দেখ ও এসে গেছে। ও কী করে জানল যে, আমি এখানে আছি আশ্চর্য। আর দেখ ওর চেহারায় কী পরিতৃপ্তির ভাব ফুটে উঠেছে।'

এই কুকুরকে লক্ষ্য করে গুরুদেব 'আরোগ্য'-তে একটি কবিতা লিখেছেন যার প্রথম লাইন :—

'প্রত্যহ প্রভাতকালে ভক্ত এ কুকুর
স্তব্ধ হয়ে বসে থাকে আসনের কাছে
যতক্ষণে সঙ্গ তার না করি স্বীকার
করস্পর্শ দিয়ে।.......'

কবির মর্মভেদী দৃষ্টি এই ভাষাহীন প্রাণীর করুণ দৃষ্টির ভেতরে বিশাল আনুগত্যকে অবলোকন করেছেন যা মানুষের মধ্যে দেখতে পায় না। আমি যখনই এই কবিতাটি পড়ি আমার চোখের সামনে সেদিনের অপরিসীম আনন্দে মূক হৃদয়ের আত্মনিবেদন ভেসে ওঠে। যা সেদিন এক ছোট্ট ঘটনা ছিল আজ তা বিশ্বের অনেক মহিমান্বিত ঘটনার একটি হয়ে গেছে।

শান্তিনিকেতনের পরিবেশ এবং গুরুদেবের সঙ্গ এই দুটি স্মৃতিতে অক্ষয় হয়ে আছে। শান্তিনিকেতনে যাবার পর প্রথম আমি অভিভূত হই গান শুনে। রাত্রে শোবার একটু পরেই বৈতালিকরা (শান্তিনিকেতনের ছাত্রছাত্রীরা) রবীন্দ্রনাথের একটি গান গেয়ে আশ্রম প্রদক্ষিণ করে, সঙ্গে বীণাযন্ত্রও ছিল। তেমনি ভোর সাড়ে চারটের সময় আবার শুনতে পেলুম বৈতালিকরা গান করছে। যে গানের প্রথম কলি এখনো কানে প্রতিধ্বনিত হয়, '.......মুক্ত করো ভয়'। প্রতি কাজের প্রথমে ও শেষে একটি করে গান গাওয়া হত। ফলে শান্তিনিকেতনকে মনে হত যেন একটি স[illegible] জগৎ। গান যে জীবনের এমন [illegible]চ্ছেদ্য অঙ্গ হতে পারে এ আমি কোনদিন কল্পনাও করতে পারি নি। গান নাচ, ঋতু উৎসব, নাটক, জীবন যেন এখানে আনন্দের হাট।

দ্বিতীয় বালক, যুবা, বৃদ্ধ ব প্রোফেসর যেই হন সকলের মধ্যে সহজ শিল্পপ্রীতি। যদি বাচ্চাও সভা করত তাতে বড়র চেয়ে বড় অধ্যাপক যোগ দিতেন। এই রকম মনে হত যে, অধ্যাপকদের প্রেরণায় ছোট ছোট বাচ্চাদের চিত্তে সৃষ্টির উন্মে[illegible] আপনা থেকে উদ্ভূত এক সৌন্দর্য নির্মাণে[illegible] প্রতি তাদের মনে প্রেরণা জাগছে।

তৃতীয় ওখানে এমন সব মহা মহ[illegible] বিদ্বান ব্যক্তিদের দেখেছি যাঁদের দর্শনে[র] জন্য দূর দূর থেকে লোক আসত। কিন্তু তাঁরা অতি নিরহঙ্কার ছিলেন এবং শান্তিনিকেতনের সহজ, সরল জীবনযাপনই ছি[ল] তাঁদের মূলমন্ত্র।

সবার ওপর ছিলেন গুরুদেব। শান্তিনিকেতনের তিনিই ছিলেন প্রাণ কেন্দ্র[।] তিনি কি বললেন, কার সঙ্গে রহস্য করেছে[ন] কাকে উপদেশ দিয়েছেন, কাকে কি বলেছেন, তাই নিয়ে আলোড়ন চলত[।] শান্তিনিকেতন ছিল যেন একটি বড় সংসা[র] যার আবহাওয়া ছিল উৎসাহপূর্ণ, গতিবি[ধি] ছিল সুসংস্কৃত, আর ছিল গুরুদেবে[র] উদ্বোধক ব্যক্তিত্ব যা এই বিদ্যাপুরী[কে] এক অলৌকিক আলো প্রদান করেছিল।

গুরুদেবের কাছে বড় স্নেহ পেয়েছি[।] আমার মত সাধারণ মানুষকে তিনি যে এত স্নেহ করেছিলেন জানি না। যখনি তাঁ[র] সংস্পর্শে এসেছি যেমন স্নেহ পেয়ে[ছি] তেমনি শক্তিও। প্রতিবার সাক্ষাতের স[ময়] মনে হত যেন আমি একটু ওপরে উ[ঠে] যাচ্ছি, মনে হত ভগবান আমায় বি[শেষ] কোন কাজের জন্য পাঠিয়েছেন। আমার কা[ছে] সেই সত্যিকারের বড়লোক যাঁর সংস্পর্শে এলে চরিত্রে ও মনে [illegible] জাগ্রত হয়।

জব্বলপুর

১৮৯৫ সালে [illegible] -আপনী-ক্লাবের -লেখ- কেরা। বাংলাদেশের মাটি ছেড়ে সুদূর জব্বলপুরে এসে যখনই আত্মীয় পরিজনের [illegible] মধ্যেই থাকুন। হিন্দুস্থান লজে উঠেছি। প্রথম দিন নজরে আসেনি। পরদিন সকালে নজরে পড়ল হিন্দুস্থান লজেরই সামনের বাড়ীটির দিকে। তাতে বড় বড় হরফে লেখা 'সিন্ধুবালা বসু লাইব্রেরী।' সন্ধ্যায় দেখলাম শান্তিভাবু নামে এক [illegible] হারিকেনের আলোতে বসে লাই-ব্রেরীর বই ইস্যু করছেন। আমিও সে দলে কখন ভিড়ে গেলাম। সিন্ধুবালা বসু লাইব্রেরীর সদস্যভুক্ত হলাম। যুদ্ধের টানে চাকরি নিয়ে ঝাঁকে ঝাঁকে তাজা বাঙালী যুবকেরা এসে জব্বলপুর ভরে গেল। সিন্ধুবালা বসু লাইব্রেরীতেও সে জোয়ারের ধাক্কা লাগল। লাইব্রেরীটিকে ঢেলে সাজানোর প্রয়োজনীয়তার কথা আমরা অনুভব করলাম। সে প্রয়োজনের তাগিদে খোঁজ পড়ল সিন্ধুবালা বসু লাইব্রেরীর প্রতিষ্ঠাতা প্রভাতচন্দ্র বসুর।

সিন্ধুবালা ছিলেন প্রভাতচন্দ্রের সহধর্মিণী। জলপুরের বিহারীচন্দ্র [illegible] কন্যা শ্রীমতী সিন্ধুবালার সঙ্গে প্রভাতচন্দ্র পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ হন ১৮৯৬ সালে। ১৯২৪ সালে সিন্ধুবালা পরলোকগমন করেন। সিন্ধুবালা বসু লাইব্রেরী প্রতিষ্ঠা প্রভাতচন্দ্রের একনিষ্ঠ পত্নীপ্রেম এবং সেই সঙ্গে মাতৃভাষা প্রীতির গৌরবময় নিদর্শন। প্রভাতচন্দ্র তাঁর 'সিন্ধুবালা বসু লাইব্রেরী' (অধুনা বহুধা কর্মকাণ্ডে প্রসারিত সিন্ধুবালা বসু লাইব্রেরী এসোসিয়েশন)-এর মধ্যে অমর হয়ে থাকবেন।

৩ জুলাই ১৮৭৭ সালে প্রভাতচন্দ্র জব্বলপুরে জন্মগ্রহণ করেন। প্রভাতচন্দ্রের পিতা প্রসন্নকুমার বসু পশ্চিমবঙ্গের ২৪ পরগণার মাহিনগরের থেকে প্রথম জব্বলপুরে এসে বসবাস করেন। পিতা প্রসন্নকুমারের আর্থিক অবস্থা বিশেষ সচ্ছল ছিল না। ঔষধপত্রের ব্যবসায় ছিল তাঁর। মৃত্যুকালে ৩টি অনূঢ়া কন্যা ও প্রভূত ঋণের বোঝা প্রভাতচন্দ্রের জন্য তিনি রেখে যান। স্বীয় অধ্যবসায় ও প্রতিভাবলে প্রভাতচন্দ্র পরবর্তীকালে উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত পিতৃঋণ পরিশোধ ও বোনদের সৎপাত্রে পাত্রস্থ করে জব্বলপুরে প্রচুর ভূসম্পত্তি ও প্রতিপত্তি লাভ করেন।

বাংলার বাইরে বাঙালী

বর্ণিত তরুণ ও সাংস্কৃতিকসম্পন্ন [illegible] বেহালার সাথে প্রভাতচন্দ্র বসুর সাক্ষাতের আসার সেই প্রথম সুযোগ পেলাম ১৯৫৩ সালে সিন্ধুবালা বসু লাইব্রেরীরই [illegible] সভায়। তখন দেবব্রত ভট্টাচার্যকে (অধুনা বেনারস নিবাসী) সেক্রেটারী করে নতুন পরিচালক পরিষদ গঠিত হয়েছে। কানে কম শোনেন, বয়সেও কম নবীন তবুও প্রভাতচন্দ্র উৎসাহী যুবকের মত এগিয়ে এসেছিলেন। গোড়ার দিকে সুদূর মধ্যপ্রদেশের জব্বলপুরে বাংলাভাষা ও সংস্কৃতি চর্চার ধারাকে যাঁরা উজ্জীবিত রেখেছিলেন তাঁদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন প্রভাতচন্দ্র। বাংলার বাইরে বাংলা ভাষা ও সংস্কৃতিকে বাঁচিয়ে রাখার সহজ ও প্রকাশনীয় উপায় বাংলা পাঠাগার স্থাপন—এই সত্যটিকে উপলব্ধি করেছিলেন প্রভাতচন্দ্র। তাই তিনি ১৯২৫ সালে সিন্ধুবালা বসু লাইব্রেরীর প্রতিষ্ঠায় এগিয়ে এলেন।

দুরন্ত ও ডানপিটে স্বভাবের জন্য মেধাবী হওয়া সত্ত্বেও পাঠে মনঃসংযোগ করা প্রভাতচন্দ্রের পক্ষে কঠিন ছিল। প্রথম মিশনারী বাংলা স্কুলে ও পরে হিতকারিণী হিন্দী ইস্কুলে তিনি পড়াশোনা করেন, খেলাধুলায় চৌকস ছিলেন। ইস্কুলের পড়া শেষ করে রবার্টসন কলেজ থেকে বি-এ পাশ করে স্থানীয় আঞ্জুমান ইস্কুলে শিক্ষকতা করার সময় কৃতিত্বের সঙ্গে তিনি আইন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন।

১৯০২ সালে আইন ব্যবসায়ে তিনি আত্মনিয়োগ করেন। ১৯২৩ সালে মধ্যপ্রদেশ ও বেরারের বিধানসভার সদস্য নির্বাচিত হন। ১৯২৪ সাল থেকে পরপর তিন বছর নির্বাচনে জয়লাভ করে জব্বলপুর পৌরসভার সম্মানিত চেয়ারম্যানের পদে আসীন থাকেন। সবশেষে একনাগাড়ে [illegible] তিনি জব্বলপুর পৌরসভার সভাপতি ছিলেন। এই সময় প্রাথমিক ও উচ্চ বিদ্যালয়, নতুন রাস্তাঘাট, পাকাপোক্ত বাজার, হাসপাতাল, পার্ক, লাইব্রেরী প্রভৃতি জনহিতকর নানাবিধ উন্নয়নমূলক কাজ করে জব্বলপুরবাসীদের অশেষ কৃতজ্ঞতা পাশে আবদ্ধ করে গেছেন। তাঁর জীবিতকালেই তাঁর তৈরী বাজারের নাম 'প্রভাতচন্দ্র বোস বাজার' এবং তাঁর বাড়ির সামনের রাস্তার নাম 'প্রভাতচন্দ্র বোস রোড' নামকরণ করে জব্বলপুরের নাগরিকেরা তাঁর প্রতি অসীম শ্রদ্ধা প্রকাশ করেছেন। ১৯[illegible] সালে তিনি তৎকালীন মধ্যপ্রদেশ সরকারের শিক্ষামন্ত্রীর পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। জব্বলপুরের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে তিনি আজীবন যুক্ত ছিলেন।

বদান্যতায় তাঁর জুড়ি মেলা ভার। বহু জনহিতকর কাজে তিনি অকাতরে দান করে গেছেন। তাঁর যোগনাথগঞ্জের বাড়ির সংলগ্ন জমিতে তিনি পাড়ার উৎসাহী যুবকদের জন্য ব্যায়ামাগার স্থাপন করেছিলেন এবং ট্রাস্ট গঠন করে সেই সম্পত্তি দান করে দেন। পশুর চিকিৎসা এবং পশুপালনের জন্য নর্মদা তীরের নয় একর জমি গোরক্ষণী সভাকে দান করেন। পত্নীর স্মৃতিরক্ষায় ১৯২৫ সালে দেড় বিঘা জমির ওপর সিন্ধুবালা বসু লাইব্রেরী স্থাপন করেন।

শিকার এবং পড়াশোনা ছিল তাঁর নেশা। ১৯১৭ সালে [illegible] ফেব্রুয়ারি প্রথম বাঘ শিকার করে [illegible] দক্ষ শিকারী রূপে খ্যাতিলাভ করেন। [illegible]৩০টি চিতাবাঘ ও ৮টি রয়েল বেঙ্গল টাইগারও তিনি শিকার করেছেন। এছাড়া ভালুক, বাইসন, কুমীর, বারশিঙ্গা প্রভৃতি অসংখ্য শিকারের নিদর্শন তাঁর বাড়িতে দেওয়ালে দেওয়ালে এখনও অযত্নে বিরাজ করছে দেখতে পাবেন।

অবসর সময়ে তিনি পড়াশোনা করতে ভালবাসতেন। বহুবিচিত্র বিষয়ে তাঁর অনুসন্ধিৎসা ছিল। ইংরেজি, হিন্দি, ফার্সি ও বাংলা বইয়ের চমৎকার সংগ্রহ ছিল। বিষয়বস্তুতেও বৈচিত্র্য কম ছিল না। সাহিত্য বিজ্ঞান, সঙ্গীত, দর্শন, আইন, পশুপালন গৃহ-চিকিৎসা, যোগব্যায়াম, ফটোগ্রাফি গৃহনির্মাণ, উদ্যান রচনা ও রন্ধনশিল্প ইত্যাদি বিভিন্ন বিষয়ের বই তাঁর সংগ্রহে ছিল, 'মধ্যপ্রদেশ মে শিকার' নামে হিন্দি রচিত তাঁর শিকার কাহিনী তৎকালে পাঠকমহলে বিশেষ সমাদৃত হয়েছিল।

চমৎকার বৈঠকী গল্পে তিনি শ্রোতাদের মুগ্ধ করে রাখতেন। অসাধারণ তী[illegible] পরিহাস বোধও ছিল তাঁর।

বহু জনহিতকর কাজ ও গুণপনার ভারত সরকার প্রভাতচন্দ্রকে ১৯২৭ সালে রায়বাহাদুর এবং ১৯৩২ সালে সি আই ই উপাধিতে সম্মানিত করেন।

১৯৬১ সালে ৪ জুলাই ৮৫ [illegible] বয়সে ভিক্টোরিয়া হাসপাতালে [illegible] দেহরক্ষা করেন।

ক্রিকেট

অস্ট্রেলিয়ায় ভারতীয় ক্রিকেট দল

ব্রিসবেনের 'গাব্বা ওভাল' মাঠে ভারতীয় ক্রিকেট দল এক ইনিংস ও ১২৩ রানে কুইন্সল্যাণ্ডকে পরাজিত করেছে। চারদিনের ম্যাচের এই খেলাটি তৃতীয় দিনে ১৩ মিনিট খেলার পর শেষ হয়ে যায়। অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে প্রথম টেস্ট খেলার প্রাক্কালে দলের এই সাফল্যে ভারতীয় খেলোয়াড়দের মনোবল শতগুণ বেড়ে গেছে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, ১৯৭৭-৭৮ সালের অস্ট্রেলিয়া সফরে ভারতীয় দলের এটা [illegible] অন্যতম জয়। প্রথম টেস্ট খেলার আগেই ভারতীয় ক্রিকেট দল অস্ট্রেলিয়ার অন্যতম রাজ্য ক্রিকেট দলকে পরাজিত করার গৌরব লাভ করেছে।

প্রথম দিনের খেলায় ভারতীয় দল প্রথম ইনিংসের ৮ উইকেট খুইয়ে ৩৫৩ রান সংগ্রহ করেছিল। ভারতীয় খেলোয়াড়রা এই প্রথম অস্ট্রেলিয়ার ফাস্ট টেস্ট বোলার জেফ টমসনের বল খেলার অভিজ্ঞতা লাভ করেন। ভারতীয় খেলোয়াড়রা টমসনের বল সাহসের সঙ্গে খেলেন। খেলার প্রথম দিনটা ছিল ব্যাটসম্যানদেরই। রান সংগ্রহে বিশেষ কৃতিত্ব দেখিয়েছেন দিলীপ ভেঙসরকার (৬৩ রান), চিরাগ প্যাটেল (৫৪ রান), অশোক মানকাড (৬৯ রান) এবং সৈয়দ কিরমানী (নট আউট ৫৯ রান)। ভারতীয় দলের প্রথম ইনিংসের ২২৩ রানের মাথায় ৬টি উইকেট পড়ে গেলে অনেকেই ভেবেছিলেন ভারতীয় দলের প্রথম ইনিংস আর বেশী দূর গড়াবে না। কিন্তু ৭ম উইকেটের জুটিতে অশোক মানকাড এবং সৈয়দ কিরমানী দৃঢ়তার সঙ্গে খেলে ১১২ রান যোগ করেন।

দ্বিতীয় দিনে ভারতীয় দল ব্যাট না করে তাদের পূর্বদিনের ৩৫৩ রানের (৮ উইকেটে) ওপরই খেলার সমাপ্তি ঘোষণা করে। কুইন্সল্যাণ্ডের প্রথম ইনিংস মাত্র ১১৯ রানের মাথায় শেষ হলে ভারতীয় দল ২৩৪ রানের ব্যবধানে এগিয়ে থাকার সুবাদে কুইন্সল্যাণ্ডকে ফলো-অন করাতে বাধ্য করে। কুইন্সল্যাণ্ড তাদের দ্বিতীয় ইনিংসের খেলাতেও সুবিধা করতে পারেনি। দ্বিতীয় ইনিংসের ৮টা উইকেট খুইয়ে মাত্র ৯৬ রান সংগ্রহ করেছিল। দ্বিতীয় দিনে ভারতীয় দল পেয়েছিল কুইন্সল্যাণ্ড দলের ১৮টা উইকেট। কুইন্সল্যাণ্ড দলের এই শোচনীয় বিপর্যয়ের প্রধান কারণ হল অব্যর্থ ভারতীয় স্পিন বোলিং। দ্বিতীয় দিনে বেদী ৯টা এবং চন্দ্রশেখর ৬টা উইকেট পান।

তৃতীয় দিনে মাত্র ১৩ মিনিটের খেলায় কুইন্সল্যাণ্ডের বাকি দুটো উইকেট পড়ে যায়। কুইন্সল্যাণ্ডের দ্বিতীয় ইনিংস ১১১ রানের মাথায় শেষ হলে ভারতীয় দল এক ইনিংস ও ১২৩ রানে জিতে যায়। ৬ ঘণ্টারও কম সময়ের খেলায় কুইন্সল্যাণ্ডের ২০টা উইকেট পড়ে যায়। এই ২০টা উইকেটের মধ্যে উইকেট—বেদী ১০টা এবং চন্দ্রশেখর ৭টা। বেদী উভয় ইনিংসে পাঁচটা করে উইকেট পান—প্রথম ইনিংসে ৩৫ রানে ৫ এবং দ্বিতীয় ইনিংসে ৩৮ রানে ৫। বর্তমান অস্ট্রেলিয়া সফরে বেদী এই নিয়ে চারবার এক ইনিংসে পাঁচটা করে উইকেট পেলেন।

কুইন্সল্যাণ্ডের বিপক্ষে ভারতীয় দলের এই জয় খুবই গুরুত্বপূর্ণ এই কারণে যে, ব্রিসবেনের এই 'গাব্বা ওভাল' মাঠেই ভারত বনাম অস্ট্রেলিয়ার প্রথম টেস্ট খেলার আসর বসবে এবং কুইন্সল্যাণ্ড দলের পক্ষে খেলেছিলেন ওয়েস্ট ইণ্ডিজের টেস্ট খেলোয়াড় কালীচরণ এবং অস্ট্রেলিয়ার প্রথম টেস্টে নির্বাচিত তিনজন খেলোয়াড়—জেফ টমসন, প্যারী কোজিয়ার এবং টোনি ওগিলভি।

সংক্ষিপ্ত স্কোর

ভারতীয় দল: ৩৫৩ রান (৮ উইকেটে ডিক্লেয়ার্ড। দিলীপ ভেঙসরকার ৬৩, চিরাগ প্যাটেল ৫৪, অশোক মানকাড ৬৯ এবং সৈয়দ কিরমানী নট আউট ৫৯ রান। টমসন ৭৫ রানে ৩ উইকেট)

কুইন্সল্যাণ্ড: ১১৯ রান (প্যারী কোজিয়ার ৩১ রান। বেদী ৩৫ রানে ৫, এম অমরনাথ ১২ রানে ২ এবং চন্দ্রশেখর ৫২ রানে ২ উইকেট)

ও ১১১ রান (জে ম্যাকলীন ৩০ রান। বেদী ৩৮ রানে ৫ এবং চন্দ্রশেখর ৪৪ রানে ৫ উইকেট)

কোচবিহার স্কুল ক্রিকেট ট্রফি

পূর্বাঞ্চলের ফাইনাল

পাটনার মৈঈন-উল হক স্টেডিয়ামে আয়োজিত কোচবিহার স্কুল ক্রিকেট ট্রফির পূর্বাঞ্চলের ফাইনালে বাংলা স্কুল তিন উইকেটে গত বছরের বিজয়ী আসামকে পরাজিত করার গৌরব লাভ করেছে।

প্রথম দিনের খেলায় আসামের প্রথম ইনিংস মাত্র ৬০ রানে পড়ে যায়। দলের সর্বোচ্চ ১১ রান করে দুজন—দিলীপ বড়ুয়া এবং অরুণ কলিতা। বাংলার ইন্দ্রনীল চ্যাটার্জি ১৩ রানে ৪ এবং অরূপ ভট্টাচার্য ৯ রানে ৩ উইকেট পেয়েছিল। বাংলা প্রথম ইনিংসের ৭ উইকেটে ৬৮ রান তুলে ৮ রানে এগিয়ে যায়। প্রথম দিনের খেলাটা ছিল বোলারদের সাফল্যে।

ভাল খেলে ঘুম কেড়ে নেব

এবারে অস্ট্রেলিয়া সফরকারী ভারতীয় দলে দু-নম্বর উইকেট রক্ষক ভরত রেড্ডী। ষোলজন খেলোয়াড়ের তালিকা প্রথম যেদিন ঘোষিত হল সেদিন অন্ততঃ এই নামটি নিয়ে দেশের বহু ক্রিকেট অনুরাগী এবং বোদ্ধার ভুরু কুঁচকে উঠেছিল। ভরত রেড্ডী স্থান পেয়েছেন সম্বরণ ব্যানার্জীকে সরিয়ে। স্বভাবতই কৌতূহল জেগেছিল সম্বরণকে কেন্দ্র করে এই বাক যুদ্ধ, একবার সাক্ষাতে জেনে আসি সম্বরণের প্রতিক্রিয়া।

ডাক নাম মাধু। যাদবপুর হাইস্কুলে সম্বরণ ঢুকেছিল বলতে গেলে ব্যাট হাতে করে। যাদবপুরের সেণ্ট্রাল রোডের ওপর ইঁটের উইকেট সাজিয়ে বল পেটাপেটি করতে করতে কোন দিন যেন হাফপ্যান্ট পরা পাড়ার মাধুর পায়ে প্যাড, হাতে গ্লাভস উঠে এল। এবং দেখা গেল বড় মাঠের বড় খেলায় উইকেটের পেছনে সারস পাখির মত গলা উঁচিয়ে উবু হয়ে বসে আছে মাধু। ক্লাশ এইটের ছাত্র যখন, ইন্টার স্কুল টুর্ণামেন্ট খেলতে শুরু করেছিল সম্বরণ। সালটা বোধহয় ১৯৬৫। ইডেনে খেলা চলছে। খেলা দেখে কার্তিক বোস ডেকে নিয়ে গেলেন বাড়িতে। সেই থেকে কার্তিকদার হাতে বেড়ে উঠেছে।

বললাম, 'কিছু স্ট্যাটিসস্টিকস দাও। নরত মানব কেমন করে, তুমি যোগ্য উইকেট রক্ষক হওয়া সত্ত্বেও নির্বাচকদের নজর হারা হয়েছে।'

'১৯৫৫ থেকে '৭০ পর্যন্ত স্কুল টিমে বেঙ্গল রিপ্রেজেণ্ট করেছি। ১৯৬৯-৭০-এ শ্রীলঙ্কার বিরুদ্ধে ভারতীয় স্কুল দলের টেস্ট সিরিজে আমি ছিলাম এক নম্বর উইকেটরক্ষক। এ সময়ে আমি বছরের সেরা স্কুল-ক্রিকেটার নির্বাচিত হয়েছিলাম। সমস্ত পূর্বাঞ্চলে এখনও পর্যন্ত দীপংকর সরকার ছাড়া আর কেউ এই সম্মান পায়নি।

—'কবে থেকে বড় আসরে এলে?'

—'১৯৭৩-এ রণজিতে বাংলার দলে এলাম। প্রথম খেলা আসামের বিপক্ষে। আমার শিকার ছিল তিনটি। দুটি ক্যাচ, একটি স্ট্যাম্প। দলীপ ট্রফিতে পূর্বাঞ্চলের দলে এলাম ১৯৭৫-এ। উত্তরাঞ্চলের বিরুদ্ধে প্রথম খেলায় আমার শিকারের সংখ্যা তিন। ইরানী ট্রফিতে বোম্বাইয়ের বিপক্ষে অবশিষ্ট ভারতীয় দলের হয়ে খেলেছি।'

—'জানেন, টনি গ্রেগের এম সি সি-র সফরে গৌহাটিতে ওদের বিরুদ্ধে পূর্বাঞ্চলের হয়ে খেলে আমি ভারত সফরকারী যে-কোন ফরেন দলের বিপক্ষে রেকর্ড করেছি।'

—'পরিসংখ্যানটা কি?'

—'সেকেণ্ড ইনিংস-এ পাঁচটি শিকার। তিনটে ক্যাচ, দুটো স্ট্যাম্প। বিয়ার্লি, বার্লো এবং টলচার্ড আমার হাতে ধরা পড়েছিল। উইকেট উপড়ে দিয়েছিলাম ওল্ড এবং উলমারের।'

৭৫-৭৬-এ সম্বরণ রণজিতে পূর্বাঞ্চলের রেকর্ড সৃষ্টি করেছে। পাঁচটি ম্যাচের বিনিময়ে ২৪টি শিকার। ভারতের রেকর্ড সাতাশটি শিকার। রেকর্ড অধিকারীর নাম ইন্দ্রজিৎ

সমস্যাসংকুল। ১০টা উইকেট পড়ে মাত্র ১২৮ রান উঠেছিল।

দ্বিতীয় দিনে বাংলার প্রথম ইনিংস ৭৫ রানের মাথায় শেষ হলে বাংলা ১৪ রানে এগিয়ে যায়। দ্বিতীয় দিনে মাত্র ৯ মিনিটের খেলায় বাংলার শেষ তিনটে উইকেটে মাত্র ৬ রান উঠেছিল। আসামের দ্বিতীয় ইনিংস ১২২ রানের মাথায় শেষ হয়। এবার ইন্দ্রনীল চ্যাটার্জি পেল ২১ রানে ৩ এবং অরূপ ভট্টাচার্য ২৭ রানে ৩ উইকেট। তাছাড়া শৈবাল ব্যানার্জি ২০ রানে ৩টে উইকেট পায়।

খেলায় সরাসরি জয়ের জন্যে বাংলার ১০৯ রানের দরকার ছিল। তৃতীয় দিনের খেলায় বাংলা দ্বিতীয় ইনিংসের ৭ উইকেটে ১০৯ রান তুলে ৩ উইকেটে জিতে যায়।

সংক্ষিপ্ত স্কোর

আসাম : ৬০ রান (দিলীপ বড়ুয়া ১১ এবং অরুণ কালিতা ১১ রান। ইন্দ্রনীল চ্যাটার্জি ১৩ রানে ৪ এবং অরূপ ভট্টাচার্য ৯ রানে ৩ উইকেট)

ও ১২২ রান (রাজীব কালিতা ২৮ রান। ইন্দ্রনীল ২১ রানে ৩, অরূপ ২৭ রানে ৩ এবং শৈবাল ব্যানার্জি ২০ রানে ৩ উইকেট)

বাংলা : ৭৪ রান (প্রণব দে ২৩ রান)

ও ১০৯ রান (৭ উইকেটে। অমল কর্মকার ১৮ রান। কে দাশ ২৮ রানে ৩ উইকেট)

ইডেন উদ্যানের রঞ্জি স্টেডিয়ামে কোচ-বিহার স্কুল ক্রিকেট টুর্নিমেন্টের আঞ্চলিক কোয়ার্টার ফাইনালে দক্ষিণাঞ্চল ৭৩ রানে পূর্বাঞ্চলকে হারিয়ে সেমি-ফাইনালে পশ্চিমাঞ্চল দলের সঙ্গে খেলবার যোগ্যতা লাভ করেছে।

প্রথম দিনে দক্ষিণাঞ্চলের প্রথম ইনিংস ১৭৪ রানে শেষ হলে বাকি সময়ের খেলায় পূর্বাঞ্চল কোন উইকেট না খুইয়ে ৩ রান করে। দক্ষিণাঞ্চলের পক্ষে ব্যাটিংয়ে কৃতিত্বের পরিচয় দেন আমানুল্লিন (৫১ রান)। অপরদিকে পূর্বাঞ্চলের শৈবাল ব্যানার্জি ৩১ রানে ৩টে উইকেট পায়।

দ্বিতীয় দিনে পূর্বাঞ্চলের প্রথম ইনিংস মাত্র ৭৮ রানে শেষ হয়। ফলে দক্ষিণাঞ্চল ৯৬ রানে এগিয়ে যায় এবং দ্বিতীয় ইনিংস খেলতে নেমে ৩ উইকেটে ৬৩ রান করে।

শেষ তৃতীয় দিনে দক্ষিণাঞ্চলের দ্বিতীয় ইনিংস ১১০ রানের মাথায় শেষ হয়। অপরদিকে পূর্বাঞ্চলের দ্বিতীয় ইনিংস ১০৪ রানে শেষ হলে দক্ষিণাঞ্চল ৭৩ রানে জিতে যায়।

সংক্ষিপ্ত স্কোর

দক্ষিণাঞ্চল : ১৭৪ রান (আমানুল্লিন ৫১ রান। শৈবাল ব্যানার্জি ৩১ রানে ৩ এবং ইন্দ্রনীল চ্যাটার্জি ৪৩ রানে ৩ উইকেট)

ও ১১০ রান (পবন কুমার ৯৫ রান। ইন্দ্রনীল ৫৯ রানে ৫ এবং শৈবাল [illegible] রানে ৩ উইকেট)

পূর্বাঞ্চল : ৭৮ রান (সঞ্জয় দত্ত ১৪ রান। বাংসালাম ১৯ রানে ৫, রাথোড় ১৩ রানে ৩ এবং প্রেমন ৮ রানে ২ উইকেট)

ও ১০৪ রান (অমল কর্মকার ৩১ রান। রাথোড় ৪৩ রানে ৩ উইকেট)

[illegible]

সম্বরণ ব্যানার্জী

সিংজী। সাতটি ম্যাচের সংবাদে। বাংলা যেবার আরো দুটো ম্যাচ খেলার সুযোগ পেলে ভারতীয় রেকর্ডটি হয়ত ভেঙে দিতে পারত সম্বরণ। কিন্তু, সেমি-ফাইনাল এবং ফাইনাল খেলার সৌভাগ্য হয়নি।

সবে ইংলিশ কাউন্টি খেলে ফিরেছে সম্বরণ। অভিজ্ঞতায় এবং দক্ষতায় কোন দিক দিয়ে কম যায় না বর্তমান ভারতের যে-কোন উইকেটরক্ষকের চেয়ে। সাগর-পারের মাঠেও তার অনেক নজির ছড়িয়ে রেখে এসেছে সে। খেলেছে যোগ্ডন লীগ, ক্রিজলে ক্রিকেট ক্যাবের পক্ষে। এই লীগে খেলে গেছে বর্তমান বিশ্বের অনেক উজ্জ্বল তারকা। ন'টি লীগ এবং তিনটি নক-আউট, সর্বমোট বারটি খেলায় শিকার করেছেন সাতাশজন ব্যাটধারীকে। তিনবার 'হ্যাট ক্যাচেকশনে'র গৌরব অর্জন করেছেন।

স্বভাবতই এবার যখন ভারতের টেনিং ক্যাম্প-এ ডাক পড়ল সম্বরণের, তখন ভাবা গিয়েছিল, যাক, এতদিনে বোধহয় আমাদের নির্বাচকদের দু-চোখেই দৃষ্টি ফুটল। ক্যাম্পের প্রতিটি আইটেমে, সে খেলার দক্ষতায় হোক কিংবা নিয়ম-শৃংখলায় নিভাগেই হোক, সম্বরণ সর্বদা প্রথম পাঁচজনের ভেতর জায়গা করে নিয়েছিল। স্থান পেয়েছিল 'গাভাসকার ইলেভেন এবং ভেংকটরাঘবনের ইলেভেন'র মধ্যে অনুষ্ঠিত নির্বাচনী খেলাটিতে-ও। খেলেছিল শেষের দলটিতে। অথচ ভারত রেভতীর জায়গা হয়নি ঐ খেলায়। সম্বরণের ব্যাটিং-এ ভাল রান আসে। আসল কথা, ভরত রেড্ডীর কোন পরি-সংখ্যানই সম্বরণকে ছাড়িয়ে যেতে পারেনি। অথচ সম্বরণের পরিবর্তে দলে দ্বিতীয় উইকেটরক্ষক হিসাবে ভরত রেড্ডী নির্বাচিত হয়ে গেল।

উঠে আসছিলাম। সম্বরণ এগিয়ে এল গেট পর্যন্ত। বলল—'দেখে নেবেন, ওরা নির্বাচন করুক না করুক, আমরা আরো ভাল খেলে যাব। ভাল খেলে ওদের মন কেড়ে নেব।'

দীপঙ্কর দাস

বিশ্বের সেরা বোলার জীবন লাল

[illegible] আমার দেওয়া নয়। বিশ্ব-বিখ্যাত [illegible], গারফিল্ড সোবার্স, ববি সিম্পসন, মনসুর আলি খান পতৌদি, কলিন কাউড্রে, সোনি রামধীনরা অর্থাৎ—[illegible] জীবনলাল পালকে ঐ নামেই ডাকেন। ক্লাবহাউসের এ'কোণটিতে জীবনলালের ঘুপচি ঘরে ওই সমস্ত এবং আরো অনেক বিখ্যাত ক্রিকেটারের সঙ্গে তোলা ছবি জীবন সযত্নে বাঁধিয়ে রেখেছে। সেই সঙ্গে ওর জামা কাপড়ের সিন্দুকে আছে দুটি সার্টিফিকেট। ১৯৫৮ আর ১৯৬৪ সালে কলকাতায় খেলতে এসে বাঘা বাঘা বিদেশী ক্রিকেটাররা ঐ সার্টিফিকেট দিয়েছেন। সার্টিফিকেট ইংরাজীতে লেখা,—'উই দি আন্ডারসাইনড ক্লেম জীবন পাল দি গ্রেটেস্ট জাগলার অ্যান্ড দি ফাইনেস্ট বোলার ইন দি ওয়ার্ল্ড।'

সার্টিফিকেটের তলায় সই করেছেন সোবার্স, রিচি বেনো, সিম্পসন, কলিন কাউড্রে, মনসুর আলি খান, আয়ান চ্যাপেল, বেসিল বুচার আর কত নাম করবো?

আপনি নিশ্চয়ই এতক্ষণে রীতিমত গবেষণা করতে শুরু করেছেন—কে এই জীবনলাল পাল? ভারতে এত বড় একজন বোলার আছে তা তো এতোদিন জানা ছিল না!

সবিনয়ে জানাচ্ছি যে, আপনার চিন্তিত হবার কোন কারণ নেই। বিশ্বের এই সেরা বোলার জীবনলাল পাল তার জীবনে কোনদিন পাড়ার ক্রিকেটেও খেলেনি। জীবনলাল কলকাতার ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশন অফ বেঙ্গলের এক অধস্তন কর্মচারী। কিন্তু ক্রিকেট সম্পর্কে তার জ্ঞান অনেক বড় বড় বোলার থেকে বেশী।

ইডেন উদ্যানে বিধানচন্দ্র রায় ক্লাব হাউসে গেলেই আপনি দেখা পাবেন ওঁর। সি এ বি'র একজন অতি সাধারণ কর্মী জীবনলাল। কিন্তু তার যে আসল কাজ কোনটা সেটা আজ পর্যন্ত আমি বুঝতে পারিনি। কখনও রিসেপশনিস্ট, কখনও খেলোয়াড়দের ম্যাসিওর, কখনো বেয়ারা, কখনও সম্পাদকের পার্সোনাল অ্যাসিস্ট্যান্ট, আবার বাংলা দলের বিভিন্ন রাজ্য সফরের সময় সে দলের অপরিহার্য তল্পিতল্পাবাহক কাম সবকিছু। বিদেশী দল কলকাতায় টেস্ট খেলতে এলে তাদের খিদমত খাটার জন্য জীবনলাল সব সময় হাজির। খেলোয়াড়দের সঙ্গে এমনি করেই তার জান-পহেচান হয়। সে বল করতে পারে শুনে বিদেশীরা অবাক হয়। নেটে বল করার জন্য ডাক পড়ে ওর। জীবনলাল তো একপায়ে খাড়া। এমনি করেই সে কলিন কাউড্রেকে নেটে বোল্ড করেছে, সোবার্সকে ফাঁকি দিয়েছে আর একবার তো পরপর তিনবার মনসুর আলি পতৌদির স্টাম্প ছিটকে দিয়েছিল। পতৌদি সেবার জীবনের পিঠ চাপড়ে বলেছিলেন,—'জীবন, তুম ক্রিকেট কিঁউ নেই খেলা?'

জীবনের ব্যবহারে ক্রিকেটের ব্যাকরণ জ্ঞানে খুশী হয়ে সব বড় বড় খেলোয়াড়ই ওর সঙ্গে ক্যামেরার সামনে দাঁড়ান। সেই সব ছবিগুলিই জীবনের সবচেয়ে বড় সম্পদ। ছবিগুলো বুকে আঁকড়েই জীবন তার জীবনের বাকি দিনগুলো বাঁচতে চায়।

কলিন কাউড্রের সঙ্গে জীবনলাল

১৯৫২ সালে, জীবন তখন সবে বারো বছরের ছেলে, ইস্টবেঙ্গলের অধিনায়ক প্রবীর (খোকন) সেন ওকে নিয়ে আসেন সি এ বিতে। পঞ্চাশ টাকা মাইনের চাকরি। অনাথ ছেলে জীবনের কাছে ওটাই তখন পরম-প্রাপ্তি। সবচেয়ে বড় কথা ক্রিকেটারদের কাছাকাছি থাকা যাবে—ওটাই তো জীবনের স্বপ্ন। ১৯৫৪ সালে কলকাতায় রনজি ট্রফির ফাইনাল খেলা বাংলা আর হোলকারের মধ্যে। হোলকারের দলনায়ক মুস্তাক আলি। প্রবীর সেন মুস্তাককে বললেন,—'মুস্তাক, তোমাদের তো একজন ম্যাসিওর লাগবে, তোমরা জীবনকে নাও।' মুস্তাক রাজী হলেন। জীবনের ম্যাসাজের গুণে না হলেও, হোলকার ভাল খেলেই জিতল। হোলকার তো ঘরে ফিরলো। কিন্তু সেই শুরু হল জীবনলালের ম্যাসিওর-এর 'জীবন'। ফাঁকে ফাঁকে খেলোয়াড়দের সঙ্গে সুযোগ-সুবিধা মতো নেট প্র্যাকটিসও চলল জীবনলালের। সেই ধারা আজও অব্যাহত। মাইনে এখন দুশো পঁচিশ টাকা।

মাইনে কম বলে জীবনলালের আক্ষেপ আছে। সংসার বলতে স্ত্রী আলপনা আর মেয়ে নীমা। মেয়ের বয়স সাড়ে তিন বছর। জীবনলালের মেয়ে হবার খবর শুনে ভারতের প্রাক্তন অধিনায়ক মনসুর আলি পতৌদি বলেছিলেন,—'জীবন ছেলে হলে তুমি তো তাকে বড় ক্রিকেটার বানাতে পারতে তোমার স্বপ্ন সার্থক হত।'

জীবন পতৌদিকে কি উত্তর দিয়েছে জানেন? বলেছে, 'কুছ পরোয়া নেই, নীমাকেই আমি মেয়ে ক্রিকেটার বানাব।'

জীবনলাল বরাবরই আশাবাদী কিন্তু পরিণত বয়সে একটি আকাঙ্খাই ওর অপূর্ণ রয়ে গেছে। টাকা নয়, পয়সা নয়, একটা গাড়িবাড়িও নয়। জীবনলাল শুধু একবার, একটিবার বাংলাকে দেখতে চায়, রনজি ট্রফির চ্যাম্পিয়ন রূপে। জীবনলালের সেই সাধ কবে মিটবে?

জয়ন্ত চক্রবর্তী

চিত্রধ্বনি

খুনের শপথ

এটি এমন এক চলচ্চিত্র যার সম্পাদনা, চিত্র গ্রহণ, রঙ পৃথিবীর যে-কোন প্রথম শ্রেণীর ছবির সঙ্গে তুলনীয়। কিন্তু এ সবের বাইরে যেটা মূল ব্যাপার অর্থাৎ গল্প, সেখানে তা ভীষণভাবে অগোছালো ও স্থূল। আলোচ্য ছবিটির চারটে পর্ব। প্রথম পর্বে নারী ব্যবসায়ী স্বামীকে ত্যাগ করে স্ত্রীর পুত্রকন্যাসহ গৃহত্যাগ ও তাদের মানুষ করা। দ্বিতীয় পর্বে বোনের বিয়ের জন্য পঁচিশ হাজার টাকা জোগাড় করতে ভাই-এর বোম্বাই যাত্রা। এক যুবতীকে বদমায়েসদের হাত থেকে বাঁচানো ও তার সঙ্গে প্রেম এবং ভাই বোনের বিয়ের জন্য কঠোর পরিশ্রম করছে এই যুক্তিতে বোনের গৃহত্যাগ। তৃতীয়াংশে বোনের অনুসন্ধান, দালালের দ্বারা বোনের দেহোপজীবিনীতে রূপান্তর ও আত্মহত্যা। (যেহেতু তাকে বাঁচিয়ে রাখলে নানা ঝঞ্ঝাট শুরু হতো।) চতুর্থ পর্বে ভাই অর্থাৎ নায়ক কর্তৃক দুষ্টদমন।

এবং এইসব নাটক সৃষ্টির জন্য যে-ভাবে কাহিনী বিস্তার হয়েছে, তাতে নায়ক মোটর সাইকেলে করে মাঝ-সমুদ্রে লঞ্চের ওপর জাম্প দিয়েছে, আসল খুনীকে ধরার জন্য দোষী সেজে জেলে গেছে, নায়িকা দুর্দান্ত খুনীর কাছে একটু নাচ দেখিয়ে স্বীকারোক্তি আদায় করেছে, প্রেমিকের জন্য বাইজী সেজে নেচেছে, ভিলেনের দল অভিনব প্রথায় হত্যার চেষ্টা করেছে...ইত্যাকার নানা ঘটনা দৃশ্যায়িত, যার কোনটাই যুক্তি বা বুদ্ধিগ্রাহ্য নয়।

এর নায়ক মেসিন গানের মুখে বেঁচে গেলে, হাজার যুদ্ধেও তার পোশাকের ক্রীজ নষ্ট না হলে, বা মোটর সাইকেলে কাঞ্চনজঙ্ঘা থেকে এভারেস্টে জাম্প দিলেও অবাক লাগে না। কিন্তু আশ্চর্য হতে হয় যখন অপ্রয়োজনীয় মুহূর্তে কেউ না কেউ কেঁদে ওঠে। ছবিতে গ্লিসারিনের খরচ হয়েছে যথেষ্ট। নায়ক নায়িকা থেকে শুরু করে ভিলেন এমন কি কৌতুক শিল্পী পর্যন্ত প্রত্যেককেই একাধিকবার কাঁদতে হয়েছে। পরিচালক বুদ্ধিমান, তিনি জানেন, তাঁর দর্শকেরা হলে বসে কান্নাকাটি দেখতে ভারি ভালবাসে।

অভিনয়ে নায়করূপী মীতেন্দ্র সেই-সব জায়গায় সাবলীল যেখানে মারামারি ফিচলেমি বা লঘু মুহূর্তগুলো উপস্থিত। কিন্তু যেখানে গম্ভীরতা, সেখানে তিনি একেবারেই ব্যর্থ। অবশ্য এই ছবির বেশির ভাগ অংশই মীতেন্দ্রের চেয়ে তার ভাগ্নিই দখল করে আছে। নায়িকা সুলক্ষণা থেকে সহ-নায়িকা ফরিদা জালাল অনেক বেশি মর্মস্পর্শী। অন্যেরা প্রথানুগ।

আবহ ও কণ্ঠ এই উভয় সঙ্গীতেই একঘেয়েমি ও পুনরাবৃত্তির ছাপ।

চলচ্চিত্রে সঙ্গীতের ব্যাপারে একটা মূল সুর থাকা উচিত, এখানে সে সবের কোন বালাই নেই।

এই বক্তব্যের পরেও একটা কথা কিন্তু না বললে ভুল হবে যে, পরিচালক পরিচালনা ব্যাপারটা জানেন। গল্পের একাকীত্ব বোঝাতে যেভাবে হাই-অ্যাঙ্গেল শট ব্যবহার হয়েছে, জেল-এর দৃশ্য থেকে মুনলাইট ক্যাবে ক্যামেরা চলে এসেছে, বোনের চিঠি পড়ার মুহূর্তে প্রথমে ক্লোজ আপে শুধুমাত্র চিঠি-ধরা হাত দৃশ্যায়িত হয়েছে যা নায়ক তার বন্ধুকে চড় মারার পরে দ্রুত কাট করে যেভাবে অন্য দৃশ্য এসে গেছে তা এক-কথায় অনবদ্য।

'দম মারো' ছবি করতে গেলেন কেন? পরি-

কিন্তু এতসব জেনেও পরিচালক এই চালক হয়তো বলবেন, তার ছবি দর্শক নিচ্ছে খুশী হচ্ছে তাহলে দোষটা কি? কিন্তু এই খুশী বা আনন্দ তো নানা-ভাবেই আসে, কেউ কাউকে খুঁচিয়ে মারতে আনন্দ পান আবার কেউ বা তাকে চুম্বন করে আনন্দ পান। এখন প্রশ্ন, আমরা কোন্ আনন্দের সঙ্গী হবো?

আলোচ্য চিত্র : কসম খুন কী। সঙ্গীত পরিচালক—কল্যাণজী আনন্দজী। পরিচালক—অশোক রায়।

পীযূষ বসু পরিচালিত বজ্রবুলি

শক্তি বন্দ্যোপাধ্যায় পরিচালিত দৌড়

খেল্ যদি চলতে থাকে

দেওয়ালির মেলা থেকে বাড়ি ফেরার পথে তিন দুশমনের হাতে বাবা প্রাণ দিল, দীর্ঘতা দিদি খুনখুনি করলো, ছোট ভাইটি উঁচু পাহাড়ের ওপর থেকে ছিটকে পড়লো অনেক নীচের নদীতে, তখন হরির রক্তে তিলক এঁকে বদলা নেবার শপথ নিল কিশোর খিলাড়ী আর তখনই শুরু হয়ে গেল তার খেল। আর সে যে কত খেল-কি খেল-কেন খেল তা না দেখে বোঝা যায় না, দেখেও না।

খিলাড়ী তো বড় হয়ে ধর্মেন্দর হয়ে গেল। চোর সে হয়েছিল বাল্যকালেই। বড় হয়ে হল সখের ডাকাত 'সখী ডাকু' আর সামাজিক পরিচয়ে রাজা সাব। কিন্তু ছোটবেলায় তাকে চোর যে বানিয়েছিল সে এক সাধুবাবার মহানুভবতার বশে গোল্লা সমাজ সংস্কারক (অর্জুন হিন্দোরিণ) মাস্টারজী চরিত্রগুণিধর ইস্কুল খুলেছেন। তাঁর ইস্কুলের চার অপদার্থদের মধ্যে এসে হটেল ওস্তাদেরা কে ওস্তাদ হবে। এ কিন্তু ধর্মেন্দরের সেই বিহ্বল ভাবে

[illegible] দিতে না দিলেই, [illegible] [illegible] ঠিক [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] উনি ওয়াজাককে [illegible] জন্য অপেক্ষা করছিল। যাই [illegible] [illegible] সাধসাধর টেকনিকে [illegible] [illegible] করেছেন।

[illegible] ছবি জুড়ে পরিচালকের খেয়াল-খুশি মতো এসে গেছে ড্রেস-দার টিক-টিকের অ্যাটমস্ফিয়ার, উত্তেজনার রিক্তহস্ত প্রীপ যেটির বোট ছোয়া ঘোড়া হাতী [illegible] অর্থহীন প্রদর্শনী, গরু, গরু, [illegible] বিজ্ঞাপিকামী, শেষকালে দুপলমকা মধন, ছড়কসমে বিচ্ছিন্ন হওয়া দুই ভাইকা মিলন এবং জেলে যেতে যেতে শত্রুপক্ষের টা-টা দিয়ে সমাপন।

কল্যাণজী আনন্দজীর সুরে দেওয়া [illegible] গানের একটা যেন আকাশবাণী এবং পঞ্চাশদশ প্রচারিত দৈনবাণীর কল্যাণে চেনাচেনা মনে হল। বাকী গান-গুলো মনে রাখার মত কোন কারণ ঘটেনি। [illegible] চড়া আওয়াজের ইম্পোর্টেড ঐকতান। অবশ্য এই ছবিতে খাপ-খাওয়ানোর মত সুর কেউই কি দিতে পারতেন।

টেকনিক্যাল ব্যাপারে হিন্দী ছবি এখন অনেক উন্নত অনেক পরিচ্ছন্ন। কিন্তু আলোচ্য ছবিটি সে ব্যাপারেও বেশ পিছপা এডিটিং আরো পরিচ্ছন্ন হতে পারত। ফটোগ্রাফিও নেহাৎই মামুলি।

প্রযোজক-পরিচালক অর্জুন হিঙ্গোরানি তাঁর ছবিতে ছোটবেলায় মতো। এদিক ওদিক থেকে অনেক কিছুই ছিনতাই করে এখানে লাগিয়ে দিয়েছেন। চরিত্রশূন্য বিদ্যালয়ের মাস্টারজীর এই শোধন প্রয়াস যদি অব্যাহত থাকে তাহলে— 'হিন্দি ছবির দুনিয়ায় এই রকম ছিলিম টেনে ফিল্ম বানানো যদি চলতে থাকে তাহলে ঘাটে-ঘাটে না হোক পর্দায় সোনার বাংলা আবার আসবেই।

আলোচ্য ছবি— খেল খিলাড়ী কা সংগীত —কল্যাণজী আনন্দজী, প্রযোজক-পরিচালক— অর্জুন হিঙ্গোরানি।

-বিমান দাস

সত্যজিৎ রায় পরিচালিত সতরঞ্জ কে খিলাড়ী

হিন্দীতে বাংলা ছবি

উনি কি সেই পরিচালক, যিনি নরেন্দ্রনাথ মিত্রের 'রস' নামে ছোট গল্পটিকে চিত্রায়িত করেছিলেন? কিছুদিন আগের 'ত্রিবিনমুক্ত' কি ওঁরই পরি-চালনার। বিশ্বাস করতে কষ্ট হয় নাকি একই নামে দুই ব্যক্তি বোম্বাইতে অব-স্থান করছেন।

সোয়া দু ঘণ্টার এই ছবিটি এমন এক টোকিস ড্রাইভারের গল্প বলেছে, যার জীবনযাপন বিত্তবানদের সঙ্গে সমতুল্য। হয়তো কোন ভাঁড় বা পরীর সঙ্গে নায়ক-নায়িকাদের বন্ধুত্ব আছে যারা ঐসব বিলাসবহুল মালমসলা সাপ্লাই করে।

ছবি ও তার গল্প এমনই যে একটা ১৫।১৬ বছরের ছেলেকে যদি আনুষঙ্গিক যন্ত্রপাতি ও কিছু ছেলেমেয়ে দিয়ে একটা ফিল্ম তৈরী করতে বলা হয়, তাহলে সে যে জিনিস প্রস্তুত করবে, আলোচ্য ছবিটি তার তুলনায় কোন অংশে বেশী নয়।

হিন্দী ছবিতে সাধারণ যে এ্যাকশান ও সাসপেন্স থাকে, এখানে সেসব কিছু রাখার চেষ্টা হয়েছে, কিন্তু তা এত শ্লথগতিতে যে দর্শকদের ঝিমুনি এসে যায়। হলের চাওয়ালারা বেশ বুদ্ধিমান। দর্শকদের কথা চিন্তা করে তারা চায়ের সঙ্গে ঐ ছবির জন্য স্পেশাল আইটেম হিসাবে মাইকেলফাইন্ড এ্যাসপ্রো- রাখছে।

বেশীরভাগ দৃশ্যই ইনডোরে ব্যাক প্রোজেকশানের সাহায্যে তোলা, যা ছবির স্বাভাবিকতাকে অনেকখানি নষ্ট করার পথ দেখায়। নায়ক ও নায়িকার মধ্যে রোমান্টিক [illegible] কৌশল [illegible] কার্যকরী হতে পারে নি। একটা [illegible] আছে, কিন্তু তাও সে মামুলি। ছবিতে [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] একেবারেই মানিয়েছে। অভিনয়ে ছোট থেকে বড় অবধি সবাই মুখ আর হাত-পা নেড়েছেন, তার বেশীকিছু নয়। এ ছবির সঙ্গীত সম্ভবতঃ একটা বড় রকমের একসপেরিমেন্ট। হঠাৎ হঠাৎ এমনসব জিনিস বেজে ওঠে যে চমকানোরও সুযোগ থাকে না। গানগুলো সম্ভবতঃ স্যুটিং-এর আগে রেকর্ডিং হয়ে-ছিল। ছবি যখন শেষ হবে ভাবছি, এবং আমরা প্রায় চেয়ার থেকে উঠে পড়েছি তখনই হঠাৎ একটা গান বেজে ওঠে। গানটা মনে হয় বেশী থেকে গেছিল, পরিচালক জায়গা না পেয়ে ওখানে লাগিয়ে দিয়েছেন। ছবিটি সম্পর্কে শুধু একটা কথা বললেই হবে যে যাঁরা ছবি দেখে আর কিছু নয় সামান্য আনন্দ বা মজা পেতে চান (শিল্প তো দূরের কথা); অর্থাৎ ছবিতে মোটামুটি একটা গল্প চান নাটক চান, এ্যাকশান, সাসপেন্স, ফাইটিং অভিনয় প্রেম গান ইত্যাদি চান এই ছবি তাঁদের জন্য নয়।

আলোচ্য চিত্র : আপকি খা[illegible]
পরিচালনা : সুখেন্দু [illegible] সঙ্গীত : বাপি লাহিড়ী

নীরা শ্রীবাস্তব

বিদেশী ছবি

অপারেশন ডেবেক : সম্ভবতঃ এই প্রথম একজন মার্কিন চিত্রপরিচালক চেকো-শ্লোভাকিয়ায় গিয়ে এ ছবির স্যুটিং করলেন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের মধ্যভাগে নাৎসী সাম্রাজ্য ও হিটলারের বিরুদ্ধে রুখে উঠলেন সাতজন তরুণ ও এক তরুণী: তাঁদের জ্বলন্ত দেশপ্রেম ও সাহস নাৎসী-দের বর্বর আক্রমণ প্রতিরোধ করতে সাহায্য করে। 'দ্য এ্যাডভেঞ্চার' ও 'মেন্ডেস' খ্যাত বিশিষ্ট পরিচালক লুই গিলবার্ট এই চিত্রটি পরিচালনা করেছেন। এর শুরু থেকে শেষ অবধি অ্যাকশান। আলোকচিত্র ও আঙ্গিকের কাজ বৈশিষ্ট্যপূর্ণ।

হফম্যান : এখানে এক মধ্যবয়স্ক নিঃসঙ্গ ব্যক্তির কথা বলা হয়েছে যে তার

[illegible]

[illegible] আচার্যের [illegible]

মীনাবাজার—বরানগর থেকে উলুবেড়িয়া

বরানগরে সাতক্ষীরার জমিদার রায়-চৌধুরী বাড়ির বংশধর অমর রায়চৌধুরী মীনাবাজারে রূপলাল, আহমেদ শা-র আমলের এক চাষী। স্ত্রী চম্পা—অরুণা গোস্বামী, মীনাবাজারে লাঞ্ছিতা। সোনা দেবনাথ, যাঁকে দেখলেই আসরে হাসির ঝড় ওঠে, তিনি লালাজী মহাজন। চম্পাকে ভোগ করতে চায়। গৌরিদের গেরুয়া পাঞ্জাবি (কাজ করা) আর সাদা ট্রাউজার পরে গোষ্ঠ-দাস বাউল হন মুক্তাক, রূপলালের বন্ধু। গোষ্ঠদাসের গান প্রাণে এসে লাগে। রঞ্জিৎ আর বেলা ব্যানার্জি, এক দম্পতি, খোলা

তলোয়ার নিয়ে লড়ে গেলেন। একজন আহমেদ শা-র আর্দালি, একজন পাঠান সর্দার। শাহ আহমেদ পারস্যের শাহ নাদির-এর দোসর। শাহ নাদির নগর লোটাতে ছিলেন। নির্দেশক এই গ্রাম-নাট বরানগরে আহলাদ করে এনেছিলেন। সেদিন বৃষ্টিতে উত্তর কলকাতার অনেক এক বিশাল জলাশয়ে পরিণত হয়ে গেছে খেয়াল করিনি।

ভারত সম্রাট আহমেদ শাহ-র পাশে পাশে থেকে আমিও রাজপুরুষ হয়ে গিয়ে-ছিলাম। সুনীলেন্দু ভট্টাচার্য পুলিশ সার্জেনের চাকরি ছেড়ে দিয়ে ভারত সম্রাট হয়েছেন। ব্যাপারখানা বুঝুন। এত বড় প্রমোশন আর কেউ পেয়েছেন কখনো?

বাঁদী জুবেদা মঞ্জুশ্রী ঘোষ পর্দার ফাঁক দিয়ে বৃষ্টি পড়া দেখছেন। বাঁদীরা সুন্দরী হলে আয়েশা থাকে। মঞ্জুশ্রী অতো-দিক সুন্দরী। গজলের ঢঙে একটা গানও আবার গাইলেন।

কিশোরী শঙ্কর সাহা রূপলালের ভাই মদন। ওর গাওয়া গানটা টগবগ টগবগ ঘোড়া ছুটিয়ে' রেকর্ড কোম্পানির রেকর্ড করা উচিত।

অবনী চন্দ হয়েছেন গাজীউদ্দিন। চক্রান্তকারী সেই চরিত্রকে এত স্বাভাবিক করে ফেলেছেন অবনীবাবু তাঁকে সব সময়ই গাজীউদ্দিনই মনে হচ্ছিল। শাহ আলম সেদিন মহলায় আসেন নি। অর্থাৎ মুকুল সরকার অনুপস্থিত।

এই অনুপস্থিতির খেসারত দিলেন মঙ্গলবাবু উলুবেড়িয়ায়। জমিয়ে অভিনয় করে দেখিয়ে দিলেন তাঁর কৃতিত্ব। পরি-পূর্ণ শাহআলম। জমজমাট মীনাবাজার। উলুবেড়িয়ার, কালীবাড়ির চত্বরে ঘনঘন ক্ল্যাপ, হাততালি। উপচে পড়া ভীড়। প্রথম রজনীতেই 'মুক্তধারা' নিজেকে প্রতিষ্ঠা করে নিল।

প্রভাত চৌধুরী

মঞ্চে ৮৫ বছর আগের নাটক

গত ২৩ নভেম্বর রবীন্দ্রসদনে টি এল জি তাঁদের মনোনীত নাটক করলেন। যবনিকা তুলে, পাত্রপাত্রীরা সমবেত হয়ে কতকটা গান—কিছুটা নাচ এবং অতি দীর্ঘায়িত ছড়া কেটে বুঝিয়ে দিলেন, তাঁরা গিরিশচন্দ্রের 'আবু হোসেন' মঞ্চস্থ করছেন। কি ভেবে? 'পুরোনো চাল ভাতে বাড়ে'—এই ভেবে। স্পষ্টত, যুক্তিটা ঠিক নয়। পঁচাশি বছর আগের একটি কৌতুকপ্রবণ গীতিনাট্য এখনো আমাদের শ্রদ্ধা আদায় করতে পারতো—যদি কৌতুক, গান ও নাটকের সমবেত শক্তিটা এখনো জোরালো থাকতো। গিরিশচন্দ্র ঘোষের এই অপেরা-টিক মেলোড্রামার, কৌতুকপ্রবণতা গীতি-প্রবণতা এমন কি নাট্যপ্রবণতা থাকলেও শুধু তিনটি প্রবণতায় তো আর কোনো জিনিস দাঁড়ায় না। এ আমাদের দেশের জিনিস বললেও নয়। অতোক্ষণে, সুভাষত ছড়া-গুলিতে ছন্দোবদ্ধতা জানিয়ে দিচ্ছে, পুরোনো নাটকটিকে খানিকটা সম্পাদনা করা হয়েছে এবং আবু হোসেনী জ্যাল ছেড়ে তাঁরা জোগাড় করতে পারেন নি। যা থেকে, পরিষ্কার সিদ্ধান্ত নিতে পারা যায় যে এই আবুহোসেন হলো সৌখিন ও অপেশাদারী নাট্যসংস্থার ব্যবসায়িক প্রযোজ-সর্বস্বতার দিকে নজর-রাখা একটি প্রযোজনা। এন্টার-টেইনিং নাটক বিশেষ লেখা হচ্ছে না এখন—সুতরাং তাঁরা পচাশি বছর পিছনে তাকিয়ে আবু হোসেন ধরেছেন।

নাটকটি যাঁরা পড়েছেন তাঁরাই জানেন, এটি ঠিক ফার্স নয়। পঁচাশি বছর পর আজকের বাংলাদেশে থেকে এই নাটকের পাত্রপাত্রীদের শ্রুতিকটু অশ্লীলতাময় সংলাপ নিম্নরুচি প্রহসনচেষ্টা এবং অসমঞ্জ-সতা সহ্য করা শক্ত। কিন্তু থিয়েটার লাভার্স গ্রুপকে ধন্যবাদ, তাঁরা আন্তরিক সশ্রম টিমওয়ার্কের ছাতার তলায় তাঁদের প্রযোজনাকে এই দুর্দৈব নাটকের দুর্যোগ থেকে অনেকবার বাঁচিয়েছেন। পুরো রক্ষা হয়নি অবশ্য। নির্দেশক পঙ্কজ মুন্সী এক-বার একটি সুপরিকল্পিত নৈঃশব্দের ব্যবহার করেছেন। তাঁকে অনুরোধ, কুশীলবদের সকলেরই প্রায় গলা ভালো, কিন্তু বড়ো হলে এ নাটক করতে গেলে সেই গলা যাতে শেষ রো থেকেও শোনা যায়। আবু হোসেনের চরিত্রের অভিনেতা একটু ফিল্মি কায়দার পক্ষপাতী—সমগ্র টিমওয়ার্কে এটা একটু ছন্দোভঙ্গ। নির্দেশক [illegible] কম্পোজিশন জানেন—নাটক দেখতে দেখতে বোঝা যাচ্ছিলো। কিন্তু পাত্রপাত্রীরা অতো পিছিয়ে গিয়ে-ছিলেন কেন?

নাটক : আবুহোসেন। পরিচালনা : পংকজ মুন্সী।

পার্থপ্রতিম কাঞ্জিলাল

বিশ্বরূপায় 'জনগণমন'

বিশ্বরূপা থিয়েটারের আগামী নাটক শ্রীবিমল মিত্র'র 'জনগণমন'। নাটক, পরি-চালনা দুরদর্শনি শ্রীরাসবিহারী সরকারের। আলো তাপস সেন, সুর ভি বালসারা, মঞ্চ সুরেশ দত্ত ও ধ্বনি কমল চৌধুরী।

স্বাধীনতার বেশ কিছু কাল পরেও আমাদের দেশের বেশীর ভাগ মানুষ যে দুর্ভোগ ও দুর্ভাগ্যের শিকার হচ্ছে এ নাটকে তারই চিত্রিত আলেখ্য।

বয়েসে ছেলেমানুষ হলে কি হবে, মর্যাদা কম নয় তা বলে। ন' বছর বয়েসেই তো পরীক্ষা হলো গেছে বড়াল উৎসবে। বাঘা বাঘা গাইয়ে বাজিয়েরা সব বসে সামনের সারিতে। তাঁদের দিকে চেয়ে গলা শুকিয়ে উঠতে চাইছিল কিন্তু তবু মর্যাদা ও। হেরে গেলে তো সবই গেল, গেল এত কষ্টের রেয়াজ, বাবার শিক্ষা।

চিন্তা ছিল মসিদ খাঁরও। তবে ভরসাও ছিল। কম্‌বু বড় জিদ্দি ছেলে, যা ধরে তা না করে ছাড়ে না। ছাড়েওনি। রথী-মহারথীরা একবাক্যে রায় দিয়েছিলেন, বাচ্চা হলে কি হবে, ইলমদার ছেলে—

সেই থেকে চলছিল অবিশ্রান্ত সাধনা। খানদানী সঙ্গত, তার সঙ্গে মিশেছিল বুদ্ধির দীপ্তি আর সূক্ষ্ম শিল্প-রসবোধ। এই তিনের মিশ্রণে এক নিজস্ব রূপ পেয়েছিল তাঁর বাজনা। দীর্ঘ কয়েক দশক ধরে শ্রোতাদের তৃপ্তি দিয়েছেন তিনি, সৃষ্টি করে গেছেন এক ছন্দের মায়াজাল।

ভারতের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে গুণীরা কলকাতায় এলে খুঁজতেন ও'কে সেই সেকাল থেকেই। বাংলার বাইরে থেকে ডাক আসত অহরহ, ডাক আসত বিদেশ থেকে।

এর অর্থ অবশ্য এ নয় যে সারা ভারতে আর কোন গুণী তবলিয়া ছিলেন না। ছিলেন কণ্ঠে মহারাজ, আল্লারাখা, সামতাপ্রসাদ। দিকপাল সব। কিন্তু তবু কেরামৎ কেরামৎই, বলতেন গায়ক বাদকরা। তিনি শুধু তবলিয়া ছিলেন না, ছিলেন, প্রকৃত সঙ্গতকার, মরমী শিল্পী।

হাসতেন তিনি, বলতেন, আমি তো একা নই আমি গায়কের সঙ্গী, যন্ত্রীর সখা, তাদের ছাপিয়ে যাবার লোভটুকু না সামলাতে পারলে আর শিল্পী কিসের ?

কিন্তু তবু শ্রোতার মনোযোগ কেড়ে নিত ওই হাতের সুর ফোটানো বোল সে যেন যন্ত্র নয়, কখনও মৌমাছির গুঞ্জন, নদীর কুলুকুলু স্বর, কখনওবা মেঘের গুরু গুরু ধ্বনি মূর্ত হয়ে উঠত ওই দশটি আঙ্গুলের কারু-কার্যে। সুরের বৈচিত্র্য নাই বা থাকল কিন্তু ছন্দের দোলা মনকে দোলায় না এমন রসিক মানুষ আছে নাকি কোথাও ?

বিশ্বাস হয় না আর কোনদিন দেখব না সেই আশ্চর্য যাদুকরের মত মানুষটিকে।

শরীর ভেঙে ছিল অনেক দিনই। অনেক রোগভোগের পর সেরে উঠেছিলেন সেবার। কিন্তু স্বাস্থ্য ভেঙে গিয়েছিল একেবারে। তবু বাজাতে বসলে তখনও হাতে উঠে আসত বোলের সারি, মিষ্টি, দোলা জাগানো ঠেকা, তাও ছিল। ওরা যেন রক্তের আত্মীয়, শিরা উপশিরায় জড়িয়ে গিয়েছিল আজন্ম অভ্যাসে। কিন্তু শরীর সইতে পারত না পরিশ্রম, উত্তেজনা। তবু এর মধ্যেই চলেছে বাজনা। শিখিয়েছেনও অবসর সময়ে, দিল্লী গেছেন সঙ্গীত নাটক একাডেমীর পুরস্কার নিতে। সবই চলেছে, কিন্তু ধনসম্পত্তির ক্ষয় হয়েছে তলায় তলায় আলগা হয়ে এসেছে মাটির বন্ধন। অবশেষে এল সমাপ্তি।

ছন্দের দোলায় দুলে বিচিত্র সৃষ্টির মধ্যে দিয়ে এসে জীবনের আবর্ত শেষ হয়েছে আজ—এবারে বিশ্রাম। যন্ত্রকে সামনে ঠেলে দিয়ে উঠে গেছেন কেরামতুল্লা খান, উৎসব শেষে শূন্য মঞ্চ পড়ে রয়েছে একটা হতাশ হাহাকারের চেহারা নিয়ে। তবু বিশ্বাস হয় না।

রেখা বড়ুয়া

অজিত পাণ্ডে

আর নেই

আমাদের দেশে গণসঙ্গীতের জন্ম জোয়ারের কাল চারের দশক। জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্র, হেমাঙ্গ বিশ্বাস, ভূপেন হাজারিকা, সলিল চৌধুরী প্রমুখ গুণী শিল্পীদের হাতে এর শতধা-বিস্তার ঘটেছিল। তারপর প্রায় দুটো দশক মরা কোটালের কাল গেছে। একালের সঙ্গীত-প্রিয় মানুষ ভুলতে বসেছিলেন গণসঙ্গীত কাকে বলে। এমনি পড়ন্ত দিনে কড়ি ও কোমলে বেজে উঠল তরুণ অজিত পাণ্ডের গলায় মানুষের জন্য মানুষের প্রেমে বাঁধা গানের পর গান। প্রায়-বিস্মৃত একটি অধ্যায় ভস্ম-অবশেষ থেকে ধুলো ঝেড়ে উঠে আবার রাজকীয় পদক্ষেপে মঞ্চে এসে দাঁড়াল।

কয়লা খনির মজুর থেকে কাছের মানুষ অজিত পাণ্ডে কোনো অর্থেই কমার্শিয়াল সঙ্গীতশিল্পী নন। দেশপ্রেমের গান বিপ্লবের গান, লোকসঙ্গীত, আন্তর্জাতিক সঙ্গীত—এক কথায় মানুষের উপর মানুষের ভালো-বাসাকে যা কিছু উজ্জীবিত করে তৈ... তা-ই প্রাণ-প্রতিম হয়ে উঠেছে অজি... গলায়। বিষণ্ণ, দুঃখী, মার-খাওয়া মানু... জন্য গান শুনে উঠে বসেছে, বাঁচার ও ... জন্য লড়ে যাওয়ার কথা নতুনভাবে ভেবে... একজন গণশিল্পীর এর চেয়ে আর ... পাওনা কি আছে?

অজিতের সবচেয়ে বড় কৃতিত্ব গণ-সঙ্গীতে নতুন রকম আমদানী করা মানুষের স্বপক্ষে একালের কবিরা যে কবিতা ও ছড়া লিখেছেন, অভিনব সু... যোগ করে সেইসব রচনাগুলিকে সে জীব... করে তুলেছে। না, কোনো সংকীর্ণতা ছুঁৎমার্গ নেই অজিতের। অবলীলায় সে দেশের গানের রীতির পাশাপাশি বিদে... লোক-গীতির সুর বয়ে নিয়ে এসেছে।

চাল-চুলো, জীবিকা, মাথার ও নিরাপত্তার ছাদ কিছুই নেই অজিতে... কোনো ইনাম বা সস্তা খ্যাতির কাছে ... নোয়ায় নি এই বেপরোয়া তরুণ। দারি... আর অবসাদের চাপে ভেঙে পড়তে প... বারবার সোজা হয়ে উঠে দাঁড়িয়েছে ... কারণ একজন গণসঙ্গীত-শিল্পীর সব... বড় প্রাপ্য কি তা সে জেনে গেছে। তা... দেশ-বিদেশের লক্ষ লক্ষ শ্রোতার বুকে... ভালোবাসা।

তারই উত্তাল জোয়ারে সমস্ত ব্যর্থ... সম্ভাবনাকে তীরে ফেলে অবহেলায় উ... গণ-সঙ্গীতের পাল তুলে নৌকা ভা... দিয়েছে অজিত।

অগ্নিকান্ত দাশগ...

চোখ বেঁধে মোটর সাইকেলে

এই সেদিন ১২ই নভেম্বর ৭৭ স... নটায় কলকাতার কয়েক সহস্র না... একটা অবাস্তব সত্য ঘটনা প্রত্যক্ষ... সাক্ষী হয়ে আছেন। ঘটনাটির নায়ক ... কাতার তরুণ যাদুকর শ্রীরবীন মন্ডল... সেদিন সকালে অপূর্ব দক্ষতার সঙ্গে এ... ক্রীড়াচাতুর্য তিনি উপহার দিয়েছেন ক... কাতাবাসীদের। সমস্ত খেলাটি দেখে ... হয়েছে, যেন এক ... প্রতিভাবান ... সংগীতশিল্পী অপূর্ব দক্ষতায় একটি ক... রাগসংগীতকে অতি সহজেই আয়ত্তে ... শ্রোতৃমন্ডলীর সামনে পেশ করলেন।

মধ্য কলকাতার আমহার্স্ট স্ট্রী... সেন্ট্রাল ক্যালকাটা স্পোর্টিং ক্লা... উদ্যোগে সেদিন সকালে শ্রীমতি... আমহার্স্ট স্ট্রীট ও বৌবা... স্ট্রীটের সংযোগস্থল থেকে যাত্রা শু... করেন। দক্ষিণ দিকে শশিভূ... দে স্ট্রীট, তালতলা এভেনু, সুরেন্দ্র... ব্যানার্জী রোড, রফি আহমেদ কিদো... স্ট্রীট, পার্ক স্ট্রীট, লাউডন স্ট্রী... আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু ... শরৎচন্দ্র বসু রোড হয়ে ... কুপার স্ট্রীটে কোলকাতা হাইকোর্টের ... নীর প্রধান বিচারপতি শ্রীশঙ্করপ্রসাদ ... মহাশয়ের বাড়ির প্রাঙ্গণে তার আ...

...ন্ন করেন। মাননীয় শ্রীমিত্র খাদ্যকরের সঙ্গে বন্ধনমুক্ত করেন। পথিমধ্যে কোথাও ট্রাফিক পুলিশ কোথাও বা দুধারে অপেক্ষমান মোটর আরোহীদের সঙ্গে করমর্দন করে তিনি দর্শকদের বিস্মিত করে তোলেন।

যাত্রার শুরুতে কোলকাতা হাইকোর্টের মাননীয় বিচারপতি শ্রীসলিল রায়চৌধুরী মহাশয় নিজ হাতে কয়েক সহস্র উৎসুক দর্শকের সামনেই শ্রীমল্লিকের চোখ প্যাণ্ডার করে দেন। দীপ্তিভূষণ গুপ্ত

রেস্তোরাঁ

মধ্য হাওড়ার আটপৌরে বাঙালীর ঘরোয়া রেস্তোরাঁ। মাথায় টালির ছাদ। ... দেওয়াল। সেখানে তিন দিন ফুল পেমেন্ট করে পরের দিন ধার রাখেন অনেকে। নন্দদার কোন ধারের খাতা নেই। সবই উনি সাতচল্লিশ বছরের পোড়খাওয়া মগজে ধরে রাখেন। কখনও কখনও খদ্দেরের ইচ্ছে অনুযায়ী তার হিসেব লিখে রাখেন দরজা-জানলায় খোলামকুচির আঁচড়ে। নন্দলাল রেস্টুরেন্ট সেই স্বদেশী আমলের হোটেল। তখন অনেক স্বদেশী মানুষ এখানে আসতেন। এই কারবার দেখাশোনা করতেন তখন নন্দর বাবা। সেদিন বিক্রী ছিল রোজকার দু'তিন হাজার। সিজনে অকেসানে আরও বেশী। চপ, কাটলেট, ঘোল, কবিরাজী তখন রোজই হোত। ডালপুরি আর সিমাইয়ের হালুয়া ছিল মর্নিং স্পেশাল।

আজ খদ্দেরদের সংখ্যা বাড়লেও বিক্রী অনেক কমেছে। আজকের বিক্রীর কথা বলতে গেলে নন্দদার লজ্জা করে। "আজকের খদ্দেরদের সে পেটই নেই, পয়সা তো দূরে অস্ত"— নন্দদা বলেন। নন্দদা তাঁর খদ্দের ডাকেন ঘুঘনি, আলুর দম, ছাড়া, ডাল তরকারী, ভাত, রুটি, মাছ, মাংস, ডিম দিয়ে। শেষে তেঁতুলের টকটা অবিশ্যি বিনি পয়সায়। খাওয়ার শেষে এক চিমটে মৌরি আর খড়কে কাঠি এটাও বিনি পয়সায়। পাশের ইয়ুথ হোস্টেলের বিদেশী ট্যুরিস্টরা মাঝে মধ্যে এখানে আসেন, বাঙালী খানা খেতে। নন্দদার দোকানের পাশের হিন্দুস্থানী ভাইরা নন্দদার কাছে লাঞ্চ, ডিনার সারে। মাত্র দেড়-দু টাকায়। চাহিদা মতো পাশের দোকান থেকে নন্দদা ছাতু আনিয়ে দেন। কোন কেবিন নেই। মুক্তমেলা। বৃটিশ আমলের কাঠের বেঞ্চির ওপর তেঁতুল পাতায় নাস্তা।

হাওড়ার বেশ কিছু তরুণ কবি, শিল্পী ও গায়ক এই রেস্তোরাঁয় সন্ধ্যে কাটান। খদ্দের কম থাকলে ভালো আড্ডা জমে। খিদে পেলে এক প্লেট আলুর দম কিম্বা ঘুঘনি বরাদ্দ। নন্দদা খবরের কাগজ পড়েন না, এদের মুখ থেকেই খবর শোনেন।

নন্দদা আজ আর বড়ো লাভের স্বপ্ন দেখেন না। কোন রকমে ছেলে বউ পালন করেন। ছেলেমেয়েদের স্কুলে পড়ান। বছরে মাস অন্তর দেশের বাড়ী আরামবাগে বেড়াতে নিয়ে যান। বড় পুকুরে চান করার পর বেলতলাতলায় জপ করতে যান। মাথা ধবধবে টিপতে দেখে তখন বোঝা যায়, নন্দদারা কতো বড়ো বনেদী ব্রাহ্মণ। নির্মলেন্দু ঘোষাল

রান্না

সেদিন একটা বড়সড় বেগুন এলো বাড়িতে। অনুমানে বলছি, প্রায় আধ কেজির মত। আমি সেটা নিয়ে নাড়াচাড়া করছি দেখে রাণিপুরী বৌদি বললেন, কী করবি ওটা দিয়ে? আমি বললাম ভাবছি কী করি। ভাজতে গেলে তেল লাগবে অনেক। ফেলে তো আর দেব না, কিছু একটা করবো ঠিক। রাণি বৌদি বললেন, এক কাজ কর, অর্ধেকটা ভেজে ফেল আর অর্ধেকটা দিয়ে কোপ্তা করব। নটুকে বল, শ'খানেক কুঁচো চিংড়ি নিয়ে আসুক বাজার থেকে। পঁচিশ গ্রাম আদা আর পঞ্চাশ গ্রাম বড় পেঁয়াজ নিয়ে আসুক। ভাল করে রেঁধে দেব কোপ্তা— বেগুনের কোপ্তা। ঝক্কি নেই, ঝামেলা নেই, অল্প পয়সায় তোফা খানা। বেগুনটা ভাল করে সেদ্ধ করে নিবি। কুচো চিংড়ির খোসা ছাড়িয়ে বেটে নিবি। তারপর বেগুন আর চিংড়ি বাটা মিশিয়ে তার মধ্যে আদার রস, পেঁয়াজের রস কয়েকটা কাঁচা লঙ্কার কুচি একটু নুন মিষ্টি দিয়ে কিছুটা ময়দা মিশিয়ে ভাল করে মিশিয়ে মাখবি। এরপর তেলে ছাড়লেই হল। ডাল ভাতের সঙ্গে বড়া খেতেও ভাল লাগবে। অথবা যদি কোপ্তা করিস তবে মোটামুটি কিছুটা তেলে আদা পেঁয়াজ লঙ্কা রসুন ভাল করে কষিয়ে নিয়ে বড়াগুলো ছেড়ে দিবি। মাঝে মাঝে সামান্য জলের ছিটে দিয়ে নেড়েচেড়ে দিলেই কোপ্তা। দিতেও ভালো খেতেও ভালো। কম পয়সায় এর চেয়ে ভালো কোপ্তা কেউ করতে পারবে না।'

আত্রেয়ী সেনগুপ্তা

গ্রাম থেকে ফিরে

বনগাঁ লাইনের নাম শুনলেই চমকে ওঠেন। এমন লোক সংখ্যায় অনেক। যেমন মানুষের ভিড়। তেমনি অস্বাভাবিক জীবনধারা। এর মধ্যে অসংখ্য মানুষ বেঁচে আছে নানা উপজীবিকায়, নানা সুখে দুঃখে। পূর্ববাঙলার মানুষই সংখ্যায় বেশি এই অঞ্চলে। তাদের ফেলে আসা সংস্কৃতিকে নানাভাবে বাঁচিয়ে রেখেছে এপারে। পালাপার্বন, পুজো কবিগান, তরজা আরও অনেক কিছু। পূর্ববাঙলার সংস্কৃতির অঙ্গ, এপার বাংলায় তার জীবন্ত রূপ আমরা দেখতে পাচ্ছি।

সম্প্রতি মছলন্দপুরে গিয়েছিলাম। ওখানে বসেছে বিরাট রাসের মেলা। বেশ মনোরম জুড়ে বিরাট মানুষের সমাবেশ। বিরাট শামিয়ানা চত্বর জুড়ে। একধারে সার সার সাজান শ্রীকৃষ্ণের নানান রূপ।

সস্তা ভেলেভাজা আর নানাধরনের মিষ্টির দোকান। অসম্ভব ভীড়। এরমধ্যে পকেটমারেরও আনাগোনা। পুতুল নাচের আসর বসেছে। মাইকে ভেসে আসছে যাত্রাপুরী গান। হিন্দী গানের ফোয়ারা। ছোটরা যেন বড়দের চমকে ওঠে মাঝে মাঝে। হাজার হাজার দর্শনার্থীর ভিড়ে মেতে উঠেছে উৎসব। যেন একটা অদ্ভুত পরিবেশ। হ্যাণ্ড একটা মেয়েকে কেউ টেনে ভাগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। মানুষজন। মানুষজন তাঁবুতে।

হাজার হাজার দর্শনার্থী রাসমেলায় চেনা অচেনার ভিড়ে হারিয়ে যাচ্ছে আবার খুঁজে পাচ্ছে নিজেদেরকে। শীতের রাত ওদের স্পর্শ করে না। ওরা সবাই পায়ে পায়ে বাড়ী ফিরছে। শীতটাই যেন মিছিলের দেশ। এপার মছলন্দপুর স্টেশনে। হাজারে হাজারে মানুষ আপ আর ডাউন ট্রেন ধরতে ব্যস্ত। প্লাটফরমের নীচে আস্তানা করে পড়ে রয়েছে দু-চারটি শরণার্থী পরিবার। তাদেরই পাশে আগুন জ্বলছে। পড়ে থাকা, আধ-খাওয়া অথবা আমাদেরই দেওয়া কিছু নিয়ে রান্নায় ব্যস্ত। ওদেরই শীর্ণ শিশু, না জন্মানো শিশু মধ্যে মুক্ত আকাশের নীচে অর্ধমৃতের মত পড়ে রয়েছে। ওদের দেখে মনেই হয় না পাশে রাসের উৎসবে হাজার হাজার তীর্থযাত্রী ভিড় জমিয়েছে। বিশ্বনাথ ঘোষচৌধুরী

আমি কঙ্কাবতী বলছি

প্রাণশক্তি — ইংরিজিতে যাকে 'এনার্জি' আখ্যা দেওয়া হয়, জীবনযুদ্ধে অতি মূল্যবান। জীবনের প্রতি পদক্ষেপে প্রয়োজন প্রাণশক্তি, ব্যক্তিত্বও এর-ই উপর নির্ভরশীল অনেকে সবসময় ব্যস্ত-সমস্ত ঊর্ধ্বশ্বাসে থাকেন, কেউ বা সর্বদা ম্রিয়মাণ। এই বৃহৎ জনঅরণ্যে মাত্র দু-একজনকে দেখা যায়, সারা দিনের পরিশ্রম, দুশ্চিন্তা ও মালিন্যের মধ্যে দিয়ে মসৃণ ছন্দে ভেসে চলতে। কখনও মলিন কিম্বা বিধ্বস্ত অথবা অস্নাত দেখায় না তাঁদের। কি এই রহস্য ? কেন ব্যবধান ? প্রাণ-শক্তি-রহস্যের অনুসন্ধান করে পশ্চিমের কয়েকজন ডাক্তার এই সিদ্ধান্তে এসেছেন :

১। এ কথা সত্য, যে কারুর প্রাণশক্তি (এনার্জি) স্বাভাবিকভাবেই অন্যদের চেয়ে বেশি, কারুর বা কম। একটি শরীরের সঙ্গে আরেকটির প্রাকৃতিক তারতম্য নিশ্চয়ই থেকে যায়। কিন্তু, প্রাণশক্তির প্রসার ও বৃদ্ধি অনেকটাই নির্ভর আপনার নিজের ইচ্ছের উপর।

পুষ্টিকর খাদ্য যে প্রাণশক্তি বৃদ্ধির জন্য অত্যন্ত প্রয়োজনীয়, এ কথা বলাবাহুল্য। সবাই জানেন যে, যে সব খাদ্যে প্রোটিন, ভিটামিন ও খনিজ পদার্থ বেশি (অর্থাৎ দুধ, ডিম, মেটে, মাছ, শাক-জাতীয় সবজি ইত্যাদি) সেগুলি শারীরিক এনার্জি বা শক্তি যোগায়। খাদ্যবিদ ডাক্তার পল লা চান্স তিনটি খাদ্যকে সবচেয়ে এনার্জিদায়ক বলে মনে করেন। এগুলি হলো আলু, দুধ ও শুকর-মাংস। যদিও একটি আলুর আশি ভাগ অংশই জল, বাকি কুড়ি ভাগ এনার্জিতে ঠাসা। এতে আছে তিন গ্রাম প্রোটিন, ও তিন রকমের ভিটামিন 'বি'; তাছাড়া ভিটামিন 'সি'-এর অন্যতম শ্রেষ্ঠ উৎস হলো আলু। দ্বিতীয় খাদ্যটি হলো দুধ। শিশু-বৃদ্ধ নির্বিশেষে দৈনিক অন্তত দু কাপ দুধ খাওয়াটা আবশ্যিক। কিন্তু, দুধ হজম করতে যাঁদের অসুবিধে হয়, তাঁদের পক্ষে দুগ্ধজাত কোন খাদ্য (অর্থাৎ ছানা কিম্বা দই) খাওয়াটাই ভালো। দুধে আছে উচ্চ দরের প্রোটিন, ভিটামিন 'বি', ম্যাগনেসিয়াম, জিংক ইত্যাদি। শুকর মাংসে আছে এমন একটি অদৃশ্য চর্বি, যা প্রাণশক্তির জন্য প্রয়োজনীয়। এ প্রসঙ্গে আরেকটি প্রয়োজনীয় পদার্থ উল্লেখযোগ্য। এটি অবশ্য খাদ্য নয়, পানীয়। পানীয় জল ভাবতে আশ্চর্য লাগে যে, মানব শরীরের একশো ভাগের সত্তর ভাগ অংশই জল দিয়ে তৈরি। শরীরের এই জল যখন দু ভাগের বেশি কমে যায়, শরীর হয় দুর্বল। নানান রকম অসুস্থতা দেখা দেয়। যথেষ্ট জল পান করলে শরীর নির্মল, স্বচ্ছন্দ ও ঠান্ডা থাকে আর ভালো খিদে হয়। দিনে অন্তত আট গেলাশ জল অবশ্যই খাবেন।

২। প্রাণশক্তি, অর্থাৎ এনার্জি, শুধুমাত্র শারীরিক অবস্থার উপর নির্ভরশীল নয়। এনার্জির সবচেয়ে বড়ো উৎস হলো মন। শারীরিক নয়, মানসিক ক্লান্তি এনার্জি কেড়ে নেয়।

প্রাণশক্তি বা এনার্জির একটি বিশেষ পরিমাণ আমাদের প্রত্যেকের শরীরে রয়েছে। ব্যায়ামের মাধ্যমে এই শক্তিকে সঠিকভাবে ব্যবহার করতে হয়। একমাত্র তাহলেই আমাদের কোষ ও পেশীগুলি সবল থাকে, ফুসফুস গ্রহণ করতে পারে সবচেয়ে বেশি পরিমাণ অক্সিজেন।

৩। দুর্বল প্রাণশক্তির অন্যতম বড় একটি কারণ হলো বিষাদ। মন খারাপ হলে কিছু ভালো লাগে না। ইচ্ছেই করে না কিছু করতে। সুতরাং চরিত্রগতভাবে যাঁরা বিষণ্ণ, তাঁদের প্রাণশক্তি স্তিমিত হতে বাধ্য। বলেন মনস্তাত্ত্বিক ডঃ জিরন কুস, দুশ্চিন্তা কি আপনার মধ্যে সর্বদা কাজ করে ? কোনো কারণে কি আপনি উদ্বিগ্ন ? ভেবে দেখুন, সেই জন্য হয়তো আপনি অচেতনভাবে বাইরের জগৎ থেকে নিজেকে গুটিয়ে নিয়েছেন, যাতে কোনো কিছুই আপনাকে আপনার সমস্যার কথা মনে না করিয়ে দেয়। এটি কিন্তু ভুল দৃষ্টিভঙ্গী। কারণ শেষ-পর্যন্ত কোনো সমস্যার থেকেই পলায়ন করা যায় না। বদলে, খুঁজুন নতুন কোনো কাজ ও শখ,—অর্থাৎ উৎসাহিত হওয়ার, মনোযোগ দেবার মতন নতুন কিছু।'

বলেন ডাক্তার প্যাট্রিসিয়া মুলার—'অপরাধবোধ কিম্বা দুশ্চিন্তা নিজের মধ্যে চেপে রাখবেন না। কারণ নিজের বিষাদ ও অপরাধ বোধের জটের মধ্যে একা একা লড়াই করতেই ক্ষয় হয় সবচেয়ে বেশি এনার্জি। কিছু আবদ্ধ রাখতেই যদি সমস্ত প্রাণশক্তি খরচ হয়ে যায়, তাহলে গঠনমূলক কাজের জন্য কিছুই বাকি থাকবে না।' ডাক্তার মুলার আমাদের সকলের জানা একটি চিরন্তন সত্যের উপর জোর দিয়ে বলেন যে, 'জীবনে অন্যতম সবচেয়ে জরুরী জিনিসটি অদৃশ্য। বলা বাহুল্য, এটি হলো ভালোবাসা। প্রত্যেক মানুষ চায় অপর একজনের কাছে সবচেয়ে মূল্যবান বিবেচিত হতে। কারুর স্নেহ, কারুর উৎকণ্ঠা, কারুর উষ্ণতা ছাড়া জীবনযুদ্ধ অসহনীয় ঠেকে। বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই দেখা যায় যে, যাঁরা জীবনে ও কাজে সবচেয়ে সার্থক, তাঁদের আছে, মানসিকভাবে নির্ভর করবার মতো অপর কেউ।'

প্রাণশক্তি সঞ্চয় করুন দৈনিক আধ ঘন্টা ধ্যান করে এবং দিনে পাঁচবার আধ মিনিট করে গভীরভাবে নিঃশ্বাস নিয়ে ব্যায়াম করুন। করুন অতিরিক্ত জল পান। সুযোগ পেলে সাঁতার কাটুন। আর খান মাথামতো পুষ্টিকর খাদ্য। হৃদয়ের জানালাটি খোলা রাখুন ভালবাসা, ঈশ্বরবোধ ও প্রকৃতিপ্রেমের জন্য। তবেই না চোখে খেলবে সোনালী ঝিলিক, হৃদয়ে প্রাণের স্পন্দন!

অমৃত পাবলিশার্স প্রাইভেট লিঃ-এর পক্ষে শ্রীসুপ্রিয় সরকার কর্তৃক পত্রিকা প্রেস ১৮, আনন্দ চ্যাটার্জি লেন, কলিকাতা-৩ হইতে মুদ্রিত ও তৎকর্তৃক ১১।১, আনন্দ চ্যাটার্জি লেন, কলিকাতা-৩ হইতে প্রকাশিত।
ইণ্ডিয়ান অ্যাণ্ড ইস্টার্ণ নিউজ পেপার সোসাইটির সদস্য।
মূল্য ৭৫ পয়সা ॥ ত্রিপুরায় অতিরিক্ত বিমান মাশুল ১৫ পয়সা। ভারতের অন্যত্র অতিরিক্ত বিমান মাশুল ২০ পয়সা।

আমরা ওকে ফ্যারেক্স খাওয়াতে শুরু ক'রে ভালই করেছিলাম।

আমাদের ডাক্তার বলেছিলেন: "বাচ্চার কোমল হজমশক্তির দরুন অন্য যে কোনো শক্ত আহারের আগে ওর প্রথমে দরকার ফ্যারেক্স"

ডাক্তাররা বলেন : প্রথমেই ফ্যারেক্স ! কেন ?

৩ মাসে পড়তেই আপনার বাচ্চার শক্ত আহার দরকার, কারণ ওর যেসব পুষ্টিগুণ পাওয়া দরকার শুধু দুধই তা যোগাতে পারে না, আর তাছাড়া, এ সময় থেকে ওর চিবিয়ে খাওয়ার অভ্যাসও গ'ড়ে তোলা দরকার। তবে বাচ্চার হজমশক্তি এখনও খুবই কোমল ব'লে—যে-কোনো শক্ত আহার হ'লেই চলবে না—এমন কি চটকানো-আলুর মত নরম খাবারও নয়। ওর দরকার ফ্যারেক্স-এর মত—বিশেষভাবে তৈরী এক আহার—যা ওর কোমল হজমশক্তির উপযোগী।

অন্য আর কি কি ভাবে ফ্যারেক্স বাচ্চার চাহিদা মেটায় ?

ফ্যারেক্স বাচ্চার বিশেষ বিশেষ চাহিদা মেটায় আরও অনেক ভাবেই। যেমন ধরুন, মস্তিষ্ক আর শরীরের বিকাশের জন্য ফ্যারেক্স সঠিকভাবে মেশানো আর সহজে হজম করার প্রোটিন যোগায়। শক্তির জন্য যোগায় কার্বোহাইড্রেট।

আপনার বাচ্চার জন্মের সময় আপনি ওকে ৩ মাসের মত আয়রণ যুগিয়ে ছিলেন, যা স্বভাবতই বাচ্চা ৩ মাসে পড়তেই নিঃশেষ হয়ে যাবে। আপনার বাচ্চার চাহিদা পুরোপুরি পূরণ করার জন্য এবং ওর রক্ত সুস্থ রাখার জন্য ফ্যারেক্সে আছে পর্যাপ্ত আয়রণ। এ ছাড়াও ফ্যারেক্স যোগায় পর্যাপ্ত ক্যালসিয়াম, ফসফোরাস আর ভিটামিন ডি২ যার দৌলতে বাচ্চার গ'ড়ে ওঠে মজবুত হাড় আর শক্ত দাঁত।

৩ মাসে পড়তেই কেন ?

কারণ, এ সময় থেকেই বাচ্চাকে চিবিয়ে খাওয়া শেখানো দরকার। তা না হলে, পরে আপনি ওকে যে খাবার দেবেন ও হয়ত তা' গিলে খেতে শুরু করবে, তাতে ওর পেটে ব্যথা হবে আর শরীরের পুষ্টিও ভাল হবে না। এখন থেকেই ওকে ফ্যারেক্স খাওয়াতে শুরু করুন আর তাতে পরের দিকে "বড়দের" খাবার আরম্ভ ক'রে নিতে ওর পক্ষে সহজ হবে এবং তা ভালভাবে চিবিয়ে খেতে আর ঠিকমত হজমও করতে পারবে।

কখন থেকে ওকে "বড়দের" খাবার খাওয়াতে শুরু করবেন ?

যখন থেকে ও হেলেদুলে হাঁটতে শুরু করবে। এ সময় থেকেই ও "বড়দের" খাবার গ্রহণ করতে শুরু করবে, যেমন—শাকসব্জি, ডাল, ফল, ডিম। তবে ফ্যারেক্স-এর বিশেষ পুষ্টিগুণ তখনও ওর দরকার। তাই বাচ্চার বয়স ৩ বছর না হওয়া পর্যন্ত একটু কল্পনার সাহায্যে আর আপনার স্নেহ উজাড় ক'রে ওর সমস্ত আহারের সঙ্গেই ফ্যারেক্স মেশান।

Glaxo
FAREX

শিশুদের প্রথম শক্ত আহার-সব দিক থেকে দ্রুত বেড়ে ওঠার জন্য

গ্ল্যাক্সো

লিনটাস-GP.58-2315 BG

অমৃত

১৭ বর্ষ
৩৪ সংখ্যা
২৮ পৌষ
১৩৮৪

13th. Jan. 1978

আগামী সংখ্যায়

প্রচ্ছদ কাহিনী
ছোট পরিবার সুখী পরিবার
লিখেছেন
অমরেন্দ্র চক্রবর্তী এবং অমল আচার্য
আমার কালের কবিতা
লিখেছেন মণীন্দ্র রায়
পরিতোষ সেন লিখিত ও চিত্রিত কাহিনী

অথ বিশ্ববিদ্যালয় কথা

পশ্চিমবঙ্গ মন্ত্রিসভা কলকাতা কল্যাণী বর্ধমান ও উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের সমস্ত নির্বাচিত কমিটি রদ করে দেবার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। এই উদ্দেশ্যে চারটি আলাদা অর্ডিনান্স জারি করার কথাও শোনা গেছে।

শিক্ষামন্ত্রী সরকারী সিদ্ধান্তের কথা বলার সঙ্গে সঙ্গে এটাও জানিয়েছেন যে, এতে বিশ্ববিদ্যালয়গুলির অধিকারের ওপর হস্তক্ষেপ ঘটবে না। প্রত্যেকটি বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্যে নতুন ধরনের এক বিশ্ববিদ্যালয় কাউন্সিল তৈরি করা হবে এবং তারই ওপর থাকবে কাজকর্ম পরিচালনার দায়িত্ব।

স্বীকার করতে হবে ব্যবস্থাটি নতুন। এবং অস্বীকার করা যাবে না যে কোন বিশ্ববিদ্যালয়েরই পরিচালন ব্যবস্থা ত্রুটিহীন ছিল না। কিন্তু এই পদ্ধতির প্রতিক্রিয়া সুফলপ্রসূ হবে কিনা সে বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ রয়েছে।

প্রথমত, এই সিদ্ধান্তের আওতায় কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ও পড়েছে এবং তার সুদীর্ঘ ইতিহাসে এমন ঘটনা কখনোই ঘটে নি। অর্থাৎ পরাধীনতার আমলেও বিশ্ববিদ্যালয়ে যে ধরনের স্বায়ত্তশাসন ছিল, স্বাধীন যুগে তা ক্ষুণ্ণ হবে।

দ্বিতীয়ত, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য সমেত দেশের বহু শিক্ষাবিদই এ ব্যবস্থাকে খোলা মনে গ্রহণ করতে পেরেছেন বলে মনে হচ্ছে না।

তৃতীয়ত এতে ছাত্রদের লেখাপড়ার পথও কতদূর সুগম হবে বোঝা যাচ্ছে না।

বলাই বাহুল্য, বিশ্ববিদ্যালয়ের থাকা বা না থাকার আসল মাপকাঠি হল পড়াশোনার উৎকর্ষ বা অপকর্ষ। শিক্ষার মানই যদি ক্রমাগত নিচের দিকে নেমে যায় তাহলে সেটা সোনা ফেলে আঁচলে গেরোর মত হয়ে যাবে না কি!

প্রচ্ছদের নেপথ্যে : ১৯৩৯ সালে ত্রিপুরায় ধর্মনারায়ণ দাশগুপ্তের জন্ম। শিক্ষাগ্রহণ আগরতলা এবং শান্তিনিকেতনের কলাভবনে। ১৯৬২ তে কলকাতায় ধর্মনারায়ণের একক প্রদর্শনী হয়েছে। কলকাতা শান্তিনিকেতন এবং আগরতলায় হয়েছে যুগ্ম-প্রদর্শনী। হাওড়ার সেন্ট থমাস চার্চ স্কুলের শিক্ষক ধর্মনারায়ণ দাশগুপ্তের ছবি সর্বভারতীয় প্রদর্শনীতেও দেখানো হয়েছে।
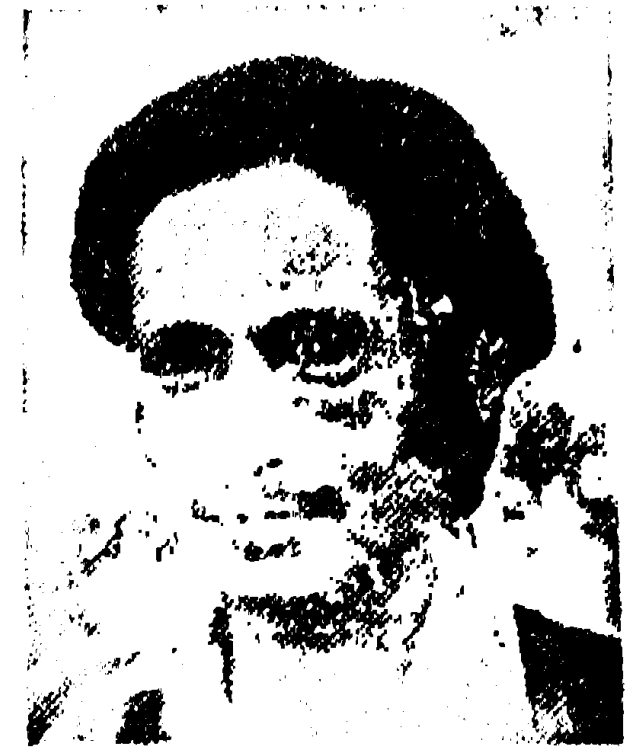
সঙ্গীত সমালোচনার ভাষা

রবিশংকরের সেতারে শেষ ঝংকার যেন গীর্জায় ঘণ্টাধ্বনির মতো বেজে উঠল। নীরব হলো আল্লারাখার মুখর তবলা।.... কোথায় যেন বেজে উঠল বিষাদের একটি সুর। মনে হলো, সারা হৃদয় জুড়ে যেন পুজোর শেষে বিজয়ার বিষণ্ণতা। মনের মণিকোঠায় রয়ে গেল শুধু স্মৃতিটুকু।

দিন যেমন চলে যায় রেখে আরো দিন, তেমন এই সম্মেলনের গায়কবৃন্দের অনেকজন আমাদের জন্যে রেখে গেলেন অনেক উজ্জ্বল সংগীত মুখর মুহূর্ত। স্মৃতি যাকে সযত্নে লালন করবে আগামী বহুদিন....তাঁ গায়কীতে এমন এক আশ্চর্য কল্পনা কুশলতার পরিচয় মেলে যা অচিরেই শ্রুতি ও মনকে মোহিত করে। রাগস্বভাবের সানুভব উদ্ঘাটনে এবং তান ও ছন্দের কারুকৃতি রচনাতেও তাঁর মুন্সীয়ানা অবিসংবাদিত রূপে মনোমুগ্ধকর ...বুঝে নিতে দেরী হলো না যে সাধনালব্ধ অভিজ্ঞতাই তাঁকে এমন সুস্থিরতা দান করেছে...ব্যাকরণকে সওয়ার করেও রাগের নান্দনিক রূপটি সমুজ্জ্বলে রাখা যায় যদি থাকে শিল্পবোধ ও রসবোধ....ধ্যা কোথাও আহত হলো না অথচ স্বরবি পুরিয়ার রূপ ও রঙ কেমন ফো ফোঁটায় নিংড়ে নিলেন। তাঁর তানক আর সরগমের নক্সা রচনা? সেখানেও ক মজা। যারা শুনেছেন তারাও মজে বৈকি....এখানেও তিনি তাঁর স্বমহি সমুজ্জ্বল। আর তবলায়....বাজায় ও জানালেন তাঁদের আসা তখনও সং সতেজ, অথচ সুখশ্রাব্য।

ওপরের এই কটি লাইন একজন সংগীত সমালোচকের। বেরিয়েছে একটি দৈনিকে। বিষয়: বিশিষ্ট কয়েকজন সংগীতজ্ঞের গান ও বাজনা নিয়ে আলোচনা। দৈনিকের দেড়কলম জুড়ে এই আলোচনাটি বেরিয়েছে। এরকম আলোচনা আমরা প্রায়ই দৈনিক ও সাপ্তাহিকে দেখতে পাই। এবং এরকম আলোচনা দেখা মাত্র বিজ্ঞাপন জ্ঞানে পাতা উল্টে যাই। পড়ি না। কারণ কি?

সমালোচক গান বাজনা শুনে যা বুঝেছেন তা প্রকাশের মতো ভাষা তার আয়ত্তে নেই। এমনকি ঐ গান-বাজনা তিনি আদৌ বুঝেছেন কিনা সে সম্পর্কে সন্দেহ জাগে তারই ঐ ওপরের লেখা পড়ে। উচ্ছ্বাস, অর্থহীন আবেগ, অর্থহীন শব্দ ছাড়াও সারা লেখায় আগাগোড়া অশিক্ষা ছড়িয়ে আছে। বরেকটি শব্দই ঐ লেখার মধ্যে ছড়ানো। যেমন তানকর্তব, মনের মণি কোঠায় শুধু স্মৃতিটুকু, দিন যেমন চলে যায় রেখে আরো দিন, অনেক উজ্জ্বল সংগীতমুখর মুহূর্ত, স্মৃতি যাকে সযত্নে লালন করবে, এক আশ্চর্য কল্পনা কুশলতা, রাগ স্বভাবের সানুভব উদ্ঘাটন, ছন্দের কারুকৃতি, মুন্সীয়ানা অবিসংবাদিত রূপে মনোমুগ্ধকর, ব্যাকরণকে সওয়ার করে, রূপ ও রঙ কেমন ফোঁটায় ফোঁটায় নিংড়ে নিলেন, স্বমহিমায় সমুজ্জ্বল—ইত্যাদি ইত্যাদি।

গত বিশ-পঁচিশ বছর ছাপার অক্ষরে ঠিক এই ভাষায়—এই পদ্ধতিতে সংগীত সমালোচনা হয়ে আসছে। যাঁরা গান করেন, যাঁরা বাজান—তাঁরা এই সমালোচনা পড়ে কখনো হাসেন। কখনো বিমর্ষ হন। বিরক্ত হওয়া ভুলে গেছেন।

যাঁরা এই লেখা পড়েন তাঁরা সাধারণত সংগীতের কাছাকাছির লোক। এই অর্থহীন গোলকধাঁধা সদৃশ রচনায় তে তারা ঘোরাফেরা করেন। আমরা পাঠক পাতা উল্টে যাই।

খেলা নিয়ে এরকম লেখা লিখ পাঠক সে কাগজ ছোঁবে না। বছর দুই তি হলো সিনেমা সমালোচনার নামে যে কখ ক্যামেরার পেছনে দাঁড়ায় নি, কখনো মাতৃ ভাষার সাহিত্য পড়ে নি—সে ছায়াছ সম্পর্কে বিশিষ্ট পরিচালকের মানসিক সম্পর্কে পাকা পাকা কথা লিখছে।

এই জাতের সংগীত সমালোচক অ লোক। গান বোঝেন না, ভাষা বোঝেন না। পাঠক ও সংগীতজ্ঞের পক্ষে এই লেখা সমালোচক দুই-ই বিরক্তিকর। এই লে সমেত সমালোচককে আবর্জনের গঙ্গায় ফে দেওয়া দরকার।

বৈকুণ্ঠ পাঠক

কারাগারের অন্তরালে

নকশাল আন্দোলনের সমসাময়িক কালে কারাগারে রাজনৈতিক বন্দীদের ওপর অমানুষিক অত্যাচারের বেশ কয়েকটি কাহিনী আপনার পত্রিকা মারফৎ জানতে পারলাম। এগুলো পড়লে সত্যিই আমাদের মন প্রবলভাবে আলোড়িত হয়। জানি না কারাগারের অন্তরালে সরকারী আদেশ পালনের নামে মানব দেহ ও মানব মনকে নিয়ে যাঁরা এই সব দানবীয় খেলা খেলছেন, তাঁরা নিজেরা কত দূর সুস্থ আছেন বা কতদিন মানসিক সুস্থ থাকবেন। মনো রোগী হয়ে এঁরাও আবার কয়েক বছর পর সমাজের ওপর বোঝা হয়ে বসবেন না তো? তাছাড়া আরও বহু প্রশ্ন ভিড় করে আসে মনে। কারাগারকে ব্যভিচারের কেন্দ্র তাঁরা কেন বানাচ্ছেন, যাঁদের হাতে সমাজের ন্যায় নীতি রক্ষার দায়িত্ব রয়েছে? একটি মেয়েকে কেন ডাকাত ও ওয়াগান ব্রেকারদের সঙ্গে একা একটি লক-আপে সারা রাত বন্ধ করে রাখা হল? শাস্তি দেওয়া কি এর উদ্দেশ্য? কি বর্বর এই শাস্তি, ভাবলে মাথা হেঁট হয়ে যায়। এর চেয়ে ক্ষুধার্ত পশুর মুখে নিরস্ত্র দাসদাসীদের নিক্ষেপ করে যারা মজা দেখত তারাও ঢের বেশী সুস্থ, ঢের বেশী দয়ালু ছিল। প্রতিটি কাহিনী মর্মান্তিক। পড়ার সঙ্গে সঙ্গে পাঠকের মনে রক্ত ক্ষরণ শুরু হয়ে যায়। আর ভাগ্যের কি পরিহাস, তথাকথিত অপরাধীরাই সবটুকু করুণা, স্নেহ লুট করে নিয়ে নেয়।

এই প্রসঙ্গে অন্য যে প্রশ্নটি ম উদিত হয় সেটি একটু জটিল। অন্যান্য উদ্দেশ্যের মধ্যে মানুষের মনের সুকুমা বৃত্তিগুলিকে রক্ষা করা এবং তাদের যথা যথ বিকাশ করা বা বিকাশে সাহায্য কর সাহিত্য এবং সাহিত্য পত্রিকাগুলো উদ্দেশ্য। অতিরিক্ত আঘাতে মানুষে মনের সুকুমার বৃত্তি নষ্ট হয়, অতিরিক্ত নিষ্ঠুরতার কাহিনী বার বার পড়লে ম নিরাসক্ত হয়ে যায়, ভোঁতা হয়ে যায়। সুতরাং বাস্তবতার প্রয়োজনেও এই স নিষ্ঠুরতার কাহিনীগুলি যাতে আগামী কয়েক বছরের সাহিত্যের উপজীব্য না হয়ে ওঠে সেদিকে আপনারা একটু নজর রাখুন

—স্বপ্না রায়, কলকাতা—১৪।

তিনটি গবেষণা গ্রন্থ

অনেকেরই ধরণা ভারত-সোভিয়েৎ মৈত্রী হালের এবং তা মূলত রাজনৈতিক। বইটি পড়লে মনে হয়, ভারত-রুশ মৈত্রীর এক উজ্জ্বল অধ্যায়— উনবিংশ শতাব্দী।

..প্রতিটি অংশেই তিনি বঙ্কিমচন্দ্রের অভিমত সাহসের সঙ্গে আলোচনা করেছেন...শ্রীমদ্ হরিদাস সিদ্ধান্তবাগীশ অন্য দেশে জন্মালে লোকোত্তর প্রতিভার যোগ্য সম্মান ও জাতীয় স্বীকৃতি পেতেন.......

রূপক চক্রবর্তী, অভীক রায়, বাসুদেব দেব-এর মতামত।

কেশব চক্রবর্তী

ভারত-রুশ কথা

বিষয় : ভারত রুশ, এই দুই শক্তিশালী ও সুপ্রাচীন দেশের সাংস্কৃতিক সম্পর্ক নিয়ে দুদেশের গবেষক মহলের তৎপরতা— ইদানিং দুদেশেরই বিদগ্ধ সমাজের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। তবে পলাশীর যুদ্ধ (১৭৫৭) থেকে রুশ বিপ্লব (১৯১৭)-এর কালপরিধির পৃষ্ঠপটে বাংলাসাহিত্যে ও সংবাদপত্রে রুশচর্চা নিয়ে গবেষণা—আর এক নতুন পদক্ষেপ বলতেই হবে।

লেখকের মন্তব্য অতি সংক্ষিপ্ত। তথ্যেরই চিত্র-বৈচিত্র্যে একাল ও সেকালের মুগ্ধগদ্যরীতিতে এবং উপস্থাপনার রমণীয় ভঙ্গিতে বইটি কেবল সুখপাঠ্যই হয়ে ওঠেনি, কোনো কোনো বিষয়ে নতুন করে ভাবারও অবকাশ করে দিয়েছে।

অনুদ্ঘাটিত তথ্যের মধ্যে যেমন, রাধাকান্ত দেবের বিশাল কর্মকাণ্ড 'শব্দ-কল্পদ্রুম' পড়ে রুশিয়ার বুধমণ্ডলীর, রুশিয়ার ইম্পিরিয়াল একাডেমি অব সায়েন্সের সদস্যপদে এবং জার-নামাঙ্কিত স্বর্ণপদক রাধাকান্তকে সম্মানিত করা; 'আমি যদি হইতাম, রুশিয়ার কিছু। টেবিলে বসিতাম খেতে হাতে দিয়ে বিং— বলে গুপ্ত কবি ঈশ্বর গুপ্তের কবি বাসনা, আর ক্রিমিয়ার যুদ্ধে জার পক্ষ নিয়ে কবি ঘোষণা 'রুশিয়ারে জয় করে সাধ্য আছে কার!' অমিত বলবীর্যশালী জার প্রথম নিকোলসের উদ্দেশ্যে, 'রুশিয়ার অধিপতি নৃপচূড়ামণি। রাজার প্রধান বলে [illegible] মানি'—বলে এক বাঙালী কবির বন্দনা পড়ে সত্যিই কৌতুক লাগে। জার আমলের শেষ রাজা দ্বিতীয় নিকোলস, ১৮৯১তে যুবরাজ হিসেবে কলকাতায় বেড়াতে এলে 'জার পুত্রের প্রতি ভারতমাতা' কবিতায় দেশমাতৃকার আক্ষেপোক্তি, 'কি মনে করিয়ে রাজা ভারতভুবনে। কি দিয়ে তুষিব তোরে আছে কিবা ধনরে'—প্রকাশ পেলেও উনিশ শতকের প্রথমার্ধেকার বাঙালীচিত্তের রুশরাজপ্রীতি, উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে, রুশরাজদ্রোহীদের প্রতি সহানুভূতিতে রূপান্তরিত হয়েছিল। কারণ, এ সময়েই, স্বৈরাচারী জারের বিরুদ্ধে রুশদেশে নিহিলিস্ট আন্দোলনের উৎপত্তি ও বিকাশ। বিপ্লবী বাকুনিন, ভেরা জাসুলিচ, ফিলিপাভো ফিগনার প্রভৃতির সাথে রবীন্দ্রনাথ সম্পাদিত ভেরা সেজোলেভার কাহিনী এবং জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর লিখিত বাংলাসাহিত্যে সর্বপ্রথম দুই মার্কসবাদী বিপ্লবী রমণীর কথা পড়ে বিস্ময় না জেগে পারে না।

উনিশ শতকের সত্তর দশকে রুশদেশে নিহিলিস্টদের ভ্রান্ত পথ ধরা পড়ার সাথে সাথে তারা পেয়েছিল দেশের মধ্য থেকে লেনিনকে এবং জার্মান দেশ থেকে কার্ল মার্কসকে। ঠিক এখানেও তেমনি পাওয়া গেল [illegible] গান্ধীজীকে এবং [illegible] ওনিহিলিস্ট মনের নির্মম টলস্টয়কে। [illegible] ও নিহিলিস্ট থেকে [illegible] দিনে ভারতবাসী [illegible] শরণ নিল। [illegible] দেখিয়েছিলেন অবশ্য বিদ্যাসাগর কোন নিহিলিস্টের আন্দোলন-[illegible] ঘটনায় তিনি নীরব। আবার, ভূদেব [illegible] কাহিনী স্কুল-পাঠ্য হিসেবে অমনোনীত করায় তাঁকে সমালোচনা [illegible] হয়েছিল। অথচ এই দুয়ের বিরুদ্ধে : আধুনিক রাশিয়ার রূপকার, কবি, সাহিত্যিক, ভাষাতত্ত্ববিদ— পণ্ডিত সমনসফ-এর জীবনী দেশের মানুষের সামনে তুলে ধরলেন। টলস্টয়কে হরণ করে নেবার পূর্বপ্রস্তুতির কাজটি এইভাবে বিদ্যাসাগরের হাতেই হয়েছিল। এই প্রসঙ্গে লেখকের বিশ্লেষণটি চমৎকার।

দুদেশের সাংস্কৃতিক দূত বিনিময় প্রসঙ্গে বাংলা নাটকের লেবেদেফ, চিত্রশিল্পী সলতুইকভ, শিল্পী ভেরেশ্চাগিন এবং বৌদ্ধ পণ্ডিত মিনায়েভের এ দেশে আগমন, পক্ষান্তরে, ষোড়শ শতাব্দীর বাঙালীর বণিক ভিখুশেখের রুশযাত্রা, উনিশ শতকে নিশিকান্ত চট্টোপাধ্যায়ের সেন্টপিটসবর্গ বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনা ও রুশ অভিজ্ঞতা বর্ণিত হয়েছে। ভারত আগে, সাংস্কৃতিক মৈত্রী প্রচেষ্টায় মিশনারিদের ভূমিকা দেখানো হয়েছে। কলকাতায় প্রথম মিলন, ইংরেজ যুবক গিরিনাল্ডহিবার, আইরিশ পাদ্রী জেমস লং এবং থিওসফি আন্দোলনের জন্মদাত্রী রুশ রমণী মাদাম ব্লাভাটস্কি—এই ত্রয়ীর কর্মকাণ্ড পর্যালোচনাটি আকর্ষণীয়। হিবারই এদেশে প্রথম শোনালেন দুদেশের সমাজশিল্প ভাষা ও সংস্কৃতির আশ্চর্য সাদৃশ্য। হিন্দুধর্ম পুনরুত্থান আন্দোলন পর্বে ব্রাহ্মসমাজ, আর্যসমাজ, স্বামী বিবেকানন্দের সঙ্গে রীতিমতো পাল্লা দিয়ে থিয়সফি মত প্রচারে মাদাম ব্লাভাটস্কির প্রাণান্তকর প্রয়াসের রোমাঞ্চকর ও রহস্যময় অধ্যায়টি সম্ভবত: বইটির সবচেয়ে আকর্ষণীয় পরিচ্ছেদ। তবে পাদ্রী লংই ছিলেন দুদেশের সাংস্কৃতিক মৈত্রীর প্রথম সচেতন প্রয়াসী। নীলদর্পণ নাটকের সাথে এদেশে পাদ্রীর খ্যাতি। পাদ্রীর এতিহ্য অনেকের কাছেই অজ্ঞাত। বাল্যে রুশদেশে ছিলেন। কলকাতা থেকে দু' দুবার রুশদেশে পাড়ি দিয়েছিলেন। এ নিয়ে দুদেশে বিস্তর সন্ধান-সমীক্ষা করেছেন, লিখেছেন,

অনেককে দিয়েও লিখিয়েছেন। পাদ্রীর উৎসাহেই রাজেন্দ্রলাল মিত্র 'রুশিয়া রাজ্যের ইতিহাস' (১৮৫৪), ভূদেব মুখোপাধ্যায়, 'মহামতি পেতরের জীবনবৃত্তান্ত' (১৮৫৪) রচনা করেন। পাদ্রীর প্রত্যক্ষ সাহায্যে শ্রীমধুসূদন চট্টোপাধ্যায়, বাংলা সাহিত্যে সর্বপ্রথম রুশ সাহিত্যের অনুবাদ 'ক্রীলফের নীতিগল্প' (১৮৭০) প্রকাশ করেন। সত্তর দশক থেকেই বাংলা সাহিত্যে রুশ সাহিত্য-চর্চার শুরু এবং পাদ্রী লংই তার প্রবর্তক।

ভারতী পত্রিকাগোষ্ঠী থেকে সবুজপত্র গোষ্ঠীর রুশ সাহিত্যচর্চা, বাংলা সাহিত্যে রুশ সাহিত্যচর্চার প্রথম পর্ব। গগল, পুশকিন, তলস্তয়, দস্তয়েভস্কি, পেটেরচস্কি, টুর্গেনিভ, কেভ, কলোৎসব, মায়কভস্কি, উলস্টয়, শেখভ, আন্দ্রীভ, ভানচেস্কো, এমনকি গর্কির লেখাও রুশ বিপ্লবের আগেই বাংলা সাহিত্যে অনূদিত হয়েছিল। প্রথম পর্বের অনুবাদকেরা হলেন, চণ্ডীচরণ সেন, কামিনী রায়, প্রিয়ংবদা দেবী, সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত, হেমেন্দ্রকুমার রায়, প্রেমাঙ্কুর আতর্থী, আরো অনেকে। সেদিন রুশীয় মহৎ সাহিত্য পরিচয়ের নান্দীকারের ভূমিকা নিয়েছিলেন, রুশ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক নিশিকান্ত চট্টোপাধ্যায়, সুরেশ সমাজপতি, প্রমথ চৌধুরী, অজিত চক্রবর্তী, ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, রাধাকমল মুখোপাধ্যায়, বিনয় সরকার প্রমুখ খ্যাত ও অখ্যাত আরো অনেক ব্যক্তি। অথচ অনেকেরই ধারণা, ভারত-সোবিয়েৎ মৈত্রী হালের এবং তা মূলতঃ রাজনৈতিক। বইটি পড়লে মনে হয়, ভারত-রুশ মৈত্রীর এক উজ্জ্বল অধ্যায়—ঊনবিংশ শতাব্দী।

বইটি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগ থেকে ১৯৭৫ সালে পি এইচ ডি এবং ১৯৭৬ সালে 'নেহরু পুরস্কার' প্রাপ্ত। বইটির প্রতি বাংলার কেবল বিদগ্ধ মহলেরই নয়, সাধারণ পাঠককুলের দৃষ্টি আকর্ষণ করি।

ভারত রুশকথা : বাঙালীর রুশচর্চা: ডঃ কেশব চক্রবর্তী; মণীষা গ্রন্থালয়, ৪।৩বি বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রীট, কলকাতা-১২, মূল্য কুড়ি টাকা।

বঙ্কিমচন্দ্রের কৃষ্ণ চরিত্র

শ্রীকৃষ্ণ এক আশ্চর্য মহান চরিত্র। বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর 'কৃষ্ণচরিত্র' গ্রন্থে এই চরিত্রকে নিপুণভাবে বিশ্লেষণ করেছিলেন। এবং বঙ্কিমচন্দ্রের এই গ্রন্থকে নিজস্ব চিন্তাশক্তি ও মেধার সাহায্যে বিচার করেছেন বীরেন্দ্রচন্দ্র সরকার। বীরেনবাবুর এই গ্রন্থ 'কৃষ্ণচরিত্রের' ওপর এক দীর্ঘ প্রবন্ধ। মোট পঁয়ত্রিশটি অংশে তিনি এই প্রবন্ধকে ভাগ করেছেন। প্রতিটি অংশেই তিনি বঙ্কিমচন্দ্রের অভিমত সাহসের সঙ্গে আলোচনা করেছেন। অনেকক্ষেত্রেই তাঁর সঙ্গে বঙ্কিমচন্দ্রের মতবিরোধ হয়েছে। কোথাও কোথাও বীরেনবাবু বিদ্রোহ ঘোষণা করেছেন। তবে অনস্বীকার্য, তাঁর এই 'বিদ্রোহ যথার্থ প্রমাণের মধ্যে।

পরিশেষে তিনি পাঠককে স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন, কৃষ্ণচরিত্র' সম্পর্কে এই আলোচনা তিনি তাত্ত্বিক দিক থেকে করেছেন। এবং স্বীকার করেছেন, 'কৃষ্ণচরিত্র' গ্রন্থ জাতির কাছে বন্দেমাতরম মন্ত্রের মতো চিরবরণীয় হয়ে থাকবে।

শ্রীকৃষ্ণ সম্পর্কে সাধারণ বাঙালী কিভাবে ? এই প্রসঙ্গে বঙ্কিমচন্দ্র যে কটাক্ষ করেছেন—বীরেনবাবু তাঁর তীব্র সমালোচনা করেছেন। প্রতিটি জাতিই দোষ-গুণে মিশ্রিত। বীরেনবাবুর অভিমত, ইংরেজ কিংবা মার্কিন জাতি অথবা ভারতের অন্য প্রদেশবাসী কেউ স্বজাতির দিকে আঙুল তুলে কোনো দোষ দেখায় না। এই প্রাচীন অপরাধ একমাত্র বাঙালীই করে থাকে। বীরেনবাবুর এই খেদ, তাঁর পাঠকের কাছেও যথেষ্ট যুক্তিসঙ্গত নয়।

যথেষ্ট হোক বীরেনবাবুর এই গ্রন্থটি চিন্তাশীল পাঠকের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করবে, আশা করা যায়।

বঙ্কিমচন্দ্রের কৃষ্ণচরিত্র—আমার দৃষ্টিতে বীরেন্দ্রচন্দ্র সরকার প্রকাশক বীরেন্দ্রচন্দ্র সরকার ৮৯ অশোক রোড গাঙ্গুলীবাগান পোঃ গড়িয়া, ২৪ পরগণা।

হরিদাস সিদ্ধান্তবাগীশ

শ্রীমদ্ হরিদাস সিদ্ধান্ত বাগীশ অন্য দেশে জন্মালে লোকোত্তর প্রতিভার যোগ্য সম্মান ও জাতীয় স্বীকৃতি পেতেন। আমাদের এই অমার্জনীয় ঔদাসীন্যের জবাব হিসেবেও গ্রন্থটি মূল্যবান। বাঙালী মাত্রই আজ যেমন রামমোহন বিদ্যাসাগর বংকিমচন্দ্র রবীন্দ্রনাথের অপরিশোধ্য ঋণ জালে বাঁধা, তেমনি এই নিরহংকার জ্ঞান-তপস্বী পণ্ডিত শিরোমণি শ্রীমদ্ হরিদাস সিদ্ধান্ত বাগীশেরও। প্রতিকূল অবস্থার মধ্যে অবিরাম সংগ্রামে একক প্রচেষ্টায় তিনি যা করে গেছেন একটা জীবন দিয়ে, তা ভাবলে শ্রদ্ধায় ও বিস্ময়ে অভিভূত হতে হয়। প্রায় ৫০ হাজার পৃষ্ঠায় ১৫৯ খণ্ডে লেখা 'মহাভারতমে'র স্বকৃত টীকা, নীলকণ্ঠকৃত প্রাচীন টীকা ও পাঠান্তসহ প্রাঞ্জল ও মূলানুগ অনুবাদ লক্ষ লক্ষ অর্থ ব্যয়ে পণ্ডিত মণ্ডলীর বহু 'সবব্যাপী পরিশ্রমেও যা দুঃসাধ্য, তা তিনি একাই তাঁর জীবন ও মননকে পরিপূর্ণ উৎসর্গ করে রূপায়িত করে গেছেন। সংবাদপত্র-পত্রিকায় ঋষি হরিদাসের সাধনার আশ্চর্য কাহিনীর সেদিন যে আবেগ ও আনন্দের সঞ্চার করেছিল আজ বিস্মৃতিপরায়ণ বাঙালীর কাছে তা ম্লান হয়ে এসেছে। কিন্তু চিরকালীন মহৎ কৃতীর ভাণ্ডারে এই অবদান উজ্জ্বল ও মহামূল্যবান। এই সত্যটিকেও আমাদের কাছে শতবর্ষের আলোয় তুলে ধরেছেন পাঁচুগোপাল ভট্টাচার্য। মহৎ জীবনের দুটি দিক থাকে, একটি তাঁর বাইরের ঘটনাপঞ্জী আকীর্ণ ঐতিহাসিক রূপ; অন্যটি তাঁর অন্ত-র্নিহিত সংগ্রাম-দ্বন্দ্ব, যন্ত্রণা ও সাফল্যের, মনন ও সাধনার গভীর নেপথ্য কাহিনী। লেখক প্রথম রূপটিকে যতটা বিশদ ও বিন্যস্তভাবে ফুটিয়ে তুলতে পেরেছেন ততটা সাফল্য সম্ভবত দেখাতে পারেন নি সিদ্ধান্ত বাগীশের আন্তরজৈবনিক রূপ উদ্ঘাটনে। এ সীমিত অবশ্য যে কোন গবেষক লেখকের পক্ষেই অবশ্যম্ভাবী, কারণ আপাত দৃষ্টিতে ঋষি হরিদাস এক সাধারণ মানুষের জীবন যাপন করেছেন, তিনি যেখানে অসাধারণ ও অবিচল সত্যনিষ্ঠায়, তাঁর নিষের রচনায় বা প্রকাশে তা নিজেই গোপন রেখে গেছেন সযত্ন সতর্কতায়। এখানেও তিনি অসাধারণ।

ভৌগোলিক পটভূমিকা ও ঐতিহাসিক বাতাবরণ ছাড়া কোন মহৎ জীবনের বিশ্লেষণ সম্ভব নয়, কিন্তু লেখক কোটালিপাড়া গ্রাম ও হরিদাসের বংশ-গরিমা বর্ণনায় যতটা জায়গা নিয়েছেন তা পরবর্তী কালের ঘটনাবহুল জীবনালোচনার অনুপাতে অনেক বেশী ও অনেক স্থলে অপ্রাসঙ্গিক। কিন্তু এ কথা অনস্বীকার্য লেখত প্রভূত পরিশ্রম ও নিষ্ঠাভরে বিভিন্ন সূত্র থেকে সংবাদ ও তথ্য আহরণ করেছেন, সেগুলিকে সত্যের নিকষিতে যাচাই করেছেন। লেখকের ভাষা খুব সাবলীল ও শব্দধার্মিভত, অহেতুক বিনয়ের প্রয়োজন আছে বলে [illegible]দের মনে হয় না, লেখক সত্যিই এ কা[illegible]ধিকারী। তাঁর সংস্কৃত জ্ঞান, রসবো[illegible]বোধ পরি-বেশনের বৈজ্ঞানিক রীতি [illegible] পরিশীলিত মন ও রুচির পরিচয় মেলে গ্রন্থটিতে। আরক্ষা কাহিনীর [illegible] উচ্চ পদের দায়িত্ব পালন করেও এই প্রবীণ লেখক যে পরিশ্রম যত্ন ও অনুরাগে এই মহৎ জাতীয় কর্তব্য পালনে অগ্রণীর ভূমিকা নিয়েছেন তার জন্য আবারও তাঁকে সকৃতজ্ঞ সাধুবাদ জানাই। আমরা গ্রন্থটির প্রচার কামনা করি। সমস্ত সংস্কৃতিপরায়ণ বাঙালীর কাছেই এই মহৎ জীবনী আদরনীয় হোক। কয়েকটি দুষ্প্রাপ্য ছবি ও পাণ্ডুলিপির প্রতিলিপি সংযুক্ত হয়ে গ্রন্থটিকে আরও মূল্যবান করে তুলেছে।

শ্রীমদ্ হরিদাস সিদ্ধান্ত বাগীশ স্মরণে। পাঁচুগোপাল ভট্টাচার্য, বিশ্ববাণী প্রকাশনী। কলিকাতা-৯। দাম ছ টাকা।

চিঠিপত্রে মোহিতলাল

১২৯৫ বঙ্গাব্দের ১১ কার্তিক (১৮৮৮ খৃস্টাব্দের ২৬ অকটোবর) নদীয়া জেলার কাঁচড়াপাড়ায় মামার বাড়িতে মোহিত-লালের জন্ম হয়। বাবার নাম নন্দলাল মজুমদার। মোহিতলালের পূর্বপুরুষের একটা শাখা উত্তরপ্রদেশের এলাহাবাদে বসবাস শুরু করেন। এঁরা 'মজুমদার' উপাধি ছেড়ে বংশের পদবী 'সেন' গ্রহণ করেন। কবি দেবেন্দ্রনাথ সেন এই বংশের একজন উত্তরপুরুষ। মোহিতলালের মাতুলবংশের শাখায় কবি ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত জন্মগ্রহণ করেন।

মোহিতলালের ছেলেবেলা এবং স্কুলজীবন কাটে হুগলী জেলার বলাগড় গ্রামে। একেবারে ছেলেবেলায় মায়ের মামারবাড়ি হালিসহরের স্কুলে কিছুদিন লেখাপড়া করেছিলেন। বলাগড় স্কুল থেকে প্রবেশিকা পরীক্ষায় পাশ করার পর মোহিতলাল কলকাতার বিদ্যাসাগর কলেজ থেকে ইংরেজীতে অনার্স নিয়ে বি-এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। নানা কারণে তাঁর আর পড়াশোনা করার সুযোগ ঘটেনি।

১৩১৬ সালের ২৫ বৈশাখ বারাকপুরের রায়সাহেব যোগেন্দ্র-নাথ রায়ের মেয়ে শ্রীমতী তরুলতার সঙ্গে তাঁর বিবাহ হয়।

মোহিতলালের চাকুরীজীবন শুরু রাজস্ব দপ্তরের কানুনগো হিসাবে। পরবর্তী সময়ে তিনি শিক্ষকতার কাজ নেন। প্রথমে ক্যালকাটা স্কুলে (ঐ সময়ে নগেন ভট্টাচার্যের স্কুল নামে পরিচিত ছিল।) এবং পরে মেট্রোপলিটান ইনস্টিটিউশনে যোগ দিয়েছিলেন। চারুচন্দ্র চৌধুরী এবং নীরদ সি. চৌধুরী ছাত্রদের মধ্যে অন্যতম।

১৯২৮ সালে মোহিতলাল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলা ভাষার অধ্যাপক হিসাবে যোগ দেন। ১৯৪৩ সালে কর্মজীবন থেকে অবসর নেওয়ার আগে অকটোবর মাসে দীর্ঘ ছুটি নেন। ঐ সময়ে মোহিতবাবুর বইয়ের অন্যতম প্রকাশক বঙ্গভারতী গ্রন্থালয়ের স্বত্বাধিকারী শ্যামসুন্দর মাহীত তাঁর বাগনানে থাকার ব্যবস্থা করেন। ১৯৪৭ সালে বাগনান ছেড়ে ২৪ পরগণার বরিষায় বসবাস শুরু করেন। ঐ বরিষার বাসা থেকেই ১৯৫২ সালের ২২ জুলাই অসুস্থ মোহিতলালকে প্রেসিডেন্সী জেনারেল হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়। ২৬ জুলাই তিনি চিরবিদায় নেন।

১৯১১ থেকে ১৯৪১ মোটামুটি এই তিরিশ বছর মোহিত-লাল কবিতা রচনা করেছেন। দীর্ঘ তিরিশ বছরের ফল সংগ্রহ করেছেন মাত্র চারটি কাব্যগ্রন্থের 'স্বপন-পসারী' (১৯২১), 'বিস্মরণী' (১৯২৬), 'স্মরগরল' (১৯৩৬), 'হেমন্ত গোধূলি' (১৯৪১)। এরপর 'ছন্দচতুর্দশী' গ্রন্থে তাঁর সনেটগুলি একত্রিত হয়ে প্রকাশিত হয়েছে।

নীলাঙ্গুরীয় প্রসঙ্গে

ঢাকা
৯।১।১৯৪৫

শ্রদ্ধাস্পদেষু,

আপনার পত্র পাইলাম। আপনাকে ইতিপূর্বে পত্র দিবার ইচ্ছা হইয়াছিল—ঠিকানাও আনিয়াছিলাম। কিন্তু অতিরিক্ত ক্লান্ত ও পরিশ্রমে ক্লান্ত থাকায় এবং স্বাস্থ্য বড় খারাপ হওয়ার জন্য এ পর্যন্ত লিখিতে পারি নাই। আপনার মাতৃ-বিয়োগের সংবাদে খুবই দুঃখিত হইয়াছি। আপনি আমার অন্তরের সমবেদনা জানি-বেন।

আপনি 'সাহিত্য বিতান' পাইয়াছেন জানিয়া নিশ্চিন্ত হইলাম। আপনার অনেক বই আমি পাইয়াছি; পাইয়া আনন্দিত হইয়াছি কিন্তু আপনাকে কিছুই দিতে পারি নাই। তাই মনে বড় ক্ষোভ ছিল। সুরেশ দাস (আপনার পাবলিশার) আমার যে বইখানি প্রকাশিত করিয়াছেন, তাহাও এক খণ্ড আপনাকে পাঠাইতে বলিব। জানি না আমার লেখা আপনার কাজে লাগিবে কিনা, তবু আপনাকে দিয়া আমি আনন্দ লাভ করিব।

আপনি 'নীলাঙ্গুরীয়' বইখানিতে প্রাণ ঢালিয়াছেন বলিয়া মনে হয়—লেখার মধ্যেও অতিশয় সূক্ষ্ম ভাব-চিত্র, উচ্চ কল্পনা এবং অনুভূতির গভীরতা আছে। আমি 'প্রবাসী'-তে প্রথম দুই-তিন সংখ্যা পড়িয়া খুবই চমৎকৃত হইয়াছিলাম। মনে হইয়াছিল, একটা খুব বড় জিনিস এবং আপনারও ম্যাগনাম ওপাস হইবে। পরে আর পড়িতে সুযোগ হয় নাই, একে-বারে বইখানিই অতিশয় আগ্রহ ও আনন্দসহকারে পড়িয়া বন্ধুদিগকেও পড়াইয়াছি। আপনি ছোটগল্প লিখিয়া ইতিমধ্যেই একজন শক্তিশালী লেখক-রূপে প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছেন—অন্ততঃ আমি আপনাকে প্রথম শ্রেণীর মধ্যেই ধরি। আপনার বড় উপন্যাস বোধহয় এই প্রথম, তাই ইহা আপনার শক্তির একটা নূতন পরীক্ষা। সে পরীক্ষায় আপনি এক হিসাবে উত্তীর্ণ। তবে, আপনার 'জীবনের অভিজ্ঞতা' বলিয়া যে অনুমান করিয়া-ছিলাম, তাহা ভুল হওয়াই সম্ভব, কেননা আমি ত আপনার জীবনকাহিনী কিছুই জানি না। তবু বইখানিতে চিত্র ও চরিত্রের যে সূক্ষ্ম রেখাঙ্কন ও ভাবের গভীর বাস্তব অনুভূতি আছে, তাহাতে সাহস করিয়া ঐরূপ সিদ্ধান্ত করিয়াছিলাম। এখন তাহা ভুল জানিয়া আরও খুশি হইলাম এই জন্য যে, যদি ঐ উপন্যাসে আপনার নিজের ব্যক্তিগত বাস্তব অনু-ভূতি ও অভিজ্ঞতার কোন ছাপ না থাকে, তবে আপনার কল্পনা শক্তি যে সত্যই অসাধারণ, তাহা বুঝিতে পারিলাম—আপনার স্বপ্ন যে এমন বাস্তব-অনুগামী হইতে পারে ইহা বিস্ময়কর, এজন্য আমি আপনাকে অভিনন্দিত করিতেছি।

এখন আপনার প্রধান প্রশ্নের উত্তর দিব। প্রথমেই আপনার নিজের রচনা সম্বন্ধে আপনার একটি আশ্চর্য ভুল ধারণা দূর করিতে হইবে। বইখানি এখন আমার হাতের কাছে নাই। কিন্তু আমার মনে হইতেছে, উহার একটি প্রিফেস লিখিয়া....পাঠককে কোন এক বিষয়ে সাবধান করিয়া দিয়াছেন যে, উপন্যাসটির বিষয় লঘু নয়—গুরু। উহাতে প্রেম নামক মনোবৃত্তির বিশ্লেষণ আছে। এই বিশ্লেষণের জন্য বাস্তবতার যে বহিরাবরণ উহাতে আছে, তাহাতে উহার ভিতরকার আইডিয়ালিজম কিছুমাত্র ক্ষুণ্ণ হয় নাই। বরং সে বাস্তবের কনট্রাস্ট এ কল্পনার রোমান্স লক্ষণ আরও প্রবল হইয়া উঠিয়াছে। আপনি কি নিজেকে ভুলাইতে চান, না পাঠককে ভুলাইতে চান? আপনি কি সত্যই নিজেই বিশ্বাস করেন যে, 'নীয়াঙ্গুরীয়'-এর মূল সুর বা প্রেরণা রিয়ালিজম? আপনার পুস্তকের প্রধান মন্ত্র প্রেম, তাহার দেবতা নারী আপনি সকল কৃত্রিমতা, সকল আধুনিক বিকৃতির জন্যে নারীর আদিম প্রকৃতি, তাহার শক্তির দীপ্তি ও হৃদয়ের মহিমা আবিষ্কার করিয়াছেন যে, বাস্তবকে আপনি তাহার আধার বা পঠভূমি করিয়াছেন। তাহাতেই তাহা আরও গভীর বর্ণ ধারণ করিয়াছে। ইনসিডেন্ট, সিচুয়েশন, এপিসোড ও সিনস এমন কল্পিত ও রচিত হইয়াছে যে, তাহা ক্রমাগত পাঠকের চিত্তে একটি দিব্যোৎকণ্ঠার কাব্যলোক সৃষ্টি করে—উপন্যাসখানির ভিতর দিয়া আগাগোড়া— সংসাররূপ নিষাদের বাণবিদ্ধ একটি ক্রৌঞ্চ-হৃদয় স্পন্দিত হইতেছে। ইহা যদি কাব্য না হয়, খাঁটি ও চিরন্তন রোমান্স না হয়, তবে সমালোচকমাত্রকেই হার মানিতে হইবে। আপনি আপনার যে যুক্তি দিয়াছেন, তাহাতে ইহাই বুঝিলাম যে, আপনি ঐ উপন্যাসের পরিকল্পনায় ভুল করিয়াছেন; ও বস্তু বাস্তবের ফ্রেমে বাঁধানো যায় না—বাস্তবের একটা ভুল সংকল্প এবং রোমান্সের সত্য কল্পনা এই দুই-এর দোটানাতে পড়িয়া আপনি শেষে কল্পনাকে বাস্তবের দ্বারা ক্ষুণ্ণ করিয়াছেন। আপনার উপন্যাসে দুইটি নায়িকার প্রেমেই গ্র্যান্ড প্যাশন-এর ছায়া রহিয়াছে—নায়কটি তাহার উপযুক্ত হয় নাই; এই জন্যই যে পরিণাম, যে উচ্চাঙ্গের ট্র্যাজেডি উহার পক্ষে একটা কিয়েটিভ নেশেসিটি বা অনিবার্য রস-পরিণাম, তাহা ঘটে নাই। যদি বলেন, উহাই আপনার অভিপ্রায় ছিল এবং নায়ক ঐরূপ হওয়াতে ঐ পরিণাম বাস্তবের দিক দিয়া ঠিক হইয়াছে, তবে বলিব যে আপমি এই উপন্যাসের অধিকাংশ ভাগে যে বস্তুকে প্রাধান্য দিয়া পাঠকের চিত্তে যে রসের পিপাসা উদ্রিক্ত করিয়া-ছেন, সেই উন্মুখ পিপাসাকে তৃপ্ত করিতে পারেন নাই—আর্টিস্ট হিসাবে এতবড় অপরাধ আর হইতে পারে না। আপনি লিখিয়াছেন, এই উপন্যাসের সহিত বাস্তব অভিজ্ঞতার কোন সম্পর্ক নাই—তবে কি ইহা নিছক কল্পনা—কেবল টেকনিকটা বাস্তব? ঐ চরিত্রগুলি বা ঐ ঘটনার কিছুও কি আপনার দেখা নয়—নায়কও কি সম্পূর্ণ কল্পিত? এমন কোন ব্যক্তির পরিচয় কি আপনি কোথাও পান নাই? যদি তাই হয়, তবে কল্পনার উপরে এতটা নির্ভর করিয়া ভাল করেন নাই—উৎকৃষ্ট কল্পনাই দিব্য দৃষ্টি—শ্রেষ্ঠ কবি-প্রতিভা। সে-কল্পনা বাস্তবের শাসন না মানিয়াই বাস্তব অপেক্ষাও সত্য এবং সে-সত্যের পরিচয় পাওয়া যায়—কাহিনীর পরিণাম-নির্দেশে। বাস্তবের টেকনিক হইলেই চলিবে না, দৃষ্টিও বাস্তব দৃষ্টি হওয়া চাই। যাহা আসলে রোমান্স, তাহার টেকনিক যেমনই হোক, তাহার গতি ও পরিণাম স্বধর্মানুযায়ী হইবে—না হইলে সার্থক রসসৃষ্টি হইবে না।

আপনি আমার যে উক্তিটি উদ্ধৃত করিয়া তাহার অর্থ বিশদ করিবার জন্য অনুরোধ করিয়াছেন—তাহা বোধহয় আর করিতে হইবে না—যে-কোন উৎকৃষ্ট রোমান্টিক ট্র্যাজেডি তাহার উদাহরণ। 'মৃত্যুর হাত হইতে মৃতসঞ্জীবনী'—কোন ফিলোসফিক পাওনা নয়—মৃত্যুকে বরণ করিয়া অর্থাৎ চরমতম আত্মোৎসর্গ করিয়া মৃত্যুকে পরাজিত করা, ইহাও শক্তির কথা—ভক্তি[illegible] নয়, অর্থাৎ বৈষ্ণবের আত্মসমর্প[illegible] দ্বারা 'অকূল শান্তি' ও 'বিপুল [illegible]তি' লাভ নয়—বজ্র মাথায় পাতিয়া লইয়া সে বজ্রের আলোকে আত্মাকে মহিমাদীপ্ত করিয়া তোলা।

আজ এই পর্যন্ত। কিন্তু আপনাকে একটা পরামর্শ বন্ধুভাবে দিব—কিছু মনে করিবেন না। আপনি কবি, স্রষ্টা, আর্টিস্ট আপনি সমালোচক নহেন, অতএব সমা-লোচকের সমালোচনা যেটুকু আপনার প্রয়োজন, সেইটুকুই গ্রহণ করিবেন। যাহা অপ্রয়োজনীয়—অর্থাৎ আপনাকে কনভিন্স করে না—তাহার বিরুদ্ধে আপনি কিছু বলিবেন না। তাহা শোভনও নয়। আমার আন্তরিক শ্রদ্ধা প্রীতি গ্রহণ করিবেন। আশা করি কুশলে আছেন।

আপনার
শ্রীমোহিতলাল মজুমদার

করুণানিধানের চিঠি

২৬ আশ্বিন '৫৫
পোঃ—খাগড়া জেলা—মুর্শিদাবাদ

কল্যাণীয়েষু,

ভাই মোহিতলাল, তুমি আমার 'বিজয়া দশমীর' স্নেহাশীর্বাদ ও কোলা-কুলি জানিবে এবং প্রাণাধিক পুত্রকন্যাদের জানাইবে। সকলে মনের সুখে থাক।

শান্তিপুরের বাড়ীতে একা বাস করিতে না পারিয়া খাগড়ায় আমাদের অন্তরঙ্গ সুহৃদ কবিরাজ শ্রীযুক্ত জীবন-কালী রায় মহাশয়ের বাড়ীতে আসিয়া-ছিলাম। এখানে কিছুদিন থাকিয়া পশ্চিম পানে যাত্রা করিব মনস্থ করিয়াছিলাম। এখানে জীবনবাবুর কাছে একমাস থাকিয়া শরীর ও মন স্বাস্থ্যলাভ করিতেছিল। একমাস থাকার পর এখান হইতে রওনা

হইবার দুই দিন পূর্বেই সাইনোজাইটিস রোগে আক্রান্ত হইয়া কিছুদিন শয্যাশায়ী ছিলাম। আজকাল লাঠি লইয়া ১০।১৫ পা চলিতে পারিতেছি। জীবনবাবুর চিকিৎসাধীন ছিলাম। শুধু চিকিৎসা নহে—তাঁহার পরিবারস্থ সকলের আন্তরিক সেবাযত্নই আমাকে এ-যাত্রা রক্ষা করিয়াছে। শ্রীভগবানের এইটুকু অনুগ্রহ যে, তিনি আমাকে এখানে পাঠাইয়া দিয়াছিলেন। অন্যত্র আমি রোগাক্রান্ত হইলে অনাথ আতুরের মতই মৃত্যু হইত। সকলি বিধি-নির্দিষ্ট।

জীবনবাবু যথার্থ বন্ধু। তাঁহার এই অকৃত্রিম প্রীতিলাভে আমি ধন্য। তিনি যাহা করিয়াছেন, আপনার লোকেও সেরূপ করে না। শান্তিপুরে আমাকে দেখিবার মত দরদী কেহ নাই।

তুমি বুদ্ধিমান—আমার নিরুপায় অবস্থা বুঝিতে পারিতেছ। জানি না, আরো কিরূপ দুর্ভাগ্যে কষ্ট পাইতে হইবে। তোমাকে আমার নিদারুণ ব্যাধির সংবাদ দিয়া উৎকণ্ঠিত করি নাই, কারণ তুমি আমায় আন্তরিক ভালবাস।

আমার ঠিকানা :

করুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায়

C/o কবিরাজ জীবনকালী রায়,

বিদ্যারত্ন,

পোঃ খাগড়া, (মুর্শিদাবাদ)।

২৩-৪-৪৮

কলকাতা ৯, মনোহরপুকুর রোড

কেঃ অঃ শ্রীযুক্ত বিষ্ণুপদ চট্টোপাধ্যায়

বি-এল

(কালীঘাট পোস্ট অফিসের

পূর্বদিকে)

পরমকল্যাণীয়েষু,

ভাই মোহিত, পরশু এখানে পৌঁছিয়া উপরে লিখিত ঠিকানায় আছি। তোমাকে দেখিতে ইচ্ছা করে, যদি আসিতে পার বড়ই আনন্দিত হইব। দীর্ঘকাল রোগ-যন্ত্রণায় কষ্ট পাইয়া শরীর ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। এখানে ২।৪ দিন থাকিব, তোমাদের সহিত দেখা করিয়া কোন স্বাস্থ্যকর স্থানে চলিয়া যাইব। আমি বড় দুর্বল হইয়া পড়িয়াছি। চলিতে-ফিরিতে হাঁপ ধরে।

বঙ্গদর্শনে তোমার লিখিত 'সন্ধ্যারবি' পড়িয়া পরিতৃপ্ত হইলাম। আমার ছবি-খানি দেখিয়া আনন্দিত হইলাম, দেখা হইলে বড় খুসি হইব। আমি বাড়ী হইতে বাহির হইতে অক্ষম—অবসরমত আসিবে। আশা করি সপরিবারে কুশলে আছ।

আশীর্বাদক

শ্রীকরুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায়

এ-বৃদ্ধ কবি তোমাদের উপর অনেক ভরসা করে।

শতনরীর (দ্বিতীয় সংস্করণ) শীঘ্রই প্রকাশিত হইবে। বই শীঘ্রই পাইবে। ইতি

আশীর্বাদক—

শ্রীকরুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায়

সমালোচক মোহিতলাল

শ্রীমান আবদুল কাদির

স্নেহাস্পদেষু,

অনেকদিন হইল, তোমার বন্ধু শ্রীমান আজহারউল ইসলামের মারফৎ একসঙ্গে দুইখানি বই উপহার পাইয়াছিলাম এবং পাইয়া খুসী হইয়াছিলাম, কারণ বই দুইখানি ভালো। কিন্তু বড়ই লজ্জার বিষয় যে, এই ভাল-লাগার সংবাদটি আমি এতদিন যথাস্থানে পাঠাইবার অবসর পাই নাই।

তোমার কাব্যখানির কথা পরে বলিতেছি, তৎপূর্বে শ্রীযুক্তা শামসুন নাহারের 'রোকেয়া জীবনী'র কথাই বলি, কারণ 'লেডিস ফার্স্ট' নীতি সর্বত্রই রক্ষা করা কর্তব্য হইলেও, এক্ষেত্রে আরও অধিক কর্তব্য বলিয়া মনে হইয়াছে। 'রোকেয়া জীবনী'র লেখিকা এবং এই জীবনী যাঁহার সেই স্বর্গগতা মহিলা—উভয়েই আমার শ্রদ্ধার পাত্রী হইয়াছেন। বেগম রোকেয়ার যে জীবন-কাহিনী পাঠ করিলাম, তাহা যেমনই বিস্ময়কর, তেমনই আশাপ্রদ। বাংলার মুসলিম সমাজে এখনও যে যুগ চলিতেছে, হিন্দুসমাজের সেই যুগে এক-জন নারীর জীবনে ও চরিত্রে এমন শক্তি ও সাহস, এমন নিষ্ঠা ও সত্য-পিপাসা বিরল ছিল বলিয়া মনে হয়। নারীকে হিন্দু যে শক্তির আধার বলিয়া পূজা করে, নারীচরিত্রে যে একটি সহজ মহিমা ও শুচিতা আছে, যাহা প্রাকৃতিক শক্তির মতই স্বতঃস্ফূর্ত এবং পুরুষের পক্ষে অনেক স্থানেই যাহা সাধনসাপেক্ষ, তাহার প্রমাণ পাই এই মহীয়সী নারীর চরিত্রে। লতা যেমন আপনিই আলোকের দিকে উন্মুখ হইয়া থাকে, যতই বাধা পাক তবুও সেই দিকে তাহার সহজ গতি—এই নারীর জীবনে সত্য ও সুন্দরের প্রতি একটি অনিবার্য প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়। অবশ্য ইহাও লক্ষ্য করিতে হইবে, বাল্য ও বিবাহিত জীবনে তাঁহার সেই প্রাণধর্ম যথেষ্ট অনুকূল আবেষ্টনীর সাহায্য পাইয়াছিল এবং তাঁহার দেহে উৎকৃষ্ট রক্ত প্রবাহিত ছিল। নানা কুসংস্কার, কুপ্রথা এবং অশিক্ষাজনিত মনোভাবের বিরুদ্ধ প্রভাব অতিক্রম করিয়া তাঁহার আত্মা যে স্থানটিতে আরোহণ করিয়াছিল, তাহা যে কত সত্য ও দুরূহ, তাহার এই প্রমাণ পাই যে, আমি বাঙ্গালী হিন্দু, ঠিক যে নীতি ও ধর্মকে প্রাণের মধ্যে গ্রহণ

করিয়াছি, এই বাঙ্গালী মুসলিম দুহিতাও ঠিক তাঁহাকে প্রাণে-প্রাণে অনুভব করিয়াছিলেন—বাঙ্গালী জাতির জাতীয় প্রেরণাই তাঁহাকে পরিচালিত করিয়াছিল। তথাপি আশ্চর্যের বিষয় এই যে, এই প্রেরণা এমন করিয়া একজন নারীকেই আশ্রয় করিয়াছে—বাঙ্গালী মুসলিম সমাজের আত্মা ও বিবেকবুদ্ধি এমনভাবে একটি নারী-প্রতিমারূপে প্রকাশ পাইয়াছে। একালে হিন্দুসমাজেও এমন নারীচরিত্র বিরল। কিন্তু তজ্জন্য হিন্দু আমি কিছুমাত্র লজ্জিত বোধ করিতেছি না, কারণ, বেগম রোকেয়া শুধুই মুসলিম মহিলা নহেন, তাঁহার জীবনবৃত্ত পাঠ করিয়া আমার দৃঢ় বিশ্বাস হইয়াছে যে, তিনি খাঁটি বাঙ্গালীর মেয়ে।

এই 'জীবনী' যিনি রচনা করিয়াছেন, সেই লেখিকাও সামান্যা নহেন। তিনি যে এমনভাবে এই চরিত্রটি গড়িয়া তুলিয়াছেন তাহার কারণ তিনি এই জীবনকে সম্পূর্ণভাবে আপনার মনে ও প্রাণে গ্রহণ করিতে পারিয়াছেন—আমরা যে চিত্রখানি পাইয়াছি তাহার ছায়া আলোকের সুসমা ও বর্ণ-বিন্যাসের পারিপাট্য তাঁহারই ধ্যানকল্পনাময় সহানুভূতির পরিচয় দিতেছে। এমন করিয়া একাত্ম হইতে না পারিলে তিনি 'রোকেয়া জীবনী' রচনা করিতে পারিতেন না। যে আদর্শ ওই জীবনে ও চরিত্রে বিদ্যমান ছিল, সেই আদর্শকে তিনি নিজের অন্তরে চাক্ষুষ করিতে পারিয়াছেন—তাঁহার হৃদয়ও এই এক ছাঁচে গড়া। এই জীবনী রচনায় সেই যে আত্মপরিচয় দিয়াছেন, তাহাও পাঠকের দৃষ্টি এড়াইবে না। আশা করি ওই একটি মহৎ জীবন আরও অনেকের অন্তর্নিহিত মহত্ত্বকে উদ্বুদ্ধ করিবে, বেগম রোকেয়ার ভাব-দেহ বহু সন্তানের জননী হইবে।

এইবার তোমার কাব্যখানির সম্বন্ধে যৎকিঞ্চিৎ বলিব : যৎকিঞ্চিৎ—তার কারণ, আধুনিক বাংলা কাব্য সম্বন্ধে গম্ভীরভাবে কিছু বলিতে যাওয়া আদৌ বুদ্ধি-সঙ্গত নয়। তথাপি বাংলার মুসলিম কবি-গণের মধ্যে যে কাব্যসাধনা ও কাব্যরসের আদর্শ কিছুকাল যাবৎ প্রকট হইয়াছে, তাহাতে আমার যেমন আশা ও আনন্দ হয়, তেমনই আশঙ্কাও আছে। দরিদ্র কাঙাল পিতল কুড়াইয়া পাইলেও তাহাকে সোনা মনে করিয়া উৎফুল্ল হইতে চায়। সাহিত্য-ক্ষেত্রে বাঙ্গালী মুসলমান এখনও দরিদ্র, এ-অবস্থায় কোথাও একটু স্বর্ণাভা প্রকাশ পাইলে আনন্দের আতিশয্য হওয়াই স্বাভাবিক। আমারও আনন্দ অনেকটা সেই কারণেই। বাঙালী মুসলমান যে এতদিন পরে মাতৃভাষায় আপন প্রাণের পিপাসা মিটাইতে অধীর হইয়াছে, তাহাতে আমার যে কত আনন্দ তাহা তোমরা দুই-চারিজন অবশ্য জানো। সেই আনন্দের আবেগে আমিও অতিশয় কঠোর সমালোচনাসূত্রে সেই সকল অর্ধস্ফুট অথচ আবেগবহুল কলকাকলীর বিচার করিতে ইচ্ছুক নই। একটুখানি শক্তি, একটি খাঁটি কবিত্বের লক্ষণ থাকিলেই আমিও চরিতার্থ হই—পণ্ডিত সমালোচককে নিরস্ত করি। কিন্তু ক্রমেই আবহাওয়া দূষিত হইতেছে, সাহিত্যের ক্ষেত্রেও অতিমাত্রায় সাম্প্রদায়িক রাজনীতি প্রবেশ করিতেছে যাহা বাংলা-সাহিত্য—বাংলাভাষায় রচনা, অতএব সমগ্র বাংলাসাহিত্যের অঙ্গীভূত, রসের দিক দিয়া যাহার মাপকাঠি ভিন্ন হইতে পারে না—তাহাকে পৃথক করিয়া গর্ব অনুভব করা ও ভিন্ন মাপকাঠি ব্যবহার করা যেন উত্তরোত্তর বাড়িয়া উঠিতেছে। ইহাই আশঙ্কার কারণ। কেননা বাংলা-ভাষায় যাহা রচিত, তাহা বাংলাসাহিত্য ছাড়া আর কিছুই নহে, এবং সাহিত্যের রসও এক বই দুই নয়। বাঙ্গালী কবি, হিন্দু হোক আর মুসলমানই হোক, স্থান লাভ করিবে একই সোপানপরম্পরায়। খাঁটি সাহিত্য হিসাবে এক আদর্শ বা মাপ-কাঠি হইবে হিন্দুর আর একটি হইবে মুসল-মানের—ইহা যেমন হাস্যকর, তেমনই মিথ্যা। ভাব হিন্দুর মত হোক অথবা মুসলমানের মত হোক তাহাতে কিছুই যায় আসে না, কিন্তু সেই ভাবের কল্পনা-মাহাত্ম্য এবং প্রকাশ-কৌশলই রসবিচারের একমাত্র বিষয়। ভাবটা উপাদান মাত্র—এবং উপাদানের বৈষম্য রসাস্বাদনে বিষমতার উদ্রেক করে না, বরং বৈচিত্র্যবিধান করিয়া রসিকের রসপিপাসা বৃদ্ধি করিয়া থাকে। এই সকল কথা রসিক সমাজেই সকলে স্বীকার করে—বেরসিক বা কালচারহীন সমাজ ইহা বুঝিবে না। এইজন্যই সাহিত্যকে বাঁচিতে ও বৃদ্ধি পাইতে হইলে উদারতর ও বিশালতর সমাজের আশ্রয় অত্যাবশ্যক। একথা বোধহয় কেহই অস্বীকার করিবে না যে, এপর্যন্ত বাংলা-সাহিত্যের সেই সমজদার সমাজ কালচার হিসাবে বহু পরিমাণে অগ্রসর সমাজ হিন্দু। যদি এখনই সমাজ হইতে নবীন মুসলমান বাংলা সাহিত্যিক ও সাহিত্যকে বিচ্ছিন্ন করিয়া লওয়া হয়, তাহা হইলে আমার মত ব্যক্তির আশা ও আকাঙ্খা অনেক পরিমাণে স্তিমিত হইয়া পড়ে।

এই দীর্ঘ ভূমিকার প্রয়োজন ছিল। তোমার কাব্যখানিকে কোন্ মানদণ্ডে বিচার করিব? ইতিমধ্যে প্রায় শুনিতে পাই মুসলিম বাংলার অমুক কবি রবীন্দ্রনাথের সমতুল্য, এমনকি মৌলিকতায় ও বীর্য-বত্তায় তাঁহা অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ। অমুক কবি খাঁটি বাঙ্গালী কবি হিসাবে জীবিত কবিগণের সকলের উপরে। এই দুয়ের একের মধ্যে আছে হয়ত ছন্দ ও ভাষার দামামাধ্বনি এবং ভাবের অতিশয় কাঁচা আবেগ। অপরের কবিতায় আছে বন-বিহঙ্গের কলকাকলীর অনুকরণ। বিংশ শতাব্দী এই যুগে যে আমরা ঊনবিংশ শতাব্দীর য়ুরোপীয় কবিগণের কবি-কীর্তির শতাংশের এক অংশও আমাদের প্রতিভায় আয়ত্ত করিতে পারিলাম না—সেই আমাদের কাব্য-সাহিত্য যেটুকু কালচারের অধিকারী হইয়াছে, যার জন্য আমরা পৃথিবীর রসিকসমাজে একটুকু আসন দাবী করিতে পারি, তাহাকে অস্বীকার করিয়া কাব্যের অতিশয় প্রাকৃত আদর্শকেই যদি উৎকৃষ্ট মনে করিয়া আত্মপ্রসাদ লাভ করি — মধুসূদন, বিহারীলাল, রবীন্দ্রনাথকেও যদি বুঝিবার শক্তি লোপ পায়, তবে এ-সাহিত্যের সূচনাকে প্রাণের সহিত অভিনন্দিত করিলেও, ইহার ভবিষ্যৎ উন্নতি সম্বন্ধে কতটুকু আশান্বিত হইতে পারি? তাই আমি বাংলার মুসলমান কবিসাহিত্যিকদের সম্বন্ধে একটু দুর্বল ও কোমল প্রাণ হইলেও, পাঁচ আনাকেই পনেরো আনা বলিয়া মনে করিতে উৎসুক হইলেও, আমার সেই প্রেমের কারণেই শংকিত হইয়া যাই। সেদিন একটি বিজ্ঞাপনে দেখিলাম লেখা হইয়াছে, রবীন্দ্রনাথের কথা ও কাহিনীর কবিতাগুলি হিন্দুর পক্ষে যেমন, এই কাব্যের কবিতাগুলি মুসলমানের পক্ষে তেমন নয়। পড়িয়া কষ্ট হইল। এ ত' বাঙ্গালীর কথা নয়, বিজ্ঞাপনেও এমন কথা মনে আসিবে কেন? যাহাদের উদ্দেশ্যে এই বিজ্ঞাপন, তাহারা কেমন সাহিত্যরস-রসিক? যদি ইহার অর্থ এমনই হয় যে, রবীন্দ্রনাথের কবিতার বিষয় হিন্দু ইতিহাস ও কিংবদন্তী এবং এই কবিতা-গুলির বিষয় মুসলমান ইতিহাসের, তাহাতেই বা কাব্যরসিকের রসস্বাদনের পার্থক্য ঘটিবে কেন? তবে কি আমি মুসলমান ইতিহাস বা সাহিত্য হইতে বিষয়বস্তু লইয়া যে সকল কবিতা লিখিয়াছি, তাহার রস মুসলমান পাঠক যেমন উপভোগ করিবে, হিন্দু তেমন করিবে না? তোমাদের মহাকবি যিনি তাঁহার কবিতা তো হিন্দুই উপভোগ করিয়াছে সর্বাগ্রে। এই বিজ্ঞাপন-লেখকের মনোভাবই মুসলমান সাহিত্য-সমালোচকের লেখাতেও আমি দেখিয়াছি। ইহা অপেক্ষা শোকাবহ ব্যাপার সাহিত্যের ক্ষেত্রে আর কি হইতে পারে?

এত কথা বলিবার কারণ এই যে, তোমার কবিতায় যে কালচারের লক্ষণ আছে, তাহা আমি এপর্যন্ত আর কোনও মুসলমান কবির লেখায় [illegible] নাই। অতএব যে-কারণে আমি [illegible] কবিতা পছন্দ করি, সেই [illegible] তোমাদের সাহিত্য রসিক সমাজে গ্রাহ্য হইবে না তাহা জানি। তোমার কবিতায় যে সংযত শ্রী এবং ভাবের বা ইমোশান-এর যে পরিপাক আছে, তাহাতে ঝড়ঝঞ্ঝার ঝনৎকার, খুন-লোহুর বীররস 'ব্লাড এন্ড থান্ডার'-এর উত্তেজনাপ্রিয় রসিক সম্প্রদায় পরিতৃপ্ত হইবে না। কিন্তু যাহার কাব্যকে সুগঠিত বাণীবিগ্রহরূপে পাইতে চায়, সংযমিত আবেগের ধীর-গভীর সৌন্দর্যই যাহাদের রসাস্বাদনের অনুকূল, তাহারাই তোমার কবিতার পক্ষপাতী হইবে। আমি তোমার দিলরুবার কবিতাগুলির কথাই বলিতেছি না, সেই সঙ্গে তোমার আরও অনেক পরবর্তী রচনাও স্মরণ করিতেছি। কাব্যের ভাষাই কবিমানসের উৎকর্ষের পরিচায়ক—তোমার ভাষায় সেই উৎকর্ষের পরিচয় আছে — বাংলাভাষায় সংস্কৃতের যে সংস্কৃতি আছে, তাহার ভাবরূপ ও

ধর্মনিরূপ দুই-ই তোমার আয়ত্ত হইয়াছে। অথচ এই সংস্কৃতির জন্য তোমাকে বিশেষভাবে হিন্দু হইতে হয় নাই—ইসলামের ভাব ও ভাবুকতা তোমার কবিতার প্রেরণা যোগাইয়াছে—আরবঃ মোয়াজ্জিন, কাফেলা-ই-মোয়াজ্জমের তোমার ঐ ভাষায় কিছুমাত্র মহিমাভ্রষ্ট হয় নাই। ইহাতে প্রমাণ হয় যে, বাংলাভাষায় যে শক্তি জন্মিয়াছে, তাহাতে সত্যসুন্দরের সুমার্জিত শ্রী সম্ভব হইয়াছে, তাহাতে সর্ববিধ উৎকৃষ্ট ভাব ও ভাবনা সে আত্মসাৎ করিতে পারে—অর্থাৎ আমরা বর্তমানে আমাদের ভাষাকে এমন পূর্ণাঙ্গ করিয়া তুলিতে পারিয়াছি যে, বাঙ্গালী হইয়াই এবং বাঙ্গালী থাকিয়াই আমরা পৃথিবীর সকল কালচারের মর্মমধু আহরণ ও আস্বাদন করিতে পারি কিন্তু ঐ মর্মমধু কথাটির উপরে জোর দিতে হইবে—কালচার বলিতে খাঁটি বস্তু বুঝায়, তাহা ঐ মর্মমধুকেই হজম করিতে পারে—চর্মবল্কলরসকে নহে। তোমার লেখায় ভাষার সেই কালচার-লক্ষণ আছে, তুমি বাংলাভাষার রসরূপকে গ্রাহ্য করিয়াছ।

তোমার কবিতার সৃষ্টিশক্তির প্রাচুর্য হয়ত নাই, কল্পকুসুমের অজস্রতা নাই; কিন্তু তোমার শ্লোক-মঞ্জরীর সুরভিশ্বাসে মাদকতা আছে, ছন্দের হিল্লোলে ও শব্দের পত্রকরচনায় ইন্দ্রজালের চমক আছে, ভাবপ্রকাশে বৈদগ্ধ্য আছে। এই যে কারুশিল্পের প্রতি অনুরাগ—ইহা উৎকৃষ্ট কবি-প্রতিভার শ্রেষ্ঠ বা একমাত্র লক্ষণ নয়, এমনকি বিপরীত লক্ষণও হইতে পারে। কিন্তু তোমার কবিতার এই লক্ষণ আমাকে এই কারণে আশ্বস্ত করিয়াছে যে উহা কবির শিল্পীমনের পরিচয়—তাহাও একটি বিশিষ্ট কালচারের লক্ষণ। যে যুগে কবিপ্রেরণা প্রায় লোপ পাইতে বসিয়াছে—অতিশয় নিম্নস্তরের রিপু এবং অসুস্থ মনোবৃত্তির রস-উপাধির দাবী করিতেছে, সে যুগে নদীস্রোত বা ঝড়ঝঞ্ঝার মত প্রাকৃতিক শক্তির দোহাই দিয়া স্বভাব-কবি হইবার বাসনা ত্যাগ করাই নিরাপদ, ধমনী বা হৃদপিণ্ডকে বিশ্বাস না করিয়া একটু মস্তিষ্কের সাধনা বা আরাধনাই শ্রেয়স্কর, কাঁচা ভাবকে প্রশ্রয় না দিয়া ভাবের রূপ-চর্চাই অধিকতর কল্যাণকর, তাহাতে আত্মার আত্মস্থ হইবার উপায় আছে। আমার মনে হয় এই রূপচর্চাতে সত্যকার মুক্তি আছে—আত্মাভিমান হইতে নিষ্কৃতি পাওয়া যায়। কাব্যসৃষ্টির মূলে নিছক ভাবের আবেগ না থাকাই ভাল তাহাও একরূপ প্রকৃতি-পারবশ্য। যে

free Creative activity to Mathew Arnold "highest function of man" বলিয়াছেন—এবং 'It is proved to be so by man's finding in it his true happiness".

আমরা মতে তাহার মূলে খুব বড় অনাসক্তি আছে। উৎকৃষ্ট আর্ট এইরূপ অনাসক্তি বা চিত্তজয়ের সাধনা। কালচার বলিতেও আসলে যাহা বুঝায় তাহাও এই ধরনের জ্ঞানলিপ্সার ও প্রেমের অবিরোধ ঘটিলে প্রাণের যে উদার অনাসক্তি জন্মে তাহাই কালচার বা উৎকৃষ্ট রস-সম্বোধি। কবির সৌন্দর্যবোধ যখন কাঁচা জীবন-চেতনা-মূলক ভাবগুলিকে পরিপাক করিয়া শব্দে ও ছন্দে রূপকে অপরূপ করিয়া তোলে তখনই বুঝিতে পারি, কবির প্রতিভা যে স্তরের হউক, তাঁহার চিত্তে সেই কালচারের স্পর্শ ঘটিয়াছে তিনি রসব্রহ্মের কৃপা লাভ করিয়াছেন। বড় কবি হইতে না পারিলেও, যদি এইটুকুও কাহারও কবিতায় লক্ষ-গোচর হয় তবে তিনিও সৌভাগ্যবান। ভাবের অজস্রতা ও প্রাবল্য, উদ্দাম ঘূর্ণি-বাত্যার গগন-হুঙ্কার, চোখধাঁধানো বজ্র-বিদ্যুৎ—এ সকল একপ্রকার শক্তির লক্ষণ বটে, কিন্তু আধুনিক মানুষের রস-চৈতন্যের অনুকূল নহে। কেবলমাত্র গর্জন ও বর্ষণ, উচ্ছ্বাস ও প্লাবন উৎকৃষ্ট কবি-প্রতিভার বিচারক নয়। এই জন্য বায়রণের মত কবিকেও ম্যাথু আরনল্ড বড় কবি বলিয়া স্বীকার করেন নাই। কারণ, তাঁহার মতে:

'he had not the equipment of a supreme modern poet' and but for sheer force of genius he was but an ordinary Nineteenth Centuray. English gentleman' will little Culture and no ideas."

বায়রন সম্বন্ধে ম্যাথু আর্নল্ডের এই উক্তি যতই তাঁহার ব্যক্তিগত আদর্শের অনুযায়ী হউক—ইহার মধ্যে অনেকখানি সত্য আছে। আজ কয়জন বায়রনের কবিতা পড়িয়া তৃপ্তি লাভ করে? আমি নিজের কথা বলিতে পারি—বায়রনের কবিতার চেয়ে আমি ঐ ম্যাথু আর্নল্ডের কবিতাই অনেক বেশি পছন্দ করি। কিন্তু বায়রনের কালচার যতই কম থাকুক, তিনি আমাদের কবিদের মত অশিক্ষিত ছিলেন না, এবং প্রতিভার সিয়ার ফোর্স-এর সঙ্গে আমাদের এক মধুসূদনেরই তুলনা হয়। এই বায়রন এককালে য়ুরোপের রসিকসমাজে সর্বশ্রেষ্ঠ ইংরাজ কবি বলিয়া আদৃত হইয়াছিলেন—এবং গেটের মত কবি-মনীষিও তাঁহার প্রতিভাকে স্বীকার করিয়াছিলেন। কেবল-মাত্র প্রবল ইমোশন বা ভাবাবেগ এতবড় প্রতিভার জোরেও চিরন্তনের দরবারে স্থান পাইল না—ইহার তুলনায় আমাদের ভাবাবেগ-সম্বল কবিরা কত নীচে! অতএব আজও যদি আমরা অপরিপক্ব ও অজ্ঞতা-সুলভ হৃদয়াবেগের কবিতাকে শ্রেষ্ঠ কবিতা বলিয়া ভোটের জোরে কেল্লাফতে করিতে পারি, তাহাতে সাহিত্যিক সংস্কৃতির ক্ষেত্রে আমরা উন্নতি লাভ না করিয়া অধোগতি লাভ করিব। এই জন্যই আমি তোমার কবিতার প্রসঙ্গে এত কথা না বলিয়া পারিলাম না। বিদ্যা পাণ্ডিত্য বা সূক্ষ্ম মানস-ক্রিয়াকেই আমি কাব্যরসের প্রধান উপায় বা উপকরণ বলিতেছি না, কবিকে পণ্ডিত হইতে হইবেই এমন কথাও বলি না; কিন্তু সে কালচার বা মানসিক সংযম ও উদার সুষমা-বোধ সাধারণ মানুষের শিক্ষাদীক্ষা ও সাধনসাপেক্ষ হইলেও দৈবীপ্রতিভার সহজ সম্পদ এবং সেই সহজ সম্পদও শিক্ষামূলক সাধনার দ্বারা বৃদ্ধি পাইয়া থাকে—সেই কালচার সকল উৎকৃষ্ট কবির কল্পনায় সংযুক্ত হইয়া থাকে—না থাকিলে তাহা প্রকৃত রসিকের রস-পিপাসা মিটাইতে পারে না। পথবাহী জনতার শোভাযাত্রায় যে ধরনের বাদ্যভাণ্ড উত্তেজিত ও উচ্চকিত করে, কবির বীণায় তাহা বাজিয়া উঠিতে চাহিলে তন্ত্রীগুলি আর টিঁকিয়া থাকে না। আজকাল আর রসিকের রসচক্র নাই—জনতার শোভাযাত্রাই সকল রসের পরখ-প্রণালী হইয়াছে—সুর নয় চীৎকার, এবং ভাব নয় কলশব্দই এখন কাব্যেরও রস-প্রমাণ হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

তোমার কাব্যখানিতে সুর এবং ভাব দুইই আছে। সর্বপ্রথম গানটিতে ভাব ও সুরের সংযম নৈপুণ্যে আবেগের অকৃত্রিমতাই আরও ফুটিয়া উঠিয়াছে। রূপরস বিহ্বলতাও তোমার কবিতার একটি বিশিষ্ট লক্ষণ—এই লক্ষণ তোমার অনেক কবিতাতেই আছে—এবং এই রূপরস-বিহ্বলতার জন্য তোমার ভাষায় ও ছন্দস্পন্দনে একটি অবোধ-মধুর আকূতি—রসাবেশের প্রগাঢ়গুঞ্জন জাগিয়া উঠে। তোমার অন্যত্র প্রকাশিত 'সুন্দরী চন্দ্র' কবিতাটি এই জন্যই আমার খুব ভাল লাগিয়াছিল। তথাপি আরও সংযমের অবকাশ আছে—সুন্দর বর্ণ-বিন্যাস ও ধ্বনিসুষমাকেই অনেকে বিশুদ্ধ কাব্যরসের উৎস বলিয়া মনে করিলেও

(magic of words—musical pattern of words which gives delight)

এবং আমি নিজে তাহা কতকটা স্বীকার করিলেও, একথা তোমাকে স্মরণ করাইতে বলি যে, চৈতন্য একেবারে লোপ না করিয়াও রসাস্বাদন করানো যায় মিউজিক্যাল প্যাটার্ন অফ ওয়ার্ডস' এ যে রসসৃষ্টি হয় তাহার মূলে অবশ্যই ঐ রূপ শব্দবিন্যাসের সজ্ঞান চাতুরী বা কারিগরি নয়, তাহার মূলে আছে কবির প্রাণের 'এস্টেট অফ র‍্যাপচার' নতুবা পাঠকের মনেও সেই রসবিহ্বলতা সংক্রামিত হইতে পারিত না। তোমার কবিতার এই রূপ বর্ণবিন্যাস ও ছন্দহিল্লোল অনেক স্থলেই তোমার কবি-হৃদয়ের সেই ভাবাবস্থার সাক্ষ্য দেয় তবু সর্বত্র তাহার প্রমাণ সুলভ নহে।

এই জমাই—এ স্টেট অফ র‍্যাপচার-এর উপরে সম্পূর্ণ নির্ভর করিও না, চৈতন্যকে একটু জাগ্রত রাখিতে চেষ্টা করিও। তোমার 'হজরত মোহম্মদ—আবির্ভাব' যেমন এক কারণে গোড়া হইতে শেষ পর্যন্ত একটি স্টেট অফ র‍্যাপচার-এর দ্যোতনা করে, তেমনই অন্য কারণে তাহাতে ভাব-প্রকাশে ও ছিন্ন রচনায় অসংযম আছে, তাহাতেও তাহার অনেক ক্ষতি করিয়াছে; কবিতাটি আর একটু গাঢ় ও বর্ণবাহুল্য-বর্জিত হইলে আরও উপাদেয় হইতে পারিত। তোমার কবিতায় যে লক্ষণগুলির কথা বলিয়াছি, তাহা সামান্য লক্ষণ নহে—উহাই যদি রক্ষা করিতে ও নিয়োগ করিয়া তুলিতে পারো, তবেই তোমার কাব্যসাধনা সার্থক হইবে। আমি তোমাকে আমার আন্তরিক অভিনন্দন ও শুভ কামনা জানাইতেছি। ইতি—

শুভাকাঙ্ক্ষী
শ্রীমোহিতলাল মজুমদার

জীবনকালী রায়ের চিঠি

পোঃ খাগড়া,
জেলা মুর্শিদাবাদ, বেঙ্গল।
৮।১০।৪২

আয়ুর্বেদাচার্য
কবিরাজ শ্রীজীবনকালী রায় বৈদ্যরত্ন

প্রিয়বরেষু,—

আপনার পত্র যথাসময়ে পাইয়াছি। মোহিনীবাবু এখানে ছিলেন না বলিয়া আপনার পত্রের উত্তর দিতে দেরী হইল। তাঁহার স্কুল শিক্ষা বেশী নয় বলিয়া জানাইতে ইচ্ছুক নন। তাঁহার সংক্ষিপ্ত পরিচয়—

কবি শ্রীযুক্ত মোহিনীমোহন চট্টোপাধ্যায়ের আদি নিবাস নবদ্বীপ। তিনি তত্রত্য প্রসিদ্ধ নৈয়ায়িক কৃষ্ণজীবন ন্যায়ালঙ্কারের অধস্তন চতুর্থ পুরুষ। তাঁহার পিতামহ খাগড়ায় বসবাস স্থাপনা করেন। পিতা ও পিতামহ খ্যাতনামা ব্যবহারজীবী।

কবি এই জেলার কাগ্রামে মাতুলালয়ে ১২৮৮ সালের মাঘ মাসে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি বাল্যকাল হইতে সাহিত্যচর্চা করিতেছেন। এক্ষণে বৈষ্ণব সাহিত্যই তাঁহার প্রধান অবলম্বন। তাঁহার ১খানি মহাকাব্য 'চন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত 'উপকথা-পত্রিকায়' প্রকাশিত হয়। মুদ্রিত কাব্য ১ বনফুল ২য় গীতিগৌরাঙ্গরঙ্গম (৩) পদ্যকাব্য—গৌরচন্দ্রে সপ্তপ্রে।

স্বর্গীয় কুমুদ লাহিড়ীর সহিত আমার বিশেষ পরিচয় ছিল কিন্তু আমি তাঁহার ফৈজাবাদে বাস ছাড়া আর কিছু জানি না। এখানে তাঁহার আরও দুজন অন্তরঙ্গ বন্ধু আছেন, আমি তাঁহাদের সঙ্গে দেখা করিতে পারি নাই, সুবিধামত জানিতে পারিলে জানাইব।

আমার ও পত্নীর স্বাস্থ্য বিশেষভাবে ক্ষুণ্ণ হইয়াছে, বাঁচিয়া আছি মাত্র। সম্প্রতি বড় ছেলে শঙ্কর প্রবল ম্যালেরিয়া জ্বরে কাতর, সে জন্যই কুমুদবাবুর পরিচয় জানিতে সময় পাইলাম না।

আপনার কথা সর্বদা মনে হয়। জীবনে একবার আপনার ও করুণাবাবুর সাক্ষাৎ পাইলে বড়ই তৃপ্তি পাইতাম, হয়ত তাহা হইবে না।

পূজার ছুটীতে কোথায় থাকিবেন। কলিকাতা বা দেশে থাকিলে ঠিকানা জানাইবেন। পূজার পর একবার কলিকাতা যাবার ইচ্ছা আছে।

আমার প্রীতি সম্ভাষণ ও নমস্কার গ্রহণ করিবেন। আপনার ও পারিবারিক কুশল মধ্যে ২ জানাইলে সুখী হইব। ইতি—

আপনার গুণমুগ্ধ
শ্রীজীবনকালী রায়

শ্রীশ্রীকালী শরণং

খাগড়া
২৭।৩।৫২

প্রিয়বরেষু,—

মোহিতবাবু! ফাল্গুন মাসে আপনার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া ফিরিবার পরে নিজে ও স্ত্রী-পুত্র সকলের অসুখ জন্য বিব্রত আছি—লেখাটি নকল করিয়া পাঠাইতে পারি নাই। পরিশুদ্ধভাবে লিখিয়া পাঠান আমার পক্ষে সম্ভবপর হইবে না, যে ভাবে আছে, তাহাই আগামীকল্য পাঠাইব।

এর মধ্যে করুণাবাবু ২খানি পত্রে লেখাটি আপনার নিকট পাঠাইবার জন্য এবং আপনি দেখিয়া দিলে শনিবারের চিঠিতে প্রকাশ জন্য তাঁহার হাতে দিবার জন্য লিখিয়াছেন। তাঁহার শেষ পত্রখানি আজ পাইলাম। লিখেছেন—'আপনার লেখাটি শ্রীমান মোহিতের হাত হইতে ফিরিয়া আসিলে, আমার পাঠাইলে তখন শ্রীমান সজনীকান্তের হাতে দিব।' আমার জীবনীতে (শনিবারের চিঠিতে প্রকাশিত অংশ) যে ভুলটি ঘটিয়াছে তাহা আপনি সংশোধন করিয়া দিবেন।'

তাঁহার পত্রের উত্তর দিলাম—

'বন্ধু, আপনার অভিপ্রায়ের বিরুদ্ধে যাওয়া আমার পক্ষে সু-কঠিন। আমার লেখার মধ্যে সজনীকান্তর ও শনিচক্রের কথা আছে ও থাকিবে। সজনীবাবুর প্রশংসাই করিয়াছি, তবুও তাঁহার আমার প্রতি ব্যবহার সম্বন্ধে সামান্য একটু শ্লেষাত্মক বাক্য আছে; শনিচক্রেরও আমি প্রাণ খুলিয়া প্রশংসা করিতে পারি নাই—নিন্দাও নয়। এগুলি বাদ দেওয়া চলিবে না বা সত্য গোপন করাও উচিত হইবে না। এই চিন্তা করিয়া আমার লেখার মুখবন্ধ ও আরম্ভ ও সজনীকান্তর বিষয়ে যাহা লিখিয়াছি—কিছু কিছু তুলিয়া ৮।১০ দিন পূর্বে তাঁহাকে এক দীর্ঘ পত্র লিখিয়াছিলাম তিনি সে পত্রের প্রাপ্তি স্বীকার করেন নাই।

২য় কথা—কবি যতীন সেনগুপ্ত লেখাটির প্রশংসা করিয়াছেন। বলিলেন—মোহিতলালকে যেভাবে ফুটিয়েছেন, বড় সুন্দর হয়েছে।' আপনি ভিন্ন আর কেহ পারিত না। মোহিতবাবুর সহিত আপনার বন্ধুত্বের পরিমাপও ইহাতে আছে। তিনিও বলেন মোহিতলালের এতকথা শনিবারের চিঠিতে এখন আর ছাপিবে না।'

(যতীনবাবু যেরূপ কঠোর মন্তব্য করেন, তাহাতে আমি যথেষ্ট আশান্বিত হইয়া তাঁহাকে শুনাইলে তিনি লেখাটির ভাষা প্রকাশভঙ্গীর প্রশংসা করেছেন, উত্তম-পুরুষের কথা পীড়াদায়ক হয় নাই, তাহাতেও ....কৌশল হইয়াছে, মধ্যে আয়ুর্ব্বেদের বিষয় থাকায় বৈচিত্র্যও আছে; অনেক কথা সেদিন বলেছিলেন এই বলার মধ্যে কৃত্রিমতা ছিল না বলিয়া মনে হয়।)

৩য় কথা—মণীশ ঘটক লেখাটির উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করে, ...পত্রিকার জন্য চাহে। তিনি বলেন প্রতি সংখ্যার জন্য আপনি ২০ টাকা করিয়া পাইবেন—লেখা বড় অনেকগুলি টাকা পাইবেন। আমি তাঁহাকে বলিয়াছি—যাঁদের জন্য লেখা তাঁহারা শুনিয়াছেন। আমার কাজ শেষ হইয়াছে। এখন যদি করুণাবাবু ও মোহিত-বাবু ইচ্ছা করেন তবে তাঁহাদের অভিপ্রায় অনুযায়ী প্রকাশ হইবে।

৪র্থ কথা—মোহিতলাল একখানি পত্রিকা বাহির করিতেছেন। সেদিন একটু ইঙ্গিত করেছিলেন তবুও আপনি শনিবারের চিঠির কথা বলেছেন তজ্জন্য বলিবেন শনি-বারের চিঠিতে বাহির হইলে পাঠক পাবেন বেশী, তবে সর্ত্ত রাখিবেন আপনার বিনানুমতিতে একটি শব্দও কাটিতে না পারে।

মোহিতলালকে লেখাটি কাল পাঠাব, যদি মোহিতলাল নিজের কাগজে দেয় তবে বোধ হয় সেটাই ভাল সম্মুখে কন্যাদায় তবুও আমি মণীশের টাকার প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করিয়াছি। সজনী যদি পত্রের উত্তর না দেয় কিংবা তাহার বা শনিচক্রের বিরুদ্ধ যদি

সে ছাপিতে না পারে তবে মোহিতলালকে দেওয়াই ভাল নয় কি? আমার এ বিশ্বাস আছে নিজের কাগজে না হলেও আপনার অভিপ্রায় মত শনিবারের পত্রে দিলেও মোহিতবাবু আপত্তি করিবেন না। এ বিষয়ে সজনীবাবুর মত জানিয়া আমাকে লিখিবেন।'

করুণাবাবু কি বলেন পরে জানাইব, তবে শনিবারের পত্রে আমি ছাপিব না, করুণাবাবুর মনটা বুঝাইতে হইবে।' বড় কাটাকাটি ও ভুল আছে।। কাল প্রথম পর্ব কিংবা দুইটাই পাঠাইব, পৃথক পাতায় শনি-চক্র সজনীবাবু অশোকবাবু ও সুনীতিবাবুর বিষয় লিখিয়াছি, উহার নকল রাখিলাম না আপনি কাটিয়া কুটিয়া দিলে তখন ঠিক করিয়া দিব। কাজীর বিষয়ে যাহা লিখিয়াছি এখন পাঠাব না. উহা নোট করা মত আছে, ভাল করিয়া লিখিতে হইবে।

আপনার গদ্যকাব্য সম্বন্ধে আর প্রবন্ধ লইয়াও কিছু বলিবার ইচ্ছা আছে। এগুলি আপনাকে না জানাইয়া লেখা হইবে না। আমি ৫।৭ দিন মধ্যে পল্লীভবনে যাইব। তৎপূর্ব্বে আপনার কুশল সংবাদ পাইলে সুখী হইব।

বাড়ির কাহার শরীর ভাল নাই। প্রীতি সম্ভাষণ জানিবেন। ইতি—

আপনার গুণমুগ্ধ
শ্রীজীবনকালী রায়

সুনীতিকুমারের চিঠি

Suniti Kumar Chatterj, M.A.
(Calcutta), D. Lit. (London),
F.R.A.S.B., Khaira Professor
of Indian Linguistics and
Phonetics, and Head of the
Department of Comparative
Philology,
Asutosh Building,
The University,
Calcutta.
Date, 14, January, 1943

শ্রীযুক্ত মোহিতলাল মজুমদার সমীপেষু।
প্রিয় বরেষু,

মোহিতবাবু, আজ প্রাতে আপনার 'কাব্য মঞ্জুষা' পাইলাম। ইতিপূর্ব্বে আপনার 'সাহিত্য বিতান' (কয়েক সপ্তাহ হইল) পাইয়াছি। প্রথম পুস্তকখানির প্রাপ্তি স্বীকারে—সকৃতজ্ঞ প্রাপ্তি স্বীকারে—দেরী হইয়া গেল, আলস্যের জন্য, ক্ষমা করিবেন। 'সাহিত্য বিতান'-এর লেখাগুলার অধিকাংশই আমাদের পূর্ব্ব পরিচিত—'শনিবারের চিঠি'র কল্যাণে এগুলি আমাদের প্রিয়বস্তু হইয়া দাঁড়াইয়াছে। আমি নিজে কবি নই, সুতরাং আপনার কবিত্ব শক্তির আলোচনা করিবার ধৃষ্টতা আমার নাই—ভাষাতত্ত্বের অনুশীলনকারীর কাছে আপনি কাব্য জগতে একজন মহান ব্যক্তি রূপেই আমার সমক্ষে বিদ্যমান কিন্তু সাহিত্যরসিক হিসাবে সাহিত্য আলোচনায় আপনি আমাদের চোখ ফুটাইয়া দিয়াছেন। আমি সেজন্য আপনাকে আমার সাহিত্যবোধ বিষয়ে অন্যতম গুরু বলিয়া মনে করি। আধুনিক বাঙলা সাহিত্য জগতে আপনার ন্যায় সমঝদার অন্তর্মুখ সমালোচক আর কাহাকেও দেখি না। আপনার সাহিত্য রসাস্বাদ ও উহার পরিবেশন আধুনিক বাঙ্গালা সাহিত্যের (এবং ভারতীয় সাহিত্যের) গর্বের বস্তু। আপনার 'সাহিত্য-কথা'-ও আমার কাছে অতি আদরের জিনিস (দুঃখের বিষয়, কোনও বিস্মৃতনামা বন্ধু পড়িবার জন্য লইয়া গিয়া বইখানি আর ফেরত দেন নাই।)—এই দুইখানি বই এ বিষয়ে 'এক যাত্রী'। সূক্ষ্ম সাহিত্য বিচারের সঙ্গে অতি চমৎকার প্রাঞ্জল সাধু বাঙ্গালা ভাষার এমন সমাবেশ দেখা যায় না। আপনি এইভাবে সাহিত্য সৌন্দর্য্য বিষয়ে আমাদের চক্ষু সার্থকতা করিতে সহায়তা করিয়াছেন। নীরস ভাষাতত্ত্ব বইতে আপনাকে কি দিতে পারি? আমার 'বাঙ্গালা ব্যাকরণ' . বড় বই ম্যাট্রিকের পাঠ্য।—'আপকী সেবামে' পহুঁছে নাই বোধ হয়, সেখানির দ্বিতীয় সংস্করণ বাহির হইয়াছে। পাঠাইয়া দিব কি 'ভাষাতত্ত্বের ভূমিকা' আর অন্য দুই একখানি বই—'জাতি সাহিত্য ও সংস্কৃতি' পাইয়াছেন কি জানি না—এগুলি আগামী সপ্তাহের মধ্যেই পাঠাইয়া দিতেছি। আজ বৃহস্পতিবার কাশী যাইতেছি, ফিরিব আগামী মঙ্গলবার কিংবা বুধবার—ফিরিয়াই এগুলি পাঠাইবো। 'কাব্যমঞ্জুষা' দেখিলাম, ফিরিয়া আসিয়া ভাল করিয়া দেখিব—আপনার ছন্দ সম্বন্ধে মন্তব্য ভাল করিয়া পড়িব—ছাত্রদের জন্য যে টীকা টিপ্পনী দিয়াছেন সেগুলি চমৎকার লাগিতেছে—এমনভাবে কবিতার ছন্দ পরিচয়, রস বিশ্লেষণ ও শব্দানুশীলন আর কোথাও আমাদের মাতৃ ভাষায় দেখি নাই। 'কবি পরিচয়' অংশটিও বিশেষ সুন্দর হইয়াছে—প্রমথ চৌধুরী মহাশয়ের ভাষায় 'মোদ্দা কথাটি' ধরা হইয়াছে, সংক্ষেপে বিশেষ সমগ্রতার সঙ্গে আলোচ্য কবিদের বৈশিষ্ট্য নির্দেশ করিয়া দেওয়া হইয়াছে। যাঁহারা বাঙ্গালা কবিতা পড়ান, আপনার 'কবিতা পাঠ' তাঁহাদিগকে একটা দিগ্‌দর্শন করাইবে।

আপনি দ্বিজ বা দ্বিতীয় চণ্ডীদাসকে একরকম স্বীকার করিয়া লইয়াছেন—খ্রীষ্টীয় ১৬-র শতকের মানুষ বলিয়া—ইহা শ্রীযুক্ত হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়ের ও আমার কাছে বিশেষ আত্মপ্রসাদের কথা। আপনার স্বাস্থ্য সম্বন্ধে পাঠ করিয়া বিশেষ চিন্তিত হইলাম। আপনি সম্পূর্ণ নিরাময় হউন ইহাই আন্তরিক কামনা। আমার প্রীতি শ্রদ্ধাপূর্ণ নমস্কার।

ইতি আপনার
শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়

কুমুদরঞ্জনের চিঠি

কোগ্রাম ১৮।৬।৫৩

ভাই মোহিতলাল,

তোমার চিঠি পেলাম তার আগেই তোমাকে শ্রীশ্রীবিজয়ার ভালবাসা জানিয়ে চিঠি দিয়েছি বোধহয় পেয়েছ। বনতুলসী আমি এখনো পাই নাই—পাইলে পড়িব। তোমার সম্বন্ধে আমার যে ধারণা হইয়াছে যে ছবি আমার মনে পড়িয়াছে তাহারি একটি রেখাচিত্র দিবার চেষ্টা করেছি।' তোমার গুণ তোমার নিজের কাজে আসে নাই বরং ক্ষতিই করিয়াছে। তুমি যদি সাধারণের মত হইতে যথেষ্ট অধিক সম্মান অর্থ ও সৌভাগ্য অর্জন করিতে পারিতে। তুমি যে সব কটু অপ্রিয় কথা বল তাহা তোমার সত্যানুরাগ ও দেশানুরাগের অভিব্যক্তি। উহাতে কপটতার লেশ নাই ইহা দেখিয়াই মুগ্ধ হই—দেখে ভুলিয়া যাই। তবে আমার ধারণা তোমার লিখার ও যোগ্যতার প্রতিভার মর্যাদা তুমি পাইবে—এখনও পাও নাই।

শ্রীভগবানের কৃপায় তুমি পূর্ণ স্বাস্থ্য লাভ কর, দীর্ঘ কর্মময় কীর্তিময় জীবন লাভ কর—সপরিবারে সুখে শান্তিতে থাকো।

ইতি—
শুভাকাঙ্ক্ষী
শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক

শ্রীহরি শরণং

কোগ্রাম
২৫।৬।৫৯

কল্যাণবরেষু,

ভাই মোহিতলাল, তোমাকে শ্রীশ্রী বিজয়ার আশীর্বাদ পূর্বে পাঠাইয়াছি বোধহয় পাইয়াছ। কবিতাটি আমি যেভাবে লিখিয়াছি তাহা বোধহয় পরিস্ফুট করিতে পারি নাই। গভর্ণমেণ্ট যেসব গুণীকে দশ হাজার পাঁচ হাজার টাকা পুরস্কার বা প্রণামী দিতেছেন তাহারা কেহই তোমার সমকক্ষও নন। তোমার আবেগ তোমাকে কালিদাস বহু্যার জানাইয়াছে এবং তুমি নিজের লেখনীর উপর নির্ভর করিয়া সব কর কোনো অভাব নাই তাহা জানি কিন্তু দেশের কর্তব্য তোমার মত লোককে যথোচিতভাবে রাখা তোমার যে আয় তাহা যথেষ্ট নহে। তোমাকে যেন যাহা দিবে তাহা পাওনা দিবে ভিক্ষা নহে। তোমার লেখনী যাহা দিয়াছে তাহার জন্য দেশবাসীর

বড় একটা বৃত্তি দেওয়া উচিত। কালিদাসের সঙ্গে এই বিষয় লইয়াই আমার মতভেদ, কালিদাস ঠিক তোমার ভিউ পয়েন্টই আমাকে জানাইয়াছিল, কিন্তু আমি যাহা চাই তাহা তোমার ন্যায্য প্রাপ্য বা তোমার প্রতিভার রিকগনাইজেশন, তোমার অনমনীয়তা ও তেজস্বিতা কি আমি জানি না? তুমি হেমবাবু, বা অন্য কাহারো মত সাহায্যের প্রার্থী নহ বা পাত্র নয় তাহা কে না জানে? কিন্তু তুমি থাকিবে কলিকাতায় নিজের বাড়িতে, নিজের গাড়ীতে—তোমার অপেক্ষা কম দরের প্রতিভাও যাহা পাইয়াছে। আমি আমার ভাবটা পরিস্ফুট করিতে পারি নাই, অজ্ঞাতে তোমাকে ব্যথা দিয়াছি তজ্জন্য লজ্জিত ও দুঃখিত, তবে আমার যাহা বক্তব্য তাহা বন্ধু সুধাংশুকেই জানাইয়াছি। আমার লিখা ভাবটি অন্যরূপ হইয়া গিয়াছে।

যাহা হউক ও কবিতা কোথাও ছাপিতে দিব না এবং আলোচনা করিব না। শ্রীভগবান তোমার মনোবাঞ্ছা সকল রকমে পূর্ণ করুন। ইতি—

শুভাকাংখী
শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক

শ্রীহরি শরণং

কোগ্রাম
৯।৫।৫৮

ভাই মোহিতলাল,

তোমার শরীর অসুস্থ জানিয়া বড়ই চিন্তিত হইলাম। শ্রীশ্রীমা মঙ্গলচণ্ডী মাতার নির্মাল্য পাঠাইলাম তুমি মাথায় ধারণ করিবে। সব অসুখ সারিয়া যাইবে, মনেও যথেষ্ট বল পাইবে। কোন ভাবনাই নাই।

দেশ জাতির জন্য বিশেষতঃ বাঙলা বাঙালী ও তাহার ভাষার জন্য তুমি যে কত গভীরভাবে চিন্তা কর তাহা আমি অনুভব করি। ওরকমভাবে তন্ময় হইয়া চিন্তা করা সাধারণের চক্ষে পাগলামি অধিকাংশ লোকে লোক দেখাইয়া জাতি ও দেশকে ভালবাসে প্রতিষ্ঠা লাভের জন্য তাহাতে আন্তরিকতা অতি কম, ব্যবসা হিসাবে তাহা বেশ লাভজনক কিন্তু তোমার ঠিক বিপরীত। তোমার এ ভালবাসায় নিজের ক্ষতি ছাড়া লাভ নাই, তাহা খ্যাতি ও আয়ের প্রতিকূল। তুমি যথোচিত সম্মান পাও নাই, প্রতিভার মূল্য পাও নাই ঐ দোষ বা গুণের জন্যই। যদি তুমি একটু ব্যবসাদার হইতে তাহা হইলে তুমি এতদিন একজন ধনী হইতে পারিতে। সরকার দত্ত সাহায্য ও সম্মান পাইতে। ডি লিট হইতে অনেক কিছুই হইত।

আমি কয়েকজন মন্ত্রী ও প্রভাবশালী লোকের কাছে তোমার কথা তুলিয়াছি তাঁহারা তোমার প্রতিভার মূল্য না বোঝেন তাহা নহে কিন্তু সময়ের অপেক্ষা করিতেছেন। তৃতীয় শ্রেণীর লোক এখন প্রথম শ্রেণীর মর্যাদা পাইতেছে এবং তাহারা প্রথম শ্রেণীকে দাবাইয়া রাখিতে চায়: তাহাদের দল, তাহাদের আশ্রিত, তাহাদের স্তাবক আজকাল প্রচণ্ডশালী-সাহিত্য ক্ষেত্রেও।

তোমার মর্যাদা বুঝিবার জন্য একটু বিদ্যাবুদ্ধি ও অনুভূতির দরকার। বড় প্রতিভাকে হিংসা করে অনেকে কাজেই ন্যায্য প্রাপ্য তাঁরা পান না।

'বঙ্গদর্শনের' ন্যায় কাগজ এ বাজারে চলিল না লোকে এখন চতুর্থ শ্রেণীর উপন্যাসই পড়ে, অধঃপতন চরমে উপস্থিত হইয়াছে। আমি সামান্য লোক, দেখি এবং চুপ করিয়া থাকি, অনেক ক্ষেত্রে প্রতিবাদও করি না, কারণ তাহাতে কোন ফল হইবে না। কেবল বন্ধু বিচ্ছেদ হইবে মাত্র।

যে সব পিগমি তোমার সমকক্ষ নিজদিগকে ভাবে তাদের ক্ষুদ্রতা এবং অভেদ্য অজ্ঞতা দেখিয়া অবাক হই, তাহারা কি লেখে নিজে জানে না। আমাদের সঙ্গে এক সহপাঠী ছিল, সে পরীক্ষা দিয়াই বলিত প্রথম বিভাগে তো যাইবই সে বিষয়ে সন্দেহ বিন্দুমাত্র নাই কিন্তু পরীক্ষায় সকল বিষয়েই শোচনীয়ভাবে অনুত্তীর্ণ হইত। কি লিখিত তাহারি জ্ঞান ছিল না। তোমার প্রতিদ্বন্দ্বীগণের অনেকের অবস্থাই সেইরূপ।

দিন আমি তোমার কথা কই, দিন ভাবি, ভগবানের কাছে তোমার সর্বাঙ্গীন মঙ্গল প্রার্থনা করি। তুমি ভাবিবে না। লেখা বন্ধ করিবে না—একটা কাগজে নিয়মিত তোমার লেখা প্রকাশ হওয়া দরকার, বহু লোকেই পড়িতে চায়, আমি তো চাই-ই। মধ্যে মধ্যে তুমি কুশল সংবাদ দিবে। আমার নিজের শরীর ভাল যাইতেছে না।

শুভাকাংখী
শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক

শ্রীহরি শরণং

কোগ্রাম
১৫।৬।৫৪

কল্যাণবরেষু,

তোমার 'বাঙলা ও বাঙালী' পড়িয়া খুব আনন্দিত হইলাম। আমাকে অনুগ্রহ করিয়া বইখানি পাঠানোর জন্য বহু ধন্যবাদ দিতেছি। বইখানি পড়িয়া যাহা মনে হইয়াছে একটি কবিতাতে তাহা লিখিয়া পাঠাইলাম।

শ্রীভগবান তোমাকে দীর্ঘজীবী করুন, তোমার সমস্ত বাধাবিঘ্ন ঘুচাইয়া তোমাকে জয়ী ও সুখী করিবেন। তুমি আমার একখানি কবিতা সংগ্রহ করিলে বলিয়াছিলে, অবকাশ হইবে কি? ইউ এন ধর-ও ছাপিতে চায়। অবসর মত লিখিবে, তাহার ব্যবস্থা করিবার চেষ্টা করিব। যদি অন্য পাবলিশার লন তাহাও ভাল। মধ্যে মধ্যে তোমার কুশল দিবে।

আঃ
শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক

কবিতা প্রসঙ্গ

৩০।১ বিডন রো
২৮-১০-২৯

প্রিয়বরেষু,

তোমার চিঠির বহর ও রকম সকম দেখে বোঝা যাচ্ছে যে কিরূপ কুড়েমিতে দিন কাটাচ্ছ। আমি যে কুড়েমি ছাড়া অন্যকিছু আশ্রয় করেছি তা নয়, তবে আড্ডাতে অনেক সময় যায় বলে ফুরসৎও বড় একটা নেই। কবিতা আর লিখতে পারি নি তবে পুরোন খাতাটার রিভিশন শেষ করেছি। এইবার মনস্থির করেছি যে জিনিসটা ছাপান যেতে পারে। শনিমণ্ডলী এ প্রস্তাব সমর্থন করেছে—আনএনিমাসলি সনেটের দুর্ভিক্ষে এই কয়টি কবিতা গ্রহণীয় হতে পারে।'

কবিতা লিখিনি বটে, তবে কবিতার যাহারা আশ্রয় স্বরূপ তাঁহাদের একজনের সঙ্গে সম্প্রতি কলিকাতায় হঠাৎ দেখা হয়ে গেল। হৃদয়বিদারক ট্র্যাজেডি—দেখা যাক শেষ পর্যন্ত কি দাঁড়ায়। কিন্তু কবিতা লেখাটা মাটি হয়ে গেল!

তোমার যে কাব্যলক্ষ্মী কিছুদিন অন্তর্ধান হয়েছেন, তা বেশ বোঝা যাচ্ছে, কারণ 'বিচিত্রা' থেকে 'শান্তি' ও 'স্বদেশী বাজার' পর্যন্ত যে ছয়খানি কাগজে তোমার কবিতা বাজারে বাহির হয়েছেন তা মোটেই আশাপ্রদ বোধ হয় না। সকলে আমায় গালাগালি দিচ্ছে, যে তোমাকে ঢাকায় লইয়া গিয়া মাটি করে দিয়েছি। তবে 'লণ্ঠন ঠনঠন' কবিতাটা না ছাপাইলে ভালো হত। আমরা মনে করেছি যে শনিবারের চিঠিতে (সংবাদসাহিত্যে) জাল মোহিতলালের কবিতা বলিয়া এবার কিছু নমুনা উঠাইয়া বাঙালী পাঠকদিগকে সাবধান করে দিব যে এগুলি সত্য মোহিতলালের কবিতা বলে যে কেহই গ্রহণ না করেন

৮ই নভেম্বর নাগাদ যাত্রা করছি; তবে বোধ হয় এ যাত্রা একা নয়। কারণ গৃহিণী কলিকাতার আমোদ উৎসবের প্রলোভন ত্যাগ করবেন কি না সে বিষয়ে এখনো মনস্থির করতে পারেন নি। ১৫শে তারিখ নাগাদ ঢাকায় পৌঁছিব।

শনিবারের চিঠির জন্য একটা সিরিয়াস প্রবন্ধ পাঠাইও—পরপাঠ মাত্র। অক্ষয় বড়াল সম্বন্ধে তোমার যে একটা লেখা ছিল সেটা শুধরে পাঠাতে পারবে কি?

আশা করি সমস্ত খবর ভাল।

তোমার
সুশীল

সজনীবাবু প্রসঙ্গ

পি এন্ড বিল্ডিংস
নিকলসন রোড, দিল্লি
সেপ্টেম্বর ২৯, ১৯৫১

শ্রদ্ধাস্পদেষু,

মাস্টারমশায়, আপনার চিঠি আমি ১৭ই তারিখ পাইয়াছিলাম। বই-এর খবর

দিয়া উত্তর দিব এই ইচ্ছা থাকাতে এতদিন পরে প্রাপ্তি স্বীকার করিতেছি।

বইখানা ৭ই সেপ্টেম্বর বিলাতে বাহির হইয়াছে এবং প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই 'অবজার্ভার' ও সানডে টাইমসে রিভিউ হইয়াছে। অবজার্ভারে রিভিউ করিয়াছেন হ্যারল্ড নিকলসন ও সানডে টাইমসে রেমণ্ড মর্টিমার। দুজনেই উচ্চ প্রশংসা করিয়াছেন। বিলাতে এবং এখানে সকলেই বলিতেছেন এরূপভাবে রিভিউ হওয়া খুব উল্লেখযোগ্য ব্যাপার। অন্য রিভিউও শীঘ্রই বাহির হইবে। বই এখনও আসিয়া আমার হাতে পৌঁছে নাই—পৌঁছামাত্র আপনাকে পাঠাইব। আপনার মতামতের জন্য বিশেষ আগ্রহান্বিত আছি।

সজনীবাবু সম্বন্ধে আপনি যাহা লিখিয়াছেন তাহা অত্যন্ত দুঃখের ব্যাপার। এই অপ্রীতিকর প্রসঙ্গ....চিরকালের মত শেষ করিয়া দিব। আপনি যে লিখিয়াছেন আমি সজনীবাবুর কথা ১৯৪২ সনের পর জানি না উহা ঠিক নয়, আমি তাঁহার বৈষয়িক প্রভাব প্রতিপত্তির কথা খুবই জানি। গেলবার তিনি আমার বাড়িতে (এখানে দিল্লীতে) আসিয়াছিলেন। আমার বক্তব্য এই যে— ভারতবর্ষের সর্বত্রই ইংরেজ রাজত্ব অবসানের ফলে অ্যাডভেঞ্চারের আবির্ভাব হইয়াছে—সজনীবাবু হয়ত এই এক অ্যাডভেঞ্চারের একজন, ইহাতে গৌরব বা বিশেষত্ব কি ? সজনীবাবুর তুলনায় অশিক্ষিত, সজনীবাবুর তুলনায় বুদ্ধিহীন, সজনীবাবুর তুলনায় অসৎ হাজার হাজার লোক এখন সজনীবাবুর অপেক্ষা অনেক উচ্চস্থান অধিকার করিয়া আছে। আমাদের বাংলা গভর্ণমেন্টের কথাই ধরুন। উঁহাদের কাহারও ইতিহাস ত অজানা নয়, সুতরাং সজনীবাবুকে তাঁহারা খাতির করিবে ইহা আশ্চর্য নয়, অস্বাভাবিকও নয়। এসব কথা ভাবিয়া দুঃখ করিয়া লাভ নাই। এখন এক নিজের ধর্ম নিজে বজায় রাখা ভিন্ন গত্যন্তর নাই।

আপনি প্রথম কিস্তি সম্বন্ধে যাহা লিখিয়াছেন তাহা পড়িয়া খুব আমোদ পাইলাম। শ্লোকটির লেখক কি সুশীলবাবু ? শুনিলাম তিনিও সজনীবাবুর সহিত সহযোগিতা করিতে না পারিয়া সাহিত্য পরিষদ ছাড়িয়াছেন। তিনি এখন কলিকাতায় আছেন কিনা এবং আপনার সহিত দেখা হয় কিনা জানি না ? যদি হয়, আমার বইখানা পড়িয়া দেখিতে বলিবেন।

আপনার নতুন বই বোধহয় এখন প্রকাশিত হয় নাই। বিজ্ঞাপন দেখিলাম।

আজ আর বিশেষ কিছু লিখিবার নাই। বই আসিলে আবার লিখিব। ইতি—

আপনার
নীরদ

কালীদাস রায়ের চিঠি

টালিগঞ্জ
জুলাই—৩৩

সুহৃদ্বরেষু,

বহুদিন পত্রাদি দেওয়া হয় নাই। শরীর বেশ ভাল থাকে না—আবার বাতের বেদনা অনুভব করিতেছি।

শ্রীকান্ত এতদিন পড়িতেছিলাম—ইহাতে যথেষ্ট জ্ঞানবৃদ্ধি হইল। চমৎকার।

তারাচরণের বই আমার কাছে রহিয়াছে।

ব্রজেন বাঁড়ুজ্জে এবার রবীন্দ্র প্রাইজ পেলেন আর পেলেন শুনছি কোন এক কালীপদ ঘটক নভেলের জন্য।

আপনার মাসিক কি সত্বর বাহির হইবে ?

কুমুদরঞ্জনেরও ম্যালিগনেন্ট ম্যালেরিয়া হইয়াছিল—আমার রোগবিষ তাহার বাড়ি হইতেই আহৃত বেশ যুঝা যাইতেছে। জীবনদাদা আসিয়াছিলেন তাঁহার জীবন-স্মৃতি শুনাইলেন। অনেক তথ্যই আছে। যতীনের অনুপূর্বার দ্বিতীয় সংস্করণ বাহির হইবে।

গত সোমবার তারাশঙ্কর ও সজনীর অনুষ্ঠিত সংস্কৃতি সম্মেলনে গিয়াছিলাম। সভার উদ্বোধন করিলেন জওহরলাল নেহরু।

তারাশঙ্কর আপার হাউসে-এ সদস্য মনোনীত হইয়াছে গভর্ণরের দ্বারা।

আশা করি কুশলে আছেন। ইতি—

আপনার
শ্রীকালিদাস রায়

যতীন্দ্রমোহন বাগচী

বাগচী এস্টেট,
খাগড়া,
মুর্শিদাবাদ।
৮।১০।৪২

ভাই মোহিতলাল,

*কুমুদনাথ লাহিড়ীর পুত্র শ্রীমান ভোলানাথ কাল এখানে আসিয়াছিলেন। তাঁহার দ্বারা তাঁহার পিতৃদেবের একটু সংক্ষিপ্ত পরিচয় লিখাইয়া পাঠাইয়াছি; সম্ভবত এই সঙ্গেই পাইবে। আজি তাঁহার উহা তোমার নামে পাঠাইবার কথা।

শ্রীযুক্ত মোহিনীমোহন বাবুও কাল রাত্রে ও আজ সকালে এখানে আসিয়াছিলেন। তিনিও তাঁহার পুস্তক ও স্বীয় সংক্ষিপ্ত পরিচয় এই সঙ্গে তোমার নামে পাঠাইতেছেন। মিত্রের পত্র পূর্বেই পাইয়া থাকিবে। সুতরাং তোমার যাহা প্রয়োজনীয় তাহার আর কিছু বাকী থাকিল না। তোমার অনুরোধ রক্ষা করিতে পারিয়াছি বলিয়া আনন্দলাভ করিতেছি।

অভিপ্রায় মত আমার একটুখানি সংক্ষিপ্ত পরিচয়ও এই সঙ্গে পাঠাইলাম। আবশ্যক মত কাটিয়া ছাঁটিয়া লইবে। ভাষাও ঠিক করিয়া লইবে।

নদীয়া জেলার যমশেরপুরের সম্ভ্রান্ত বাগচী পরিবারে সন ১২৮৩ সালের অগ্রহায়ণ মাসে যতীন্দ্রমোহন বাগচীর জন্ম। বাল্যকাল হইতেই ইঁহার বঙ্গ সাহিত্যের প্রতি অতি গভীর অনুরাগ। পাঠলিপ্সা তাঁহার এতই প্রবল ছিল যে, যখন যে পুস্তক হাতের কাছে পাইতেন, তাহাই পাঠ করিতেন। এই অভ্যাসের ফলে ১৪।১৫ বৎসরের মধ্যেই কৃত্তিবাসী রামায়ণ কাশীদাসী মহাভারত প্রভৃতি বঙ্গ ভাষার বহু শ্রেষ্ঠ গ্রন্থের পাঠ শেষ করিয়াছিলেন। বিদ্যালয়ের ছাত্রাবস্থা হইতেই বঙ্কিমচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথের রচনা তাঁহাকে অত্যধিক আকৃষ্ট করে এবং তিনি রবীন্দ্রনাথের আদর্শে কাব্য রচনা আরম্ভ করেন। এণ্ট্রান্স পরীক্ষা পাশ করার পর হইতেই তাঁহার রচনা সুবিখ্যাত 'সাহিত্য' ও 'ভারতী' পত্রিকায় প্রকাশিত হইতে থাকে। তিনি যখন হেয়ার স্কুলের পঞ্চম শ্রেণীর ছাত্র, তখন বিদ্যাসাগর মহাশয়ের মৃত্যু অবলম্বনে তাঁহার প্রথম কবিতা মুদ্রিত হয়। ১৩০২ সালে বি, এ পাশ করেন।

যতীন্দ্রমোহন বিখ্যাত 'মানসী' পত্রিকার ৫ বৎসর ও 'যমুনার' ৫ বৎসর অন্যতম সম্পাদক ছিলেন। ইঁহার লিখিত নানা পুস্তকের মধ্যে লেখারেখা, অপরাজিতা, নাগকেশর, জাগরণী, নীহারিকা, মহাভারতী, কাব্যমালঞ্চ, পথের সাথী উপন্যাস প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য ও কাব্যামোদীর প্রিয়। 'মহাভারতী' কলিকাতা বিদ্যালয়ের বি, এ পরীক্ষার্থীর পাঠ্য। মহামহোপাধ্যায় যাদবেশ্বর তর্করত্ন কর্তৃক কাশীধামে ১৩০০ সালে 'কবি কুলেশ্বর' উপাধিতে ভূষিত হইয়াছিলেন। কিন্তু, এ উপাধি তিনি কখনও নিজ নামের সঙ্গে ব্যবহার করেন নাই। ১৩৩৮ সালে ৬ই ভাদ্র কবিশেখর কালিদাস রায় প্রতিষ্ঠিত 'রসচক্র' সভায় বহু সাহিত্যিক কর্তৃক কবি সম্বর্ধিত হইয়াছিলেন। এই সম্বর্ধনা 'উপাসনা' পত্রিকায় যতীন্দ্র সম্বর্ধনা সংখ্যা নামক আশ্বিনের স্বতন্ত্র সংখ্যায় বিস্তারিত প্রকাশিত হইয়াছে। রবীন্দ্রনাথ শরৎচন্দ্র প্রভৃতি বঙ্গ সাহিত্যের প্রায় যাবতীয় শ্রেষ্ঠ লেখকই এই উপলক্ষ্যে যতীন্দ্রমোহনকে বাঙ্গলার অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবি বলিয়া সানন্দে সম্বর্ধিত করিয়া আশীর্বাদ করিয়াছিলেন। ১৩৩৮ আশ্বিন সংখ্যা উপাসনায় 'যতীন্দ্র সম্বর্ধনা সংখ্যা'য় এই সকল প্রকাশিত হইয়াছিল। গত আশ্বিনে কবির শেষ কাব্যগ্রন্থ পাঞ্চজন্য প্রকাশিত হইয়াছে। এখনও তাঁহার রচনা পুরোদমে চলিতেছে।

ভায়া, লিখিতে বলিয়াও বলিয়াই নিজ হাতে এই সকল অশোভন কথা লিখিতে হইল। লজ্জা ও সঙ্কোচের ইহাতে সীমা নাই। তুমি কাটিয়া ছাঁটিয়া শোভন ও শিষ্ট করিয়া লইবে।

আমার শরীরটা ভাল নয়। তুমি কেমন আছ? পূজায় কোথায় থাকিবে? স্নেহালিঙ্গন লও।

ইতি
তোমার সখামুগ্ধ
যতীন্দ্রমোহন

ভাই মোহিতলাল, আজই তোমাকে পত্র লিখিয়াছি, পাইয়া থাকিবে। *কুমুদনাথের পুত্র শ্রীমান ভোলানাথ আসিয়াছিলেন। তাঁহার দ্বারা তাঁহার পিতৃদেবের কয়েকছত্র পরিচয় লিখাইয়া পাঠান গেল। নিম্নে তাঁহার স্বাক্ষরসহ লেখাটুকু দেখিবে ও যথাকর্তব্য করিবে। ইতি তোমার যতীন্দ্রমোহন বাগচী। ৭।১০।৪২

কুমুদনাথ লাহিড়ী

জন্ম—মাঘ, ১২৮৬; ফরিদপুর জেলার কোড়কদী গ্রামে।

মৃত্যু—১৭ই আষাঢ়, ১৩৪০, কলিকাতা।

গ্রন্থ—সাগরের ডাক (আধ্যাত্মিক নাটক), বিল্বদল (কবিতা পুস্তক) পাপ ও পুণ্য (গাথা)।

'সাহিত্য', 'প্রবাসী', 'উপাসনা', 'গৃহস্থ', 'আর্থিক উন্নতি', 'বিচিত্রা', 'বঙ্গবাণী' ইত্যাদি পত্রিকায় তাঁহার গল্প, কবিতা ও প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছিল। 'ভাগ্যসূত্র' নামে ইঁহার একটি উপন্যাসের কিয়দংশ 'বিশ্ববাণী' পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়া বন্ধ হইয়া যায়।

ইনি আসানসোল ই, আই, আর হাই স্কুলে অধ্যাপনা করিতেন।

শ্রীভোলানাথ লাহিড়ী-(পুত্র)

শ্রীযুক্তা সরলাবালা সরকার লিখিত তাঁহার জীবনী (কুমুদনাথ) হইতে আরও খবর পাওয়া যাইবে। এই বইটি গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্সের দোকানে পাওয়া যায়। প্রকাশক শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়, ১৯নং বিজয়কৃষ্ণ ষ্ট্রীট, উত্তরপাড়া, হুগলী।

'স্বারকা ভবন',
সৈদাবাদ,
খাগড়া পোঃ,
জেলা মুর্শিদাবাদ।
৮।১০।৪২

শ্রদ্ধাস্পদেষু—

কবি যতীন্দ্রমোহন বাগচী মহাশয়ের নিকট শুনিলাম আপনার 'কাব্য সঞ্চয়ের' জন্য আমার পিতা *কুমুদনাথ লাহিড়ী মহাশয়ের কবিতা নির্বাচিত হইয়াছে। কবি পরিচিতি প্রসঙ্গে পিতৃদেবের পরিচয় ছাপানোও আবশ্যক। সুতরাং যতীনবাবুর নির্দেশক্রমে এই সঙ্গে তাঁহার সংক্ষিপ্ত পরিচয় লিখিয়া পাঠাইলাম; আপনার সুবিধানুযায়ী উহা কাট-ছাঁট করিয়া লইবেন।

পুস্তকখানি বাহির হইলে যদি দয়া করিয়া নীচের ঠিকানায় আমাকে একখণ্ড পাঠান, অনুগৃহীত হইব।

যদি আবশ্যক বিবেচনা করেন, আমার ও বন্ধুবান্ধব পরিচালিত বিদ্যালয়ে পুস্তকখানি যাহাতে পাঠ্যতালিকাভুক্ত করা হয় তজ্জন্য সাধ্যমত চেষ্টা করিতে পারি। আমি মেদিনীপুর জেলার গোলগ্রাম অবৈতনিক উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়ের সহকারী প্রধান শিক্ষক। বর্তমানে বি, টি, পড়িতে কলিকাতায় আসিয়াছি। আমার স্কুলের ঠিকানা :—পোঃ গোলগ্রাম, জেলা

মেদিনীপুর। এই ঠিকানায় অথবা বি, টি, স্টুডেন্টস মেস, ১৯, কলেজ রো, কলিকাতা —যে কোন ঠিকানায় চিঠিপত্র লিখিলে আমি পাইব।

আপনার কোন প্রয়োজনে আমাকে নিযুক্ত করিতে কুণ্ঠা বোধ করিবেন না।

আমার সশ্রদ্ধ নমস্কার গ্রহণ করিবেন। ইতি—

বিনীত
শ্রীঅমলানাথ লাহিড়ী

এম, এল, মজুমদার, এম্কো,
প্রফেঃ ঢাকা ইউনিভার্সিটি,
৩৮, নীলক্ষেত রোড,
পোঃ রমনা,
ঢাকা।

এস, এন, বসু
বিল্ডার এণ্ড কণ্ট্রাক্টর

'লক্ষ্মী কুঞ্জ'
সুরেন্দ্র বসু রোড,
মধুপুর, এস, পি,
২৯।১২।৪২

মান্যবরেষু

আপনার ২ খানা পত্রই পাইয়াছি। শ্রীযুক্তা কনকলতা দত্তের সমস্ত বিষয় এর দেখাশোনা করার ভার আমার উপর আছে। *সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত ও অন্যান্যের কবিতা লইয়া আপনি পুস্তক প্রকাশ করিতে মনস্থ করিয়াছেন জানিলাম। শ্রীযুক্তা দত্তের মতে জানাইতেছি যে আপনি যখন পুস্তকখানি বাজারে বিক্রয় করিবার জন্য বাহির করিতেছেন তখন বিনা রয়্যালটিতে কবিতা ছাপাইতে দিতে তাঁহার মত নাই। আশাকরি এজন্য ক্ষমা করিবেন।

আমার নমস্কার জানিবেন।
ইতি

শ্রীশৈলেন্দ্রনাথ বসু

এস, এন, বসু
বিল্ডার এণ্ড কণ্ট্রাক্টর

'লক্ষ্মী কুঞ্জ'
সুরেন্দ্রনাথ বসু রোড
মধুপুর, এস, পি,
১১।১।৪৩

মান্যবরেষু—

আপনার পত্র ও পুস্তক পাইয়াছি। কবিতার বইখানি দেখিলাম। সুন্দর হইয়াছে আপনি পুস্তকখানি ছাপাইবার পূর্ব্বে মোট কতকগুলি কপি ছাপাইতে চান সমস্ত বিষয় জানাইলে মতামত জানাইতে পারিতেন যেরূপ গত ২৫।৫।৩৮ সালে বিশ্বভারতী রবী ঠাকুরের কাব্য পরিচয় পুস্তকখানি ছাপাইবার পূর্ব্বে মতামত চাহিয়া পাঠাইয়াছিলেন আপনি দয়া করিয়া সমস্ত বিষয় জানাইলে তিনি মতামত জানাইবেন।

কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের কবিতাগুলি বাছিয়া লইয়া 'কাব্য সঞ্চয়ন' নামে ১ খানা পুস্তক এম, সি, সরকার এণ্ড সন্স প্রকাশ করিয়াছে তাহা বাজারে চলিতেছে সেই কারণ কবির অন্য কবিতা লইয়া বই বাহির করান শ্রীযুক্তা দত্তজায়ার মত নাই। আশাকরি ভাল আছেন। আমার নমস্কার জানিবেন। ইতি—

শ্রীশৈলেন্দ্রনাথ বসু

মধুপুর—
২৪।১।৪৩

শ্রদ্ধাস্পদেষু

আপনার ১৮।১ তারিখের পত্র কাল পাইয়াছি। শ্রীযুক্তা দত্তজায়াকে পত্র দেখাইয়াছিলাম। আপনার পত্রে যাহা লিখিয়াছেন তিনি সমস্ত দেখিয়াছেন এবং তাঁহার কোন অমত নাই জানাইতে বলিয়াছেন। আশাকরি ভাল আছেন। আমার নমস্কার জানিবেন।

ইতি—
শ্রীশৈলেন্দ্রনাথ বসু

শ্রীহরি
শরণং

কুমুদরঞ্জন মল্লিক
বি, এ,
কোগ্রাম, পোঃ লাটনহাট,
(বর্দ্ধমান)
দি ৮।১২।১৯৬৫

প্রিয়বরেষু,

আপনার সুন্দর পত্রখানি পাইয়া আহ্লাদিত হইলাম। আপনি আমার কবিতার যদি একখানি সংকলন পুস্তক করেন, আমি গৌরব বোধ করিব। এই কার্য্যে যাহা সাহায্য দরকার আমি করিতে সর্ব্বদাই প্রস্তুত।

'বনহংসী' পাঠাইতে লিখিয়াছি। আমার বর্তমান কবিতাগুলির যাহা ছাপা হয় নাই তাহার সংখ্যা ৫।৬ শত হইবে, হাতের লেখা ভাল নয় তাহার কতকগুলির পাণ্ডুলিপি যাহা 'স্বর্ণসন্ধ্যা' নামে ছাপিবার আয়োজন করিতেছি তাহা পড়িবার কষ্ট কি স্বীকার করিবেন, যদি আদেশ করেন পাঠাইতে পারি। আপনার স্বাস্থ্য লক্ষ্য করিয়া উহা পাঠাইতে পারিতেছি না। ভগবান আপনাকে নীরোগ করুন এবং সর্ব্বাঙ্গীন সুখ শান্তি প্রদান করুন।

আপনি বাংলা সাহিত্যে সমালোচনার এক নূতন যুগ আনিয়াছেন—আপনার সূক্ষ্ম রসানুভূতি ও নূতন দৃষ্টিভঙ্গি লোককে মুগ্ধ করিয়াছে। আপনার বিদেশী কবি 'শেলীর' সমালোচনা বিশ্ব সাহিত্যে একটা অপূর্ব্ব জিনিষ। আপনার লেখা সত্য শিব ও সুন্দরের জয়গীতি। 'রূপকথার উৎসর্গ' বড় করুণ বড় মর্ম-স্পর্শী। কবিতা হিসাবে চমৎকার। শেষ দুটী লাইনের উপরের লাইন দুটী বাদ দিলে আমার কবিতাটি আরও বাড়িত মনে হয়। ভগবান আপনাকে আমাদের বাংলার আর যেন কোন বেদনা না কোন না পান। এখন আপনার পুস্তক উদ্ধৃত দিতেছি।

আমার পূণ্যবতী মাতামহী এবং ভক্তিমতী মাসিমাতারা আমাদের দরিদ্র গৃহস্থালীকে তপোবন করিয়া রাখিয়া-ছিলেন; যেখানে সর্বদা ভগবানের আরাধনা ও হরি কথা। আমাদের বংশে ২।৩টি স্ত্রীলোক সতী গিয়াছেন ইহাতে শৈশবেই আমি গৌরব অনুভব করিতাম। আমার মা ১৩৪২ সালে আমার পিতাকে রাখিয়া মারা যান। তাঁর নাম *ভক্তিমতী দিবস। তাঁহার পিসতুতো ভ্রাতা যতীন্দ্রনাথ মল্লিক (একজিকিউটিভ ইঞ্জিনীয়ার) বলিতেন, 'দিদি তুলসীর তলে যখন প্রণাম করেন মনে হয় তাঁর প্রত্যেক প্রণাম গিয়া ঠিক ভগবানের চরণপদ্মে পড়িতেছে এবং সে রাঙা পদকে আরও রাঙা করিয়া তুলিতেছে।'

শৈশবে আমায় কবিতা লিখিতে উৎসাহ দেন আমার ঐ মাতুল যতীন্দ্রনাথ মল্লিক মহাশয় আর আমার রচিত সেই কবিতা আবৃত্তি ও গান করিতে পাত্রের

শ্রীমন্মথ ঘোষাল যাঁর কথা আমি উল্লেখিতে লিখেছি।

মধ্যযুগে মহারাজা মণীন্দ্রচন্দ্র আমাকে যেমন পুত্রের মত ভালবাসিতেন, আমার কবিতাও তিনি অত্যন্ত প্রশংসা করিতেন এবং প্রতি উৎসবেই আমার কবিতা তিনি চাহিতেন। তাঁর অপরিমেয় স্নেহ ও উদারতা আমাকে কাব্যচর্চার সকল সুযোগ দিয়াছে। মধ্যযুগেই বেশী কবিতা লিখিয়াছি—সহস্র কার্য ও ভিড়ের মধ্যে। একটি পেন্সিল কহিনূর এবং একখানি ফুলস্কাপ ১৬ পেজি আন্দাজ একশত পৃষ্ঠার খাতা প্রায় আমার সঙ্গে থাকে তাহাতেই ইচ্ছামত কবিতা লিখি। একদিন ৫।৭টা হইতে ১০।১২টা কবিতাও লিখিয়াছি ও লিখি। তবে সাজিয়ে-গুছিয়ে কবিতা লিখিতে বসা আমার হয় না।

আমার মনে হয় একটা ভাব সেও সত্যের ন্যায় অমর উহা ছন্দে ধরিয়া না রাখিলেও বহু দিন পরেও আবার ছন্দেই ধরা দেয় আর কবিতা লিখা ভগবানের পূজা বা আরাধনা তা সে যে কবিতাই হউক। যখন আমি কবিতা লিখি তখন মনে হয় আমি তপস্বী আমার কেহ নাই। আমার আর কাজ নাই, আমি ভগবানের কাছেই রহিয়াছি—বাকি ব্রহ্মাণ্ড সরিয়া গিয়াছে। এমন পাগলামি মাঝে মাঝেই মনে হয়। মনে হয় জন্মজন্মান্তরেই আমার এই কাজ এই ফুল পাখী প্রকৃতির পরিবেষণা সব আমার যুগের যুগের চেনা ফুলের গন্ধে পাখীর গানে জন্মান্তরের স্মৃতির আভাস পাই। আমি শৈশবেই কবিতা লিখিতে আরম্ভ করি। শৈশবের শ্রীবৎস উপাখ্যান ও হরিশ্চন্দ্র উপাখ্যান আমাকে সর্বাপেক্ষা অভিভূত করে। দীনবন্ধুদাদার গল্প আমার একেবারে সত্য মনে হইত। নীলকণ্ঠের যাত্রাগান, খেপা বলিয়া একটি সাধকের গান, মেঠো পল্লীসঙ্গীত আমাকে ব্যাকুল করিত। কৈশোরে প্রথম যখন রসকীর্তন গান, রাম প্রসাদের গান শুনি আমি মুগ্ধ হইয়া তৃষিতের ন্যায় সে সুধা পান করিতাম। সন্ধ্যায় শঙ্খের ধ্বনির সঙ্গে আমার মন ঊর্ধ্বলোকে উধাও ছুটিত। ছাত্রাবস্থায়—রুল বিটানিয়া রুল দি ওয়েভস এবং বিটানিয়া নিডস নো বুলওয়ার্ক দুটী নোংরা কবিতা আমাকে বড়ই ব্যথিত করিত এবং ইংরাজ জাতির ওপর উৎকট দম্ভের জন্য ঘৃণা আসিত। ওয়ার্ডসওয়ার্থই প্রথম আমাকে ইংরাজী কবিতার ভক্ত করিয়া তোলেন। আর বাংলায় ভাওয়ালের গোবিন্দ দাসের কবিতা ভাল লাগিত যেমন ভাল পটের ছবি। প্রথম পেন্টিং দেখিলাম, কবি দেবেন্দ্রনাথের কবিতায়, উহা আমাকে একেবারে মুগ্ধ করিল, 'মলিন হাসি নীরব বিদায়', বিরহা, কাপুরে ঢোড়হাট, নাগা সন্ন্যাসী প্রভৃতি কবিতা একটা নতুন রাজ্যের সন্ধান দিল। রবীন্দ্রনাথের যে কবিতা অন্যে ভালবাসে না তাহাও অনেক আমার ভাল লাগিত, আমি খুবই আনন্দ পাইতাম কিন্তু আমাকে দেবেন্দ্রনাথের কবিতার মত অভিভূত করিতে পারিত না। তারপর বয়সে রবীন্দ্রনাথকে আরও ভাল করিয়া বুঝিলাম। বৈষ্ণব কবিতা আমি যৌবনে খুবই পড়িয়াছি, পরিণত বয়সে তাহা আরও ভাল লাগিয়াছে। তবে আমাকে আমাদের পল্লীগ্রামের পরিবেষ্টনী ও তাহার প্রাকৃতিক সৌন্দর্যই ভাবপ্রবণ করিয়া দাঁড়িয়াছে। আমার মা-মাসিমারা বড়ই ভক্তিমতী ছিলেন তাঁহাদের পুণ্য জীবনের প্রভাব কিছু আমার উপর পড়িয়াছে। আমি হিন্দু দেবদেবী তাঁদের সহ্য, তাঁহাদের পূজা মন্দির একান্ত অনুরাগী — আমার অনেক অতি উচ্চ বংশীয় মুসলমান বন্ধু আছেন—তাঁহারা আমার গোঁড়ামিকে শ্রদ্ধার চক্ষে দেখেন আমি কোন মাংস কখনও খাই নাই। পিঁয়াজ ও হাঁসের ডিম, উপনয়নের পর আর স্পর্শ করি নাই—আমার ভাল লাগে না।

কবিতা আমি লিখিব বলিয়া কখনো লিখি নাই, বৎসরের ২।৩ বার আমার মনে যেন বদল লাগে, তাহা কখনো ৭ দিন কখনো বা ১ মাস থাকে, তখন কেবল কবিতাই লিখি, জলভরা মেঘের মত মন যেন সর্বদায় ভারী। অন্য কোন কাজ কোন কথা ভাল লাগে না খাওয়া-দাওয়াও অত্যন্ত কমিয়া যায়। কবিতা লিখি মনে হয় ভগবানের পূজা করিতেছি—যেন যোগে আছি। অনাত্মীয় লোকে আমার অবস্থা দেখিয়া তখন হাসে।

কবিতা লিখিবার সময় আমার নির্জনের দরকার হয় না, সহস্র কোলাহলের মধ্যেও আমি নিরাময় কবিতা লিখিয়া যাই। ক্ষুধা পাওয়ার মত আমার কবিতা পায় কবিতা মাপিতে বসিতে পটু নহি, ইচ্ছাও হয় না। স্কুলে হোস্টেলে এক ঘরে ৩।৪টি ছেলে লইয়া থাকিতাম তাহারা চিৎকার করিয়া পড়িত আমি কবিতা লিখিতাম। এখনো সে অভ্যাস যায় নাই। আমার সময় সময় মনে হয় আমার একটা কবিতাও স্থায়ী হইবে না কিন্তু আমার রবীন্দ্রনাথ ও আপনার ন্যায় মনীষীর সমালোচনা সেটা ভুলাইয়া দেয়। আমার কবিতা আমার মহাপীঠের দেবীর (শ্রীশ্রীমঙ্গলচণ্ডীমাতা) ভালবাসেন এইরূপ স্বপ্ন আমাকে বিচলিত করে। আমার চারিপাশে বাউল গান ক্ষেপার গান, যাত্রা-গান কথকথা আমাকে প্রভাবিত করিয়াছে।

এখনকার কবিতায় — অজয়ের চর, [illegible], মুদির দোকান, অভাবের আনন্দ প্রভৃতি কতকগুলি কবিতা আপনার ভাল লাগিবে। এমএস্‌গুলি আদেশ পাইলেই পাঠাইব।

আমার 'মুখোসের দোকান' নামে একটা ছোট ছেলেদের বই বেরিয়েছে তাহা আপনাকে পাঠাইতে লিখিলাম। যাহা যাহা জানিবার দরকার জানাইব। আমাদের গ্রাম উজানি শ্রীমন্ত সদাগরের [illegible] বাড়ী—এখানকার 'ভ্রমরাদহ' প্রভৃতি স্থান ও কাহিনী আমার মনে গভীর রেখাপাত করিয়াছে।

একান্ত [illegible]

শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক

বহরমপুর
(বেঙ্গল)

শ্রীশ্রীনিত্যানন্দ চৈতন্যচন্দ্রায়
নমঃ—

আপনার অনুকম্পায় লিখিত হইল। শ্রীমোহিনীমোহন চট্টোপাধ্যায়, পিতা নরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, সাং খাগড়া, জেলা মুর্শিদাবাদ। জন্ম ১২৮৮ সাল, মাঘ মাসে। একখানি মহাকাব্য উপাসনায় লিখিত হইয়াছিল। বনফুল মুদ্রিত এবং 'গৌরচন্দ্র সাতকে' মুদ্রিত।

পরম শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন বাগচী মহোদয়ের আদেশ অনুসারে এই ক্ষুদ্র দীনজনের পরিচয় লিখিলাম। হে সুহৃদোত্তম আপনি আমার প্রীতি নমস্কার জানিবেন।

শ্রীমোহিনী

নিজেও যেন তার ক্লান্তি। তাই সমর, শালগ্রামশিলার মতো, ও ভাবেই পড়ে রইল।

মশারির ছাদে সুতোর বুননের হের-ফেরে জমিটা অসমান। কোথাও একদলা সুতো ডানদিকের প্রান্ত থেকে বাঁদিক পর্যন্ত চলে গেছে। তারপরই একটা জায়গা জালিজালি মতো। ওর পাশেই বেশ খানিকটা সেলাই করা। সুঁই ফোঁড়ার দাগ-গুলো পর্যন্ত দেখা যাচ্ছে। সে জায়গা-গুলো দলাদলা। কটা সেলাই পড়েছে। এক, দুই, তিন, চার, পাঁচ—না তারপর সেলাইটা শেষ হতেই একটু কুঁচকোনো, আবার মশারির জমি। সমর দেখল, সাদা-সাদা জমিটার মধ্যে দু জায়গায়, বাঁদিকেই একটু একটু তফাতে দুটো লালচে অপ্রাসঙ্গিক সুতো। ওগুলো থাকবার তো কথা নয়। সমর ধীরে ধীরে মাথার ঠিক ওপরের বিন্দু থেকে, চোখটা, মশারির ছাদের শেষদিকে ডান পায়ের দিকে, নিয়ে এলো। ডানদিকে, মশারির জালের সাথে একটা মড়া মশা ঝুলছে। ঐ জায়গাটা একটু রক্ত লাগা। তারপরই ঠিক পাশে কালো কালো কতগুলো দাগ। নিশ্চয়ই ধোপার নম্বর। যদিও এখন মশারিটা কালচে কালচে হয়ে আছে, সমর জানে, ধোপাবাড়ি থেকে কেচে আসা ইস্তিরী করা মশারির মধ্যে শুতে রাজা রাজা লাগে। আর বেল-ফুল যখন আসবে।

বেলার কথা মনে পড়তেই সমরের আবার মনে পড়ল, আজ সে ছুটি নিয়েছে। আজ বেলার জন্মদিন।

মশারির ছাদ থেকে দৃষ্টি সরিয়ে, এবার সমর, ডানদিকের খোলা জানলার দিকে তাকাল। অন্যদিন এই সময় উঠে ট্রেন ধরতে ছুটতে হয়— মাসকাবারি ডালপাটি। কিন্তু আজ ছুটি নিয়েছে বলেই ভাবছে, কোনোরকমেই কি ইলেকট্রিক ট্রেনটাকে এড়ানো যায় না! তার সামনে দুটো রাস্তা—ডান হাতে আর বাঁ হাতে—ডান হাতে বাসে সোজা মিনিট দশেক গেলে, নেমে পাকা রাস্তা ছেড়ে বাঁয়ে মোড় নিয়ে দুটো মিলের শ্যাওলাধরা দেওয়ালের দুপাশে রেখে কাঁকরের একটা কাঁচা রাস্তায় গঙ্গার ঘাটে যাওয়া যায়, সেখানে লঞ্চে নদী পার হয়ে ওপারের শহরে গিয়ে লোকাল ধরতে পারে। আর, বাঁ হাতে গেলে, বাসে নিজের অফিসের [illegible] যাওয়া যায়। তাহলে [illegible] ঐ গঙ্গা নদীটার ঝামেলা পোয়ানো কেন বাপু!

তাহলে, ইলেকট্রিক ট্রেনটাকে এড়ানো যাচ্ছেই না। এমন অমোঘ!

জানলা দিয়ে বাইরের এক চিলতে আকাশ দেখা যাচ্ছে। সকালবেলার আকাশ। পুজো পার্বণে, স্নান করে আলতো কাপড় জড়ানো মায়ের মুখটা দেখে মাঝে মাঝে এমন আকাশ মনে হয়। সমর পাশ ফেরে। বাঁদিকে হেলে থাকা বাঁপায়ের পাতাটা আস্তে আস্তে বিছানার সঙ্গে লম্বাভাবে নিয়ে এসে একটা শারীরিক চাপ দিল। ফলে, হাঁটু থেকে পায়ের গোড়ালী অবধি শক্ত হয়ে উরুর মাংসপেশীতে কয়েকটা খাঁজ তৈরি হয়। বাঁপাটা ওপরে টেনে তুলছে তুলতে, বাঁপাশের কোমরের দিকটাও বাঁকাঁধ আর বুকের বাঁ-অংশটার সঙ্গে কাৎ হতে থাকে। মাথাটাও, তাই, আর আগের মতো নবজাতক-সরবেরঘাতশ-প্রতীম চলে স্থির রয় না। ধীরে ধীরে, ডানদিকের কান, মাথার চুলের বেশ কিছুটা, ডান গালটা, চোখের দু-একটা পাতা, বালিশ ছুঁয়ে থাকে। বাঁদিকের বালিশের কোণটায় তুলোর ঢিবি ডান দিকটা এই কাৎ ফিরবার ফলে, ছড়িয়ে যায়। তার শরীরটা এমন হতে থাকে যখন, ডান হাতটা আর লম্বা না হয়ে বুকের সাথে কনুই অবধি লেগে থাকে, সেখান থেকে আর একটা কোণ তৈরি করে ভেসে যায় এবং বাঁ হাতটা বিছানা থেকে টেনে তুলে বাঁদিকের বুক-পিঠ এলাকায় ঝুলিয়ে রাখে। তার খালি বুকের পাঁজরে বাঁহাতের কনুই-এর হাড়টা ঘষা লাগে। সে তাই দুটো পাঁজরের মাঝখানের একটা অবকাশে হাড়টাকে বসায়। এভাবে চিৎ শোয়া ভঙ্গী পাল্টে ডান কাত ফিরবার ক্রিয়াটি শেষ হলে, সমর আবার অনড় হয়ে যায়। কেবল সামনে খোলা জানলার দিকে তাকায় মশারির জালের ভেতর দিয়ে।

পাঁচটা শিক আছে। কাঠের ফ্রেমের সাদামাটা রংগুলোকে এখন জং ধরার দাগ বলে মনে হয়। শিকের মধ্যে, দ্বিতীয়টির তলার দিকে একদলা চুন। আর ডানদিকের থেকে শেষতম শিকটার তলাটা ক্ষয়ে ক্ষয়ে একচিলতে পেরেকের মতো ফ্রেমের গর্তের মধ্যে ডুবে আছে। জানলার গায়ে লাগোয়া প্রাচীর—এ দিকটা প্লাস্টার করা নেই। তাই ইঁট আর মাঝখানে সিমেন্টের লেয়ারে এদিকটা থেকে প্রাচীরটার কঙ্কাল দেখা যায়। সমর আশ্চর্য হলো, যে, এ দিকটায় যে প্লাস্টার নেই, তা তার আজ চোখে পড়ল, যেমন, সে একটু আগে অবাক হচ্ছিল মশারির ছাদে নানান বিন্যাস লক্ষ্য করে। জানলা দিয়ে প্রাচীরের যেটুকু দেখা যাচ্ছিল—ওতে, ইঁটের ফাঁকে ফাঁকে শ্যাওলা ধরেছে। শ্যাওলার সবুজের মধ্যে গোটাকতক কালো পিঁপড়ে! বৃষ্টির জল পড়ে ইঁটগুলোর ভেতরে কালো ছোপ ছোপ। বিবর্ণ একটা খয়েরী পানের পিকের লম্বা দাগ। সমর পর পর সাজানো ইঁটের থাকগুলো গুনতে লাগল। এক, দুই, তিন চার, পাঁচ, সাত, দশ পর্যন্ত গুনল।

প্রত্যেক থাকে দশটা করে ইঁট, ছয় থাকের পাঁচ নম্বর ইঁটটা, সমর দেখে অনেকটা ভাঙা। তাই, পরের ইঁটটার সঙ্গে জোড়া দেবার জন্য সিমেন্টের এক গাদা ঐ ভাঙা জায়গাটা দিয়ে বেরিয়ে এসেছে। সেই প্রাচীরের পরে একটা বাড়ির ছাদের অংশ। তার মাঝখানে একচিলতে আকাশ। আকাশটার ঐটুকু অংশ পরিষ্কার, মেঘ ছিল না। যেমন, স্নান করবার পর মায় মুখে একটাও অবাঞ্ছিত চুল থাকে না।

আজ বেলার জন্মদিন। আজ সমর ছুটি নিয়েছে। যাকে বলবে না ঠিকই, আপিস-সময়ের কাছাকাছিই বেরুবে ঠিকই কিন্তু কত ধীরে, সুস্থভাবে, আপিস-টাইমের ধাবমান জনস্রোতের মধ্যে দাঁড়িয়েও আজ সে যাত্রা। খোলকলা পুরত, যদি ইলেকট্রিক ট্রেনটা এড়ানো যেত। গরম-কালে ইস্কুল থেকে বাড়ি ফিরবার সময় পিচগলা রাস্তার ওপর দাঁড়িয়ে যেমন মনে মনে ভাবত—যদি দুটো পাখা মেলে সোঁ-ও-ও করে উড়ে যাওয়া যেত, একফালি অকাশের দিকে জালের ভেতর দিয়ে তাকিয়ে থাকা সমর তার ভারি হয়ে আসা দেহ নিয়ে বেলার জন্মদিনের কথা ভাবতে ভাবতে মনে করল, ট্রেনে উঠেই রোজ যদি সমর অজ্ঞান হয়ে যেতে পারতো আর শেয়ালদায় পৌঁছেই তার জ্ঞান ফিরে আসত—, অজ্ঞান সমরকে একটু বাতাস পাওয়ার সুযোগ লোকজন করে দিক কি না দিক—অন্তত এই প্রায়—একঘন্টা সময় তো সমর ডুব সাঁতার দিতে পারত। একটা দাঁড়কাক পাঁচিলের ওপর এসে বসে। কর্কশ দু-একবার কা-কা করেই, [illegible] ডানার শব্দ তুলে উড়ে যায়।

ঠিক এই সময়ে বারান্দায় খড়মের খটাংখট আওয়াজ ওঠে। বুঝল, মা উঠেছেন। আর এই শব্দে সচকিত সমরের কান, আজ রুদ্ধশ্বাস-বিস্ময়ে যেন আবিষ্কার করল—চারদিকে কত শব্দ। মা খটাং খটাং করে বালতী নাড়ছেন। তারপরই একটা টিনের আওয়াজের সঙ্গে খলখল [illegible] শব্দ। পাঁচিলের ওপাশ থেকে এল এলোমেলো ঠুংঠাং। দুধের বোতলে চুড়ির বাজন। একটা গলা 'হড়-ড়-ড়-হড়' শব্দ তুলে বারকয়েক 'হাক থুঃ হাক থুঃ' করল। 'ক্যাঁচ' করে একটা কিছু বেঁকে বসে আর রাতের ঘুমের গম্ভীর গলায় প্রথমে 'সা'-এ কাটকে বাঁয়ে কাটকে চলোও চলোও ঠিক হ্যায় বাঁয়ে—তারপর একটা কিছু চাপড়ে ঘটাং ঘটাং আওয়াজ তুলে আগের মত চিৎকারে 'হেঁই আস্তে-এ। একটা বাচ্চা গমকে গমকে কেঁদে ওঠে আর কে যেন, কি যেন পথে চিনাৎ করে রেখে উফ বাবাঃ বলে ওঠে। তারপর বাচ্চাটার কান্না শোনা যায় না। পিছে পিছে একটানা ঠক ঠক ঠক আওয়াজে কেউ মেজাজী অলসতায় হেঁটে যায়—নিউকাটে মর্নিং ওয়াক নিশ্চয়ই খটাটং খটাটং দুজন চেনের সঙ্গে চেন গার্ডের ঘষা লাগাতে লাগাতে ঠিন ঠিন করে বেল বাজাতে বাজাতে চলে গেল কেউ। ঠিক ঐ সঙ্গে একটু হিন্দী গান ভেসে এল। কাঁধে খোলা ট্রানজিস্টরেরই। আর সোঁ সোঁ

আওয়াজ তুলে গমগম করে শহরের মাথা ছুঁইয়ে কাঁপিয়ে ঐরাবত ইলেকট্রিক ট্রেনের দঙ্গল ছুটে যাচ্ছে সকালবেলার বুকের ওপর দিয়ে।

সময় কান খাড়া করে শোনে। আর প্রতিটি শব্দের সঙ্গে একটা সম্ভাব্য শারীরিক ভঙ্গীমা কল্পনা করে। এ খেলা তো খেলে নি সময়। আজ, তার প্রেমিকার জন্মদিনে ছুটি - নেওয়া - সকালবেলায় সময় কি নতুন করে জন্ম নিচ্ছে। সে পৃথিবী ছিল অথচ আজ যেন তার সামনে পাঁপড়ি খুলে খুলে সমস্ত অন্তর্লীন আবহসঙ্গীতে ভাসিয়ে দিচ্ছে তাকে।

শুয়ে থাকতে ভারি ভাল লাগছিল।

যে সময় আর অলসতা নিয়ে সময় প্রথমবার চিৎ থেকে ডান কাতে শুয়েছিল, সেইরকম দীর্ঘ, বা দীর্ঘতর, চেষ্টায় সময় বাঁ দিকে ফিরল। মাথার তলা থেকে বালিশটা সরে গিয়েছিল। ঠিক করে নিল। উঠতে ইচ্ছে করছে না। আজ তার ছুটি বেলার জন্মদিনও তো। ও দাঁড়িয়ে থাকবে সময়ের জন্য। কিন্তু সময় যদি আজ না যায়। যদি সারাদিন এই বিছানায়ই, শুয়ে শুয়ে আকাশ আর দেয়াল আর মশারির ছাদ আর আকাশ আর শব্দ আর কাকের ডাক দেখে দেখে শুনে শুনে কাটায়। যদি সে অগাধ ঘুময়! গাঢ় ঘুম, বিষ্ণুর অনন্ত নিদ্রার মতো, আহা সুপ্তি, সেই অণু-প্রতীম মনুষ্য অবয়ব ভাসমান মেঘমণ্ডলের ন্যায় বিশাল বিরাট ক্রমপ্রসারমান আয়তনে যেন আয়োজন পরিব্যাপ্ত — নগর, প্রদেশ, অরণ্যমালা সমুদ্র, সেই শারীরিক দেবতুল্য বিশ্বরূপে অকিঞ্চিৎকর। আর ম্যাসন্ট খোদিত কাম্যকায় ঈশ্বরপ্রতীম সেই মূর্তির পাদদেশে দক্ষিণ করতলে দক্ষিণ পদপ্রান্ত স্থাপিত করতঃ বাম হস্তে প্রেম এবং প্রণয়ের অনন্তোয় সিক্ত বেলা লক্ষ্মী সাধ্বীর ন্যায় উপবিষ্ট, অনন্ত নিদ্রা, সহস্র মহাযুগ, তারপর চোখ দেখবে বেলা বুড়ি। সময় হাসল। মনে মনে। বেশ একটা আবহ-মান হিন্দু মিথ তৈরী হচ্ছিল, এলো-মেলো। হয়ে গেল— বেলার আজ জন্মদিন, তার জন্য সে ছুটি নিয়েছে, তাই তাকে যেতে হবে, এ চিন্তায়।

মা-র খড়মের শব্দ, ঘণ্টার আওয়াজ, শোনা যাচ্ছে না। তার মানে, মা ঠাকুরঘরে চলে গেছেন।

পেটটা বাথরুমে টনটন্ করছে। তল-পেটের দিকটা শক্ত। শুয়ে থাকতে ভাল লাগছে না। এবার উঠে বসতে হবে। সময় চিৎ হয়ে যায়। পিয়ে বাঁ হাতের কনুইটা বিছানার ওপর একটু চাপ দিতেই তার নরম পিঠটা বিছানার থেকে ওপরে উঠে আসে। পা দুটো সামনে ছড়ানো। উঠবার সময় মশারির ভেতরকার স্থির বাতাসে একটু তরঙ্গ ওঠে, ফলে মশারির ডান ধার-টায় একটা মোলায়েম সেমুত ঢেউ খেলে। বসে থাকা সময়ের পিঠটা কুঁজো হয়ে বেঁকে থাকে। সামনের দিকে তাই মাথাটা এগিয়ে আসে। পেটটা পিঠের দিকে ঢুকে যায়।

মশারিটা উঠিয়ে, সময়, পাশের বেডের টেবিলে রাখা সিগারেটের প্যাকেটটার দিকে হাত বাড়ায়। মশারিতে একটা টান পড়ে। ফলে যে কোণের দড়িটা দরজার ছিটকিনির পাশের পেরেকটায় লাগানো— সেটা কেমন করে আধখন্ড তোড়াটায় টান লাগায় আর কটর-র-র-র করে ছিটকিনিটা খুলে গিয়ে দরজাটা, ক্যাঁচ্ ক্যাঁচ্ মরচেপড়া শব্দ তুলে এক পাল্লায় খুলে গেল।

মশারির মধ্যেই, সময় একটা সিগারেট ধরায়।

কটর করে এক বুক ধোঁয়া টানল। ভেতরে নিল। গলার টনসিলটার ফোলা অংশটা একবার নীচে নেমে আবার ফিরে এলো স্বস্থানে। ঠোঁট দুটোকে ছুঁচলো করে তুললো। ঝিনুকের মতো অসংখ্য ভাঁজ হলো কালো ঠোঁটটাতে। তারপর একটা কেমন গলা থেকে হাওয়ার ধাক্কা বাইরে পাঠালে— যার জন্য আলজিহ্বার কাছে কং করে একটা শব্দ হয়— সেই ধাক্কায় একরাশ ধোঁয়ার রিং ঘুরতে ঘুরতে বেরিয়ে আসে। সময় সেই ভাসমান ধোঁয়ার রিংটার দিকে তাকিয়ে। মাঝখানে একটা বৃত্তাকার শূন্যতার চারপাশে ধোঁয়ার রেখাগুলো একটা নির্দিষ্ট গতিতে পাক খেতে খেতে সামনের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। এখন আর বৃত্তাকার থাকছে না। ত্রিভুজ হয়ে তলার দিকে ঝুলে পড়ে খানিকটা ধোঁয়া— যেমন শীতকালে মাঠের মধ্যে কুয়াশা ঝুলে থাকে। এবার দুপাশের থেকে কিছু অংশ পিছিয়ে গেল। সেখানে আরও কতগুলো মেঘমণ্ডলের সৃষ্টি হলো। তখনই সামনের সেই আকাশ ছোঁওয়া তরাই রেলের লাইনে সবুজ পাহাড়ের থেকে চোখে পড়ল দক্ষিণের দিগন্ত ভরা করনেট রেঞ্জ, মহানন্দা, রায়ডাক, তিস্তার বর্ণাঢ্যকাচিক বেড়— আর সাত হাজার ফুট উঁচু থেকে পাহাড়ের দিকে ভেসে আসা সাদা সাদা মেঘমণ্ডল— পাখীর ডানার মতো চক্রাকে উড়ে আসা ছড়ানো মেঘের বাশ বাতাসের এখানে ওখানে দায়িত্বহীন নির্মল শৈশবের মতো ঘুরে বেড়াচ্ছে টলটল। সেই সিকসটি সেভেন টেভেনের কথা। আর সেই মুহূর্তে সামনে ধাবমান ধোঁয়াগুলো মশারির দেয়ালে লেগে, ভেঙে, গা বেয়ে নেমে যেতে থাকে নিচে বিছানার দিকে। দূর থেকে দেখা পাহাড়ী ঝর্নার মতো। যদি মেঘ হওয়া যেত, ভাসমান মেঘ, সময় ছোটবেলার মতো ভাবল। যদি সেই সাত হাজার ফুট আকাশ থেকে মেঘময় ভেসে ভেসে নেমে আসা যেত লোয়ার তরাই রেলের বুকময় বনময়, সম্বরের হরিণের নরম পায়ের ছাপে ভরা বুনো ঘাসের বিস্তীর্ণ জঙ্গলের মধ্যে, সেই নির্জনতায় যদি পাওয়া যেত বেলাকে— বেলাকে চুম্বন করা যেত, যদি রাত্রিবেলায় তিনধরিয়ার পাহাড়ী বস্তিতে মধ্যবিত্তদের মাদলে মাদলে নেচে ওঠা যেত, বেলার মাথায় আমি গুঁজে দিতাম বুনো লিলি, শালের ফুল, ডালিমের পাতা, আর বনতুলসী ভেজানো শিশির পাতে সারা রাত বেলাকে একটা তিতির পাখীর মতো স্নান করাতাম— অসংখ্য সুকক্ষরা গল্প গল্প, চুপচুপ, ওর জন্মদিনে, মধ্যযামের সন্ধিকালে ওর জন্ম-লগ্নে।

ঠং। টিনের দরজায় একটা শব্দ উঠল।

আর গেট খুলে ঢুকল টগর।

মা ঠাকুরঘর থেকে বলে উঠলেন— 'কে' ?

টগর উত্তর দেবার কোনো দরকার বোধ না করে, সোজা, সময়ের একপাল্লা খোলা দরজার সামনে, বারান্দার সিঁড়িতে এসে বসল। টগরের চোখে পলক পড়ে না।

মা আবার জিগেস করলেন— 'কে ?,
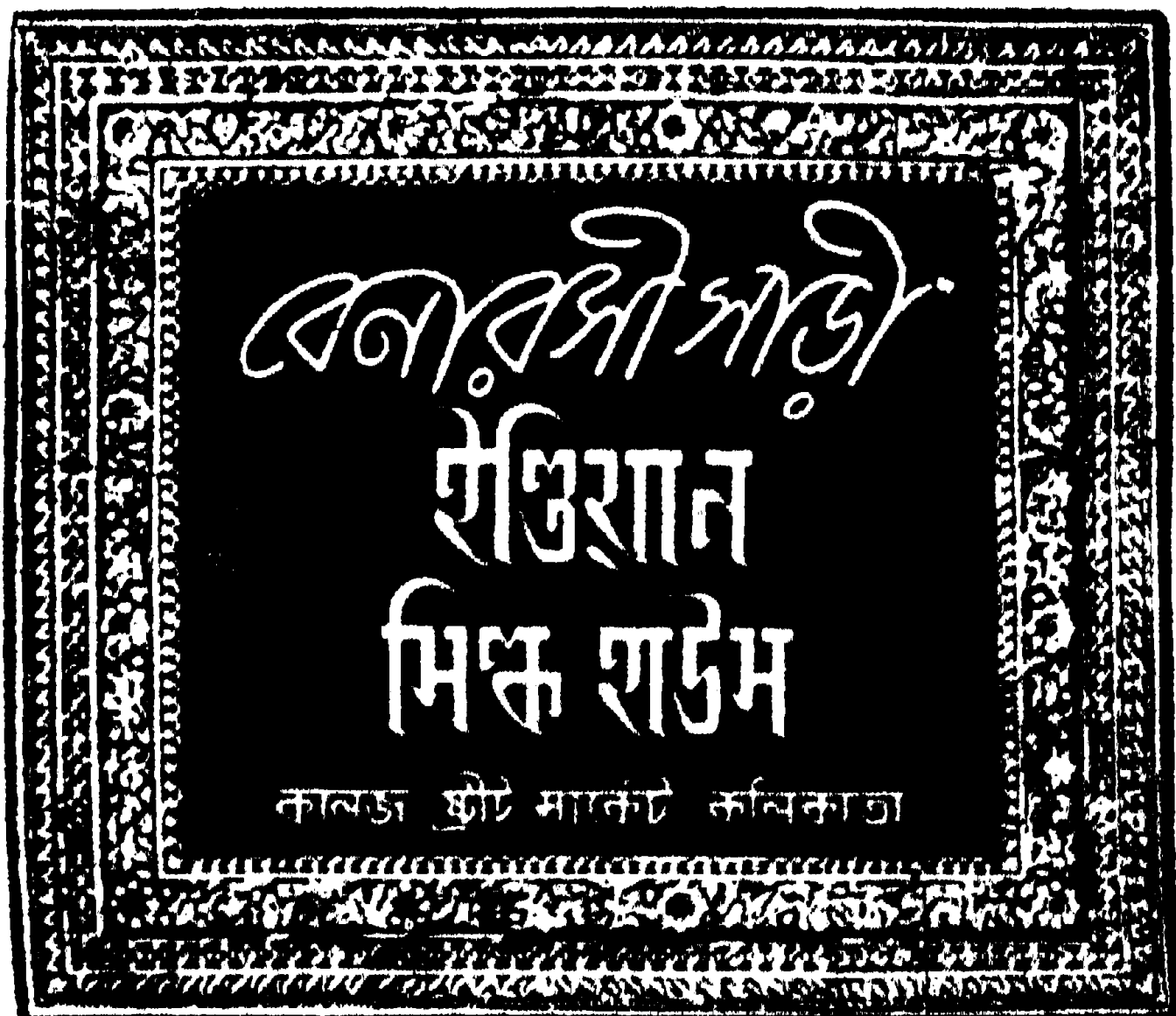
উত্তর না পেয়ে মা ডাকলেন 'সময় উঠেছিস?'

সময় একটানা 'হ্যাঁ-এ-এ' বাতাসে **ভাসিয়ে দিল। দুপুরবেলায় ফিরিওয়ালার** **হাঁকের মতো।**

'কে এলো রে?'

'ট-গ-র' তিনটে শব্দ অনেকক্ষণ পরে এক সুরে বলে গেল সময়।

টগর সময়দের বাড়িতে আগে দুধ যোগান দিত। ও বরাবরই একটু কেমন। **তারপর একদিন টগর এলো না। ওর ভাই এসে বলল—** দিদির একটু বাড়াবাড়ি **হইছে।**

তারও পর অবশ্য টগর এসেছে। মাঝে মাঝেই আসে। এখন খুব সেজে থাকে। **রঙীন শাড়ি।** মাথায় খোঁপা করে। কানে **দুল।** হাতে ভর্তি কাচের চুড়ি। মাঝে **মাঝে মাথায় জবাফুল গোঁজে।** আজকাল, এলোচুলেও থাকে। গান গায় চীৎকার করে। **সময় প্রায়ই দেখে,** পাড়াদের সামনে টগর পাগলী মুদীখানা দোকানের সিমেন্টের সিঁড়িতে বসে আছে।

আজ টগরের সারা শরীর ভেজা। শাড়িটা ভিজে গায়ের সাথে লেপ্টে গেছে। খোলা দরজা দিয়ে মশারির জালের অন্তরাল থেকে সময় দেখে, জবজবে ভেজা এলো-মেলো টগর বসে আছে। কানের মধ্যে দুটো কাঁঠালি গোঁজা। কপালে একরাশ সিঁদুর জলে ভিজে গলে গলে পড়ছে নাকের পাশ দিয়ে।

টগর অপলক তাকিয়ে আছে জালের ভেতরের অবছা সময়ের দিকে।

আর সময় শেষ ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে ভাবছে গত বর্ষাকালে একবার টগর, ভরা গঙ্গায় সন্ধ্যাবেলা ঝাঁপ মেরেছিল। টই-টম্বুর গঙ্গায় টগর কোথায় ভেসে গেল! সবাই বলল— টগরটা মরল তাহলে। অথচ আশ্চর্য পরদিন বাজারে টগরকে দেখে সবাই **অবাক।**

জিগেস করল— 'কি রে তুই না কাল গঙ্গায় ঝাঁপ মেরেছিলি।' টগর উত্তরে বলেছিল— 'মরা, মইরা দ্যাখলাম, মইরা কোন সুখ নাই।'

সময় টগরকে দেখতে লাগল। টগর কতো বন্ধনহীন। সব কিছুর মধ্যে থেকেও ও কতো নিঃসঙ্গ করে নিয়েছে নিজেকে! এতো উদাসীন টগর— তোর এই জন্য দেহ নিয়ে কেন কবিতা লিখছি না— এতো বিরল **টগর, তুই কেন ছবি আঁকিস না—মন্তরের** প্রদেশ থেকে ঘুরে এলি টগর, **তুই কেন** পূজারিণী হোস না রে। **টগর কত বড়।** সব কিছুর ওপরে টগর **কোন নির্জন** একাকী চূড়ায় বসে আছে—যেখান থেকে পায়ের তলার এই পৃথিবীটার দিকে তাকিয়ে কখনও হাসে কখনও বুক চাপড়ায়— এই তো রোমান্স টগর— তুই কি মেঘের মতো চপলা। তোর কি আজ জন্মদিন। টগরের একদৃষ্টে পলকহীন চেয়ে থাকা মুখের দিকে তাকিয়ে সময় ভাবে— টগরের জন্মদিন কবে।

এই টগর— এত সকালে কি করতে এসেছিস। টগর একটু নড়ে চড়ে উঠল। কথার উত্তর না দিয়েই।

'কি রে। কথা বলছিস না যে?'

টগরের চোখে পলক পড়ে না।

'ক্যান? শোন শোন দামাক বাবু, অত দামাক মইরা কথা কইও না।' সময় চমকে দেখল।

আর তার পরেই উপবেশন ছেড়ে টগর, গেটের পাশে, একটু খোলা জায়গাটায়, নেচে উঠল তা তা থৈ থৈ। গান গাইতে গাইতে। হাত ঘুরছে বাতাসে। টগর নাচছে। মা চেঁচিয়ে বললেন— 'এই টগর। সাত সকালে কি পাগলামী করছিস?'

টগর উচ্ছলে হেসে উঠল খলখল করে। মাকে বলল, 'কালী নাচ মা' 'কালী তাল, সব ভাইঙে ফালব। আমি থাকব আর মা থাকবে—কালী নাচ মা, শিবের নাচ' নাচতে নাচতে টগর কানের জবা ফুলটা হঠাৎ—দূরে মাটিতে ছুঁড়ে ফেলে, উঠোনের মধ্যে জোড়াসনে বসে, চোখ দুটো বুজে নিস্পন্দ হয়ে রইল। তারপর হঠাৎ হেসে উঠল, দুই কিং কিং কিং একলা ফোকলা সব হব কিনছি' বলতে বলতে দুই হাতে বুক চাপড়াতে চাপড়াতে, তিনবার দেখে মনন শব্দ তুলে, বেরিয়ে গেল দৌড়ে।

টগর চলে যেতেই মা খটং খটং করে দরজার সামনে এসে বললেন, 'কই, উঠেছিস বললি যে।'

—'মা, আজ তোমার তাড়াতাড়ি করতে হবে না। আজ গড়িমসি করেই যাব।'

—'সেই তো। রোজ তো কি করে যাস' মা বলতেই সময় গেয়ে উঠে—

'মা গো আমার মা

এতো বড় হলাম

তবু

বিয়া দিলা না

মা গো বিয়া দিলা না।'

—'করলেই পার, আমি তোমায় দিব্যি দিছি। তারপর বউ আইনে, মাভারে রাইখে চলে যাও।'

সময়ের আজ ভাল লাগছে। ভীষণ ভাল লাগছে। টগরকে ভাল লাগল। মাকে ভাল লাগল। সময়ের মনে হলো— ছুটে গিয়ে মা-এর কোলে বসে আঁচল চাপা দিয়ে একবার দুধ খেয়ে আসে।

বাইরে বেলা বেড়ে গেছে। জানলা দিয়ে যে একফালি ছাদ দেখা যায়— সেখানে বেশ রোদ।

এবার ওঠা উচিত। পেচাছাপে তলপেটটা বাথা করছে। সময় দুহাতে মশারিটা তুলে দুটো পা সামনে, খাট থেকে ঝুলিয়ে, শুনেই, এপাশ ওপাশ ঘোরাতে লাগল হাওয়াই-এর জন্য। চপ্পলটা পায়ে গলিয়ে উঠে দাঁড়ায়। হাত দুটো ঘুরিয়ে পেছনে এনে জোড়া করে 'আ-আ-আ' শব্দ তুলতে তুলতে, বেঁকে, একটা আড়মোড়া ভাঙে। তলপেটের কাছে ঝুলে যাওয়া আলগাবাঁধন কোঁচকান পায়জামাটা পেটের নাভীর কাছে টেনে তুলে, একবার গলা খাঁকারি দিয়ে বাথরুমের দিকে এগুলে।

এতক্ষণ ঘরের মধ্যে শুয়ে শুয়ে সে যে এতো সময় এতো অবকাশময় পৃথিবী-টার কথা ভাবতে ভাবতে নিজেকে মুক্ত কল্পিত উপলব্ধি করছিল, বাথরুমের দরজা বন্ধ করবার সাথে সাথে এক নতুন জগতে সে পা দিল যেন, চার দেয়ালের মধ্যে আদিগন্ত মধ্যে জলের টুংটাং তরঙ্গ ধ্বনিতে সে এখন একক সম্রাট, বাথরুমের মানুষ যেমন আত্মমগ্ন হয় আর কি। যেমন হেঁড়ে গলার লোকও গেয়ে ওঠেন কোনো তান বা মীরার ভজন, রবীন্দ্রসঙ্গীত, বিশেষ করে আজ, যখন তাকে দড়াম করে দরজা বন্ধ করেই হুড়হুড় করে জল ঢেলে গামছা দিয়ে মাথা ঘষতে ঘষতে মিনিটেই বেরিয়ে আসতে হবে না।

কতদিন পর আজ যেন সময় হাত বোলালো নিজের গায়ে। মোলায়েম রোমশ পিঠে আর বুকে দুহাতের করতল বোলাতে লাগল সময়। কত সুন্দর লাগছে! কী ভাল লাগে! সময় নিজেকে আদর করে। আয়নার আরও কাছে সরে এসে সময় মুখটাকে দেখতে পেল। আরও কাছে, আরও, আরও— মুখধোবার বেসিনে পেট লাগিয়ে, সময়, তার মুখমণ্ডলের প্রতিবিম্বের আরও কাছে এগিয়ে গেল। আয়নার সেই ছায়ার মধ্যে সময় সময়কে আতিপাতি করে খুঁজছে নীচের ঠোঁটের বাঁ দিকের তিলটা এতো বড়ো হয়ে গেছে! আগে একটা কুচকুচে কালোজিরের মতো ছিল। ছোটবেলায়, সবাই ওর নীচের ঠোঁটের বাঁ দিকের তলায় তাকিয়ে বলত, 'বাঃ, তোমার তো ভারী ভারী সুন্দর একটা বিউটি স্পট আছে।'

খেলা কী বলেছিল! সেই কালো কুচকুচে ফিরেটা, আজ সমর দেখল, ধূসর আঁচিলের মতো বড়। তার মাঝে মাঝে কালো কালো চুল গজিয়েছে, আর চামড়া অর আঁচিলটার যোগাযোগের জায়গাটায় রোঁয়া রোঁয়া। তিল থেকে আঁচিল অবধি পেরিয়ে আসা সময় তাও ভালবাসল তার সেই শৈশবের বিউটি স্পটটুকে, শৈশবের সমরকে তো খুঁজে পেল! নিজের চুলের দিকে তাকাল। মা ছোটবেলার স্নান করাবার সময় চুপচাপ তেল মাখাতেন। মার সাথে একটা খেলা ছিল সমরের। ডান হাতের চেটোয় নারকোল তেল ঢেলে মা সমরের মাথার ঠিক মধ্যেখানটায় উল্টে দিতেন। তারপর ঐ জায়গাতেই চেটোটাকে এমনভাবে নাড়াতেন, শব্দ হতো আর সমর গলায় 'আ-া-া-া একটানা আওয়াজ বের করতে চাইলে, তা, দানা দানা 'আ, আ, আ' হয়ে বেরিয়ে আসত গলা দিয়ে। চোখ বন্ধ করে এভাবে সমর কতদিন চুলু চুলু হয়েছে। সমর চিরুনিটা দিয়ে মাথাটা আঁচড়াল। যেন শৈশবের পর আজ দ্বিতীয়বার। পাট পাট করে আঁচড়াল। এলোমেলো করে দিল। কপাল ঢেকে দিলো। আমার চুল, মাঠের খোড়ো হাওয়ার উড়ন্ত আমার চুল। মাথার চুলের ভেতর দশ আঙুলে ঝির ঝির করে সমর আদর করল।

দু'একটা গাছা কপালে এসে পড়েছিল। সরিয়ে দিতেই কপালটা জেগে উঠল। থাক্ থাক্ বলিরেখার মতো সময় বহে গেছে। দেখেছিস সম—তোর কপালটা কেমন সকালবেলার আকাশের মতো ফরসা। ঐ বাঁদিকটায় মা কালো কাজলের টিপ্ দিতেন অনামিকায়, যাতে ছেলের গায়ে চোখ না লাগে। সম রে—তোর কপাল দেখে সই কঙ্কালীতলার মাঠ মনে পড়ে না রে তোর, আদিত্যপুর গ্রামের চারদিকের ধানকাটা মাঠের মতো তোর এই বিশাল কপালটায় সমর একবার হাত বুলো তুই. তুলোর মতো মোলায়েম তোর এই কাজলের-টিপ-পরা কপালে কাদাখোঁচা পাখীর পায়ের ছাপ কোপাই-এর চরে, সাঁওতাল ছেলের দল তালডিঙি করে ভেসে যাচ্ছে দূরে, দ্যাখ্ সম, কপালে তোর কত ব্রতপার্বনের মতো আলপনা।

আর সেই সমস্ত কিছু ভেসে যায় তোর নয়নসমদে। গোয়ালপাড়ার গাঁয়ে যেতে কাজুবাদামের বন ঘেরা টলটলে দীঘির মতো এত শীতল চোখ, ঠান্ডা ঠান্ডা চাওয়া তুই কোথায় পেলি রে সম। তুই একদিন খুঁজে পাস নি এই দহ। আর সেই কালো মণিটা কি যাযাবর পাখী। সমর তোর চোখের জলে বুকের খরা ভিজে থাকে সারা রাত, সারা রাত শিশির পড়ে মন ঘাসের মতো তোর চোখের পাতায়। এত বিষাদ তুই কোথা থেকে পেলি রে সমর। তুই জানিস না।

সমর ঠোঁট দেখে, কাঁক করে দাঁত দেখে, হাঁ করে যেন আলজিভ অবধি দেখে নিতে চায়।

আয়নাটা একটু নীচের দিকে নামিয়ে আনে। চোখে পড়ে সেই বুক। জীর্ণ একটা বুকের বাঁ দিকে ধুকধুক করছে তার হৃৎপিন্ডে। সম একবার একবার বুকের মধ্যে হাত বোলায়। ভালবাসা। ভালবাসা। বুকভরা ভালবাসা। শ্রাবণের ধারার মতো পড়ুক ঝরে, ঝরে পড়ুক মুখের পরে বুকের পরে। বুকের মধ্যে শিরশিরিয়ে বড় ব্যথা জাগে, বড় বিস্ময় জাগে, নিঃসঙ্গতা, এই বুকে আর একটা পৃথিবী আছে, সৌরজগত, নক্ষত্রখচিত অনন্ত আকাশ।

আর সেই বিশাল বিজনতার মধ্যে হাঁটতে হাঁটতে সম এসে দাঁড়ায় নাভী-কুন্ডলীর প্রান্তে। মার গর্ভের কথা মনে পড়ে। লক্ষ লক্ষ হাজার হাজার বছরের সমগ্র বিবর্তনের ইতিবৃত্তকে শরীরময় জড়িয়ে স্নেহময় তরলে ভেসে থাকা, নাড়ীতে নাড়ীতে জড়িয়ে একটি বেড়ে ওঠা ভ্রূণ আর একটি অস্তিত্বের সঙ্গে খেলা করে, নড়েচড়ে গোটা বিশ্বব্রহ্মের ইতিহাসকে যেন হাতে হাতে লোফালুফি করে সম, তুই কি প্রাচীন পথিক।

সম, তুই তো ঈশ্বরের মতো সৃজনশীল তুই গড়ে তুলতে পারবি নিজের সৃষ্টিকে। একান্ত তোর, একদম নিজের, রাহুল। সমর, দেখ্ দেখ্, মনে পড়ছে, তুই মানুষ।) আমি মানুষ। যে কড়াপড়া হাতে আমি রোজ কুলতে কুলতে যাই, বারো মাস চোদ্দ দিন, যে আঙ্গুলে আমি কলম চালাই ঘন্টার পর ঘন্টা, সে সবের জন্য তারা নয়। আমি জীবনকে আলিঙ্গন করতে চাই, তার চল নামা ধূজনীকে আসনে বসিয়ে আমি চুম্বন করতে চাই, চুম্বন।

আর এভাবে আয়নার মধ্যে আত্মপ্রতিবিম্বকে দেখতে দেখতে, নিজেকে

চাপতে, ঐ দুটো শরীরের বাধা পেরিয়ে কামরার ভেতরে, কোথায় যেন, পা রাখতে পায়।

চারদিকে চেপে ধরছে গলিত মাংসের দেয়াল। সমরের মনে হলো, হাজার হাজার মানুষ যেন একটিমাত্র পথ দিয়ে ঠেলে বেরুতে চাইছে। কামরার মধ্যে উত্তপ্ত কার্নেসের মতো হাওয়ার সপসপে ঘামে ভেজা দেহ। শ'এ, শ'এ, মানুষের গায়ের গন্ধে কামরার মধ্যে বিকট দুর্গন্ধ। সমর আরও একটু সেঁধাতে চেষ্টা করল। মাথার ওপরে রডে ধরবার মতো একটাও হাতল নেই। দোলানীর জন্য তাকে ডানদিকে কারও পিঠের ওপর হেলে থাকতে হয়। ঘামে ভেজা একটা রোমশ হাত সমরের নাকের কাছ থেকে ওপাশের দেয়ালটা ধরে আছে। মুহুর্মুহু ঝাঁকুনীতে তার মুখ, ঠোঁট এবং নাকের অবকাশ, সেই থকথকে ঘামের মধ্যে ডুবে যাচ্ছে। দুই ঊরুর ভেতর দিয়ে একটা পা চলে গেছে। ভীষণ চাপ লাগে। পিঠের শিরদাঁড়াতে একটা কনুই চেপে বসে। বুকের দুদিকে, পাঁজরে, লেগে আছে, আরও বুক পিঠ পিঠের অংশ, হাত, মাথা, ঘাম, গন্ধ, দেহ, মুণ, বেয়ে রুবের মতো তরল, মাংসের দেয়াল। সমস্ত কামরাটায় যেন খাবি খাচ্ছে একগাদা জ্যান্ত মানুষ। পাঁকে, কাদায় জড়িয়ে পড়া দেহের মতো বেঁচে থাকার শেষ চেষ্টায় জলের ওপরে গলার শিরা তুলে চেয়ে আছে ওপর দিকে। বাইরের আঁচে ঘর্মাক্ত চোয়ালের হাড় চকচক্ করে উঠছে। চোখের তলায় ঘন কালি। সূক্ষ্ম শিরা রক্তচাপে ফুলে আছে। বন্ধ চোখের পাতার ওপর লালচে ধমনীর আভাস। কপালের দুপাশে টান্-টান্ হয়ে আছে দুটো রগ। ঘাড় আর গলা আর চিবুকে জেগে ওঠা হাড় ধক্ ধক্ করে প্রকট হয়ে উঠছে ট্রেনের দুলুনীতে। সেই নিমজ্জমান মানুষসমাহারের ভেতর বন্যায় ভেসেযাওয়া শেষ দীর্ঘ হাম্বাধ্বনির মতো ছাড়া ছাড়া কথা শোনা যায়, তখন সেইটিই একমাত্র প্রমাণ হয়ে দাঁড়ায়, কামরাটি মানুষের, জীবন্ত মানুষের।

'বাঃ, বেশ জলহাওয়ার ব্যবস্থা আছে তো।'

'বউকে নিয়ে চাঁদ দেখতে পাবেন'

দুটো মন্তব্যে, হেসে, সমর ওপর দিকে তাকায়। মাথার ওপরে অনেকটা খুবলে ফাঁকা করে দেয়া। চারদিকেই চোরা ভাঙাভাঙির দাগ। একটাও বাল্ব নেই। সেসব জায়গায় পোড়া ঘায়ের মতো গর্ত গর্ত হয়ে আছে। বাঙ্কের লোহার পাতগুলো উপড়োনো। মাইকা-দেয়া দেয়ালেরও অনেকটা ছাল উঠে এসেছে। পেন্টিং করা চকচকে লোহার রডগুলো খোলা। মানুষ মানুষকে ধরে ঝুলছে। তার সামনেই লাল কালিতে লেখা—ট্রেনচলাকালীন আপনার দেহের কোনো অংশ বাহিরে রাখিবেন না।

'এ তো সেকেন্ড ক্লাশ কমফোর্ট'

'হেঃ, তাহলে বলুন ফার্স্ট ক্লোসে ছাদই নেই'

'ভোলা, লোকাল ট্রেন আর মাল-গাড়ির মধ্যে পার্থক্য কি?'

'মনে আছে, গুলজারিলাল নন্দ এক-বার ঢুকেছিল।'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ, সে তো পি, ডবলিউ, ডি খেয়েছিল।'

'পি, ডবলিউ, ডি কি মশায়'

'মদনা, এ্যাব্রিভিয়েশনের পুরোটা ছোট্ট করে শুনিয়ে দাও তো'

—উল্টে ডিগবাজী'

'আর এদিকে যে—ফাটিয়ে দিল ছারপোকা'

'তাহলে গান গাও—

'ধীরে সে জানা খাটিয়াল মে
হো-ও-ও-ও
খটমল....'

'এই চুপ করে থাক, লেডীসরা লজ্জা পাবে'

'ভোলা, এই কামরায় কেউ অসভ্যতা করলে, তাকে ওয়াংচু কমিশনের কাছে নিয়ে যাওয়া হবে।'

'শালা বোর কচ্চিস কেন বে।'

'চু-ষু-উ-ন দাদা, চুষুন, জোড়া দশ, যত চুষবেন তত রস, এই গরমে আনারসের আস্বাদ, লেবুর চাট্নীটা দাদা।'

'এই ডানদিকে দেখ।'

সমরও তাকায়। একটি ভরাস্বাস্থ্য মেয়ে সমরের দিকে পেছন ফিরে দাঁড়িয়ে আছে। একটি লোক সেঁটে দাঁড়িয়ে তার পেছনে। লোকটির চোখ বন্ধ। নীচে, লোকজনের পায়ের ফাঁক দিয়ে, সমর দেখতে পায়, লোকটির বাঁ পায়ের পাতার ওপর মেয়েটির পায়ের পাতা চাপা। আর কোথা থেকে ভেসে আসে একটা সুন্দর ধূপের গন্ধ। ঘামের ভাপ-ওঠা কামরার এক কোণা থেকে লিক্‌লিকে একটা ধোঁয়ার শিরা মানুষগুলোর মাথার ওপর দিয়ে উড়ে যাচ্ছে। দম-আটকানো বদ্ধতায়, নাক আর ঠোঁটের অবকাশে কিছু কিছু ঘামের ভেতর দিয়েও সেই গন্ধ নাকে যায়, মাথায় যায়, আবেশে যেন চোখ বন্ধ হয়ে আসে। সন্ধ্যাবেলা হাওয়া বইছে ঘরের দরজা জানালা খোলা পর্দা সরানো ইউক্যালিপটাস গাছের পাতাগুলো থিরথির করছে বাতাসে ঘরে ধূপ জ্বালানো বাইরের উঠোনে বসে সন্ধের আকাশে তাকিয়ে বেলায় চুলের সাথে জড়িয়ে-যাওয়া তারা আকাশ ছায়াপথ তারা উল্কাপাত অন্ধকার চুমকীর সমুদ্রে ভাসতে ভাসতে এক নিস্তরঙ্গ পারাপারহীন স্তব্ধতায় নিজের মাধ্যাকর্ষণ হারানো দেহে ডুবতে ডুবতে তারা আলো-অন্ধকার

মাথার ভেতর ঝাঁ ঝাঁ শূন্যতা গন্ধ ধূপের গন্ধ পা নেই মাটিতে শূন্যে শূন্যে মহাকাশ অতল অন্ধকার গন্ধ ঘুম ঘুম ঘুম ঘুম যায় ঢলে পড়ে শূন্যতায় ঢলে পড়ে অন্ধকার স্তব্ধতা........

'আরে আরে'!
'কি হলো মশাই'
'ধরুন দাদা, ধরুন'
'কেন যে ওঠে বুঝি না বাবা'
'গা কি ঠাণ্ডা হয়ে যাচ্ছে'
'জল দিন'
'জল নেই'
'রুমালটা দিন না'
'আরে ধারে মশায়, আগে জানলার পাশে বসান না'
'দাদা, কাইণ্ডলি সাইডটা'
'হবে না। এরকম না-হওয়াটাই আশ্চর্য'

'ভোলা, চিমটি কেটে দেখ নে'
'এই যে দাদা—ও দাদা, এই যে, জানান, শুনুন শু-নু-উ-ন...'

হু হু করে ছুটে-চলা ট্রেনের জানলার পাশে গঙ্গা হাওয়ার ঝাপটে ঝাপটে ঢলে-পড়া সমরের অচৈতন্য দেহ ঘামে ঘামে চুপসে যেতে থাকে।

বেলা খুঁজে পেল সমরকে, একটা বেঞ্চে শোয়ানো অবস্থায়। দূরে এনামেলের থালা বাজিয়ে একটি ভিখারী, গান গাইছে। দুপুরের আঁচে তার মুখের বলিরেখাগুলো ঘামের স্রোতে ভর্তি। সমর কাঁপতে কাঁপতে গোঙাচ্ছিল। বেলার মুখ লাল। দুপুরের রোদে বাড়ি থেকে বেরিয়েছে—। ঘাড় টান করে, উবু হতে হতে বেলা জিগেস করতে থাকে—'এই কি হলো! এই এই এই, কি হলো। তুমি কথা বলছ না কেন। এই'

'কে-এ-এ' বহুদূর থেকে যেন ভেসে আসে একটা স্বর 'জ-অ-ল, কে-এ-এ'
'আমি বেলা'

সমর ভারী চোখের পাতা দুটো টেনে তোলে। মড়া মাছের চাউনী। বহু-ভলকেল থেকে কে যেন বলে উঠল—'জ-অ-অ-ল'। বুকের ছাতি শুকিয়ে গেছে, গলার নলী শুকিয়ে গেছে, জিহ্বার গ্রন্থিগুলো শুকিয়ে কাঠ। সাদা মুখ দিয়ে কুকুরের লালার মতো গড়িয়ে আসছে থাম।

'দাঁড়াও, দাঁড়াও' বেলা সামনের একটা চায়ের দোকানীর কাছে ছুটে যায়। সেই মুহূর্তে আবার একটি ট্রেন ঐ প্ল্যাটফর্মে এসে দাঁড়ায়। লহমায় গোটা প্ল্যাটফর্মটা গমগম হয়ে ওঠে হাজার হাজার মানুষে। বেলা এক খুঁড়ি জল নিয়ে পেছন ফিরতেই দেখে, সমরের বেঞ্চ আর তার মাঝখানে কয়েক ফুট পুরু মানুষের দেয়াল। বেলা যাবার চেষ্টা করে দু-একবার। গুঁতো লেগে খানিকটা জল চলকে যায়। সমরকেও দেখা যায় না। অত লোক দেখে ভিখিরীটা আরও আরও উচ্চগ্রামে গলা তুলে নেয়, যেন আর্তনাদ—

'বল্ ভালবাসা
তোর এমন কেন মলিন দশা?
সুখের গলা শুকায় গেলে
একঘটি কে জল দিবা—
বল্ ভালবাসা'....

অনেক চরণ পেরিয়ে একটি চরণে অসাধারণ ব্যঞ্জনা, 'বল্ ভালবাসা'-র এনামেলের থালা টং টং করে ধাক্কা মারে—জিজ্ঞাসা প্রবলতর হয়ে ফেটে যায় 'মলিন দশা-আ-আ-আ', তারপর জোরে বাতাস টানবার শব্দ, টনসিলটা নীচে নেমে আসে, নিখাদ থেকে 'সুখ', চলে যায় শুখা-র দিকে, ছাতিফাটা সুখে দাঁড়িয়ে সমান্তরাল 'একঘটি'-র সুর পেরিয়ে যেন আবহমান গোঙানো, টলমল হেঁচকী তোলবার মতো 'কে' কলকল করে বহে যায় 'জল দিবা', যেন জলের মতো প্রবহমান খরা সারা বুকে, আবার থালায় নখের আঁচড়, ঝনঝন্ করে গলায় ভেঙে পড়ে 'বল ভালবাসা আ-আ-আ'। বেলা এক খুঁড়ি জল হাতে একদিকে, তেষ্টায় বেহুঁস সমর নেতিয়ে আছে বেঞ্চে, মাঝখান দিয়ে হু হু করে মানুষের দেয়াল আর সবকিছু জুড়ে রনন তুলে যায়—'বল ভালবাসা'....'শুকায় গেলে একঘটি কে জল দিবা' '....মলিন দশা'—কাটা কাটা কথা, টুকরো সুর, বেলার হাতে কম্পমান জলের খুঁড়ি, মাঝখানে স্রোতঘূর্ণি মানুষের দেয়াল, ভেণ্ডারদের মালের পাহাড়, হাজার হাজার মাংস, গনগনে আঁচে ঘাম-ওঠা গলা, কোমরের চর্বির ভাঁজ, শরীর লবণাক্ত অসংখ্য শরীর। বেলাকে, তাই, কেঁপেই যেতে হয়, একখুঁড়ি জল হাতে একটু দূরে অপূর্ণ অচেতন তৃষ্ণাকে শায়িত রেখেও।

লোক যাওয়া শেষ হলে বেলা পৌঁছুতে পারে সমরের কাছে। কঁৎ কঁৎ করে গিলে ফেলে সমর।

'জ-অ-অ-ল'। বেলা আবার ছুটে যায়। আবার জল দেয়। আঙুলে তুলে কিছু জল চোখে, কপালে ছিটিয়ে দেয়। ভেজা চোখে সমর তাকিয়ে থাকে, বেলার দিকে।

'কি হলো গো? ভাল লাগছে একটু?'

চোখ বন্ধ করে, আবার খুলে, সমর ভাল-লাগা বোঝায়।

'এমন কেন হলো?'
'জানি না', সমর বলে।
'এখন কেমন লাগছে, এই?'
'দুর্বল লাগছে।'
'কি করব!'
'আমি আর পারছি না'—সমর চোখ বন্ধ করে।

বেলা কি করবে ভেবে পায় না। দ্রুত কপালে রেখায় ভাঙচুর হয়। হঠাৎ সে ঘাড় ঘুরিয়ে ডাকে—'কুলী, কুলী, কুলী'। লাল তকমা আঁটা একটি মানুষ এগিয়ে আসে।

'এ-কে বাইরের ট্যাক্সি-স্ট্যাণ্ডে নিয়ে চলো তো?'
'এক টাকা লাগবে মাইজী।'
বেলা চমকে তাকায়।

'বেহুঁস আদমীকে লিয়ে যেতে এক টাকা লাগে মাইজী।'

আবার বহুদূর থেকে যেন ভুক্তভ স্বর ভেসে আসে 'আমরা কোথায় যাব?' অনন্তর নগরীর রাজপথ, গলিপথ বাহিয়া এক বিপুল ছুটন্ত শবযাত্রা গৃহ-বাসস্থান হাহাকারে শূন্যতায় রাখিয়া ভাগীরথী অভিমুখে ধাবিত হয়। উত্তপ্ত ঘূর্ণি বাতাস গম্ভীর নাদধ্বনিবৎ সমবেত মানুষের আর্তনাদে গমগম্ করে। প্রখর অগ্নিতাপে গলিত পথে পথে সহস্র মানব-সমাহারের শিরাধমনীপ্রকট দশ অঙ্গুলী গাঁথিয়া গাঁথিয়া যায়। মধ্যাহ্ন নগরীর সমস্ত অধিবাসী প্রখর গতিতে ধাবমান। আকাশে চক্রাকারে ঘূর্ণমান গৃধ্রের ঝাঁকে নিম্নস্থ পৃথিবীর এই দীর্ঘ শবযাত্রা তীক্ষ্ণ নজরবন্দী করে। প্রস্তরে আঘাতপ্রাপ্ত নক্তক্ষরণে রক্তিম মানুষ, কুষ্ঠ রোগী গলিত মাংস লইয়া, বিকলাঙ্গ, অগ্রে নবজাতক নাড়ীছেদনের স্থান হইতে জন্মক্ষণের ক্রন্দনে আকাশ মুখরিত করিয়া, সহস্র বৃদ্ধ-বৃদ্ধা লোলচর্ম ঝুলন্ত পুরুষাঙ্গ ও স্তন লইয়া, কোটি কর্মণিক, চাকুরীজীবী, শ্রমজীবী, পরান্নজীবী, যুবক, সমগ্র নগরীর গৃহাদি শ্মশান করিয়া যেন উল্কার গতিতে ধাবমান ভাগীরথী অভিমুখে, ভাগীরথীর দুই তটভূমি স্তম্ভহীন লৌহনির্মিত বিশাল সেতুবন্ধে আবদ্ধ। কিলবিল সরীসৃপ-মণ্ডের ন্যায় তাহার উপরে কৃমিকীট-মানবজাতি, দুই তটরেখায় কর্দমে পিপীলিকাবৎ ছুটন্ত, ধাবমান, উন্মত্ত কোটি কোটি মানুষ আকাশে আর্তনাদে সচকিত করিয়া নগরপ্রান্তের সেই নদীবক্ষে দলে দলে ঝাঁপাইতে থাকে। জলপ্রবাহ যেন ঘর্মাক্ত লবণাক্ত মাংসলপ্রবাহে থিক্ থিক্ হইয়া যায়। অনাহারের তাড়নায় নহে, অপর্যাপ্ত শ্বাসবায়ু নিমিত্ত নহে, উদ্বেল জলরাশির ন্যায় দুরন্ত [illegible] মানবজাতির অবচেতনের স্বনিয়ন্ত্রণ [illegible] নিয়মমাফিক বিজনতা নির্জনতা, সামাজিক রুদ্ধতামুক্ত হইবার কামনা। ঘুরিয়া ঘুরিয়া গৃধ্র-র দল পৃথিবীর দিকে নামিতে থাকে, শ্মশানশহর হইতে শৃগাল সংঘ ভাগীরথীপূর্ণ পচা মানবমাংসের গন্ধে হিংস্র ব্যাঘ্রবৎ। এবং সেই স্তম্ভহীন লৌহনির্মিত সেতুবন্ধের গগনচুম্বী শীর্ষপ্রদেশ হইতে অর্ধাঙ্গিনীর হস্ত ধারণ করিয়া নিম্নস্থ নদীবক্ষে ঝাঁপাইবার ঠিক পূর্বমুহূর্তে চমক ভাঙে। ট্যাক্সির ভেতর নোয়ানো মাথা তুলতেই সমর বোঝে, পিঠের ওপর বেলার হাত। প্রণয়ের সময় পিঠে যেমন মেয়েরা হাত রাখে। ছুটন্ত ট্যাক্সির জানলা গলে বাতাস লাগছে চোখেমুখে, নদীর বাতাস, জলো হাওয়া। সমর মুখ ঘোরায়, চোখ তুলে, জন্মদিনের বেলাকে বলে, 'মইরা যাইতাম, মইরা [illegible]'

ব্যক্তিগত মৃত্যু

মানব গঙ্গোপাধ্যায়

অবিনাশবাবুর মৃত্যুর আগাম তারিখ পাওয়া গেল। তাও এতদিনে। এতদিনে মানে কুড়ি-পঁচিশ দিনে। এই প্রায় তিন সপ্তাহ ধরে সমস্ত পরিবারের কী আতঙ্ক কি হয় কি হয়। সর্বস্বান্ত হবার উদ্বেগে সংসারের সকলের মনে হয়েছে, যেন তিন যুগের আতঙ্কে এতকাল কেটেছে। এবার খবর এল, বড় জোর এক সপ্তাহ বা তিন চারদিনের মাথায়....। বিশেষজ্ঞদের মত। নড়চড় হবার উপায় নেই। অবিনাশবাবু এবার মরবেন।

মাত্র দু মাস আগে তিনি অবসর নিয়েছেন। অবসর নেবার ফটোটি এখনও তাজা আছে। ফ্রেমে বাঁধাবার সময় পর্যন্ত পাওয়া গেল না। বড় ছেলে অবশ্য সেদিন ফটোটির দিকে তাকিয়ে না ভেবে পারেনি। শেষের দিনের ফটো আর এই অবসর নেবার ফটো এক সঙ্গেই বাঁধিয়ে নেবে। না, দুটো আলাদা ফ্রেমেই।

তবু এই তিন সপ্তাহের আতঙ্কে—একি ভুলে থাকা যায়? ভুলে থাকা গেলেও কেউ মনে রাখতে চায় না। অবিনাশবাবুর দিকে এখন নজর দেবার সময় এসেছে। হাতে সময় বড় কম—এক সপ্তাহ বা বড় জোর তিন-চার দিনের মাথায়। এতদিন তো চিকিৎসার ঝামেলায় অবিনাশবাবুর দিকে তাকাবার সময় পাওয়া যায় নি। এখন, যখন বিশেষজ্ঞদের অটল, অচল মত পাওয়া গেল, তখন...।'

গত মাসের শেষের দিকে মাথায় যন্ত্রণা হতে থাকে। গোড়ায় এনাসিন, পরে স্যারিডন, তারও পরে পাড়ার হোমিওপ্যাথ। শেষপর্যন্ত ডাক্তার। ডাক্তার সন্দেহ করলেন ব্রেন টিউমার। বেশ বড় ডাক্তার, মোটা ভিজিট। তবে অবিনাশবাবুর বাল্যবন্ধু, ভিজিট লাগল না। কিন্তু তিনি যা বললেন, তাতে সবার মুখ, বুক শুকিয়ে গেল। ভেলোরে অস্ত্রোপচার করাতে হবে। ভালো হলেও হতে পারেন। আর দেরি না করে ভেলোরে রওনা হওয়া উচিত। তবে একবার মেডিক্যাল কলেজে গিয়ে সব ঠিকঠাক করে নিতে হবে। কত খরচ হবে? তা কতদিন থাকতে হবে টিউমারের অবস্থা কি, এমনি সব নানা জটিল অবস্থার 'পর খরচ নির্ভর করছে। তবু? ডাক্তারবাবু ভাসা ভাসা জানালেন, পাঁচ-সাত হাজার টাকাও লাগতে পারে। সঙ্গে তো একজনকে যেতে হবে। তার খাওয়া-থাকা, তাও কতদিন কে জানে? হাজার দশেকে এসে ডাক্তার নিশ্চিন্তে থামলেন।

দশ হাজার, আশ্চর্য তো। অবিনাশবাবু অবসর নেবার সময় প্রভিডেন্ট ফান্ড, গ্র্যাচুইটি সব মিলিয়ে ঐ দশ হাজার টাকার মতই পেয়েছিলেন। সামান্য কেরানী। বড়-বাবুও হতে পারেননি কোন দিন। জমি কিনেছিলেন প্রভিডেন্ট ফান্ড থেকে ধার করে। মেয়ের বিয়ে দিয়েছিলেন তাও প্রভি-ডেন্ট ফান্ড থেকে ধার করেই। ইচ্ছা ছিল, এই দশ হাজার টাকা দিয়ে দুখানা ঘর তুলে ভাড়া দেবেন। আর নিজে তিরিশ টাকা ভাড়ায় যে বাসায় এতকাল আছেন তাতেই থাকবেন। ভাড়াতে আয়ের একটা পথ হবে।

এখন ভেলোরে না গিয়ে উপায় নেই। পথে বসাতে হবে।

দুটি ছেলে। দুটির বয়স হয়েছে, দুটিই বেকার। একটি মেয়ের বিয়ে হয়েছে। আরেকটি কলেজে পড়ে। ছেলে দুটি পথে বসবার আতঙ্কে নিজেরা যে বেকার একথাই প্রায় ভুলে গেল। ছোট মেয়েটি কলেজে যাওয়া বন্ধ করে দিল। থমথমে আতঙ্ক সকলের চোখেমুখে।

এমনি সময় মেডিক্যাল কলেজের তরফ থেকে খবর এল, ব্রেন ক্যান্সার। এডভান্সড স্টেজ, মাত্র কদিনের মামলা। তবু একবার চিত্তরঞ্জন ক্যান্সার হাসপাতালে দিয়ে...।' বড়ছেলেটি তখনই বাবাকে নিয়ে চিত্তরঞ্জন ক্যান্সার হাসপাতালে ছুটল। চিত্তরঞ্জন ক্যান্সার হাসপাতাল থেকে পাকা খবর এলো এক সপ্তাহ বা বড় জোর তিন-চার দিনের মাথায়। বাবাকে প্রথমে মেডিক্যাল কলেজে নিয়ে যেতে যেতে বড়ছেলেটি ভেবে ছিল, হঠাৎ হার্টফেলের মামলায় খরচে মৃত্যু ওদের মত ভাগ্যহীনদের হবে কেন?' ওদের কপালেই যত সব...। পাকা খবর পাবার পর বড় ছেলেটি এখন ক্যান্সারের পর হার্টফেলের মতই কৃতজ্ঞ। বিশেষজ্ঞদের মত জোর করে আঁকড়ে ধরে বসা গলায় বড় ছেলেটি জানায়, ডাক্তারদের ভালো কথা আর কী বলে, অথচ খারাপ কথাটি কখনও....।'

বাসার সবার বুকের ভার নেমে গেল। এখন নিশ্চিন্তে ভেলোর পর্বটি বিসর্জন করা যায়। অবিনাশবাবুর দিকে নজর দেওয়া যায়। চিত্তরঞ্জন ক্যান্সার হাসপাতালের প্রতি-

মানমর্যাদার মর্যাদা অনেক বাড়িয়ে দিয়েছে। পরিবারে তিনি এখন সম্মানিত ব্যক্তি।

সমস্ত বাড়ির লোক এবার নিশ্চিন্তে তাঁর জন্যে শোক শুরু করলেন। বুকের ভার কমে গেল। চোখে জল নেমে এলো।

চিকিৎসার সর্বস্বান্ত হবার প্রবল দুশ্চিন্তায় অবিনাশবাবুর স্ত্রীর চোখেমুখে আহারনিদ্রা উড়ে গিয়েছিল। যে মানুষ জীবনে বিশেষ কিছু করতে পারেনি, সারা জীবনে এমন কিছু সাধ-আহ্লাদ মেটায়নি, এমন কিছু কিছু স্বাচ্ছন্দ্যও দেয়নি। আর আজ বিনা একটা অসুখ বাধিয়ে সবাইকে পথে বসাতে বসেছে। স্বামীর পর এমন একটা বিদ্বেষ ও ক্ষোভ যা তিনি অতিকষ্টে অনেক সংযমে গোপন করতে চেষ্টা করছিলেন, কিন্তু সংসারের জন্যে উৎকণ্ঠার ছিদ্র দিয়ে এই অসন্তোষ পর পরই বের হয়ে পড়ছিল। শেষে এসে তো রাস্তায় ভিক্ষে করতে হবে। সপরিবারে প্লাটফরমে বাসা বাঁধতে হবে। প্লাটফর্মে নামবার জন্যেই সে তার নারী-জন্ম এ তিনি ভালো করেই জানেন। একটা মানুষের জন্যে গোটা সংসারটা নষ্ট হতে চলেছে, সেই মানুষটার মুখের দিকে তিনি তাকাতে পারছিলেন না। ইতিমধ্যে তিনি আধাইচ্ছায় আধা-অনিচ্ছায় কিছু ভাবিষ কবচের খরচও যোগাড় করেছিলেন। যদি ভেলোরে রবিকল্প জ্যোতিষশাস্ত্রে কিছু থেকে থাকে। কিন্তু ছেলে যখন পাকা খবর নিয়ে এলো, যখন সঠিক খবর জানা গেল স্বামী তাদের পথে বসিয়ে মরছেন না, চিকিৎসারও বিশেষ কিছু নেই, বাড়ি তেরারীর টাকায় স্বামী ভাগ বসাচ্ছেন না, নিজের চিকিৎসায় সব সম্বল উড়িয়ে দিচ্ছেন না, তখন যেন তিনি এতদিন পরে, এতদিন মানে বহু বছর পরে, স্বামীর দিকে তাকাবার অবসর পেলেন। আজ যেন তিনি স্বামীকে অনুভব করলেন। তার জন্য কৃতজ্ঞতায় চোখে হু হু করে জল নেমে এল। ভেলোরে না যাবার আকস্মিকতায় স্বামীকে রীতিমত একান্ত মনে হল। এ কদিনের প্রবল দুশ্চিন্তার হাত থেকে রক্ষা পাবার প্রবল উচ্ছ্বাসে দরজা বন্ধ করে স্বামীর জন্যে প্রাণপণে কাঁদতে থাকলেন। স্বামীকে এতদিন পরে ভালো করে মনে পড়ল। মনে পড়ল, একটা মানুষ ছিল। সংসারে আর পাঁচজন থেকে ভিন্ন করে আজ মানুষটাকে ভালো করে তিনি অনুভব করে একটা পতিব্রতা নারীর গৌরব ও প্রায় নিজের অগোচরে অনুভব না করে পারলেন না। প্রায় বিনা খরচায় এত তাড়াতাড়ি মরে যাবার মধ্যে দিয়ে তিনি যেন জীবনে এই প্রথম মানুষটার কাণ্ডজ্ঞানের পরিচয় পেলেন। অস্পষ্ট অস্পষ্ট এই ভাবনাগুলোকে একধারে ঠেলে তিনি স্পষ্ট করে ভাবলেন, ভাবলেন কান্নার স্রোতকে চালু রাখবার জন্যে, কাউকে কষ্ট না দিয়ে সংসারের জন্যে সারা জীবন খেটে আজ মানুষটা চলে যাচ্ছে। কথাটা আঁকড়ে ধরে এই কথার ইন্ধনে কান্নাকে জাগিয়ে রাখলেন।

এ কদিন বড় ছেলেও দুশ্চিন্তার অস্থির হয়ে উঠেছিল। প্রভিডেন্ট ফান্ড, গ্র্যাচুইটির টাকা কটা যদি এতেই....। এ সময়ে বাবার সম্বন্ধে ওর সব অভিযোগগুলো যেন একসঙ্গে মনে পড়তে লাগল। মেজাজ খারাপ হয়ে যায় ভাবলে। এতকাল অফিসে কাজ করলেন, অথচ কোন ইনফ্লুয়েন্স নেই। বাবা অবশ্য ওকে নিয়ে নানা জায়গায় ধরণা দিয়েছে, কিন্তু কেউ আমল দিয়েছে? এত নন-এন্টারপ্রাইজিং। যেই বাবা একটা চাকরিও জুটিয়ে দিতে পারেননি, এখন সংসারের সব দিয়ে তার চিকিৎসা কর। নিজেকে সংযত করতে ওর রীতিমত কষ্ট হয়েছে। এদিকে রুনুর তর সইছে না। বারবার এক কথা বিয়েটা হয়ে যাক—অনেক দিন তো হল। রুনুকে বলতেই হয়েছে, বাবার অফিসে একটা টেম্পোরারী এপয়েন্টমেন্ট পেয়েছি। না বললে, আর প্রেস্টিজ থাকছিল না। বিয়ের বায়না। চাকরি নেই বাকরি নেই, বাসায় বিয়ের কথা বলব কোন মুখে। অথচ দেখা হলেই—। বাবার অসুখে একটা ছুতো পাওয়া গেছে, এখন কি বাসায় বিয়ের কথা বলা যায়? বাবার নিশ্চিন্ত মৃত্যুর তারিখ জানবার পর একদিকে যেমন নিঃস্ব হবার দুশ্চিন্তা কেটে গেল, তেমনি, অন্ততঃ অশৌচের বছরের জন্যে রুনুর হাত থেকে বছরখানেক এর জন্য অব্যাহতি পাওয়া যাবে। একটা বছর তো আপাততঃ পাওয়া গেল। [illegible]ছাড়া এরই মধ্যে সংসারের সব বিষয় ওর [illegible] মা পরামর্শ করতে শুরু করায়, [illegible] কর্তৃত্বের স্বাদ ওকে বেশ গম্ভীর [illegible] তুলল। ভাই-বোনদের উদ্দেশ্যে বলে, এতদিন বট গাছের ছায়ায় ছিলেন, অ্যাপ্রিশিয়েট লাগেনি। বাবার মত এমন ভালো লোক, নিজের বাবা বলে বলছিনে—এমন অনেস্ট। বাবার রেশন-কার্ডটি সারেন্ডার করতে হবে মনে পড়তেই থেমে যায়। এ বাজারে একটা রেশনকার্ড চলে যাওয়া। বাবার মৃত্যুর ক্ষতিটা এবার নিজের সামনেও স্পষ্ট।

ছোট ছেলেও ভেলোরের আতঙ্ক থেকে রক্ষা পেয়ে নিশ্চিন্তে একটা সিগারেট ধরায়। দাদা তো সংসার দেখবার নাম করে কলকাতাতেই থেকে যেত। ওকেই হয়ত ভেলোরে পাঠাত বাবার সঙ্গে। সেখানে সব সাহেবসুবো ডাক্তারদের সঙ্গে ইংরেজিতে কথা বলা, কি করতে হবে, যা হবে না, কী ভয়ংকর। একটা অফিসে ঢুকতে ওর বুক কাঁপে, একটা যেন [illegible]

হয়ে ওঠে। আর ওকেই কিনা একটা আধা-অজ্ঞান রোগীকে নিয়ে সেই মাদ্রাজ না কোথায়—কার্তিকদের পথ কে জানে, যেতে হবে। জীবনে বর্ধমান আর কোলাঘাট ছাড়া কোথাও যায়নি। আর ওকেই কিনা। অথচ বাড়িতে জানিয়েছে—জানিয়েছে বারংবার ও সাড়ম্বরে—ওর মত ইংরেজী প্রফেসাররাও—কত হিপিকে আচ্ছা করে কবে ইংরেজিতে এমন গাল দিয়েছে। পথেঘাটে সাহেব অবাঙালীদের ইংরাজিতে এমন তাড়া করেছে। ওকে ভেলোরে না পাঠিয়ে এখন ছাড়বে না। দুশ্চিন্তায় ওর রাগ হয়ে যায়—কই, একবার পুরী যেতে চেয়েছিল, তখন তো কেউ রাজী হয়নি। টাকা কোথায়? এখন ওকে কেন? রেশন, দুধ, রুটি, মিউনিসিপ্যালিটি সবই দাদা করে। রকে বসে আড্ডা দেওয়া ছাড়া ওর বিশেষ কাজ নেই। পরীক্ষায় টুকে বি এ পাশ করেছে। সুতরাং শিক্ষিত আর বেকার বলে বাবার সঙ্গেই ওর বিবাদ। বাবার মৃত্যুর এক সপ্তাহের নোটিশ পেয়ে বুক থেকে পাথর নেমে গেল।' রকের বড়দের জামাল, ক্যান্সারের এনসার নেই ঠিকই, কিন্তু লন্ডনে, রাশিয়ায় একবার ক্যান্সার সন্দেহ করলে তক্ষুনি বাসা থেকে তুলে নিয়ে ডাক্তাররা শেষ পর্যন্ত লড়ে যেত। সঙ্গে সঙ্গে একটা আধা চিন্তা পলকে ওকে কেমন স্বস্তি দিয়ে যায়। বাবার মৃত্যুর পর অন্তত দিন দশ বারোর জন্য এই সিগারেট দোকানের ও অন্যান্য ধারগুলোর তাগাদার হাত থেকে নিশ্চিন্ত। ভেলোরে যেতে না হবার মহা-স্বস্তিতে ও কদিনের তাগাদার হাত থেকে বাঁচবার পুলকে বন্ধুদের বলে, আমাদের সমাজে মানুষের মূল্য। সঙ্গে সঙ্গে দাদা সংসারের সর্বেসর্বা হতে যাচ্ছে, এ কথা মনে পড়তেই কেমন একটা বিপন্নও বোধ করে। বাবার কাছে যা হোক দু-চারটে পয়সা, আর দাদা যা চিজ্‌। এবার নিরীহ বাবার কথা ওর মনে পড়ে।' বাবার অভাব ওকে কেমন চিন্তিতও করে। বাবার আসন্ন মৃত্যুর গুরুত্ব ওর চোখে পড়ে।'

বড় মেয়ে সংসার নিয়ে মহা ঝামেলায়। স্বামী একটা কারখানায় মেসিনম্যান। কার-খানায় ধর্মঘট শুরু হয়েছিল কিছুকাল আগেই, এখন লক-আউট। বাবার মাথার যন্ত্রণা, ভেলোরে যাবার সম্ভাবনা, চিত্তরঞ্জন হাসপাতাল, এসব কোন সংবাদই এসে পৌঁছয়নি। বাপেরবাড়ি যাওয়াও হয়নি বেশ কিছুকাল। যদিও কদিন পরে স্বামী ছেলে-মেয়ে নিয়ে ওকে বাপেরবাড়ি যাবার তাগাদা দিচ্ছিল। কারণ আর সংসার চলছিল না। গত মাসের মাইনে হয়নি, সঞ্চয় নেই। এদিকে এ মাসও যেতে বসল। চারটি ছেলেমেয়ে নিয়ে এ বাজারে....। এমন সময় ছোট ভাই এসে বাবার মৃত্যুর তারিখ জানিয়ে গেল। কয়মুহূর্তের জন্যে হতভম্ব। তারপর চোখ মুছতে মুছতে তক্ষুনি ছেলেমেয়ে স্বামী নিয়ে বাপেরবাড়ি রওনা হবার জন্যে তৈরী হতে লাগল। বাপেরবাড়ি বেশ কদিন ছেলেমেয়েদের নিয়ে থাকবার একটা ন্যায্য কারণ পেয়ে ভেতরে ভেতরে কী পরিমাণে স্বস্তি ও আনন্দ পেল তা বলবার নয়। কারণ, আগামীকাল একমুঠো চাল বা পয়সাও আর থাকবে না। স্বস্তিতে কাঁদতে কাঁদতে ছেলেমেয়েদের জামা-কাপড় পরিয়ে নিজেও শাড়ি পাল্টে যা নেবার তা তাড়াতাড়ি গুছিয়ে নিয়ে স্বামীকে তৈরী হতে জানিয়ে ফিস্‌-ফিস্‌ করে বলল, মোড়ের মাথায় ফলের দোকান থেকে অন্ততঃ এক টাকার মোসম্বী নিয়ে যেতে হবে। তোমাকে হয়ত ধার দেবে না আমাকে ফেরাতে পারবে না। তুমি পাশের বাড়িতে রেশন কার্ডগুলি দিয়ে এস। ওরা যেন তুলে নেয়। বড় মেয়ের কাছে বাবার মৃত্যু শুধু স্বস্তিই দেয়নি-একটা চ্যালেঞ্জও এনেছে। সবাই জানে, বড়দির মন নরম—অল্পেতেই কেঁদে ফেলে। এখন সেই নরম মনের পরিচয় কি ভাবে দেবে—দুশ্চিন্তায় ইতিমধ্যেই ভেতরে ভেতরে রীতি-মত অস্থির। এখন তো কাঁদতে কাঁদতে ঢুকবেই—সেই সময় সেই চার-পাঁচদিনের মাথায় অন্তত আছাড় খেয়ে অজ্ঞান....। কিন্তু কোনটাই মনোমত না হওয়ায় নিজের পর বিরক্তিতে স্বামীকে জানায়—বিপদ যখন আসে তখন সব দিক থেকেই আসে।

ছোট মেয়ে সবচেয়ে ছোট হলেও আদরের নয়। ময়লা রঙ, দেহ শীর্ণ। চোখ-মুখ দিদির তুলনায় খারাপই। কলেজে কেউ ওর দিকে বেশি মনোযোগ দেয় না, অনায়াসে ওর কাছ থেকে মনোযোগ পিছলে যায়। পরীক্ষার ফল মনোমত হয় না। নিয়মিত রোববারে রাশিফল পড়ে। পরীক্ষার আগে, পরে, কোন ছেলের সঙ্গে আলাপ হবার আগে, পিছে। না, কিছু ফলে না। তবু না পড়ে পারে না। ও জানে কেউ ওকে বিয়ে করতে আসবে না, কেউ ভালবাসবে না। ওর বিয়ে দেবার ক্ষমতাও বাড়ির লোকদের নেই। পছন্দ অপছন্দের কথা বাদ দিলেও। চুপচাপ থাকে। আর মন গুটিয়ে চলে। ভেলোরে যাবার আতঙ্ক যখন সকলের নাওয়া খাওয়া বন্ধ করে দিতে চাইল—তখন ভেতরে ভেতরে কোন বিশেষ উদ্বেগ ও উৎকণ্ঠা কেন যেন ওর হয়নি। শুধু এসময়ে দুশ্চিন্তা করতে হয়, তাই নিজেকে উদ্বিগ্ন রাখতে চেষ্টা করছে। ভেতর থেকে কোন সাড়া পায়নি তাকে আমল না দিয়ে সংসারের সকলের সঙ্গে পাশে বসবার আতঙ্কে আতঙ্কিত হবার জন্যে নিজেকে মানিয়ে নেবার চেষ্টা করে চলেছে। সকলের মন যুগিয়ে আতঙ্কিতও হয়েছে। শুধু ভেতরে ভেতরে সংসারের এই উৎকণ্ঠিত ও আতঙ্কিত চেহারা কেমন যেন শুধু একটা স্বাদ বদলের গোপন আনন্দই এনেছে তা নয়, এই পাশে বসবার আতঙ্কের মধ্যে কেমন যেন একটা প্রতিহিংসার অতি গোপন আহ্লাদ ওকে স্বস্তি দিয়েছে। যখন বাবার মৃত্যুর তারিখ দাদা দিয়ে এল, বাবার দিকে ওর নজর পড়ল। এতকালের অবহেলা, যন্ত্রণা, বেদনা ও দুঃখ ওকে প্রাণভরে কাঁদবার একটা সুযোগ করে দিল। শীতকাল তাই পাখাগুলো খুলে রাখা হয়েছে। একটা হাত পাখা হাতে করে বাবার পাশে বসল। এতদিন কাঁদবার কোন কোন সুযোগ সুবিধা ছিল না, সেই দিদির শ্বশুরবাড়ি যাবার সময়টুকু ছাড়া। তাও কতকাল হ'ল। এবার প্রবলভাবে কাঁদবার অন্তরঙ্গ না করে কাঁদবার সম্ভাবনায় ওর দেহ মন একটা গোপন আরামে উৎকণ্ঠিত হয়ে ওঠে। এমন একটা কাঁদবার সুযোগ পেয়ে যেন বেঁচে গেল। চোখের জল দুহাতে মুছতে মুছতে বাবার ঘাম মুছিয়ে দেয় হাত পা বুলিয়ে দেয়। বাবার দিকে যায় যায় তাকিয়ে কান্নার আকাঙ্ক্ষাকে তাজা রাখতে চায়। আর সেই মুহূর্তে সেই চরম সময় নিজেকে উজাড় করে দেবে হাল্কা, শূন্য করে দেবে। বাবার মৃত্যুকে জোয়ারের মত ধরে এক এক করে এতকালের জমানো বেদনা অব-হেলা অপমানকে চোখের লবণাক্ত স্রোতে ভাসিয়ে দেবে। বাবা এমন সুযোগ এনে দেওয়ায় নিজের অগোচরেই বাবার প্রতি কৃতজ্ঞতার একটানা বাতাস করে চলে। সেবার ভার, ওষুধ খাওয়াবার দায়িত্ব নিজেই

নিয়ে নেয়। শেষ কদিন বাবার কাছে সব সময় থাকবার জন্যে ওর অনেক কান্না কাঁদবার যে একটা অধিকার ও সঙ্গত কারণ রয়েছে তা যেন সবাই বুঝতে পারে।

জামাই এসে বুঝল, আজ তার দিকে কারো মনোযোগ নেই। দুমাস মাইনে পাচ্ছে না, রোজগার নেই, তাই শ্বশুরবাড়ির লোকেরা শ্বশুর মশায়ের অসুখের অছিলায় তাকে অবহেলা করছে। মনে মনে জানান, তোরা যে গোষ্ঠীশুদ্ধ বেকার, তোদের আমি অবহেলা করতে পারতাম না। একদিন রোজগার করতে না পারলে এমনি হয়। ঠিক আছে, এক জামানা চিরকাল থাকবে না তখন। তাছাড়া শ্বশুর মশায়ের ক্যান্সার হওয়াতে কেমন যেন ঈর্ষা হয়। মনে হয়, এমন একটা বড় অসুখ হওয়াতে যেন ওর শ্বশুরবাড়ির লোকদের সম্মান অনেক বেড়ে গেছে। বাড়ির আবহাওয়ার মধ্যে কেমন যেন একটা বড়লোকী ভাব দেখাতে পায়। আর বর্মঘাঁটি হবার মধ্যে চারদিক অনিশ্চয়তার জন্যে নিজেকে ছোট ভাবতে থাকে। বর্মঘাঁটি আর লক্ষ্মীঘাটে নিয়ে পাড়াপড়শীদের সঙ্গে আলাপ করবার ইচ্ছে চলে যায়।

বাড়ির ঠিকে ঝি বহুকালের, পনের ষোল বছরের। গিন্নির সঙ্গে সুখ দুঃখের কথাও চলে, ঝগড়াঝাটিও হয়। দুখানা বাসন বেশি হলে দশ দশ বার পা ফেলে। বাড়ির আবহাওয়া ওর গায়েও লাগে। ভেলোরে গিয়ে সব টাকা খরচ হলে ওর এতকালের চাকরি চলে না যায়। যখন বাবুর মরবার আর দেরি নেই জানতে পারল, তখন প্রথমেই মনে হল, এবার তো গিন্নির জন্যে ভিন্ন হেঁসেল হবে, আলা বাসন। এ তো আর দুএকদিনের ব্যাপার নয়, মাইনে না বাড়িয়ে পারবে না। ঝি মুখ কাচু মাচু করে রোগীর ঘর ঝাট দেয়, মনে মনে হিসেবের দুশ্চিন্তা কত মাইনে বাড়াবে কে জানে। মুখে সবাইকে বলে, বাবু আমাদের মাটির মানুষ গো, এতকাল রয়েছি, একবেলার তরে মুখ কখনো কালো দেখিনি, হেঁকে কথা বলতে শুনিনি।

যে বাবা বাঁচবে না তাঁকে শুধু ঘুম পাড়িয়ে রাখবার জন্যে একগাদা ওষুধের পয়সা দিতে বড় ছেলের মন খচ খচ করে। তবু নিজেকে উদার করতে ব্যস্ত। ছোট ছেলেকে ওষুধ আনতে দিচ্ছে বলে দাদা মাতব্বরী শুরু করে এখনই ওকে বাজার সরকার করে তুলল বলে ক্ষুব্ধ। বড় মেয়ে এসেই খানিক অচেতন বাবার সামনে খানিক সকলের সামনে কান্নাকাটি করে দাদাকে ডেকে বলে, মা'র জন্যে একদিন মাছ আনবি। বড় মেয়ে হেঁসেলের দায়িত্ব নেয়। ধর্মঘটের পর থেকে ওর ছেলেমেয়েরা মাছের কথা ভুলেই গেছে। বড় ছেলে এবার আর ছোট ভাইকে না পাঠিয়ে নিজেই বাজারে গিয়ে মা'র মত পঞ্চাশ গ্রাম মাছ নিয়ে আসে, বলে, এখন কি আর কারও কিছু খেতে ইচ্ছে হয়। দাদার কান্ড দেখে বড় মেয়ে হতভম্ব, জামাইয়ের পাতে একটুকরো দেবে না? এবার ওর বাবাকে মনে পড়ে। বাবা থাকতেই পঞ্চাশ গ্রাম। পঞ্চাশ গ্রাম মাছের মধ্যেই যেন ওর বাপের বাড়ির আদর শেষ হবার নোটিশ দেখতে পায়। এবার বাবার দাম ওর কাছে স্পষ্ট। মা ঘরে বসে চোখের জল ফেলেন স্বামীর নানা স্মৃতি মনে এনে ক্লান্ত চোখের জলকে বিশ্রাম দিতে অপরাধ বোধ করেন। কিন্তু বড় মেয়ে হেঁসেলের দায়িত্ব নেবার জন্যে দুশ্চিন্তা, নিজের কাছেও চাপা দিতে পারেন না। বড় খরচে হাত। মাস কাবারের বাজার, ভাঁড়ার আর হেঁসেল কেবল ডাকতে থাকে। ছোট মেয়েও বিরক্ত হয়ে ওঠে। দিদির বাচ্চারা এসে এত হট্টগোল শুরু করেছে, ওদের চোখে মুখে উৎসবের কৌতূহল লক্ষ্য করে দিদির পর চটে যায়। ওদের হট্টগোলে বাবার যদি একটু ঘুম ভাঙে। নিজের কান্নার ইচ্ছে নিস্তেজ হচ্ছে দেখে উৎকণ্ঠা বোধ করে। মনে মনে ভাবে, যেন অনেক আগেই বাবার মরে এসে গেছে, সত্যি বেশী আগে চোখের জল মুছতে শুরু করেছে।

অবিনাশবাবু মরছেন। মরছেন জানতে পেরেও বুঝতে চাচ্ছেন না। অনুমান করছেন কিন্তু বিশ্বাস করছেন না। মৃত্যুর জন্যে তিনি তৈরি নন। কিন্তু জীবনের স্বাদও তাঁর কাছে এমন কিছু মূল্যবান নয়। মূল্যবান দশ হাজার টাকা। যখন ভেলোরে গিয়ে দশ হাজার টাকা খরচ করে সর্বস্বান্ত হয়ে ভালো হয়ে আসতে হবে শুনলেন—তখন তিনি ভেঙে পড়লেন। না গেলে মরবেন, গেলে সর্বস্বান্ত হবেন। অথচ তিনি মরতেও চান না, সর্বস্বান্ত হতেও না। যখন ক্যান্সার হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হল, তখন যেন মৃত্যুকে আশেপাশে ঘুরে বেড়াতে দেখছেন। ফ্যাকাসে মুখে, একেবারে শুকনো গলায় তিনি শুনলেন, শুনলেন বড় ছেলের কাছ থেকে ক্যান্সার সাসপেক্ট করা হয়েছে মাত্র, ডাক্তাররা ঠিক বুঝতে পারছেন না। ভেলোরে যাবার পরামর্শই দিয়েছেন। বাবা পাছে ভেঙে পড়েন, তাই বড় ছেলে ভেলোর যাবার কথাটি আমরণ বাবার স্বপ্ন হিসেবেই রাখতে চইল। মেডিকেল কলেজও ক্যান্সার হাসপাতালে যাবার আগের কদিন স্ত্রীর অসন্তোষ, ছেলেদের মুখভার, সমস্ত সংসারের নিঃশব্দ আর্তনাদে তিনি যেন এক্সট্রিক হয়ে গিয়েছিলেন। চুপচাপ একা একা বসে মাথায় যন্ত্রণায় সয় দিতেন। কিন্তু ক্যান্সার হাসপাতাল থেকে ফিরে আসবার পর হঠাৎ বাসার আবহাওয়া বদল তাকে চমকে দিল। বাবার জন্যে ভেলোর গিয়ে যদি নিঃস্ব হতে হয় তবু বড় ছেলে চিকিৎসা করবেই, এই দৃঢ় প্রতিজ্ঞা বার বার তাঁর সামনেই বড় ছেলে ঘোষণা করতে লাগল। স্ত্রীর সহানুভূতি, মেয়ের সেবা সবমিলে তাকে কুণ্ঠিত করে অবাক করে তুলল, তেমনি কেমন একটা গোপনতর সন্দেহে তাঁর বুক পর্যন্ত শুকিয়ে গেল। তাহলে তিনি কি বাঁচবেন না? কিন্তু এমন দমবন্ধ করা চিন্তায় বেশিক্ষণ থাকা সম্ভব নয়, ভাবলেন, ভেলোরে গিয়ে ফিরে আসবে কিনা ঠিক নেই তাই স্ত্রীর সহানুভূতি, মেয়ের দেখা, ছেলের পিতৃভক্তি। কিন্তু এতকালের সংসারের অভিজ্ঞতা তাতে ঠিক হায় দেয় না। তবু এ চিন্তাকেই আঁকড়ে ধরে রইলেন। ঠিক ঠিক বিচার করবার মত দেহের মনের অবস্থা ছিল না। প্রায়ই চেতনা হারাচ্ছিলেন। তা ছাড়া বাঁচবার ইচ্ছা—ভেলোরে গিয়ে তাকে বাঁচাবার জন্যে সকলের ইচ্ছা এচিন্তার পর তিনি [illegible] চেয়েও বেশী নির্ভর করতে চাই[illegible]। কিন্তু দুতিনদিন যেতে না যেতেই চেতনা শুধু হারাচ্ছিলেন না, চেতনা কেমন নিস্তেজও হয়ে আসছিল।

তবু জ্ঞান হলেই এদের সর্বস্বান্ত করে ভেলোরে যাচ্ছেন, এ অপরাধ বোধও আত্মগ্লানিতে আবার অজ্ঞান হবার জন্যে লেভীর মত ব্যাকুল হয়ে ওঠেন। যন্ত্রণা যত প্রবল হচ্ছিল, তত ভেলোর যাবার তারিখ এগিয়ে আসছে বুঝতে পারছিলেন। হয়ত জ্ঞান হয়ে দেখবেন, ভেলোর হাসপাতালেই রয়েছেন। আরও একদিন যেতেই যন্ত্রণা অসহ্য। তখন জিজ্ঞেস করতে ইচ্ছে হয়, কবে নিয়ে যাবি রে ভেলোরে, আর যে সহ্য হয় না। তবু মুখ ফুটে ভেলোরে যাবার কথা বলতে পারেন না। অজ্ঞান হবার পিপাসা প্রবল। আবার চেতনা নষ্ট হয়। কিছুক্ষণের জন্যে যখন আবার জ্ঞান হয়, কিছুটা ওষুধ খান, ব্যথা কমে কেমন ঝিম ঝিম নেশার মত হয়, তখন সকলের ব্যস্ততা ও ব্যগ্রতার মধ্যে তিনি যেন ভেলোরে যাবার আয়োজনই দেখতে পান। তাঁকে বাঁচাবার জন্যে স্ত্রী ছেলে মেয়ের ব্যগ্র ব্যস্ততা ও উৎকণ্ঠায় ভারী সঙ্কোচ ও আনন্দ বোধ করেন। এতদিন ধরে—এতকাল ধরে স্ত্রী ছেলে মেয়েদের ভুল বুঝবার জন্যে নিজের ভেতরে একটা খুঁতখুঁতে অপরাধবোধও দেখা দেয়। ব্যথা যখন কিছুক্ষণের জন্যে কমে নেশার মত ঝিম ঝিম করে, তখন স্ত্রী ছেলেমেয়েদের পর কৃতজ্ঞতায় শৌখিন হয়ে ভাবেন ভেলোরে যাবার আগেই যেন আমার মরণ হয়।

কিন্নর কিন্নরী

হীরেন্দ্রকুমার বসু

এছাড়াও বার মাসে তের পার্বণের প্রতিটি সঙ্গীতমুখর অনুষ্ঠানগুলিকে শুধু যে সুরধারায় সুললিত করে গড়ে তুলতে হতো তা নয় তার আবহ শব্দ যোজনায় পরিবেশ সৃষ্টি করতে পূর্ণ আয়োজনের ভার আমার উপরই ন্যস্ত ছিল—যা শ্রোতাদের মনে সৃষ্টি করতো এক সূক্ষ্ম শব্দানুভূতি। যেমন— বাণীকুমার রচিত শিবরাত্রি অনুষ্ঠানে নাটিকার প্রথমেই পরিকল্পনা করা হলো ঝরণার পর পর শব্দে—পাদদেশে উপলসংকুল পথে খরস্রোতার কল কল ধ্বনির সঙ্গে প্রতিধ্বনিত উচ্চসুরে বেহালার তরঙ্গমালা—সত্যিই যা শ্রোতাদের শ্রবণে এক অভিনব শান্তি-শুভ্রতির সমাবেশ ঘটিয়ে চলেছিল। প্রভাতে আশ্রম দৃশ্যে ঊষার প্রথম মুহূর্তে পাখীদের কলকাকলীর সাথে সমাবেশ ঘটানো হয়েছিল এক অনবদ্য জলতরঙ্গের মত নতুন যন্ত্র—যার বর্ণনা আমি পূর্বেই বলে এসেছি। সমুদ্রবেলার দৃশ্যে শ্রোতারা সবাই শুনতেন অগণিত বীচিমালার তরঙ্গায়িত আছাড়ি-পিছাড়ি —যা ঘটানো হয়েছিল শ্রীশ বসুর 'সন্দিগ্ধা' বইতে। আমার রচিত 'বেদনার শাশ্বত রাগিণী' নাটিকায় সামান্য সারিগানের পিছনেও নদী ও নৌকার জলপথে দাঁড় টানার অনবদ্য ছপ ছপ শব্দের সঙ্গে দাঁড়ের বন্ধন স্থানের সূক্ষ্ম ক্যাঁচ ক্যাঁচ ঘর্ষণ ধ্বনি পর্যন্ত শোনাবার প্রচেষ্টাও শ্রোতাদের মুগ্ধ করে তুলেছিল। নাটক ও তার পরিবেশকে কি করে প্রাণবন্ত করে তোলা হবে তার চেষ্টায় আমরা একটুকু ত্রুটি করতাম না।

এইবার শুনুন আমাদের হাস! চুপেয়—তারপর কি হলো!

বি-কে পালের বাগানে লোকনাথ দৃশ্যটি সুষ্ঠুভাবেই তোলা সম্পন্ন হোলো। এরপর আমরা দরমাহাটার মল্লিক ওরফে ছোটো মল্লিক মশাইয়ের দমদমার বাগানে ছবি তুললাম গল্পের রোমান্টিক দৃশ্যায়।

বাগানের মধ্য দিয়ে একটি সুদীর্ঘ ঝিল চলে গেছে—তার মাঝে মাঝে ব্রীজ শুধু—ঝিলের দক্ষিণ পারে গড়ে তোলা একটি পাহাড়...পাহাড় বেয়ে একটি সিঁড়ি ঝিলে এসে নেমেছে।

নির্বাক চিত্রে তখন অভিনেতাদের বিশিষ্ট ডায়লগ ছবিতে চালিয়ে নেওয়া হোতো... যেগুলি পর্দায় টাইটেল লিখে দর্শকদের বুঝিয়ে দেওয়ার রীতি ছিল।

পাহাড়ী সিঁড়ি পথের একটি ধাপে আমি বসে, তার দুটো ধাপ তলায় আসন নিয়েছে শ্রীমতি লাইট।

আমি বললাম—দেখুন ধরে বেঁধে জোর করে বিয়ে দিলে আমি বিয়ে করব না বলেই এখানে পালিয়ে এসেছি।

উত্তরে ও দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বলে—আমারও ঠিক তাই।

কথাটা বলেই ও দাঁড়িয়ে উঠতে গিয়ে পা ফস্কে সিঁড়ি ধাপে উল্টে পড়ে...বলে, উঃ ওর পড়ে যাওয়া অবস্থা দেখে তাড়াতাড়ি ওকে কোলপাঁজা করে তুলে নি। সুবোধদা বলেন—কাট।

ইলাহিবকসের দেওয়ানি বৈঠকে বসেছে বন্ধুদের নিয়ে গানের আড্ডা। আমার হাতে হারমোনিয়ম—বাঁয়াতবলায় বসেছেন ধীরেন্দ্র কৃষ্ণ ভদ্র—পাশে বসে হাতে তাল দিচ্ছেন পংকজকুমার মল্লিক —সামনে বসে সিগার মুখে সত্য দত্ত সমঝদার শ্রোতা—এছাড়া অনন্ত (পরে নৈহাটি সিনেমার মালিক-ডাঃ আদিত্য গুপ্ত (ডেন্টাল সার্জন) আর

জীতেন ঘোষ
মেগাফোন কোম্পানির মালিক

বাংলা হিন্দীর আজকের নায়ক বিশ্বজিতের শ্বশুরমশাই মিঃ মৈত্র মহাশয়। সবাই মাথা নেড়ে তারিফ করছেন। এ সুটিংও শেষ হলো।

ঘড়িওয়ালা মল্লিকদের বরাহনগরের বাগান বাড়ি ঝিলে তোলা হলো—হিরো-হিরোইনদের চাঁদনী রাতে নৌকা-বিলাস।

এমনি করে এক এক করে সিন হয়ে চলেছে—বাকী মাত্র হিরো-হিরোইনের বিয়ের সিন্।

এরই জন্যে দরমাহাটার ছোটো মল্লিক মশাই এর কাছে গেলাম—ওঁদের চৌধুরী গাড়িখানা চাইতে বরের গাড়ির আশায়....যাতে চড়ে বর বিয়ে করতে আসবে।

উনি বললেন—তা—আসবে কোথায়?

আমি বলি—ওটা এখনও ঠিক করিনি (অর্থাৎ লোকেশনটা কোথায়)।

উনি বলেন—যদি বলি বর আসবে আমারই গাড়িতে ক্ষতি আছে কি?

আমি বলি—সে তো সৌভাগ্যের কথা।

উনি জিজ্ঞেস করেন—কে হিরো....আর হিরোইন্ বা কে?

আমি বলি—হিরো আমিই—আর হিরোইন মিস্ লাইট।......

উনি মৃদু হেসে জিজ্ঞেস করেন—মেয়ের পক্ষের বাড়ির মেয়েরা কারো কারো জানতে পারি কি?

আমি বলি নিভাননী, বেদনাবালা (আঙুরবালার বোন), রেডিওর আভাবতী, প্রভাবতী, আশালতা, প্রফুল্লবালা-তাছাড়া থাকবেন চুনীবালা দিদিমার ভূমিকায়, আরও অনেকে।

উনি বললেন—বরযাত্রী কারা—আমি বলি, ধীরেনবাবু, পংকজবাবু ইত্যাদি ইত্যাদি করে বিশ-ত্রিশজন.... বরকর্তা হচ্ছেন তুলসী লাহিড়ী।

খুশী হয়ে বলেন—বেশ। আমার বাড়িতে বর, বরযাত্রীসহ আসবেন—আমাদের চৌধুরী চড়ে। বিবাহ বাসর হবে পুজোর দালানে, ভেতরের উঠানে সাজানো হবে ছাতনাতলা....বর বসবে উঠানে বরাসন সিংহাসনে—দালানে লোকজন খাবে সমস্ত ব্যবস্থাই আমি করব—এমনকি খরচ পর্যন্ত—কেমন রাজী?

আমি বলি—খরচ আপনি করবেন কেন?

উনি বললেন—আমার সখ—আমি বরকে আর কনেকে আসল গয়না পরিয়ে সাজিয়ে দেবো।

তথাস্তু বলে—সুটিং এর দিন ধার্য করে—বাড়ি ফিরে সুবোধদাকে খবর দিলাম—সুবোধদা বললেন সত্যিই সৌখীন ভদ্রলোক। তার পরদিনই লোকেশনে গিয়ে

শুভক্ষণে সুবোধদা আমার এডিটিং-এর হাতে-খড়িও দিলেন। যতটুকু অভিনয়াংশ রাখার প্রয়োজন যে শটে—সেইটুকুই রেখে অপর শটের প্রথমাংশের একপ্রান্তের সঙ্গে কনটিনিউটি মিলিয়ে দুটি অংশের মিলনের জায়গা কাঁচি দিয়ে সুষ্ঠুভাবে কেটে কাঁচির ফলাকে প্রতি অংশের একটি করে ফ্রেমের ধার চেঁচে, দুটিকে পরস্পরের ওপর চাপিয়ে সিমেণ্ট (ফিল্ম জোড়ার আঠা) দিয়ে জুড়ে গল্প এগিয়ে নিয়ে যেতে হতো।

সুবোধদা বলতেন—কোন দৃশ্যের কতটুকু অংশ থাকা উচিত—তার সূক্ষ্ম বিচারবুদ্ধি যার যত প্রখর, তিনি ততই ভাল এডিটার। আবার এডিটিং না জানা ডিরেক্টারের মূল্য কিছুই নেই।

একদিন দুপুরে বসে বসে এডিটিং চলেছে, এমন সময় বিখ্যাত ক্যামেরাম্যান কৃষ্ণগোপাল (ভূতপূর্ব ক্যামেরাম্যান—ব্রিটিশ ডোমিনিয়ন) ও তাঁর সঙ্গে একটি সুপুরুষ যুবক হাসি-হাসি মুখে আমাদের সামনে এসে দাঁড়ালেন। যুবককে দেখলে চোখ যেন টেনে নেয় এমনিই বুদ্ধিদীপ্ত মুখ। সুবোধদা আমার সঙ্গে এঁদের দুজনার পরিচয় করিয়ে দিলেন। কৃষ্ণগোপাল বাবু ও শ্রীপ্রমথেশ বড়ুয়া....ইনি সেই প্রখ্যাত প্রমথেশ বড়ুয়া—যিনি গৌরীপুরের রাজকুমার! বিস্ময়ে চেয়ে থাকি।

মিঃ প্রমথেশ শ্রীধীরেন গঙ্গোপাধ্যায়ের (ডি-জি) প্রতিষ্ঠিত বৃটিশ ডোমিনিয়নে তাঁর প্রথম ফিল্মী হাতে-খড়ি সেরে পশ্চিম পৃথিবী পর্যটন করে সবে ফিরে এসেছেন। ওখানকার অভিজ্ঞতা নিয়ে নিজের বাসভবনের হল-ঘরটিকে স্টুডিওতে পরিণত করে বাংলাদেশে সর্বপ্রথম ইলেকট্রিক আলোর সাহায্যে ছবি তোলার চেষ্টা করছেন। ওঁর এই পদ্ধতিতে 'অপরাধ' নামক একটি ছবি তুলছেন। মিঃ কৃষ্ণগোপাল তাঁর ফোটোগ্রাফার....আর উনি নিজে হিরো এবং ডিরেক্টর।

মিঃ বড়ুয়ার আগে আলোক-সম্পাতে ছবি তোলার প্রচেষ্টা আর কেউ করেন নি। মিঃ বড়ুয়াকেই তাই সর্বপ্রথম এর প্রবর্তক নিঃসংকোচে বলা চলে।

ইলেকট্রিক আলোকে ছবি তোলার রীতি-নীতি, সুবিধা-অসুবিধা নিয়ে অনেকক্ষণ আলোচনার পরে মিঃ বড়ুয়া সুবোধদার ওপরেই ওঁর ছবির নেগেটিভের ভার দিলেন। আমাদের এই ল্যাবরেটরীতে অপরাধ ছবির ডেভলাপিং, প্রিণ্টিং হবার সব ঠিক-ঠাক হয়ে গেল।

ওঠার সময় তিনি তাঁর নতুন ইলেকট্রিক স্টুডিওতে নিমন্ত্রণ জানিয়ে গেলেন—এ বিষয়ে সুবোধদা ও আমার দুজনেরই ঔৎসুক্য কম নয়....অ ছাড়া উনি আলোর ফিল্ম এক্সপোজের সম্বন্ধেও কৃষ্ণগোপাল বাবুর সঙ্গে আলোচনা করে নেবেন স্থির করলেন।

ঋষির প্রেম ছবিতে নায়ক হীরেন বসু এবং পার্শ্বে নায়িকা সরযূবালা

সময় করে একদিন দুজনেই মিঃ বড়ুয়ার স্টুডিও দেখতে গেলাম। দেখলাম ওর হল-ঘরেই সেটিং লাগিয়ে স্যুটিং চলেছে। ইসারায় অপেক্ষা করতে বলে শট্ শেষ করলেন, তারপর সকলের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেন।

প্রথমেই পরিচয় করালেন ডি-জির সঙ্গে: ডি-জির নাকি ইতিমধ্যে অনেক বিপর্যয় ঘটে গেছে, তাই স্টুডিও তুলে দিয়ে চুপটি করে তিনি ঘরে বসেছিলেন। মিঃ বড়ুয়ার বহু অনুরোধে তিনি এসে ওঁদের প্রোডাকশনের দায়িত্ব নিয়েছেন। (ওঁর স্ত্রী-বিয়োগ ঘটায় উনি তখন নিজেকে সব কিছু থেকে সরিয়ে রেখেছিলেন।)

দেখা হলো সমর ঘোষ মশাই-এর সঙ্গে... ইনি আমাদের পাড়ারই ছেলে—আমার পরিচিত। চীফ ইলেকট্রিশিয়ান হয়ে মিঃ বড়ুয়াকে সাহায্য করছেন। চুপি চুপি বললেন, মিঃ বড়ুয়া টকী মেশিন বুক করে এসেছেন—ওটা এসে গেলেই আমি সাউণ্ডে চলে যাবো। আর দেখলাম বেণু লাহিড়ী (নীরেন লাহিড়ী) ও সুশীল মজুমদার দুজনকে। ওঁরা দুজনেই আমার পরিচিত। বেণু সুগায়ক এবং নাটোর পরিবারের কুটুম্ব....গান বাজনার সূত্রে তাঁর সঙ্গে আমার আলাপ—আর সুশীলের সঙ্গে আলাপ ইউনিভার্সিটি ইন্সটিটিউটের নাটক অভিনয় কালে। ইনি আবার প্রখ্যাত কংগ্রেসসেবিকা হেমপ্রভা মজুমদারের বড় ছেলে।

এই সূত্রে মিঃ কৃষ্ণগোপাল ও প্রমথেশ বাবু প্রায় রোজই আমাপুকুরের ল্যাব-রেটারীতে আসতে শুরু করলেন।

মিঃ বড়ুয়া লোকটিকে আমার খুবই ভাল লাগতো। চেহারায় যেমন ছিমছাম, কথাবার্তায়ও তেমনি অল্পভাষী—তবে অসম্ভব রসিক আর ভদ্রতায় তুলনা-বিহীন। রাজকুমার হয়েও মনে এতটুকু গর্ব ছিল না। সুবোধদার ঘরে বসে কালোসুতোর বিড়ি পর্যন্ত তাঁকে হাসিমুখে টানতে দেখেছি। তাঁর মুখে প্রায়ই বিদেশী স্টুডিওর গল্প শুনতাম......মনে হতো ভদ্রলোক বুঝি কোনো তীর্থভ্রমণ করে এসে তাঁর পুণ্যাপুণ্যের ফলটুকু আমাদের মধ্যে প্রসাদের মতো ছড়িয়ে দিচ্ছেন। কত যে বিদেশী শিল্পীদের অমূল্য তত্ত্ব তিনি অকপটে ব্যক্ত করতেন তা বলা যায় না।

সুবোধদা ছবি প্যাক্ করে এনেছেন। একদিন বললেন, এবার হাউসে হাউসে ঘোরো হে—ছবি রিলিজ করার ব্যবস্থা তো করতে হবে।

আবার সুবোধদার শরণ নিলাম...

হাটচাঁদ বড়ালের বাড়ি গানের জলসায় আমার পৃষ্ঠপোষক ছিলেন শ্রীঅমর মল্লিক মশাই।

(চলবে)

শহরের তলানী শহরতলী

মিহির গঙ্গোপাধ্যায়

ভোর থেকে গভীর রাত পর্যন্ত ভিড়ের আর শেষ থাকে না। সে ভিড় উজানের চেয়ে ভাঁটিতে অনেক বেশী। সাইকেলে, সাইকেল রিক্সায়, পায়ে হেঁটে চলমান সেই জনতায় নারী পুরুষ, ধনী গরীব, মূর্খ পণ্ডিত, অফিসার বেকার, সাধু অসাধু, বাস্তু-ঘুঘু থেকে বাউণ্ডুলে সবাই আছে—সবাই।

তাদের সবার লক্ষ্য হয় স্টেশন, না হয় শেরশাহের তৈরী জি টি রোডের বিভিন্ন মোড়। জি টি রোড চলেছে, দক্ষিণ থেকে উত্তরে। তার সঙ্গে সমান্তরাল রেখায় বয়ে চলেছে ভাগীরথী। এখানে কেউ ভাগীরথী বলে না। বলে গঙ্গা।

গঙ্গার ধারে ধারে অনেক ঘাট। অধিকাংশই ছিল বাঁধাঘাট। সকাল থেকে দুপুর পর্যন্ত যখন ঘাটগুলি স্নানার্থীদের ভিড়ে ভরে থাকত সে দিন গত হয়েছে। এখন ভাঁটার সময় বিভিন্ন কলকারখানার বাতিল করা নোংরা গঙ্গার জলকে পঙ্কিল করে তোলে। তখন আর যাই হোক তাকে পতিতোদ্ধারিণী বলে মনে হয় না। মনে হয় গঙ্গাকে পতিতদশা থেকে উদ্ধার করার জন্য আর একজন ভগীরথের আবির্ভাব দরকার।

গঙ্গার এই অনেক ঘাটের মধ্যে একটি খেয়াঘাট। খেয়াঘাটেও যাত্রীর ভিড় জমে ভোর থেকে। শীত গ্রীষ্মে জোয়ার ভাঁটায় এই ভিড়ের কোন ব্যতিক্রম হয় না।

বরাহনগর থেকে হালিশহর, বালি থেকে বাঁশবেড়িয়া পর্যন্ত বিস্তৃত শহর কলকাতার প্রতিটি শহরতলীর এই একই চেহারা, একই ছবি। ঠিকুজী, গাই গোত্র, কুল মেলেও মিল পাওয়া যাবে বিস্তর। এদের অনেকেই কলকাতার থেকে বেশী প্রাচীনত্বের হকদার। কলকাতার জন্ম হবার অনেক আগে এদের কারো কারো জন্ম হয়েছে। কলকাতা সভ্য-ভব্য হবার অনেক আগে এরা শিক্ষিত ও সংস্কৃতিসম্পন্ন হয়েছে। কিন্তু ধনী হতে পারে নি। তাই কলকাতা অনেক পরে যাত্রা শুরু করলেও বড় তাড়াতাড়ি বেড়ে উঠল বনস্পতির মত।

বড় গাছের ছায়ায় যারা থাকে তাদের ছোট গাছ হয়েই থাকতে হয়। জনঅরণ্যের বনস্পতি কলকাতার আওতার মধ্যে যে সব প্রাচীন গ্রাম ও বন্দর পড়ল তাদেরও সেই হাল হল। তাদের নতুন পরিচয় হল শহর কলকাতার শহরতলী। অনেকটা বড়লোকের অন্নদাস আত্মীয়দের মত।

মাথা না থাকলে মাথা ব্যথার বালাই থাকে না। তেমনি শহর না থাকলে শহরতলীও হয় না। অবশ্য শহর হলেই যে তার শহরতলী থাকবে তেমনও নয়। যেমন ইন্দ্রপ্রস্থ, কাশী, কাঞ্চি, সুরাত, আগ্রা বা পাটলিপুত্রের, কিংবা গৌড়, কর্ণসুবর্ণ কি মুর্শিদাবাদ কাশিমবাজারের শহর হিসাবে খ্যাতি কলকাতার থেকে কিছু কম না থাকলেও তাদের শহরতলী ছিল বলে জানা যায় না।

সেই হিসাবে শহরতলী কথাটি কলকাতা শহরের চেয়েও নতুন। ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী যদি কলকাতার জন্মের সৃষ্টিকর্তা হয় তবে জব চার্ণক কলকাতার নাড়ি কেটেছিলেন, ১৬৯০ সালের আগস্ট মাসে।

ইংরাজীতে সুবার্ব বলতে যা বোঝায় বাংলায় শহরতলী মানেও তাই। শহরতলীর বদলে তাকে শাখানগরও বলা যায়। একটি অভিধানে সুবার্ব শব্দের মানে দেওয়া আছে, লণ্ডনের মত শহরের এক বা একাধিক জেলা বা তার অংশ।

এই মানেটি আমাদের কলকাতার শহরতলীর সঙ্গে চমৎকার খাপ খেয়ে যায়। এর আর একটি মানেও বোধ হয় করা যায়। তা হল,

গাছের তলায় থাকে তার শিকড়। সেই শিকড়ের সঙ্গে গাছের যা সম্পর্ক শহরতলীর সঙ্গে শহরের সম্পর্কও তাই। গাছের ফুল ফল পাতার শোভা দেখে মানুষ মরিমরি করে। শিকড় তার কাজ করে যায় নীরবে নিভৃতে। শহর এক বিবেকহীন রাক্ষসীর মত শহরতলীর কর্মশক্তি, মেধা, প্রতিভা, সম্পদ লুঠ করে নিজেকে মোহিনী মায়ায় সাজায়। রাক্ষসী নিজেকে যতই তিলোত্তমায় রূপান্তরিত করার চেষ্টায় মাতে, একের পর এক গ্রাম ততই শহর রাক্ষসীর ঠাঁট-ঠমকে ভুলে তার স্পর্শ ও গন্ধ নেবার লালসায় উন্মাদ হয়ে নিজেকে হারিয়ে ফেলে। শহর-ঘেঁষা গ্রাম পরিণত হয় শহরতলীতে।

১৬৯০ সালে কলকাতার জন্ম হলেও তার প্রভাব প্রতিপত্তির কালপর্বের সূচনা ১৭৬৫ সালে। ঐ সময় ইস্টইন্ডিয়া কোম্পানী বাংলা-বিহার-ওড়িশার দেওয়ানী নিয়ে কলকাতায় কায়েমী হয়ে বসে। কোম্পানী শাসন চালাবার জন্য সশস্ত্র সেপাই আনে আপন মুলুক থেকে, নিরস্ত্র সেপাই অর্থাৎ বেনিয়া, মুৎসুদ্দী, দালাল, কেরানী বাহিনী গড়ে কালা আদমীদের নিয়ে। কোম্পানীর সেই স্বার্থবুদ্ধি থেকেই জন্ম নিল শহরতলী। আদি যুগের সেই শহরতলী গড়ে উঠেছিল প্রধানতঃ শহরের উত্তর অঞ্চলে। হুগলী শ্রীরামপুর, ব্যারাকপুর যখন শহরতলী হিসাবে বিখ্যাত হয়ে উঠেছে তখন কি ছিল যাদবপুর, টালিগঞ্জ, ঢাকুরিয়া বা গড়িয়ার পরিচয়? কোথায় ছিল সোনারপুর বা মজবজ?

কোন্নগরের বয়স অন্তত পাঁচ'শ বছর

এ সব জায়গা যখন অজ পাড়াগাঁ ছাড়া আর কিছু ছিল না তখন কাঞ্চনপল্লী কাঁচড়াপাড়া হয়ে, ভট্টপল্লী ভাটপাড়া হয়ে, কুমারহট্ট কামারহাটি হয়ে পরিণত হয়েছিল শহরতলীতে।

যদিও দেড়শ দুশ বছর আগে গঙ্গাতীরের এই সব জায়গায় বেশীর ভাগ বাসিন্দাই ছিল চাষি কৈবর্ত। কিছু জেলে, দু-এক ঘর কুম্ভকার, এক-আধ ঘর কর্মকারও ছিল নিশ্চয়। এলাকার বেশীর ভাগই ছিল ঝোপ-জঙ্গল, ডোবা, এঁদো বা বড় পুকুর এবং বাগানের দখলে। পথঘাট বলতে বড় রাস্তাটি ছাড়া আর কিছু ছিল বলে মনে হয় না। পথের আলো ছিল স্বপ্ন। ঘরের আলো বলতে সেজ ও পিদীম। নৌকাই ছিল একমাত্র বাহন।

বর্গীদের আক্রমণ বা মনসবদার বিদ্রোহের মত রাজনৈতিক ঘটনা যে সমাজ বিপ্লবের সৃষ্টি করল তারই প্রতিক্রিয়ায় কিছু ব্রাহ্মণ কায়স্থ এসে পড়লেন গঙ্গার ধারের এইসব গ্রামে। ওইসব গ্রামের মধ্যে একটি ছিল কোন্নগর। গঙ্গার পশ্চিম উপকূলের এই জায়গা কোনদিন বারাণসীর সমতুল ছিল কিনা তা বলা যাবে না। তবে প্রাচীন বাংলা সাহিত্যকে প্রমাণ হিসাবে ধরলে এলাকাটি যে সুতানুটি, গোবিন্দপুরের চেয়ে বর্ধিষ্ণু জনপদ ছিল তার প্রমাণ মেলে। ১৪৯৫ সালে বিপ্রদাস পিপলাইয়ের লেখা মনসামঙ্গল পুঁথিতে চাঁদ সওদাগরের বাণিজ্যতরী যে পথ ধরে যাতায়াত করত তার ধারের লোকালয়গুলির মধ্যে কোন্নগর ছিল অন্যতম। এই হিসাবে কোন্নগর অন্ততঃ পাঁচশ বছরের পুরান জনপদ। তখন কোথায় কলকাতা, কোথায় তার শহরের গর্ব?

শহরতলী বা শাখানগর হিসাবেও জনপদগুলির শতবর্ষ অতিক্রান্ত হয়েছে। 'শ্রীশ্রীমতি বিশ্বমাতা রাজেশ্বরী' ভিক্টোরিয়া ভারতবর্ষের রাজ্যভার নিজের হাতে নিলেন ১৮৫৮ সালের পয়লা নভেম্বর। 'ঐ দিবস সন্ধ্যা হইতে সমস্ত রাত্রি কলিকাতা মহানগর এবং শাখানগরের জলোস্থলে সমান শোভা হইয়াছিল।' প্রাত্যহিক-পত্র সংবাদ প্রভাকরের এই সম্পাদকীয় (২১।৭।১২৬৫) বিবরণের মন্তব্য থেকে অন্ততঃ এইটুকু সূত্র পাওয়া গেল যে, শাখানগর বা শহরতলীর সংখ্যাও সম্ভবতঃ ক্রমশ বেড়ে চলেছিল। ... সেই শহরতলী এলাকার মধ্যে হুগলী চুঁচুড়া পড়ত তার প্রমাণও ওই সম্পাদকীয় বিবরণে পাওয়া যায়। কোন্নগর, শ্রীরামপুর পেরিয়ে চুঁচুড়া যেতে হয়। তাই কোন্নগরও যে শহরতলী ছিল তাতে আর সন্দেহ কি?

রবীন্দ্রনাথ উপাসনাসঙ্গীত গেয়েছিলেন

ভিক্টোরিয়ার ঐ ভারতের রাজ্যভার হাতে নেওয়ার সময় আমোদ-আহ্লাদের প্রচুর আয়োজনের সঙ্গে গুণীজন সম্বর্ধনারও কিছু ব্যবস্থা হয়েছিল। তারই অংশ ছিল মহামহোপাধ্যায় উপাধি বিতরণ। প্রথম দফায় মাত্র দশজন সংস্কৃত পণ্ডিত ঐ উপাধি পেয়েছিলেন। তাঁদের মধ্যে একজন ছিলেন কোন্নগরের দীনবন্ধু ন্যায়রত্ন।

ওই দীনবন্ধু একবার মহা ফাঁসাদে পড়েছিলেন। শ্রীশচন্দ্র মহারাজের পুত্রের নিমন্ত্রণে তিনি গিয়েছিলেন কলকাতা। সেই সময় বিধবা বিবাহ চালু করার জন্য কলকাতায় জোর আন্দোলন চলছিল। দীনবন্ধু কলকাতা যাওয়া মাত্র কোন্নগরে জোর গুজব রটে গেল যে তিনি সেখানে বিধবা বিবাহের সভা শোভা করেছেন। গুজব এত গুরুতর চেহারা নিয়েছিল যে তাঁকে রাজা কমলকৃষ্ণের দরবারে গিয়ে নির্দোষ সাব্যস্ত করতে হয়। কোন্নগরের বিশালাক্ষী সড়কে তাঁর টোল ছিল। আজ দীনবন্ধু নেই, তাঁর টোলও

নেই। কিন্তু তাঁর ভিটে সংলগ্ন প্রাঙ্গণটি চৌধুরীপাড়ার মাঠ নামে সেই স্মৃতিকে কিছুটা জাগিয়ে রেখেছে।

প্রায় তারই সমকালে সাহিত্যসম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র কোন্নগরের মাঝকে অমর করে দিয়ে গেলেন তাঁর বিষবৃক্ষ উপন্যাসে। অবশ্য তার কিছুটা আগেই আধুনিক কোন্নগরের জনক শিবচন্দ্র দেব স্বগ্রামকে সাজিয়ে গুছিয়ে দেবার কাজ আরম্ভ করে অনেক দূর এগিয়ে দিয়েছেন। শিবচন্দ্রের শিক্ষাদীক্ষা প্রেরণা এ সবেরই শিকড় পোঁতা ছিল এপার মাইল দূরের কলকাতায়। তিনি শিক্ষক হিসাবে পেয়েছিলেন ডিরোজিওকে, ইয়ং বেঙ্গলীরা ছিলেন তাঁর বন্ধু, বিদ্যাসাগর ছিলেন ভাইয়ের মত, সুহৃদতা ছিল মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সঙ্গে।

শিবচন্দ্র ছিলেন ধর্মে গোঁড়া ব্রাহ্ম, পেশায় উচ্চ পদের রাজপুরুষ। এই শিবচন্দ্র এখন থেকে একশ তেইশ বছর আগে ইংরাজী স্কুল, একশ ঊনিশ বছর আগে সাধারণ পাঠাগার, একশ সতের বছর আগে বালিকা বিদ্যালয় গড়ে দেন। তাঁরই চেষ্টায় ওখানে চালু হয় ডাকঘর, প্রতিষ্ঠিত হয় রেল স্টেশন। উপাসনার জন্য ব্রাহ্মসমাজ তো ছিল। সেই সূত্র ধরেই রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ওই উপাসনা মন্দিরে এসে ব্রহ্মসঙ্গীত গেয়ে গেছেন।

গ্রামের জন্য এত করেও শিবচন্দ্র সমাজপতিদের মন পাননি। ছেলের বিয়ের সময় জানতে পারলেন, কোন কায়স্থ বা ব্রাহ্মণ তাঁর বাড়িতে জলস্পর্শ করবেন না। কারণ, তিনি বিধর্মী। তাই একঘরে।

এই গ্রাম একই ব্যবহার করেছিল শ্রীঅরবিন্দের বাবা ডাঃ কে ডি ঘোষের সঙ্গে। কে ডি ঘোষ ছিলেন কোন্নগরের সন্তান। কোন্নগরের স্কুল থেকেই তিনি এণ্ট্রান্স পাস করেন। পরে এবার্ডিন বিশ্ববিদ্যালয়ের এমডি হন। দেশে ফিরে শুনলেন কালাপানি পার হবার মহা অপরাধের জন্য তাঁকে প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে। না হয়, তিনি সমাজচ্যুত হয়ে একঘরের জীবন কাটাবেন। গ্রামবাসীরা তাঁর সঙ্গে সম্পর্ক রাখবেন না।

প্রখর ব্যক্তিত্বসম্পন্ন কে ডি ঘোষ বললেন, আমিই আপনাদের সঙ্গে সম্পর্ক রাখব না। প্রায়শ্চিত্ত করব না। তারপর বাস্তুভিটা বেচে তিনি দেশত্যাগী হলেন। আর ফেরেননি।

কোন্নগরের এই স্কুলে কেবল কে ডি ঘোষের মত ছাত্রই পড়েননি, শিশিরকুমার ঘোষের মত মহাত্মাও এখানে শিক্ষকতা করে গেছেন।

দিগম্বর মিত্র এবং ত্রৈলোক্যনাথ মিত্রও গ্রাম ছেড়েছিলেন তবে তা কোন সামাজিক শাস্তিবিধানের পরিণামে নয়, স্বেচ্ছায়। রাজা কৃষ্ণনাথের প্রাইভেট টিউশানি করে দিগম্বর নিজেই রাজা বনে যান। শহরতলী কোন্নগরের দিগম্বর সাহেবদের শহর কলকাতার প্রথম বাঙালি শেরিফ হয়েছিলেন। রামপুকুর রাজবাড়িতেই থেকে গিয়েছিলেন তিনি পাকাপাকিভাবে। বালক গদাধর দাদা রামলালের সঙ্গে কলকাতায় এসে উঠেছিলেন রাজা দিগম্বরের বাড়িতে। রাজা দিগম্বর বা তাঁর বংশের কেউ পরে আর কোন্নগরে বাস করতে আসেননি। শুধু একবার তাঁর এক বংশধর গ্রামে ফিরেছিলেন গাথাবল্লভী ও লেডি ক্যানিংয়ের রূপ ধরে। সে কথায় পরে আসছি।

তারও আগে আছে ডঃ ত্রৈলোক্যনাথ মিত্রের কথা। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম ডক্টরেটদের মধ্যে একজন ছিলেন ত্রৈলোক্যনাথ। তিনি চুঁচুড়ো কোর্টে ওকালতি করতেন। এলোকেশী মামলায় তারকেশ্বরের মোহন্তদের পক্ষে দাঁড়িয়ে ত্রৈলোক্য এমন নাম করেন যে, ইংরাজ বিচারপতি তাঁকে বলেন, বাবু, চুঁচুড়ো তোমার মত দুঁদে উকিলের উপযুক্ত আদালত নয়। তুমি

ডাউন টাউন

'রাজা যত বলে, পারিষদ দলে বলে তার শত গুণ।' এই লাইনটা কোন-কোন মানুষের স্বভাবের সম্পর্কে শুধু খাটে না। কলকাতার উপকণ্ঠের দিকে, যে উপকণ্ঠ অঞ্চলকে আজকাল গ্রেটার ক্যালকাটা বলা হয়— তাকালেই এই পদ্যাংশটা মনে এসে যায়।

একদা বিশেষ কাজে একদিন বিরাটি গিয়েছি। বিরাটি কলকাতা বাহান্ন, সে হিসেব, কলকাতাতেই আছি মনে করা যেতে পারে। শিয়ালদা থেকে আসা বাঁ দিকের ডান দিকের স্টেশনের পাশেই সিনেমা হল। তার মুখোমুখি ডোবা। ডোবার পাশ দিয়ে রাস্তা— অসমান, ইঁট পাত করা। প্রায় ফাঁকা রাস্তা —একটু এগিয়ে কালীঠাকুর আছেন। ঠিক সেই জায়গায় পৌঁছাতে একটি বাচ্চা ছেলে দৌড়ে এসে হাতে একটি লিফলেট গুঁজে দিল। সন্তোষীমা। পূর্ণ দুপুরের খাঁ-খাঁ রাস্তায় সিনেমা হলে সাতবাসি হিন্দী ছবি, কালীঠাকুর, তাঁর সামনে পিতলের থালায় কয়েকটি দশ ও পাঁচ পয়সা, নবজাগত সন্তোষীমার প্রচারপত্র ও বাচ্চা ছেলেটির রিলিজিয়াস ইকনমিক সিস্টেমের একক চাপ পেতেই বুঝলাম লিফলেটটি আপাতত ধরে বেড়াতে হবে। সেটিকে পকেটস্থ করে, বন্ধুর খোঁজে গেলাম। তিনি নেই। তাঁর প্রতিবেশীর বাড়িতে, আগে থেকেই পরিচয় ছিল বলে বসতে হল। কথাবার্তার ফাঁকে জানা গেল—শুক্রবার সন্তোষীমার পুজো তাঁরাও দিয়ে থাকেন। বাড়ির ন বছরের ছেলেটি, এরই মধ্যে, রামনারায়ণ রাম-এর সুর ভাঁজতে ভাঁজতে উপস্থিত। কাছাকাছি, বেশ কয়েকটি বাড়িতে সন্ধ্যে নাগাদ একটি কীর্তন হয়, যার শুরু, রামনারায়ণ রাম। ছেলেটির মাকে আমি ও আমার বন্ধু দুজনেই কাকিমা বলি। আমার শেষ করা চায়ের কাপ হাতে নিয়ে কাকিমা বললেন, কিরে, বিলুকাকে পেলি?

—হুঁ। বলে দিয়েছে। না লাগে নি।

কাকিমা ভিতরে গেলেন। একটু বাদে একটা ভাঁজ-করা কাগজ আর একটা আধুলি নিয়ে এসে বললেন, ঝম্পা, আর একবার যাতো!

—নমো। এই তো এলাম—সন্ধ্যেবেলায় যাবো?

—আরে এখন যা না, সন্ধ্যেবেলায় বার হলে তোমার বাবা বকাবকি করবেন। এই তো এখান থেকে একটু — স্টেশনের পারে। কী কুঁড়ে ছেলে দেখ বাবা! চায়ের সঙ্গে একটা সন্দেশ খেতে হয়েছিল বলে নিশ্চিত ছিলাম যে আধুলিটা অতিথি-সৎকারের নয়। জিজ্ঞেস করলাম, বিলু কে কাকিমা!

—ম্যা? কেউ না পাড়াসম্পর্কে.... ও, ওকে আবার পাঠাচ্ছি তাই বলছো? ও কিছু না মেয়েলি [illegible] পাম্বনের ব্যাপার!

আমার মনে পড়ছিল, কাকিমা আমাকে আজকেও হাত দেখিয়েছেন। বরাবরই উনি টাকা-পয়সার কথা জিজ্ঞেস করেন। কাকাবাবু রিটায়ার্ড, এখানে হোমিওপ্যাথি করেন, কাকিমার এক সৎ-ছেলে সামান্য কিছু টাকা পাঠায়। মান কথা, এঁদের আর্থিক জীবন কেমন যাচ্ছে না যাবে। ভাবতাম ভদ্রমহিলা বোধহয় লটারীর টিকিট কাটেন, তাই এত পীড়াপীড়ি। এখন, ল্যাটা খেলার একটি সুকর্মের দুঃশোর জন্যে, সবটা বুঝলাম এক ফাঁকে উঠে এলাম। যাবার সময় প্রণাম করতে ভুললাম না। গুরুজনকে যাঁরা শ্রদ্ধা করেন না কাকিমা তাঁকে কঠোর সমালোচ

টেন ধরে এলাম মামলায়। আমার বন্ধুটি সেখানেও থাকতে পারেন। স্টেশন থেকেই অ্যামোনিয়ার গন্ধে বোঝা যায়—ইহা দমদম। স্টেশন থেকে বাঁদিকে গিয়ে প্রথমে যে গলিটা পড়ে সেখানেই আমা

কলকাতায় যাও। সেখানে তোমার আরও নাম-ডাক, আরও প্রসার হবে।

ত্রৈলোক্যনাথ তাই করলেন। ভবানীপুরে বকুলবাগান রোডে বাড়ি করে সেখানেই থেকে গেলেন। তাঁর নাতি নাম মিত্র ছিলেন ভবানীপুর ক্লাবের প্রাণস্বরূপ। পেশার খাতিরে ত্রৈলোক্যনাথ কলকাতার বাসিন্দা হয়ে গেলেন কিন্তু কোন্নগরকে ভুললেন না। তিনি ছিলেন দরাজ দিলের মানুষ। প্রতি বছর দুর্গাপুজোয় গ্রামে আসতেন। ধুমধাম করে উৎসব হত। গ্রামের সব ব্রাহ্মণ-কায়েতের নিমন্ত্রণ থাকত পুজোর কদিন। ছেলের বিয়েতেও খুব ধুমধাম হয়েছিল। সেই উপলক্ষে বিশিষ্ট অতিথিদের জন্য বাড়ির মধ্যে বড় উঠোনে একদিন কলকাতার নাম করা থিয়েটার দল এসে গেয়ে গেল। আর একদিন বাইরের মাঠে হল বায়োস্কোপ। এসব ছিল তখনকার দিনের অসাধারণ ঘটনা।

কায়স্থ সমাজে কোন্নগরের মিত্রদের খুব বোলবোলাও ছিল। কোন্নগরের প্রথম ব্রাহ্মণ বাসিন্দাদের সঙ্গে একদল পশ্চিম দেশীয় (সম্ভবতঃ বিহার ও যুক্তপ্রদেশের) মানুষ এসেছিলেন। স্থানীয় লোকেরা জিজ্ঞাসা করেন, তোমরা কোন জাতের মানুষ। জবাব দেবার আগে তাঁরা বুদ্ধি করে প্রশ্ন করেন, এখানে কোন জাতের লোক বেশী। জবাব পান, কায়েত। তখন পশ্চিমারা বলে ওঠেন, 'হাম ভি কায়েত।' কিন্তু কায়স্থ সমাজপতিদের বাধায় তাঁরা মিত্র উপাধি নিতে পারেন নি।

বিংশ শতাব্দীর গোড়ায় কলকাতায় বিভিন্ন সাহেব-কোম্পানীর অনেক কাছারি ও কুঠিবাড়ি। পেটে সামান্য বিদ্যা থাকলেই তখন সেসব দপ্তরে একটা কাজ জুটে যেত। প্রথম দিকে কুঠিওলাবাবুরা কলকাতায় ডেলি-প্যাসেঞ্জারী করতেন বাঁধা নৌকায়। ১৯০৪ সাল নাগাদ ম্যাকিনন ম্যাকেঞ্জীতে চাকরি করার জন্য ট্রেনে ডেলি-প্যাসেঞ্জারী করতেন সোনামণি মিত্র। হাওড়া আর কলকাতার মধ্যে তখন কর্ডের বিজ্র। বাস চালাত ওয়ালফোর্ড কোম্পানী। মিত্রমশাইকে হঠাৎ বদলী করে দেওয়া হল মেটেবুরুজে গার্ডেনরীচ ওয়ার্কশপে। সে ছিল কলকাতা থেকে অনেক দূরের পথ। পথের কষ্ট তো ছিলই, তার ওপর সেখানে ছিল জলকষ্ট। ওয়ার্কশপের সাহেব কর্মচারীদের জন্য সোডা লেমনেডের ব্যবস্থা ছিল। মিত্রমশাইও তাই দিয়ে নিজের দরকার মেটাতেন। একদিন ধরাও পড়ে গেলেন। অনেক কথা কাটাকাটিও হল। তারপর স্বেচ্ছায় অবসর নিয়ে তিনি ঘরেই থেকে গেলেন পিতৃসম্পত্তির দেখাশোনা, তাই নিয়ে মামলা মোকদ্দমা এবং সাতচল্লিশ টাকা পেনসনকে অবলম্বন করে।

বাটা কোম্পানীর কারখানা প্রথম কোন্নগরেই ছিল

গঙ্গা, রেলপথ এবং জি টি রোড—যার ডাক নাম বড় রাস্তা, কলকাতার সঙ্গে দ্রুত যোগাযোগের এত সুবিধা ছিল বলে কলকাতার মফঃস্বল একটি বিরাট শিল্প এলাকা হিসাবে দেখা দিল এই শতকের শুরু থেকেই। এখন কিসের কারখানা নেই এই এলাকায়—চট, কাপড়, রাসায়নিক, ওষুধ, কৃত্রিম সিল্ক, লোহার গড়ি, রঙ, সাবান-বিস কারখানা ধীরে ধীরে গড়ে উঠেছে কোন্নগরেও। এই সূত্রে বিহার, উত্তরপ্রদেশ, অন্ধ্র তামিলনাদের বেশ কিছু মানুষ এই কোন্নগরের প্রায় স্থায়ী বাসিন্দা বনে গেছেন। কলকাতার দিক থেকে কোন্নগরে ঢুকলে ওই এলাকা পার হবার মুখে, ডান দিকে একটি লম্বা পাঁচিল-ঘেরা জায়গা দেখা যাবে। ১৯৩০ সাল নাগাদ বাটা কোম্পানী তাদের জুতোর কারখানা প্রথম খুলেছিল ঠিক এই জায়গাটিতে। ক্রমে কারখানা বাড়াবার প্রয়োজনে দরকার হল আরও অনেক জমির।

তখন বাদের খালের কাছে জি টি রোডের পশ্চিম দিকে পড়ে ছিল বিরাট এক ফাঁকা প্রান্তর। ঝোপ-জঙ্গলে ভরা সেই

কথুটির বাসা। তাঁর বাসার কাছাকাছি বড় ড্রেনের সবুজ জলে একটা মরা বিড়াল পচছে। ড্রেনের ওপরে, জায়গায় জায়গায় কাঠ কিংবা দুটো বাঁশ পাতা। কোন রকমে, টাল সামলে গেলাম। মিনিট দশকের ভিতর তাঁকে নিয়ে আমি স্টেশন সংলগ্ন বাজারে একটি চায়ের দোকানে। দোকানটি অভিজাত। আমার মত রোগার পক্ষেও সরু বেঞ্চ, গদি আঁটা। মুখোমুখি লোককে মনে হয় ঘাড়ে পড়ছে। এখানে প্রেমিক-প্রেমিকারা আসেন—শুনলাম। দিন কয়েক আগে, এই দোকানে রেগুলার আড্ডা দিতেন এমন এক তরুণ প্রেমিক তাঁর ছলনাময়ী কিশোরী প্রেমিকাটিকে রেল লাইনের ধারে নিয়ে গিয়ে গালে ব্লেড বসিয়ে দিয়েছেন। কেস হয় নি। কন্যা পক্ষের আর্থিক সঙ্গতি নেই। এ গল্প দমদমে বছর দশ আগেও শুনেছি। জিজ্ঞেস করলাম, বড্ড ডেলাইটে? কাছাকাছি লোক ছিল না?

—ছিল। তাতে কী! কে নাক গলাতে যাবে।

একটু বাদে আমরা সেখান থেকে ডানদিকে সোজা হাঁটতে হাঁটতে এলাম মডার্ণ স্টুডিওর কাছাকাছি বাস স্ট্যান্ডে। স্ট্যান্ডে দুজন ছিলেন, একজনের কাছে আমার বন্ধু হঠাৎ এগিয়ে গিয়ে প্রশ্ন করলেন, কাকাবাবু, এদিকে?

—হ্যাঁ, স্বপ্নাদের খোঁজ-খবর নিতে এসেছিলাম। দ্যাখো না, একটাও ট্যাক্সি নেই। তাই বাসের জন্যে দাঁড়িয়ে আছি। তা, তুমি এখন কি করছ, গৌতম?

—কিছু তো পাচ্ছি না কাকাবাবু, আপাতত টিউশানি করছি তিনটে—

—না না এটা ঠিক নয়। টু স্পীক টু, টিউশানি ওল্ড স্টাফদের বিজনেস। ইয়াংম্যানরা কেন করবে? ওটাতে কাঁদুনে করে দেয় ই বুঝলে গৌতম, আর্ণ বাই এনি মীনস! পুরুষ মানুষ, যে কোনভাবে হোক—টাকা কামাবে। সোজা কি বাঁকা, ওসব নিয়ে মাথা ঘামালে চলে না। এসো একদিন—

—সবটা জানি না। এমনিতে যে বাসটায় ঝাঁ করে উঠে গেলেন ভদ্রলোক তাতে তখনো বেশি ভিড় হয় নি বলেই দেখা গেল, দুজন রোগা চেহারার লোকের মাঝখানে ইনি একটা বিপুল থাকাকাসমেত বসে বেশ বড় জায়গা করে নিলেন। বাসটা চলে যেতে, গৌতম বললেন, ঐ স্বপ্নাদের কথাই সেদিন বলছিলাম। ওর ভাসুর বাবা করেন। শাড়িতে মা—ওঁর প্রতিপত্তির কোন তুলনা হয় না। একদিন আমাকে বললেন, পদ্যটদ্য ছেড়ে বরং এই নাটক-টাটক লিখলে তো পারো—পাবলিক যা চায় তা তো দেখছ!

—স্বপ্নার বাবা কি করেন?

কর্পোরেশনে আছেন, তবে জমিজমা অনেক আছে শুনেছি — ইস্টবেঙ্গলের জমিজমার একসচেঞ্জ না কি করেছেন—এও শুনলাম, সুদের ব্যবসা। তা না হলে—

কথার সময় আমি ডানদিকে তাকিয়েছিলাম; একটু দূরে, বড় দেওয়ালে, চুন-লেপা হলেও পড়তে পারা যাচ্ছে, 'গ্রাম থেকে শহর ঘিরে ফেল।' তারই সামনে, শনিঠাকুর, রাস্তার ওপরে সমাসীন। একটি মহিলা সেখানে মানত করাতে করাতে ফোঁপাচ্ছিলেন। হঠাৎ গায়ের কাছেই স্কুটারের উপস্থিতিতে তিনি চমকে উঠলেন। প্রায় একটা অ্যাকসিডেন্ট বাঁচিয়ে, হাসি মুখে একটি বলিষ্ঠ ছেলে বুড়ুশশী গেঞ্জি গায়ে স্কুটার চেপে এঁকেবেঁকে বেরিয়ে গেল। নিষ্প্রয়োজনে মহিলাটির অত কাছে যাবার জন্যে সে মোটেই লজ্জিত নয়। লক্ষ্য করলাম, সে চলেছে শাখারীপাড়ার দিকে। সত্যিই, গ্রাম থেকে শহর ঘিরে ফেলা হচ্ছে। গ্রাম নয়, শাখারিপাড়া। এই শাখারিপাড়ার অলক সাপুই ছিল শাসক আমাদের গোষ্ঠীর ক্যাপ্টেন।

পার্থপ্রতিম কাঞ্জিলাল

প্রথম বাটার কারখানা। এখন ইস্ট ইন্ডিয়া অয়েল মিল
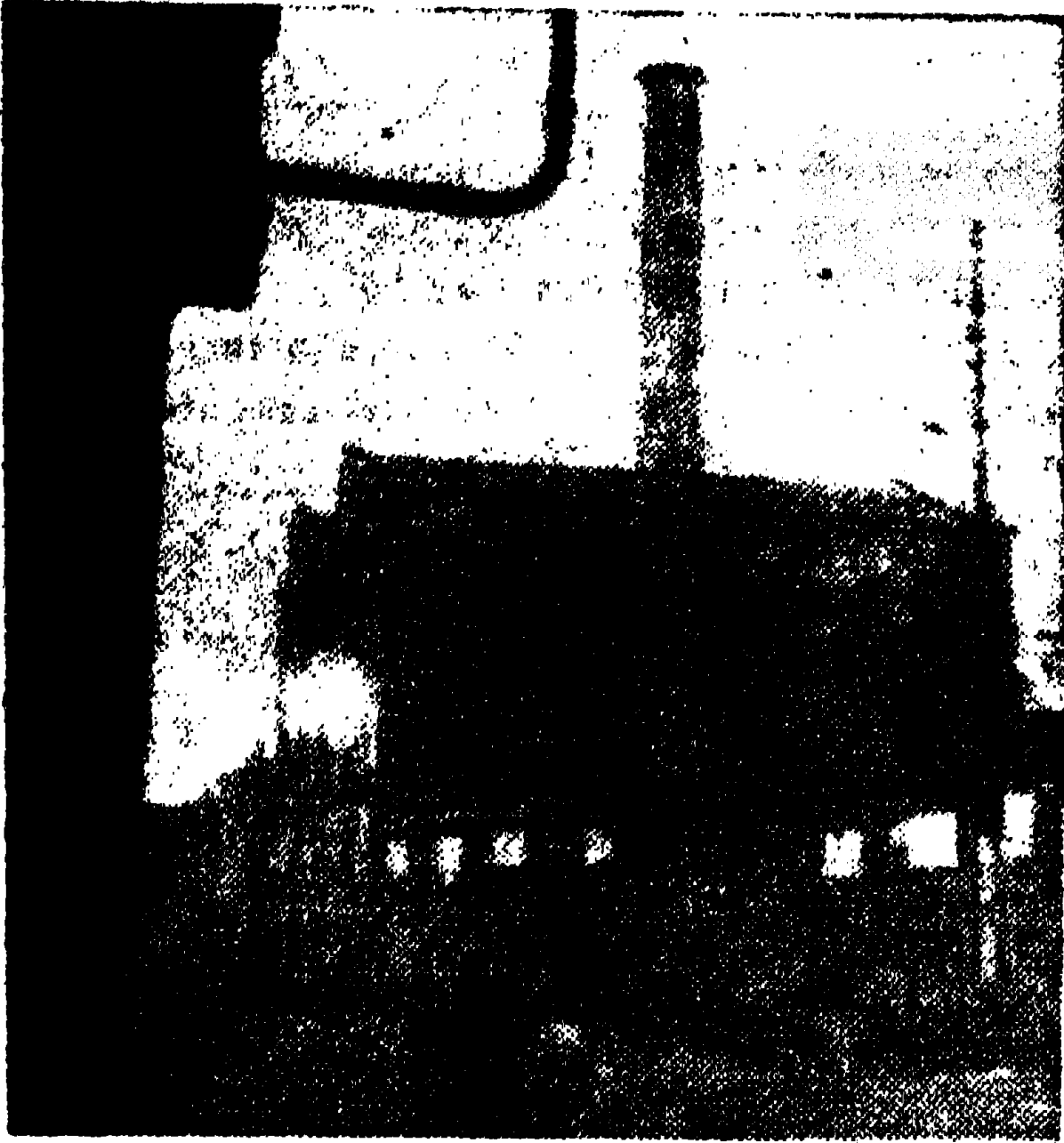
প্রান্তরের নাম ছিল হিদের জলার মাঠ। ঐ জমির তদানীন্তন মালিকরা জুতোর কারখানা করার জন্য জমি দিতে চাইলেন না।

দক্ষিণে কোন্নগর ও কলকাতা থেকে অনেক দূরে বজবজে ছিল বার্ন কোম্পানীর ইঁট ভাঁটা। তখনকার বজবজ গণ্ডগ্রাম ছাড়া আর কিছুই ছিল না। বার্ন কোম্পানী সেখানকার ইঁট-ভাঁটা তুলে দিচ্ছে শুনে বাটা কোম্পানী ওই জমি কিনে নিয়ে পত্তন করল বাটানগরের।

বাটা কোম্পানীর পরিত্যক্ত জমি ও বাড়িতে ফুলচাঁদ জলন্ত ক্যানাল অয়েল মিল নাম দিয়ে এক তেল কল খুলে বসলেন। ফুলবাবুর ভাই এবং ভাইপোরা স্থানীয় লোকেদের সঙ্গে খানিকটা মেলামেশা করতেন। কিন্তু ফুলবাবুর বন্ধু ছিলেন খোদ সুরাবর্দি সাহেব। এতেই বোঝা যাবে ফুলবাবুর কারখানায় যেমন তেমন তেল হত না। এমন তেল হত যা দিয়ে প্রিমিয়ারকেও মসৃণ করা যেত।

কারখানার দক্ষিণের অংশে বিরাট প্রাসাদে ফুলবাবু সপরিবারে বাস করতেন। একদিকে ছিল পড়ার বাড়ি, অন্যদিকে ছিল বাগানবাড়ি। সুন্দর বাগান, টেনিস কোর্ট, এলাহি ব্যাপার। গেটে বন্দুক কাঁধে পাহারা থাকত দিন-রাত।

কিন্তু কি এক অজ্ঞাত কারণে ফুলবাবুর সাজান বাগান শুকিয়ে গেল। তাঁরাও সব কে কোথায় চলে গেলেন। সেসব আর পঁচিশ বছর আগের কথা। বছরের পর বছর হানাবাড়ির মত পড়ে রইল সেই বিশাল সম্পত্তি। বছর দুয়েক আগে সেখানে আর একটি তেলকল নতুন করে চালু হয়েছে।

যে হিদের জলার মাঠ বাটা কোম্পানী পেল না সেখানে যুদ্ধ শেষে অ্যালানবেরীর কোম্পানী মরা গাড়ির ভাগাড় করেছিল। এখন আর সেখানে ভাগাড় নেই। তার মধ্যে তৈরী হচ্ছে বৈদ্যুতিক সিল্ক, তোষকের গদি এবং লোহার তার তৈরীর তিনটি আলাদা আলাদা কারখানা। শেষ কারখানাটির পরেই রেললাইন। রেললাইন ধরে দক্ষিণ দিকে গেলে পড়বে সি এস মুখার্জি স্ট্রীট। এই জায়গাটিতে এলে কারো মনে হবে না যে তিনি পশ্চিমবঙ্গের কোন শহরে আছেন। এখানে ছিল একটি বিরাট চটকল। তার প্রায় লাগোয়া ছিল একটি কাপড়ের কল। কাপড়ের কল আর চটকল দুটিই এখন বন্ধ। চটকলের এলাকার মধ্যেই পরে আরও দুটি কারখানা হয়েছিল। তার মধ্যে একটি সম্প্রতি বন্ধ হয়ে গেল। এইসব কল-কারখানাকে কেন্দ্র করে কোন্নগরের এই এলাকায় একটি বেশ বড় অবাঙালী বসতি গড়ে উঠেছে। তাদের মাতৃভাষায় প্রাথমিক শিক্ষা দেবার জন্য বিদ্যালয়ও রয়েছে। কাপড়ের কলটি ধরে রেললাইন বরাবর সামান্য দক্ষিণে এগিয়ে গেলে কোন্নগর স্টেশন। স্টেশনের পশ্চিম দিকে বিরাট বাজার, দোকানপাট, রিকসার আড্ডা, কলকাতার নিত্য যাত্রীদের সাইকেল রাখার দোকান; স্টেশনের পূব দিকের দৃশ্যপটও একই রকমের। পূর্বে জি টি রোড থেকে যে সড়কটি সোজা এসে স্টেশনে হাজির হচ্ছে তার নাম ক্যাইপার রোড।

ক্রাইপার সাহেব

ক্যাইপার ছিলেন রীতিমত একজন শাদা চামড়ার সাহেব; কোন্নগরে তাঁর তৈরী মদের ভাঁটিখানা ছিল যা এখন উঠে গেছে ভদ্রকালীতে। ভাঁটিখানার মালিক ক্যাইপার কখনও জলপান করতেন না, তাঁর একমাত্র পানীয় ছিল মদ। এত মদ খেয়েও তিনি মাতাল হতেন না, তাজে ঠিক থাকতেন। সাধারণতঃ লুঙ্গি পরতেন ও খদ্দরের বেনিয়ান জাতীয় জামা গায়ে দিতেন। একটি ঘোড়ারগাড়ি ছিল তাঁর বাহন। পরে তিনি একটি হা[illegible]ড়ি কিনেছিলেন, কিন্তু তাতে চাপবার ভরসা পেতেন না।

ক্যাইপার সাহেব হয়েও কালা আদমীদের সঙ্গে আপনজনের মতই মিশতেন। তাঁদের দায়ে দফায় দেখতেন, কোন ক্লাব সাহায্য চাইতে এলে ফেরাতেন না। তাঁর এইসব দানের কথাই স্মরণীয় করে রাখার জন্য কোন্নগরের একটি প্রধান সড়কের নাম রাখা হয়েছে ক্যাইপার রোড। কোন্নগরের দুটি বড় ক্লাব ফ্রেণ্ডস ইউনিয়ন এবং অলিম্পিক ইন্সটিটিউট। অলিম্পিক তার পাকাবাড়ির নাম রেখেছে ক্যাইপারের নামে।

ফ্রেণ্ডস ইউনিয়ন আর অলিম্পিক যেন কোন্নগরের মোহনবাগান ইস্টবেঙ্গল। অন্য সময় কুম্ভকর্ণের মত না ঘুমলেও ফুটবলের মরশুমে ক্লাব দুটি চাঙ্গা হয়ে ওঠে। আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন রেফারী প্রত্তুল চক্রবর্তী অলিম্পিকের সঙ্গে যুক্ত। অলিম্পিক বা ফ্রেণ্ডস ইউনিয়ন কলকাতার ঘেরা মাঠকে মাত করে দেবার মত কোন প্রতিনিধি এ যাবৎ পাঠাতে পারেনি।

তবে সে অভাবের কিছুটা পূরণ করেছে রাজরাজেশ্বরী যুব সমিতির মেয়ে ভলিবল খেলোয়াড়রা। এদের মধ্যে কয়েকজন জাতীয় প্রতিযোগিতায় পশ্চিমবঙ্গের প্রতিনিধিত্ব করেছেন। রাজরাজেশ্বরী মন্দিরের লাগোয়া মাঠে এই সমিতির খেলাধুলো হয় বলে ক্লাবের নাম ঐ রকম রাখা হয়েছে। এই পাড়ায় ঘোষালবাড়ির পুজো হিসাবেই রাজরাজেশ্বরী পুজোর প্রচলন। কিন্তু শুরু থেকেই তা বারোয়ারী পদ্ধতিতে পরিচালিত হয়। ফাল্গুন মাসে মহা ধুমধাম করে তিনদিন ধরে পুজো হয়। আড়াইশো বছর ধরেই নাকি তা চলছে।

রাজরাজেশ্বরী পাড়া থেকে বেরিয়ে এস সি চ্যাটার্জি স্ট্রীট ধরে দক্ষিণ দিকে এগোলে দেখা যাবে শকুন্তলা কালী মন্দির। বৈশাখ মাসে মূর্তি এনে পুজো হয়। এক রাতের পুজো। তাকে কেন্দ্র করেই বিরাট মেলা বসে। শ-পাঁচেক পাঁঠা পড়ে। বলি শেষ হতে রাত পুইয়ে যায়। শত শত নারী-পুরুষ গঙ্গায় স্নান সেরে প্রচণ্ড রোদে তেতে ওঠা পথে দণ্ডি কেটে মন্দির পর্যন্ত যান মানত রক্ষা করতে।

যে ঘাটে তাঁরা স্নান সারেন তার নাম শম্ভু চাটুজ্জের ঘাট। শম্ভু চাটুজ্জের নামেই রাস্তার নাম শম্ভু চাটুজ্জে স্ট্রীট। কোন্নগরের আদি যুগে গ্রামের উত্তর অংশে এই চাটুজ্জে, বাঁড়ুজ্জে এবং ঘোষাল পরিবারের ছিল দোর্দণ্ড প্রতাপ। তিন পরিবারই ছিল জমিদার।

দ্বাদশ শিব মন্দির

শম্ভু চাটুজ্জের ঘাটেই ছিল কোন্নগরের একটি শ্মশান। ঘাটের ওপর ছিল বিরাট পাকা চাঁদোয়া। একশ তের বছর পরে আজ আর তা খুঁজে পাওয়া যাবে না। ঘাটের ওপর আছে দুটি শিব-মন্দির। বিগ্রহ দুটির নাম ত্রিলোকন ও শম্ভুনাথ। কিন্তু শিব-মন্দির যদি দেখতে হয় তবে এই ঘাট থেকে একটু উত্তরে যেতে হবে।

সেখানে আছে কোন্নগরের ল্যান্ডমার্ক দ্বাদশ মন্দির। জি টি রোডের ওপর পাঁচিল ঘেরা বিরাট এলাকা। তার মধ্যে উত্তর দিকে এবং দক্ষিণ দিকে ছয়টি করে শিবমন্দির। মন্দিরের সারির ঠিক মাঝখানে পাকা চাঁদনী। তার পর লম্বা চওড়া বাঁধা ঘাট নেমে গিয়েছে গঙ্গার জল পর্যন্ত। মন্দির ও গঙ্গার মধ্যেও অনেকটা করে ফাঁকা জমি।

দ্বাদশ মন্দির চিরকালই সকাল সন্ধ্যায় বেড়াবার একটা ভাল জায়গা।

প্রতি বছর চৈত্র সংক্রান্তিতে দ্বাদশ মন্দিরের মাঠে চড়কের মেলা বসে। শিবরাত্রিতে এখানে স্নান ও পূজোর ধুম পড়ে যায়। বিজয়া দশমীর দিনও সন্ধ্যা থেকে নিরঞ্জন দেখার ভিড় ঘাট ও তার মাঠ ভরে ফেলে।

একশ ছাপ্পান্ন বছর আগে হাটখোলা দত্তবাড়ির হরসুন্দর এই মন্দির ও ঘাট তৈরী করে দেন। কোন্নগরে দক্ষিণে মিত্র ও ঘোষ বংশীয় কায়স্থদের নাম-ডাক ছিল, প্রভাব-প্রতিপত্তিও কম ছিল না। হরসুন্দরের একমাত্র মেয়ের বিয়ে হয়েছিল কোন্নগরের এ কে মিত্তির বাড়িতে। মেয়ের বাড়ি যাতায়াত করতে করতে হরসুন্দরের কোন্নগরের ওপর টান পড়ে যায়। তাই তিনি কোন্নগরে দ্বাদশ মন্দির তৈরী করে দেন। মহা সমারোহে নিত্য পূজোর ব্যবস্থা করেন। হরসুন্দরের কালে পূজোর জন্য রোজ আধ মন আতপ চাল, আড়াই সের ঘি, বকমারি ফল ও মশলা ও পাঁচ জোড়া পৌনটির গুড়ো সন্দেশের দরকার হত। তা ছাড়া বৈশাখ মাসে শিবের খাবার সমস্ত জিনিস গ্রামের এক একজন ব্রাহ্মণের বাড়িতে এক একদিন পাঠান হত। তার পরিমাণও নেহাৎ কম ছিল না। মাঠের মাথায় একটি বড় কাঠের বারকোস ভর্তি করে সেসব জিনিস যেত। তাদের নানা ফল, দই, সন্দেশ, ছানা, চিনি প্রভৃতি উপকরণে বারকোস ঠাসা থাকত।

হরসুন্দরও গেছেন, শিবেরও সে সুদিন গেছে। চুয়াল্লিশ বছর আগে পূর্ণচন্দ্র উদ্ভটসাগর বিশ্ববাণী পত্রিকায় হরসুন্দর ও তাঁর প্রতিষ্ঠিত দ্বাদশ মন্দিরের বিবরণ দিতে গিয়ে লেখেন, "অতই দুঃখের সহিত বলিতে হয় বর্তমান সময়ে ১২টি শিবের সেবার জন্য দৈনিক ॥ আট আনা নির্ধারিত আছে।"

মহা দুঃখে উদ্ভটসাগর আরও লিখলেন, "হরসুন্দর, তুমি শান্তিধাম হইতে আসিয়া একবার দেখ, বর্তমানে বিগ্রহগুলির দুরবস্থা দেখিলে মনে হইবে তোমার শিব কৈলাশেশ্বর শিব নহেন —পথের ভিখারী এক মুষ্টি আতপ তণ্ডুলের প্রত্যাশী হইয়া বসিয়া আছেন। একবার আসিয়া দেখ মন্দিরের পশ্চিমাংশে যে পুষ্পোদ্যান ছিল তাহা এখন পশুদের চারণভূমি হইয়া আছে। একবার আসিয়া দেখ মন্দিরের দক্ষিণাংশে অতিথিশালা ছিল—অভ্যাগত যেথান হইতে ফিরিত না, সেইখানে এখন চটকলের জেটি নির্মিত হইয়াছে। মন্দিরের উত্তর দিকে যেখানে ঠাকুর সেবার আয়োজন হইত, সেখানে পুরলক্ষ্মীরা আসিয়া মহেশ্বর চরণে পুষ্পাঞ্জলী দিবার জন্য সমবেত হইতেন তাহা এখন আর শিবের নাই; সরকারের হাতে পড়িয়া জীর্ণ কলেবর হইয়া [illegible] স্মৃতিটুকু জাগাইয়া বসিয়া আছে। তাঁহার নির্মিত সুদৃঢ় [illegible] সংস্কার অভাবে গঙ্গাগর্ভে নামিতেছে। এইরূপ অবস্থা বিপর্যয় দেখিয়া আমার মনে হয় বোধ করি তুমি সবই দেখিতেছ আর সুদূরে বসিয়া হাসিয়া বলিতেছ, নশ্বর জগতে ইহাই অবস্থা। আর আমার বলিতে ইচ্ছা হইতেছে নরনারায়ণের শেষ শ্মশান দেবত্র—Paths of glory lead to the grave.

শিবচন্দ্র দেবের মর্মর মূর্তি

আসলে হরসুন্দরের উত্তরাধিকারীরা অনেক শাখা-প্রশাখায় ভাগ হয়ে যান। সেই সঙ্গে দ্বাদশ মন্দিরের আয় বলতে কিছু না থাকায় ঘাট ও মন্দিরগুলো নষ্ট হয়ে যেতে বসেছিল। তাই দেখে স্থানীয় কিছু নাগরিক চাঁদা তুলে বাড়া দেন ঘাটে পাথর জমা দেন। তখন সেচ বিভাগ ঘাটের দুপাশে বাঁধ দিয়ে ঘাটটিকে রক্ষা করেন।

১৯৬৭ সালে বিড়লা জনকল্যাণ ট্রাস্ট সীমানার পাঁচিল, চাঁদোয়া এবং মন্দিরগুলি মেরামত করে দেন।

দ্বাদশ মন্দির থেকে জি টি রোড ধরে কয়েক মিনিট এগোলেই কোন্নগরের সাংস্কৃতিক, রাজনৈতিক, প্রশাসনিক কাজকর্মের এলাকা। এগুলি যেন কেউ একজন পরিকল্পনা করে একই জায়গায় পাশাপাশি গড়ে তুলেছেন। প্রথমে শিবচন্দ্র দেব প্রতিষ্ঠিত সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ। প্রতি বছর এখানে মাঘোৎসব হয় ভাবগম্ভীর পরিবেশে। যাঁরা অব্রাহ্ম তাঁরাও সেই উৎসবে যোগ দেবার সাদর নিমন্ত্রণ পান। কয়েক বছর হল সেই উৎসবে যেন কিছুটা প্রাণের অভাব দেখা যাচ্ছে। তার লাগোয়া বালিকা বিদ্যালয়। বালিকা বিদ্যালয়ের পাশেই সাধারণ গ্রন্থাগার। গ্রন্থাগারের কাছেই ডাকঘর। ডাকঘর পেরোলেই স্কুল। স্কুলের পাশেই বেওয়ারিশ গরু আটক রাখার খোঁয়াড়। খোঁয়াড় পেরোলেই পৌরসভা ভবন। দুইয়ের মাঝে রেশন অফিস। পৌরভবনের কাছেই পুলিশ ফাঁড়ি।

এইখানে আর আছে সমবায় ব্যাঙ্ক যার বয়স হল চুয়াল্ল। ১৯২৩ সালে সত্যচরণ মুখোপাধ্যায়, ননীগোপাল বসু, ললিত ঘোষাল প্রমুখ পনেরজন উৎসাহী যুবক একশ পঁচিশ টাকা পুঁজি নিয়ে ব্যাঙ্কটি চালু করেন। ১৯৭৭ সালে তার সভ্য সংখ্যা হয়েছে সাতশ, পুঁজির পরিমাণ বেড়ে হয়েছে প্রায় এক লক্ষ টাকা। বিশ বছর আগেও সমবায় ব্যাঙ্কটিই ছিল গ্রামের একমাত্র ব্যাঙ্ক। এই সময়ের মধ্যে স্টেট ব্যাঙ্ক, এলাহাবাদ ব্যাঙ্ক এবং ইউনাইটেড ব্যাঙ্কের

না কেন তার মানে কি ধরে নিতে হবে য়ুরোপের এই ঠগেরা খুব একটা এ্যাড-ভান্সড, শিক্ষিত, সভ্যতার মধ্যে লালিত, তার অনুপাতে কি তবে আফ্রিকা অনেক পিছিয়ে পড়া দেশ? অন্ততঃ এই ধরণের খবরইতো আমরা জানি, জেনে আসছি। মরাঠী বললেই যদি মাওলী হোতো বাঙালী বললেই যদি নাগা, সাঁওতাল হোতো তা হলে সভ্য-ভদ্র আমরা কে? সারা আফ্রিকাকে জড়, ভূত রাক্ষুসে ভূতুড়ে উলঙ্গ, বর্বর নরমাংসভুক বলে আমরা যে জানি তার জ্ঞান কি এই ঠগীরাই জোগায়নি? তবু এদেরই লেখায় আমাদের এতো আস্থা কেন?

সব দেশেরই আদিবাসী আছে। ভারতবর্ষে তো সেই আদিযুগ থেকে আছে। আফ্রিকারও আদিবাসীও যেমন আছে তেমনি উন্নত মানের সমাজও ছিলো, এবং আছে। এমনি ছিলো ওয়েস্ট ইণ্ডিজে, সারা আমেরিকা ভূখণ্ডে, নিউজিল্যাণ্ডে, অস্ট্রেলিয়াই কিন্তু সভ্য সভ্য খৃষ্টানদের পাল্লায় পড়ে আজ তারা আর বড়ো বেশী নেই। ওয়েস্ট ইণ্ডিজের মতো আরও অনেক জায়গা আছে যেখানে আদিবাসী নেই-ই। লোপাট হয়ে গেছে। কাজেই কাফ্রী, নিগ্রো ইত্যাদি বলে যাদের হেয় করি, একটা বাণ্ডিল বেঁধে পাচার করি,—তাদের সম্পর্কে অজ্ঞতাই জাহির করি।

এই অজ্ঞতাকে চিন্তায় মগজে ঢুকিয়ে দিয়েছে সফেদী শিক্ষা। তা নৈলে বোঝা কঠিন হোতো না যে—আফ্রিকাকে হীনের চীন দীনের দীন করে রেখেছিলো কুখ্যাত দাস বাণিজ্যের ত্রিভুজী মার। এটা বোঝাতে হবে। ইতিহাসে এটার দুর্গন্ধ ছড়িয়ে আছে মিডল প্যাসেজ (মাঝের ধারা) নামক এক নরকের মধ্যে। মিডল প্যাসেজ নিয়ে বহু খোরাক লেখা হয়েছে। নতুন করে বলার কিছু নেই। তবু মনে হয় আমরা যারা উপন্যাসে কবিতায়ই সাহিত্য চাখি তার বাইরে পা দিতেই ডরাই, বিয়ের উপহারে বই দেবার মতো যোগ্য বই ছাড়া অন্য বই উপহার দেবার কথা ভাবি না—আমরা যারা লাইব্রেরিতে সাধারণ জ্ঞান, ইতিহাস, ভ্রমণের বিভাগে যাওয়া মাত্র পণ্ডিতদের হাতে ছেড়ে দিয়ে বসে আছি—সেই আমাদের জন্য একথার বিচার হওয়া দরকার।

কুখ্যাত মিডল প্যাসেজ মাঝের ধারা। মাঝের পথ বললে মনে পড়ে যাবে বুদ্ধের মধ্য মার্গ মজ্ঝিমিকা। এ গলি বন্ধ করে দেবার গলি। সভ্য-দুনিয়ার সদর রাস্তা এড়িয়ে পিছনের পথ যে পথে খুন-খারাবি, হত্যা রাহাজানি সহজে করা যায় ইতিহাসের চোখ এড়িয়ে।

[illegible] ক থেকে জাহাজ যাচ্ছে মাল নিয়ে [illegible]তে মাল বেচে সে ক ফিরে না গিয়ে গেলো গ-তে। গ-য়ে মাল বেচে গেলো ফিরে ক-য়ে এবার। একথা মনে করার কারণ নেই যে ক থেকে খ-তে যাবার সময়েই মাল ছিলো, আর খ-গ এবং গ-ক যাবার জাহাজ থাকতো ফাঁকা। প্রতি যাত্রায়ই জাহাজ থাকতো মালে বোঝাই। কিন্তু লাভ হোতো ক-র অর্থাৎ যে বন্দরের জাহাজ সেই দেশেরই—সবার বেশী। এর মধ্যে ক-খ প্রথম প্রবাহ খ-গ মধ্যম প্রবাহ, এবং গ-ক অন্তিম প্রবাহ। আমরা এই মধ্যম প্রবাহের কথাই বলবো। মাঝের ধারা।

লণ্ডন থেকে গিনী কোস্টে জাহাজ আসতো নানা খেলনা, লোহার অস্ত্রশস্ত্র ছুরি, কাঁচি গোলা-বারুদ, বন্দুক-পিস্তল কাঁচের মনোহারী মাল, ফুটো পুঁতিদানা; এই সব মাল নিয়ে। এ মাল খরচ করায়, কিন্তু পয়সা করায় না। এই সব মালের বিশেষত মদ-বন্দুকের বিনিময় যখন দাস খরিদ করা হোতো তখনই টাকাটা হয়ে যেতো দু টাকা। গিনিকোস্ট থেকে যখন দাস খরিদ করে জাহাজ ভর্তি করা হোতো তখন সেই টাকায় মাল খরিদ তদ্দিরে সেই দু টাকা হয়ে যেতো চার টাকা। এবার ঐ মাল ছাড়া হোলো ওয়েস্ট ইণ্ডিজের বন্দরে জামাইকায়। বারবাডোজে— আমেরিকায়। লাভ এমন হোলো যে গোড়ার সেই একটি টাকা হয়ে পড়তো আশী টাকা।

এখন ঐ টাকায় আমেরিকা, ওয়েস্ট ইণ্ডিজের মাল কেনা হোলো। জাহাজ পুনশ্চ ভরা হোতো কোকো, কফি, তুলো, মশলা, জায়ফল, লবঙ্গ, চিনি, রাম, নীল, আদা, লংকা। —লক্ষ্য করলে বুঝতে কষ্ট হয় না একটা ভালো পিস্তলের বদলি বা একটা আরসির বদলি এক বস্তা নীল বা জায়ফল, বা দু বস্তা লংকার দামকুলে কী হোলো।

লিভারপুলের জাহাজ অকস্মাৎ এলো কি গাম্বিয়ায় সেনেগালে। তারপর সেনেগাল থেকে গেলো বাটাভোজে। বাবাডোজ থেকে লিভারপুলে। কী সমৃদ্ধি এখন লিভারপুরের।

এই সমৃদ্ধির জন্য মানুষ মনুষ্যত্ব হারিয়েছে। সেকালের জাহাজগুলোর মানুষ ভরা হোতো বাকসতে চামচ প্যাক করা হয় যেভাবে। ১০০ টনের জাহাজের খোলে ২২০—২৫০ পর্যন্ত দাস ঠাসা হোতো যেন সেলফে বই রাখা হচ্ছে। এমনিতেই জাহাজের খোলে যেখানে দাসরা থাকতো সেখানে ছ ফুট উঁচুতেই ছাদ। একদা বণিকদের মনে হোলো মাঝে একতালা করলে কেমন হয়। তাক ধরে ছ ফুটের মধ্যে দুটো সেলফ করে নিলো। বসলে দাসদের ঘাড় গুঁজে বসতে হোতো। এবং এসব দাসদের সর্বদা শেকল দিয়ে বেঁধে রাখতে হোতো। বহুবার এমন হয়েছে যে সকালে উঠে কোনো দাস আবিষ্কার করলো যে সারারাত সে পাশাপাশি শুয়ে কাটিয়েছে একটা মড়ার সঙ্গে এক শেকলে বাঁধা। কিন্তু যে জীবন্ত সে ঈর্ষা করেছে সেই মড়াকে। পুরুষদের জন্য ৬ ফুট লম্বা, ১৬ ইঞ্চি চওড়া আর দু ফুট সাত ইঞ্চি খাড়াই জায়গার বরাদ্দ ছিলো, মেয়েদের ৫ ফুট ১০ ইঞ্চি, ১৬ ইঞ্চি বালক ৫ ফুট ১৪ ইঞ্চি, বালিকা ৪ ফুট ৬ ইঞ্চি ১২ ইঞ্চি। এ সংখ্যা দিচ্ছি এই জন্য যে বোঝা যায় কী ভঙ্গির সাথে এই জায়গা ব্যয় করার হিসেব চলতো। ক্যাপ্টেনে ক্যাপ্টেনে এ নিয়ে ছিলো জবর পাল্লার রেষারেষি। লিভারপুলের ক্যাপ্টেনরা জাহাজে কত কতো মাল কীভাবে ধরানো হয় চার্ট বিজ্ঞপিত করতো। এক জাহাজের ডাক্তার ফ্যালকনব্রিজ বলেছেন, জুতো খুলে হামাগুড়ি দিয়ে রুগী দেখতে হোতো। হাঁটু ছড়ে যেতো। মেঝেতো যখন তখন সারা গায়ে যে যেখানে পেরেছে দাসেরা কামড়ে দিয়েছে। মড়ো পেচ্ছাবের মধ্য দিয়েই যেতে হোতো। কারণ বাইরে ওরা যেতো না আমাদের যখন মড়কের সৃষ্টি করতো তখন না হোতো সে দর্শন দেওয়া দুঃসাধ্য। মহামন্ত্রী পার্লামেন্ট শেষ অবধি দয়ালু অনুশাসন জারী করেন। ৩০০-র জায়গায় ৪৫১ জনের বেশী দাস যাত্রী নেওয়া চলবে না। একবার ৭০০ জন দাস জুটে গেছিলো। বকশী মাত্র দুজনকে কোথায়

ভরা যায় তাই নিয়ে মহা সমস্যা। কী রেটে যে ঠাসাই হোতো। এ থেকেই বোঝা যায়।

সকালে একবার ডেকে আনা হোতো। সার সার বসিয়ে খাবার দেওয়া হোতো। তখন থাকতো চার ধারে সশস্ত্র পাহারা। 'মাল' খরিদের পর জাহাজ'য়ের সময়েই খবরদারী ছিলো বেশী। একটু গোলমাল হলেই বাঁধাজেট তাঁর কাছে. ঝুপ-ঝাপ সব পালাবার ফিকির খুঁজতো। দেশী মাল্লারা পালাতে সাহায্য করতো। দয়াপরবশ হয়ে নয়, পুনশ্চ ধরে বেঁধে টাকা বানাবার আশায়।

বিদ্রোহ হাঙ্গামা তো লেগেই থাকতো। থাকবেই; আশ্চর্য কী। অতোগুলো শক্ত-সমর্থ মানুষ নীরবে এই অত্যাচার মেনে কেন নেবে আপ্রাণ লড়াই করতো। দাস-ব্যবসায়ের গবেষণায় একটি ফলশ্রুতি এই যে শতই বর্বর, নিরীহ, অ-মানুষ, আধা-পশু হিসেবে নিগ্রোকে চিহ্নিত করা হোক,—নীরবে অত্যাচার কখনও এরা মেনে নেয় নি, অন্ততঃ আফ্রিকায়। ছবির পর ছবিতে বন্দী দাস-দাসীর চিত্রণ যা আজও পাওয়া যায় তা থেকে প্রচারিত হয় এই দাসদের মানুষ হিসেবে অপদার্থতা। প্রচারিত হয়, প্রমাণিত হয় না। কারণ, ইতিহাস অন্য দলিল পেশ করে। সহজে তারা না দিয়েছে ধরা, না থেকেছে কয়েদে. শত শত জাহাজ বিদ্রোহীরা রসাতলে দিয়েছে। জাহাজ চালানো দূরের কথা জাহাজই তারা কোনোদিন দেখে নি, খোলা দরিয়ায় ক্যাপ্টেন কোতল হলে, জাহাজ খারাপ হলে মৃত্যু অনিবার্য, তবু সে মৃত্যু অগ্রাহ্য করেও বিদ্রোহের ঘাটতি কখনও হয় নি। (দ্রষ্টব্য)—বস্ম্যান, স্নেল গ্রেভ, বারবো, ক্যাপ্টেন উইলিয়ামস, প্রভৃতির কড়চা)। অথচ সেই 'টম কাকার কুটীর' থেকে একালের 'গন উইথ দ উইণ্ড' পর্যন্ত সাদারা সাদা কাগজে 'সাদা' সত্য একই ধ্বনিতে বাজিয়ে গেছে, 'এই কালো জাতের সৃষ্টিই সাদা জাদের খিদমৎগারী করতে। জন্মগতই এরা দাস, বশম্বদ,—সাদাদের ঘাড়ের বোঝা বইবার পুণ্য কর্মে খোদাতালা এদের আফ্রিকার জাহান্নম থেকে সাদাদের বেহেশতে ঠেলছেন আর ঠেলছেন।'

স্নেলগ্রেভের জাহাজে খালাসীরা জ্বরে ভুগছিলো, মাত্র গুটী দশেকই ছিলো সুস্থ। এই মোকায় কারামান্টো নিগ্রোরা খালাসীদের সঙ্গে লড়ে সাবড়ে দিলো 'হোল্ড'-এর রক্ষীকে। লড়াই প্রবল হোলো। কিন্তু কাঠ আর কাটলাসের ওপর একটা সময়ে বন্দুক হয়ে উঠলোই বলবান। কিন্তু বিদ্রোহীরা কী আত্মসমর্পণ করে ছিলো না করে নি। জলে ঝাঁপ দিয়ে নিজেদের সম্মান, মানুষের মর্যাদা রক্ষা করেছিলো।

'হুজ্জৎ হাঙ্গামা শান্ত হবার পর প্রশ্ন করি—তোরা এ সব করতে গেলি কেন?' জবাব এলো, আমি নাকি বিকট শয়তান। মানুষ হয়ে মানুষকে বেঁধে নিয়ে চলেছি। আমি বলি, বেঁধেছি যা তা তো মানুষ নয়; দাস, মাল। এদিক কিনেছে, দাম দিয়ে বেচেছে, আমি তো মাল-বাহক মাত্র। আমার জাহাজের খোলে ঢোকার আগেই তাদের বেচা-কেনা বাঁধা-বুঁধি খতম। তবে আমাকে অমানুষের মতো দেখা কেন? ওদের যদি ছেড়েও দিই, মুক্তি কী ওদের হবে? ওদের স্বজাতিরাই আবার ওদের ধরবে, বেচবে, বাঁধবে, জাহাজে তুলে দেবে. এর মধ্যে আমি কোথায় দায়ী? কী অমানুষিকতা আমার?—ওরা চুপ করে [illegible] ওদের বুক-ফেটে একটা চাপা আর্তনাদ বেরুলো। ওরাই মাথা নীচু করে নিলো।' (উইলিয়াম স্নেলগ্রেভ)। দাসেরা বিদ্রোহ করার ফলে ক্যাপ্টেন উইলিয়ামসের জাহাজ 'নান্সী' তো পুড়ে ছারখারই হয়ে গেলো। ক্যাপ্টেন উইলিয়ামস কোনোক্রমে বেঁচে যান। উপকূলের নিগ্রোরাই তাকে রক্ষা করে।

উইলিয়াম রিচার্ডসন এক ইংরেজ জাহাজে খালাসী। একবার এক ফরাসী জাহাজে বিদ্রোহ হোলো। ইংরেজরা সাহায্য করতে এলো। লিখছেন তিনি—'একটা জোয়ান সুঠাম নিগ্রো মুলুকের পায়ের জিঞ্জীর সঙ্গে যে নিগ্রোটা বাঁধা ছিলো সেটা মরে যাবার পরেও সেই শবদেহ বয়ে বয়েও বীর বিক্রমে সে যা লড়াই করছিলো দেখে আমি বিস্মিত। কিছুতেই তাকে নিরস্ত্র করা গেলো না। আর অস্ত্র কি? একখানা কাঠ। কিন্তু যতক্ষণ গুলি মেরে তাকে শেষ না করা হোলো সে থামে নি। ১৬৯৯ থেকে ১৮৪৫-এর মধ্যে অন্ততঃ পঞ্চান্ন বার বিদ্রোহ হয়েছিলো। এ সব দলিলে নথী হয়ে আছে।—সবটা বিদ্রোহের মধ্যে অন্ততঃ একটাতেও তারা পূর্ণ জয়ী হোতো। তাই বহু মানি। সটার পরাজয় তাদের দমাতো না। যারা জিততো তাদের কাহিনীই গাথা হয়ে থাকতো। কিন্তু নৌ-চালনায় অজ্ঞ থাকার দরুন বিজয়ী হয়েও তারা দেশে ফেরার পথ পেতো না। অন্য জাহাজের হাতে বন্দীই হোতো। বিজয়ী হয়েও কয়েদী।

কাজেই কুখ্যাত এই 'মাঝের ধারা'য় ছিলো অমানুষিক বর্বরতা, নৃশংস অত্যাচার। এইসব পরিস্থিতি কাটিয়ে অবশেষে জাহাজ সমুদ্রের পথে পাড়ি দিতো। তখনও বিপদ বহু। আগুন, জাহাজ ডুবি ঝড়, পাইরেট, অন্য রাষ্ট্রের দাবীর সঙ্গে সংঘর্ষ, লাইসেন্সের আইন-সিদ্ধতা এ সব তো আছেই, তাছাড়া জলে ঝাঁপাচ্ছে, রোগ-ভোগ, ঝড়-ঝঞ্ঝা, বাতাস থেমে যাওয়া, বিপথে ঘোরা—এ সবও। সওদাগরদের মাল সবই ইনসিওর করা থাকতো। মরতে [illegible] দাসরাই। কিন্তু রোগ-মড়কের [illegible] ইনসিওর হোতো না। কাজেই অনিচ্ছা সত্ত্বেও ক্যাপ্টেনদের খবরদারী রাখতে হোতো দাসেদের স্বাস্থ্যের প্রতি। —এ সব সত্ত্বেও একদা যথাকালে এইসব দাস বাজারে পৌঁছে যেতোই, কারণ কঙ্কালের তো আর নতুন মৃত্যু নেই। যা পৌঁছোতো; তা কংকাল।

অষ্টাদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময় পর্যন্ত দাস-জাহাজে মনুষ্যত্বের এই অমর্যাদার বিবরণ কেউ বিশ্বাসই করতো না। নাজীদের আমলে সাধারণ ভদ্র শিক্ষিত জার্মানদের কেউ বা বিশ্বাস করতো কনসেনট্রেশন ক্যাম্প নামক কোনও বিভীষিকা বীর-হিটলারের হুকুমে সম্ভাব্য ছিলো? অথচ তখনকার দিনের নানা কড়চায়, নথীতে পাচ্ছি 'এতো নীচু ছাত যে কোনও রকমে বসে থাকতো হাঁটু গেড়ে আবার একের হাঁটুর মধ্যে মধ্যেও অপর কেউ মাথা গুঁজে বসে আছে। রাতে দিনে, শোয়া তো দূরে থাক একটু নড়া-চড়ার যো ছিলো না। (জাহাজের ভাসায়)

'কাৎ হয়ে পড়ে থাকা ছাড়া অন্য কোনো উপায়ই ছিলো না। এক একবার একটার ঘাড়ে অন্যটাকে চাপিয়েও রাখা হোতো' ফ্যাল কন বিজ্র

এরই মধ্যে ওলোন্দাজ জাহাজগুলো একটু বড়ো সড়ো ছিলো। খোলের মধ্যে বাতাস চালিয়ে দেবার জন্য যান্ত্রিক ব্যবস্থাও ছিলো। ইংরেজ স্প্যানিশ-আ[illegible] [illegible]কানদের কার্পণ্য আর অনীহা [illegible] নগণ্য। ওদের চোখে নিগ্রো মানে কালো 'মাল', এর বেশী কিছু নয়।

(চলবে)

লীলা মজুমদার
পাকদণ্ডী

(৩২)

আমার ছাত্র-জীবনের কাহিনী ক্রমে শেষ হয়ে আসছে। এম-এ পাস করবার পর আর আমি কখনো কোনো পরীক্ষা দেবার কিংবা মস্ত প্রবন্ধ লিখে খেতাব পাবার চেষ্টা করিনি। ও-সবের সঙ্গে আমার কি? ঐ দু-বছরে আমি অনেক বিদগ্ধ-জনের দেখা পেয়েছিলাম। তাদের মধ্যে সকলে আমার মাস্টারমশাই ছিলেন না। যাঁরা ছিলেন, তাঁদের নাম আগে বলি। বিদগ্ধ-শিরোমণি জয়গোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় ছিলেন। আমাদের শেলি, ওয়ার্ডসওয়ার্থ ইত্যাদি পড়াতেন। ছোটখাটো প্রৌঢ়, ফিট-ফাট কাপড়চোপড়, কিঞ্চিৎ কাঠখোট্টা চেহারা, কিন্তু কাব্যরসে ডুবে থাকতেন। শেলি কীট্‌সের গুণ স্বীকার করেও ওঁদের আমার মনে ধরত না। কেমন একটু মরে গেলাম, গলে গেলাম, উচ্ছ্বাসের ভাব মনে হত। ওয়ার্ডসওয়ার্থ অমনটি না হলেও এত সামান্য জিনিস নিয়ে এত দীর্ঘ ভাব জমান যে আমার ধৈর্য থাকত না। সেকালে যাঁর দ্বারা আমি সব চাইতে প্রভাবিত হয়েছিলাম, তিনি হলেন রবার্ট ব্রাউনিং। তাঁর বলিষ্ঠ, মাঝে মাঝে রূঢ় রুক্ষ পদগুলি আমার মনের মধ্যে গেঁথে যেত। দুঃখের বিষয়, আমাদের বিশেষ পাঠ্য-বিষয় ছিল রোম্যান্টিক কবিদের গোড়ার কল্পনা। তাই স্বার্থকলাপে যিনি সব চাইতে রোম্যান্টিক চিন্তার পরিচয় দিয়েছিলেন, তাঁকে নমোনমো করে ছেড়ে দেওয়া হত। কিন্তু আমি তাঁকে আজ পর্যন্ত ছাড়তে পারিনি।

আরেকজন ছিলেন রজনীকান্ত গুহ, প্রৌঢ়, ব্রাহ্ম, প্রচ্ছন্ন একটু সরসতায় চোখ মিটমিট করত, বার্ক, কারলাইল পড়াতেন। দিদিদের ক্লাসে একদিন যা বলেছিলেন, তার বাংলা হল, 'বন্ধুগণ, আমি তোমাদের এমন সব কথা বলতে পারি, যার ফলে যদি এখনো অবিবাহিত থাকো, তো চির-অবিবাহিতই থাকবে!' দেশকর্মী ছিলেন, অশ্বিনীকুমার দত্তের সহকর্মী, দেশের জন্য অনেক কষ্টও সহ্য করেছিলেন, কিন্তু সেসব তাঁর মনে কোনো তিক্ততা রেখে গেছে বলে মনে হত না। আমি তাঁকে শ্রদ্ধা করতাম। মোহিনীমোহন ভট্টাচার্য ছিলেন, মেধাবী, আইনজ্ঞ, বিদ্বান, কিন্তু দুঃখের বিষয়, মেয়েদের দিকে পাশ ফিরে গড়গড় করে ল্যান্ডর পড়িয়ে যেতেন বলে, আমাকে একটুও প্রভাবিত করেন নি। আরো অনেকে ছিলেন; প্রত্যেকে পণ্ডিত মানুষ, কর্তব্যপরায়ণ, কিন্তু কেউ আমার মনে আলো জ্বালান নি; সেটা নিশ্চয় আমারি অনবধানতার জন্য। প্রিয়রঞ্জন সেন, কুমুদ-বন্ধু রায়, সুহাসচন্দ্র রায়, পঞ্চানন গঙ্গোপাধ্যায়। কিন্তু এদের তত্ত্বাবধানে শিক্ষার পথ আমার যে বড়ই উপভোগ্য হয়ে উঠেছিল তাতে সন্দেহ নেই। আরেকজন ছিলেন তাঁর পুরো নামটি নিয়ে গোলমাল লাগছে, বোধ হয় কে সি মুখার্জি, শৌখীন, অমায়িক, বিদগ্ধ, অক্সফোর্ড কিম্বা কেম্ব্রিজে উচ্চপদে অধিষ্ঠিতও ছিলেন। তাঁকে আমার ভালো লাগত।

সে সময়ে সুনীতিকুমার চট্টো-পাধ্যায়কে ছাত্ররা ভারি শ্রদ্ধার চোখে দেখত। দুঃখের বিষয় তাঁর কাছে পড়বার সুযোগ পাইনি, কারণ তিনি ছিলেন বি-গ্রুপের মাস্টারমশাই। যে দুজন অধ্যা-পককে আজও মাঝে মাঝে দেখি, তাঁরা হলেন শ্রদ্ধেয় অমিয়কুমার সেন আর শ্রদ্ধেয় রমাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, যাঁর স্নেহ লাভ করে এ-বয়সেও আমি কৃতার্থ। তবে সত্যের খাতিরে বলতে বাধ্য হচ্ছি এঁরা কেউ আমাদের দিকে ফিরেও দেখতেন না; আমরা আছি কি নেই সে বিষয়ে চৈতন্য ছিল কিনা টের পেতাম না। সুনীতি চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গে পরে অনেক ঘনিষ্ঠ-ভাবে মেলামেশা করবার সুযোগ পেয়ে-ছিলাম। ভাষায় অমন পাণ্ডিত্য আমি আর কারো মধ্যে দেখিনি। তার ওপর ছিল রস-বোধ, সেকালের অধ্যাপকদের মন থেকে যে জিনিসটি উপচে পড়ত, কিন্তু এখন খুঁজে দেখতে হয়। একদা আমার বড়দা সুকুমার রায়ের মণ্ডে ক্লাবের সদস্য ছিলেন সুনীতিকুমার। তাঁর পি আর এস লাভ উপলক্ষ্যে তাঁর ঘাড় ভেঙে অন্য সদস্যরা সাড়ে ১৭ টাকার ভোজ খেয়েছিল, অন্য সূত্রে সে-কথাও জানতাম।

যতদূর মনে হচ্ছে তখন ভারতীয় ভাষা বিভাগে শ্রদ্ধাভাজন শ্রীবিশ্বপতি চৌধুরী অধ্যাপনা করতেন। আমাদের প্রিয় বন্ধু নীহাররঞ্জন রায়ের বৈদগ্ধ্য তখনি লোকের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল। খুবই কম বয়সে পি আর এস হয়ে, ভাইস-আর্টস বিভাগে অধ্যাপনা করতেন। কিন্তু সেই সঙ্গে সারা জীবন তাঁর বঙ্গ-সাহিত্যের দিকে, বিশেষ করে রবীন্দ্র-সাহিত্যের দিকে মন ছিল। আমার চাইতে খুব বেশি বড় নন, বড় জোর বছর চারেকের, কিন্তু সে-সময়ে দুজনার মধ্যে তাঁর জ্ঞানের গরিমার জন্য আকাশ-পাতাল ব্যবধান ছিল। আমার সাহিত্য-জীবন অনেক দিন ধরে ধীরে ধীরে, মাঝে মাঝে অনেক দিনের নীরবতা রেখে, অগ্রসর হয়েছিল। আমি যখন পায়ের নিচে মাটি খুঁজছি, তখন আমার সম-বয়সীরা, বুদ্ধদেব বসু, আশাপূর্ণা দেবী, অজিত দত্ত, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় ইত্যাদি যশস্বী লেখক বলে সকলের কাছে পরিচিত। তবে ছোটদের জন্য লেখার কথা অন্য এক জিনিস। নীহারদাকে আমার ষোল বছর বয়স থেকেই চিনতাম। উনি অমল হোমের আপন খুড়তুতো ভাই। ওঁদের আসল পদবী হোমরায়। অমল হোমরা রায়টা ছাড়লেন; নীহারদারা হোমটা ছাড়-লেন। যতদূর মনে হয় নীহারদা সে সময়ে ইউনিভার্সিটি ত্রৈমাসিকের সম্পাদক ছিলেন। আশুতোষ বিল্ডিং-এর তলায় রঙীন কাচের জানলা দেওয়া আশুতোষ হল-এর উদ্বোধন হল। আমি সেখানে এলিজাবেথ ব্যারেট ব্রাউনিং-এর সনেট্‌স ফ্রম দি পর্তুগীজ সম্বন্ধে প্রবন্ধ পাঠ করেছিলাম। নীহারদা পাণ্ডুলিপিটি সঙ্গে সঙ্গে নিয়ে ত্রৈমাসিকে ছেপে দিলেন। সমালোচনার জগতে এই আমার প্রথম পদক্ষেপ। ইংরিজি কাব্য প্রসঙ্গ, ইংরিজিতে রচনা। বাংলা সমালোচনায় নিজের যোগ্যতা সম্পর্কে আমার এতটুকু আস্থা ছিল না; কিন্তু কিছু পড়লেই মনের মধ্যে কতকগুলো জিজ্ঞাসা সর্বদা ভিড় করে আসত। ঐ জিজ্ঞাসাই হল সমালোচকের প্রধান উপজীব্য একথা পরে বুঝেছিলাম। অপরের চিন্তা-রাজ্যে পথ চিনে হাঁটা; নিজের চিন্তারাশি তার ওপর আরোপ করা নয়। অন্যের লেখার ভালো-মন্দ বিচার করা নয়, তার চিন্তার বলিষ্ঠতা দুর্বলতা প্রকাশ করা। যে পড়বে সে বিচার করুক। এ কাজ বড় সহজ নয়; একসঙ্গে নির্মমভাবে অন্যের চিন্তা রাজ্যে দৃষ্টিপাত করা, এবং হৃদয়ের সমস্ত সহানুভূতি দিয়ে তার যুক্তি অনুধাবন করা। অবশ্য তার মানে নয় যে, যুক্তি গ্রহণ করতে হয়। তীক্ষ্ণ বুদ্ধি আর কোমল সমবেদনা না থাকলে, সমালোচনায় হাত না দিলেই ভালো। আমি কে যে আমার উপলব্ধি আরেকজনের ওপর চাপাব? শুধু সমালোচনা লিখে সাহিত্যিক হতে ১০০ জনের মধ্যে একজন হয়তো পারে। শুধু অপরের দোষ-গুণ বলে দিয়ে তো আর সাহিত্যিক হওয়া যায় না, নিজেরও কিছু দিতে হয়। মৌলিক লেখা ছাড়া অন্য কিছুকে আমি সাহিত্যের আসরে আসন দিই না। সমালোচনা লিখি মাঝেমাঝে, কিন্তু ভয়ে-ভয়ে, সেই ইংরিজি কবিতা মনে রেখে:

'টেক্ড সফট্‌লি, ফর ইউ টেক্ড অপন মাই ড্রীম্‌স্।' আস্তে পা ফেল, কারণ

আমার স্বাস্থ্যের ওপর পা ফেলেছে। সে যাই হোক একটি বয়ঃপ্রাপ্তদের পত্রিকায় আমার প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়ে গেল। সঙ্গে সঙ্গে 'ফরওয়ার্ড' বলে একটি ইংরিজি সাপ্তাহিক, তার সম্পাদককে মনে নেই, যে কোনো বিষয়ে একটি প্রবন্ধ চেয়ে বসল। আমি আধুনিক ছেলেমেয়েদের মনোভাব সম্বন্ধে ছোট-খাটো একটি প্রবন্ধ লিখে দিলাম। ইংরিজিতে। পাঠকদের সেটি ভালো লেগেছিল। কিন্তু আমার এতটা ভালো লাগেনি যে যত্ন করে তুলে রাখব। বয়স্ক পাঠকদের জন্য বাংলায় লিখবার সংসাহস আমার ছিল না, অথচ বক্তব্য যথেষ্ট ছিল। আমি আমাদের পূর্ববর্তীদের রক্ষণশীলতা সম্পর্কে ক্রমে অসহিষ্ণু হয়ে উঠছিলাম। তবে আমার চিন্তাগুলো যে বড় কাঁচা তাও জানতাম।

ছোটদের জন্য গল্প লেখায় নিজেকে ছেড়ে দিতে পারতাম। সবগুলি গল্প যে খুব ভালো হত তা-ও নয়। তবু মনে হত আমার মনের মধ্যে থেকে কেউ আমাকে লিখতে বাধ্য করে। গল্পগুলো তৈরি করে আমার কলমের আগায় এনে উপস্থিত করে। রাফখাতা থাকত না; ভুল-ভাল শুধরে একটা সংশোধিত সংস্করণ নেই; মনে মনে তৈরি হয়ে না উঠলে, কলম সরে না। লেখা হয়ে গেলে একবার বানান ব্যাকরণ দেখে দেওয়া। আর কিছু নয়। তবে মাঝে মাঝে খানিকটা লেখা হলে আমার ঐ ভেতরকার মানুষটা আমাকে ত্যাগ করে? তখন লেখা ছিঁড়ে ফেলতে হয়। মাঝে মাঝে সে আমাকে ভুলে যায়। তখন আমি কিছু লিখতে পারি না। যদি পেড়াপেড়ির পাত্রী হয়ে জোর করে লিখি, সে লেখা উৎরোয় না। ইঁট কাঠ খড় দিয়ে আমি গল্প তৈরি করতে পারি না।

মোট কথা 'সন্দেশে' ২-১ মাস পর পর একটি করে গল্প লিখি। তার জন্য একটি করে চাইনিজ ইংক দিয়ে ছবিও এঁকে দিই। একবার সন্দেশের সম্পাদক, আমার মণিদা, (অর্থাৎ সুবিনয় রায়) বললেন, 'জল-রঙ দিয়ে ফুল-পোকা একটা ছবি এঁকে দাও, তাকে দিয়েই গল্প হবে।' জল-রঙ-এর কাজ ভালো করে শিখিনি। সেই যে আমার স্কুল-জীবনে প্রবেশ গ্রহণ করে একজন ছবি আঁকার মাস্টারমশাই ছোট ক্যাটা ঠিক করে দিয়েছিলেন, তিনি আমাকে যত্ন করে দেখাতেন কাজ আর তেল-রঙের কাজ শিখিয়েছিলেন। তা ছাড়া আমার বড়দিকে ওঁদের কটকের বাড়িতে বসে তেল-রঙে অপূর্ব সব সমুদ্রের দৃশ্য আঁকতে দেখেছিলাম। নিজেও কিছু কিছু এঁকে একে এঁকে দিয়েছিলাম। কিন্তু জল-রঙ সামান্যই জানতাম। তবে শখ ছিল। শখ মানুষকে যতদূর নিয়ে যায়, তেমন আর কিছুতে নয়। দিলাম একটা পুকুরের দৃশ্য এঁকে। পুকুরে মাছ-মায়ের পাশে মাছ-মেয়ে বিকট মেজো জোড়ি কাটছে। অবিশ্যি এ-সব কথার সঙ্গে-সঙ্গেই জানতাম, এ আমার কাজ নয়। ঐ সন্দেশে ছাপা হবার পর, 'সন্দেশ' বন্ধ হয়ে গেল। আমার গল্প

থামবার কথা ওঠে না। রামধনুতে, মৌচাকে, মাঝেমাঝেই গল্প বেরুত। একটা বিষয় সচেতন ছিলাম। আমি জানতাম আমার লেখা ছোটদের গল্প যদি সম্পাদক গ্রহণ না করেন, তাহলে দুঃখে আমার বুক ফেটে যাবে। তাই জীবনে কখনো নিজের থেকে কোনো সম্পাদককে লেখা পাঠাইনি। সম্পাদক চেয়েছেন, তবে দিয়েছি। ফেরত দেননি কেউ। শুধু অনেক পরে বুদ্ধদেব বসুর আমার একটি বড়দের গল্প পছন্দ হয়নি। তার বদলে 'বৈশাখী'র জন্য আরেকটি চেয়ে নিয়েছিলেন। অপছন্দের গল্পটি বিশ্বভারতী পত্রিকায় ছাপা হয়েছিল। তার নাম 'সবুজ যার চোখ'।

এই সময় শ্রীযুক্তা রাধারাণী দেবীকে প্রথম দেখলাম। তাঁর লেখা কবিতা অনেক দিন থেকেই পড়তাম। প্রেসিডেন্সি কলেজে এক সাহিত্য-সভা হয়েছিল, কে উদ্যোক্তা কি উপলক্ষ্য কিছুই মনে নেই। বক্তা শ্রীমতী রাধারাণী দেবী। তখনো তাঁর কবি নরেন্দ্র দেবের সঙ্গে বিবাহ হয়নি। শুনেছিলাম বাল-বিধবা। প্রেসিডেন্সি কলেজে তখন মেয়েরা পড়ত না, তাই আসর জমাবার জন্য ইউনিভার্সিটির ছাত্রীরা নিমন্ত্রিত হল। শ্রীমতী রাধারাণী দেবী রবীন্দ্র সাহিত্য সম্বন্ধে বলেছিলেন। মনে আছে যে ভালো লেগেছিল, কিন্তু বক্তব্যের বেশি কিছু মনে করতে পারছি না, তবে এটুকু মনে আছে তিনি বলেছিলেন ঘরে-বাইরের একেকটি চরিত্র একেকটি প্রতীক। শুনে মনে হয়েছিল রবীন্দ্রনাথের সব চরিত্রই একেকটি বিশেষ চিন্তাধারার প্রতীক। এখনো ভাবি সত্যিই তাই, ওরা কেউ রক্ত-মাংস দিয়ে তৈরি আস্ত আস্ত মাটির মানুষ নয়। ওদের স্থান সাধারণতের খানিকটা ওপরে। মনটা রাধারাণী-বৌদির কথায় সায় দিয়েছিল। পরে তাঁকে আরো কাছে থেকে অনেকবার দেখেছি। প্রথম দিনের কথাগুলি যতখানি মনে ধরেছিল তেমন আর কোনো কথা নয়।

সে সময় কলেজের পঞ্চম ও ষষ্ঠ শ্রেণীতে মোট ২০ জন মেয়েও পড়ত কিনা সন্দেহ। তাদের মধ্যে দেশকর্মী কল্যাণী দাশ ছিল। এমন নির্মল দৃঢ় চরিত্র এমন আদর্শবাদী মেয়ে সচারচর দেখা যায় না। পরবর্তী কালে এর ছোট বোন বীণা দাশেরও লাট সাহেবকে হত্যা করার চেষ্টার জন্য বহুদিন কারাবাস দণ্ড হয়েছিল। কল্যাণীও দীর্ঘকাল জেলে থেকে অশেষ অপমান আর লাঞ্ছনা ভোগ করেছিল। এদের আজকালকার সাধারণ লোকেরা ভুলেই গেছে। এক দিকে নির্মম দেশকর্মী, অন্য দিকে কি কোমল স্বভাব, মানুষের দুঃখ দেখে ওদের চোখে জল আসত। গান্ধীজি যেদিন অনশন করতেন, ওরাও সেদিন জলস্পর্শ করত না। পরিবারটাই ছিল অন্য রকম। আদর্শবাদী। কটকে ওদের বাবা বেণীমাধব দাশের ছাত্র ছিলেন সুভাষচন্দ্র বসু এবং তাঁর কাছেই স্বাধীনতা সংগ্রামের অনুপ্রেরণা পেয়েছিলেন, এ-কথা বলা চলে। কল্যাণী দর্শন শাস্ত্রে এম-এ পড়ত। আমার কৈশোরের বন্ধু মীরা দত্ত গুপ্তা পড়ত

ছিল, দোতলার দালানের এক মাথা পার্টিশন দিয়ে আলাদা করে বসবার ঘরটি হয়েছিল। মধ্যেখানে একটা বড় টেবিল, তার চারদিকে অনেকগুলি কাঠের চেয়ার। মেয়েদের ব্যবহারের জন্য আলাদা একটা বাথরুমও ছিল। কিন্তু সেটি কমন্-রুমের সংলগ্ন না হয়ে, তিন তলায় অবস্থিত ছিল। তার দরজায় তালা দেওয়া থাকত। দরোয়ানের কাছ থেকে চাবি নিয়ে দরজা খুলতে হত। তবে সে তালা-চাবি অ-ভেদ্য ছিল না। ঘরের দেয়ালে মাঝে মাঝে পেন্সিল দিয়ে অশ্লীল মন্তব্য লেখা আর ছবি আঁকা থাকত। এখানে সব ভদ্রঘরের শিক্ষিত যুবকরা পড়ত, তবু কি করে সেটা সম্ভব হত জানি না। আগেই বলেছি যে-মেয়েরা উচ্চ-শিক্ষা গ্রহণ করত, তখনো আমাদের দেশের লোকেদের বেশির ভাগ তাদের শ্রদ্ধা করতে শেখেনি। আমরা আমাদের আত্মসম্মান রক্ষা-কবচের মতো হাতের মুঠোর মধ্যে করে নিয়ে বেড়াতাম। মাঝে নামে কবিতা লিখে রাখত। আমার নামেও বার দুই লিখেছিল। কিন্তু সেগুলো খোশামোদ-প্যাটার্ণের হওয়াতে, মতট চটতে পারতাম, ততটা চটিনি। একদি কমনরুমে ঢুকে দেখি আবহাওয়া কেমন থমথমে।

টেবিলের ওপর [illegible] 'ভোট-রঙ্গ' বা গোলাপী একটা [illegible] পড়ে আছে। আমার 'ভোট-রঙ্গ' পড়ত না, এর আগে কখনো হাতেও পাইনি। টেবিল ঘিরে হাঁড়ি-মু করে ৬-৭জন মেয়ে বসে আছে। কি ব্যাপার? না, খুলে পড়েই দেখ না। ভোট রঙ্গে একটা লম্বা কবিতা। কোন ছাত্রী নাকি বৃষ্টি পড়ার সময় লেকের ধারে একজ ছাত্রের সঙ্গে এক বর্ষাতি গায়ে দিতে দে গিয়েছিল। এই হল ব্যাপার। কবিত শিরোনামায়, অপরাধী-যুগলের নাম ইঙ্গিত রয়েছে। উত্তেজিতভাবে ছাত্রীরা বল লাগল, এতে সমস্ত ছাত্রীদের নিন্দা হ এ-রকম হতে দেওয়া উচিত নয়। ও ইউনিভার্সিটি ছেড়ে যেতে বাধ্য করা হো আমরা ওকে একশো বার বলেছি ঐ রিস স্টুডেন্টের সঙ্গে অত কি ভাব। ইত্যা শুনে আমি অবাক হলাম, 'তোমরা এ-র জানতে নাকি?' 'নিশ্চয় জানতাম, রোজ ও ওর সঙ্গে বেড়াতে যায়। সে ভালো ছাত্র হ কি হবে, এ কি রকম জঘন্য ব্যবহ জানতে তো এর আগে ওকে এক-ঘরে ক কেন? মোট কথা আমি ওর সঙ্গে কথা ব কোথায় সে?' 'কোথায় আবার? দাল কোথাও দাঁড়িয়ে আছে, এখানে মুখ দেখ লজ্জা করছে।' সেই মেয়েকে খুঁজে ি তার ক্লাসের দোর-গোড়া অবধি পে দিয়েছিলাম। ব্যাপারটা বেশি দূর গড়া ছাত্রীরা ঠান্ডা হয়ে গেছিল। পরে ঐ মে সঙ্গে ঐ রিসার্চ স্টুডেন্টের বিয়ে হয়েছি ভোট-রঙ্গ ঘটকালিতে বিয়েটা একটু আ হল, নইলে ওদের ইচ্ছা ছিল ডক্টরেট নিয়ে চাকরি পেয়ে তবে করবে। বড় কষ্টে কিছুদিন কাটাতে হ ছিল, আশা করি পরে সুখী হয়েছিল

আজিও এই ব্যাপার থেকে ি

নর-নারীর মন সম্বন্ধে আমার প্রথম পাঠ নিয়েছিলাম। নিজেদের দুর্বলতা বিষয়ে যত ক্ষমাশীল, অন্যের ভুল-চুক বিষয়ে ততটা সচেতন। এর মধ্যে খানিকটা আত্ম-প্রসাদের সঙ্গে অনেকখানি নিষ্ঠুরতা থাকে। লোকে পাপ বলতে ভাবে নারী-পুরুষ সম্বন্ধীত কিছু, কিন্তু আসলে নিষ্ঠুরতা হল সব চাইতে জঘন্য পাপ।

পুজোর সময়ে মীবাদের সঙ্গে এই এই প্রথম পাহাড় দেখা। মীরার জ্যাঠামশাই এঞ্জিনিয়ারিং কলেজে বাবার সহপাঠী ছিলেন। নইলে একটা অচেনা হিন্দু পরি-বারের সঙ্গে কোথাও একা যাবার অনুমোদন পাওয়া যেত না। বড় ভালো এই পরিবার। শিক্ষিত, উদার, কিন্তু সেকালের নিয়মে ওদের ঘরকন্না চলত। ওদের সঙ্গে ক'দিন থেকে মুগ্ধ হয়ে গেলাম। আর পাহাড়? এমন মহান পাহাড় আমি ভাবতে পারিনি। হিমালয়ের মতো আছে কি?

শিলং-এ যে হিমালয় দেখেছিলাম, কোনো কোনো বিশেষ জায়গায় দাঁড়িয়ে, পরিষ্কার দিনে, সে হিমালয় দেখে মনে হত বুঝি আকাশের পটে তুলি দিয়ে আঁকা, বাস্তব নয়। আর এই হিমালয়ও বাস্তব নয়, বাস্তব জিনিস এমন মহান মহিমাময় হয় না। কেবলি আমার দাদামশায়ের কথা মনে হত। তিনি হিমালয়ের তীর্থে তীর্থে শেষ জীবনটা কাটিয়েছিলেন। বাস্তব ছিল বটে, আমার হৃদয়ের শিলং পাহাড়। এর মধ্যে দুর্গা পুজো এসে গেল। বাজারের ওপরে সুন্দর ঠাকুর গড়ে, ঘটা করে পুজো হল। বিকেলে দেখতে গেলাম। পথে 'মহারাণী স্কুলের' ২-৩ জন ব্রাহ্ম শিক্ষিকার সঙ্গে দেখা, তারাও আমার সঙ্গে গিয়ে ঠাকুর দেখে এল। পরদিন স্কুলের অধ্যক্ষা, শিবনাথ শাস্ত্রীর মেয়ে হেমলতা সরকার ওদের বকলেন, 'ব্রাহ্ম হয়ে মূর্তি পুজো দেখতে গেলে?' ওরা আর কিছু ভেবে না পেয়ে বলল, 'লীলাও গেছিল।' হেম-মাসিমা বলেছিলেন, 'ওর কথা আলাদা। ওর দাদামশাই একবার ব্রাহ্ম হয়েও আবার হিন্দু হয়ে গেছিলেন।' শুনে 'আমি অবাক!! আবার মনে হয়েছিল যে যারা উপনিষদের মন্ত্র পড়ে উপাসনা করে, তারা আবার অ-হিন্দু কিসে? তবে মূর্তি-পুজোয় আমারো মন সায় দেয় না, তাই বলে তাকে নিরাকার পুজোর থেকে ছোট বলে দেখি না। সেদিন ওদের এত কথা বলি নি। কলকাতায় ফিরে এসে দিদিকে বলেছিলাম, 'আমি যখন বিয়ে করব, একজন হিন্দুকে বিয়ে করব।' দিদি বলেছিল, 'সে আমি সর্বদাই জানি।'

তারপর পড়াশুনোর ডুবে গেছিলাম। বড় অশান্তির সময় ছিল সেটা, ১৯৩০, আইন-অমান্য আন্দোলনের বছর: হিংসাত্মক কার্যকলাপ। অত্যাচার। সংগ্রাম। নির্দোষ লোকদের গ্রেপ্তার। পুলিশ চালানো। এমন কি কলেজ স্ট্রীটের দোকান থেকে 'সিভিলাইজেশন ইন দি নাইন টিন্থ সেঞ্চুরি' বইটিও দোকানের মালিকের সঙ্গে সন্ত্রাসবাদী পাঠ্য বিবেচনায় ধরে নিয়ে গেল। বন্ধু-বান্ধব অনেকে জেলে গেল। বিলিতী জিনিসের ব্যবহার প্রায় উঠে গেল। বই ছাড়া আমরা কোনো বিলিতী জিনিস কিনতাম না। বিলিতী জ্ঞান কখনো কোনো দেশের সম্পত্তি হয়?

আমাদের পরীক্ষা পেছিয়ে গেল। মে-জুনে না হয়ে হল নভেম্বরে। আমি পরীক্ষা দিয়েই হেম-মাসিমাকে চিঠি লিখলাম আমাকে কিছুদিনের জন্য শিক্ষিকার পদ দিতে। হেম-মাসিমা অবাক। 'এ ছোট কাজ কি তোমার ভালো লাগবে?' কি করে বোঝাই যে আমার জীবনে এমন একটা সময় এসেছে যখন আমার একান্ত-ভাবে একা থাকা দরকার। আমাদের বাড়িতে সবাই সবাইকে এত ভালোবাসত যে কারো পক্ষে একা থাকা অসম্ভব ছিল। সেই জীবন-যাত্রা তার নিরাপত্তা আর স্নেহ দিয়ে আমাদের আমিত্বকে পঙ্গু করে দিত। তার ওপর বাবার সঙ্গে আমার কিছুতেই মতের মিল হত না।

গেলাম চলে দার্জিলিং-এ, ১৯৩১ সালের ২৭শে ফেব্রুয়ারী। আমার তখন ২৩ বছর বয়স। দিদির ২৪। আমাদের বাড়ির অভিভাবকরা ঠিক করা বিয়েতে বিশ্বাস করতেন না আর বাইরের পুরুষদের সঙ্গে মেলামেশাও পছন্দ করতেন না। অনেকে বলতে লাগলেন আমাদের বিয়ের বয়স পেরিয়ে যাচ্ছে।

যাবার কয়েক দিন আগে পরীক্ষার ফল বেরোল। একজন ফিরিঙ্গি মেয়ে আর আমি এক সঙ্গে প্রথম হয়েছি। এইখানেই আমার ছাত্র-জীবনের শেষ। কোনো উচ্চতর উপাধির জন্য চেষ্টাও করি নি। ছাত্র-জীবনের শেষ আর সংসারের প্রতিদিনকার বিদ্যালয়ের শিক্ষা জীবনের শুরু। তার পাট চলেছে আজ পর্যন্ত।

এর পর আমার কর্মজীবন। সে আরেক কাহিনী।

(শেষ)

অচেনা সুভাষ

১৯৩৪ সালের ২০শে জানুয়ারী সুভাষচন্দ্র ইটালীর মিলন শহর ঘুরে আবার সুইজারল্যাণ্ডের জেনিভা শহর-এ আসেন। আর জেনিভা ছেড়ে জার্মানীর মিউনিখের উদ্দেশ্যে অস্ট্রিয়ার পথে রওনা হয়েছিলেন ২০শে মার্চ। অর্থাৎ সুভাষচন্দ্রের জেনিভা অবস্থান ছিল গোটা দু'টি মাস। এবার জেনিভা আসার উদ্দেশ্য হলো, ভারতীয় সংস্থা বা লীগ অফ্ নেশনস্-এর সংগঠন, কার্যকর্ম ইত্যাদি খুঁটিয়ে দেখা এবং লীগ অব্ নেশনস্-এর দরবারে ভারতের স্বাধীনতার পক্ষে প্রচার ও জনমত গঠন করা।

১৯৩৩ সালে জেনিভাতে তিনি এ-ব্যাপারেই কাজকর্ম করেছিলেন মিঃ ভি জে প্যাটেলের সঙ্গে। এবার কিন্তু উনি একা। সুতরাং সুভাষচন্দ্রকে অসম্ভব পরিশ্রম করতে হতো। সারাদিন অক্লান্ত পরিশ্রমের পর রাতে যে সম্পূর্ণ বিশ্রাম নেবেন, সেটাও তার হয়ে উঠতো না। নৈশভোজের পর প্রত্যহ রাতে অনেক সময় কাটতো চিঠির উত্তর ও নানা প্রবন্ধ লিখতে। নিয়মিত তিনি চিঠি পেতেন অসংখ্য। বলাবাহুল্য, এসব চিঠির বিষয়বস্তু থাকতো বিভিন্ন। উচ্চ রাজনীতি থেকে শুরু করে একেবারে নেহাতই ব্যক্তিগত প্রসঙ্গের।

রাতে চিঠি লেখার সময়েও সুভাষচন্দ্র খুব সচেতন থাকতেন, কাকে চিঠি লিখছেন, তাঁর সঙ্গে ওঁর সম্পর্ক কি, তাঁকে উনি কি চোখে দেখেন, পত্র-প্রাপক সম্পর্কে ওঁর আশা-আকাঙ্ক্ষা কতদূর ইত্যাদি সব কিছু বিষয়-এ। ওঁর সে কোন বন্ধু-বান্ধব, আত্মীয়, প্রিয়-পরিজনকে (তিনি গুরুজন বা স্নেহভাজন যেমনই হোন না কেন) লেখা চিঠি থেকেই একথার প্রমাণ পাওয়া যায়। এমনই একটি চিঠির কিছু কিছু অংশ নীচে দেওয়া গেল। চিঠিখানি সুভাষচন্দ্র ১৯৩৪ সালের ২১শে ফেব্রুয়ারী জেনিভা থেকে লিখেছিলেন অত্যন্ত স্নেহভাজন ভ্রাতুষ্পুত্র, যাকে উনি নিজের রাজনৈতিক সহকারী তৈরী করতে চেয়েছিলেন সেই অমিয়নাথ বসুকে। অমিয়নাথ কলিকাতাস্থ স্কটিশ চার্চ কলেজে বিজ্ঞানের পরিবর্তে কলা বিভাগে ভর্তি হবে সেই প্রসঙ্গ নিয়ে চিঠি শুরু করা হয়েছে। কিন্তু তারপর থেকে শেষ পর্যন্ত পড়লে মনে হবে বুঝিবা স্বামীজীর কোন চিঠি পড়ছি।

পীস্ ও আমেরিকান এক্সপ্রেস কোং
জেনিভা
২১-২-৩৪

"...বিজ্ঞান শিখলে চিন্তা ও কাজের অভ্যাসগুলো 'এগ্জ্যাক্ট' হয়। আমাদের জাতের বড় দোষ যে আমরা বড় 'ঢিলা-ঢালা'—চরিত্রের মধ্যে 'এক্জ্যাক্টনেস' এবং বাঁধন নেই। সেটা আনতে হলে আমাদের শিক্ষা বৈজ্ঞানিক হওয়া চাই। আমার যদি সম্ভব হত আমি গোড়া থেকে বিজ্ঞান আবার শিখতাম। কিন্তু আমি 'ফিলজফি' —— —— [illegible]—এখন বিলাতের [illegible] [illegible] এখন 'টু-ই স্কট'।......এদেশে প্রত্যেক বালক-বালিকা স্কুলে উচ্চ বিজ্ঞান শেখে—আমাদের তো সেই উপায় নেই—তাই কলেজে গিয়ে আমাদের বিজ্ঞান শিখতে হয়।

"চরিত্রের প্রকৃত ভিত্তি স্থাপন করতে হলে—বিবেকানন্দের আশ্রয় নেওয়া ছাড়া উপায় নেই। আমাদের জাতের চরিত্রের প্রধান দোষ—আমাদের একাগ্রতা নেই—'কনসেনট্রেশন' নেই। এই 'কনসেনট্রেশন' পাবার জন্যে পূর্বে ধ্যানের অভ্যাস করতে হত।। এই একাগ্রতার সঙ্গে থাকা চাই 'টেনাসিটি'—'লেগে থাকা'। একটা আদর্শকে আঁকড়ে ধরতে হবে এবং সেই আদর্শের পেছনে সমস্ত জীবনটা কাটিয়ে দিতে হবে। বাঙ্গালী যদি 'কনসেনট্রেশন' ও 'টেনাসিটি' লাভ করতে পারে—যদি তার চরিত্রে একাগ্রতা ও আদর্শ-প্রবণতা আসে—তাহলে তার সঙ্গে আর কেউ পেরে উঠবে না। কারণ চরিত্রের অন্যান্য উপাদান তার সবই আছে।

অস্ট্রিয়ার বাদগাস্টাইন-এ ১৯৩৭ সালের শীতকালে। বাঁদিক থেকে—মিঃ এ সি এন নাম্বিয়ার, কাউন্ট ফুলপ মিলার, সুভাষচন্দ্র, অমিয়নাথ বসু ও ফ্রয়লাইন এমিলি শেংকল।
(আলোক চিত্র শ্রীমতী জ্যোৎস্না বসুর সৌজন্যে)

"একটা কথা সর্বদা মনে রাখবে যে, সংসারে হীনতা ও কুটিলতাকে জয় করতে হলে—শুধু ভালবাসার দ্বারা সেটা জয় করা যায়। এর চেয়ে বড় সত্য ইহজগতে নেই। যদি জীবনে কোন বস্তু ঘৃণা করতে হয়—তাহলে ঘৃণা করা উচিত নীচতা ও কুটিলতাকে। কিন্তু নীচতার প্রতিদানে নীচতা দেখালে চলবে না—ভালবাসা ও উদারতা দেখাতে হবে। তাই 'ক্রাইস্ট' ক্রুশ-বিদ্ধ হয়ে বলেছিলেন—'ফাদার ফরগিভ দেম ফর দে নো নট হোয়াট দে ডু'
এবং গৌরাঙ্গ মহাপ্রভু বলেছিলেন—'মেরেছ কলসীর কাণা তাই বলে কি প্রেম দিব না'।

"সন্ন্যাসীর আদর্শ বাইরে নয়—প্রাণের ভিতরে। গৈরিক ধারণ করলে সন্ন্যাসী হয় না। প্রকৃত কর্মী হতে হলে সন্ন্যাসী হওয়া চাই। প্রত্যেক যুগে সন্ন্যাসের একটা বিশিষ্ট রূপ আছে।' এই যুগের [illegible]—কর্ম সন্ন্যাস।।

অর্থাৎ সমস্ত ক্ষুদ্র স্বার্থ ত্যাগ করে একটা মহান আদর্শের জন্য জীবনটা ঢেলে দিতে হবে। এর নাম নিঃস্বার্থ।

"তুমি জান যে আমি নিজে একবার বাড়ী ছেড়ে বেরিয়ে গেছলাম। গুরু খোঁজবার আকাঙ্ক্ষা আমাকে তাড়িয়ে নিয়ে গেছল। মনের মত গুরু পাই নাই। তাই ফিরে আসি। সেই সময়ে আমি বুঝতে পারি যে সংসার আমাদের বাহিরে নয় আমাদের মনের ভিতরে। বনে গেলেও মানুষ নিজের আকাঙ্ক্ষার কথা চিন্তা করবে যদি তার আকাঙ্ক্ষা রয়ে গিয়ে থাকে। তবে আমি স্বীকার করি যে মাঝে মাঝে নির্জন স্থানে যাওয়া ভাল ও যাওয়া দরকার।

"তারপর নারীর কথা। ব্রহ্মচর্য দুই রকমের আছে—প্রথম অবস্থায় ব্রহ্মচর্য মানে শরীরকে শুদ্ধ রাখা। এর পরের অবস্থায় ব্রহ্মচর্য মানে নারীর প্রতি কোনও কামনা পোষণ না করা। প্রথম রকমের ব্রহ্মচারী হওয়া খুব কঠিন নয়, কিন্তু দ্বিতীয় রকমের ব্রহ্মচারী হতে হলে বহুকাল চেষ্টা ও অভ্যাস দরকার। আমার নিজের অভিজ্ঞতা থেকে বলতে পারি যে খাঁটি ব্রহ্মচারী হতে হলে দুটো জিনিস চাই :—

১। জীবনে একটা মহান আদর্শকে প্রাণের সঙ্গে ভালবাসতে হবে এবং সেই আদর্শের প্রতি সমস্ত শক্তি নিয়োগ করতে হবে। তাহলে 'অটোমেটিক্যালি' অন্য বাসনা থেকে মনটা সরে আসবে।

২। মাতৃরূপে নারীর চিন্তা করা চাই—অর্থাৎ দুর্গা বা কালীরূপে ভগবানের আরাধনা করা চাই। এই রকম ধ্যান ও প্রার্থনা করতে করতে মনের এমন একটা অবস্থা আসবে যে স্ত্রীলোককে দেখলে বা স্ত্রীলোকের চিন্তা করলে—মার কথা মনে আসবে। এই ভাবটা আরও ঘনীভূত করার জন্য আমাদের শাস্ত্রে এবং তন্ত্রে অনেক প্রকার পূজার আয়োজন আছে যেমন কুমারী পূজা। অর্থাৎ কুমারীকে সামনে বসিয়ে রেখে শুধু মার কথা এবং বিশ্বজননীর কথা চিন্তা করতে হয়।

অল্পদিনের চেষ্টায় সম্পূর্ণ সফলকাম না হতে পারলে—হতাশ হওয়া চলবে না। বিবাহ পরে তুমি কর বা না কর—এখন থেকে ব্রহ্মচর্য পালন করতে হবে। প্রত্যহ সকালে এবং রাত্রে যদি দুর্গামূর্তির ধ্যান করা হয়, তাহলে উপকার পাওয়া যাবে। চণ্ডীতে আছে—

বিদ্যাঃ সমস্তাস্তব দেবি ! ভেদাঃ
স্ত্রিয়ঃ সমস্তা সকলা জগৎসু

অর্থাৎ "সমস্ত বিদ্যা তোমার ভিন্নরূপ এবং সমস্ত স্ত্রীজাতিও তোমার ভিন্নরূপ—হে বিশ্বজননী"।......আমার মধ্যে ভাল যদি কিছু থাকে—তা যেন তুমি পাও এবং মন্দটা যেন না পাও এটাই আমার নিরন্তর প্রার্থনা। ইতি রাঙাকাকাবাবু"

শিবব্রত ঘোষ

চিঠিপত্র

লেখকের নগদ বিদায়

সম্প্রতি অমৃতে (২৩-৯-৭৭) কবিতা সিংহের 'নগদ বিদায়' পড়ে ভাল লাগল। সত্যি এখন বেশীর ভাগ লেখক লোভী পুরোহিতের মত দক্ষিণার দিকে তাকিয়ে বাংলা সাহিত্যের সেবা করেন। বর্তমানে লেখকেরা দামের জন্য নামী। আমাদের অনামী পত্রিকার জন্য বহু লেখকের স্বারস্থ হয়েছি, লেখা দূরে থাক দেখা পর্যন্ত করেন নি। আজকাল লেখকেরা গায়ে নামী পত্রিকার জার্সি পরে পত্রিকা অফিসের শোভা বর্ধন করেন। সম্পাদক। মালিকের কথামত পত্রিকার পাতার সংখ্যা বাড়ান। শুধু অর্থের বিনিময়ে লিখলে লেখকেরা নিজস্ব সত্তা হারিয়ে ফেলেন। সাহিত্যে একটা কৃত্রিমতার ছাপ পড়ে। ফলে সৎ ও সুন্দর সাহিত্য সেখানে গড়ে ওঠে না।

'সাহিত্য সমাজের আয়না', বর্তমান বাংলা সাহিত্যে একথাটা অপ্রযোজ্য। সমাজের উপর যখন রাজনৈতিক আঘাত নেমে আসে তখন অনেক লেখকই গা বাঁচান। অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ বাংলা সাহিত্যে আর চোখে পড়ে না। —দেবব্রত ঘোষ, সালকিয়া, হাওড়া।

রাস্তায় নারী মূর্তি

অমৃতে কয়েকটা নতুন সংযোজনের [illegible] সাধুবাদ জানাই। গত ৪ সেপ্টেম্বরের ([illegible]৭ বর্ষ, ১৭ সংখ্যা) কবিতা সিংহের কলকাতার রাস্তায় নারীমূর্তি স্থাপনের মন্তব্য সত্যই প্রশংসনীয়। শ্রীমতী সিংহের পূর্বের বহু লেখায় সত্য কথা বলতে কি নারী হিসাবে আমি একটু কুণ্ঠিত ছিলাম, কিন্তু অধুনা তাঁর সাহিত্য সম্মেলনে যোগদানের কাহিনী, কয়েক সংখ্যা আগে প্রকাশিত বড়বাবু লেখাটি সত্যই আনন্দ দিয়েছে। ৪ সেপ্টেম্বরের সংখ্যায় তাঁর লেখাটি বড় সুন্দর। তিনি যেন চৌরঙ্গী এলাকার একটি নিখুঁত ছবি উপহার দিয়েছেন। নারীমূর্তি প্রতিষ্ঠা সম্বন্ধে তাঁর যুক্তি সত্যই প্রণিধানযোগ্য। ও বিষয়ে জনগণ ও সরকারের অবহিত হওয়া বিধেয়। বাংলা তথা ভারতে সার্থক নারীর অপ্রতুলতা নেই। কাজেই তাঁদের মূর্তি স্থাপন জাতীয় কর্তব্য। শ্রীমতী সিংহকে আমার আন্তরিক শ্রদ্ধা দেবেন এবং লেখার জন্য অভিনন্দন জানাবেন। ইতি—স্বপ্না সরকার, হাওড়া।

মিশার অত্যাচার

অমৃতে ধারাবাহিক প্রকাশিত মিসা ১৯৭৩ প্রকাশের জন্য সম্পাদক মহাশয়কে জানাই অনেক ধন্যবাদ। লেখক শ্যামল রায় জরুরী অবস্থা চলাকালীন পুলিশী নির্যাতনের যে ভয়াবহ বিবরণ পাঠকের সমনে তুলে ধরেছেন তা থেকে সহজেই মনে পড়ে যায় ত্রিশ বছর আগের পরাধীন ভারতবর্ষের কথা। মনে পড়ে যায় বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের কথা। ভেবে পাই না আজ আমরা স্বাধীন দেশে কতটুকু স্বাধীন। আমার বর্তমান বয়স একুশ। পরাধীনতার বীভৎস রূপ দেখতে না পেলেও বর্বর বৃটিশের নির্মম অত্যাচারের বর্ণনা মন দিয়ে পড়েছি। রক্ত গরম হয়েছে। মনে মনে ভেবেছি সে সময় যদি আমার জন্ম হত তবে নিজের মাতৃভূমিকে ইংরেজদের হাত থেকে রক্ষা করার জন্য নির্ভয়ে এগিয়ে যেতাম। কিন্তু আজ ভাবতেও লজ্জা হয় এই কি আমাদের স্বাধীন দেশ ? আমরা কি স্বাধীন দেশের নাগরিক ? শরীরের রক্ত টগবগ করে উঠে। এদের হৃদয় বলে কি কিছুই নেই ? পুলিশী অত্যাচারের নিরপেক্ষ সরকারী তদন্ত যদি হয় এবং দোষীরা যদি উপযুক্ত সাজা পায় তবেই শ্যামলবাবুর নির্ভীক লেখনী সার্থক হবে। —মনতোষ রায়, কামাক্ষ্যাগুড়ি, জলপাইগুড়ি।

আমি কঙ্কাবতী বলছি

"অমৃতের আমি একজন ভক্ত পাঠিকা। সুদূর বাংলাদেশ থেকে শত অসুবিধা সত্ত্বেও আপনাদের সাপ্তাহিকটি আমি নিয়মিত সংগ্রহ করি। যদিও প্রতিটি সংখ্যা বেরুবার পর অনেক দেরিতে আমার হাতে পৌঁছে। এর প্রতিটি বিভাগই আমার কাছে ভালো লাগে। পৃষ্ঠা সংখ্যা বাড়ালে আরো খুশী হতাম। ইদানিং আপনাদের নতুন সংযোজন 'আমি কঙ্কাবতী বলছি' বিভাগটি খুবই ভালো লাগছে। বিভাগটি যেন তুলে দেবেন না। সেই সঙ্গে রান্না ও সেলাইএর বিভাগ করলেও ভালো হয়। 'অমৃত' সম্পূর্ণ হতো।

সাজেদা হোসেন (রেখা)
ঢাকা, বাংলাদেশ।

বাঘা ক্রিকেটার পাতৌদি

শান্তিপ্রিয় বন্দ্যোপাধ্যায়

॥ তিন ॥

মাত্র একচল্লিশ বছর বয়সে পাতৌদির নবাব ইফতিকার আলি খাঁ মারা গেলেন। নবাব বোধহয় জানতেন, তিনি বেশীদিন বাঁচবেন না। ছেলে-মেয়েদের লেখাপড়ার জন্য ব্যবস্থা তিনি আগে থাকতেই করে রেখেছিলেন। মনসুর চলে গেলো ইংলণ্ডে আর তার বোনেরা সুইজারল্যাণ্ডে।

সাসেক্সে ম্যাকডোনাল্ডরা ছোটদের একটি স্কুল চালাতেন। মনসুর উঠলো ম্যাকডোনাল্ডদের বাড়িতেই। ভীষণ মন খারাপ করতো মনসুরের। মা কতো দূরে— সেই ভূপালে কিম্বা পাতৌদিতে। বোনরাও কাছে নেই। আর বাবা... কান্না পেত তার। এগারো বছরের মনসুর একা বসে বসে কাঁদতো। যখন আর থাকতে পারতো না, তখন ব্যাট-বল নিয়ে বেরিয়ে পড়তো। খেলার মধ্যে ডুবে গেলে কিছুই মনে থাকতো না তার।

মনসুর খেলা শিখতে শুরু করলো নামকরা খেলোয়াড় ফ্র্যাঙ্ক উলির কাছে। বিশ্ববিখ্যাত ন্যাটা ব্যাটসম্যান উলিই মনসুরের বাবার আদর্শ খেলোয়াড় ছিলেন। তার কাছে খেলা শেখা আর লেখাপড়া করা এক সঙ্গে চলতে লাগলো। বছরে একবার বাড়ি আসতে পারতো সে। মনসুর শীত-কালটাকেই বেছে নিল। কারণ শুধু শীত-কালেই ভারতে পুরোদমে ক্রিকেট খেলা চলে। ঐ সময় দেশে ফিরে সেও মেতে উঠতো ক্রিকেট খেলা নিয়ে। কখনো পাতৌদি, কখনো মামার বাড়ি ভূপাল আবার কখনো দিল্লিতে—ছুটির দিনগুলো যে কোথা দিয়ে কেটে যেতো টেরই পেত না সে। তার-পর একদিন আবার ফিরে যেতে হতো ইংলণ্ডে।

ম্যাকডোনাল্ডদের ছোটদের স্কুল ছেড়ে মনসুর ভর্তি হল উইনচেস্টারে। ওয়েলিং-টনের ক্রিকেট প্রশিক্ষক ছিলেন সাসেক্সের অলরাউণ্ডার জর্জ কক্স। তাঁর কাছে মনসুর তখন খেলা শিখতে লাগলো। তবে ততো-দিনে সে অনেক পরিণত হয়ে উঠেছে। উইনচেস্টারের চার বছরে সে করলো ২,০৩৬ রাণ। এর মধ্যে আবার শেষ আঠারোটি ইনিংসে সে তুললো ১,০৬৮ রাণ। সেই সঙ্গে সে ভেঙে দিল স্কুল ক্রিকেটে ডি আর জার্ডিনের রেকর্ড। জার্ডিন ছিলেন ইংল্যাণ্ডের দারুণ নামকরা খেলোয়াড়। অনেক বছর তাঁর ওপরই ইংলণ্ড দল পরি-চালনার ভার ছিল। ১৯৩৩ সালে তাঁর নেতৃত্বে যে ইংলণ্ড দলটি অস্ট্রেলিয়া সফরে গিয়েছিল সেই দলেই ছিলেন মনসুরের বাবা পাতৌদির নবাব ইফতিকার আলি খাঁ। জার্ডিনের ছেলেও মনসুরের সঙ্গে পড়তো। কিন্তু ক্রিকেট খেলায় তার বিন্দুমাত্রও আকর্ষণ ছিল না।

১৯৫৬ সালে স্কুলের ব্যাটিং গড়ে পাতৌদি তৃতীয় হল ৩৫৪ রাণ করে। সেবার তার সর্বোচ্চ রাণ ছিল অপরাজিত ৬৬। পরের বছর সে আরো ভালো খেললো। গড়ে ইনিংস প্রতি ৬৫-৪৬ রাণের হিসেবে করলো ৮৫১। সর্বোচ্চ ১২৭ অপরাজিত।

১৯৫৭ সালে মাত্র ১৬ বছর বয়সে মনসুর প্রথম কাউণ্টি ক্রিকেটে খেলতে শুরু করে। সাসেক্সের হয়ে সে ছটি ম্যাচের নটি ইনিংস খেলে ১৪৫ রাণ করেছিল। হোভে মিডলসেক্সের বিরুদ্ধে ৯৬ রাণই ছিল সেই মরশুমে কাউণ্টি ক্রিকেটে তার সর্বোচ্চ।

ব্যাটসম্যান হিসেবে পাতৌদি তখন ধীরে ধীরে প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে। নাম ছড়িয়ে পড়ছে তার। সকলেই তার বাবার সঙ্গে তরুণ পাতৌদির তুলনা করছে। 'উইসডেন'ও সে কথা লিখেছে। ইতিমধ্যেই সে খেলেছে মার্লিস পাবলিক স্কুলের পক্ষে। আর উইনচেস্টারের অধিনায়ক মনোনীত হয়েছে।

কিন্তু সেইবারেই উইনচেস্টার পাঁচ বছরের মধ্যে প্রথম হারলো। তবে হ্যারোর সঙ্গে সেই খেলাটি দারুণ উত্তেজনাপূর্ণ হয়েছিল। সেই খেলায় মনসুর ৯৫ রাণ করার পর হঠাৎ কভারে ক্যাচ তুলে আউট হয়ে যায়। তারপর উইনচেস্টার পর পর কটি উইকেট হারালো। তাদের শেষ ব্যাটসম্যান যখন ব্যাট করতে নামলো তখন জয়ের জন্যে মাত্র দুটি রাণ দরকার। পাতৌদি তাকে বলে দিল 'পেটাও'। কিন্তু বলটা ছিল একদম সোজা। 'ক্রস ব্যাটে' হাঁকাতে যেতেই বলটি তার ব্যাট গলে উইকেট ভেঙে দিল। মাত্র এক রাণে হেরে গেল পাতৌদির দল।

সেই বছর মনসুর ভেঙে দিল ইংলণ্ডের অধিনায়ক জার্ডিনের রেকর্ড। ১৯১৯ সালে জার্ডিন স্কুল ক্রিকেটে ৯৯৭ রাণ করে যে নজির গড়েছিলেন এতোদিন তাকে কেউ ভাঙতে পারে নি। কিন্তু তাকে ডিঙিয়ে গিয়ে মনসুর করলো ১,০৬৮ রাণ। শুধু তাই নয় কাউণ্টি ক্রিকেটেও সে বছর পাতৌদি দারুণ খেললো। [illegible] তখন ইয়র্কশায়ারে খেলেন, দারুণ জোরে বল করেন। ঐ সময় তিনিই ছিলেন বিশ্বের সবচেয়ে

স্কুলের ছাত্র মনসুর উইনচেস্টারে পড়ার সময় সমারসেট স্কুল দলের পক্ষে অর্গানিস্ট ক্লাবের বিরুদ্ধে [illegible] মাঠে খেলছেন

দুন্ত বোলার। ছোটো সাসেক্সের বিরুদ্ধে খেলতে নেমে পাতৌদি করলো ৫২ রান। আর তারই স্বীকৃতি হিসেবে ইংলন্ডের ক্রিকেট সোসাইটি সেবার মনসুরকে সবচেয়ে সম্ভাবনাপূর্ণ তরুণ ক্রিকেটার হিসেবে চিহ্নিত করলেন।

১৯৬০ সালে স্কুলের পাঠ শেষ করে মনসুর অক্সফোর্ডের বেলিওল কলেজে ভর্তি হল। এই কলেজেই মনসুরের বাবা ইফতিকার আলি খাঁ ১৯২৯ থেকে ১৯৩১ সাল পর্যন্ত পড়েছিলেন। এবং ব্লু পেয়েছিলেন।

লর্ডস মাঠে কেমব্রিজের বিরুদ্ধে খেলতে নামলেন। কেমব্রিজ দলে তখন টনি লুইস, রজার প্রিডু রা খেলতেন। তবু তারা ১৫৩ রানের বেশী করতে পারলো না। কিন্তু অক্সফোর্ড ব্যাট করতে নামলেই তারা পাল্টা আঘাত হানলো। অ্যালান স্মিথ, ডেভিড গ্রীণ, ও আব্বাস আলি বেগকে তারা চটপট আউট করে দিল। জাভেদ বার্কি (পরে পাকিস্তানের অধিনায়ক হয়েছিলেন) তখন উইকেটে। মনসুর আর বার্কি মিলিতে এক রানের হিসেবে ১৯০ তুলে ফেললো চটপট। মনসুর শেষ পর্যন্ত ১৩১ রান করে আউট হল। এর মধ্যে সে ১৮টি চার ও একটি ছক্কা হাঁকিয়েছিল। বাবার মত তরুণ পাতৌদিও কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের বিরুদ্ধে শতরান করার গৌরব অর্জন করলো।

১৯৬১ সালে ই জবল্যু সোয়ানটন টেস্ট আর কার্ডাশ্ট খেলোয়াড়দের নিয়ে একটা দল গড়ে ওয়েস্ট ইণ্ডিজ সফরে গেলেন। সেই দলে স্থান পেল মনসুর আলি খাঁ। উইকস, ঞ্জ ফ্রিঙ্কওয়াল প্রভৃতি নাম করা খেলোয়াড়দের সঙ্গে খেলার সুযোগ পেল সে।

এক মাসের সেই সফর শেষ করে ইংলেণ্ডে ফিরতেই তাকে অকসফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় দলের অধিনায়ক মনোনীত করা হল। আর সেইবারই সে খেললো সফরকারী অস্ট্রেলিয়া দলের বিরুদ্ধে। রিচি বেনো সেবারের অস্ট্রেলিয়া দলের অধিনায়ক ছিলেন।

কলেজ ও কার্ডাশ্ট ক্রিকেটে মনসুর তখনই মারুণ নাম করা খেলোয়াড়ের বাবার মত সেও তখন ধীরে ধীরে এগিয়ে চলেছে টেস্টে খেলার জন্যে। নাম করা ব্যাটসম্যান হতে চায় সে। এমন একজন মারকুটে ব্যাটসম্যান যাকে ভয় করবে সব বোলাররা। সে হাঁকাবে সেঞ্চুরি, ডাবল সেঞ্চুরি। তারপর একদিন....

(চলবে)

অস্ট্রেলিয়াতে ভারতের এই প্রথম টেস্ট জয়\আমাদের গর্ব

এতদিন পর ভাগ্যদেবী ভারতের প্রতি মুখ ফিরিয়ে তাকালেন। অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে ১৯৭৭—৭৮ সালের চলতি টেস্ট সিরিজে ভারত ভাগ্য বিড়ম্বনায় প্রথম ও দ্বিতীয় টেস্টে যথাক্রমে ১৬ রান এবং ২ উইকেটে হেরেছিল। সদ্য সমাপ্ত মেলবোর্ণের তৃতীয় টেস্ট ভারতের কাছে অস্ট্রেলিয়া ২২২ রানে হেরেছে। অস্ট্রেলিয়ার মাটিতে ভারতের এই প্রথম টেস্ট জয়ের নজির। এই নিয়ে অস্ট্রেলিয়ার মাটিতে ভারত বনাম অস্ট্রেলিয়ার যে ১২টা টেস্ট খেলা হল তার ফলাফল: অস্ট্রেলিয়ার জয় ১০, ভারতের জয় ১ এবং খেলা ড্র ১। বর্তমানে ভারত বনাম অস্ট্রেলিয়ার ২৮টা টেস্ট খেলার ফলাফল দাঁড়াল: অস্ট্রেলিয়ার জয় ১৮, ভারতের জয় ৪ এবং খেলা ড্র ৮।

সদ্য সমাপ্ত মেলবোর্ণ টেস্টে প্রধানত গাভাসকার, অমরনাথ, বিশ্বনাথ এবং চন্দ্রশেখরের ব্যক্তিগত সাফল্যের দরুণই ভারতের এই বিরাট জয়লাভ সম্ভব হয়েছে। চন্দ্রশেখরের মারাত্মক বোলিংয়ে (১০৪ রানে ১২ উইকেট) অস্ট্রেলিয়ার প্রথম ইনিংস ২১৩ রানে এবং দ্বিতীয় ইনিংস ১৬৪ রানে পড়ে যায়।

ভারত টসে জিতে প্রথমদিনের খেলায় প্রথম ইনিংসের ৬টা উইকেট খুইয়ে ২৩৪ রান সংগ্রহ করেছিল। খেলার সূচনা কিন্তু মোটেই সুবিধার হয়নি। দলের খাতের খাতা শূন্য অবস্থায় রেখে গাভাসকার এবং চৌহান আউট হয়ে যান। তৃতীয় উইকেট জুটি বিশ্বনাথ এবং অমরনাথ ১৫৪ মিনিটে ১০৫ রান যোগ করে দলের ভাঙন ঠেকিয়ে দেন। বিশ্বনাথ ৫৯ রান এবং মহীন্দর অমরনাথ ৭২ রান করে আউট হন। প্রথম দিনের খেলার শেষ ওভারে কিরমানি এল বি ডবলিউ হন সিম্পসনের বলে।

দ্বিতীয় দিনে ভারতের প্রথম ইনিংস ২৫৬ রানের মাথায় শেষ হয়। ভারত শেষ চার উইকেটে মাত্র ২২ রান যোগ করেছিল আধ ঘণ্টার খেলায়।

দ্বিতীয় দিনে ২৫২ মিনিটের খেলায় অস্ট্রেলিয়ার প্রথম ইনিংস ২১৩ রানের মাথায় শেষ হয়। ২য় উইকেটের জুটিতে দু ঘন্টার খেলায় কোজিয়ার এবং সার্জেন্ট ১০৪ রান যোগ করেছিলেন। কোজিয়ার ৬৭ এবং সার্জেন্ট ৪৫ রান করে আউট হন। চন্দ্রশেখর এইদিন তাঁর টেস্ট ক্রিকেট খেলোয়াড়-জীবনে ২০০ উইকেট নেওয়া পূর্ণ করেন। অস্ট্রেলিয়ার প্রথম ইনিংসে তিনি ৫২ রানে ৬টা উইকেট পেয়েছিলেন—শেষ চারটে উইকেট পান মাত্র ১৬টা বল করে। প্রথম ইনিংসের খেলার শেষে চন্দ্রশেখরের টেস্ট উইকেট পাওয়ার সংখ্যা দাঁড়ায় ২০৫। বেদী এবং চন্দ্রশেখর ছাড়া অপর কোন ভারতীয় বোলার টেস্টের খেলায় ২০০ উইকেট পাননি। এখানে আরও উল্লেখ্য, চন্দ্রশেখরকে নিয়ে মাত্র ১৩ জন বোলার এ পর্যন্ত আন্তর্জাতিক টেস্ট ক্রিকেট খেলায় ২০০ উইকেট পূর্ণ করেছেন।

দ্বিতীয় দিনে ভারত দ্বিতীয় ইনিংসের একটা উইকেট খুইয়ে ৫০ রান সংগ্রহ করে মোট ৯৩ রানে এগিয়ে যায়। দ্বিতীয় দিনের খেলায় মোট ১৭টা উইকেট পড়েছিল।

তৃতীয় দিন বৃষ্টির জন্যে ১১০ মিনিটের খেলা নষ্ট হয়। ভারতের দ্বিতীয় ইনিংসের রান দাঁড়ায় ২৩৪ (৪ উইকেটে)। সুনীল গাভাসকার ১০৩ রান করে অপরাজিত থাকেন। এই নিয়ে তিনি ৩৫টা টেস্ট ম্যাচ খেলে ১৩টা সেঞ্চুরী করলেন—ওয়েস্ট ইণ্ডিজের বিপক্ষে ৬, ইংল্যাণ্ডের বিপক্ষে ২, নিউজিল্যাণ্ডের বিপক্ষে ২ এবং অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে ৩।

তৃতীয় দিনের খেলার শেষে হিসাব নিয়ে দেখা গেল ভারত মোট ২৭৭ রানে এগিয়ে গেছে। তাদের হাতে জমা দ্বিতীয় ইনিংসের আরও ৬টা উইকেট। গাভাসকার ১০৩ রান এবং মানকাদ ১৫ রান করে অপরাজিত।

চতুর্থ দিনে ভারতের দ্বিতীয় ইনিংস ৩৪৩ রানের মাথায় শেষ হলে তারা বিরাট ৩৮৬ রানের ব্যবধানে এগিয়ে যায়। খেলায় জয়লাভের জন্যে অস্ট্রেলিয়ার যেখানে ৩৮৭ রান করার প্রয়োজন ছিল সেখানে তারা চতুর্থ দিনের বাকি সময়ের খেলায় দ্বিতীয় ইনিংসের ৮টা উইকেট খুইয়ে মাত্র ১২৩ রান সংগ্রহ করে পরাজয়ের দোরগোড়ায় হাজির হয়ে যায়।

শেষ পঞ্চম দিনে অস্ট্রেলিয়ার দ্বিতীয় ইনিংস ১৬৪ রানের মাথায় শেষ হলে ভারত ২২২ রানে জয়লাভের গৌরব লাভ করে। অস্ট্রেলিয়ার মাটিতে ১২টা টেস্ট ম্যাচ খেলে অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে ভারতের এই প্রথম জয়।

মেলবোর্ণের এই তৃতীয় টেস্টের দ্বিতীয় ইনিংসের সুনীল গাভাসকার ১১৮ রান করে আউট হন। এই নিয়ে গাভাসকার উপর্যুপরি চারটে টেস্টে সেঞ্চুরী করলেন ১০৮ রান (বিপক্ষে ইংল্যাণ্ড, বোম্বাইয়ের ৫ম টেস্ট ১৯৭৭) এবং অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে চলতি টেস্ট সিরিজে—১১৩ রান (১ম টেস্ট, ব্রিসবেন), ১২৭ রান (২য় টেস্ট পার্থ) এবং ১১৮ রান (৩য় টেস্ট, মেলবোর্ণ)।

ভগবত চন্দ্রশেখর মেলবোর্ণের তৃতীয় টেস্টের উভয় ইনিংসেই গোল্লা করেন। এই নিয়ে তিনি চারবার টেস্টের উভয় ইনিংসেই গোল্লা করলেন। ফলে তিনি সর্বাধিকবার টেস্টের উভয় ইনিংসে গোল্লা করার (অর্থাৎ কোন রান না করে আউট হওয়ার) বিশ্ব রেকর্ড করেছেন।

এখানে আরও [illegible], অস্ট্রেলিয়া সফরে চলতি টেস্ট [illegible] চন্দ্রশেখর এ পর্যন্ত এক রানও সংগ্রহ করতে পারেন নি।

সংক্ষিপ্ত স্কোর

ভারত : ২৫৬ রান (মহীন্দর ৭২, বিশ্বনাথ ৫৯, মানকাদ ৪৪ এবং বেঙ্গসরকার ৩৭ রান। ক্লার্ক ৭৩ রানে ৪, টমসন ৭৮ রানে ৩ এবং গ্যাননন ৪৭ রানে ২ উইকেট)

ও ৩৪৩ রান (গাভাস্কার ১১৮, বিশ্বনাথ ৫৪, অমরনাথ ৪১ এবং মানকাদ ৩৮ রান। ক্লার্ক ৯৬ রানে ৪, কোজিয়ার ৫৮ রানে ২ এবং গ্যাননন ৮৮ রানে ১ উইকেট)

অস্ট্রেলিয়া : ২১৩ রান (সার্জেন্ট ৮৫ এবং কোজিয়ার ৬৭ রান। চন্দ্রশেখর ৫২ রানে ৬, ঘাউড়ি ৩৭ রানে ২ এবং বেদী ৭১ রানে ২ উইকেট)

ও ১৬৪ রান (কোজিয়ার ৩৪ রান। চন্দ্রশেখর ৫২ রানে ৬ এবং বেদী ৫৮ রানে ৪ উইকেট)।

ডুরাণ্ড কাপ

আমেনকার স্টেডিয়ামে ১৯৭৭ সালের ডুরাণ্ড কাপ ফুটবল প্রতিযোগিতার দ্বিতীয় দিনের ফাইনালে মোহনবাগান ২—১ গোলে পাঞ্জাবের বিখ্যাত জগজিত কটন টেক্সটাইল মিলস দলকে পরাজিত করে একই বছরে আই এফ এ শীল্ড, রোভার্স কাপ এবং ডুরাণ্ড কাপ জয়ের দুর্লভ গৌরব লাভ করেছে। এ পর[illegible] মোহনবাগান ছাড়া অপর কোন দল এ[illegible] ভাবে একই বছরে আই এফ এ শী[illegible] রোভার্স কাপ এবং ডুরাণ্ড কাপ জয়ী হয় নি।

দর্শক

দীর্ঘ প্রতিক্ষার অবসান

চব্বিশ বছর পরে কলকাতায় আবার জাতীয় ফুটবল প্রতিযোগিতা অর্থাৎ সন্তোষ ট্রফির খেলা হচ্ছে। ১৯৫৩ সালের পর ১৯৭৮ সালে। অথচ কলকাতাই হচ্ছে ভারতীয় ফুটবলের মক্কা। ভারতীয় ফুটবলের জন্ম এই কলকাতারই মাঠে, কলকাতার খেলোয়াড়রাই তাকে শৈশবাবস্থা থেকে যৌবনে পৌঁছে দিয়েছেন। অর্থাৎ কলকাতাই ভারতীয় ফুটবলের পীঠস্থান। এবং জাতীয় ফুটবলের আয়োজনের ব্যাপারে কলকাতার দাবীই সবার আগে ভারতীয় ফুটবল সংস্থার মেনে নেওয়া উচিত।

এতোদিন কিন্তু তা হয় নি। ১৯৫৩ সালের পর থেকে বাংলা এই দায়িত্ব পাবার জন্যে বারবার চেষ্টা করেছে। কিন্তু বাংলার দাবী হালে পানি পায়নি ভারতীয় ফুটবলের কর্তাদের খেয়াল খুশীর কাছে। এখন প্রশ্ন উঠতে পারে—কেন এতোদিন বাংলাকে এই দায়িত্ব দেওয়া হয় নি ? উত্তরে অনেক কথাই উঠবে। তবে তার মধ্যে সব চেয়ে বড় হল আই এফ এর সঙ্গে এ আই এফ এফয়ের ঠাণ্ডা লড়াই। এবং লড়াই কলকাতার নামকরা খেলোয়াড়দের নিয়ে।

মারদেকা প্রভৃতি আন্তর্জাতিক ফুটবল প্রতিযোগিতা যখন হয় তখন কলকাতায় ভরা ফুটবল মরশুম। লীগ চ্যাম্পিয়নশীপের দৌড়ে তখন মেতে ওঠে মোহনবাগান, ইস্টবেঙ্গল কিংবা মহামেডান স্পোর্টিং। ঠিক তখনই পাতিয়ালায় কিম্বা অন্য কোথাও বসে ভারতীয় দল গড়ার প্রশিক্ষণ শিবির। এবং সেই শিবিরে ডাক পড়ে কলকাতার নামী খেলোয়াড়দের। নামী দলগুলো থেকে চার, পাঁচ কি তারো বেশী খেলোয়াড়কে শিবিরে যাবার নির্দেশ দেওয়া হয়। ক্লাবগুলো তখন সঙ্গত কারণেই খেলোয়াড়দের ছাড়তে চায় না। কারণ নামী খেলোয়াড়দের পাবার জন্যে তাদের অনেক কাঠ-খড় পোড়াতে হয়েছে, দিতে হয়েছে অর্থদণ্ড। তারপর সেই সব খেলোয়াড়দের সাহায্য যদি ক্লাবগুলো না পায়—তা হলে ক্লাবের সদস্য এবং সমর্থকরাই বা তা মেনে নেবেন কেন ? এই নিয়ে ক্লাবগুলোর সঙ্গে আই এফ এর এবং আই এফ এর সঙ্গে ভারতীয় ফুটবল সংস্থার গোলমাল বাধলো।

গত বছর দার্জিলিংএ ভারতীয় ফুটবল সংস্থার বার্ষিক সভায় হয়েছিল যে, ১৯৭৭ সালের জাতীয় ফুটবল প্রতিযোগিতা কলকাতায় হতো যদি বিভিন্ন আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহণকারী ভারতীয় দলে খেলার জন্যে আই এফ এ তার খেলোয়াড়দের ছেড়ে দেয়। কিন্তু নামী ক্লাবগুলো খেলোয়াড় ছাড়তে রাজী হয়নি। ব্যাপারটা শেষ পর্যন্ত সরকারী পর্যায় পর্যন্ত পৌঁচেছিল। আর কলকাতা তার খেলোয়াড়দের ছাড়েনি বলে জাতীয় ফুটবল প্রতিযোগিতার দায়িত্ব কলকাতাকে না দিয়ে দেওয়া হল পাটনাকে। গত বছর এই প্রতিযোগিতার দায়িত্ব কাঁধে নিয়ে পাটনাকে অনেক টাকা লোকসান দিতে হয়েছিল।

গতবারের ভুল বাংলা এবার আর করেনি। এবার বিভিন্ন আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহণকারী ভারতীয় দলে খেলার জন্যে কলকাতার তিনজন করে খেলোয়াড়কে পাঠানো হল। মোহনবাগান, ইস্টবেঙ্গল এবং মহামেডান স্পোর্টিং—তিনটি দল থেকে একজন করে খেলোয়াড় ছেড়ে দেওয়ায় তাদেরও খুব একটা অসুবিধে হয়নি। এবং ঐ খেলোয়াড় ছাড়ার বিনিময়ে বাংলা এবার এতোদিন প্রতীক্ষার পর পেল জাতীয় ফুটবল প্রতিযোগিতা পরিচালনার ভার।

অর্থাৎ পুরো ব্যাপারটার মধ্যেই একটা দেওয়া-নেওয়ার গন্ধ রয়েছে। তুমি আমায় তোমার খেলোয়াড়দের দাও, বিনিময়ে আমি তোমায় সন্তোষ ট্রফির দায়িত্ব দেবো। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে পৃথিবীর কোন্ দেশ তাদের ভরা মরশুমে বাইরে যায় ? কোন দেশই দেশের আসল খেলা ছেড়ে বিদেশে যায় না। যদি একান্তই যেতে হয় তাহলে তারা সাধারণত তাদের দ্বিতীয় দলটি পাঠিয়ে থাকে। কিন্তু আমাদের ব্যাপার স্যাপার সবই আলাদা। আমরা দেশের কথা ভাবি না, বিদেশের কথায় মুখে লালা ঝরে। তাই দেশের মরশুম, লীগ কিংবা শীল্ডের খেলাকে অবহেলা করে আমরা বিদেশে আমাদের সামনের সারির খেলোয়াড়দের পাঠাতে এতোটুকুও ইতস্তত করি না; অথচ খেলোয়াড়দের চাকরি-বাকরি, তাদের আর্থিক সঙ্গতি সবই হয় ঐ ক্লাবগুলোর কৃপায়। তা ছাড়া এমনও হয়েছে যে, জাতীয় দলে খেলার জন্যে অনেক সময় অফিসে ছুটির গোলমাল হয়েছে। কিংবা আহত হলে অবহেলা পেতে হয়েছে। অথচ ক্লাবের বেলায় ওসব হয় না। ওঁরা সেখানে অনেক যত্নে থাকেন। অনেক বেশী সহযোগিতা পান। আহত হলে সব ব্যবস্থাই ক্লাবগুলো করে। তাই খেলোয়াড়রাও চান যে ক্লাবের দৌলতে তাঁদের অতো নাম, অতো সুখ স্বাচ্ছন্দ্য তাদের হবেই খেলতে। তখন অনেকেই খেলোয়াড়দের ঠাট্টা করেন। বলেন এদের কাছে দেশের চেয়ে ক্লাব বড়। কিন্তু কেন যে ক্লাব বড়—সে কথাটা কেউ চিন্তা করে দেখেন ? আই এফ এ সেইদিকটা নিয়ে চিন্তা করতে গিয়েছিলেন বলেই চক্ষুশূল হয়ে উঠেছিলেন ভারতীয় ফুটবল সংস্থার। এবং সেই জন্যেই এতোদিন কলকাতাকে জাতীয় ফুটবল প্রতিযোগিতার আয়োজন করার দায়িত্ব দেওয়া হয় নি। কথাটা বোধহয় ভারতীয় ফুটবল সংস্থার কর্তারা অস্বীকার করতে পারবেন না....।

শান্তিপ্রিয়

চিত্রধ্বনি

আহা কি দেখিলাম

লাইট হাউসের মখমলে মোড়া গদী একটু পরেই খান ইঁট হয়ে গেল, যদিও আমরা তখন সুইজারল্যাণ্ডে।

সবুজ বনের বুকে সাদা পাহাড় চূড়ো, ঝরঝরিয়ে ঝর্ণা গড়ায় এদিক-ওদিক, ঝকঝকে প্রশস্ত পথে ছোটো মুখ খোঁতা নাক, গাড়ীতে লাগে গতির প্রতিযোগিতা। ডানায় ভর দিয়ে মানুষ আকাশে ভাসে। নায়ক-নায়িকাও পাখি হয়ে ওড়ে, গান গায়, প্রেম করে। তারপর....

শ্রদ্ধেয় জে ওমপ্রকাশজী পরিচালক হিসেবে পরিচিতির অপেক্ষা রাখেন না, উনি আগেও ছবি করেছেন, করবেনও আরও। আলোচ্য এ্যাংলো-হিন্দি ছবিটি ওঁ'র এক অনবদ্য সৃষ্টি, জিনত রাজেশ ড্যানি আসরানি ওমপ্রকাশ প্রমুখ সুপার স্টারের জেল্লায় ঝিলমিল। তিনি কাহিনীর জন্য ঘটনা না ঘটিয়ে ঘটনার জন্য কাহিনী বানিয়েছেন। অবশ্য এ প্রচেষ্টা হিন্দি চিত্র জগতে অভিনব কিছু নয়—তবে এ ব্যাপারে এঁ'র চেয়ে কৃতী আর কাউকে তো এই মুহূর্তে মনে পড়ছে না।

তিনি সৌন্দর্যের পূজারী। শুধু আশিক হুঁ বাহারোঁকা নামেই যে তাঁ'র সৌন্দর্যপ্রিয়তা সীমিত তা নয়। বহু বিদেশী ছবি থেকে অপহরণ থুড়ি আহরণ করা বেশ কিছু ঘটনায় তিনি ছবিকে সুন্দর করে তুলতে যত্নবান।

খুব সম্ভব জে জী ঐন্দ্রজালিকও বটে। তা হইলে বিদেশী মুদ্রার যখন এতই আকাল শুনি, তখন জে জী তাঁ'র কল্পনা-বাহারকে রূপ দিতে সুইস মুদ্রার এমন অঢেল জোগান পান কোন মন্ত্রবলে!

পরমাণু বিজ্ঞানে তাঁ'র যে অগাধ জ্ঞানের পরিচয় এ ছবিতে পেলাম তাতে পরের ছবিতে তাঁ'র সুইজারল্যাণ্ড ছেড়ে মঙ্গলগ্রহে যাওয়া আশ্চর্যের নয়। আহা যেন তাই হয়। আমাদের মত অলসমূঢ় জনগণের (রবীন্দ্রনাথ বলেছেন—জে জী প্রমাণ করেছেন) তাতেই মঙ্গল।

জে জীর প্রতি সম্যক শ্রদ্ধা যদি এতেও না প্রকাশ করতে পেরে থাকি তাহলে প্রিয় পাঠক, আমাকে একটু সময় দিন, বটতলা সাহিত্যটা রপ্ত করে নিই।

আলোচ্য ছবি—আশিক হুঁ বাহারোঁকা পরিচালক—জে ওমপ্রকাশ, সঙ্গীত-পরিচালক—লক্ষ্মীকান্ত প্যারেলাল।

বিমান দাস

অসফল কৌতুক, অসফল প্রতীক

থিয়েটার ওয়ার্কশপ বরাবরই একটি চিহ্নিত নাট্যগোষ্ঠী। প্রায় ষাট দশকের শেষ থেকে আমরা এঁদের প্রযোজনা দেখছি।

নরক গুলজার পরিচালনা : বিভাস চক্রবর্তী

নাটক যেমনি হোক—সে নাটকের দুর্বলতা এঁরা সহসা বুঝতে দিতেন না।

তাই বলতে ভালো লাগে না, যে এঁ'দেরই নাটক 'নরক গুলজার'। 'চাক ভাঙা মধু' জনপ্রিয় হবার পর, বাঙালি নাটকের দল মুখ ঘুরিয়েছিলো কৌতুকপ্রবণতার দিকে। এখনো, বাঙালি স্টেজে তার আপত্তিকর ও বিপজ্জনক প্রভাব চলছে। কৌতুক রাখতেই হবে—নরক গুলজার এর নির্মাতাদের এই মনোভাব ছিলো, টের পাওয়া যায়। কিন্তু পৃথিবীতে সর্বাপেক্ষা কৌতুকবোধহীন লোকটির নাম গোপাল ভাঁড়, এ তথ্য তাঁরা ভুলে গিয়েছিলেন। তাই, এই নাটকে হিন্দুস্থানী উচ্চারণ, মাস্তানি স্ল্যাং, সংস্কৃত শব্দ প্রভৃতি সবরকম পেটেন্ট কৌতুক-উপকরণ আছে—যার জোগানদার বাংলা সিনেমা। এতেও হয়নি। যমের নিতম্বাশ্রিত ভাঙা, ছন্দ-সন্দর্ভ নন্দাপ্রাপ্তির বদলে তদলীলাভ এবং দেবতাদের ফড়পরজনিতজনিত ঘনঘন বাথরুমগমন দেখাতে এবং উল্লেখ করতে হয়েছে। গরুর মুখোস-পরা দেবতা-, কালোবাজারীরাও শেষ দৃশ্যে মঞ্চে এসেছেন। মঞ্চসজ্জা ছিলো ভালো। ওয়ার্কশপের কুশীলবদের 'টিমওয়ার্ক' সম্পর্কে প্রশ্ন ওঠে না— একমাত্র ফুটপাথ - দম্পতির নারীটির অভিনয় ছাড়া। মায়া ঘোষকে সাধ্যমত অনুকরণ করেও তাঁর অভিনয় ভালো হয়নি। কিন্তু এই অভিনয়কেও চীৎকৃত পদ্ধতি বেছে নিতে হয়েছে এই কারণে যে সত্যিই প্রাণবন্ত কিছু নেই।

গাড়োয়ানি রসিকতা স্থূল হাবভাবকে বরাবরই বেছে নিতে ভালোবাসে। বারবার ভগবানের ধুতি টেনে ধরা তারই প্রিয় হতে

মঞ্চের বাম কোণে ছিলো 'কলকাতাকে সুন্দর করুন' এই পোস্টার তার পাশে চলঘর। ফুটপাথ দম্পতির অভিনয়কেন্দ্র। মধ্যভাগে স্বর্গে ভগবানের গদি ও ডানকোণে নরককুণ্ড। ভগবান গদি রাখতে ব্যস্ত, তাঁর নাতি যম বড়োলোকদের কায়দা করতে পারেন না। এহেন অবস্থায় এঁ'দের সমস্যা আরো বাড়িয়ে দেয় যারা তারা বাংলা সিনেমা ও নাটকের পেটেন্ট রাজনীতিবিদ, অবাঙালী ব্যবসায়ী, সুদখোর জোতদার, ওয়াগন-ব্রেকার ও শীর্ণ পুলিশ। বহুকাল ধরে এরকম 'চরিত্রচিত্রণ' হয়ে আসছে। ফলাফল—রাজনীতিজ্ঞ - ব্যবসায়ী-সুদখোর-পুলিশ-মাস্তানরা নিরাপদেই আছেন। এই সমস্ত কষ্টকৌতুকই স্টক কৌতুক। নতুনত্ব আছে ভগবানের স্বর্গের এস্টাবলিশমেন্ট কল্পের ভাবনার পরিকল্পনায়, কিন্তু সেটা নতুনত্বই। রস ও কৌতুকশূন্য নতুনত্ব—যা পাড়ার নাটকে আপত্তিকর নয়। অবশ্য ভগবানের সমস্যা মিটিয়ে দিলেন ফুটপাথ-দম্পতি স্বর্গে এসে। এসূত্রে, স্টেজে আলোছায়ার খেলা ও খানিকটা ভায়োলেন্সও থিয়েটার ওয়র্কশপ আমাদের দেখিয়ে দিলেন। কিন্তু এখনে নাটক [illegible], কেননা, থিয়েটার ওয়ার্কশপ [illegible]বাদী চিন্তায় বিশ্বাসী। সুতরাং না[illegible] ষড়যন্ত্রে অপদার্থ দেবতাবৃন্দ ও [illegible]দের গোমূর্তিতে দম্পতির সঙ্গে পাশাপাশিতে ফিরতে হলো। অতো পাজি যারা ছিলো তারা কি গরু হয়ে স্বভাব বদলাবে? দুষ্টু গরুর থেকে শূন্য গোয়াল ভালো—এরকম শুনেছিলাম যে। এদিকটা পরিচালক বিবেচনা করেননি।

যদিও ফার্স-ফ্যান্টাসির মেলামেশা ঘটেছে এ নাটকে, স্পষ্ট বোঝা যায় যে নাট্যকার ও পরিচালক এই প্রহসনটির মাধ্যমে আমাদের সমাজের হায়ারার্কিকে বিদ্রূপ করতে চেয়েছেন, তাঁরা যে সামাজিক সমস্যা সম্পর্কে ওয়াকিবহাল তার অ্যালিবাই হিসেবে তুলে ধরেছেন পাঁচটি শোষক-চরিত্র ও দুটি শোষিত চরিত্রকে। প্রতীক জিনিষটা হয়ে ওঠে, প্রতীক করে তোলা যায় না—এটা মনে রাখলে, আমরা না হয় বলবো যে নাটকটা রূপক ব্যবহার করেছে। তাতে কি? সামাজিক সমস্যা যিনি সত্যিই জানেন, বোঝেন ও বোঝাতে পারেন তাঁর রূপকের ঢাক ঢাক গুড়গুড়ে কি দরকার? স্বর্গস্থ ফুটপাথ দম্পতির সঙ্গে ছায়াশরীরী শোষকদের হাতাহাতি যদি জনতার সমস্ত সংগ্রামকে বোঝায়ই, নারদটি কি 'সাইন' করছে? নিজেদের বর্তমান অবস্থাকে নিয়ে কার্টুন করা যায়, কিন্তু বইয়ে পড়া ভবিষ্যৎ কর্মপন্থাকেও সেই কার্টুনের সাহায্যে [illegible] করতে গেলে কর্মপন্থার কি হয় জানি[illegible] কার্টুনটি মাঠে মারা যায়, আর [illegible] নরক গুলজার করে তোলে। নাটক : নরক গুলজার, রচনা : মনোজ মিত্র, [illegible]লনা : বিভাস চক্রবর্তী।

Filmotsav 78

১৯৭৫ যে কলকাতায় অনুষ্ঠিত 'আদার সিনেমা' এবং পরের বছর বোম্বাইতে অনুষ্ঠিত আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবের অনুকরণে এ বছরের শুরুতেই মাদ্রাজে অনুষ্ঠিত হচ্ছে 'ফিল্মোৎসব-৭৮'। অ-প্রতিযোগিতামূলক এই আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র মেলা বলা যায় দক্ষিণ ভারতের নতুন বছরের বড় আকর্ষণ।

সংখ্যার হিসাবে মাদ্রাজ ভারতের জাপান, বছরে সবচাইতে বেশী সংখ্যায় ছবি তৈরী হয় এখানেই, কিন্তু পরীক্ষা-নরীক্ষার ঝোঁক ঐ রাজ্যে খুব কম। সম্প্রতি হাতে গোনা কয়েকজন তরুণ সে পথে সাহসভরে পা বাড়িয়েছেন। এই উৎসবের গুরুত্ব তাই সেখানে কম নয়।

ফিল্মোৎসবের আয়োজক ফিল্ম ফিনান্স কর্পোরেশন ও চলচ্চিত্র উৎসব আধিকারিক কয়েক মাস আগে থেকেই প্রস্তুতির কাজ শুরু করেছিলেন। তামিলনাড়ু সরকারও সর্বত সাহায্য করছেন। উৎসব কমিটি যে ছবিগুলি প্রদর্শনের বন্দোবস্ত করেছেন সেগুলি হল—লিওপোল্ড টোরি নেলসনের সেভেন ম্যাড ম্যান, সানতোস পেরিয়ার-এর টেন্ট অফ মিরাকলস, কুফোর ম্যান হু লাভড ওম্যান, গদারের ম্যাসকুলিন ফেমিনিন, আন্যেস ভাঁদার ওয়ান সিঙ্গস, দি আদার ডাজ নট, ক্লদ গোরেতার দি লেসমেকার, ফ্যাসবাইন্ডারের ফিয়ার ইটস দি সোল, এফি বেস্ট, ভোলকার ফাবনির দি ফিফথ সিন, ইস্তাভান জাবোর বুডাপেস্ট টেলস, ভিট্টোরিও টাভিয়ানির পাদরে পাদরোনে, ফ্রান্সেস্কো রোসির ইলাসট্রেসিয়ান করপসেস, জন ডোনারের অ্যান আমেরিকান ড্রিম, ইভো ফোরডকের মেটামরফসিস, মার্টিন স্করসিসেস ট্যাক্সি ড্রাইভার, অ্যালিস ডাজ নট লিভ হিয়ার অ্যানি মোর, রবার্ট অল্ড্রিচের হাসল, অরসন ওয়েলসের এফ ফর ফেক, উ ডি এলেনের লাভ এন্ড ডেথ, এলিয়া কাজানের দি লাস্ট টাইকুন, জেমস আইভরির নতুনতম ছবি রোজল্যান্ড।

এ ছাড়াও আফ্রিকার উন্নয়নশীল দেশ—যেমন আলজিরিয়া, মিশর, সেনিগাল, মরক্কো, সিরিয়া, টিউনিসিয়ারও কিছু ছবি থাকছে উৎসবে। গ্রীক পরিচালক মাইকেল কাকোয়ানিস ও ফরাসী অভিনেতা-পরিচালক জ্যাক তাতির এক গোছা ছবি প্রদর্শিত হচ্ছে।

উৎসবের ছবিগুলি মাদ্রাজ শহরের পাঁচটি ছবিঘর দেবী, দেবী প্যারাডাইস, এগা ও সত্যমে দেখানোর বন্দোবস্ত হয়েছে, সরকারী প্রেক্ষাগৃহ কলাইভানর আরঙ্গমে উদ্বোধনী ও অন্তিম সন্ধ্যার অনুষ্ঠান ছাড়া ভারতীয় ছবির এক ব্যাপক প্রদর্শনী চলবে। সেখানে সত্যজিৎ রায়, মৃণাল সেন, শ্যাম বেনিগাল, গিরিশ কারনাডের ছবি যেমন দেখান হবে, তেমনি চলবে তরুণ চিত্রকর গিরিশ কাসারবল্লি, অরুণ বিকাশ, ভীম সেন বা শ্রীধর ক্ষীরসাগরের ছবির প্রদর্শনী।

উৎসবের আরেকটি আকর্ষণ হল পাঁচ দিনব্যাপী এক আলোচনাচক্র। বিষয় ছবির ব্যবসা ও উৎপাদন মূল্য। অংশ নেবেন স্বদেশী ও বিদেশী চলচ্চিত্রকার-প্রযোজক। প্রায় পঞ্চাশজন বিদেশী অতিথি আসছেন উৎসবের অলংকার হিসাবে। কিন্তু তাঁদের নাম-ধাম এখনও অজ্ঞাত।

মাদ্রাজ থেকে সরেজমিনে খবর পাবেন শিগগির। ছবি আর ছবির মেলা নিয়ে আকর্ষণীয় খবর।

মাদ্রাজে অনুষ্ঠিত ফিল্মোৎসব-৭৮-এর নানা আকর্ষণীয় সংবাদ, আলোচনা ও ছবি অমৃতের আগামী সংখ্যা থেকে বেরোবে। মাদ্রাজ থেকে এই সংবাদ পাঠাবেন নির্মল ধর।

—নির্মল ধর

পূর্ব জার্মানীর ছবি

ইতালির ছবি

বহুরূপীর দুই একাঙ্ক

পশ্চিম বাংলায় ভালো নাটক আমরা প্রত্যাশা করি না। কেননা, কোনো নাটকের দলকে আমরা এ পর্যন্ত একটি হল দিতে পারি নি। আর, নাটককে এখন সিনেমা ছাড়াও লড়তে হচ্ছে যাত্রা ও টি-ভির সঙ্গে। কিন্তু, নাটকের দল এখন নাটক বাছেন, তখন একটা আশা থাকে। যদি রিয়ালিস্ট অ্যাপ্রোচ হয় সেই নাটকের, যেন তা বিশ্বাস্য হয়।

এগারোই ডিসেম্বর, সাতাত্তর সালে, আকাদেমি অব্ ফাইন আর্টসের হলে বসে, এ সব কথা মনে হচ্ছিল। স্টেজে তখন একটি পরোপকারী যুবক ডিগবাজি খাচ্ছেন। আজকাল প্রত্যেকটি নাটকে কিছু কিছু সহজসাধ্য শারীরিক কসরত দেখানো হয়। হয়তো যুবকদের ব্যায়ামে উদ্বুদ্ধ করার জন্যে। যে নাটকটি হচ্ছিলো, তার নাম 'পাখী'। এক হারিকেন বিক্রেতা যুবকের কাহিনী। সে পঞ্চম বিবাহ বার্ষিকী যাপন করছে। জাঁকজমক করেই প্রভিডেন্ট ফান্ডের টাকা তুলে। তার মা গাঁয়ে থাকেন। অসুস্থ, দরিদ্র। যুবকটি মাইনে পায় দেড়শো। সন্তানাদি নেই, কিন্তু আকাঙ্ক্ষা আছে। তার এমনতরো বিলাসিতার কারণ হলো, তার কিছু সচ্ছল বন্ধু-বান্ধব তাকে আর্থিক অবস্থা নিয়ে বিদ্রূপ করেছে। তাই সে মরিয়া হয়ে প্রভিডেন্ট ফান্ডের টাকা তুলে বিবাহ বার্ষিকীতে তাদের নেমন্তন্ন করে। মনে রাখা দরকার, তার স্ত্রী ধারের জন্যে মুখ দেখাতে পারে না। তার স্ত্রী ন্যাপথলিন পায় না বলে কারু-কাজ করা চাদর পোকায় কেটে যায়। স্ত্রীর ভূমিকায় সাঁওলী মিত্রের উজ্জ্বল শ্যাম-বর্ণ, মসৃণ ত্বক প্রথমেই চোখে পড়ে। দারিদ্র্য ঝড় বয়ে যাওয়া পাঁচটি বছরের স্ত্রী—ভাবতে কষ্ট হয়। তিনি রবীন্দ্র-সঙ্গীতও জানেন। একটি তাৎপর্যপূর্ণ গানও তিনি গান—ও জোনাকি কি সুখে ওই ডানা দুটি মেলেছো। দুটি ডানা ইকোয়ালটু এই দরিদ্র দম্পতি। তারা বড়োলোক নয় ইকোয়ালটু তুমি নওকো সূর্য নওকো চন্দ্র। সমীকরণ দেখলে রবীন্দ্রনাথ বলতেন, মেলাবেন তিনি মেলাবেন। নাটক জমে ওঠে যখন বন্ধুরা

সারিকা

আসেন না। তবে কিনা পাত্রপাত্রীরা যৌবনের প্রতীক, তারা সামলে নেয়। অপরাজিত দৃঢ়তা নিয়ে হাসাহাসি করে। নাটকটা, এক কথা, হয় না। হারিকেন বিক্রেতার স্ত্রীর সংলাপে হাতে হারিকেন বসিয়ে হাসাবার চেষ্টাগুলো—হয় না। আনন্দময় দরিদ্র যুবকের ব্যবহৃত টাইপ দেখিয়ে করুণ মাধুর্য আনা যায় না। একমাত্র সাঁওলী মিত্রই স্বচ্ছন্দ ছিলেন, যদিও তাঁকে ঐ চরিত্রে মানায় নি এবং তাঁর অভিনয় মাঝে মাঝে একজন চিত্রাভিনেত্রীকে মনে করিয়ে দেয়। সব থেকে বড়ো অস্বস্তিকর হচ্ছে এই আলটপকা দরিদ্র সহানুভূতি। যা কোনোভাবেই সমাজ সচেতনতা বোঝায় না।

পরের একাঙ্ক ছিলো আততায়ী। সেট খরচ প্রচুর—কিন্তু মঞ্চ স্থাপত্যে কোনো কল্পনা করতে দেবার অবকাশ নেই। একটি দোকানের মধ্যে বসে এক যুবা কেরানী ও এক প্রৌঢ় ক্যাশিয়ার গল্পসল্প করছেন। হঠাৎ তাঁদের আলো-চনার আততায়ীর আবির্ভাব ঘটলো। আমরা দেখলাম, কল্পনাতীত-ধরনে স্বাস্থ্য ভেঙে যাওয়া এক ধর্মেন্দ্র স্টেজে এলেন। ভয় দেখানো তাঁর প্রফেশান। উপস্থিত বাকি দুটি চরিত্র হাতে-মুখে ভয় পেলেন। হাঁটা-চলা স্বাভাবিক রইলো। ক্রমে আরো দুজনের আবির্ভাব। তাঁরাও তারপর দেখা গেলো আততায়ী নেই। চারজনে বিমূঢ়। যাকে পাচ্ছিলেন তাহলে সে কে? দর্শক বললেন, কেন, ভূত? অবশ্য নির্দেশক ভাবেন নি। ভ অস্তিত্বের টানাপোড়েন নিয়ে নাটক চেয়েছেন। কিন্তু বাস্তবতা থেকে সার্ডিটিতে কিভাবে লাফ দিতে তিনি জানেন না। আততায়ীর ভ চরিত্রাভিনেতা প্রায় কমিক হয়ে যাবা আরো অসুবিধে ছিলো। এছাড়া, ভ মূলক কথাবার্তা—যাকে আজকাল নাটকের কেপালসারি হিউমার বলা তা তো ছিলোই। একটা ভালো ল বহুরূপীর আগেকার অভিনয় পাল্টে গিয়েছে। কিন্তু সেই প চোখে লাগে না—কেননা সেই অন্যান্য গ্রুপ থিয়েটারেরও র আততায়ী নাটকটির কুশলীবরা স্বর অভিনয়ে এবং কম্পোজিশন রচনায় বারে কাঁচা। নাটকীয় বলতে গেলে ঘটনাই যে এঁরা এইসব নাটক কর বহুরূপীর ব্যানারে।

পার্থপ্রতিম কাঞ্

নেতাজী স্টেডিয়ামে রফি-রুণা-কি

ইয়াহু বলে চিৎকারের পর দম বাঁধা 'ও দুনিয়াকে রাখবালে' গাইতে ভারত বিখ্যাত গায়ক মহম্মদ রফি একটু বেকাদায় পড়ে গেলেন। খাদের গলাটা ঠিক ঠিক বলল না। তাহলেও গানেরই এক জায়গায় (মহল উদাস সুরেলা গলায় তিনি যেটুকু করলেন, তাঁর শনিবাসরীয় খোলখান ছাপিয়ে সেটুকুই শুধু কানে রয়ে

মহম্মদ রফির রেশ তখনও নি। রুণা লায়লা ধরলেন 'গঙ্গা আমা কথা আর সুরের অনবদ্য সমন্বয়, সেই রুণার কণ্ঠ মিলে সমস্ত প যেন মুহূর্তে [illegible] গেল। কানে বাঁশীর আওয়াজ সেদিনের বোম্বাই-অর্কেস্ট্রাতে যার অভাব ছিল। শ্রী লায়লা গঙ্গা থেকে নেমে এসে পরে গান করলেন। দেশী-বিদেশী মি অনেক।

এরই মাঝে হেলেন একটু গেলেন। অতঃপর আবির্ভূত কিশোরকুমার। সত্যিই তাঁর গান অভিজ্ঞতা। অত নাচনাচি করেও গল কি করে অত সুরে বলে সেটাই বিস্ম দরাজ গলায় তিনি অনেক কিছু শোনা হাল্কা সিরিয়াস দু ধরনেরই। তবে তাঁর গলায় সিরিয়াস গানই যেন প্রাণ পেয়েছিল। কিনারা ছবির 'জানে শোচ কর'—ছিল এ রকমই একটি গা

অসিতবরণ

বিচিত্রা

পৌলমির নৃত্য দীক্ষা

১৪ ডিসেম্বর অ্যাকাডেমি অব ফাইন আর্টস মঞ্চে বারো বছরের মেয়ে কুমারী পৌলমী যেরকম দাপটের সঙ্গে দক্ষিণ ভারতীয় ছন্দোলাবণ্য আর প্রবল প্রকাশক্ষম নৃত্য-প্রতিমা প্রতিষ্ঠিত করছে, দেখে বিশ্বাস করা শক্ত যে ভারত ন্যাটামে মাত্র তিন বছরের অনুশীলনের পর এই তার প্রথম পূর্ণাঙ্গ মঞ্চারোহন। সত্যি বলতে কী, তার এই আরঙ্গেত্রম্-এ আমি ভবিষ্যতের এক প্রবল প্রতিভাময়ী পূর্বভারতীয় ভারতনাট্যম শিল্পীকেই দেখতে পেয়েছি। জেনে ভালো লাগলো, নিষ্ঠ মেয়েটি এখন থেকেই কর্ণাটক সংগীত আর তামিল ভাষাও শিখছে। পুষ্প-দর্শন বাদে, আদি তালে গণেশকে তার পুষ্পাঞ্জলি দিয়ে অনুষ্ঠানের শুরু। তার ওই নৃত্যস্তবের পাশাপাশি আমাদেরও সাদা-মাটা ভাবে প্রার্থনা করতে ইচ্ছে হয়, মঞ্চের দেবতা যেন বরাবরই তার হাতের পুজোর জন্যে কাঙাল হয়ে থাকেন। ভারত নাট্যমের আদি অঙ্গরচনা, পরিভাষায় যাকে 'আড়াবু' বলে, পৌলমী যাঁতক্রমে যেভাবে ধরে-ছিল, তা দেখে মনে হয় প্রথম দিনই মঞ্চ-দেবতা তার পুজো গ্রহণ করেছেন। বাস্তবিক অলারিপু থেকে তিল্লানা পর্যন্ত মঞ্চ জুড়ে তার সাবলীল ছন্দোসঞ্চালন, ক্ষনে-ক্ষনে মুদ্রারচনা, বিশেষ করে মুখমণ্ডলে একের পর এক ভাবের মূর্তিতে প্রানদান করে যাওয়া দেখতে-দেখতে বারে-বারেই আমি মুগ্ধ হয়েছি। তার চোখের নৃত্যসম্ভবনা অপরিসীম। মধ্যযুগীয় বিকারের বলে চোখ না নাচিয়ে চোখ দুটিতে কতো বাঙ্ময় করে তোলা যায়, তার নান্দনিক নিদর্শন হিসেবে আমাদের অবিস্মরণীয় নৃত্যশিল্পীদের পাশাপাশি এই বালিকার নামটিও রাখতে চাই। তার চোখ-মুখই তার হৃদয়। নৃত্য আর অভিনয়ের যুগলমিলন শ্রীআদি পুষ্মায়া রচিত বর্ণম-এ 'মাইনম অদিনার' ও 'দিককু তেরিয়াম্ভা কাড়িল' পদম-দুটিতে পৌলমীর ভাব প্রকাশের ক্ষমতা দেখে ওকে নিয়ে খুব বেশি আশা করতে ইচ্ছে হয়।

অম্বুজেশ্বরী' পদমটিতে এক পায়ের নিশ্চল প্রতিমা কদাচিৎ-কখনো নড়ে গিয়ে যেটুকু বিঘ্ন ঘটায়, মুখের ভাব তার বহুগুণ সামর্থে অসুরনাশিনীর শক্তি ও লাবণ্যকে পুরাণ থেকে তুলে এনে প্রাণ দান করে। একেবারে শাস্ত্রীয় নিষ্ঠায়।

পৌলমীকে ওই পা দুভাবে দাঁড়ানোয়, স্থির প্রতিমা নির্মাণে আরো মন দিতে হবে। আমার বিশ্বাস, এই ত্রুটি ও অচিরেই কাটিয়ে উঠবে, কেননা, তার পদসঞ্চালন খুবই সুন্দর ও শাস্ত্রীয় অর্থে শুদ্ধ। সে-তুলনায় তার হাত কিছুটা ভ্রষ্ট মনে হলো। হাতের পাতার আনুভূমিক সংস্থাপন বা মণিবন্ধ ভাঙার অনুপাত বিষয়ে ও কি একটু সংশয়াচ্ছন্ন, না-কি অমনোযোগী? সুন্দরী গ্রীবার আধিক্য আমি নিতে পছন্দ করি না, পৌলমীকেও বেশ সতর্ক দেখলুম।

পৌলমী নাচ শেখে কলকাতার একমেব নিষ্ঠাবান দক্ষিণ ভারতীয় নৃত্যশিক্ষালয় কলামণ্ডলম-এ শ্রীমতী থাংকামণি কুট্টির কাছে। পিতা প্রখ্যাত অভিনয়শিল্পী সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় তার সাংস্কৃতিক প্রেরণার একটি চমৎকার পারিবারিক উৎস। সেদিনের অনুষ্ঠানে স্নেহশীল পিতা হিসেবে তাঁর শিল্পী-কন্যাকে নিবেদনের বিনীত ভঙ্গিটি ভারতের একটি চমৎকার সামাজিক আদর্শের স্মৃতি উসকে দেয়। বিষ্ণু দে-র 'একাদশী' কবিতাটি আমার মনে পড়ে উঠেছিল। অনুষ্ঠানে সম্মানিত অতিথি সত্যজিৎ রায়, শিক্ষাগুরু ও অনুষ্ঠান পরিচালিকা থাঙ্কামণি কুট্টি, সঙ্গীতশিল্পী লক্ষ্মী নারায়ণস্বামী, মৃদঙ্গবাদক ভি রামন ও বংশীবাদক এস হরিহরকে দাক্ষিণাত্যের

পৌলমি। ছবি সুকুমার রায়ের তোলা

সৌন্দর্যে ভূষিতা পৌলমীর মাল্যদান ও প্রণামের মুহূর্তগুলি কলকাতার নাগরিক দর্শকদের একটি প্রাচীন ভারতীয় প্রথার মহিমা মনে করিয়ে দিয়েছে। সত্যজিৎ, আমি সব সময়েই দেখেছি, শিল্পসংস্কৃতির যেকোনো প্রসঙ্গে যখন যা-ই বলেন, প্রতি দু-তিনটি বাক্যেই একটি করে নকশা, এবং ভেবে দেখবার মতো। সেদিনও তিনি এক লহমায় লক্ষ করলেন, পশ্চিমবঙ্গে মার্গ-সঙ্গীত এসেছে। কিন্তু ভারত নাট্যমের মতো মার্গ নৃত্য এখনো শেকড় গাড়েনি। তাঁর আশীর্বাদ পেয়ে পৌলমীর দায়িত্ব আরো বেড়ে গেলো, কেননা সেদিন তার সাধনার পরিচয় পেয়ে সত্যজিতের মতো আমরাও অনেকেই আশান্বিত হয়ে ভেবেছি, পূর্ব ভারতের এই দৈন্য পৌলমীরা একদিন দূর করে দেবে।

ধর্ম ও নন্দনতত্ত্বের যুগল মিলন

গুরু বিপিন সিং মণিপুরী নৃত্যে শুধু একটি নাম নয়, একটি প্রতিষ্ঠান, আলংকারিক আক্ষরিক দুই অর্থে। ২৭ নভেম্বর অ্যাকাডেমি অব ফাইন আর্টস মঞ্চে তাঁর প্রতিষ্ঠিত মণিপুরী নর্তনালয়ের অনুষ্ঠান ভারতের এই ধ্রুপদী নৃত্যকলার দিকে দর্শকদের নতুন করে মনোযোগী করবে। মণিপুরী নাচের নানা ঐশ্বর্য ও শাস্ত্রীয় রীতি-প্রকৃতি, নৃত্ত, নৃত্য ও নাট্যের সব-কটি দিক, দর্শনা ঝাবেরীর সরল কিন্তু পাণ্ডিত্যপূর্ণ মুখবন্ধে জেনে নেবার সুযোগ পেয়ে দর্শকরা খুব উপকৃত হয়েছেন। বিষয়ের মুখবন্ধের সঙ্গে দুয়েকটি নৃত্যাংশ গুরু বিপিন সিং যেভাবে অবলীলায় নেচে দেখালেন, তাকে প্রায় অলৌকিক বলা যায়। ধুতি-পাঞ্জাবি পরা ছোটোখাটো একটি মানুষকে সামান্য অঙ্গ সঞ্চালনে হুবহু হাতির দুলকি চাল ফুটিয়ে তুলতে দেখে নৃত্যের শক্তি ও সম্ভাবনা সম্পর্কেই আস্থা বেড়ে যায়। কি তাঁর 'গজগামিনী'তে, কি দর্শনার 'অভিসারিকা'য়, কি কলাবতী-শান্তিবালার ললিতোদ্ধত নর্তনে, সর্বত্রই মণিপুরীর নিজস্ব বৈশিষ্ট্য, সর্বত্রই প্রতিভা ও সাধনার যুগলমিলন। দর্শনার 'তাল রত্নাকর', শান্তিবালার 'তাল কংকণ', দর্শনা, শান্তিবালা, অঞ্জনা, শাশ্বতীর 'ভেঙ্গেনো প্রবন্ধ'—মণিপুরীর একেকটি বিস্ময়কে সুরে-তালে বর্ণচ্ছটায় বেঁধে আনে। কলাবতী, শান্তিবালা, দর্শনা গুরু বিপিন সিং-এর তিন শিষ্যা, মণিপুরীর তিনটি মণি। মণিপুরী নৃত্যের সব শাস্ত্র, সব সৌন্দর্য এঁরা পরম নিষ্ঠায় গুরুর কাছে শিক্ষা করেছেন। তিনজনকে মৃদঙ্গ বাদন-এ একসঙ্গে বাজাতে শোনা ও দেখা একটি অবিস্মরণীয় নান্দনিক অভিজ্ঞতা। শান্তিবালার একক পুংচোলম বা মৃদঙ্গ চোলম নৃত্যেরই বিস্ময়। মৃদঙ্গের কথায় শিবমঙ্গল সিং-এর নেপথ্যের মৃদঙ্গও উল্লেখ করতে হয়। মৃদঙ্গ মণিপুরেই বাজিয়েছে।

কলাবতী দেবী, শান্তিবালা দেবী, দর্শনা ঝাবেরী

মৃদঙ্গ, বর্ণাঢ্যতা, ধর্মবিশ্বাস, সূক্ষ্ম রুচি ও অপরূপ লাবণ্যের পাশাপাশি সেদিনের অনুষ্ঠানে আগাগোড়া আমাদের মুগ্ধ রেখেছে মণিপুরী প্রবল পদ সঞ্চালন ও প্রাণবান অঙ্গ আন্দোলন। মণিপুরী নাচে প্রবলতা আর লাবণ্য, আবার যুগলমিলন কথাটা ধার করতে ইচ্ছে হয়, একেবারে মিশে রয়েছে। যুগলমিলন ধর্ম ও নন্দনতত্ত্বেরও! রাখাল রাসের একটি অংশ কৃষ্ণ-বলরামের কন্দুক খেলা-এ তো কলাবতী শান্তিবালা দুই মণিপুরী বোন ছন্দোলাবণ্যের চরম করে ছেড়েছেন।

দ্বিতীয়ার্ধে ধর্মপ্রাণ মণিপুরের বিখ্যাত নৃত্যনাট্য 'মহারাস'। ১৭৭৯-র 'মহারাস' পরের যুগের গুরুদের রচনায় প্রযোজনায় আরো সুচারু, আরো লাবণ্যময় হয়েছে। ভাগবতের সঙ্গে পদাবলীর মিশ্রণ সেদিক থেকে তাৎপর্যপূর্ণ। মণিপুরে কার্তিক পূর্ণিমায় যা মণিপুরী রূগোই মারূপ-এর অনুষ্ঠানে আজকাল যে মহারাস দেখা যায়, তা এই পরের যুগের। সংস্কার ও সংযোজনাকে দ্বিগুণ সার্থক করছেন মণিপুরী নর্তনালয়ের শিল্পীরা। কৃষ্ণের বেশে দর্শনাকে দেখে মনে হয়, ওই বোম্বাইবাসী, গুজরাটি-তনয়ার মন মণিপুরেই পড়ে থাকে। রাধার ভূমিকায় কলাবতী দেবী অবিস্মরণীয়। অপর কৃষ্ণের ভূমিকায় শান্তিবালা মণিপুরী নৃত্যাভিনয়ের একটি স্থায়ী। শাশ্বতীর কৃষ্ণ দেখে তাঁর সম্পর্কে খুব আশা করতে ইচ্ছে হয়। বকাসুরের বেশে কুঞ্জ সিং-এর বকেন গ্রীবাভঙ্গি শুধু বকের গ্রীবাভঙ্গির সঙ্গেই তুলনীয়। অন্যান্য ভূমিকায় মিত্রা মিত্র, গৌরী দত্ত, স্বাতী গুহরায়, প্রীতি প্যাটেল, অঞ্জনা ঝাবেরী, মল্লিকা গঙ্গোপাধ্যায় গুরু বিপিন সিং-এর শিক্ষাপদ্ধতির সার্থক নিদর্শন। প্রথমার্ধের সংগীত ও নৃত্যরচনা তাঁরই। অনুষ্ঠানের একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ অতসী চট্টোপাধ্যায়ের কণ্ঠ।

অমরেন্দ্র চক্রবর্তী

নীলামে বিয়ের খাট

গল্পটি কিছু কিছু এলাকায় বেশ জনপ্রিয়। বাবার একমাত্র ও আদুরে ছেলে একদিন হঠাৎ কুড়ুল দিয়ে তার শোবার বিরাট তক্তাটির অর্ধেক কাটতে আরম্ভ করে। এতে বাবা অবাক ও ক্রুদ্ধ। তিনি এর কারণ জিজ্ঞেস করলে ছেলেটি কাটতে কাটতেই বলে, 'আমি তো একাই শুই, এতোবড় তক্তার দরকার নেই। বরং, এতে কিছু রান্নার কাঠ পাওয়া যাবে।' এভাবেই তার বিয়ের ইচ্ছা সে বাবার কাছে প্রকাশ করেছিল।

বাবা অভিজ্ঞ ব্যক্তি। তিনি গোপনে হেসে ছেলেকে ব্যস্ত হয়ে বলেন, 'থাক থাক, আর কাটতে হবে না। আমি ব্যবস্থা করছি।'

কলকাতা ও তার আশপাশ অঞ্চলে অবিবাহিত ছেলেদের এখন আর ওরকম কোন বিরাট খাট বা তক্তপোশ নেই যেটাতে বিয়ের পরও স্বচ্ছন্দে চলে যায়। না-থাকার নানা কারণ আছে। সেইজন্য বিয়েতে ফার্নিচার উপহার দেওয়ার প্রথা বেশ জাঁকিয়ে বসেছে। উপহার দেওয়া কেউ না-থাকলে নিজেদেরই কিনতে হয়।

পার্ক স্ট্রিট এলাকায় নীলামে বাজারে প্রতি রবিবারই প্রচুর খাট বিক্রি হয়। প্রথমে দুটো সিঙ্গল খাট নীলামে উঠল। আড়াইশো থেকে ডাক শুরু হয়ে শেষ হল দুশো নব্বুই-এ। বেশ ফুরফুরে

বহাওয়া। একটু শীত ও পড়েছে। তবে ছু পরে নীলামদার হাঁকলেন এ উডেন স্টেন ডাবল বেড। সানমাইকা ফিটিং। লেন, টু হ্যান্ডেড ফিফটি রুপিজ। ডাই শো।' একজন বয়স্ক ভদ্রলোক ডু করে বললেন, দুশো সত্তর। 'আর জন, দুশো আশী। এভাবে ডাক নশো চল্লিশে উঠে গেলে নীলামদারের ভাঁড় পড়ার এক মুহূর্ত আগে একজন য় লুকিয়ে লুকিয়ে বললেন, তিনশো াশ। সঙ্গে সঙ্গে হাতুড়ি পড়ে গেল ও টি ঐ দামে তাঁরই হয়ে গেল। জিজ্ঞেস রে জানা গেল, ভাই-এর বিয়ে। কিছু নিচার কিনতে এখানে এসেছেন। বল-লেন, দেখুন তো, কি ঝামেলা। নিজেরা সে পছন্দ করলে কতো সুবিধে হত। মন হচ্ছে, বুঝতেই পারছি না। তবে, ন্তো কি বলেন?'

বললাম, 'নিশ্চয়ই ভালো।'

এরপর নীলামদার হাঁকলেন, 'এ -ডোর ওয়র্ডরোব। প্র্যাকটিক্যালি নিউ।' ন সানমাইকা লাগানো ওয়র্ডরোবটি াসতে হাসতে চারশো পঞ্চান্ন টাকায় বিক্রী য়ে গেল।

আর এক জোড়া সিঙ্গল খাট বিক্রী ক মাত্র দুশো বিরানব্বুই টাকায়। একটু রই নীলামদার হাঁকলেন, 'এ বক্স স্প্রিং বল বেড। থ্রি হানড্রেড রুপিজ। নে?' খাটটা চমৎকার। হেসে-খেলে র দাম সাতশো টাকা। বিক্রী হল মাত্র চারশো পনেরো টাকায়। যিনি কিনলেন, ায় প্রথম থেকেই ডেকে যাচ্ছিলেন বলে, টো ওঁরই প্রাপ্য ছিল।

এক তরুণ এসেছিলেন, সঙ্গে তরুণী, ন ঘুরে ও মনোমত খাটটি পেলেন কয়েক মাস আগেই বিয়ে হয়েছে। মতুন বাসায় উঠে যাচ্ছেন বলে ফার্নিচার কেনাকাটা করতে হচ্ছে। পুরোনো বাসায় না-থাকার প্রধান কারণ, স্পেসের অভাব। হেসে বললেন, 'দেখি, পরের রোববার আসতে হবে।' তাঁর মুখে সারাদিনের ক্লান্তি ছিল। ঠোঁটে সিগারেট।

একরাম আলি

চাই না মাগো রাজা হতে

প্রচণ্ড শীতের কনকনানির মধ্যে ওরা চারজন হারমোনিয়াম বাজিয়ে গান ধরল 'ও মন মাঝি রে' তার সঙ্গে তবলা সঙ্গত। তবলা ঠিক নয়, মাটির খালি হাঁড়ি পেটের মধ্যে লাগিয়ে সঙ্গত করছিল। অনেক দূরে দাঁড়িয়েছিলাম ট্রেনের অপেক্ষায়। ট্রেনের অনেক দেরী। তাই ছোট ছোট পায়ে এগিয়ে এলাম ওদের কাছে। ওরা সবাই অন্ধ—জন্মঅন্ধ। কারও দেশ পূর্ব বাংলায় (বাংলাদেশ), আবার কেউ এদেশীয় মানুষ। রাণাঘাটের নগতলার তিপ্পান্ন বছর বয়সী দুলাল দাস। বাউল, ভৈরব, ভাটিয়ালী সুরে গাহিতে একবারে ওস্তাদ। দমদম স্টেশনে ঘন অন্ধকারে বাউল, ভাটিয়ালী সুরে পর পর কয়েকটি গান গেয়ে সকলের মন ভরিয়ে দিলেন। পাশেই দুলাল দাসের অন্ধ স্ত্রী একই সঙ্গে কণ্ঠ মিলিয়ে আসর মাত করে দিচ্ছিলেন। পরনে এক খণ্ড ছিন্ন বস্ত্র। নাম শান্তি দাস। দুলালবাবু কালকাটা ব্লাইণ্ড স্কুলে বেহালায় সঙ্গীত সাধনা করতেন। দুলাল-বাবুর মতে কালকাটা ব্লাইণ্ড স্কুল তৎ-কালীন লাটসাহেব শ্রীকৈলাসনাথ কাটজুর আমলে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। প্রায় বছর পঁয়ত্রিশ আগেকার কথা কি তারও কিছু বেশী। যেটুকু শিখেছিলেন তাই দিয়ে আজ ওদের একবেলার অন্ন জোটে। কোন দিন দু টাকা তিরিশ পয়সাও হয় আবার কোন দিন এগার টাকা দু পয়সাও জোটে।

কেবল দমদম নয়, বারুইপুর ও মধ্যমগ্রামের এই অন্ধ সমিতির সভ্যরা প্লাটফর্ম মাতিয়ে দিচ্ছে গান গেয়ে। কে বলবে ওরা নামী বা দামী শিল্পী নয়? বারুইপুরে ঠিক এই রকম একটি আসরে ওদের সমিতির বন্ধুরা পাঁচজনে মিলে একটি ইউনিট গড়ে পথে পথে গান গেয়ে অর্থ রোজগার করে। বারুইপুরে প্লাটফর্মে গানের আসর বসিয়েছিল। শুনেছিলাম গান। কিরণ বৈদ্য সভাপতি সমিতির। তারই নেতৃত্বে লুৎফর রহমান। মুজিবর রহমান ও বাবলু দাসরা মিলে এই আসর শুরু করত। মিউজিকের ব্যবস্থা আছে। গানের তালে তালে সেই খালি হাঁড়ির অপূর্ব সঙ্গত আর ঝিং-কিড়িকি প্রভৃতির ব্যবস্থা—একেবারে জমজমাট আসর। মূল গায়েন লুৎফর রহমান। সংস্থার সম্পাদক মুজিবর। বাবলু দাস ম্যানেজার-কাম-ট্রেজারার। আসর মাত করা গান শুনে দু-চার পয়সা দিতে যাত্রীরা সেদিন কার্পণ্য করে নি। লুৎফর একটি গান ধরল মান্নার গাওয়া 'ওই কূলে আমি আর ওই কূলে তুমি মাঝখানে নদী ওই বয়ে চলে যায়'—সত্যিই অপূর্ব। কিন্তু ভগা ওদেরকে দিয়েছে তাই ওরা অন্ধ, নাহলে অমন মধুর কণ্ঠভরা গান তো বড় বড় জলসায় আসর জমিয়ে রাখত।

লোকাল ট্রেনে কত অন্ধ মানুষ এই-ভাবে গান গেয়ে অর্থ রোজগার করে দুটো রুটির জন্য। সকলের না হলেও এক-একজনের গাইবার ক্ষমতা অপূর্ব। একদিন মধ্যমগ্রাম থেকে কলকাতা আসার পথে ট্রেনের মধ্যে একটি বছর পনেরোর অন্ধ বালক ভিড় ঠেলে ভিতরে এসেই সুরেলা গলায় গান ধরল 'চাই না মা গো রাজা হতে'। ট্রেনের ভিতরটা অফিসে আসার পথে একটা চালের বা পাটের গোডাউন অর্থাৎ একটার পর একটা এইভাবে সাজান। কোন প্রকারে লক্ষ্যস্থলে পৌঁছানোর জন্য প্রাণপণ চেষ্টা তারই মধ্যেই ওই অন্ধ বালক আবার শুরু করল 'ও বাবু একটা পয়সা দে দে'। —বিশ্বনাথ ঘোষ চৌধুরী

ভেনাস সার্কাস

বড় শহরে এরা এই প্রথম। আর প্রথম দিন থেকেই এরা কলকাতার খোকা-খুকুদের মন কেড়ে নিয়েছে। সেই সঙ্গে বড়দের। অবশ্য শহরে এবার সার্কাস এই একটিই। সার্কাসপ্রিয়দের তাই পার্ক সার্কাস ময়দানের ভেনাসকে দেখা ছাড়া গতি নেই। এরা কিন্তু সেই সুযোগ নিয়ে দাম-সারা গোছের কোন কিছু দেখাচ্ছেন না। সমস্ত খেলাতেই বেশ নিষ্ঠা এবং আন্ত-রিকতার ছাপ আছে। যার মধ্যে ট্র্যাপিজ, রোলার স্কেটিং, প্লাস্টিক স্কেচ, জল ভর্তি গ্লাস নিয়ে ব্যালান্স, দাড়ির ওপর মলগত ব্যালান্স, গ্লোবের মধ্যে মোটরবাইক চালান ইত্যাদি ভাল লাগবে। সেই সঙ্গে জলহস্তী, হাতী, ঘোড়া, উট, ভাল্লুক, বাঘ, জোকার—তো আছেই।

আমি দময়ন্তী বলছি

বলছিলেন দময়ন্তী দেবী। দময়ন্তী রায়। শুধুমাত্র বিউটিশান হয়েই একদা যিনি ইউরোপ ও আমেরিকার বিভিন্ন দেশে পাড়ি দিয়েছিলেন। বিভিন্ন দেশে পাড়ি দিয়েছিলেন। বিভিন্ন জায়গায় ঘুরে বিভিন্ন বিউটিশানের সঙ্গে থেকে হাতেকলমে কাজ করে যিনি আরও অনেক অজ্ঞাত প্রশ্নের উত্তর নিয়ে ফিরে এসে এদেশে লেডিস ফিনিশিং অ্যাণ্ড কালচারাল স্কুল করেছেন, সেই তিনিই সেদিন আমার কথার উত্তরে বলছিলেন, আসলে রূপচর্চার প্রথম কথাই হল স্কিন। স্কিন যদি ভাল না থাকে তবে কোন লোশনেই কোন কাজ হবে না। আরও একটা ব্যাপার আছে। আমার তো মনে হয় নারীর সৌন্দর্যের পেছনে স্কিনের মতই আর একটা ব্যাপার কাজ করে। সেটা তার হাঁটাচলা, কথাবার্তা এবং তার ব্যবহার। গুড বিহেব, সফট লুকিং অ্যাণ্ড সফট স্পোকিং—এই তিনটি গুন থাকলেই একজন নারী তার স্বাভাবিক নারীত্ব অর্জন করতে পারে। তাই নয় কি

—ঠিক তাই। আমারও তাই মনে হয়। আচ্ছা এসম্পর্কে ওদেশের মেয়েদের ধারনা কি ?

—দেখুন ওরা এ-ব্যাপারে অনেক অ্যাডভান্সড। একটি বারো চোদ্দ বছরের মেয়ে ওদেশে নিজেকে নিজেই তৈরী করে নিতে পারে। অবশ্য ওদেশের ক্লাইমেটই ওদের এমন তৈরী হবার সুযোগ দিয়েছে। আমাদের তো শীতপ্রধান দেশ নয় তাই আমরা অনায়াসেই নিজেদের শরীরকে অবহেলা করতে পারি। অথচ জানেন আমাদের দেশেই স্কিন সবচেয়ে ভাল থাকে

—আচ্ছা একটা কথা জিজ্ঞেস করব ? হঠাৎ কথার মাঝখানেই আমি কথা বলে বসলাম। বললাম, আচ্ছা বিদেশে যাবার আগে আপনি এ বিষয়ে এত উৎসাহ পেলেন কি করে ?

দময়ন্তী বললেন দেখুন ছেলেবেলা থেকেই এ ব্যাপারে আমি ভীষণ ইনটারেস্টেড। তার কারণও ছিল। আমার জন্ম শিলঙে। ছেলেবেলায় চোদ্দ থেকে পনের বছর পর্যন্ত ওই শিলঙে কাটিয়ে দিয়েছিলাম। শিলঙের ক্লাইমেট কুয়াশা-মাখা। জমাট বরফের মত কনকনে ঠাণ্ডায় জড়ানো। সুতরাং বুঝতেই পারছেন অবহেলা করলেও উপায় নেই। হাত পা ফেটে যাবে। মুখে ছিটছিটে দাগ ধরবে। চামড়া হয়ে উঠবে ফ্যাকাশে। আর তার থেকে বাঁচবার জন্যই খুব অল্পবয়স থেকেই আমি হাতের সামনে যা পেতাম তাই মেখে ফেলতাম। কখনো টাটকা মাখন। কখনো দুধের সর। একবার কি হল জানেন—আমার যখন সাত কি আট, হঠাৎ একদিন দেখি আমার গালের উপরে একটা ফোঁড়ার মত বসে উঠেছে। খুব বিচ্ছিরি। ভীষণ খারাপ লাগল। কিন্তু কি আর করি। তাড়াতাড়ি নানারকম জিনিস লাগাতে লাগলাম। তবু কমে না। বরং আরও বড় হয়ে উঠল। শেষ পর্যন্ত আমার যখন সব প্রচেষ্টায় ব্যর্থ হতে চলেছে সেই সময়ে দিদিমা বললেন, শিমুল গাছের ডাল চন্দনের মত বেটে ওখানে লাগালেই নাকি ভাল হয়ে যাবে। সত্যিই তাই হল। পরের দিনই মিলিয়ে গেল। আর তাতেই আমার উৎসাহ বেড়ে গেল। তখন দিদিমাকে দিন-রাত প্রশ্ন করি আর দিদিমাও উত্তর দিয়ে যান। সেই থেকেই জেনেছি গঙ্গার নরম পলিমাটি মুখে মাখলে মুখের রস সেরে যায়। বাঁটা চন্দনের সঙ্গে লেবুর রস কিংবা গ্লিসারিনের সঙ্গে লেবুর রস মেশালেও সেটা একটা উপকারী জিনিস। এমনি আরও অনেক উপকারী জিনিস আছে আমাদের প্রকৃতির মধ্যে যেগুলোকে খুব ভাল মত স্কিনের জন্য ইউজ করা যায়।
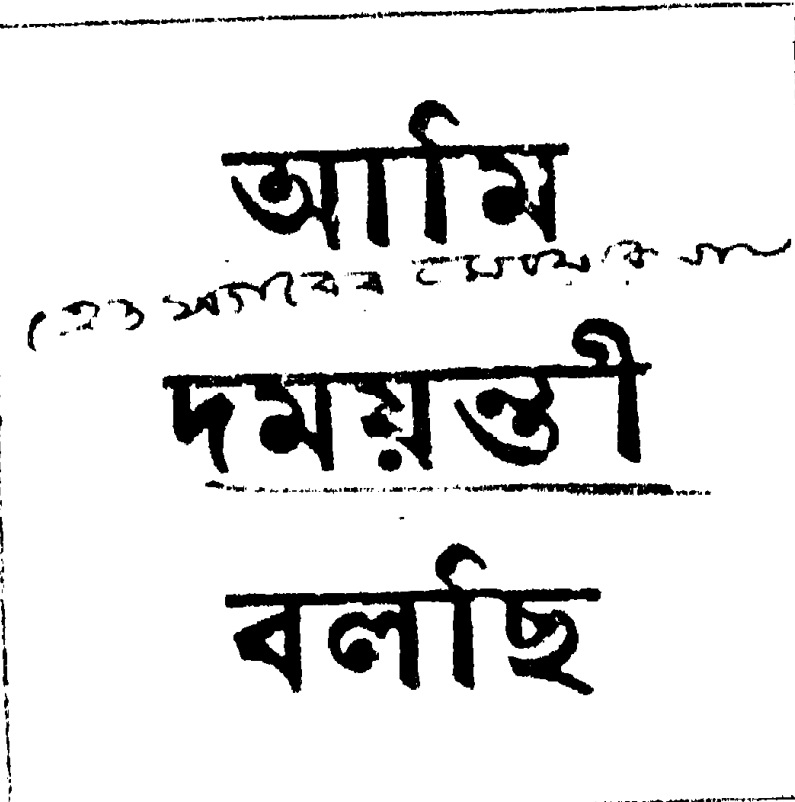
—আচ্ছা আপনি কবে বিদেশে যান ?

—১৯৭০। কিন্তু তার আগে '৬৮-তে এক বিদেশী মহিলা ছ'মাসের জন্য কলকাতায় এসেছিলেন। আমার সঙ্গে হঠাৎ তাঁর যোগাযোগ হয়ে যায়। বিউটিশান কোম্পানীর সেই মহিলার কাছেই প্রথম ৬ মাস আমি এবিষয়ে একটা ট্রেনিং নিলাম। আর তাতেই আমার চোখ গেল জানেন। দেখলাম আমরা ... সম্পর্কে কত অজ্ঞ। কত আনাড়ি। প্রায় জানি না। সেই মহিলাই প্রথম শেখালেন ক্লাইমেট ... লোশনের উপকারীতা। শেখালেন প্রোডাক্টের প্রপারলি ব্যবহার। ... ট্রেনিং শেষ হলেই আমি নিজের নানারকম থিয়োরি অ্যাপ্লাই ... নানারকম ...পরীক্ষানিরীক্ষা করতাম। দিনে ...ই আসে আমার কাছে। মেয়েরাই এসে তাদের সমস্যা আলোচনা করে। আর তার ফলেই একটা স্কুল করে বসলাম।

—তখন কি রকম ভিড় হত ? বলে বসলাম।

দময়ন্তী বললেন, বেশ ভি... অনেকেই আসতেন। এমনিতেই একটু তাড়াতাড়ি বিয়ে হয়েছিল উনিশে। আর তারপর থেকেই চাকরি করতে হয়েছিল। বেশ কট... আমি চাকরি করি। শেষ পর্যন্ত ... ওষুধ কোম্পানীতে চাকরি করা... ওরাই আমাকে রেমমেণ্ড করে পাঠিয়ে দেয়।

—ফিরে এসে আপনার কি ম...

—আমি খুব অবাক হয়ে গি... জানেন। নিউইয়র্ক, বোস্টন কানা... লন্ডন ফেরৎ যখন ভারতে ফিরে অ... আমার চোখ খুলে গিয়েছিল। ... ছিল সত্যিই কত কম জানতাম আ... তখনই সঙ্গে সঙ্গে ঠিক করে ফে... আমার এই অভিজ্ঞতা আর নতু... পরীক্ষাকে আমি কাজে লাগাব। ক... দিন তৈরী হল আজকের এই ফিনিশিং অ্যাণ্ড কালচারাল স্কু...

কথা বলতে বলতে একসময় থেমে দাঁড়ালেন দময়ন্তী দেবী। ... বেজে উঠেছিল। ধরার আগেই ... তাহলে আজ এখানেই থাক। সা... বরং অন্য কিছু নিয়ে আলোচনা ...

—হ্যাঁ সামনের দিন আমি ... আলোচনা করব। আর তারপরেই ... আসবে হাত-পা-মুখ-চুল এবং ... আজ এখানেই থাক।

সেই কথামতই ডেট নিয়ে ... পড়লাম। বাইরে শীতের সন্ধ্যা এসেছে ততক্ষনে।

প্র...

অমৃত পাবলিশার্স প্রাইভেট লিঃ-এর পক্ষে শ্রীসুপ্রিয় সরকার কর্তৃক পত্রিকা প্রেস ১৪, আনন্দ চ্যাটার্জি লেন, কলি... হইতে মুদ্রিত ও তৎকর্তৃক ১১।১, আনন্দ চ্যাটার্জি লেন কলিকাতা-৩ হইতে প্রকাশিত।

ইণ্ডিয়ান এণ্ড ইস্টার্ণ নিউজ পেপার সোসাইটির সদস্য

মূল্য ৭৫ পয়সা ॥ ত্রিপুরায় অতিরিক্ত বিমান মাশুল ১৫ পয়সা। ভারতের অন্যত্র অতিরিক্ত বিমান মাশুল ৩০ প...